756.3
002/2

বঙ্গদর্শন।

LIBRARY

১১ বর্ষ
১৩১৮

লোকশিক্ষা।

ক্রমশ নানা সমস্যা ভারতবর্ষে জটিল হইয়া উঠিতেছে। রাষ্ট্রীয় সমস্যা, সামাজিক সমস্যা, স্বাস্থ্য সমস্যা, জীবিকা সমস্যা—নানা সমস্যা আমাদের উন্নতির পথে তীক্ষ্ণধার কণ্টকের মত একে একে মস্তক উত্তোলন করিতেছে। এ সকল সমস্যার সমাধান না হইলে জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। কিন্তু এই সকল জটিল সমস্যার সমাধান কিরূপে হইবে?

আমাদের মনে হয় শিক্ষার বিস্তার ব্যতীত ইহাদের সমাধানের উপায়ান্তর নাই।

এ সময়ের কতকগুলি প্রধান সমস্যা লইয়া আলোচনা করিলেই এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে।

প্রথমে রাষ্ট্রীয় সমস্যা লইয়াই আলোচনা করা যাউক। রাষ্ট্রীয় সমস্যা বলিতে আমরা ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির অসদ্ভাবকেই বুঝিতেছি। ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নতির জন্য ভারতবর্ষে—এক মহান, ভারতীয় জাতিগঠন যে অবশ্য প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে কিছুমাত্র মতভেদ নাই। এই বৃহৎ জাতিগঠনের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্ববিধ বিরোধের সম্পূর্ণ উন্মূলন আবশ্যক। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে জাতিতে জাতিতে [illegible] থাকে থাকুক, কিন্তু যেন বিরোধ না থাকে; অন্যথায় বৃহৎ জাতিগঠন অসম্ভব।

এই বিরোধের কথা ভাবিতেই সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষের দুই প্রধান সম্প্রদায়—হিন্দুমুসলমানের কথা মনে আসে। এই দুই প্রবল সম্প্রদায়ের মধ্যে যতদিন বিরোধের মূল উৎপাটিত না হইবে ততদিন জাতীয় উন্নতি কিছুতেই সম্ভব হইবে না। একের বিরুদ্ধাচরণ অপরের সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিবে।

এই বিরোধের ব্যাপার প্রত্যেক চিন্তাশীল ভারতবাসীরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

জাতীয় মহাসভার সভাপতি সার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ স্বয়ং এই বিরোধ ভঞ্জনের জন্য উদ্যোগী হইয়া উভয় সম্প্রদায়ের দলপতিগণের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। দলপতিগণও কিরূপে এই বিরোধ বিদূরিত হইতে পারে তাহার নিরাকরণের জন্য আলোচনা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। কিন্তু ইহাই কি বিরোধভঞ্জনের জন্য যথেষ্ট? দলপতিগণ পরামর্শ করিয়া বিরোধভঞ্জনের জন্য যে ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন, সেই ব্যবস্থা অনুসারেই যে কাজ হইবে তাহার সম্ভাবনা কোথায়? শিক্ষিত মণ্ডলীর সঙ্গে অশিক্ষিত জনসাধারণের সংযোগসূত্র কোথায়? জন-

সাধারণ দেশের জন্য ত্যাগস্বীকারের মহিমাও বুঝে না, বিরোধভঞ্জনের আবশ্যকতাও বুঝে না। রাষ্ট্রীয় ঐক্য তাহাদের নিকট আকাশ কুসুমেরই মত অবোধ্য। সুতরাং যতদিন জনসাধারণকে আমরা এ সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণেও শিক্ষিত করিয়া তুলিতে না পারিব, ততদিন এ সমস্যার সমাধান কিছুতেই হইবে না।

সামাজিক সমস্যাসম্বন্ধেও এ কথা প্রযুজ্য। সামাজিক সমস্যা বলিতে আমরা হিন্দুসমাজের সমস্যা বলিয়াই বুঝিতেছি।

অল্পদিন হইতে দেখা যাইতেছে, জাতিভেদসমস্যা আমাদের সমাজে ক্রমশই জটিল হইয়া উঠিতেছে। নিম্নশ্রেণী উচ্চশ্রেণীর শ্রেষ্ঠতা আর স্বীকার করিতে চাহিতেছে না, এবং উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের চেষ্টা পরস্পরের প্রতি একটা বিদ্বেষ ও হিংসার সৃষ্টি করিতেছে। কার্য্যের দ্বারা, আচরণের দ্বারা যথার্থ উন্নতি লাভের চেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই কিন্তু এক জাতির অপর জাতির প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হওয়া সমাজের পক্ষে নিতান্তই অকল্যাণকর। সুতরাং ইহার প্রতীকার আবশ্যক। জাতিভেদ রক্ষা করিয়াও এই বিদ্বেষের ভাবকে দূরীভূত করা যাইতে পারে, যদি আমাদের আচরণ হইতে সর্ব্ব প্রযত্নে অনুদারতার ভাবকে আমরা বিদূরিত করিতে পারি। যে উদ্দেশ্যে জাতিভেদ প্রচারিত হইয়াছিল তাহা হইতে বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথা বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছে। আর সে বৃত্তিভেদও নাই, অধিকারভেদও নাই, শিক্ষাভেদও নাই। এখন এই কৃত্রিম ভেদের বন্ধনকে সহনীয় করিবার একমাত্র উপায় পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতি ও উদারতা প্রদর্শন।

অনুদারতার ভাব চলিয়া গেলে বিভেদ রক্ষা করিয়াও প্রীতি স্থাপিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু এ জন্যও শিক্ষার প্রয়োজন। অজ্ঞানই সমস্ত অনর্থের মূল।

শিক্ষা ব্যতীত উদারতা জন্মে না এবং উদারতা ব্যতীতও এ সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। জাতিভেদ ভিন্ন আরও নানা প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যা সমাজকে পীড়িত করিতেছে।

বিবাহে পণগ্রহণ-প্রথা ইহাদের অন্যতম। এই প্রথাকে অত্যন্ত কুপ্রথা বলিয়া অনেকে স্বীকার করিয়াও কার্য্যতঃ ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। শুনা যায়, স্ত্রীলোকদিগের বিবাহব্যাপারে আড়ম্বরপ্রিয়তাই এই প্রথাকে বদ্ধমূল করিয়া রাখিয়াছে। পুরুষেরা ইচ্ছা করিলেও স্ত্রীলোকদিগের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন না। যদি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে এ প্রথার দূরীকরণ জন্য স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার প্রয়োজন, এবং স্ত্রীশিক্ষাও লোকশিক্ষার অন্তর্গত।

সভ্যতার যেমন সুফল আছে, তেমনি কিছু কিছু কুফলও আছে। সেই কুফলকে বাধা দিবার এক মাত্র অস্ত্র—শিক্ষা। তাই শিক্ষা সভ্যতার অপরিহার্য্য অঙ্গ। যেখানে সভ্যতার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, অথচ শিক্ষার বিস্তার হয় নাই, সেখানেই অনর্থ উৎপাদিত হইয়া গিয়াছে। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে আদিম অধিবাসিগণের বিলোপের ইহাও এক প্রধান কারণ।

আমাদের দেশেও পাশ্চাত্য সভ্যতার

সঙ্গে সঙ্গে অসভ্যতার কুফলও প্রবেশ করিয়াছে। শিক্ষার বিস্তার ব্যতীত ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় দেখি না।

আমাদের দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে রেলওয়ে বিস্তৃত হইয়াছে এবং রেলওয়ের সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়াও দেশের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে।

কবে কোথায় সুদূর দ্বীপ হংকংএ প্লেগের আবির্ভাব হইয়াছিল। বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্বন্ধ না থাকিলে সে রোগ কখনই সাগর পার হইয়া এ দেশে উপস্থিত হইতে পারিত না। কিন্তু বাণিজ্যবিস্তার সভ্যতার অঙ্গ। ব্যাধিবিস্তারও সভ্যতার ফল।

এখন এ সকল ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার আবশ্যক।

আমরা এখন বুঝিয়াছি ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে গেলে, জলনিকাশের ব্যবস্থা, জঙ্গলপরিষ্কার, পানীয়জলের সুব্যবস্থা, মশকের আবাসস্থানভূত পুরাতন-জলাশয়ের সংস্কার প্রভৃতির একান্ত প্রয়োজন। যদি সাধারণের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়, তাহা হইলে ম্যালেরিয়াকে বিদূরিত করিতে অধিক সময় লাগে না। ধনী বা রাজা বহু আয়াসে যে কার্য্য সাধিত করিতে পারেন, জনসাধারণের সমবেত চেষ্টা অচিরে তাহা সুসম্পন্ন করিতে সক্ষম।

প্লেগের প্রকৃত নিদান আজও বুঝা না গেলেও এটুকু বেশ বুঝা গিয়াছে যে আবর্জ্জনা এবং সাধারণ স্বাস্থ্যবিধির লঙ্ঘনই এ রোগের প্রধান কারণ। সাধারণের মধ্যে এ শিক্ষার প্রচার না হইলে এ রোগের [illegible] আশা নাই। যে দেশে ঘরদুয়ার সংশোধিত করিবার চেষ্টা করিতে গেলে লোকে উত্তেজিত হইয়া উঠে, সে দেশে শিক্ষার বিস্তার যে কিরূপ অবশ্য প্রয়োজনীয় তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

প্রথম প্রথম প্লেগের দমনার্থ বিষনাশক দ্রাবকাদির প্রক্ষেপে লোকে রাজকর্ম্মচারীদের উপর কিরূপ উত্তেজিত হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিলেই এ কথার যাথার্থ্য অনুভূত হইবে। সুতরাং স্বাস্থ্যসমস্যার সমাধানের জন্যও শিক্ষা অপরিহার্য্য। শিক্ষার বিস্তার ব্যতীত জীবিকাসমস্যার সমাধানও সম্ভব নহে।

এখন যেরূপ দিন পড়িয়াছে তাহাতে জীবিকা-নির্ব্বাহের নূতন নূতন প্রণালী অবলম্বিত না হইলে, আর সকলের অন্নসংস্থান হইবে না।

যাহারা কৃষি লইয়া আছে, তাহাদের কৃষি-কার্য্যের উন্নতি করিতে হইবে, শিল্পের উন্নতি করিতে হইবে, ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হইবে, তবে সকলের পক্ষে অন্নসংস্থান সম্ভব হইবে।

নিরক্ষর কৃষিজীবী কৃষিসম্বন্ধে নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের সঙ্গে পরিচিত না হইলে কৃষির উন্নতি ঘটিবে না।

শিল্পের উন্নতির জন্যও নূতন উন্নত প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। এবং ত্যাগস্বীকার ও সহযোগিতা ব্যতীত নানা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বাণিজ্যের উন্নতি ঘটিবে না।

বৃহৎ কার্য্য এবং বৃহৎ চেষ্টার জন্য সম্মিলিত শক্তির প্রয়োজন। সম্মিলিত ভাবে কাজ-করা শিক্ষা-সাপেক্ষ। সুতরাং এ জন্যও শিক্ষার একান্ত আবশ্যক।

এইরূপে দেখা যাইতেছে আমাদের দেশে যে সকল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাদের সমাধানের জন্য শিক্ষা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। সুতরাং এখন আমাদের সর্ব্ব প্রযত্নে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে।

এত বড় প্রকাণ্ড দেশে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়াও সহজ ব্যাপার নহে। এই বিপুল জনসঙ্ঘের শিক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে বিনা ব্যয়ে নিম্নশিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। জীবনে প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয় গুলিরই মূলসূত্র এই নিম্নশিক্ষার অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে এবং কেহ যাহাতে অশিক্ষিত না থাকে সে জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

বহুদিন হইতে বিনা ব্যয়ে নিম্নশিক্ষার ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে। আশা করি গভর্ণমেণ্ট সত্বরেই তাঁহাদের ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন। যদি না পারেন তাহা হইলে দেশের লোককেই এই গুরু কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে।

শ্রদ্ধাস্পদ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলেন, যন্ত্রবদ্ধ শিক্ষাপ্রণালী আমাদের দেশের পক্ষে অনুকূল নহে। 'টোলে' যে প্রকার শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত, অনেকটা সেই প্রকারের প্রণালীই এ দেশের পক্ষে উপযোগী। ত্রিবেদী মহাশয়ের চিন্তাশীলতা এবং শিক্ষা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লোকপ্রসিদ্ধ। সুতরাং তাঁহার মত এ বিষয়ে অত্যন্ত মূল্যবান সন্দেহ নাই।

যদি শিক্ষার ব্যবস্থা দেশের লোককেই করিতে হয় তাহা হইলে যাহাতে সে ব্যবস্থা দেশের উপযোগী হয় সে চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য "বাঙ্গলার জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ" এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। নূতন চেষ্টা না করিয়া দেশের সকলে মিলিয়া যদি পরিষদের কার্য্যে সহায়তা করেন তাহা হইলেও এ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে। যেরূপেই হউক ইহা সকলেরই বুঝা প্রয়োজন যে শিক্ষা ব্যতীত আমাদের দেশের উন্নতির সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। এবং আপামর সর্ব্বসাধারণের শিক্ষা প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতবাসীর জীবনের লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন।

এখন সকল কথা ভুলিয়া ইহার জন্যই আমাদের প্রাণপণ করিতে হইবে। যে দেশে শত করা ৯৯ জন অশিক্ষিত সে দেশে কোন বৃহৎ অনুষ্ঠানই সিদ্ধ হইতে পারে না।

আমাদের উন্নতির পথে যদি আমরা আমাদের জনসাধারণকে সঙ্গে লইতে না পারি তাহা হইলে আমাদের কোন চেষ্টাই সফল হইবে না।

এবারকার কংগ্রেসে প্রস্তাব হইয়াছে যে আমরা যদি ইংলণ্ডের জনসাধারণকে আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে শিক্ষিত করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের দেশে রাজনৈতিক উন্নতি ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

এ কথা সত্য হইতে পারে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আমাদের দেশের জনসাধারণকে নিজের দেশের অবস্থা সম্বন্ধে শিক্ষিত করিতে পারিলে কি ততোধিক ফললাভের আশা করা যায় না?

জাতীয় মহাসমিতি যদি এখন কিছুকাল সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ জাতীয়শিক্ষা-বিস্তারে [illegible] আমাদের শক্তি ও সামর্থ্য

প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে আমাদের মনে হয় মহাসমিতির উদ্দেশ্য অধিক পরিমাণে সুসিদ্ধ হইবে।

এখন কিছুকাল শুদ্ধ এই কথা দেশের লোকের চিত্ত অধিকার করিয়া থাকুক যে দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতির ভিত্তিস্থাপনের জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন—লোকশিক্ষা। লোকশিক্ষা ব্যতীত সকল চেষ্টা, সকল উদ্যম, নিষ্ফল।

সাহিত্যে অপচয়।

কোন বিভাগেই প্রতিভাশালী লোক অধিক জন্মে না। সাহিত্যবিভাগেও সেই কথাই খাটে। সাহিত্যের পরিপুষ্টিও বহুল পরিমাণে সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন লেখকদিগের দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে, প্রতিভাশালীর তীক্ষ্ণ আলোক মধ্যে মধ্যে সাহিত্যকে আলোকিত করিয়া দেয় মাত্র।

প্রতিভা নিজের পথ নিজেই করিয়া লয়, তাহাকে পথ দেখাইয়া দিবার আবশ্যক হয় না। কিন্তু সাধারণ লেখকদিগের পক্ষে সে কথা খাটে না। তাহাদের শক্তিকে উত্তেজিত ও নিয়মিত করিতে হয়, নহিলে শক্তির অযথা অপব্যয় ঘটে। এই জন্যই সাহিত্যে সমালোচনার সৃষ্টি। সমালোচক লেখকের শক্তিকে উত্তেজিত এবং নিয়মিত করেন।

সাহিত্যের আদিম অবস্থায় যখন সাহিত্যের বিস্তৃতির দিকেই অধিক লক্ষ্য রাখিতে হয়, নির্ব্বাচনের বড় একটা অবকাশ থাকে না, তখন সমালোচনার আবশ্যকতা তত অনুভূত হয় না, কিন্তু যখন সাহিত্য বিস্তৃত হইয়া পড়ে, যখন কেবলমাত্র বিস্তৃতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সাহিত্যের উন্নতির দিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন হয়, তখন সমালোচনার অনাবশ্যকতাকে আর উপেক্ষা [illegible]

বাঙ্গালা-সাহিত্য এক্ষণে ইহার শৈশব অতিক্রম করিয়াছে। পরিপুষ্ট সাহিত্যের স্রোত এখন নানা দিকে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, এ সময়ে সাহিত্যের গতি ও প্রসারকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য সমালোচকের প্রয়োজন।

বাঙ্গলায় সমালোচক বড় বেশী নাই বলিলে বোধ হয় অনেকে বিস্মিত হইবেন। কারণ এখানে সংবাদ বা মাসিকপত্রের সম্পাদকমাত্রেই সমালোচক। কিন্তু আমাদের দেশে সংবাদপত্র বা মাসিকপত্রে সাধারণত যে সকল সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তাহাতে তেমন ফল হয় না। সমালোচকের কার্য্য অত্যন্ত গুরুতর। সমালোচকের অনেকগুলি গুণ থাকা প্রয়োজন। সমালোচকের সর্ব্ব প্রধান গুণ, আমাদের মনে হয়, সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ।

সাহিত্যের কল্যাণবাসনা যে সমালোচকের হৃদয়ের মধ্যে দৃঢ়মূল নহে, তাঁহার দ্বারা প্রকৃত সমালোচনা অসম্ভব। যিনি সাহিত্যকে আন্তরিক ভাল বাসেন, তিনিই সাহিত্যের উন্নতি ও সংস্কারকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। এই উন্নতি ও সংস্কার অনায়াসলভ্য নহে, এ জন্য প্রগাঢ় চিন্তা এবং সতর্ক [illegible] তীক্ষ্ণদৃষ্টির প্রয়োজন [illegible]

এত কষ্ট কেহ স্বীকার করিতে পারে না। সমালোচকের দ্বিতীয় গুণ, আমাদের মনে হয়, আত্মসংযম। আমরা সকলেই নিজের রুচি দিয়া পরের রচনা বিচার করি। নিজের ব্যক্তিগত প্রীতি ও অপ্রীতিকে যথাসম্ভব পরিহার করিতে না পারিলে নিরপেক্ষ সমালোচনা হয় না। বিচারককে নিরপেক্ষ বিচারের জন্য নিজের জ্ঞান ও ধারণাকে দূরে রাখিতে হয়, সমালোচকের পক্ষেও সেই ব্যবস্থা। এ কথা শুনিতে সহজ, কিন্তু ইহা কঠোর আত্মসংযম-সাপেক্ষ।

আর এক বিষয়েও সমালোচককে সংযত হইতে হয়। অপ্রীতিকর ভাষায় মতামত প্রকাশের প্রলোভন হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে হয়। কঠোর ভাষায় সমালোচনা করিলে পাঠকের কৌতুকবৃদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু সমালোচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়। সত্যকেও প্রীতিকর ভাষার সাহায্যে মনোরম করিয়া তুলিতে হয়, নহিলে সত্যকেও কেহ গ্রহণ করিতে চাহে না।

সমালোচকের তৃতীয় গুণ লেখকের প্রতি পরিপূর্ণ সহানুভূতি। যেখানে আন্তরিক প্রীতি নাই, সেখানে কল্যাণও নাই। লেখকের উন্নতি ও কল্যাণই সমালোচকের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, লেখকের প্রতি আন্তরিক প্রীতি না থাকিলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না।

যাঁহারা নির্দ্দয়ভাবে লেখককে আক্রমণ করেন, তাঁহাদের সমালোচনায় কোন উপকার হয় না। লেখকের শক্তিকে উত্তেজিত করিয়া তোলাও সমালোচকের কাজ। কঠোর আক্রমণে ক্ষীণ শক্তি বিলুপ্ত হয়। সুতরাং যেখানে লেখকের মধ্যে অতিসামান্য শক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানেও উৎসাহ দ্বারা সেই ক্ষুদ্র ক্ষমতাকে বিকশিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা সমালোচকের কর্ত্তব্য।

সমালোচকের চতুর্থ গুণ—সর্ব্বতোগামিনী বুদ্ধি এবং সর্ব্বপ্রকার ভাবের অনুভবক্ষম হৃদয়। যাঁহাদের সঙ্গীতে কান নাই, তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গীতের বিচার করিতে যাওয়া যেমন বিড়ম্বনা, যাঁহাদের তীক্ষ্ণ অনুভবশক্তি নাই, তাঁহাদের পক্ষে সমালোচনা করিতে যাওয়াও তেমনি অনধিকারচর্চ্চা। লেখককে ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে, লেখকের ভাবে নিজেকে অনুপ্রাণিত করিবার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। সে ক্ষমতা না থাকিলে লেখকের বিচার করা যায় না। অনেক সমালোচক লেখকের ভাবের মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত না করিয়া রচনা অবোধ্য বলিয়া লেখককে সকলের নিকট উপহাসাস্পদ করিতে চেষ্টা করেন এবং লেখক যাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, তাঁহার প্রতি সেই সকল বিষয়ের মিথ্যা আরোপ করিয়া তাঁহাকে দোষী প্রতিপন্ন করেন।

এরূপ আচরণ সমালোচকের পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয়। ইহাতে সমালোচক লেখককে লঘু করিতে গিয়া নিজেই হাস্যাস্পদ হন।

সমালোচকের পঞ্চম গুণ—উদারতা। একই বিষয় নানা দিক হইতে নানা ভাবে আলোচিত হইতে পারে। সুতরাং ধৈর্য্যসহকারে সকলেরই মতামত নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবার জন্য সমালোচককে প্রস্তুত থাকিতে হয়। নিজের মতের বিরুদ্ধ কোন অভিমত দেখিলেই সে মতকে কোন প্রকারে নিরাস করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলে চলে না। যাহার যে টুকু প্রাপ্য তাহাকে সে টুকু দিতে

হয়, নহিলে সমালোচকের কর্ত্তব্যের ত্রুটি ঘটে।

সমালোচকের ষষ্ঠ গুণ—প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। যাঁহার কর্ত্তব্য লেখককে পরামর্শ দান করা, তাঁহার সাধারণত সকল বিষয়েরই অন্তত মূলসূত্রগুলি জানা প্রয়োজন। তুলনায় সমালোচনার জন্য বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় এবং সাহিত্যের প্রকৃতি ও প্রবণতা নির্ণয়ের জন্য সাহিত্যের ইতিহাসেও তাহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক।

এই সকল বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে বাঙ্গালাদেশে সমালোচকের কত অভাব।

আজকাল বাঙ্গলাভাষার লেখকসংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু অনেক লেখকের রচনাই অসার। তদ্দ্বারা সাহিত্যের কোনই উপকার হইতেছে না। এই যে প্রচুর শক্তির অপচয়, ইহাকে আমরা সাহিত্যের পক্ষে ক্ষতি বলিয়া মনে করি। আমাদের মনে হয় উপযুক্ত রূপে পরিচালিত হইলে এই সকল লেখকদের দ্বারা সাহিত্যের অনেক উপকার সাধিত হইতে পারে।

যাঁহারা মৌলিক রচনায় ব্যর্থকাম, হয় ত তাঁহাদের দ্বারা উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলীর অনুবাদ-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, যাঁহাদের নিজের চিন্তাশীলতা নূতন তত্ত্বোদ্ভাবনের পক্ষে যথেষ্ট নহে, তাঁহাদের দ্বারা সঙ্কলন-কার্য্য হয় ত উত্তম রূপে সাধিত হইতে পারে; অনেক যিনি উপন্যাস-রচনা লইয়া শক্তি ক্ষয় করিতেছেন, তাঁহার দ্বারা হয় ত ইতিহাসের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হইতে পারে, যিনি কবিত্ববশপ্রার্থী হইয়া অর্থহীন প্রলাপে ভাষাকে পীড়িত করিতেছেন, তিনি হয় ত গদ্যরচনায় সফলতর হইতে পারেন। এই পরিচালনা-কার্য্যের জন্য উপযুক্ত সমালোচকের অভ্যুদয় প্রার্থনীয়।

সমালোচকের যে সকল গুণের আবশ্যক, কোন ব্যক্তিবিশেষ সে সমস্ত গুণের অধিকারী না হইলে, কয়েক জনের সম্মিলিত চেষ্টাতেও এ কার্য্য সাধিত হইতে পারে। যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনি যদি সেই সেই বিষয় সম্বন্ধে লেখকদিগকে পরিচালিত করেন, তাহা হইলেও যথেষ্ট উপকার হয়। আমাদের মনে হয়, যদি কেবল সমালোচনার জন্য একটি সমিতি গঠিত হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থা মত সাহিত্যের কার্য্য বহু পরিমাণে অগ্রসর হইতে পারে। সাহিত্যে সংযম ও শ্লীলতা রক্ষার জন্য এবং দেশবাসীর রুচিকে মার্জ্জিত করিবার জন্যও এরূপ সমালোচক-সমিতির প্রয়োজন হইয়াছে।

দুর্ভাগ্যবশত সময়ে সময়ে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, ক্ষুদ্র স্বার্থ, লজ্জাকর সংকীর্ণতা এবং কুরুচি সাহিত্যকে কলঙ্কিত করে। ইহাদের দমনের জন্যও অতন্দ্রিত সমালোচকের আবশ্যক।

সাধারণের রুচিকে গঠিত করিয়া তোলাও সমালোচকের অন্যতম কার্য্য। যাহা সুন্দর, যাহা সত্য, যাহা শিব,—সেই দিকে যাহাতে পাঠকের রুচি আকৃষ্ট হয়, সে চেষ্টা করাও সমালোচকের কার্য্য, ইহা দ্বারা পাঠকের মানসিক অবস্থা উন্নত হয়, সুলেখকগণও উৎসাহ প্রাপ্ত হন। রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণকে বলিতে শুনিতে পাই, শ্রোতৃবৃন্দের জন্য

নাট্যালয়ে উৎকৃষ্ট নাটক অভিনীত হইতে পারে না। শ্রোতারা যাহা চাহে তাহা দিতে গেলে বাধ্য হইয়া নাটকের সৌন্দর্য্যকে ক্ষুণ্ণ করিতে হয়। সমালোচকের চেষ্টায় পাঠক ও শ্রোতার রুচি সংশোধিত হইলে এ অভিযোগের কারণ বিদূরিত হইতে পারে।

আমরা আশা করি, আমাদের সাহিত্য-সমাজের অগ্রণীগণ এ বিষয়ে মনঃসংযোগ করিয়া বৃথা অপচয় হইতে সাহিত্যিক শক্তিকে রক্ষা করিবার উপায় বিধান করিয়া দিবেন।

বুদ্ধ-সংবাদ।

(১)

(মূলপালি দীঘনিকায়ের অন্তর্গত সোণদণ্ডসুত্ত)

ব্রাহ্মণ

কোন সময়ে ভগবান্ বুদ্ধ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতে করিতে অঙ্গদেশের অন্তর্গত চম্পানামক নগরীতে সমাগত হইয়া তত্রত্য গর্গরা-নামক পুষ্করিণীর তীরে বিহার করিতেছিলেন, সেই সময়ে ঐ চম্পানগরীতেই সোণদণ্ড নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইনি সুপণ্ডিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন; এবং মগধরাজ সৈনিক বিম্বিসার তাঁহাকে সম্মান করিয়া ঐ চম্পানগরী খানি রাজকীয় দানরূপে প্রদান করিয়াছিলেন। ভগবানের আগমন সংবাদে ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ দলে দলে তাঁহাকে দেখিবার জন্য গমন করিতেছে দেখিতে পাইয়া সোণদণ্ডও গমন করিতে উদ্যত হইলেন। সেই সময়ে চম্পানগরীতে বিবিধ রাজ্য হইতে আগত শতশত ব্রাহ্মণ সোণদণ্ডের নিকটে মন্ত্র (বেদ) অধ্যয়ন করিবার জন্য বাস করিতেন। সোণদণ্ড বুদ্ধদেবকে দেখিতে যাইবেন শুনিয়া ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—

'আপনি কি শ্রমণ গৌতমকে দেখিবার জন্য সত্যই গমন করিবেন?'

'হাঁ; আমার মনে হইতেছে যে, আমিও তাঁহার নিকটে দেখা করিবার জন্য গমন করিব।'

'না, আপনি তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য যাইবেন না। আপনার তাঁহার নিকটে যাওয়া উচিত নহে। আপনি যদি তাঁহার নিকটে যান, তাহা হইলে, আপনার যশের হ্রাস এবং শ্রমণ গৌতমের যশের বৃদ্ধি হইবে। এ জন্য আপনার সেখানে যাওয়া উচিত নহে, তাঁহারই আপনাকে দেখিবার জন্য আগমন করা উচিত। আপনার পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়ই বিশুদ্ধ, আপনি এইরূপ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সপ্তমপুরুষ পরম্পরা পর্য্যন্ত কেহ কখনো জাতিগত কোন কথায় এই বংশের নিন্দা বা কুৎসা করিতে পারে নাই। আপনি মন্ত্রজ্ঞ, বেদপারদর্শী ও অন্যান্য বিবিধ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। আপনি সুরূপ, দর্শনীয় ও ব্রহ্ম-বর্চঃসমন্বিত। [illegible] আপনি আচার্য্য

গণেরও আচার্য্য, আপনি তিনশত বটুকে মন্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া থাকেন; নানা দেশ ও নানা জনপদ হইতে মাণবকগণ অধ্যয়ন করিবার জন্য আপনার নিকটে আসিয়া থাকে। আপনি প্রাচীন হইয়াছেন, বৃদ্ধ হইয়াছেন, আপনার বয়স পরিপূর্ণ হইয়াছে; আর শ্রমণ গৌতম ত তরুণ, তিনি তরুণ পরিব্রাজক। মগধরাজ সৈনিক বিম্বিসার আপনার সৎকার করেন, পূজা করেন, মান্য করিয়া থাকেন, গুরু বলিয়া সম্মান করেন। মগধরাজ বিম্বিসার আপনাকে সজলতৃণকান্ত এই চম্পানগরীকে রাজদানরূপে প্রদান করিয়াছেন, আপনি তাহাতেই অধিষ্ঠান করিতেছেন। অতএব আপনার সেখানে যাওয়া উচিত নহে, আপনি সেখানে যাইবার যোগ্য নহেন; শ্রমণ গৌতমেরই আপনাকে দর্শন করিবার জন্য এখানে আগমন করা উচিত।'

এই কথা শুনিয়া শোণদণ্ড বলিলেন যে, তাঁহারা তাঁহার যে সমস্ত গুণকলাপ উল্লেখ করিয়া শ্রমণ গৌতমের নিকট গমন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, শ্রমণ গৌতমের সেই সমস্ত গুণের অভাব নাই; তাঁহাতে ত ঐ সমস্ত গুণ আছেই, তাহা ছাড়া আরো অধিক গুণ আছে। তিনি বলিলেন— 'শ্রমণ গৌতম মহান্ জ্ঞাতিবন্ধুবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছেন। তিনি ধরাধামের ও আকাশধামের প্রভূত সুবর্ণ-হিরণ্য পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছেন। তিনি তরুণ ও অভিকৃষ্ণকেশ হইয়াও, শোভনযৌবনযুক্ত হইয়াও, প্রথম বয়সে বিদ্যমান থাকিয়াও গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রমণ গৌতম পিতার রোরুদ্যমান প্রবৃত্ত অশ্রুমুখ অনিচ্ছু পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিয়া কেশশ্মশ্রু অপনীত করিয়া কাষায় বসন ধারণ করিয়াছেন। শ্রমণ গৌতম সুন্দর, সুরূপ ও ব্রহ্মবর্চ্চসযুক্ত। তিনি শীলবান্ আর্য্যশীল, কুশলশীল, কীর্ণরাগ ও চাপল্য-হীন। ব্রাহ্মণগণ, শ্রমণ গৌতম মহাধন-শালী মহাভোগশালী আঢ্যবংশ হইতে প্রব্রজিত হইয়াছেন। মগধরাজ সৈনিক বিম্বিসারের ন্যায় কোশলাধিপতি প্রসেনজিৎও তাঁহাকে সম্মান করেন, পূজা করেন, সৎকার করেন, এবং তাঁহার গৌরব করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ পুষ্করসাদীও তাঁহাকে এইরূপে সম্মান করেন। কেহ উপস্থিত হইলে শ্রমণ গৌতম স্বাগতসম্ভাষণে সমাদর করেন, এবং প্রথমে তিনিই কথা কহিয়া থাকেন। লোকে ইঁহার কল্যাণ কীর্ত্তিশব্দ সর্ব্বত্রই উত্থিত হইতেছে। ইঁহার যশ সাধারণ শ্রমণ-ব্রাহ্মণের ন্যায় যেমন-তেমন নহে, অলৌকিক বিদ্যা ও আচরণ-প্রভাবে ইঁহার যশ অভ্যুত্থিত হইয়াছে। আরো দেখুন ব্রাহ্মণগণ, তিনি আমাদের চম্পায় আগমন করিয়া পুষ্করিণী গর্গরার তীরে বিহরণ করিতেছেন, তিনি আমাদের গ্রাম-ক্ষেত্রে আগমন করিয়াছেন, তিনি আমাদের অতিথি, অতিথিকে আমাদের পূজা করিতে হইবে, সম্মান করিতে হইবে, সৎকার করিতে হইবে, এবং তাঁহার গৌরব করিতে হইবে। অতএব শ্রমণ গৌতম আমাদিগকে দর্শন করিবার জন্য এখানে আসিতে পারেন না, আমাদেরই তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য যাওয়া উচিত। আমি ত তাঁহার এই কয়টিমাত্র প্রশংসা করিলাম, আমি তাঁহার প্রশংসা শেষ করিতে পারি

নাই, তাঁহার প্রশংসা অপরিমিত।'

'আপনি যেরূপ ইঁহার যশোবর্ণনা করিলেন, তাহাতে, ইনি যদি শতযোজন দূরেও থাকেন, তথাপি তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য শ্রদ্ধাবান্ কুলপুত্রের পাথেয় বন্ধন করিয়াও গমন করা উচিত। অতএব আমরা সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিব।'

অনন্তর সকলেই গমন করিলেন। শোণদণ্ডও গমন করিতে করিতে যখন বিহারের বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার মনে এইরূপ বিতর্ক উঠিতে লাগিল 'আমি যদি শ্রমণ গৌতমকে কোন প্রশ্ন করি, আর যদি তিনি তাহাতে এইরূপ বলেন যে, "ব্রাহ্মণ, এ প্রশ্ন এই প্রকারে জিজ্ঞাসা করিতে হয় না, ইহা এইরূপে জিজ্ঞাসা করা উচিত," তাহা হইলে এই পরিষৎ আমাকে পরিভব (অনাদর) করিবে, তাহারা বলিবে যে, "ব্রাহ্মণ শোণদণ্ড মূঢ় অবিজ্ঞ, ইনি শ্রমণ গৌতমকে যুক্তিদ্বারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পরিলেন না," এই পরিষৎ যাহাকে পরিভব করে, তাহার যশোহানি হয়, আবার যাহার যশোহানি হয়, তাহার ভোগের হানি হইয়া থাকে। আমার ভোগ ত যথেষ্ট। আবার শ্রমণ গৌতমই যদি আমাকে প্রশ্ন করেন, আর উত্তর প্রদান করিয়া তাঁহাকে যদি আমি সন্তুষ্ট করিতে না পারি, এবং তিনিও যদি বলেন যে, "ব্রাহ্মণ, এ প্রশ্নের উত্তর এরূপভাবে করিতে হয় না, এইরূপ করিতে হয়", তাহা হইলেও ত এই পরিষৎ আমাকে ঐরূপ পরিভব করিবে। আবার যদি এত সমীপাগত হইয়াও তাঁহাকে না দেখিয়াই চলিয়া যাই, তাহা হইলেও এই পরিষৎ আমার পরিভব করিবে

তিনি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতেই অন্যান্য সকলের সহিত ভগবানের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহার সহিত যথোচিত সম্ভাষণ ও কুশলপ্রশ্ন করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। চম্পাবাসী ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ ঐ রূপে উপবেশন করিলেন, ইঁহাদের মধ্যে কেহ অঞ্জলি বন্ধন করিয়া, কেহ কেহ নামগোত্র উল্লেখ করিয়া, এবং কেহ কেহ বা মৌনাবলম্বনেই এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। শোণদণ্ড মনে মনে তাহাই ভাবিতেছেন, তিনি মনে করিতেছেন, শ্রমণ গৌতম যদি আমাকে আমাদের ত্রৈবিদ্য আচার্য্য-বিষয়ে প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে আমি প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া তাঁহার চিত্তারাধনা করিতে পারিব।

ভগবান্ স্বচিত্তে শোণদণ্ডের চিত্তবিতর্ক বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে তাদৃশ প্রশ্ন করিবার জন্যই ইচ্ছা করিলেন এবং বলিলেন—'হে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ কতগুলি অঙ্গ (অর্থাৎ ধর্ম্ম বা গুণ) বিশিষ্ট হইলে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে "ব্রাহ্মণ" বলিয়া জানাইতে পারেন? এবং তিনিও নিজেকে "আমি ব্রাহ্মণ" এই কথা ঠিকভাবে বলিতে পারেন, এবং তাহা তাঁহার মিথ্যা বলা হইবে না?'

শোণদণ্ড ভাবিলেন যে, তিনি মনে যাহা করিতেছিলেন, তাহাই হইয়াছে। অনন্তর তিনি শরীর উন্নত করিয়া ও পরিষৎকে অবলোকন করিয়া কহিলেন—

'হে গৌতম, ব্রাহ্মণগণ পাঁচটি অঙ্গে সমন্বিত ব্রাহ্মণকে "ব্রাহ্মণ" বলিয়া জানাইয়া থাকেন, এবং তিনিও নিজেকে "আমি

ব্রাহ্মণ" এই কথা ঠিক ভাবে বলিতে পারেন, এবং তাহা তাঁহার মিথ্যা বলা হইবে না। পাঁচটি অঙ্গ কি?

'প্রথম, ব্রাহ্মণ মাতৃপক্ষ ও পিতৃপক্ষ উভয়পক্ষেই সুজাত হইবেন, তাঁহার পিতামহ প্রভৃতি সপ্তম পুরুষপর্য্যন্ত মাতৃকুক্ষি সংশুদ্ধ থাকিবে; এবং তিনি তাবৎ পুরুষপর্য্যন্ত জাতিবাদের দ্বারা কখনো তিরস্কৃত বা অবজ্ঞাত হইবেন না।

'দ্বিতীয়, তিনি কৃতাধ্যয়ন হইবেন। তিনি মন্ত্রধর হইবেন, তিন বেদ, নিঘণ্টু, কল্প-শাস্ত্র, শিক্ষা, নিরুক্তি, (চতুর্থ বেদ অথর্ব্ব), এবং পঞ্চম (বেদ) ইতিহাস, এই সকলের পারগামী হইবেন, তিনি পদজ্ঞ ও বৈয়াকরণিক হইবেন, এবং লোকায়ত (অর্থাৎ বিতণ্ডাশাস্ত্র) জানিবেন। তাঁহাকে মহা-পুরুষের লক্ষণশাস্ত্র জানিতে হইবে।

'তৃতীয়, তিনি রূপবান্ দর্শনীয় ও রূপপ্রভাবে অন্যের চিত্তপ্রসাদক হইবেন, তাঁহার শরীরের বর্ণ পরম সুন্দর হইবে, শ্রেষ্ঠ হইবে, তিনি ব্রহ্মবচ্চ সমন্বিত হইবেন, তাঁহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই দর্শনীয় হইবে।

'চতুর্থ, তিনি শীলবান্ হইবেন, তাঁহার শীল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে; তিনি এইরূপ শীলেই শীলবান্ হইবেন।'

'পঞ্চম, তিনি পণ্ডিত হইবেন, মেধাবী হইবেন, এবং যাঁহারা (যজ্ঞের জন্য) স্রুগ্‌দণ্ড ধারণ করিয়া থাকেন (অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন,) ইনি তাঁহাদের মধ্যে প্রথম বা দ্বিতীয় হইবেন। হে গৌতম, এই সমস্ত অঙ্গে সমন্বিত ব্রাহ্মণকেই ব্রাহ্মণেরা "ব্রাহ্মণ" বলিয়া জানাইতে পারেন, এবং তিনিও নিজেকে "আমি ব্রাহ্মণ" ইহা ঠিকভাবে বলিতে পারেন, এবং তাহাতে তাঁহার মিথ্যা বলা হয় না।'

'আচ্ছা, এই পাঁচটি অঙ্গের মধ্যে কোন একটি অঙ্গকে ত্যাগ করিতে পারা যায় কি? অবশিষ্ট অপর চারিটি থাকিলে কি ঐ ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণেরা "ব্রাহ্মণ" বলিয়া জানাইতে পারেন না? এবং তিনি কি নিজেকে "আমি ব্রাহ্মণ" ইহা সম্যক্ ভাবে বলিতে পারেন না? তাহাতে ত তাঁহার মিথ্যা বলা হয় না?'

'হাঁ গৌতম, পারা যায় বৈ কি? এই পাঁচটি অঙ্গের মধ্যে বর্ণকে পরিত্যাগ করিতে পারা যায়। কেননা, বর্ণে কি করিবে? ব্রাহ্মণ যদি পূর্ব্বোক্ত অপর চারিটি অঙ্গে সমন্বিত হয়, তাহা হইলে তাহাতেই তাঁহাকে ব্রাহ্মণেরা "ব্রাহ্মণ" বলিয়া জানাইতে পারেন, এবং তিনিও নিজে "আমি ব্রাহ্মণ" ইহা সম্যক্ ভাবে বলিতে পারেন, এবং তাহাতে তাঁহার মিথ্যা বলা হয় না।'

'ভাল ব্রাহ্মণ, এই চারিটি অঙ্গের মধ্যে কোনো একটি অঙ্গকে ত্যাগ করিতে পারা যায় না কি? অবশিষ্ট আর তিনটি অঙ্গ থাকিলে কি ঐ ব্রাহ্মণ যথার্থ ব্রাহ্মণ হইতে পারে না?'

'হাঁ গৌতম, পারা যায়। এই চারি অঙ্গের মধ্যে মন্ত্রকে পরিত্যাগ করিতে পারা যায়। কেননা, মন্ত্র কি করিবে? অবশিষ্ট আর তিনটি অঙ্গ থাকিলেই ব্রাহ্মণেরা ইঁহাকে "ব্রাহ্মণ" বলিয়া জানাইতে পারেন, এবং তিনিও "আমি ব্রাহ্মণ" ইহা সম্যক্‌ভাবে বলিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার মিথ্যা বলা হয় না।'

'ব্রাহ্মণ, এই তিনটি অঙ্গের মধ্যে

একটিকে পরিত্যাগ করিয়া অপর দুইটি দ্বারা সমন্বিত হইলে কি তাহাকে "ব্রাহ্মণ" বলিয়া জানাইতে পারা যায় না? তিনি কি "আমি ব্রাহ্মণ" ইহা সম্যক্‌ভাবে জানিতে পারেন না? তাহাতেও তাঁহার মিথ্যা বলা হয় না?'

'হাঁ গৌতম, পারা যায়। এই তিনটির মধ্যে জাতিকে পরিত্যাগ করিতে পারা যায়। কেননা, জাতি কি করিবে? অবশিষ্ট দুইটি অঙ্গে সমন্বিত হইলেই ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণেরা "ব্রাহ্মণ" বলিয়া জানাইতে পারেন, এবং তিনিও নিজেকে "আমি ব্রাহ্মণ" বলিয়া সম্যক্‌ভাবে জানিতে পারেন, এবং তাহাতেও তাঁহার মিথ্যা বলা হয় না।'

ইহা উক্ত হইলে সেই ব্রাহ্মণগণ বলিয়া উঠিলেন —

'শোণদণ্ড, আপনি এরূপ বলিবেন না! শোণদণ্ড, আপনি এরূপ বলিবেন না! আপনি বর্ণের অপবাদ করিতেছেন, আপনি মন্ত্রসমূহের অপবাদ করিতেছেন, আপনি জাতির অপবাদ করিতেছেন! শোণদণ্ড, আপনি একাংশে শ্রমণ গৌতমেরই মতে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছেন!'

অনন্তর ভগবান্ সেই সমস্ত ব্রাহ্মণকে বলিলেন :—

'ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের যদি এইরূপই মত হয়, আপনারা যদি মনে করেন যে, ব্রাহ্মণ শোণদণ্ড অল্পশ্রুত, ইনি অকল্যাণবচন, ইনি দুষ্প্রজ্ঞ, ইনি শ্রমণ গৌতমের সহিত এই বিষয়ে বিচার করিতে পারিতেছেন না, তাহা হইলে ইনি থাকুন, আপনারাই আমার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হউন। আর যদি আপনাদের মনে হয় যে, ব্রাহ্মণ শোণদণ্ড বহুশ্রুত, কল্যাণবচন ও পণ্ডিত, ইনি শ্রমণ গৌতমের সহিত এই বিষয়ে বিচার করিতে সমর্থ, তাহা হইলে আপনারা থাকুন, ইনিই আমার সহিত বিচার করুন।'

ইহা বলিয়া শোণদণ্ড ভগবান্‌কে বলিলেন —'গৌতম, আপনি থাকুন, আপনি চুপ করিয়া থাকুন, আমিই ইহাদের ধর্ম্মের সহিত প্রত্যুত্তর প্রদান করিব।' তিনি ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন :—

'আপনারা এরূপ বলিবেন না, এরূপ বলিবেন না যে, "শোণদণ্ড, আপনি বর্ণের অপবাদ করিতেছেন, মন্ত্রসমূহের অপবাদ করিতেছেন, জাতির অপবাদ করিতেছেন। আপনি একাংশে শ্রমণ গৌতমের মতে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছেন।" আমি বর্ণ, মন্ত্র, বা জাতির অপবাদ করিতেছি না।'

সেই সময়ে শোণদণ্ডের ভাগিনেয় মাণবক অঙ্গক সেই পরিষদের মধ্যেই উপবিষ্ট ছিল। শোণদণ্ড ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন 'আপনারা আমার ভাগিনেয় মাণবক অঙ্গককে জানেন কি?'

'হাঁ জানি।'

'ব্রাহ্মণগণ, মাণবক অঙ্গক রূপবান্, দর্শনীয়, ও রূপের প্রভায় সকলের চিত্তপ্রসাদক; ইহার শরীরের বর্ণ পরম সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ, ইহার ব্রহ্মবর্চ্চস আছে, এবং ইহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই দর্শনীয়। মাণবক অঙ্গক কৃতজ্ঞান, মন্ত্রবিৎ এবং ত্রিবেদ অন্যান্য শাস্ত্রের পারদর্শী। আমিই ইহাকে মন্ত্রসমূহ পাঠ করাইয়াছি। মাতৃপক্ষ ও পিতৃপক্ষ উভয় পক্ষেই [illegible] ইহার পরিবাদও সুবিশুদ্ধ,

জাতিবানের দ্বারা ইহার বংশ তিরস্কৃত ও অবজ্ঞাত নহে। আমি ইহার মাতাপিতাকে জানি। ব্রাহ্মণগণ, মাণবক অদক যদি প্রাণিহত্যা করে, অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করে, পরদার গমন করে, মিথ্যা কথা কহে ও মদ্য পান করে, তবে বর্ণ তাহার এখানে কি করিবে? মন্ত্র ইহার কি করিবে এবং জাতিই বা কি করিবে? ব্রাহ্মণ যদি শীলবান্ হন, তাঁহার শীল যদি বর্দ্ধিত হয়, তাঁহার যদি সেই বর্দ্ধিত শীল থাকে, তিনি যদি পণ্ডিত ও মেধাবী হন, এবং স্রুগ্-গ্রহণকারিগণের, (অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠাতৃগণের) প্রথম বা দ্বিতীয় হন, তবে এই দুই অঙ্গ সমন্বিত হইলেই ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে "ব্রাহ্মণ" বলিয়া জানাইতে পারেন, এবং তিনিও নিজে "আমি ব্রাহ্মণ" ইহা সম্যক ভাবে জানিতে পারেন, এবং তাহাতেও তাঁহার মিথ্যা বলা হয় না।

'এই দুই অঙ্গের মধ্যে একটি ত্যাগ করিয়া কেবল অপরটির দ্বারা কি ব্রাহ্মণকে "ব্রাহ্মণ" বলিয়া জানাইতে পারা যায়? এবং তিনিও কি নিজে "আমি ব্রাহ্মণ" ইহা সম্যক ভাবে জানিতে পারেন? তাহাতে তাঁহার ত মিথ্যা বলা হয় না?'

'না গৌতম, ইহা পারা যায় না। কেননা, গৌতম, প্রজ্ঞা শীলের দ্বারা পরিধৌত, এবং শীল প্রজ্ঞা দ্বারা পরিধৌত; যেখানে শীল সেই খানে প্রজ্ঞা, এবং যেখানে প্রজ্ঞা সেইখানেই শীল; শীলবানের প্রজ্ঞা হয়, এবং প্রজ্ঞাবানের শীল হয়; শীল ও প্রজ্ঞা লোকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। যেমন হস্তের দ্বারা হস্ত, অথবা পদের দ্বারা পদ ধৌত করিতে পারা যায়, এই প্রকারেই প্রজ্ঞা শীল দ্বারা পরিধৌত, এবং শীল প্রজ্ঞা দ্বারা পরিধৌত; যেখানে শীল সেখানেই প্রজ্ঞা, এবং যেখানে প্রজ্ঞা সেই খানেই শীল; শীলবানের প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞাবানের শীল; এবং শীল ও প্রজ্ঞাই লোকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।'

'হাঁ ব্রাহ্মণ, ইহা এইরূপই। কেননা, প্রজ্ঞা শীলের দ্বারা পরিধৌত, এবং শীল প্রজ্ঞা-দ্বারাই পরিধৌত; যেখানে শীল, সেখানে প্রজ্ঞা, এবং যেখানে প্রজ্ঞা সেখানে শীল; শীলবানের প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞাবানের শীল; এবং শীল ও প্রজ্ঞাই লোকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। আচ্ছা ব্রাহ্মণ, শীল কি? এবং প্রজ্ঞাই বা কি?'

'গৌতম, এ বিষয়ে আমাদের এই পর্য্যন্ত শেষ। ভাল, আপনিই ইহার অর্থ প্রকাশ করুন!'

* * * * *

শোণদণ্ড ভগবানের উপদেশে আনন্দিত হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিলেন, এবং তখনই বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিলেন।

* * * * *

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

কবি ঈশানচন্দ্রের অপ্রকাশিত কবিতা।

'যোগেশে'র কবি ঈশানচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে অপরিচিত নহেন। তাঁহার স্নিগ্ধগম্ভীর তেজোময় ভেরীনিনাদ বঙ্গভাষার মূল্যবান সম্পত্তি। তথাপি ঈশানচন্দ্রের সমস্ত রচনা আজিও বাঙ্গালী পাঠকের হস্তগত হয় নাই।

বাঙ্গালার পাঠক কেবল তাঁহার 'যোগেশ' ও 'বাসন্তী'র সহিতই পরিচিত। ঈশানচন্দ্রের আরও কতকগুলি রচনা যে আজিও লোকচক্ষুর অন্তরালে বিরাজ করিতেছে সে সংবাদ বোধ হয় অনেকেই রাখেন না। বাঙ্গালী আজ প্রত্নতত্ত্বসংগ্রহে উদ্যোগী; পরলোকগত সাহিত্যসেবিগণের অপ্রকাশিত গ্রন্থরাজির সমুদ্ধার-চেষ্টাকে কি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অন্তর্গত করা যায় না? অন্ততঃ বাঙ্গালার "সাহিত্য-পরিষদ্" এ বিষয়ে উদ্যোগী হইলে ভাল হয়। পুরাতন গ্রন্থের উদ্ধার অপেক্ষা আধুনিক সারবান গ্রন্থকে বিনাশ হইতে রক্ষা করা অল্প প্রয়োজনীয় নহে।

কবি ঈশানচন্দ্রের তিনখানি অপ্রকাশিত গ্রন্থের আমরা সন্ধান পাইয়াছি। একখানির নাম 'অনন্ত' একখানির নাম 'দেবীতীর্থ' এবং একখানি কতকগুলি কবিতার সমষ্টি। আমরা আজ সংক্ষেপে পাঠকবর্গকে এই অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলীর পরিচয় দিব।

পাঠক দেখিবেন এই সকল অপ্রকাশিত গ্রন্থও ঈশানচন্দ্রের স্বভাবসুলভ কবিত্বের স্বর্গালোকে সমুজ্জ্বল।

১। অনন্ত—'অনন্ত' একখানি খণ্ড কাব্য এবং ইহার নায়কের নাম 'অনন্ত'। কর্ম্মফল-পীড়িত জীবের যাতনা দেখিয়া অনন্তের মহাপ্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। অনন্ত দেখিলেন, বিশ্বের বর্ত্তমান ব্যবস্থায় দুঃখ, কষ্ট, যাতনা অবশ্যম্ভাবী। তাই জীবকুলের শান্তির জন্য অনন্তের প্রাণ 'বাল্মীকির জয়ে' বিশ্বামিত্রের মত নূতন জগৎ নির্ম্মাণ করিতে চাহিল। কবি গ্রন্থে যে সূচিপত্র দিয়াছেন, তাহা হইতেই আলোচ্য গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়ের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইবে, এই আশায় নিম্নে সেই সূচিপত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

১। সর্গ—অনন্তের যোগশেষে শক্তির সহিত সাক্ষাৎ।

২য় সর্গ—ভাগ্যলোকে নিয়তির নিকট গমন।

৩য় সর্গ—ব্রহ্মলোকে ভক্তির সহিত সাক্ষাৎ।

৪র্থ সর্গ—নূতন জগৎনির্ম্মাণ।

৫ম সর্গ—সে জগতে কাম-রতির প্রবেশ নিষেধ।

৬ষ্ঠ সর্গ—বিশ্বভ্রমণ।

৭ম সর্গ—কবিগান (?)

৮ম সর্গ—কালের সহিত সাক্ষাৎ।

৯ম সর্গ—রুদ্রলোকে গমন।

সমস্ত সর্গগুলিই কবির উজ্জ্বল কল্পনা-লোকে সমুজ্জ্বল। ভাষাও সুন্দর।

ভাগ্যলোকে নিয়তির নিকট গমনের পথের বর্ণনা হইতে কিয়দংশ পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি—

"দুগ্ধ ফেননিভ শুভ্র ছায়াপথ
শোভিছে আকাশ মাঝে,
দু'ধারে তাহার স্নিগ্ধালোক ধরি
তারকারে হার সাজে

পথের দু'ধারে বিজলির লতা
নবীন নীরদ পাতা
রজত বরণ কিরণের ফুলে
বৃন্তে বৃন্তে বৃন্তে গাঁথা।
মাঝে মাঝে তরু নীরদ বরণ
শুভ্রপটে যেন আঁকা
ফুলর বরণ নবীন পল্লব
আকাশে প্রসারি শাখা।
শাখাপথ কত বিচিত্র গতিতে
চলিয়াছে চারিধার
দুইধারে তার তারকার হার
কৌমুদী কিরণ তার।
বিজলি লতিকা বিকলা হইয়ে
উঠিয়াছে তরুগায়,
দ্বিসহস্র বাহু করি প্রসারিত
জড়ায়ে ধ'রেছে তায়।
সহস্র বদন চাপি অঙ্গে অঙ্গে
তরুরে চুম্বন করে,
আবেশে তাহার সহস্র মস্তক
রাখে তরু হৃদিপরে।
দ্বিসহস্র তার অতৃপ্ত নয়নে
চেয়ে দেখে তরু পানে
দেখিতে দেখিতে সৃজি নব বাহু
তরুরে জড়ায় প্রাণে।
একাকী অনন্ত চলেছে সে পথে
ব্রহ্মাণ্ডবিজয়ী বেশ
দৃঢ় পদক্ষেপে হয় অগ্রসর
নাহিক শঙ্কার লেশ।
চারিধারে তার অসংখ্য জগৎ
ভাসিছে গগন গায়
শ্বেত পীত নীল বিবিধ কিরণ
ফুটিয়া পড়েছে তায়।

এরূপ ভাষা ও কল্পনার বিচিত্র লীলায় 'অনন্ত' পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিভূষিত।

২। 'দেবীতীর্থ'—গ্রন্থখানি দশ সর্গে সম্পূর্ণ। 'অনন্তে'র সর্গের মত ইহার সর্গগুলি ছোট ছোট নয়। এখানি একখানি মহাকাব্যেরই মত এবং ইহার বর্ণনীয় বিষয়ও মনুষ্য-হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের নিপুণ বিশ্লেষণে কবির উচ্চতর শক্তির পরিচায়ক। কবি যোগেশের অনুরূপ করিয়াই এ কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন।

কিন্তু কবি ইহাতে 'যোগেশ' অপেক্ষা এক সোপান অগ্রসর হইয়াছেন। যোগেশ কর্ত্তব্য, অকর্ত্তব্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম সমস্ত উপেক্ষা করিয়া উদ্দাম হৃদয়-স্রোতে শুধু নিজের হৃদয়-বৃত্তি অনুসরণ করিয়া অকূলে ভাসিয়াছে, ইহাতে কবি বুঝাইতে চাহিয়াছেন, 'স্বাতন্ত্রে আনন্দ নাই।' বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

"কর্ত্তব্যই জীবধর্ম্ম অকর্ত্তব্য পাপ।"

'যোগেশে' যৌবনস্বপ্নমুগ্ধ কবি ভাবিয়াছিলেন স্বাধীন ভাবে হৃদয়ের অনুসরণেই সুখ; পরিপক্ক বয়সে কবি বুঝিয়াছেন, সুখ উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির পথে নহে, সুখ সংযমের সাধনায়, সুখ দৃঢ়চিত্তে কর্ত্তব্য পরিপালনে! 'দেবীতীর্থে'র নায়ক ভাস্করও প্রথম জীবনে যৌবনের চিত্ত-বিক্ষেপকারী উন্মাদনায় ভাবিয়াছিল "কেন আমি স্বাধীন ভাবে নিজের হৃদয়কে অনুসরণ না করিব? কেন আমি সমাজের ভয়ে আপনার সুখের পথকে কণ্টকিত করিব? কেন আমি বাহিরের পাঁচজনের কথায় নিজের হৃদয়ের আদেশ অবহেলা করিব?"

আমার কৌমার জীবনে —

'খুলিত স্বর্গের দ্বার প্রণয়ের নামে,
হেরিত কিরণময়ী ত্রিদিব ললনা,
আসিছে বরিতে তারে বাহু প্রসারিয়া,
ললাটে প্রভাত হাসে, ছায়া ভালে কেলে,
নয়নে চপলা ছোটে, মুখে ফোটে শশী,
হৃদয়ে উথলে সিন্ধু, অঙ্গে ছোটে বাণে!"

আমি তাহাকে ছাড়িয়া তোমাদের অধীনতায় পড়িয়া

'এক অবলা নারীর—
বন্দীকৃত স্রোতোহতে হৃদয়ের কূপে,
গণিতে গণিতে ক্ষুদ্র অলস লহরী,"

কেন এই সুদীর্ঘ জীবন যাপন করিব? কেন সমাজের এই নিষ্ঠুর অত্যাচার সহ্য করিব? কিন্তু ভাস্করের পরীক্ষার দিন আসিল। ভাস্কর একদিন জলে নিমজ্জমানা এক বালিকাকে আসন্নমৃত্যু হইতে উদ্ধার করিল। বালিকার নাম পূর্ণিমা। যত পরিচয় বাড়িতে লাগিল ততই ভাস্করের হৃদয় পূর্ণিমার শক্তি ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে লাগিল। তাহার প্রাণ বলিতে লাগিল।

মরি কি সৌন্দর্য্য এ শক্তি বিহনে,
রমণী সুন্দরী নহে!

পূর্ণিমাও ভাস্করকে ভাল বাসিল। কিন্তু উভয়ের মধ্যে মিলন ঘটিবার উপায় ছিল না। দুজনেই তাহা বুঝিল।

সংযতচিত্তা পূর্ণিমা নিয়তির আদেশ অবনত মস্তকে গ্রহণ করিল। কিন্তু ভাস্করের স্বাধীনচিত্ত ইহাতে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ভাস্কর সমাজের নিয়মে ইতিপূর্ব্বে বিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু সমস্ত দুনিয়া তাহার অবশচিত্ত পূর্ণিমার জন্য লোলুপ হইয়া উঠিল। পূর্ণিমা অনেক করিয়া ভাস্করকে বুঝাইয়াছিল

"স্বাতন্ত্রে আনন্দ নাই, পারতন্ত্রে প্রীতি;
বিশ্বের নিয়ন্তা যিনি তাঁহারি ইঙ্গিত
স্বাতন্ত্র হইতে ক্রমে পারতন্ত্রে রত।
এই বৃত্তি অনুসৃত হইয়া স্বয়ম্ভূ
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এই করিলা সৃজন।
আপনার প্রিয় বাক্য ওই প্রকৃতির
স্তরে স্তরে এই তত্ত্ব আছে বিদ্যমান।"

তবে কেন বৃথা বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া অকূলে ভাসিবে?

"দৈহিক কি মানসিক দুর্দ্দম আগ্রহ
লক্ষ্যহীন পথে যদি হয় নিয়োজিত
সতত নিষ্ফল তাহা; চাঞ্চল্য সে শুধু।"

অতএব ফির। বিধাতা যাহা তোমায় দিয়াছেন, তাহা লইয়াই কর্ত্তব্য সাধন কর।

"কর্ত্তব্যই জীবধর্ম্ম, অকর্ত্তব্য পাপ;
কর্ত্তব্যের সাধনায় এই মর্ত্ত্য লোকে
নরনারী দেবদেবীরূপে অবসিত।"

আইস আমরা দেবদেবী হইবার চেষ্টা করি। কিন্তু ভাস্করের বিদ্রোহী হৃদয় সে কথা মানিল না। ভাস্কর বলিল—

"অমা নিশীথিনী হ'তে কালিম জলদ
আঁধারে সংহারবেশে সমগ্র জীবন
ভীম প্রভঞ্জন হ'তে প্রবল ঝটিকা
ছিন্ন ভিন্ন করি চিত্ত হয় প্রবাহিত।"

ভাস্করের অবস্থা দেখিয়া পূর্ণিমার চক্ষুতে জল আসিল।

"অশ্রুপূর্ণ নেত্র তুলি ভাস্করের পানে
রক্তে রক্তময় হয় এই হৃদিতল"

বলিয়া পূর্ণিমা সেই প্রকোষ্ঠ ত্যজিল। ভাস্কর চীৎকার করিয়া বলিল—

"তুমিও মানবী যদি দাঁড়াও পূর্ণিমা"
পূর্ণিমা দাঁড়াইল না। বুঝি
এঁপশিল না পূর্ণিমার শ্রবণে সে রব"।
পূর্ণিমা ভাস্করের চক্ষু হইতে আপনাকে অন্তর্হিত করিল। উন্মত্ত ভাস্কর বিবাহিতা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণিমার সন্ধানে দেশে দেশে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ভাস্কর ও পূর্ণিমার চিত্র পাঠককে যোগেশ ও মন্দাকিনীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ভাস্কর যোগেশেরই মত অবিবেকী ও চঞ্চল এবং পূর্ণিমা মন্দাকিনীর মতই বিবেকী ও স্থির, কিন্তু মন্দাকিনী বিবাহিতা, পূর্ণিমা কুমারী, সুতরাং যোগেশের উন্মত্ত পাপপূর্ণ ভালবাসা অপেক্ষা ভাস্করের ঐকান্তিক হৃদয়-বেগ সমাজের নিকট অধিকতর সহানুভূতি লাভের যোগ্য।

পূর্ণিমা ভাস্করকে ছাড়িয়া গেল, কিন্তু তাহাকে ভুলিল না। সে অধিচলিত সাধনায় তাহার পবিত্র প্রণয়কে দেহ সম্বন্ধের পরপারে উত্তীর্ণ করিয়া দিল। সে ভাস্করের চিন্ময় মূর্ত্তিকে হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লোক-সেবায় আত্মোৎসর্গ করিল।

"অযোধ্যার প্রান্তভাগে, সরযূর কূলে
শোভিছে প্রকাণ্ড হর্ম্ম্য, শীর্ষদেশে তার
বৃহৎ অক্ষরে লেখা "ভাস্কর-আশ্রম"

এই অনাথ-আশ্রম পূর্ণিমার। পূর্ণিমা আপনার অর্থ-সামর্থ্য সমস্ত এই আশ্রমের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিল। প্রেমের ইহাই পূর্ণ পরিণত অবস্থা। এক জনকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতে বাসিতে আমরা দেখি, এই সংসার তাঁহাতেই পূর্ণ, সকল জীবের মধ্যেই তিনি বিরাজমান, তখনই ভালবাসা সার্থক হয়, মানুষ দেবতায় পরিণত হয়। প্রেমের মধ্যে এই রহস্য নিহিত বলিয়াই প্রেম মুক্তির সোপান।

উন্মত্ত ভাস্কর দেশে দেশে ছুটিতে ছুটিতে এক দিন অবসন্ন দেহে হতাশ-প্রাণে আশ্রমের সেই হর্ম্ম্যতলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

"অদূরে সরযূতটে [illegible]
অবসন্ন দেহে পড়ি পথিক জনেক
আশ্রমের শীর্ষস্থিত নামাঙ্কের প্রতি
স্থির দৃষ্টে আছে চাহি বিস্মিত নয়নে।
বিবর্ণ বিকৃত মূর্ত্তি পথিক পীড়িত
আক্রান্ত বসন্ত রোগে, ক্ষত অঙ্গময়।"

এই পথিক হতভাগ্য ভাস্কর!

"এমন সময়ে সেই আশ্রম হইতে
একটি রমণী কক্ষে কলসী লইয়া
চলিল সরযূ মুখে বারি আনয়নে;
মুণ্ডিত কুন্তল, অঙ্গে নাহি অলঙ্কার,
দেহ আচ্ছাদিত ঘন মলিন বসনে
তথাপি সে রমণীর বদনমণ্ডলে—
অলৌকিক মহিমার ছটা বিকশিত
প্রতিভায় প্রজ্বলিত আয়ত লোচন
অধরে প্রগাঢ় শান্তি পড়েছে ফুটিয়া
দারিদ্র্যের অধীশ্বরী যেন সে রমণী।"

এই অপূর্ব্ব রমণীরত্ন—পূর্ণিমা!

পূর্ণিমা—

"দূর হ'তে নিপতিত পথিকে হেরিয়া,
[illegible]
কলসী রাখিয়া ভূমে ত্বরিত চরণে
পথিকের সন্নিকটে আসি দাঁড়াইল।"
"পথিক হেরিয়া তায় চীৎকার করিয়া
নিমীলিত করেদ্বয়ে মুদিল নয়ন।"

উভয়ে আজ কত অন্তর! সংযমের সাধনায় একজন দেবত্বের স্নিগ্ধ শান্তিতে পরিপূর্ণ—আর একজন লালসার তাড়নায় ক্ষতবিক্ষত—লাঞ্ছিত—মুমূর্ষু!

কঠিন আঘাত পাইয়া ভাস্করের শিক্ষা আরম্ভ হইল। ভাস্কর আজ বুঝিল দেবত্ব বাসনার চরিতার্থতায় নহে, সংযমের সাধনায়। তাই সে পূর্ণিমাকে দেবী বলিয়া উপলব্ধি করিয়া সেই দেবীর ধ্যানে চিত্তকে নিয়োজিত করিল।

বাসনার ক্ষুধাসুর সম্পূর্ণ বিদূরিত হইলে উভয়ের মধ্যে মিলন ঘটিল। কিন্তু সে মিলন আর পার্থিব মিলন নহে। তাই কবি প্রণয়ীযুগলকে স্বর্গে পাঠাইয়া দিলেন। কাব্য সমাপ্ত হইল। তাই বলিতেছিলাম শিক্ষায় ও কবিত্বে 'দেবীতীর্থে'র স্থান 'যোগেশে'রও উর্দ্ধে।

ভাস্করের বিবাহিতা পত্নী তটিনীর চিত্র তেমন ফুটে নাই। তাহাকে আমরা দুইবার মাত্র দেখিতে পাই, একবার তাহার পিত্রালয়ে আর একবার পূর্ণিমা-ভাস্করের মৃত্যুস্থান 'দেবীতীর্থে'। স্বামী-পরিত্যক্তা বিরহিণী উভয় স্থলেই উন্মাদিনীরূপে চিত্রিতা।

(৩) কবিতাবলী—ইহাতে চতুর্ব্বিংশতিটি কবিতা সন্নিবেশিত।

(১) পূর্ণিমা (২) মালকের আক্ষেপ (৩) কৌরব-নীতি (৪) জগত (৫) আমি তোর কি এত সুন্দর? (৬) দুইখানি ছবি (৭) গান (৮) তিনখানি ছবি (৯) বিভা (১০) তুমি কি রমণী? (১১) প্রতিমা (১২) পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্বর্গারোহণ (১৩) বঙ্কিমচন্দ্রে (১৪) কারে দিব বঁধু এ ভালবাসা (১৫) আবাহন (১৬) গৌরগীতি (১৭) বিশ্বাস (১৮) সত্যযুগ (১৯) দিশেহারা (২০) বর্ষশেষে (২১) মৃতপতির কর্ম্মস্থল ও বন্ধুদর্শনে (২২) তরণীবক্ষে (২৩) মহামন্ত্র (২৪) বিশ্বামিত্র ও পরশুরাম।

ক্ষুদ্র কবিতাগুলিও কবির কাব্যগ্রন্থের ন্যায় তাঁহার কবিত্ববিভায় সমুজ্জ্বল। দুই একটি উদাহরণ দিতেছি।

কবি প্রথম কবিতায় (পূর্ণিমা) পৌর্ণমাসী রজনীকে প্রেমভার-প্রপীড়িতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণীরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। প্রণয়ীর অভাবে পূর্ণিমার পক্ষে জীবন ভারস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রেমপূর্ণ হৃদয় প্রণয়ীর জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছে। আত্মবিসর্জ্জনই যে প্রেমের ধর্ম্ম এবং পরিপূর্ণ অনন্ত স্বরূপ পরম দেবতাই যে সকল প্রণয়ের শেষ লক্ষ্য এই তত্ত্ব এই কবিতায় পরিস্ফুট হইয়াছে। কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"আমি পারি না বহিতে এ রূপের ভার
আমার আকুল হইল দেহ;
আমি খুঁজিয়া বেড়াই প্রণয়ী আমার
দেখায়ে দিল না কেহ।
* * *
আমি বলি বলি করি বলা যে হোলো না
সাধের মরম কথা
আমি পারি না ভাসিতে এ রূপ রাশিতে
লইয়া সুখের ব্যথা।
ওহে কে আছ ভুবনে প্রণয়ী তেমন
করহে হৃদয় দান
আমার রূপের সাগর মথিত করিয়া
করহে পীযূষ পান।
* * *

আমি আপনার তরে আপনা সঁপিব
চাহি না হে প্রতিদান
আমি তোমাতে মজিয়া তোমারে ভজিয়া
জুড়াব আমার প্রাণ।

* * *

মনের মতন মেলে না যে জন
তাহারো চোরা সবি প্রাণ
এ রূপ যৌবন এত আকিঞ্চন
তাহে কি ফুলায় স্থান।
আমি আধ আধ সাধ পারি না মিটাতে
খুঁজিয়া বেড়াই ধরা
ওহে পরিপূর্ণ লুকায়ে কোথায়
আইস নিকটে ত্বরা।"

তৃতীয় কবিতাটী (কোরক-গীতি) একটি "কোটে-নাই. ফোট ফোট" কিশোরীর সুন্দর মনশ্চিত্র। কোরক বলিতেছে—

"আমি ফুটবো কেমন করে?
আমার ছড়িয়ে পড়ে পাপড়িগুলো
লাজে যাই মরে।
যে আলো রয়েছে চেয়ে, যে তরু রয়েছে ছেয়ে
এখনি যে দেখবে চেয়ে অমনি যাব ঝ'রে।"
ইত্যাদি

এটি একটি গীত। খাতায় ইহার সুর লেখা আছে—সুরট মল্লার।

পঞ্চম কবিতাটি (আমি তোর কি এত জ্বালা?) প্রীতিময়ী কিশোরী পত্নীর প্রতি কিশোর স্বামীর স্নেহোক্তি :—

স্বামী বলিতেছেন :—

"এত কাছে কাছে থাকি, এত বুকে বুকে রাখি
তবু যেন দেখা নাই কত
পলক পড়ে না চোখে, কি যেন অপূর্ব্ব দেখে
চেয়ে থাক কাঙালের মত।
অধরে আনন্দ মাখা ললাটে সন্তোষ লেখা
তবু যেন কত সাধ বুকে
দিন রাত কথা কয়ে ঠোঁট গেছে শ্রান্ত হ'য়ে
তবু যেন কত কথা মুখে।

* * * *

শুনিতে শুনিতে কথা ভিজে গেল আঁখিপাতা
অশ্রুজলে ভাসে দুটি তারা
সুশীতল সরোবরে ভ্রমর ভ্রময়ে ক'রে
কমল যুগল বৃন্ত হারা।"

সরল সুন্দর দাম্পত্যের একটি মধুর আলোক-চিত্র! একাদশ কবিতায় (প্রতিমা) কবি স্নেহ-প্রেমময় আত্মীয়গণের সুমধুর হৃদয়স্পর্শের কথা স্মরণ করিয়া প্রাণের আবেগে বলিয়াছেন—

"কে বলেরে ধরাতল
নরপিশাচের স্থল
ঘরে ঘরে দেবতা যথায়;
এই গৃহ দেবতায়
যে কভু না পূজে হায়
সে কি পূজা শিখিবে ধরায়।
মহাতীর্থ ভূমণ্ডল
চিত্ত শোধনের স্থল
উপাসনা বিধান তাহার,
এ প্রাণের প্রতিমায়
না যদি পূজিবি হায়
দেবতা কোথায় পাবি আর?"

প্রবন্ধ ক্রমে দীর্ঘ হইয়া উঠিল। সুতরাং আমরা পাঠকগণকে কবির এই আশাসবাণী শোনাইয়াই আপাততঃ বিদায় গ্রহণ করিলাম। আমাদের বিশ্বাস, কবির অপ্রকাশিত কবিতাবলী অচিরেই লোকচক্ষুর বিষয়ীভূত হইবে এবং পাঠকগণ স্বয়ং কবির "মধুচক্র" হইতে "সুধাপান" করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

শ্রী বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ

বৌদ্ধধর্ম্মের সংঘ বা ভিক্ষুমণ্ডলী।

(লাফৌর ফরাসী হইতে)

এ পর্য্যন্ত আমি বৌদ্ধধর্ম্মের দর্শন, বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি ও সেই নীতি হইতে যে সকল বিভিন্ন কর্ত্তব্য ও উপদেশ-বাক্য নিঃসৃত হইয়াছে—তাহারই ব্যাখ্যা করিয়াছি। আমি বলিয়াছি, বৌদ্ধ উপাসকেরা—অর্থাৎ যাহারা শাক্যমুনির উপদিষ্ট সমস্ত মত গ্রহণ করিয়াও সংসারকে পরিত্যাগ করে না—তাহারা শুধু পাঁচটি সাধারণ প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। কিন্তু বুদ্ধ-নির্দ্দেশিত মোক্ষ লাভ করিতে হইলে, নির্ব্বাণে উপনীত হইবার নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি ধাপ অতিক্রম করিতে হইলে, প্রবল প্রযত্ন আবশ্যক—শুধু আবশ্যক নহে তাহা অপরিহার্য্য। সংসারে থাকিয়া সে কার্য্য সাধন করা অসম্ভব। বহুকাল যাবৎ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সন্ন্যাসীরা এই কথার মর্ম্ম বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন এবং সেই হেতু ভারতের অরণ্য সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এই সন্ন্যাসীরা নির্জ্জনে থাকিয়া, একাকীই ব্রহ্মের ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন হইতেন। বৌদ্ধেরাও বুঝিয়াছিল, সংসার ত্যাগ করাই সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রথম অনুষ্ঠান। কিন্তু ভগবান বুদ্ধ যে ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন সেই মৈত্রী ও ধর্ম্মপ্রচারের প্রবৃত্তিই বৌদ্ধদিগের নিকট একটা নূতন পথ খুলিয়া দিল—একত্র সম্মিলনের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিল। তা ছাড়া, বুদ্ধদেব ইতর-সাধারণের নিকট ধর্ম্মপ্রচার করিতেন,—যাহা পূর্ব্বে আর কেহ কখন করে নাই। তাঁহার শিষ্যেরা ও যাহারা তাঁহার বাক্যে আকৃষ্ট হইত, তাহারা একান্তই তাঁহার অনুগত হইত, কখনই তাঁহাকে ত্যাগ করিত না। ইহাতে করিয়াই একটা ভক্ত-সংঘ সংগঠিত হইল। অবশেষে, সকল বর্ণের মিশ্রণ হওয়ায়, এবং যে আসিত তাহাকেই বৌদ্ধেরা গ্রহণ করায়, সেই আদি বৌদ্ধদিগের উপর ব্রাহ্মণেরা খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেই সময় ব্রাহ্মণদেরই সর্ব্বময় প্রভুত্ব ছিল। তখন বৌদ্ধেরা, স্বকীয় বলবৃদ্ধির জন্য, সম্মিলনের আবশ্যকতা অনুভব করিল।

বোধ হয় ইহাই বৌদ্ধসংঘের উৎপত্তির মূল কারণ।

এইরূপে বৌদ্ধদিগের জীবন সমবেত ভাবে আরব্ধ হইলে, কতকগুলি বিধি-ব্যবস্থার প্রয়োজন হইল। যে সকল বৌদ্ধ এইরূপ ভ্রাতৃভাবে একত্র সম্মিলিত হইয়াছিল, তাহাদের জন্য বৌদ্ধ-নীতিসঙ্গত কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠানের নিয়ম পদ্ধতি নির্দ্ধারিত হইল। ত্রিপিটকের একটি গ্রন্থের নাম "বিনয়-পিটক" অর্থাৎ অনুশাসনের গ্রন্থ; এই গ্রন্থে ঐ সকল নিয়ম লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের আরম্ভকালে, বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করিবার পক্ষে তেমন কোন কঠিন নিয়ম ছিল না; কেননা, তখন দলপুষ্টি করিবার দিকেই বৌদ্ধদিগের বিশেষ আগ্রহ ছিল। শুধু বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা থাকিলেই এবং বুদ্ধের মতানুসারে চলিব এইরূপ ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেই তখন ভিক্ষুশ্রেণীভুক্ত যাইতে পারিত।

শুধু নবদীক্ষিত ব্যক্তিকে মস্তকের কেশ ও শ্মশ্রু মুণ্ডন করিতে হইত। শ্মশান হইতে সংগৃহীত চীরবস্ত্র, পীত বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তাহাকে পরিধানের জন্য প্রদত্ত হইত। পরে সেই দীক্ষিত ব্যক্তি, শরণ-গ্রহণের মন্ত্র ও দশ শীলের প্রতিজ্ঞা পাঠ করিত।

শরণ-গ্রহণের মন্ত্রটি এই—"আমি বুদ্ধের শরণ লইতেছি, আমি ধর্ম্মের শরণ লইতেছি; আমি সংঘের শরণ লইতেছি। ইহাই বৌদ্ধদিগের পবিত্র ত্রিশরণ বা ত্রিরত্ন। মৃত্যুকালে, বুদ্ধদেব ইহারই উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন—"তোমরা আপনারাই আপনার প্রদীপ, আপনারাই আপনার শরণ; তোমরা আর কাহারও শরণ লইও না।" এই ত্রি-শরণকে বৌদ্ধেরা পথ প্রদর্শক ধ্রুবতারা বলিয়া অভিহিত করে। দশ শীলের মধ্যে, অষ্ট শীল গৃহস্থ-বৌদ্ধেরা পালন করিতে বাধ্য, অবশিষ্ট দুইটি শীল সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা এইরূপ—"আমি কখন বিলাসময় বহুমূল্য পর্য্যঙ্ক ব্যবহার করিব না, আমি নিম্ন ও কঠিন পর্য্যঙ্ক ব্যবহার করিব; আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দরিদ্রের জীবন যাপন করিব।" গৃহস্থ-বৌদ্ধের তৃতীয় প্রতিজ্ঞায় শুধু ইন্দ্রিয়-সংযমের কথা আছে, কিন্তু সেই স্থলে ভিক্ষু-বৌদ্ধকে সর্ব্বতোভাবে মৈথুন বর্জ্জন করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে হয়।

ভিক্ষুর সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতরূপে বৃদ্ধি হওয়ায়, ভিক্ষুসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করিবার নিয়ম স্থাপন করা, তাহাদের বিভিন্ন পদমর্য্যাদা নির্দ্ধারণ করা, এবং ভিক্ষুমণ্ডলীর শৃঙ্খলা ও অনুশাসন সম্বন্ধে উপদেশ স্থির করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল।

অতএব প্রথমেই বর্জ্জনের হেতু নির্দ্ধারিত হইল। যে সকল ব্যক্তি দুশ্চিকিৎস্য কিংবা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত, যাহাদের দৈহিক গঠনে কোন গুরুতর হীনতা আছে, যেমন নপুংসকদিগের; যাহারা গুরুতর অপরাধে অপরাধী যাহারা পিতৃহন্তা; যাহারা খুনী; যাহারা ভিক্ষুদের মধ্যে ভেদ ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছে;—এইরূপ লোক বর্জ্জনীয় বলিয়া স্থির হইল;—তাহারা ভিক্ষু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে না। যে সকল বালকের বয়স ২০ বৎসরের কম, যে সকল অপরিণতবয়স্ক ব্যক্তি পিতা মাতার অনুমতি পায় নাই, যে সকল ক্রীতদাস মুক্তি লাভ করে নাই, যাহারা সৈনিক, যে সকল অধমর্ণ তাহাদের ঋণ পরিশোধ করে নাই, তাহারাও বর্জ্জনীয় বর্গের মধ্যে ধর্ত্তব্য।

কোন একজনমাত্র ভিক্ষু প্রবেশের অনুমতি দিতে পারিবে না; সমস্ত ভিক্ষু-মণ্ডলীর অনুমতি ব্যতীত কোন দীক্ষার্থী ভিক্ষুসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে না। এখন দেখা যাক্, বৌদ্ধদের মধ্যে কিরূপ শ্রেণীভেদ ছিল। আমরা পূর্ব্বেই সেই সকল বৌদ্ধদিগের কথা বলিয়াছি যাহারা বৌদ্ধধর্ম্মের নিয়ম পালন করিয়া সচরাচর গৃহস্থের জীবন যাপন করিত। এই সকল বৌদ্ধ উপাসক নামে অভিহিত হইত। তার পর ভিক্ষু-মণ্ডলী।

দীক্ষার দুইটি ধাপ। এক, নিম্নতর বা ঔপক্রমিক দীক্ষা—যাহার নাম "প্রব্রজ্যা"। আর এক, উচ্চতর দীক্ষা—যাহার নাম "উপসম্পদা"। প্রব্রজ্যার অর্থ নিষ্ক্রমণ।

ইহা সেই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান যাহার দ্বারা গৃহস্থ বৌদ্ধ ভিক্ষুমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিবার অভিপ্রায়ে সংসার পরিত্যাগ করে; ইহা—"গৃহহীন জীবন যাপন করিবার জন্য গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণ।" যে কোন ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইলেই সে দীক্ষার্থীকে এই প্রথম ধাপে উঠাইয়া লইতে পারে। তখন সেই দীক্ষার্থী মুণ্ডিতকেশ ও মুণ্ডিতশ্মশ্রু হইয়া, জীর্ণ চীরবস্ত্রে দেহ আচ্ছাদন করিয়া, শরণ-গ্রহণের সূত্রটি, ও দশ শীলের প্রতিজ্ঞাটি আবৃত্তি করে, এবং কোন ভিক্ষুকে নায়ক রূপে বরণ করিয়া তাহারই নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করে। তখন তাহার নাম হয়—"শ্রমণের।"

নিম্নতর ধাপে থাকিয়া ধর্ম্মশিক্ষা শেষ হইলে ঐ শ্রমণেরের দ্বিতীয় দীক্ষার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই দীক্ষার অনুষ্ঠানপদ্ধতি খুবই সাদাসিধা ধরণের। Oldenberg এইরূপ তাহার বর্ণনা করিয়াছেন—ভিক্ষুমণ্ডলীর সমক্ষে ভক্তিভাবে নতশির হইয়া দীক্ষার্থী এইরূপ বলিতে আরম্ভ করে—"পূজনীয় ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুমণ্ডলীর নিকটে এই দীক্ষা যাচ্ঞা করিতেছি। পূজনীয় ভিক্ষুগণ! যেন ভিক্ষুমণ্ডলী আমাকে তাঁহাদিগের সমীপে উত্তোলন করেন। যেন তাঁহারা আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করেন।" তিনবার তিনি এইরূপ যাচ্ঞা করেন। তাহার পর দীক্ষার্থীকে কতকগুলি প্রশ্ন করা হয়। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়—তিনি কে, এবং তিনি কোন বর্জ্জনীয় বর্গের মধ্যে ধর্ত্তব্য কি না। যদি উত্তর সন্তোষজনক হয়, তাহা হইলে, ভিক্ষুমণ্ডলীর কোন একজন এইরূপ বলেন:—"পূজনীয় মহাশয়গণ! অবধান করুন। উপস্থিত অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির শিষ্য, দীক্ষাগ্রহণের জন্য ইচ্ছুক হইয়াছেন। দীক্ষিত হইবার পক্ষে যে সকল বাধা আছে, তাহা হইতে ইনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। ইহার কমণ্ডলু আছে, ইহার চীবর-বস্ত্র আছে। ভিক্ষুমণ্ডলীর নিকটে অমুক ব্যক্তি দীক্ষা যাচ্ঞা করিতেছেন, অমুক ব্যক্তি ইহার নায়ক। অমুক নায়ক-উপদিষ্ট অমুককে ভিক্ষুমণ্ডলী দীক্ষা দান করুন। অমুক নায়কাধীনে অমুককে দীক্ষা দান করা, যে পূজনীয় ভিক্ষুর মত হইবে, তিনি মৌন হইয়া থাকুন। যাঁহার অমত হইবে, তিনি প্রকাশ করিয়া বলুন।" কোন প্রতিবাদ না হইলে, দীক্ষার্থী গৃহীত বলিয়া পরিঘোষিত হয় "অমুক নায়কাধীন অমুক ব্যক্তি ভিক্ষুমণ্ডলীর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন; ভিক্ষুমণ্ডলীর ইহাই অভিপ্রায়। সেই জন্যই তাঁহারা মৌন হইয়া আছেন; আমি ত এইরূপ বুঝিয়াছি।" এখান হইতে প্রস্থান করিয়াই "শ্রমণের" "শ্রমণ" হইয়া দাঁড়াইলেন। অর্থাৎ ভিক্ষু হইলেন। এখন হইতে তিনি সংঘের অর্থাৎ ভিক্ষুমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হইলেন। এখন হইতে তিনি সাংসারিক সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিবেন, দশ শীল পালন করিবেন, ধর্ম্মানুশীলনে রত হইবেন, সংঘ-নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে জীবন যাপন করিবেন। তাঁহার কমণ্ডলুতে যে কিছু খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আনিবেন, শুধু তাহাই তিনি আহার করিবেন, এবং তিনি স্বয়ং গিয়া ভিক্ষা করিবেন। আবর্জ্জনা রাশির মধ্যে, কিংবা

শ্মশানভূমিতে যে সকল চীর-বস্ত্র কুড়াইয়া পাইবেন তাহাই তাঁহার পরিধান-বস্ত্র হইবে। এখন হইতে, অরণ্যের কোন বৃক্ষতলেই তাঁহার শয্যা হইবে। (ক্রমশ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিজয়নগর।

বরেন্দ্র-ভ্রমণ।

৪

যাঁহারা গজারোহণে অনভ্যস্ত, তাঁহাদের পক্ষে বরেন্দ্র ভ্রমণ অধিকক্ষণ সুখকর বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে না। কৌতূহলের প্রথম আবেগ নিরস্ত হইবামাত্র, গজারোহণ-ব্যাপার বিভীষিকার আধার হইয়া পড়ে। দিনের পর দিন অনবরত গজারোহণে বরেন্দ্রের বহুল ক্ষেত্র অতিক্রম করিতে বাধ্য হইয়া সাহিত্যিকগণের মধ্যে অনেকেই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলেন। আজ প্রত্যূষে অনেকেই যথাসাধ্য পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

কুমারপুরে উপনীত হইয়া গ্রামবাসি-গণের সাহায্যে পুনরায় পুরাকীর্ত্তির অনু-সন্ধান করিবার আয়োজন আরব্ধ হইল। কুমারপুর কত যুগের পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন ভূগর্ভে লুকাইয়া রাখিয়াছে, কেহ তাহার পরিচয় প্রদান করিতে পারে না। চারি-দিকে অগণ্য স্তূপ, তাহার নিকটে অগণ্য উচ্চভূমি,—তাহাতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রস্তরময় পুরাতন প্রাসাদাবলীর ধ্বংসাবশেষ। এক সময়ে এই সকল রক্তাভ উচ্চভূমির দক্ষিণপার্শ্ব বিধৌত করিয়া নদীপ্রবাহ প্রবাহিত হইত, এখন তাহা অনেক দূর দক্ষিণাভিমুখে সরিয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও বুঝিতে পারা যায়,—পুরাতন নদী-প্রবাহ কোথায় ছিল। তাহার অনতি-দূরে কুমারপুরের সে অংশ এখনও একেবারে জনশূন্য হয় নাই, তাহা মানচিত্রে "কুমারপুর চান্দনীয়া" নামে লিখিত হইয়া আসিতেছে। এ রূপ নাম প্রচলিত হইবার কারণ এই যে, এখানেই পুরাকালে কুমারপুরের বিপণিশ্রেণী প্রতিষ্ঠিত ছিল—তজ্জন্যই তাহার নাম "চান্দনীয়া"। এখনও এখানে পুরাতন বৃক্ষমূলে হাট বসিয়া থাকে। কিন্তু সে হাট আর পুরাকালের ন্যায় বিবিধ বিচিত্র পণ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ হয় না। এই হাটের নাম বঙ্গসাহিত্যে অপরিচিত নয়। চারি-শত বৎসর পূর্ব্বে এখানে এক পরম কৌতুক সংঘটিত হইয়াছিল। তাহার বিবরণ বৈষ্ণব-সাহিত্যে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

তখন নূতন প্রেমের নূতন বন্যা। তাহাতে তুফান তুলিয়া, চৈতন্যচন্দ্রের শিষ্যানুশিষ্যগণ পূর্ব্বসংস্কার ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছিলেন। নরোত্তম দত্ত কায়স্থ সন্তান হইয়াও ব্রাহ্মণসন্তানগণকে মন্ত্রশিষ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতে সমাজের মধ্যে কোলাহল পড়িয়া গিয়াছিল। নর-সিংহ নামক এক রাজার সভায় কোলাহলের

মাত্রা কিছু অধিক হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার সভায় অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন,—তাঁহারা রাজাকে ধর্ম্মরক্ষার্থে উত্যক্ত করিতে লাগিলেন।

নরসিংহ নামে রাজা রহে দূর দেশে।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বহু রহে তাঁর পাশে॥
ক্রোধে বিপ্র রাজা প্রতি কহে বার বার।
ধর্ম্ম লোপ হৈল কেহ না করে বিচার॥
কৃষ্ণানন্দ দত্ত পুত্র নরোত্তম দাস।
লইয়া বৈষ্ণব যত কৈল সর্ব্বনাশ॥
না জানিয়ে কি বা বা কুহক সেই জানে।
অনায়াসে বিপ্র শিষ্য হয় তার স্থানে॥
যদি কহ তার আছে শাস্ত্রে অধিকার।
সে কেবল মূর্খ প্রতি মিথ্যা অহঙ্কার॥
যো সবার আগে কি তাহার বাক্য স্ফুরে।
করহ গমন শীঘ্র লইয়া যো সবারে॥
দেখিবে কৌতুক একা আমার আসেতে।
অবকাশ লইয়া সে পলাবে সেথা হৈতে॥
সকল দেশেতে হৈবে তোমার সুখ্যাতি।
তোমা স্থানে রহিবেক ব্রাহ্মণের জাতি॥
রাজা দণ্ডকর্ত্তা যাহে ঈশ্বরের অংশ।
নহিলে হইবে বহু বিপ্রজাতিধ্বংস॥
শুনি রাজা নরসিংহ করিলা গমন।
চলিলা রাজার সঙ্গে রূপনারায়ণ॥
অধ্যাপকগণ বহু পুস্তক লইয়া।
মহাদর্প করি চলে উল্লাসিত হৈয়া॥
খেতারি নিকট গ্রাম কুমরপুরেতে।
তথা আইলেন রাজা বহুলোক সাথে॥

বৈষ্ণব কবি নরহরি চক্রবর্ত্তীর "নরোত্তম বিলাস" নামক গ্রন্থের এই বর্ণনায় সেকালের একটি সমাজচিত্রের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে চিত্র আমাদের দেশের পক্ষে একেবারে নূতন নহে। যুগে যুগে তাহার পটপরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া আসিতেছে। এখনও এরূপ কোলাহল নিরস্ত হয় নাই। কিন্তু নরোত্তমের চরিত্রগুণে তাঁহার বিরুদ্ধে যে কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল তাহা সহজেই নিরস্ত হইয়া গিয়াছিল,—যাঁহারা "বহু পুস্তক লইয়া" ঠাকুর মহাশয়কে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিবার আশায় "বহু লোক সাথে" কুমারপুরে উপনীত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এবং তাঁহাদের প্রতিপালক রাজা নরসিংহ নরোত্তমের মন্ত্রশিষ্য হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন।

কিরূপে সেই বিচিত্র ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, সাহিত্যিকগণ কুমারপুরের হাটে সে কাহিনী শ্রবণ করিতে লাগিলেন। নরসিংহের আগমন বার্ত্তা প্রচারিত হইবামাত্র নরোত্তমের দুইজন পার্শ্বচর (রামচন্দ্র এবং গঙ্গানারায়ণ) কুণ্ডকার এবং বারুই সাজিয়া হাটে বসিয়া হাঁড়ি এবং পান বিক্রয় আরম্ভ করিলেন। রাজা নরসিংহের রাজসভার অধ্যাপকবর্গের "পঢ়ুয়াগণ" হাঁড়ি এবং পান কিনিতে হাটে আসিয়া ছদ্মবেশী পণ্যবিক্রেতার নিকটে বিচারে পরাস্ত হইতে লাগিলেন,—ক্রমে অধ্যাপকগণ আসিয়া তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হইতে লাগিলেন, তাঁহাদিগেরও সেই দশা সংঘটিত হইল! তখনও শাস্ত্রার্থবিচারে সত্য নির্ণীত হইলে তাহা স্বীকার করিয়া লইবার সরলতা বর্ত্তমান ছিল বলিয়া, রাজা নরসিংহের দলবল বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

বাঙ্গালার অনেক ক্ষেত্র পুরাকালের

যুদ্ধক্ষেত্র বলিয়া কথিত হইতে পারে। কুমারপুরের 'চান্দনীয়া' সেরূপ ক্ষেত্র নয়,—তাহা তর্কযুদ্ধের ক্ষেত্র সাহিত্যিকগণ যখন জানিতে পারিলেন, এখন আর কুমারপুরের ঘাটে নিষ্কর্ম্মা কৃষক ভিন্ন অন্য কাহারও সমাগম হয় না, তখন তাঁহারা কুক্কুরগুলিকে পাঠাইয়া গজারোহণে করিয়া সেই তর্কযুদ্ধক্ষেত্রের উপর দিয়া সগৌরবে বিজয় যাত্রা করিলেন।

কুমারপুরে দেখিবার সামগ্রীর অভাব না থাকিলেও, দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করিবার উপায় নাই। যাহা কিছু তৃপ্তি দান করিতে পারিত, তাহা এখন ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া রহিয়াছে। যাহা এখনও মৃত্তিকাসাৎ হয় নাই, তাহাও কণ্টকবনে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। উপর রাজা নামক একটি স্থান এখনও দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে। অথচ তাহাই কুমারপুরের রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া পরিচিত। মধ্যস্থলে একটি প্রাসাদভূমি ছিল, তাহার চারিধারে অট্টালিকাশ্রেণী স্থিত হইয়াছিল। তাহার বাহিরে পরিখার আকারে জলাশয় খনিত হইয়াছিল। এখনও জলাশয় একেবারে শুষ্ক হয় নাই, কিন্তু তাহাবেষ্টনী একটি সুবৃহৎ মৃত্তিকাস্তূপে পরিণত হইয়াছে। তাহা সমতলক্ষেত্র হইতে প্রায় ৩০।৪০ ফিট উচ্চ, এবং দুরারোহ। সেখানে এখন ব্যাঘ্রের আশ্রয়স্থান। সাহিত্যিকগণ গজারোহণে উচ্চভূমিতে আরোহণ করিবার আয়োজন করিতে গিয়াই রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হইলেন। বাঘ বাঘ বলিয়া কলরব উঠিবামাত্র অনুচরবর্গ পলায়নপর হইল, হাতীগুলি কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিল। সাহিত্যিকগণ সকলেই কীর্ত্তিমান সুতরাং সকলেই রণে ভঙ্গ দিতে পারিলেন, কারণ—"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।"

যাঁহারা বাঘ স্বীকার করিতে গিয়া পলায়ন করেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন—"বাঘটা পালাইয়া গেল!" বাঘ তাহার প্রতিবাদ করিতে পারে না। কুমারপুরের বাঘটও প্রতিবাদ করিতে না পারিয়া, এইরূপ অকীর্ত্তিকর অবমাননা ভোগ করিতে বাধ্য হইল। সাহিত্যিকগণ বাঘের নিকট হইতে আসিয়া, তীরের মধ্যে এক কুণ্ডীরের দর্শনলাভ করিলেন। বেচারী অনেক দূরে, গভীর জলের শীতল সমাধির উপর,—শুষ্ক অরুণ কিরণ উপভোগ করিতেছিল। সহসা বন্দুকের শব্দে তাহার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। গুলি ছুটিল, জল ছিটকাইয়া উঠিল, কিন্তু কুম্ভীর গভীর জলে চলিয়া গেল। শিকারীকে লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ বলিয়া উঠিলেন, "বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে!"

কুমারপুর হইতে অনতিদূরে আর একটি স্থান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম শীতলপুর। নিজয় রাজা ভ্রাতা শীতলরাজা এই স্থানে বাস করিতেন বলিয়া কৃষকগণের বিশ্বাস। এখানে তাহারা মৃত্তিকা খনন করিতে গিয়া কতকগুলি প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। একখানি মূর্ত্তি পুরিখার জলে ফেলিয়া দিয়াছে। দুখানি মূর্ত্তি একত্রযুক্তরূপে পাওয়া গিয়াছে। তাহা কোনও বৌদ্ধমন্দিরের অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিত। দুইখণ্ড প্রস্তরই অতি পুরাতন, কালপ্রভাবে তাহার মসৃণ তলের কর্কশ হইয়া উঠিয়াছে, বস্ত্রলেপে

উঠিয়া গিয়াছে। এই সকল অঞ্চলে এক সময়ে নানা বৌদ্ধকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, এখনও তাহার নিদর্শন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। যে সকল স্থানে তাহার প্রমাণ লাভের সম্ভাবনা আছে, তাহার খননকার্য্য বহুব্যয়সাধ্য কঠিন ব্যাপার।

কুমারপুর এক সময়ে একটি বিস্তৃত রাজনগর ছিল। তাহার একাংশমাত্রই এখনও কুমারপুর নামে কথিত হইয়া আসিতেছে। অন্যান্য অংশ ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছে। এই সকল নামের মধ্যে বিজয়নগরের নাম সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। তাহার একাংশ রাজধানী এবং অপরাংশ রাণীনগর নামে কথিত হইয়া আসিতেছে।

ধোয়ী কবির "পবনদূতে" দেখিতে পাওয়া যায়, বিজয়পুর নামক একটি নদীতীরবর্ত্তি স্থানে এক রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তথায় তরুণ যুবক লক্ষ্মণসেন দেবের অভিষেক-ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়াছিল। লক্ষ্মণসেনের পিতামহ বিজয়সেন দেবের নামানুসারেই তাহার নামকরণ হইয়া থাকিবে। এই বিজয়পুর বিজয়নগর কি না, তদ্বিষয়ে সাহিত্যিকগণের মধ্যে তর্কবিতর্কের সূত্রপাত হইল। যাঁহারা পুস্তকালয়ে বসিয়া ইতিহাসের উপাদান সংকলিত করিতেছেন, তাঁহারা কেহ কেহ নবদ্বীপকেই বিজয়নগর বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশিত করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা বিজয়নগরের অস্তিত্ব অবগত আছেন কি না সন্দেহ। ইহার উত্তরাংশে (বেতপাড়া নামক স্থানে) বিজয়সেনের প্রশস্তি এবং তাম্রলিখিত দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে; বল্লালসেনের "দানসাগরে" বিজয়সেন বরেন্দ্রে বাস করিবার কথাই লিখিত আছে; এবং সেখানে তাঁহার বিজয়নগর এখনও বহু প্রাসাদশিলায় পরিচয় প্রদান করিতেছে। সুতরাং বিজয়নগরকেই "পবনদূতের" বিজয়পুর বলিয়া গ্রহণ করিলে, তাহার প্রমাণপরম্পরার অভাব থাকে না।

সেনরাজবংশের প্রথম রাজধানী বরেন্দ্রমণ্ডলেই প্রতিষ্ঠিত থাকিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, অন্য কোনও স্থানে যে তাহা প্রতিষ্ঠিত ছিল, এরূপ প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। বরেন্দ্রভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া সাহিত্যিকগণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। নদীতীরে অনেক দেবমন্দির ছিল, স্থানে স্থানে তাহার ইষ্টক-প্রস্তর পড়িয়া রহিয়াছে। যাহা আছে, তাহাতেই, যাহা নাই তাহারও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। এখানে যে সকল প্রাসাদ রচিত হইয়াছিল, তাহার আয়তন এবং রচনাকৌশল অনন্যসাধারণ ছিল, যেমন বৃহৎ, সেইরূপ সুন্দর। কত কাল হইতে এখানে একটি প্রধান নগর বর্ত্তমান ছিল তাহা কে বলিতে পারে?

একটি স্থানের নাম মিলিক বিজয়নগর, তাহার পুরাতন নদী খাতের উপরে সংস্থিত একটি উচ্চভূমি, তাহার উপর পুরাতন তিন্তিড়ী বৃক্ষের আতিশয্য। সেখানে মুসলমানগণ এক দরগা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সে দরগা এখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কেবল তাহার ইষ্টকরাশি এখনও ধরাতল আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সেই ইষ্টকরাশির

মধ্যে কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিবামাত্র বুঝিতে পারা যায়, এখানে যে দেবালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহারই ভিত্তিভূমির উপর দরগা নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং দেবালয়ের কোন কোন প্রস্তর-স্তম্ভের আকৃতি কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিয়া দরগার প্রয়োজন সাধনের উপযোগী করিয়া মুসলমান ফকির আস্তানা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। স্থানটি এখন বড়ই নির্জ্জন, ছায়াপূর্ণ এবং শান্তিপ্রদ। ইহার অনতিদূরে একটি স্থানে এক সুবৃহৎ প্রস্তর-স্তম্ভের (বোধিকা) মাথা পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা কৃষক-সমাজে রাজান্তঃপুর বলিয়া পরিচিত।

বিজয়নগরে মৃত্তিকা খনন করিতে গিয়া অনেকেই প্রস্তরস্তম্ভাদি প্রাপ্ত হইয়াছে, কোন কোন কৃষকের গৃহে তাহা পড়িয়া রহিয়াছে। প্রস্তরগুলি বৃহৎ বলিয়াই তাহা এখনও অন্যত্র নীত হইতে পারে নাই। ভ্রমণের নিদর্শন স্বরূপ বিজয়নগরের রাজবাটীর বাঙ্গালায় শেষ হিন্দুরাজবংশের প্রথম রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ হইতে কিছু কিছু প্রস্তর-সংগ্রহের জন্য সাহিত্যিকগণের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। এরূপ আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক হইলেও, তাহাকে পরিতৃপ্ত করিবার উপায় সহজ বলিয়া বোধ হইল না! অনেক চেষ্টায়, যাহা কিছু সংগৃহীত হইল, তাহার জন্য যানবাহন দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িল।

বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষটি সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত না থাকিলেও অনুসন্ধান-সমিতির কাহারও কাহারও নিকট অনেক দিন হইতেই সুপরিচিত ছিল এবং সকলে মিলিয়া তর্কবিতর্ক করিয়া, সেই সকল ধ্বংসাবশেষের ঐতিহাসিক মূল্য নির্ণয়ের জন্য ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন। এ সকল বিষয়ে কথা কহিবার অধিকার সকলেরই সমান মনে করিয়া আমরা সকলেই কোলাহল করিয়া থাকি। বিশেষজ্ঞগণ তাহাতে কিছু বিরক্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু বিজয়নগরের অবস্থান ও ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া তাহার প্রকৃত পরিচয় লাভের জন্য বিশেষজ্ঞগণের শরণাপন্ন হইবার প্রয়োজন বড় অধিক অনুভূত হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সেই সেনবংশের প্রথম রাজধানী, বিজয়ী বিজয়সেন দেবের বীরকীর্ত্তির লীলাভূমি, বল্লালসেন দেবের অধ্যাপক অনিরুদ্ধ ভট্টের পদরজঃপূত, লক্ষ্মণসেন দেবের অভিষেক স্থান। এখানে প্রদ্যুম্নেশ্বরমন্দির নির্ম্মিত হইবার সময়ে উমাপতি তাহার প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন, সেনবংশের অনুগ্রহে যে সাহিত্য-প্রতিভা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার শোভা এখানেই রাজসভার গৌরব বর্দ্ধন করিত। জয়দেবের পদাবলী, যেখানে রচিত হউক না কেন, এখানকার রাজসভায় গীত হইয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, এবং এখান হইতেই ভক্তকবি নরোত্তম দাসের সঙ্গীতের উৎস উন্মুক্ত হইয়া বৈষ্ণবসাহিত্যকে রসময় করিয়া তুলিয়াছিল। এই সকল কারণে ইহা সাহিত্যিকগণের তীর্থক্ষেত্র।

বিজয়নগর পরিদর্শনের পর এ যাত্রার মত বিজয়-যাত্রা পরিসমাপ্ত হইল। তখন সাহিত্যিকগণ একে একে নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন, এই কালে

যাবাণী-রচিত সিন্ধুপদ।—ইহাতে কাহারও তথায় আনীত হইয়াছিল। তাহা দেখিবার
কিছুমাত্র বিস্ময় ঘটিল না। নগরে উপনীত জন্য মেলা বসিয়া গিয়াছিল।
হইবার পূর্ব্বেই পুরাকীর্ত্তির অনেক নিদর্শন

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

সমুদ্র।

আবার এসেছি আমি তোমার নিকটে
হে অসীম, হে অপার!
কি নীলিমা—কি বিস্তার—
কি সুন্দর—কি মহান্—উদ্বেগে সাপটে!
কি অস্থির সংঘর্ষণ,
কি গভীর আলোড়ন,
বিস্মিত, স্তম্ভিত আমি দাঁড়াইয়া তটে।

নাহি দিবা-রাত্রি-জ্ঞান,
অস্তমিত বিশ্বজ্ঞান,
তুমি মত্ত আপনার প্রলয় নর্ত্তনে!
তরঙ্গে আছাড়ি তীরে
কাতরে কাঁদিয়া ফিরে,
ক্ষুব্ধ বায়ু হাহা করে নিষ্ফল গর্জ্জনে!

৩

উচ্চ শির, উদ্যমিয়া,
সহস্র তরঙ্গ নিয়া
সহস্র বাসুকী-ফণা ঘর্ষয়ে নির্ঘোষে;
বক্ষে ফেন রাশি রাশি,
কি বিকট অট্ট হাসি,
ধরারে ফেলিবে গ্রাসি' আহত সংরোষে।

৪

এইখানে, ধরা শেষ,
ধরার সংঘর্ষ ক্লেশ,
জীবনে মরণে সন্ধি—লুপ্ত আত্মপর!
ক স্পৃষ্ট তন্তুর তট,
মহাকাশ সন্নিকট,
সাগরে জলদ বহ জলদে সাগর!

৫

এই চির হাহা রবে,
যেন আমি একা ভবে,
হেরি মূল প্রকৃতির হৃদয়-স্পন্দন!
পলকে পলকে হয়,
কতনা উত্থান লয়,—
কত অনির্দ্দেশ আশা, অস্ফুট স্বপন!

৬

ওই দূর চক্রবালে,
রহস্যের অন্তরালে
আভাসে প্রকাশ পায়, সে আদি কিরণ
কোথা তুমি বিশ্বস্বামী!
কোথা ক্ষুদ্র তুচ্ছ আমি,
কত তুচ্ছ সুখ দুখ জীবন মরণ!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

পয়গম্বর।*

We cannot look, however imperfectly, upon a great man, without gaining some thing by him. He is the living light-fountain, which it is good and pleasant to be near. The light which enlightens, which has enlightened the darkness of the world; and this not as a kindled lamp only, but rather as a natural luminary shining by the gift of Heavens —Carlyle.

সে আজ বহুদিনের কথা,—হিরা পর্ব্বতের এক প্রান্ত শুষ্ক শীতল গুহা মধ্যে নিভৃতে বসিয়া একজন ভক্ত আত্মবিস্মৃত হইয়া চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। কখনো আশা, কখনো নিরাশা, কখনো সন্দেহ, কখনো সন্তোষ তাঁহার উজ্জ্বল ললাটপটে, তাঁহার কৃষ্ণতারনয়ন প্রান্তে প্রতিফলিত হইতেছিল। অকস্মাৎ কে যেন তাঁহার কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণ করিয়া কহিল—হে ভক্ত উঠ, বিশ্বের দিকে চাহিয়া দেখ—আমি আছি। মহম্মদ বিদ্যুদ্বেগে গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন!

উদার প্রকৃতি—যিনি চল্লিশ বর্ষ ধরিয়া তাঁহাকে সকল শিক্ষা দিতেছিলেন—স্নেহভরে চাহিয়া রহিলেন। মহম্মদ দেখিলেন মস্তকের উপর মেঘ-কলঙ্কশূন্য নক্ষত্রাবলী-খচিত সমুজ্জ্বল নীলাকাশ, বিশ্বশিল্পীর রণ কৌশল প্রদর্শন করিতেছে; সম্মুখে পশ্চাতে যতদূর দৃষ্টি চলে অনন্ত বালুরাশি চন্দ্রকিরণে ঝলসিতেছে, সেই উত্তপ্ত বালুকা ভেদ করিয়া উৎসমুখে ভগবানের আশীর্ব্বাদ তুষিত মানবের অশান্ত হৃদয় যেন সুধাধারা বর্ষণ করিতেছে, দূরে ঐ সুদূরে, উচ্চে আরো উচ্চে শূন্যের উপর শূন্য উঠিয়া আলোকে-আঁধারে মিশাইয়া গিয়াছে। নীরব—নীরব—সব নীরব! সুবিশাল নভোমণ্ডল নীরব—সুবিস্তৃত প্রান্তর নীরব—অগণিত শিখরাবলী-পরিশোভিত বিপুল হিরা পর্ব্বত নীরব! সেই গম্ভীর নীরবতার মধ্যে, সেই শৈলচ্ছায়া ও চন্দ্রালোকের মিলনক্রমে, সেই বিরাট বিশ্বপটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভক্ত মহম্মদ দিব্য জ্ঞান লাভ করিলেন। মরুপ্রদেশের প্রতি উষ্ণ পবন-শ্বাসে তিনি শুনিতে লাগিলেন—কৃষ্ণপ্রস্তরখণ্ড কিছু নহে, অনুরঞ্জিত কাষ্ঠ-ফলক ভগবান নহে—হে ভক্ত! আমি আছি, আমার পূজা কর!

উদ্‌ভ্রান্ত মহম্মদ ব্যাকুল চিত্তে প্রিয়তমা পত্নীর পার্শ্বে যাইয়া কহিলেন—'খোদেজা, আমি পাইয়াছি, ভগবানকে পাইয়াছি। তাঁহার পূজা কর। আর সব মিথ্যা, খোদেজা! আর সব মিথ্যা!' তখনই আবার সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল। 'সত্যই কি পাইয়াছি? তবে কি সকলই মিথ্যা?' ভক্ত সেবক কর্ত্তৃক বহুমানে পূজিত বহু বর্ষের বৃদ্ধ কাবা, তাহার অভ্যন্তরে সেই জগতের সাক্ষাৎ দেবতা কৃষ্ণপ্রস্তর—সম্প্রদায়ে সম্প্র-

* ১৯১০ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে বঙ্গভাষার মাননীয় বন্ধুবর স্বর্গীয় রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী বাহাদুরের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনীর অধিবেশনে পঠিত।

ঘরে পরিবারে পরিবারে গৃহে গৃহে মন্দিরে দেবো পদাঘাতে সেবিত শত শত রঞ্জিত দারুমূর্ত্তি পিতৃপিতামহ কর্ত্তৃক সগৌরবে প্রচারিত অতি বৃদ্ধকাল-মান্য শত সংস্কার—এ সকলই কি তবে মিথ্যা?'

ভক্ত-হৃদয় পুনরায় আলোকোদ্ভাসিত হইল; তিনি বুঝিলেন সবই মিথ্যা, সবই ভাণ, শুধু সেই অনাদি অনন্ত পরমেশ্বর। তাঁহার বিজয়ী হৃদয় কহিল—মহম্মদ সমস্ত আরব তোমাকে কি দিতে পারে? গ্রীক্ হিরাক্লিয়াসের রাজমুকুট? পারস্যের খস্রুর রাজ-সিংহাসন? সমস্ত পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিকার? তুচ্ছ! তুচ্ছ! ধূলার ধরণী মুহূর্ত্তে ধূলা হইবে! মহম্মদ বুঝিলেন পুণ্য মন্দির কাবার অধিপতি অথবা সমগ্র আরবের পুরোহিত হইয়াও যদি একখানি কাষ্ঠফলক লইয়া জীবন কাটাইতে হয়, তাহাতে মুক্তি নাই, মরণে সেইরূপ শ্রেষ্ঠ শেষেরও মুক্তি ঘটিবে না! মহম্মদ ব্যাকুল আগ্রহে পুনরায় কহিলেন 'খোদেজা, সত্য সত্যই ভগবান আছেন। তিনি এক—তিনিই সব। তাঁহারই পূজা কর। বল খোদেজা, আমি কি সত্য সত্যই সেই ভগবানকে পাইয়াছি?'

পতিগতপ্রাণা স্নেহময়ী মুগ্ধা বিস্মিতা খোদেজা এতক্ষণ পতির মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। সন্দেহহীন সরল চিত্তে অতিমাত্র বিশ্বাসের সহিত কহিলেন,—ভয় নাই, প্রভু, তুমি আজ আনন্দের সংবাদ আনিয়াছ। আজ হইতে আরবজাতির স্বর্গদূত বলিয়া তোমার পূজা করিব। আনন্দ কর প্রভু আনন্দ কর। আল্লার আশীর্ব্বাদে অপযশ তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। এত দিন কি বৃথাই তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনদিগকে ভাল বাসিয়াছ, বৃথাই কি সকলের ব্যবহারে প্রতিবেশীদিগকে তুষ্ট করিয়াছ? তোমার দীনে দান, বাক্য-রক্ষা, সত্যের জন্য সমর, এ সকল কি তবে বৃথাই যাইবে?

মহম্মদের বিশ্বাস, মহম্মদের সংস্কার, মহম্মদের সংকল্প যখন ক্ষুদ্র অসহায় শিশুর ন্যায় আর একজনের আশ্রয়ে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে চাহিতেছিল, ইস্‌লাম প্রতিষ্ঠার সেই মহাসন্ধিযুগে যদি তিনি পত্নীর আশ্রয় না পাইতেন, কে বলিবে যে তাহা হইলে ঝঞ্ঝা-বিতাড়িত বালুরাশির ন্যায় তিনিও সমূলে স্থানচ্যুত, লুপ্ত ও চিরতরে বিস্মৃত হইতেন না? যে ভগবানের অন্বেষণে তিনি দিবানিশি ব্যাকুল থাকিতেন, যাঁহার জন্য তিনি দাসদাসী, বসন-ভূষণ এমন কি প্রাণোপমা খোদেজাকে পর্য্যন্ত পশ্চাতে রাখিয়া অনন্যচিত্ত যোগীর ন্যায় নির্জ্জন শৈলকক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই ভক্তের ভগবান খোদেজার শক্তি দিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। তাই মক্কা আরব পৃথিবীর ইতিহাসে স্থান লাভ করিল, ইস্‌লামমন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল, ইস্‌লামের মন্ত্র-শক্তি ভক্তগণের হৃদয়ে হৃদয়ে, বাহুতে বাহুতে সঞ্চারিত হইয়া বিশ্ববিজয়ে অগ্রসর হইল। উত্তরকালে মহম্মদ নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিলেন যে, ভগবান খোদেজার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াই তাঁহাকেও শক্তিশালী করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল পর খোদেজা স্বর্গে গমন করিলে যখন মহম্মদ সুন্দরী যুবতী আয়েষার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা মুসলমান-রমণী-সমাজের শিরোমণি আয়েষা একদিন স্নেহ মধুর বাক্যে

জিজ্ঞাসা করিলেন—'বল প্রভু, আমি কি খোদেজা অপেক্ষা ভাল নহি? সে বিধবা ছিল। বয়স হইয়াছিল বলিয়া তাহার তেমন রূপও ছিল না। বল, তুমি কি খোদেজা অপেক্ষা আমাকে বেশী ভালবাস?'

পূর্ব্ব কথা স্মরণে উদ্বেলিতহৃদয় মহম্মদ মৃদুস্বরে কহিলেন—'না আয়েষা, আমার দোহাই—না। পৃথিবীতে যখন কেহ আমাকে বিশ্বাস করে নাই, তখন সে-ই আমাকে বিশ্বাস করিয়াছিল। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বন্ধু বলিতে একজনই শুধু ছিল। সে সেই খোদেজা।' কি প্রবল অনুরাগ! কি মুগ্ধতা!

এই খানেই সেই তথাকথিত মূঢ় বেদোইন-চরিত্রের দৃঢ়তা সূচিত হইতেছে, যাহারা মৃত্যুর পরও বুঝি উপকার বিস্মৃত হয় না, কিন্তু শত্রু অতিথি হইলেও দিবসত্রয় পর্য্যন্ত তাহাকে নিজ পট্টাবাসে আশ্রয় দেয় এবং যথোচিত সেবার পর নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্য পথে পৌঁছাইয়া দিয়া অবশেষে যে কোন উপায়ে তাহাকে হত্যা করে! বেদোইন মনে করে যে তদ্রূপে শত্রু-সংহার অতিথিসৎকারের ন্যায়ই পবিত্র অনুষ্ঠান বিধিমাত্র!

মরুভূমি আরব—তাহার সেই মরু প্রান্তরের মধ্যে মধ্যে কঠিন বন্ধুর কর্কশ শৈল-শ্রেণী—মৃত্যুর পর শুষ্ক তপ্ত তপন-কিরণে অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছে। গিরিমালা ধূসর-ধূসরোহ। স্থানে স্থানে শস্যশ্যামল, সিক্ত ভূমি আলেখ্যবৎ প্রতিভাত হইয়া বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেছে, স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝর প্রবাহিত হইয়া কিছু দূর পর্য্যন্ত ন্যায় শোভা বিস্তার করিবার সুযোগ ঘটাইয়াছে। কোথাও বা পত্রশূন্য গন্ধতরু গন্ধলতাদি পবন-হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে, কোন স্থানে কণ্টকগুল্ম ফল-সুশোভিত খর্জ্জুর বৃক্ষশ্রেণী রুদ্র রৌদ্রে তপ্ত তপনে রসহীন হইতেছে। যেন একটি অতি বিস্তীর্ণ অনন্ত অচল মরু সমুদ্র দিগন্তর চুম্বন করিয়া নিদ্রিত। সে সমুদ্রে দৃশ্যমান আর কিছু নাই, কেবল বহু দূরে দূরে মনুষ্যাবাসের ক্ষীণ চিহ্ন বর্ত্তমান। সেখানে তুমি একা! এই বিরাট বিশ্বকে একান্ত নগ্ন মূর্ত্তিতে সম্মুখে লইয়া তুমি একা! প্রভাত হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত মরুসূর্য্যের অনলাধিক তপ্ত অনল কিরণ চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হইয়া তোমাকে দগ্ধ করিবে—নিশীথে মেঘশূন্য পরিচ্ছন্ন ঘন নীল আকাশ গ্রহ-নক্ষত্রাদি খচিত হইয়া তোমার শিরোপরি শীতল আস্তরণ বিস্তৃত করিয়া দিবে। এই দেশই মনুষ্যহৃদয় দৃঢ়চিত্ত জাতির বাসের যোগ্য। তাই আরব-চরিত্রের মর্ম্মে মর্ম্মে কি যেন একটা ক্ষিপ্রকারিতা কর্ম্মশীলতা বর্ত্তমান, অথচ মনে হয় এ জাতি চিন্তাশীল, স্বপ্নভাবী এবং উৎসাহী। তাই দার্শনিক কার্লাইল কহিয়াছেন, আরবগণ প্রাচ্যের ইতালীয়—"Oriental Italians." ইহারা এক তীক্ষ্ণবুদ্ধি মহান্ জাতি—সহস্র আবেগ, সহস্র আকাঙ্ক্ষা যে জাতির হৃদয় দ্বারে ব্যাকুল ভাবে আঘাত করিতেছে, আবার আবশ্যক হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যেই সংবৃত হইতেছে। আরবগণ বহুকাল হইতে ধর্ম্ম-প্রাণ। আপন আপন ধর্ম্মভাব ও সংস্কার-বশত ইহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি নানাবিধ প্রাকৃতিক বস্তুর উপাসনা করিত। সে উপাসনায় প্রাণ ছিল, ভক্তি

ছিল, সুখও ছিল। বৎসরান্ত সহস্র ভক্ত কত আয়াস ও পথশ্রম স্বীকার করিয়া প্রাচীন মক্কার তাত্ত্বিক পুস্তকের কারবার দ্বারে সম্মিলিত হইয়া কীর্ত্তিগৌরব ও ধর্ম্ম অর্জ্জন করিত। ক্রেতা বিক্রেতা প্রভৃতি লক্ষাধিক লোক তখন মক্কানগরে বাস করিত। মক্কাই সেকালে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র ছিল। দেশে কোন নিয়ম-তন্ত্রানুমোদিত বিচার বা শাসনপ্রথা প্রচলিত ছিল না। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ছিল। সকলেই স্বাধীন, সকলেই আত্মমতাবলম্বী, সকলেই আপন আপন সাম্প্রদায়িক নেতার আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিল। এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের কণ্ঠচ্ছেদ করিতে বিন্দুমাত্র চিন্তা করিত না। সৌখ্য সম্বন্ধ একরূপ ছিল না। আরবের মরু মধ্যে তখনও জন্মলাভ করিবার সুযোগ পায় নাই। যে সম্প্রদায়ে যাহার যখন প্রতিপত্তি, শক্তি ও সমৃদ্ধি থাকিত, লোকে তাহাকেই নেতৃত্বে বরণ করিত। একই সময়ে একই সম্প্রদায় মধ্যে দুইজন শক্তিশালী ব্যক্তি থাকিলে তাহারা পরস্পর পৃথক হইয়া দলবদ্ধ হইত। দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় হইতে দশ জন নির্ব্বাচিত হইয়া কাবার কর্ত্তারূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। ইস্‌লাম-প্রবর্ত্তক মহম্মদের সময়ে কোরেশ-সম্প্রদায় এই গৌরবের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্বয়ং মহম্মদ সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

যাহা থাকিলে মানুষ আত্মীয়তা সূত্রে বদ্ধ হইয়া শক্তিশালী হয়, যাহা থাকিলে শক্তিশালী জাতি বিশ্বের সম্মুখে গর্ব্বভরে বলিতে পারে, "আমার গতি কে রোধ করিবে আইস" —যাহার জন্য সেই শক্তিসম্পন্ন জাতি পৃথিবীর ইতিহাসে বরেণ্য হইতে পারে, আরবে তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। কেবল অভাব ছিল, অনন্যসাধারণ শিল্পীর—যাঁহার চরণস্পর্শে মূক বাগ্মী হয়, বধির শ্রবণ শক্তি পায় পঙ্গু গিরিলঙ্ঘন করে—যাঁহার ঐন্দ্রজালিক আহ্বানে বায়ু হইতেও সহস্র বীর মুহূর্ত্তে আবির্ভূত হইয়া বিশ্ববিজয়ে অগ্রসর হয়।

শুভক্ষণে ৫৭০ খৃঃ অব্দে সেই মহাশিল্পী আরবদেশ পবিত্র করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কাল তখনও আসে নাই। কোরেশ-সম্প্রদায়ের দরিদ্র অথচ সম্ভ্রান্ত হেসেম পরিবারে তিনি জন্ম পরিগ্রহ করিলেন, পিতালোক দর্শন করিতে না করিতেই তাঁহার পিতার মৃত্যু ঘটিল। পিতামহ পৌত্রের নয়নে বদনে অবয়বে চিরনিদ্রাভিভূত প্রাণাধিক পুত্র আবদুল্লাকে নিরীক্ষণ করিয়া পরম যত্নে শিশুকে রক্ষা করিলেন। দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই বৃদ্ধেরও মৃত্যু ঘটিল, আরবের ভাগ্যবিধাতা, খুল্লতাত আবু তালেবের গৃহে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন।

ধীরে ধীরে শৈশব অতিক্রান্ত হইয়া কৈশোর আসিল, আরবে তখন লিখনপ্রণালী কেবল প্রচারিত হইতেছে। বালক মহম্মদ তাই তখন হইতেই প্রকৃতির বিরাট পুস্তক পাঠ করিতে অভ্যস্ত হইতেছিলেন। সভ্যতার বিদ্যালয়ের অভাবেই বিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার কোনো সম্বন্ধ থাকিল না। যিনি একটি শক্তিশালী জাতি, হিরার ন্যায় সমুন্নত ধর্ম্মমত গঠন করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, বিদ্যালয়ে তাঁহার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

পৃথিবীর সকল গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ যাহা, তাহাই তাঁহার সম্মুখে উন্মুক্ত ছিল, তিনি সানন্দে তাহাই পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বাণিজ্যব্যপদেশে মুগ্ধতাতের সহিত নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এক দিন যোগ্যের সহিত যোগ্য আসিয়া মিলিত হইল—পঞ্চবিংশতিবর্ষবয়স্ক মহম্মদের সহিত চল্লিশবর্ষবয়স্কা বিধবা সুন্দরী খোদেজার পরিণয় ঘটিল। দরিদ্র মহম্মদ সম্পত্তিশালিনী পত্নীর অর্থে ধনশালী হইলেন। তখনও তিনি ভাবিয়াছিলেন যে গৃহে থাকিয়া সদুপায়ে জীবন যাপন করিবেন—সম্পূর্ণরূপে গৃহীই থাকিবেন।

কাল তাঁহাকে অন্যদিকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। প্রকৃতির শিক্ষা যখন পূর্ণ হইল, ভগবান তখন তাঁহার হৃদয় মধ্যে অধিষ্ঠান করিলেন, হৃদিপদ্ম ভগবানের চরণস্পর্শে বিকশিত হইয়া উঠিল, যেন কোনো দেবতা আসিয়া জ্ঞানাঞ্জনশলাকা-স্পর্শে তাঁহার নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া দিল—তিনি যাহা কখনো দেখেন নাই তাহাই দেখিলেন। হৃদয় বলিল কি সুন্দর! কি মহান্! কি অপূর্ব্ব! মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকাকণা হইতে নীলাম্বরশোভী পূর্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত সবই যেন এক অভিনব সুন্দর নয়নাভিরাম বেশে তাঁহার সম্মুখে প্রতিভাত হইল। যে চিন্তা এতদিন তাঁহাকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইত, আজ তাহা মূর্ত্তি লইয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিল। তিনি ভাবিলেন, কি আমি? কে আমি? যাহাকে লোকে পৃথিবী বলে—এই রচনা-কৌশলময় বিশ্ব, ইহাই বা কি? কে ইহার শিল্পী? তাঁহার বিভ্রান্ত চিত্ত ব্যাকুল হইল। তিনি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার কর্ত্তব্য কি?' দূরে হিরা পর্ব্বতের শিখরাবলী আলোকপাতে উজ্জ্বল হইয়া তাঁহার দিকে মূর্ত্তের ন্যায় চাহিয়া রহিল—ঐ দিনেই-পর্ব্বতমালা, বৃদ্ধ আরবের জ্ঞান গরীয়ান সাক্ষীর ন্যায় উচ্চ শিরে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। বৃক্ষ গুল্ম লতা পত্র, গ্রহ-নক্ষত্র কেহ কথা কহিল না। ভক্ত মহম্মদ কাতর চিত্তে আত্ম-জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সেই আকুল আত্ম-জিজ্ঞাসার ফলে আরবের বিদগ্ধ বক্ষ চিরিয়া যে বেগশালী প্রস্রবণ বহিয়াছিল, তাহা কিরূপে গ্রাম হইতে গ্রামে, নগর হইতে নগরে, দেশ হইতে দেশে, দুরারোহ গিরি, দুরতিক্রম্য সাগর, পথহীন কানন কিছু না মানিয়া পরবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল—তাহা আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

যে দেশে সাম ঋক্ যজু সৃষ্ট হইয়া পৃথিবীকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছিল, যে দেশের সুষিনী-কাননে মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়া অর্দ্ধ পৃথিবীর পূজা পাইয়াছিলেন, যে দেশের ভাগীরথী-তীরে মৃদঙ্গ-নিনাদ শুনিয়া বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা আনন্দে নৃত্য করিয়াছিল, সে দেশের ধর্ম্মমত তত বিস্তার লাভ করে নাই, যতটা আরব দেশের ধর্ম্মমত করিয়াছিল। বুদ্ধ ভারতের ধর্ম্মচক্র এক দিন ত্রিবেণীর ত্রিধারায় তীর পৃথিবীর নানা স্থানে জ্ঞান ও আলোক দান করিয়া সঞ্চারিণী দীপশিখার ন্যায় ভ্রমণ করিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সে গৌরব, সে ভক্তি অধিক দিন তেমন ভাবে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। যজ্ঞবহ্নিতে ক্রুশ যে

দিন পৃথিবী মধ্যে আপন গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল; আজিও যেমন, শত বর্ষ পূর্ব্বেও তেমনি শত শত ধর্ম্ম-দূত, নানা দিগ্দেশে কত শ্রম কত কষ্ট কত অত্যাচার সহিয়াও ক্রুশের মাহাত্ম্য প্রচারে ব্রত করিয়াছিলেন, যে প্রচারের কাহিনীর সহিত কত শিরশ্ছেদ, কত পৈশাচিক নিগ্রহ, পৃথিবীর কত ভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের কাহিনী বিজড়িত—যাহার সহিত কত মেহাদের শোণিতসিক্ত ইতিহাস আজিও শত সহস্র ধর্ম্মপ্রাণ স্বদেশভক্তের গৌরব ও ত্যাগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, সে ক্রুশও বহু পরিভ্রমের পর কোনো কোনো স্থানে আরবের 'খালেদ'কে পরাজিত করিয়াছিল বটে, কিন্তু নিজেও বহু স্থানে পরাজিত হইয়াছিল। এসিয়া হইতে সমুদ্ভূত এই বৌদ্ধ, মুসলমান ও খৃষ্টানধর্ম্মের এই বিপুল ত্রিবেণীর সংঘর্ষকাহিনী, শুধু যে শিক্ষাপ্রদ তাহা নহে, পৃথিবীর ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা জটিল অথচ শ্রেষ্ঠ ঘটনা। যাঁহাদের চরণপ্রান্ত হইতে সেই ত্রিধারা বহির্গত হইয়াছিল, সেই তিন মহাপুরুষই তাই পৃথ্বি-পূজিত, বরেণ্য ও দ্যাবচন্দ্র-দিবাকরসমুজ্জ্বল গ্রহের ন্যায় দীপ্যমান। তাঁহারা কোনো দেশের কোনো জাতির বা কোনো সমাজের নিজস্ব নহেন—তাঁহারা বিশ্বের! বিশ্বের মহাপ্রাণ তাঁহাদের জীর্ণ নরদেহের পিঞ্জরে থাকিয়া লোকহিতের জন্য তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিল। নিমীলিত নেত্রে একাগ্রচিত্তে, উদার হৃদয়ে চিন্তা করিলে ইহাই দেখা যাইবে যে, সেই মহাপ্রাণ হইতে নানা ভাবে, নানা ভাষায়, নানা আবরণে শুধু একটি মাত্র, মহাবাক্যই ধ্বনিত হইয়া বিশ্বকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছিল। সেই মহাবাক্য আর কিছুই নহে—চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধি! একটি অগণ্য তুচ্ছ ক্ষুদ্র বাক্যমাত্র। কিন্তু বিশ্ববীজের ন্যায় ক্ষুদ্র অথচ বিশ্বের ন্যায় বৃহৎ। যে মহাবাক্যের মূর্ত্তি হৃদয়ে শান্তি, মনুষ্যে প্রীতি ও ঈশ্বরে ভক্তি—তাহাই কি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার কথা নহে? সংসারত্যাগী কৌপীনধারী, পত্রাহারী সন্ন্যাসী, ঐ যে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া যুক্ত করে নিমীলিত নেত্রে বসিয়া শ্বাপদসঙ্কুল শৈলারণ্যে ধ্যান-নিমগ্ন অথবা ঐ যে রাজ-রাজেশ্বরের রাজকুমার প্রিয়তমা পত্নীর পার্শ্বে নিদ্রিত! রজনী দ্বিপ্রহর—নীরব যেন, বাতহীন। কুমার জাগ্রত হইলেন—মুহূর্ত্তে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন, সংসার ত্যাগ করিবেন—স্নেহ, মমতা, প্রেম তাঁহাকে আকর্ষণ করিল, শয্যাপার্শ্বে ফিরাইয়া আনিল, ক্রন্দিতস্ত্রী করুণ রাগিণীতে গাহিল—নির্দ্দয় কোথায় যাও; দেখ, চাহিয়া দেখ, যশোধারার মুখের দিকে চাহিয়া দেখ—ঐ রাজকুমারের দিকে চাহিয়া দেখ। রাজ-কুমার মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইলেন, মুহূর্ত্তের জন্য চাহিয়া দেখিলেন; মুহূর্ত্তের জন্য—সে বুঝি শুধু মুহূর্ত্তের জন্য—তাঁহার হৃদয়ে ব্যথা বাজিল। রাজকুমার পর মুহূর্ত্তেই গৃহের বাহির হইলেন, বিশ্বের বিষাদ তাঁহাকে কর্ম্মপথে আহ্বান করিয়াছিল। আবার সেই এক দিন যে দিন ঐ দেখ কাষ্ঠ-ফলকে কণ্ঠবিদ্ধ হইয়া একজন মহাপুরুষ কহিলেন—পিতা ইহাদিগকে ক্ষমা কর, ইহারা কি করিতেছে তাহা জানে না। আবার

সেই দিন আর এক জনও যখন কাতর কণ্ঠে কহিলেন "আর সব মিথ্যা, সেই অনন্ত অনাদি পরমেশ্বরকে ভাব", তখন অপমানিত, নির্য্যাতিত, লোষ্ট্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইলেন, তবুও কহিলেন—সেই এক ভগবান, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই ধর্ম্ম। ইহারা কিসের সন্ধানে জীবন ক্ষয় করিয়াছিলেন? জীবন ক্ষয় করিয়া ইহারা কোন মহান্ সত্য প্রচার করিয়াছিলেন? হৃদয়ে শান্তি, মনুষ্যে প্রীতি, ঈশ্বরে ভক্তি তাহাই চিত্তশুদ্ধি, তাহাই ধর্ম্ম, তাহাই সকল ধর্ম্মের সার, ইহাই ভগবাক্য ইহাই—

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হুদাহৃত
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।
সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।
স এষ ভক্তিযোগস্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণান্মদ্ভাবায়োপপদ্যতে।

বঙ্গের সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র স্বল্প কথায় এই বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়া কহিয়াছিলেন—"চিত্তশুদ্ধি থাকিলে সকল মতই শুদ্ধ, চিত্তশুদ্ধির অভাবে সকল মতই অশুদ্ধ। যাহার চিত্তশুদ্ধি নাই, তাহার কোন ধর্ম্মই নাই, যাহার চিত্তশুদ্ধি আছে, তাহার আর কোন ধর্ম্মেই প্রয়োজন নাই। চিত্তশুদ্ধি কেবল হিন্দুধর্ম্মেরই সার এমত নহে, ইহা সকল ধর্ম্মেরই সার। ইহা হিন্দুধর্ম্মের সার, খ্রীষ্টধর্ম্মের সার, বৌদ্ধধর্ম্মের সার, ইসলামধর্ম্মের সার, নিরীশ্বর কোমৎধর্ম্মেরও সার। যাহার চিত্তশুদ্ধি আছে, তিনি শ্রেষ্ঠ হিন্দু, শ্রেষ্ঠ খ্রীষ্টিয়ান, শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ, শ্রেষ্ঠ মুসলমান, শ্রেষ্ঠ 'পজিটিভিষ্ট।' যাঁহার চিত্তশুদ্ধি নাই, তিনি কোন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। চিত্তশুদ্ধিই ধর্ম্ম।"

যাহারা নরশোণিতে পরিতৃপ্ত হইতে, বান্ধবের কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে কুণ্ঠিত হইত না, যাহারা শিশু-হত্যা, নারী নিগ্রহ করিয়া আরবের তপ্ত মরুকে আরও তপ্ত করিয়াছিল, চিত্তশুদ্ধির পুণ্যপ্রস্রবণ কিরূপে তাহাদের কলঙ্করেখা ধৌত করিয়াছিল, তাহা বারান্তরে বলিব।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি।

সুদূর নন্দন লোকে মন্দাকিনীতীরে
হাতে লয়ে স্বর্ণবীণা উন্মাদের পারা
গাহিতে অমৃতগীতি হয়ে আত্মহারা
অরূপের সুরবৃন্দে নয়নের নীরে
ভাসাইতে গীতরবে হে গায়ক-কবি।
ছাড়ি সে অমরাপুরী হে সুর-সন্ন্যাসী
এলে তুমি এ ধরায়। মানব মানবী
নিত্য যেথা সুখ দুঃখ পুণ্য পাপরাশি
তুলিতেছে অহর্নিশ, তুমি সেথা আসি
তুলিলে নন্দন-তান, অমিয় ঝঙ্কার।
সহসা থামালে বীণা অশ্রুজলে ভাসি
জনতার সুর সনে মিলাইলে তার,
জাগায়ে তুলিলে ধীরে মীড়ে মূর্চ্ছনায়
ধরার ক্রন্দনধ্বনি নন্দনবীণায়।

শ্রীসুরেশচন্দ্র [illegible]

বশীকরণ।

সুবিস্তৃত উদ্যানবাটিকায় পরিচ্ছন্ন শিলা-তলে বসিয়া দুই বন্ধুতে মহাতর্ক চলিতেছিল।

রমেশ বলিল "হিন্দুধর্ম্মের ও সব 'বুজরুকি' আমি মানি না। যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, দেব, দানব, ভূত, প্রেত—যত সব 'অনাসৃষ্টি' ব্যাপার! তার উপর আবার দৈববল, মন্ত্রশক্তি, আচার-তন্ত্র, সংস্কার-কাণ্ড প্রভৃতি ছত্রিশ কোটী উপদ্রব! ধর্ম্মের উপর এত উৎপীড়ন সহ্য হয় না। যেখানেই দেখিবে আড়ম্বরের অতিশয় বাহুল্য, সেখানেই জানিবে প্রকৃত তথ্য অতি অল্প। এই সকল জটিল আড়ম্বর-বাহুল্যই হিন্দুধর্ম্মকে অহিন্দুর নিকট অশ্রদ্ধেয় করিয়া তুলিয়াছে।"

শুনিয়া শচীন্দ্রনাথের মুখমণ্ডল রক্তিম হইয়া উঠিল। শচীন্দ্র বলিল "তোমার প্রধান দোষই হইতেছে কোন বিষয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা না করা। জলের উপরে উপরে ভাসিয়া কেহ মুক্তার সন্ধান পায় না। মুক্তা লাভ করিতে হইলে অতলে ডুব দিতে হয়।" রমেশ হাসিয়া বলিল "কিন্তু ডুবিবার পূর্ব্বেই লোণা জল খাইয়া যে প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে!"

শচীন্দ্র বলিল "হিন্দুধর্ম্মের এক কণিকাও অনুমান বা কল্পনা নহে। ইহার সমস্তই প্রত্যক্ষলব্ধ সার সত্য! জগতের আর কোন ধর্ম্ম এ গৌরব করিতে পারে না।"

রমেশ হাসিয়া বলিল "এই গায়ের জোরের তর্কটাও চিরকালই শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু কোন দিন সত্যকে উপলব্ধি করিতে ত কাহাকেও দেখিলাম না।"

শচীন্দ্র অনেকক্ষণ ভাবিল। তার পর সহসা বলিল "আচ্ছা আজ হইতে এক মাসের মধ্যে আমি তোমাকে একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিব। ইতি মধ্যে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।"

রমেশ হাসিয়া বলিল "সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় রহিলাম। সে শুভদিন যদি নাও আসে তাহা হইলেও বিশেষ দুঃখিত হইব না। শুধু এইটুকু দেখিও, হিন্দুধর্ম্মের সত্যতা প্রমাণ করিতে গিয়া এ হতভাগাকে যেন তোমার বন্ধুত্ব হইতে বঞ্চিত করিও না। হিন্দুধর্ম্মের সারত্ব অপেক্ষা আমি তোমার বন্ধুত্বকে অধিক মূল্যবান মনে করি।" রমেশ হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। শচীন্দ্র সেই গোধূলিরঞ্জিত আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতে লাগিল।

তার পর সহসা উঠিয়া আপনার কক্ষে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আলো জ্বালিয়া 'বৃহৎ তন্ত্রসার' লইয়া বসিল।

ইংরাজী-শিক্ষার ভীষণ মোহ হইতে যে দুই চারিজন দৈবক্রমে রক্ষা পাইয়া ঘরে ফিরিয়াছিল, শচীন্দ্রনাথ তাহাদের মধ্যে একজন। বিজ্ঞানে এম্-এ, পাস করিয়াও শচীন্দ্রনাথের শাস্ত্রে অটল বিশ্বাস ছিল।

শচীন্দ্রনাথ অনেক ভাবিয়া স্থির করিয়াছিল, প্রত্যক্ষ কিছু দেখাইয়া অবিশ্বাসীর সংশয়চ্ছেদের পক্ষে তন্ত্রের মত বহুমূল্য আর কিছুই নাই।

পর দিন হইতেই শচীন্দ্রনাথ দাঁড়কাকের পিত্ত, বনমানুষের হাড়, শ্বেত আকন্দের মূল প্রভৃতি লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়া দিল।

কিন্তু এক সপ্তাহের নিষ্ফল প্রয়াস তাহার চিত্তে বিতৃষ্ণা উৎপাদন করিল। সন্ধ্যার

করিল। শচীন্দ্রনাথ দেখিল শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ফলের সহিত প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ফলের মোটেই ঐক্য হইতেছে না। তখন সহসা শচীন্দ্রের মনে পড়িল, হিন্দুশাস্ত্রের সমস্ত সাধনাই গুরুমুখী। গুরুকৃপা ব্যতীত কোন সাধনাই সিদ্ধ হইবার নহে। শচীন্দ্র পরদিনই বায়ু-পরিবর্ত্তনের উপলক্ষ করিয়া বারাণসী যাত্রা করিল।

২

অমাবস্যা রাত্রির ঘোরান্ধকারে শ্মশান-ভূমিতে শবাসনে বসিয়া ধ্যানমগ্ন স্বামী কালিকানন্দ—আর সম্মুখে কুশাসনে উপবিষ্ট পট্টবস্ত্র পরিহিত যুক্তহস্ত শচীন্দ্রনাথ।

আজ শচীন্দ্রনাথের দীক্ষার দিন।

শিবাকণ্ঠে ঘোর কোলাহলে মধ্যযাম ঘোষিত হইল। স্বামী চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। ক্ষণপরে বজ্রকঠোর স্বরে বলিলেন "প্রস্তুত।" বিনীতভাবে শচীন্দ্রনাথ বলিলেন "প্রস্তুত"।

কালিকানন্দ। 'কারণ' কোথায়?

শচীন্দ্রনাথ বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে মদ্যপাত্র বাহির করিয়া স্বামীর হস্তে প্রদান করিলেন। স্বামী বোতলের অর্দ্ধেক মদ্য শবের মুখে ঢালিয়া দিয়া অবশিষ্টের অধিকাংশ নিজমুখে নিক্ষেপ করিলেন। স্বল্পাবশেষ শচীন্দ্রনাথকে দিয়া বলিলেন "প্রসাদ গ্রহণ কর।" শচীন্দ্রনাথ ভয়ে ভয়ে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। তাহার পর অগ্নি সাক্ষী করিয়া শিষ্যকে মন্ত্র দান করিলেন। মন্ত্রদানের পর স্নেহস্বরে শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?"

করজোড়ে শচীন্দ্র কহিলেন "প্রভু, তান্ত্রিক সাধনায় অদ্ভুত শক্তি লাভ হয় শুনিয়াছি। কোন একটি স্বল্পায়াসসাধ্য সাধনার উপদেশ দিয়া যদি অধমের দুর্ব্বল চিত্তে বিশ্বাসের দৃঢ়তা জন্মাইয়া দেন তাহা হইলে দাস কৃতার্থ হয়। আমি জানি কঠোর সাধনা ব্যতীত শক্তিলাভ সম্ভব নহে। কিন্তু আপনি অনন্ত শক্তিশালী মহাপুরুষ, আপনার কৃপা হইলে কিছুই দুর্লভ নহে।"

ঈষৎ হাসিয়া স্বামী কহিলেন "বিভূতিলাভ অতি আয়াসসাধ্য, তবে তোমার চিত্ত-স্থৈর্য্যের জন্য একটি সামান্য ক্ষমতা আপাততঃ তোমায় প্রদান করিব। কিন্তু সাবধান ইহার অপব্যবহার করিও না, একবার মাত্র পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে। ক্রমে সাধনা করিতে করিতে সকল ক্ষমতাই তোমার আয়ত্ত হইবে। সকল ক্ষমতার মধ্যে বশীকরণ ক্ষমতাই সহজলভ্য। তুমি সহস্রবার একাগ্রচিত্তে এই মন্ত্র জপ করিয়া যাহার বস্ত্রে তোমার নাম লিখিয়া দিবে, সে এই মন্ত্রশক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তোমার নিকটে উপস্থিত হইবে। তুমি যতক্ষণ না মন্ত্রের প্রতিসংহার করিবে ততক্ষণ সে এই আকর্ষণী শক্তি হইতে মুক্তি পাইবে না।" গুরুদেব শিষ্যকে মন্ত্র ও মন্ত্রজপ-প্রণালী শিক্ষা দিলেন। শচীন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হইয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিল।

গুরু বলিলেন, "আবার আগামী অমাবস্যায় সাক্ষাৎ করিও।" শচীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত কে একজন দ্রুতবেগে শচীন্দ্রনাথের পাশ কাটাইয়া নিবিড় অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। চিন্তামগ্ন শচীন্দ্রনাথ তাহাকে লক্ষ্য করিলেন না।

৩

রবিবারের অবকাশ পাইয়া কর্ম্মক্লান্ত ভবতারণ বাবু নীরবে বসিয়া তাম্রকূট-ধূম পান করিতেছিলেন। কিন্তু সর্ব্বসন্তাপহারী তাম্রকূটও আজ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিতেছিল না। তাঁহার কুঞ্চিত ললাটে গভীর দুশ্চিন্তারাশি ক্রমেই ঘনীভূত আকারে দেখা দিতেছিল। কন্যাদায়গ্রস্ত ভবতারণ অকূল সমুদ্রের কূল দেখিতেছিলেন না। ত্রিশ টাকা বেতনের দরিদ্র কর্ম্মচারী সুপাত্রের সর্ব্বনিম্ন মূল্য তিন সহস্র মুদ্রা জানিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন।

ভবতারণ বাবুর কন্যা শান্তি পরম সুন্দরী! কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়? দক্ষিণা ভিন্ন দানসিদ্ধির ব্যবস্থা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

আজ ছয়মাস হইতে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ভবতারণ ক্লান্ত হইয়াছিলেন, অতঃপর কি করিবেন ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। পিতার দুর্ভাবনার কৃষ্ণছায়া আসন্নযৌবনা বুদ্ধিমতী কন্যার মুখেও পড়িয়াছিল। কন্যার মুখ পিতার স্নেহময় হৃদয়কে তীক্ষ্ণ কণ্টকের মত ব্যথিত করিতেছিল। শূন্যে দৃষ্টি রাখিয়া চিন্তাভার-প্রপীড়িত ভবতারণ যখন এইরূপে ধীরে ধীরে হতাশার অতল গহ্বরে অবতীর্ণ হইতেছিলেন, সেই সময়ে ভবতারণের অকৃত্রিম সুহৃদ ননীগোপাল সহসা দ্রুত গতিতে ভবতারণের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার দুঃস্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া দিলেন। ননীগোপালের মুখ আনন্দপ্রফুল্ল দেখিয়া সুসংবাদের প্রত্যাশায় ভবতারণ আগ্রহান্বিত হইয়া বলিলেন "কি ভায়া বহুকাল পরে যে! কিছু করতে পারলে? আমি ত একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছি!" ননীগোপাল হাসিয়া বলিলেন "সে কি কথা? হাল ছাড়লে চলবে কেন?

তুফানে পতিত কিন্তু না ছাড়িব হাল
আজিকে হ'ল না কিন্তু হতে পারে কাল।"

ভবতারণ কহিলেন "কা'ল কা'ল করে ত ভাই ছ'মাস কেটে গেল; আরও আশা করি কি ক'রে? আর— তিন হাজার টাকার সংস্থান, সে ত আমাকে বিক্রি করলেও হবে না। মেয়েটাও আমার অবস্থা দেখে দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে! কি আর বোলবো ভাই, গরিবের মরণই ভাল।" ভবতারণ বাবুর জ্যোতিহীন চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল।

ননী বাবু বলিলেন "জান ত ভাই আমি নিশ্চিন্ত নেই, এত দিনে মনে হ'চ্ছে একটা কিছু উপায় করতে পারব। যদি সুবিধে হয় তাহ'লে ভাই শান্তির উপযুক্ত পাত্র হবে। ছেলে শীলে রূপে গুণে চমৎকার! অবস্থাও ভাল। একটি পয়সা খরচও নেই।"

বড় দুঃখেও ভবতারণ বাবু হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন "এ কি প্রত্যাদেশ না কি? তুমি ত সাধু সন্ন্যাসী নিয়েই আছ!"

ননীগোপাল বলিলেন "সত্যিই সন্ন্যাসীর আশ্রমেই রত্নটির সন্ধান পেয়েছি, এখন ভুলে আঁচলে বাঁধতে পারলেই হয়! আর বেশী দিন নয়— এক মাসের মধ্যে একটা 'ইস্পার' 'উস্পার' করতে পারব!"

ভবতারণ বলিলেন "তুমি যে ক্রমেই দুর্বোধ হ'য়ে উঠ্‌চ! ব্যাপারটা খুলে বল দেখি।" সহাস্য মুখে ননীগোপাল বলিলেন "সেইটি এখন বল্‌চিনে। তুমি বিয়ের সমস্ত আয়োজন ঠিক ক'রে রাখ, চাই কি

এই মাসের মধ্যেই বিয়ে হ'য়ে যেতে পারে! আমাকে এখন আর কিছু দিন দেখতে পাবে না। যে পর্য্যন্ত না বিয়ে হয়, পাত্রটিকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখতে হবে। তুমি ইতিমধ্যে বিয়ের আয়োজন গুলো সব ঠিক ক'রে রাখবে। কারণ যখন বিবাহের দিন উপস্থিত হবে, তখন আর আয়োজনের অবসর থাকবে না।" বলিতে বলিতে ননী-গোপাল দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন।

গভীর রহস্যে অভিভূত ভবতারণ অন্যমনস্কভাবে নির্ব্বাপিত তাম্রকূটপাত্র হইতে ধূমাকর্ষণের নিষ্ফল চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

(৪)

কুসুমজ্যোৎস্নাপুলকিত সন্ধ্যায় সৌধশিরে বসিয়া শচীন্দ্রনাথ কল্পনার স্বর্গলোক সৃজন করিতেছিলেন। তাঁহার মনুষ্যশক্তি পরীক্ষার দিন নিকট হইয়া আসিয়াছিল। একপক্ষ অতীত হইয়াছে শচীন্দ্রনাথ রজক গৃহে গিয়া মন্ত্রপাস্তে রজককে অর্থদানে বশীভূত করিয়া একখানি সাড়ীতে নিজের নাম লিখিয়া দিয়া আসিয়াছিলেন। কে জানে কে সেই বস্ত্রের অধিকারিণী? কোন্ কুসুম-কোমলহৃদয় আজ অনির্দ্দিষ্ট বেদনায় অজ্ঞাত প্রেমিকের জন্য এই স্নিগ্ধ নিশায় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে, কে জানে? কে জানে কেমন সে সুন্দরী! পুষ্পপ্রফুল্লা লতিকার মত, কৌমুদীস্নাত মেঘখণ্ডের মত, মেঘ-মধ্যস্থা দামিনীর মত, কে আপন সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত হৃদয়ের অর্ঘ্য বহিয়া তাহার দুয়ারে আসিয়া দেখা দিবে কে জানে?

শচীন্দ্রনাথ কি করিবে? অর্জ্জুনের ভাষায় বলিবে—

"ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী আমি, পতিযোগ্য
নহি বরাননে!"

দ্বিতীয় অর্জ্জুনোর্ব্বশীর চিত্র কল্পনায় অভিনীত দেখিয়া শচীন্দ্র বিজয়গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল। অমূল্য প্রেমের অর্ঘ্য বহিয়া পরিবর্ত্তে সর্ব্বস্বের মূল্যটী হাতে সমাগত, কিন্তু বীরহৃদয় অচল অটল! কি সুন্দর! এমন 'রোমান্স' রমস্তাসেও দুর্লভ!

সহসা কে কক্ষদ্বারে আঘাত করিল। সেই আঘাতের তালে তালে শচীন্দ্রনাথের হৃদয়-তন্ত্রীও স্পন্দিত হইয়া উঠিল। তাহার অন্তর মধ্যে কবিতাবিহঙ্গ গুঞ্জরিয়া উঠিল—

"ওগো চির দিবসের প্রিয়া
আজি, উদয় হইলে হৃদয় মন্দিরে কোন্;
গোপন দুয়ার দিয়া?"

স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় দ্বারে উপস্থিত হইয়া কম্পিত-বক্ষে শচীন্দ্রনাথ দ্বারউন্মুক্ত করিলেন। কিন্তু হায়,

"শীতল বলিয়া　　জলদ সেবিতে
বজর পশিয়া গেল!"

কোথায় লোকাতীত সৌন্দর্য্যশালিনী কুসুমপেলবা কিশোরী, আর কোথায় কক্ষ-মূর্ত্তি স্থূলযষ্টিসনাথ সুদৃঢ়দেহ প্রৌঢ়! শচীন্দ্রনাথের বক্ষ অজ্ঞাত আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। লোকটিকে পরিচিত মনে হইতে লাগিল। কোথায় যেন তাহাকে দেখিয়া-ছেন। স্বামী কালিকানন্দের আশ্রমে কি? দীক্ষার পর দিন প্রাতঃকালে যে জ্যোতিষী তাঁহার বাসায় আসিয়া তাঁহার বিষয়ে সকল কথা জানিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গেও যেন অভ্যাগতের কতকটা সাদৃশ্য ছিল। কিন্তু তাহার দীর্ঘশ্মশ্রু ও জটা ছিল—ইহার কিছুই নাই! শচীন্দ্রনাথ কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। স্থির করিবার অবসরও বড় পাইলেন না। কারণ ক্ষণকাল একদৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াই কর্কশ কণ্ঠে প্রৌঢ় জিজ্ঞাসা করিল "তোমারই নাম শচীন্দ্রনাথ বসু?"

ভয়ে ভয়ে শচীন্দ্র বলিল 'হাঁ মহাশয়।'

আগন্তুক। আমার সঙ্গে চল।

শচীন্দ্র। কোথায়?

আগন্তুক। গেলেই বুঝিতে পারিবে।

শচীন্দ্র। পূর্ব্বে মহাশয়কে কখনও দেখিয়াছি, বলিয়া ত মনে হয় না, আমাকে মহাশয়ের কি প্রয়োজন।

আগন্তুক। চিকিৎসা করিতে হইবে।

শচীন্দ্র। সে কি মহাশয়? চিকিৎসা আমার কোন পুরুষে জানে না!

আগন্তুক বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন "রোগ উৎপন্ন করিতে পার চিকিৎসা জান না?"

শচীন্দ্রনাথ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, ব্যাপার ক্রমেই জটিল হইয়া আসিতেছিল। ভয়ে ভয়ে বলিলেন "সে কি মহাশয়?"

আগন্তুক উত্তরীয়াভ্যন্তর হইতে এক খণ্ড বস্ত্র বাহির করিয়া বলিলেন "কাপড়ের কোণে এ কাহার নাম মহাশয়?"

শচীন্দ্রনাথের বক্ষের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল জিহ্বা শুষ্ক হইয়া গেল। বস্ত্রে শচীন্দ্রনাথেরই হস্তাক্ষর। শচীন্দ্রনাথ প্রাচীর গাত্র অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার মস্তক ঘুরিতেছিল।

আগন্তুক বলিলেন "এ জন্যে আমায় কি কম কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে, ডাক্তার কবিরাজ দেখিয়ে দেখিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হবার উপক্রম হ'য়েছিল, তার পর একজন জ্যোতিষীর সাহায্যে এই ব্যাপারের সন্ধান পাই। এ কি রকমের ভদ্রতা বাপু? ভদ্রলোকের কুমারী কন্যা তার উপর এই অত্যাচার। এখন চল মেয়েটাকে রক্ষা কর। আজ ১৫ দিন হইতে মেয়েটা পাগলের মত হইয়াছে দিন রাত্রি ছুটিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে চায়। কি কষ্টে যে দিন রাত কাটিয়াছে তা ভগবান জানেন।"

ভয়ে ভয়ে শচীন্দ্রনাথ বলিলেন "আমি ত ইহার প্রতিষেধক জানি না, আগামী অমাবস্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। আমি গুরু দেবের নিকট প্রতীকারের উপায় জানিয়া আসিয়া আপনার কন্যাকে রোগমুক্ত করিব।"

আগন্তুক চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বলিলেন "আমি আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিব না। ১৫ দিনের মধ্যে তুমি যদি নিষ্কণ্টক হও, তাহা হইলে আমার কন্যার কি উপায় হইবে? আজ এই রাত্রির মধ্যে যদি তুমি কন্যাকে রোগ মুক্ত করিতে পার ত উত্তম, নতুবা তোমাকে এই রাত্রেই সেই কন্যা বিবাহ করিতে হইবে। যদি স্বীকৃত না হও পুলিস আছে। প্রমাণ-প্রয়োগের অভাব নাই, তাহা বুঝিতেই পারিতেছ!"

শচীন্দ্রনাথের ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। বলিলেন "বিবাহ? আপনাদের জাতি কুল আমি কিছুই জানি না আমারও কিছুই আপনারা জানেন না।"

আগন্তুক ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "তোমার জাতি কুল, জ্যোতিষীর প্রসাদে আমার অজ্ঞাত নাই। বিবাহের পক্ষে সে সকল বাধা কিছুই নাই। কেমন এখন প্রস্তুত ত? প্রস্তুত যদি না হও তাহা হইলে যাহা পরিণাম হইবে তাহা বুঝিতেই পারিতেছ; তোমার হস্তাক্ষরও আছে, রক্ষক উপস্থিত আছে। এখন যাহা স্থির হয় শীঘ্র আমাকে বল। হয় আরোগ্য, নয় বিবাহ, নয় জেলে! যা অভিরুচি হয়!"

ভয়ে ভয়ে শচীন্দ্র বলিল "আরোগ্য করিবার শক্তি নাই, জেলে যাইতেও প্রবৃত্তি আমার নাই।"

সাগ্রহে আগন্তুক বলিলেন "তা হ'লে বিবাহই স্থির?"

শচীন্দ্র নত মুখে বলিলেন "অগত্যা"।

তিন দিন পরে বধূ সমভিব্যাহারে শচীন্দ্রনাথ বাটী পৌঁছিলেন। বাটীতে পূর্ব্বেই সংবাদ গিয়াছিল। রমেশ লোকজন লইয়া ষ্টেসনে অপেক্ষা করিতেছিল। শচীন্দ্রকে হাসিয়া বলিল "কি হে হিন্দুধর্ম্মের প্রত্যক্ষ প্রমাণ কই?"

শচীন্দ্রনাথ হাসিয়া শান্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

উচ্চহাস্য করিয়া রমেশ বলিল "প্রমাণ প্রত্যক্ষ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই! এবার হার আমারই।"

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

নূতন নীহারিকাবাদ।

৮. সূর্য্যকে মাঝে রাখিয়া যে, গ্রহগণ নিয়তই পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা অতি প্রাচীন জ্যোতির্বিদগের জানা ছিল। কিন্তু ইঁহারা গ্রহের ভ্রমণপথগুলিকে সম্পূর্ণ বৃত্তাকার বলিয়া মনে করিতেন। পথ ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজ না হইয়া কেন বৃত্তাকার হইল জিজ্ঞাসা করিলে ইঁহারা বলিতেন সমস্ত জ্যামিতিক ক্ষেত্রগুলির মধ্যে এক বৃত্তেরই গঠনে সর্ব্বাঙ্গীন সুশৃঙ্খলা বর্ত্তমান। এ জন্যই ভগবান গ্রহদিগকে বৃত্তাকার পথে ঘুরাইয়া থাকেন। জ্যোতিঃশাস্ত্রের এই ঔপন্যাসিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিলে দেখা যায়, ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে যে দিন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী কেপ্‌লার Kepler) গ্রহদিগকে বৃত্তাভাস (Elliptical) পথে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছিলেন, সেই দিনই নব্য জ্যোতিষের জন্মদিন। কেপ্‌লার সাহেব এই নূতন তথ্যটি কেবল সংগ্রহ করিয়াই গিয়াছিলেন; বৃত্তাভাস পথের উৎপত্তি প্রসঙ্গে কোন নূতন কথা তাঁহার নিকট হইতে শুনা যায় নাই। প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য প্রায় শত বৎসর প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছিল; গত ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে অদ্বিতীয় মহাপণ্ডিত লাপ্লাস্ সাহেব জগৎ-উৎপত্তির একটা ব্যাখ্যান দিয়া বিষয়টির মীমাংসা করিয়াছিলেন। সূর্য্য, বুধ, শুক্র, পৃথিবী, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি গ্রহোপগ্রহের উপাদান এককালে অনন্ত নীহারিকার আকারে আকাশে ঘুরিতেছিল বলিয়া ইঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল, এবং কালক্রমে উহাই জমাট বাঁধিয়া এই জগতের উৎপত্তি করিয়াছে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। দ্রব জিনিষ কঠিন হইয়া গেলে, একটিমাত্র জমাট পিণ্ড পাওয়া যায়। একই নীহারিকা জমাট বাঁধিয়া কি প্রকারে বহু জ্যোতিষ্কের সৃষ্টি করিল জানিতে চাহিলে তিনি বলিতেন, সেই বিশাল নীহারিকা কঠিন হইয়া সঙ্কুচিত হইবার সময়, উহার দেহের কিয়দংশ মাঝে মাঝে বলয়াকারে রাখিয়া গিয়াছিল। এখন সেইগুলিই পুঞ্জীভূত হইয়া মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি এবং পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহের উৎপত্তি করিয়াছে। উপগ্রহের উৎপত্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলেও লাপ্লাস্ সাহেব ঐ ব্যাখ্যান দিতেন। গ্রহগণ যে সকল বলয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার সামগ্রীগুলি একত্র হইয়া পিণ্ডাকারে পরিণত হইলে, ইহাদেরও চারিদিকে ছোট ছোট বলয়ের উৎপত্তি হইত। আমাদের চন্দ্র এবং বৃহস্পতি শনি ও মঙ্গলের উপগ্রহগুলি সেই সকল বলয়েরই জমাট মূর্ত্তি।

যাহা হউক ঘূর্ণ্যমান বৃহৎ নীহারিকা হইতে বিচ্যুত হইয়াই যে, এই গ্রহ উপগ্রহাদির সৃষ্টি হইয়াছে গত এক শত বৎসর ধরিয়া তাহা অবিসম্বাদে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। সূর্য্যকে সেই নীহারিকাস্তূপের মূল অংশ এবং গ্রহ উপগ্রহাদিকে তাহারই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন অংশ বলিয়া সকলেই মানিতেছিল। সম্প্রতি অধ্যাপক-সি, (X. J. J. Sec) সৃষ্টিতত্ত্বের এই প্রাচীন সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ করিয়া সম্প্রতি কয়েকটি নূতন কথার অবতারণা করিয়াছেন। সি,

সাহেব আমেরিকার একজন খ্যাতনামা জ্যোতিষী এবং নানা জ্যোতিষিক গবেষণায় তাঁহার নাম এখন জগদ্বিখ্যাত। বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রগুলির পাতায় পাতায় আজকাল যে সকল নব সিদ্ধান্তের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, সি, সাহেবের কথাগুলিকে সেই শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। ইহার প্রত্যেক উক্তিই গণিতিক প্রমাণের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। তা ছাড়া দীর্ঘকাল আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে সকল তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির সহিত নব সিদ্ধান্তের ঐক্য আছে। এই সকল কারণে হঠাৎ ইহাকে উড়াইয়া দেওয়া চলিতেছে না। দেশবিদেশের জ্যোতিষীমহলে আজকাল ইহার খুবই আলোচনা চলিতেছে।

শিশু সূর্য্য হইতে স্খলিত হইয়া যে, এই সৌরজগতের উৎপত্তি হইয়াছে এ কথাটা সি, সাহেব প্রথমেই অস্বীকার করিয়াছেন। প্রথম কালের এক বিশাল নীহারিকাস্তূপের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়া ইনি বলিতেছেন, সেই নীহারিকারই নানা অংশ জমাট বাঁধিয়া বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি গ্রহেরই উৎপত্তি করিয়াছে। এই সকল জমাট অংশগুলির সূর্য্যেরই গুরুত্ব ও আয়তন বৃহৎ ছিল, কাজেই নিজের প্রবলতর আকর্ষণে সে দূরবর্ত্তী সকল গ্রহকেই টানিয়া নিকটে আনিয়াছে। উপগ্রহের উৎপত্তি প্রসঙ্গেও তিনি এই কথা বলিতেছেন। আমাদের চন্দ্র এবং শনি বা বৃহস্পতির উপগ্রহগুলি কখনই মূলগ্রহের অঙ্গীভূত ছিল না। আকর্ষণের সীমার মধ্যে জমাট হইতে আরম্ভ করিয়াছিল বলিয়াই এগুলি গ্রহদিগের নিকট ধরা দিয়াছে। আকর্ষণের বন্ধন ছিন্ন করিয়া পলাইবার সামর্থ্য এখন ইহাদের কাহারো নাই।

পূর্ব্বের কথাগুলি হইতে বুঝা যায়, সিদ্ধান্তটি প্রচলিত নীহারিকাবাদেরই এক নূতন সংস্করণ। প্রচলিত সিদ্ধান্তে আমরা এক ঘূর্ণ্যমান নীহারিকার অস্তিত্ব মানিয়া থাকি, এবং তা'র পর আবর্ত্তনের চাপে উহার সীমান্তবর্ত্তী কতক অংশ বিচ্যুত হইয়া পড়ে বলিয়া স্বীকার করি। সি, সাহেব এইগুলিই মানিতে চাহিতেছেন না। ইনি বলিতেছেন, প্রাথমিক নীহারিকার আবর্ত্তনের চাপ ছিল না। চিনির রসে দানা বাঁধিতে সুরু হইলে রসভাণ্ডের স্থানে স্থানে যেমন আপনা হইতেই দানা বাঁধা সুরু হয়, কতকটা সেই প্রকারে নীহারিকার গ্রহগুলি জমিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

এই নব সিদ্ধান্তের সাহায্যে ধূমকেতুর এক নূতন জন্মপত্রিকা প্রস্তুত হইয়াছে। সি, সাহেব বলিতেছেন, এই ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কগুলি প্রাথমিক নীহারিকারই সীমান্ত প্রদেশে জন্মিয়াছিল; বোধ হয় নীহারিকার ভিতরকার অংশটা গ্রহোপগ্রহের রচনাতেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। এখন সূর্য্যের আকর্ষণে এক একবার জগতের কেন্দ্রের নিকট আসিয়া তাহারা আবার সেই সীমান্তবর্ত্তী জন্মস্থানের কাছাকাছি হইতেছে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে জ্যোতির্বিগণ আকাশের নানা অংশে বহু নীহারিকা দেখিয়া আসিতেছেন; কিন্তু এ গুলির উৎপত্তি-তত্ত্ব অদ্যাপি জ্যোতিঃশাস্ত্রের একটা প্রকাণ্ড সমস্যা হইয়া রহিয়াছে। নূতন সিদ্ধান্তের

প্রতিষ্ঠাতা বলিতেছেন, শত সূর্য্যোপম নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র উল্কাপিণ্ড প্রভৃতি ছোট বড় সকল জ্যোতিষ্কই নিজ নিজ দেহ হইতে নিয়তই অতি সূক্ষ্ম ধূলি-কণা ত্যাগ করিতেছে। এইগুলিই দীর্ঘকাল এলোমেলো ভাবে আকাশে ভাসিয়া শেষে একত্র হইয়া নীহারিকার উৎপত্তি করে। প্রায় সমগ্র আকাশই যে জ্যোতিষ্ক দেহচ্যুত ধূলিতে আচ্ছন্ন, তাহা আকাশের ফোটোগ্রাফ্ চিত্রে এখন প্রত্যক্ষ দেখা যায়। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, জ্যোতিষ্কের দেহই ক্ষয় পাইয়া নীহারিকার উৎপত্তি করে এবং কালক্রমে জমাট বাঁধিয়া আবার নূতন সৃষ্টির কারণ হয়। জন্মমৃত্যু ও ভাঙ্গা-গড়ার ব্যাপার কেবল আমাদেরই ক্ষুদ্র পৃথিবীর ঘটনা নয়। অনন্ত নক্ষত্রলোকেও অনন্তকাল ধরিয়া সেই লীলা চলিতেছে। সর্ব্বত্রই মৃত্যু পুরাতনকে নূতন জীবন দান করিতেছে।

নীহারিকাগুলির অবস্থান পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, ইহাদের প্রায় সকলেই ছায়াপথ (Milky-way) হইতে দূরে অবস্থিত। এই ব্যাপারটি শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী সার উইলিয়ম হার্শেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং পরে তাঁহারই স্বনামখ্যাত পুত্র সার জন্ হার্শেল উহা লইয়া অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু কি কারণে আকাশের অপরাংশ ছাড়িয়া নীহারিকাগুলি ছায়াপথ হইতে দূরে অবস্থান করে, তাহার প্রকৃত তত্ত্ব জানা যায় নাই। অধ্যাপক সি, গত দশ বৎসর জ্যোতিষ্কের আকর্ষণ-বিকর্ষণের ফল অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে নীহারিকার অবস্থান সম্বন্ধে একটা নূতন তত্ত্ব তাঁহার মনে হইয়াছিল। এখন তাহাই অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন, যখন বিকর্ষণ-শক্তির প্রভাবে তাড়িত হইয়া নক্ষত্রদিগের দেহের কণাই নীহারিকার রচনা করে, তখন সেগুলি যে নক্ষত্রবহুল ছায়াপথের নিকট পুঞ্জীভূত হইবে, ইহা কখনই সম্ভব নয়।

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি সত্য হইলে ছায়া-পথে নক্ষত্রের যে বিন্যাস দেখিয়া হার্শেল সাহেব অবাক হইয়াছিলেন, তাহাতে একটা সুব্যাখ্যা পাওয়া যায় সি, সাহেব বলিতেছেন, নীহারিকাগুলি ছায়াপথের বাহিরে থাকিয়া যখন কালক্রমে বহুগ্রহবেষ্টিত নক্ষত্রের মূর্ত্তি গ্রহণ করে, তখন সেই ছায়া-পথেরই বৃহৎ নক্ষত্রদিগের টানে উহাদিগকে সাড়া দিতে হয়। কাজেই দূরে জন্মগ্রহণ করিয়াও শেষে তাহাদিগকে ছায়াপথের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইতেছে।

কেবল আকর্ষণ-বিকর্ষণের মূলতত্ত্ব-গুলিকে অবলম্বন করিয়া অধ্যাপক সি, এই প্রকারে বৃহত্তম নক্ষত্রলোকের অভিব্যক্তি দেখাইয়াছেন। তা ছাড়া যুগলনক্ষত্র, ধূমকেতু, উল্কা এবং গ্রহ-উপগ্রহ প্রভৃতি সকল জ্যোতিষ্কেরই উৎপত্তিতত্ত্ব এই সিদ্ধান্তের সাহায্যে জানা যাইতেছে। গৌণামিলের জন্য অনেক সময় যেমন কতকগুলি অদ্ভুত ধর্ম্ম স্বীকার করিতে হয়, ইহাতে তাহার প্রয়োজন হয় নাই। জড়ের যে সকল ধর্ম্ম অতি সুপরিচিত, এবং শত শত পরীক্ষায় যে গুলির অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন করা যাইতেছে, সি, সাহেব কেবল

তাহাদেরই সাহায্য গ্রহণ করিয়া সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মানুষের হাতে-গড়া বিধি এবং প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, প্রকৃতি নিষ্করুণভাবে সমগ্র বিশ্বকে অনন্তকাল ধরিয়া তাঁহার চিরন্তন নিয়মের অনুগত রাখে। প্রকৃতির অধিকারে খণ্ডরাজ্য নাই, একই ব্যাপক এবং কঠোর নিয়ম চিরদিনই বিশ্বকে শাসন করে। এই কথাটা স্মরণ করিলে, প্রাকৃতিক ব্যাপারের যে সকল ব্যাখ্যান আমাদের চিরপরিচিত ও পরীক্ষিত নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত, কেবলই তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে ইচ্ছা যায়। সি, সাহেবের সিদ্ধান্তে এই গুণটা পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান। বোধ হয় এই জন্যই তাঁহার কথাগুলি লইয়া আজকাল এত আলোচনা চলিতেছে।

পরিবর্ত্তনশীল (variable) নক্ষত্রের কথা পাঠক অবশ্যই শুনিয়াছেন। এই শ্রেণীর জ্যোতিষ্কের উজ্জ্বলতা স্থির থাকে না; এক একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের অন্তে এবং কখন কখন অনিয়মিত ভাবে ইহারা হঠাৎ উজ্জ্বল হইয়া পড়ে। আধুনিক জ্যোতির্বিগণ এই ঘটনার নানা কারণ নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছিলেন। সি, সাহেব বলিতেছেন, জ্যোতিষ্কদিগের দেহ হইতে স্খলিত হইয়া, যে ধূলিপুঞ্জ মহাকাশে ব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহাই এই সকল পরিবর্ত্তনের মূল কারণ। নির্দ্দিষ্ট পথে চলিবার সময় কোন অনুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক যদি ঘন ধূলিপুঞ্জের সংঘর্ষণ প্রাপ্ত হয়, তবে ইহার তাপে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হইবারই সম্ভাবনা। এই প্রকারে আকস্মিক উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলিকেই আমরা দূর হইতে পরিবর্ত্তনশীল তারকার আকারে দেখি। যে সকল নক্ষত্র জোড়া জোড়া বা তিন চারিটি করিয়া একত্র অবস্থান করে, তাহাদেরও উজ্জ্বলতার নিয়মিত পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যান প্রয়োগ করিতে পারা যায়। যে গুলিকে আমরা যুগল নক্ষত্র বলি, তাহা সত্যই খুব কাছাকাছি থাকিয়া নির্দ্দিষ্টকালে পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করে। সুতরাং ইহাদের কাহারো কক্ষার মাঝে যদি কোন ধূলিপুঞ্জ আসিয়া দাঁড়ায়, তবে প্রত্যেক প্রদক্ষিণের শেষে উহাকে ধূলির সংঘর্ষণে জ্বলিয়া উঠিতে হয়।

নবীন জ্যোতিঃশাস্ত্রে অদ্যাপি কোন নক্ষত্রের মৃত্যুসংবাদ লিপিবদ্ধ হয় নাই। কোটি কোটি বৎসরজীবী নক্ষত্রগুলি যে, দুই হাজার বৎসরের শিশু পৃথিবীকে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখাইবে, তাহাও আশা করা যায় না। কিন্তু নক্ষত্রের জন্ম বড় দুর্লভ ঘটনা নয়। আকাশের যে সকল স্থান সম্পূর্ণ নক্ষত্রবর্জ্জিত কখন কখন সেখানে হঠাৎ নূতন নক্ষত্রের আবির্ভাব দেখা গিয়াছে। এ গুলি প্রায়ই কয়েকদিন মাত্র উজ্জ্বলালোক বিতরণ করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। যাহা হউক অধ্যাপক সি, ইহাদের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলিতেছেন, অনুজ্জ্বল বা স্বল্পোজ্জ্বল নক্ষত্র যখন গন্তব্য দিক্ ধরিয়া যাইতে যাইতে সেই ধূলিপুঞ্জ বা অপর কোন অনুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের সংঘর্ষণ প্রাপ্ত হয় তখন উভয়েই সংঘর্ষণ তাপে জ্বলিয়া উঠে। আমরা দূর হইতে এই বিশাল অগ্নিকাণ্ডকেই নূতন নক্ষত্রের আকারে দেখি।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া চক্ষুমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ

করিলে, আগ্নেয়গিরির গহ্বরের অনুরূপ কতকগুলি চিহ্ন চন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত দেখা যায়। আধুনিক জ্যোতির্বিগণ এ গুলিকে নির্ব্বাপিত আগ্নেয়গিরির বিবর বলিয়াই প্রচার করিয়া আসিতেছেন। নূতন নীহারিকাবাদের প্রতিষ্ঠাতা সি, সাহেব এই সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য করিতেছেন না। ইঁহার মতে সে গুলি উল্কাপাতের চিহ্ন। কাদার চিল ফেলিলে যেমন তাহাতে এক প্রকার চিহ্ন রহিয়া যায়, কোমল চন্দ্রদেহে সেই প্রকার বহু উল্কা পড়িয়া এক সময়ে ঐ চিহ্নগুলি উৎপন্ন করিয়াছিল।

নূতন নীহারিকাবাদের সাহায্যে গ্রহদিগের আবর্ত্তন (Rotation) ও পরিভ্রমণ (Revolution) এই দুইয়েরই সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়াছে, এবং গ্রহদিগের কক্ষ বৃত্তাকার না হইয়া কেন বৃত্তাভাস হইল, তাহারও কারণ নির্দ্দেশ করা চলিতেছে। সি, সাহেব এই সকল ব্যাপারে গণিতের প্রমাণ দিয়াছেন, সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই নাই।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে জ্যোতির্বিগণ সৌরজগৎকে অতি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করিতেন। শনিগ্রহের বাহিরে সৌরপরিবারভুক্ত অপর কোন জ্যোতিষ্ক নাই বলিয়াই ইহাদের বিশ্বাস ছিল। ইহার পর কয়েক বৎসরের মধ্যে ইউরেনস্ ও নেপ্‌চুন্ গ্রহযুগলের আবিষ্কারে সৌরজগতের প্রসার খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সি, সাহেব তাঁহার নব সিদ্ধান্তের সাহায্যে আমাদের জগতকে আরো বৃহৎ বলিয়া প্রমাণ করিতেছেন। নেপ্‌চুন্-গ্রহের কক্ষ সূর্য্য হইতে বহু দূরবর্ত্তী থাকিয়াও, আকারে প্রায় বৃত্তের ন্যায় রহিয়াছে। ইনি গণিতের প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া বলিতেছেন, নেপ্‌চুন্ সৌরজগতের সীমান্তবর্ত্তী হইলে ইহার কক্ষ বৃত্তের অনুরূপ না হইয়া সুস্পষ্ট ডিম্বাকৃতি হইত। কাজেই বলিতে হইতেছে, নেপ্‌চুনের বাহিরে এখনো একাধিক বৃহৎ গ্রহ বর্ত্তমান আছে। সূর্য্য হইতে বহুদূরবর্ত্তী বলিয়া ইহারা আমাদের অলক্ষ্যে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে। অদূর ভবিষ্যতে এ গুলি একদিন ইউরেনস্ ও নেপ্‌চুনের ন্যায় হঠাৎ ধরা দিবে।

অপর জ্যোতিষ্কদিতে জীববাস আছে কি না, এই প্রশ্নটি লইয়া যে সুদীর্ঘ আলোচনা চলিতেছে তাহার বিশেষ পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। জ্যোতির্বিগণ বহু বিচার করিয়াও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। বহু দূরের জ্যোতিষ্কগুলির কথা ছাড়িয়া আমাদেরই গৃহদ্বারে যে শুক্র ও মঙ্গল অবস্থান করিতেছে, তাহাদের ঘরের খবর জানিতে গেলেও হতাশ হইতে হয়। কোন জ্যোতির্ব্বিদই ইহাদের আকাশ এবং পৃষ্ঠদেশের অবস্থা নিঃসন্দেহে নিরূপণ করিতে পারেন নাই। এই প্রসঙ্গে সি, সাহেব বলিতেছেন যে, এক মহানিয়মের শাসনে এই বিশ্বের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা কখনই বিশেষভাবে পৃথিবীতে কার্য্য করে নাই। ধরাপৃষ্ঠ জীববাসের উপযোগী হওয়া এবং জড়কে জীবে পরিণত করা যখন ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী একই মহাশক্তির কার্য্য, তখন সেই শক্তিরই লীলাভূমি অপর জ্যোতিষ্কগুলিতে কেন জীব জন্ম গ্রহণ করিবে না, তাহার সঙ্গত কারণ নাই।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

কলিকাতার অভ্যন্তরে।

কলিকাতা একটি বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র। কিন্তু একালে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম এতাদৃশ জড়ীভূত যে কলিকাতাকে 'ধর্ম্মক্ষেত্র' বলিলেও হয়নি নাই! অনেকের মতে ইহাতে বরং ত ধর্ম্মের অবমাননা করা হয়। আমাদিগের কোন বিশেষ মতামত নাই, তবে এ সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখা ভাল। কলিকাতার ভবিষ্যৎ কি রকম?

গীতার বহুল ভাবে প্রচার হওয়াতে 'ধর্ম্ম' ও 'কর্ম্ম' সম্বন্ধে একটা লৌকিক মত দাঁড়াইয়া গিয়াছে। স্বার্থকামনারহিত কর্ম্মই 'ধর্ম্ম'। ইহাতে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ভাব পূর্ব্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়া, কর্ম্মের বিশাল ক্ষেত্রে নূতন জাতীয় জীবন সংগঠিত করে। এই নূতন সদ্ভাব এবং সম্মিলন, পুরাতন সাম্প্রদায়িক কলহ হইতে শ্রেষ্ঠতর। ইহাতে কর্ম্মই মুখ্য, উপাসনাপ্রণালী গৌণ।

পুরাতন সম্প্রদায়ের লোক হয় ত বলিবেন যে ইহা বেতর পাশ্চাত্য রকমের ভঙ্গী। কিন্তু নবীন সম্প্রদায়ের বক্তব্য যে ঈশ্বর পরায়ণ লোকের ঈশ্বর অন্তরে থাকুন, নাস্তিকের সন্দেহ 'অজ্ঞেয়বাদ' অবলম্বন করুক্। যাহার ইচ্ছা হয় হরিনামের মালা জপ করুন, সাকার কিংবা নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করুন, কিংবা যোগাবলম্বী হউন। এ গুলি সম্মুখে স্থাপনা করিবার বস্তু নহে। তুমি কি রকম ভাবে কর্ম্ম করিতেছ তাহাই তোমার ধর্ম্মের প্রমাণ। মানবই প্রতিমা। মানব-সমাজ-বন্ধনের উপযোগী কি রকম মন্দির নির্ম্মাণ করিতেছ, কতদূর স্বার্থত্যাগ করিতেছ, তাহা দেখাও। নচেৎ সকলে ভুলিবে না, তোমার অনুসরণ করিবে না। ইহারই নাম কর্ম্মযোগ, এবং নীচ ও অজ্ঞান হইতে, উচ্চ ও জ্ঞানী পুরুষ সকলেই ইহাতে যোগ দিতে পারেন। ইহাতে প্রত্যবায়, বাধা, বিঘ্ন নাই।

কথাটা অতি মনোহর। পূর্ব্বকালে অন্তর হইতে একটা আদর্শ গ্রহণ করিয়া, তাহার ধ্যান করিয়া এবং উপাসনা করিয়া, লোকে সমাজ সংগঠন করিত। এখন নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিয়া অর্থাৎ স্বার্থশূন্য হইয়া, জীবের হিতার্থে প্রাণ পর্য্যন্ত সঙ্কল্প করিয়া, একটা আদর্শের সৃষ্টি করিতে হইবে।

তাহার প্রমাণ 'ফলেন পরিচীয়তে'। কলিকাতার কর্ম্মক্ষেত্রের নূতন ছাঁচ আদর্শ-স্থানীয় কি না, তাহা বিচার করিতে কেহ কলিকাতায় যায় না! কিন্তু সকলেই কলিকাতায় গিয়া থাকে। দোকানদারী, ব্যবসাবাণিজ্য, নৃত্যগীত, কাব্য-সাহিত্য, রাজনীতি ও কূটনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির কলিকাতা একটি বিশ্ববিদ্যালয়। সকলেই কিছু শিখিয়া আসে। নূতন ফ্যাসন, নূতন সঙ্গীত, নূতন সাহিত্যের বহি, নূতন রকমের জুতা, কাপড়, চসমা, নূতন রকমের মিষ্টান্ন, প্রেমের কথা, বক্তৃতা, জুয়াচুরি, প্রবঞ্চনা এবং ধর্ম্মভাব, কলিকাতায় কিছুরই অভাব নাই। কলিকাতায় পদার্পণ করিলেই

একটা কিছু নূতনত্ব সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

আমরা মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় গিয়াছি, এবং দুর্ভাগ্যক্রমে যদিও কোন বিশেষ রকমের নূতনত্ব সংগ্রহ করিয়া স্বীয় পুরাতন ছাঁচ বদলাইতে পারি নাই, তথাপি নূতনত্বের অভ্যন্তরে ভবিষ্যতের একটা বিশাল বস্তুর সূত্রপাত দেখিতে পাইয়াছি। তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত এবং হর্ষিত হইয়াছি। তবে আদর্শটা কি রকম দাঁড়াইবে তাহা ঠিক বুঝিতে পারি নাই।

কলিকাতায় প্রথমতঃ গিয়াই ক্ষুধা প্রবল হয়। সকলের না হউক আমার সর্ব্বদাই হয়। খাদ্যদ্রব্যের অভাব নাই। অতি সুচারু, পরিপাটী, মনোহর, সুখপ্রিয় এবং সুগন্ধিপূর্ণ। এত মহামূল্য খাদ্য আছে যে একজন একবেলায় দশ টাকার আহার্য্য এবং পানীয় অনায়াসে গলাধঃকরণ করিতে পারে। একটা 'স্যাম্পেনের' দাম আট টাকা, একটা 'ডিনার' আড়াই টাকা। ইহার উপর গিয়া আরও খরচ করিতে পার। দেশীয় খাদ্যের মধ্যে অতি তোফা সন্দেশের অনেক দাম। একটা কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়, যত মূল্য বেশী ততই অসার বস্তু। জীবন সংরক্ষণোপযোগী পদার্থ অপেক্ষাকৃত সস্তা। যথা মুড়ি, কড়াইশুটী এবং ছোলার দাইল প্রভৃতি। একটাতে তেল্ অধিক। খাইলে বুক জ্বলিয়া যায়, অম্লরোগ এবং অনিদ্রা হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়মনোহর। অন্যটা খাঁটি এবং সারক, কিন্তু চর্ব্বণ করিলে সনাতন পৌষ-পার্ব্বণাদির কথা মনে পড়িয়া লজ্জা উৎপাদন করে।

ইহার মধ্যে কোন্‌টা আদর্শ তাহা জানি না। সারটা খাইলে দুঃখ হয়, অসারটা খাইলে ক্রমে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। উভয়েরই ফল এক, উভয়েরই জগতের মঙ্গল বিধানের উপর সমান আস্থা যাওয়া, সুতরাং তর্ক করা বৃথা। ইহার মধ্যে ভাল-মন্দের বিচার, কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্যের মীমাংসা করা বৃথা। কিন্তু যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রের গৌরব রক্ষা করিতে উদ্যত তাঁহাদিগের আদর্শ কোন্‌টা, অর্থাৎ কোন্‌টা ব্যবহার করিলে সমাজের দৃঢ়বন্ধন হয়, জাতীয় জীবনের একতা ঘনীভূত হয়, তাহার সম্বন্ধে কোন কথা শুনিতে পাই না।

দোকানদারের দোষ দিতে আমরা নারাজ। তাহাদিগের জীবন রাখিতে হইবে। প্রবঞ্চনা জুয়াচুরি করিতে হইবে, তেল চালাইতে হইবে। তদ্বিষয়ে সকলে একমত, এবং তাহাদিগের একতা আদর্শ-স্থানীয়। সোডা-লেমোনেড্, হাঁসের ডিম, এবং সময় পাইলে রাত্রিজাগরণ এবং হুইস্কি, একটা কোন পথপ্রদর্শক। সকল পথই কোথাও গিয়া মিলিয়াছে। হয় ত পুরাতন পথ কর্ম্মের মধ্য দিয়া এবং নূতন পথ বস্তুর মধ্য দিয়া। কর্ম্মক্ষেত্রের আদর্শ স্থির প্রেম, না অপস্ত বস্তু? কে জানে?

পূর্ব্বে স্নেহময়ী সহধর্ম্মিণী, ব্রহ্মচর্য্যরতা বিধবা, পবিত্রা কন্যা এবং কুলবধূর হাতের অন্নব্যঞ্জন খাইয়াছি। এখন কীচকের ন্যায় পাচক ব্রাহ্মণ এবং সূর্পনখার ন্যায় পাচিকা ব্রাহ্মণী, কিংবা হোটেলের বর্ণশঙ্কর, যজ্ঞোপবীতধারী উপনংশপীড়িত ব্রাহ্মণঠাকুরই আমাদিগের ভরসা। কিন্তু হোটেলে গিয়া

আমরা দশ জাতির দশ জনে একত্র বসিয়া খাইতে পারি, গৃহস্থের ঘরে পূর্ব্বপ্রথা রক্ষা করিলে সে সুবিধা টুকু হয় না। একজাতীয় হইলেও সকল সময় খরচে কুলায় না, চাঁদা করিতে হয়, এবং ভালমন্দ অনেক রকম লোক থাকাতে দাক্ষিণাত্যের মত কুলবধূগণকে তাহাদের সম্মুখে বাহির করিতে খট্‌কা বোধ হয়। পরিবর্ত্তনের স্রোত জলের ন্যায় নিম্নগামী। সমাজকে উঁচু করিয়া বাঁধা শক্ত। নিচু করিয়া পাতালের দিকে লওয়া সহজ। প্রথমটা আয়াসসাধ্য নহে, কাজেই দ্বিতীয়টার মধ্য দিয়াই জাতীয় জীবন সংগঠন করার সাধ দেখিতে পাওয়া যায়।

অবশ্য টাকা চাহি, এবং টাকা চাহিলেই জুয়াচুরি চাহি, কিন্তু যখন ইহা জাতীয় জীবনের সানুকূল তখন শিরোধার্য্য। ইহার গতিও ঈশ্বরের দিকে। নাম যুগধর্ম্ম, পদবী কর্ম্মযোগ।

ব্যবসাবাণিজ্যের মধ্যেও সেই কথা। নূতন কাপড়, কোমল জুতা, পশমী গলাবন্ধ, খুকীর ক্যাপ্, খোকার গেঞ্জি এবং ফুটবল, জামাতার হার্ম্মোনিয়ম, মাষ্টার মহাশয়ের খাদিয়া জামাজ, গৃহিণীর কুন্তলীন এবং পিতামহের দিব্য নস্য, যত দামই লাগুক না কেন (অবশ্য স্বদেশী জিনিষ) না হইলে নয়। নহেৎ মনুষ্যত্ব থাকে না, যুগ থাকে না। দারিদ্র্য আসে আসুক কিন্তু এটা আদর্শ। চাষাভুষারা শিখিবে, ছেলেপিলে শিখিবে, দেশের শিল্পের উন্নতি হইবে। মনুষ্যত্বের কিনারা বাহির হইয়া পড়িবে। পুরাতন কালের জনার্দ্দনের ন্যায় লাঙ্গল ধরিয়া, রৌদ্রে শস্য কর্ত্তন করা বিরক্তজনক শক্ত কাজ। চাষীরা জমি ছাড়িয়া কলিকাতায় আসুক, শিল্পের চর্চ্চা করুক, চেহারা বদলাইয়া ফেলুক, নূতন ছাঁচের সুশ্রী, নূতন ধরণের সৌন্দর্য্য, তাহাদের দেখিতে ও শিখিতে হইবে। নহেৎ জীবন বৃথা। যদি তাহাই না হইবে তবে বানর রূপ বদলাইয়া মনুষ্য হয় কেন?

বাস্তবিক, সৌন্দর্য্যবিকাশই এ নূতন কর্ম্মক্ষেত্রের একটা অঙ্গ। রস্‌কিনের মতে সৌন্দর্য্যবিকাশ একটা বিরাট ধর্ম্ম। তবে সেটা কি রকম সৌন্দর্য্য এবং কোথায় বিকাশ করিতে হইবে, তাহা এখনও প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে। কথাটা মনে হইলে সাহিত্য, চিত্রকলা, কাব্য, নৃত্যগীতাদির কথাও মনে পড়ে।

বহুপূর্ব্বে, প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন কলিকাতায় লেখাপড়া শিখিতে আসি (তাহারও পূর্ব্বে একবার আসিয়া কুলপির বরফ খাইয়া গিয়াছিলাম) তখন মস্‌জিদ বাটী ষ্ট্রীটে ৺ঈশ্বর গুপ্তের ('প্রভাকর' সম্পাদক) বাটীতে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলাম। তখন সমাজপতি প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায়, কিন্তু রবীন্দ্র-বাবু উদীয়মান তরুণ সূর্য্যের ন্যায় বঙ্গের পূর্ব্ব গগনে। বঙ্কিমচন্দ্র পশ্চিমে হেলিয়াছেন। মনে পড়ে অক্ষয় সরকার লেনে, 'সাবিত্রী লাইব্রেরীর' বাৎসরিক অধিবেশনে রবি বাবুর 'অকালকুষ্মাণ্ড' নামক প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। বঙ্কিম বাবু সভাপতি। সেই সভায় 'বন্দে মাতরম্' গান বঙ্গদেশে প্রথম রবি বাবু কর্ত্তৃক গীত হয়।

জাতীয় জীবনের সেই প্রথম উন্মেষের কাল। সৌন্দর্য্যবিকাশের নূতন রঙ্গস্থল। রবি বাবুর সৌন্দর্য্য ও প্রতিভা চিরন্তন অন্তরে এবং বাহিরে, উভয় দিকে। কিন্তু নকলনবীশগণের আদর্শ বাহিরে। অমু ওহ মহাশয়ের আবড়াধারী শ্যামবর্ণের পাষান-ওয়ান্ হইতে, প্লীহা-রোগী স্কুলের ছেলেপুলে, অনেকে অকালকুষ্মাণ্ডের ন্যায় রবি বাবুর চুলের এবং কোমল স্বরের নকল আরম্ভ করিল। তিন বৎসরের মধ্যে অনেক চুল কাটা হইল, ঘসিয়া মাজিয়া অনেক শ্যামবর্ণ উজ্জ্বলতা লাভ করিল। তাহার পরেও হইয়াছে। কিন্তু অন্তরে রবি বাবুর ন্যায় সৌন্দর্য্য ও প্রতিভা বত্রিশ বৎসরের মধ্যে যে, কেহ পাইয়াছে তাহা আমরা শুনি নাই।

কিন্তু সেই সময় হইতে 'কি যেন গানের মত', আমাদিগের কোমল প্রাণে বাজিয়াছিল। এই যে Renaissance তাহা Pre-Rephaelite কিংবা Neo-Rephaelite তাহা ঠিক বলা যায় না। যাহাই হউক না কেন, সেই সময় হইতে ধর্ম্ম, নীতি, সাহিত্য এবং কাব্য একটা নূতন পথ ধরিয়া চলিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। হেলিয়া, দুলিয়া, মন্থরগমনে, একটা অপূর্ব্ব স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সঙ্গীতে এবং চিত্রে বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িয়াছে। কাহারও নিকট Classical Style অর্থাৎ পুরাতন ধ্রুপদ খেয়াল মন্দ বোধ হয় না, কিন্তু তাহার আদর বৃদ্ধ ষোটকের মত। ব্যবহারোপযোগী নয়, অথচ চারিটি দানাপাণি বিতরণ করিয়া পূর্ব্বকালের গৌরব রক্ষায় আপত্তি নাই। কিন্তু ইহাতে জাতীয় জীবন দৃঢ় হয় না। বৈষ্ণবগণের পদাবলী কিংবা কীর্ত্তনেও হয় না। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেমের বিলাপ অতি শোচনীয়। যেখানে অন্নের হাহাকার, প্রবঞ্চনা এবং রক্তপাত, সেখানে হৃদয় প্রেমের গানে মুগ্ধ হইবার কথা নহে। প্রেমের চিত্রও নয়নানন্দদায়ক সব সময় হইয়া উঠে না। সাহিত্য, কবিতা, গান ও ছবিতে স্বভাবতঃ কোথায়ও উগ্রমূর্ত্তি, কোথায়ও হতাশভাব, কোন স্থানে অপরিমিত তেজ, এবং কোন স্থানে নিবিড় তমিস্রার ভাব আসিয়া পড়িতেছে।

এই যে বিশাল চঞ্চলতা আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহার মূল কেবল আমাদিগের ভারতবর্ষে নয়, সর্ব্বদেশের গভীর স্তরে নিহিত। পাশ্চাত্যসংস্রবে আমাদিগের সেই চঞ্চলতার তীব্রভাব।

সমস্যাটার সহিত অর্থের অর্থাৎ অন্নের বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে। জ্ঞানের বিস্তারের সহিত সমাজের সুখ-স্বচ্ছন্দতা, এবং সৌন্দর্য্য-বিকাশের লালসা বাড়ে। সে জ্ঞানটা ঠিক জ্ঞান কি না, এবং সে সৌন্দর্য্য ঠিক আদর্শ কি না তাহা পরে বিচার্য্য। আপাততঃ প্রথমে এই কথা যে, কর্ম্মক্ষেত্রে 'জাতীয়-জীবনে'র যদি ইহাই উদ্দেশ্য হয়, তবে অর্থে এবং অন্নে আমরা কুলাইয়া উঠিতে পারিব কি না। দ্বিতীয়তঃ আমাদিগের সাহিত্য, কাব্য, চিত্রকলা প্রভৃতি কীদৃশ সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী হইবে?

বহুমূল্য অথচ অসার খোরাক্, সূক্ষ্ম এবং অনাবশ্যক নানাবিধ বস্ত্র, নেশা, সুগন্ধি, এবং সহস্র প্রকারের সৌখীন পদার্থ, এবং

যাহাতে ইন্দ্রিয়াদি দমনে থাকা দূরে যাউক, প্রবল হইয়া পড়ে তাহার প্রতি-পোষক সাহিত্য, কাব্য, চিত্র, ঔষধ এবং রসায়ন, এবং স্ত্রীলোকের হাবভাব বেশভূষা, কেবল এই দেশকে নয়, সকল দেশকেই দারিদ্র্যের দিকে লইয়া যায়। অর্থের অভাব হইলে একটা 'জাতীয়-জীবনে'র সূত্রপাত হয়, কিন্তু এক জাতির সহিত অন্য জাতির যুদ্ধ বাধে। যে জাতি জয়ী হয় সেও বেশী দিন টিকিতে পারে না, কারণ ব্যক্তিগত সুখ-স্বচ্ছন্দতা এবং ইন্দ্রিয়-লালসা প্রবল হইয়া রেষারেষি মারামারি কাটাকাটি হয়। অবশেষে রোমক প্রভৃতি পুরাতন রাজ্যের ন্যায় পতন অবশ্যম্ভাবী।

এহেন জাতীয়তা, অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রচারিত মুখ্য ধর্ম্মের আদর্শ পশ্চাতে ফেলিয়া, ইন্দ্রিয়-প্রমুখ সুখসৌকর্য্যের লালসায় দল বাঁধিয়া সভ্যতার সোপানে আরোহণ যে কর্ম্ম-যোগের আদর্শ তাহা ইতিহাস মানিতেছে না।

তবে কেহ কেহ বলিবেন যে ইহা প্রাকৃতিক 'প্রবৃত্তির' পথ। কীট, পতঙ্গ, পশু হইতে মনুষ্যসমাজ বরাবর লক্ষযুগ ধরিয়া এই পথের অনুসরণ করিতেছে। দার্শনিক হিসাবে ইহার ফল এই যে ক্রমে মনুষ্যসমাজ এই কর্ম্মস্রোতের ফল ভোগ করিয়া অবশেষে যথার্থ জ্ঞান লাভ করিবে, তাহার পর ইন্দ্রিয়-উপভোগ্য বিষয়ে অনাস্থা এবং বৈরাগ্য লাভ করিলে নিবৃত্তির পথে যাইবে। তখন ঋষিগণের ন্যায় প্রজ্ঞাসম্পন্ন লোক, এবং পুরাকালের ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদির ন্যায় জ্ঞানী ভক্তগণ একত্রিত হইয়া সমাজ সংস্থাপন করিবে। তাহার কোন রকম সূত্রপাত এবং উৎপাত এখনই করিলে এই নিবৃত্তিমার্গীয় দেশ মোটা চাউল খাইয়া এবং মোটা কাপড় পরিয়া চিরন্তন বহু জাতির করতলস্থ হইয়া জুতাসাথি সহিয়া, মাত্র ছয়দিনাবে জীবন যাপন করিবে।

সকল দেশেই দুই শ্রেণীর কর্ম্মবীর আছে। এক শ্রেণী সনাতন নিবৃত্তি-মার্গীয়। ইউরোপ প্রভৃতি মহাদেশে ইহারা এক প্রকার লুপ্ত। ধর্ম্মযাজকগণের মধ্যেও Current politics অর্থাৎ কূটরাজনীতিই আদর্শ স্থান লাভ করিতেছে। Socialism এর আদর্শ জগতের হিত, কিন্তু অর্থের সমানভাগে বণ্টন। অর্থনীতির বিশিষ্ট বৈতবাদ। যে যেমন পরিশ্রমী এবং কৃতী তাহাকে সেই রকম অর্থ দাও। Labor question, Tariff, Suffrage প্রভৃতি ইহারই অন্তর্গত। কিন্তু নিবৃত্তির পথের উপদেশ নাই। উপযুক্ত লোক ভাল খাইবে ভাল পরিবে, ইত্যাদি। Self Exertion আদর্শ। ত্যাগ আদর্শ নহে। অপরের জন্য আমি ত্যাগ করিব কেন? শিল্প, সৌন্দর্য্যচর্চা, বাড়িতে থাকুক। যুদ্ধ হইতে থাকুক। কে কেমন উপযুক্ত বুঝা যাউক। রণতরী সুসজ্জিত হউক। খাইবার সংস্থান না থাকিলে পুত্রকলত্র কম হউক। এই সকল বিষয় সমস্যা লইয়া মহাতর্ক, আন্দোলন এবং শান্তিহীনতা। নানাবিধ মত লইয়া এক একটা দল। সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যগীত, কাব্য, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের আবিষ্কার।

কিন্তু ভারতবর্ষে যদিও এ ঢেউ

আসিয়াছে, তথাপি অনেকে পুরাতন নিবৃত্তির পথ এবং সনাতন ধর্ম্মের আদর্শ ভুলিয়া যায় নাই যদি ইন্দ্রিয়-কামনাটা কমান যায়, তবে অনেক রক্তপাতের এবং যন্ত্রের আশঙ্কা থাকে না। অভাব কমিলে লোকসংখ্যা কমিয়া যায়। অভাব বাড়িলে রক্তবীজের মত জীবের উৎপত্তি হয়। কামনার কামনার যুদ্ধ বাধে। শাস্ত্রকারগণ সেটা বলিয়া ভারি মানিয়াছেন। অথচ বিদেশীয় সংস্রবে, এবং সংঘর্ষণে, বিদেশীয় শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের 'প্রাকৃতিক ধর্ম্ম'-প্রচারে, এবং বিদেশীয় ভোগস্পৃহার নূতন নূতন আদর্শে, এ দেশের হৃৎপিণ্ডের তাণ্ডব নৃত্য দিন দিন সমধিক ভাবে বর্দ্ধনশীল। অনেকে ভাবিয়া থাকেন 'পুরাতন পথে গিয়া কোন কালে আমরা রাজা হইব কি?'

ইউরোপ বলিতেছে, রাজারাণীর দিন গিয়াছে, এখন সাধারণতন্ত্রের যুগ আসিয়াছে। সনাতন ধর্ম্মের সময় রাজা দেখিয়াছ, এখন 'কর্ম্মযোগের' সময় একবার democracy দেখিয়া লও। সকলে এই মন্ত্রে দীক্ষিত হও। পুরাণো দল হাসিতেছে। রাজার দোষটা দেখিয়াছ, রাজা যাইতেছে, প্রজার গুণটা আপাততঃ মনমুগ্ধকর। কিন্তু যে ভোগলালসায় রাজন্যবর্গের পতন, সেই ভোগলালসায় প্রজাতন্ত্রেরও পতন অবশ্যম্ভাবী। রাজাপ্রজা উভয়ে সদ্ভাবে তিষ্ঠিতে পারে তাহার কোন রাস্তা নাই কি?

ভারতবর্ষ যদি সে শিক্ষা দিতে না পারে তবে অন্য দেশ পারিবে না।

রাজা স্বদেশীয় কি বিদেশীয় তাহাতে কিছু আসে যায় না। ধর্ম্মের আদর্শের সহিত কর্ম্মের আদর্শ ঠিক মিলিয়া না গেলে কেহই উচ্চস্থান লাভ করে না। যাহার উচ্চাসনের দিকে কামনাপূর্ণ দৃষ্টিপাত তাহার চক্ষু দিব্যচক্ষু নহে। প্রথমত নিজের গুণপণাটা জাহির করা চাহি। তাহার পর জাতীয়তা। জাতীয়তা আগে পাড়া করিলেও সনাতন ধর্ম্ম পশ্চাতে রাখিলে তাহার ফল কর্ম্মভোগ মাত্র।

এটা বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আমরা যে পথে জাতীয় জীবন বাঁধিতে বসিয়াছি, তাহাতে অর্থে এবং অন্নে কুলাইয়া উঠিতে পারিব না। ভোগ বাড়িতেছে। লাঙ্গলের দিকে কেহ যাইতে চাহে না। 'শিল্প শিখাও কর'। যেন পয়সা আসিবে। কারণ দেশে দেশে ভোগলালসা প্রবল। সেই অগ্নির জন্য ঘৃতসিক্ত সমিধ চাহি। যে জাতি সস্তায় ঠিকা লইয়া দুই পয়সা লাভ করিতে পারে, সেই জাতিরই অর্থলাভ নিশ্চয়। আমরা চট্ করিয়া তাহা পারি না। যে যত কল-কারখানা স্থাপন করিয়া, ওস্ত বসাইয়া, ছুঁচাচুরি করিয়া লাভ করিতে পারে সেই জয়ী। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে একটা কর্ম্মযোগ ফাঁদিয়া এ কর্ম্মটা শিক্ষা করা এ দেশে অনেকের পক্ষে একটা বিভীষিকা

'দান পুণ্য করিনু দক্ষিণ হস্ত যানে,
শুকরের মলমূত্র ধুইব কেমনে?'

—হরিশ্চন্দ্র

অথচ তাহা না হইলে কর্ম্মটা আর কি? যদি সৌন্দর্য্যের বিকাশ করিয়া, ধরাতল স্বর্গের মত করিয়া, রম্য অট্টালিকা, বিলাস-ভবনাদি খাড়া করিয়া, মাতোয়ারা হইয়া, মনুষ্যজন্মের চরম এখানেই না প্রমাণ করা যায়, তবে সভ্যতার কি হইল?

কিন্তু সেটা কি রকম? তাহাই কি জ্ঞান এবং সৌন্দর্য্যের আদর্শ? এ বিষয়ের মীমাংসা প্রচ্ছন্নভাবে হইতেছে। মহাযন্ত্রের মধ্যেও ধর্ম্ম ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য হইতেছে। তাহার আভাষ আমরা মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় পাই। নৃত্যগীতে, কাব্যে, সাহিত্যে, চিত্রে, ধর্ম্মমন্দিরে, বিদ্যালয়ে পাই। সমাজের চালচলনে, বিশুদ্ধচেতা দেশহিতৈষী অধ্যাপকগণের মধ্যে, এবং নারীসমাজেও পাই। এই মহাযন্ত্রের মধ্যেও ঘরে ঘরে শান্তি দেখিতে পাই। বাহিরে দেখা যায় না। কিন্তু যখনই গিয়াছি, কলিকাতায় যাহা পাইয়াছি তাহা তীর্থস্থানেও পাই নাই। যে অন্তঃস্রোত কলিকাতার প্রবাহমান তাহা লিপিবদ্ধ হয় না, ইতিহাসের অন্তর্গত নহে, এবং হয়ত হইবেও না, কিন্তু সে স্রোত পাশ্চাত্য আগ্নেয়-স্তর হইতে বিভিন্ন।

ভারতবর্ষের ধর্ম্মের ভিত্তি ভক্তি ও জ্ঞান। পশুপ্রকৃতি এবং ইন্দ্রিয়াদির পরধর্ম্ম ইহার নিকট ভয়াবহ আত্মজ্ঞানশূন্যতা হইতে অন্য কোন দাসত্ব ইহা অনুভব করিতে পারে না। একটা বিশাল শিবের মত ইহা। তাহার উপর যত কড় পড়িয়া যাউক, যত করাল গ্রাসে প্রাকৃতিক বিপ্লব উলঙ্গ হইয়া নৃত্য করিতে থাকুক, শিবের নিদ্রা অটুট। এক একটা জাতি আসিয়া ইহার সৃষ্টির সমক্ষে নর্ত্তকীবৎ অঙ্গভঙ্গী পূর্ব্বক যাহা খুসী করিয়া যাইতেছে, সকলই ভারতবর্ষের নিকট অসার। মোট কথা ভারতবর্ষের জ্ঞান ও ভক্তির নিকট সকল শক্তিই পরাজিত। এই কারণেই 'হিন্দু' নামক আর্য্যজীব, ঘুমাইয়া থাকিলেও বিলক্ষণ আত্মসজাগ। যদি জ্ঞান ও ভক্তির অনুকূল কর্ম্ম ইহাকে দাও, দম্ভ বিকাশ করিয়া আসিবে, নচেৎ প্রলয়েও ইহার নিদ্রাভঙ্গ হয় না।

কারণ, নিদ্রাভঙ্গ করিলেও ইহা পার্থিব বস্তুকে অলীক, মায়াময়, অসার এবং স্বপ্নের ন্যায় দেখে। ইহার লোভ নাই, কামনা নাই, ভোগলালসা নাই। ইহা যন্ত্রের মধ্যে নাই। জ্ঞানের কথা কহ, প্রেমের কথা কহ, ভক্তির কথা কহ, এবং তাহারই সানুকূল কর্ম্মের কথা কহ, ইহা যোগ দিয়া কর্ম্মযোগী হইতে রাজী। যদি বল 'তুমি এই রকম চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত করিয়া চিরকাল থাকিবে?' উত্তর 'আগে আত্মাকে সাধনাও তাহার পর ঘটিবাটী'। সামান্য কৃষক ও ভিক্ষাজীবীর রক্তে এই জ্ঞান ও ভক্তির বীজ নিহিত। ইহারা একটা সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন জীববিশেষ। ক্ষমা ইহাদিগের ভূষণ। আত্মোৎসর্গ ইহাদিগের চারি যুগের অভ্যাস। মার্টিন লুথার কিংবা সেণ্ট পলের কথা শুনিয়া ইহারা শিহরিয়া উঠে না। ধর্ম্ম ইহাদের ঘরের কথা।

এই প্রকার মনুষ্যের পক্ষে আর উচ্চতর ক্রমবিকাশ নাই। এ হেন Type ভাল প্রকৃতির পক্ষে অসম্ভব। ডারউইনের আইন এখানে খাটে না। সমগ্র জগৎ লোপ পাইলেও ভারতবর্ষের প্রকৃতিপুঞ্জ সর্ব্বশেষে যাইবে; কারণ, ঈশ্বর ইহাদিগেরই মধ্যে পূর্ব্বে বাস করিয়াছিলেন, এবং প্রলয়াগমে ইহাদিগেরই মধ্যে লুক্কায়িত হইবেন।

এ দেশের স্ত্রীজাতিকে বেশ করিয়া দেখুন। বাস্তবিক ইহাদিগের মধ্যে কোন বিশেষ একটা সমাজ নাই। গ্রামে গ্রামে একটা সমাজ আছে, কিন্তু তাহার ভিত্তি পরনিন্দা, গ্লানি, কলহ এবং আত্মবিচ্ছেদ। সেই সকল স্ত্রীলোক কলিকাতায় আসে। আসিলে, প্রচ্ছন্ন ধর্ম্মকেত্র হৃদয়াভ্যন্তরে জাগিয়া উঠে। কালিঘাটে পূজা দিয়া যায়, ষষ্টি লইয়া তারকেশ্বরে হত্যা দিতে যায়, ঠাকুর দেবতার দুই একখানা পট খরিদ করে, থিয়েটারে গিয়া কাঁদিয়া আসে। তাহারা কলিকাতার মধ্যে ধর্ম্ম খুঁজিয়া বেড়ায়। কলিকাতার স্ত্রীলোকও তাহাই অন্বেষণ করে। কলিকাতার বিশাল কর্ম্ম-কোলাহল, হাস্যকৌতুক, ছায়াবাজী ও দৃশ্য ইহাদিগের নিকট বিরক্তিকর। দু'দিনের জন্য মনোহর, কিন্তু অন্তরে অতৃপ্তিকর। ইহারা যে সৌন্দর্য্যের উপাসনা করিতে চাহে, বিলাতের রমণীসমাজে তাহা এখনও ফুটিয়া উঠে নাই। সেখানে ভোগলালসা অবিরাম ভাবে চিতার ন্যায় প্রজ্বলিত। তাহার আদর্শসৌন্দর্য্য মদিরার ন্যায় মত্তকারী কিন্তু তাহাতে তৃষ্ণার উপশম হয় না। কলিকাতায় সেই নমুনা, প্রদর্শিত হইতেছে, খেলনা সামগ্রীর মত বিক্রয় হইতেছে, কিন্তু অন্তরে কেহই চাহে না।

এই যে বাহ্য সৌন্দর্য্যের ছটায় আন্তরিক অনাস্থা তাহার কারণ আর কিছুই নয়। ভারতের রমণী স্বামীকে ঈশ্বরপরায়ণ, ভক্তিপূর্ণ, ও জ্ঞানী দেখিতে চাহে। আদিম কাল হইতে তাহারা এই পথের পথিক। শেষেও তাহাই থাকিয়া যাইবে। এই জন্যই তাহারা সতী। যতদিন রমণী-সমাজ ধর্ম্মের সহায়তা করিবে, ততদিন তাহাদিগের কর্ম্মের আদর্শ অন্তরালে থাকিয়া যাইবে। এটা সম্পূর্ণ দৈবী প্রকৃতির অনুরূপ। কিন্তু সে আদর্শ আমরা হয় ত তাড়িতে বসিয়াছি। তাহা পারিব না। কর্ম্মের আদর্শস্বরূপ একটা প্রলোভন দেখাইয়া যে সমাজ-বন্ধনের উদ্যোগ আমরা করিতেছি তাহা টিঁকিবে না। রমণীসমাজ বাঁধিবার এখন ও বিলম্ব আছে। নূতন প্রদর্শনীর গোলমাল চুকিয়া গেলে, পুনর্ব্বার ঘরে ফিরিয়া আসিলে, পুরাতন অঙ্কে পুনরায় বিশ্রাম লাভ করিলে, হয় ত আমরা সমাজ দেখিতে পাইব। ইত্যবসরে যাঁহারা অভ্যন্তরে মন্দির নির্ম্মাণ করিতেছেন, তাঁহারা করিতে থাকুন। প্রান্ত পথিকের পান্থশালা এই দেশের নিভৃতে ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে।

অলিভ্‌শ্রীনার বিলাতের বৃদ্ধা এবং নবীনা যুবতী সমাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে গত যুগের পুরাতন সরসী শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। হংসীগণ তথায় সৌন্দর্য্যবিহীন পঙ্ক দেখিয়া কলরব করিতেছে। সেখানে পত্রপূর্ণ মৃণাল ও শতদল আর নাই। সমাজের মধ্যেও কোন আদর্শ নাই। নারীসমাজ চৌষট্টি যোগিনীর ন্যায় খড়্গহস্তা। পুরুষ তাহাদিগের নিকট হেয়। তাহারা পুত্রসন্তান চাহে না। ডাকিনীর ন্যায় উলঙ্গিনী। অন্নের জন্য হাহাকার। কর্ম্মক্ষেত্রে নারী, পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠা হইতে চাহে। ঘরকন্না, স্বামীসেবা, সংসারাভ্যন্তরালে থাকিয়া ধর্ম্ম এবং জগত

রক্ষা, এ সম্বন্ধে তাহারা নিঃসন্দিগ্ধ তাহারা বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছে কিছু দিন পরেই 'ডাইনামাইট' চালাইবে। রুশ হইতে আরম্ভ করিয়া, ইউরোপের পশ্চিমাংশে যাইয়া এই বহ্নি প্রজ্বলিত। ইহা নির্ব্বাপিত করিবার শক্তি যাঁহার নিকট, তাঁহার আদর্শ সে সমাজে প্রায় অন্তর্হিত।

একশ্রেণীর সাহিত্য সঙ্গীত ও কাব্যরূপে এই বহ্নি অনেকটা প্রশমিত করিতে পারে, কিন্তু ইহারা যে পথ দিয়া আসে তাহা প্রজ্বলিত পথ হইলে ইহাদিগের ভঙ্গী বদলাইয়া যায়। ভারতবর্ষের সাহিত্য, কাব্য ও চিত্রকলা সকলই ধর্ম্মের আদর্শে পরিপূর্ণ। আমাদিগের দেশে একটা পুরাতন বস্তু এখনও অটুটভাবে বর্ত্তমান। ঘরে ঘরে বৈরাগী-ভিখারী আসিয়া ধর্ম্মের কথা গাহিয়া যায়। পাশ্চাত্যজগতে সেটা গিয়াছে। আমাদের দেশে রমণীরা তাহা এখনও লুকাইয়া শুনে।

নূতন লোকের কলিকাতায় গেলে একটা খট্‌কা বাধে। এত বড় বিরাট সহরে, এতাধিক মহাপণ্ডগোলের মধ্যে, শাকান্ন আহার করিয়া সাহিত্যাদিগ্‌গজ, দার্শনিক, ও কবিসমাজ, এবং ধর্ম্মপ্রচারকগণ, পুরাকালের শান্তি বজায় রাখিতেছেন কি প্রকারে? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময়ে পূর্ণিমা-সম্মিলন হইত না সত্য, কিন্তু অমাবস্যার বিরহের মধ্যেই ধর্ম্ম স্বীয় কর্ম্ম সারিয়া লইত। হয় ত এ কালে আমরা সমাজপতি মহাশয়ের ওখানে হংসডিম্বের কোপ্তা ও গলদা চিংড়ীর কট্‌লেট খাইয়া আসিয়াছি, কিংবা ঠাকুরবাড়ীতে দিব্য সন্দেশ ও পেস্তার বরফি এবং লেহ্য পদার্থাদি, কিংবা রায় মহাশয়ের ওখানে পেয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়া চারপার্শ্ব হইয়াছি। কিন্তু তাহা এই দুঃখময় ভীব নর মধ্যে চাট্‌নিস্বরূপ। আমরা খাইবার জন্য ভাল বাসি না, ভাল বাসিবার জন্য খাই। খাইলে দুঃখ হয়, কেননা যাঁহার মন্দির দেখিতে যাই, তাহা খাইয়া দেখিতে পাই না। দ্বন্দ্ব বাধিলেও আমাদিগের প্রেম উত্তরোত্তর বাড়ে। অনাহারে ফুটিয়া উঠে। আমরা একাদশী করিয়া চিরকাল ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছি। কলিকাতার অসার বস্তুতে পেটের জ্বালার নিবৃত্তি হয় না। তথাপি আমরা তাহাতেই দল বাঁধিতেছি।

সাহিত্যে, কাব্যে এবং চিত্রকলায় তাহাই প্রতিফলিত। যেখানে ভয়ানক স্বদেশ-প্রিয়তা এবং তেজস্বিনী ভাষা, সেখানেও তেজটা ব্রাহ্মণ্য। অর্থাৎ একটা মিষ্ট কথাতেই জল। রাগ করিলে দুঃখ হয়, এবং পাছে কেহ তাহাতে মর্ম্মাহত হয়, এই ভয়ে কাঁদিয়া ফেলি। ইচ্ছা হয় যে প্রতিদ্বন্দ্বী আসিয়া রাগটা থামায়। কেহ আসে না। কিন্তু ফলে একই। পরখ্‌ করিয়া দেখ সে রাগ আর নাই। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যাহা হইয়া থাকে, সাহিত্যসমাজেও তাহাই। এক ঘরের লোক। একান্নবর্ত্তী। আমরা রাগ করিলে খাই না। অন্য জাতির রাগ হইলে অধিক পরিমাণে খায় ও খাইয়া আরও রাগে ফুলিয়া উঠে। একখানা মটন কিংবা সাণ্ডউইচ না খাইলে অন্যদেশে প্রেমিকার অভিমান ভাঙ্গে না। আমাদের অনাহারেই ভাঙ্গে। কারণ আমরা নিবৃত্তির পথে,

ইন্দ্রিয়-দমনের পথে, তাহারা প্রবৃত্তির পথে। আমাদিগের পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানের সাধুকুল কর্ম্ম একরূপ, তাহাদিগের জ্ঞানের এখনও বিলম্ব আছে, কাজেই কর্ম্ম অন্য রকম।

বেশ সবল প্রবল পরাক্রান্ত রণক্ষেত্রীর ন্যায় কাব্য আমাদের দেখে কম। গোটা কতক মদিরা-উন্মত্ত শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন কবি তাহার নমুনা দেখাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু উপসংহারে ধর্ম্ম, মৃত্যুকালে বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণ। আমাদিগের ধর্ম্ম এত প্রবল যে অন্য কোন শক্তির বিকাশকে চুটকী মারা উড়াইয়া দিয়া থাকি।

কলিকাতার অভ্যন্তর দিয়া যত ধর্ম্ম, সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলা বাহির হইয়াছে তাহার প্রকৃতি শান্তিময়, ভক্তিময়, এবং সেই শান্তি এবং ভক্তির আদর্শ ঈশ্বরময়। এখানে গভীর কূপ খনন করিলে ঈশ্বর বাহির হইয়া পড়ে। অন্য দেশ মরুভূমির মত। তাহাদের অতি গভীর স্তরে ধর্ম্ম পাওয়া যাইতে পারে। এখানে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ স্তর খনন করিলেই বড়-বাজারের সন্দেশের মত তোফা ধর্ম্ম পাওয়া যায়। ইহা বিদ্রূপের কথা নহে, সত্য। তাহাকে আগ্নেয় আচ্ছাদন দিয়া ঢাকিতে পার, পাশ্চাত্যসভ্যতারঞ্জিত নানাবর্ণের বিদ্যামালা পরাইতে পার, কিন্তু ঘাঁটি সৌরভ ও শান্তি কখনই লুপ্ত হইবে না।

এ দেশে দুঃখের সময়ও রসিকতা ও অন্ধকারের মধ্যেও স্বর্গীয় চিত্রকল্পনা স্বভাবসিদ্ধ। কলিকাতার লোকে উপবাসের সময় মধুর হাসে ও নিবিড় অন্ধকারে আকর্ণবিস্তৃত সুন্দর চক্ষু চিত্রে টানে, যদি কাহাকেও সন্ধ্যাকালে হাসিতে দেখ নিশ্চয় জানিও যে সে সারাদিন আহার করে নাই, তামাকু সেবন করিতে আসিয়াছে। সে হাসি চিরানন্দময় আত্মার স্বভাবসিদ্ধ হাসি। চিত্রে আমরা ইষ্ট-দেবতার কল্পিত ছবি চাহিয়া থাকি। হরের মদনভস্মের মধ্যে রতিকে যতই সুশ্রী করিয়া টান না কেন, বস্ত্র একেবারে হ্রস্ব করিয়া দাও, যৌবন ফুটাইয়া দাও, চক্ষু মনোমোহন করিয়া দাও, অঙ্গ ঢলাইয়া দাও, আমাদের চক্ষু কেবল হরের দিকে। বহ্নিটা যে মদনের দিকে গেল ইহাই আমাদিগের আদর্শ। রতির রূপ আদর্শ নয়। রাত থাকাতে বহ্নির আলোক ও সৌন্দর্য্য বাড়িয়াছে, কিন্তু সেটা মাধ্যপ্রয়োজন। আমরা হরের চক্ষুর দিকে চাহিয়া রহী।

বিলাতে চিত্র দেখিয়া লোকে উন্মত্ত হয়, এখানে চিত্র আমাদিগকে দেখিয়া উন্মত্ত হয়। বড় বড় গাছপালা, নীলাভ পর্ব্বত-মালা, নদীসলিলে বাহ্যজগতের প্রতিবিম্ব, কিংবা মানব-প্রকৃতির মধ্যে অঙ্গসৌষ্ঠব, চাকচিক্য ও সুখদুঃখ চিন্তাদির ভঙ্গী, এ গুলি দেখিয়া আমরা কৃতার্থ হই না। ভাল চিত্র দেখিলে আমরা বলি, 'বেশ!' কিন্তু আমাদের হৃদয়-দেবতার ভাব তাহাতে না পাইলে সেটা ছেলেপুলেদের ঘরে কীটদষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকে। এখানে আট আনার বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মান অধিক। শতমুদ্রা মূল্যের প্রাকৃতিক দৃশ্যের তৈলচিত্র আমাদিগের নিকট কিছুই নহে। আমরা বনে উপবনে গিয়াও সেই দেবতাকে অন্বেষণ করি বৃক্ষের উপর অন্ততঃ একটা পাখী

থাকা চাহি, যবে একটা গোবৎস কিংবা হরিণ, যবে একটা দীর্ণ দীর্ণ মানুষ।

এই যে মহানগরী কলিকাতা ইহা প্রকৃতিগত বৈষ্ণব। ইহার অন্তরে গোবৎসের স্মৃতি বিলক্ষণ ভাবে বর্ত্তমান। যখন জগৎ শ্মশান হইয়াযায়, তখনও মাঠে গাভীর হাম্বারব, এবং পথভ্রান্ত বৎসের সকরুণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া, আমরা শূন্যে কর প্রসারণ করিয়া থাকি। বেশভূষা পরিচ্ছদের চাকচিক্য, ছিটাকোঁটা হাটকোট নেকটাই আমাদিগের নিকট রঙ্গভূমির সঙ্গের সাজ। খুলিয়া ফেলিতে পারিলে বাঁচি। পুনরায় সেই জীর্ণ ধুতি চাদর এবং পৃথিবীর বৈরাগ্য মলিন পাছাপেড়ে শাড়ী আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষের গোধূলিলগ্নের স্মৃতি টানিয়া আনে।

তাই অনেকে বলিয়া থাকেন "ওহে, গীতার কর্ম্মযোগটা কোন কর্ম্ম? সে যুদ্ধের আগ্রহটা কোন যুদ্ধ? সে মোহটা কিসের মোহ? জগতে সকলেই কৃষ্ণের জীব, কেহ আনন্দে রাখাল সাজে, কেহ কৃষ্ণ সাজে, কেহ রাজারাণী সাজে আমাদের সম্মুখীন হয়। হিন্দু-মুসলমান, শিখ, পার্শী, খ্রীষ্টান, মোগল, পাঠান, মহারাষ্ট্র, যেই রাজা সাজুক না কেন আমাদিগের সহিত সম্বন্ধ খেলাধূলা লইয়া। হয় দু'ঘা মারিল, না হয় তাহারা মুর্গীর ঠ্যাংটা ও হুইস্কিটা এবং আমরা সজিনার খাড়া ও আমড়ার আঁটিটা খাইলাম, তাহা ক'দিনের জন্য! তাহা লইয়া দ্বন্দ্ব কেন? ইহার মধ্যে মারামারি ও শ্মশানের কোলাহল কেন?

হউক না কেন তাহারা প্রবৃত্তিমার্গীয়, ছাড়ুক না কেন গোলাগুলি. তাহারা শিখিতে আসিয়াছে যাহা, তাহা শিখিয়া যাইবে। আমরা গুরুস্থানীয়। ভূমি কর্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যা পর্য্যন্ত, সকল বিদ্যার সেরা ব্রহ্মবিদ্যা। ভারতবর্ষের ধন। ইহা চিরকাল শিখাই বলিয়া ভারতবর্ষ সমান ভাবে টিঁকিয়া আছে। কোন ঝড়ে উড়াইতে পারে নাই, কোন বিপ্লবে ভাসাইতে পারে নাই।

এই যে অন্তরের একটা সনাতন পূর্ব্বকালের ভাব তাহা কলিকাতার বাহ্য দৃশ্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। হোটেলে বসিয়া খাও, বক্তৃতার মধ্যে যাও, অন্দরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াও, হাস্য-পরিহাসে জুড়ুলে এবং নিদ্রায় একটা অনন্তকালের স্বপ্নজাল ঈশ্বরের সনাতন শিশু সন্তানগণকে ভাবল শীতল ছায়ায় ভাব বেষ্টন করিয়া আছে দেখিতে পাইবে।

সুরদাস

মানবের জন্মকথা।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন।

আমরা দেখিলাম যে মানবদেহে ও মনে এবং ইতর জীবগণের ঐরূপ পরিবর্ত্তন যে সকল সাধারণ কারণাধীনে হয় ও উহারা যে সকল সাধারণ বিধানানুসারে পরিচালিত, মানব প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সেই সকল কারণ ও বিধান-

সুসারেই পরিদর্শিত হইয়া থাকে। মানব পৃথিবীতে বহু বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; এবং নিশ্চয়ই বিস্তৃতিকালে নানাবিধ অবস্থায় পতিত হইয়াছে। টেরেডেল ফিউগো, উত্তমাশা অন্তরীপ, এবং ট্যাস্‌মেনিয়া দক্ষিণ ভূভাগে, এবং সুমেরু প্রদেশ উত্তর ভূভাগে; এই উভয় বিভাগের অধিবাসিগণ নিশ্চয়ই তাহাদিগের বর্ত্তমান আবাস-ভূমিতে উপনীত হইবার পূর্ব্বে নানা দেশের মধ্য দিয়া গিয়াছে, নানা ঋতু পরিবর্ত্তন সহ করিয়াছে এবং বহুবার আচারব্যবহার পরিবর্ত্তন করিয়াছে, অন্যান্য সমস্ত জীবের ন্যায় মানবের বহু পুরাতন প্রথম পূর্ব্ব পুরুষগণও নিশ্চয়ই সংখ্যায় এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, প্রচুর আহার্য্য বস্তুর অভাব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ কারণবশত নিশ্চয়ই তাহাদিগের মধ্যে সময় সময় জীবনসংগ্রাম বাধিয়া উঠিত। সুতরাং তাহারা কঠোর প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বিধির অধীন হইয়াছিল। এইরূপে কখন কখন কিম্বা সর্ব্বদাই উপকারজনক পরিবর্ত্তন সকল রক্ষিত হইত ও অপকার-জনক পরিবর্ত্তন সকল পরিত্যক্ত হইত। এ স্থলে আমি দেহগঠনের গুরুতর পরিবর্ত্তনগুলির কথা বলিতেছি না; সে সকল দীর্ঘকাল পরে পরে উৎপন্ন হয়। আমি সামান্য ব্যক্তিগত প্রভেদের (পরিবর্ত্তনের) কথাই বলিতেছি। একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব। ইতর প্রাণী-দিগের ন্যায় আমাদিগেরও হস্ত ও পদের পেশি সকল পরিবর্ত্তনশীল। ঐ সকল পেশিই গতিবিধি সম্পাদন করে। মনে কর, মানবের পূর্ব্ব পুরুষগণ, যাহারা কোন একটি প্রদেশে বাস করিত তাহাদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছিল। এমন সময়ে তাহারা দুইটি সমসংখ্যক দলে বিভক্ত হইল। তাহা হইলে, যে দল গতিশক্তির উন্নতিবশত আহার্য্যসংগ্রহে অধিকতর সবল অথবা আত্মরক্ষা করিতে অধিকতর সমর্থ, তাহারাই অপেক্ষাকৃত অসম অপর দলের অপেক্ষা বেশীর উপর বাঁচিবে ও অধিকসংখ্যক এবং বংশবৃদ্ধিও বেশী করিবে।

বর্ত্তমান সময়ে অসভ্য মানব যে অবস্থায় আছে, সে অবস্থাতেও এই জীব যেরূপ প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সক্ষম, তদ্রূপ ক্ষমতাশালী আর কোনও জীব ধরাতলে কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। উচ্চশ্রেণীস্থ জীবগণ মধ্যে মানবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছে; অপরাপর সমস্ত জীব তাহার পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে মানবের এই অতি প্রাধান্য বুদ্ধিবৃত্তির, সামাজিকতার এবং দৈহিকগঠনের ফল। জীবনসংগ্রামে মানব সকলের উপর জয়ী হইয়াছে; ইহাতেই ঐ ত্রিবিধ কারণের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যায়। তাহার বুদ্ধিবৃত্তি হইতে কথিত ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে; এবং তাহার আশ্চর্য্যজনক উন্নতি, প্রধানতঃ ভাষার উপরেই নির্ভর করিয়াছে। মিঃ চনপি রাইট বলেন "ভাষা-বৃত্তিকে বার্শনিক ভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ভাষাতে অতি সামান্য মাত্র পারদর্শিতা লাভ করিতে মস্তিষ্কের শক্তি যে পরিমাণ আবশ্যক হয়, অন্য বিষয়ে অতীব উন্নতি

করিতেও সে পরিমাণ হয় না।" মানব নানাবিধ অস্ত্র, যন্ত্র এবং ফাঁদ নির্ম্মাণ করিয়াছে, এবং সেই সকল ব্যবহার করত আত্মরক্ষা করে, শিকারকে বধ অথবা আবদ্ধ করে এবং অন্য প্রকার খাদ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। মানব ডিঙ্গী অথবা নৌকার খোল প্রস্তুত করিয়া মৎস্য শিকার করে,এবং জল পার হইয়া উর্ব্বর ভূমিতে যায়। সে অগ্নি জ্বালাইবার প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছে, এবং তদ্বারা সুপাচ্য উদ্ভিদমূলাদি রন্ধন করিয়া সুপাচ্য করিয়া লইতে সক্ষম হয়; বিষাক্ত গাছ অথবা মূলকেও নির্দ্দোষ করিয়া লইতে পারে। তাহার আবিষ্কার ছাড়িয়া দিলে, অগ্নির আবিষ্কারই মানবের সর্ব্বপ্রধান আবিষ্কার; ইহা ঐতিহাসিক সময়ের পূর্ব্বেকার আবিষ্কার। এই সকল আবিষ্কার এবং উদ্ভাবন বশতঃ মানব এতদূর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এ প্রাধান্য তাহার পরিদর্শন শক্তি, স্মৃতি, কৌতূহল, কল্পনা ও বুদ্ধি বৃত্তির উন্নতির প্রত্যক্ষ ফল। মিঃ ওয়ালেস* বলেন "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবশত মানবের মস্তিষ্ক বানরের মস্তিষ্ক হইতে কিছু কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়াছে মাত্র।" তিনি কেন যে এরূপ বলেন আমি তাহার অর্থ বুঝিতে অক্ষম। মানবের বুদ্ধি ও সামাজিক আচরণই তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুতর বিষয়; কিন্তু তাহা হইলেও দেহগঠনকে আমি লঘু বিষয় মনে করিতে পারি না। এ অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশে দেহগঠনের কথাই আলোচনা করিব। পরে, তাহার বুদ্ধি, নীতি এবং সামাজিক বৃত্তি অন্য অধ্যায়ে আলোচিত হইবে।

যাহারা সূত্রধরের কার্য্য শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহারা সকলেই স্বীকার করিবে যে ঠিক মত হাতুড়ির আঘাত দেওয়াও সহজ কার্য্য নহে। আত্মরক্ষার নিমিত্ত অথবা পক্ষীশিকার জন্য ফিউজিয়ানগণের ন্যায় অব্যর্থ লক্ষ্য করিয়া প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিতে, স্কন্ধ, বাহু ও হস্তের পেশিগুলির যুগপৎ ও সম্মিলিত ক্রিয়ার অতীব উৎকর্ষ আবশ্যক হয়; এবং অতি সূক্ষ্ম স্পর্শানুভবশক্তিরও প্রয়োজন। প্রস্তরখণ্ড অথবা বর্ষা নিক্ষেপ করিতে মানুষকে পায়ের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইতে হয়; ইহাতেও বহু পেশির সম্মিলিত ক্রিয়ার উৎকর্ষ থাকা আবশ্যক। চকমকি পাথরে অতি সামান্য যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হইলেও, অস্থি হইতে কণ্টকযুক্ত বর্ষা অথবা বড়িশ গঠন করিতে হইলেও অতি উন্নত হস্ত গঠনের আবশ্যক। মিঃ স্কুল ক্রাফ্‌ট এ বিষয় বিবেচনা করিবার উত্তম অধিকারী; তিনি বলেন, প্রস্তরখণ্ড হইতে ছুরি, বর্ষা কিম্বা বাণ গঠন করিতে অদ্ভুত শক্তি ও দীর্ঘ অভ্যাস প্রয়োজন হয়। আদিম মানবেরা শ্রম বিভাগ করিতে জানিত, ইহাতেই ঐরূপ শক্তি ও অভ্যাস থাকা সম্ভবপর হয়। সে কালেও প্রত্যেক মানুষ তাহার নিজের পাথুরিয়া যন্ত্র অথবা মোটা বাসন নিজে প্রস্তুত করিত না। নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির ঐ সকল যন্ত্র নির্ম্মাণ করিত

* এই বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিৎ এবং ডারুইন উভয়েই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবিধির আবিষ্কারক। এই আবিষ্কারের গৌরব তিনি অপূর্ব্ব ত্যাগশীলতা প্রদর্শন পূর্ব্বক ডারুইনকে দিয়াছেন — অনুঃ।

এবং তাহার বিনিময়ে নিশ্চয়ই শিকারলব্ধ খাদ্য প্রাপ্ত হইত। স্থাপত্য-বিদ্যাবিদ্‌গণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে আদিম মানবগণের মনে, প্রস্তরখণ্ড দ্বারা মসৃণ যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিবার ভাব উদয় হইবার পূর্ব্বে, বহুকাল অতীত হইয়াছিল। যে মানব-আকারের অন্তর বাহু ও হস্ত আছে, এবং তদ্বারা অব্যর্থ লক্ষ্য করিয়া শিলা-লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে পারে, অথবা প্রস্তরময় মোটা যন্ত্রও গঠন করিতে সমর্থ হয়, সে প্রাণী অভ্যাস করিলে, সভ্যমানব যাহা প্রস্তুত করিতে পারে, (সেও নির্ম্মাণকৌশলে,) প্রায় তাহাই করিতে সমর্থ হইবে,—এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ করা যায় না। এ সম্বন্ধে হস্তের গঠনের সহিত বাক্‌যন্ত্রের তুলনা করা যায়। এই যন্ত্র দ্বারা বানরেরা নানাবিধ সঙ্কেতসূচক ধ্বনি করে; একটি গণভুক্ত * বানর সঙ্গীতও করিয়া থাকে। মানবের ও বানরের বাক্‌যন্ত্র প্রায় তুল্য; কিন্তু মানব এই যন্ত্র দ্বারা কথিত ভাষা উচ্চারণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। অভ্যাসের ফল বংশ-পরম্পরাগত হইয়া এইরূপ হওয়া বিবেচনা হয়। †

মানুষের নিকট কুটুম্বগণ, অর্থাৎ উচ্চ-শ্রেণীস্থ বানর, যাহারা প্রাথমিক মানুষের প্রায় তুল্য, তাহাদিগের কথা বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে তাহাদিগের হস্ত এবং মানবের হস্ত একই আকৃতির; তথাপিও নানা প্রকার ব্যবহারে মানবের অপেক্ষা উপযোগিতায় অনেক কম। কুকুরের পদ চলাচল করিবার পক্ষে যেরূপ সুগঠিত, বানরের হস্ত তদ্রূপ নহে; এ কথা ওরাং এবং শিম্পাঞ্জির গতি দেখিলেই বুঝা যায়, কারণ উহারা করতলের সোড়ালির উপর ভর দিয়া চলে। কিন্তু উহাদিগের হাত গাছে উঠিবার পক্ষে বেশ উপযোগী। হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি একদিকে, এবং অন্যান্য অঙ্গুলি ও করতল আর এক দিকে,—এতদুভয়ের মধ্যস্থলে বানরগণ ছোট ছোট ডাল অথবা দড়ি ধরে, আমরাও ঐরূপেই ধরি। এইরূপে উহারা বতলের ন্যায় বড় বস্তুও উঠাইয়া মুখে দিতে পারে। ব্যাবুন বানরেরা পাথর উল্টাইতে পারে, এবং মাটি হাঁচ্‌ড়াইয়া শিকড় তোলে। উহারা সুপারি, পোকা ইত্যাদি ক্ষুদ্র বস্তু হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও অন্যান্য অঙ্গুলি দিয়া ধরিতে পারে; এবং তাহারা এই রূপেই পক্ষীর বাসা হইতে ডিম্ব ও শাবক ধরিয়া বাহির করিয়া লয়। আমেরিকার বানরেরা গাছের ডালে আঘাত দিতে দিতে অপক্ক নেবুর খোসা উল্টাইয়া ফেলে; তার পর দুই হাতের অঙ্গুলি দ্বারা টানিয়া খোসা ছাড়ায়। উহারা কঠিন ফল পাথরের আঘাতে ভাঙ্গে। অন্য বানরেরা দুই হাতের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা খুলিতে পারে। উহারা অঙ্গুল দ্বারা কাঁটা খুলিতে পারে এবং পরস্পরের গায়ের চর্ম্মকীট, উকুন খুঁটিয়া দেয়। শত্রুর উপর পাথর গড়াইয়া দেয়, অথবা পাথরের ঢিল মারে। কিন্তু উহারা এই সকল কার্য্য ভাল মত করিতে পারে না। আমি নিজে দেখিয়াছি, উহারা ঠিক-লক্ষ্য করিয়া পাথর ছুঁড়িতে সমর্থ হয় না।

* Genus.

† অনেক অভ্যাসের ফল বংশপরম্পরাগত হওয়া বিশিষ্ট জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ একণে স্বীকার করেন না। অনুঃ।

বানরেরা ভাল * করিয়া কোন বস্তুই ধরিতে পারে না; সুতরাং তাহাদিগের যেরূপ হস্ত আছে, তদপেক্ষা গড়নে কিছু খারাপ হস্ত থাকিলেও কাজ সমানই চলিত,—এ কথা আমার বিবেচনার সত্য নহে। আমার বোধ হয় যে উহাদিগের হস্ত আরও সুগঠিত হইলে বেশি সুবিধা হইত, যদিও তাহাতে উহাদিগের হস্ত গাছে উঠিবার পক্ষে কম উপযোগী না হয়। মানুষের মত সুগঠিত হস্ত যদি বানরের হইত, তবে উহাদিগের গাছে উঠার অসুবিধা হইত, এরূপ অনুমান করা যায়, কারণ গাছে উঠিতে সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ বানরদিগের অর্থাৎ আমেরিকার অ্যাটিলিস, আফ্রিকার কলোবাস, এসিয়াখণ্ডের হাইলোবেটিস নামক বানরদিগের হস্ত ত অঙ্গুষ্ঠ নাই, নচেৎ অঙ্গুলিগুলি পরস্পরের সহিত অংশত যোড়া-লাগা; সুতরাং হস্তপদের আকার যেন বড়শির মত বোধ হয়।

আহারান্বেষণের প্রণালী পরিবর্ত্তন বশতই হউক অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্ত্তন জন্যই হউক, যখনই কোন প্রাচীন-কালীন বানরের বৃক্ষারোহণ স্বভাব কমিয়া আসিল, তখন হইতেই উহাদিগের গমনা-গমনের পদ্ধতিও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল; আর তখন হইতেই উহারা প্রকৃতপক্ষে চতুষ্পদ বা দ্বিপদগামী হইবার কারণ হইয়াছিল। * ব্যাবুন বানর পার্ব্বত্য প্রদেশে যাতায়াত করে, এবং নিতান্ত বাধ্য না হইলে উচ্চ বৃক্ষে উঠে না। উহাদিগের হাটা প্রায় কুকুরের মত হইয়াছে। কেবল মানুষই দ্বিপদগামী হইয়াছে। মানুষ দাঁড়াইতে অভ্যস্ত হইয়াছে; আমার বোধ হয় তাহার এই বিশেষত্বের কারণ কতকাংশে বুঝা যাইতে পারে। মানুষ হস্তের ব্যবহার না করিতে পারিলে কখনই জীবগণের মধ্যে এমন প্রধান পদ অধিকার করিতে পারিত না। ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিবার পক্ষে হস্ত অতি উপযুক্তরূপে নির্ম্মিত। সার, সি, বেল বলেন "হস্ত যাবতীয় যন্ত্রের কার্য্য করে; উহা বুদ্ধির সহিত একতায় কার্য্য করিতে সক্ষম বলিয়াই মানব সকলের উপর আধি-পত্য প্রাপ্ত হইয়াছে।" কিন্তু যে পর্য্যন্ত হস্ত এবং বাহু কেবল গমনাগমনের জন্যই ব্যবহৃত হইত এবং সমস্ত দেহভার বহন করিত, অথবা যে পর্য্যন্ত উহা কেবল বৃক্ষা-রোহণ কার্য্যেরই উপযুক্ত ছিল, সে পর্য্যন্ত উহা অস্ত্র নির্ম্মাণ করিবার অথবা অন্যার্থ লক্ষ্যে প্রস্তর লোষ্ট্র অথবা বর্ষা নিক্ষেপ করিবার উপযুক্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে বোধ হয় পারিত না। গমনাগমন, দেহবহন, বৃক্ষারোহণ ইত্যাদি মোটা কাজে হস্তের ব্যবহার করিলে স্পর্শবোধ ভালরূপ পরিস্ফুট হইত না। স্পর্শবোধের উন্নতির উপরই সূক্ষ্ম কার্য্য করতা নির্ভর করে। * কেবল এই সব কারণেই দ্বিপদগামী হওয়া মানুষের পক্ষে লাভজনক হইবার কারণ হইয়াছিল। কিন্তু বহুবিধ কর্ম্মের নিমিত্ত বাহু এবং দেহের উপরার্দ্ধ ভাগ স্বাধীন থাকা নিতান্ত প্রয়োজন, এই হেতু বশত

* গাছে গাছে লাফালাফি করিলে চতুষ্পদও বলা যায় না, দ্বিপদও বলা যায় না। ঐ অভ্যাসটি করিলে যখন মাটিতেই চলাফেরা করিতে হয়, তখনই হয় চতু-ষ্পদ না হয় দ্বিপদে চলিবার হেতু হয়। অনু।

* সুতরা মানব হস্ত বোধহয় কার্য্যে পারগ হইত না।

দৃঢ়ভাবে পায়ে ভর দিয়া দণ্ডায়মান হওয়া আবশ্যক হয়। এ নিমিত্ত পদতল চাপটা হইয়াছে, এবং পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে উহার ধরিবার শক্তি প্রায় লোপ হইয়াছে। হস্ত যে পরিমাণে ধরিবার শক্তি লাভ করিয়াছে অর্থাৎ বস্তু গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হইয়াছে, পদও সেই পরিমাণে যাতায়াত করিবার এবং দেহভার বহন করিবার যোগ্য হইয়াছে। জীবদেহে এইরূপে কার্য্যবিভাগ সমস্ত জীবের মধ্যেই দেখা যায়। কোন কোন অসভ্য জাতির পদ, ধরিবার শক্তি সম্পূর্ণরূপে হারায় নাই; ইহা তাহাদিগের গাছে উঠিবার প্রণালী এবং অন্যান্য কার্য্য দেখিলেই বুঝা যায়।

শ্রীশশধর রায়।

ভারতীয় ইতিহাসের উপকরণ।

উত্তর শতপথ।

শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪টি কাণ্ডে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম দশটি কাণ্ড "পূর্ব্ব শতপথ" ও অবশিষ্ট ৪টি কাণ্ড "উত্তর শতপথ" নামে পরিচিত। পূর্ব্ব শতপথ ৬৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত, উত্তর শতপথে ৩৪টি অধ্যায় আছে। একাদশ কাণ্ডের প্রারম্ভে বা উত্তর শতপথের প্রথম অধ্যায়েই নিম্নলিখিত বচনগুলি পরিদৃষ্ট হয়। যথা—

যোঽসৌ বৈশাখস্যামাবস্যা তস্যামাদধীত।
আগ্নেয়ৈবৈতৎ প্রজাঃ পশূন্ প্রতিতিষ্ঠতি।

ঐ অধ্যায়েরই স্থানান্তরে—

"তস্মান্ন নক্ষত্রমাদধীত।"

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, শতপথ ব্রাহ্মণের পূর্ব্বভাগে নক্ষত্রবিশেষে অগ্ন্যাধান করিতে বলা হইয়াছে; কিন্তু এখানে, উত্তর শতপথে নক্ষত্র-বিশেষে আধান করিতে স্পষ্টাক্ষরেই নিষেধ করা হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, বৈশাখ মাসেরও উল্লেখ দেখা যাইতেছে। বেদের মন্ত্রভাগে বৈশাখাদি মাসের সংজ্ঞা কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না—ব্রাহ্মণ ভাগের প্রাচীন অংশে ঐ সকল নাম নাই। কাজেই উত্তর শতপথকে পূর্ব্ব শতপথের বহু পরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। ঋগ্বেদীয় কৌষীতকী ব্রাহ্মণের শেষাংশের পৌষ ও মাঘ মাসের অমাবস্যার উল্লেখ দেখা যায়। "পঞ্চবিংশ" ব্রাহ্মণে—

"দুষ্যং বা এতৎ সাংবৎসরিকং যৎ ফাল্গুনঃ"। ৫।৯।১

ফাল্গুন মাসের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল নাক্ষত্র-সৌর মাসের প্রচার আমাদের দেশে কিরূপে হয়, তাহার বিচার করিয়া ৺শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত মহোদয় দেখাইয়াছেন, খ্রীষ্টপূর্ব্ব দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে চৈত্রাদি মাসের নামানুসারে কাল-গণনা করিবার পদ্ধতি এ দেশে প্রচলিত হইয়াছিল। এই কারণে, শতপথ, কৌষীতকী ও পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের যে সকল অংশে চৈত্রাদি মাসের সংজ্ঞা পরিদৃষ্ট হয়, সেই সকল অংশ খ্রীষ্টপূর্ব্ব দুই সহস্র হইতে ১৫ শত অব্দের মধ্যে কোনও সময়ে রচিত হইয়াছে বলিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয়ের মতে খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ [illegible]

গ্রন্থ-রচনা-কালের শেষ সীমা। উহার আরম্ভ বা পূর্ব্বসীমা খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৮শ শতাব্দী।

উপনিষৎ কাল।

ফল কথা, খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৮শ শতাব্দী হইতে হইতে খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দ পর্য্যন্ত কালকে মূলতঃ ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ-রচনা ও সঙ্কলনের কাল নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থসমূহের শেষাংশ আরণ্যক ও উপনিষদ নামে প্রসিদ্ধ। শতপথ ব্রাহ্মণের শেষ বা ১৪শ কাণ্ডটি বৃহদারণ্যকোপনিষদ নামে ও সামবেদীয় ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের শেষাংশ ছান্দোগ্য উপনিষদ নামে পরিচিত। সুতরাং ব্রাহ্মণ কালের শেষ ভাগকেই "উপনিষৎকাল" নামে অভিহিত করিতে পারা যায়। উক্ত শতপথের প্রথম অধ্যায়েই বেদান্ত শব্দের পুনঃপুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া মূলতঃ ১৮০০ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে উপনিষৎ সঙ্কলন কালের আরম্ভ ও ১৪০০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে উহার শেষসীমা নির্দ্দেশ করিতে হয়। এই কালের মধ্যে অধিকাংশ প্রাচীন উপনিষদ সংকলিত হইয়া ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহের শেষাংশে সংযোজিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ব্রাহ্মণ-কাল ও উপনিষৎ-কালকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বা পরস্পর-নিরপেক্ষ যুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মতে ব্রাহ্মণকালে বৈদিক যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডেরই বাহুল্য ছিল; পরে উপনিষৎ-কালে কর্ম্মকাণ্ডের অসারতা আর্য্য-মনীষিগণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন এবং তাহারই ফলে ঔপনিষদিক মতের প্রচার হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই মত এ দেশের অনেক পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ীর নিকট সমাদৃত হইয়াছে, দেখা যায়। কিন্তু কিঞ্চিৎ প্রণিধানপূর্ব্বক বিচার করিলে এ মত প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ, আমরা ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ও ঐ সংহিতার প্রায় সর্ব্বত্রই ঔপনিষদিক মতের সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাই। ঐরূপ নিদর্শন যেখানে যেখানে পাওয়া গিয়াছে, সেই সেই স্থানেই রমেশ বাবু স্বকৃত ঋগ্বেদানুবাদের পাদটীকায় বলিয়াছেন, ঐ সকল অংশ পরবর্ত্তী কালে বা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে রচিত হইয়াছে। কারণ, তাঁহার মতে অতি প্রাচীনকাল বা বৈদিক-কালের প্রথম ভাগে আর্য্যঋষিগণ জড়োপাসক ছিলেন; পরে কালক্রমে তাঁহাদের চিত্তক্ষেত্রে এই সমগ্র জড়-জগতের কারণস্বরূপ এক ঐশী শক্তির অস্তিত্ব জ্ঞান সমুদ্ভূত হয়। এই মত ক্রম-বিকাশবাদের অনুকূল, সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল ক্রমবিকাশবাদের উপর নির্ভর করিয়া বেদসংহিতার ব্রহ্মপ্রতিপাদক অংশগুলিকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের রচনা বলিয়া নির্দ্দেশ করা সকল সময়ে নিরাপদ বলিয়া মনে হয় না। তদপেক্ষা অধিকারিভেদে এরূপ মনোভাবের তারতম্য ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করাই আমরা অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে করি। এই অনুমানের সমর্থনে বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ও প্রজাপতির রচিত দুইটি সূক্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি প্রথম মণ্ডলের প্রথম দশটি সূক্ত ও নবম মণ্ডলের প্রথম সূক্তে অগ্নি, ইন্দ্র, অশ্বিযুগল,

বরুণ, বায়ু, সোম প্রভৃতি দেবতার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্তুতি করিয়াছেন—ঐ সকল স্তুতিতে "এক ব্রহ্ম ভাবের" কোনও স্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু সেই মধুচ্ছন্দার ভ্রাতা (বিশ্বামিত্রের অপর পুত্র) প্রজাপতির রচিত সূক্তে (রমেশ বাবুর মতেও) "প্রকৃতির কার্য্যপরম্পরার ও দেবগণের কার্য্যের ঐক্য" ও "এক ঈশ্বরের অনুভব" সঙ্কটিত হইয়াছে। (তৃতীয় মণ্ডলের ৫৫ সূক্ত ও টীকা দেখুন এইরূপ আরও উদাহরণ দেখান যাইতে পারে।

ফল কথা, সকল সমাজেই জ্ঞানিগণ ঐশ্বরিক তত্ত্ব নিরূপণ বিষয়ে জনসাধারণের অপেক্ষা অগ্রগামী হইয়া থাকেন। বৈদিক কালীন আর্য্যসমাজে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবে কেন? সে সময়ের জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ঔপনিষদিক পরমার্থ তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছিলেন; কিন্তু সাধারণ জনগণের মধ্যে সে ভাবের বহুল প্রচার ছিল না, এখনও নাই, ইহাই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের চিন্তা-প্রণালী ও ইংলণ্ডের সাধারণ গ্রন্থকারদিগের চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে বহুল পার্থক্য বিদ্যমান সত্ত্বেও যখন তাঁহাদিগের সাময়িকত্বে অবিশ্বাস করি না, তখন ঋক্‌সংহিতার ব্রহ্মবাদী ঋষিগণকে বহুদেবোপাসক কর্ম্মকাণ্ড নিরত ঋষিগণের সাময়িক বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইব কেন? কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অধিকারিভেদ স্বীকার করেন না। এই কারণে তাঁহারা বৈদিক গ্রন্থকলাপের সময়-নির্ণয় প্রসঙ্গে পরস্পর-নিরপেক্ষ যুগ-পরম্পরার কল্পনা করিয়া থাকেন। ফলতঃ এরূপ কল্পনা নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তিমূলক, সন্দেহ নাই।

ঔপনিষদিক পরমার্থতত্ত্বের সুস্পষ্ট উল্লেখ ঋক্‌সংহিতার বহু স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা উপরে যাহাকে উপনিষৎকাল বলিয়াছি, সে কালের বহু পূর্ব্বে ঔপনিষদিক ভাবসমূহ গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়াছিল, দেখা যায়। শতপথ ব্রাহ্মণের সাময়িকত্ব বা তদপেক্ষাও প্রাচীনতর পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ী সূত্রে উপনিষৎগ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা;—

"জীবিকোপনিষদাবৌপম্যে।" ৪।৩।৯৯

এই সূত্র হইতে অনুমিত হয় যে, পাণিনির সময়ে বা খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৪শ কি ২৫শ শতাব্দীতে উপনিষৎ তুল্য গ্রন্থ রচনা করিয়া কেহ কেহ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। পাণিনি যে "পারাশর্য্য প্রণীত ভিক্ষু সূত্রের" (৪।৩।১১০) উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান বেদান্ত-দর্শনের বীজভূত গ্রন্থ বলিয়াই মনে হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে যে নিরুক্তকার যাস্ক পাণিনিরও পূর্ব্ববর্ত্তী, সেই যাস্ক প্রণীত নিরুক্তে "ইত্যুপনিষদবর্ণো ভবতি (৩।২।৬) ইত্যাকার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উপনিষদ ভাবে যাহা বর্ণিত হইয়াছে ("উপনিষদ ভাবেন বর্ণ্যতে") তাহাকেই এখানে "উপনিষদবর্ণ" বলা হইয়াছে। সুতরাং নিরুক্তকারের সময়েও উপনিষৎ ছিল বলিতে হয়। ফল কথা, উপনিষৎ সমূহ অতীব প্রাচীনকালেই আর্য্যসমাজে সমাদৃত হইয়াছিল। তবে আমরা এই প্রস্তাবে উপনিষৎকাল বলিয়া যে যুগের উল্লেখ করিয়াছি, সেই যুগে উপনিষৎগুলি বর্ত্তমান আকারে

সংকলিত হইয়া ব্রাহ্মণগ্রন্থ সমূহে পরিশিষ্ট রূপে সংযোজিত হইয়াছে—এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে। অবশ্য এ কথা প্রাচীন উপনিষৎ সমূহের সম্বন্ধেই প্রযুজ্য। পরবর্ত্তী-কালে অনেক কৃত্রিম উপনিষদেরও সৃষ্টি হইয়াছিল। পাণিনির সময়েও উপনিষদ্‌বৎ গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল।

নিরুক্তকার যাস্কের আবির্ভাবকাল।

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্রে যাস্কের উল্লেখ দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা নিরুক্তকার যাস্ককে পাণিনির পূর্ব্বগামী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীনকালে যাস্কনাম-ধারী একাধিক আচার্য্য বিদ্যমান ছিলেন, দেখা যায়। শতপথ ব্রাহ্মণের শেষাংশে যে বংশ-বর্ণনা আছে, তাহাতে একজন যাস্কাচার্য্যের নাম পাওয়া যায়। তিনি মধুবিদ্যার একজন প্রাচীন উপদেষ্টা বলিয়া ঐ স্থানে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। মধুবিদ্যা অধ্যাত্ম-বিদ্যার নামান্তর। ঐ মধুবিদ্যার আচার্য্য যাস্ক উত্তর শতপথকারের প্রায় ২৬ পুরুষ পূর্ব্বতন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ছন্দোগ্রন্থের আচার্য্যগণের নামোল্লেখকালেও কোনও কোনও স্থানে একজন যাস্কের নাম পাওয়া যায়; যথা—

"উরো বৃহতী যাস্কস্য"—পিঙ্গল ৭।১০

কিন্তু যাস্কের নিরুক্ত গ্রন্থে "উরোবৃহতী"-বিষয়ক কোনও উল্লেখ না থাকায় অনুমিত হয় যে, পিঙ্গলোক্ত যাস্ক আমাদের সুপরিচিত নিরুক্তকার হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। বাজসনেয়ী সংহিতার ভাষ্যকার উবটাচার্য্য বহ্বৃক্ প্রাতিশাখ্যের তৃতীয় সূত্রের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

"তথা সর্ব্বৈঃ ছন্দোবিচিত্যাধিভিঃ পিঙ্গল যাস্কসৈতব প্রভৃতিভিঃ যৎসামাম্নায়েনোক্তংলক্ষণম্"—

সুতরাং উবটাচার্য্যের (১০৩৫ খ্রীঃ) মতে অনেক ছন্দঃশাস্ত্র প্রণেতারও নাম যাস্ক ছিল। শৌনকীয় প্রাতিশাখ্যের এক স্থলে "ইতি বৈয়াঘ্রঃ" এইরূপ প্রয়োগ দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা নিরুক্তকার যাস্ককে শৌনকাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা "বৈয়াঘ্র" পদের অন্তর্গত "বৈ"টিকে স্বতন্ত্র উপসর্গ পদরূপে গ্রহণ করিয়া ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যাচার্য্য উবট বলেন—"বৈয়াঘ্র একজন আচার্য্যের নাম।" পক্ষান্তরে প্রাতিশাখ্য যে প্রসঙ্গে বৈয়াঘ্র পদের উল্লেখ করা হইয়াছে, সে প্রসঙ্গও যাস্ককৃত নিরুক্তের কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। কাজেই প্রাতিশাখ্যোক্ত "বৈয়াঘ্র" যদি বৈ×যাস্কও হন, তথাপি তাঁহাকে নিরুক্তকৃৎ বলিয়া স্বীকার করিতে বিধা জন্মে।

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্রে "যস্কাদিভ্যো গোত্রে" (২।৪।৬৩) ইত্যাদি উল্লেখ দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, নিরুক্তকার যাস্ক পাণিনির পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু পাণিনীয় সূত্রে কেবল "যস্ক" গোত্রীয় দিগকে "যাস্ক" বলা হইয়াছে। গোত্রীয় বলিলে অপত্য পৌত্র প্রভৃতিকেও বুঝায়। সুতরাং ঐ সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া, যাস্কীয় নিরুক্তের সহিত পাণিনির পরিচয় ছিল বলিয়া মনে করা সর্ব্বথা সঙ্গত নহে। পক্ষান্তরে যাস্কীয় নিরুক্ত গ্রন্থে "পদঃসন্নিকর্ষঃ সংহিতা"—এই পাণিনিপ্রোক্ত সংহিতা লক্ষণ ও "পূর্ব্বাপরাণি যথোপদিষ্টং",

"আপনীকণাদিতি কণতেশ্চকর্ত্তরীতবৃত্তম্" প্রভৃতি বহুবিধ পাণিনীয় মতানুযায়ী উল্লেখ দেখিয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামাশ্রমী মহাশয় প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, যাস্ক বৈয়াকরণ পাণিনির ও তৎপরবর্ত্তী প্রাতিশাখ্যকার শৌনকেরও পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সামাশ্রমী মহাশয়ের মতে নিরুক্তকার যাস্কের আবির্ভাব-কাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব ঊনবিংশ শতাব্দী।

প্রচলিত মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে নিরুক্তকার যাস্কের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। যথা—

"যাস্কো মামৃষিরব্যগ্রো নৈমিষারণ্যবাসিষু গীতবান্।
শিপিবিষ্ট ইতিক্ষুদ্রং গুহ্যনামধরো হরিম্ ॥ ৭০ ॥
স্তুত্বা মাং শিপিবিষ্টেতি ন চক্রুর্নিষ্করাবধীঃ।
যৎপ্রসাদাদধো নষ্টঃ নিরুক্তমভিজগ্মিবান্ ॥ ৭১ ॥

৩৪২ অধ্যায়।

ইহা অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। শান্তিপর্ব্বের এই অংশ যদি ব্যাস প্রণীত মূল ভারতসংহিতার অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা হইলে নিরুক্তকার যাস্ককে যুধিষ্ঠিরাদির অপেক্ষাও প্রাচীনতর বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ৩৪০তম অধ্যায়ে যে প্রকারে নৈমিষারণ্যবাসী শৌনকাদি ঋষির দ্বারা সৌতির নিকট এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে উহা সৌতি দ্বারাই মহাভারতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শান্তিপর্ব্বে প্রক্ষিপ্ত অংশের যেরূপ বাহুল্য, তাহাতে এই পর্ব্বোক্ত উল্লেখের উপর নির্ভর করিয়া কোনও ঘটনাকে ভারত যুদ্ধের সমকালবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিতে বড়ই সঙ্কোচ জন্মে। পক্ষান্তরে, নিরুক্তবৃত্তিকার দুর্গাচার্য্য (খ্রীষ্টীয় ১২শ বা ১৩শ শতাব্দী) যাস্ক-কৃত "এষ চ আখ্যান-সময়ঃ" (৭।২।৩) এই নিরুক্তাংশের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, "ভারতে ব্যাখ্যান-সময়ে এষ এষ সিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ"। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, দুর্গাচার্য্য, আচার্য্যকে ভারত যুদ্ধের পরবর্ত্তী বলিয়াই যেন মনে করিতেন।

দেখা গেল, যাস্ক নামে একাধিক আচার্য্য পুরাকালে এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই তথ্যের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে নিরুক্তকার যাস্ক খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫ম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। পাণিনিকে খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর লোক মনে করিয়াই প্রথমে যাস্কের এই সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। তাহার পর গোল্ড-ষ্টুকার পাণিনিকে শাক্য সিংহের জন্মের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। কিন্তু যাস্কের সময় সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা পুনর্ব্বিচার করা আর প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন নাই, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। সে যাহা হউক, আমরা দেখিয়াছি, যাস্ক নামে একাধিক ব্যক্তি ছিলেন। তন্মধ্যে উত্তর শতপথকারের ২৬ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী, মধু-বিদ্যার উপদেষ্টা যাস্কই বোধ হয়, সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। নিরুক্তকার যাস্ককে তাঁহার বহুপরভবিক বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। সামশ্রমী মহাশয় খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৯শ শতাব্দীতে তাঁহার যে আবির্ভাবকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত মনে হয় না। নিরুক্ত-পরিশিষ্টের "নমঃ পারস্করায়, নমো যাস্কায়" ইত্যাদি উক্তি হইতে তিনি অনুমান করেন যে, নিরুক্তকার যাস্ক গোত্রীয়, পারস্কর দেশীয় ও পারস্কর বংশীয় যজুর্ব্বেদী আচার্য্য ছিলেন।

যাস্কই বোধ হয়, বেদের সর্ব্বশেষ নিরুক্তকার। তাঁহার গ্রন্থে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রায় ১৭ জন বেদব্যাখ্যাতার নাম ও মত উল্লিখিত দেখা যায়। সে নামগুলি এই ১। অগ্রায়ণ, ২। আগ্রায়ণ, ৩। ঔদুম্বরায়ণ, ৪। ঔপমন্যব, ৫। ঔর্ণবাভ, ৬। কাথক্য, ৭। ক্রৌষ্টুকি, ৮। গার্গ্য, ৯। গালব, ১০। চর্ম্মশিরাঃ, ১১। তৈটিকি, ১২। বার্ষ্যায়ণি, ১৩। শাকটায়ন। ১৪। শাকপূণি, ১৫। শাকল্য, ১৬। স্থৌলাষ্ঠীবি, ১৭। মৌদ্গল্য। এতদ্ভিন্ন স্থানে স্থানে পরিব্রাজক, ঐতিহাসিক, যাজ্ঞিক, নৈদান ও বৈয়াকরণদিগের মতও উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

ভ্রান্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

'হা বাবা, বল,' প্রৌঢ়া জননী অন্নপূর্ণা, কিশোর পুত্র কিশোরীমোহনের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতেছেন, "হা বাবা, বল তোর 'ভাল দিদি'কে কি বলব বল?"

মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া কিশোরী কিঞ্চিৎ তন্দ্রাভিভূত হইয়া জননীর কথার কোনটা শুনিয়া কোনটা বা না শুনিয়া,—কেবল, "হা হু" উত্তর দিয়া যাইতেছিল; তাহার পিঠের উপর ঝুঁকিয়া জ্ঞাতি ভগ্নী সাতবছরের বালিকা প্রফুল্ল কচি কচি হাত দু'খানি দিয়া দাদার ঘামাচি মারিতেছিল, আর 'দাদা, তোমার গায়ে এত ঘামাচি কেন? ওটা পাকা, এটা কাঁচা' ইত্যাদি কত মন্তব্য জাহির করিতেছিল।

মা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কই কিছু উত্তর ত দিলিনে! কিশোরীর তন্দ্রালস চক্ষু তখন মুদিয়া আসিতেছিল, সে চক্ষের পাতা না খুলিয়াই দুষ্টামির একটু মৃদু হাসি হাসিয়া বলিল, "কি উত্তর দিব, বল"।

মা একমুখ হাসিয়া বলিলেন, 'খ্যাপামি দেখ একবার, তুই কি উত্তর দিবি, তা আমি কি বলব।' কিন্তু সে কথাটা কিশোরীর কাণে শ্রব পৌঁছিল কি না সন্দেহ, কারণ কিশোরী ক্রমে তন্দ্রাভিভূত হইতেছিল' সেই সময়ে কয়েকজন প্রতিবেশিনী সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন! গৃহিণী অন্নপূর্ণা সকলকে আদর-সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া বসিতে বলিলেন। আগন্তুক মহিলাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বর্ষীয়সী কিশোরীর "ভাল দিদি" এবং অন্নপূর্ণার জ্ঞাতি সম্বন্ধে খুড়-শাশুড়ী, তিনি অন্নপূর্ণা দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কি গো বৌমা বুড়ো খোকাকে কোলে নিয়ে কি কথা হচ্ছে!" অন্নপূর্ণা সহাস্য বদনে কি উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, পশ্চাৎ হইতে অন্নপূর্ণার যাতা সম্বন্ধে,—কোন মহিলা বলিয়া উঠিলেন, "কেন গো আমাদের ছেলে বুড়ো হ'তে যাবে কেন? অমন সোণার চাঁদ ছেলে কি তোমাদের আছে?" বর্ষীয়সী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন —"না মা আমরা আর কোথা পাব বল, তোমরা বাপের বাড়ী হতে—এ" কিন্তু তাঁর আর বলা হইল না—অকস্মাৎ কে একজন তার মুখ চাপিয়া ধরিল, কাণে কাণে বলিল "ছেলের সাক্ষাতে কি বল তার ঠিক নাই—বাহাত্তরে গিয়েছ না কি!—কাছাকাছি বটে বলিয়া বর্ষীয়সী একটু হাসিলেন, সে হাসিটুকু হয় ত অপ্রতিভের, কিন্তু অপ্রতিভ হইয়া, ভুল বুঝিয়া, সে ভুল স্বীকার করিবার পাত্র তিনি নন—একটু উচু স্বরে বলিলেন— "দেখছিস্ নে তোদের বুড়ো খোকার এখন যে অর্দ্ধেক রাত্রি!" বলিয়াই, তিনি সুর ধরিলেন—

"আয় ঘুম আয়"

তখন ঘুমপাড়ানীর গীত আরম্ভ হইল, কিন্তু বাটা ভরা পানের আশা, এবং গাভী প্রসবের পর গোবৎস পাইবার প্রলোভনেও নিদ্রাদেবী কিশোরীর চক্ষে অধিষ্ঠান হইতে পারিলেন না,—'ভাল দিদি'র পরিচিত সুকণ্ঠে—কিশোরীর কাঁচা ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গেল—নিদ্রাতুর চক্ষু কচলাইতে কচলাইতে কিশোরী তাড়াতাড়ি মাতৃ-অঙ্ক ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল "এই যে ভালদিদি, আপনারা সব কতক্ষণ। আজ অসময়ে যে!" ভাল দিদি একটু বাঁকা পথ ধরিলেন, বলিলেন "আর ভাই, আমাদের কি আর এখন সময় আছে,—এখন সব সময়ই আমাদের অসময়। তার পর তিনি অন্নপূর্ণার

দিকে একবার চাহিলেন—বলিলেন 'কি গো বৌমা, খবর কি? সে কাজের কি হলো বাছা? বালিকা প্রফুল্ল এতক্ষণ দাদার ঘামাচি মারিতেছিল, আর অবাক হইয়া হাঁ করিয়া ঠাকুরাণীদের বাক্যামৃত পান করিতেছিল,—ভাল দিদি এলোকেশী ঠাকুরাণীর মুখে সে কাজের কি হইবে ইত্যাদি শুনিয়া, সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না,—হাসি মুখে বলিয়া উঠিল,

"সে কার্য্যের কি হইল দাস—? চরণে ধরিতে চৈতন্য পাইল—উঠিয়া খাইল ঘাস,—

বালিকার কথায় গৃহ মধ্যে হাস্যের একটা তরঙ্গ খেলিয়া গেল, কারণ মেয়েরা এ কথাটার মানে সকলেই জানিত! বড় আশা করিয়া কোন কাজ করিতে গিয়া বিফলমনোরথ হইলে মেয়েরা প্রায় এই ছড়াটিই কাটিয়া থাকেন, নিশ্চিত গরুকে মৃত মনে করিয়া চর্ম্মকার বড় আহ্লাদ করিয়া চর্ম্মের আশায় কাছে গিয়া পায়ে হাত দিতে না দিতে লাফাইয়া উঠিয়া গরু ঘাসে মন দিল—প্রবাদের সংক্ষিপ্ত মূল এই, ইহা কিশোরীর জানা ছিল না, তাই সে প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসা করিল,—"উঠিয়া খাইল ঘাস কিরে"—প্রফুল্লকে কিছু বলিতে না দিয়া ভাল দিদি বলিলেন "এ কথাটা আর বুঝতে পারলে না—তবে লেখা পড়া কি শিখেছ, ছাই, সেই জন্যই তোমার পক্ষে, ঘুম হতে উঠার পর প্রফুল্ল ঘাসের ব্যবস্থা করিয়াছে, বুঝেছ—তা তাই এখন ঘাস টাস ছেড়ে, আসল কথার কি হবে বল"—কিশোরীও নিতান্ত রস হীন নয়,—এসব রসিকতা এলোকেশী ঠাকুরাণী নিতান্ত অস্থলে অর্থাৎ কি না জলে ফেলেন নাই, অনেক দিন অনেক বার এলোকেশী চিলটি কাটিয়া কিশোরীর নিকট পাটকেলটি খাইয়াছেন, কিন্তু আজ জননীর সমক্ষে এ সকল কথার উত্তর দিতে কিশোর প্রস্তুত নয়, তাই গরুড় যেমন, মহাদেবের মস্তকস্থিত সর্পের প্রভাব সহ্য করিতে বাধ্য হন—কিশোরীও তেমনই ঐ সকল বিদ্রূপ গায়ে না মাখিয়া সোজা কথায় নিতান্ত ভাল মানুষটির মত বলিল—কিসের কি হবে, ভাল দিদি?"

যা বল আর যা কও এতটা জাকামি কিন্তু এলোকেশীর অসহ্য, এলোকেশী যেন ভীমমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আসরে নামিলেন। "আচ্ছা কিশোরী তোর এত জিদ কিসের? তুই বি'য়ে করবি নে কেন বল ত? কত কষ্ট করে তোর মা তোকে মানুষ করেছে—তুই এখন একটা পাশকরা বড় ডাক্তার, আজ বাদে কাল কত রোজগার করবি,—কোথায় এখন বিয়ে করে, ঘর-সংসার পাতিয়ে, মাকে সুখ শান্তি দিবি, মার ভার কমাবি, তা নয় কেবল চালাকি! সহরে থাক্‌লেই কি মা বাপের অবাধ্য হতে হয় নাকি?"

সহরের কথা শুনিয়াই প্রফুল্ল দাদার পানে মুখ করিয়া একটি শ্লোক আওড়াইল,—

দাদা গো দাদা সহরে যাও,
তিন টাকা করে মাইনে পাও,
হেই দাদা তোর পায়ে পড়ি
বৌ এনে দাও খেলা করি!

"চুপ কর দুষ্টু, মার খাবি" বলিয়া কিশোরী প্রফুল্লের চিবুক নাড়িয়া দিলেন, কিন্তু ভবি ভুলিবার নয়! "মার খাবি" কথাটায় প্রফুল্ল ভয় পাওয়া দূরে থাক্, যেন সে আরও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, এবং দ্বিগুণ উৎসাহে আরম্ভ করিল

দাদার হাতে লাল টুকরি
ফেলে মেরেছে।
দুই দিকে দুই কাতলা মাছ
ভেসে উঠেছে।
একটা নিলে গুরু ঠাকুর—
একটা নিলে চিরে।
দাদার হবে বিয়ে;
ঝাম কুরু কুরু দিয়ে;
আমরা সবাই—নাচব খেয়ে খেয়ে!

কিশোরী প্রফুল্লকে কৃত্রিম ক্রোধ দেখাইয়া ধরিতে গেল, কিন্তু প্রফুল্ল পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক ছিল—'নাচব খেয়ে খেয়ে' কথাটার সহিত কার্য্যের সামঞ্জস্য করিয়া সে দূরে পলাইল! "ও প্রফুল্ল শোন—শোন, আর শোন, সে ততক্ষণ পগার পার!

বালিকার রকম দেখিয়া সে প্রকোষ্ঠে আবার হাস্যের রোল উঠিল! কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্য। মেঘ ভরা আকাশে যেন ক্ষণেকের জন্য বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, তার পর আবার ঘোর অন্ধকার! এলোকেশী ঠাকুরাণী, নিতান্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া মহা মুরুব্বির মত দীর্ঘ বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন—কিন্তু কিশোরীর মন সে বক্তৃতায় ভিজিল না! কিছুমাত্র টলিল না! এলোকেশী ঠাকুরাণী এবার যেন সত্য সত্যই চটিয়া গেলেন—তখন তিনি গুরু গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন "কিশোরী, তুই যত তর্কই কর, আমি নিশ্চয় বলচি, এ সব কিছু টিক্‌বে না—ছয় মাসের মধ্যে তোর বিয়ে দেব, দেব, দেব! আমার কথা যদি সত্য না হয়—" কিশোরী অতি ধীরে ধীরে বলিল, বলে যান, "তবে দেবতা মিথ্যা ভ্রমর অসতী!"—সে প্রকোষ্ঠে ২।১ জন উপন্যাসপড়া যুবতীও ছিলেন, তাঁরা সম্বন্ধে কিশোরীর ভাতৃবধূ,—কিশোরীর এই মন্তব্যে তাঁরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, কিন্তু সে হাসির বিকাশ বড় ভয়ে ভয়ে "কদাচ অধর বিনা অন্য দিকে যায় না!" এলোকেশী ঠাকুরাণী তখন নিজের কথাতেই মত্ত ছিলেন, এ দিকে তত লক্ষ্য ছিল না, বিশেষতঃ এ রহস্য বুঝিবার বিদ্যাও তাঁর ছিল না—তিনি বলিয়াই চলিলেন,—"আমার এ কথা যদি সত্যি না হয়, তবে আমি হারু বাড়ুয্যের বেটিই নই।" অন্য সময় হইলে, যাঁরা তাঁর সমবয়সী অথচ সম্বন্ধে পুত্রবধূস্থানীয়া, তাঁরা নিশ্চয়ই বলিতেন, ওটা আর বেশী কথা কি হলো, কিন্তু এই বীররসের মধ্যে কেহ আর হাস্যরসের ফোড়ন দিতে সাহস করিলেন না। এলোকেশী যখন রুদ্রমূর্ত্তিতে এ কথা বলিতেছিলেন, তখন যেন মনে হইতেছিল দুষ্মন্ত-চিন্তামগ্না শকুন্তলাকে দুর্ব্বাসা ঋষি অভিসম্পাত প্রদান করিতেছেন; কিন্তু, যাহার প্রতি এ অভিসম্পাত, তাহার উদ্বেগের লেশমাত্রও পরিলক্ষিত হইল না! কিশোরী তাড়াতাড়ি ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন, পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে! আজ যে গ্রামের স্কুল গৃহে সাড়ে ছয়টার সময় তার বক্তৃতা, বক্তৃতার বিষয় "বিবাহে ম্যালথস্!" এখন কিশোরী সে সভার সময়ে যোগ দিবার জন্য তাড়াতাড়ি এ সভা ভঙ্গ দিলেন! এখানে সকলকে আজিকার ব্যাপারে উৎসাহ-ভঙ্গ ও দুঃখিত বুঝিয়া, কিশোরী সেই তপ্ত-ক্ষেত্রকে কিঞ্চিৎ শীতল করার আশায় বলিল, "ভাল দিদি, আজ তবে ধামা চাকা রইল, কাল আবার বুঝা পাড়া হবে।"

এলোকেশী ঠাকুরাণীর আর বড় রাগ নাই, তবু তিনি এ আপাদ্রিতে প্রীতি প্রদর্শন না করিয়া একটু অভিমানের সুরেই বলিলেন "যাও যাও আর তোমার আদরে কাজ নাই!"

এলোকেশী ঠাকুরাণীর সহসা এ কি পরিবর্ত্তন। এ দিকে আঁটা আঁটি দেখিয়া তিনি কাঁদিয়া ভিজায় মাটি" লোহ হইয়া গেলেন, তাকে চেনা শক্ত! তিনি "এবে বুড়া, তবু কিছু গুড়া আছে শেষে!" (ক্রমশঃ)

[redacted] পরিকার দ্বারা মুদ্রিত

কৃষ্ণের চন্দ্রকান্তি!

রূপ এবং সৌন্দর্য্য ও যৌবনের নবীনতা সদা স্থায়ী রাখিতে চাহেন? এই সদ্গন্ধযুক্ত লেপন চর্ম্মরোগমাত্রই অর্থাৎ দাদ, চুলকানি, খামাচি, ছুলী, মেচেতা, কদাকার চিহ্ন, ব্রণ ইত্যাদি শীঘ্র আরোগ্য করিয়া চর্ম্মের কোমলতা, চাকচিক্য ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে রমণীগণের আদরের সামগ্রী। মূল্য ৸৹ আনা, ডাঃ মাঃ ।৹ আনা।

আফিম পরিত্যাগের ঔষধ।

যত অধিকদিনের আফিম সেবনকারী হউন না কেন, বিনা কষ্টে আফিমরূপ কালকূট বিষ পরিত্যাগ করিয়া শারীরিক গ্লানিশূন্য হইয়া বেশ স্ফূর্ত্তি, সচ্ছলতা এবং সতেজতা ও কান্তিপুষ্টি লাভ করিতে পারেন, অথচ কোন পীড়া হইবার সম্ভাবনা নাই। পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

কে, সি, বিশারদ,
৬৭ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

জ্যৈষ্ঠ] [২য় সংখ্যা

বঙ্গদর্শন।

(নব পর্য্যায়)

একাদশ বর্ষ।

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা
১। সামাজিক সমস্যা	৬৯	৪। বুদ্ধ-সংবাদ	৯৮
২। মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের সমাজচিত্র	৭৫	৫। মৎস্য-সমাজ	১০৬
৩। রবীন্দ্রনাথ	৯০	৬। বৌদ্ধসংঘের গঠন ও নিয়মপদ্ধতি	১১২
		৭। মানবের জন্মকথা	১২৫

এস্ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩১৮।

হিন্দুস্থান সমবায় বিমামণ্ডলীতে বিমা ও
এজেন্সির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন
শ্রীউমেশচন্দ্র চাকলাদার, বিশেষ প্রতিনিধি,
হিন্দুস্থান কার্য্যালয়—ময়মনসিংহ

রুষ-জাপান যুদ্ধের ইতিহাস।

৪৪ খানি অত্যুৎকৃষ্ট হাফ্‌টোন ছবি ও ম্যাপসহ, বহুমূল্য স্বদেশী এ্যান্টিক কাগজে অতি সুন্দররূপে মুদ্রিত প্রকাণ্ড পুস্তক। অল্প ও মৎস্যভোজী ক্ষুদ্রকায় জাপানীগণ কি অপূর্ব্ব রণকৌশলে ও বিজ্ঞানবলে অর্দ্ধ পৃথিবীর অধিপতি ও ইউরোপের সর্ব্ব প্রধান শক্তি রুষদিগকে প্রতিযুদ্ধে, জলে ও স্থলে, সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া জগতকে বিস্মিত, চকিত ও স্তম্ভিত করিয়াছেন তাহা অবগত হওয়া প্রত্যেক নরনারীর অবশ্য কর্ত্তব্য। এই পুস্তকে সার্পনেল হাই আদেল প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে যে সকল অতি ভীষণ গোলা আবিষ্কার হইয়াছে তাহার দ্বারা পোর্টআর্থার প্রভৃতি মহাদুর্ভেদ্য দুর্গসমূহ কি প্রকারে বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহা মনোমুগ্ধকর ফটোচিত্রের দ্বারা এমন সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে যে, পাঠকবর্গ যেন রুষ-জাপান যুদ্ধ প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন বলিয়া বোধ হইবে। অতি সরল ও সুমিষ্ট ভাষায় লিখিত—অল্পশিক্ষিতা স্ত্রীলোকেরাও অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন পড়িতে পড়িতে শরীর রোমাঞ্চিত হইবে। পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় জাপানিগণের অদ্ভুত বীরত্ব ও জন্মভূমির জন্য অকাতরে প্রাণদান;—ইহা যে কত কৌতূহলোদ্দীপক ও লোমহর্ষণ ঘটনায় পূর্ণ তাহা লেখনীর দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব। একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। উপহার দিবার পক্ষে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক। ইহা দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রতি খণ্ড ১৷০ টাকা। একত্র দুই খণ্ড লইলে ২৷৷০ টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

মণিপুরের ইতিহাস।

মণিপুর—চিরস্বাধীন দেশ—কি প্রকারে ইংরাজ অধিকারে আসিল—কীর্ত্তিশালী আর্য্যরাজগণের শাসন-পালন-ব্যবস্থা—নাগ কুকি প্রভৃতি জাতিগণের রহস্যপূর্ণ বিবরণ—অমানুষিক হত্যাকাণ্ড, লোমহর্ষণ ব্যাপার, যুদ্ধ, বীরশ্রেষ্ঠ টিকেন্দ্রজিতের বৃত্তান্ত, বিচার, রাজনীতির গূঢ় রহস্যাদি, সুমিষ্ট সরল ভাষায় বিবৃত—ঠিক যেন উপন্যাস পড়িতেছেন বলিয়া বোধ হইবে। ১৬ খানি অত্যুৎকৃষ্ট ছবিসহ প্রায় ১৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সুন্দর বাঁধাই, মূল্য ১৲ টাকা।

শিল্পী।

এই পুস্তকে সাবান, দীপ-শলাকা, কালী, কাঁচ এনামেলের দ্রব্যাদি, সুগন্ধি তৈল, এসেন্স, পিণ্ট ও বার্ণিশ, এনগ্রেভিং, ফটোগ্রাফিং ইলেক্ট্রোসিটি প্রভৃতি সহস্র সহস্র বিষয়ের শিক্ষাপ্রণালী অসংখ্য চিত্রের দ্বারা বিশদরূপে প্রদর্শিত ও অতি সরল ভাষায় লিখিত হইতেছে। ইহার সাহায্যে সকলেই অনায়াসে নানাপ্রকার শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিয়া অর্থোপার্জ্জন ও স্বদেশের মহোপকার সাধন করিতে পারিবেন। বঙ্গভাষায় এরূপ বিস্তৃত শিল্পগ্রন্থ আর নাই। বঙ্গের সুসন্তান শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মাগণের দ্বারা বিশেষরূপে প্রশংসিত ৯৬ পৃষ্ঠার প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা। এইরূপ ১২ সংখ্যায় ১১৫২ পৃষ্ঠার একখণ্ডের অগ্রিম মূল্য ৪৲ টাকা।

মনোমোহন লাইব্রেরী, ২ কলেজস্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা।

বঙ্গদর্শন।

সামাজিক সমস্যা।

য়ুরোপ যে পথে চলিয়া ক্রমে হায়রাণ হইয়া পড়িতেছে, সভ্যতার জটিল সমস্যার সম্মুখে দিন দিনই দিশাহারা হইয়া যাইতেছে, আমরাও কি সেই পথেই চলিব, না নূতন পথ খুঁজিয়া বাহির করিব,—এ প্রশ্নটা তুলিবার সময় আসিয়াছে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে য়ুরোপ আমাদিগকে একান্তভাবে অভিভূত করিতে পারে নাই। খৃষ্টীয়ধর্ম্মের সংঘর্ষে আসিয়া হিন্দুধর্ম্মের সনাতন মতসমূহ নিষ্প্রভ হয় নাই, বরং উত্তরোত্তরই উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। য়ুরোপীয় সামাজিক আদর্শও আমাদিগের সমাজকে একেবারে অভিভূত করিয়া তুলিতে পারে নাই মধ্যযুগের সামাজিক সংকীর্ণতা কিয়ৎ পরিমাণে নষ্ট হইয়া, বর্ত্তমান সমাজ উদারতর হইয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু সমাজের মূল ভিত্তি য়ুরোপীয় সভ্যতার আঘাতে এখনো বিশেষ ভাবে বিচলিত হয় নাই। তবে ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে অভয়পদ পাইয়াছি, সমাজ সম্বন্ধে সে পদ এখনো পাইয়াছি, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। হিন্দুর ধর্ম্ম কখনো নষ্ট হইবে না। কিন্তু হিন্দুর সমাজ কি টিঁকিয়া থাকিবে? ইহারই বিচার করা এখন আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। আর হিন্দুর সমাজই যদি একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়, তবে হিন্দুর ধর্ম্মই বা কতদিন টিঁকিয়া থাকিতে পারিবে, ইহাও ভাবিবার কথা। ধর্ম্ম প্রাণ, সমাজ তার দেহ। ধর্ম্ম কেবল কতকগুলি তত্ত্ব, কতকগুলি মত ও বিশ্বাস নহে। অনুষ্ঠান ধর্ম্মের প্রাণ অনুষ্ঠানে ধর্ম্ম আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে এই অনুষ্ঠান সামাজিক জীবনের সঙ্গে জড়িত। ধর্ম্ম ও সমাজের সম্বন্ধ আকস্মিক নহে, নিত্য; বাহ্য নহে, অন্তরঙ্গ। একের পরিবর্ত্তনে অপরের পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। একের বিনাশে অপরের স্থিতি অসম্ভব অনুষ্ঠানবিরহিত ধর্ম্ম মতরূপে, সিদ্ধান্তরূপে, তত্ত্বরূপে, দর্শনরূপে, থাকিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মরূপে থাকিতে পারে না। আর সংস্কারে ও অনুষ্ঠানে, আচারে ও নিয়মেই সমাজের প্রতিষ্ঠা। সংস্কার নাই, অনুষ্ঠান নাই, আচার নাই, নিয়ম নাই, এমন জনমণ্ডলী যদি কোথাও থাকে বা থাকিতে পারে, তারা পশুযূথের মত থাকিবে, মনুষ্য-সমাজ বলিয়া পরিগণিত হইবে না। ধর্ম্মের আদর্শেই মূলে সংস্কার-অনুষ্ঠান-আচার-নিয়মাদি ক্রমে গড়িয়া উঠে। ইহাই সমাজেরও আদর্শ হয়। ধর্ম্মের আদর্শ ও সমাজের আদর্শ, সকল সময়েই প্রায় একরূপ

হইয়া রহে। ধর্ম্ম বাহির হইতে আসে না; সমাজের প্রাণ হইতেই ফুটিয়া উঠে। সমাজ-প্রকৃতির উপরেই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয়। সমাজের প্রকৃতি যখন বদ্‌লাইয়া যায়, তখন ধর্ম্মও বদলাইতে আরম্ভ করে। সমাজের মূল যখন বিগড়াইতে আরম্ভ করে, তখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান অনিবার্য্য। সুতরাং হিন্দুর ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা যদি রাখিতে হয়, তবে হিন্দুসমাজের প্রতি উদাসীন হইলে চলিবে না। হিন্দুর সমাজ যদি হিন্দুর ধর্ম্মের আদর্শ হইতে একেবারে সরিয়া পড়ে, তবে তার ধর্ম্মও থাকিবে না, সমাজও থাকিবে না। হিন্দুর হিন্দুত্ব একেবারে এ জগতে লোপ পাইয়া যাইবে।

কিন্তু এক দিকে যেমন আমরা আমাদের ধর্ম্মকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছি, অন্য দিকে তেমনি সমাজের প্রতি ক্রমশই উদাসীন হইয়া পড়িতেছি। এ দেশে কখনো যা হয় নাই, আজ আমরা তাই করিতেছি। এ দেশে ধর্ম্ম কখনো মতবদ্ধ হয় নাই। খৃষ্টীয়ানধর্ম্ম বা মুসলমানধর্ম্মের ন্যায়, হিন্দু-ধর্ম্ম মতবদ্ধ ধর্ম্ম নহে।

বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্ত মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্ত তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

জগতের আর কোনো ধর্ম্মসাহিত্যে এমন উদার মতের প্রতিষ্ঠা দেখা যায় না। হিন্দুর ধর্ম্ম মতের ধর্ম্ম নহে, পথের ধর্ম্ম। এই পথ আচারের পথ, অনুষ্ঠানের পথ, সাধিত কর্ম্মের পথ। আচার, অনুষ্ঠান, সাধনা, কর্ম্ম, —এ সকলেরই বাঁধাবাঁধি আছে। এ সকল বন্ধন। কিন্তু হিন্দুর সাধনায় বন্ধনের ভিতর দিয়াই মুক্তির ব্যবস্থা। সাধনের অবস্থায়, সিদ্ধার্থীর জন্য, বন্ধনই বিহিত। এ সকল আচার-নিয়মের বাঁধাবাঁধির ভিতর থাকিয়া, এ সকল বিধিনিষেধের বশ্যতা স্বীকার করিয়া, চিত্তশুদ্ধি করিতে হয়। চিত্তশুদ্ধি হইলে, সেই শুদ্ধ চিত্তে সত্যের ও তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। এবং তত্ত্বসাক্ষাৎকারে যখন সাধকের

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ—

হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, সকল সন্দেহের উচ্ছেদ হয়, তখন

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি

তাঁহার সকল কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া থাকে। তখন তিনি সকল বিধিনিষেধের অতীত হন। আচার-নিয়ম, ব্রত-অনুষ্ঠান, এ সকলেই সমাজের স্থিতি। এ সকলের ভিতর দিয়াই হিন্দুকে পরমার্থ সাধন করিতে হয়। এই জন্যই হিন্দুর সমাজের সঙ্গে ধর্ম্মের এমনতর ঘনিষ্ট, এতটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। এখানে কেবল ধর্ম্মকে রাখিতে পারা যায় না। ধর্ম্মকে রাখিতে গেলে সমাজকেও রাখিতে হইবে। হিন্দুর সমাজকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া হিন্দুর ধর্ম্মকে রাখিতে পারিব, এ কল্পনাও যেন আমরা না করি।

আর কেবল হিন্দুরই কথা বলি কেন? কোথাও ধর্ম্ম সমাজকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। যেখানেই সমাজ এক পথে, এক আদর্শ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করে, আর ধর্ম্ম আর এক পথে, আর এক আদর্শ ধরিয়া রহে, সেখানেই গোল বাঁধে।

সেখানেই ধর্ম্ম ও সমাজ উভয়ই যুগপৎ ক্ষয় পাইতে থাকে। আধুনিক খৃষ্টীয় জগতে ইহা তো সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। বিশুদ্ধ খৃষ্টের আধ্যাত্মিক আদর্শের সঙ্গে বর্ত্তমান খৃষ্টীয়ান সমাজের মতিগতির কোনোওই সামঞ্জস্য নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। খৃষ্টীয় সঙ্ঘ (চর্চ্চ) এক কথা বলেন, আর খৃষ্টীয়ান সমাজ অন্য পথে চলে। গীর্জ্জার প্রতি রবিবারে ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্মরাজ্যের আলোচনা করেন, কিন্তু সপ্তাহভর, হাটে বাজারে, পথে ঘাটে, সে রাজ্যের কোনোওই সন্ধান পাওয়া যায় না। আর ধর্ম্মের আদর্শ ও সমাজের মতিগতির মধ্যে এই বিশাল বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে বলিয়া, ধর্ম্ম ক্রমশই প্রাণহীন ও সমাজ উত্তরোত্তর ধর্ম্মহীন হইয়া পড়িতেছে বিপুল খৃষ্টীয় সমাজকে সংসার একান্তই অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। এমন কি ধর্ম্মের দেহটাকেও এই সংসার অধিকার করিবার প্রয়াস পাইতেছে। চারিদিকে গির্জ্জা শূন্য হইয়া, সেকুলারিষ্ট (Secularist) বা এথিকেল (Ethical) সোসাইটির সভাগৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। ধর্ম্ম ও সমাজের এই অসামঞ্জস্য নিবন্ধন, ধর্ম্ম দৃষ্টিহীন ও শক্তিহীন, ও সমাজ শিথিলগ্রন্থী হইয়া পড়িতেছে।

য়ুরোপে চক্ষের উপরে যাহা ঘটিতেছে, অনুরূপ অবস্থাধীনে আমাদের দেশে যে তাহা হইবে না, এমন কল্পনা করা সঙ্গত ও সমীচিন নহে। হিন্দুর সমাজ খৃষ্টীয় সমাজের ন্যায় সংসারের দ্বারা একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িবে, আর লোকে এই সংসারের বস্তুতান্ত্রিকতাকেই সভ্যতার প্রশস্ত পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিবে, এই পথ ধরিয়াই চলিতে থাকিবে, অথচ হিন্দুর ধর্ম্মের হিন্দুর ও পারমার্থ পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকিবে, এও কি কখনো সম্ভব? হিন্দু চিরদিনই পরমার্থকে সংসারের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। পরমার্থকেই হিন্দু চিরকাল শ্রেষ্ঠতম দৈবসম্পদ বলিয়া জানে; সংসারকে আসুরী সম্পদ জানিয়া হিন্দু চিরদিনই তাহাকে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে। হিন্দু জানে, দৈবী সম্পৎ মোক্ষের নিবন্ধনস্বরূপা মাতা। দৈবী সম্পৎ বা পরমার্থই মোক্ষহেতু, আর সংসার বা আসুরী সম্পদ সর্ব্বদাই বন্ধহেতু। এই পরমার্থবুদ্ধিই হিন্দুধর্ম্মের প্রাণ। হিন্দুর আচার-নিয়ম, ব্রত-অনুষ্ঠান, পারিবারিক সংস্কার ও সামাজিক শাসন—সকলই এই পরমার্থবুদ্ধিকে জাগাইবার, এই অধ্যাত্মদৃষ্টিকে ফুটাইবার জন্য। যখনই সংসারের লোভ ও মোহ এই পরমার্থবুদ্ধিকে অভিভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, জীব যখনই ভগবদ্বিমুখ হইয়া পড়িয়াছে, ধর্ম্মের আদর্শ ও সমাজের মতিগতির মধ্যে যখনই বিষম বিরোধ দাঁড়াইয়াছে, তখনই সাধু-ভক্ত মহাজনে ভগবদাবেশ হইয়া, সংসারলুব্ধ সমাজকে আবার ধর্ম্মের দিকে টানিয়া আনিয়াছেন। তখনই আবার পরমার্থ সংসারের উপরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, ধর্ম্ম ও সমাজের বিরোধ খণ্ডন হইয়াছে। যুগে যুগে এইরূপেই হিন্দুর ধর্ম্ম ও হিন্দুর সমাজ উভয়ই বিপ্লব ও বিনাশের হাত হইতে বাঁচিয়াছে। যখনই হিন্দুর সমাজকে ছাড়িয়া হিন্দুর ধর্ম্ম স্বতন্ত্রভাবে আপনাকে -

রক্ষা করে নাই। এ অদ্ভুত চেষ্টা আমাদের ইতিহাসে কখনো হয় নাই।

হিন্দুধর্ম্মকে যদি রক্ষা করিতে হয়, তবে হিন্দুসমাজের প্রতি উদাসীন হইলে চলিবে না। হিন্দুসমাজের হিন্দুত্বকে বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া রাখিতে হইবে। এর অর্থ এই নহে যে আমরা যেমনটি আছি তেমনটিই থাকিব। এ জগতে এরূপ স্থায়িত্ব কুত্রাপি সম্ভবে না। জড়ের পক্ষে সাধারণ পরিমাণে এরূপ স্থায়িত্ব সম্ভব হইলেও, জীবের পক্ষে আদৌ সম্ভব নহে। স্থিতি জড়ের স্বভাব, গতি জীবের ধর্ম্ম। পরিবর্ত্তন নিসর্গের নিয়ম। জীব নিসর্গের এই নিয়মের অধীন। নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল নিসর্গের ব্যবস্থার সঙ্গে আপনার অবস্থার সামঞ্জস্য করিয়াই জীবকে জীবন ধারণ করিতে হয়। যারাই এ সামঞ্জস্য সাধনে অক্ষম হয়, তারাই জীবন-সংগ্রামে পরাভব লাভ করিয়া জীবরাজ্য হইতে সরিয়া পড়ে। মানবসমাজেও জীবের এই সাধারণ ধর্ম্ম বিদ্যমান। মানবসমাজকেও নিয়তই জগতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আপনার জীবনকে মিলাইয়া ও মানাইয়া চলিতে হয়। যে সমাজ ইহা পারে না, তার ধ্বংস অনিবার্য্য। এই অক্ষমতা নিবন্ধন প্রাচীন কালের অনেক সমাজ একেবারে বিলোপ পাইয়াছে। চারিদিগের নূতন ব্যবস্থার সঙ্গে আপনাদের অবস্থাকে মিলাইতে না পারিয়া, অনেক বর্ব্বর জাতি আধুনিক সভ্যতার সংঘর্ষে পড়িয়া নির্ব্বংশ হইয়া যাইতেছে। হিন্দু যে সর্ব্বদাই বাহিরের নূতন নূতন ব্যবস্থার সঙ্গে আপনার ভিতরকার সমাজের অবস্থাকে মিলাইয়া চলিতে পারিয়াছে বলিয়াই হিন্দু এখনো জগতে মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। হিন্দু সর্ব্বদাই বাহিরের পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আপনার সমাজের ভিতরকার ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়াছে। শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ই তার সাক্ষী। এই জন্যই হিন্দুর ধর্ম্মে বহু পন্থা, বহু সাধন, বহু শাস্ত্র, বহু ক্রিয়াপদ্ধতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই জন্যই হিন্দুর স্মৃতিও অনেক। এই জন্যই এক স্মৃতিতে যাহা বিহিত, অন্য স্মৃতিতে তাহা নিষিদ্ধ, একে যাহা নিষিদ্ধ, অপরে তাহাই বিহিত, এ সকল ভেদাভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। হিন্দু সমাজের জীবনে যুগে যুগে অশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এখনো অশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, ভবিষ্যতেও অশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিবে। আচার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তন, খাদ্যাখাদ্যের পরিবর্ত্তন, রীতিনীতির পরিবর্ত্তন, ব্যবহারিক জীবনে, কি ব্যক্তির কি সমাজের, সকলেরই পক্ষে এ সকল অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মকে রাখিতে গেলে, হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিতে হইলে, এ কথার অর্থ এই নহে যে সমাজের কোন মতই পরিবর্ত্তন করিলে চলিবে না। আমরা পরিবর্ত্তন করিতে চাই বা না চাই, চারিদিগের অবস্থার তাড়নায় সমাজ আপনিই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। এ পরিবর্ত্তনকে আটকান কাহারো সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু পরিবর্ত্তন রোধ করা অসাধ্য বলিয়া, তাহাকে নিয়ন্ত্রিত ও সংযত করিবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। যে পরি

বর্ত্তনে হিন্দুর হিন্দুত্বকে ফুটাইয়া তোলে, তাহাকেই কায়মনপ্রাণে আলিঙ্গন করিতে হইবে। যাহাতে হিন্দুত্বকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে, সে পরিবর্ত্তনের স্রোতকে বুক দিয়া, জীবনপাত করিয়াও, রোধ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। হিন্দুসমাজ যাহাতে হিন্দুত্বভ্রষ্ট না হইয়া পড়ে, সে দিকে সর্ব্বদা সজাগ থাকিতে হইবে।

আর তা' যদি করিতে হয়, তবে সকলের আগে এই হিন্দুত্ব বস্তুটা যে কি, ইহা ভাল করিয়া ধরিতে হইবে। কোনো বিষয়ের বিশেষত্ব কি জানিতে গেলে, তাহার সমগ্র ইতিহাসের আলোচনা করা চাই মনুষ্যত্ব বস্তুটা যে কি, ইহা বুঝিতে হইলে, মানুষের সমগ্র ইতিবৃত্তের আলোচনা করিতে হইবে। মানুষ ক্রমে ক্রমে কি ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে, এক দিন সে পশুর মতন ছিল, পর্ব্বতগহ্বরে কিম্বা বৃক্ষকোটরে বাস করিত, শীকার করিয়া আম-মাংসে উদর পূর্ত্তি করিত; দন্তনখাদিই তার একমাত্র অস্ত্র ছিল; ক্রমে সে সেই পাশব অবস্থা হইতে বাড়িয়া উঠিয়া, আজ সুসভ্য মানুষরূপে জগতে চমৎকার করিতেছে; এই যে মানবের যুগযুগান্তব্যাপী ইতিহাস, এই ইতিহাসের আলোচনা করিয়াই, তার ভিতরকার মনুষ্যত্ব বস্তুটা যে কি তাহাকে ধরিতে, জানিতে, বুঝিতে হয়। প্রাচীনতম বর্ব্বরতা হইতে, আজিকার শ্রেষ্ঠতম সুসভ্যতা পর্য্যন্ত মানুষের যে সমগ্র ইতিবৃত্ত, যার ভিতর দিয়া মানুষ মানুষ হইয়াছে, এই ইতিহাসের অশেষ বিবর্ত্তনের ভিতরে কোন্ বস্তুটা, কোন্ তত্ত্বটা, কোন্ ধর্ম্মটা, কোন্ গুণটা, নিরবচ্ছিন্নরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তারই সন্ধান করিতে হয়। বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে ফুল ও ফল, এ যেমন একটা বিশেষ উদ্ভিদের নিজস্ব জীবনের ইতিহাস, এ সকলের মধ্যে যেমন একটা শক্তি, একটা স্বরূপ, উত্তরোত্তর ফুটিয়া উঠে, সেইরূপ মানবের সমগ্র জীবনের ইতিহাসের ভিতর দিয়া একটা গুণ, একটা ধর্ম্ম, একটা শক্তি, একটা স্বরূপ উত্তরোত্তর ফুটিয়া উঠিয়াছে। মানুষের সকল অবস্থাতেই ইহা তার মধ্যে ছিল। এই বস্তুই মানুষকে পশুপক্ষী হইতে, বানরকিন্নরাদি হইতে, অপর সমুদায় জীব হইতে, পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। ইহাই তার মনুষ্যত্ব।

সেইরূপ যে বস্তুটা হিন্দুর সমগ্র ইতিহাসের ভিতর দিয়া, প্রাচীনতম বেদ হইতে অদ্যতন আধুনিক শাস্ত্র পর্য্যন্ত, হিন্দুর চিন্তার সমগ্র ইতিহাসের ভিতর দিয়া আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছে, সকল শাস্ত্র, সকল পন্থা, সকল বিজ্ঞান, সকল দর্শন, সকল তন্ত্র, সকল মন্ত্র, সকল ভাব ও সকল ভাবনা, সকল রীতি-নীতি, সকল আচার-নিয়ম, সকল শাসন ও সকল সংস্কার, সকল ব্রত, সকল অনুষ্ঠান, সকল সাফল্য ও সকল নিষ্ফলতা, সকল সাধনা ও সকল চেষ্টার ভিতর দিয়া, হিন্দুর জীবনে, চরিত্রে, সমাজে, ধর্ম্মে, সভ্যতায়, যে বস্তুটা জাগিয়া আছে, যে বস্তুটা ফুটিয়া উঠিয়াছে, যে বস্তুটা আপনাকে সবল ও পরিপূর্ণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছে, যাহাতে হিন্দুচরিত্রকে, হিন্দু-সাধনাকে, হিন্দুশিল্পাদিকে জগতের

অপর সকল লোকসঙ্ঘের অপর সকল সাধনা অপর সকল শিল্পসাহিত্যাদি হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে, তাহারই নাম হিন্দুত্ব, তাহাই হিন্দুর বিশেষত্ব। এই বস্তুটাই হিন্দুর সমগ্র জীবনের ও সমস্তরব্যাপী ইতিহাসের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইয়াছে। ইহাই হিন্দুত্বের নিদর্শন। ইহাই হিন্দুত্বের মাপকাঠি। ইহাই হিন্দুত্বের একমাত্র কষ্টিপাথর।

প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন এক একটা বিশেষত্ব আছে, যাহাকে আমরা তার ব্যক্তিত্ব বলি; সেইরূপ প্রত্যেক জাতিরও এক একটা বিশেষত্ব আছে, যাকে তার জাতিত্ব বলা যাইতে পারে। এই ব্যক্তিত্ব বস্তুটা জ্ঞানে বেশ ধরা যায়, কিন্তু কথায় তার অভিব্যক্তি করা তত সহজ নহে। রামও মানুষ, যদুও মানুষ। উভয়েরই মানুষের মত, একই আকারের দেহ, একই প্রকারের ভাষা, একই রূপ শরীরমনের গঠন; অথচ তারা এক নহে। রামকে দেখে যদু ভ্রম হয় না, রামের কণ্ঠে যদুর সুর বাজে না। সেইরূপ হিন্দুও মানুষ, ইহুদিও মানুষ। উভয় জাতেরই মোটের উপর বলবুদ্ধিটা, শরীরের চেষ্টা, পারিবারিক সম্বন্ধ, সমাজের শাসনসংস্কারাদিও মোটের উপর একই রকমের। অথচ এ দু'টা এক জাতি নহে, স্বতন্ত্র। কিছুকাল ধরিয়া যে হিন্দুকেও দেখিয়াছে, ইহুদিকেও দেখিয়াছে, সে এ দু'এর ভিতরে কখনো এককে অন্য বলিয়া ভ্রম করে না। যে বস্তুটার প্রকাশে হিন্দুকে লোকে ইহুদি হইতে বা জগতের অপর সকল মনুষ্যসমাজ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া জানিতে পারে,—সেই বস্তুটাই তার হিন্দুত্ব। সকল তত্ত্ববস্তুই যেমন অনুভূতিতে যতটা পরিষ্কাররূপে ধরা যায়, কথায় সেরূপ করিয়া ব্যক্ত করা যায় না, হিন্দুর হিন্দুত্ব সম্বন্ধেও তাহাই। ইহাকে অনুভূতিতে যেমন করিয়া ধরিতে পারি, বিশ্লেষণ-ব্যবচ্ছেদের দ্বারা তেমন করিয়া প্রকট করিতে পারা যায় না। কিন্তু সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই হিন্দুত্ব-বস্তুকে ভূমানিষ্ঠা বা পরমার্থনিষ্ঠা বলা যাইতে পারে।

হিন্দু আজিকার লোক নহে। দু'চার শ বৎসরে তার ইতিহাসের মাপ হয় না। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া সে এই জগতে বসবাস করিতেছে। কত পরিবর্তন, কত বিপ্লব, তার মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, ইয়ত্তা করা যায় না। আজই যে হিন্দু দুনিয়ার মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছে, এমন নহে। কত জাতের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার হইয়াছে। কত সাধনার সঙ্গে তার সংঘর্ষ হইয়াছে। জগৎকে সে কত দিয়াছে, জগতের কাছ হইতে কতই না লইয়াছে। এ দু'দিনই না হয় আমরা জাতিবর্ণের কঠোর শৃঙ্খলে আপনাদিগকে বাঁধিয়া দুনিয়া হইতে পৃথক্ থাকিবার চেষ্টা করিয়াছি। চিরদিন এমনভাবে হিন্দু কূপমণ্ডূকের মত এ জগতে বাস করে নাই। কিন্তু হিন্দু দুনিয়াকে যাই দিক্ না কেন, দুনিয়ার কাছ হইতে যাহাই লউক না কেন, কখনো এই সকল আদানপ্রদানের ভিতরে, এই সকল বিপ্লব-বিবর্তনের মধ্যে আপনার এই সনাতন ভূমানিষ্ঠাটুকু ছাড়ে নাই।

কখনো সংসারলোভে একান্তভাবে পরমার্থ-বিমুখ হইয়া পড়ে নাই, সামাজিক রীতি-নীতির পরিবর্ত্তন, আচার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তন,—এ সকল হিন্দুজীবনে নূতন ব্যাপার নহে। যুগে যুগে এ সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়া আসিয়াছে। আজও ঘটিতেছে আরো ঘটিবে। এ সকল পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। সাগরজল যেমন বাঁধা যায় না, তেমনি সামাজিক বিবর্ত্তনের বা পরিবর্ত্তনের স্রোতকেও রোধ করা সম্ভব নহে। এ বিফল প্রয়াসে শক্তিক্ষয় করাই অজ্ঞানীর চিহ্ন। পরিবর্ত্তন হইবে, পরিবর্ত্তন হউক, তাহে ক্ষতি নাই। কেবল এইটি দেখিতে হইবে, এ পরিবর্ত্তনের স্রোতে মূল ধরিয়া না টানিয়া ফেলে। ইহাতে হিন্দুর এই হিন্দুত্ব যাহাতে বিলোপ পাইয়া না যায়। বর্ত্তমানের ভাঙ্গা-গড়ার ভিতরে আমাদের সনাতন ভূমানিষ্ঠা বা পরমার্থনিষ্ঠাটুকু কিসে বাঁচাইয়া রাখিতে পারা যায়, ইহাই আজিকার ভারতের প্রধান ও বিষম প্রশ্ন। ইহাই আমাদের অতি গুরুতর, অতিশয় জটিল সামাজিক সমস্যা।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের সমাজচিত্র।

কবি মুকুন্দরামের কাব্য রসাত্মক বাক্য, এবং সেই রসাত্মক বাক্যের সৃষ্টি করিবার জন্য যে সহৃদয়তার আবশ্যক তাহার প্রচুর অধিকারই মুকুন্দরামের প্রধান গৌরব। সেই সহৃদয়তার বলে কবি যখন যে রসের অবতারণা করিয়াছেন, তখনই তাহা স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দতার সহিত প্রকটিত হইয়াছে। এই সহজ শক্তিকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার কাব্য যেন অবলীলাক্রমে, অবিরাম গতিতে নিজের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই পথে যাহা কিছু তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, সকলই কবির তুলিকাস্পর্শে উজ্জীবিত হইয়া তাঁহার কাব্যে স্থান লইয়া বসিয়াছে। সেই জন্যই মুকুন্দরামের কাব্যে আমরা তদানীন্তন সমাজের একখানি অখণ্ডিত চিত্র দেখিতে পাই। আবুল ফজেলের আইন-ই-আকবরীতে যত কথা, যত তথ্য আমরা জানিতে পারি, ততোধিক তথ্য আমরা মুকুন্দরামের চণ্ডী-কাব্য হইতে সংগ্রহ করিতে পারি। তিনি যাহা দেখিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন মায় বাজার দর পর্য্যন্ত বাদ দেন নাই। বাঙ্গালীর ঘরের কথা, তাহাদের নাম, তাহাদের আমোদ-আহ্লাদ, তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, তাহাদের আচার-ব্যবহার, তাহাদের ভোজন-শয়ন, গমনাগমন, শিক্ষা-কুসংস্কার, পূজাপার্ব্বণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলই আমরা এই কাব্য হইতে জানিতে পারি। তাই বলিয়া যে মুকুন্দরাম এই সকলের বিবরণ দিবার জন্যই উদ্যোগী হইয়া কবির পদ পরিত্যাগ করিয়া, ঐতিহাসিকের আসন গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা যেন কেহ না ভাবেন। যে সর্ব্বদর্শিত্বের প্রভাবে সেক্সপীয়র একটি অঙ্কের ও কালিদাস একটি

ধারবান মুগের সমস্ত বিশেষত্বটুকু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কবি কবিকঙ্কণ সেই গুণ-শালিত্ববশতই এই সকল বিষয়ের বর্ণনা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি তাঁহার এত স্বভাবসিদ্ধ যে সেগুলি না বর্ণনা করিলে তাঁহার মনে যেন একটা কিছুর অভাব আসিয়া পড়িত। এতদ্ভিন্ন এটাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব কবি চরিত্রাঙ্কন-ব্যপদেশে এমন অনায়াস-কৌশলের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমরা বেশ ধারণা করিতে পারি যে উহা তৎসৃষ্ট চরিত্রগুলির সম্পূর্ণতা সাধনার্থ অত্যাবশ্যক। সূক্ষ্মদর্শিতা মুকুন্দ-রামের একটি স্বাভাবিক গুণ, তাই এই সকল চিত্রে কোথাও অস্বাভাবিকতা দৃষ্ট হয় না, বরঞ্চ আমাদের মনে হয় যে এই সকল তথ্য মুকুন্দরাম যে যে স্থলে যেমন ভাবে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তেমনটি না করিলে তাঁহার কাব্যের অঙ্গহানি হইত।

ভারতচন্দ্রে কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই ইহার বিপরীত। মুকুন্দরাম যেমন স্বাভাবিকতা ও স্বচ্ছন্দতার সহিত এই সকল কথা প্রকাশ করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র তাহা পারেন নাই। অনেক স্থলে তাঁহার বিবরণ কৃত্রিম বলিয়া বিবেচিত হইবে। একটা উদাহরণ দ্বারা এই কথা পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করা যাউক। মুকুন্দরামের "চণ্ডীকাব্যে"র দুর্বলার বেসাতি ও হিসাব-প্রদান রূপান্তরিত হইয়া ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দরে" হীরা মালিনীর বেসাতি ও হিসাব-দান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুর্বলার বেসাতি ও হিসাব-দান দ্বারা দুর্বলার চরিত্রের এক অংশ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে ইহা দুর্বলার পক্ষে অস্বাভাবিক তো নহেই, পরন্তু তাহার চিত্রটি সম্পূর্ণ করিয়াছে, দুর্বলা দাসী, দাসীর কার্য্য তাহার পক্ষে যতটা স্বাভাবিক, হীরা মালিনীর পক্ষে বাজার-হাট করা ততটা নহে, তাহার বাজার করাটা এবং বেসাতির হিসাব-নিকাশ অনেকটা সখের ব্যাপার। অনেকটাই যা কেন বলি দেখিয়া মনে হয় যেন সবটাই সখের, এবং সখের কবি এই ব্যাপারটাকে যে অন্য কোনও রূপ ভাবে দেখেন নাই, তাহার জলন্ত প্রমাণ তাহার বর্ণনের ছটা। দুর্বলা তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া তাহারই অবশ্য দেয় হিসাব দিতেছে; হীরা মালিনী তাহার সখের বাজার সারিয়া সখ করিয়া হিসাব দেওয়ার ভাণ করিতেছে। আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে মুকুন্দরাম এই দুর্বলার চরিত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন কেবল দুর্বলা দাসীকে; কিন্তু ভারতচন্দ্র হীরা মালিনীকে অবলম্বন করিয়া নিজের 'কারদানি' প্রকাশ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই। কোনও একজন সুসমালোচক ভারতচন্দ্রকে তৎসৃষ্ট হীরা মালিনীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। এই স্থলে তাহার যৌক্তিকতা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে।

তাই বলিয়া আমি এমন কথা বলিতেছি না যে ভারতচন্দ্রের কাব্যে তাঁহার সময়ের সমাজ একেবারেই প্রতিফলিত হয় নাই। কবির কাব্যে তৎসাময়িক সমাজের প্রতিচ্ছবি অবশ্যই পড়িবেই পড়িবে।

এইরূপ ছবি ভারতচন্দ্রের কাব্য মধ্যে অনেক আছে। কিন্তু সেগুলি যেন বিক্ষিপ্ত-ভাবে এদিকে ওদিকে ছড়াইয়া আছে; একটা কোনও চরিত্রের বা সমস্ত কাব্যের সম্পূর্ণতা সাধনের উপলক্ষে যে সেই সকল তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নহে।

মুকুন্দরাম যাহা কিছু ঐতিহাসিক তথ্য প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা সকলই চরিত্র-সৃষ্টিসাপেক্ষে; তিনি নিজের অস্তিত্ব যতদূর সম্ভব গোপন করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার কাব্যে নাট্যকলা অত্যন্ত পরিস্ফুট। তিনি যাহা দেখাইয়াছেন তাহা কোনও একটা অপরিহার্য্য প্রয়োজনবশতঃ, অধিকাংশ স্থলেই কোনও চরিত্রের পুষ্টিসাধনোপলক্ষে তাঁহাকে যেন দেখাইতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। আমরা এই নাট্যকলার বিষয় পরে আরও কিছু বলিব, এখন মুকুন্দরাম যে সমাজের বিবরণ ব্যক্ত করিয়াছেন সেই সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থা একবার দেখিয়া লইব।

দীনেশ বাবু করিয়াছেন—"মুকুন্দরাম প্রথম শ্রেণীর চিত্রকর, কিন্তু তিনি যে সমাজের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর।" * কথাটা যেন একটু অপরিষ্কার বলিয়া মনে হয়। অন্তত দীনেশ বাবু যে তুলনা দ্বারা ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগের ঐ কথা বুঝিবার বিশেষ সুবিধা হয় নাই। যাহাই হউক কবিকঙ্কণের সময়ের বাঙ্গালী-সমাজ দোষগুণযুক্তই ছিল, এ কথা স্বীকার করিতে কোনও বাধা নাই, তবে তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর কি প্রথম শ্রেণীর, তাহার বিচারে আমাদিগের বিশেষ প্রয়োজন নাই। আমরা কিন্তু দেখিতে পাই যে সে সময়ে বাঙ্গালীজাতি একেবারে মনুষ্যত্ববিবর্জ্জিত হয় নাই, আত্মসম্মানহীন হইয়া পড়ে নাই, ধর্ম্মে বিশ্বাস হারায় নাই। যিনি পত্ত-তত্ত্বান্বেষী, তিনি কলির ধর্ম্ম কোন যুগের ধর্ম্ম, তাহার বিচার করিতে প্রবৃত্ত হউন, আমরা কেবল দেখি যে, যে ধর্ম্মই তখন প্রচলিত থাকুক, জন-সাধারণ সেই ধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিল। যা'রা করেন তাহা ভালর জন্যই করেন, এই বিশ্বাস লোকের মনে প্রবল ছিল; এবং সেই জন্য সুখে দুঃখে তাহারা মাতৃচরণে মতিহীন হইত না। আমরা দেখিতে পাইব যে মুকুন্দরামের সমগ্র কাব্য এই শক্তিপূজার মাহাত্ম্য-প্রচারই প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সুবর্ণ সূত্রবৎ তত্রস্থ পরস্পর-অসংলগ্ন উপাখ্যান-সমূহকে পরস্পরের সহিত গ্রথিত ও সংশ্লিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া বাঙ্গালী যে তখন উদ্যমহীন হইয়া পড়িয়াছিল তাহা নহে। মুকুন্দরামের অল্পপূর্ব্বেই বাঙ্গলার প্রতাপাদিত্যের অভ্যুত্থান হইয়াছিল, ইহা আমাদের মনে রাখা উচিত। ঐশীশক্তির অখণ্ড প্রতাপ স্বীকার করিয়াও বাঙ্গালী তখনও বলবীর্য্যবান্ ছিল। কালকেতু তাহার প্রমাণ। বাঙ্গালী তখন ব্যবসাবাণিজ্যে বড় ছিল, বাণিজ্যার্থে অনায়াসে দেশ ছাড়িয়া বিদেশে গতায়াত করিত, সমুদ্রপার হইয়াও অপর দেশে বাণিজ্য করিতে যাইত, আদিত্যপুরাণের দোহাই দিয়া ঘরে বসিয়া থাকিত না। সে সময়

বাঙ্গালী নিতান্ত ভীরু হইয়া পড়ে নাই, তাহার প্রমাণ শ্রীমন্তের সিংহল-যাত্রা। কিন্তু সমাজে কতকগুলি কুলক্ষণও প্রবেশ লাভ করিয়াছিল—তাহার মধ্যে প্রধান কৌলীন্য-প্রথা। এই প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া বঙ্গে ব্রাহ্মণশক্তির যথেষ্ট অপচয় হইতেছিল। মূর্খ বিপ্রের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়িয়া উঠিতেছিল—কবি তাহাদের প্রতি একটু তীব্র কষাঘাত করিতে ছাড়েন নাই—

"মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে
শিখায় পূজার অধিষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে দেব পূজা ঘরে ঘরে
চাউলের বোঝা বান্ধে টান॥
মরকা ঘরে পায় খণ্ড গোপ ঘরে দধিভাণ্ড
তেলি ঘরে তৈলকুপী ভরি।
কোথাও মাগয়া কড়ি কেহ দেয় থালিবড়ি
গ্রাম বাটী আনন্দে সাঁতরি॥"

বাঙ্গালী-চরিত্রে আর একটি দোষ প্রবেশ লাভ করিতেছিল—তাহা বৈষ্ণবতা। যদিও তখনও ইহা দ্বারা বাঙ্গালী একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে নাই, তথাপি ইহা বেশ উপলব্ধি করা যায় যে কতকপরিমাণে ইহার কুফল বাঙ্গালীর কার্য্যকলাপে বিষ উৎপাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কালকেতু অতখানি বীর্য্য প্রকাশ করিয়া শেষে স্ত্রীর কথায় যে স্বচ্ছন্দে গৃহকোণে লুকাইল, ইহাতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কবি "যথাদৃষ্ট তথালিখিত" করিয়াছেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু এ সকল দোষ আসিয়া পড়িলেও তখন বাঙ্গালীর চরিত্রে একটি বিশেষ সদ্‌গুণ ছিল—সেই গুণ আত্মসংযম। কবিকঙ্কণের কবিত্ব আত্মসংযমে প্রতিষ্ঠিত; তাঁহার চরিত্র আত্ম সংযমে গৌরবান্বিত। এতদ্ভিন্ন তাঁহার হৃদয় ভক্তিধৌত অতএব সুখে বা দুঃখে অবিচলিত। এই চরিত্র-বলে বাঙ্গালী তখনও বলীয়ান্ ছিল। সত্য বটে, মুসলমানের অদম্য প্রতাপে বাঙ্গালীর উৎসাহ সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু তখনও প্রতাপাদিত্যের বা কেদার রায়ের অভ্যুত্থান একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে নাই। তখনও বাঙ্গালী দিল্লীশ্বরের প্রচণ্ড বিক্রমকে উপহসন করিবার সাহস রাখিত। তখনও সমাজে একজন সরল ধার্ম্মিকের পক্ষে অজাতিনির্ব্বিশেষে যথেষ্ট প্রতিপত্তি পাইবার সম্ভাবনা ছিল।

শিক্ষা-দীক্ষাদি সম্বন্ধেও সমাজ তখন যথেষ্ট উন্নত ছিল। ধনীর সন্তানও গুরু-গৃহে গিয়া রীতিমত বিদ্যা শিক্ষা করিত—এ বিদ্যাশিক্ষা তখনও খাঁটি হিন্দুমতেই হইত; মুসলমান-রাজত্বের প্রভাব তখনও এতটা প্রসৃত হয় নাই, যে ফার্সী না শিখিলে চলিত না; মুসলমানের সভ্যতা ও বিলাসিতা তখনও বাঙ্গালীকে অভিভূত করিয়া ফেলে নাই। শ্রীমন্তের বিদ্যালাভের বিবরণ এইরূপ—

রচিত পঞ্জিকাটীকা আর কোষ নাটিকা
পদবৃত্তি আর ব্যাকরণ।
জানিতে শাস্ত্রের তত্ত্ব পড়িল অনেক মত
বিদ্যা বিনা নাহি অন্য মন॥
পড়িল কথক দণ্ডী করিতে কবিত্ব খণ্ডী
নানা ছন্দ পড়িল নিঙ্গল।
করি দৃঢ় অনুরাগ পড়িল তারবি মাঘ
বক্রভণে ভারবি কুন্তল॥

জৈমিনি ভারত-মত ব্যাস পরে মেঘদূত
নৈষধ কুমারসম্ভব
দিবানিশি নাহি জানি পড়ে রঘু শেতধূনি
ভাষব পাণ্ডবী অমরেব ॥
অব্যাহত বুদ্ধিপাত পড়ে দুই সপ্তশতী
পড়ে মুদ্রা মুরারি মালতী।
হিত উপদেশ কথা পড়িল বাসবদত্তা
কামন্দকী দীপিকা ভাগবতী ॥
কাব্য প্রকাশ পড়ি অভ্যাস করিল বড়ি
রত্নাবলী সাহিত্যদর্পণে।
দিবানিশি নাহি জানে পড়ে সাধু সাবধানে
প্রসন্ন ভাষব রাম ভণে ॥

স্ত্রীলোকেরাও পুরাণাদি কথা শিক্ষা করিতেন, ফুল্লরা ছদ্মবেশিনী চণ্ডীকে অনেক পৌরাণিক কথা শুনাইয়াছিলেন। খুল্লনা স্বামীর মঙ্গলকামনায় ভাগবত শুনিয়াছিলেন এবং দেখিতে পাওয়া যায় যে খুল্লনা বিদুষীসাধিনীও ছিলেন, কারণ তাঁহারই আদেশে ও আগ্রহে শ্রীমন্তের বিদ্যারম্ভ হইয়াছিল। ফলত স্ত্রীজাতিই তখনকারও বঙ্গ সমাজের উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ ছিলেন, এখনও আছেন—তবে এখন অনেক স্থানেই অনেকটা বিদেশী ভাবাপন্ন হইয়াছেন, তখন খাঁটি আর্য্যনারীই ছিলেন। স্বামী-ভক্তি, আত্মহীনতা, ধর্ম্মে বিশ্বাস ও কার্য্য-পটুতারূপ সদ্‌গুণে ভূষিতা হইয়া তখনকার রমণীসমাজ সীতা-সাবিত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া পতনোন্মুখ বাঙ্গালীজাতির গৌরব রক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু সীতা-সাবিত্রীর মত দুর্দ্দম নির্ভীকতা তাঁহাদের ছিল কি? বোধ হয় ছিল না, নচেৎ ফুল্লরা যুদ্ধোদ্যত স্বামীকে ঘরের কোণে লুকাইবার পরামর্শ দিতেন কেন? খুল্লনা শ্রীমন্তের ঐকান্তিক আগ্রহবশত তাহাকে সিংহল-যাত্রার অনুমতি দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, প্রথমে কিন্তু অনেক ওজর আপত্তি তুলিয়াছিলেন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তখনকার সমাজে ব্রাহ্মণ অনেক পরিমাণে ব্রহ্মণ্য-শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল, ব্রাহ্মণ আর তেমন শান্ত দান্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ আত্মজয়ী দেবতুল্য মনুষ্য ছিল না। গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক অনেক পরিমাণে বিপর্য্যয়গ্রস্ত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ কবি জনার্দ্দন ওঝার যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা হইতেই এ কথা সাব্যস্ত হইতেছে। ব্রাহ্মণসমাজের পতনে পবিত্রতাকল্পিণী নারীজাতিরও কিছু পতন হইয়াছিল; আদর্শহীনতা তাঁহাদের মধ্যেও ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছিল, নচেৎ পতি-নিন্দাশ্রবণে প্রাণত্যাগকারিণী সতী যে দেশের নারীর আদর্শ, সেই দেশের নারীর মুখে পতিনিন্দা বসাইতে কবি কুণ্ঠিত হইলেন না কেন? সৌভাগ্যের বিষয় তখনও কিন্তু স্ত্রীজাতি আত্মসংযম হারান নাই, দারিদ্র্য বা অন্য দুঃখকে আপনাদের সহিষ্ণুতা লোপ করিতে দেন নাই।

কিন্তু কুসংস্কার স্ত্রীজাতিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, এ কথা বলিলে অন্যায় হইবে না। আমরা যে সময়কার কথা বলিতেছি, তখন সমস্ত জগৎই বোধ হয় এমনি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। সকল দেশের স্ত্রীলোকেরাই তখন স্বামী-বশীকরণের ঔষধ পাইবার জন্য ব্যস্ত থাকিত,

লীলাবতী লহনাকে যে পতিবশীকরণের ঔষধ বলিয়া দিয়াছিল তাহা পড়িলেই, সেই সময়কার ইংরাজ কবি মিডলটনের 'Love philter'এর কথা মনে পড়িবে।

1st Witch—Here is the blood of a bat

Hecat—Put in that O put in that

2nd Witch—Here's Libbard's bane

Hecat—Put in again.

1st Witch—The juice of toad the oil of adder

2nd Witch—Those will make the yonker madder.*

Hecateএর আবহা।

লীলাবতীর Prescription ঔষধের ব্যবস্থা)

"ছিনা জোঁক আর শ্বেত কাকের শোণিত।
কালিয়া কুকুর মারি আন তার পিত॥

এইরূপ দোষে গুণে মাখামাখি হইয়াও সেসময়কার রমণীগণের চরিত্র নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ছিল না, এ কথা সকলেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

মুকুন্দরামের সমালোচনায় তাঁহার সমসাময়িক সমাজের একটি ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়া নিতান্ত অবান্তর বিষয়ে সময়-ক্ষেপ করা নহে, তাহার সমাধার্থ অধিক যুক্তি-তর্কের আবশ্যক করে না। কবিকে বুঝিতে হইলে, কাব্যের চরিত্রগুলিকে বুঝিতে হইলে সে সময়কার সমাজের অবস্থা জানা বড়ই আবশ্যক। সৌভাগ্যবশতঃ মুকুন্দরামের কাব্যে আমরা তৎকালীন সমাজের একটা অবিকল প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাই। আমরা এতক্ষণ তাহার আভ্যন্তরীণ অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। সে সময়কার আচার-ব্যবহার প্রভৃতি বাহ্য অঙ্গগুলিও কবির কাব্যে পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর কি কি আচার-পদ্ধতি ছিল, কবির সূক্ষ্ম দৃষ্টি হইতে কিছুই এড়াইয়া যায় নাই। বঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থা, বঙ্গের ধর্ম্মসম্বন্ধে মতামত, বঙ্গের জ্ঞান, উদ্যম, উৎসাহ, সকলই এই কাব্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। কবির বিশাল চিত্রপটে, ছোট-বড়, ভাল-মন্দ সকল প্রকার দৃশ্যের একত্র সমাবেশে একটি সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে; বহু দিনের পুরাতন একটি সমাজ যেন পুনরুজ্জীবিত হইয়া আমাদের নয়নের সমক্ষে দাঁড়াইয়াছে। কোনও ঐতিহাসিক কি ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী করিতে পারেন? সত্য বটে, ইহাতে কোন রাজা কতকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, কে কবে সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, এ সকল সংবাদ নাই, কিন্তু যাহাদের লইয়া ইতিহাস তাহাদিগকে, অর্থাৎ তখনকার মানুষগুলিকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি, ইহা অপেক্ষা কোন্ ইতিহাস অধিক মূল্যবান্ সংবাদ দিয়াছে? মুকুন্দরামের পুস্তক ঐতিহাসিক গবেষণাপূর্ণ নহে, তাহা কাল্পনিক সৃষ্টিমাত্র; কিন্তু এই কাল্পনিক কাহিনী হইতে আমরা যে সত্য তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারি তথাকথিত ইতিহাস হইতে তাহা পারি কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে।

* Middleton—The Witch—Act V. Sc II

"The fiction carries greater amount of truth in solution than the volume which purports to be all true. Out of the fictitious book I get the expression of the life of the time, of the manners, of the movement, the dress, the pleasures, the laughter, the ridicules of the society. The old times live again ..Can the heaviest historian do more for me?" *

কবিকঙ্কণের নিপুণ তুলিকার স্পর্শে যে সমাজের চিত্র প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার ভিতর হইতে যত সম্বন্ধে যে কয়েকটি তথ্য আমরা সংগ্রহ ক'রতে পারি, তাহা এই অবসরে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক। বলা বাহুল্য যে কবিকঙ্কণ কোনও একটা গভীর দার্শনিক উদ্দেশ্য লইয়া, বা কোনও ধর্মপ্রচারকের আসন গ্রহণ করিয়া এ সকল তথ্য পাঠকের গোচর করেন নাই। তাঁহার কাব্যের উপাখ্যান সম্পূর্ণ করিবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু তিনি করিয়াছেন, কথাগুলি যেন আপনা হইতে আসিয়া পড়িয়াছে—কিন্তু তাহা হইতেই আমরা তাঁহার সময়কার ধর্ম্মের ইতিহাস জানিতে পারি। আমরা জানিতে পারি যে সে সময় বৈষ্ণব-শাক্ত-শৈবের বিদ্বেষভাব অনেক পরিমাণে তিরোহিত হইয়াছিল, বহু বৎসর পরে ভক্ত কবি রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন—

শ্যাম শ্যামা তত্ত্ব, মহাকাল কালী
একই সকলি বুঝিতে নারি।

অশিক্ষিত কালকেতু ভক্তিবিগলিত হৃদয়ে গাহিয়াছিল—

তুমি সত্ত্ব তুমি রজ তুমি রজো গুণ,
আরাধনে হরি হর তুমি তিন জন॥

মুকুন্দরাম শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তী; শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মশিক্ষায় তখন বঙ্গদেশ প্লাবিত হইয়াছিল, মহাপ্রেমিকের প্রেমবন্যায় সুরম্য বাঙ্গলা-দেশ সর্ব্বতোভাবে সিক্ত হইয়াছিল। কবি চণ্ডীর উপাসক হইলেও তাঁহার হৃদয় এই অমৃতময় প্রেমরসে আপ্লুত হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট পরিচয় তাঁহার কাব্য মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁহার শ্রীমন্ত ও তাহার সাথী বালকগণ কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিত; নিত্যানন্দের জীবনী হইতে আমরা জানিতে পারি যে তাঁহার বাল্যকালেও ঐরূপ ক্রীড়া তাঁহার প্রিয় ছিল, এবং মহাপ্রভুর জীবনেও এইরূপ আবেশ প্রায়ই দেখা যাইত। জীবে দয়া মহাপ্রভুর প্রধান শিক্ষা; মুকুন্দরামও সেই শিক্ষা দিয়াছেন:—

শুন রে অবোধ ব্যাধ, কি তোর জীবনে সাধ
কেন কর প্রাণীবধ পাপ।
অধর্ম্ম করিয়া নিত্য, পোষ বন্ধু দারসুত
পরলোকে পাবে বড় তাপ॥

হরিনাম-মহাত্ম্য-প্রচারও চণ্ডীকাব্যে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। যাহার যে ইষ্টদেবতাতেই নিষ্ঠা থাকুক, বোধ হয় অধিকাংশ লোকেই ধর্ম্মের প্রতি হৃদয়ের সহিত আস্থাবান্ ছিল। লোকের সেই আস্থা প্রকাশ করিবার সময়ই ধর্ম্মের চিত্র কবি উদ্ঘাটিত করিয়াছেন ধর্ম্মে বিশ্বাসের

* Thackeray—English Humorists

৬

ফলে কতকগুলি সদ্‌গুণ তখনকার মনুষ্যের চরিত্রে বিরাজমান ছিল, তাহা আমরা বলিয়াছি। তাহার প্রথম আত্ম-সংযম। অশিক্ষিত ব্যাধ কালকেতুর ইহা যদি সংযম যদি আজিকার দিনে আমরা পাইতাম, তাহা হইলে বোধ হয় আমাদের অনেক দুঃখ-দুর্দশা দূর হইত।

"পর স্ত্রীরে দেখি আমি নিজ জননী।" একটি ব্যাধের হৃদয়ে যে সমাজে এমন সুন্দর এমন উচ্চ ভাব জাগিতে পারে, সে সমাজ দ্বিতীয় শ্রেণীর কি তৃতীয় শ্রেণীর তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। আমাদিগকে কালকেতুর অপূর্ব আত্ম-সংযমের ইতিহাসটি স্মরণ ক'রে রাখিতে হইবে। একটি অনিন্দ্যসুন্দরী ষোড়শী উপযাচিকা হইয়া তাহার গৃহে উপস্থিত, সে তাহাই জানে; কিন্তু সেই অপূর্বসুন্দরীর লোভ সেই অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যাধ যুবক অনায়াসে সম্বরণ করিয়া নিজের যে অপূর্ব্ব চরিত্র প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা আজ-কালকার অনেক উচ্চভাষী উচ্চশিক্ষাদর্পিত পুরাতনের প্রতি ভ্রূকুঞ্চনকারী যুবকবৃন্দের শিক্ষার স্থল। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আরও একটি সুন্দর গুণ সেই অশিক্ষিত ব্যাধের চরিত্রে বিদ্যমান ছিল—তাহা তাহার নম্রতা, অহঙ্কারের অভাব। আমরা যদি দৈবাৎ একটা ভাল কার্য্য করিয়া ফেলি, তবে তাহার প্রকাশ মাসে চতুর্দ্দিকে ঢাক বাজাইয়া বেড়াই, এবং অন্যান্য লোককে অতিশয় কৃপার চক্ষে দেখিয়া থাকি, এবং "Principle" "Duty" প্রভৃতি হাল আমদানি কথার শ্রাদ্ধ ক'রে দেশশুদ্ধ লোককে পাগল করিয়া তুলি। কিন্তু কালকেতু এমন দুরূহ আত্ম-বশীকরণ দ্বারাও গর্ব্বিত হইল না; এতদ্ভেও সে বুঝিতে পারিল না যে দেবী সে কৃপাময়ীর কৃপা লাভ করিয়াছে। "হাসোয়াহি ব্যাধ আমি অতি নীচ জাতি। মোর ঘরে কি কারণে আইলে পার্ব্বতী॥"

আমরা মুকুন্দরামের চরিত্রাঙ্কনপ্রতিভার বিষয় বলিবার সময় কালকেতুর চরিত্র বিশেষরূপে বুঝিবার চেষ্টা করিব, এখন অন্য কথা বলিবার সময়।

আমরা তখনকার সরল বিশ্বাসের ফলাফল বিচার করিতেছিলাম। তাহার দুই একটি ফল দেখাইয়াছি, আরও কিছু দেখাইতে ইচ্ছা করি। কবিকঙ্কণ আমাদের জন্য কত অমূল্য রত্ন রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদিগের দেখাইবার উদ্দেশ্য। ধর্ম্মে সরল বিশ্বাসহেতু, মায়ের বিধান সকলই মঙ্গলময়, এই ধারণা তখনকার স্ত্রীলোকের চিত্তেও স্ফূরিত হইত, এবং সেই ধারণা হইতে চিত্তে বিলক্ষণ দৃঢ়তার সঞ্চার লাভ করিয়া তখনকার লোকে দুঃখ-দারিদ্র্য, শোক কষ্ট অনেকটা অকাতরে সহ্য করিতে পারিত। তাই বলিয়া যে কেহ কাঁদিত না তাহা নহে, যে মানুষ কাঁদিতে জানে না সে মানুষ বোধ হয় মানুষই নয়। কিন্তু কাঁদিত বলিয়া তাহারা মায়ের বিচারে ভক্তিহীন হইত না, অথবা নিতান্ত মোহগ্রস্ত হইয়া মাকে ভুলিত না। তাই পুত্রবিরহিতা কাতরা খুল্লনা মাকে বলিতে পারিয়াছিল—

সেই ছিরা দিয়াছে আপনি
হাথে তুলে দিয়া নিধি পুন কেড়ে লহ যদি
তবে কি করিতে পারি আমি॥

আমিত্ব ভাব আজ কাল যেমন প্রবল, তখন তেমন ছিল না, আমার আমার করিয়া যাহারা হাহাকার করিত, তাহারা তখন একটু নিস্পৃহ ছিল বলিয়া মনে হয়।

"জান কন অন্তরা সাধুরে পিয় ভাষে।
মোর মোর বলিতে অবনী দেবী হাসে॥"

ইহার ফলে সাধুচরণে আত্মসমর্পণ—

"যেই যদি পর ভালে নিবারিতে পারি।
লক্ষ অপচয়ের ভাগী হন মহেশ্বরী॥
যেচিয়াছি আপন হস্ত চণ্ডিকার পায়।
তোমার কাড়নে কালকেতু না ডরায়॥
অন্নধান কর রায় করি নিবেদন।
অন্নময় হইলে হয় অন্নপূর্ণা মরণ॥"

ইহাই ভাঁড়ুর আত্মসমর্পণ।

ইহার ফলে কি বাঙ্গালীচরিত্রে কাপুরুষত্ব প্রবেশ লাভ করিয়াছিল? কাহারও মনে করেন যে দেবতার উপর আত্যন্তিক নির্ভরতা দ্বারা বাঙ্গালী অনেক পরিমাণে মনুষ্যত্ব হারাইয়াছিল। হয় তো সে কথা সত্য; সাংসারিক কার্য্যে অনেক সময় আত্ম-নির্ভর অপেক্ষা উপকারী তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে আত্ম-নির্ভর ভগবানের উপর নির্ভরের সহিত মিশ্রিত থাকিলেই মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ হয়। কবিকঙ্কণ পুরুষকার সম্বন্ধেও বিশ্বাসবান্ ছিলেন—

"সুবুদ্ধি পুরুষকারে দৈবকি লঙ্ঘিতে পারে।"

কিন্তু তিনি ইহাও বিশ্বাস করিতেন যে পুরুষকার সত্ত্বেও দৈবদোষে অনেক সময় লোকে বুদ্ধি হারাইয়া ফেলে, তাই যুদ্ধে সকলকে পরাজিত করিয়াও কালকেতু স্ত্রীর কথায় ঘরের কোণে লুকাইল। বাঙ্গালী তখনও একেবারে নির্ভীক বা পুরুষকার-হীন হয় নাই, তাহা ঐতিহাসিকের গবেষণা হইতেও প্রমাণ হইতেছে।

এই উপলক্ষে আমরা মুকুন্দরামের সময়কার রাজনৈতিক অবস্থাও দেখিয়া লইবার বাসনা করি। মুকুন্দরাম আকবরের রাজত্বের শেষ কালে ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বের আরম্ভে জীবিত ছিলেন বোধ হয়। তিনি রাজা মানসিংহের প্রশংসা করিয়াছেন। রাজা মানসিংহ প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায়কে দমন করিয়া বঙ্গের সুবাদার হইয়াছিলেন। অতএব তাঁহার পূর্ব্বেই অথবা সেই সময়ই এই দুই বীরপুরুষ বঙ্গগগনে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত উঠিয়াছিলেন, এবং নির্ভয় চিত্তে প্রচণ্ড মোগলশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া কতক দিনের জন্য বঙ্গদেশকে হিন্দুরাজার শাসনাধীনে আনিয়াছিলেন। বঙ্গে তখনও সাহসিকতার ক্ষমতা অপরিবর্ত্তিত ছিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য নিজ অধ্যবসায় ও বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক বাহুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া কিছু দিন বঙ্গের স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন। কালকেতুর রাজ্যপ্রাপ্তি কি এই ঐতিহাসিক ঘটনারই কবিকল্পিত প্রতিচ্ছবি নহে?

গুজরাটে কালকেতু খাত হৈল রাজা।
আর যত ভূঞা রাজা সভে করে পূজা॥
কোন রাজা সম নহে করিতে সমর।
পরাজয় পায়া রাজাগণ দেয় কর॥

আমরা জানি যে সে সময় বঙ্গে সেই মহাবীর একটা মহাশক্তির দ্বারা ছুটাইয়াছিলেন; বৈষ্ণবধর্ম্মের শান্তিময়ী প্রকৃতি বশীভূত বাঙ্গালীকে আর একবার শক্তির উপাসনায় সঙ্কল্পবিকল্প করিয়াছিলেন। কাল-

কেতুর উপাস্য দেবতাও চণ্ডী, কবি মুকুন্দরামেরও আরাধ্য দেবতা চণ্ডী, ও চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রকাশই তাঁহার কাব্যের উদ্দেশ্য। ইহাই তাঁহার কাব্যের চরম লক্ষ্য, তাঁহার কাব্য যে লক্ষ্যহীন এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারিতেছি না। তাঁহার সময়ে যে মহাশক্তির উদ্বোধন হইয়াছিল, এই কালকেতুর উপাখ্যানে স্পষ্টাক্ষরে তাহা নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ইহার ভিতর হইতেই আমরা তখনকার অনেক রাজনৈতিক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি। কেমন করিয়া সকল নূতন নগরেই মুসলমানগণ আসিয়া জুটিয়া বসিয়াছিল তাহা জানিতে পারি, কেমন করিয়া নিয়োগী চৌধুরীগণ তাহাদের মস্তক করিতেছিল তাহাও জানিতে পারি। কত দীনাবস্থ ব্যক্তি তখন নিজের উদ্যমবলে, বা বীর্য্যবলে হীনাবস্থা হইতে সমৃদ্ধ অবস্থায় উপস্থিত হইত। পশুযুদ্ধে যে একটা রাজনৈতিক ঘটনার ছায়াপাত আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু দীনেশ বাবু যে ভাবে সেটিকে বুঝিয়াছেন আমি ঠিক সে ভাবে বুঝি না। আমার বিবেচনায় কালকেতুর অভ্যুত্থানে প্রতাপাদিত্যের অভ্যুত্থানের চিত্র দৃষ্ট হইতেছে, তাঁহার অদ্ভুত বীর্য্যের কাছে অন্যান্য ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীর মস্তকাবনমন এই পশুযুদ্ধের বর্ণনা দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়াছে। কালকেতুর দ্বারা চণ্ডীর পূজা যে প্রচারিত হইয়াছিল ইহার একটা তাৎপর্য্য আছে। সে তাৎপর্য্য কি? বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুপ্রাণিত শিথিলবীর্য্য বঙ্গের সন্তানগণের মধ্যে শক্তিপূজার প্রচার প্রতাপাদিত্যই করিয়াছিলেন, অতএব আমি মনে করি যে কালকেতু ও পশুদিগের মধ্যে যুদ্ধে পশুদিগের পরাজয়ে ঐ ঐতিহাসিক ঘটনাই কবি আভাসে জানাইয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই যে এই পশুগুলি বেশ শান্তশিষ্ট হইয়া বৈষ্ণবের মত অহিংসা-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছিল—

"বাঘের খাইবে মৃগ কেশরী বারণে
তুরঙ্গ মহিষ যে সাস্তাহ এক স্থানে।
অবিরোধে গোহে থাক শশাক্ষ খটাশ।
স্মরণ করিলে দুঃখ করিব বিনাশ।

পশুরাজ্যের বর্ণনা যাহা আমরা দেখিতে পাই তাহা একটা ভগ্ন রাজার রাজ্যের ছায়াস্বরূপ। যাহাই হউক ইহা যে তাৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার এক অংশের চিত্র তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। বাঙ্গলাকে প্রথম মুসলমান রাজ্যভুক্ত করেন মানসিংহ, তৎপূর্ব্বে নামে মুসলমান রাজ্যান্তর্গত থাকিলেও, বঙ্গদেশ প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন ছিল। তাই আমরা চণ্ডীকাব্যে মুসলমানের কথা বেশী শুনিতে পাই না। কিন্তু মুসলমানের অত্যাচার যে আরম্ভ হয় নাই তাহা নহে—কবির নিজের জীবনের ইতিহাসেই সে অত্যাচার-কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। বারভূঞাগণের মধ্যেই কতকগুলি মুসলমান ছিলেন। এতৎসত্ত্বেও মুসলমান-সভ্যতায় দেশ তখনও আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে নাই ইহা নিশ্চিত। তখনও ধুতি-চাদরের আদর ছিল। তখনও মহাভারত-পুরাণের আদর ছিল। সকলের উপর প্রজার একটি মহৎ সুখ ছিল—প্রজার অন্নের সংস্থান ছিল।

ভারতচন্দ্রের সময়ও প্রজার অন্নকষ্ট দেখা দেয় নাই, দেশে তখনও অন্নের যথেষ্ট সংস্থান

ছিল। রাজনৈতিক অবস্থারও যে সবিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তাহা বলা যায় না। প্রকৃত শাসনভার দেশের ভূম্যধিকারিগণের হস্তেই ন্যস্ত ছিল, তাঁহারা নবাবকে কর দিয়াই নিশ্চিন্ত হইতেন। কিন্তু মুকুন্দরামের সময়কার বাঙ্গালীতে আর ভারতচন্দ্রের সময়কার বাঙ্গালীতে বিস্তর প্রভেদ হইয়া গিয়াছিল। "সম্ভ্রান্ত ঘরের মধ্যে মুসলমানের বিলাসিতা হিন্দুসংযমের স্থান অধিকার করিয়াছে সুতরাং তাঁহাদের স্বভাব-চরিত্র কিছু উচ্ছৃঙ্খল, ইন্দ্রিয়পরায়ণ; নিম্নশ্রেণীর লোকেরাও চরিত্রহীন, মাৎসর্য্যসম্পন্ন, ধর্ম্মের অবনত মূর্ত্তির উপাসক।" *

ভারতচন্দ্রের কাব্যেও আমরা তাঁহার সময়ের সমাজের, দেশের ধর্ম্মকর্ম্মের ও রাজনৈতিক অবস্থার বিলক্ষণ পরিচয় পাই। আমরা দেখিতে পাই যে "বঙ্গের সামাজিক প্রথায়ও মুসলমান সভ্যতা হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে। বাঙ্গালী তখন ভাষায় ও ব্যবহারে অর্দ্ধ মুসলমান। পারস্য তখন রাজভাষা—এখন ইংরাজীর যেমন কদর, পারসীরও তখন সেইরূপ। স্বয়ং কবিকেও কেবল মাত্র সংস্কৃত শিখিয়া প্রথমে হতাদর হইতে হইয়াছিল।" *

ভারতচন্দ্র নিজে নিজের বিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন,

"মানসিংহ পাতশায় হইল যে বাঙ্গী।
উচিত যে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী॥
পড়িয়াছি সেই মত জানিবারে পারি।

অন্নদা কবির গুণপণা বর্ণনকালে কহিয়াছেন :—

"ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীতশাস্ত্রের অধ্যাপক॥
পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারসী।
দয়া করি দিব দিব্য জ্ঞানের আরসী॥"

বিদ্যাশিক্ষার মত সাজসজ্জারও বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর পরিচ্ছদে হিন্দু ও মুসলমানের অপূর্ব্ব খিচুড়ি, কর্ণে কুণ্ডল বা বীরবৌলি, পরিধানে বিলাতী খেসাড, মাথায় জরকশী টীরা (পাগ্‌ড়ি ?) হীরকময় মাণিক কসসী তোরা পরিয়া, গলে ঝুক্ ঝুকি দোলাইয়া খড়্গ, চর্ম্ম ও 'লেজা তীর খঞ্জর কমোদে সুশোভিত হইয়া ঘোড়ার ছোনায় (গলায় ?) রত্নভরা খুঙ্গী পুঁথি লইয়া কবি তাঁহার সুন্দরকে বর্দ্ধমান প্রেরণ করিয়াছেন—এ পরিচ্ছদে ভারতের ভাষার মত সংস্কৃত পারস্যের অপূর্ব্ব সম্মিলন! হিন্দুর রাজসভায়ও তদ্রূপ হইয়াছে, আরজবেগী নকীব মুন্সী কোতোয়ালে ব্রাহ্মণ বন্দী বৈদ্য-রাজে রাজা বীরসিংহের সভা সমুজ্জ্বল। অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকেরা নাকে বেশর হাতে শাঁখা কঙ্কণ ও তাড়, সীমন্তে সীথি গলায় হীরার ও পলার মালা পরিয়া রক্ত বা নীল বর্ণ পট্টবস্ত্র পরিয়া পাটের মশারির ভিতর শয়ন করিয়া কৃতার্থ হইতেন। রন্ধনে তাঁহারা দ্রৌপদী ছিলেন—অন্যান্য গৃহকর্ম্মের মধ্যে রন্ধনই তাঁহাদের প্রধান সার্টিফিকেট ছিল—মহীনাদের যেমন আজকাল উল্‌বুনা ও পিয়ানো বাজান হইয়াছে—" *

আমরা যে "পোষাক" দেখিলাম তাহা "দরবেরে" পোষাক, ঘরে আসিয়া বাঙ্গালী এই দরবেরে পোষাক ছাড়িয়া ধুতি আর

* ভারতী ১২৮২ সাল

চাদর পরিয়া পান খাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিত। এই প্রকারে বাঙ্গালীর চরিত্রেও একটা বিষভাব আসিয়া পড়িয়াছিল—"দরবেরে" আর "দরওয়া"। বাঙ্গালী আর তেমন সরল ধার্ম্মিক উৎসাহশীল কূর্ম্মপটু ছিল না, তাহাদের খেলা-ধূলায়, আমোদ-আহ্লাদে একটা বিপ্রকৃষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। আগে লোকে ভারত-পুরাণাদি শুনিয়া হরিনাম শ্রবণ করিয়া, সঙ্কীর্ত্তনানন্দে যোগ দিয়া সময়ক্ষেপ করিত, এখন লোকে "বুল্‌বুলি মোরগের লড়াই দেখিয়া, তীর চালাইয়া, লাঠি খেলিয়া, উড়াপাক ঢাল খেলা ও রায়বাঁস লোফা ও মল্লদের মালসাট দেখিয়া নদীয়া শান্তিপুর হইতে সমাগত অশ্রাব্য খেঁউড় শুনিয়া ভব্যতা ও সময়ের আত্মকৃত্য করিত।"

বাঙ্গালীর বুদ্ধিও দরবেরে ও দরওয়া এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। বাঙ্গালীর "মাথা" চিরকালই বাঙ্গালীর "মাথা"—কিন্তু তখন আর বাঙ্গালীর মাথা সরল ভাবে খেলিত না। দরওয়া বুদ্ধি লইয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যার উৎসাহ দান করিতেন, প্রজার সুখের ব্যবস্থা করিতেন, সন্ধ্যাহ্নিক করিয়া, আমোদ-আহ্লাদ করিয়া, সময় কাটাইতেন। আর "দরবেরে" বুদ্ধি লইয়া পিতৃব্যকে ঠকাইয়া কৌশলে রাজা হস্তগত করিতেন; আলিবর্দ্দিকে অকূর্ম্মণ্য ভূমি দেখাইয়া রাজকর মাপ করাইতেন, রাজবল্লভের হাতে পৈতা জড়াইয়া ৫ লক্ষ টাকা ফাঁকি দিবার ব্যবস্থা করিতেন, এবং নিমকহারাম মীরজাফরের সহিত মিলিত হইয়া নবাবকে রাজ্যচ্যুত করিবার কৌশল উদ্ভাবন করিতেন। রাজনৈতিক কূটতার প্রশ্রয় বাড়িয়াছিল বলিয়া সোজা রাস্তায় চলা অনেকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। অধিকাংশ লোকই নৈতিক চরিত্র হারাইয়া, আত্মসংযম হারাইয়া তুচ্ছ ইন্দ্রিয়পরতায় গা ঢালিয়া দিয়াছিল। কবির কাব্যে যতগুলি চরিত্র আছে সকলেই ইন্দ্রিয়-সুখমুগ্ধ বিলাসপ্রিয় স্ত্রীচালিত জীব। আমরা বলিয়াছি যে মুকুন্দরামের সময় হইতেই বাঙ্গালীর চরিত্রে স্ত্রৈণতা-দোষ স্পর্শ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল—এই দোষ ভারতচন্দ্রের সময় একটা শক্ত রোগে দাঁড়াইয়াছিল বড় হইতে ছোট সকলেই এই রোগগ্রস্ত। তাহার উপর কাপুরুষতা ও অকৃতজ্ঞতা এবং উদ্যমহীনতা প্রভৃতি অনেক দোষ বাঙ্গালীর চরিত্রে আসিয়া জুটিয়াছিল। কবির ধূমকেতুর চরিত্র ও দাসু-বাসুর চরিত্রে বাঙ্গালী চরিত্রের অনেক কথা প্রকাশিত। ধূমকেতু নিজে অকর্ম্মণ্য, কিন্তু অন্যের উপর হাঁকডাকে ও অত্যাচারে বিশেষ পটু; পঁচিশ জনের সাহায্যে একজন মানুষকে বন্দী করিয়া তাহার যে আনন্দ কবি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে হাসিব কি কাঁদিব তাহা ঠিক করিতে পারি না; সে দৃশ্যটিকে পরিষ্কারে আজকালকার পুলিস-পুঙ্গবগণের বীরত্ব আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। দাসু ও বাসুর চরিত্র আরও অদ্ভুত; তাহারা আসিয়াছে প্রভুর সহিত প্রভুর উন্নতিতে কিছু লাভ করিতে। যেই প্রভু বিপদাপন্ন হইলেন অমনি তাহারা বিপন্ন প্রভুকে ছাড়িয়া পলাইবার পরামর্শ করিতেছে।

দাসু বলে বাসু ভাই পলাইয়া চল যাই
কি হইবে বিদেশে মরিলে।
বিস্তর চাকুরী পাব বিস্তর পরিব খাব
কোনরূপে পরাণ থাকিলে॥

কি সুন্দর প্রভুভক্তি! দেশ ছাড়িয়া বিদেশে উন্নতি মানসে আসিয়াছেন প্রভুর এ কি কম অপরাধ?

যে সে বামনের ছেলে, আও পাছু নাহি চলে
দিল্লী আইল রাজাই করিতে।
দুধে ভাতে ভাল ছিল, হেন বুদ্ধি কেটা দিল
পাতসার বেয়ানে আসিতে॥

তার পর সেই শৈশবের সেই ঘরের কোণের প্রতি বাঙ্গালীর যে আমাদিগের চিরপরিচিত অনুরক্তি তাহাও ইহাদের চরিত্রে বেশ ফুটিয়াছে:—

যুবতী রমণী আছে ন, রয়ে তাহার কাছে
কেন আসু রমনের সাথে
নারী ত্যজি সুখ চেয়ে তবু আসু মাটী খেয়ে
তারি ফল পাছে হাতে হাতে॥
দিবসে মজুরি করে রজনীতে গিয়া ঘরে
নারী লয়ে যে থাকে সে সুখী
নারী ছাড়ি ধন আশে যেই থাকে পরবাসে
তার বাড়া কে বা আছে দুখী॥

পুরুষ-চরিত্রের সহিত স্ত্রী-চরিত্রেরও অবনতি ঘটিয়াছিল। কিন্তু সে অবনতি অত দুর্দ্দিনেও বড় লৌকিক ঘর ছিন্ন অন্য কোনটাও বড় একটা বুঝিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। বিদ্যার চরিত্র লইয়া তখনকার স্ত্রী-চরিত্র বিচার করা ঠিক সঙ্গত নহে। যদি "বিদ্যাসুন্দর" কাব্য কবির মৌলিক রচনা হইত, তাহা হইলে বিদ্যা-চরিত্র তখনকার বড় ঘরের মেয়ের চরিত্র প্রতিবিম্বিত করিতেছে সে কথার সারবত্তা মানিতাম; কিন্তু বিদ্যাসুন্দর কাব্যে কবি পরহস্তাগত কাষ্ঠখণ্ডে কারুকার্য্যমাত্র করিয়াছেন, অতএব ইহা হইতে কবির কোনও গভীর উদ্দেশ্য করনা করা ন্যায়-সঙ্গত নহে। কবি কি সমাজের প্রতি শ্লেষ হাস্য করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন? রবি বাবু লিখিয়াছেন—"বরঞ্চ বিদ্যাসুন্দরের কবি সমাজের বিরুদ্ধে যথার্থ অপরাধী। সমাজের প্রাসাদের নীচে তিনি হাসিয়া হাসিয়া সুরঙ্গ খনন করিয়াছেন।" *

বিদ্যাসুন্দর কাব্য যদি যথার্থই "অত্যাচারী সমাজের প্রতি মানব-প্রকৃতির সুনিপুণ পরিহাস" হয়, তাহা হইলে সেই পরিহাস করিবার নিন্দা, বা প্রশংসা যাহাই বলুন ভারতচন্দ্রের প্রাপ্য নহে, কারণ ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বে অনেকে বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র কেবল পিত্তল ঝালাইয়া সোণার মত দেখিতে সুন্দর করিয়াছেন—কিন্তু বস্তুটা পিত্তল ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিদ্যাসুন্দর হইতে যদি কিছু জানা যায় তো তাহা সমাজের বিকৃতরুচি। যে সমাজে এমন কাব্যের আদর হইত, তাহার রুচি নিতান্ত কলুষিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু বিদ্যার চরিত্র সে সময়-কার সমস্ত স্ত্রী-জাতির চরিত্রের পরিচায়ক বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। অধিকাংশ সমালোচকগণ ভারতচন্দ্রের সমালোচনা করিবার সময় তাঁহার "বিদ্যা-সুন্দর" ভিন্ন অন্য কাব্যের কথা একেবারে

* প্রবাসী ৮।

বিস্তৃত হইয়া যান। বিদ্যা রাজা-রাজড়ার মেয়ে তাহার চরিত্রের মাপকাটিতে গৃহস্থ-স্ত্রীর চরিত্র মাপ করিলে চলিবে কেন? স্বীকার করি যে মুসলমান-সভ্যতার বিষময় ফলে তখন স্ত্রী-চরিত্রও কতক পরিমাণে বিকৃত হইয়াছিল, কিন্তু তখনও তো বন্ধুরা আজকালকার মত অগ্নি স্পর্শে গলিয়া যাইতেন না; তখনও ভবানন্দ রাজসিংহ পাইয়া দেশে ফিরিয়া আসিবার পরও তাঁহার পত্নী স্বহস্তে পাক করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সমাজে তখনও রাষ্ট্র ভবানীর সম্ভাবনা তিরোহিত হয় নাই, তখনও বঙ্গললনা হাসিতে হাসিতে স্বামীর চিতায় আরোহণ করিতে পশ্চাৎপদ হইত না।

"চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী স্বর্গে যাইবারে সুখী
সহমৃতা হইলা হাসিয়া।"

ভারতচন্দ্রই তো এই কথা লিখিয়াছেন, তবে সেটি ভুলিয়া গিয়া কেবল বিদ্যা বিদ্যা করিয়া অবিদ্যাগ্রস্ত হইব কেন?

তাই বলিতেছিলাম যে, রুচি যতই বিকৃত হোক, স্ত্রীচরিত্রের আদর্শ যতই খর্ব্ব হউক, সকল স্ত্রীলোকই যে বিদ্যার মত "বেহায়া" হইয়াছিল, ভারতচন্দ্রের সময়ের ঘাড়ে সে দোষটা না চাপাইলে কি চলে না? অনেকে বলিবেন যে তবে নারী-গণের পতিনিন্দা ভারতচন্দ্রে স্থান পাইল কেন? পতিনিন্দা মুকুন্দরামেও আছে, মুকুন্দরামে যাহা আছে ভারতচন্দ্র তাহা নানা উপায়ে নিজের রচনা মধ্যে টানিয়া আনিয়াছেন; এই পতিনিন্দা ব্যাপারটাও সেই অনুকরণ-প্রবণতার ফল নহে ইহা আমি বলিতে পারিলাম না। বিশেষত এই পতিনিন্দার ভিতর হইতে যে আমরা যথার্থই রমণীগণের বাক্য শুনিতে পাই তাহা নহে—মুকুন্দরামের পতিনিন্দায় একটি বাস্তব বেদনার ছায়াপাত আছে—কিন্তু ভারতচন্দ্রের পতিনিন্দায় সে মুমূর্ষুকার রমণী-গণের আর্ত্তধ্বনি নাই, কবির রসিকতা ও বিদ্রূপ করিবার ক্ষমতার পরিচয় আছে, আর আছে কবির কুৎসিত জঘন্য বিকৃত প্রিয়তার বিভৎস বিকাশ। "শাবাস হুজুগ আজব সহরে" কবি হেমচন্দ্র যে রসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নারীগণের পতিনিন্দা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এই পতিনিন্দারূপ সুদীর্ঘ পদ্যে ভারতচন্দ্রও অনেকটা সেই হাস্য রসকেই অবলম্বন করিয়াছেন এ পরিহাস-বন্যায় উকীল, পুরোহিত, বক্সী, মুন্সী কেহই বাদ যান নাই, সকলেই সেই স্রোতের মুখে ভাসিয়া গিয়াছেন। যথার্থ নিরপ্রবৃত্তির পরিচয় সুন্দরকে দেখিয়া নারীগণের চিত্তবিকৃতিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এ বিষয়টিও ভারতচন্দ্রের নিজের মৌলিক নহে, রামপ্রসাদেও ইহার অস্তিত্ব আছে। স্ত্রীচরিত্র যে অধঃপতিত হইয়াছিল তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহার জলন্ত প্রমাণ হীরার মত চরিত্রশালিনী স্ত্রীলোকের আমদানী। কিন্তু সমগ্র কাব্য হইতে আমরা যাহা বুঝি, তাহাতে মনে হয় যে এই সকল স্ত্রীলোকের কারবার বড় ঘরেই পর্য্যবসিত ছিল, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরে তাহাদের প্রবেশাধিকার ছিল না। দেখিতে পাওয়া যায় তখন অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ প্রায়ই একাধিক বিবাহ করিতেন। কবি বলিয়াছেন এ না হইলে স্ত্রীর আদর পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহাতে যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হইত,

তাহাতে স্ত্রীচরিত্রের যথেষ্ট ক্ষতি হইত, এবং সেই নিত্য কলহময় গৃহ হইতে দেবী অন্নদা যে পালাইয়া সুযোগ খুঁজিবেন তাহারই বা আশ্চর্য্য কি?

ধর্ম্মেও বিদ্বেষ ও হিংসাভাব প্রবেশ করিয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায় কবির আশ্রয়দাতা কৃষ্ণচন্দ্র শাক্ত ছিলেন ও চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতেন। কবির সৃষ্ট ব্যাস-চরিত্রে কি কৃষ্ণচন্দ্রের এই ভ্রম দূর করিবার প্রয়াস লক্ষিত হইতেছে? তা যাহা হউক কিন্তু ব্যাসচরিত্রব্যপদেশে কবি এবম্বিধ সাম্প্রদায়িক কলহের মীমাংসা ও সম্প্রদায়-গণের মধ্যে সদ্ভাব-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য ব্যাসের চরিত্র কবির দেবচরিত্রের মত অত্যন্ত খর্ব্ব হইয়াছে, কিন্তু এই ধর্ম্মসমন্বয়ের চেষ্টা কবির সহৃদয়তার পরিচায়ক। এতদ্ভিন্ন তখন মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যেও বিলক্ষণ ধর্ম্মযুদ্ধ চলিত, কবি সহজ কথায় তাহারও মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, দুরূহ বিষয় সহজ কথায় বুঝাইয়া দিবার ক্ষমতা ভারতচন্দ্রের বেশ ছিল।

"হিন্দু মুসলমান আদি জীব জন্তু যত।
ঈশ্বর সবার এক, নহে দুই মত॥
• • •
মাটি কাঠ পাথর প্রভৃতি চরাচর।
পুরাণে কোরাণে দেখ সকলি ঈশ্বর॥
তাঁহার মূরতি গড়ি পূজা করে যেই।
নিরাকার ঈশ্বর সাকার দেখে সেই॥
সাকার না ভাবিয়া যে ভাবে নিরাকার
সোণা ফেলি কেবল আঁচলে গিরা সার॥"

জাহাঙ্গীরের হিন্দুনিন্দা ও ভবানন্দের উত্তরে আমরা দুইটি কথা জানিতে পারি। প্রথম হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্মসংক্রান্ত বিদ্বেষ ও দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের নির্ভীকতা, অমন পতিতা-বস্থায়ও ব্রাহ্মণ নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী। ভারতচন্দ্রের সমগ্র কাব্য মধ্যে এই অংশ-টুকু উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত।

ভেদজ্ঞানী নহে হিন্দু অভেদ ভাবিয়া
যারে তারে সেবা দেয় ভূমে মাথা দিয়া॥

ভবানন্দের নির্ভীক উত্তরের ফলে তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা, ইহাতেও তখনকার দিনের একটা ছায়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। উদ্ধতপ্রকৃতি ও বিবেকহীন যুবক নবাব সিরাজদ্দৌলা নিজের অবিমৃষ্যকারিতার প্রশ্রয় পাইয়া যে যথেচ্ছাচারী হইয়াছিল তাহারই ফলে কয়েক বৎসর পরেই পলাশী-ক্ষেত্রে তাহার অধঃপতন।

মাঝে মাঝে এইরূপ অত্যাচার ঘটিলেও তখন পর্য্যন্ত প্রজাগণের সুখ ছিল, অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া প্রজাগণকে আত্মহারা হইতে হয় নাই। তাহারা জমীদারকে খাজনা দিয়া নিশ্চিন্ত মনে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, ঘরে ঘরে দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি পর্ব্ব আনন্দ ও উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইত; অতিথি কখনও গৃহস্থের ঘরে আসিয়া অসৎকৃত হইয়া ফিরিয়া যাইত না, অতিথিসৎকার করিবার যাহার ক্ষমতা হইত না সে আপনাকে বড়ই দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করিত। পিতামাতার প্রতি ভক্তিও তখন প্রবল ছিল। এখনকার মত অন্ধ স্বাধীনতার মোহাচ্ছন্ন হইয়া লোকে কেবল নিজের জন্য ভাবিতে শিখে নাই, বাপ মাকে তুচ্ছ করিয়া

পল্লীভক্ত হইতে শিখে নাই। দেশবাসীর নাম বাঙ্গালীর চক্ষে—

সপ্ত দ্বীপ মাঝে ধন্য ধন্য জম্বুদ্বীপ।
তাহাতে ভারতবর্ষ ধর্ম্মের প্রদীপ॥
তাহে ধন্য গৌড় যাহে ধর্ম্মের বিধান।
সাধ করি যে দেশ গঙ্গার অধিষ্ঠান॥"

কতকটা সুখের সময়, বিলাসময় হইয়াও বাঙ্গালী তখনও বীর্য্যহীন নহে। মুসলমান ও হিন্দু বহু দিনের একত্র সহবাসে অনেকটা ভাই ভাইয়ের মত হইয়াছে।

কিন্তু জাতীয় চরিত্রের এই সুখস্বচ্ছন্দতা ও অশোক স্বাধীনতার ফলে একটা অবসাদ, একটা অলস বিলাসিতা ও অকর্ম্মণ্যতা আসিয়া পড়িয়াছিল, ধর্ম্মে উচ্ছৃঙ্খলতা ও জীবনে সংযমহীনতা ও বুদ্ধিতে কূটতা মিশিয়াছিল; বাঙ্গালী উচ্চাভিলাষ ও উচ্চনীতি হারাইতে বসিয়াছিল বা হারাইয়াছিল! এই জাতীয় চরিত্র ভারতচন্দ্রের কাব্যে—নিজেরই মত বিলাস-বিভ্রমময় চটুল চারু ছন্দোবন্ধে উচ্ছৃঙ্খল হাস্যজড়িত হইয়া কতক কৃত্রিম ও কতক বিশুদ্ধভাবে, কখনও ঘরোয়া কখনও দরবারী পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে—এ অভিব্যক্তি অধিকাংশ স্থলেই আভাবে—ইহাতে সম্পূর্ণতা নাই, আত্ম-প্রকাশের আবেগ নাই, সব সময় যে নির্ভীক সত্যানুরাগ আছে তাহাও জোর করিয়া বলিতে পারি না। মুকুন্দরামের ও ভারত-চন্দ্রের সমাজ-চিত্রে এই প্রভেদ।

আমরা এই প্রবন্ধের এতদংশে অনেকটা প্রত্নতত্ত্ববিদের কার্য্য করিয়াছি, কারণ তাহা না করিলে কবিদ্বয়ের চরিত্র চিত্রাঙ্কনের বিশেষত্ব ও তারতম্য বুঝিতে পারিব না। অতঃপর আমরা পুনর্ব্বার সমালোচকের কার্য্য আরম্ভ করিব।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

রবীন্দ্রনাথ।*

আজ আমরা বঙ্গজননীর যে প্রতিভাশালী সুসন্তানের সংবর্দ্ধনার জন্য এই সভাস্থলে সমবেত হইয়াছি, বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার প্রকৃত স্থান কোথায় সে কথা নির্ণয় করিবার উপযুক্ত সময় বোধ হয় এখনো আসে নাই। এ সম্বন্ধে প্রাচীন উপমা পুনরুক্ত করিয়া বলা যাইতে পারে যে, দূর হইতে না দেখিলে পর্ব্বতের সমগ্র সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য সুস্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় না। নিকটে দাঁড়াইলে তাহার বিশাল দেহের একাংশ মাত্র দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করিয়া পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভে ব্যাঘাত জন্মায়। সেই জন্য কোন অসামান্য প্রতিভার প্রকৃত বিচার তাহার জীবিতকালে সম্ভবপর হয় না।

কিন্তু এ কথা সত্য হইলেও প্রতিভাশালী মহাপুরুষের সমুজ্জ্বল গুণরাশি সম্পূর্ণ লুক্কায়িত থাকে না। বিদ্যুতালোকের তীব্র উজ্জ্বলতা তাহার স্বরূপনির্ণয়ে বাধা প্রদান করিলেও তাহার দীপ্তির দুর্ব্বিষহ তীক্ষ্ণতাই

* গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনার জন্য রাজসাহী "সাহিত্যসম্মিলনী"র [শেষ অংশ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য

তাহার উজ্জ্বলতার পরিমাণ সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মাইয়া দেয়, বিশাল সমুদ্রের তরঙ্গায়িত নীলোচ্ছ্বাস তাহার অসীমতা ও গভীরতা সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মনোমধ্যে রাখিয়া যায়।

সেই কারণে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ গুণরাশি সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিলেও তাঁহার বিচিত্র মধুর রচনার অপূর্ব্ব রাগিণী মনোমধ্যে একটা স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যায় এবং মুগ্ধ চিত্ত আপনার অজ্ঞাতসারে সমুজ্জ্বল প্রতিমার চরণপ্রান্তে মস্তক অবনত করে!

বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বহুমুখী প্রতিভা বঙ্গসাহিত্যে আর দেখা যায় নাই। তাঁহার সর্ব্বতোপ্রসারিণী বুদ্ধি-বৃত্তির আয়ত্তের মধ্যে আসে না এমন বিষয় প্রায় দেখা যায় না। কাব্য, উপন্যাস, গল্প, নাটক, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্মতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রহসন, সমালোচনা, রাজনীতি, সমাজনীতি কিছুই তাঁহার অমৃত তুলিকার মোহন স্পর্শ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। বলা বাহুল্য এই বহুবিষয়িণী প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় দেওয়া এ ক্ষেত্রে অসম্ভব। সুতরাং আমি অতি সংক্ষেপে তাহার রচনার প্রকৃতি এবং বিশেষত্ব সম্বন্ধে ইঙ্গিত মাত্র করিয়াই অবসর গ্রহণ করিব।

রবীন্দ্রনাথ কবি বলিয়াই বঙ্গসাহিত্যে অধিক প্রসিদ্ধ। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার কাব্যই আমাদের আলোচ্য।

যে স্বাভাবিক অভিব্যক্তি বলে মানুষের হৃদয়কলিকা ধীরে ধীরে পূর্ণ বিকশিত হইয়া অবশেষে একদিন ভগবানের শ্রীচরণপ্রান্তে স্থান লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়, রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র, মধুর, সমুজ্জ্বল কবিতায় সেই স্বাভাবিক অভিব্যক্তির একটি সুমধুর ইতিহাস সুস্পষ্ট অঙ্কিত দেখা যায়। মানুষ সর্ব্বপ্রথমে জড়জগতের সঙ্গেই পরিচিত হয়। সে দেখিয়া দেখিয়া তাহারই শোভা ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়—খেলনা লইয়াই বালক আনন্দে বিহ্বল হয়। অতীন্দ্রিয় কিছুর কথা তখন তাহার মনে পড়ে না।

রবীন্দ্রনাথও তাঁহার কবিতার প্রথম স্তরে বালকের মতই আনন্দে জননী বসুন্ধরার স্নেহের দান—'কালোজলের কলধ্বনি,' 'বিমল-রজত-ভাতি', ফুলরাশির 'সুরভিসার', কলকণ্ঠ বিহঙ্গের 'সুরব সার', স্নিগ্ধ শশধরের শুভ্র 'রজত ধারা', তরুণীর 'কণ্টকবাঁকা কটাক্ষ,' মান, অভিমান, মিলন, বিরহের শত বিচিত্র রাগিণী—যাহা কিছু পাইয়াছেন, দুই হাতে কুড়াইয়া আপনার কৈশোরের কুঞ্জকুটীর সজ্জিত করিয়াছেন। ক্ষুদ্র 'পাখীর পালক', ক্ষীণ শিশিরবিন্দু, চিরম্লান ধূলিকণা কাহাকেও উপেক্ষা করেন নাই। তিনি 'হরিৎ পাতার ঘোমটা' খুলিয়া 'গোলাপবালা'র মনের কথা জানিতে চাহিয়াছেন, কমলিনীর কুঞ্জবনে অলির দৌত্য দেখিয়া পুলকিত হইয়াছেন, সন্ধ্যাকাশে 'মেঘের উপর মেঘ' 'রঙের উপর রঙ' দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গান গাহিয়াছেন, নির্ঝরের স্বপ্ন কেমন করিয়া ভাঙে, মলয় বাতাস কি গান গাহিয়া যায়, ভীরু বালিকা চুরি করিয়া চাহিতে গিয়া কেমন করিয়া হাসিয়া পলায়, প্রীতিভরে সব তত্ত্ব তন্ন করিয়া দেখিয়াছেন। এবং এমনি করিয়া

"মানব জীবন হৈতে যত আছে স্বাদ
বিশ্বের সকল পাত্র হতে
আনন্দ ভরিয়া ধারা নব নব স্রোতে"
বারবার সাধ মিটাইয়া পান করিতে চাহিয়াছেন।

প্রকৃতির প্রতি এমন প্রগাঢ় প্রেম বাঙ্গলার অন্য কোন কবির কার্য্যে দৃষ্ট হয় না। তাঁহার প্রেম এত গভীর যে তিনি প্রকৃতির সঙ্গে যেন এক হইয়া মিলিয়া যাইতে চান।

"• • • • ও গো মা মৃণ্ময়ী
তোমার মৃত্তিকা মাঝে মৃত্যু হয়ে রই
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মত।"

"• • • ইচ্ছা করে আপনার করি
যেখানে যা কিছু আছে, নদীস্রোতোনীর...
আপনারে গলাইয়া দুই তীরে তীরে
নব নব লোকালয়ে ক'রে যাই দান
পিপাসার জল; গেয়ে যাই কল গান
দিবসে নিশীথে; পৃথিবীর মাঝখানে
উদয় সমুদ্র হ'তে অস্ত সিন্ধু পানে
প্রসারিয়া আপনার ভুজ গিরিরাজি
আপনার সুচরণ রহস্যে বিরাজি।"

"নবতৃণ দলে ঘন ঘন ছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে
পুলকিত নীপ নিকুঞ্জে আজি
বিকলিত প্রাণ মেগেছে
নয়নে সজল স্নিগ্ধ মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে।"

কিন্তু মানুষ শুধু জড়জগত লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। শরতের মৃদু বাতাসে বিহগের কলকূজন শুনিতে শুনিতে মনে হয়

"আজি কে যেন গো নাই, এ প্রভাতে তাই
জীবন বিকল হয় গো!
তাই চারি দিকে যায় মন কেঁদে গায়
এ নহে এ নহে এ নয় গো!"

থাকিয়া থাকিয়া অজানা বাঁশির সুর তাহার চিত্তকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া দেয়।

"ওগো কে বাজায় (বুঝি শুনা যায়)
মহারহস্যে বসিয়া
চিরকাল ধরে গম্ভীর স্বরে
অম্বর পরে বসিয়া!
গ্রহমণ্ডল ঘুরেছে পাগল ফিরিছে
নাচিয়া চির চঞ্চল
গগনে গগনে ছুটিছে অনল
পড়িছে খসিয়া খসিয়া!"

জগতের এই বিচিত্রতা ও মধুরতার অন্তরালে কোন্ অজ্ঞাত দেবতার সুন্দর মুখের আভাস পাওয়া যায়! 'আদি জননী' ধীরে ধীরে পা টিপিয়া আসিয়া প্রিয়তমা কন্যার ক্ষুদ্র মুখ খানি মাতৃ-হৃদয়ের শুভ্র উচ্ছ্বাসে প্লাবিত করিয়া দিবার অবসরে কাণে কাণে 'অজ্ঞাত ভুবন ভ্রূণ মাঝে' থাকার অতীত কাহিনী স্মরণ করাইয়া দিয়া যান, 'চারি বছরের মেয়ে'র করুণ অনুরোধ 'যেতে নাহি দিব' শুনিতে শুনিতে প্রেম ও মৃত্যুর চিরন্তন বিবাদের কথা মনে পড়িয়া যায়— নক্ষত্রলোকের স্মিতহাস্যে যেন কোন্ গোপন রহস্যের ক্ষীণ ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়, ভ্রমরের গুঞ্জনে, বিহগের কাকলিতে প্রকৃতির গোপন হৃদয়ের সুখদুঃখগাথা ধ্বনিত হইয়া উঠে, নীল যমুনার তরঙ্গ-হিল্লোলে কাহার 'অম্বরব্যাপী নীরব হাস্য' অজ্ঞাতে ফুটিয়া উঠে, বিশ্বব্যাপী বিচিত্র রাগিণী কাহার

কনকচম্পুরের কলধ্বনির গোপনবার্ত্তা লইয়া আসে। তাই—

রহিয়া রহিয়া নব কান্তে
ফুল মুগন্ধ গগনে
কেঁদে ফেরে হিয়া মিলন বিহীন
মিলনের শুভ লগনে।"

"ডাকে যেন মোরে অব্যক্ত মাধুরে
শতবার ক'রে সমস্ত ভুবন!"

অলক্ষিত হৃদয়-দেবতার অস্পষ্ট আভাস পাইয়া আকুল প্রাণ গাহিয়া উঠে—

"তুমি দুর্লভ দুরাশার মত
কি কথা আমায় শুনাও সতত
তব ভাষা শুনে তোমারে হৃদয়
চেনেছে তাহার স্বভাষী
হে সুদূর আমি উদাসী।
কৌতুক মাখানো অলস খেলায়
তরুমর্ম্মরে ছায়ার খেলায়
কি মূরতি তব নীলাকাশ পারী
নয়নে উঠে গো আভাসি
হে সুদূর আমি উদাসী।
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার
সে কথা যে যাই পাসরি।"

অল্পে অল্পে এই অস্পষ্ট আভাস স্পষ্টতর হইয়া উঠে—

"দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে!"

অবশেষে একদিন গোপন হৃদয়দেবতা ভক্তের সম্মুখে প্রকাশিত হন। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নারাশি আসিয়া মৃণ্ময়-প্রদীপের ম্লান আলোককে ঢাকিয়া ফেলে—সমস্ত দুয়ার দেখিতে দেখিতে খুলিয়া যায়—আপনার যত্নরচিত ক্ষুদ্র কুশকুটীর বিশ্বের সঙ্গে একাকার হইয়া যায়। বিশ্বব্যাপী আনন্দের প্রবল প্লাবনে তুচ্ছ সুখদুঃখ, কোথায় ভাসিয়া যায়। মনে হয় এই জগতের পবিত্র সুখ-দুঃখ আলোক-অন্ধকার, শোভা-সুষমা, নরনারীর শত বিচিত্র কাহিনী, হাবভাব লীলাবিলাস, তটিনীর কলধ্বনি, নদীর নিপুণ নৃত্য, বসন্তের রাজবেশ, প্রাবৃটের মহোৎসব—সকলি সেই লীলাময়ীর বিচিত্র লীলা, নীলাকাশ যাঁহার শ্রীচরণ চুম্বন করিবার জন্য সতত, ধরণী যাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শে চিরমুগ্ধ, ইন্দুকিরণ যাঁহাকে প্রদীপ্ত করে, কুলগন্ধ যাঁহাকে পুলকিত করে, ছন্দ যাঁহার লীলাভঙ্গীতে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে, যাঁহাকে পাইবার জন্য আকুল ক্রন্দন মর্ম্মের মাঝে ব্যাকুল হইয়া রহে! দেখিয়া দেখিয়া মুগ্ধচিত্ত বিস্ময়ে গাহিয়া উঠে—

কত বিচিত্র তুমি, ওগো বিচিত্ররূপিণী!"

কৃতার্থ হৃদয় আনন্দে বলিয়া উঠে—

"আঁধার আসিতে রজনীর দীপ
জেলেছিনু যতগুলি
নিবাও রে মন আজি সে নিবাও—
সকল দুয়ার খুলি।
আজি মোর ঘরে জানি না কখন
প্রভাত করেছে রবির কিরণ।
মাটির প্রদীপে নাই প্রয়োজন
ধূলায় হোক সে ধূলি।
নিবাও রে মন রজনীর দীপ
সকল দুয়ার খুলি।"

আরও অগ্রসর হইয়া ভক্ত দেখেন, বিশ্ব-দেবতা ও নিজের হৃদয়দেবতা বিভিন্ন নহেন—উভয়েই এক আনন্দময় অদ্বিতীয় সত্যং শিবং সুন্দরং। ভক্ত দেখেন, যে প্রাণ তাঁহার মধ্যে আন্দোলিত তাহাই ধরণীর ক্ষীণ ধূলিকণা হইতে আকাশ পর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছে। নিজের নাড়ী বিশ্বের হৃদয়স্পন্দনের সঙ্গে সমতালে স্পন্দিত হইতেছে নিজের হৃদয়বীণা বিশ্ববীণার সঙ্গে এক সুরে বাঁধা!

"এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ তরঙ্গমালা রাত্রি দিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বসিন্ধুজলে
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে—সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু সমুদ্র দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার ভাটায়।"

তখন ভক্ত নিজের জীবনে সঞ্চিত সকল সুখ-দুঃখ, সাধ-আশা স্নেহ-প্রীতি "নৈবেদ্য" রূপে ভগবানের শ্রীচরণে উপহার দিয়া পারে যাইবার আশায় ভক্তি ভরে "খেয়া"র ঘাটে আসিয়া দাঁড়ায়। তাহার মুগ্ধ হৃদয় ভক্তিভরে প্রার্থনা করে—

"আমারে কর তোমার বীণা
লহ গো লহ তুলে
উঠিবে বাজি তন্ত্রী রাজি
মোহন অঙ্গুলে।
কোমল তব কমল করে
পরশ কর পরাণ পরে
উঠিবে হিয়া গুঞ্জরিয়া তব শ্রবণ মূলে।"

মৃত্যুকেও তখন আত্মীয় বলিয়া মনে হয়। সকল ভীতি ও রহস্য পরিহার করিয়া সেও সুমধুর মূর্ত্তিতে দেখা দেয়—

"স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে
আবার সান্ত্বনা পায় গিয়ে স্তনান্তরে!"
"বর্ণে বর্ণে সুরঞ্জিত বিশ্বচিত্র খানি
ধীরে ধীরে মৃদুহস্তে লও তুমি টানি
সর্ব্বাঙ্গ হৃদয় হতে; দীপ্ত দীপাবলী
ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে ছিল যা উজ্জ্বলি
দাও নিবাইয়া; তার পরে অন্ধরাতে
যে নির্ম্মল মৃত্যুশয্যা পাত নিজ হাতে,
সে বিশ্ব ভুবন হীন নিঃশব্দ আসনে
একা তুমি বস আসি পরম নির্জ্জনে।"

জীবনের সকল রহস্য তখন সুস্পষ্ট বুঝা যায়।

"তোমার ইঙ্গিত খানি দেখিনি তখন
ধূলিবৃষ্টি ছিল তারে করিয়া গোপন
যখনি দেখেছি আজ, তখনি পুলকে
নিরখি ভুবনময় আঁধারে আলোকে
জ্বলে সে ইঙ্গিত।
তখন তোমার পানে
বিমুখ হইয়া ছিনু কি লয়ে কে জানে!
বিপরীত মুখে তারে পড়েছিনু তাই
বিশ্বজোড়া সে লিপির অর্থ বুঝি নাই।"

তখন পূর্ব্বের সকল তুচ্ছ আকর্ষণ, তুচ্ছ প্রীতির কারণ বুঝা যায়। বুঝা যায় সে প্রীতিও তাঁহারই প্রতি প্রীতি। তিনি সকলের মধ্যে আছেন বলিয়া প্রীতি।

"আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে
তোমারেই ভাল বেসেছি

জনতা বাহিয়া চিরদিন ধরে
শুধু তুমি আর আমি এসেছি।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ভক্তজীবনের এই যে একটি সুন্দর ক্রমবিকাশ দেখা যায়, তাহা অন্যত্র দুর্লভ। জ্ঞানী বিচার ও যুক্তির সাহায্যে যে মহাতত্ত্ব উপলব্ধি করেন, কবি হৃদয়ের মধ্য দিয়া অজ্ঞাতসারে অতি সুন্দর ভাবে সেই তত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন।

"না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে
কেমনে কিছু না জানি
অর্থের শেষ পাই না তবুও
বুঝেছি তোমার বাণী"

এবং এই না "বুঝেও বুঝার" জন্যই রবীন্দ্রনাথের কবিতা গভীর হইয়াও এত মধুর। কমলকলিকা যেমন স্বাভাবিক ভাবে বিনা চেষ্টায় ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিয়া পরিপূর্ণ সুষমায় এবং চিত্তহারী সুগন্ধে সকলকে মুগ্ধ করে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা তেমনি ধীরে ধীরে অপূর্ব্ব শোভায় সহজে স্বাভাবিক ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে; এ কারণে তাঁহাকে কোন প্রকার চেষ্টা বা কৃত্রিমতার আশ্রয় লইতে হয় নাই। কোন তত্ত্ব প্রতিপাদন করিবার চেষ্টায় বা কোন উদ্দেশ্য লইয়া কাব্য রচনা করিতে গেলে রচনা নীরস হইয়া পড়ে, রবীন্দ্রনাথের এই অজ্ঞাত বিকাশ তাঁহার কবিতাকে গভীর ভাবপূর্ণ করিয়াও নীরসতা হইতে রক্ষা করিয়াছে। এমন মধুর অথচ এমন ভাবপূর্ণ কবিতা শুধু বঙ্গসাহিত্যে নহে—জগতের সাহিত্যে দুর্লভ।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার দ্বিতীয় বিশেষত্ব তাঁহার অপূর্ব্ব শব্দসম্পদ। পড়িতে পড়িতে তাহার গুণে ভাব যেন চক্ষুর সম্মুখে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে!

"বিদারিয়া
এ বক্ষ পিঞ্জর, টুটি এ পাষাণ বন্ধ
সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার—বিদোলিয়া, মর্ম্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকীরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভুলোকে।"

পড়িতে পড়িতে গিরিনির্ঝরের ন্যায় বাসনার খরস্রোত যেন চক্ষের সম্মুখে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠে।

"নির্ঝরি ঝরে উচ্চ শিখরে
বহুদূর নিম্নে সরণে
ছন্দে ছন্দে সুন্দর গতি
পাষাণ হৃদয় হরণে!
কোমল কণ্ঠে মৃদু মৃদু সুর
ফুটি অবিরল তরল মধুর
সদা শিঞ্জিত মাণিক নূপুর
বাঁধা চকল চরণে।"

শুনিতে শুনিতে কলনাদিনী নির্ঝরিণীর সুমধুর কলধ্বনি যেন স্পষ্ট শুনা যায়।

"ঘন ঘোর ধূম ঘুরিয়া ঘুরিয়া
দুলিয়া দুলিয়া উড়িল
দেখিতে দেখিতে ধূম্র বিদারি
ঝলকে ঝলকে উষ্ণা উগারি
শত শত লোল জিহ্বা প্রসারি
বহ্নি আকাশ জুড়িল।"

পড়িতে পড়িতে গভীর ধূমরাশির মধ্য হইতে প্রকাশমান প্রজ্বলিত অনলের আকাশব্যাপী লোহিতচ্ছটা যেন কল্পনানেত্রে সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয় উঠে

"গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্তদেহে
স্বর্ণাঞ্চল টানি
তুমি কোন গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল
সন্ধ্যাদীপ খানি
দ্বিধায় জড়িত পদে কম্পবক্ষে
নম্র নেত্রপাতে
স্মিত হাস্যে নাহি চল বাসর শয্যাতে
শুভ্র অর্দ্ধ রাতে!

পড়িতে পড়িতে বালিকা বধূর সলজ্জ মধুর অস্ফুট শ্রী মনোমধ্যে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে।

"এতেন নিকষে কিরণ ঠিকরে
মুকুতা ঝলকে অলক পাশে,
মদির শীকর সিক্ত আকাশ
ঘন হয়ে যেন ঘেরিয়া আসে।"

পড়িতে পড়িতে মনে যে চিত্র সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠে, বর্ণ ও তুলিকার সাহায্যে তাহাকে স্ফুটতর করা অসম্ভব।

"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে—
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে
ঘন গৌরবে নব যৌবনা বরষা
শ্যাম গম্ভীর সরসা।"

পড়িতে পড়িতে প্রাবৃটের গম্ভীর মহোৎসবের জলকলরব যেন কানে স্পষ্ট শুনা যায়।

ভাষা ও ভাবের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যের এরূপ উদাহরণ অসংখ্য।

এই সকল বিশেষত্বের জন্য রবীন্দ্রনাথের রচনা কোমল অরুণালোকের মত অতি স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে বাঙ্গলার কাব্যসাহিত্যকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মাধুর্য্য এবং সৌন্দর্য্য এত অধিক যে তাহার বিশেষ বিবরণ দিতে গেলে কথা শেষ হয় না। তাঁহার এক একটি কবিতার সৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্য এক একটি প্রবন্ধ লিখিত হইতে পারে। সুতরাং সে প্রয়াসে প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। রবীন্দ্রনাথের কবিতার কোমলতা, মধুরতা এবং পরিপূর্ণতার জন্য বঙ্গসাহিত্য তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কেবল কবি নহেন, তাঁহার গদ্যসাহিত্যও বিচিত্র রত্নরাজির আকর।

ছোট গল্প রচনায় রবীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয়, তাঁহার এক একটি ছোট গল্প এক একটি রত্নের ন্যায় সমুজ্জ্বল। তাহাদের মাধুর্য্য, বৈচিত্র্য, রচনাভঙ্গী হৃদয়কে মুগ্ধ করে।

উপন্যাসরচনাতেও রবীন্দ্রনাথের মৌলিকত্ব পরিস্ফুট। সুকুমার হৃদয়-ভাবের এমন নিপুণ ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বাঙ্গলা-সাহিত্যে দুর্লভ। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলাদেশে যত উপন্যাস রচিত হইয়াছে, তাহাদের বোধ হয় অধিকাংশেরই আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস রচনার রীতি স্বতন্ত্র—বঙ্গসাহিত্যে বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস রচনার প্রবর্ত্তক।

রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা' চাণক্য-শ্লোকের ন্যায় কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিবার যোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্যবোধ তাঁহার সৌন্দর্য্যসৃষ্টি-শক্তিরই অনুরূপ সেই জন্য সৌন্দর্য্যের সমালোচনাতেও রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত। তাঁহার শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির সমালোচনা যে কোন লেখকের পক্ষে গৌরবজনক

হাস্যরসেও রবীন্দ্রনাথের অধিকার সামান্য নহে। তাঁহার স্নিগ্ধ, সংযত, সরস হাস্য বাঙ্গলাভাষার অমূল্য সম্পত্তি। যাঁহারা "গোরার গলদ", "প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ" বা "বৈকুণ্ঠের খাতা" পড়িয়াছেন, তাঁহারাই এ কথা স্বীকার করিবেন, ইহাতে শ্লেষের তীব্রতা নাই, অশ্লীলতার মলিনতা নাই, ব্যক্তিগত আক্রমণের নিন্দনীয়তা নাই, ইহাদের বিশুদ্ধ হাস্যরস সূর্য্যকরোজ্জ্বল শিশির-বিন্দুরই মত স্নিগ্ধ এবং নির্ম্মল।

গম্ভীর প্রবন্ধরচনাতেও রবীন্দ্রনাথ সুনিপুণ। এমন সহজ ও সুন্দরভাবে তিনি ধর্ম্মের, সমাজের ও রাজনীতির জটিল তত্ত্ব-রাশির ব্যাখ্যা করিতে পারেন যে পড়িলে বিস্মিত হইতে হয়।

যিনি অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে আমাদের জাতীয় সাহিত্যকে এইরূপে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্য্য-শালী করিয়াছেন তাঁহার নিকট প্রত্যেক বঙ্গবাসীই কৃতজ্ঞ। জীবনের মধ্যাহ্নে কবি একদিন গাহিয়াছিলেন, তিনি সংসার হইতে চলিয়া গেলে

"নদীজলে মোর গান
পাবে না কি শুনিবারে কোন মুগ্ধ কান
নদীকূল হ'তে? উষালোকে মোর হাসি
পাবে না কি দেখিবারে কোন মর্ত্ত্যবাসী
নিদ্রা হ'তে উঠি? আজ শত বর্ষ পরে
এ সুন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে
কাঁপিবে না আমার পরাণ? ঘরে ঘরে
কত শত নরনারী চিরকাল ধ'রে
পাতিবে সংসার খেলা, তাহাদের প্রেমে
কিছু কি রব না আমি? আসিব না নেমে
তাদের সর্ব্বাঙ্গ মাঝে সরস যৌবন?
তাদের বসন্ত দিনে অকস্মাৎ সুখ?
তাদের মনের কোণে নবীন উন্মুখ
প্রেমের অঙ্কুর রূপে?"

আজ তাঁহার একপঞ্চাশত্তম জন্মদিনে আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, তিনি অসামান্য প্রতিভার বাঙ্গালীর হৃদয়ে যে প্রীতির আসন রচনা করিয়াছেন, তাহা হইতে কোন কালেই তিনি বিচ্যুত হইবেন না। বাঙ্গালী যখনি দেখিবে—

যার শ্যাম দুর্ব্বাদল নবনীল নভস্তল
বিকশিত বনস্থল বিকচ ফুলে"

যখন দেখিবে,

"কলিতেছে জল তরল অনল
গলিয়া পড়িছে অম্বর তল
দিক্‌বধূ যেন ছল ছল আঁখি
অশ্রুজলে।"

তখনি সে তাহার সৌন্দর্য্যের চির-উপাসক প্রিয় কবিকে স্মরণ করিবে। যখনি

"উষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা
কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা"—

আদর্শ সৌন্দর্য্যের চরণতলে চিত্ত তাহার

"জানুপাতি বসি নির্ব্বাক বিস্ময় ভরে
নতশিরে"

"পূজা উপচার" স্বরূপ "পুষ্পসম তার" "তুণ শূন্য করি" সমর্পণ করিতে চাহিবে, যখনি প্রেমিক যুবা প্রণয়িনীর কাছে

"কেন আন বসন্ত নিশীথে
আঁখিভরা আবেশ বিহ্বল
যদি বসন্তের শেষে ভ্রান্ত মনে ম্লান হেসে
কাতরে খুঁজিতে হয় বিদায়ের ছল।"

শুনিয়া এই অজ্ঞাত পরিবর্ত্তনের রহস্য ভেদ

করিবার জন্য ব্যাকুল হইবে, যখনি রাজধানীতে নির্ব্বাসিতা পল্লীবধূর আর্ত্ত হৃদয় করুণকণ্ঠে গাহিয়া উঠিবে

"সবাই মনে হয় আঁধার ছায়াময়
দীঘির সেই জল শীতল কালো।
তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভালো।"

যখনি রূপহীনা প্রেমিকার আকুল হৃদয় কাঁদিয়া বলিবে,—

"তবে, পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া
পূজিব তারে গিয়া কি দিয়ে!"

যখনি দূর কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া যাইবার সময় বালিকা কন্যা প্রবাসযাত্রী পিতাকে 'বিষণ্ণ নয়ন ম্লান মুখে' কহিবে, 'যেতে আমি দিব না তোমায়,' যখনি একান্ত অনুগত 'চিরপুরাতন ভৃত্যকে' বিদেশে ফেলিয়া বক্ষে গুরুভার বহন করিয়া শূন্যমুখে ঘরে ফিরিতে হইবে, তখনি স্নেহময় কবির মধুর ঝঙ্কার কাণের কাছে বাজিয়া উঠিবে।

যখনি অশান্ত হৃদয় আপনার হৃদয়-দেবতাকে পাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিবে, যখনি শোকপীড়িত ভগ্ন হৃদয় যন্ত্রণায় হাহাকার করিবে, যখনি চির উপেক্ষিতা দীনা জন্মভূমির করুণমূর্ত্তি হৃদয়ে বেদনা সঞ্চার করিবে, তখনি ভক্ত কবির সান্ত্বনার অমৃতধারা তাহার শুষ্ক হৃদয়কে অভিসিঞ্চিত করিবে।

অমৃতবর্ষী রবীন্দ্রনাথের অক্লান্ত লেখনী আজিও ভাষাকে অবিরাম পরিপুষ্ট করিতেছে, কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি আরও বহুদিন সুস্থ ও নিরাময় থাকিয়া আমাদের নবীন সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করুন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

বুদ্ধ-সংবাদ।

(দীর্ঘ নিকায়ের অন্তর্গত কূটদন্ত সূত্র)

পার্থ বন্দ্য।

এক সময়ে ভগবান্ পঞ্চশত ভিক্ষুর সহিত মগধ-জনপদে ভ্রমণ করিতে করিতে স্থানুমত-নামক এক ব্রাহ্মণগ্রামে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য আম্রবাটিকা-নামক উদ্যানে বিহরণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে স্থানুমত-গ্রামে কূটদন্ত নাম এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। মগধাধিপতি বৈম্বিসার তাঁহাকে ঐ গ্রামখানি ব্রহ্মদেয়রূপে প্রদান করিয়াছিলেন। কূটদন্ত প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন; তিনি সেই সময়ে এক মহাযজ্ঞের আরম্ভ করেন, তিনি এক শতযাগের আয়োজন করিয়াছিলেন। যজ্ঞের জন্য যজ্ঞভূমিতে যূপকাষ্ঠে সপ্তশত বৃষভ, সপ্তশত বৎসতর, সপ্তশত বৎসতরী, সপ্তশত ছাগ ও সপ্তশত মেষ বন্ধন করা হইয়াছিল।

স্থানুমত-গ্রামের ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ

শুনিতে পাইলেন যে শাক্যপুত্র গৌতম শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহাদের গ্রামের আম্রষষ্টিকা-উদ্যানে আগমন করিয়াছেন। গৌতমের কল্যাণ কীর্ত্তিগণ তখন চারিদিকেই রটিয়াছে, সকলেই জানিয়াছে তিনি সম্যক্ সম্বুদ্ধ ও অর্হাপ্রেষ্ঠ; তিনি সমস্ত লোকতত্ত্ব বিশেষভাবে জানিয়া শুনিয়া সাক্ষাৎ করিয়াছেন; তিনি যে ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করেন, তাহা আদিতে কল্যাণ মধ্যে কল্যাণ, এবং অন্তেও কল্যাণ; তিনি পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য সমগ্ররূপে পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ করিতেছেন। অনন্তর সেই গ্রামবাসিগণ সকলে গ্রাম হইতে নির্গত হইয়া দলে দলে আম্রষষ্টিকা-উদ্যানে গমন করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণ কূটদন্ত সেই সময়ে প্রাসাদের উপরিতলে দিবসশয্যায় আসীন ছিলেন। তিনি ঐ গ্রামবাসিগণকে দলে-দলে আম্রষষ্টিকা-উদ্যানে যাইতে দেখিয়া স্বকীয় দৌবারিককে আহ্বান করিলেন, এবং গ্রামবাসিগণ কোথায় যাইতেছেন জানিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। দৌবারিক জানিয়া যথাযথ নিবেদন করিলে, ব্রাহ্মণ কূটদন্ত মনে মনে ভাবিলেন যে, 'শ্রমণ গৌতম যজ্ঞের ত্রিবিধ সম্পদ্ ও ষোড়শবিধ অলঙ্কারকে জানেন, কিন্তু আমি তাহা জানি না; আমি মহাযজ্ঞ করিতে যাইতেছি, অতএব আমি অবশ্যই শ্রমণ গৌতমের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহা জিজ্ঞাসা করিব।'

ব্রাহ্মণ কূটদন্তের আদেশানুসারে তাঁহার দৌবারিক ঐ গ্রামবাসিগণকে বলিলেন যে, যাহারা যেন তাঁহার নিকট আগমন করেন, তিনিও শ্রমণ গৌতমকে দেখিবার জন্য যাইবেন।

সেই সময়ে ব্রাহ্মণ কূটদন্তের মহাযজ্ঞ দর্শন করিবার জন্য বহুশত ব্রাহ্মণ ঐ গ্রামে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কূটদন্ত শ্রমণ গৌতমকে দেখিতে যাইবেন শুনিয়া ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণ তাহাতে তাঁহার যথোচিত প্রকৃতি বিবিধ কারণ নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে ঐ সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন; তাঁহারা যুক্তি বলে দেখাইলেন যে, শ্রমণ গৌতমেরই তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসা উচিত, স্বয়ং তিনি কিছুতেই তাঁহার নিকট যাইতে পারেন না।

প্রত্যুত্তরে কূটদন্ত তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'ব্রাহ্মণগণ, আপনারা আমার কথা শ্রবণ করুন, আপনারা তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে গৌতমকে দর্শন করিবার জন্য আমারই গমন করা উচিত, তিনি এখানে আমাকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিতে পারেন না।' এই বলিয়া তিনি শ্রমণ গৌতমের গুণরাশি কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে যে মগধাধিপতি সৈনিক বিম্বিসার ও কোশলাধিপতি প্রসেনজিতের ন্যায় নৃপতিগণ এবং পুষ্করসাদির ন্যায় ব্রাহ্মণগণও সৎকার ও অর্চ্চনা করেন তাহাও বলিলেন। বিশেষত তিনি ইহাও বলিলেন যে, শ্রমণ গৌতম যখন আমাদেরই গ্রামে আসিয়াছেন, তখন তিনি আমাদের অতিথি, তাঁহাকে ত

আমাদের সম্মান করিতেই হইবে। অতএব আমারই সেখানে যাওয়া উচিত।

কূটদন্তের বাক্যে ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহারা উৎসাহের সহিত শ্রমণ গৌতমকে দেখিবার জন্য গমন করিতে উদ্যত হইলেন।

কূটদন্ত সেই মহান্ ব্রাহ্মণসঙ্ঘের সহিত আম্রবাটিকা-উদ্যানে উপস্থিত হইলেন, এবং শ্রমণ গৌতমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরস্পর আনন্দিত হইয়া যথোচিত সম্ভাষণাদি করিলেন। ব্রাহ্মণগণও যথোচিত অভিবাদনাদি করিয়া একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর ব্রাহ্মণ কূটদন্ত ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'হে গৌতম, আমি শুনিয়াছি, লোকেরা বলিয়া থাকে যে, শ্রমণ গৌতম যজ্ঞের ত্রিবিধ সম্পৎ ও ষোড়শবিধ অলঙ্কার জানেন। আমি কিন্তু তাহা জানি না। আমি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ভাল, আপনি আমাকে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।'

'তাহা হইলে আপনি শ্রবণ করুন ও মনে ধারণা করুন' এই বলিয়া ভগবান্ বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"ব্রাহ্মণ, পুরাকালে মহাবিজিত-নামে এক অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন প্রভূতধনধান্যশালী নরপতি ছিলেন। তিনি যখন এক দিন নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মনের মধ্যে এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত হয় যে, 'মনুষ্যজীবনে যাহা কিছু উপভোগ্য তাহা ত প্রচুররূপেই লাভ করিয়াছি, আমি এই মহৎ পৃথিবীমণ্ডল জয় করিয়া, তাহাতে বাস করিতেছি। অতএব যাহাতে আমার চিরদিন মঙ্গল হয়, তজ্জন্য মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে যাগ করিব।' রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া পুরোহিতকে আহ্বান করাইলেন, এবং নিজের সঙ্কল্প তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, 'আমি মহাযজ্ঞের দ্বারা যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, অতএব যাহা আমার দীর্ঘকাল যাবৎ হিতের নিমিত্ত হয়, তদ্বিষয়ে আমাকে উপদেশ প্রদান করুন।'

"পুরোহিত উত্তর করিলেন—'মহারাজ, আপনার অধিকৃত জনপদের কণ্টক ত এখনো নিঃশেষ হয় নাই, আপনার জনপদ এখনো উপপীড়িত হইতেছে। আপনার জনপদের মধ্যে গ্রামঘাতকও দেখা যায়, নরঘাতকও দেখা যায়, আবার পান্থঘাতকও দেখা যায়। আপনি রাজা, আপনি যদি এইরূপ জনপদে (দেবতার উদ্দেশে) বলি প্রদান করেন, তাহা হইলে আপনি অকার্য্যকারী হইবেন। আপনি হয় ত মনে করিতে পারেন যে, আমি এই দস্যুজনিত উপদ্রবকে বধ দ্বারা, বা বন্ধন দ্বারা, বা হানি দ্বারা বা তিরস্কার দ্বারা, অথবা নির্ব্বাসনের দ্বারা বিনষ্ট করিব, কিন্তু এই দস্যু-উপদ্রব এইরূপে সম্পূর্ণভাবে নিরাকৃত হয় না। কেননা, যাহারা হতাবশিষ্ট থাকিবে, তাহারাই পরে রাজার জনপদকে পীড়িত করিবে। কিন্তু আপনি যদি এক কার্য্য করেন, তাহা হইলে সমস্ত দস্যু-উপদ্রব নিবৃত্ত হইবে। মহারাজ, আপনার জনপদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি কৃষি বা গোরক্ষায় উৎসাহিত থাকে, তাহা হইলে, তাহাদের বীজ ও অন্ন পর্য্যন্ত না

থাকিলে আপনি তাহাদিগকে বীজ ও অন্ন প্রদান করুন। যদি কেহ আপনার জনপদে বাণিজ্য করিবার জন্য উৎসাহিত হয়, তাহা হইলে মহারাজ, আপনি তাহাকে মূলধন প্রদান করুন। আপনার জনপদের মধ্যে যাহারা রাজপুরুষ হইতে উৎসাহ করে, আপনি তাহাদিগের অন্ন ও বেতনের ব্যবস্থা করুন। তাহা হইলে ঐ সকল মনুষ্য নিজ নিজ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া আপনার জনপদকে আর উপদ্রুত করিবে না, এবং আপনারও অনেক ধন ধান্য-রাশি হইবে। জনপদসমূহ অকণ্টক ও অনুপপীড়িত হইয়া কল্যাণে অবস্থান করিবে, মনুষ্যসকল আনন্দিত হইয়া বুকের উপর ছেলেকে নাচাইয়া এবং গৃহের দ্বার বন্ধ না করিয়াই * আনন্দে বিহরণ করিতে পারিবে।'

"রাজা মহাবিদিত পুরোহিতের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া 'তাহাই হউক' বলিয়া তদনুসারে কার্য্য করিলেন, এবং তাঁহার জনপদও সেইরূপ আনন্দময় ও নির্ভয় হইয়া উঠিল।

"অনন্তর মহাবিজিত পুরোহিতকে আবার আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, আপনার বিধি অনুসরণ করায় আমার জনপদে দস্যু-উপদ্রব নিবৃত্ত হইয়াছে। জনপদবাসী মনুষ্যগণ এখন অকণ্টক ও অনুপপীড়িত হইয়া কল্যাণে অবস্থান করিতেছে। তাহারা আনন্দিত হইয়া বুকের উপর ছেলেদেরকে নাচাইতেছে, এবং ঘরের দ্বার বন্ধ না করিয়াই তাহাতে বিহার করিতেছে। এখন আমি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করি। অতএব আপনি আমাকে উপদেশ প্রদান করুন, যাহাতে আমার দীর্ঘকাল যাবৎ মঙ্গল হইতে পারে।'

'তাহা হইলে মহারাজ, আপনার জনপদের মধ্যে যে সকল অনুরক্ত জানপদ ও নাগরিক ক্ষত্রিয় আছেন, আপনি তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করুন, তাঁহাদিগকে নিবেদন করুন যে, আমি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিতেছি, অতএব আপনারা আমাকে তাহাই অনুজ্ঞা করুন, যাহা আমার দীর্ঘকাল যাবৎ মঙ্গল ও সুখের জন্য হইতে পারে; এইরূপ আপনার জনপদের মধ্যে যে সকল অনুরক্ত জানপদ ও নাগরিক, অমাত্য ও পারিষদ, এবং ব্রাহ্মণ ও মহাগৃহস্থগণ রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও আমন্ত্রণ করিয়া ঐরূপ নিবেদন করুন।'

"রাজা মহাবিজিত পুরোহিতের বাক্য গ্রহণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিলেন, এবং সকলেই তাঁহার মহাযজ্ঞকে অনুমোদন করিলেন।"

ভগবান্ কূটদন্তকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'ব্রাহ্মণ, এই যে চারিটি অনুমতিপ্রদ পক্ষ, ইহা যজ্ঞের অলঙ্কার বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।'

"রাজা মহাবিজিত অষ্ট অঙ্গে সমন্বিত ছিলেন—তাঁহার কুল অতি বিশুদ্ধ, পিতৃত ও মাতৃত উভয় দিকেই সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত কেহ কখনো জাতিবাদগ্রহণে তাঁহাকে নিন্দা করিতে পারে নাই; তিনি অতি-

* উহে পূর্ব্বে মক্ষেত্তা অপাবৃত দ্বার।"

সুন্দর ও দর্শনীয় ছিলেন : তিনি মহাধন, মহাভোগ ও মহাদ্বন্দ্ব ছিলেন ; তিনি বলবান্ ও চতুরঙ্গিণী সেনায় সমন্বিত ছিলেন ; তিনি শ্রদ্ধাপূর্বক দান করিতেন ; তিনি দানপতি ছিলেন ; তাঁহার গৃহদ্বার বন্ধ হইত না ; তিনি বহুজ্ঞ ছিলেন ; তিনি বিবিধ ভাষার অর্থ জানিতেন ; তিনি পণ্ডিত, বিজ্ঞ ও মেধাবী ছিলেন, এবং অতীত, অনাগত ও বর্তমান এই কালত্রয়ের বিষয়কে চিন্তা করিতে পারিতেন। এই আট অঙ্গও যজ্ঞের অলঙ্কার।

"তাঁহার ব্রাহ্মণ-পুরোহিতও চতুর্বিধ অঙ্গে সমন্বিত ছিলেন—তিনি মাতৃকুল ও পিতৃকুল উভয় কুলেই সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ ; তিনি স্বয়ং অধ্যয়নকারী এবং তিনি বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন ; তিনি শীলবান ছিলেন, এবং তিনি পণ্ডিত, বিজ্ঞ ও মেধাবী ছিলেন। এই চারি অঙ্গকেও যজ্ঞের অলঙ্কার বলা হয়।

"অনন্তর পুরোহিত রাজা মহাবিজিতকে যজ্ঞের পূর্বেই ত্রিবিধ অভিমানের কথা বলিলেন। তিনি রাজাকে বলিলেন 'মহারাজ, আপনি ত মহাযজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু আপনার মনে এরূপ অনুতাপ উপস্থিত হইতে পারে যে, আমার প্রভূত ভোগ্যরাশি চলিয়া যাইবে, 'কিন্তু আপনি এরূপ অনুতাপ করিবেন না। আপনার মনে এরূপ অনুতাপ হইতে পারে যে, 'আমার মহাভোগরাশি চলিয়া যাইতেছে,' কিন্তু আপনি এরূপ চিন্তা করিবেন না। আবার আপনার এরূপ অনুতাপও হইতে পারে যে, 'আমার প্রভূত ভোগ্যরাশি চলিয়া গিয়াছে,' কিন্তু মহারাজ, আপনি এ অনুতাপও করিবেন না।"

"পুরোহিত আবার বলিলেন 'মহারাজ, যজ্ঞে দান গ্রহণ করিবার জন্য বহু লোক আগমন করিবে, তাহাদের মধ্যে এরূপ লোকেরাও আসিবে, যাহারা পূর্বে প্রাণাতিপাত করিত, কিন্তু সেই সময়ে তাহা হইতে বিরত হইয়া আসিয়াছে। মহারাজ, প্রাণাতিপাতের যাহা ফল তাহা তাহাদিগেরই হইবে, আপনি যেখানে যাহাদিগকে প্রাণাতিপাত হইতে বিরত থাকিতে দেখিবেন, তাহাদিগকেই আপনি আনন্দের সহিত দান প্রদান করিবেন। এইরূপ যাহারা অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করে, যাহারা ব্যভিচার করে, যাহারা পিশুনবাক্য বলিয়া থাকে, যাহারা পরুষবাক্য বলিয়া থাকে, এবং যাহারা ব্যর্থ লঘুবাক্য বলিয়া থাকে, তাহারাও আপনার যজ্ঞে আগমন করিবে। আবার লোভী-অলোভী, সমৎসর-নির্মৎসর এবং মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত (নাস্তিক) সম্যক্ দৃষ্টিযুক্ত লোকেরাও যজ্ঞে আগমন করিবে। যাহারা মিথ্যাদৃষ্টি (নাস্তিক্য) প্রভৃতি পোষণ করে তাহার ফল তাহাদেরই হইবে, আপনি এখানে যাহাদিগকে সম্যক্ দৃষ্টিযুক্ত দেখিবেন তাহাদিগকে আমোদের সহিত দান করিবেন।'

ভগবান্ কূটদন্তকে বলিলেন 'ব্রাহ্মণ, যজ্ঞে রাজা মহাবিজিতের দানপ্রতিগ্রাহীতাদের সম্বন্ধে মনে যদি কোনরূপ অনুতাপ উপস্থিত হয় তজ্জন্য পুরোহিত যজ্ঞের পূর্বেই এই দশ প্রকারে সেই অনুতাপের অপনয়ন করিয়াছিলেন

"কূটদন্ত, অনন্তর পুরোহিত পুনর্ব্বার রাজা মহাবিজিতকে বলিলেন—'মহারাজ, আপনি যখন মহাযজ্ঞ করিতে প্রস্তুত হইবেন, তখন কোনো ব্যক্তি এরূপ বলিতে পারে যে, 'রাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিজের জনপদবাসী অনুরক্ত পৌর ও জানপদ ক্ষত্রিয়গণকে আমন্ত্রণ করেন নাই; তিনি এইরূপেই মহাযজ্ঞের দ্বারা যাগ করিতেছেন।' মহারাজ, কেহ এরূপ বলিলে তাহা ধর্ম্মত বলিবে না, কেননা আপনি তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়াই মহাযজ্ঞ করিতেছেন। অতএব তদ্বিষয়ে কিছু মনে না করিয়া আপনি আনন্দের সহিত যজ্ঞ করিবেন, আপনি চিত্তকে প্রসন্ন করুন। আবার কেহ কেহ ঐরূপেই বলিতে পারে যে, আপনি পৌর ও জানপদ অমাত্য ও পারিষদ্‌গণকে আমন্ত্রণ করেন নাই, ব্রাহ্মণ-মহাশালগণকে আমন্ত্রণ করেন নাই, আপনি গৃহপতি-পরিষদ্‌কে আমন্ত্রণ করেন নাই, অতএব এইরূপে যজ্ঞ করিতেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে কিছু মনে না করিয়া আপনাকে সহিত যজ্ঞ করিবেন, কেননা তাহারা ধর্ম্মত যে কথা বলে না। মহারাজ আপনার বংশ সম্বন্ধে আভিজাত্য সম্বন্ধে কেহ নিন্দা করিতে পারে, আপনার রূপ-সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে আপনার বিদ্যা-বিনয়-সম্বন্ধে শৌর্য্য-বীর্য্য সম্বন্ধে আপনার ধর্ম্মের প্রতি আপনার বিদ্যাদান সম্বন্ধে কেহ কেহ নিন্দা করিতে পারে, কিন্তু তাহারা তাহা ধর্ম্মত করিতে পারিবে না, অতএব আপনার পুরোহিতের সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা বলিতে পারে, তাহারা তাঁহার আভিজাত্য সম্বন্ধে, বহুশ্রুতত্ব সম্বন্ধে, পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে ও তাঁহার শীল সম্বন্ধে নিন্দা করিতে পারে, কিন্তু তাহা ধর্ম্মত নহে। অতএব আপনি আনন্দের সহিত যজ্ঞ করিবেন, আপনি নিজের চিত্তকে প্রসন্ন করুন।"

'রাজপুরোহিত এইরূপ ষোড়শ প্রকারে রাজার চিত্তকে আনন্দিত ও উৎসাহিত করিলেন।

"ব্রাহ্মণ কূটদন্ত, সেই যজ্ঞে গোবধ করা হয় নাই সেই যজ্ঞে ছাগ ও মেষও হত হয় নাই, কুক্কুট ও শূকরও হত হয় নাই, এবং অপর কোন প্রাণীও বধ করা হয় নাই। সেই যজ্ঞে যূপের জন্য বৃক্ষসমূহকে ছেদন করা হয় নাই, বা আস্তরণের জন্য দর্ভ-সমূহকে কর্ত্তন করা হয় নাই। সেই যজ্ঞে যে সকল দাস, প্রেষ্য ও কর্ম্মকর ছিল তাহারা দণ্ডসন্তর্জ্জিত ও ভয়তর্জ্জিত নহে, তাহারা অশ্রুমুখ হইয়া রোদন করিতে করিতে কার্য্য করে নাই। তাহারা ইচ্ছা করিলে [illegible] নাই। তাহাদের যে সকল কার্য্য ইচ্ছা হয় তাহারা তাহাই করিয়াছিল, যাহা ইচ্ছা হয় নাই তাহারা তাহা করে নাই। সেই যজ্ঞে ঘৃত, তৈল, নবনীত, দধি, মধু ও খাঁটি [illegible]

[illegible] পৌর ও জানপদ ক্ষত্রিয়গণ, অমাত্যগণ, পারিষদ্‌গণ ব্রাহ্মণমহাশালগণ ও গৃহপতিগণ তৃপ্তি লাভ [illegible]

[illegible] করে

ধন গ্রহণ করিয়া রাজা মহাবিজিতকে বলিলেন 'দেব, এই ধন আপনার জন্য আমরা আহরণ করিয়াছি, আপনি ইহা গ্রহণ করুন।' রাজা বলিলেন 'না, না, ইহাতে প্রয়োজন নাই আমারও ধর্ম্মবলে সঞ্চিত ধন সঞ্চিত আছে, তাহা তোমাদেরই হউক, তোমরা তাহা এখান হইতে লইয়া যাও।'

"তাঁহাদিগকে রাজা মহাবিজিত এইরূপে প্রত্যাখ্যান করিলে তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিলেন যে, যে ধন তাঁহারা সেখানে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, তাহা বাড়ীতে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া ঠিক নহে। রাজা মহাবিজিত যজ্ঞারম্ভ করিলেন, তাঁহারাও সেখানে তদনুসারে যাগ করিবেন। তাঁহারা ঐ ধন সেখানেই দান করিয়া যাইবেন। এই স্থির করিয়া তাঁহারা যজ্ঞবাটের চতুর্দ্দিকে ঐ অর্থ দান করিতে লাগিলেন।'

অনন্তর যজ্ঞসমূহে ব্রাহ্মণেরাও গোবধ করেন নাই, ছাগ ও মেষসমূহ তাহাতে হত হয় নাই, অপর কোন প্রাণীরও বধ করা হয় নাই, যূপের জন্য বৃক্ষসমূহ ছিন্ন হয় নাই, এবং আস্তরণের জন্য কুশও ছিন্ন হয় নাই, দাস প্রভৃতি সেখানে ভয়চকিত ও যন্ত্রতাড়িত হইল না, তাহারা অশ্রুমুখ হইয়া রোদন করিতে করিতে কাজ করে নাই; যাহারা যাহা ইচ্ছা করিয়াছিল তাহারা তাহাই করিয়াছিল, যাহা ইচ্ছা করে নাই, তাহা তাহারা করে নাই। সেই সমুদয় যজ্ঞ ঘৃত তৈল নবনীত প্রভৃতি দ্বারাই সমাপ্ত হইয়াছিল।

'ব্রাহ্মণ, এই চারিটি অনুমতিপ্রদ পক্ষ ছিল, রাজা মহাবিজিত অষ্ট অঙ্গে সমন্বিত ছিলেন, এবং তাঁহার ব্রাহ্মণ পুরোহিত চারিটি অঙ্গে সমন্বিত ছিলেন, আর (ঐ যূপীর) তিনটি অভিমান। যে ব্রাহ্মণ ইহাকেই যজ্ঞের ত্রিবিধ সম্পৎ ও ষোড়শবিধ অলঙ্কার বলা গিয়া থাকে।'

উপবিষ্ট ব্রাহ্মণগণ ভগবানের এই কথা শ্রবণ করিয়া 'অহো যজ্ঞ-সম্পৎ! অহো যজ্ঞ-সম্পৎ!' এই বলিয়া আনন্দে উচ্চধ্বনি উচ্চশব্দ করিয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহারা কূটদন্তকে নীরবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন -'কূটদন্ত, আপনি শ্রমণ গোতমের এই সুভাষিত, সুভাষিত বলিয়া অনুমোদন করিতেছেন না কেন?'

কূটদন্ত বলিলেন—'শ্রমণ গৌতমের সুভাষিতকে সুভাষিত বলিয়া যে অনুমোদন করিতেছি না তাহা নহে। শ্রমণ গৌতমের সুভাষিতকে কে না অনুমোদন করিবে? যে না করে তাহার মস্তক বিদলিত হইয়া যায়! কিন্তু আমার মনে এই হইতেছে যে, শ্রমণ গৌতম ত বলিলেন না যে, 'ইহা আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি,' অথবা 'এইরূপ হওয়া উচিত;' তিনি এইমাত্র বলিলেন যে, "তখন এইরূপ ছিল, তখন এই প্রকার ছিল।' আমার মনে হইতেছে, শ্রমণ গৌতম সেই সময়ে যজ্ঞস্বামী রাজা মহাবিজিত, অথবা যজ্ঞের যাজক ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছিলেন।' আচ্ছা, গৌতম, আপনি কি জানেন, এই যজ্ঞের দ্বারা যাগ করিলে বা যাগ করাইলে মরণের পর কি শরীর-ক্ষয়ে সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হওয়া যায় কি?'

'হাঁ ব্রাহ্মণ, আমি জানি এতাদৃশ যজ্ঞের দ্বারা যাগ করিলে বা যাগ করাইলে মরণের পর শরীরক্ষয়ে সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হওয়া যায়। আমি সেই সময়ে ঐ যজ্ঞের যাজক পুরোহিত ছিলাম।'

কূটদন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন 'গৌতম, এই ত্রিবিধ যজ্ঞসম্পৎ এ ষোড়শ অলঙ্কার হইতে অপর কোন যজ্ঞ আছে কি যাগা অল্পতর পদার্থে ও অল্পতর সমারম্ভে হইতে পারে কিন্তু মহত্তর উপকার ও মহত্তর ফল প্রদান করে?'

ভগবান্ বলিলেন 'হাঁ ব্রাহ্মণ, সেরূপ যজ্ঞ আছে। শীলবান্ প্রব্রজিত-গণের উদ্দেশে যে প্রতিদিন কুলপরম্পরা ক্রমে অন্নদানরূপ যজ্ঞ করা হয়, তাহাই তাদৃশ যজ্ঞ হইতে অধিকতর মহৎ ফল ও উপকার প্রদান করে তাহার কারণ এই যে প্রচলিত পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞে অর্হৎ অথবা অর্হন্মার্গে প্রবিষ্ট ব্যক্তিগণ গমন করেন না। কেননা, ঐ সকল যজ্ঞে পশুহিংসা ও করা হয় এবং গলহস্তও প্রদত্ত হয়। অপর পক্ষে, শীলবান্ প্রব্রজিতগণের উদ্দেশে কুলপরম্পরাক্রমে যে প্রতিদিন অন্ন দান করা হয়, তাহাতে অর্হৎ প্রভৃতি গমন করিয়া থাকেন, কেননা সেখানে পশুহিংসা বা গলহস্ত প্রদান নাই।'

'আচ্ছা গৌতম, শীলবান্ প্রব্রজিতগণের উদ্দেশে এই নিত্য অন্নদান হইতে কি কোন মহত্তর ফল ও উপকারপ্রদ যজ্ঞ আছে?'

'হাঁ ব্রাহ্মণ, আছে। চতুর্দ্দিকে সঙ্ঘের উদ্দেশে বিহার-নির্ম্মাণ তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ।'

'গৌতম, ইহা অপেক্ষাও কি শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ আছে?'

'হাঁ ব্রাহ্মণ, যে ব্যক্তি প্রসন্নচিত্ত হইয়া বুদ্ধকে শরণ গ্রহণ করে, ধর্ম্মকে শরণ গ্রহণ করে, এবং সঙ্ঘকে শরণ গ্রহণ করে, তাহার সেই যজ্ঞই পূর্ব্বোক্ত সমস্ত যজ্ঞ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।'

'আচ্ছা গৌতম, এই শরণ-গমন হইতে কি শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ আছে?'

'হাঁ ব্রাহ্মণ, যে ব্যক্তি প্রসন্নচিত্ত হইয়া প্রাণাতিপাত, অদত্তাদান-গ্রহণ, ব্যভিচার, মৃষাবাদ, ও সুরামেরয়ের মত্ত প্রমাদস্থান হইতে বিরত থাকিবার শিক্ষাপদ-সমূহ গ্রহণ করে, তাহার সেই যজ্ঞই পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞসমূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

'ভাল গৌতম এই শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করা হইতেও কি শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ আছে?'

'হাঁ ব্রাহ্মণ আছে', এই বলিয়া ভগবান্ সবিস্তর বর্ণনা করিয়া বলিলেন যে শীলবান্ হইয়া ক্রমে ক্রমে যথোক্ত প্রথম হইতে চতুর্থ ধ্যানে বিহরণ করিবার পর চিত্ত পরিশুদ্ধ হইলে সেই চিত্তকে জ্ঞানদর্শনের জন্য সেই দিকে প্রবর্ত্তিত করিতে হয়। সেই সময়ে বিবিধ যোগ বিভূতি দর্শন করিতে পারা যায়। এইরূপে সেই শীলবান্ ক্রমে ক্রমে দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ ও দুঃখ-নিরোধের পথকে যথাযথভাবে জানিতে পারেন। এইরূপ যথাযথ জ্ঞান হইলে ক্রমশ সমস্ত আসক্তি হইতে চিত্ত বিমুক্ত হয়, এবং তখন তিনি জানিতে পারেন যে, "আমি বিমুক্ত হইয়াছি, জন্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্যাদি করা

হইয়াছে, এবং যাহা কর্ত্তব্য ছিল তাহা করা হইয়াছে, আর কিছু করিবার নাই!" ব্রাহ্মণ, এই যজ্ঞই সমস্ত যজ্ঞ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহা অপেক্ষা অপর কোন উৎকৃষ্টতর যজ্ঞ নাই।'

কূটদন্ত আনন্দে 'অতি রমণীয়! অতি রমণীয়!' উচ্চারণ করিয়া বলিলেন 'গৌতম, যেমন কোন ব্যক্তি পথ ভুলিয়া গেলে কেহ তাহাকে পথ দেখাইয়া দেয়, অথবা অন্ধকারের মধ্যে কেহ যেমন তৈলপ্রদীপ ধারণ করে, অথবা প্রচ্ছন্ন বস্তুকে যেমন কেহ বিবৃত করিয়া দেয়, সেইরূপই আজ আপনি ধর্ম্ম উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। আজ আমি ভগবান্ গৌতমকে শরণ গ্রহণ করিতেছি, ধর্ম্মকে শরণ গ্রহণ করিতেছি, এবং সঙ্ঘকে শরণ গ্রহণ করিতেছি। আজ হইতে আপনি আমাকে আমার জীবন পর্য্যন্ত আপনার শরণাগত উপাসক বলিয়া জানুন। আমি এই সপ্তশত ষণ্ড, সপ্তশত বৎসতর, সপ্তশত বৎসতরী, সপ্তশত ছাগ, ও সপ্তশত মেষকে মুক্ত করিয়া দিতেছি! তাহাদিগকে আমি জীবন প্রদান করিতেছি। তাহারা হরিৎবর্ণের তৃণ ভক্ষণ করুক এবং শীতল জল পান করুক! শীতল বাতাস প্রবাহিত হইয়া ইহাদের শরীরকে শীতল করুক!'

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

মৎস্য-সমাজ।

মৎস্য কিংবা 'মাছ', ভগবানের প্রথম অবতার। অনেকের ধারণা এই যে ভগবানের মৎস্যরূপে অবতার হইবার পূর্ব্বে সৃষ্টিক্ষেত্রে মৎস্য ছিল না সেটা কিন্তু সম্ভবতঃ ভুল। কারণ সমুদ্রমন্থনের পূর্ব্বে যে কূর্ম্ম ছিল না এমন কোন কথা নাই, এবং বরাহ এবং বামনের পূর্ব্বের অনেক বরাহ জাতি এবং বামন পৃথিবীতে বিচরণ করিয়াছিল। তবে তৎকালীন সৃষ্টির মধ্যে ভগবানের অতীব প্রিয় জীব মৎস্য নিশ্চয় ছিল, নচেৎ তিনি অবতীর্ণ হইতেন না।

আমরা বাঙ্গালী জাতি। মৎস্য চিরকালই আমাদিগের প্রিয়। অথচ মৎস্য সম্বন্ধে আমাদের কোন ইতিহাস নাই। প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বৎসর হইল মৎস্যের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। সেটা ভাজা ইলিস মৎস্য। তৎপরে মৎস্যের শিকারে অনেক কাল কাটাইয়াছি, ভাজিয়া, ঝড় করিয়া, সিদ্ধ করিয়া, চপ্ এবং কটলেট্ প্রস্তুত করিয়া মৎস্য এবং তাহার ডিম্ব উদরে দিয়াছি। কাঁটা দুটিয়া কষ্ট পাইয়াছি। অথচ মৎস্যের উপর কোন অনাস্থা জন্মে নাই। ঝোলের এবং অম্বলের ত কথাই নাই, নানা প্রকারে মৎস্যের রূপ এবং রস পরিবর্ত্তন করিয়া আমরা কৃতার্থ হই এবং ভবিষ্যতেও হইব। যতদিন জগতে সধবা সতী হিন্দুনারীর মস্তকে সিন্দুর থাকিবে ততদিন মৎস্যকুলের সম্মান অটুট রহিবে।

এ হেন জীবের সমাজ, ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতি সম্বন্ধে দুই একটা কথা জানিয়া রাখা ভাল।

মৎস্য জলে বাস করে। ইহারা স্থলে

উঠিয়া বাতাসে বিচরণ করিতে পারে না। কোন কোন সামুদ্রিক মৎস্যের পাখা আছে, তাহারা কিঞ্চিৎ উড়িতে পারে, কিন্তু খাঁটি মৎস্য সম্পূর্ণভাবে জলচর।

মৎস্যের শরীরে তৈল হওয়া একটা আশ্চর্য্যজনক কথা। যেমন মনুষ্যদেহের মধ্যে আত্মা। যাহার যত তৈলের ভাগ বেশী সে তত উর্দ্ধে উঠিয়া সন্তরণ করে। কই, মাগুর প্রভৃতির তৈলের ভাগ কম, অতএব তাহারা পঙ্ক আশ্রয় করিয়া থাকে। ইলিস, খোরসোলা প্রভৃতি দিব্যচক্ষু বিস্তার পূর্ব্বক স্রোতের মধ্যে উজান বহিয়া যায়। তৈল থাকা প্রযুক্ত মৎস্য জলজন্তু হইয়াও জল হইতে আধ্যাত্মিক ভাবে স্বতন্ত্র। মসৃণতা, পিচ্ছিলতা ও দুর্দ্দম চঞ্চলতা ও গতি-প্রিয়তা মৎস্যের সাধারণ গুণ।

জাতিবিভাগ। মৎস্যের জাতি বিভাগ করিতে গেলে 'বৃহৎ-কায়' ও 'ক্ষুদ্র-কায়', দুই শ্রেণীর দিকে দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য।

১। বৃহৎকায়।

(ক) শুষ্কবিশিষ্ট। বোয়াল, আইড়, চাঁই, কিংবা ছেলং। (Turko-Iranian Type) ইহাদিগের আঁইস নাই। চর্ব্বি বেশী।

(খ) নাসিকাবিশিষ্ট। চেখল (Indo-Aryan Type) ইহারা কামড়াইতে বিলক্ষণ পটু। আঁইস ছোট।

(গ) বড় আঁইস নং ১। মৃগেল (Scytho-Dravidian Type)।

(ঘ) ঐ নং ২। রোহিত (Aryo-Dravidian Type) এই জাতীয় 'কাল্‌বোস্' নামক কৃষ্ণবর্ণ এক শ্রেণী আছে।

(ঙ) ঐ নং ৩। কাতলা। (Mongolo-Dravidian Type)।

আমরা সচরাচর চলিত মৎস্যের জাতি-বিভাগ করিলাম। ক্ষুদ্রকায় মৎস্য সম্বন্ধেও তাহাই করিব।

২। ক্ষুদ্রকায়।

(ক) পীতবর্ণাভ। ট্যাংরা (Mongoloid type) ইহারা কাঁটা মারে।

(খ) কৃষ্ণবর্ণ। কই, মাগুর, চ্যাং, শোল, লাটা প্রভৃতি (Dravidian)—যেমন সাঁওতাল, কোল, ভীল প্রভৃতি। ইহারাই জম্বুদ্বীপের আদি বাসিন্দা (Vide Risley's Tribes and castes of India)।

(গ) শুভ্রবর্ণ। ইলিস, খয়রা, খোর-সোলা, তপ্‌সে, পুঁটী, চ্যালা, মৌরলা, চাঁদা, বেলে, ডানকুনি প্রভৃতি। ইহারা ক্ষুদ্র Caucasian type, কিন্তু বাঙ্গালী জাতির ন্যায় ইহাদিগের কোন আদি ইতিহাস পাওয়া যায় না।

ইহা ছাড়া গোটাকতক পৌরাণিক যুগের জাতি এখনও মৎস্য নামে পরিচিত।

(ক) গল্‌দাচিংড়ী। ইহারা আর্য্য-কৃষিগণের type।

(খ) বাইন্। ইহারা অরুৎকায় প্রমুখ নাগ-বংশের type।

মৎস্যগণের মধ্যে চতুর্ব্বর্ণের বিভাগ নাই। সকলেই কিঞ্চিৎ যুদ্ধ-ব্যবসায়ী। তবে কেহ নিরামিষ, কেহ বা আমিষপ্রিয় তৎসম্বন্ধে পরে বক্তব্য।

বাসস্থান। আমরা স্রোতস্বতী পুষ্করিণী লইয়া কেহ কেহ বড় বড় নদী

সচরাচর চলিত মৎস্যের বাসস্থান। কিন্তু যাঁহারা ভাল করিয়া মৎস্যজীবন অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা নির্দ্বিবাদে বলিতে পারেন যে মৎস্যজাতির নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। নদী তাহাদিগের বিচরণ স্থান। স্রোতস্বিনীর স্বভাব মৎস্যজীবনের সাধুমূল। নদীর গতি সাগরাভিমুখে, মৎস্যের গতি স্রোতের বিপরীত দিকে। এই মহাদ্বন্দ্ব তাহাদিগের জীবন। মনুষ্যজীবনও তাহাই, কিন্তু আমাদিগের বাহিরে তাহা দেখা যায় না। মৎস্যজীবনে তাহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে সমুদ্র প্রথমে, তাহার পর মহাদেশ এবং নদনদী। অতএব আদিমকালে কেবল জলচর জন্তুরই প্রাদুর্ভাব ছিল বলিয়া বোধ হয়। সামুদ্রিক মৎস্য ভূভাগের দিকে আসিয়া এবং নদ নদী আশ্রয় করিয়া ক্রমে স্থলচর জন্তু এবং পক্ষী প্রভৃতির ভক্ষ্য হইয়াছিল। ক্রমে নদনদীর মধ্যে প্রস্তর এবং শৈবালাদি আশ্রয় করিয়া তাহারা মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম লাভ করিত। বর্ষাকালে ভূভাগ জলাকীর্ণ হইলে নদ নদী হইতে বিল এবং জলাভূমে এবং ক্রমে পুষ্করিণীতে চলিয়া আসিত। এইরূপে তাহাদিগের আদিম জীবন সঙ্কীর্ণ ভাব লাভ করিয়া, ক্রমে সমাজ, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি আশ্রয় করিয়াছিল।

নদ নদী মধ্যে যেখানে সচরাচর 'দহ' পড়িয়া যায় সেই সকল স্থানে মৎস্যগণ কিছুকাল স্থায়ীভাবে বাস করে। পুষ্করিণীর মধ্যে আশ্রয় লাভ করিলে ইহারা রীতিমত বাসস্থান নির্দ্দেশ করে। শীত এবং গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবে তাহারা কর্দ্দমের মধ্যে থাকে। মৃণালপূর্ণ সরোবর মৎস্যগণের অতি সুখের বাসস্থান। মৎস্যের মধ্যে কোন কোন জাতির বাসস্থান সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন লক্ষিত হয়। পরে দেখা যাইবে।

সমাজনীতি। ইহা তাহাদিগের শরীর-সংগঠনের উপর অনেকটা নির্ভর করে। কতকগুলি মৎস্যের স্থির জলেও ডিম ফুটিয়া শাবক হয়। যথা ট্যাংরা, কই, মাগুর, পুঁটী প্রভৃতি। একটা পুষ্করিণী, কিংবা ডোবা হইলেই যথেষ্ট। ইহাদিগের জীবন ক্ষুদ্র, এবং প্রায় স্থির জলে থাকিয়া দুর্ব্বল ও পীড়িত হইয়া পড়ে। এই কারণে ইহাদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। চাঁদা, ডানকুনি প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিবা-মাত্র বিবাহ করে, এবং আমরা দুই দিনের মৌরলা-বধূকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় দেখিয়াছি। তিন দিন বয়স্কা পুঁটীর পেটে সচরাচর ডিম দেখা যায়। ইহাদিগের সংসার বর্দ্ধনের চেষ্টা অতিশয় তীব্র। ইহাদিগের মধ্যে অবরোধ-প্রথাও প্রচলিত আছে। স্ত্রীলোক পুঁটী ডিম না থাকিলেও প্রায় দুই হাত জলের নিম্নে বিচরণ করে। পুরুষগণ এক হাত জলেও টোপ ধরে। নব-বিবাহিতা মৌরলা, চাঁদা, ট্যাংরা প্রভৃতি প্রায় পুষ্করিণীর ঘাটের অপেক্ষাকৃত আচ্ছাদিত স্থানে বিচরণ করে। পুঁটুলে ছিপে বন্ধুবর সতীশচন্দ্র প্রভৃতি টোপ ফেলিয়া দেখিয়াছেন যে শৈবালপূর্ণ পুরাতন ভগ্ন বাঁধা-ঘাটের উত্তর পার্শ্বে কেবল ঐ শ্রেণীর ক্ষুদ্র মৎস্য পরিপূর্ণ। প্রায় প্রাতঃকালে কিংবা সূর্য্যাস্তের সময় তাহারা বাহির হয়।

অবরোধ-প্রথা খোরসোলা প্রভৃতি ক্ষুদ্র-কায় মৎস্যের নাই। তাহারা জলের উপর ভাসিয়া আসে এবং কোন কালে টোপ ধরে না। খয়রা, ইলিস, তপ্‌সে প্রভৃতি ঠিক জলের উপর না আসুক প্রায় শীর্ষভাগে বিচরণ করে। ইহাতে বোধ হয় কোন পূর্ব্বযুগে তাহারা অপেক্ষাকৃত সভ্যতার গুণ সকল আয়ত্ত করিয়াছিল।

বৃহৎ মৎস্যগণের বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই, কিন্তু বিধবাবিবাহ আছে বলিয়া বোধ হয়। আমাদের বাটীর সম্মুখে ১৮৯১ সালে একটা দহ পড়িয়াছিল। সেখানে গোটা-কতক পুরাতন ভগ্নাংশ স্বরূপ ইষ্টকের ঢিপি ছিল। তাহার মধ্যে এক জোড়া চেখল বাস করিত। পুরুষকে আমরা ছিপে গাঁথিয়া তুলিয়াছিলাম। স্ত্রীলোকটা বঁড়শি মুখে বাধিয়া সুতা ছিঁড়িয়া পলাইয়া যায়। তাহার দুই বৎসর পরে দেখা গিয়াছিল যে সে অপেক্ষাকৃত যুবা পুরুষের সহিত বিবাহ করিয়াছে।

রোহিত, কাতলা প্রভৃতি যৌবন প্রাপ্ত হইলে বিবাহ করে। অতএব ইহাদের পোনাতে ডিম্ব দেখা যায় না। মৃগেল (Scytho-Dravidian type) কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে ডিম্ব পাড়ে। অতএব ইহারা তত সুস্বাদু হয় না।

চিংড়ি সম্বন্ধে পরে বলিব। তবে এক্ষণে বলিয়া রাখা ভাল যে ইহাদিগের মধ্যে দুই জাতি। গলদা চিংড়ী বড় হইবা মাত্র ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে। তখন তাহাদিগের ডিম্ব দেখা যায় না। বাদা কিম্বা ক্ষুদ্র চিংড়ী বার মাস ডিম্ব পাড়ে, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর ন্যায় ইহাদিগের ডিম্ব বাহিরে থাকে। তাহার জন্য যত্নাদি করে না।

মৎস্যদিগের মধ্যে বিলক্ষণ দলাদলি আছে। সকল জন্তুই, এমন কি মনুষ্য পর্য্যন্ত দলপ্রিয়, কিন্তু মৎস্য সর্ব্বাপেক্ষা। আমরা দুই তিন ঘাটে চার করিয়া দেখিয়াছি, এক ঘাটের মৎস্য অন্য ঘাটে যায় না, এবং গেলেও ঘাট-বাসিন্দা দলের ভয়ে দশ হাত দূরে ঘুরিয়া বেড়ায়।

আহারাদি সম্বন্ধে মৎস্যজাতির বিচার অতি দৃঢ়।

বোয়াল, আইড় প্রভৃতি আমিষভোজী। নিরামিষ টোপ মোটেই গ্রহণ করে না। মাংসাদির উপর ইহাদের অত্যন্ত টান শবদেহ, কীট, পতঙ্গ, বিষ্ঠাদি ইহারা ভাল বাসে। চেখল মৎস্যের (Indo-Aryan type) চিংড়ীর উপর অতিশয় টান ইহাতে বোধ হয় তাহাদিগের অধিক চর্ব্বণ না করিয়া গলাধঃকরণের চেষ্টাই খরতর। মৃগেল নিরামিষ ও আমিষ উভয়ই আহার করে, কিন্তু কেঁচোর উপর টান বেশী। সুন্দর, নধর, গোলাপী রঙ্গের কেঁচো পাইলে ইহারা অন্য কিছু চাহে না। রোহিত মৎস্যের বরফ ছাতু, আটা প্রভৃতির উপর ঝোঁক। ঘৃতসিক্ত হইলে নিস্তার নাই। পিপীলিকার ডিম্ব, ঘোলতার টিপ, প্রভৃতি মিশ্রিত করিলে ইহারা অতিশয় সন্তুষ্ট হয়। মৎস্যের মধ্যে ইহাদের ঈষৎ নবাবী-কেতা আছে। আর্য্যদিগের হোমাবশিষ্ট অন্ন হইতে আরম্ভ করিয়া পবিত্র কীট পতঙ্গাদি ইহাদিগের প্রিয়। কাতলার প্রথা অতি চমৎকার, ইহারা সূচি, চাউলের কুঁড়া,

প্রভৃতি খাইতে ভাল বাসে এবং অগ্রদানী ভ্রাহ্মণের ন্যায় চিৎ হইয়া পড়িয়া থাকে। ফল কথা ইহাদিগের শিকার-প্রিয়তা নাই, এবং বোধ হয় তিব্বতবাসি-গণের ন্যায় ইহারা শান্তপ্রকৃতি, ধর্ম্মভীরু ও হৃষ্টপুষ্ট। ক্ষুদ্রকায় মৎস্যগণের মধ্যে কই, মাগুর, ল্যাঠা প্রভৃতি সম্পূর্ণ আমিষাশী এবং কোল ভীল জাতির ন্যায় নোংরা।

চার করিলে এবং ছিপ ফেলিলে অনেক মৎস্য টোপের নিকট আসে না। যেমন ইলিস, খয়রা, তপসে, খোরসোলা প্রভৃতি। পূর্ব্বে ইহার কারণ উক্ত হইয়াছে। এখন চারের নিকট মৎস্য আসিলে কাহার কি প্রকার প্রবৃত্তি তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে।

টোপ কিংবা খাদ্য দেখিলে মৎস্যগণের একটা প্রকাণ্ড উদ্বেগ উপস্থিত হয়। ভয় হয়, সন্দেহ হয়, লালসা হয়, অনেক সময় আত্মসংযম চেষ্টা হয়। ইহা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে ইহারা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে। আমরা সাধারণ ভাষায় তাহাকে 'ঘুট' বলিয়া থাকি। রোহিত মৎস্যের বেশ পরিষ্কার জোড়া 'ঘুট'। অর্থাৎ দুইটি বড় বড় মটরের ন্যায় কিম্বা শুপারীর ন্যায় (যদি ১০।১৫ সের মাছ হয়) বুদ্বুদ জলের উপর প্রকাশমান হয়। ইহা মৎস্য-বরের নাসিকা বিনির্গত যুগল নিশ্বাস মাত্র। মৃগেলের ঘুট একটাও হইতে পারে, কিংবা ঘন ঘন অনেকগুলি হইতে পারে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। কাতলার বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ঘুট। ইহার সহিত লালা নির্গত হয়। ইহারা অত্যন্ত পেটুক ভ্রাহ্মণের ন্যায় ব্যবহার করে কিন্তু টোপ ধরিতে পারে না। কাজেই গাঁথা ভিন্ন ইহাদের তুলিবার যো নাই। ছোট মাছের মধ্যে পুঁটীর ঘুট প্রশস্ত, অনেক সময় বড় মৎস্যের বলিয়া ভ্রম হয়। বোয়াল প্রভৃতির বড় বড় ঘুট।

ঘুট দেখিয়া বেশ বুঝা যায়, মাছ কত দূরে আছে এবং তাহার উদ্দেশ্য কি। একটা মাছ অনেকক্ষণ ঘুট দিয়া বেড়াইলে বুঝা যায় যে তাহার অগ্নিমান্দ্য হইয়াছে। রোহিত মৎস্য দূরে ঘুট দিয়া হঠাৎ দৌড়িয়া টোপ ধরে। রোহিতের বল এবং প্রথম দৌড় অত্যন্ত বেশী কিন্তু অতি শীঘ্র ক্ষীণ হইয়া পড়ে। অতএব মরিলেও তোফা চেহারা থাকে। মৃগেল মাটী ঘেষিয়া মুক্ত হইবার চেষ্টা করে, অত্যন্ত মুখ-জোর, এবং অসাধারণ সহিষ্ণুতার সহিত 'খেলে'। অতএব মরিলে অত্যন্ত কদাকার দেখায়। কাতলা মরিলে বুঝা যায় না। কারণ প্রয়াণকালে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া মুক্ত হয়।

ধর্ম্ম ও নীতি। ইহা হইতে মৎস্যগণের ধর্ম্মের অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। প্রথমতঃ আমাদিগের বোধ হয় ধর্ম্মযাজক-গণের মধ্যে গলদা চিংড়ি সর্ব্বপ্রধান। ইহারা আসল বৈদিক ভ্রাহ্মণ। কারণ ইহাদিগের দাড়ি গোঁফ লম্বা, এবং নখর সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ। ইহারা বিলক্ষণ প্রাণা-য়াম-পরায়ণ, কারণ 'ঘুট' নাই বলিলেও হয়, এবং গহ্বরে বাস করে। ইহারা প্রাতঃ-কালে এবং সন্ধ্যা ভিন্ন আসরে নামে না, এবং অতি ধীরে ধীরে আহার অন্বেষণ করে। অতি ধীরে ইহাদিগকে সন্ধ্যাকালে

গৌরী রাগিণীর মত, কিংবা প্রাতঃকালে ভৈঁরো রাগের মত ভাঁজিতে হয়। টান মারিবার জো নাই, তান করিবার, কিংবা খেলাইবার জো নাই। আলপিনের বড়শিই ইহাদিগের ব্রহ্মাস্ত্র। ইহারা আহার্য্য বস্তু ধীরে ধীরে গৃহে লইয়া যায়, কখনও বমিয়া খায় না। বোধ হয় প্রথমে ইষ্টদেবতাকে ভোগ দিয়া তবে খায়।

অতি স্থির জলে, নির্জ্জনে, সান্ধ্যগগনের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাক, বহুকালের স্মৃতি তোমার নিকট আসিতে থাকুক, শৈশবের খেলা, যৌবনের প্রণয়, গত নিরাশা এবং ভবিষ্যতের আশা নদীসৈকতে গোধূলির সঙ্গে কম্পিত হউক, সেই সময় ঠিক গলদা চিংড়ী তোমার 'ফাতনা' ডুবাইতে আরম্ভ করিবে। এক ছিলিম তামাকু টানিয়া লও, ধীরে ধীরে উঠাও, প্রথমে অল্প ভারী, তাহার পর বেশী, ক্রমে ঈষৎ ভারনত ছিপের ডগা, তাহার পর মূর্ত্তিমান্ যোগীবর প্রকাশ হইয়া আত্ম বলিদান দিতে বদ্ধ-কর। কি সুন্দর দাড়ী, চক্ষু, এবং কিরাতের ন্যায় জটাপূর্ণ ঘৃতাক্ত মস্তক! তাহার তুলনা নাই।

ধর্ম্মাধিক্যবশতঃ গলদা চিংড়ীর কাঁটা হয় না, এবং জ্ঞানাধিক্যবশতঃ ইহাদিগকে হজম করিতে বিলম্ব হয়।

মৎস্যগণ কোন বিশেষ ধর্ম্মাবলম্বী না হইলেও আমরা তাহাদিগকে হিন্দু বলিতে পারি। কারণ হিন্দুধর্ম্ম বিশ্বজনীন ধর্ম্ম এবং সকলই ইহার মধ্যে আছে। হিন্দু শব্দ 'সিন্ধু'র অপভ্রংশ। সিন্ধু শব্দের অর্থ সমুদ্র। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, সকল জলচরই আদিম কালে বিশাল জলধির মধ্যে বাস করিত, অতএব মৎস্য যে হিন্দু তাহার কোন সন্দেহ নাই।

হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া ইহাদিগের মধ্যে শাক্ত, বৈষ্ণবসম্প্রদায় প্রভৃতি নিশ্চয় আছে। কালবোসের চেহারা ও রক্তবর্ণ চক্ষু দেখিলে ইহাদিগকে শাক্ত বলিয়া বোধ হয়। বেলে মাছ প্রভৃতি বৈষ্ণবের মত।

রোহিত প্রভৃতি Aryan (আর্য্য) Typeএর মৎস্যগণ যে চতুর্ব্বিধ আশ্রম পালন করিয়া থাকে তাহার আভাস পাওয়া যায়। ছোট ছোট পোনা প্রায় টোপ্ ধরে না, এবং বৃদ্ধ হইয়া পড়িলে গভীর জলে গিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে। তখন মোটেই চারে আসে না। মৎস্যগণের পরিব্রাজক ও পরমহংসগণও আছে একদিন দেখিয়াছি চারে এক দল রুই আসিয়াছিল, কিয়ৎক্ষণ পরেই একটা বৃহৎ পুরাতন ও বৃদ্ধ পরিব্রাজক আসিয়া তাহাদিগের সম্মুখে কিঞ্চিৎ ঋজুভাবে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সকলেই টোপের উপর অবহেলা প্রদর্শন করতঃ চলিয়া গেল (ক্রমাগত 'কুট' ও দীর্ঘনিশ্বাস)। ভাব এই যে "এ যাত্রা লোভ সংবরণ করিলাম"।

মিথ্যাকথা, পরনিন্দা, প্রভৃতি কুনীতি মৎস্যগণ আশ্রয় করে কি না তাহা জানি না। কারণ তাহাদিগের ভাষা আমাদিগের নিকট দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু ইহারা নেশা করিতে ভালবাসে। কারণ মদের গোড়া (মহুয়া প্রভৃতি) ও চিনির গাদের চায় প্রভৃতির

চারে ইহারা চট্ করিয়া আসে এবং মত্ত হইয়া নানাপ্রকার অঙ্গ ভঙ্গী করে।

সাহিত্য-কাব্য ইত্যাদি। লেখা-পড়া না জানিলেও ইহাদিগের অঙ্গ ভঙ্গী দ্বারা ও পুচ্ছ প্রভৃতির গতি দ্বারা মৎস্যগণের সাহিত্য এবং কাব্যপ্রিয়তা অনেকটা প্রতীয়মান হয়। কতকগুলি মৎস্য (Turko-Iranian Type) পুচ্ছ সোজা করিয়া আসে এবং সম্মুখ প্রায় পশ্চাদ্গামী হয়। মুখ ফিরায় না। ইহা দেখিয়া বোধ হয় ইহারা ফার্সী ভাষার বুৎপন্ন। অনেকে ডানা নাড়িয়া ছন্দের সহিত নৃত্য করিতে থাকে এবং চক্ষু উল্টাইয়া আকাশের দিকে চাহে; ইহা কবিত্বের লক্ষণ পুঁটী, মৌরলা প্রভৃতি, দলে দলে একটা কাল্পনিক কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে পরিধি আকারে ঘুরিতে থাকে এবং মধ্যে একটা সরল পুঁটী হতভম্বার ন্যায় স্থির হইয়া থাকে। ইহা নগর-সংকীর্ত্তনের লক্ষণ।

বাইন প্রভৃতি মৎস্যের আবিষ্কার-প্রিয়তা লক্ষ্য করিয়াছি। ইহারা প্রস্তরাদির মধ্যে পুরাতন চিহ্নাদি দেখিয়া অনেকক্ষণ শুঁড় বাহির করিয়া বসিয়া থাকে। বোধ হয় প্রত্নতত্ত্বে ইহাদিগের বিশেষ ক্ষমতা আছে।

ক্ষুদ্র মৎস্যগণ সারাদিন হাস্য পরিহাসে মগ্ন থাকে। সন্ধ্যাবন্দনা ইহাদিগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সারাদিন শিকারে হতাশ্বাস হইয়া সূর্য্যাস্তের পর পুষ্করিণীর পাড়ে বসিয়া থাক। মৃদু বায়ুহিল্লোলে সরসী-বারির ক্ষুদ্র তরঙ্গের ভেদ করিয়া ছোট এবং বড় মৎস্যপুচ্ছ দেখিতে পাইবে। একটি বিরাট জীবনের ক্রোড়ে ক্ষুদ্র জীবনের ক্রীড়া! তখন দেখিলে হৃদয় আনন্দে ভরিয়া আসে। হে মৎস্যগণ তোমরা সমুখীন নিশায় পরম পিতার ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ কর।

সুরদাস।

বৌদ্ধসংঘের গঠন ও নিয়মপদ্ধতি।

ভিক্ষু-সম্প্রদায় সংগঠিত হইলে পর, উহার সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য ভিক্ষুগণের মধ্যে পদমর্য্যাদার উচ্চ-নীচতা স্থাপন করা আবশ্যক হইল। পদমর্য্যাদা শ্রেষ্ঠতার দুইটি লক্ষণ নির্দ্ধারিত হইল;—বয়স ও গুণ। ভিক্ষুকগণ বয়স অনুসারে পদ-মর্য্যাদা লাভ করিত। বয়ঃজ্যেষ্ঠগণ স্থবির নামে অভিহিত হইত। গুণ দেখিয়াও পদ-মর্য্যাদা নির্দ্ধারিত হইত। যে ভিক্ষু স্বকীয় গুণের দ্বারা প্রাধান্য লাভ করিত, সে প্রাধান্য অধিসম্বাধিত। যে সকল ভিক্ষু গুণ ও বিদ্যায় গরীয়ান্ তাঁহারা আর্য্য নামে অভি-হিত হইত। উচ্চ-নীচ দশ পদবীর আর্য্য ছিল; ইহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্হৎ অর্থাৎ পূজনীয়।

যে চারিটি অবস্থা অতিক্রম করিলে অর্হৎগণ চরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, শাক্যসিংহ সেই চারি অবস্থার কথা

গণের বোধশক্তি ও যোগ্যতা অনুসারে বিবৃত করিয়াছিলেন। এই অবস্থার দুইটি অংশ পৃথক করা আবশ্যক ;—প্রথম, যে অবস্থায় সাধক সিদ্ধির পথে অবস্থিতি করে ; দ্বিতীয়, যে অবস্থায় যাত্রাকালে পুরস্কার লাভ করা যায়। ইহা হইতেই এইরূপ বৌদ্ধবাক্য প্রচলিত ;—"তিনি অমুক অবস্থায় পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।" "স্রোত আপত্তি"—অর্থাৎ যে অবস্থায় স্রোতে গা ভাসাইয়া দেওয়া হয়—Turnourএর মতে এইটি অন্তঃশুদ্ধির প্রথম অবস্থা। এই অবস্থায় যে প্রবেশ করিয়াছে, সে পর পর অন্য অবস্থাগুলিতে উপনীত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় অবস্থা "সকৃদ্-আগামিন্";—অর্থাৎ যাহার আর একবার প্রত্যাগমন করিতে হইবে। এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে, "স্রোত-আপত্তির" সমস্ত গুণ অর্জ্জন করিতে হইবে, বাহ্য বিষয়ের আসক্তি হইতে মুক্ত হইতে হইবে, এবং অন্যের অনিষ্ট কামনা হইতে বিরত হইতে হইবে।

তৃতীয় অবস্থা—"অনাগামিন্" ; অর্থাৎ যে অবস্থায় আর প্রত্যাগমন করিতে হইবে না। প্রথমোক্ত দুই অবস্থা অতিক্রম করিয়া অজ্ঞান, সংশয় ও বিদ্বেষজনিত কুপ্রবৃত্তি হইতে মুক্ত হইয়া, তবে এই "অনাগামিন্" অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়।

সর্ব্বশেষে চতুর্থ অবস্থা—অর্হৎ-এর অবস্থা। ইহাই উচ্চতম অবস্থা। ভিক্ষু-ধর্ম্ম গ্রহণ ও একটি উচ্চতর বিদ্যার সহায়তা ব্যতীত এই অবস্থায় উপনীত হওয়া যায় না।

প্রাক্তক অবস্থাগুলি হইতে আরও উচ্চতর দুইটি অবস্থা আছে ; কিন্তু অল্প লোকই সেই অবস্থায় উপনীত হইতে পারে। ইহা "বোধি"র অবস্থা। অর্থাৎ ইহাতে বুদ্ধের অবস্থা ও বুদ্ধের বুদ্ধি দুই এক সঙ্গে অবস্থিত। এই অবস্থাপন্ন ব্যক্তি—সর্ব্বজ্ঞ। তাহার পর,—"প্রত্যক্-বুদ্ধের" অবস্থা ; "প্রত্যক্ বুদ্ধ" কি না ব্যক্তিগত বুদ্ধ। বুদ্ধের সমস্ত সিদ্ধি, বিজ্ঞান, শক্তি ও মৈত্রী যাঁহাতে আছে, কেবল সম্যক্‌সম্বুদ্ধের যে পরিত্রাণ করিবার সামর্থ্য, সেই সামর্থ্যটি যাঁহাতে নাই, এইরূপ ব্যক্তিই "প্রত্যক্ বুদ্ধ" নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে দেখা যাক, ভিক্ষু-সংঘের জীবন-যাত্রার প্রণালী কিরূপ ছিল।

প্রতিদিন প্রাতে ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া খাদ্যদ্রব্যের জন্য ভিক্ষুদিগকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইত। মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে তাহাদিগকে ভোজন করিতে হইত। উহাই তাহাদের একমাত্র আহার। নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের সম্বন্ধে তিলমাত্র অবহেলা করিলে দণ্ডিত হইতে হইত। প্রত্যেক ভিক্ষুর নিজের বস্ত্র নিজেকেই ধৌত করিতে হইত, সেই বস্ত্র ছিন্ন কাপড়ের টুকরা জুড়িয়া নিজেরই প্রস্তুত করিতে হইত। সকলের সঙ্গে একত্র বসিয়া আহার করিতে হইত, একত্র ধর্ম্মসাধনা করিতে হইত, পরস্পরকে সাহায্য করিতে হইত, পরস্পরকে শিক্ষা দান করিতে হইত। অল্পবয়স্ক ভিক্ষুদিগকে পাঁচ বৎসরের জন্য কোন এক উপাধ্যায়ের অধীনে অবস্থিতি করিতে হইত। ভিক্ষার্থে বাহির হইবার পূর্ব্বে, প্রাতঃকাল হইতে উহারা, বুদ্ধের উপদিষ্ট বীজমন্ত্রগুলি সুর করিয়া আবৃত্তি করিত।

বিহারের অবশিষ্ট সময় এবং অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত (কেননা, উহারা অল্পক্ষণ নিদ্রা যাইত) বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধে আপনাদের মধ্যে বাক্যালাপ করিত, ইহার বিষয়সম্বন্ধে আলোচনা করিত, চিন্তা করিত। মাসের মধ্যে দুইবার করিয়া আপনাদের পরস্পরের নিকট পাপ খ্যাপন করিত। কোন বৌদ্ধ আচার্য্য, তীর্থযাত্রার বাহির হইয়া কোন বৌদ্ধসংঘের নিকট দিয়া গেলে, "শ্রামণের"দিগের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক তাহারাই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত, তাঁহার উত্তরীয়-বস্ত্র গাত্র হইতে খুলিয়া লইত, তাঁহার হস্ত হইতে তাঁহার কমণ্ডলু নামাইয়া রাখিত, পা ধুইবার জল দিত ও রাত্রির জন্য শয্যা প্রস্তুত করিত।

ভিক্ষুদিগকে কি প্রকারে ভিক্ষা করিতে হইবে, তাহারও নিয়ম নির্দ্দিষ্ট ছিল। ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া, উত্তর-বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া, নতনেত্রে, নিঃশব্দে, অদ্রুতপদে, অবহিত ভাবে, গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করিতে হইবে। কিছু ভিক্ষা পাইলে ভিক্ষাপাত্রটি উত্তর-বস্ত্রে আচ্ছাদন করিয়া, ভিক্ষাদাতার মুখের দিকে নেত্র উত্তোলন না করিয়া, নিঃশব্দে প্রস্থান করিতে হইবে। কোনক্রমেই ভিক্ষা না হইতে পারিলে না। দরিদ্রের দ্বারে ভিক্ষা করিতে যাওয়া নিষিদ্ধ। কেননা তাহা হইলে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য হইতে দরিদ্র ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা হয়। স্বর্ণ-রৌপ্য গ্রহণ করা একেবারেই নিষিদ্ধ। খাদ্যদ্রব্য, সামান্যবস্ত্র, ঔষধ এই সকল কিনিসই ভিক্ষুরা গ্রহণ করিতে পারে কোন গৃহে বা গ্রামে ভিক্ষুরা কোন ব্যপদেশেই রাত্রিযাপন করিতে পারে না।

বৌদ্ধসংঘও,—কি ভূমি, কি দাস, কি অশ্ব, কি গবাদি অন্য পশু, কি স্বর্ণ— ইহার কিছুই গ্রহণ করিতে পারে না। কেননা প্রত্যেক ভিক্ষু যাহা পাইতে পারে, তাহা অপেক্ষা কিছুমাত্র অধিক গ্রহণ করিবার সংঘের অধিকার নাই। যদি কোন ভিক্ষু নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া স্বর্ণ গ্রহণ করে, তাহাকে সমস্ত ভিক্ষুসংঘের নিকট সকাতরভাবে দোষ খ্যাপন করিতে হইবে। তখন, সেই স্বর্ণও কোন ভিক্ষুর হস্তে কিংবা তাহার অবিদ্যমানে, কোন বিশ্বাসী উপাসকের হস্তে অর্পিত হইবে, সে উহা এমন কোন স্থানে নিক্ষেপ করিবে, যেখানে কেহ না খুঁজিয়া পায়।

ভারতবর্ষে বর্ষা তিন মাস কাল স্থায়ী হয়। এই সময়ের মধ্যে ভিক্ষুরা বাহিরে শয়ন করিতে পাইত না, ভ্রমণ করিতে পাইত না। এই নিষেধ-আজ্ঞা হইতেই বিহারনির্ম্মাণের আবশ্যকতা হয়। প্রথম সময় গুহার মধ্যে কতকগুলি কক্ষ খনন করিয়া, অথবা কতকগুলি কাষ্ঠের কুটীর একত্র সংযুক্ত করিয়া বিহার নির্ম্মিত হইত। পরে এইগুলি প্রকাণ্ড মঠে পরিণত হইল। এই সকল গুহা-খাত বিহার ভিক্ষুদিগের যেমন আবাস গৃহ হইল, সেইরূপ তীর্থযাত্রীদিগেরও আগন্তুকদিগেরও বিশ্রাম-স্থান হইয়া দাঁড়াইল। কঠিন শৈলময় কোন এক পর্ব্বতে নিদান ৮ কিলোমেটর ব্যাপী এলোরার গুহামন্দির, এইরূপ বিহারের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

এ কথা সত্য, এই যুগে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা বুদ্ধের আদর্শ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম অনেকটা স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। কেননা বিহারগুলি বিস্তৃত ভূখণ্ড অধিকার করিয়া এক একটা বৃহৎ ভূসম্পত্তির সামিল হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের আদি-কালে বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে এরূপ ঐশ্বর্য্যের আতিশয্য দৃষ্ট হইত না, মধ্যযুগের খৃষ্টীয় মঠের ন্যায়, তখন বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রীভাবের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হইত। বহুকাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ভিক্ষুর সম্বলের মধ্যে ছিল—নিজ উপার্জ্জিত পুণ্যটুকু, পরিচ্ছদের মধ্যে—একখণ্ড ছিন্ন বস্ত্র, বাসের জন্য বিহারের অন্তর্গত একটি অন্ধকার-কুঠরী ও আসবাবের মধ্যে একটি ভিক্ষাপাত্র।

বৌদ্ধভিক্ষু-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন প্রকার জোর-জবরদস্তি ছিল না। কোন ভিক্ষু বহিষ্কৃত হইবার উপযুক্ত কোন দোষ করিলে সংঘ হইতে বহিষ্কৃত হইত। লঘু দোষ করিলে, দোষখ্যাপন ও প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা অব্যাহতি পাইত। অতীত জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য স্মরণ করিয়া যদি কোন ভিক্ষুর কষ্ট বোধ হইত, তখনই সে অনায়াসে সংঘ ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিত।

ভিক্ষুণী-সম্প্রদায়ের কথা বলিবার পূর্ব্বে, —বৌদ্ধধর্ম্মে স্ত্রীজাতির কিরূপ অবস্থা ছিল তৎসম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব। আমি ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম নারীর মহত্ত্ব ও সদ্‌গুণসমূহের মর্য্যাদা ঠিক বুঝিয়াছিল। নারীকে সম্মানের দৃষ্টিতে, শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দর্শন করিত। যে যুগে বুদ্ধ জীবিত ছিলেন, তখনও রমণীগণ অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকিত না, ভিক্ষুদিগকে ভিক্ষা দিবার ভার সাধারণতঃ রমণীদের উপরেই ন্যস্ত ছিল। বুদ্ধদেবের শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক থাকিত; আর ইহা নিশ্চিত, রমণীদিগের উৎসাহ ও ভক্তিনিষ্ঠা, বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারে অনেকটা সহায়তা করিয়াছিল। প্রথম হইতেই বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে বহুসংখ্যক "উপাসিকা" ছিল। Oldenberg বলেন, "শ্রাবস্তি নগরের বিশাখা নাম্নী একজন সম্ভ্রান্তা রমণী ছিলেন; তিনি বহু সন্তানের জননী, ও বহু পৌত্রের পিতামহী। যজ্ঞে উৎসবে, সকলেই বিশাখাকে নিমন্ত্রণ করিত, এবং সকলের আগে তাঁহারই পরিচর্য্যা হইত; "তাঁহার ন্যায় অতিথি গৃহে সৌভাগ্য আনয়ন করেন।" এই বিশাখা লোকসেবায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন, এবং বুদ্ধশিষ্যাদিগের গুরুতর অভাবসকল পূরণ করিবার জন্য সর্ব্বদাই আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। একদিন শিষ্যদিগের সহিত বুদ্ধ বিশাখার গৃহে ভোজন করিতেছিলেন। ভোজন শেষ হইলে বিশাখা তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিল এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া এই কথাগুলি বলিল;—"ভগবানের নিকট আমি আটটি অনুগ্রহ যাচ্ঞা করি...আমার ইচ্ছা, আমার জীবৎকালে, সংঘকে বর্ষার কাপড় যোগাইব; অন্যত্র হইতে যে সকল ভিক্ষু এখানে আসেন, যে সকল ভিক্ষু এখান দিয়া যাত্রা করেন, যে সকল ভিক্ষু পীড়িত যাঁহারা পীড়িতদিগের পরিচর্য্যা করেন, তাঁহাদের সকলেরই আমি আহার যোগাইব, ভৈষজ্য যোগাইব, তাঁহাদিগকে দৈনিক অন্ন বিতরণ

করিব, তাঁহাদের স্নানের পরিচ্ছদ যোগাইব" .....বিশাখা এইরূপ উদারচরিতা রমণী ছিলেন; এই সকল রমণী তাঁহাদের বিপুল অর্থের দ্বারা, অসীম ধর্ম্মোৎসাহের দ্বারা বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মহৎ উপকার সাধন করিতেন "

বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রতি, রমণীদিগের এইরূপ অসন্ত উৎসাহ ও অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধদেব রমণীদিগকে সংঘের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। "যেমন জলের মধ্যে মৎস্যের গতি দুর্লক্ষ্য ও প্রচ্ছন্ন সেইরূপ নারীর স্বভাব রহস্যময়, তাহাদিগের অন্তরের প্রকৃত কথা অবগত হওয়া দুষ্কর।" "অতএব তাহাদিগকে দর্শন না করা, তাহাদের সহিত কথা না কহাই কর্ত্তব্য। যদি একান্তই তাহাদিগকে এড়াইতে না পারা যায়,তাহাদিগের সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া আবশ্যক।" তথাপি, শাক্যমুনির মাতৃস্বসা মহাপ্রজাপতি—যাঁহার ক্রোড়ে শাক্যমুনি লালিতপালিত হন—সর্ব্ব প্রথমে তিনিই সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধের শিষ্য ও আত্মীয় আনন্দের অনুরোধে, আরও কতকগুলি রমণী ভিক্ষু-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। বুদ্ধের পত্নীও এই সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ ভিক্ষুণী-সম্প্রদায় বিস্তৃত হইয়া পড়িল। পুরুষদিগের ন্যায় উহাদের একই ব্রত নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইল এবং সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা তাহাদেরও একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল। যে কোন ভিক্ষুণী এই ব্রত লঙ্ঘন করিত, তাহাকে তৎক্ষণাৎ সংঘ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইত। ভিক্ষুদিগের ন্যায়, ভিক্ষুণীদিগকেও জীবিকার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত। ভিক্ষুণী-সম্প্রদায় একটি পৃথক্ সম্প্রদায়, কিন্তু ভিক্ষু-সংঘের অধীন। উহাদের নিজের বিহার ছিল; বিহারে উহারা একত্র বাস করিত; কারণ ভিক্ষুণীদিগের পক্ষে একাকী থাকা নিষিদ্ধ। উপসম্পদা গ্রহণের পূর্ব্বে, দুই বৎসর কাল তাহাদিগকে শিক্ষানবীশ-রূপে থাকিতে হইত, এবং উপদেশগুলি যথাযথ পালন না করিলে তাহাদিগকে গ্রহণ করা হইত না। পাপ-খ্যাপনের সময় ও উপদেশ-শ্রবণের সময় ভিন্ন, ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের সহিত কথা কহিতে পাইত না। যদিও ভিক্ষুদের ন্যায় ভিক্ষুণীরা একই প্রকার জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত, তথাপি ভিক্ষুণীদিগের জন্য কতকগুলি বিশেষ নিয়ম ছিল। ভিক্ষুণী-সংঘ কোন রমণীকে উপসম্পদা প্রদান করা সত্ত্বেও যতক্ষণ না তাহা ভিক্ষু-সংঘের অনুমোদিত হইত, ততক্ষণ সে উপসম্পদা গ্রাহ্য হইত না। সেইরূপ, ভিক্ষুণীরা আপনাদের মধ্যে দোষখ্যাপন করিলেও, ভিক্ষুসংঘে গিয়া সেই দোষখ্যাপন তাহাদিগকে পুনর্ব্বার করিতে হইত। সাধারণ সংঘের জন্য অন্যত্র হইতে যে সকল দান পাওয়া যাইত, তাহা ভিক্ষু-সম্প্রদায় ও ভিক্ষুণী-সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্দ্ধার্দ্ধভাবে বিভাগ হইত।

আমি যে এখনও পর্য্যন্ত বৌদ্ধদিগের ক্রিয়াকলাপের কোন উল্লেখ করি নাই, তাহার কারণ, প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মে ক্রিয়াকলাপের বড় একটা প্রাধান্য ছিল না। ফলত যে ধর্ম্মে বাঁধাবাঁধি ধর্ম্মমত খুবই অল্প,

সে ধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপও খুব অনাড়ম্বর। বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল। শাক্যমুনি এ বিষয়টা এত তুচ্ছ মনে করিতেন যে, ধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠান অপেক্ষা, নৈতিক কর্ত্তব্যগুলিকেই তিনি সর্ব্বদা উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছিলেন।

শাক্যসিংহ কখনই ঈশ্বরাবতার বলিয়া আপনার পরিচয় দেন নাই। তিনি বরাবর বলিয়া আসিয়াছেন, তিনি একজন মনুষ্যমাত্র—নিজ শক্তির দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন শরীরের প্রতি, এবং যাহা কিছু ভৌতিক তাহার প্রতি তাঁহার সুগভীর অবজ্ঞা ছিল। সুতরাং, তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে দেবতা-রূপে পূজা করিবে, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত ছিলনা; তিনি তাহাদিগকে স্পষ্টই নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন, যেন তাঁহার উদ্দেশে কোন মন্দির প্রতিষ্ঠিত না হয়। তিনি ঈশ্বরসম্বন্ধে কোন উপদেশ দেন নাই; কারণ তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মতন্ত্রে তিনি স্বীকার করেন নাই যে, মানুষের কাজে ঈশ্বরের কোন হাত আছে; অতএব কি দণ্ড, কি পুরস্কার—ইহার জন্য ঈশ্বরের আরাধনা নিষ্প্রয়োজন; এবং এই জন্যই ঈশ্বরের স্বরূপ ও মানুষের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ নির্ণয় করা তিনি আবশ্যক বোধ করেন নাই। এই কারণেই বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান—"পূজা" নামে এবং ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান "যজ্ঞ" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ফলত, আদি-বৌদ্ধদিগের মতে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা বুদ্ধদেবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাই বৌদ্ধধর্ম্মের ধর্ম্মানুষ্ঠান। এই পূজার দুইটিমাত্র উপকরণ; বুদ্ধের মূর্ত্তি-স্থাপন ও স্তূপনির্ম্মাণ। এই স্তূপে বুদ্ধের দেহাবশেষ রক্ষিত হয়। আর ক্রিয়া-কলাপের কথা যদি বল, সে অতি সাদাসিধা রকমের; পুষ্পাঞ্জলী দিয়া, সুগন্ধী ধূপ পুড়াইয়া, গান ও স্তবস্তুতি করিয়া, শত শত বৎসর যাবৎ বুদ্ধের ভক্তগণ বুদ্ধকে পূজা করিয়া আসিতেছে।

এই পূজাপদ্ধতির আড়ম্বর-হীনতা সত্ত্বেও, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, গোড়ায় বুদ্ধের যে অভিপ্রায় ছিল, বুদ্ধের ভক্তেরা তাহা অতিক্রম করিয়াছে। তাঁহার মৃত্যু হইলে, লোকেরা তাঁহার প্রতি রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন করে, খুব আড়ম্বরের সহিত তাঁহার অগ্নি সৎকার করে; এবং যে সকল রাজা তাঁহার ভক্ত ছিল, তাহারা তাঁহার ভস্মাবশেষ অতীব ভক্তিসহকারে সংগ্রহ করিয়া আপনাদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া লয়। দারিদ্র্য-ব্রত গ্রহণের জন্য যিনি সিংহাসন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন, যিনি তাঁর জীবদ্দশায় এই শরীরকে পূতিগন্ধী আবর্জ্জনা বলিয়া মনে করিতেন, যিনি তাঁহার জীবদ্দশায় এরূপ সম্মান আদৌ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার প্রতি এইরূপ সম্মান প্রদর্শন করা হয়—এরূপ কখনই তাঁহার আবেশ হইতে পারে না, এরূপ সম্মান কখনই তাঁহার অনুমোদনীয় হইতে পারে না। তাঁহার অন্তিমকালের বাক্য শ্রবণ করিলে এবিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র থাকে না। তিনি সেই সময় তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন:—"আমার ধর্ম্মমতকে অনু-

সরণ করাই আমার পক্ষে সম্মান প্রদর্শন করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা।" অতএব যিনি এইরূপ অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের বিধান করিয়াছিলেন, তিনি যে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে বলিবেন, সেই প্রতিমূর্ত্তিকে পুষ্পাঞ্জলী দ্বারা পূজা করিতে বলিবেন, ইহা কখনই স্বীকার করা যাইতে পারে না। অতীব প্রাচীন সূত্রের মধ্যেও এরূপ আদেশের কোন চিহ্নমাত্রও নাই। কিন্তু মানুষ, কোন প্রকার পূজা-অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া-কলাপ না করিয়া থাকিতে পারে না। বৌদ্ধেরাও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম স্থল নহে। একটা সাদাসিধা অনুষ্ঠান পদ্ধতি হইতে যাহা আরম্ভ করিয়া, বৌদ্ধেরা, বিশেষত তিব্বতের বৌদ্ধেরা ক্রমে অন্ধ-বিশ্বাসমূলক কতকগুলা পুরাবৃত্তের অনুষ্ঠানে আসিয়া পৌঁছিল। জেসুট পাদ্রিদিগের দ্বারা দীক্ষিত আমেরিকান-ইণ্ডিয়ান ও নিগ্রো নিগ্রোদের আধা-খৃষ্টান ও আধা পৌত্তলিক ধর্ম্মের জন্য যেমন খৃষ্টকে দায়ী করা যায় না, সেইরূপ বৌদ্ধধর্ম্মের এই ভ্রষ্টাচারগুলির জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতাকে দায়ী করাও ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। অতএব ইহা নিঃসন্দেহ যে, বুদ্ধ আপনাকে মানুষের আসনেই স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার যে সকল মূর্ত্তি দেখা যায়, তাহা ভারতের ও সাধারণ এসিয়ার প্রচলিত কোন অদ্ভুত গঠনের দেবমূর্ত্তি নহে, ইহা ধ্যানাসনে ও উপদেষ্টার আসনে উপবিষ্ট মানুষেরই মূর্ত্তি। অতএব ইহাই একটা প্রমাণ—যে দেশে ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা মাত্রকেই দেবত্ব প্রদান করিয়া থাকে, যে দেশে ঈশ্বর অবতার হইয়া মানব দেহ ধারণ করেন এইরূপ সাধারণের বিশ্বাস, সেই দেশে, বৌদ্ধসম্প্রদায়ের কোন শাখাই, বুদ্ধের উপর দেবত্ব আরোপ করিতে সাহস করে নাই; কেননা, তাহারা এ কথা বিলক্ষণ জানিত যে বৌদ্ধধর্ম্মের মতে দেবতা মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন না, পরন্তু মানুষই সাধনাবলে দেবত্ব লাভ করে।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম যুগে, কেবল দুইটি অনুষ্ঠান ছিল; দুইটিই স্বয়ং বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। উহার মধ্যে একটির কথা অনেকবার বলিয়াছি, কারণ উহা অতীব প্রয়োজনীয়। সেটি দোষ-খ্যাপনের অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানটি বলিতে গেলে সমস্ত বৌদ্ধধর্ম্ম-বিশ্বাসের ভিত্তি-স্বরূপ। ভালো কার্য্যের দ্বারা মন্দ কার্য্যের খণ্ডন করা যাইতে পারে, এই বিশ্বাসটি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্মেও প্রচলিত। কারণ,—কি ভাল, কি মন্দ, সকল কার্য্যেরই ভাল দণ্ড কিংবা পুরস্কার নির্দ্দিষ্ট আছে। এই বিশ্বাস হইতেই প্রায়শ্চিত্তের উৎপত্তি। এই উপায়ে, অপরাধী ব্যক্তি ধর্ম্ম সাধন করিয়া আপনাকে পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। এই দোষ-খ্যাপন ব্যাপারই বৌদ্ধদিগের প্রায়শ্চিত্ত-অনুষ্ঠান। অনুতাপসহকৃত পাপ-খ্যাপনই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। এবং এই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত তিন জাতীয় দোষসম্বন্ধে প্রযুক্ত হইত:—কায়িক, বাচিক, মানসিক। একজন ভিক্ষু আর একজন ভিক্ষুকে কটূক্তি করায়, যে কটূক্তি করিয়াছিল তাহাকে অপর ভিক্ষু বলিল:—"এই দোষের জন্য, তুমি স্বীকার কর যে তুমি পাপ করিয়াছ; স্বীকার করিলে, তোমার দোষের লাঘব

হইবে, তোমার দোষের উচ্ছেদ হইবে, তোমার দোষ ক্ষমাযোগ্য হইবে।"

দোষখ্যাপনপ্রথা বৌদ্ধসংঘে প্রথম হইতেই প্রবর্ত্তিত হয়। প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায়, উপবাসের দিনে এই অনুষ্ঠানটি সমস্ত ভিক্ষুমণ্ডলীর সমক্ষে গম্ভীরভাবে সম্পাদিত হইত, কেবল পীড়িত ও উন্মাদ-গ্রস্ত ভিক্ষুরা ইহা হইতে অব্যাহতি পাইত। ভিক্ষুমণ্ডলী সমবেত হইলে পর সংঘ-নায়ক দোষখ্যাপনের বচন আবৃত্তি করিত; ওলডেন্‌বর্গের "বুদ্ধ" নামক গ্রন্থ হইতে আমি একটা অংশের অনুবাদ দিতেছি—"পূজনীয় ভিক্ষুগণ, অবধান করুন। অদ্য উপবাস-বাসর, অমুক পক্ষের চতুর্দ্দশী পূজনীয়গণ আপনারা যদি প্রস্তুত থাকেন, শুদ্ধি কিম্বা অশুদ্ধি খ্যাপন করুন। আমি দোষখ্যাপনের বচন আবৃত্তি করিতেছি। (সংঘ উত্তর করিল):— আমরা সকলেই এখানে উপস্থিত আছি, আমরা অবহিত হইয়া আপনার বাক্য শ্রবণ করিব। তাহার পর সেই বচনের আবৃত্তি—আপনাদের মধ্যে যদি কেহ কোন পাপ করিয়া থাকেন খ্যাপন করুন। যদি না করিয়া থাকেন তবে মৌনী থাকুন। আপনাদিগকে মৌনী দেখিয়া আমি বুঝিলাম আপনারা শুদ্ধ আছেন। যেরূপ কোন ভিক্ষুকে পৃথক্ ভাবে কোন প্রশ্ন করিলে, সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাহার কর্ত্তব্য, সেইরূপ এই সংঘের সমক্ষেও কোন ভিক্ষুকে তিনবার প্রশ্ন করিলে, তাহার উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য। তৃতীয় বার প্রশ্ন করিবার পরেও যে ভিক্ষু কৃত পাপ খ্যাপন না করে, সে জ্ঞান-পূর্ব্বক মিথ্যাকথন-অপরাধে অপরাধী হইবে। এবং পূজনীয়গণ, আপনারা ত অবগত আছেন জ্ঞানপূর্ব্বক যে মিথ্যাকথা কহে সে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইহাই ভগবানের বচন। অতএব যদি কোন ভিক্ষু কোন পাপ করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার যদি তাহা স্মরণ থাকে, এবং তিনি যদি শুদ্ধি লাভ করিতে অভিলাষী হন, তবে তিনি অবিলম্বে সেই পাপ খ্যাপন করুন। কারণ, পাপ খ্যাপন করিলে, তাঁহার হৃদয় লঘু হইবে।"

তদনন্তর যে সকল দোষ খ্যাপন করা আবশ্যক, সেই সকল দোষের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক আবৃত্তি করা হয়। যে সকল অপরাধ করিলে সংঘ হইতে বহিষ্কৃত হইতে হয়, সর্ব্বপ্রথমে সেই সব গুরুতর অপরাধের উল্লেখ করা হইয়া থাকে— যথা দয়া ও শীলের লঙ্ঘন ইত্যাদি। তাহার পর, সংঘ-নায়ক উপস্থিত ভিক্ষুমণ্ডলীকে তিনবার এইরূপ প্রশ্ন করেন:—

"পূজনীয়গণ, এক্ষণে আপনাদিগকে এই প্রশ্ন করিতেছি। এই সকল দোষ সম্বন্ধে আপনারা পরিশুদ্ধ আছেন কি না? দ্বিতীয়বার আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি আপনারা পরিশুদ্ধ আছেন কি না? তৃতীয় বার আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনারা পরিশুদ্ধ আছেন কি না? (যদি সকলেই মৌনী থাকেন):—এই পূজনীয়গণ পরিশুদ্ধ বলিয়াই মৌনী হইয়া আছেন; এইরূপ ত আমি বুঝিয়াছি।"

তাহার পর লঘুতর দোষগুলি যথাক্রমে পঠিত হয়। এই সকল দোষের লঘুদণ্ড স্বরূপ

কিছুকালের জন্য পদাবনতি বা সম্প্রদায়চ্যুতি হইয়া থাকে। যে কোন ভিক্ষু দূষিত অন্তঃকরণে, কোন রমণীর হস্ত কিংবা শরীর স্পর্শ করে ইহার উক্ত প্রকার দণ্ড হইয়া থাকে।

এই সকল দোষের "চুল-চেরা" সূক্ষ্ম পার্থক্যসূচক শ্রেণীবিভাগের ব্যাপারটা খুব পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। Cowma বলেন যে গ্রন্থে এই শ্রেণীবিভাগ সন্নিবিষ্ট সেই "প্রাতিমোক্ষ সূত্রে" ২৫৩ নিয়ম আছে—এই নিয়মগুলি আবার দোষের প্রকৃতি অনুসারে পাঁচভাগে বিভক্ত।

আদি বৌদ্ধধর্মের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান—ক্ষমা প্রার্থনা। বর্ষাকালে ভ্রমণ করা কিংবা সংঘ হইতে দূরে প্রস্থান করা ভিক্ষুদের পক্ষে নিষিদ্ধ।

বর্ষার তিনমাস সকলে একত্র থাকিয়া, যখন আবার পরিভ্রমণের সময় উপস্থিত হইত তখন যাত্রার পূর্ব্বে সকলে গম্ভীরভাবে সভাস্থলে আসিয়া একবার সমবেত হইত। বয়ঃজ্যেষ্ঠ হইতে সর্ব্বকনিষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই পর্য্যায়ক্রমে আসিয়া, সমস্ত ভ্রাতৃমণ্ডলীকে অতিবিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিত, তাঁহারা তাহার কোন দোষ দেখিয়াছেন কি না, কিংবা তাহার আচরণে এমন কিছু দেখিয়াছেন কি না যাহা তিরস্কারযোগ্য। সে বলিত :—পূজনীয়গণ, আমি সংঘকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতেছি—আমার সম্বন্ধে এরূপ কোন কিছু আপনারা দেখিয়াছেন কিংবা শুনিয়াছেন কি না। যদি সে বিষয়ে আপনাদের কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে, পূজনীয়গণ কৃপা করিয়া আমাকে তাহা বলুন। যদি জানিতে পারি, এখনই তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

সংক্ষেপে বলিতে গেলে,—শ্মশ্রু ও কেশ মুণ্ডন করা, একখণ্ড চীরবস্ত্র পরিধান করা, ভিক্ষালব্ধ যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য আহার করিয়া জীবন ধারণ করা, একবেলামাত্র ভোজন করা, নিম্ন ও কঠিন শয্যায় অল্পক্ষণ নিদ্রা যাওয়া, শৈল-গাত্র একটি ক্ষুদ্র কক্ষের মধ্যে বাস করা, আসবাবের মধ্যে একটি মৃৎপাত্র সঙ্গে রাখা—ইহাই ভিক্ষুর বহির্জীবনের নিয়ম পদ্ধতি।

ঐকান্তিক ব্রহ্মচর্য্য ও ইচ্ছাপূর্ব্বক দারিদ্র্য ব্রত গ্রহণ করা, সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকা, কোন জীবের প্রতি হিংসা না করা, মিথ্যাকথা না বলা, কাহাকে প্রতারণা বা কাহারও নিন্দা না করা, শত্রুকে ক্ষমা করা, অপকারের প্রতিদানে উপকার করা,—এই সকল বৌদ্ধদিগের সাধারণ নীতি-উপদেশ।

আধ্যাত্মিক ভ্রাতাদিগের সহিত একত্র বাস করা, বুদ্ধদেবের ধর্ম্মমত অনুশীলন ও তাঁহার উপদেশ সকল গম্ভীরভাবে অনুধ্যান করা, স্বকীয় পাপ খ্যাপন করা, দোষ-ত্রুটির জন্য আধ্যাত্মিক ভ্রাতাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা, এবং যাহাতে সংশোধিত হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে তাহাদের দোষ প্রদর্শন করিবার জন্য তাহাদের নিকট অনুনয় করা, দূরদেশে গিয়া অবিশ্বাসী ও অজ্ঞলোকদিগের নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করা—এই সকল সুঠোচিত কর্ত্তব্যের নিয়ম।

আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভের জন্য প্রথম

করা, শরীর বাক্য ও মনে পরিশুদ্ধ থাকা, অহং-কে জয় করা, ভয়, দ্বেষ ও বাসনা হইতে মুক্ত হওয়া, সকলের প্রতি মৈত্রীভাব প্রদর্শন করা, এবং শান্ত ও নিরুদ্বিগ্নচিত্তে নির্ব্বাণে প্রবেশ করা,—ইহাই বুদ্ধের পরিকল্পিত ভিক্ষু-জীবনের চরম আদর্শ, এবং এই আদর্শকে আদিবৌদ্ধধর্ম্মের শত শত ভিক্ষুগণ স্বকীয় জীবনে সার্থক করিয়া তুলিয়াছিলেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মানবের জন্মকথা।

জীবন-সংগ্রামে মানব অসাধারণ ভাবে জয়যুক্ত হইয়াছে। তাহার হস্তের মুক্তাবস্থা এবং দ্বিপদ ভাবে বর্ত্তমান হওয়া—এই দুই হেতুতে এ বিষয়ে মানব বিশেষ লাভবান হইয়াছে। মানব যদি এই কারণে লাভবান হইল, তবে মানবের পূর্ব্ববর্ত্তী জীব দ্বিপদ ভাবে বর্ত্তমান হইয়া লাভবান হইবে না কেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। এই ভাব প্রাপ্ত হইলে উহারা প্রস্তর অথবা যষ্টি দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে অধিকতর সক্ষম হয়, শিকার আক্রমণ করিতে অধিকতর পটু হয়, এবং আহার সংগ্রহে অধিকতর সমর্থ হয়। যাহারা অধিক সুগঠিত, তাহারা অধিক জয়যুক্ত হইবে, এবং অধিকসংখ্যক বাঁচিতে সক্ষম হইবে। গরিলা এবং তদ্রূপ প্রাণী যদি বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে এরূপ তর্ক করা চলিত যে, চতুষ্পদ অবস্থা হইতে ক্রমে দ্বি-পদ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নহে, কারণ যাহারা মধ্যবর্ত্তী অবস্থাপন্ন তাহারা গমনাগমনের নিতান্ত অনুপযুক্ত হইত। এ তর্ক বলবান হইত এবং শুনিতে প্রথমত সত্য বলিয়াই বোধ হইত। কিন্তু আমরা জানি যে উচ্চশ্রেণীর বানরগণ মধ্যবর্ত্তী অবস্থাপন্ন আর, একথাও সকলেই স্বীকার করিবেন যে সে অবস্থা তাহাদিগের জীবনব্যাপারের উত্তম উপযোগী। এই বিষয়টি বিশেষ ভাবে বিবেচ্য। গরিলা সাধারণত হস্ত বাঁকাইয়া তাহার উপর ভার রাখিয়া চলা ফেরা করে, কিন্তু দৌড়াইতে হইলে পার্শ্বে ঝুঁকিয়া অসমান ভাবে থমথত করিয়া চলে। দীর্ঘবাহু বানরগণ হস্তদ্বয়কে দুইখানি লাঠির ন্যায় ব্যবহার করে। তাহারা হস্তদ্বয়ের মধ্য দিয়া দেহকে বেগে চালাইয়া দেয়। কোন কোন হাইলোবেট্ বানর সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া-হাঁটিতে পারে, এবং একটু দ্রুতবেগে দৌড়াইতেও সক্ষম হয়। তাহাদিগকে এই রূপ করিতে শিক্ষা দিবার আবশ্যক হয় না। কিন্তু তাহারা মানুষের ন্যায় দৃঢ় ও সাবধান ভাবে যাইতে পারে না; তাহাদিগের হাঁটা বিশ্রী। বর্ত্তমান বানরগণের গতি চতুষ্পদের মতও নহে, দ্বিপদের মতও নহে, মধ্যবর্ত্তী ভাবাপন্ন। তথাপিও উচ্চশ্রেণীর বানরগণের গঠন যে পরিমাণে চতুষ্পদের ন্যায় তদপেক্ষা বেশিই দ্বিপদের ন্যায়। সুবিবেচক ব্রোকারও এই মত।

মানবের পূর্ব্বাধিকারিগণ যখন ক্রমে দ্বিপদ ভাবে বর্ত্তমান হইতে লাগিল,

তখন তাহাদিগের হস্ত ও বাহু এরূপ পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিল যে তাহাতে বস্তু গ্রহণ কার্য্যে এবং অন্যান্য কার্য্যে সুবিধা হয় এবং পদ ও পদযন্ত্র এরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইল যে দেহ-ভার বহন ও গমনাগমন করিবার উপযোগী হয়; আর তখনই দেহ-গঠনের অন্যান্য নানাবিধ পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক হইয়া উঠিল। বক্ষস্থলের প্রশস্ত হওয়া, মেরুদণ্ড বক্র হওয়া, মস্তক পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ পৃথক স্থানে যুক্ত হওয়া প্রয়োজনীয় হইল, এবং এ সকল পরিবর্ত্তন মানবের হইয়াও ছিল। অধ্যাপক হ্যাক্‌স্‌লে বিবেচনা করেন যে মানব দ্বিপদ ভাবাপন্ন হওয়াতেই তাহার কপোলের সংঘাত-প্রবর্দ্ধন এতদূর শক্তিশালী হইয়াছে। এই প্রবর্দ্ধন ওরাং ওটাং এবং সিম্পাঞ্জির নাই এবং মানব অপেক্ষা গরিলার ছোট আরও অনেক গঠনের সহিত মানবের হস্তাগমান অবস্থার সম্বন্ধ আছে সে গুলিও এস্থানে উল্লেখ করা যাইত। সে সকলের কোন

* একত্র পরিবর্ত্তন; দ্বিপদ অবস্থার সহিত একত্রে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

† ব্যবহার বৃদ্ধির ফলগত পরিণাম, এ মত এক্ষণে প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সং—) * পরিবর্ত্তনটি প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল এবং কতদূরই বা ব্যবহার-বৃদ্ধির ফলগত পরিণাম, † অথবা এক অংশের উপর অন্য অংশের প্রতিক্রিয়ার ফলেই বা কত দূর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহা বলা সুকঠিন। পরিবর্ত্তনের এই সকল হেতু অনেক সময় একত্র ক্রিয়া করে, সন্দেহ নাই। কোন পেশি এবং অস্থির সাধন তাহার সংযোগস্থান যতই ব্যবহারাধিক্যবশত বড় (অথবা) পুষ্ট হয়, তবে ইহাও বুঝা যায় যে উহার কতিপয় কর্ম্ম অভ্যাসবশতই করা হইতেছে সুতরাং ঐ সকল কর্ম্ম উপকারজনক অর্থাৎ তত্তৎজীবের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছে। এই নিমিত্ত যে সকল জীব ঐ সমস্ত কর্ম্ম উত্তম রূপে করিতে সক্ষম, তাহারা অন্যাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় জীবিত থাকিবে।

মানবের হস্ত এবং বাহুর মুক্তাবস্থা অংশতঃ হস্তাগমান অবস্থার কারণ, এবং অংশতঃ কার্য্য। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বোক্তভাবে তাহার দেহ-গঠনের আরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মানবের আদিম পূর্ব্বপুরুষগণের স্বদন্ত বৃহৎ ছিল, তাহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। কিন্তু তাহারা প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রুগণের সহিত সংগ্রামকালে প্রস্তর, যষ্টি অথবা অন্য অস্ত্র ব্যবহার করিতে যতই অভ্যস্ত হইয়া উঠিল, ততই দন্ত এবং চঞ্চুর ব্যবহার কমিয়া গেল। এ ক্ষেত্রে হস্ত এবং দন্ত একত্রে ন্যূন হইয়া যাইবে। এতদনুরূপ অন্যান্য দৃষ্টান্ত হইতে এ বিষয় আমরা পরে নিশ্চিত রূপেই বলিতে পারি। পরবর্ত্তী একটি অধ্যায়ে ইহার অনুরূপ একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব। এ স্থলে এই মাত্র বলি যে পুংজাতীয় রোমযুক্ত জীবের স্বদন্ত হ্রস্ব অথবা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যায়; আর তৎসহ শৃঙ্গ বিকাশের সম্ভব থাকা প্রতীয়মান হয়। পুরুষগণ সংগ্রাম কালে কর্ত্তন-অস্ত্র এবং খুরের ব্যবহার করে, তজ্জন্যই তাহাদিগের স্বদন্তের ঐ রূপ অবস্থা হওয়া সম্ভব।

প্রাপ্তবয়স্ক উচ্চশ্রেণীস্থ পুংবানরগণের চক্ষু-সংসৃষ্ট পেশিসকলের অতিবৃদ্ধি বশতঃ করোটির এত অধিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে মানবের সহিত তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন দেখায় এবং সেই হেতু "উহাদিগের মুখাবয়ব সত্যই অতি ভয়ঙ্কর হয়"। কাট মেয়ার * এবং অন্যেও ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। মানবের পূর্ব্বপুরুষগণের হনু ও দন্ত ক্রমে যতই খর্ব্ব হইতে লাগিল, ততই প্রাপ্তবয়স্ক মানবের করোটিও বর্ত্তমান আকার ধারণ করিতে লাগিল। পরে দেখাইব যে পুংগণের অবয়ব অত্যন্ত খর্ব্ব হইয়া গেলে বংশানুক্রমের বিধান মতে স্ত্রীগণের দন্তও ঐ ভাব প্রাপ্ত হইবে।

মনোবৃত্তি সকল ক্রমে যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল মস্তিষ্কও ক্রমে ততই বড় হইতে লাগিল; এরূপ হওয়া একরূপ নিশ্চিত বলা যায়। গরিলা অথবা ওরাংওটাঙ্গের দেহের তুলনায় মস্তিষ্ক যে পরিমাণ দেখা যায়, মানুষের দেহের তুলনায় মস্তিষ্ক তদপেক্ষা অনেক বৃহত্তর। মানুষের মস্তিষ্কের এই আধিক্যবশতই তাহার উচ্চতর মনোবৃত্তি সকল পরিস্ফুট হইয়াছে; এ কথায় বোধ হয় কেহই সন্দেহ করিবেন না। কীটগণ মধ্যে এতদনুরূপ বৃত্তান্ত অনেক পাওয়া যায়, কারণ পিপীলিকাগণের মাথার স্নায়ুগণ্ড দেহের তুলনায় অনেক বড়, গোবরে পোকা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিহীন কীটদিগের অপেক্ষা সমস্ত শিল্পীপত্রী কীটেরই মাথার স্নায়ুগণ্ড বৃহত্তর। পক্ষান্তরে এরূপ কেহই মনে করেন না যে মস্তিষ্কের আয়তন দ্বারা কোন দুই জন্তুর কি কোন দুই মানুষের বুদ্ধিশক্তির পরিমাণ করা যায়। অতি অল্প পরিমাণ স্নায়বক পদার্থ থাকিলেও অসাধারণ মানসিক ক্রিয়া সিদ্ধ হইতে পারে, ইহা নিশ্চিত। কারণ পিপীলিকাগণের মাথার স্নায়ুগণ্ড আলপিনের অগ্রভাগের এক-টি কি পরিমাণও নহে, তথাপিও তাহাদিগের বিবিধ সংজ্ঞা বৃত্তি ও মানসিক শক্তি ও ভাব সকল অতীব অদ্ভুত। এই হিসাবে বলিতে গেলে, পিপীলিকার মস্তিষ্ককে এই পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্র বস্তু সকল মধ্যে একটি অত্যাশ্চর্য্য অণুবৎ বলা যায়; বোধ হয় মানব-মস্তিষ্ক অপেক্ষাও ইহা অধিক আশ্চর্য্যজনক।

মানবমস্তিষ্কের আয়তনের সহিত তাহার বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এরূপ বিশ্বাস প্রাচীন ও আধুনিক মানব করোটির তুলনার দ্বারা সমর্থিত হয়, এবং সম্প্রতি নিম্ন জন্তুশ্রেণীর কথা বিবেচনা করিলেও ঐরূপ অনুমান হইতে পারে। ডাক্তার ব্রে বার্গাড্ ডেভিস সাবধানতার সহিত অনেক গুলি করোটির মাপ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে ইউরোপীয় করোটির আভ্যন্তরিক আয়তন ৯২·৩ ঘন ইঞ্চি; আমেরিকানদিগের ৮৭·৫, এসিয়াবাসীদিগের ৮৭·১, অষ্ট্রেলিয়াবাসীদিগের কেবলমাত্র ৮১·৯ ঘন ইঞ্চি। অধ্যাপক ব্রোকা দেখাইয়াছেন যে প্যারিস নগরের ঊনবিংশ শতাব্দীর গোর স্থানে যে সকল মানব করোটি পাওয়া গিয়াছে তাহা দ্বাদশ শতাব্দীর করোটি অপেক্ষা বড়, উহাদিগের অনুপাত ১৪৮৪ : ১৪৬

* Rutimeyer.

পরিমাপের দ্বারা তিনি ইহাও দেখাইয়াছেন যে, বড় করোটিগুলির বৃদ্ধি কেবল সম্মুখ ভাগে, আর এই স্থানেই বুদ্ধিবৃত্তির আধার। গ্রীচার্ড বিশ্বাস করেন যে প্রাচীন বৃটন-বাসীদিগের অপেক্ষা বর্ত্তমানকালীয়গণের মস্তিষ্কাধার অনেক বড়। এতৎসত্ত্বেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে অতি প্রাচীন কালীয় কোন কোন মানব-করোটি বিলক্ষণ বর্দ্ধিত ও বড়; যথা নিয়ান্ডার খনের সেই বিখ্যাত করোটিটি। প্রাচীন টার্শিয়ারী যুগের এবং বর্ত্তমান যুগের একই শ্রেণীর স্তন্যপায়ী জন্তুদিগের করোটি তুলনা করতঃ এম্. ই লাটেট্ সিদ্ধান্ত করেন যে, আধুনিক জন্তুগণের মস্তিষ্ক মোটের উপর বৃহত্তর এবং মস্তিষ্কের ভাঁজগুলিও অপেক্ষাকৃত জটিল। এই সিদ্ধান্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। The variation of animals and plants under domestication অর্থাৎ 'গৃহপালিত অবস্থায় জন্তুর ও উদ্ভিদের পরিবর্ত্তন' নামক গ্রন্থে আমি দেখাইয়াছি যে গৃহপালিত খরগোসের মস্তিষ্ক বন্য খরগোসের অথবা বন্য শশকের মস্তিষ্ক অপেক্ষা অনেক ছোট। তাহারা বহু বংশপরম্পরায় আবদ্ধ থাকাতে ঐ রূপ হওয়া বিবেচনা করা যায়। কারণ ইহাতে তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি, সহজ জ্ঞান, উদ্ভিদের ব্যবহার এবং স্বেচ্ছাবত গতি-বিধি—এ সকলেরই পরিচালনা হ্রাস হইয়া গিয়াছে।

মানবের করোটি ও মস্তিষ্ক ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায়, উহাদের ভারবাহী মেরু-দণ্ড ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়াছে; বিশেষত যখন মানব বিপদ অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছিল, তখনই অধিকতর রূপে ঐ পরিবর্ত্তন সিদ্ধ হইয়াছে, যে সময় মানবের বিপদ অবস্থা প্রাপ্তি হইতেছিল, তখন মস্তিষ্কের চাপে করোটির আকারও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল; কারণ অনেক বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে এই কারণবশত করোটি সহজেই পরি-বর্ত্তিত হয়। বর্ণতত্ত্ববিদ্‌গণ বিশ্বাস করেন যে, যেরূপ বালিসে মাথা রাখিয়া শিশু নিদ্রা যায় তদ্রূপভাবে তাহার করোটির পরি-বর্ত্তন হয়। পেশি সকল প্রায়শঃ আক্ষিপ্ত অথবা কুঞ্চিত হইলে, এবং বেশি আগুণে পুড়িয়া বা শুকাইলে সে হেতুতেও মুখাস্থি গুলির স্থায়ী পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। যে সকল অল্পবয়স্ক বালকের মস্তক পীড়াবশতঃ পার্শ্বের দিকে অথবা পিছনের দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে, তাহাদিগের একটি চক্ষু স্থানচ্যুত হইয়াছে! এবং বোধ হয় পূর্ব্বাপেক্ষা ভিন্ন দিকে মস্তিষ্কের চাপ পড়ায় করোটির আকৃতিও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমি প্রমাণ করিয়াছি যে লম্বকর্ণ খরগোসদিগের এক দিকের কর্ণপত্র কাটিয়া দিলে ঐ সামান্য কারণেই ঐ দিকের করোটির প্রায় সকল অস্থিগুলিই সম্মুখের দিকে সরিয়া আসে; সুতরাং অপর দিকেরই ঐ সকল অস্থির সহিত আর ঠিক মিল থাকে না। পরিশেষে বক্তব্য যে কোন জন্তুর মনোবৃত্তি সকল অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া যদি দেহ মোটের উপর অধিক বড় অথবা অধিক ছোট হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার করোটির আকৃতিও প্রায় নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তিত হয়; অথবা যদি দেহাবয়বের বিশেষ কিছু পরি-বর্ত্তন না হইয়া মনোবৃত্তিগুলি অধিক বর্দ্ধিত

বা হ্রাস হইয়া যায় তাহা হইলেও ঐ রূপ ফলই উৎপন্ন হইবে। গৃহপালিত খরগোস দৃষ্টে আমি ঐরূপ বিবেচনা করি; ইহাদিগের কোন কোন শ্রেণীর দেহায়তন বন্যাবস্থা হইতে অনেক বড় হইয়াছে; কোন কোন শ্রেণীর দেহায়তন প্রায় সমানই আছে; কিন্তু এতদুভয় ক্ষেত্রেই শরীরের অনুপাতে মস্তিষ্ক অনেক ছোট হইয়া গিয়াছে। এই সকল খরগোসের করোটি দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমি প্রথমে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। একটি বন্য ও একটি গৃহপালিত খরগোসের করোটির প্রস্থ সমান ছিল, কিন্তু বন্য খরগোসের করোটির দৈর্ঘ্য ৩·১৫ ইঞ্চি এবং গৃহপালিতের ৮·৩ ইঞ্চি দেখা গিয়াছে।* বিভিন্ন জাতীয় মনুষ্যগণের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, কাহারও করোটি দীর্ঘ, কাহারও গোলাকৃতি। খরগোসের করোটি সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, মনুষ্যগণের সম্বন্ধেও তাহাই কারণ বিবেচনা করা যাইতে পারে। ওয়েল্‌কার পরীক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছেন যে খর্ব্বাকার মনুষ্যদিগের করোটি অনেক স্থলেই গোলাকৃতি এবং দীর্ঘাকার মনুষ্যদিগের করোটি অধিক স্থলেই দীর্ঘাকৃতি হইয়া থাকে। দীর্ঘাকার মনুষ্যদিগকে এ বিষয়ে বড় অথবা দীর্ঘদেহ খরগোসের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, উহাদিগের সকলের করোটিই দীর্ঘ।

মনুষ্যকরোটির বৃহৎ আয়তন এবং অন্যান্য গোল আকার কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা এই সকল বৃত্তান্ত হইতে কতক পরিমাণে বুঝা যাইতে পারে। নিম্নশ্রেণীস্থ জন্তু এবং মনুষ্য এতদুভয়ের বিশেষ পার্থক্যই ঐ দুইটিতে।

মানব এবং ইতর জন্তু মধ্যে আর একটি স্পষ্ট প্রভেদ চর্ম্মের লোমহীনতা। হোয়েল, পরপয়েস্, ডুগং, হিপোপোটেমাস—ইহাদিগের গাত্রচর্ম্মে লোম নাই; তাহাতে উহাদিগের জলে সন্তরণ পক্ষে সুবিধা হইতে পারে। লোমহীনতায় উষ্ণতার যে কিছু হানি হয় তাহাতেও কোন অনিষ্ট নাই, কারণ উহাদিগের মধ্যে যাহারা শীতপ্রধান স্থানসমূহে বাস করে, তাহাদিগের ত্বকের নিম্নে চর্ব্বি-আচ্ছাদন রহিয়াছে; সেই হেতু সিল্ এবং উদ্‌দিগের লোকে যেরূপ কার্য্য করে উহাদিগেরও তদ্রূপই হইয়া থাকে। হস্তী এবং গণ্ডার প্রায় লোমহীন; কিন্তু অতীব শীতপ্রধান মেরুপ্রদেশে ভূগর্ভ মধ্যে যে সকল হস্তী ও গণ্ডারের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, তাহা দীর্ঘলোম অথবা চুল দ্বারা আবৃত থাকায় অনুমান হয় যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের তাপবশতই এক্ষণে উহারা লোমহীন হইয়াছে। এই অনুমান অধিকতর সম্ভবপর বোধ হয়, কারণ ভারতবর্ষে শীতপ্রধান উচ্চস্থান সমূহে যে সকল হস্তী বাস করে, তাহাদিগের দেহ নিম্নপ্রদেশবাসী হস্তীদিগের অপেক্ষা লোমশ। তাহা হইলে, প্রাথমিক অবস্থায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাস করা হেতুই মানবও লোমহীন হইয়াছে; এরূপ অনুমান কি করা যাইতে পারে? নরগণের বুধে

* দৈর্ঘ্য—করোটির পশ্চাদ্ভাগের উচ্চ চিপি স্থান হইতে ক্রমধ্য পর্য্যন্ত। প্রস্থ—এক কর্ণের উপরিভাগের সংলগ্ন করোটিস্থান হইতে অন্য কর্ণের ঐ স্থানপর্য্যন্ত

ও বুকে চুল থাকায় এবং নরনারী উভয়েরই হস্তপদের সহিত দেহের সংযোগ স্থলগুলিতে চুল থাকায় এইরূপ অনুমানের পোষকতা হয়। কারণ মানব দ্বিপদভাবে দণ্ডায়মান হইবার পূর্ব্বেই লোমহীন হইয়াছিল, এইরূপ বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে এক্ষণে তাহার দেহে যে সকল স্থানে চুল অধিক, চতুষ্পদ অবস্থায় ঐ সকল স্থান সূর্য্যতাপ হইতে সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু মাথার উচ্চতম ভাগ সকল অবস্থাতেই যথেষ্ট পরিমাণে রৌদ্র প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপিও উহাতে অত্যধিক চুল দৃষ্ট হইতেছে—ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। জীবগণ মধ্যে মানব যে শ্রেণীর * অন্তর্গত, সে শ্রেণীর অন্যান্য প্রাণী গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাস করা সত্ত্বেও লোমশ, আর উহাদিগের দেহের উপরিভাগ বিশেষ লোমযুক্ত,—এই ঘটনা দেখিলে, মানব যে সূর্য্যতাপবশত লোমহীন হইয়াছে তাহা বলা যায় না। মিষ্টার বেল্‌ট্ বিবেচনা করেন যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে লোমহীন হওয়া মানবের পক্ষে অতি সুবিধার কথা; কারণ তাহা হইলে পরপুষ্ট লোম-কীটগুলি তাহাকে বিশেষ উপদ্রব করিতে পারে না; উহারা কখন কখন চর্ম্মে ঘা জন্মায়, লোমহীন হইলে তাহাও করিতে পারে না। কিন্তু এই উপদ্রব এত গুরুতর কি না, যে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন-বশত ইহা হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত লোমহীনতা উৎপন্ন হইয়াছে,—সে বিষয় সন্দেহ উপস্থিত হয়; কারণ আমি যতদূর জানি তাহাতে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের কোন চতুষ্পদ জন্তুকে পরপুষ্ট লোম-কীট হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত বিশেষ কোন উপায় অবলম্বন করিতে দেখা যায় না। আমার মতে সুন্দর দেখাইবার নিমিত্ত নারীগণ প্রথমতঃ লোমহীনতা প্রাপ্ত হয়, ইহাই বিশেষ সম্ভব বলিয়া অনুমান করি। এ কথা দাম্পত্যনির্ব্বাচন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় আরও বিশদ হইবে। এই মত অনুসারে, গরিলা সিম্পাঞ্জি ও বানর প্রভৃতির তুলনায় মানবের লোমহীনতা এত অধিক হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কারণ, দাম্পত্যনির্ব্বাচনে যে সকল লক্ষণ অর্জ্জিত হয় তাহা নিকটসম্বন্ধবিশিষ্ট প্রাণিগণ মধ্যেও অতীব পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

লেজের অভাব—সকলেই মনে করেন যে লেজ না থাকাই মানবের বিশেষত্ব। কিন্তু যে সকল বানর মানবের অতীব নিকট সংসৃষ্ট তাহাদিগেরও লেজ নাই। সুতরাং লেজহীনতা শুধু মানবেরই হইয়াছে, এ কথা বলা যায় না। একগণভুক্ত প্রাণীদিগের মধ্যেই লেজের দৈর্ঘ্যে অত্যন্ত প্রভেদ দেখা যায়। যথা, কোন কোন ম্যাকেকাস্ জাতীয় বানরের লেজ সমস্ত দেহ অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে বড়, উহাতে বিংশতি কশেরু আছে; কিন্তু অপর ম্যাকেকাস্ বানরদিগের লেজ নাই বলিলেই হয়, উহাতে কেবলমাত্র তিনটি অথবা চারিটি কশেরু আছে, কোন কোন বানরের লেজে পঁচিশটি কশেরুও দেখা যায়, অনেক বানরের লেজে দশটিও থাকে,

* Primates

কুভেএর পাঁচটি কশেরুও দেখিয়াছেন। লেজ ছোটই হউক আর বড়ই হউক, উহার অগ্রভাগ প্রায়ই ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া আসে। আমি অনুমান করি যে, ব্যবহারের অভাবে এই দিকের পেশি, শিরা ও ধমনী সকল নির্জীব হওয়াতেই অগ্রভাগের অস্থিগুলিও ক্ষুদ্র ও ক্রিয়াহীন হইয়া গিয়াছে। লেজের দৈর্ঘ্যে যেরূপ গুরুতর প্রভেদ দেখা যায় তাহার কারণ নির্দ্দেশ অদ্যাপিও করা যায় না। কিন্তু মানবের (বাহ্যিক) লেজের সম্পূর্ণ অভাব হইয়াছে। ইহাই আমাদিগের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়। অধ্যাপক ব্রোকা সম্প্রতি দেখাইয়াছেন যে, সমস্ত চতুষ্পদেরই লেজের দুই অংশ আছে, উহারা পরস্পর হইতে পৃথক। (১) দেহলগ্ন অংশ এবং (২) অগ্রভাগ। দেহলগ্ন অংশের কশেরুগুলির মধ্যে অল্পাধিক প্রণালী দেখা যায়, এবং ঐ কশেরুগুলির অস্থি স্থান বিশেষে বর্দ্ধিত। কিন্তু অগ্রভাগের কশেরুগুলির মধ্যে প্রণালী নাই, উহারা প্রায় মসৃণ এবং দেখিতেও কশেরুর ন্যায় নয়। যে সকল বানরের (বাহ্যিক। লেজ নাই তাহাদের, এবং মানবের, উভয়েরই প্রকৃত পক্ষে [মেরুদণ্ডের নীচে] লেজ আছে, তাহা বাহির হইতে দেখা যায় না, এবং উভয়ের লেজই এক আকারেই গঠিত। ঐ লেজের শেষাংশে (অর্থাৎ অগ্রভাগে) কশেরুগুলি লুপ্তাবশিষ্টবৎ, আয়তনেও ক্ষুদ্র, সংখ্যায়ও অল্প। দেহলগ্নাংশেও কশেরুসকল অল্পসংখ্যক, পরস্পরের সহিত সংযুক্ত, এবং প্রথম হইতেই উহাদিগের পরিবর্দ্ধন বন্ধ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু অন্যান্য জন্তুর লেজের দেহলগ্নাংশ অপেক্ষা মানবলেজের এই অংশ অধিক প্রশস্ত এবং চেপ্‌টা। ব্রোকা ইহাদিগকে ত্রিকাস্থির, কশেরু নাম দিয়াছেন। ইহারা দেহাভ্যন্তরস্থ কতিপয় প্রত্যঙ্গগুলিকে ধারণ করে বলিয়া ইহাদিগের কার্য্যকারিতা আছে; অন্য প্রকারেও ইহারা কার্য্যকর। ইহাদিগের আকৃতির পরিবর্ত্তন দ্বিপদ ভাবের সাক্ষাৎ ফল; মানব এবং কতিপয় বানরের দ্বিপদ ভাবে দণ্ডায়মান হওয়ার সহিত ঐ কশেরুগুলির আকৃতিপরিবর্ত্তন সাক্ষাৎ স্বরূপে সংবদ্ধ। এই সিদ্ধান্ত অধিকতর বিশ্বাস্য, কারণ ব্রোকা পূর্ব্বে অন্য মত পোষণ করিতেন, তিনি এখন এই মত বিশ্বাস করেন। অতএব মানবের ও উচ্চশ্রেণীর বানরগণের (আভ্যন্তরিক) লেজের দেহলগ্নাংশ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবশতই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; সাক্ষাৎস্বরূপেই হউক অথবা গৌণভাবেই হউক, এইরূপ হওয়াই সম্ভব।

কিন্তু ঐ লেজের শেষাংশের অর্থাৎ অগ্রভাগের পরিবর্ত্তনশীল লুপ্তাবশিষ্ট কশেরুগুলির সম্বন্ধে কি বলা যাইবে? লেজের বাহ্যিক অংশ ঘর্ষণবশতঃ বিলুপ্ত হইয়া থাকিবে,—এই একটি মত অনেক বার উপস্থিত হইয়াছে, এবং নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে আরও উপস্থিত হইবে; কিন্তু প্রথমে এই মতটি যতদূর হাস্যাস্পদ বোধ হয়, প্রকৃতপক্ষে উহা তদ্রূপ নহে। ডাক্তার এণ্ডার্সন বলেন, ম্যাকেকস্ ব্রনিয়াস নামক বানরের অতি ক্ষুদ্র লেজে দেহলগ্নাংশ সমেত মোটে এগারটি কশেরু আছে। ঐ

লেজের শেষাংশ কণ্ডারময়, ইহাতে কশেরু নাই; তাহার শেষে পাঁচটি লুপ্তাবশিষ্ট কশেরু আছে, কিন্তু তাহারা এত ক্ষুদ্র যে ঐ পাঁচটি একত্রে এক ইঞ্চির আট ভাগের এক ভাগ মাত্র (১)" দীর্ঘ। তাহার পর, এ গুলি বড়শির ন্যায় একদিকে স্থায়িরূপে বক্র। লেজের যে ভাগ নাড়াচাড়া করিবার যোগ্য তাহা দীর্ঘে এক ইঞ্চির একটু বেশী, উহাতে ক্ষুদ্র চারিটি মাত্র কশেরু আছে। এই ক্ষুদ্র অংশটুকু ম্যাকেকাস ক্রনিয়াস্‌গণ খাড়া করিয়া রাখে; কিন্তু ইহার মোট দৈর্ঘ্যের প্রায় এক চতুর্থাংশ বামের দিকে বাঁকাইয়া দুমড়াইত করে। এই শেষাংশটি পাছার দুই দিকের কড়া-পড়া অংশদ্বয়ের মধ্যভাগে অবস্থিত। সুতরাং এই শ্রেণীর বানরগণ ইহার উপর চাপিয়া বসে, এবং সেই হেতু ইহাতে কড়া পড়ে ও খস্‌খসে হয়। ডাক্তার এণ্ডার্সন স্বীয় পর্য্যবেক্ষণের কথা এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—"এই সকল দণ্ডায়মান হইতে মনে হয় যেন এই শ্রেণীর বানরগণের বসিবার সময় তাহাদিগের ক্ষুদ্র লেজটি এক উপদ্রব স্বরূপ হইয়াছিল, কারণ তাহার উপরই চাপিয়া বসিতে হইত। তজ্জন্য ইহারা পাছার উভয় পার্শ্বের কড়াপড়া স্থান দুইটির মধ্যস্থলে লেজকে ইচ্ছাপূর্ব্বক বাঁকাইয়া রাখিত, তাহাতে উহার উপর চাপ পড়িত না। এই অভ্যাসের ফলে কালক্রমে লেজের ঐরূপ বক্রভাব হইয়া গিয়াছে;* তাই এখন বসিতে আর চাপ লাগে না।" এই সকল অবস্থায় লেজটি খস্‌খসে ও কড়া-পড়া হওয়াতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। ডাক্তার সুরি পশুশালাতে এই জাতীয় বানরকে এবং ইহা অপেক্ষা একটু বড় লেজযুক্ত আরও তিন জাতীয় বানরকে বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে উহারা বসিবার সময় স্বভাবতই পাছার এক পার্শ্বে লেজটিকে ঠেলিয়া দেয়; সুতরাং লেজ ছোট হউক, বড় হউক, উহা গোড়া ঘেঁস্ লাগিয়া খস্‌খসে হয় ও বাঁকিয়া যায়। কাটিলে কি অঙ্গচ্ছেদ করিলে তাহার ফল বংশানুগত হয়, ইহা এক্ষণে প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং লেজের ঐ অংশের ব্যবহার না থাকায় উহাও বংশানুক্রমে অকর্ম্মণ্য ও লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে এবং দীর্ঘকাল ঘর্ষণেও বাঁকাইয়া রাখা হেতু বক্র হইয়া উঠিয়াছে। লেজের এই অবস্থা ম্যাকেকাস্ ক্রনিয়াস্ বানরের হইয়াছে; এবং এম্, ইকডেটাস্ ও তদপেক্ষা উচ্চজাতীয় কোন কোন বানরের লেজ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অবশেষে, অতি দীর্ঘ কালের ঘর্ষণে আঘাত প্রাপ্ত হইতে হইতে মানবের এবং প্রায় মানুষভাবাপন্ন বানরদিগের লেজের বহির্ভাগ সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়াছে, এরূপ বোধ হয়। উহার ভিতরের অংশ যাহা দেহ মধ্যে বিদ্যমান আছে, তাহা দণ্ডায়মান অথবা অর্দ্ধ দণ্ডায়মান অবস্থার উপযোগী ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া কমিয়া গিয়াছে।

* অভ্যাসের বংশানুক্রমিক ফল এখন স্বীকৃত হয় না।

* ইহাও স্বীকৃত হয় না

শ্রীশশধর রায়।

কুঞ্চের চন্দ্রকান্তি !

রূপ এবং সৌন্দর্য্য ও যৌবনের নবীনতা সদা স্থায়ী রাখিতে চাহেন ? এই সদ্গুণযুক্ত লেপন চর্ম্মরোগমাত্রই অর্থাৎ দাদ, চুলকানি, ঘামাচি, ছুলী, মেচেতা, কদাকার চিহ্ন, ব্রণ ইত্যাদি নীঘ্র আরোগ্য করিয়া চর্ম্মের কোমলতা, চাকচিক্য ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে রমণীগণের আদরের সামগ্রী। মূল্য ৸০ আনা, ডাঃ মাঃ ।০ আনা।

আফিম পরিত্যাগের ঔষধ।

যত অধিকদিনের আফিম সেবনকারী হউন না কেন, বিনা কষ্টে আফিমরূপ কালকূট বিষ পরিত্যাগ করিয়া শারীরিক গ্লানিশূন্য হইয়া বেশ স্ফূর্ত্তি, সচ্ছন্দতা এবং সতেজতা ও কান্তিপুষ্টি লাভ করিতে পারিবেন, অথচ কোন পীড়া হইবার সম্ভাবনা নাই। পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

কে, সি, বিশারদ,
৬৭ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

আষাঢ়] [৩য় সংখ্যা

বঙ্গদর্শন।

(নব পর্য্যায়)

একাদশ বর্ষ।

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা
১। সমাজসংস্কারে বঙ্কিমচন্দ্র	১২৯	৬। বঙ্কিম চরিত	১৮৫
২। মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র	১৫২	৭। ভ্রান্তি (উপন্যাস)	১৮৮
৩। ফিডো (অনুবাদ)	১৭১	৮। অভাব (কবিতা)	১৯২
৪। গোরা	১৭৫	৯। অতৃপ্তি (কবিতা)	১৯২
৫। করুণা (গল্প)	১৮০	১০। আমার জীবন	১৯৩
১১। গ্রন্থসমালোচনা	১৯৬		

এস্ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩১৮

সাধনতত্ত্ববিচার।

শ্রীরামাচরণ বসু বিরচিত। বৈষ্ণব ধর্ম্মের উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বাদি অতি সরল ও সহজ ভাষায় লিখিত। মূল্য ৸০ বার আনা।

মজুমদার লাইব্রেরী, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

নিত্য নূতন মানব-সুখের উপাদান আবিষ্কার করিতেছে। ভারতে প্রাচ্যজাতি পরলোককেই একমাত্র আরাধ্য বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল—ইহলোকের ভোগবিলাস, সুখ-সম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য তাহারা বড় একটা চেষ্টা করে নাই, তাহাদের সমস্ত কার্য্য; সমস্ত সমাজ-বন্ধন, রীতিনীতি সেই উদ্দেশ্যেই নিয়মিত হইয়াছিল। তাই যদিও তাহারা প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্ত করিবার বিশেষ চেষ্টা করে নাই—কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের কূটতত্ত্বের আলোচনায় তাহারা জগতে শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়াছিল। যদিও ইহ-লোকের সুখসম্পদের হিসাবে তাহারা দরিদ্র ছিল, কিন্তু পরলোকের পাথেয় অর্জ্জনে কোন দিনই তাহারা আলস্য দেখায় নাই।

যখন এই দুই বিভিন্ন প্রকারের সভ্যতা পরস্পরের সংস্পর্শে আসিল, তখন তাহাদের মধ্যে স্বভাবতঃ সংঘর্ষ উপস্থিত হইল এবং তাহার ফলে বঙ্গের হিন্দুসমাজে বহুকাল পরে এক বিপ্লবের সূচনা হইল। এই সময়ে ডেভিড হেয়ার, রাজা রামমোহন রায়, লর্ড বেণ্টিঙ্ক, লর্ড মেকলে প্রভৃতির চেষ্টার ফলে সর্ব্বত্র ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার হইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বেই কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল। এইখানে নব্য হিন্দুযুবকেরা ডিরোজিয়োর ন্যায় শিক্ষকদের নিকট হইতে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া প্রতীচ্য সভ্যতার মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে লাগিল এবং তাহা বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিল। ইংরাজের আইন, ইংরাজের বিচার-প্রণালী সর্ব্বসাধারণের মনের উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। খৃষ্টান মিশনরী ও অন্যান্য বৈদেশিকেরা ভারতের ধর্ম্ম ও সমাজ-নীতিকে আক্রমণ করিয়া বক্তৃতা ও লেখনী চালনা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্র হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে এইরূপে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। বহুকালের ঘুমন্ত হিন্দুসমাজ এই সংঘর্ষের ফলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। কেহ কেহ হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিয়া শত্রুর দলে যোগ দিয়া অধিকতর আগ্রহে জাতিবধে প্রবৃত্ত হইলেন। অপর পক্ষে কেহ কেহ বা হিন্দু-সমাজের প্রাচীন, জরাজীর্ণ, বহুকালের অব্যবহৃত ভাঙ্গা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া এই নবীন পরাক্রমশালী সেনাদলের সম্মুখীন হইলেন।

ইংরাজীশিক্ষিত একদল যুবকের মনের উপর এই পাশ্চাত্যসভ্যতা যার পর নাই প্রভাব বিস্তার করিল। তাঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহনমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া তাহার সমস্ত রীতিনীতি আচার-ব্যবহার ভাল-মন্দ-নির্ব্বিশেষে চরমরূপে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। অনুকরণের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎকৃষ্ট অপেক্ষা অপকৃষ্ট অংশই তাঁহাদের চক্ষে সহজে পড়িতে লাগিল। অভক্ষ্য-ভক্ষণ, সুরাপান, জাতি-বিচার-ত্যাগ, নিরঙ্কুশ সাম্য, সর্ব্বপ্রকার নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ, আচার-অনুষ্ঠানের বিসর্জ্জন তাঁহারা ইহাই পাশ্চাত্য সভ্যতার সারসত্য বলিয়া বুঝিয়া লইলেন। আপনাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও সাহসের দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য তাঁহারা প্রকাশ্য লোকচক্ষুর সম্মুখেই এই সমস্ত শাস্ত্র ও সমাজ-নিষিদ্ধ কার্য্য করিতে লাগিলেন, ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার হিন্দু-

ধর্ম্মের সংস্পর্শ সম্পূর্ণরূপেই ত্যাগ করিলেন। মিশনরীদিগের বক্তৃতা ও লেখনীতে আকৃষ্ট হইয়া খৃষ্টধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বেভারেণ্ড লালবিহারী দে প্রভৃতি সুপণ্ডিত দেশীয় খৃষ্টানেরা এই বিষয়ে আরও বেশী সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই প্রবল আঘাত হিন্দুসমাজের পক্ষে সহ্য করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল। এই সময়ে রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিলেন। খৃষ্টধর্ম্মের যে একেশ্বরবাদের মোহে শিক্ষিত যুবকগণ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিলেন, রামমোহন রায় বুঝাইলেন যে উচ্চ অঙ্গের হিন্দুধর্ম্ম সেই একেশ্বরবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রতীচ্য সভ্যতার সাম্য, মৈত্রী প্রভৃতি যে সকল ভাব নব্য শিক্ষিতদের মনের উপরে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, সেগুলি তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের অঙ্গ করিয়া লইলেন। ইহার ফলে বহু নব্যশিক্ষিত যুবক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। যাঁহারা হয় ত একদিন মিশনরীদের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিতেন তাঁহাদের অনেকেই রাজা রামমোহন রায়ের আশ্রয় লইয়া জোয়ারের মুখে আত্মরক্ষা করিলেন।

রাজা রামমোহন রায় প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুসমাজকে এক বিষম আঘাত হইতে কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা করিয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারকেরা (বিশেষতঃ রামমোহন রায়ের পরবর্ত্তী প্রচারকগণ) একটি বিশেষ ভুল করিয়াছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুসমাজ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। হিন্দুধর্ম্ম অধিকাংশ প্রাচীন ধর্ম্মের ন্যায় রক্ষণশীল হইলেও নিতান্ত সংস্কারবিরোধী নহে। বহু বিরোধী ধর্ম্মের শাখা হিন্দুধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে; কিন্তু উদার হিন্দুধর্ম্ম তাহাদের সকলকেই আপনার ভিতরে স্থান দিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মও যদি হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে থাকিয়া তাহার সংস্কারের চেষ্টা করিত, তবে হয় ত তাহার চেষ্টা অধিক পরিমাণে সফল হইতে পারিত। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম এই সামঞ্জস্য চেষ্টা করে নাই, সে একেবারে গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহের ভিতরকার সংস্কার করিতে হইলে, তাহার মধ্যে থাকিয়া করাই সঙ্গত ও সহজসাধ্য; বাহির হইতে দ্বারে আঘাত করিতে থাকিলে ভিতরের লোক কেবল ত্রস্ত ও চমকিত হইয়া উঠে মাত্র। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। প্রাচীন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মসমাজের এই সংস্কারের প্রয়াসে সমাজবিপ্লবের আশঙ্কায় ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সে তাহার প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ শাস্ত্র খুঁজিয়া খুঁজিয়া বচন সংগ্রহ করিয়া তাহার প্রচার ও ব্যাখ্যায় অতি মাত্র উদ্যোগী হইয়া উঠিলেন। গোঁড়াদলের বক্তারা হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের সকল প্রকার আচার, রীতিনীতি, অনুষ্ঠান, বিধিব্যবস্থার নানা সম্ভব ও অসম্ভব, বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় দেশ ছাইয়া ফেলিলেন। চারিদিকে এই আন্দোলন চলিতে লাগিল। ব্রাহ্মদিগের শাসনের নিমিত্ত হিন্দুরা তাহাদের যত প্রকার সামাজিক শাসনের

ব্যবস্থা ছিল তাহার কিছুই বাকি রাখিলেন না। ব্রাহ্মরাও হিন্দুদিগের কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা প্রভৃতি আক্রমণ করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইতে লাগিলেন।

কিন্তু এই বিরোধে আসল কথার মীমাংসা হয় না। যে প্রাচ্য-প্রতীচ্য সমস্যা এই সমস্ত বিপ্লবের মূল, এই বিরোধে তাহার কোন সমাধান হইতে পারে না। এক দল লোক এই কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইহারা প্রাচ্য ও প্রাতীচ্য উভয় প্রকার সভ্যতারই মর্ম্ম জানিয়াছিলেন। ইহারা এক দিকে যেমন প্রতীচ্যের ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি আলোচনা করিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনই প্রাচ্য-সাহিত্য, সমাজ-তত্ত্বেও ইহাদের পারদর্শিতা ছিল। তাই তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এক দিকে সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্যসভ্যতার অনুকরণ ও অন্য দিকে আমাদের প্রাচীন সভ্যতার প্রাচীরের মধ্যে নিশ্চল হইয়া থাকা, উভয়ই নব্য হিন্দুসমাজের পক্ষে অনিষ্টকর। বহুকাল হইতে পরাধীন থাকিয়া আমাদের সমাজের প্রাণশক্তি লোপ পাইয়াছিল। বহু শত বৎসরের আলস্য, কুসংস্কার ও জীবনহীনতা শৈবালদলের মত সমাজ-নদীর স্রোত রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর নব গৌরবময় জ্ঞানবিজ্ঞানের যুগে আবার সেই সুদূর অতীতে ফিরিয়া যাওয়া আমাদের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব ছিল। কালধর্ম্মে আমাদের সমাজের অবনতি হইয়াছিল, কালধর্ম্মানুসারেই আবার তাহার সংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু সেই সংস্কার ইউরোপের যথাযথ অনুকরণ নহে। উদ্যম, উৎসাহ ও প্রাণময় নবীন প্রতীচ্য সভ্যতার নিকট আমাদের শিক্ষার বিষয় অনেক আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের বহুশত বৎসরের সঞ্চিত সভ্যতার সমস্ত উৎকৃষ্ট রত্ন ধূলিমুষ্টির মত ত্যাগ করিয়া ইউরোপের দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হাতে দাঁড়াইতে যাওয়া আমাদের পক্ষে কোন ক্রমেই মঙ্গলাবহ নহে। তাই এই স্থিরবুদ্ধি সংস্কারকেরা মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া সংস্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে বিরোধ বাধাইয়া নহে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয়ের দ্বারাই তাঁহারা এই সংস্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহারা হিন্দুসমাজের মধ্যে থাকিয়াই একদিকে যেমন হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের গৌরব ঘোষণা করিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনি তাহার সমস্ত জঞ্জাল ও আবর্জ্জনা মোচনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। এক দিকে তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের বিধিব্যবস্থা, রীতিনীতি, ও আচার-ব্যবহারের সারসত্য ও মহিমা যেমন গভীর যুক্তির সঙ্গে প্রচার ও ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, অন্যদিকে তেমনই পাশ্চাত্য সভ্যতার অনেক গভীর সত্য ও উচ্চনীতির আদর্শও হিন্দুসমাজের চক্ষুর উপর ধরিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইতেছিলেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র এই মধ্যপন্থী সংস্কারকদিগের অন্যতম। তিনি অবশ্য বক্তৃতা বা সভা-সমিতির দ্বারা এই সংস্কারের চেষ্টা করেন নাই, উচ্চমঞ্চে দাঁড়াইয়া তেজস্বিনী ভাষায় লোকের মন উত্তেজিত করিবার প্রয়াস পান নাই। তাঁহার অবলম্বিত প্রণালী একটু স্বতন্ত্র ছিল। তিনি সাহিত্যের দ্বারা এই সংস্কারের চেষ্টা

করিয়াছিলেন। সভাসমিতি বা বক্তৃতা খুব সময়োপযোগী; তৎসময়ের জন্য লোকের মন খুব উত্তেজিত করিতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু সাহিত্যের শক্তিও সামান্য নহে। সাহিত্যের প্রভাব বহুদূর বিস্তৃত ও বহুকাল-ব্যাপী। তাহা লোকের মনে ক্ষণিক উত্তেজনার সঞ্চার করিয়াই ক্ষান্ত হয় না: বর্ত্তমান ও সুদূর ভবিষ্যৎ ব্যাপ্ত করিয়া ইহার শক্তি কার্য্য করিতে থাকে। ইহার আদর্শ সাময়িক ভাব ও আবেগের দৃষ্টিতেই পর্য্যবসিত হয় না; সর্ব্বকাল ধরিয়া মানবজ্ঞানের সম্মুখে শিক্ষা ও আদর্শের উৎসরূপে বিদ্যমান থাকে। ফরাসী-বিপ্লবের সময়ে রবেস্পেয়ার প্রভৃতি উষ্ণমস্তিষ্ক বক্তাদের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় যে ফল হইয়াছিল, ভল্‌টেয়ার, ডিডেরট, রুসো প্রভৃতি মনস্বী লেখকদিগের গ্রন্থাবলী তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কার্য্য করিয়াছিল। সেগুলি কেবল যে ফরাসী-বিপ্লবেরই সৃষ্টি ও বিস্তার করিয়াছিল, তাহা নহে, তাহার পরেও বহুকাল ধরিয়া জগতের ইতিহাসে রাষ্ট্র ও সমাজনীতিকে নিয়মিত করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই সাহিত্যের মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার ঈপ্সিত সংস্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার উপন্যাস, অন্যান্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলী কেবল যে বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টি ও বর্দ্ধন করিয়াছিল তাহা নহে, তাহারা আধুনিক হিন্দুসমাজের গতির উপরেও বহুল পরিমাণে আনুষঙ্গিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সেই প্রভাব কি পরিমাণে হিন্দুসমাজের উপরে কার্য্য করিয়াছে ও তাঁহার সৃষ্ট আদর্শাবলী আধুনিক সমাজচরিত্র-গঠনে কতদূর সহায়তা করিয়াছে তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়ে কেবল সামান্য কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

পাশ্চাত্য সভ্যতা হিন্দুসমাজের অনেক বিষয়েরই উপরে আঘাত করিয়াছিল। হিন্দু স্ত্রীজাতির অধিকার ও ব্যক্তিগত অধিকার এই দুইটি বিষয়ের উপরেই এই আঘাত বেশী প্রবলভাবে লাগিয়াছিল। এই দুইটি বিষয় লইয়াই হিন্দুসমাজের সঙ্গে পাশ্চাত্য সমাজের বেশী সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় হিন্দুর রমণীর আদর্শও আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হিন্দু স্ত্রী কেবল বিলাসসঙ্গিনী ছিলেন না; তিনি সহধর্ম্মিণী, সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মকর্ম্মের সঙ্গিনী ছিলেন। তিনি গৃহে গৃহলক্ষ্মী, গার্হস্থ্য যজ্ঞের তিনিই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ কেবল ইহকালের জন্য নয়, পরকালেও সেই সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন থাকিবে। সুতরাং হিন্দুর চক্ষে স্ত্রীজাতি কেবল ভোগের বস্তু মাত্র নহে—তিনি পূজার পাত্রী, সম্মানের পাত্রী ছিলেন। তাঁহারও ব্যক্তিত্ব ছিল, স্বাধীনতা ছিল। তাঁহারও পুরুষের ন্যায় শিক্ষা পাইবার অধিকার ছিল, চিত্র-সঙ্গীত প্রভৃতি কলাবিদ্যায় তিনিও পাণ্ডিত্য লাভ করিতেন। অনেক সময়ে পরিষদে তিনি যোগদান করিতেন, এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রেও কখনও কখনও তাঁহার গতিবিধি দেখা যাইত। কঠোর অবরোধে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনীর মত তাঁহাকে বন্দিনী হইয়া থাকিতে হইত না। কিন্তু মুসলমানদিগের আগমনের

ফলে এই আদর্শের অনেক পরিবর্ত্তন হইল। 'সেমিটিক' জাতির রমণীর আদর্শ হিন্দু বা অন্যান্য আর্য্যজাতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহাদের নিকট স্ত্রীজাতি শুধু ভোগের বস্তু, বিলাসের সামগ্রী ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। সে কেবল কামনা-পরিতৃপ্তির উপায় মাত্র, কেবল ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করিবার সহায়স্বরূপ। তাহার ব্যক্তিত্ব, আত্মমর্য্যাদা বা স্বাধীনতা ছিল না। 'যক্ষের ধনে'র মত পুরুষ তাহাকে সর্ব্বদাই কঠোর পাহারা দিয়া রাখিত, পাছে সে লোকনেত্রের সম্মুখে পড়ে। তাহাকে লইয়াই কত যুদ্ধবিগ্রহ, কলহবিবাদ, কত নরহত্যা, শোণিতপাত হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; কেননা মানুষের অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় কেবল বল দ্বারাই তাহাকেও লাভ করা যাইতে পারে। সে সমাজের ক্রীতদাসী; গোমহিষাদির ন্যায় তাহাকেও ক্রয় বিক্রয় করা যাইতে পারে। মুসলমানেরা যখন ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে রাজত্ব স্থাপন করিল, তখন তাহাদের এই রমণীর আদর্শ হিন্দুসমাজের উপর বহুল পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিল। কঠোর অবরোধ-প্রথা ও তৎসঙ্গে স্ত্রীজাতির সর্ব্ব-প্রকার অধিকারের লোপ ধীরে ধীরে হিন্দু-সমাজে প্রচলিত হইয়া পড়িল। * হিন্দু স্ত্রী আর সহধর্ম্মিণীর মর্য্যাদা পাইতে লাগিলেন না, তিনি প্রকারান্তরে দাসী ও বিলাসসঙ্গিনী হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা ও ধর্ম্মকর্ম্মের অধিকার ক্রমেই লোপ পাইতে লাগিল। সর্ব্বোপরি বহুশত বৎসরের পরাধীনতার ফলে সমাজের অলস, উর্ব্বরমস্তিষ্ক নানাপ্রকার কুপ্রথা ও কু-সংস্কারের সৃষ্টি করিয়া স্ত্রীজাতির মাথায় পুঞ্জীকৃত করিয়া ফেলিল। হিন্দুসমাজ কেবল পুরুষেরই সমাজ হইয়া উঠিল। তাহার মধ্যে রমণীর আর কোন স্থান রহিল না।

যখন মুসলমানপ্রভাবের ফলে সমাজের এই প্রকার অবস্থা তখন ইংরাজেরা তাহাদের নবীন সভ্যতা লইয়া এ দেশে প্রবেশ করিলেন। পাশ্চাত্যের নারী-আদর্শ অধঃপতিত হিন্দুসমাজের চক্ষে এক নূতন আলোকে প্রতিভাত হইল। ইউরোপের নারী-আদর্শ আধ্যাত্মিক ভাবে অনুপ্রাণিত না হইলেও তাহা যে অতি পবিত্র ও উন্নত তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার সঙ্গে 'সেমিটিক' আদর্শের তুলনাই হইতে পারে না। পাশ্চাত্য নারী জীবনসঙ্গিনী, সর্ব্বকর্ম্মে সহচরী। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার তুলনায় সে কোন অংশেই হীন নহে। সমাজের চক্ষে সে পুরুষের সহিত সর্ব্ব বিষয়েই সমান অধিকারশালিনী। পুরুষ যেমন সমাজের এক প্রয়োজনীয় অংশ, নারীও তেমনই। পুরুষ সমাজের দক্ষিণ অঙ্গ, সে বাম অঙ্গ। ভোগ বা বিলাসের জন্য সে পুরুষের ক্রীত-দাসী নহে; বরঞ্চ সে পুরুষের আনন্দের উৎস, আশার আলোক ও শান্তির নিকেতন। সে পুরুষের ধৈর্য্যে ও সাহসে সহায়রূপিণী, সে-ই পুরুষের বাহুতে বলসঞ্চার করিয়া থাকে। বল দ্বারা তাহাকে পাওয়া যায় না,

* মহারাষ্ট্রপ্রদেশে মুসলমান সভ্যতার প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে নাই। সে স্থানে হিন্দুরমণীদিগের মধ্যে অবরোধ-প্রথাও নাই। লেঃ

তাহাকে পাইতে হইলে ভালবাসার সাধনা চাই। প্রেমে সে স্বাধীন, শিক্ষায় সে মার্জ্জিতা, ব্যবহারে সে নিঃসঙ্কোচ, গৃহধর্ম্মে সে-ই চালিকা। এই নিঃসঙ্কোচ, নির্ভীক, স্বাধীন, মার্জ্জিতবুদ্ধি, শিক্ষিতা পাশ্চাত্যনারী যখন নব্যশিক্ষিত হিন্দুর দৃষ্টিতে পড়িল, তখন তাহারা সহজেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। নূতনত্বের আদর্শে মুগ্ধ হইয়া এই আদর্শকেই সমাজে যথাযথ প্রচলিত করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। ইহার ফলে সমাজে এক বিষম আন্দোলন আরম্ভ হইল। স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, বিধবা-বিবাহ, প্রভৃতি লইয়া দেশময় কোলাহল চলিতে লাগিল। নব্যশিক্ষিত হিন্দুরা ও ব্রাহ্ম-সম্প্রদায় উৎসাহের আতিশয্যে বাঙ্গালিনীকে মেমসাহেব সাজাইবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। কিন্তু চিরকালই চরম পন্থার যে ফল হইয়া থাকে, তাহাই হইল। ইউরোপের যে চটকদার, বাহ্যসুন্দর অংশ-টুকু তাহাই কেবল এই অনুকরণ-প্রয়াসীদের চোখে পড়িতে লাগিল। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার নামে পাশ্চাত্য বিলাস ও ব্যসন সমাজে প্রবেশ করিতে আরম্ভ হইল। রমণীর অধিকারের নামে স্বেচ্ছাচার আদর পাইতে লাগিল। এই উচ্ছৃঙ্খল অনুকরণের ব্যাপার দেখিয়া হিন্দুসমাজ আশঙ্কিত হইয়া উঠিল।

বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ সময়ে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এই গুরুতর সামাজিক সমস্যার সমাধান করে তাঁহাকে অতি সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার স্রোত যেরূপ ভাবে দেশকে ছাইয়া ফেলিয়াছে, তাহাতে হিন্দুসমাজের উপরে তাহার প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। তাহাকে সম্পূর্ণরূপে দেশ হইতে তাড়াইবার কোন উপায় নাই। নব্যশিক্ষিত সমাজ ইউরোপীয় সভ্যতার ছাত্রস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং ইউরোপীয় আদর্শের প্রতি আকর্ষণ তাহার উপর পক্ষপাত, তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। মুসলমান-সভ্যতার প্রভাবে হিন্দুসমাজে রমণীর অবস্থা কতদূর অবনত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা আমরা বলিয়াছি। নব্যশিক্ষিত হিন্দু সে আদর্শে কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিতে-ছেন না। তাহাদিগকে সমাজের সেই জীর্ণ, মলিন, অনার্য্যোচিত অবস্থার দিকে টানিয়া লইয়া যাওয়ার চেষ্টা নিতান্তই নিরর্থক। তাই বঙ্কিমচন্দ্র এই নিষ্ফল চেষ্টা করেন নাই। বিলাত হইতে 'আস্ত' পাশ্চাত্য বিলাসিনীকে আমদানী করা অবশ্য আমাদের সমাজের পক্ষে কখনই মঙ্গলকর হইতে পারে না। তাহা হিন্দু-সমাজের চিরাচরিত সংস্কারের বিরুদ্ধ,—তাহাতে সমাজের মধ্যে ধ্বংসকারিণী বিপ্লবেরই সূচনা হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ইউরোপের রমণী-জীবনে, যাহা উৎকৃষ্ট, যাহা মঙ্গলকর, মনুষ্যত্বের সনাতন সত্যের অনুগামী, তাহা গ্রহণ করিতে কোনই আপত্তি হইতে পারে না। বহুকাল হইতে যে জঞ্জালজাল সমাজশরীরে সঞ্চিত হইতে-ছিল, নবীন পাশ্চাত্য আদর্শের সাহায্যে সে গুলির সংস্কার ভিন্ন সমাজে প্রাণশক্তি ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা ছিল না, নিদাঘতাপ-শুষ্ক, শৈবালাচ্ছন্ন জলাশয়ের

সংস্কার করিতে হইলে যেমন বর্ষার নববারি সমাগমে তাহার মুখ খুলিয়া দেওয়াই প্রয়োজন, তেমনই ইউরোপীয় সভ্যতা হইতে উন্নত, উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করাই এই জীর্ণ, অধঃপতিত সমাজের পুনর্গঠনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল।

এই সমন্বয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সর্ব্বলোকপ্রিয় উপন্যাস-গুলির আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার মানসী কন্যারা হিন্দুরমণী, অস্থিমজ্জায় মনে, প্রাণে, হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত হিন্দু রমণী। কিন্তু তাহারা যবনী সভ্যতার কলঙ্কলাঞ্ছিতা মধ্যযুগের অধঃপতিতা হিন্দু-রমণী নহে। তাহারা কেবল ভোগের বস্তু, বিলাসের বস্তু নহে। শৃঙ্খলাবদ্ধ, পালিত বন্য পশুর মত আপনার অস্তিত্বহীন জ্ঞান ও শিক্ষায় বঞ্চিতা জড়পদার্থ মাত্র নহে। ইউরোপীয় সভ্যতার সঞ্জীবতা তাহাদের হৃদয়ে আসিয়া আঘাত করিয়াছে। তাহাদের ব্যক্তিত্ব আছে, স্বাধীনতা আছে; সমাজে তাহাদের স্থান আছে, পুরুষের চক্ষে সম্মান আছে। সুশিক্ষায় তাহাদের হৃদয় বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুরমণীগণের ন্যায় তাহারা স্বামীর সহধর্ম্মিণী, সর্ব্বকার্য্যে সহায়রূপিণী, ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা তাহার অনুগামিনী। পতিই তাঁহাদের ধ্যান, পতিই তাঁহাদের আরাধ্য দেবতা। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা পুরুষের ক্রীতদাসী নহেন। তাঁহাদেরও আত্মমর্য্যাদা, মনুষ্যত্বের গৌরব আছে। তাঁহাদের হৃদয় কেবল বিলাসসঙ্গিনীর ক্ষুদ্র আনন্দলিপ্সা ও আত্মসুখেই পূর্ণ নহে; তাহাতে সরল নিসঙ্কোচ উন্নত পবিত্র প্রেমের সিংহাসন আছে। অনেকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নাম শুনিয়া নাসিকা-কুঞ্চিত করেন। তাঁহার উপন্যাসের নায়িকারা খাঁটি হিন্দু আদর্শ নহে বলিয়া শিহরিয়া উঠেন। কিন্তু খাঁটি হিন্দুরমণীর আদর্শ কি তাহা তাঁহারা বুঝাইয়া বলেন না। তাহা বৈদিক যুগের, পৌরাণিক যুগের বা মুসলমান যুগের আদর্শ তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে পারেন না। বরং মুসলমান যুগে যে সমস্ত অনার্য্য আচারব্যবহার হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই গুলিকেই তাঁহারা বেশী ভালবাসেন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু পাতি-ব্রত্য, নিষ্কাম পতিপ্রেম, ধর্ম্মভীরুতা আত্মত্যাগ, সংযম ও সহিষ্ণুতা, ধর্ম্মাচরণে স্বামীর সহায়তা এই সকলই যদি হিন্দু-রমণীর আদর্শ গুণ হয়, তবে বঙ্কিম-চিত্রিত আদর্শ রমণীচরিত্রাবলী কোন অংশেই হিন্দুসমাজের অনুপযোগী নহে। যে সমাজ প্রাচীন দাম্পত্য-জীবনের উচ্চ আদর্শ ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহাদের চক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র দাম্পত্য-প্রেমের যে সমস্ত পবিত্র চিত্র ধরিয়াছেন, সে গুলি কোন অংশেই তাহার পক্ষে অগৌরবের নহে। কালধর্ম্মানুসারে সমাজও পরিবর্ত্তনশীল। যাঁহারা এই পরি-বর্ত্তনকে স্বীকার করিতে চান না, তাঁহারা আসুরীর গতিরোধপ্রয়াসী মদমত্ত ঐরাবতের ন্যায় বুদ্ধিবিশিষ্ট, তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কোন তর্কের বিষয় নাই। যাঁহারা সামাজিক পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ মানসী কন্যারা

বাহ্যতঃ ইউরোপীয় আদর্শের বর্ণপাতে রঞ্জিতা হইলেও, খাঁটি হিন্দুরমণী। হিন্দু-রমণীর চরিত্রের যে সমস্ত প্রকৃত গুণ, সে সমস্ত হইতে তাহারা বঞ্চিত নহে।

বঙ্কিমচন্দ্র যে সমস্ত নব যুগের আদর্শ হিন্দুরমণী সৃষ্টি করিয়াছেন তন্মধ্যে সূর্য্যমুখী একটি প্রধান চরিত্র। সূর্য্যমুখী শিক্ষিতা, মার্জ্জিতবুদ্ধিশালিনী, প্রাচীন ভারতবর্ষ বা পাশ্চাত্যের রমণীদিগের ন্যায় সঙ্গীত-চিত্রাদিতে অনুরাগিণী। তিনি স্বামীর সর্ব্ব কার্য্যে সহায়, তাঁহার সখা, মন্ত্রী, ক্রীড়াসহচরী; তিনি স্বামীর সঙ্গে হোলি খেলিয়া তাঁহার অঙ্গে কুঙ্কুম ছড়িয়া মারেন, সুভদ্রার অনুকরণে স্বামীর গাড়ীতে সারথ্য করিয়া বর্ষা হাঁকাইয়া আমোদ অনুভব করেন, স্বামী কর্ত্তৃক উমার ন্যায় কুসুমসাজে সজ্জিতা হইয়া সুখী হন। কিন্তু এ সকল সূর্য্যমুখীর বহিরাবরণ। এ সমস্ত তাঁহার বাহিরের সাজসজ্জা, বাহিরের সৌন্দর্য্য। ভিতরের যে সূর্য্যমুখী, অন্তরের অন্তঃস্থলে যে সূর্য্যমুখী, তিনিত খাঁটি হিন্দুরমণী, পতিসর্ব্বস্বা পতিগত-প্রাণা, পতির জন্য সর্ব্বত্যাগিনী; পতিই তাঁহার ধ্যান, পতিই তাঁহার জ্ঞান। সূর্য্য-মুখী কমলমণিকে পত্রে লিখিতেছেন—

"পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন চিন্তা থাকে তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন সম্পত্তি থাকে তবে সে স্বামী—"

আর এক স্থলে সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রকে বলিতেছেন, "তুমি আমার সর্ব্বস্ব। তুমি আমার ইহকাল, তুমি আমার পরকাল।"

স্বামীর সুখেই সূর্য্যমুখীর সুখ, স্বামীর দুঃখেই তাঁহার দুঃখ। যখন সূর্য্যমুখী দেখিলেন যে স্বামী অন্য রমণীতে প্রণয়শালী হইয়াছেন, তাঁহার হৃদয় অন্যের নিকট বিক্রীত, তাহাকে না পাইলে তিনি সুখী হইবেন না, সূর্য্যমুখীতে আর তাঁহার সুখ নাই, তখন সাধারণ রমণীতে যাহা পারে না, সূর্য্যমুখী তাহা করিলেন। স্বামীর অভিলাষ পূর্ণ করিতে আপনি উদ্যোগী হইলেন, তাঁহার সুখের জন্য আপনার সুখ বলি দিলেন। নিজ হাতে নগেন্দ্রের সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর বিবাহ দিলেন। কমলমণি যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বিবাহ কি তোমার উদ্যোগে হইয়াছে? কেন তুমি আপনার মৃত্যুর উদ্যোগ আপনি করিলে?" সূর্য্যমুখী হাসিয়া বলিলেন "আমি কে? একবার তোমার ভাইকে দেখিয়া আইস, সে মুখভরা আহ্লাদ দেখিয়া আইস, তখন জানিবে তিনি আজ কত সুখে সুখী। তাঁহার এত সুখ যদি আমি চক্ষে দেখিলাম, তবে কি আমার জীবন সার্থক হইল না? কোন্ সুখের আশায় তাঁহাকে অসুখী রাখিব?"

কিন্তু সূর্য্যমুখী কি ইহাতে সুখী হইয়াছেন? কমল যখন বলিলেন "তুমি সুখী হইয়াছ?" সূর্য্যমুখী উত্তর দিলেন "আবার আমার কথা কেন জিজ্ঞাসা কর, আমি কে? যদি কখনও স্বামীর পায়ে কাঁকর ফুটিয়াছে দেখিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে যে, আমি ঐখানে বুক পাতিয়া দিই নাই কেন, স্বামী আমার বুকের উপর পা রাখিয়া যাইতেন!" এই আত্মোৎসর্গ, এই আত্মবলিদান, হিন্দু রমণী ভিন্ন আর কে করিতে পারে?

কিন্তু মানুষ দেবতা নহে। হাজার

উন্নত হোক, মানব-চরিত্র দুর্ব্বলতার অধীন। কতকগুলি স্বাভাবিক দুর্ব্বলতাকে মানুষ সহজে জয় করিতে পারে না। সূর্য্যমুখী কুন্দকে স্বামী দান করিলেন বটে, কিন্তু গৃহে থাকিয়া তাহা চক্ষে দেখিতে পারিলেন না। ভিখারিণীর ন্যায় তিনি গৃহ ত্যাগ করিলেন। ইহাতে আমরা সূর্য্যমুখীকে বড় একটা দোষ দিই না; কেননা তিনি মানবী মাত্র, দেবী নহেন। বরং ইহাতে মানবী সূর্য্যমুখীর প্রগাঢ় পতিপ্রেম আরও উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু স্বামীর উপরে রাগ করিয়া নহে। স্বামী অন্য রমণীর প্রতি অনুরক্ত, সূর্য্যমুখী গৃহ-ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, কিন্তু তখনও বলিতেছেন—"তাঁহার উপরে রাগ করিয়া আমি দেশান্তরে চলিলাম না। তাঁহার উপরে আমার রাগ নাই কখনও তাঁহার উপর রাগ করি নাই, কখনও করিব না। যাঁহাকে মনে হইলে আহ্লাদ হয়, তাঁহার উপর কি রাগ হয়? তাঁহার উপরে যে অচলা ভক্তি, তাহাই রহিল; যত দিন না মাটীতে এ মাটী মিশে ততদিন থাকিবে।"

কিন্তু সূর্য্যমুখী বেশী দিন স্বামীকে না দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না। স্বামীকে না দেখিয়া, তাঁহার সেবা না করিয়া তিনি কি জীবনধারণ করিতে পারেন? তাই আবার তাঁহাকে গৃহাভিমুখে ফিরিতে হইল। কিন্তু পথি মধ্যে রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। এইরূপ অবস্থায় যখন হরমণি বৈষ্ণবীর গৃহে সূর্য্যমুখী আপনার মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন, তখন ব্রহ্মচারীকে বলিতেছেন—

"আর আমার মনোদুঃখ কিছুই নাই কেবল মরিবার সময়ে যে স্বামীর মুখ দেখিতে পাইলাম না এই দুঃখ। মরণেই আমার সুখ; কিন্তু যদি তাঁহাকে না দেখিয়া মরিলাম, তবে মরণেও দুঃখ। যদি এ সময়ে একবার তাঁহাকে দেখিতে পাই, তবে মরণেই আমার সুখ। আমি চিরকাল স্বামীর চরণ ভিন্ন কিছুই জানি না। ইহাতে যদি পুণ্য থাকে, তবে সে পুণ্যের ফলে স্বর্গ চাহি না, কেবল এই চাই যেন মৃত্যুকালে স্বামীর মুখ দেখিয়া মরি।"

স্বামীর তুলনায় স্বর্গও তাঁহার নিকট তুচ্ছ। এই পতিব্রতা হিন্দুরমণী মৃত্যু-কালেও স্বর্গলাভ অপেক্ষা স্বামীদর্শনই অধিক কামনা করেন। এই অতুল, অনুপমেয়, পবিত্র, সুন্দর চরিত্রের সকল সৌন্দর্য্য আলোচনা করা অসম্ভব। সূর্য্যমুখী কিরূপ পত্নী, কিরূপ গৃহিণী ছিলেন তাহা নগেন্দ্র নিজেই বলিতেছেন—

"সূর্য্যমুখী কি কেবল আমার স্ত্রী? সূর্য্য-মুখী আমার সব। সখ্যে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী। আমার সূর্য্যমুখী—কাহার এমন ছিল? সংসারে সহায়, গৃহে লক্ষ্মী, হৃদয়ে ধর্ম্ম, কণ্ঠে অলঙ্কার! আমার নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্ব্বস্ব! আমার প্রমোদে হর্ষ, বিষাদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্য্যে উৎসাহ! আর এমন সংসারে কি আছে? আমার দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ। আমার বর্ত্তমানের সুখ, অতীতের স্মৃতি,

ভবিষ্যতের আশা, পরলোকের পুণ্য। আমি শূকর, রত্ন চিনিব কেন?"

পড়িতে পড়িতে রঘুবংশে রামচন্দ্রের সেই বিলাপ মনে পড়ে—

"কার্য্যেষু মন্ত্রী, করণেষু দাসী,
ধর্ম্মেষু পত্নী, ক্ষময়া ধরিত্রী,
স্নেহেষু মাতা, শয়নেষু বেশ্যা,
রম্যে সখী • • • •।"

এই সূর্য্যমুখী যদি হিন্দু-আদর্শের অযোগ্যা, তবে হিন্দু-আদর্শ কি?

বিষবৃক্ষের আর একটি রমণী-চরিত্র কমলমণি। সূর্য্যমুখী ধীরা, স্থিরা, কিন্তু গাম্ভীর্য্যশালিনী, মিতভাষিণী ও মিতহাসিনী। কিন্তু কমলমণি হাস্যময়ী, আনন্দময়ী, সৌরকররূপিণী। যেখানে এই 'ফুটন্ত হাসির ভালা'র উদয় হয়—সেইখানে সকলই হাস্যময় হইয়া উঠে। যেখানে এই সৌরকররূপিণীর আবির্ভাব হয়, সেইখান হইতেই সমস্ত দুঃখ, শোক ও বিষাদ দূর হইয়া যায়। শ্রীশচন্দ্রের গৃহ একটি সুন্দর সুখস্বপ্নের মত। জ্যোৎস্নাপ্লাবিতা রজনীর ন্যায় কমলমণির হাস্যরাশিতে তাহা সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ হইয়া আছে। কমলমণি সুশিক্ষিতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী, মানবহৃদয়দর্শিনী, বাক্‌চাতুর্য্যে সিদ্ধিমতী, রসিকতায় অতিনিপুণা। কিন্তু এই আনন্দময়ী বিদ্যুৎরূপিণীর পতিভক্তি অতুলনীয়। স্বামীকে ছাড়িয়া তিনি এক দণ্ড তিষ্ঠিতে পারেন না। তিনি যেন তাঁহার কণ্ঠের হার, নয়নের মণি। সূর্য্যমুখী হইতে স্বামীর উপরে যেন তাঁহার অধিক বিশ্বাস, সূর্য্যমুখী যখন কুন্দের উপর স্বামীর আসক্তি সন্দেহ করিয়া পত্র লিখিলেন, তখন কমলমণি তদুত্তরে লিখিলেন—

"তুমি পাগল হইয়াছ। নচেৎ স্বামীর হৃদয়ের প্রতি অবিশ্বাসিনী হইবে কেন? স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইও না। আর যদি নিতান্তই সে বিশ্বাস না রাখিতে পার, তবে দীঘির জলে ডুবিয়া মর। আমি কমলমণি তর্কসিদ্ধান্ত ব্যবস্থা দিতেছি, তুমি দড়ি কলসী লইয়া জলে ডুবিয়া মরিতে পার। স্বামীর উপরে যাহার বিশ্বাস রহিল না, তাহার মরাই মঙ্গল।"

স্বামীর প্রতি এই অগাধ বিশ্বাস হিন্দুরমণীরই উপযুক্ত বটে। কমলমণির চরিত্রের আর এক অংশ তাঁহার মাতৃত্ব। বাঙ্গলা উপন্যাসে মাতৃত্বের আদর্শ নাই বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করেন—তাহা অনেকাংশে সত্য সন্দেহ নাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কমলমণি ও 'আনন্দ-মঠে'র নিমাইয়ের চরিত্রে এই মাতৃত্বের কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া গিয়াছেন। কমলমণির সেই পুত্রবাৎসল্য, নবীনা মাতার সেই চিত্র কি সুন্দর, কি উজ্জ্বল, কি মধুর! তাহা যাহারা না জানে, তাহাদিগকে আমরা বুঝাইতে পারিব না। এই মাতৃস্নেহে অতুল, পতিপ্রেমে সুন্দর কমলমণির চরিত্র, শ্রীশচন্দ্র ও কমলমণির মধুর পবিত্র দাম্পত্য জীবন, যদি হিন্দুসমাজের উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, তবে তাহার মঙ্গলের জন্যই করিয়াছে সন্দেহ নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি সুন্দর চরিত্র মৃণালিনী। ইহা দৃঢ়তা ও কোমলতা, কঠোরতা ও সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ। একদিকে পাপ ও অত্যাচারের সম্মুখে মৃণালিনী যেমন অকুতোভয়, অন্যদিকে প্রেম

ও ভালবাসার নিকটে তিনি তেমনি আনন্দ-বিবশা। বিপদে তিনি অটল, অচল, দৃঢ়; তেমনি সুখের সময় আবার তিনি আপনাকে হারাইয়া ফেলেন। অপরিচিত মাধবাচার্য্য যখন তাঁহাকে ছলক্রমে নৌকার উপরে উঠাইয়া লইয়াছেন, তখন মৃণালিনী ভীতা হন নাই। লম্পট হৃষীকেশ যখন তাঁহার উপর অত্যাচারোন্মুখ হইয়াছিল, তখন তিনি সিংহিনীর মত আপন গৌরবে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন। কিন্তু সেই মৃণালিনীই আবার হেমচন্দ্রের স্পর্শসুখেই বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়া পড়েন।

মৃণালিনীর প্রেম সম্পূর্ণ নিষ্কাম। ইহার মধ্যে কামনার গন্ধ মাত্র নাই। এরূপ কামনালেশশূন্য প্রেমের চিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয় আর অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। মৃণালিনী হেমচন্দ্রের জন্য গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন; পিতামাতা আত্মীয়স্বজনের দর্শনে বঞ্চিতা হইয়াছিলেন; লোকাপবাদ কিনিয়াছিলেন, পরগৃহ বাস করিয়াছিলেন; এমন কি ভিখারিনীর ন্যায় তাঁহাকে দিনপাত করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তবুও হেমচন্দ্রের প্রতি এক দিনের জন্যও তাঁহার ভালবাসা যায় নাই, এক মুহূর্ত্তের জন্যও হেমচন্দ্র হইতে তাঁহার মন বিচলিত হয় নাই। হেমচন্দ্রকে ভালবাসিয়াই তিনি সুখী, প্রতিদানের আশা তাহাতে কিছু মাত্র নাই। হেমচন্দ্র তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি অন্যের মত বিমুখ হইয়াছেন, তবুও মৃণালিনী আপনার ভালবাসা হারান নাই; তখনও বলিতেছেন—

"হেমচন্দ্রের সহিত এ জন্মে আমার সম্বন্ধ ঘুচিবে না। আমি কালিও হেমচন্দ্রের দাসী ছিলাম—আজিও তাঁহার দাসী।"

নিষ্কাম বলিয়াই এই প্রেম সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠাশূন্য আপনার অস্তিত্ব, আপনার সুখদুঃখ, আত্মগর্ব্ব বা অহঙ্কার, এমন কি রমণীর প্রাণের প্রাণ যে অভিমান তাহাও ইহাতে নাই। ইহা যে অতি উচ্চ নিষ্কাম প্রেমের আদর্শ তাহা বোধ হয় বলিবার প্রয়োজন নাই। এই উচ্চ হিন্দু-আদর্শ যে প্রাচীন বা আধুনিক কোন সমাজেরই অগৌরবের নহে, তাহা আমরা গর্ব্বের সঙ্গে বলিতে পারি।

কল্যাণী ও শান্তি—বঙ্কিমচন্দ্রের এই দুই সৃষ্টি অভিনব ও অপূর্ব্ব। ইহা বাঙ্গালীর বর্ত্তমান জীবনের জন্য নহে; ইহা ভবিষ্যতের। ভবিষ্যতে যে মহান্ নবজীবন বাঙ্গালীর জন্য অপেক্ষা করিতেছে, এই দুই আদর্শ সেই গৌরবময় নবজীবনের জন্য। কল্যাণী আদর্শ হিন্দুপত্নী, স্বামীই তাঁহার ইষ্টদেবতা, স্বামীই তাঁহার ধর্ম্মকর্ম্ম, স্বামীই তাঁহার তপস্যা,—তাঁহার সর্ব্বস্ব। স্বামীর জন্য তিনি সমস্ত কষ্টই সহ্য করিতে পারেন। নিজে অনাহারে মৃতপ্রায়, তবু স্বামীকে না খাওয়াইয়া খাইতে পারেন না। পত্নী স্বামীর কার্য্যের সহায়। যখন কল্যাণী বুঝিলেন যে তিনি বাঁচিয়া থাকিলে স্বামীর কার্য্যে বিঘ্ন হইবে; স্বামী সন্তানধর্ম্ম গ্রহণে ইচ্ছুক, কিন্তু তিনি বাঁচিয়া থাকিলে সে পথে বহু অন্তরায়; তিনি দেবকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারিবেন না; তখন স্বামীর মঙ্গলের নিমিত্ত, তাঁহার ব্রত-রক্ষার নিমিত্ত তিনি স্বহস্তে বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিলেন। স্বামীর ধর্ম্মরক্ষার

জন্য নিজের প্রাণ বলি দিলেন। মৃত্যুকালে মহেন্দ্রকে শোকাচ্ছন্ন দেখিয়া কল্যাণী বলিতেছেন—

"আমি ভালই করিয়াছি। ছার স্ত্রী লোকের জন্য পাছে তুমি দেবতার কাজে অবহেলা কর। আমি তোমার গলগ্রহ। আমি মরিলাম ভালই করিলাম। আমায় আশীর্ব্বাদ কর যেন, আমি সেই আলোকময় লোকে গিয়া আবার তোমায় দেখা পাই। * * আমি মরিয়া ভালই করিলাম। তুমি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, কায়মনোবাক্যে তাহা সিদ্ধ কর; পুণ্য হইবে। আমার তাহাতে স্বর্গলাভ হইবে। দুইজনে একত্রে অনন্ত স্বর্গ ভোগ করিব।"

তার পরে ভবানন্দের চেষ্টায় কল্যাণী প্রাণ পাইলেন; কিন্তু তিনি মহেন্দ্রের পক্ষে মৃতাই রহিলেন। মহেন্দ্র সন্তানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া একাগ্র মনে মাতৃসেবা করিতে লাগিলেন। ভবানন্দের নিকট কল্যাণী এই কথা যখন শুনিলেন, তখন তিনি কিছু মাত্র দুঃখিত হইলেন না। বরং যে জন্য তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা যে সফল হইয়াছে, স্বামী যে আপনার ব্রতরক্ষা করিতেছেন, ইহাতে আরও সুখী হইলেন। বলিলেন—

"আমি প্রাণত্যাগ না করিলে কি এত হইত? যার বুকে কাদাপোরা কলসী বাঁধা, সে কি ভবসমুদ্রে সাঁতার দিতে পারে! যার পায়ে লোহার শিকল সে কি দৌড়ায়? কেন সন্ন্যাসী, তুমি এ ছার জীবন রাখিয়াছিলে?"

ভব। স্ত্রী সহধর্ম্মিণী, ধর্ম্মের সহায়।

ক। ছোট ছোট ধর্ম্মে। বড় বড় ধর্ম্মে কণ্টক। আমি বিষ-কণ্টকের দ্বারা তাঁহার অধর্ম্ম-কণ্টক উদ্ধৃত করিয়াছিলাম।"

কল্যাণীর অবলম্বিত পথ কিঞ্চিৎ ভ্রান্ত হইলেও তাহা কেবল হিন্দুপত্নীর পক্ষেই সম্ভব। অন্যের পক্ষে দুঃসাধ্য। কিন্তু হায় এই আদর্শের উচ্চতা বুঝিবার সৌভাগ্য সকলের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না!

কল্যাণী আদর্শ পত্নী, শান্তি আদর্শ সহধর্ম্মিণী। শান্তি-চরিত্র-অঙ্কনে বঙ্কিমচন্দ্র অতি সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন। এরূপ উচ্চ ও মহিমাময় চরিত্র অঙ্কনে আর কোন হিন্দু লেখক সাহস করিয়াছেন কি না জানি না। এই অসাধারণ চরিত্রচিত্রে বঙ্কিম বাবুর মত অসাধারণ শিল্পীই কৃতকার্য্য হইতে পারেন। শত সমাজসংস্কারকের কার্য্যও এই রূপ একটি চরিত্রের প্রভাবের সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারে না।

হিন্দু স্ত্রী সহধর্ম্মিণী, তিনি কেবল স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী নহেন, তাঁহার ধর্ম্মভাগিনীও বটেন। ফলের হিসাবে নহে, কেননা ফলাকাঙ্ক্ষা ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্মের সাধনাই ধর্ম্মের চরম পরিণতি। পতির যাহা ধর্ম্ম, পত্নীরও তাহা ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম কেবল ব্রত-উপবাস, যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মাত্মক ধর্ম্মেই সীমাবদ্ধ নহে। হিন্দুর ধর্ম্ম আজীবনব্যাপী—তাহা মনুষ্যত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠবদ্ধ। এই হিসাবে স্বজনরক্ষা, জাতিরক্ষা বা স্বদেশরক্ষাও ধর্ম্ম। স্বধর্ম্মরক্ষা আরও উচ্চতর ধর্ম্ম। তদর্থে যুদ্ধও ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মযুদ্ধেও হিন্দুপত্নী সহায়-রূপিণী হইতে পারেন। কেননা তিনি সহধর্ম্মিণী। স্বামীর সকল ধর্ম্মচরণেই তিনি সঙ্গিনী হইতে পারেন, বীরধর্ম্মেই বা

কেন না পারিবেন? যখন চন্দ্রবেদিনী শান্তিকে চিনিতে পারিয়া সত্যানন্দ বলিলেন, "কেন এ পাপাচার করিতে আসিলে?" শান্তি বলিলেন, "পাপাচরণ কি প্রভু? পত্নী স্বামীর অনুসরণ করে সে কি পাপাচরণ? সন্তানধর্ম্মশাস্ত্রে যদি একে পাপাচার বলে তবে সন্তানধর্ম্ম অধর্ম্ম। আমি তাঁহার সহধর্ম্মিণী, তিনি ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত, আমি তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ করিতে আসিয়াছি।"

সত্যানন্দ। তুমি সাধ্বী। কিন্তু দেখ মা, পত্নী কেবল গৃহধর্ম্মেই সহধর্ম্মিণী—বীরধর্ম্মে রমণী কি?

শান্তি। কোন্ মহাবীর অপত্নীক হইয়া বীর হইয়াছেন? রাম সীতা নহিলে কি বীর হইতেন? অর্জ্জুনের কতগুলি বিবাহ গণনা করুন দেখি? ভীমের যত বল তত্তগুলি পত্নী। কত বলিব? আপনাকে বলিতেই বা হইবে কেন?

সত্য। কথা সত্য, কিন্তু রণক্ষেত্রে কোন্ বীর জায়া লইয়া আইসে?

শান্তি। অর্জ্জুন যখন যাদবীসেনার সহিত অন্তরীক্ষ হইতে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কে তাঁহার রথ চালাইয়াছিল? দ্রৌপদী সঙ্গে না থাকিলে, পাণ্ডব কি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুঝিত?

সত্য। তা হউক, সামান্য মনুষ্যদিগের মন স্ত্রীলোকে আসক্ত এবং কার্য্যে বিরত করে। এই জন্য সন্তানের ব্রতই এই যে রমণীজাতির সঙ্গে একাসনে উপবেশন করিবে না। জীবানন্দ আমার দক্ষিণ হস্ত। তুমি আমার ডানহাত ভাঙ্গিয়া দিতে আসিয়াছ।

শান্তি। আমি আপনার দক্ষিণ হস্তে বল বাড়াইতে আসিয়াছি। আমি ব্রহ্মচারিণী, প্রভুর কাছে ব্রহ্মচারিণীই থাকিব। আমি কেবল ধর্ম্মাচরণের জন্য আসিয়াছি; স্বামীদর্শনের জন্য নয়। বিরহ-যন্ত্রণায় আমি কাতরা নই, স্বামী যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আমি তাহার ভগিনী কেন হইব না? তাই আসিয়াছি।

এই খানে কল্যাণীর সঙ্গে শান্তির প্রভেদ। কল্যাণীর বিবেচনায় "স্ত্রী সহধর্ম্মিণী, ধর্ম্মের সহায় ছোট ছোট ধর্ম্মে। বড় বড় ধর্ম্মে কণ্টক।" তাই তিনি বিষ-কণ্টকের দ্বারা স্বামীর কণ্টক উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। আত্ম-হত্যা করিয়া স্বামীর ধর্ম্মপথের বিঘ্ন দূর করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু শান্তি তাহা করিতে সম্মত নহেন। তিনি বলেন "স্বামী যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আমি তাহার ভগিনী কেন হইব না?" তাই তিনি গৃহত্যাগ করিয়া স্বামীর সঙ্গে ধর্ম্মাচরণের জন্য গেলেন।

এই ধর্ম্মাচরণে শান্তি অসাধারণ মানসিক বলের পরিচয় দিয়াছেন। রণে বনে সর্ব্বত্র মূর্ত্তিমতী ধর্ম্মের ন্যায় তিনি জীবানন্দের কার্য্যে সহায়রূপিণী হইয়াছেন। ব্রহ্মচারিণী শান্তি ধর্ম্মাচরণে অটল অচল। ক্ষুব্ধ ইন্দ্রিয় তাঁহার কি করিবে? প্রাণের প্রাণ যে ভালবাসা তাহাকেও তিনি ধর্ম্মের নিকট বলি দিতে পারেন। জীবানন্দ যখনই সাহস হারাইয়াছেন, তিনিই তাঁহার হৃদয়ে সাহস সঞ্চার করিয়াছেন। যখনই তাঁহার বাহুতে দুর্ব্বলতার লক্ষণ দেখা গিয়াছে, তখনই তিনি তাহাতে বল বাড়াইয়াছেন। জীবা-

নন্দের হৃদয় বরং কখনও বিচলিত হইয়াছে; কিন্তু শান্তির হৃদয় হিমাচলের ন্যায় অটল, অচল;—প্রশান্ত সিন্ধু সদৃশ অক্ষুব্ধ। নিমাইয়ের গৃহে শান্তির সঙ্গে জীবানন্দের দেখা হইলে জীবানন্দের হৃদয় বিচলিত হইল। জীবানন্দ বলিলেন,—"তোমায় দেখিয়া আর ফিরিয়া যাইতে পারিতেছি না। • • তোমায় দেখিলে আমি ফিরিতে পারি না। একদিকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, জগৎসংসার। এক দিকে ব্রতহোম যাগযজ্ঞ; সবই একদিকে আর একদিকে তুমি—একা তুমি। আমি সকল সময় বুঝিতে পারি না, কোন দিক ভারি হয়। • • • • পৃথিবী সন্তানদের আয়ত্ত হইবে কি না জানি না, কিন্তু তুমি আমার আয়ত্ত, তুমি পৃথিবী অপেক্ষা বড়, তুমি আমার স্বর্গ। চল গৃহে যাই, আর আমি ফিরিব না।"

অন্য রমণী হইলে এই প্রেমের আবেগ —এই ভালবাসার প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিত না। হয় ত কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিত; 'প্রিয়তম' 'প্রাণনাথ' বলিয়া পদতলে লুটাইয়া পড়িত। কিন্তু শান্তি ইহার কিছুই করিলেন না। তিনি কিছুক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না। বোধ হয় মনে ঈষৎ চাঞ্চল্যের আভাস দেখা দিয়াছিল, তাই চোখ রাঙাইয়া তাহাকে শাসন করিলেন। তার পর বলিলেন—

"ছি—তুমি বীর। আমার পৃথিবীতে বড় সুখ যে আমি বীরপত্নী। তুমি অধম স্ত্রীর জন্য বীরধর্ম ত্যাগ করিবে? তুমি আমায় ভালবাসিও না—আমি সে সুখ চাহি না। কিন্তু তুমি তোমার বীরধর্ম কখনও ত্যাগ করিও না।"

এ কথার তুলনা নাই, কিন্তু হায়, আধুনিক বঙ্গরমণীর এ কথা বুঝিবার ক্ষমতা নাই!

জীবানন্দ ও শান্তির এই প্রেম, ইহা শুধু ইহকালের জন্য নহে; ইহকাল ছাড়াইয়া এই প্রেম পরকাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ইহকালের যে ইন্দ্রিয়গন্ধ, তাহা ইহাতে নাই। ইহাতে আছে কেবল ভালবাসা, আছে কেবল ধর্মাচরণ। তাই শান্তি জীবানন্দকে বলিতেছেন—

"আমি তোমার ধর্মপত্নী, সহধর্মিণী, ধর্মে সহায়। তুমি অতিশয় গুরুতর ধর্ম গ্রহণ করিয়াছ। সেই ধর্মের সহায়তার জন্যই আমি গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। দুইজনে একত্রে সেই ধর্মাচরণ করিব বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া বনে বাস করিতেছি। তোমার ধর্ম বৃদ্ধি করিব। ধর্মপত্নী হইয়া তোমার ধর্মের বিঘ্ন করিব কেন? বিবাহ ইহকালের জন্য এবং বিবাহ পরকালের জন্য। ইহকালের জন্য যে বিবাহ, মনে কর তাহা আমাদের হয় নাই। আমাদের বিবাহ কেবল পরকালের জন্য। পরকালে দ্বিগুণ ফল ফলিবে। • • • আরও দেখ গোঁসাই, ইহকালেই কি আমাদের বিবাহ নিষ্ফল? তুমি আমায় ভালবাস, আমি তোমায় ভালবাসি, ইহা অপেক্ষা ইহকালে আর কি গুরুতর ফল আছে?"

এই বিবাহ পরকালের জন্য; এই প্রেমের আদর্শ ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই জন্য এই এখানে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

ভালবাসার অপেক্ষা ভালবাসার যে আস্পদ স্বামী, তাহা অপেক্ষাও ধর্ম্ম বড়। জীবন ইহার নিকট তুচ্ছ, মৃত্যু—তাহাকে ত হাসিতে হাসিতে আলিঙ্গন করা যায়। তাই সত্যানন্দ যখন শান্তির নিকট জীবানন্দের প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন, জীবানন্দকে প্রায়শ্চিত্ত হইতে বিরত করিবার পরামর্শ দিলেন, তখন শান্তি বলিলেন—

"আমার স্বামীর ধর্ম্ম আমার স্বামীর হাতে। আমি তাঁহাকে ধর্ম্ম হইতে বিরত করিবার কে? ইহলোকে স্ত্রীর পতি দেবতা। কিন্তু পরলোকে সবারই ধর্ম্ম দেবতা। আমার কাছে আমার পতি বড়, তার অপেক্ষা আমার ধর্ম্ম বড়। তার অপেক্ষা আমার কাছে আমার স্বামীর ধর্ম্ম বড়। আমার ধর্ম্মে আমার যে দিন ইচ্ছা জলাঞ্জলি দিতে পারি; আমার স্বামীর ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিব? মহারাজ! তোমার কথায় আমার স্বামী মরিতে হয় মরিবেন, আমি বারণ করিব না।"

এই মহামহিমময় চরিত্র, এই ক্ষুদ্র-পরিসর প্রবন্ধে আলোচনা করা অসম্ভব। এই মহান্ স্ত্রীচরিত্র অঙ্কিত করিয়া বঙ্কিম-চন্দ্র ধন্য হইয়াছেন, বাঙ্গালীকেও ধন্য করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করিয়াছেন 'আঁধার আসিবে কি মা? শান্তির ন্যায় কন্যা আবার গর্ভে ধরিবে কি?' আমরা বলি, যে আর বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় পুত্র হইতে পারে, শান্তির মত কন্যা তাঁহার অঙ্কশোভা করিতে কতক্ষণ!

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুর মত সর্ব্বজন-পরিচিত, তাঁহার সমস্ত আদর্শরমণীই সুশিক্ষিতা। 'সাম্য' নামক প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"লোকে সুশিক্ষিত হইলে—বিশেষতঃ স্ত্রীগণ সুশিক্ষিত হইলে তাহারা অনায়াসেই গৃহমধ্যে গুপ্ত থাকার পদ্ধতি অতিক্রম করিতে পারিবে। শিক্ষা থাকিলেই অর্থোপার্জ্জনে নারীগণের ক্ষমতা জন্মিবে, এবং এ দেশী স্ত্রীপুরুষ সকল বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলে, বিদেশী ব্যবসায়, বিদেশী শিল্প বা বিদেশী বণিক তাহাদিগের অন্ন কাড়িয়া লইতে পারিবে না। শিক্ষাই সকল প্রকার সামাজিক অমঙ্গল নিবারণের উপায়।"

'প্রাচীনা ও নবীনা' শীর্ষক প্রবন্ধেও তিনি স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক বঙ্গে যে স্ত্রীশিক্ষার প্রণালী প্রচলিত হইয়াছে তাহার সুফল সম্বন্ধে কিছু সন্দিহান হইয়াছেন। তাঁহার মতে অল্পবিদ্যা অনিষ্টকর। তাহাতে প্রচলিত ধর্ম্মের মূল শিথিল করিয়া ফেলে এবং স্ত্রীগণকে বিলাসিনী করিয়া তোলে। শিক্ষার মূল গভীর ও সুদৃঢ় না হইলে এবং তাহার সঙ্গে ধর্ম্ম শিক্ষা সংযুক্ত না হইলে তাহা সুফলপ্রদ হয় না।

স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁহার মত আমরা উপরের উদ্ধৃত অংশ হইতেই বুঝিতে পারি। আর যে অবরোধ-প্রথায় রমণীদিগকে সিন্দুকের মধ্যে কুলুপবন্ধ হইয়া থাকিতে হয়, যা 'কর্ত্তার ঘোড়া' পর্য্যন্ত দেখিয়া লজ্জায় ঘোমটা টানিয়া সরিয়া যাইতে হয়, সেই মুসলমানী অবরোধ প্রথা আনিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের কোন

ঔপন্যাসিক আদর্শেই দেখিতে পাই না, বা তৎপক্ষে কোথাও তিনি সমর্থন করেন নাই। সুখের বিষয় আধুনিক হিন্দুগৃহ হইতে এই তামসিক লজ্জা ক্রমেই দূরীভূত হইতেছে। আর বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন যদি অন্যান্য জাতির মত কর্ম্মময় হইয়া উঠে, বাঙ্গালীর স্ত্রী যদি বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রকার মহৎ ধর্ম্মে সহধর্ম্মিণী হইতে ইচ্ছা করে, তবে এই কঠোর অবরোধ-প্রথা যে সেই উন্নত সমাজের সঙ্গে খাপ খাইতে পারে না, তাহা শান্তির চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট দেখাইয়াছেন। সেইরূপ আদর্শে বাঙ্গালী রমণীকে গঠিত করিতে হইলে তাহার যেরূপ শারীরিক ও মানসিক শিক্ষার প্রয়োজন, তাহাও শান্তির চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ইঙ্গিত করিয়াছেন।

বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'সাম্য' নামক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য অতি উচ্চ আদর্শ ও উচ্চ ধর্ম্ম, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে পতিব্রতা ও স্বামীর প্রতি যাঁহাদের হৃদয় অবিচলিত, তাঁহারাও স্বতঃই বিধবা হইয়া ব্রহ্মচারিণীব্রত অবলম্বন করিবেন। কিন্তু অনেক রমণী এরূপ থাকিতে পারেন যে তাঁহারা স্বামী কি তাহাই জানিতে পারেন নাই, বা তাঁহারা নানাকারণে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে অসম্মত ও পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, এরূপ বিধবারমণীর বিবাহে সমাজের কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়। পুরুষের মধ্যেও যাঁহারা বিপত্নীক হইয়া দারপরিগ্রহে ইচ্ছুক, তাঁহাদের পক্ষে সমাজ যখন এইরূপ কোন নিষেধ-বিধি প্রচার করে নাই, স্ত্রীলোকের পক্ষেই বা এইরূপ বিধি থাকিবে কেন? ব্রহ্মচর্য্য বিধবার পক্ষে উচ্চ ধর্ম্ম হইতে পারে, কিন্তু বলপ্রকাশ দ্বারা বা জোর জবরদস্তি করিয়া সেই ধর্ম্মে কাহারও প্রবৃত্তি জন্মাইলে সেই ধর্ম্মের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয় এবং সমাজেরও তাহাতে অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গলের কোন সম্ভাবনা থাকে না। *

তবে অবাধ বিধবাবিবাহ বা রূপজ ও কামজ বিধবাবিবাহের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। এ সম্বন্ধে বিষবৃক্ষই প্রমাণ। 'বিষবৃক্ষে' তিনি কামজ বিধবাবিবাহের কুফল দেখাইয়াছেন। এই প্রকার বিধবাবিবাহ ইন্দ্রিয়বশ্যতার ফল, আত্মসংযমে অক্ষমতাই ইহার কারণ। তাহাতে মানুষের কিরূপ অধঃপতন হয় এবং নানাদিকে তাহার ফল কিরূপ বিষময় হইয়া উঠে, বিষবৃক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র তাহা অতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোত হিন্দুসমাজের

---

* অধুনা প্রকাশিত বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থাদিতে 'সাম্য' নামক প্রবন্ধে এই সকল কথা পাওয়া যায় না। প্রাচীন 'বঙ্গদর্শন'ও আমাদের নিকট নাই। সেই জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি যথাযথ উদ্ধৃত করিতে না পারিয়া আমরা কেবল মাত্র তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম। লেখক

বঙ্কিম বাবু পরে গ্রন্থাকারে 'সাম্য' প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু 'সাম্যে' বঙ্কিম বাবুর প্রবন্ধসমূহের যে সকল মত প্রচারিত হইয়াছিল তাহার অনেকগুলি তাঁর পরিণত বয়সে পরিবর্ত্তিত হয় বলিয়াই বঙ্কিম বাবু অনেকের অনুরোধ সত্ত্বেও জীবিতাবস্থায় আর সাম্যের নূতন সংস্করণ প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং কেবল 'সাম্যে' প্রকাশিত রচনার উপর নির্ভর করিয়া 'বিধবা-বিবাহ' বা অন্যান্য বিষয়ে বঙ্কিম বাবুর মতামত নিরূপণ করার চেষ্টা করিলে তাঁর প্রতি সুবিচার করা হইবে না। সম্পাদক

যে সমস্ত অংশের উপর আঘাত করিয়াছিল তাহার মধ্যে আর একটি ব্যক্তিগত অধিকার (Individual right)। এই সামাজিক গঠন হিসাবেও হিন্দুসমাজ ও পাশ্চাত্য সমাজ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। হিন্দুসমাজ সমাজ-তন্ত্রী, পাশ্চাত্য সমাজ ব্যক্তিতন্ত্রী। হিন্দু-সমাজে সমাজই সর্ব্বেসর্ব্বা, ব্যক্তি কিছুই নয়; পাশ্চাত্য সমাজে ব্যক্তিই কেন্দ্র ও তাঁহার ইঙ্গিতেই সমাজের স্থিতি ও গতি। তাই আমাদের সমাজ তাহার নিজেরই সার্ব্বভৌমত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত। যাহা কিছু আইন-কানুন, রীতিনীতি, বিধিব্যবস্থা সমস্তই এই সর্ব্বগ্রাসী সমাজের প্রাধান্য রক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই প্রচলিত হইয়াছে, ব্যক্তির সুখ-দুঃখের উপর নির্ভর করে নাই। ব্যক্তি তাহাতে পিষিয়া মরুক, তাহার প্রাণ-বায়ু লোপ পাউক, তাহার দিকে সমাজ দৃষ্টিপাত করে নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজ ব্যক্তিকেই মূলকেন্দ্র ধরিয়া লইয়াছে, ব্যক্তির সমষ্টিই যে সমাজ ইহাই তাহারা বুঝিয়াছে। সুতরাং এই সামাজিক গঠনের ফলে ব্যক্তির প্রাধান্যই সমষ্টিগত সমাজ অপেক্ষা বাড়িয়া গিয়াছে। ব্যক্তির স্বাধীনতা, লোকমতের স্বাধীনতা পাশ্চাত্য সমাজে বিশেষরূপে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। তাহার ফলে ব্যক্তিগত সাম্য সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কৃত্রিম বৈষম্যের সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু আমাদের সমাজে, সমাজের সার্ব্বভৌমত্বের ফলে বিপরীত ফল ফলিয়াছে। ব্যক্তির স্বাধীনতা লোপ পাইয়াছে, লোকমতের স্থান আমাদের সমাজে কোনদিনই প্রস্তুত হইয়া উঠিতে পারে নাই। যাহাই একবার সামাজিক বিধি ও আচার বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে, তাহাই যেন চির-কালের জন্য বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। তাহার অপব্যবহারে নানা কুফল উৎপন্ন হইলেও লোকমতের অভাবে সহজে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়া উঠিতে পারে নাই। এইরূপে এক সময় সামাজিক প্রয়োজনীয়তায় কর্ম্মবিভাগের ফলে যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা অবশ্য জাতিভেদপ্রথায় পরিণত হইয়াছে। কর্ম্মানুসারে যে ব্রাহ্মণ একদিন সমাজের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া পূজিত হইতেন, কালে তিনি দেবত্বে উঠিয়া শূদ্রাদি অন্যান্য জাতিকে দাসত্বের পদবীতে নামাইয়াছেন।

সুতরাং পাশ্চাত্য সমাজের সাম্যবাদের আদর্শ যখন নবশিক্ষিত হিন্দুসমাজের দৃষ্টি-পথে পড়িল, তখন তাহার ফলে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি হইল। নবশিক্ষিতগণ জাতি-ভেদ একেবারে উঠাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। প্রাচীন হিন্দুসমাজকে সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পাশ্চাত্য সাম্য-বাদের উপরে তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী হইলেন। অপর পক্ষে গোঁড়া হিন্দুর দল জাতিভেদকেই হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন এবং তাহা যে স্বয়ং ব্রহ্মা বা ভগবানের দ্বারা প্রবর্ত্তিত এবং তাহার পরিবর্ত্তন বা বিলোপসাধনে সমাজের যে কোনই ক্ষমতা নাই, তাহাই শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। এইরূপ অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র-প্রমুখ মধ্যপন্থিগণ জাতিভেদ সম্বন্ধে কিরূপ চিন্তা করিয়াছেন তাহা দেখিতে স্বভাবতই কৌতূহল হইতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও জাতি-

তের সম্পূর্ণ পৃথক্ জিনিষ। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সামাজিক কর্ম্মবিভাগের উপরে প্রতিষ্ঠিত। তাহার অপব্যবহারে জাতিভেদ কুফলপ্রদ হইতে পারে, কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সামাজিক প্রয়োজনীয়তা হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং তাহা সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর। আমরা নিম্নে 'অনুশীলন' বা 'ধর্ম্মতত্ত্ব' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি—

"অতএব জ্ঞান ও কর্ম্ম মানুষের স্বধর্ম্ম। • • • • জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য ব্রহ্ম : সমস্ত জগৎ ব্রহ্মে আছে। তজ্জন্য জ্ঞানার্জ্জন যাঁহাদিগের স্বধর্ম্ম তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা যায়। ব্রাহ্মণ শব্দ ব্রহ্মণ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

কর্ম্মকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বুঝিতে গেলে কর্ম্মের বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। জগতে অন্তর্ব্বিষয় আছে ও বহির্ব্বিষয় আছে। অন্তর্ব্বিষয় কর্ম্মের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। বহির্ব্বিষয়ই কর্ম্মের বিষয়। সেই বহির্ব্বিষয়ের মধ্যে কতকগুলিই হউক বা সবই হউক, মনুষ্যের ভোগ্য। মনুষ্যের কর্ম্ম মনুষ্যের ভোগ্য বিষয়কেই আশ্রয় করে। সেই আশ্রয় ত্রিবিধ, যথা, (১) উৎপাদন (২) সংযোজন বা সংগ্রহ (৩) রক্ষা। যাহারা উৎপাদন করে তাহারা কৃষিধর্ম্মী, যাহারা সংযোজন বা সংগ্রহ করে তাহারা বাণিজ্য-ধর্ম্মী, এবং যাহারা রক্ষা করে, তাহারা যুদ্ধধর্ম্মী। ইহাদিগেরই নামান্তর ব্যুৎক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ; এ কথা পাঠক স্বীকার করিতে পারেন কি ? • • •

যখন জ্ঞানধর্ম্মী, কৃষীধর্ম্মী, বা বাণিজ্য ধর্ম্মীর কর্ম্মের এত বাহুল্য হয় যে তদ্ধর্ম্মিগণ আপনাদিগের দৈহিকাদি প্রয়োজনীয় সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারেন না, তখন কতকগুলি লোক, তাহাদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হয়। অতএব (১) জ্ঞানার্জ্জন বা লোকশিক্ষা, (২) যুদ্ধ বা সমাজরক্ষা, (৩) শিল্প বা বাণিজ্য, (৪) উৎপাদন বা কৃষি, (৫) পরিচর্য্যা, এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম।"

এখানে বঙ্কিমচন্দ্র যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকেই বুঝাইতেছেন তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। ইহার অপব্যবহার জাতিভেদের ফলে যে সামাজিক বৈষম্যের উৎপত্তি হয় তাহা 'সাম্য' প্রবন্ধে তিনি সুন্দর রূপে বুঝাইয়াছেন।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের শীর্ষস্থানে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ যদি এই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রকৃত অনুবর্ত্তী হন তবে হিন্দুসমাজের অশেষ মঙ্গল হইতে পারে, প্রাচীন হিন্দুসমাজে তাহাই হইয়াছিল। তখন ব্রাহ্মণ প্রকৃতই সমাজশিক্ষক, সমাজের গুরু, দেবতা, ভক্তির পাত্র। তখন ব্রাহ্মণ-ভক্তিতে সামাজিক কল্যাণই সাধিত হয়। কিন্তু মূর্খ, ব্রহ্মজ্ঞানহীন, স্বার্থপর, নীচবৃত্তি-পরায়ণ যে ব্রাহ্মণ তাহাকেও কি ভক্তি করিতে হইবে ? তাহার উত্তর ব্রাহ্মণ বঙ্কিমচন্দ্র দিতেছেন—

"কদাপি না। যে গুণের জন্য ভক্তি করিব, সে গুণ যাহার নাই, তাহাকে ভক্তি করিব কেন ? সেখানে ভক্তি অধর্ম্ম। এই টুকু না বুঝাই ভারতবর্ষের অবনতির একটি গুরুতর কারণ। যে গুণে ব্রাহ্মণ ভক্তির পাত্র ছিলেন, সে গুণ যখন গেল, তখন আর ব্রাহ্মণকে কেন ভক্তি করিতে লাগিলাম ?

কেন আর ব্রাহ্মণের বশীভূত রহিলাম? তাহাতেই কুশিক্ষা হইতে লাগিল, কুপথে যাইতে লাগিলাম, এখন ফিরিতে হইবে।"

এক কথায়—

"যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকে ভক্তি করিব; যিনি তাহা নহেন, তাঁহাকে ভক্তি করিব না। তৎপরিবর্ত্তে যে শূদ্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকেও ভক্তি করিব।" (ধর্ম্মতত্ত্ব)

ইহাই ত প্রকৃত ব্রাহ্মণের কথা। লোক-শিক্ষক, সমাজ-শিক্ষকই ত প্রকৃত ব্রাহ্মণ। নহিলে ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া শুধু পৈতার চাপরাসেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। প্রকৃত ব্রাহ্মণের আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার মাধবাচার্য্য, চন্দ্রচূড় প্রভৃতি চরিত্রচিত্রে দেখাইয়াছেন। ইহারা সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী, পণ্ডিত, সর্ব্বত্যাগী, নিষ্কাম, অথচ সমাজ-শিক্ষক, ধর্ম্মশিক্ষক, লোকহিতে প্রবৃত্ত। ইহাই প্রকৃত-ব্রাহ্মণের আদর্শ।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অপব্যবহার জাতিভেদের অনেক কুফল উৎপন্ন হইয়াছে, সমাজশরীরে নানা ব্যাধি বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে সমুদ্র-যাত্রা-নিষেধ * ও লোকশিক্ষার অভাব, এই দুইটি বিশেষ রূপে উল্লেখ-যোগ্য। ষোড়শ শতাব্দীতেও হিন্দুরা সমুদ্র যাত্রা করিত। তাহার পরে কোন্ সময়ে এবং কি কারণে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছিল তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। আজ কাল রক্ষণশীলদল যে ভাবে সমুদ্র-যাত্রানিষেধের সাফুকূলে যুক্তি প্রয়োগ করেন, তাহাতে বোধ হয় বিজাতীয় দেশে গমন করিয়া শাস্ত্রনিষিদ্ধ অখাদ্য ভক্ষণ প্রভৃতি করিয়া জাতিলোপের ভয়েই সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি ইহাই প্রকৃত কারণ হয় তবে যে ইহা জাতিভেদের একটা কুফল তাহাতে সন্দেহ নাই, লোকমতের অভাবের ফলে ইহার আরও পুষ্টি ও বর্দ্ধন হইয়াছে। যে কারণেই হউক সমুদ্রযাত্রা-নিষেধের ফলে হিন্দুর শিল্পবাণিজ্যের যারপর নাই ক্ষতি হইয়াছে। বিশেষতঃ বহির্ব্বাণিজ্য ইহাতে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তার পরে যখন ইংরাজ-রাজত্ব ভারতবর্ষে স্থাপিত হইল এবং তাহার ফলে নানা পাশ্চাত্যজাতির সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল; তখন পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, ও শিল্পবাণিজ্য-প্রণালী শিক্ষা আমাদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল। এই শিক্ষার জন্য পাশ্চাত্য দেশে গমন সুতরাং সমুদ্রযাত্রাও প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। কিন্তু রক্ষণশীলদল এ বিষয়েও

* আমার কোন শাস্ত্রজ্ঞ বন্ধু বলিয়াছেন যে স্মৃতিতে কলিযুগে যে 'সমুদ্রযাত্রা' নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহা বাণিজ্যার্থ বা অন্য কারণে পোতারোহণ পূর্ব্বক 'সমুদ্রযাত্রা' নহে। এখন যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তিকে 'গঙ্গাযাত্রা' করান হয়, পূর্ব্বকালে তেমনি মুমূর্ষুর পক্ষে 'সমুদ্রযাত্রা'র বিধি ছিল। কলিযুগে সেই 'সমুদ্রযাত্রা' নিষিদ্ধ হইয়াছে। পোতারোহণ পূর্ব্বক দেশান্তর-গমন নিষিদ্ধ হয় নাই। আমি শাস্ত্রজ্ঞ বা প্রত্নতত্ত্ববিৎ কিছুই নহি, সুতরাং আমার পক্ষে ইহার সত্যাসত্য-নির্দ্ধারণ অসম্ভব। যদি কোন শাস্ত্রজ্ঞ ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ এ বিষয়ে আলোচনা করেন তবে বড়ই ভাল হয়। লেখক

ঘোরতর প্রতিকূলাচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ দ্বারা সমুদ্রযাত্রা-নিষেধের পোষকতা করিতে লাগিলেন; এবং যে সমস্ত মনস্বী ব্যক্তি পাশ্চাত্যদেশ হইতে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া আসিতে লাগিলেন, তাহাদিগকে জাতিচ্যুত এবং 'বিলাত-ফেরত' বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে হিন্দুসমাজে থাকিয়াও যে সকল মহাত্মা সমুদ্রযাত্রার অনুকূলে মত দিয়াছিলেন এবং বিলাত-ফেরতদিগকে আদরের সঙ্গে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহারা অতি সাহসের কার্য্য করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ইহাদিগের মধ্যে একজন, তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-বাণিজ্যাদি শিক্ষার জন্য সমুদ্রযাত্রা আধুনিক জাতীয় জীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সমুদ্রযাত্রা কোনকালেই হিন্দুসমাজে নিষিদ্ধ ছিল না এবং আধুনিক কালেও নিষিদ্ধ হইতে পারে না। বলা বাহুল্য গোঁড়াদলের নিকট ইহার জন্য তাঁহাকে বিলক্ষণ ভৎর্সনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। সেই সময়ের 'জন্মভূমি' নামক প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায় পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় 'বঙ্কিম বাবু ও সমুদ্র-যাত্রা' শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিম বাবুকে যেরূপ তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন তাহা পড়িলেই আমাদিগের কথার সত্যতার উপলব্ধি হইবে। তর্করত্ন মহাশয় বলিয়া-ছিলেন যে বঙ্কিম বাবু, রমেশ বাবু প্রভৃতি বাবু সাহেবেরা হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে মত দিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ হিন্দুসমাজ তাঁহাদের কথা শুনিবে না। তাহার পরে কয়েক বৎসর অতীত হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু ও রমেশ বাবু উভয়েই নিন্দাপ্রশংসার অতীত পরলোকে গমন করিয়াছেন। তর্করত্ন মহাশয় এখনও হিন্দুসমাজের শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি হিন্দুসমাজ সেই 'বাবু সাহেব'দিগের মতই শুনিতেছে। জাতীয়জীবনের আত্ম-রক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিয়া হিন্দুসমাজে সমুদ্রযাত্রা এক প্রকার প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। এখন যিনি হিন্দুত্বের দোহাই দিয়া সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ প্রমাণ করিতে উৎসুক তিনি হিন্দুসমাজের ঘোরতর অমঙ্গলেরই চেষ্টা করিতেছেন, সন্দেহ নাই।

জাতিভেদের আর এক কুফল লোক-শিক্ষার অভাব। প্রাচীন হিন্দুসমাজে কর্ম্ম-বিভাগানুসারে ব্রাহ্মণই প্রধানতঃ জ্ঞানচর্চ্চা করিতেন এবং তিনিই লোকশিক্ষক ছিলেন। অন্যান্য বর্ণ তাই বলিয়া জ্ঞানচর্চ্চায় অনধিকারী ছিল না। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরাও জ্ঞানচর্চ্চা করিতেন। শূদ্র কেবল বেদপাঠে অনধি-কারী ছিল। পুরাণাদি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিতে পারিত। কিন্তু কালক্রমে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ইহারও অপব্যবহার হইল। ব্রাহ্মণেরাই শেষে একমাত্র জ্ঞানচর্চ্চায় অধিকারী হইয়া উঠিলেন। অন্যান্য জাতি শিক্ষায় বঞ্চিত হইতে লাগিল। এই অবস্থার বর্ণনা করিতে বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন—

"এই গুরুতর বর্ণবৈষম্যের ফলে ভারত-বর্ষ অবনতির পথে দাঁড়াইল। সকল উন্নতির মূল জ্ঞানোন্নতি। পশ্বাদিবৎ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি ভিন্ন, পৃথিবীতে এমন একটি সুখ তুমি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারিবে না, যাহার মূল জ্ঞানোন্নতি নহে। বর্ণবৈষম্যে জ্ঞানো-

গতির পথ রোধ হইল, শূদ্র জ্ঞানালোচনায় অধিকারী নহে, এক মাত্র ব্রাহ্মণ তাহার অধিকারী। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক ব্রাহ্মণেতর বর্ণ, অতএব অধিকাংশ লোক মূর্খ হইল।" (সাম্য)

ইহার ফলে হিন্দুসমাজের যে গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। আজ বহুশত বৎসরের পরেও আমরা সেই কুপ্রথার বিষময় ফল ভোগ করিতেছি। ভারতবর্ষের যে অধঃপতন হইয়াছে, তাহার একটি প্রধান কারণ এই লোকশিক্ষার অভাব। লোক-শিক্ষার অভাবে ভারতবর্ষের জ্ঞানের প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল-অনুষ্ঠান ও শুভচেষ্টা এই লোকশিক্ষার অভাবে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। বঙ্কিম বাবুও এই কথা লিখিয়াছেন—

"বাঙ্গলার ছয় কোটী ষাটি লক্ষ লোকের দ্বারা যে কোন কাজ হয় না, তাহার কারণ এই যে বাঙ্গলায় লোকশিক্ষা নাই। যাঁহারা বাঙ্গলায় নানাবিধ উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত, তাঁহারা লোকশিক্ষার কথা মনে করেন না, আপন বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশেই প্রমত্ত। ব্যাপার বড় আশ্চর্য্য নহে।" (লোকশিক্ষা)

অন্য একস্থলে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"শিক্ষাই সকল প্রকার সামাজিক অমঙ্গল নিবারণের উপায়।" ('সাম্য')

আধুনিক সময়ে অনেক বিষয়েরই উন্নতি হইতেছে, লোকশিক্ষার উন্নতি হইতেছে না কেন? যদি লোক-সাধারণকে বিদ্যালয়ে সাহিত্য, ইতিহাস, জ্যামিতি প্রভৃতি পড়াইবার ব্যবস্থা থাকিত বা হয়, তাহা হইলেই কি এই লোকশিক্ষার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়? ইহার কারণানুসন্ধান করিতে যাইয়া বলিতেছেন,—

"কিন্তু আসল কথা বলি। কেন যে এ ইংরাজী শিক্ষা সত্ত্বেও লোকশিক্ষার উপায়, হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহার মূল-কারণ বলি, 'শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। শিক্ষিত অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না, শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না।"

কি উপায়ে এই কারণ দূরীভূত হয়, কি উপায়ে লোকশিক্ষা অতি সহজে ও যথার্থ-ভাবে দেশমধ্যে বিস্তৃত হইতে পারে, তাহাও তিনি বলিয়াছেন—

"সুশিক্ষিত যাঁহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা বাঙ্গলার সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতের সঙ্গে না মিশিলে তাহা ঘটিবে না। সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই।"

(বিবিধপ্রবন্ধ—লোকশিক্ষা)

আজি এই লোকশিক্ষার আন্দোলনের দিনে, নিম্নবর্গের উন্নতি চেষ্টার যুগে, মহা-পুরুষের এই উপদেশ আমাদিগের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সুখের বিষয় দেশের লোকের এ বিষয়ে মতি ফিরিয়াছে। লোকশিক্ষা কেবল হিন্দুসমাজের নহে, জাতীয় জীবনের একটি প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু সমাজসংস্কারে বঙ্কিম বাবুর যাহা প্রধান কার্য্য তাহা আমরা বলি নাই। তাহাই বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। মানুষের যত প্রকার অমঙ্গল আছে, সর্ব্বা-পেক্ষা গুরুতর অমঙ্গল আত্মগৌরবের

লোপ। ইহা অপেক্ষা গুরুতর অধঃপতন মানুষের পক্ষে আর হইতে পারে না। বহুশত বৎসরের পরাধীনতায় ও সামাজিক বিপ্লবে, আমাদিগের সেই দশা উপস্থিত হইয়াছিল। যখন ইংরাজেরা তাহাদের সুব্যবস্থিত সামাজিক আদর্শ লইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন আমরা তাঁহাদিগের তুলনায় আপনাদিগকে নিতান্ত হীন মনে করিতে লাগিলাম, আমাদিগের সর্ব্ব প্রকার সামাজিক ব্যবস্থা, বৈষম্য ও দুর্নীতিমূলক বলিয়া বোধ, হইতে লাগিল। এক শ্রেণীর লোক স্পষ্টই আর্য্যসমাজের ঘোরতর নিন্দায় প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ কেহ্ বা হিন্দুসমাজের ব্যবস্থায় অতৃপ্ত হইয়া, আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিতে লাগিলেন। এই বিষম বন্যার সময়ে হাল ধরিয়া যাঁহারা নৌকা 'বানচাল' হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। তিনি সেই সঙ্কট সময়ে হিন্দুর মনে আত্ম-গৌরবের জ্ঞান জাগাইয়া দিয়াছিলেন। হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থা, হিন্দুর রীতিনীতি যে নিতান্ত অসার ও অযৌক্তিক নহে, তাহা যে নিতান্ত নিগ্রো কাফ্রি বা জুলুদিগের সমাজ নহে তাহা পথভ্রান্ত পাশ্চাত্য-মোহমুগ্ধদিগের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলেন। পৃথিবীতে যে সমস্ত মানবসমাজ উন্নতি লাভ করিয়াছে, হিন্দুসমাজও যে তাহাদেরও অন্যতম, তাহারও সামাজিক ব্যবস্থা ও আচার নীতি প্রভৃতি যে উচ্চনীতি ও মহদাদর্শের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাহা তিনি অক্লান্ত লেখনী-চালনার দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আজ বাতাস ফিরিয়াছে, হিন্দু আপনার সামাজিক গৌরব বুঝিতে পারিয়াছেন। বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সমাজকে ঘৃণা করা ও তাহার সংশোধনের চেষ্টা করা, সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ। প্রথমটি—হিংসা, আসুরিক ভাব; দ্বিতীয়টি প্রেম—দৈবসম্পৎ! বুঝিতে পারিয়াছেন যে ভালবাসিয়া ও সামাজিক ব্যাধি ও ক্ষতের চিকিৎসা করা যাইতে পারে। বরং প্রেম ও ভক্তির উপর যে সংস্কারের ভিত্তি গঠিত, তাহাই সুপ্রতিষ্ঠিত। এই দিনে, যিনি স্বদেশ ও স্বসমাজের কল্যাণ চিন্তা করিয়া আপনার মস্তিষ্ক ক্ষয় করিয়াছিলেন, লোকের নিন্দা ও প্রশংসা উভয়কেই তুচ্ছ করিয়া একমাত্র মঙ্গলকেই লক্ষ্য করিয়া দৃঢ়পদে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই পরলোক-গত মনস্বী মহাত্মাকে, আন্তরিক ভক্তির সঙ্গে প্রণাম করিয়া আমরা আজ বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

—:—:—

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র।

চরিত্রাঙ্কন-প্রতিভা—অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত।

কবি দুই প্রকারের—সৃষ্টিকারী ও চিন্তাশীল। ইংরাজীতে রস্কিন এই দুই বিধ কবির নামকরণ করিয়াছেন Creative and Reflective. এই দুই শ্রেণীর কবি ভিন্ন তিনি অন্য কোনও প্রকার কবির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ইহাদের মধ্যে সৃষ্টিকারী কবিগণের কার্য্য অপেক্ষাকৃত দুরূহ, কারণ তাঁহাদিগকে কল্পনার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু শুধু কল্পনার উপর নির্ভর করিলেই চলে না, যে চরিত্র সৃষ্টি করিবেন তাহার সহিত প্রচুর সহানুভূতির প্রয়োজন করে। তাহা না হইলে চরিত্র সৃষ্টি হয় না, চরিত্রের একটা আভাস দেওয়া হয় মাত্র। চরিত্র জানিবার জন্য তাহার সহিত নিজের মনকে মিশাইয়া ফেলিতে হইবে।* To know a thing, what we can call knowing, a man must first love the thing, sympathise with it, that is, be intimately related to it.

চরিত্রসৃষ্টি ও রসসৃষ্টি উভয়ে অনেকটা উভয়ের অপেক্ষা রাখে। রসসৃষ্টি ব্যতিরেকে চরিত্র কখনও পুষ্ট হয় না, এবং চরিত্রসংশ্লিষ্ট রস না হইলে তাহার গাঢ়তা হয় না। সেই জন্য রসাবতারণশক্তি কবির একটি প্রধান গুণ। আমাদের অলঙ্কার-শাস্ত্রে রস প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে, কারণ কবি সৃষ্টিকারীই হৌন অথবা চিন্তাশীলই হৌন, মহাকাব্যই লিখুন, অথবা খণ্ডকাব্য বা গীতিকাব্যই লিখুন, যে পর্য্যন্ত না তিনি রসাত্মক কথা লিখিবেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার লেখা কবিত্বসম্পর্কযুক্ত হইবে না।

রসের আশ্রয় মনুষ্যের চিত্তবৃত্তি, মনুষ্যের সুখ-দুঃখ, মনুষ্যের হৃদয়ান্তর্গত ভাব। যিনি এই গুলিকে পৃথকদৃষ্টির সাহায্যে দেখিয়া একটি সম্পূর্ণ মনুষ্যের চিত্র আঁকিতে পারেন, যিনি সহানুভূতির বলে মনুষ্য-হৃদয়ের সমস্ত ভাবটুকু আকর্ষণ করিয়া নিজের ক্ষমতায় তাহাকে লোকসমক্ষে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ কবি। যিনি তাহা না পারেন, তিনি কবিতা লিখিলেও কবি নহেন। "To the poet as to every other we say "See." If you cannot do that it is of no use to keep stinging rhymes together, jingling sensibilities against each other and name yourself a poet.*

সুখ-দুঃখ ভাব প্রভৃতি লইয়াই মনুষ্য। মনুষ্য সমস্ত জগতেই প্রায় একরূপ, অন্ততঃ মনুষ্যের সুখ-দুঃখ প্রভৃতি সমস্ত জগতেই একই কারণে উদ্ভূত হয়, মানুষ যে সমাজে থাকে তাহার আচারপদ্ধতিতে, তাহার বাহ্য-ব্যবহারের বিভিন্নতা সাধিত হইতে পারে, কিন্তু মানুষ যে সমাজেই থাকুক তাহার চিত্ত-বৃত্তিগুলি একই রকম; উন্নত সমাজেও মানুষ

* Carlyle—Hero as a Poet.

* Carlyle—Hero as a Poet.

যাহাতে হাসে কাঁদে, অবনত সমাজেও মানুষ সেই সকল কারণেই হাসে কাঁদে, ইয়ুরোপীয় জনগণ যাহাতে হাসে কাঁদে, বঙ্গের মানুষও সেই সকল কারণেই হাসে কাঁদে। যে সমাজভুক্তই হৌক একটি মানুষের যথাযথ চিত্র যদি কেহ আঁকিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি সকল সমাজের মানুষেরই ছবি দেখান। কবি নিজের সমাজ ছাড়িয়া অন্য সমাজ হইতে মানুষের ছবি আঁকিতে যান না। সেক্ষপীয়র ইটালীর কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু সেখানকার মানুষগুলাকেও ইংলণ্ডবাসীর চরিত্রযুক্ত করিয়াই আঁকিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিজের সমাজের মানুষগুলিকে এত সূক্ষ্মদৃষ্টির সহিত দেখিয়াছিলেন, তাহাদের চিত্তবৃত্তিগুলি এত সুন্দর এত সত্য করিয়া আঁকিয়াছেন যে, তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র সকল দেশের ও সকল সমাজের লোকের পক্ষেই সত্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। তাঁহার ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিও মানুষের ছাঁচে ঢালা, তাহারা কবেকার লোক, কোনও ঐতিহাসিক ভ্রম হইতেছে কি না, এ সকল কথা ভাবিবার তাঁহার অবসর ছিল না। Ruskin বলেন—"If it be said that Shakespear wrote perfect historical plays on subjects belonging to the preceding centuries, I answer that they are perfect plays just because there is no care about centuries in them, but a life which all men recognize for the life of all time, and this is not because Shakespear sought to give universal truth, but because painting honestly and completely from the men about him, he painted that human nature which is constant enough. And the work of these idealists is therefore always universal; not because it is not portrait, but because it is complete portrait down to the heart which is the same in all ages: and the work of the mean idealists is not universal, not because it is portrait, but because it is half-portrait of the outside, the manners and the dress, not of the heart. Thus Finfort and Shakespear paint both of them, simply Venetian and English nature as they saw it in their time down to the root; and it does for all time." *

অতএব সৃষ্টিকারী কবিগণ আপন আপন সমাজের মধ্য হইতে মানুষ দেখিয়া তাহাদের চরিত্র চিত্রিত করেন; তাহাদের ভাল মন্দ যাহা কিছু আছে, কল্পনার বলে সকলি তাঁহাদের কাছে প্রত্যক্ষ হয়, তাঁহারা কোনও আদর্শ গড়িবার ইচ্ছা করিয়া দোষ বাদ দিয়া গুণটুকু, অথবা গুণ বাদ দিয়া কেবল দোষটুকু দেখাইবার চেষ্টা করেন না। তাঁহারা একটি চরিত্রের সর্বদিক্ দেখাইতে চেষ্টা করেন। এই সম্পূর্ণচিত্র প্রদানের ক্ষমতাই এই সকল কবির বিশেষত্ব।

* Modern Painters. Vol III.

এ বিশেষত্ব কল্পনা ভিন্ন আসে না। সকল বস্তুর অভ্যন্তর পর্য্যন্ত সমগ্র দর্শন কল্পনার কার্য্য। কেবল অনুভূতি দ্বারা এ কার্য্য সম্পন্ন হইবার নহে; অনুভূতি (Fancy) বাহ্যমাত্র দেখে, কল্পনা ভিতরে প্রবেশ করে। অনুভূতি অনেকটা প্রবৃত্তিময়ী, কল্পনা বুদ্ধি-বৃত্তিশালিনী। অনুভূতি বল বা Fancy বল, ইহা দ্বারা উদ্ভাবন হয় না, কল্পনাই কেবল এই উদ্ভাবনীশক্তি প্রদান করিতে সক্ষম। অতএব কল্পনার কাছে ছোট বড় সবই সমান, সবই তাহার গ্রাহ্য ও ব্যবহার্য্য। আমাদের সৌন্দর্য্য-গ্রাহিণীবৃত্তি যাহা ফেলিয়া দিতে চায়, কল্পনা তাহাই সাদরে গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। মহা-মতি রস্কিন বলিয়াছেন যে আমাদের কল্পনা অশোভন উপচার সংগ্রহ করিয়া যে মন্দির নির্ম্মাণ করে, তাহা সম্পূর্ণ হইলে আমাদের সৌন্দর্য্য-গ্রাহিণী বৃত্তি সচরাচর যাহাকে Æsthetic faculty বলে এবং তিনি যাহাকে Theoretic faculty নাম দিয়াছেন, তাহার পদে পূজোপহার দিতে বাধ্য হয়। মানুষের দৈনিক কার্য্যকলাপ অনেক ক্ষুদ্রতার সমাবেশে গঠিত হয়, আমাদের সৌন্দর্য্যানুভব-শক্তি হয় তো সেই ছোট ছোট কার্য্যগুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হইবে, কিন্তু সেই ছোট ছোট কাজগুলির ভিতর হইতে মনুষ্যের চরিত্রের একটি অংশ হয় তো এমনি অলক্ষ্যে বিকশিত হইতেছে যে কল্পনা তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারে না, সে সেই ছোট ছোট বিষয়গুলিকেও সাদরে গ্রহণ করিয়া বড় বিষয়ের সহিত মিশাইয়া স্বাভাবিক ভাবে এমন একটি চরিত্র গড়িয়া তোলে যে সেই সম্পূর্ণ শিল্পের সৌন্দর্য্য আমাদের সৌন্দর্য্যগ্রাহিণী বৃত্তিকেও বশীভূত করিয়া ফেলে। জগতে এমনি সুন্দর ও অসুন্দর বস্তু সর্ব্বদাই পাশাপাশি দেখা যায়। তাই কাল্পনিক কবি ইহার কিছুই বাদ দিতে পারেন না। এই জন্যই কালিদাস বা সেক্ষপীয়র ভাল মন্দ কিছুই বাদ দেন না, মহাদেবের পার্শ্বে মদনকে চিত্রিত করিতে কুণ্ঠিত হন না, কুশের পার্শ্বে অগ্নিবর্ণ বা ডেস্‌ডিমোনার পাশে ইয়াগোকে আঁকিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন না।

এতদ্ভিন্ন কল্পনার আর একটি সহজশক্তি আছে তাহা অসত্যকে সত্যবৎ প্রতিভাত করা। আমরা যাহা দেখিতে পাই না, কল্পনার বলে কবি তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ইতালীর কবি ডান্টে স্বীয় অদ্ভুত কল্পনার বলে স্বর্গপর্য্যটন ও নরক প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদের বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা স্বপ্নদৃষ্ট নহে, প্রত্যক্ষীকৃত। এই বর্ণনার মধ্যে কিছুই অস্পষ্ট নহে, কোনও কথা আভাসে বলা হয় নাই, কবি মানসনেত্রে যাহা স্পষ্ট দেখিয়াছেন, তাহাই দেখাইয়া-ছেন। যাঁহাদের কল্পনার শক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প তাঁহারা এ সকল চিত্রে স্পষ্টতার পরিবর্ত্তে সাজানো অস্পষ্টতা আনিয়াছেন, মিল্টনের নরকবর্ণনায় এইরূপ অস্পষ্টতা-দোষ দেখা যায়। তাঁহার নরক অনেক পরিমাণে রহস্যময় (mysterious)। সে কথা যাউক, এখন আমাদের বক্তব্য এই যে কবিগণ প্রায়ই অপ্রাকৃত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, কিন্তু এই অপ্রাকৃত চিত্রাঙ্কন বিষয়ে কবি-গণের কল্পনা-শক্তির তারতম্য নিবন্ধন অনেক

তারতম্য দেখা যায়। একটা উদাহরণ দ্বারা এই কথা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক। সেক্ষপীয়র তাঁহার ম্যাক্‌বেথ নামক নাটকে ম্যাক্‌বেথের সমক্ষে ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মার আবির্ভাব বর্ণনা করিয়াছেন; সে বর্ণনা এত ক্ষমতাশালী যে আমরাও যেন ম্যাক্‌বেথের সহিত সেই প্রেতাত্মাকে দেখিতে পাই; এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, সেক্ষপীয়র অপার্থিব হইলেও সেই প্রেতাত্মাকে দিব্য চক্ষে দেখিয়াছিলেন, ম্যাক্‌বেথ যেমন স্পষ্ট-রূপে দেখিতে পাইয়াছিল, সেক্ষপীয়রও তেমনি স্পষ্টরূপে তাহাকে দেখিয়াছিলেন। এ একটা কৌশলমাত্র নহে, পূর্ব্বশ্রুত ভূতের গল্পের ছায়ামাত্র নহে, ইহা সত্য, সজীব প্রত্যক্ষীকৃত সত্য। সেক্ষপীয়রের শক্তিময়ী কল্পনা এই ঘটনা দেখিয়াছিল, দেখিয়া তবে তাহা বর্ণনা করিয়াছে। কিন্তু সেক্ষপীয়রের সমসাময়িক কবি মিড্‌লটন এইরূপ ক্ষেত্রে কি করিয়াছেন? তিনিও প্রেতাত্মার আবির্ভাব বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু সে যেন একটা আবছায়া মাত্র, তাহার অস্তিত্ব যেন অনুমান-সাপেক্ষ।

De Flores :—

Ha! what art thou that takest away the light
Betwixt that star and me?
I dread thee not—
'Twas but a mint of conscience,
all's clear again.
The Changeling.

De Floresও ম্যাক্‌বেথের মত হত্যাকারী, তাহার সমক্ষেও হতব্যক্তিরই প্রেতাত্মার আবির্ভাব কবি বর্ণনা করিয়াছেন, এবং খুব সম্ভব এই ঘটনা হইতেই সেক্ষপীয়র ম্যাক্‌বেথের সমক্ষে ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মার আবির্ভাব কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু উভয় চিত্রে কি বিরাট ব্যবধান! কবি মিড্‌লটন Alonzoর প্রেতাত্মাকে আনিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে তিনিই ভাল করিয়া দেখিতে পান নাই, তো ডি ফ্লোরিস দেখিবে কি? তাই সে সেই আবির্ভাবে বিচলিত না হইয়া 'Twas but a mint of conscience বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিল, কিন্তু ম্যাক্‌বেথ ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল, তাই সে আতঙ্কে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল—Thy bones are marrowless, thy blood is cold প্রভৃতি বর্ণনা প্রত্যক্ষ না করিলে হয় না।

এইরূপ অপার্থিব বা অবাস্তবকে বাস্তবের মত দেখা ও দেখান কল্পনার একটি প্রধান কাজ। সকল মহাকবিই অপ্রাকৃতের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যে যে একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, তাহাই দেখান কি ইহার উদ্দেশ্য? এ বিশ্বসংসারের প্রতি লক্ষ্য করিলে মানুষকে অভিশপ্ত দেবতা বলিয়াই কি মনে হয় না? নিজের কর্ম্মফলের হাত হইতে দেবতারও বুঝি নিস্তার নাই। মহামায়ার মায়া দেবতাও এড়াইতে পারেন না, তাই ভগবান্ বলিয়াছেন, "দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।" আজকালকার পাঠক কথায় কথায় অভিশাপ দেখিয়া বড় ক্রুদ্ধ হ'ন। কিন্তু এই অভিশাপ-ব্যাপারের ভিতর বিশ্ব-পরিচালিনী নীতির একটি সুন্দর নীতি

প্রকাশিত হইতেছে। ভগবৎপদে সামান্য ত্রুটিও বিশ্বনিয়ন্তার কাছে মার্জ্জনীয় নহে, বিশেষতঃ যাঁহারা দেবপদে উন্নীত হইয়াছে তাঁহাদের কাছে। আজ আমরা আমাদের দুর্ব্বল ও দলিত জ্ঞানের প্রভাবে দেবতায় বিশ্বাস করি না, কিন্তু পূর্ব্বে সকলে ঠাকুর-দেবতা মানিতেন, অন্ততঃ আমাদের আলোচ্য কবিরা মানিতেন, সে বিষয়ে দ্বিধা করিবার কোনও কারণ নাই। আমরা দেবতা মানি না, কিন্তু মিল্টনের আর্ক-এঞ্জেলের বিবরণ পড়িয়া মুগ্ধ হইতে কোনও বাধা হয় না, এবং ঈশ্বরাভিশপ্ত হইয়া আর্ক এঞ্জেল হইতে সয়তানরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া স্বর্গ হইতে নরকে নির্ব্বাসন-ব্যাপার বেশ সঙ্গত মনে করিয়া, তদ্বিবরণ সম্বলিত কাব্যরস স্বচ্ছন্দে উপভোগ করিতে পারি। একটু ভাবিয়া দেখিলে এই অভিশাপ-ব্যাপার নিতান্ত হাস্যজনক নহে তাহা আমরা বুঝিতে পারিব। কিন্তু আমরা প্রথমেই একটা অন্ধধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের মনটিকে এই ব্যাপারের বিপক্ষে দাঁড় করাইয়া তুলি; তখন আর অত ভাবিবে চিন্তিবে কে? নব্যসমালোচক লিখেন "প্রাচীন কবিরা গণেশ-বন্দনা, সরস্বতী-বন্দনা—উর্দ্ধ পক্ষে বেশী দার্শনিক হইতে গেলে—পুরাণোক্ত সৃষ্টিরহস্য বর্ণনা করিতেন, ও নীলাম্বরের অহেতুক শাপে, ও ব্যাধকে জয়ন্তী বেশে অন্নপূর্ণার ছলনায়, দেবীর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ দেখাইয়া তখনকার পাঠককে রোমাঞ্চিত করিতেন। সে সকল বর্ণনায় নব্য পাঠকের মন ভক্তিরসার্দ্র না হইয়া, এই কথায় কথায় অভিশাপ দেওয়া নিতান্ত অযৌক্তিক ও হাস্য-রসোদ্রেককর খাম্‌খেয়ালি ব্যবহার মনে করিবেন।"

কথাটা কি সত্য? অন্যান্য বিষয়ে যে ভ্রম থাকে থাকুক, আমরা এখন এই নীলাম্বরের অভিশাপ ব্যাপারটা একটু অভিনিবেশ সহকারে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইব। আমরা এখন অতিপ্রাকৃতের কথার আলোচনা করিতেছিলাম, অতএব এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই স্থলে বলিয়া রাখিলে অশোভন হইবে না। নীলাম্বরের অভিশাপটা কি যথার্থই হাস্যরসোদ্রেককর? এই অভিশাপের ইতিহাসটা আমাদিগকে একবার স্মরণ করিতে হইতেছে। নীলাম্বর ইন্দ্রকর্ত্তৃক শিবপূজার পুষ্পাহরণে আদিষ্ট হইয়া পুষ্প-অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে; ভগবতীর মায়ায় সে স্বর্গোদ্যানে পুষ্প না পাইয়া মর্ত্ত্যে পুষ্পচয়নার্থ আসিয়াছে, সেখানে সে ধর্ম্মকেতু ব্যাধকে মায়ামৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে দেখিয়া নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া কহিতেছে—

"হৃদয়ে রহিল শাল, ব্যাধের জনম ভাল
কেনে হৈলাম ইন্দ্রের কোঙর॥
এই ব্যাধ ভাল জীয়ে তৃষাকালে পাণি পিয়ে
যথাকালে করয়ে ভোজন,
পুর মথনের পূজা যাবত না করে রাজা
ততক্ষণ উদর দাহন॥
* * * *
সাজি দণ্ড হাথে করি প্রভাতে কাননে ফিরি
অনুদিন যেন মালাকার॥
চরণে কণ্টক ফুটে আঁচর শতেক বুকে
নিদারুণ দৈব আমার।"

নীলাম্বর দেবতা হইয়াও ভগবতীর মায়া

বুঝিতে পারিল না, সে সতৃষ্ণ নয়নে স্বর্ণমৃগ দেখিতে লাগিল।

"অনিমিখ নয়নে দেখিল নীলাম্বর।
ক্ষুণ্ণ চিত্ত দূরে গেল ভাবেন কোঙর॥"

পিতাকর্ত্তৃক ভগবৎসেবার উপচার-সংগ্রহে নিযুক্ত হইয়া নীলাম্বর একটা মায়ামৃগ দেখিয়া নিজ কর্ত্তব্য ভুলিয়া গেলেন, এবং অপরের প্রতি ঈর্ষার ভাব হৃদয়ে ধারণ করিলেন। যেখানে অমৃতাস্বাদপুষ্ট হৃদয় নিত্য-শান্তিময়, যেখানে ভগবৎচিন্তার বিরাম ও বাধা নাই, সেই অমৃতলোকনিবাসী হইয়া নীলাম্বর যে ক্ষুদ্র জনোচিত ভাব প্রকাশ করিয়াছে, তাহার উপযুক্ত শাস্তি কি নরলোকে ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ নয়? তাই শিবরূপী ভগবান তাহাকে অভিশপ্ত করিলেন—

"মোর সেবা ছাড়ি তুমি অন্য কর সাধ।
বসুমতী চল ঝাট হও তুমি ব্যাধ॥"

ইহা কি পরমনীতিবেত্তার ন্যায়সঙ্গত বিচার নহে? আমি জিজ্ঞাসা করি যে ইহা অপেক্ষা Satan (সয়তান) কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছিল যে তাহাকে স্বর্গচ্যুত হইয়া নরকে বাস করিতে হইল? Angelত্ব হারাইয়া সয়তান হইতে হইল। নিজের অদৃষ্টের প্রতি ধিক্কার দেওয়া অর্থেই ভগবানের ন্যায় বিচারে সন্দেহ, ইহা অপেক্ষা Adam and Eve (আদম ওহবা) কি কিছু গুরুতর অপরাধ করিয়াছিল যে তাহাদের Paradise (স্বর্গীয় কানন) ত্যাগ করিয়া মর্ত্ত্যে আসিয়া দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল? যিনি নীলাম্বরের অভিশাপকে অহেতুক, হাস্যজনক ও খামখেয়ালি ব্যবহারের পরিচায়ক বলিয়াছেন, তিনি কি এ সকল কথাগুলি একেবারে ভুলিয়াছিলেন? কিন্তু আদম ও হবাকে ভুলাইবার জন্য যেমন একজন সয়তানের আবশ্যক হইয়াছিল, নীলাম্বরকে ভুলাইবার জন্য সে সয়তানের আবশ্যক হয় নাই, তাহাকে ভুলাইয়াছিল ঈশ্বরেরই প্রকৃতি—ঈশ্বরের মায়াস্বরূপিণী মহামায়া। নির্ভীক ও সত্যতত্ত্বজ্ঞ সনাতন ধর্ম্ম সকলেও সয়তানের অস্তিত্ব নাই, এবং এই নীলাম্বরের অভিশম্পাত-ব্যাপার দ্বারা জগতের একটি অত্যাবশ্যক ও অত্যুপকারী কার্য্য সাধিত হইয়াছে,—তাহা জগতে ঐশীশক্তির পূজা-প্রচার। অভিশপ্ত নীলাম্বর অভিশপ্ত সয়তানের মত চিরদিন মন্দপ্রবৃত্তি-ময় হইয়া সংসারে জন্ম গ্রহণ করেন নাই, অথবা আদমের অভিশাপের ন্যায়, তাহার অভিশাপ অনন্ত যন্ত্রণাময় হয় নাই। নীলাম্বরকে আদমের মত বলিতে হয় নাই—

All that I eat and drink or shall beget
Is propagated curse.

* * * *

Did I request Thee maker from
my clay
To mould me man? Did I solicit
thee
From darkness to promote me, or
here place
In this delicious garden. As my will
Concurred not to my being, it were
but right
And equal to reduce me to dust
Desirous to resign, and render back
All I received, unable to perform

Thy terms too hard by which I was to hold
The good I sought not. To the loss of that
Sufficient penalty, why hast thou added
The sense of endless woes ?

এখন একবার ভাবিয়া দেখিলে আমরা কি বলিতে পারি যে নীলাম্বরের অভিশাপ অহেতুক ও খামখেয়ালি ব্যাপার ? কবি ভারতচন্দ্র কহিয়াছেন—

কর্ম্মভূমি ভূমণ্ডল ত্রিভুবন সার।
কর্ম্ম-হেতু জন্ম লৈতে আশা দেবতার॥

এই দুইটি ছত্রে এই অভিশাপতত্ত্বের একটি সুন্দর সরল ব্যাখ্যা রহিয়াছে। স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে, দেবত্ব ও মনুষ্যত্ব পরস্পরার্থ ও ঘনিষ্ঠকর্ম্ম সম্বন্ধে আবদ্ধ, এই তত্ত্ব এই অভিশাপ হইতে প্রকটিত হইতেছে। মুকুন্দরাম কবি, দার্শনিক নহেন ; দার্শনিক যাহা তর্কযুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন, কবি তাহাই সজীব চিত্রের দ্বারা দেখাইয়া দেন। মুকুন্দরামে দার্শনিক তত্ত্ব নাই, ইহাতে দুঃখিত হইবার কোনও কারণ নাই, কারণ কোনও কাব্যই কঠিন দার্শনিক তত্ত্বের সহযোগে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। দেবদেবী বন্দনা করিয়া অথবা পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া তিনি কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন, কাব্য আরম্ভ করিয়া তিনি আর কোথাও দার্শনিক সমস্যার অবতারণা করেন নাই। কাব্য মধ্যে কূটতর্কের স্থান হয় না, ইহার পর তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা যুক্তিগ্রাহ্য নহে, হৃদয়গ্রাহ্য। তিনি যাহা হৃদয়ের ভিতর অনুভব করিয়াছেন এবং ভক্তির চক্ষে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাই লিখিয়াছেন। নীলাম্বরের অভিশাপ কাল্পনিক ব্যাপার বটে, কিন্তু মুকুন্দরাম তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বর্ণনা পাঠ করিলে বেশ বোঝা যায়। ভক্ত কবি যাহা ভক্তি-তুলিকার সাহায্যে চিত্রিত করিয়াছেন, তখনকার ভক্ত ও বিশ্বাসবান্ লোকে তাহা হৃদয়দর্পণে প্রতিবিম্বিত করিয়া আনন্দে রোমাঞ্চিত হইতেন ; আমরা এখন বিশ্বাসহীন নির্জ্জীব যন্ত্রবৎ পরিচালিত, আমরা তখনকার কবির বা তখনকার লোকের সরল বিশ্বাস বুঝিতে পারি না, তাহা কি কবির দোষ ? আমাদের ভাল লাগে না বলিয়া তাহার একটা অন্যায় ও অযৌক্তিক কারণ অনুসন্ধানের, অথবা একটি মনগড়া সাফাই দিবার কোনও হেতু নাই। আমাদের অনেক জিনিষই এখন ভাল লাগে না, এখন আমরা, যাহা সহজে বোঝা যায় না, তাহাকেই কবিত্বের চরম বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছি, বিদেশীভাবে যাহা সমাচ্ছন্ন তাহাকেই ভাল ভাবিতে শিখিয়াছি, তাই আমাদের আগেকার খাঁটি জিনিষ কিছুই ভাল লাগে না। তাই বলিয়া কাহারও নামে বৃথা দোষারোপ করিয়া নিজের রুচির বিজয় ঘোষণার প্রয়োজন দেখি না।

সে যাহা হৌক আমরা অন্ততঃ এইটুকু লক্ষ্য করিতে পারি যে মুকুন্দরাম যে অতি-প্রাকৃত ঘটনার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার চক্ষে আবছায়ার মত দেখা দেয় নাই, তাহা বেশ স্পষ্টভাবে তাঁহার নয়নের কাছে

আবির্ভূত হইয়াছিল। প্রকৃত মনুষ্য-জীবনের সহিত অপ্রাকৃত ঘটনার অতি নিকট সম্পর্ক তিনি তাহা বিশ্বাস করিতেন, সত্য হৌক বা মিথ্যা হৌক এই বিশ্বাস ভারতবর্ষে অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে, এখনও একেবারে তিরোহিত হয় নাই। তিনি যে অপ্রাকৃত ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা কাব্য লিখিবার খাতিরে নহে, তাই সেগুলি আজকালকার বিশ্বাসযোগ্য হৌক বা না হৌক, অন্ততঃ কষ্ট-কল্পিত নহে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তখনকার পাঠক ও আমাদের ভিতর একটা বিরাট ব্যবধানের কল্পনা করিয়া আজকাল-কার সমালোচক নিজ উচ্চাসন হইতে তাহাদিগের প্রতি করুণ নেত্রপাত করিতে থাকুন, কিন্তু তখনকার পাঠকগণ যদি এই সকল চিত্র দর্শনে ধর্ম্মে মতিমান্ হইত, ও ভক্তি দ্বারা হৃদয় স্নিগ্ধ করিতে পারিত তো তাহারা লাভবান্ বৈ ক্ষতিগ্রস্ত হইত না। তাহারা কবির সহিত ঐশীশক্তির প্রভাব অনুভব করিয়া তৃপ্ত হইত। কবি মুকুন্দরাম হিন্দু কবি, হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসবান্, তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা প্রাণের সহিত ভক্তির সহিত ; ভক্তের পক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, কল্পনার সাহায্যে সজীব করিয়া তিনি সেই সকল চিত্র সত্য করিয়া তুলিয়াছেন। অতিপ্রাকৃতের সাহায্য আধুনিক কবিগণও গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু সে অতিপ্রাকৃত-চিত্রে সত্যতার চিহ্নমাত্র নাই, তাহা কেবল কবিত্বময় বলিয়া বিবেচিত হইয়া কবির কবিত্ব-প্রকাশের উপায় ব্যতিরিক্ত আর কিছু হয় নাই। মুকুন্দরামের কাছে যাহা প্রত্যক্ষ করিবার সম্ভাবনাযুক্ত সত্য ছিল, তাহা মাইকেল মধুসূদনপ্রমুখ আধুনিক কবিগণের কাছে "Mythology" না হয় সেটা "Grand mythology"ই হৌক। ভারতচন্দ্রের সময়ও তাহা গল্পে পরিণত হয় নাই, তাই তাঁহার মহা-দেবের মূর্ত্তি অমন সুন্দর। ভারতচন্দ্রের কল্পনা সে সকল চিত্রকে তাঁহার চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত না করিলে তাহা কখনই অমন উজ্জ্বল হইত না। ভারতচন্দ্রের সময়ও লোকে বিশ্বাস হারায় নাই তখনও লোকে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিত, চরিত্রের বহু ক্ষতি সাধিত হইলেও তখনও লোকে ধর্ম্মের প্রতি অনাদর করিতে শিখে নাই ; ভারতচন্দ্রেও যে অতিপ্রাকৃত আছে তাহা মুকুন্দরামের মত প্রাণস্পর্শী না হইলেও অনেক স্থলে স্বাভাবিক। কিন্তু অধিকাংশস্থলেই তিনি অনুকরণ করিয়াছেন ও কৃত্রিমতা-দুষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। বলিয়াছি তো যে ভারতচন্দ্র মুকুন্দরামের প্রতিবিম্ব-স্বরূপ। দুই একটি উদাহরণ দ্বারা ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ভগবতী মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কালকেতুর ভবনে বিরাজমানা, ফুল্লরা অনেক বুঝাইয়াও তাঁহাকে সরাইতে পারিল না, তখন সে স্বামীর সন্ধানে গেল। পরে স্বামীকে সঙ্গে লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল ও কালকেতুও তাঁহাকে অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তিনি তো নড়িবেন না ; আজ কাল-কেতুর পরীক্ষার দিন। কালকেতু তখন মহা-ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুর্ব্বাণে শর গ্রহণ করিল, এবং "ভানু সাক্ষী করি বীর

ছুড়িলেক শর।" কিন্তু এ কি অপরূপ ঘটনা!

ছাড়িতে ছুড়িতে শর নাহি পারে বীর।
পুলকে পূরিত তনু চক্ষে বহে নীর॥
শরাসনে আকর্ণ পূরিত কৈল বাণ।
হাথে শর রাহু যেন চিত্রের নির্ম্মাণ॥
নিমেষিতে মুখে নাহি নিঃসরে বচন।
বল বুদ্ধি হত হৈল আখেটী নন্দন॥

একটি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী চিত্র। এ অবস্থাটি কবির মৌলিক সৃষ্টি নহে তাহা আমরা জানি, ইহার মূল রঘুবংশ—

"বামেতরস্তস্য করঃ প্রহর্ত্তুঃ,
নখপ্রভাভূষিতকর্ণপত্রে।
সক্তাঙ্গুলিঃ সায়কপুঙ্খ এব
চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে॥"

অবস্থা একরূপ হইলেও ভাবের পার্থক্যে চিত্রদ্বয়ে অনেক পার্থক্য আসিয়াছে; বাহুস্তম্ভে দিলীপ রুদ্ধবীর্য্য সর্পের ন্যায় "বিবৃদ্ধমন্যুঃ" বাহুস্তম্ভে কালকেতু পুলকে রোমাঞ্চিত। তাই বলিতেছিলাম যে এ চিত্রদ্বয়ে পার্থক্য আছে; মুকুন্দরাম কালিদাসেরই মত কালকেতুর এই ভাববিহ্বল অবস্থা যেন চক্ষে দেখিয়া চিত্রিত করিয়াছেন।

কালকেতুর যখন এইরূপ অবস্থা তখন দেবী কৃপা করিয়া তাহাকে আত্মপরিচয় দিলেন; কিন্তু কালকেতু তাহাতে বিশ্বাস করিতে পারিল না, সে স্পষ্টই বলিল যে পরস্তু দেবী হইলেও হইতে পারে, সে বুঝিতে পারিল না যে তাহার কোন্ গুণে দেবী তাহাকে এত করুণা করিবেন। তাই সে বলিল যে আদ্যা যদি মহিষমর্দ্দিনী রূপে তাহাকে দর্শন দেন তবে সে বিশ্বাস করিবে যে তিনি যথার্থই ভগবতী বটেন ভগবতী কালকেতুকে কৃপা করিয়া মহিষমর্দ্দিনী রূপ ধারণ করিলেন, সে মূর্ত্তি কবি অতি মনোজ্ঞভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কালকেতু মায়ের সেই দানবদলনী মূর্ত্তির প্রভাব সহ্য করিতে পারিল না, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল; দেবী তাহাকে প্রবুদ্ধ করিলেন, এবং তাহার প্রার্থনায় আবার পূর্ব্বরূপ ধারণ করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিলেন। তখন ব্যাধদম্পতী আনন্দে মাকে বরণ করিয়া লইল। আমরা দেখিতেছি যে এই সকল অবস্থা, কবি গীতার অর্জ্জুন-কৃষ্ণ-সংবাদ হইতে লইয়াছেন, কিন্তু কালকেতুর অবস্থা এখানেও তাঁহার কাছে প্রত্যক্ষ ব্যাপার তাহা ঈষৎ মনোযোগ করিলেই বুঝা যাইবে। বিরাটমূর্ত্তি দর্শনে মহাজ্ঞানী অর্জ্জুনও ভীত হইয়া বলিয়াছেন যে সে মূর্ত্তি তিনি সহ্য করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু তিনি মূর্চ্ছিত হ'ন নাই। অজ্ঞানী কালকেতুর পক্ষে তাহা স্বাভাবিক নহে, কবি মানসচক্ষে দেখিলেন যে কালকেতু মায়ের বিরাট মূর্ত্তি দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। চিত্রের জন্য মুকুন্দরাম ঋণী হইলেও তাঁহার কল্পনা এখানেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই।

ভারতচন্দ্র হরিহোড়ের চিত্রে বহুল পরিমাণে মুকুন্দরামের কাছে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি বিশ্বাস করিতেন যে এরূপ অবস্থা হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু তিনি হরিহোড়ের অবস্থা মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই, তাই তাঁহার চিত্র দেখিয়া তাহার স্বাভাবিকতায় আমরা

সন্দিহান হই। একটি যে অন্নের অনুকরণ মাত্র তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। হরিহোড় অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইল কেন? মায়ের অমন কোমল, অমন আশাপ্রদ, অমন মনোহর মূর্ত্তি তো আর নাই, সে মূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল না হইয়া হরিহোড় মূর্চ্ছিত হইল কেন? ভারতচন্দ্র মুকুন্দরামে যে যে অবস্থা পাইয়াছিলেন তাহাই যথাদৃষ্ট তথালিখিত করিয়াছেন, ইহাই তাহার একমাত্র কারণ।

রাজ-কবিগণের একটা দোষ যে তাঁহারা যে রাজার সভায় বাস করেন তাঁহার স্তুতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। স্বয়ং সেক্‌পীয়র এই দোষ হইতে অব্যাহতি পান নাই। ভারতচন্দ্রে এই দোষ বিলক্ষণ লক্ষিত হইবে। তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে যথেষ্ট ঋণী ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাদের বলিতে হইতেছে যে কবির মুখে তাঁটের মত স্তুতি ভাল লাগে না। শুধু কৃষ্ণচন্দ্রের স্তুতি করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হ'ন নাই, কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারকে কাব্যের অন্যতম নায়করূপে কল্পিত করিয়াছেন, এবং ইহার খাতিরে, তাঁহাকে অনেক বাজে কথা লিখিতে হইয়াছে, ভবানন্দের প্রতি মায়ের কৃপা কিছু ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু মা তাহার খাতিরে দিল্লী-সহরে ভূতের উপদ্রবের সৃষ্টি করিয়া পাতসাহকে বশ করিয়াছিলেন, এই সকল খোলাখুলি উপন্যাস শুনিলে ভাবকের অতি-প্রশংসামূলক অলীক কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই মনে হয় না। এখানে যতগুলি অনৈসর্গিক ব্যাপার কল্পিত হইয়াছে সবগুলিই অপ্রাসঙ্গিক। ভারতচন্দ্রের রোগ, যাহা মুকুন্দ-রামে পাইয়াছেন তাহা কোন না কোনও অছিলায় নিজ কাব্য মধ্যে আনিতে হইবে, তা তাহা প্রাসঙ্গিকই হৌক বা অপ্রাসঙ্গিকই হৌক সংলগ্নই হৌক বা অসংলগ্নই হৌক, সম্ভবই হৌক বা অসম্ভবই হৌক। কলিঙ্গ-ভূপতি হিন্দুরাজা, তিনি যখন বুঝিলেন যে একজন চণ্ডীভক্তকে তিনি অকারণ নির্য্যাতন করিয়াছেন, তখন তাঁহার চিত্তে চণ্ডীর স্বপ্ন-প্রদান স্বাভাবিক ও তাঁহার সেই স্বপ্ন-দর্শনও স্বাভাবিক, এবং পরে কালকেতুকে ভাই ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করা বিচিত্র নহে। কিন্তু মুসলমান-বাদসাহের জাগ্রত অবস্থায় ঐরূপ অনৈসর্গিক ব্যাপার দর্শন করা নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অসংলগ্ন। কিন্তু ভারতচন্দ্রকে তো ভবানন্দ মজুমদারকে বাড়াইতে হইবে, এবং তাঁহার অন্নদা-মঙ্গল যে দামুন্যায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ রচিত চণ্ডীকাব্য অপেক্ষা কোনও অংশেই ন্যূন নহে, তাহা রাজসভায় তাঁহাকে প্রতিপন্নও করিতে হইবে, অতএব অপ্রাসঙ্গিক হইলেও মায় "কমলে কামিনী" পর্য্যন্ত অন্নদা-মঙ্গলে "উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া" বসিয়াছেন। এই স্থলে কতকগুলি অনৈসর্গিক ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে, সবগুলিই কাব্যের খাতিরে, সহজ বা স্বাভাবিক ভাবে নহে। মেঘনাদ-বধে মায়াদেবীর কাছে গিয়া ইন্দ্রের দেবাস্ত্র-সংগ্রহের ন্যায় ইহা নিতান্তই নিষ্ফল ও নিরর্থক।

কিন্তু ভারতচন্দ্রে একটিও স্বাভাবিক অপ্রাকৃত চিত্র নাই, সে কথা আমি বলিতেছি না। অন্নদার জন্মবৃত্তান্তে ব্যাসকে

ছলনা এমনি একটি সরস চিত্র। ভারতচন্দ্র নিজের হাস্যময়ী কল্পনার বলে এই চিত্রটি বড় উপাদেয় ভাবে বড় রহস্যময় করিয়া আঁকিয়াছেন। ইহাতে সমালোচক কল্পিত দেবীর "দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ" প্রকাশ হইতেছে কি না সে বিষয়ে আমাদিগের ভাবিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু ইহা যে স্বভাব-স্বর্গোজ্জ্বল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং কবি যে এই দৃশ্যটি মনের চক্ষে বেশ দেখিতে পাইতেছিলেন ও মনে মনে বেশ আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। মুকুন্দরামেও চণ্ডীর অরতী-বেশ ধারণের বিবরণ আছে, কিন্তু তাহা এত মনোজ্ঞ নহে। ভারতচন্দ্রের বর্ণনা আমাদের নয়নের সমক্ষে একটি জীর্ণবেশা জীর্ণদেহা শ্রবণবধিরা স্থবিরাকে যেন অবলীলা ক্রমে আগাইয়া তুলে; কবিকঙ্কণের বর্ণনায় তাহা হয় না। আর ইহাতেই মায়ের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপও দেখা যায়, তাহা স্বীকার করিলেই বা ক্ষতি কি? মা আমার কত বেশে কত উপায়ে আমাদের সমক্ষে মায়া-জাল বিস্তার করিতেছেন, কত উপায়ে আমাদের বুদ্ধি পরীক্ষা করিতেছেন, তাহা আমরা বুঝিব কি করিয়া? এ সংসারে কত শত লোক নিত্য মহামায়ার মায়ায় ছলিত হইয়া আত্মনিন্দায় দিন কাটায়, তাহা কি আমরা দেখিতে পাই না? যখন জ্ঞান হয় তখন বুঝিতে পারি

"নিকটে পাইয়া নিধি চিনিতে নারিনু।
হায় রে আপনা খেয়ে কি কথা কহিনু।"

জগতে সর্ব্বত্রই মহামায়ার ছলনা, এ কথা বুঝিব না কেন? জগতের প্রধান কবিগণ কোনও না কোনও প্রকারে এই ছলনার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। মহাকবি সেক্ষপীয়র ম্যাক্‌বেথ নাটকে ডাকিনী দ্বারা ম্যাক্‌বেথকে ছলনা করাইয়াছেন, তাহা কি মহামায়ার ছলনার রূপান্তর মাত্র নহে? হিন্দুকবি মহামায়া ভিন্ন মনুষ্যের অদৃষ্টা-ধিষ্ঠাত্রী অন্য কোনও শক্তিকে জানিতেন না, চিনিতেন না, তাই এই ছলনা মহামায়ার; অন্যদেশের কবিকেও মনুষ্যের অদৃষ্টের উপর আধিপত্যময়ী শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে, এবং সমুন্নত প্রতিভাময় সকল কবিগণ তাহা স্বীকার করিতে ও দেখাইতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। আমরা বুঝিতে চেষ্টা করি না বলিয়া যে এই ছলনার অস্তিত্ব নাই তাহা নহে। "গ্রীকগণ তিনটি ভগিনীকে destiny (অদৃষ্ট) রূপ কল্পনা করিয়াছেন, তাহাই আবার রূপ-পরিবর্ত্তন করিয়া ম্যাক্‌বেথে তিন ডাকিনী-ভগিনী হইয়াছে। "And therefore no great realist in art has hesitated to admit the existence of what theologians name devine grace and of what theologians name satanic temptations." প্রভেদ এই যে হিন্দু সয়তানের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, ছলনার জন্য মহামায়া ভিন্ন অন্য কেহ নাই। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ইহাই বিশ্বাস করিতেন।

আমাদের কাছে যাহা ঠাকুরমার গল্প, হাসিবার বিষয় ও কবিকে উপহাস করিবার বিষয়, কবির কাছে তাহাই সত্য, তাহাই সম্ভব। "We slighter and smaller natures can deprive ourselves

altogether of the sense for such phenomena; we can elevate ourselves into a rare atmosphere of intellectuality and incredulity. The wider and richer natures of creative artists have received too large an inheritance from the race and have too fully absorbed all the influences of their environment for this to be possible in their case. While dim recollections and fore-feelings haunt their blood they cannot enclose themselves in a little pinfold of demonstrable knowledge and call it the universe." *

অতএব আমরা এখন বলিতে পারি যে নব্য সমালোচক যে কারণ দেখাইয়া মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্রের উপর তাঁহার তীক্ষ্ণ পরিহাস-শর বর্ষণ করিতেছেন, তাহা আদৌ সমীচিন নহে।

কিন্তু সে কথা এখন যাউক। এখন আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব যে আমাদের আলোচ্য কবিদ্বয় মনুষ্য-চরিত্র কিরূপ ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। আমরা অতিপ্রাকৃত ব্যাপার লইয়া এতখানি সময় ক্ষেপ করিলাম তাহার কারণ এই যে আমাদের কবিদ্বয় অনেক সময় এই ব্যাপারের সাহায্যে মনুষ্য-চরিত্র পরিস্ফুট করিয়াছেন। আমরা আর একবার হরগৌরীর কথা পাড়িব। হরগৌরীর চিত্র অপ্রাকৃত চিত্র হইলেও কবিদ্বয় তাঁহাদের চরিত্র অবলম্বন করিয়া অনেক মনের কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ চিত্রে কিন্তু প্রাকৃতের ও অপ্রাকৃতের এত মেশামেশি যে ইহার ভিতর হইতে সাংসারিক চিত্রটি বাছিয়া লইতে হইবে। হরগৌরীর চিত্র দৈন্যের চিত্রে আরম্ভ। মুকুন্দরাম দৈন্যের চিত্র আঁকিতে সিদ্ধহস্ত, তিনি যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা যেন সজীব চিত্র, এ কথা আমরা বলিয়াছি, তাঁহার নিজের দৈন্যাবস্থার স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল সন্দেহ নাই। ভারতচন্দ্রও দীন অবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন, তিনিও দৈন্যের চিত্র আঁকিয়াছেন। এই চিত্রে কতকগুলি বড় সত্য কথা আছে, কতকগুলি কথা এখন বাঙ্গলায় প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। ভারতচন্দ্র গৌরীকে কোপনস্বভাবা করিয়া আঁকিয়াছেন: তিনি বেশ কলহপটু। কিন্তু এই কোন্দলের চিত্রটি স্বাভাবিক, আমাদিগকে একবার হরপার্ব্বতীর দেবত্ব ভুলিয়া তাহাদিগকে মনুষ্যরূপে কল্পনা করিতে হইবে, তবেই এই চিত্রের যথার্থতা বুঝিতে পারিব। আমাদের ভাবিতে হইবে যে একটি দরিদ্র পরিবারের গৃহস্থ বয়োবৃদ্ধ, ভিক্ষা ভিন্ন অন্য উপজীবিকা অবলম্বনে অক্ষম বলিয়া ভিক্ষা-বৃত্তি দ্বারা পরিবার পোষণ করিতেছেন। তিনি বৃদ্ধবয়সে একটি তরুণী ভার্য্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছেন, ও তাঁহার দুইটি পুত্র হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন তাঁহার আর কয়েকটি পোষ্যবর্গও আছে। গৃহস্থ এককালে ভাল অবস্থায় ছিলেন, তাই ভিক্ষা করিতে তাঁহার ভাল লাগে না, লজ্জাবোধ হয়। এক দিন

* Dowden—Sakespear—His Mind, and Art,

গৃহস্থ ভিক্ষায় যাইতে অনিচ্ছুক হইয়া স্ত্রীকে বলিতেছেন—

"সকলের ঘরে ঘরে নিত্য ফিরি মেগে।
সরম ভরম গেল উদরের লেগে॥
ভিক্ষা মাগি ভিক্ষা মাগি কাটিলাম কাল।
তবু ঘুচাইতে নারিলাম বাঘছাল॥
আর সবে ভোগ করে কতমত সুখ।
কপালে আগুন মোর না ঘুচিল দুখ॥
নীচ লোকে উচ্চ ভাবে সহিতে না পারি।
ভিক্ষা মাগি নাম হৈল শঙ্কর ভিখারি॥
বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি।
গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী॥
সর্ব্বদা কন্দল বাধে কথায় কথায়।
রস কথা কহিতে বিরস হয়ে যায়।
কিবা শুভ ক্ষণে হৈল অলক্ষণ ঘর।
খাইতে না পায় কভু পূরিয়া উদর॥
আর আর গৃহীর গৃহিণী আছে যারা।
কত মতে স্বামীর সেবা করে তারা॥
অনির্ব্বাহে নির্ব্বাহ করয়ে কত দায়।
আহা মরি দেখিলে চক্ষুর পাপ যায়॥

যাহারা দুঃখের সংসার কি তাহা জানেন তাঁহারা বুঝিবেন যে এই কথাগুলি কত স্বাভাবিক। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই কোন্দলের সূত্রপাতটি তত স্বাভাবিক নহে। মুকুন্দরামের চিত্র এ সম্বন্ধে অধিক স্বাভাবিক। যাহা হৌক এই কথাতেই কলহ আরম্ভ হইল, এবং হওয়া অস্বাভাবিক নহে। গৃহিণীটির মেজাজ সহজেই একটু কড়া, তাহার উপর দুঃখের সংসারে পড়িয়া, নিত্য জ্বালাতন হইয়া একটু বেশী মাত্রায় রুক্ষ হইয়াছে। গৃহিণীর উত্তর অথবা সপ্তমে চড়িয়া কন্দল, এ অবস্থায় পড়িলে স্ত্রীলোকের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক তাহাই বটে।

শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল।
আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল॥
* * *
গুণের না দেখি সীমা রূপ ততোধিক।
বয়সে না দেখি গাছ পথের বল্মীক॥
সম্পদের নাহি সীমা বুড়া পরু পুঁজি।
রসনা কেবল কথা সিন্দুকের কুঁজি॥
কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্ন বস্ত্র দিয়া।
কেন সব কটু কথা কিসের লাগিয়া॥
* * *
গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে।
গিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে।
* * *
ছোট পুত্র কার্ত্তিকের ছয় মুখে পায়।
উপায়ের সীমা নাই ময়ূর উড়ায়॥
উপযুক্ত দু'টি পুত্র আপনি যেমন।
সবে ঘরে আমি মাত্র এই অলক্ষণ।
করেতে হৈল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে।
তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে॥
শাঁখা শাড়ী সিন্দুর চন্দন পান গুয়া।
নাহি দেখি আরতি কেবল আচাড়ুয়া॥

"বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা", বড় সমস্যা, বুড়াটির ঘরে আর বাক্যস্ফূর্ত্তি করিবার ক্ষমতা রহিল না, জবাব করিবেনই বা কি, কথাগুলা তো মিথ্যা নয়। কিন্তু সত্য কথাতেই আরও রাগ বাড়ে, ক্ষুধার জ্বালায় রাগের মাথায় বৃদ্ধ নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া ঘর ছাড়িয়া যাইতে কৃতসংকল্প।

ঘর উজাড়িয়া যাব, ভিক্ষায় যা পাই খাব,
অন্যথায় ছাড়িমু কৈলাস।

নারী যার স্বতন্তরা সে জন জীয়ন্তে মরা
তাহারে উচিত বনবাস।
বৃদ্ধকাল আপনার নাহি জানি রোজগার
চাস বাস বাণিজ্য ব্যাপার।
সকলে নির্গুণ কয় তুলায়ে সর্ব্বস্ব লয়
নাম মাত্র রহিয়াছে সার।
যত আনি তত নাই না ঘুচিল খাই খাই
কিবা সুখ এ ঘরে থাকিয়া।"

এই বলিয়া তিনি রাগ করিয়া যান. এ দিকে গৃহিণী পিত্রালয় যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সখী জয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে—

জননীর আশে যাবে পিতৃবাসে
ভাজে দিবে সদা তাড়া।
বাপ না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
যদি দেখে লক্ষ্মী ছাড়া।

আমাদের এই গৃহিণী ঠাকুরাণী রাগের মাথায় যাহাই বলুন, তিনি মনে মনে বুড়া পতির প্রতি প্রেমময়ী ও সহজজ্ঞানশালিনী; অতএব জয়ার উপদেশ তখনই তিনি গ্রাহ্য করিয়া বাড়ীতেই রহিয়া গেলেন, এবং স্বামীকে ফিরাইবার এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। এইখানে অভিপ্রাকৃত আসিয়া মিশিয়াছে; তিনি জগতের অন্ন হরণ করিয়া অন্নপূর্ণা হইয়া বসিলেন। ও দিকে শঙ্কর ঘরে ঘরে ভিক্ষা করিয়া কোথাও অন্ন পাইলেন না, শেষে লক্ষ্মীর দ্বারে গিয়া উপস্থিত। এই খানে বলিয়া রাখি যে মুকুন্দরামের চিত্র শিবের গৃহত্যাগেই শেষ হইয়াছে। ভারতচন্দ্র এ চিত্রের আরও অনেক দূর দেখাইয়াছেন।

লক্ষ্মীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া শিব অন্ন ভিক্ষা চাহিলেন, কিন্তু কি দুর্দৈব! আজ লক্ষ্মীর ঘরেও অন্ন নাই। নিরাশার ক্রোড়ে যন্ত্রণায় মহাদেবের প্রাণ অস্থির হইল, এই স্থলে তাঁহার উক্তিগুলি বড়ই স্বাভাবিক,

শুমান হৈল গুঁড়া, না মিলিল খুদকুঁড়া
ফিরিনু সকল পাড়া পাড়া।
হাতাতে যদ্যপি চাহ সাগর শুকায়ে যায়
হেসে লক্ষ্মী হ'ল লক্ষ্মী ছাড়া।
লক্ষ্মী বলে অন্ন নাই আর যাব কার ঠাঁই
ভুবনে ভাবিয়া নাহি পাই।
গলে সাপ বান্ধি চাই তবু অন্ন নাহি পাই,
কপালে দিলেক বিধি ছাই।
কত সাপ আছে গায় হাভাতেরে নাহি খায়
গলে বিষ সেহ নাহি রাখে।
কপালে অনল জ্বলে সেই না পোড়ায় বলে
না জানি মরি কি ঔষধে।
ঘরে অন্ন নাহি যার মরণ মঙ্গল তার
তার কেন বিলাসের সাধ।
যার নারী সুতাসুত সদা অন্ন কই যুত
সর্ব্বদা তাহার অবসাদ।

হায়! যাহারা এমনি কষ্টে পড়িয়াছে, তাহারাই বুঝিবে যে এই কথা গুলি কত সত্য! মরণের আকাঙ্ক্ষা লইয়াই যে সেই ব্যক্তির জীবন কাটে, তাহা যেখানে দারিদ্র্যের চিত্র আছে, সেইখান হইতেই আমরা জানিতে পারি, সে চিত্র মুকুন্দরামই আঁকুন, বা ভারতচন্দ্রই আঁকুন, বা গিয়র্সনই আঁকুন, অথবা ভিক্টর হিউগোই আঁকুন। ভারতচন্দ্র দৈন্য কি তাহা জানিতেন, এবং নিজেই বলিয়াছেন "ভারতে বিদিত ভাল দুঃখের কথন।" দুঃখের বিষয় ভারতচন্দ্র এমনই স্বাভাবিক চিত্র বড় বেশী আঁকেন নাই।

শঙ্করের দৈন্যের চিত্র এইখানেই শেষ

হইয়াছে। লক্ষ্মীর পরামর্শে তিনি আবার গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, এবং অন্নপূর্ণা আনন্দে তাঁহাকে চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় দিয়া ভোজন করাইলেন, আমাদের ঘরে ঘরে এইরূপ অন্নপূর্ণা বিরাজিতা, অন্নপূর্ণারা অন্ন না দিলে আমরা খাইতে পাই না, খাইয়া সুখ হয় না। ইহার পর অনেকক্ষণ কবি প্রাকৃত ক্ষেত্র ছাড়িয়া অপ্রাকৃত ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছেন, এবং তৎকালে সহজ ভাষায় ও সহজ ভাবে প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই বার আমরা হর-গৌরীর সুসম্পন্ন গার্হস্থ্যের অবস্থা দেখিতে পাইব।

হরগৌরীর এই অবস্থার চিত্রের সহিত আর একটি চরিত্র জড়িত আছে, তাহা ব্যাসের চরিত্র। ব্যাসের চরিত্র ভারত-চন্দ্রের নূতন সৃষ্টি। কাশীখণ্ডে যে ব্যাসের চিত্র আছে তাহা হইতে কবি এই চিত্র পাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ইহাতে তিনি এমন রং-ফলাইয়াছেন যে, ইহা নূতন সৃষ্টি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ব্যাসের চরিত্র অনেকটা ভাঁড়ুদত্তের চরিত্রের অনুরূপ, কিন্তু ভাঁড়ুদত্ত ও ব্যাস দুই জন লোক। ব্যাসের চরিত্র কবির সৃষ্ট মস্তিষ্কের চিত্র, কেহ যেন মনে না করেন যে মহাভারত-প্রণেতা, বেদবিভাগ-কর্ত্তা ব্রহ্মসূত্র-প্রণেতা মহাযোগী ব্যাসের সহিত আমাদের ব্যাসের কোনও সম্পর্ক আছে; এই চরিত্র পাঠকালে আমাদিগকে সে ব্যাসকে মন হইতে সরাইয়া ফেলিতে হইবে। এ চরিত্র ব্যাসনামে অভিহিত হইলেও ইহাতে কোনও আদর্শ জ্ঞানী পুরুষের চরিত্র অঙ্কিত হয় নাই। তথাচ আমি মনে করি যে এই ব্যাসচরিত্রই ভারতচন্দ্রের চরিত্রাঙ্কন-প্রতিভার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। ভারতচন্দ্রের অপরাপর মস্তিষ্ক-চরিত্রগুলি প্রায়ই আংশিক চরিত্রপ্রকাশ, এই ব্যাস চরিত্রটাই সম্পূর্ণ এক মাত্র বিচারোপযোগী চরিত্র, ব্যাসের চরিত্র মহৎ চরিত্র নহে; কিন্তু সত্য চরিত্র, এ রকম মানুষ আমরা জগতে প্রায়ই দেখিতে পাই। ব্যাস একজন সাম্প্র-দায়িক, অন্য-সম্প্রদায় বিদ্বেষী, প্রথমে গোঁড়া বৈষ্ণব, শেষে কিছুই নয় অথবা শাক্ত, কি যা হয় একটা কিছু। ব্যাস মহাপণ্ডিত, কিন্তু তাহার চরিত্রের বল আদৌ নাই, ধর্ম্মের মতে দৃঢ়তা নাই, কিন্তু অকারণ গোঁ-টুকু পূর্ণমাত্রায় আছে। ইহার উপর আত্মম্ভরিতা ও মদজনিত স্বার্থপরতা ও দ্বেষ তাঁহার চরিত্রে বিলক্ষণ বিদ্যমান।

ব্যাস-চরিত্রের সঙ্গে হরগৌরীর চিত্র সুকৌশলে জড়িত। বৈষ্ণব ও শৈবের দ্বন্দ্ব-উপলক্ষে কবি নিজের পরিহাস রসিকতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। অন্নদামঙ্গল কাব্য হাস্যরস-প্রধান কাব্য, ভারতচন্দ্র হাসির পক্ষপাতী। এই কাব্যে অন্য কোনও রসের পরিপক্কতা লক্ষিত হইবে না। অনেকে ইহাকে আদিরস-প্রধান বলিয়া থাকেন, কিন্তু আদিরস ইহাতে একেবারে নাই, যাহা আছে তাহা এই রসের ভেঙ্গানি। করুণ-রসের, বা অন্যকোনও গাঢ়তর রসের অবতারণায় কবির কৃতিত্ব নাই, চেষ্টা আছে কিন্তু সাফল্য নাই। যে দৈন্যের চিত্র দেখাইয়াছি তাহাতে করুণরসের পরিচয় পাই বটে, কিন্তু সে সকলে করুণরসের স্থায়িভাব নাই, ব্যভিচারিভাবের অস্তিত্ব

কিছু আছে। ভারতচন্দ্র হাসিবার সুযোগ কখনও বাদ দেন নাই। সুখে দুঃখে সর্ব্বত্রই তাঁহার হাসির বিকাশ। তাঁহার হৃদয়ে এত হাস্যরাশি সঞ্চিত ছিল বলিয়াই তিনি রাজ্যচ্যুত, বিতাড়িত, লাঞ্ছিত হইয়াও চিরদিনের মত অবসন্ন হইয়া পড়েন নাই। তাই তাঁহার কাব্যে হাস্যরস কোথাও নিগূঢ়-ভাবে, কোথাও বা স্পষ্টভাবে অহরহঃ প্রকাশিত হইয়াছে, দুঃখে দৈন্যে তাঁহার হাসির ফোয়ারা শুখায় নাই। অন্নদামঙ্গলের কাব্যাংশ হাস্যরসে আরম্ভ বলিলে, অন্যায় হয় না; প্রকৃতির রহস্যময়ী দশমহাবিদ্যার আবির্ভাবে পুরুষরূপী মহাদেবের আত্ম-বিস্মৃতিতে এই হাস্যরস নিগূঢ়ভাবে বিরাজিত। তাহার পর দক্ষযজ্ঞ-বিনাশকালে ভার্গবাদির দুর্দ্দশা দেখিয়া কবি হাসিয়া লইয়াছেন। মহাদেব যেখানে নারদকে বলিতেছেন 'কিলয় না কর, আজি চল মোর বাপা' সেখানে আদর্শ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেশের একটা কুপ্রথার প্রতি অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিয়া কবি মনে মনে হাসিয়া লইয়াছেন। তরল হাস্য, সরল-হাস্য, করুণ হাস্য ও নর্ম্মমিশ্রিত হাস্য সকলই ভারতচন্দ্রের কাব্যে অজস্র মিলিবে। ভারতচন্দ্র যেমন এক দিকে 'জীবনতারা' ও 'কামিনীকুমার' প্রভৃতি রচয়িতৃগণের পূর্ব্বপুরুষ, তেমনি অন্যদিকে দাশরথি রায়, ঈশ্বর গুপ্ত ও দীনবন্ধু-প্রমুখ হাস্য-রসিক কবিগণেরও পূর্ব্বপুরুষ। আবার চিত্রাঙ্কন বিষয়ে মাইকেল প্রভৃতি কবিগণ ভারতচন্দ্রের কাছে অনেক পরিমাণে ঋণী। ভারতচন্দ্র যে ভাল কথা বলিতে পারেন অনেকে সে কথা জানেন না, কিন্তু আমরা দেখিতে পাইব যে এই ব্যাসের চিত্রাবলম্বনে তিনি যথার্থই অনেক সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপদেশ

"অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্তবীর।"

হিন্দুর পক্ষে এমন অমূল্য উপদেশ আর নাই।

কবি যখন প্রথমে ব্যাসকে আমাদের সমক্ষে আনিলেন, তখন ব্যাস একজন গোঁড়া বৈষ্ণব, তিনি পণ্ডিত, ধর্ম্মরত এবং জগতের হিতে রত; লোকে যাহাতে ধর্ম্মে মতিমান্ হয় সর্ব্বদা তাঁহার এই চেষ্টা—

জগতের হিতে মন, ঊর্দ্ধবাহু হ'য়ে কন
ধর্ম্মে মতি হউক সবার।
ধন নাহি স্থির রয়, দারা আপনার নয়,
সেই ধর্ম্ম পরলোকে সার।

কিন্তু তাঁহার মৌলিক ভুল—তিনি অভিন্নকে ভিন্ন করিয়া দেখিতেন, তাই তাঁহার ধর্ম্ম ভক্তিহীন। তিনি জানিতেন যে "নিরাকার ব্রহ্ম তিন রূপেতে সাকার" তথাপি তাঁহার গোঁড়ামি যায় নাই। এই গোঁড়ামিই জগতে অশেষ অনর্থের মূল। এই কারণেই জগতে ধর্ম্মের নামে কত জীবহত্যা হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ব্যাস ও ঋষিগণের কলহে কবি এই সাম্প্রদায়িক যুদ্ধের চিত্র আঁকিয়াছেন। ইহাদের তর্কের মধ্যে অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্বের অবতারণা আছে, এবং কবির দুরূহ সমস্যা সহজ কথায় বুঝাইয়া দিবার ক্ষমতা বেশ বিকশিত হইয়াছে।

"কি কহিলা ব্যাসদেব না পারি সহিতে।
নয়ন মুদিয়া দেখ বিশ্ব তমোময়।
ইথে বুঝি ব্রহ্মরূপ তম বিনা নয়।
তমগুণে অহঙ্কার দোষ কিবা দিবে।
অহঙ্কার নহিলে কি ভেদব্রহ্ম জীবে।

এই রূপে দুই দলে কলহ করিতে করিতে কাশীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন, ও ব্যাস শিষ্যবর্গসহ মহানন্দে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কবি এইখানে কীর্ত্তনের একটি সুন্দর ছবি আঁকিয়াছেন। কিন্তু ব্যাস হরিনাম করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; গোঁড়ার যাহা স্বাভাবিক দোষ তাহাই করিলেন, শিবনিন্দা করিলেন। আমরা একজন গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক পাদরীর কাছে মার্টিন লুথরকে সংস্কারক (Reformer) বলিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি মহা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া "উঠিলেন Oh you call him a reformer, he was a deformer." ব্যাসও তাহাই করিলেন। তার পর শিবের ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল, বিষ্ণু আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে তাঁহাতে আর শিবে কোনও ভেদ নাই. ব্যাস যদি শিবের স্তব করেন তবেই তাঁহার নিস্তার। ব্যাস শিবের স্তুতি করিয়া হঠাৎ গোঁড়া শৈব হইয়া পড়িলেন। এইরূপ ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন আমরা অনেক দেখিয়াছি। এরূপ পরিবর্ত্তনে গোঁড়ামি ভয়ানক রকম বাড়ে। ব্যাস হরিনাম করাই ছাড়িয়া দিলেন, বৈষ্ণবের চিহ্ন একেবারে দূর করিয়া শৈব সাজিয়া বসিলেন। কিন্তু বিশ্বেশ্বরের মনে ইহাতে প্রসন্নরসের সঞ্চার হইল, হইবারই কথা। তিনি হাসিয়া নন্দীকে কহিলেন—

দেখ দেখ ওহে নন্দি ব্যাসের দুর্ব্বৈব।
ছিল গোঁড়া বৈষ্ণব হৈল গোঁড়া শৈব॥
তবে ছিল বিষ্ণুভক্ত মোরে না মানিল।
যদি হৈল মোর ভক্ত বিষ্ণুরে ছাড়িল॥
• • • •
মোর ভক্ত হয়ে সেবা নাহি মানে হরি।
আমি তো তাহার পূজা গ্রহণ না করি॥

অতএব ব্যাসকে শিক্ষা দিবার জন্য মহাদেব কাশীতে ব্যাসের ভিক্ষা নিষেধ করিলেন। ব্যাস ভিক্ষা না পাইয়া ক্রোধে কাশীতে শাপ দিলেন, এবং অন্ন পাত্র ফেলিয়া দিয়া আশ্রমে ফিরিয়া চলিলেন; এমন সময় অন্নপূর্ণা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে অন্ন দিতে চলিলেন। কবি বলিয়াছেন "শঙ্কিত একভাব অন্নদার কাছে।"

এতক্ষণে আমরা আবার হরগৌরীর সুখের দাম্পত্য-চিত্র দেখিবার অবসর পাইলাম। অন্নদা সখী লইয়া চলিয়াছেন, পথে মহাদেব আসিয়া বলিলেন—

"কোথায় চলেছ খুয়ে কার্ত্তিক-গণেশ।"

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা—চোখের অন্তরাল হইলেই জগৎশূন্য বোধ হয়। গৃহিণী একে পাকা গৃহিণী, তায় সর্ব্বভূতে দয়াময়ী, তাহার উপর স্বামী-সোহাগিনী স্বামীর কীর্ত্তিতে কোনও রূপ পাপ স্পর্শ করে তাহা তাঁহার বাঞ্ছনীয় নহে। তাঁহার উত্তরটি বড় সরস—

ক্রোধভরে কন দেবী পিছু কেন ডাক।
ব্যাসে অন্ন দিয়া আসি ঘরে বসে থাক॥
একে বুড়া তাহে ভাঙ্গী ধুতুরার ঝোল।
অল্প অপরাধে কর মহাদণ্ডগোল॥
• • • •
কি হেতু করিলে মানা ব্যাসে অন্ন দিতে।
সে দিল কাশীতে শাপ কে পারে খণ্ডিতে॥
আমি অন্নপূর্ণা আছি কাশীতে বসিয়া।
আমার দুর্নাম হবে না দেখ ভাবিয়া॥

বুড়াটির মহা বিপদ, গৃহিণী অন্ন দিতে চলিয়াছেন, তিনি অন্ন নিষেধ করিয়াছিলেন,

কিন্তু গৃহিণীকে নিষেধ করিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই; ছলে নিষেধ করিতে গিয়া একটু মিঠেকড়া গোছের ভৎর্সনা শুনিতে হইল, অধর স্ফুরিত দেখিয়া—

সঙ্গে সঙ্গে যান শিব ভয়ে কম্পমান।

আর

সভয় দেখিয়া ভীমে হাসেন অভয়া।

বুড়াটির ঠাট কে দে দেখ লো বিজয়া॥

অন্নপূর্ণা সুন্দরী গৃহস্থবধূ সাজিয়া ব্যাসকে ঘরে আনিয়া চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় দ্বারা সশিষ্যে ভোজন করাইলেন, কিন্তু ব্যাসের সঙ্গে তর্ক করিতে গিয়া বুড়া-গৃহস্থ বড় গণ্ডগোল বাধাইয়া বসিলেন; বুড়া বয়সে মতের মিল না হইলেই ক্রোধ হওয়া কত স্বাভাবিক তাহা সকলেই জানেন। রাগ করিয়া মহাদেব ব্যাসকে কাশী হইতে নির্বাসিত করিলেন, অন্নপূর্ণার ভয়ে অধিক কিছু করিতে পারিলেন না। ব্যাস ভয়ে অন্নপূর্ণার শরণাপন্ন হইয়া, তুই দিন মণিকর্ণিকায় স্নানের আদেশ পাইয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন।

কিন্তু এই অযাচিত অনুগ্রহে ব্যাসের হৃদয় দ্রব হইল না, তিনি বিশেষ অপমানিত বোধ করিয়া, শিবের প্রতি মহা রুষ্ট হইলেন। চঞ্চলমতি ব্যাস একটা গোঁ ধরিয়া বসিলেন দ্বিতীয় কাশী নির্মাণ করিবেন, শিবের সহিত টক্কর দিয়া জিতিবেন। বিষ্ণুকে ত্যাগ দিয়াছেন, এখন শিবকেও ত্যাগ দিয়া ব্রহ্মার শরণ লইবেন। প্রথমে গঙ্গাকে আনা চাই, গঙ্গার মহিমা যখন তিনি প্রকাশ করিয়াছেন তখন গঙ্গা তাঁহার উপরোধ রাখিতে বাধ্য, তা সে উপরোধ স্থায়ই হোক বা অন্যায়ই হোক। অতএব ব্যাস গঙ্গাকে খুব স্তব করিলেন, খুব খোসামুদি করিলেন, কিন্তু গঙ্গা বলিলেন তাও কি হয়

শুন হে ব্যাস।

কেন করিয়াছ হেন প্রয়াস॥

কে তুমি কি কীর্ত্তি আছে তোমার।

শিব বিনা কাশী কে করে আর॥

স্বার্থপর ব্যাস স্বার্থহানিতে চটিয়াই আকুল, গঙ্গাকে কুৎসিৎ গালাগালি দিয়া গায়ের জ্বালা মিটাইলেন। গঙ্গার কাছেও যথেষ্ট তিরস্কার খাইলেন। গঙ্গার কাছে অকৃতকার্য্য হইয়া বিশ্বকর্ম্মার শরণাগত হইয়াও ব্যাস নিষ্ফল হইলেন, তাঁহাকেও গালি দিতে ছাড়িলেন না। শেষ সম্বল ব্রহ্মা তিনিও সাফ জবাব দিয়া গেলেন, অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু ব্যাসের সে উপদেশে ফল হইল না, তাঁহাকে নিজের নাম বজায় রাখিতেই হইবে, ব্যাস-কাশী করিতেই হইবে। ব্যাসের চরিত্রে যদি নৈতিক ভিত্তি দৃঢ় হইত তো তাঁহার এই গোঁ অনেক কাজ করিত—

যে হোক সে হোক আরও করিব যতন।

মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।

অমূল্য প্রতিজ্ঞা যদি ভাল কার্য্যে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যাসের প্রতিজ্ঞা অনেকটা সয়তানের প্রতিজ্ঞার মত ভগবদ্বিদ্বেষে, ভগবানের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিযুক্ত হইয়াছে। এ প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্যও অনেকটা সয়তানের মত নিজের প্রতিপত্তি বজায় রাখা। তাই এ প্রতিজ্ঞায় তাঁহার কোন ফল হইল না, এবং বিপরীত ফল ফলিল। তিনি এবার শক্তি ছাড়িয়া শক্তির উপাসনায় মন দিলেন। তিনি বুঝিলেন না যে যিনি

সতীশিরোমণি তিনি পতির মান খর্ব্ব করিয়া তাঁহার মান রাখিবেন না। যাহা হৌক তিনি ভ্রান্তধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কঠোর-সাধনায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার যে মূলে ভুল হইতেছে তাহা তিনি ভাবিয়াও দেখিলেন না। ও দিকে অন্নপূর্ণা স্বামী-পুত্রকে পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করাইতেছেন, এখন তাঁহাদের অবস্থা বড় মন্দ, পতিপুত্র যত খান অন্নপূর্ণা তত দেন, কেহই খাইয়া শেষ করিতে পারিতেছেন না। এই আনন্দময় কৌতুকের সময় ব্যাসের ডাকাডাকি তাঁহার কানে পঁহুছিল, তিনি হঠাৎ অন্যমনা হইলেন—

কপালের টাক নড়ে, হাত হৈতে হাতা পড়ে
উছট লাগিয়া পাটলে।

তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। এ দিকে মহাদেব তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া একটু রহস্য করিয়া কহিলেন—

মোরে যেন দয়া মা ছাড়িও।
আমি বৃদ্ধ তাই কই জানি নাই তোমা বই
এক মুঠা অন্ন মেনে দিও॥

তিনি গৌরীর কাছে যে উত্তর পাইলেন তাহা সতীরই উপযুক্ত—

এত বড় তার সাধ তোমা সনে করি বাদ
করিবেক ব্যাস বারাণসী॥

ইহার পর তিনি ভারতী বেশে ব্যাসকে ছলনা করিতে চলিলেন, এবং ব্যাসের সমক্ষে মায়াজাল বিস্তার করিয়া তাঁহার সকল প্রযত্ন বিফল করিয়া আসিলেন। যখন ব্যাসের জ্ঞানোদয় হইল তখন তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার মূলে ভুল হইয়াছে, তিনি ভ্রান্তি-বশতঃ সোণা ফেলিয়া আঁচলে গিরা দিয়াছেন। যখন তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল তখন অন্নপূর্ণা তাঁহাকে অমূল্য উপদেশ দিয়া প্রকৃতিস্থ করিলেন—

"ইতঃপর ভেদবুদ্ধি ছাড়হ সকল।
জ্ঞানের সন্ধান কর অজ্ঞানে বিফল॥
হরি হর বিধি তিন আমার শরীর।
অন্তেসে যে জন ভজে সেই ভক্তবীর॥"

এই ভারতী বেশে ছলনার চিত্রটি এত স্বাভাবিক ও এত হাস্যরসোজ্জ্বল যে ইচ্ছা হয় একটির সমস্ত তুলিয়া দেখাই। যাঁহারা একটু পূর্ব্বসংস্কারশূন্য মানস লইয়া, একটু বুঝিবার ইচ্ছা লইয়া এই চিত্র পাঠ করিবেন তাঁহারাই ইহার যথার্থরস উপভোগ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। ব্যাসচরিত্রের ইহাই যে অবশ্যম্ভাবিনী পরিণতি তাহা কোনও সদ্বিবেচকের বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। কাব্যে হরগৌরীর চিত্রেরও কবি এই খানে অবসান করিয়াছেন; বলা বাহুল্য এই চরিত্রত্রয়ে কবি অনেক সংসারিক জ্ঞান এমন সরলভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে কবির এক একটি কথা চির-স্মরণীয় প্রবাদে পরিণত হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

ফিডো।

এচিক্রেটিস্—ফিডো, যে দিন সক্রেটিস বিষ পান করিয়াছিলেন, সে দিন কি তুমি নিজে তাঁহার সহিত কারাগারে ছিলে, না সেই বৃত্তান্ত আর কাহারও মুখে শুনিয়াছ?

ফিডো—এচিক্রেটিস্, আমি নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

এচিক্রেটিস্—তবে আমার এই অনুরোধ যে সক্রেটিস্ মৃত্যুর পূর্ব্বে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন এবং যেরূপে তাঁহার মৃত্যু হয় তৎ সমুদায় আমার নিকট তোমার বলিতে হইবে। সেই সকল শুনিলে আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইব। আমাদিগের ফিলিসিয়ান নগরবাসীরা এখন আর এথেন্স নগরে যায় না, আর এথেন্স হইতেও কোন লোক এখানে আসে নাই যে তাহার নিকট হইতে এই সকল ঘটনার প্রকৃত বিবরণ শোনা যাইতে পারে। কেবল এইমাত্র আমরা শুনিয়াছি যে সক্রেটিস্ বিষ পান করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার অতিরিক্ত আর কিছু আমাদিগকে কেহই বলিতে পারেন নাই।

ফিডো—তাহা হইলে তুমি তাঁহার বিচারের বিষয় কিছুই শোন নাই?

এচিক্রেটিস্—হাঁ, কে একজন আমাদিগকে সে বিষয় বলিয়াছিল, কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি নাই যে কেন বিচারের এত পরে তাঁহার মৃত্যু হইল। ফিডো, ইহার কারণ কি?

ফিডো—এচিক্রেটিস্, ইহা কোন বিশেষ ঘটনাবশত ঘটিয়াছিল। এথেন্স নগরবাসীরা যে জাহাজ ডেলস্ নগরে প্রেরণ করে সেই জাহাজের অগ্রভাগ বিচারের পূর্ব্বদিনে মুকুট দ্বারা শোভিত হইয়াছিল।

এচিক্রেটিস্—এ জাহাজটি কি?

ফিডো—এথেন্সবাসীদিগের মধ্যে এই প্রবাদ আছে যে এই জাহাজে থেসুস্ এককালে চতুর্দ্দশ যুবককে সঙ্গে লইয়া ক্রিট্ দেশে গমন করেন এবং তথায় নিজেকে এবং তাহাদিগকেও মৃত্যু হইতে রক্ষা করেন। এথেন্সবাসীরা সূর্য্যদেবের নিকট এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন যে যদি থেসুস্ এবং তাহার সহযাত্রীরা নিরাপদে প্রত্যাগমন করেন তাহা হইলে প্রতি বৎসর ডেলস্ নগরে এথেন্স হইতে দেবদূত গমন করিবে। তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রতিবৎসর সূর্য্যদেবের সম্মানার্থ একটি করিয়া দূত প্রেরিত হয়। এথেন্সবাসীদের এই নিয়মে যে দিন হইতে দৌত্যকার্য্য আরম্ভ হয়, এথেন্স নগর কোনরূপে অপবিত্র হইবে না এবং যতদিন না জাহাজ ডেলস্নগরে পৌঁছাইয়া আবার প্রত্যাগমন করে ততদিন কোন লোক মৃত্যুদণ্ড পাইবে না। যদি জাহাজ প্রতিকূল বায়ু বশে আটকাইয়া পড়ে তাহা হইলে অনেক দিন এথেন্সনগরে কেহ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয় না। সূর্য্যদেবের পুরোহিত জাহাজের অগ্রভাগ মুকুট দ্বারা অঙ্কিত করিলেই দৌত্যকার্য্য আরম্ভ হয়। এই কারণেই সক্রেটিস্ অনেকদিন কারাগারে ছিলেন এবং বিচারের অনেক পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

এচিক্রেটিস্—ফিডো, তার পর মৃত্যুর

বিষয় কি বল না? সক্রেটিস্ কি বলিয়াছিলেন এবং কি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কোন্ কোন্ বন্ধু সেখানে উপস্থিত ছিলেন? এমন কি ঘটিয়াছিল যে অন্ত শাসনকর্ত্তারা কাহাকেও সেখানে উপস্থিত থাকিতে দেন নাই? তবে কি তিনি অন্তিম কালে বন্ধুবিহীন হইয়া একাকী ছিলেন?

ফিডো—কখনই না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ছিলেন, কেহ কেহ কেন অনেকেই ছিলেন।

এচিক্রেটিস্—যদি তোমার কোন কাজ না থাকে তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া সমুদয় ব্যাপারটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা কর।

ফিডো—আমার সম্পূর্ণ অবসর আছে এবং আমার সমুদয় ঘটনাগুলি স্মরণপথে আনিতে চেষ্টা করিব। কারণ কথা কহিয়াই হউক বা শ্রবণ করিয়াই হউক সক্রেটিস্‌কে স্মরণ করা আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দকর।

এচিক্রেটিস্—ফিডো তোমার শ্রোতারাও এবিষয়ে সমান, সেই জন্য বলি সমস্ত ব্যাপারটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা কর।

ফিডো—আমি সত্য বলিতেছি যে যখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম, আমার মনে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল। বন্ধুর মৃত্যুকালে যেরূপ শোক অনুভূত হয়, আমার তাহা হয় নাই; কারণ তাঁহার ব্যবহারে এবং কথাবার্ত্তাতে বোধ হইল যে মানুষটি সুখী এবং তিনি বীরের ন্যায় এবং নির্ভীক অন্তঃকরণে মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছিলেন। সুতরাং আমার বিশ্বাস হইয়াছিল যে পরলোক যাত্রার সময় তিনি ভগবান দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলেন এবং স্বর্গে নিশ্চয়ই তাঁহার সদ্গতি হইবে। যদি কোন লোকের কখনও সদ্গতি হইয়া থাকে তবে তাঁহারই হইয়াছিল। এমন দুঃখের সময় করুণার উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু আমার সেরূপ হয় নাই। দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে কথোপকথন করিলে যে আহ্লাদ জন্মে সেরূপ আহ্লাদও আমার মনে জন্মে নাই। আমার মনে যাহা হইয়াছিল তাহা এক অপূর্ব্ব এবং অশ্রুতপূর্ব্ব ভাব, একরূপ আনন্দ অথচ তাহার সঙ্গে দুঃখ মিশ্রিত ছিল। দুঃখ এই জন্য যে তিনি শীঘ্রই মরিবেন। আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই মনে এই ভাব হইয়াছিল। এক সময় সকলে হাসিতেছে, আর এক সময় কাঁদিতেছে। এপলোডোরাস্ বড়ই বিচলিত হইয়াছিল। তুমি অবশ্য তাহাকে এবং তাহার ব্যবহার বেশ জান।

এচিক্রেটিস্—হাঁ, আমি জানি।

ফিডো—এপলোডোরাস্ একেবারে বিচলিত হইয়াছিল। আমিও হইয়াছিলাম, অন্য সকলেও অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল।

এচিক্রেটিস্—অন্যান্য যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল তাহারা কে কে?

ফিডো—স্বদেশীয়দিগের মধ্যে এপলোডোরাস্, ক্রিটোবুলাস্ এবং তাহার পিতা ক্রিটো, হারমোজেনিস্, এপিজেনিস্, এসচিনেস্, এবং এন্টিস্থেনিস্, টেসিপাস্, মেনেক্সেনাস্ এবং তাঁহার স্বদেশের আরও অনেকে সেখানে ছিলেন। প্লেটো বোধ হয় পীড়িত ছিলেন।

এচিক্রেটিস্—কোন বিদেশী উপস্থিত ছিলেন কি?

ফিডো—হাঁ, থিবান হইতে সিমিয়াস্, সিবেস্ এবং ফিডোনাইডেস্ এবং মেগারা হইতে ইউক্লিড্স্ এবং টরপিসন্ আসিয়াছিলেন।

এচিক্রেটিস্—এরিসটিপাস্ এবং ক্লিওম্ব্রোটাস্—তাঁহারা কি সেখানে ছিলেন?

ফিডো—না। শুনিলাম তাঁহারা সে দিন ইজিনাতে ছিলেন।

এচিক্রেটিস্—আচ্ছা, আর কেহ ছিল কি?

ফিডো—আমার বোধ হয় যাঁহাদের নাম করিলাম তাঁহারাই কেবল সেখানে ছিলেন।

এচিক্রেটিস্—আচ্ছা, বল তার পর কি কথোপকথন হইল।

ফিডো—প্রথম হইতে যাহা ঘটিয়াছিল সব বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি বোধ হয় জান যে আমি এবং অন্য সকলে প্রত্যহ সক্রেটিসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম। যে বিচারালয়ে তাঁহার বিচার হইয়াছিল তাহা কারাগারের নিকটবর্ত্তী বলিয়া আমরা সেইখানে সকলে সমবেত হইতাম। যতক্ষণ না কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত হইত ততক্ষণ আমরা পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতাম এবং কারাগার খুলিবামাত্র আমরা সক্রেটিসের কাছে যাইতাম এবং তাঁহার সহিত সমস্ত দিন অতিবাহিত করিতাম। কিন্তু সে দিন আমরা আরও প্রত্যূষে একত্রিত হইয়াছিলাম, কেননা তাহার আগের দিন যখন সায়ংকালে কারাগার হইতে বাহিরে আসি তখন শুনিলাম যে ডেলস্ হইতে জাহাজ আসিয়াছে। সেই জন্য আমরা স্থির করিলাম যে পরদিন অতি প্রত্যূষে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইব। তথায় আসিবামাত্র দ্বাররক্ষক আমাদিগকে বলিল তোমরা এইখানে অপেক্ষা কর এবং যতক্ষণ না ডাকি ততক্ষণ প্রবেশ করিও না। যেহেতু সে বলিল, "একাদশ বিচারপতিরা সক্রেটিস্‌কে শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতেছেন এবং অদ্য মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিতে আদেশ করিতেছেন।"

আমাদিগকে বেশী ক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয় নাই। অল্পকাল মধ্যেই দ্বাররক্ষক প্রত্যাগমন করিল এবং প্রবেশ করিতে অনুমতি দিল। কারাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে সক্রেটিস্ শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার পার্শ্বে Xanthippe পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন।

আমাদিগকে দেখিবামাত্র Xanthippe উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং স্ত্রীলোকের ন্যায় বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন—'হায় সক্রেটিস্, তোমার ও তোমার বন্ধুদের পরস্পর কথাবার্ত্তার আজ শেষ দিন।'

সক্রেটিস্ ক্রিটোর প্রতি তাকাইয়া বলিলেন, "ক্রিটো, তোমাদের মধ্যে কেহ Xanthippeকে বাড়ি লইয়া যাও।"

ক্রিটোর কয়েকজন ভৃত্য আসিয়া তাঁহাকে তথা হইতে লইয়া গেল। Xanthippe রোদন করিতে করিতে স্বীয় বক্ষঃস্থল চাপড়াইতে লাগিলেন। *

(ক্রমশ)

* অধ্যাপক ৺ কৃষ্ণবিহারী সেন, এম্-এ মহাশয়ের অপ্রকাশিত অনুবাদ।

গোরা। *

এক সময় ছিল যখন আমাদের অবস্থাতে আমরা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিলাম। অন্য সমাজের সহিত আমাদের সমাজের তুলনা করিবার প্রয়োজন হইত না। জীবিকা অর্জ্জন করিতে তখন কোনও কষ্ট ছিল না। খাওয়া-দাওয়া আমোদ-আহ্লাদ ও দলাদলি করিয়া সময় কাটাইতে আমরা কোনও অসুবিধা বোধ করিতাম না। আমরা পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত আচার পালন করিয়া যাইতাম তাহা পালন না করিবার পক্ষে যে যুক্তি থাকিতে পারে তাহা আমাদের মনেই হইত না।

বর্ত্তমানে কঠোর জীবন-সংগ্রামের মধ্যে জীবিকা অর্জ্জন করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে; আমোদ-আহ্লাদ ও দলাদলি করিবার সময়ের অভাবও ক্রমেই বিশেষ ভাবে উপলব্ধ হইতেছে। বিভিন্ন দেশের লোকের সংসর্গে আসায়, আমরা যে অতি হীন, অতি হীন, জগতের অন্যান্য জাতি সমূহের তুলনায় আমরা যে অতি অপদার্থ,—এই কথা নানা ভাবে আমাদিগকে অনবরত আঘাত করিতেছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই হীনতা ও দীনতা হইতে অব্যাহতি লাভের একমাত্র উপায় আমরা স্থির করিয়াছিলাম—প্রাচীন ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার ত্যাগ করিয়া আধুনিক উন্নত জাতিসমূহের ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহার অবলম্বন করা। তার পরে যখন দেখিলাম, তাহাতে আমাদের হীনতা অপনীত না হইয়া, আরও স্পষ্টীকৃত হইয়া উঠে, তখন পশ্চাতের দিকে নজর পড়িল। তখন দেখিলাম, ঘৃণার সহিত যাহা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা ঘৃণ্য নহে। তখন সেই পরিত্যক্ত ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহারের দুন্দুভিনিনাদ আরম্ভ করিলাম। বিদেশী ঘৃণার সহিত যাহা হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়াছে, তাহাই শিরোভূষণ করিয়া বলিতে লাগিলাম—তুমি ঘৃণা করিলেই যে আমাদের মূল্য কম হইয়া পড়িবে তাহা মনে করিও না। তুমিও মানুষ, আমরাও মানুষ। আমরা বলিতেছি—আমাদের ধর্ম্ম ও আচার জগতে অতুলনীয়।

কিন্তু এমন করিয়া কোনো কালে কোনো প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই। ঠিক যেরূপ হওয়া উচিত, সমাজ যে সেরূপটি নাই, এ কথা মুখে স্বীকার না করিলেও, মনে মনে আমরা বেশ বুঝি। বিশেষতঃ গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতায় এ কথা স্পষ্টীকৃত হইয়া গিয়াছে যে বর্ত্তমান অবস্থায় বাহিরের কোনও শক্তির সহিত কলহ করিতে আমাদের সমাজ একান্তই অক্ষম। সমাজ-শরীর জীব-শরীরের সহিত তুলনীয়। কিন্তু আমাদের সমাজ-শরীরে এক স্থানে আঘাত করিলে, তাহা স্থানান্তরে সংক্রমিত হয় না। জীব-শরীরে এক দিকে যে ক্ষয় হয়, অন্য দিক হইতে তাহার পূরণ হয়। কিন্তু আমাদের সমাজে যে ক্ষয় হইতেছে, তাহার পূরণ হইতেছে না। তাই সংশয় আসিয়াছে

* গোরা—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত উপন্যাস।

হিন্দুসমাজ জীবিত অথবা মৃত? চতুর্দ্দিকে মুসলমানের বংশবৃদ্ধি ও হিন্দুর সংখ্যালোপ দেখিয়া তাই আমরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছি।

এখন আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে প্রথমে আসিয়া যে আমাদের সমস্তই বর্জ্জনীয় স্থির করিয়াছিলাম, এ ধারণাও তাহারই মত সমাজের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর। আমরা বুঝিয়াছি "ভবিষ্যতের ভারতবর্ষের ধমনীতে অতীত ভারতবর্ষের রক্ত প্রবাহিত থাকিবে; আধুনিক ভারতবর্ষ অপেক্ষা অতীত ভারতবর্ষের সহিতই তাহার অধিক সাদৃশ্য থাকিবে। সে ভারত সম্পূর্ণ রূপেই ভারতীয় হইবে। কিন্তু তাহার সত্য যুগ তাহার সম্মুখে স্থাপিত হইবে, পশ্চাতে নহে। সমগ্র জগতের জন্য তাহার করিবার যে বিশেষ কার্য্য আছে, সে তাহাতে সম্পূর্ণই বিশ্বাস করে। কিন্তু তাহার সহিত ইহাও বিশ্বাস করে যে সেই বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন করিতে জীবিত ভারতবর্ষেরই প্রয়োজন, এবং রাজনীতি, সমাজ ও ধর্ম্মজগতে আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা তাহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক।"

সংস্কার দরকার, এ কথা স্বীকার করিতে আমাদের বিন্দুমাত্রও লজ্জার কারণ নাই। বর্ত্তমানে এমন সমাজ নাই যাহার সংস্কারের প্রয়োজন নাই, এবং যাহার বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সংস্কারের প্রয়োজন উপলব্ধি করিতেছেন না। আমাদের পক্ষে সংস্কার-সাধন কিন্তু একটি গুরুতর ব্যাপার। স্বাধীন দেশের রাজা, অথবা সমবেত সাধারণের প্রতিনিধিগণ সমাজের অনিষ্টকর প্রথা রহিত ও মঙ্গলকর প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। হিন্দু-সমাজে বর্ত্তমানে তাদৃশ কোনও শক্তি নাই। যাঁহারা সংস্কারের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের পশ্চাতে রাজশক্তি ত নাই ই, সমাজশক্তিও নাই। যিনি যাহা ভাল বুঝিতেছেন, তিনি তাহাই প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন; ইহাতে যে উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে প্রাচীন ভারতবর্ষের সহিত বর্ত্তমান ভারতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে।

কি ভাবে সংস্কার করিলে প্রাচীন ভারতবর্ষের সহিত বর্ত্তমান ভারতের বিরোধ না ঘটে, ইহা একটি কঠিন সমস্যা। আজি পর্য্যন্ত কেহ এ সমস্যার সমাধান করিয়াছেন বলিয়া জানি না কিন্তু প্রশ্নটি যে অনেকের মনে জাগিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "গোরা" এই প্রশ্নটিকে বিশেষ ভাবে সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে।

প্রাচীন ভারতের সহিত ভবিষ্যতের ভারতকে যদি অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে হয়, তাহা হইলে প্রাচীন ভারতকে আগে ভাল করিয়াই জানিতে হইবে। শ্রদ্ধা না থাকিলে কাহাকেও ভাল রূপ জানা অসম্ভব। কিন্তু মুখে প্রাচীনত্বের স্পর্দ্ধা করিলেও, ইংরেজীশিক্ষিতদিগের মধ্যে কয় জন অতীত ভারতবর্ষকে ভালবাসিয়াছেন? ইংরেজের নিকট বড়াই করিবার জন্য, যাজ্ঞবল্ক্য জনক প্রভৃতির নাম আওড়াইলেই কি তাঁহাকে জানা হইল? তাঁহাকে যদি আমরা জানিতাম, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা বাক্য

অপেক্ষা কাব্যেই অধিকতর প্রকাশিত হইত।

গোরা এই শ্রদ্ধার জীবন্ত চিত্র। গোরা মূর্ত্তিমান হৃদয়। গোরা চায়, তাহার ভারতবর্ষকে; "সমস্ত পৃথিবী যে ভারতবর্ষকে ত্যাগ করিয়াছে, যাকে অপমান করচে তারই সঙ্গে অপমানের আসনে" গোরা স্থান নিতে চায়। গোরা বলে, "আমার এই জাতিভেদের ভারতবর্ষ, আমার এই কুসংস্কারের ভারতবর্ষ, আমার এই পৌত্তলিক ভারতবর্ষ! তুমি তোমার দেশের লোককে ডেকে বলচ, তোমরা মূঢ়, তোমরা পৌত্তলিক; আমি তাদের সবাইকে আহ্বান করে জানাতে চাই—না, তোমরা মূঢ় নও, তোমরা পৌত্তলিক নও, তোমরা জ্ঞানী ভক্ত। আমাদের ধর্ম্মতত্ত্বে যে মহত্ত্ব আছে, ভক্তিতত্ত্বে যে গভীরতা আছে, শ্রদ্ধা-প্রকাশের দ্বারা সেই খানেই আমার দেশের হৃদয়কে আমি জাগ্রত করিতে চাই। যেখানে তার সম্পদ আছে, সেইখানে তার অভিমানকে আমি উদ্যত করে তুলতে চাই।"

সমাজের ত্রুটি যে গোরার চক্ষে পড়ে না, তাহা নহে। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সমাজের পরিবর্ত্তন যে আবশ্যক, তাহাও গোরা অস্বীকার করে না। কিন্তু গোরার মত, "ভারতবর্ষের পরিবর্ত্তন, ভারতবর্ষের পক্ষেই হওয়া চাই। হঠাৎ ইংরেজি ইতিহাসের পথ ধরিলে আগা গোড়া সমস্তই পণ্ড ও নির্থক হয়ে যাবে।"

কিন্তু এই ভারতবর্ষের পথটা কি তাহা গোরা কোথাও খুলিয়া বলে নাই। বর্ত্তমানে সমাজের সঙ্গে কোনরূপ বিরোধ করিতেই গোরা অনিচ্ছুক। সংস্কার করিতে হইলে আগে সমাজকে ভাল রূপ বোঝা দরকার। কিন্তু "সমাজকে সব দিক থেকে মেনে চল্‌লেই, সমাজের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের চেতনা নির্ম্মল হতে পারে। তার সঙ্গে বিরোধ করে, তাকে যে কেবল বাধা দেই তাহা নয়, তাহাকে ভুল বুঝি।"

বর্ত্তমান ভারতবর্ষের দিকে তাকাইয়া স্বীয় শ্রদ্ধাকে রক্ষা করিতে গোরাকে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হইয়াছে। "ভারতবর্ষকে পাবার জন্য সমস্ত প্রাণ দিয়ে সে সাধনা করেছে, একটা না একটা যায়গায় বেধেছে। সেই সব বাধার সঙ্গে তাহার শ্রদ্ধার মিল করিবার জন্য সমস্ত জীবন দিনরাত চেষ্টা করেছে। সেই শ্রদ্ধার ভিত্তিকে খুব পাকা করে তোলবার চেষ্টায় গোরা আর কোনো কাজই করতে পারে নাই। সেই জন্যই বাস্তব ভারতবর্ষের প্রতি সত্য দৃষ্টি মেলে তার সেবা করতে গিয়ে গোরা বার বার ভয়ে ফিরে এসেছে। একটি নিষ্কণ্টক নিরিকার ভাবের ভারতবর্ষ গড়ে তুলে সেই অভেদ্য দুর্গের মধ্যে তাহার ভক্তিকে নিরাপদে রক্ষা করবার জন্য গোরা চারিদিকের সঙ্গে লড়াই অনবরত করেছে।"

কিন্তু হঠাৎ একদিন তাহার স্বপ্ন ভেঙে গেল। অকস্মাৎ ভারতবর্ষের উত্তর হতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত সমস্ত দেব-মন্দিরের দ্বার তাহার কাছে রুদ্ধ হয়ে গেল। গোরা জানিতে পারিল ব্রাহ্মণবংশে তাহার জন্ম নহে, সে মিউটিনী সময়কার কুড়ানো ছেলে; অমনি বুঝিতে পারিল সমস্ত দেশের মধ্যে কোনো পংক্তিতে কোনো যায়গায় তাহার আহারের আসন নাই।

হঠাৎ কঠিন আঘাত পাইয়া গোরা বিমূঢ় হইয়া পড়িল। কিন্তু অচিরেই গোরা মহত্তর চেতনা লাভ করিল। গোরা দেখিল তাহার মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ তখন নাই—ভারতবর্ষের সকলের জাতি তাহার জাতি; সকলের অন্ন, তাহার অন্ন।

মহত্তর চেতনা লাভ করিলেও গোরা হিন্দুসমাজের বাহিরে পড়িল। গোরার এই পরিণাম-কাহিনী পাঠ করিতে করিতে সহৃদয় পাঠকের প্রাণ বেদনাভারে পীড়িত হইয়া উঠে। কিন্তু এই বেদনা জাগাইবার জন্যই লেখক গোরা-চরিত্রের ঈদৃশ পরিণতি সংঘটন করিয়াছেন। খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ কোনো সমাজই গোরার মত লোককে প্রত্যাখ্যান করিত না। এই সমস্ত সমাজে নূতন যাহারা আসিয়া প্রবেশ করে, তাহাদের জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম দ্বারা সমাজ যথেষ্ট উপকৃত হয়। কিন্তু হিন্দুরক্তে জন্ম নহে বলিয়া গোরার মত লোকেরও হিন্দুসমাজে স্থান নাই। এই নির্ম্মম বিধান যে চিরদিন আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে এ কথা মনে করিবার কারণ নাই। আর্য্যগণ সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিয়া যখন দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন তখন তথায় সভ্যতার উচ্চপদবিতে আরূঢ় এক জাতি বাস করিত। সেই দ্রাবীড়ীয়-গণ আর্য্য আচার ও ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আর্য্যসমাজে অত্যুচ্চ স্থান লাভ করিয়াছিল। রাজপুতগণ যখন ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া বিভিন্ন প্রদেশে রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিল, তখনও উদার আর্য্য-সমাজ স্বীয় বিশাল ক্রোড়ে তাহাদিগকে স্থান দিয়া ক্ষত্রিয় পদবীতে উন্নীত করিয়া দিয়াছিল। ইহাতে আর্য্য-সমাজ রাজপুত বীরত্ব কর্ত্তৃক বহুদিন রক্ষিত হইয়াছিল। দ্রাবীড়ীয়গণের বিদ্যা ও সাধনা আজি সমস্ত হিন্দুজাতির গৌরবের ধন। তখন সমাজে প্রাণ ছিল, বাহিরের পদার্থ তখন সমাজ-শরীরে প্রবেশ করিয়া সমাজ-পদার্থের সহিত মিশিয়া যাইতে পারিত। আজি হিন্দু-সমাজ মৃত, তাই হিন্দুধর্ম্ম ও আচারের উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাবান হইয়াও কেহ হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিতে পারে না। গোরার করুণ পরিণাম পাঠ করিয়া হিন্দুসমাজের দৃষ্টি যদি সমাজের এই ত্রুটির দিকে আকৃষ্ট হয় তাহা হইলে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হইবে।

আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় কোথায় কোথায় ত্রুটি আছে, গ্রন্থকার তাঁহার অনেকগুলি গ্রন্থে তাহা বিশদরূপে দেখাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ত্রুটিগুলি যে আমাদের চোখে পড়ে না তাহা নহে। আমরা বুঝিতে পারি না কি ভাবে তাহার সংস্কার করিব। পাশ্চাত্য সভ্যতা তাহার লেলিহান জিহ্বা মেলিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য অনবরত আমাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে। আমাদের প্রাচীন অনেক প্রথা দোষাবহ হইলেও তাহাদিগকে সংস্কৃত করিতে গিয়া পাছে সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য ভাবের নিকট আমরা আত্মসমর্পণ করি, এই আমাদের ভয়।

আর, কেই বা সংস্কার করিবে? কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গ্রন্থকার আমাদিগের সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য "স্বদেশী-সমাজ" প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছিলেন। দেশের

মনস্বিগণ একত্র সমবেত হইয়া সকল দিক ভালরূপ বিবেচনা করিয়া যে ব্যবস্থা সমাজের মঙ্গলকর তাহার পরিবর্ত্তন ও যাহা অনিষ্টকর তাহার পরিবর্জ্জন করিবেন ইহাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায় ছিল। বর্ত্তমান রাজশক্তি যখন আমাদের সমাজের সম্পূর্ণ বাহিরেই পড়িয়া আছে—তখন দেশের মনস্বীবর্গের সমবেত চেষ্টা ভিন্ন সমাজ-সংস্কারের আশা নাই এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। নবপ্রতিষ্ঠিত "ব্রাহ্মণ-সমাজ" শুধু শাস্ত্রানুসারেই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিতেছেন। নূতন শাস্ত্র-প্রণয়নে তাঁহাদের আগ্রহ নাই। কিন্তু নূতন শাস্ত্রপ্রণয়ন ভিন্ন সমাজের উন্নতির আশা সুদূর পরাহত।

গোরা-গ্রন্থের প্রত্যেক চরিত্রই যে বিশেষরূপে পরিপুষ্ট হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থখানি পাঠ সমাপ্ত করিবার পরে প্রত্যেক চরিত্রই চোখের সম্মুখে জীবন্তরূপে প্রতিভাত হয়। চরিত্রগুলি এমনি পরিস্ফুট হইয়াছে যে, ঘটনা বিশেষের মধ্যে পড়িলে, গ্রন্থোল্লিখিত যে কোনও ব্যক্তি কি রকম ভাবে চলিবে তাহা একরূপ নিঃসন্দিগ্ধ ভাবেই বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। হিমাচলের ন্যায় অচল গোরা তাহার চরিত্রের দার্ঢ্যে, দৃঢ়প্রত্যয়বিহীন দুর্ব্বল-চরিত্র বিনয় তাহার দুর্ব্বলতায়, স্নেহপ্রবণ উদারহৃদয়া ক্ষমাশীলা আনন্দময়ী তাঁহার সর্ব্বজনীন ভালবাসায়, আচারনিষ্ঠ কৃষ্ণদয়াল তাঁহার শেষাবস্থায় শুচিবায়ুতে, মহিম তাহার স্বার্থপরতায়, পরেশ তাঁহার চিত্তের গাম্ভীর্য্যে ও অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন ধর্ম্মভাবে, বরদাসুন্দরী তাঁহার সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতায়, সুচরিতা ও ললিতা তাঁহাদিগের ভাবের উত্তেজনায় ও পানু বাবু তাঁহার দম্ভ ও আত্মপ্রীতিতে আমাদিগের নিকট জীবন্ত চিত্র বলিয়াই প্রতিভাত হয়।

গ্রন্থকার যাহাকে যাহা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাঁহার নিপুণ হস্তে সে তাহাই হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু গোরাকে আইরীস্ রক্তে জাত করিয়া গ্রন্থকার তাঁহার অনেক পাঠককে যে মনঃপীড়া দিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অমন মহান্ চরিত্র গোরা, হিন্দু-রক্তে তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না—ইহাই গ্রন্থকারের বিশ্বাস বলিয়া সন্দেহ হয়। এ সন্দেহ অমূলক সন্দেহ নাই, কেননা সমাজের যে ত্রুটি প্রদর্শন গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য গোরাকে হিন্দু-রক্তে জাত বলিলেও তাহা প্রদর্শন করা অসম্ভব হইত না।

গোরার চরিত্র যে সম্পূর্ণ নহে, এ কথা গ্রন্থে বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। পরেশবাবুর সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের নিকট গোরার সংরক্ষণ-ধর্ম্ম যে হীনপ্রভ হইয়া পড়ে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে সম্বন্ধে গ্রন্থকারও পাঠকদিগকে সন্দেহের অবকাশ দেন নাই। গোরাও ঘটনা-চক্রে পড়িয়া অবশেষে স্বীয় চরিত্রের অসম্পূর্ণতা সম্পূর্ণই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। কিন্তু গ্রন্থকার যে ভাবে গোরার ভ্রম সংশোধন করিয়াছেন, তাহাতে সাধারণ পাঠক তাহা হইতে কোনও শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে কি না, সংশয় হয়। গোরা যখন বুঝিতে পারিল যে, যে ধর্ম্মের যে সমাজের জন্য সে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছে, সে ধর্ম্ম ও সমাজ বাস্তবপক্ষে

তাহার নহে, সে ধর্ম্ম ও সমাজের নিকট তাহার কোনও ঋণ নাই, তাহার ঋণ শুধু সেই দেশের নিকট, সে ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র যে দেশ তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছে এবং এত দিন পর্য্যন্ত তাহাকে পোষণ করিয়া আসিয়াছে,—তখনই গোরা স্বীয় সঙ্কীর্ণতা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিল। আপনাকে ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ মনে করিয়া এবং ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ বলিয়াই তাহার গুরুতর দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া, এতদিন সে যে গুরুতর কর্ত্তব্যভারে আপনাকে পীড়িত মনে করিতেছিল, যখনই গোরা জানিতে পারিল, সে ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ নহে, তখন নিমেষেই সে গুরুতর দায়িত্বভার তাহাকে নিষ্কৃতি দিল। তাহাতে ব্রাহ্মণসন্তানের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে, ভারতবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে ধারণা সে এতদিন পোষণ করিয়া আসিতেছিল, সে ধারণা ঠিক অথবা ভ্রান্ত সে সম্বন্ধে কোনও মীমাংসা হইল না। এতদিন যে সমস্ত যুক্তির সাহায্যে সে আপনার কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে স্থির রাখিয়াছিল, সে সমস্ত যুক্তি আইরীশম্যানের পুত্র বলিয়া গোরার পক্ষে না খাটিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মণসন্তানের পক্ষে তাহারা কেন যে প্রযুজ্য হইবে না—গোরার পরিণাম হইতে সে প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। কিন্তু সে সমস্ত যুক্তি যে ব্রাহ্মণ সন্তানের পক্ষে একেবারেই প্রযুজ্য নহে—এ কথা বলা গ্রন্থকারের অভিপ্রেত নহে। পরেশ বাবুর বিশ্বজনীন ধর্ম্মের নিকট গোরার জাতিধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশ্বজনীন ধর্ম্মলাভ করিতে সকলে পারে না। যাহারা পারে না—তাহারা যে সমস্যের স্রোতে পা ঢালিয়া দিবে তাহা কখনই সঙ্গত নহে। গোরার যুক্তি তাহাদের পক্ষে মুখ্যতর প্রযোজ্য। তবে প্রাচীন সমাজের প্রতি শ্রদ্ধার সহিত সংস্কারের যে বিরোধ নাই, সে কথা গোরা ভালরূপ বুঝিতে পারে নাই। গোরা প্রাচীন ও বর্ত্তমান সমাজকে একই দৃষ্টিতে দেখিয়াছে—এবং যে শ্রদ্ধা সম্পূর্ণই প্রাচীনের প্রাপ্য তদ্বারা জোর করিয়াই বর্ত্তমানকে আবৃত করিয়াছে। গ্রন্থকার সমাজের ক্ষতস্থানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়াছেন। সমাজহিতৈষী হিন্দুসন্তান সে ক্ষত দেখিতে পাইয়া তাহার চিকিৎসার আয়োজন করিতেছেন।

সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে যে প্রশ্ন ব্যাকুল ভাবে মীমাংসার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল গ্রন্থে সে প্রশ্নের মীমাংসা নাই। "কি ভাবে সমাজ সংস্কার করিলে প্রাচীন ভারতের সহিত বর্ত্তমান ভারতের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ চলিতে পারে—" উপন্যাস-গ্রন্থে এ প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। গ্রন্থকার অন্যত্র তাহার মীমাংসা করিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাই প্রমাণিত হইয়াছে।

পরেশ বাবুর গ্রন্থের এক স্থানে বলিয়াছেন, তিনি মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে মানেন। তাঁহার মতে, ব্যক্তির সেই স্বাধীনতা দ্বারা আঘাত করিয়াই আমরা জানিতে পারি কোন্‌টা নিত্য সত্য ও কোন্‌টা নশ্বর কল্পনা; এবং তাহা জানিবার উপরেই সমাজের হিত নির্ভর করিতেছে। প্রত্যেক সমাজের মধ্যেই বিধাতার একটা বিশেষ অভিপ্রায় আছে, পরেশ বাবু তাহা স্বীকার করেন,

এবং সেই অভিপ্রায় যে সকলের কাছে সুস্পষ্ট নয়, তাহাও মানেন। কিন্তু তিনি বলেন, সেই অভিপ্রায়কে স্পষ্ট করিয়া দেখিবার চেষ্টা করাই মানুষের কাজ; গাছপালার মত অচেতন ভাবে নিয়ত মানিয়া যাওয়া তার সার্থকতা নহে। এ সমস্ত করার অর্থ এই যে সমাজের প্রচলিত সমস্ত নিয়মই যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত, তাহা নহে। ব্যক্তিগত বিচারপদ্ধতির চালনা করিয়া যেটী সমাজের মঙ্গলকর বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে ঈশ্বরের অভিপ্রেত ও যেটী অনিষ্টকর প্রতীত হয় তাহাকে মানব-কল্পনা-প্রসূত বলিয়া মনে করিতে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজ পূর্ব্বাবধি এই পথেই চলিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের সদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কিন্তু ব্যক্তিগত বিচারশক্তির চালনা করিয়া তাঁহারা যে কেবলই ঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন ইহাও মনে করা যায় না। কিন্তু ভুল করা মানুষের প্রকৃতিসিদ্ধ। অনবরত ভুল করিয়াই মানুষ সত্যে পৌঁছিতেছে। ভুল হইবে বলিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিচালনা না করা সঙ্গত নহে। তবে এইটা যদি আমরা ভাল করিয়া বুঝি যে ভুল করা আমাদের পক্ষে খুবই সহজ তাহা হইলে যখন তখন নূতন প্রথা প্রবর্ত্তন করিবার উৎসাহ আমাদের কমিয়া যাইবে। পরেশ বাবু ও গোরার চরিত্র সৃষ্টি করিয়া গ্রন্থকার ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

করুণা।

যখন মাষ্টারী ছাড়িয়া জমীদারের নায়েব হইলাম, তখন হৃদয় নামক একটা উপদ্রব মধ্যে মধ্যে বড় গণ্ডগোল বাধাইত। আমি এম্-এ পাশ করিয়াই সুপারিসের জোরে কাঁচালিয়ার সুবিখ্যাত রায় চৌধুরী বংশের নাবালক উত্তরাধিকারীর শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলাম। বৈষয়িক জ্ঞান কখন ছিলও না এবং হইবার সুযোগও ঘটে নাই। নাবালক ছাত্রকে আদর্শ জমীদার করিয়া গড়িয়া তুলিব এমনি একটা উদ্দেশ্য লইয়া আমি কর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম এবং ইংরাজী, অঙ্ক, ইতিহাস, প্রভৃতি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সেই উদ্দেশ্যের সফলতার জন্য ছাত্রকে সুদীর্ঘ উপদেশ দিতেও ত্রুটী করিতাম না। কিন্তু ক্রীড়াপ্রিয় বালক এ সকল সদুপদেশ অপেক্ষা ফুটবল খেলা, ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতি যেগুলি পছন্দ করিত তাহা বেশ বুঝিতাম। মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইতাম, কিন্তু আশা ছাড়িতাম না। ইংরাজী নভেলে যে সকল উদ্যমশীল, প্রজাপ্রিয়, পরোপকারী জমীদারের কথা পড়িতাম সেগুলি ছাত্রের নিকট বর্ণনা করিতাম,—কেমন করিয়া জমীর ও চাষপ্রণালীর উন্নতি

করিতে হয়, Co-operative Systemএ প্রজার কি প্রকার মঙ্গল হইতে পারে, প্রতি গ্রামে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপনের কত উপকারিতা, রাজায় প্রজায় বন্ধুভাব স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিশদ ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিতাম—কিন্তু হায়! সে সব উদ্যম ক্রীড়া-শ্রান্ত বালকের তন্দ্রাকর্ষণের উদ্দীপক মাত্র হইত,—আমার অমূল্য বক্তৃতা-মুক্তারাশি বেণাবনে মারা যাইত!

ক্রমে শ্রীমান্ সুরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় চৌধুরী সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইল এবং বিশেষ ধুমধামের সহিত তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সে সময় উপস্থিত ছিলেন, তিনি যুবক জমীদারের বলিষ্ঠ দেহ দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং তাহার অসাধারণ অশ্বচালন-কৌশল এবং শীকার-নৈপুণ্যের বহু প্রশংসা করিয়া শ্রীমানকে খুব উৎসাহ দিলেন। বোধ হয় অনাবশ্যক বিবেচনায় শ্রীমানের মানসিক রাজ্যের কোন খোঁজখবর লওয়া হইল না।

সুরেন্দ্রকৃষ্ণ সাবালক হইলেও আমার চাকরী গেল না—আমি কিছুদিন তাঁর জমীদারীর সদর সেরেস্তার কাজকর্ম্ম দেখিয়া শীঘ্রই পরগণার নায়েব হইলাম। অবশ্য ইহা সুরেন্দ্রেরই অনুগ্রহে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও বোধ হয় আমার সহিত কথায় বার্ত্তায় বিশেষ "অখুসী" হন নাই—তিনিও সুরেন্দ্রকে আমার অনুকূলে কিছু বলিয়াছিলেন বোধ হয়।

চাকরীটা পাইয়া ভাবিলাম এ হইল ভাল। এখন আমি কর্ম্মক্ষেত্রে আমার আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ পাইব। নিজের কার্য্যের দ্বারায় সুরেন্দ্রকৃষ্ণের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিব এবং যে সকল প্রাচীন অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী জমীদারী-শাসন-সংরক্ষণ সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা শুনিয়া সাশ্চর্য্যের হাসি হাসিতেন এবং কর্ম্মক্ষেত্রে "মাষ্টারী বুদ্ধির" ফলাফল সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করিতেন—তাঁহাদিগকে দেখাইব—যে আমার আদর্শ কবির কল্পনামাত্র নহে।

পরগণায় গিয়া সেই ভাবে চলিতে লাগিলাম—কিন্তু ফল দেখিয়া উৎসাহ ক্রমেই কমিতে লাগিল। আমার ভদ্রব্যবহারকে প্রজারা প্রথম প্রথম বিশেষ সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল—নায়েবের এত "মুখমিষ্টি"—তাহারা শুভলক্ষণ বলিয়া মনে করিতে পারিল না। ইহাতেও কার্য্যের কোন ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু যখন ক্রমে তাহারা আমার স্বভাবটা এবং আদর্শটা কতক কতক বুঝিতে আরম্ভ করিল তখন অসংযত অশ্বের ন্যায় তাহারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতে লাগিল—পরগণার শাসন শিথিল হইয়া গেল, কর্ম্মচারীরা স্বেচ্ছাচারী হইতে লাগিল, দুষ্ট প্রজার সুসময় এবং শিষ্টের অসময় উপস্থিত হইল। যথা সময়ে যথোপযুক্ত খাজনা আদায় হয় না,—নির্দ্দিষ্ট সময়ে জমাওয়াশীল প্রভৃতি কাগজ সদরে দাখিল হয় না। আমি সদরের কঠিন তাড়নায় অস্থির হইয়া উঠিলাম। কিন্তু কি করিব? গোমস্তারা পর্য্যন্ত ডাকিলে আসে না—টাকা চাহিলে মৌজার দুরবস্থা বর্ণনা করিয়া সুদীর্ঘ পত্র দেয়। আমার অধীনস্থ যে কর্ম্মচারীকেই মৌজায় পাঠাই সেই আসিয়া বলে এবার মহলের অবস্থা বড় খারাপ। দরিদ্র প্রজারা আসিয়া আমার কাছে কাঁদিয়া পড়ে, তাদের

সর্ব্বনাশ হইতেছে ;—অবস্থাপন্ন প্রজারা, পাইক নগদিকে খোরাকী ও বকসিস্ দিয়া বিদায় করে, জমীদারের খাজনা দেয় না। আদর্শ ও বাস্তবে সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া আমি যখন হাবুডুবু খাইতেছিলাম—এমন সময় একদিন সদরের আসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার বসু মহাশয় কাছারীতে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার সঙ্গে কয়েকজন বলিষ্ঠ কর্কশভাষী হিন্দুস্থানী দরোয়ান দেখিয়া এ ক্ষেত্রে তাহাদের আগমনের কারণ ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। যাহা হউক কয়েক দিনের মধ্যেই তাহাদের আগমনের সার্থকতা বুঝিলাম। কর্ম্মিষ্ঠ বসু মহাশয় এক সপ্তাহের মধ্যে বাকী-বকেয়া এবং হালের অর্দ্ধেক খাজনা আদায় করিয়া সদরে ফিরিয়া গেলেন এবং যাইবার পূর্ব্বে আমাকে জমীদারী কার্য্য সম্বন্ধে গুটিকতক অমূল্য উপদেশ দিয়া গেলেন। আমি তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় চমৎকৃত হইলাম বটে—কিন্তু তাঁহার শাসন-প্রণালীর প্রশংসা করিতে পারিলাম না। বলিলাম,—"বসু মহাশয়, টাকা আদায় করিলেন বটে, কিন্তু প্রজাদের উপর কি অত্যাচার করা হইল না?" তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন,—"মাষ্টার, অত্যাচারটা কি দেখিলে?"—"কেন? ঐ গালাগালি তোলা।"—"ওঃ তাই! দেখ, মাষ্টার তোমাকে একটা কথা বলিয়া যাই। তুমি অনেক পুঁথি পড়িয়াছ—আমার ত সে বিদ্যা নাই, তবে আমরা অনেক দেখিয়া শিখিয়াছি। তুমি প্রজার উপকার করিবে বলিয়া খেপিয়াছ। কিন্তু তুমি ও আমি এ দুজনের মধ্যে কে প্রজার উপকারী? তোমার মিষ্ট কথার ফলে দুষ্ট প্রজার প্রতাপ বাড়িয়াছিল দুর্ব্বলেরা হাহাকার করিতেছিল—আর আজ? তুমি প্রজাদিগকে দয়া করিয়া খাজনা বাকী ফেলিতে দিতেছিলে—তার ফলে ২।৩ বৎসরে তাহারা কপর্দ্দকে জড়াইয়া পড়িত আর উদ্ধারের উপায় থাকিত না। যে জমীদার কড়ায় গণ্ডায় ন্যায্য খাজনা প্রতি বৎসর আদায় করে আপাততঃ তাহাকে কড়া বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু যে বাকী খাজনা জমিতে দিয়া প্রজাকে জড়াইয়া ফেলে সে জমীদার প্রজার অতি ভয়ঙ্কর শত্রু।—আর, শাসন! সন্ন্যাসী সাধুকে যে উপদেশ দিয়াছিল, সেটা মনে রেখো—কামড়ো না কিন্তু ফোঁস কর্‌তে বাধা কি?"

২

আমার শিক্ষালাভ হইল। কিন্তু যেমন প্রথম বয়সে সচ্চরিত্র থাকিয়া শেষ বয়সে পাপ পথে পড়িলে মাত্রাধিক্য ঘটে, তেমনি আমিও আমার কঠোরতার ও শাসনের পরিমাণ ঠিক রাখিতে পারিলাম না। একটু একটু করিয়া শাসনের মাত্রা বাড়াইয়া ফেলিলাম। জমীদারের পক্ষে তাহাতে ফল ভালই হইল এবং সদরে আমার প্রশংসাও হইতে লাগিল কিন্তু প্রজারা প্রতিদিন প্রাতে আমার পিতৃপুরুষের আহারাদির সুব্যবস্থা না করিয়া জলগ্রহণ করিত না—এমনি একটা গুজব আমার কাণে পৌঁছিল। আমি ইহাতে দমিলাম না—বরং একটা আমোদ পাইলাম —আমি এতদিনে 'কেজো লোক' হইয়াছি ভাবিলাম ক্রমে আমিও একজন পাকা নায়েব হইতে পারিব এবং শীঘ্রই এমন দিন আসিবে

যখন আমার প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইবে। সেই আমি!

ক্রমশ আমার খ্যাতি এবং প্রতাপ বিস্তৃত হইয়া পড়িল। প্রজাগণ শশব্যস্ত হইয়া উঠিল—প্রথম বয়সের সহৃদয়তা এখন দুর্ব্বলতা বলিয়া মনে হইত। এবং রাজা-প্রজার পিতাপুত্র বা বন্ধু সম্বন্ধ এখন আমার কাছে উপহাসের বিষয় হইয়া উঠিল। কর্ম্ম-ক্ষেত্রে তখন আর হৃদয়ের উপদ্রব মাত্র রহিল না।

একদিন প্রাতে কাছারীতে কতকগুলি প্রজাকে বরকন্দাজে ধরিয়া হাজির করিয়াছে। গোমস্তার রিপোর্টে প্রকাশ যে ইহাদের সকলেরই তিন বৎসরের খাজনা বাকী—কোন প্রকারেই আদায় হইতেছে না—তাই আমি ইহাদিগকে তলব দিয়া আনাইয়াছি। সকলেই অজন্মা দুরবস্থা প্রভৃতির ওজর করিতে লাগিল—শুনিয়া আমার ক্রোধ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—সব খরচই চলে, কেবল জমীদারের খাজনাই জোটে না—এ সব বাজে ওজর। পাইকদিগকে হুকুম দিলাম—"লাগাও জুতা।" ফলে অনেকেরই কাছ হইতে কিছু কিছু আদায় হইল—কেবল একটি বৃদ্ধের নিকট কিছুই বাহির হইল না। সে নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিল—কোন কথা বলে না। তাহার ধৃষ্টতা দেখিয়া আমার বিজাতীয় ক্রোধ হইল—হুকুম দিলাম "ইহাকে থামে বাঁধ।" বৃদ্ধ সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে লাগিল।

তাহাকে সেই অবস্থায় রাখিয়া কাছারী ভাঙ্গিয়া বাসায় ফিরিলাম—লোকটার এক-গুঁয়েমী দেখিয়া আমার জেদও ক্রমশ বাড়িয়া যাইতেছিল। বাড়ী আসিয়া দেখি আমার দশ বৎসরের কন্যা করুণা তার একটি সমবয়সী মেয়ের হাত ধরিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। দুজনেরই চোখে জল। দুজনেই অদূরে কাছারীর বারান্দার থামে বাঁধা বৃদ্ধের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। করুণা আমাকে দেখিতে পাইল না। আমি অভিমানিনী কন্যাকে কোলে লইবার জন্য হাত বাড়াইলাম; ভাবিলাম, আমার কিরিতে দেরী হইয়াছে, তাই করুণা রাগ করিয়াছে। মাতৃহীনা করুণাই আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন এবং সেও বাবার উপর তার দাবী সময়ে অসময়ে জাহির করিত। আমার আহারাদির বন্দোবস্ত হইতে খড়িকা, পানটি পর্য্যন্ত সে নিজে যোগাড় করিয়া রাখিত এবং নিপুণা গৃহিণীর মত আমার তত্ত্বাবধান করিত—এ সকল বিষয়ে আমার কোন স্বাধীনতা ছিল না। প্রতিদিন কাছারী হইতে আসিলে সে একবার ঝাঁপাইয়া কোলে আসিত—এবং আমি আদর করিলে—আমার হাত ধরিয়া ঘরে টানিয়া লইয়া যাইত। কিন্তু আজ এ কি! এ মেয়েটিই বা কে? আমি ডাকিলাম—"করুণা"—বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সে উত্তর দিল "কেন বাবা!"—

"এ মেয়েটি কে?"

"ঐ যে বুড়ো মানুষটিকে তুমি থামে বাঁধিয়াছ, জমাদার জুতো মারছে—ঐ ওর বাবা। এরও মা নেই।—আর কেউ নেই, তাই এও তার বাবার সঙ্গে কাছারী এসেছিল। তার পর ওর বাবাকে যখন জমাদার ধরে নিয়ে গেল ও আমার কাছে এসে কাঁদতে লাগল:—বাবা, এর বাবাকে মারছ

কেন? ওদের যে আজ তিন দিন খাওয়া হয়নি! ওরা যে বড় গরীব। বাবা,—ওকে ছেড়ে দিতে বল—দেখ মেয়েটি বড় কাঁদছে। বাবা তোমার পায়ে পড়ি—ওকে ছেড়ে দিতে বল।"

কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া আমি অবাক্ হইলাম—শরীরিণী করুণার ন্যায় তাহার কাতর আবেদন আমার হৃদয়ে বহুদিনের গুপ্ত যে তন্ত্রে আঘাত করিল তাহাতে এমন সুর অনেক দিন বাজে নাই। আমি করুণার সঙ্গিনীর মুখের পানে চাহিলাম। সেখানে কি বেদনা,—অভাগিনী বালিকার সজল চক্ষু দুটিতে কি করুণ প্রার্থনা! মুহূর্ত্তে, আমার কর্ম্মের নির্ম্মমতা আমার মাতৃহীনা কন্যার স্নেহে দরিদ্র বৃদ্ধের মাতৃহীনা কন্যার বেদনা, আমাকে তীব্র কষাঘাত করিল। হায় নির্ম্মম কর্ম্মস্রোত! জগন্নাথের রথের মত তুমি আপনার গৌরবে পৃথিবীর বক্ষের উপর দিয়া চলিয়াছ—কত হতভাগ্য, কত অসহায় যে তোমার চক্রে নিষ্পেষিত হইতেছে তাহা দেখিবার তোমার সময় কোথায়! এই কর্ম্মবন্ধনেই মানুষ মানুষকে কত অল্প বোঝে! যার সঙ্গে যতটুকু কর্ম্মের সম্বন্ধ আমাদের কাছে তার ততটুকুই সত্য—তার বাহিরে যে, তাহার বিচিত্র সম্বন্ধ আমরা তাহা জানিও না, জানিতে চাইও না।—এই যে দরিদ্র বৃদ্ধ—সে যে কেবলমাত্র জমীদারের প্রজা নহে—সে যে তার মাতৃহীনা কন্যার পিতা,—সে যে তার কন্যার ভক্তি ও স্নেহের একমাত্র আধার,—তার অপমানে ঐ ক্ষুদ্র বালিকার হৃদয় যে কি অপরিমেয় অপমান কি গভীর বেদনা ভোগ করিতেছে—এক মুহূর্ত্তে তাহার সমগ্র ভীষণতা আমার কাছে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইল। আমার কন্যার কথা ভাবিয়া আমি তাহার দুঃখ অনুভব করিলাম।

আমি স্বহস্তে বৃদ্ধের বন্ধন মোচন করিলাম এবং তাহাকে ও তাহার কন্যাকে যত্নপূর্ব্বক আহারাদি করাইয়া বিদায় দিলাম।

সে দিন হৃদয়ে বড় অনুতাপ অনুভব করিলাম! সত্যই আমার কত পরিবর্ত্তন। ছি, ছি, এ কাজে আর নয়। যে কার্য্যে দেবতাকে পশু করে, মানবকে দানব করে, সে কাজে আর নয়!

কার্য্যে রিজাইন দিয়া পুনরায় মাষ্টারীই করিব স্থির করিলাম। রাত্রিতে আহারান্তে শয়ন করিলাম কিন্তু নিদ্রা আসিল না, চিন্তার উপর চিন্তা আসিয়া হৃদয় পূর্ণ করিয়া দিল। শেষ মন স্থির করিলাম, বুঝিলাম, কার্য্যের কোন দোষ নাই, দোষ নিজের। নিজে ইচ্ছা করিয়া মনুষ্যত্ব না হারাইলে, কার্য্যের খাতিরে মনুষ্যত্ব হারাইতে হয় না।

মনুষ্যত্ব বজায় রাখিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে চাকরীতে মন দিলাম!

প্রজারা সবিস্ময়ে আমার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। আমি কর্ত্তব্যের সহিত সহৃদয়তার এবং শাসনের সহিত করুণার সামঞ্জস্য করিতে শিখিলাম। এতদিনে আমি বহুদর্শী বন্ধুমহাশয়ের উপদেশের অর্থ বুঝিলাম। এখন কামড়াইতাম না, কিন্তু আবশ্যক হইলে ফোঁস করিতেও ছাড়িতাম না। এখন আর আমি নিরীহ বা দুঃসহ নহি। এখন প্রজারা আমার ভয় ভক্তি করে, কর্ম্মচারীরাও সমীহ করিয়া থাকে, সদরও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। করুণাকেও আর কাঁদিতে হয় না।

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার।

বঙ্কিম-চরিত

মাতামহদেব স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনচরিত প্রকাশ করিতে দেশের গণ্য মান্য অনেকেই আমাদিগকে অনুরোধ করিতেছেন,—কেহ অনুরোধ না করিলেও, তাঁহার প্রকৃত জীবনী প্রকাশ করা আমাদের জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। মাতামহদেব স্বর্গারোহণের সময় বলিয়া গিয়াছিলেন যে, দ্বাদশবৎসরের পূর্ব্বে যেন কেহ তাঁহার জীবনচরিত না লেখে। ঠিক দ্বাদশ বৎসরের পরেই স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, দেশের লোক তখন হইতে সেই সাহিত্যসম্রাটকে 'বন্দে মাতরং' মন্ত্রের ঋষিজ্ঞানে অধিকতর ভক্তিভরে পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সে মহাপুরুষ কি উদ্দেশ্যে তাঁহার জীবনচরিত দ্বাদশবর্ষ লিখিতে নিষেধ করিয়া যান, সে রহস্য সম্পূর্ণ বুঝিয়া উঠা কঠিন, কিন্তু এই ঘটনায় যেন সে রহস্যজাল কতকটা ভেদ হইয়াছে। মাতামহদেবের জন্মের পূর্ব্বে তাঁহাদের বংশে বিশেষতঃ তাঁহার পিতার জীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে, তাঁহার নিজের জীবনেও অলৌকিক ঘটনার অভাব নাই—জানি না তাঁহার এই উক্তি এই ভবিষ্য-দৃষ্টি, সেই অলৌকিক বল-প্রসূত কি না। মাতামহদেবের স্বর্গারোহণ সময়ে আমরা অল্পবয়স্ক ছিলাম, আমরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার জীবনচরিত প্রকাশ করি, ইহাও বোধ হয় তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমরা এতদিন নানা কারণে সে অনুরোধ প্রতিপালন করিতে পারি নাই, আপনাদেরও সে কর্ত্তব্য পালন করিতে ক্ষমতা হই নাই।

তাঁহার আদেশে আমরা দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনী প্রচারে প্রবৃত্তই হই নাই, তাহার পরও কিছুদিন সে সুযোগ ঘটে নাই; তাঁহার স্বরচিত আত্মচরিত অবলম্বনে আমাদের তত্ত্বাবধানে তাঁহার যে বিস্তৃত জীবনচরিত লিখিত হইতেছে, তাহা প্রকাশে কিছু বিলম্ব আছে। সেই জন্য উৎসুক পাঠকবর্গকে আমরা বঙ্গদর্শনে মাতামহদেবের জীবনীর কতক কতক পরিচয় দিতেছি।

বংশ-পরিচয়।

কলিকাতা হইতে বার মাইল ব্যবধানে পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ের "নৈহাটী" ষ্টেসনের অতি সন্নিকটে কাঁটালপাড়া নামে যে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায় সেই গ্রাম মাতামহদেবের জন্মভূমি। এক্ষণে গ্রামখানি যেরূপ দুর্দ্দশাপন্ন, পূর্ব্বে উহা এ প্রকার ছিল না। তখন উহা বড়ই প্রীতিকর, নয়নস্নিগ্ধকর মনোরম স্থান ছিল। 'গঙ্গার পূর্ব্বপারে, চুঁচুড়া "ব্যারাকের" বিপরীত পারে কাঁটালপাড়া গ্রাম। প্রায় দেড়শতবর্ষ পূর্ব্বে একদিন এক সন্ন্যাসী, এক প্রকাণ্ড ঝুলি কাঁধে চেলার সহিত এই গ্রাম দিয়া যাইতেছিলেন—কোথায় যাইতেছিলেন কে জানে? ঝুলির ভিতরে চাল, ডাল, কাপড়, গামছা আর কৃষ্ণ-প্রস্তরের এক সৌম্য কৃষ্ণ-

মূর্ত্তি। গ্রীষ্মকাল, প্রখর রৌদ্র। সন্ন্যাসী ঠাকুর রৌদ্রতেজ আর সহ্য করিতে না পারিয়া বিশ্রামোপায় স্থান অন্বেষণে বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিশ্রামপ্রয়াসী ক্লান্ত সন্ন্যাসীর নয়ন এক সুন্দর স্বচ্ছ দীর্ঘিকার জলে আকৃষ্ট হইল। দীর্ঘিকার তীরে বটবৃক্ষের ছায়ায় তিনি উপবেশন করিলেন। দীর্ঘিকার নাম "অর্জ্জুনা"। হায়! সে মনোহর অর্জ্জুনা এক্ষণে আর নাই। তাহা এক্ষণে পঙ্কিল-আবর্জ্জনাপূর্ণ পূতিগন্ধময়—"ডোবায়" পরিণত হইয়াছে—নামমাত্র "অর্জ্জুনা" আছে।* সেখানে কণেক বিশ্রাম করিয়া, সন্ন্যাসী ঠাকুর উঠিলেন। উঠিয়া ঝুলি তুলিতে গেলেন, তুলিতে পারিলেন না; অনেক চেষ্টা করিলেন, কিছুই হইল না। শেষে তিনি চেলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "রঘুদেব! বুঝতে পারছ ব্যাপারখানা কি? আমি ত অনেক দেশ অনেক তীর্থ এই ঠাকুর লইয়া বেড়াইলাম কোথাও ত এরূপ ঘটে নাই। বোধ হয় ঠাকুরের ইচ্ছা আমার কাছে থাকিতে ইচ্ছা নাই। আচ্ছা ঠাকুর! তোমার যখন উঠিতে ইচ্ছা নাই তখন তুমি এইখানেই থাক।" এই বলিয়া সেই চেলাকে ঠাকুরের ভার প্রদান করিলেন এবং সেই স্থানে ঠাকুরের পাহারায় চেলাকে রাখিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর প্রস্থান করিলেন।

* আমি কবিবার পটু নহি সুতরাং সেই দীর্ঘিকার কবিতা পাঠকগণকে বুঝাইতে পারিলাম না। যাঁহারা তাহা জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক রতিমন্ত্র লিখিত কৃষ্ণকান্তের উইলের বারুণী পুষ্করিণীবর্ণনা পাঠ করিবেন, তাহা হইলেই সম্মুখে মানসচক্ষে অর্জ্জুনা দেখিতে পাইবেন।

এক্ষণে কাঁটালপাড়ায় যে সকল কুলীন ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায় রঘুদেব ঘোষালই তাঁহাদিগের আদিপুরুষ। রঘুদেব ঘোষাল মহাশয় বড়ই পরিশ্রমী ছিলেন। নিজে নিঃস্ব সন্ন্যাসীর চেলা—তবু তিনি নিজের পরিশ্রমের গুণে, সন্ন্যাসীর কৃপায়, ও রাধাবল্লভের আশীর্ব্বাদে ঠাকুরকে সেই খানে স্থাপন করিলেন—ঠাকুরের এক অতি রমণীয় মন্দির প্রস্তুত করাইলেন—ও জায়গীর সম্পত্তিও করিলেন।

রঘুদেব ঘোষাল মহাশয়ের কোন পুত্র সন্তান হয় নাই, তাঁহার তিন কন্যা। কনিষ্ঠা কন্যার কোন সন্তানাদি হয় নাই, তিনি অকালে মারা যান। জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী রোহিণী দেবীর সহিত রামজীবন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিবাহ হয়। হুগলীর অন্তঃপাতী দেশমুখো শিয়াখালা বন্দিপুরের নিকট এক ফুলিয়া কুলীনদিগের বাস ছিল। রামজীবন এই কুলীনদিগের বংশসম্ভূত। তিনি অবসথী গঙ্গানন্দ ঠাকুর মহাশয়ের প্রপৌত্রের পুত্র। গঙ্গানন্দ ঠাকুর নিজব্যয়ে নিজালয়ে অনেক ছাত্রদিগকে অন্নদান করিতেন ও তাহাদিগের থাকিবার নিমিত্ত অনেক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন; সেই গৃহগুলিকে অবসথী বলিত। সেই নিমিত্ত গঙ্গাধর ঠাকুরকে সকলেই অবসথী বলিত। গঙ্গানন্দ ঠাকুর সেই সময়েরই একজন বিখ্যাত কুলীন ছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা সেই অবধি প্রধান কুলীন বলিয়া সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বস্থানে বিশেষ খ্যাত। রামজীবনের দুই পুত্র। রামহরি ও জগন্নাথ। তাঁহারা দুই ভ্রাতা। রঘুদেব ঘোষাল মহাশয়ের বিষয় উত্তরাধি-

কারিষ সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া কাঁটালপাড়ায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা বিষয়ের কিয়দংশ জাতিবিরোধে নষ্ট করিয়া ফেলেন। এই কারণে রামহরির পুত্র গোপীরাম রঘুদেব ঘোষালের অতবড় বিষয়ের অতি অল্প অংশ মাত্র প্রাপ্ত হয়েন। তাহাতে গোপীরাম প্রায় নিঃসম্বল হইয়া পড়েন। কিন্তু তিনি দারিদ্র্যকে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। যাঁহার জীবনী আমি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তিনি ইঁহাকে একজন বিখ্যাত হিন্দু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে মাতামহদেব স্বয়ং সমস্তই জানিতেন। গোপীরামের ভাগ্যে বেশী শিক্ষালাভ ঘটে নাই; এবং তিনি কখনও নিজে এক কপর্দ্দকও উপার্জ্জন করেন নাই, তত্রাচ তিনি একজন মহাত্মা ছিলেন। তিনি জীবনে কখনও মিথ্যা কথা কহেন নাই। দান খয়রাতে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি নিলাম হোক সেও স্বীকার, তবু কখনও ভিক্ষার্থীকে বিমুখ করেন নাই। চিরকাল তাঁহার আয় অপেক্ষা দান বেশী ছিল—কিন্তু অতি গোপনে,—কেহ কখনও ঘুণাক্ষরেও তাঁহার দানের কথা জানিতে পারিত না। ইহাতে গৃহীতার বিশেষ সুখ। কারণ, তাহারা বিনা বাধায় নিঃসংকোচে দান গ্রহণ করিত। বাহিরে অপর কোন লোকের নিকট দান গ্রহণ জনিত লজ্জা বা অপমানের ভয় থাকার সম্ভাবনা বিন্দুমাত্র থাকিত না। ভিক্ষার্থী ক্ষুধার্থী, সকলেই তাঁহার বাটীতেই অগ্রে যাইত; কারণ তাঁহারা নিশ্চয়ই জানিত সেখান হইতে কখনও শুধু হাতে বা বিনা অন্নে ফিরিতে হইবে না। তাঁহার ন্যায় জিতেন্দ্রিয় পুরুষ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। নিজে নিঃস্ব কপর্দ্দকশূন্য, চারিদিকে ধনশালী ক্ষমতাবান প্রতিবেশী মণ্ডলী বেষ্টিত, তত্রাচ কখনও স্বপ্নেও তিনি একদিনের জন্য কাহারও তোয়াক্কা করেন নাই এবং পৃথিবীতে ভয় বলিয়া কোন জিনিষ জানিতেন না। এই সকল উদ্ধত, অপ্রতিহত, ক্ষমতাশালী ধনকুবের প্রতিবাসী-মণ্ডলীকে তাঁহার নির্ভীক তেজস্বিতাপূর্ণ কঠোর বাক্যসমূহ এত দূর উত্তেজিত করিত যে তাহারা তাঁহাকে লাঠিয়াল দিয়া বাটীতে আক্রমণ করিত। একদিনের ঘটনা শুনিলেই বুঝিতে পারিবেন কি রকম ভয়ানক অত্যাচারের মধ্যে তাঁহাকে বাস করিতে হইত। একদিন তাঁহারই উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্রগণ একদল লাঠিয়াল লইয়া তাঁহার বাটী আক্রমণ করিল। মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ খুড়ার মস্তক লাঠির দ্বারা গুঁড়াইয়া ফেলিবে এবং যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া যাইবে। বৃদ্ধ বাটী হইতে সমস্ত দেখিলেন—বাটীতে কাহাকেও ডাকিলেন না,—নির্ভীক ব্রাহ্মণ একাকী স্থির চিত্তে ভয়শূন্য প্রাণে আনমনে তামাক খাইতে লাগিলেন। যেন কিছুই ঘটে নাই। দৌড়াইয়া পলাইয়া গিয়া যে নিজেকে রক্ষা করিতে হয় ইহাও তিনি জানিতেন না—জীবনে কোনো দিন ইহা শিক্ষাও করেন নাই। তিনি মন্দগতিতে আক্রমণকারী দিগের দলপতির সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলেন। একে একে সকলের নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেন "বাপু সকল, অনেকদিন এ পৃথিবীতে বাস করিতেছি—অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া হাড় কালি হইয়া গেছে, আর পৃথিবীতে থাকিতে বড় সাধ নাই তোমাদের সাহসে

তুলায়—এস এই বুড়ার মাথা লাঠিতে গুঁড়াইয়া দিয়া নিজেদের নরকের পথ সাফ করি।" আক্রমণকারীরা নির্ব্বাক, নিস্তেজ, হতবুদ্ধি।—কাহারও মুখে কোন কথা নাই—যেন পাথরের প্রতিমূর্ত্তি। তাহারা লাঠি চালাইবে কি, লজ্জায় তখন পলাইয়া আসিবার পথ পায় না! এই মহাত্মাই বঙ্কিমচন্দ্রের পিতামহ।

প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় যাদবচন্দ্র ইহার তৃতীয় পুত্র। যাদবচন্দ্র কপর্দ্দকশূন্য হইয়া নিরুপায় অবস্থায় বাটী হইতে বাহির হইয়া পড়েন, এবং একটি ৮৲ টাকা মাহিনার মুন্সীগিরীতে ভর্ত্তি হয়েন। ক্রমে ইনি নিজের অধ্যবসায়ের গুণে ৪০০৲ টাকা বেতনের ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছিলেন। ইনিই সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ক্রমে ক্রমে উদ্ধার করেন। তাঁহার চারি পুত্র—শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র; এক শ্যামাচরণ বাদে সকলেই সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। পূর্ণচন্দ্র জীবিত থাকিয়া বংশের গৌরব রক্ষা করিতেছেন। ইহাদের মাতামহ বিখ্যাত পণ্ডিত ভবানীচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় একজন অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার ছগলীতে এক টোল ছিল। * (ক্রমশ)

শ্রীদিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভ্রান্তি।

(তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

সে দিন সভাটা জমিয়াছিল ভাল, কিশোরীর বক্তৃতায় খুব একটা ঝাঁজ ছিল, যাঁহারা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় নির্ব্বিচারে বিবাহের পক্ষপাতী, তাহাদের প্রতি কিশোরী শ্লেষ এবং বিদ্রূপের বিষাক্ত গুপ্ত-বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিল; সকলে অবশ্য তাহা নীরবে সহ্য করেন নাই, সুতরাং সভায় হাতাহাতির ও কথা কাটাকাটির অন্ত ছিল না, তবে, লাঠালাঠি বা লাটালাটি অবশ্য হয় নাই।

কিশোরীর বক্তৃতার কঠোর প্রতিবাদ কিশোরীর সমবয়স্ক অনেকেই করিয়াছিলেন, কিশোরীও তাহার উপযুক্ত জবাব দিতে ছাড়ে নাই। সে বাদ-প্রতিবাদের সকল কথা লিপিবদ্ধ করিলে পুঁথি বাড়িয়া যায়, তাই দুই একটা নমুনা দিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইবে।

---

* পুরেন্দু বাবুর "বঙ্কিম-প্রসঙ্গ" পরে প্রকাশিত হইল। ঃ সঃ।

গত চৈত্র মাস হইতে এই জীবনী প্রকাশের কথা ছিল,—কিন্তু শেষে স্বর্গীয় মহাপুরুষ বঙ্কিম-চন্দ্রের জন্মমাস হইতেই ইহা প্রকাশ করিবার সংকল্প হওয়ায় কয়েক মাস ইহা প্রকাশ করি নাই, এই বিলম্বের জন্য লেখক মহাশয় দুঃখিত হইবেন না। ঃ সঃ।

কিশোরীকে যাহারা প্রতিবাদের "পাটকেল" মারিয়াছিল, কিশোরী তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বিরাশি শ্রদ্ধ আনা ওজনের বিদ্রূপের পাথর ছুড়িয়াছিল; কিশোরী গম্ভীর ভাবে জবাব গাহিল "বিবাহিতের মধ্যে অনেকেই যে আমার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবেন তাহা স্বাভাবিক। শুনা যায় অশোক কাননে সীতার নিকট রামচন্দ্রের সদ্যঃদগ্ধবদন চর স্বজাতীয় সকলেরই মুখশ্রী যাহাতে তাহার শ্রীমুখের সমতুল্য হয়, সে জন্য বর প্রার্থনা করিয়াছিল। এ ব্যাপারটা নিতান্ত কবি-কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না, এক্ষেত্রে সে বাসনাই স্বভাবতঃ উদয় হয়, সুতরাং বিবাহিতের পক্ষে—বিবাহিতের দল বৃদ্ধি করার চেষ্টাকে অন্যায় বলা চলে না।" কিশোরীর এ রসিকতা সে স্থানে ধৃষ্টতার পরিচায়ক হইয়াছিল, কারণ কিশোরী তর্কের মুখে, উত্তেজনার বাহুল্যে ভুলিয়া গিয়াছিল যে সেখানে তাহার সমবয়স্ক ছাড়া মুরুব্বি-পক্ষ প্রবীণ লোকও অনেক উপস্থিত; সেই সভার সভাপতি মহাশয় প্রাচীন এবং শান্ত শিষ্ট, কিন্তু কিশোরীর এই প্রগল্‌ভতায় তাঁরও ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছিল, তিনি মূল বক্তৃতার উপযুক্ত সমালোচনা করিয়া শেষ বেশ মিষ্ট মিষ্ট কথায়, কিশোরীকে দুকথা শুনাইয়া দিলেন—"বক্তা অবিবাহিত হইলেও তাঁহার বংশের গুরুজনদের মধ্যে কেহ যে অবিবাহিত তাহা আমার জানা নাই, কিন্তু বক্তা যখন কর্ত্তব্য বুঝিয়া তাঁহাদিগকেও রেহাই দেন নাই, তখন আশা করি বক্তার আক্রমণে সভাস্থ বিবাহিত কেহই দুঃখিত হইবেন না। আমিও হইব না। তবে যে সভায়, পতিত্বের বিরুদ্ধে এরূপ যুদ্ধ ঘোষণা, সে সভার সভাপতিত্বে স্বীকার হওয়া অবশ্য আমার সুবিবেচনার কার্য্য হয় নাই, ইহা বলিতেই হইবে। কিন্তু তাহা পূর্ব্বে 'ভাবিতে উচিত ছিল,' এখন এ সভাপতিত্বের অনুশোচনা বৃথা, তবে এখানে পতিত্ব গ্রহণ করিয়া যে প্রকার অনুতপ্ত হইতে হইয়াছে, বক্তার গবেষণামূলক সুদীর্ঘ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াও অন্যান্য এ প্রকার "ভ্রান্তি" ঘটিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে পারিলাম না। আর, বক্তার সম্বন্ধে আমার একটা আশার কথা মনে জাগিতেছে যে, বক্তা বক্তৃতায় বিবাহিতের প্রতি যতটা কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিলেন ভাষ্যকালে, সকল অবিবাহিতার প্রতিই ততটা কঠোর হইবেন বোধ হয় না। এবং সভাস্থ ইতর জন, সত্বরেই, তাঁহার কৃতকার্য্যে তাঁহার বক্তৃতার রসিকতা অপেক্ষা অধিকতর সরস মিষ্টান্ন উপভোগ করিবার সুযোগ পাইবে।"

সভামধ্যে উচ্চহাস্যের রোল এবং ঘন করতালির একটা নিনাদ উঠিল। কিশোরী আপনার ধৃষ্টতা উপলব্ধি করিয়া লজ্জিত হইয়া সে জন্য সভাপতি মহাশয়ের নিকট প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করিল, কিন্তু সভাপতি তাঁহার ভবিষ্যত আশা উপলক্ষে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিবাদ করিল।

কিশোরীর বিবাহ, অসম্ভব! অসম্ভব সে কথা!

টলে যদি হিমাচল সমুদ্র শুকায়, তথাপি কিশোরীর প্রতিজ্ঞা অচল!

উদয়তি যদি ভানু পশ্চিমে দিগ্বিভাগে, তথাপি নয়!

তা এই ত চাই—
হাতিকা দাঁত, পুরুষকা বাত!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কুটুম্ব সাক্ষাৎ এবং আত্মীয় বন্ধুর সমাগমে সন্ধ্যার কাকসমাকুল বটবৃক্ষের ন্যায় সে বাটী সমাচ্ছন্ন এবং সেইরূপ কাকলী পরিপূর্ণ!

নহবতের বাদ্যে কিশোরীর কাণ ঝালাপালা হইয়া গেল! আচ্ছা, এটাও কি বিবাহের অঙ্গ! বিবাহ ব্যাপারটাই যাহার নিকট অনাবশ্যক, তার পক্ষে এ সব উপসর্গ যে নিতান্তই বাহুল্য ঠেকিবে, তাহা সন্দেহ নাস্তি। কিন্তু কিশোরীর আপত্তিতে এ বিবাহে কি আসে যায়? সে না বর, না বরকর্ত্তা। এ তার জ্ঞাতি ভ্রাতার বিবাহ। কিশোরীর সেই বক্তৃতার পর দশ দিন যাইতে না যাইতে, একপ্রকার তাহারই বাটীতে, এ বিবাহ। সে দিন সভায় যাহারা প্রতিবাদ করিয়াছিল, তারা করিয়াছিল মুখের কথায়; কিন্তু এ প্রতিবাদ যে তার নিজের বাটীতে, এবং শুধু কথায় নহে, কার্য্যে। থাক্, ইহাতে কিশোরী তেমন ভগ্নোৎসাহ নহে; সে জানে, তাহার এ চেষ্টায় আজ না হোক্, দশদিন পরে হোক্,—সুফল ফলিবে; আর "গেয়ো যোগী ভিখ্ পায় না", এও ত জানা কথা!

কিশোরী এ বিবাহ-উৎসবে বিশেষভাবে যোগ না দিলেও নববধূর 'মুখ' না দেখাটা অন্যায় হইবে, কতকটা নিজে বুঝিয়া, কতকটা বা মায়ের অনুযোগে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া কেশোরী বৌ দেখিতে উপস্থিত হইল! উঃ মেয়ের কি ভীড়! যাহা হোক বৌদিদির কৃপায় কিশোরীকে নববধূর মুখ দর্শনে বেশী ঝঞ্ঝাট ভোগ করিতে হইল না। কিশোরী যেই নববধূর সম্মুখে নীত হইলেন, অমনি কোথা হইতে পরিচিত কণ্ঠে একজন বলিয়া উঠিলেন—"কনে-নাতি-বৌ, এবার কিন্তু 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' গোছ আল-গোছে প্রণাম কর্ত্তে হবে, কারণ উনি হচ্চেন তোমার আইবুড়—বট্ঠাকুর!" এ কথায় একটা সমবেত উচ্চ হাস্যের রোল উঠিল। কনে-বৌটিও অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া স্মিতমুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। তারপর বৌদিদি কনের মুখ তুলিয়া, মুখ খুলিয়া দেখাইলেন, কিশোরী এবার একটু গোলে পড়িল। আশীর্ব্বাদী দানদুর্ব্বা না হয় "আশ গোছে" মাথায় দেওয়া চলে, কিন্তু টাকা? কনেকে হাত পাতিতে বলিতে লজ্জা করিল, হাতে হাতেও দিতে সঙ্কোচ আসে—হাজার হোক ভাশুর মানুষ ত! তখন অগত্যা টাকা কয়েকটি কিশোরী বৌ দিদির হাতেই দিল, কিন্তু আবার সেই পূর্ব্ব পরিচিত কণ্ঠে রহস্যের স্বরে উচ্চারিত হইল—"মুখ দেখলে কনের, টাকা দিলে বৌদিদিকে—এক পাড়ায় ধান ভানে, ঢেঁকি পড়ে অন্য পাড়ায়, এ কি ব্যবস্থা? কনে-বৌ ছেলেমানুষ বলে, তাকে ফাঁকি দিয়ে বৌদিদির মন রাখছ বুঝি?"

"ভাল-দিদি দেখচি বড় জ্বালালে, কোথায় কে কি বলে তার ঠিকানা নাই!"

ভাল দিদির দিকে একটু বক্রভাবে চাহিয়া কিশোরী পাশ কাটাইতে চাহিতেছিল—কিন্তু তা কি হয়? বৌদিদি ধরিয়া বসিলেন, জল খেয়ে যেতে হবে। কিশোরী তাহাতে কতই দুর্ব্বার আপত্তি পেশ করিল,

বলা বাহুল্য তাহা পত্রপাঠ না-মঞ্জুর হইল। ভাল-দিদি আর ও কাছে আসিয়া বলিলেন "ন্যাতবৌ, কিশোরী কি জল খায় তাই তোমার কথায় স্বীকার হবে, ওকে 'জল দেখাও।' কিশোরী এবার আর নীরবে গালিটা হজম করিল না। বলিল—"ভাল দিদি, আজ যে কেবল মেঘের আড়াল হ'তে বাণ মারচেন, খুব লেজে খেলচেন যে।" ভালদিদিও বড় ভাল মানুষটি নন, তিনিও জবাব গাহিলেন—

"কিষ্কিন্ধ্যার বীরদের প্রতি মেঘের আড়াল হতেই বাণ মারার ব্যবস্থা। আর খেলার বয়স আমাদের নেই, তবে আজ তোমার লেজে পা দিয়েছি বোধ হচ্চে।" আজ ভাল-দিদির মুখের কাছে কিশোরী বড় দাঁড়াইতে পারিল না। অত লোকের, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের, সর্ব্বোপরি কনে-বৌর, সমক্ষে ভাল-দিদি এ ভাবে অপ্রতিভ করায় কিশোরী সত্যই বড় অপ্রস্তুত হইয়া গিয়াছে—তাই আজ সে আর বাক্-যুদ্ধে তেমন "প্রস্তুত" হইতে পারিতেছিল না।

ভাল-দিদিকে বিজয়ী বীরের মত সগর্ব্বে রণস্থল ত্যাগ করিতে উদ্যোগী দেখিয়া কিশোরী বলিল—"দিদি, অত তাড়াতাড়ি কেন? একটু বসুন না।"

"না ভাই, আর নয়, তোমাদের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে আর ত পেট ভরবে না।"

"কেন পেট ভরার ব্যবস্থা হয় এইখানে হবে।"

"পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙতে নাকি আমার খুব মজবুত। এখন একদিন নিজের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গ দেখি,"—

"ভাঙ্গতে পারি, কিন্তু কাঁটাল পাব কোথা?"

"কাঁটালের আবার ভাবনা? বল ত আজই জোগাড় করি।"

"আচ্ছা তবে জোগাড় করুন, আমি ততক্ষণ গোঁফে তেল দিতে থাকি।"

"তামাসা নয়, ভাই এখন এত সাধ্যসাধি কচ্চি, কাঁটাল খাচ্চ না, কিন্তু এর পরে ভুতিও পাবে না।"

"কথাটা যে উল্টে গেল, খাবার কথা যে আপনার, ভাল দিদি! আমার কেবল মাথা পাতার কথা।"

"আচ্ছা—তবে মাথা পেতেই থাক, আর মাথা নেড় না।"

"বেশী ভারি হয় তো কিন্তু ঝেড়ে ফেলতে হবে দিদি!"

"তা, বেশী ভারি হবে না, তোমার পদ্ম-মাদনের চেয়ে বেশ কম!"—এই বলিয়া ভাল দিদি আর দাঁড়াইলেন না। যাইবার সময় বৌদিদিকে অপাঙ্গের ইঙ্গিতে যেন কি বলিয়া গেলেন।

"ঠাকুর পো, আমি খাবার আনি—তুমি ওই ঘরে বস,"—বলিয়া বৌদিদি জলখাবারের উদ্যোগে চলিয়া গেলেন।—কিশোরী বৌ-দিদিকে লক্ষ্য করিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বৌদিদি তখন অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ছিলেন—সুতরাং তাঁর সহিত চোখোচোখি হইল না—কিশোরীর লক্ষ্যভ্রষ্ট দৃষ্টি পড়িল আর একজনের উপর। এ যে সম্পূর্ণ অপরিচিতা! কিশোরী ভাবিল—কে এ কিশোরী? কি সুন্দর এ চক্ষু দুটি!

আর একবার সে চক্ষু দুইটির চাক্ষুষ পরিচয় হইল। এরূপ ক্ষেত্রে যে রূপ সচরাচর ঘটে, তাই ঘটিল। দুটি

করিয়া চাহিতে গিয়া উভয়েই উভয়ের নিকট ধরা পড়িল। কিশোরীমোহন ব্যাধ নহেন, তবু তার দৃষ্টি-আঘাতে সে হরিণ-লোচনার আঁখি দুটি ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

হায়! হরিণীর ফাঁদ পাতা ভুবনে॥
ভীতা হরিণী পলাইতে যাইয়া আবার
কিশোরীমোহনের আঁখি ফাঁদে ধরা পড়িল!

(ক্রমশ)

অভাব।

পুষ্পবন ভরি' আছে বিচিত্র কুসুমে
কেবল নাহিক সেথা যে শুধু আমার
শুধু মাত্র মোর লাগি প্রথম উষার
উদয় আভাস মাত্র আধ স্বপ্ন ঘুমে
আধফুট জেগেছিল, হৃদয় খুলিয়া
বুক ভরা মধু তার নিঃশেষে আমায়
আদরে করায়ে পান নিঃশঙ্কে ঝরিয়া
পড়িছিল বৃন্তচ্যুত শেফালি'র প্রায়।
শোভা তার, মধু তার, সুরভি তাহার
গলিয়াছে দেহমনে, গিয়াছে মিলিয়া
ক্ষুদ্র পুষ্প জন্ম তার জীবনে আমার।
তাই ফুলে ফুলে আজি উঠিছে ফুটিয়া
তারি সেই মুখচ্ছবি বিচিত্র বরণে
প্রতি ফুলে তারি গন্ধ সুরভি এ বনে।

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা।

অতৃপ্তি।

যেও না যেও না সখা দুটি পায়ে ধরি,
রাখ এ মিনতি মোর অতিথি আমার
করেছিলে যে রাগিণী অন্তরটি তার
এখনো ত শুনি নাই, দাও শেষ করি
আরও সঙ্গীত তব। যে অরুণ রাগে
আঁধারের একপ্রান্তে উষার আভাস
এঁকেছিলে চিত্রকর, কুসুমে ও কাগে,
মসীমাখা তুলিকায় করিও না নাশ
ক্ষণিকের স্বপ্নচ্ছবি। বসন্ত আমার,
বুক ভরা যে বাতাসে মুকুলে মুকুলে
আচ্ছন্ন করেছ মোর শাখা উপশাখা
পুষ্পহীন শুষ্কপ্রায় তবে বাঁচ ফুলে
কবিত্বময়ীর প্রাণে আভাস সুধাস্পর্শ মাখা।
একটি বাসর নিশি দিও হে প্রাণেশ
তারপর নিত্যচির বৈধব্যের বেশ।

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা।

আমার জীবন ।

তৃতীয় খণ্ড ।

(সমালোচনা)

প্রথম দুই খণ্ডের সমালোচনার অবসরে যাহা বলিয়াছি, আমার তাহাই বলিতেছি "খণ্ড-গ্রন্থের সমালোচনা সম্ভবে না।" অথচ কিছু না বলিলেও চলে না, তাই বলিতেছি। প্রথম খণ্ডের কথাই আমরা বেশী করিয়া বলিয়াছিলাম, দ্বিতীয় খণ্ডের কথা আর কিছুই বলা হয় নাই; দ্বিতীয় খণ্ডে নবীন চন্দ্রের দাসত্ব-জীবনের, বা চাকরির কথাই বেশী; এই তৃতীয় খণ্ডেও তাই। দাসত্ব-জীবনের সমালোচনা চলে না; তবে নবীন-চন্দ্র নিজ দাসত্ব-জীবনের উপরে এমন একটি শিল্পীর কাজ ও পালিস্ করিয়াছেন যে, তাহাতে পাঠককে একটুতেই মোহিত করে। মনে হয়, গোলামি জিনিসটা ভাল নহে বটে, তবে গোলামিতে একটু সর্দ্দারি করিতে পারিলে মন্দ হয় না।

এই তৃতীয়ভাগ ছয় খণ্ডে বিভক্ত। দাস-সর্দ্দারের সিংহাসনের পরিচয়ে খণ্ড গুলির নামকরণ হইয়াছে। যথা,— শ্রীক্ষেত্র, শ্যামাহিপুর, বেহার-ভোমলপুর, নওয়াখালি। কেবল এক খণ্ডের নাম করা হইয়াছে গ্রাম—ক্ষত্রির যজ্ঞে। কবি তখন ছুটীতে বাড়ীতে গিয়াছিলেন; পিতৃশ্মশানে শিবস্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং এই ভাগকে দাসত্বের জীবন না বলিলেও চলে। কবির দাসত্ব-জীবনের কৃতিত্বের পরিচয়, গ্রন্থে ভূয়ো পরিমাণ থাকিলেও অন্য কথা নাই এমন নহে, সঙ্গে সঙ্গে ভাল মন্দ অনেক কথা আছে। ভাল গুলির একটু পরিচয় দিতেছি;—প্রথম দুই খণ্ডের সমালোচনায় বলিয়াছি—যাঁহারা আচারকে ধর্ম্মের অঙ্গ বলে, তাহাদের উপর নবীনের তীব্র কটাক্ষ সমানে দুই খণ্ডে আছে; এই তৃতীয় খণ্ডেও আছে।—তাই বলিয়া নবীনচন্দ্র নাস্তিক বা একেবারে অহিন্দু ছিলেন না। নবীনচন্দ্র আপনাকে প্রতিমা-উপাসক বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। শ্মশানে শিবপ্রতিষ্ঠা সংকল্পে নবীনচন্দ্র বলিতেছেন 'শিবলিঙ্গ আমার কাছে বড়ই ঘৃণিত বোধ হয়, আমি সে জন্য মূর্ত্তি-স্থাপন স্থির করিলাম।' মূর্ত্তি স্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত হইলে কবি আবার বলিতেছেন— "শিবমূর্ত্তিতে পিতৃদেবকেই আমি দেখিতে-ছিলাম, আর বালকের মত কাঁদিতেছিলাম। প্রতিমা-উপাসকদের এই আন্তরিকতা ও সার্থকতা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা কেমন করিয়া বুঝিবে?" নবীনচন্দ্র কেবল বীরাচারী নহেন, কুলাচারী। কিন্তু অনাচারী হইয়াও প্রতিমা-উপাসক। এইজন্য তীর্থমহিমার এবং বিগ্রহমহিমার কীর্ত্তনে, তিনি বিশিষ্ট ক্ষমতা ও সিদ্ধহস্ততা দেখাইতে পারিয়াছেন। কবি যখন যেখানে গিয়াছেন, কোথাও তীর্থ করিতে ছাড়েন নাই। পুরীতে গিয়া রথের

সমস্ত কর্ত্তৃত্বই পাইয়াছিলেন। কবি, শিক্ষা-বিভ্রাটের তাড়নায়, আপনাকে হিন্দু হইতে যেন একটু পৃথক্ ভাবিয়া লিখিয়াছেন, "হিন্দুদের বিশ্বাস জগন্নাথদেবের এ নবযৌবন যে প্রথম দর্শন করে, এবং তাঁহাকে এ সময় যে প্রথম আলিঙ্গন করে, সে সশরীরে স্বর্গে যায়। তাঁহারা (অর্থাৎ পাণ্ডারা) জোর করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করাইলেন। অকস্মাৎ আমার হৃদয়েও কি এক ভক্তির উচ্ছ্বাস উঠিল, যাহা জীবনে কখনও অনুভব করি নাই। সমস্ত জগৎ ও আমার সর্ব্বাঙ্গ এখন কি এক অমৃতে সিক্ত হইল। তাঁহাদের মত আমারও কপোল বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।"

কবি শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া পীড়িত হন, সেখানে এক ব্রাহ্মণ বাড়ী তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর আশ্রয় ছিল। পীড়িত নবীন-চন্দ্রকে ব্রাহ্মণের তিনটি যুবতী কন্যা, বিশেষ সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। কবি লিখিয়াছেন "ভূতলে রমণী-হৃদয়ই স্বর্গ। বুঝিলাম হৃদয়ের এই প্রেমপ্রবলতায় বৃন্দাবনবাসিনীরা শ্রীভগবানকে পাইয়াছিলেন, এবং ভারতের ধর্ম্মেতিহাসে এরূপ নিষ্কাম প্রেমের জন্যই তাঁহারা পূজিতা।"

কবি নিজ দাসত্বের জীবনের গৌরব করিতে করিতে এইরূপ অনেক সুন্দর কথাই ভাল কথা বলিয়াছিলেন। আর দাসত্ব-জীবনে ধিক্কারও যথেষ্ট দিয়াছেন। তবে মানুষ—বিশেষ নবীন বাবুর মত শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোক—যেটা লইয়া কাল কাটান, সেটার সমস্ত দোষ পরিষ্কাররূপে দেখিতে ক্রমেই অসমর্থ হইয়া উঠেন, তবে ধিক্কার মধ্যে মধ্যে ফুটিয়া উঠে বৈ কি।

আমরা মনে করিয়াছিলাম, নবীনচন্দ্রের কবিত্বের ক্রম বিকাশের পরিচয় এই তৃতীয় খণ্ডে পাইব। কিন্তু সে সকল প্রায় কিছুই নাই। কেবল—'ভূমিয়া জীবন,' এবং 'শ্মশানে শিবপ্রতিষ্ঠা'র যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ আছে এবং 'রঙ্গমতী'র একটু বাহ্য ইতিহাস আছে। তাহাতে কাহারও তৃপ্তি হইতে পারে না।

প্রাসঙ্গিক ভাল কথা গ্রন্থে বিস্তর আছে—মন্দ কথাও আছে। কবি অবাধ লেখনীতে লিখিতে গিয়া কোন কোন স্থলে আপনাকে বেয়াড়া বয়াটে বানাইয়াছেন। কেবল ইয়ারকি হইলে আমরা কথা কহিতাম না, কিন্তু এক আধ স্থলে নিতান্ত বালীকতা আছে। তৃতীয় ভাগের ৫০০ পৃষ্ঠার পর একটি গল্প আছে। হীরেন্দ্র বাবু সমস্ত গ্রন্থের প্রুফ্ দেখিয়াছেন, তিনি একজন সমীচিন ব্যক্তি; এই দুই এক পৃষ্ঠা বাদ দিলেই ভাল করিতেন।

কবি বলিয়া নহে, সমালোচক বলিয়া নহে, আমরা আজি কালি অনেকেই আক্ষেপ করি যে, বর্ত্তমান বঙ্গ-সমাজ হইতে আন্তরিকতা দিন দিন সরিয়া যাইতেছে। শিক্ষিতের প্রাণে যেন আর সে প্রাণ নাই। সকলের মনে যেন স্বার্থপরতাজনিত সঙ্কীর্ণতা ক্রমে গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতেছে। মায়া-মায়া যেন সংসার হইতে চলিয়া যাইতেছে। কেবল হিসাব ও নিকাশ—ধন ও ঋণ লইয়াই যেন সংসার। বঙ্গসমাজের এইরূপ পরিবর্ত্তনের জন্য দুঃখ, নবীনচন্দ্র শতবার করিয়াছেন। ভাগলপুরে মন্দার পর্ব্বত দর্শন করিয়া নবীন যখন ফিরিতেছেন, তখন পথে একজন ডেপুটি (Sub Divisional

Officer) তাঁহাকে লইকাইয়া লইয়া, নিজ শিবিরে, উত্তমরূপ অতিথিসৎকার করেন।

নবীন বাবু লিখিতেছেন,—"ডেপুটি বাবু তাহাতেও ক্ষান্ত হইলেন না। শত নিষেধ সত্ত্বেও তিনি গাড়ীতে উঠিলেন। বলিলেন 'সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্র। আর কবে ইহাকে পাইব। আমি তোমাদের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ থাকিব। কিছুদূর দিয়া নামিয়া আসিব।' তাহাই হইল। প্রায় দুই মাইল পথ আসিলে, আমরা জোর করিয়া তাঁহাকে নামাইয়া দিলাম, গাড়ী খুব বেগে চলিল। হায়! এই শিষ্টাচার এই অতিথি-সৎকার এবং প্রাণ-ভরা আত্মীয়তা ও আমোদ ইতিমধ্যেই এই সার্ভিসের স্বপ্ন হইয়াছে। বর্ত্তমান বঙ্গ-সমাজ হইতেও একপ্রকার তিরোহিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

আর একটি কথা বলিয়াই এবারকার এই সমালোচনা শেষ করিব। অগ্রে আমার কথা একটু বলি।—অতি বালককাল হইতে পিতৃদেব আমাকে ভাব-প্রবণ করিয়া তুলেন। একটি গল্প বেশ আরম্ভ করিয়া, একটি ভাল লোককে এমনই বিপন্ন করিয়া তুলিতেন যে, আমি না কাঁদিয়া থাকিতে পারিতাম না। প্রত্যহই সেইরূপ হইত, প্রত্যহই বুঝিতাম গল্প বাবার বানান মিথ্যা কাহিনী; তবু কিন্তু প্রত্যহই আমাকে কাঁদিতে হইবে। যৌবনের পড়াশুনাও সেই দিকে, সেই করুণরসের দিকে, প্রবাহিত হইল। পল্লীর সমক্ষে সমগ্র লীয়র অনুবাদ করিয়া পাঠ করিয়াছি। লীয়রের সঙ্গে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়াছি! বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রাণ ভরিয়া সেবা করিতে লাগিলাম; এত কান্না বুঝি আর কোথাও নাই। সংযোগে বিয়োগে সমান কান্না। মিল্টনে কুলায় নাই, ও ভাল লাগিল না; মাইকেলে আছে, ভাল লাগিল। ক্রমে কান্নাই আমার সাহিত্যের কষ্টিপাথর হইয়াছে। সেই কষ্টি পাথরে কষিয়া নবীনের নিজ জীবনচরিত আমি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বলিতেছি। আছে বৈ কি ইহাতে জাতিবিদ্রোহের কটুতা—আছে বৈ কি ইহাতে অল্পসল্প কুরুচির বা ব্যলীকতার দুর্গন্ধ—কিন্তু সমগ্র গ্রন্থ ক্রন্দনের উৎস। নবীনের অপূর্ব্ব লিখন-কৌশলে, আমরা "জীবন্ত দুঃখ সম্মুখে মূর্ত্তিমান দেখি, আমাদের হৃদয় বিগলিত হয়, মনের ময়লামাটী ধুইয়া যায়, দুঃখভরে দুঃখিতের জন্য সমবেদনা হয়, সমবেদনায় আমরা নব-দেবত্ব লাভ করি।" নবীনের কাব্যে যে জিনিষটার ছায়া দেখিয়াছিলাম, এই আত্মচরিতে তাহা জীবন্ত দেখিতে পাইলাম।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরিকার।

গ্রন্থসমালোচনা।

সাধনতত্ত্ব বিচার।—বই খানি পড়িয়া আনন্দলাভ করিলাম। আধুনিক লেখকদের রচিত বৈষ্ণবধর্ম্মের ব্যাখ্যা গ্রন্থ মাঝে মাঝে পাঠ করিয়াছি, কিন্তু এই বইটি যেরূপ সরল, প্রাঞ্জল ও বাহুল্যবর্জ্জিত হইয়াছে এরূপ আমি দেখি নাই। আন্তরিক ভক্তির আলোকে বৈষ্ণবধর্ম্মকে গ্রন্থকার যেমন করিয়া দেখিয়াছেন তাহা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে পারিয়াছেন।

এই গ্রন্থে ভক্তিতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্বের আলোচনা আছে তাহাতে সকলেরই কিছু না কিছু উপকার হইবে কিন্তু যে অংশ সাম্প্রদায়িক তাহা অবিসম্বাদে গ্রহণ করা চলে না এবং তাহাতে ধর্ম্মের উচ্চ ভাবকে খর্ব্ব ও তাহার গভীর রসকে বিকৃত করিয়া দেয় এইরূপ আমার বিশ্বাস। ভগবানের লীলা সর্ব্বত্রই চলিতেছে কোন এক বিশেষ স্থানে, বিশেষ কালে ও বিশেষরূপে তাহা ঘটিয়াছে বলিলে তাঁহার অনন্ত দেশ ও অনন্ত কালের লীলাকে একপ্রকার অস্বীকার করা হয়। ভগবান কোনো বিশেষ ইতিহাসের বিশেষ পত্রের মধ্যে প্রচ্ছন্ন নাই, তিনি সকল ইতিহাসের মূলে এবং তাঁহার সকল অধ্যায়ের সকল পাতাতে তাঁহার অনাদ্যন্ত আনন্দের কাহিনী প্রকাশিত হইয়া চলিতেছে। পৃথিবীর কোনো বিশেষ খণ্ডে কোনো বিশেষ জাতির মধ্যে বিশেষরূপে স্বতন্ত্র আত্মপ্রকাশ করিয়া তিনি অন্য সকল জাতিকে বঞ্চিত করেন নাই—এ প্রকার সঙ্কোচ তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। অবশ্য লীলা পদার্থের মধ্যে বিশেষত্ব আছেই, কিন্তু সে বিশেষত্ব প্রত্যেক জীবের মধ্যেই। সে হিসাবে প্রত্যেক জীবেই তিনি প্রভুরূপে প্রেমিকরূপে আত্মার অন্তরতমরূপে বিরাজমান। তিনি যেখানেই আছেন সেখানেই তিনি অনন্ত সম্পূর্ণ, তাঁহার অংশ নাই, আমরা যেমন নিজের দৃষ্টিশক্তির সীমাবশতঃ আকাশকে খণ্ড করিয়া দেখি তেমনি তাঁহাকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখি—কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ণাবতার অংশাবতার এ সব কথা খাটেই না—তিনি সকল অংশেই পূর্ণ—আমার উপলব্ধি যতই পূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকিবে আমার মধ্যে তাঁহার আনন্দও ততই পূর্ণ করিয়া ভোগ করিব—তাহাতে আমারই ভোগ বাড়িবে, কিন্তু তাঁহার ভোগ সম্পূর্ণ হইয়া আছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিকাতা ২৭ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট যন্ত্রে কালীপ্রসন্ন ঘোষের দ্বারা মুদ্রিত।

কৃষ্ণের চন্দ্রকান্তি !

রূপ এবং সৌন্দর্য্য ও যৌবনের নবীনতা সদা স্থায়ী রাখিতে চাহেন ? এই সদলঙ্কৃত লেপন চর্চ্চোপযোগমাত্রই অর্থাৎ দাদ, চুলকানি, ঘামাচি, ছুলী, মেচেতা, কদাকার চিহ্ন, ব্রণ প্রভৃতি শীঘ্র আরোগ্য করিয়া চর্ম্মের কোমলতা, চাকচিক্য ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে রমণীগণের আদরের সামগ্রী। মূল্য ৸০ আনা, ডাঃ মাঃ ।০ আনা।

আফিম পরিত্যাগের ঔষধ।

যত অধিকদিনের আফিম সেবন কারী হউন না কেন, বিনা কষ্টে আফিমরূপ কালকূট বিষ পরিত্যাগ করিয়া শারীরিক গ্লানিশূন্য হইয়া বেশ স্ফূর্ত্তি, সচ্ছন্দতা এবং সতেজতা ও কান্তিপুষ্টি লাভ করিতে পারেন, অথচ কোন পীড়া হইবার সম্ভাবনা নাই। পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

কে, সি, বিশারদ,
৬৭ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শ্রাবণ] [৪র্থ সংখ্যা

বঙ্গদর্শন।

(নব পর্য্যায়)

একাদশ বর্ষ।

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা।
১। গান্ধারী	১৯৩	৭। ভ্রান্তি	২৪৬
২। মুখর-মুদ্রা ...	২১৫	৮। রিজিয়া	২৫০
৩। গবাদি পশু সম্বন্ধে কয়েকটি কথা	২১৯	৯। মৌনপূজা কবিতা ...	২৫২
৪। পয়গম্বর	২২৭	১০। বঙ্কিম-চরিত	২৫২ ক
৫। মানবের জন্মকথা	২৩৮	১১। মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র	২৫২ খ
৬। বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায়	২৪১	১২। ফিডো	২৫২ ক

এস্ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩১৮।

সাধনতত্ত্ববিচার।

শ্রীরামচরণ বসু বিরচিত। বৈষ্ণব ধর্ম্মের উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বাদি অতি সরল ও সহজ ভাষায় লিখিত। মূল্য ৸০ বার আনা।

মজুমদার লাইব্রেরী, ৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

মজুমদার লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য পুস্তক।

২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সিরাজদ্দৌলা

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয়, বি-এল্ প্রণীত। ভাষার মাধুর্য্যে, বর্ণনার চমৎকারিত্বে, যুক্তির সারবত্তায় এবং স্বাধীন গবেষণায় অক্ষয় বাবু বঙ্গ-সাহিত্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ১৲ দুই টাকা। অক্ষয় বাবুর "মীরকাসিম" ১৷৹

শ্রীশ্রীচৈতন্য-লীলামৃত

৺অমৃতলাল গুপ্ত, বি-এল্ সম্পাদিত। চৈতন্যদেবের এমন বিশদ ও প্রকৃত জীবন-চরিত ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। শিক্ষিত সমাজ এই গ্রন্থকে চৈতন্যচরিত সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া থাকেন। বিবিধ জ্ঞাতব্য ধর্ম্মতত্ত্বে পূর্ণ। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য ৩৲ স্থলে ২৲ অমৃতলাল বাবুর "মেঘদূত" ।৹ লীলাতত্ত্ব ৵১০

শৈশবসঙ্গী

শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কবিবর রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আজ কাল বালকদিগের পড়ি পুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইয়াছে। ... শৈশবসঙ্গীর দ্বারা বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থের অভাব কতকটা দূরও হইবে আশা করি।" মূল্য ৸৹

দিনচর্য্যা।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রণীত। প্রত্যেক হিন্দুজীবনকে সুন্দর, মহৎ ও সার্থক করিবার জন্য ও আদর্শের পথে পরিচালিত করিবার জন্য অত্যাবশ্যকীয় গ্রন্থ। মূল্য ।৹

আশ্রম-চতুষ্টয়

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রণীত। জীবনের লক্ষ্য কি ও কোন্ আদর্শে তাহাকে গঠিত করা উচিত, এ গ্রন্থে তাহা যথাসম্ভব আলোচিত হইয়াছে। মূল্য ।৹ আট আনা।

পঞ্চপ্রদীপ

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মজুমদার, বি-এ প্রণীত। নূতন গল্পের বই। আধিকন্তু কাউন্ট টলষ্টয়ের গল্পের অনুকরণে আমাদের দেশের মত করিয়া গল্পগুলি লিখিত। বালক বালিকা ও স্ত্রীলোকদিগের পাঠ্য। পুরস্কারের যোগ্য। সুন্দর বাঁধাই, মূল্য ৷৵৹

সেক্ষপিয়র

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় অনূদিত। প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহাতে "মিরান্দা," "রোমিও-জুলিয়েট," "ভিনিস দেশের বাণিক" "বাজা লিয়র" এই কয়েকটি গল্প আছে। ১২ খানি সুন্দর হাফটোন ছবিতে সুশোভিত, সুন্দর বাঁধাই। মূল্য ৸৹

নববিধান সমাজের

ইংরেজের বঙ্গানুবাদ পূর্ব্ববিভাগ ৩৲ উত্তর বিভাগ ২৲ কোরাণশরিফের বঙ্গানুবাদ ৪৲ হাফেজের বঙ্গানুবাদ ১৲ তাপসমালা (৬ খণ্ড) ২৲ জীবনের ১৲ মহাপুরুষ চরিত ১৲ যোগেন্দ্রের জীবনী ৩৲ ব্রহ্মসঙ্গীত ২৲ আচার্য্য কেশবচন্দ্র (বিস্তৃত জীবন চরিত) ১১৲ শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম ১৷৹ গীতাসংহার ভাষা ৫৲ বেদান্ত দর্শন ৩৲ বিবিধ ধর্ম্মসঙ্গীত ২৲ নামপ্রকাশ ১৷৹ শাক্যমুনিচরিত ১৷৹ উপাধ্যায়ের বক্তৃতা ১৲ তত্ত্বরত্নমালা ৷৵৹ চারিজন ধর্ম্মনেতা ৷৹ এসায়হোম ও হোমেজ ১৲ ধর্ম্মসাধন নীতি ।৵৹ মহাপুরুষ ও তৎপ্রচারিত সনাতন ধর্ম্ম ৸৹

সরল বর্ণজ্ঞান

ডাক্তার ব্রজনাথ সাহা প্রণীত। কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী অনুসারে শিশুদিগের বাঙ্গলা অক্ষর পরিচয়ের সচিত্র পুস্তক। সুন্দর ছবি। মূল্য ৵৹

পুরাতন বঙ্গদর্শন

১২০৯ হইতে ১৩১৬ সাল পর্য্যন্ত, প্রতি বর্ষের মূল্য ডাক মাশুল সমেত দুই টাকা।

মজুমদার লাইব্রেরী—২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

বঙ্গদর্শন।

গান্ধারী।

সিন্ধুনদের পশ্চিমতট হইতে যে ভূমি-ভাগ, ক্রমোচ্চ হইয়া, উত্তর পশ্চিমে শ্বেত গিরিতে (সফেদকো পর্ব্বতে) পর্য্যবসিত হইয়াছে, প্রাচীনকালে তাহা গান্ধার নামে অভিহিত হইত। এই গান্ধার শব্দ হইতেই এই প্রদেশের কিয়দংশ এক্ষণে কান্দাহার নামে খ্যাত হইয়াছে। আমরা যে সময়কার কথা বলিতেছি, তখন রাজা সুবল এই গান্ধার রাজ্যের অধিপতি ছিলেন।

গান্ধার প্রকৃতির বিচিত্র শোভায় পরিপূর্ণ; কোথাও যোজন বিস্তৃত সমতল ভূমি, কোথাও দুর্গম গিরিসঙ্কট, কোথাও অনিবিড় বনরাজি, কোথাও মেঘচুম্বিতশির শৈলমালা ইহার শোভা সম্বর্দ্ধন করে। শীতাগমে ইহার গিরিশৃঙ্গসমূহ, তুষারাবৃত হইয়া, রজতাচলের ন্যায় শোভা পায়; বসন্তাগমে তাহা, নানাজাতীয় শৈবালে ও লতাগুল্মে ভূষিত হইয়া, শ্যাম শোভায় নয়ন স্নিগ্ধ করে। গ্রীষ্মাগমে সমস্ত প্রদেশ দাড়িম্ব পুষ্পের আরক্ত রাগে রঞ্জিত হয় এবং বর্ষা শেষে গৃহস্থের গৃহ, উদ্যান, প্রান্তর, বন, দ্রাক্ষালতার গুচ্ছ গুচ্ছ ফলে পূর্ণ হইয়া যায়। গান্ধারের ক্ষেত্রে অমৃতোপম শস্য, গান্ধারের উদ্যানে সুরসাল ফল, গান্ধারের নদীর বালুকায় স্বর্ণরেণু; দেখিলে মনে হয়, কমলা এখানে আপনার বিহারস্থান স্থাপন করিয়াছেন।

রাজা সুবলের একটী পুত্র ও একটী কন্যা ছিল পুত্রের নাম ছিল শকুনি, কন্যার নাম গান্ধারী। এত নাম থাকিতে রাজপুত্রের নাম কেন যে শকুনি হইয়াছিল, তাহা বলা কঠিন। বোধ হয় আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে শকুনি পক্ষীর সহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য ছিল বলিয়াই লোকে তাঁহাকে শকুনি বলিত। আকৃতিতে যাহাই হউক, তাঁহার প্রকৃতিতে সত্যই শকুনি-লক্ষণ লক্ষিত হইত। কারণ শকুনির ন্যায় তাঁহারও দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ ছিল এবং শকুনি যেমন দৃষ্টিপথবর্ত্তী বস্তুর মধ্যে মৃতদেহ ভিন্ন অপর কিছুতে প্রীতি অনুভব করে না, রাজপুত্রও তেমনই সংসারের বহু বিষয়ের মধ্যে ক্রূরনীতি ভিন্ন অপর কিছুতে তৃপ্তি বোধ করিতেন না। শৈশব হইতেই তাঁহার কূট বুদ্ধি প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু রাজার একমাত্র পুত্র বলিয়া কেহ তাঁহাকে শাসন করিতে পারিতেন না। তোষামোদ-

কারিগণ বরং বলিত, "রাজপুত্রের যেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি তাহাতে উত্তরকালে তিনি একজন অসাধারণ রাজনীতিবিদ্ হইবেন।"

রাজকুমারী আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে ভ্রাতা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্না ছিলেন। গান্ধারবাসিনীগণ অনুপম রূপলাবণ্যের জন্য প্রসিদ্ধা, কিন্তু গান্ধারীদেবীর নিকট তাহারাও লজ্জা পাইত; তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত কোন দেবকন্যা ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন। বাহ্যসৌন্দর্য্যের অপেক্ষা তাঁহার মানসিক সৌন্দর্য্য আরও প্রশংসনীয় ছিল। তিনি গুরুজনে ভক্তিমতী, দেবদ্বিজে শ্রদ্ধাবতী এবং আশ্রিতজনে দয়াবতী ছিলেন। তাঁহার সুশীলতা তাঁহাকে পৌরজনদিগের পরম আদরের পাত্রী করিয়াছিল। কিন্তু সকল গুণের অপেক্ষা তাঁহার প্রধান গুণ এই ছিল যে, মাতাপিতার আদেশ তিনি দেবাদেশ হইতে বিভিন্ন মনে করিতেন না।

রাজকুমার ও রাজকুমারী উভয়ে ক্রমে যৌবন সীমায় উপনীত হইলেন। তখন রাজা সুবল, পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজকুমারীর রূপগুণের কথা শুনিয়া দেশদেশান্তর হইতে বিবাহার্থী রাজগণ গান্ধাররাজ্যে দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। একেই ত রাজকন্যার অনুপম রূপ, তাহার উপর মহাদেবের আরাধনার ফলে তিনি বহু পুত্রবতী হইবেন এই বর লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং বংশপ্রসারণাভিলাষী বহু রাজা ও রাজপুত্রই তাঁহার পাণিপ্রার্থী হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের প্রেরিত দূতগণ প্রতিনিয়তই রাজধানীতে গমনাগমন করিত। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ইহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া রাজা সুবল সম্বন্ধ স্থির করিতে পারেন নাই।

এইরূপ কিছুদিন গত হইলে একদিন সংবাদ আসিল যে, হস্তিনানগর হইতে কুরুকুলপ্রধান ভীষ্মের প্রেরিত দূত রাজকুমারীর বিবাহের প্রস্তাব লইয়া আগমন করিয়াছে। রাজা দূতের সম্বর্দ্ধনার্থ আদেশ দিয়া যুবরাজ শকুনি ও প্রধান অমাত্যের সহিত মন্ত্রণাকক্ষে প্রবেশ করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই দূত ও তাহার অনুযাত্রিগণ রাজসমীপে উপস্থিত হইল। বহুসংখ্যক ভারবাহী বহুমূল্য উপহার দ্রব্য বহন করিয়া দূতের সঙ্গে সঙ্গে আগমন করিয়াছিল। কেহ মণিমুক্তা খচিত অলঙ্কার, কেহ স্বর্ণসূত্রনির্ম্মিত বসন, কেহ কর্পূর চন্দন প্রভৃতি দ্রব্য, কেহ বা রাজব্যবহারযোগ্য বহুমূল্য অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল। নানাবিধ উপাদেয় ভোজ্য বস্তুরও অভাব ছিল না। দূত সেই সকল দ্রব্য সভাস্থলে রাখিয়া রাজাকে অভিবাদন পূর্ব্বক বিনীত বচনে কহিল, "মহারাজ! কুরুকুলপুঙ্গব ভীষ্ম আপনাকে তাঁহার অভিবাদন জানাইয়া আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তিনি শুনিয়াছেন যে আপনার একটী বিবাহযোগ্যা কন্যা আছেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাজকুমার ধৃতরাষ্ট্রের জন্য এই কন্যাটীকে প্রার্থনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এই সম্বন্ধ হইতে উভয় রাজবংশের কুলক্রমাগত সম্প্রীতি আরও দৃঢ়ীভূতা হইবে এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি।"

রাজা বলিলেন, "দূত! আমি তোমার বচনে পরম প্রীতিলাভ করিলাম। কুরু-কুলের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ নিঃসংশয় প্রার্থনীয়; কিন্তু সমস্ত বিষয় বিবেচনা না করিয়া এরূপ স্থলে সহসা কোন উত্তর দেওয়া যায় না। তোমরা বহুদূর হইতে আগমনে শ্রান্ত হইয়াছ, অদ্য বিশ্রাম কর। আগামী কল্য আমি তোমার প্রস্তাবের যথোচিত উত্তর প্রদান করিব।"

দূত অভিবাদন পূর্ব্বক সঙ্গিগণের সহিত বিদায় গ্রহণ করিল। রাজা তখন বৃদ্ধ সচিব সানুমানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"মন্ত্রিন্, এ সম্বন্ধে আপনার মত কি?"

মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ! আমার পক্ষে এ বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করা সঙ্গত বোধ হয় না, মহারাজই এরূপ স্থলে উপযুক্ত বিচারকর্ত্তা। রাজ্ঞীমাতার ও যুবরাজের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, মহারাজই স্থির করিবেন।"

শকুনি। যে সকল বিষয়ে রাজনীতির সম্বন্ধ আছে, এবং যাহার উপর হিতাহিত নির্ভর করে, অন্তঃপুরে তাহার আলোচনা সঙ্গত নয়। মন্ত্রণাকক্ষেই তাহার মীমাংসা কর্ত্তব্য।

মন্ত্রী। ইহার সহিত রাজনীতির কি সম্বন্ধ আছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।

শকুনি। পারিবেন কেন? যদি আপনার সে শক্তি থাকিত, তবে গান্ধার-রাজ্যের অবস্থা অন্যরূপ হইত।

মন্ত্রী যুবরাজ আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, জরা আমার ইন্দ্রিয় শিথিল করিয়াছে, সুতরাং আমার ত্রুটী মার্জ্জনীয়। রাজ-কুমারীর এই বিবাহের প্রস্তাবের সহিত কি রাজনৈতিক সম্বন্ধ আছে, তাহা আপনি বলুন।

শকুনি। সে কথা পরে বলিব। মাতা ঠাকুরাণীর ও আমার যাহা অভিপ্রায় মহারাজ তাহা অবশ্যই জানিতে পারিবেন। এক্ষণে আপনার অভিপ্রায় কি তাহা বলুন।

রাজাও বলিলেন, "মন্ত্রিন্, আপনি কুণ্ঠিত হইবেন না। আপনি পুরুষানুক্রমে আমার হিতৈষী, যাহা আপনার মনে হইতেছে, নির্ভয়ে বলুন।"

মন্ত্রী। মহারাজ আমি কি বলিব? কুরুবংশের সহিত সম্বন্ধ অবশ্যই প্রার্থনীয়, কিন্তু রাজকুমার ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ। তাঁহার সহিত লক্ষ্মীপ্রতিমা রাজকুমারীর বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য কি না, আপনি বিবেচনা করুন্।

রাজা। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ!

মন্ত্রী। হাঁ মহারাজ! জন্মান্ধ।

রাজা। তবে এ বিবাহ কিরূপে হইবে? শকুনি, তুমি কি বল?

শকুনি। মহারাজ! আমার মত পরে বলিব। তাহার পূর্ব্বে আমি মন্ত্রী মহাশয়কে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। ভাল মন্ত্রী মহাশয়! গত কুম্ভ-যোগে আপনি গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে স্নান করিতে গিয়াছিলেন না?

মন্ত্রী। হাঁ যুবরাজ!

শকুনি তখন কতগুলি রাজপুরু

সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া আপনার স্মরণ হয় ?

মন্ত্রী। সহস্রাধিক।

শকুনি। ইহাদিগের মধ্যে কেহ রূপে রাজকুমার ধৃতরাষ্ট্রের মত সমকক্ষ ছিলেন কি ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা না। রূপে তিনি কার্ত্তিকের তুল্য।

শকুনি। তাঁহার বাহুতে কিরূপ বল ?

মন্ত্রী। মত্ত হস্তীও তাহার নিকট পরাজিত হয়। তাঁহার বল সম্বন্ধে আমি যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি বলিতেছি। পূর্ব্ব দিন প্রত্যূষে প্রাগ্‌জ্যোতিষপতির এক মহাকায় হস্তী ক্ষিপ্ত হইয়া ও চালককে নিহত করিয়া গজশালাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল। তখন উপস্থিত জনতার মধ্যে অতি মহান্ কোলাহল উত্থিত হইল। বলবান দুর্ব্বলকে পদদলিত করিয়া, গুরুভার পীড়িতকে ধরাতলে নিক্ষেপ করিয়া এবং পুরুষ স্ত্রীগণকে পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ ভয়ে ধাবিত হইল। এ দিকে ক্ষিপ্ত হস্তী অসংখ্য ব্যক্তিকে পদমর্দ্দিত করিয়া এবং তীর্থবাসীদিগের কুটীর শুণ্ডাঘাতে ভগ্ন করিয়া ক্রমশ অগ্রসর হইতে লাগিল। রাজকুমার ধৃতরাষ্ট্র তৎকালে শিবির মধ্যে ছিলেন, তিনি এই সংবাদ শুনিবা মাত্র বহির্দ্দেশে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার পরিচারকগণ নিবারণ করিলেও তিনি তাহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। এ দিকে প্রমত্ত হস্তী তাঁহাকে পথ মধ্যে দেখিতে পাইয়া গতিশীল গিরিশৃঙ্গের ন্যায় সেই দিকে শুণ্ডোত্তোলন পূর্ব্বক ধাবিত হইল। "রাজকুমার নিহত হইলেন" "রাজকুমার নিহত হইলেন" এই বাক্য উচ্চারিত হইতে না হইতেই হস্তী আসিয়া তাঁহার উপর পড়িল। রাজকুমার বারণের কণ্ঠস্থিত ঘণ্টার শব্দে তাহার আগমন বুঝিতে পারিয়া প্রস্তুত হইয়াছিলেন। হস্তী তাঁহাকে শুণ্ডে বেষ্টন করিবার পূর্ব্বে তিনি আপনার করস্থিত বিশাল লৌহদণ্ড দ্বারা এমন বলে প্রহার করিলেন যে, গজরাজ জানুতে দারুণ আঘাত পাইয়া তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল। তীর্থাগত সাধুসন্ন্যাসিগণ আসিয়া রাজকুমারকে মহানন্দে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। মহারাজ আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে রাজকুমারের তুল্য বলশালী ব্যক্তি পৃথিবীতে দুর্লভ বলিয়া আমার বিবেচনা হয়।

শকুনি। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান কিরূপ ?

মন্ত্রী। বুঝিয়াছি, বেদ-বেদাঙ্গ সমস্তই তাঁহার কণ্ঠস্থ।

শকুনি। তাঁহার বংশগৌরব সম্বন্ধে কিছু জানেন কি ?

মন্ত্রী। চন্দ্রবংশের গৌরব সম্বন্ধে পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। যযাতি, পুরু, দুষ্মন্ত প্রভৃতি রাজর্ষিগণ এই বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

শকুনি। মন্ত্রিবর! তবে তাঁহার দোষ কি ?

মন্ত্রী। তিনি জন্মান্ধ।

শকুনি। "শাস্ত্রই জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের চক্ষু" এই মহাবাক্য তবে আপনার বিবেচনায় কিছু নয় ?

মন্ত্রী। যুবরাজ, আমার অল্প বুদ্ধিতে যাহা উচিত বোধ হইয়াছে আমি তাহাই বলিয়াছি, এখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ের ভার আপনাদিগের উপর।

রাজা। হায়! হায়! এতদিন পরে কুলে শীলে যদি বা একটী সুপাত্র জুটিল, তাহাও দেখিতেছি বিকলাঙ্গ। শকুনি, আমি কেমন করিয়া আমার সেই সোনার পুত্তলিকে অন্ধ বরের হস্তে প্রদান করিব?

শকুনি। মহারাজ! রাজধর্ম্ম অতি কঠোর! তাহাতে মায়ামমতার অপেক্ষা ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য চিত্তের দৃঢ়তারই অধিক প্রয়োজন। মন্ত্রীমহাশয় আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, এ বিবাহের সহিত রাজনীতির সম্বন্ধ কি? আমি বুঝাইয়া দিতেছি। আমাদিগের এই গান্ধার রাজ্যের প্রতি অনেকেরই লোলুপ দৃষ্টি একদিকে শক, যবন, বাহ্লিক প্রভৃতি অসভ্য জাতি ইহার শস্যশালিনী উপত্যকা লুণ্ঠন করিতে প্রয়াসী, অপর দিকে পঞ্চনদ-বাসী রাজাগণ আমিষলোভী মার্জ্জারের ন্যায় এ দিকে চাহিয়া আছেন। এ অবস্থায় কোন প্রবল রাজবংশের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐশ্বর্য্যে এবং পরাক্রমে কুরুকুল ভারতভূমিতে অদ্বিতীয়, তাহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে পারিলে কি আর্য্য কি অনার্য্য কোন শত্রুই আমাদিগের অনিষ্ট করিতে সাহস করিবে না। রাজ-কুমারীকে ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বিবাহ দিলে আমরা ভুবনবিজয়ী বীর ভীষ্মকে স্বপক্ষে লাভ করিব, ইহা বড় সামান্য কথা নয় মহারাজ! আপনার রাজ্যের কল্যাণের জন্য আপনি সম্মতি দান করুন। আপনার অবিদিত নাই যে, রাজধর্ম্ম রক্ষার জন্য অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্র ধর্ম্মপত্নীকেও নির্ব্বাসিতা করিয়াছিলেন।

রাজা। শকুনি, তোমার কথা সত্য! কিন্তু রাজমহিষী ত রাজধর্ম্ম বুঝেন না, তিনি কি বলিবেন? আর পিতৃগতপ্রাণা গান্ধারী বা কি ভাবিবে?

শকুনি। মহারাজ আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিবে কে? মাতা ঠাকুরাণী জীবনে কখনও আপনার আজ্ঞার প্রতিকূলাচরণ করেন নাই। আর গান্ধারী, তাহার নিকট দৈববাণীর অপেক্ষা ত আপনার কথার অধিক আদর।

রাজা। সত্য; কিন্তু বল দেখি, চক্ষুহীন বরে গান্ধারীর ন্যায় কন্যা সম্প্রদান করা কি কর্ত্তব্য?

শকুনি। মহারাজ! 'চক্ষুহীন,' 'চক্ষুহীন'—সকলেরই মুখে সেই এক কথা। চক্ষু ত মানুষের এক প্রধান শত্রু; চক্ষুই ত রূপ লালসা উৎপাদন করে। এই রূপে মুগ্ধ হইয়াই ত বহু রাজপুত্র পতিগতপ্রাণা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করেন। ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বিবাহ হইলে রাজকুমারীর যে সপত্নীর আশঙ্কা থাকিবে না, ইহা আপনারা কেহই চিন্তা করিতেছেন না। আমি ভগ্নী গান্ধারীর প্রকৃতি জানি; পতি অন্ধ হউক, আর পঙ্গু হউক, দেবতা জ্ঞানে সে তাঁহার সেবা করিবে; এবং তাহাতে নিজেও সুখী হইবে, স্বামীকেও সুখী করিবে

সুবল। বৎস শকুনি! তুমি অতি দূরদর্শী, নারায়ণ তোমায় দীর্ঘজীবী করুন। যখন তুমি বলিতেছ যে এই সম্বন্ধ হইতে রাজ্যের কুশল হইবে এবং গান্ধারী অসুখী হইবে না, তখন আমার আর অমত নাই। আমি অন্তঃপুরে মহিষীকে এই সংবাদ দিতে চলিলাম, তুমি মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া উপযুক্ত প্রত্যুপহারের আয়োজন কর, আমি কলাই হস্তিনায় দূত প্রেরণ করিব।"

এই সম্বন্ধই স্থির হইল

রাজা এই বলিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশের পূর্ব্বেই রাজকুমারীর বিবাহের সংবাদ তথায় প্রচারিত হইয়াছিল এবং তাহা লইয়া রাজ-কুটুম্বিনীদিগের মধ্যে মহা আন্দোলন চলিতেছিল কেহ বলিতেছিলেন, "রাজা এ কি করিলেন, এমন সোনার প্রতিমা মেয়েটীকে বেছে বেছে একটা কাণার হাতে দিলেন" কেহ বলিলেন "ইহা ত জানাই ছিল, যখন এত বর ফিরে ফিরে গেল, কিছুতেই রাজা রাণীর মনোমত হল না, তখন শেষে ত এই রকম হবেই।" আর একজন বলিলেন, "যা হোক বংশটা ভাল"! অপর একজন বলিলেন, "ভাই বা কেমন করে বলি? বাপ, যারা যাবার অনেক পরে ত এই ছেলে হয়েছিল। যা হোক ভাই! আমাদের অত কথায় কায কি? যাদের মেয়ে তারা যদি জলে ভাসিয়ে দেয়, আমরা কি কর্ব্বো?"

ক্রমে কথাটা কন্যান্তঃপুরে, যেখানে গান্ধারী দেবী অবস্থান করিতেন, সেখানে প্রবেশ করিল। তাঁহার এক প্রিয়সখী অতিম্লান মুখে আসিয়া তাঁহার নিকট বলিল;

"রাজকুমারি! একটা কথা শুনে অবধি বড়ই মনে কষ্ট হয়েছে, তাই তোমায় বলতে এসেছি!"

"কি সখি? তোমায় যেন বড় বিমর্ষ দেখ্‌চি! কি শুনে এসেছ, বল।"

সখী। শুনে এসেছি তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়েছে।

গান্ধারী দেবী হাসিয়া বলিলেন, "তাতেই ত! সে জন্য তুমি বিমর্ষ কেন? তোমার কি ইচ্ছে যে চিরকাল আমি আইবুড় হয়ে তোমাদের কাছে থাকবো? কোথায় সম্বন্ধ হয়েছে?"

সখী। হস্তিনাপুরের রাজকুমার ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে।

গান্ধারী দেবীর মুখ ঈষৎ হর্ষ-প্রফুল্ল হইল। তিনি সহাস্য বদনে বলিলেন, "তোমার সঙ্গে না হয়ে আমার সঙ্গে হয়েছে এই জন্যই বুঝি দুঃখ! তা তুমি ত আমার সুখদুঃখের অংশভাগী, তুমি না হয় অর্দ্ধেক ভাগ নিও।

সখী। রাজকুমারী তুমি জান না যে বিধাতা তোমার অদৃষ্টে কি দুঃখ লিখেছেন, তাই তুমি ব্যঙ্গ কর্‌চো। শুনলাম রাজকুমার ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ।

মুহূর্ত্তের জন্য রাজকুমারীর সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইল, কিন্তু মুখে বিন্দুমাত্র ও বিকার লক্ষিত হইল না। তিনি বলিলেন, "সখি, সম্বন্ধ কি স্থির হয়ে গিয়েছে? কে স্থির করলেন?"

সখী। স্বয়ং মহারাজ স্থির করেছেন। শুনেছি আগামী কল্য রাজদূতগণ হস্তিনায় যাবে; মহারাজের প্রথমে এ বিবাহে সম্মতি ছিল না, কিন্তু যুবরাজ তাঁহাকে বুঝাইয়াছেন, গান্ধার রাজ্যের কল্যাণের জন্য এ সম্বন্ধ অপরিত্যাজ্য। চতুর্দ্দিকের শত্রুমণ্ডলীর মধ্য হইতে গান্ধার রক্ষা করিতে হইলে, কোন পরাক্রান্ত রাজবংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করার প্রয়োজন; তাই মহারাজ শেষে সম্মতি দিয়াছেন। সমস্ত স্থির হয়ে গিয়েছে।

গান্ধারী। সখি, তাই যদি হয়, তবে আর আমার এর চেয়ে অধিক সৌভাগ্য কি হ'তে পারে? গান্ধারের মঙ্গলের জন্য যদি প্রয়োজন হয়, জীবন দিতেও ত ক্ষোভ নাই।

সখী। তুমি বুঝিতেছ না! চল, উভয়ে রাণীমার নিকটে যাই। আমি তাঁকে বলব যে তোমার বিবাহে মত নাই। তোমার মত না হলে রাণী বা কখনই মত দেবেন না, আর তা হ'লে মহারাজও মত পরিবর্ত্তন কর্ব্বেন। তুমি লজ্জিত হয়ো না; এখনও সময় আছে, চল দুই জনে যাই।

গান্ধারী। সখি! তুমি নির্ব্বোধের মত কথা বল্‌চ; পিতা যখন আমাকে সম্প্রদান কর্ব্বেন বলে স্থির করেছেন, তখন আমি নিজেকে সম্প্রদত্তা বলেই মনে কর্‌চি। এক্ষণে আমার পতি অন্ধই হউন আর পঙ্গুই হউন তা'তে আমার ক্ষতি-লাভ নাই। দেবমূর্ত্তি, মৃত্তিকায় পাষাণে ধাতুতে বা যা'তেই নির্ম্মিত হউক, ভক্তের নিকট সমান। ভক্ত তা'তে দেবত্ব আরোপ করে' পূজা কর্‌লেই মুক্তি লাভ করেন। স্বামীই স্ত্রীলোকের দেবতা, আমি আমার স্বামীতে নারায়ণের অধিষ্ঠান কল্পনা করে তাঁর সেবা করবো, তা হলে আমার মুক্তি হবে।

সখী। তুমি ধর্ম্মজ্ঞানে যা'ই বল, কিন্তু অন্ধ স্বামীকে কি তুমি মনের সহিত ভাল বাসতে পার্ব্বে?

গান্ধারী। না পারবো কেন? তাঁর অঙ্গহীনতা যদি আমার মনের বিকার উৎপাদন করে, তবে আমি তার প্রতীকার কর্ব্বো। তাঁর অঙ্গহীনতা যাতে আমার দেখতে না হয় আমি তাহার উপায় ভেবেচি। যে দিন পিতার মুখে আমার সম্প্রদানের কথা শুন্‌ব, সেই দিনই আমি বস্ত্র দিয়ে আমার চক্ষু বন্ধন কর্ব্বো। তা হলে তিনি সুরূপ, কি কুরূপ, চক্ষুষ্মান্ কি চক্ষুহীন তা আমার দেখতে হবে না। আমার স্বামী যদি আমায় না দেখে আমাকে ভাল বাস্‌তে ও পত্নীরূপে গ্রহণ কর্‌তে পারেন, তবে আমি বা তাঁকে না দেখে তাঁকে ভাল বাসতে ও স্বামীরূপে গ্রহণ করতে না পারব কেন?

সখী। সখি! আমি পরাজিত হ'লাম। আমি সাধারণ মানবী, মানবীর মত কথা বলেছি; তুমি দেবী, দেবীর মত কথা বলেছ; দেবতারা করুন, তুমি এত দিন যে হরপার্ব্বতীর সেবা করেছ, তোমাদের মিলন যেন সেই হরপার্ব্বতীর মিলনের মত হয়। আমি চল্‌লাম, রাণীমার আদেশে আমি তোমার মনের ভাব বুঝ্‌বার জন্য এসেছিলাম, তাঁকে তোমার মত গিয়া বলি, তিনি যা ভাল হয় কর্ব্বেন।

যথাসময়ে গান্ধারীদেবীর সহিত কুরু-রাজকুমার ধৃতরাষ্ট্রের শুভপরিণয় সম্পন্ন হইল। পিতার অভিপ্রায় শ্রবণের পরই তিনি বস্ত্রখণ্ড দ্বারা আপনার চক্ষু দু'টী দৃঢ়-রূপে আবদ্ধ করিলেন এবং তদবস্থাতেই হস্তিনানগরীতে আগমন করিলেন। রাজ-কুমার তাঁহাকে এবং তিনিও রাজকুমারকে বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু তাঁহাদের আত্মা অন্তর্দৃষ্টিতে পরস্পরকে দেখিতে পাইল। প্রগাঢ় প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহারা সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। রাজকুমারীর সুশীলতায় পৌরজন তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইল এবং পতিব্রতাধর্ম্মে তিনি সীতা সাবিত্রীর সমকক্ষা, এই কথা দেশে দেশে প্রচারিত হইল।

কালক্রমে গান্ধারী দেবীর গর্ভে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তাহাদিগের কথা বলিবার পূর্ব্বে প্রসঙ্গ ক্রমে অন্ত দুই একটী কথা বলিতে হইতেছে। লোকের বিশ্বাস যে সুমাতার গর্ভে সুপুত্রই জন্মগ্রহণ করে। এ কথা সাধারণতঃ সত্য হইলেও প্রত্যেক স্থানে সত্য নয়। পৌরাণিককালের কথা ছাড়িয়া ঐতিহাসিক কালের আলোচনা করিলেও ইহার যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যাইবে। ইন্দোরের হোলকার বংশীয় রাজ্ঞী অহল্যা বাইএর নাম সকলেরই পরিচিত। তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মশীলা, দয়াবতী নারী পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্মিয়াছেন। তাঁহার চরিত-লেখকগণ বলেন "মনুষ্য হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত সকল জীবের সম্বন্ধে তিনি করুণা প্রকাশ করিতেন। তিনি প্রতিদিন বহুসংখ্যক ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিতেন এবং বিশেষ বিশেষ উৎসব দিবসে চণ্ডালাদি নীচ জাতীয় ব্যক্তিদিগকে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করিতেন। শীতকালে তিনি দরিদ্র বৃদ্ধদিগকে শীতবস্ত্র দিতেন এবং গ্রীষ্মের কয়মাস তৃষ্ণার্ত্ত পথিক-দিগকে জলদানের জন্য রাজপথের পার্শ্বে জলকুম্ভ সহ লোক নিযুক্ত রাখিতেন। তিনি, মধ্যে মধ্যে, তাঁহার রাজধানী ইন্দোর ত্যাগ করিয়া, নর্ম্মদা নদীর তীরবর্ত্তী মহেশ্বর নামক একটি উপনগরে গিয়া বাস করিতেন। তথাকার কৃষকগণ অনেক দিন দেখিতে পাইত, তাহাদিগের শ্রান্ত বৃষ ও মহিষকে জলপান করাইবার জন্য রাজ-ভৃত্যগণ জলপাত্র হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অহল্যা নিজের কতকগুলি ক্ষেত্র পক্ষিগণের আহার্য্য শস্যে পূর্ণ করিয়া রাখিতেন, নানা স্থান হইতে পক্ষিসমূহ আসিয়া তথায় আশ্রয় ও আহার্য্য লাভ করিত। মৎস্য-দিগেরও জন্য নর্ম্মদার জলে শক্তু ও গোধূমমণ্ড নিক্ষিপ্ত হইত। তাঁহার অনু-গত কোন দরিদ্র ব্যক্তির বা তাঁহার কোন কর্ম্মচারীর সন্তান হইয়াছে শুনিলে নবজাত শিশুর দুগ্ধপানের জন্য তিনি একটী গর্ভিণী গাভী পাঠাইয়া দিতেন। তীর্থক্ষেত্রে গমনের সময় তিনি নানাবিধ ফলের বীজ সঙ্গে লইয়া যাইতেন এবং তরুহীন প্রান্তরে, নদীতীরে, পথপার্শ্বে তাহা রোপণ করিয়া আসিতেন। তাঁহার উদ্দেশ্য কি কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, এই সকল বীজের সকলগুলি না হউক দুই চারিটীও

ত কালে অঙ্কুরিত ও ফলিত হইবে। তখন রৌদ্রতপ্ত পথিক আসিয়া তাহাদিগের ছায়ায় স্নিগ্ধ হইবে, ক্ষুধাতুর ব্যক্তি তাহাদিগের ফলে তৃপ্তিলাভ করিবে এবং বিহগগণ তাহাদিগের শাখায় কুলায় নির্ম্মাণ করিবে; তাহা হইলে জগতের কাহারও না কাহারও ত উপকার হইবে, আমার উদ্দেশ্য বিফল হইবে না। কি সুন্দর, কি পবিত্র ভাব! যে দেশে এরূপ দয়াময়ী রমণী জন্ম গ্রহণ করেন, সে দেশ ধন্য! ভারতবর্ষের পৌরাণিক রমণীগণের কথা যে নিরবচ্ছিন্ন কবিকল্পনা নয়, অহল্যার ন্যায় ঐতিহাসিক রমণীর চরিত হইতেও তাহা প্রমাণিত হইতে পারে।

কিন্তু এই দয়াময়ী অহল্যার গর্ভে যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, একবার তাহার কথা আলোচনা করা যাউক। অহল্যা অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার একটী পুত্র জন্মিয়াছিল। সেই পুত্রের নাম মানে রাও। মানে রাও বাল্য হইতেই বিকৃতমস্তিষ্ক ও অব্যবস্থিতচিত্ত ছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত মদ্যপান অভ্যাস করাতে তাঁহার হিতাহিত জ্ঞান একরূপ অন্তর্হিত হইয়াছিল। মদিরামত্ত অবস্থায় তিনি অতি সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারীদিগকেও বেত্রাঘাত করিতেন বা ভৃত্য দ্বারা অপমানিত করাইতেন। পতি-বিয়োগের পর হইতে অহল্যা দেবব্রাহ্মণ-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মানে রাও ইহাতে সহানুভূতি প্রকাশ করা দূরে থাকুক নানাপ্রকারে মাতার কার্য্যের প্রতি-কূলাচরণ করিতেন। অহল্যা সাধু, সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণদিগকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন, মানে রাও তাঁহাদিগকে বিষদৃষ্টিতে দেখিতেন। মাতার ভক্তিপাত্রদিগকে নির্য্যাতন করিবার জন্য তিনি নিত্য নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতেন। কখনও পরিধেয় বস্ত্রের ও পাদুকার অভ্যন্তরে গোপনে তীক্ষ্ণবিষ বৃশ্চিক রাখিয়া দিয়া ব্রাহ্মণদিগকে পরিধান করিবার জন্য দান করিতেন। কখনও বা ধাতুকলস রৌপ্য-মুদ্রায় পূর্ণ করিয়া এবং তাহার মধ্যে বিষধর সর্প রাখিয়া দিয়া ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীদিগকে ইচ্ছামত অর্থগ্রহণ করিতে বলিতেন। তাঁহারা তন্মধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়া সর্পদষ্ট হইলে মানে রাওয়ের আনন্দের সীমা থাকিত না। অহল্যার করুণ হৃদয় পুত্রের এইরূপ ব্যবহারে বিদীর্ণ হইত। তিনি দিবারাত্রি অশ্রুপাত করিতেন এবং উৎপীড়িতদিগকে উপযুক্ত পুরস্কারাদি দিয়া সান্ত্বনাদানের চেষ্টা করিতেন।* ঐতিহাসিক কালে অহল্যা বাইএর গর্ভে মানে রাও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন চিন্তা করিলে গান্ধারীদেবীর গর্ভে দুর্য্যোধনাদির জন্ম অস্বাভাবিক বোধ হইবে না।

এক্ষণে আমরা প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিব। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পাণ্ডুনামে এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার প্রথমা পত্নী কুন্তীদেবীর গর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন নামে তিন পুত্র এবং কনিষ্ঠা পত্নী মাদ্রীদেবীর গর্ভে নকুল ও সহদেব নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাণ্ডুর

* প্রবন্ধলেখক লিখিত অহল্যা বাইএর জীবন চরিত।

পুত্র বলিয়া ইঁহারা পঞ্চভ্রাতা 'পাণ্ডব' নামে খ্যাত। পাণ্ডু পরলোক গমন করিলে তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী মাদ্রীদেবী স্বামীর সঙ্গে চিতারোহণ করেন এবং কুন্তীদেবী পুত্র ও স্বপত্নীপুত্রদিগকে লইয়া হস্তিনানগরীতে ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী পাণ্ডুপুত্রদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। পাণ্ডবগণ বাহুবলে এবং বুদ্ধিবলে দুর্য্যোধনাদির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, সেই জন্য প্রজাগণ তাঁহাদিগের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত ছিল এবং সর্ব্বদা তাঁহাদিগের প্রশংসা করিত। দুর্য্যোধনের ইহা সহ্য হইত না। ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ হইলেও জন্মান্ধ ছিলেন বলিয়া পাণ্ডুই রাজ্য শাসন করিতেন, সুতরাং প্রজাগণ ভাবিত পাণ্ডুর পুত্রগণই সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী। ইহাতে দুর্য্যোধনের পাণ্ডবদ্বেষ আরও দ্বিগুণিত হইয়াছিল। শৈশব হইতেই মাতুল শকুনির ন্যায় তাঁহার ক্রূর-বুদ্ধি বেশ পরিস্ফুট হইয়াছিল। কিরূপে পাণ্ডবদিগকে বধ করিয়া তিনি নিষ্কণ্টক হইবেন, সর্ব্বদা তিনি এই চিন্তা করিতেন। পাণ্ডবদিগের মধ্যে ভীম সমধিক বলশালী এবং গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধনের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। এই জন্য ভীমের প্রতি তাঁহার আক্রোশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। একবার তিনি গোপনে মিষ্টান্নের সঙ্গে বিষ মিশ্রিত করিয়া ভীমকে আহার করাইয়াছিলেন, কিন্তু দৈবানুগ্রহে ভীম সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন। আর একবার দুর্য্যোধন গন্ধক, ঘৃত, জতু (গালা) ইত্যাদি দাহ্য পদার্থ দ্বারা একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া কৌশলক্রমে পাণ্ডবদিগকে তথায় রাখিয়া অগ্নিসংযোগ করাইবার চেষ্টায় ছিলেন। প্রধানতঃ জতু বা গালা দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া এই গৃহ 'জতুগৃহ' নামে প্রসিদ্ধ। ভাগ্যক্রমে পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়া পাণ্ডবগণ এই জতুগৃহ হইতে পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বা গান্ধারী পুত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে প্রথমে কিছুই জানিতেন না। পরে জানিতে পারিয়া দুর্য্যোধনকে কখনও বা সদুপদেশ দিতেন, কখনও বা তিরস্কার করিতেন; কিন্তু কিছুতেই ফল হইত না। যতই দিন যাইতে লাগিল দুর্য্যোধনের পাণ্ডবদ্বেষ ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন ধনুর্ব্বিদ্যায় পৃথিবীতে সকলের অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁহার লক্ষ্য কখনও ব্যর্থ হইত না। জতুগৃহ হইতে পলায়নের পর পাণ্ডবগণ শুনিতে পাইলেন যে, পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য এক মহা-সভা আহ্বান করিয়াছেন এবং ঘোষণা করিয়া দিতেছেন যে, সমাগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যিনি একটী অতি উচ্চস্থানস্থিত দুর্ভেদ্য লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবেন, তিনিই তাঁহার পরমরূপবতী কন্যা দ্রৌপদীকে লাভ করিবেন। এই সংবাদ শুনিয়া পাণ্ডবগণ ছদ্মবেশে সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। সে সময়কার প্রধান প্রধান রাজগণ ও বীরগণ সকলেই সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই লক্ষ্যভেদে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে ব্রাহ্মণবেশী অর্জ্জুন লক্ষ্য ভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করিলেন। 'ক্ষত্রিয় বীরগণ

যে কার্য্যে পরাঙ্মুখ হইলেন এক জন সাধারণ ব্রাহ্মণ তাহা সম্পন্ন করিলেন' এই ভাবিয়া রাজগণ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ভীমার্জ্জুনের বাহুবলে তাঁহারা পরাজিত হইলেন। ক্রমে লক্ষ্যভেদকারীর প্রকৃত পরিচয় সকলেরই গোচর হইল। রাজা দ্রুপদের আনন্দের সীমা রহিল না; মাতার আদেশে পাণ্ডবেরা পঞ্চভ্রাতা দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন।

পাণ্ডবগণ অগ্নিদগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন এই সংবাদ সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়াছিল। এক্ষণে তাঁহারা জীবিত আছেন এবং বীর্য্যবলে পাঞ্চাল-রাজকুমারী দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছেন শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী পরম সুখী হইলেন। তাঁহারা তাঁহাদিগকে সাদরে হস্তিনায় আহ্বান করিলেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে দুর্য্যোধনাদির সহিত তাঁহাদিগের বিরোধ না হয় তজ্জন্য রাজ্য বিভাগ করিয়া দিলেন। দুর্য্যোধন হস্তিনানগরী প্রাপ্ত হইলেন, পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থ নামক নগর সন্নিবেশ করিয়া তথায় রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ দিল্লী নগরই ইন্দ্রপ্রস্থ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। দিল্লীর একাংশ এখনও ইন্দ্রপ্রস্থ শব্দের অপভ্রংশ "ইন্দর পথ" নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পাণ্ডবগণ নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সৌষ্ঠব ও সমৃদ্ধিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা নগরের চতুর্দ্দিকে সুদৃঢ় প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইলেন এবং গভীর পরিখা খনন করাইয়া নগরটীকে শত্রুর দুরাক্রম্য করিলেন। প্রশস্ত রাজপথ, শ্রেণীবদ্ধ হর্ম্ম্যরাজি, কূপ এবং সরোবর নগরের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতে লাগিল। যথাস্থানে প্রাসাদ, মন্দির, বিপণি এবং পান্থশালা ইত্যাদি নির্ম্মিত হওয়াতে নগরটীর শোভার তুলনা রহিল না। পাণ্ডবদিগের ধর্ম্মানুগত ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া নানাদেশীয় বণিক্‌গণ আসিয়া তথায় বাস করিতে আরম্ভ করিল। অল্প দিনের মধ্যেই ইন্দ্রপ্রস্থ শোভায় ও সমৃদ্ধিতে হস্তীনানগরীকে পরাজিত করিল।

পাণ্ডবদ্বেষী দুর্য্যোধনের ইহা অসহ্য হইল। তাহার উপর আবার পাণ্ডবেরা প্রতিবাসী রাজন্যবর্গকে পরাজিত করিয়া রাজসূয় নামক এক মহাযজ্ঞের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। অদ্বিতীয় প্রতাপশালী সার্ব্বভৌম নরপতি ভিন্ন আর কেহ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারেন না। ইহাতে অন্যান্য রাজাকে অনুষ্ঠাতা রাজার প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়। ভীমার্জ্জুন অপর সকলকে পরাজিত করিয়াছিলেন, দুর্য্যোধন অনিচ্ছা সত্ত্বেও কুলশ্রেষ্ঠ বলিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রাধান্য স্বীকারে বাধ্য হইলেন; কিন্তু লোকে যতই যুধিষ্ঠিরাদির গৌরব ঘোষণা করিতে লাগিল, তাঁহার ততই যেন মর্ম্মদাহ আরম্ভ হইল। কি উপায়ে তিনি পাণ্ডবগণের সর্ব্বনাশ করিবেন তাহা চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

গান্ধাররাজকুমার শকুনি অনেক সময় হস্তিনাপুরে অবস্থিতি করিতেন। একেই ত সম্বন্ধ অতি নিকট, তাহার উপর উভয়ের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য ছিল বলিয়া দুর্য্যোধন ও শকুনির মধ্যে প্রগাঢ় স্নেহবন্ধন ছিল

উভয়েই একসঙ্গে পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিতেন। সাধুর নিকট সৎপরামর্শ এবং অসাধুর নিকট অসৎ পরামর্শই প্রাপ্ত হওয়া যায়। শকুনি দুর্য্যোধনকে আপনার প্রকৃতিসুলভ অসৎ পরামর্শই দিতেন। বাহুবলে পাণ্ডবদিগকে জয় করা সহজ নয়, সুতরাং কৌশলে তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশ করিতে হইবে, উভয়ে পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিলেন। তখনকার রাজাদিগের এই একটী রীতি ছিল যে, কেহ তাঁহাদিগকে যুদ্ধে বা দ্যূতক্রীড়ায় (পাশা খেলায়) আহ্বান করিলে তাঁহারা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন না; করিলে লোকে তাঁহাদিগকে কাপুরুষ বলিত। দ্যূত ক্রীড়ায় শকুনির অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। স্থির হইল যে, শকুনি দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ক্রীড়া করিবেন এবং যুধিষ্ঠিরকে পণে পরাজিত করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব হরণ করিবেন। দুর্য্যোধনের তুষ্টির জন্য ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে হস্তিনানগরে আনিয়া দ্যূতক্রীড়া করিতে আদেশ করিলেন। দ্যূতক্রীড়ার অপকারিতা বুঝিয়াও যুধিষ্ঠির তৎকালপ্রচলিত প্রথার এবং জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যের আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু শকুনি তাঁহার অপেক্ষা ক্রীড়ায় নিপুণ ছিলেন বলিয়া তিনি প্রত্যেক বারেই পরাজিত হইতে লাগিলেন। ধন, রত্ন, অলঙ্কার, রথ, অশ্ব, গজ, এমন কি ভ্রাতৃগণকে এবং দ্রৌপদীকেও পর্য্যন্ত পণ রাখিয়া যুধিষ্ঠির পরাজিত হইলেন। শেষে নিজেকেও পণ রাখিলেন, কিন্তু শকুনি সেবারেও জয়ী হইলেন। দুর্য্যোধন এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত দেখিয়া তাঁহাদিগকে মর্ম্মভেদী বিদ্রূপবাক্যে ব্যথিত করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনের আদেশে পাপিষ্ঠ ভ্রাতা দুঃশাসন একবস্ত্রা, অশ্রুপূর্ণমুখী রাজকুমারী দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ করিয়া সভাস্থলে আনয়ন করিল এবং তাহার অঙ্গের বসন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিল। সভাস্থ ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ এই ব্যবহারে মর্ম্মাহত ও অধোবদন হইলেন; কিন্তু যুধিষ্ঠির স্বেচ্ছায় নিজেকে, এবং পত্নী দ্রৌপদীকে পণে বিক্রয় করিয়াছিলেন। পণক্রীত দাসদাসীর উপর প্রভুর সম্পূর্ণ অধিকার আছে ভাবিয়া তাঁহারা প্রতিবিধানে সক্ষম হইলেন না। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় রাজগণ যে কল্পিত কর্ত্তব্যানুরোধে একটী অবলাকে সভাস্থলে এইরূপ অপমানিতা হইতে দেখিয়া নিশ্চেষ্ট ছিলেন, বোধ হয় সেই মহাপাপেই এক্ষণে ভারতবর্ষ হইতে প্রকৃত ক্ষত্রিয়কুল উৎসন্ন হইয়াছে।

যখন রাজসভায় এই সকল ব্যাপার হইতেছিল, তখন গান্ধারী দেবী অন্তঃপুরে ছিলেন। তিনি শুনিবামাত্র একান্ত ব্যাকুল হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে সমস্ত নিবেদন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র শুনিয়া দুর্য্যোধনকে অতিশয় কঠোর তিরস্কার করিলেন এবং দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক তাঁহার দাসীত্ব মোচন করিয়া দিলেন। যুধিষ্ঠির এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণও ধৃতরাষ্ট্রের অনুগ্রহে দাসত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলেন।

পরাজিত এবং হস্তগত বৈরী এইরূপে মুক্তিলাভ করিল দেখিয়া দুর্য্যোধন ও শকুনি প্রভৃতির ক্ষোভের সীমা রহিল না। তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করিয়া পুনরায় পাণ্ডবদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত করাইবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন। স্বভাবতঃ ধর্ম্মশীল ও পাণ্ডবদিগের প্রতি স্নেহপরায়ণ হইলেও ধৃতরাষ্ট্র মনের দুর্ব্বলতাবশতঃ তাঁহাদিগের পাপানুরোধ রক্ষা করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়ার জন্য আদেশ দিলেন। শুনিয়া গান্ধারী দেবী মর্ম্মাহতা হইলেন। স্বভাবতঃ পতিচ্ছন্দানুবর্ত্তিনী হইলেও স্বামীকে এইরূপে পাপকার্য্যের সহায়তা করিতে দেখিয়া তিনি ব্যথিত হৃদয়ে তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন,—"মহারাজ, আপনি এ কি করিতেছেন! পুত্রস্নেহে আপনি কুলক্ষয়কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দুর্য্যোধন আমাদিগের কুলান্তক, তাহার অনুরোধে আপনি নিজের অমঙ্গল করিবেন না। পুত্র পিতার আদেশ প্রতিপালন করিবে ইহাই নিয়ম। আপনি আমার বাক্যানুসারে তাহাকে পরিত্যাগ করুন, নচেৎ মহাবিপদ্ উপস্থিত হইবে।"

ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মার্থদর্শিনী সহধর্ম্মিণীর বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—"প্রিয়ে, যদি বংশনাশই বিধাতার ইচ্ছা হয়, তবে তাহা নিবারণ করিতে পারিব না। পুত্রেরা যেরূপ ইচ্ছা করিতেছে, তাহাই হউক; পাণ্ডবদিগের সহিত তাহাদিগের দ্যূতক্রীড়া পুনর্ব্বার আরম্ভ হউক।"

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে পুনর্ব্বার ক্রীড়া আরম্ভ হইলে দুর্ম্মতি শকুনি যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রস্তাব করিয়া বলিল,—"মহারাজ, এবার এইরূপ পণ অবধারিত হউক, আমরা আপনাদিগের নিকট দ্যূতে পরাজিত হইলে কৃষ্ণচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক দ্বাদশবর্ষ বনবাস এবং একবৎসর কাল অজ্ঞাতবাস করিব। আর আমরা যদি জয়ী হই, তাহা হইলে আপনাদিগকেও দ্রৌপদীর সহিত পূর্ব্বোক্তরূপে ত্রয়োদশবর্ষ কালযাপন করিতে হইবে। ত্রয়োদশবর্ষ অতীত হইলে একপক্ষ পুনরায় স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। আসুন, এইরূপ পণ রাখিয়া পুনর্ব্বার ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হই।"

সভাস্থ সকলে এই দারুণ পণের কথা শুনিয়া একান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন; কিন্তু যুধিষ্ঠির লোকলজ্জায় তাহাতেই সম্মত হইয়া ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ক্রীড়ায় শকুনিরই পুনর্ব্বার জয় হইল। তখন পাণ্ডবগণ রাজপরিচ্ছদ ও অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় ভস্মাচ্ছাদিত কলেবরে অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। পতিব্রতা দ্রৌপদীও তাঁহাদিগের অনুগামিনী হইলেন। দুর্য্যোধন ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ তদবস্থায় পাণ্ডবদিগকে মর্ম্মান্তিক উপহাস করিতে লাগিলেন। হস্তিনার পুরবাসিগণ বুঝিতে পারিলেন যে, দুর্য্যোধন দুর্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন, তাহাতে কুরুকুল ভস্মসাৎ হইবে।

ক্রমে ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইল। পাণ্ডবেরা নির্ব্বাসন হইতে ফিরিয়া আসিয়া

পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুরূপ আপনাদিগের রাজ্যাংশ ফিরিয়া চাহিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন "বিনা যুদ্ধে সূচাগ্র পরিমাণ ভূমিও দিব না" বলিয়া পণ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র তখন গান্ধারী দেবীকে অন্তঃপুর হইতে সভাস্থলে আনয়ন করাইয়া দুর্ব্বৃত্ত পুত্রকে সদুপদেশ দিবার জন্য বলিলেন। ক্ষোভে এবং ক্রোধে গান্ধারী দেবী দুর্য্যোধনকে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে প্রথমে স্বামীকে বলিলেন,—"মহারাজ! এই যে মহাবাসন উপস্থিত হইয়াছে, এ জন্য আপনি নিন্দনীয় হইবেন। আপনি দুর্য্যোধনের পাপাভিসন্ধি জানিয়াও তাহার মতের অনুসরণ করিয়া থাকেন। দুর্য্যোধন ক্রোধ ও লোভের এরূপ বশবর্ত্তী হইয়াছে যে, এক্ষণে আপনি উহাকে বল দ্বারাও নিবৃত্ত করিতে পারিবেন না। মূর্খ ও দুরাশয়ের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণে যে ফল হয়, আপনাকে এক্ষণে তাহা ভোগ করিতে হইতেছে।" অনন্তর তিনি দুর্য্যোধনকে বলিলেন,—"বৎস দুর্য্যোধন, আমি তোমার ভাবী মঙ্গলের জন্য তোমাকে যে সকল কথা বলিতেছি তুমি অবহিতচিত্তে তাহা শ্রবণ কর। তোমার পিতা এবং ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ তোমাকে যাহা কহিয়াছেন তাহা পালন কর। তুমি ধর্ম্মানুগত কার্য্য করিলে আমরা সকলেই সুখী হইব। তুমি নিশ্চয় জানিও অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কখনও দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিতে সমর্থ হয় না। জিতেন্দ্রিয় মহাত্মারাই স্বচ্ছন্দে রাজ্যভোগ করেন।"

"বৎস, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের দূত হইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, তুমি তাঁহার বাক্য পালন কর। তিনি প্রসন্ন হইলে তোমাদের উভয় পক্ষের কল্যাণ হইবে। তোমার পিতা এবং ভীষ্ম প্রভৃতি ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ ভেদভয়ে ভীত হইয়া পাণ্ডবদিগকে রাজ্যাংশ দানে স্বীকৃত হইয়াছেন। রাজ্যের অর্দ্ধাংশ তোমার পক্ষে যথেষ্ট। তুমি এই ত্রয়োদশ বর্ষকাল পাণ্ডবগণের যে অবমাননা করিয়াছ, এক্ষণে তাহার প্রতিবিধান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি মূঢ়তাবশতঃ স্থির করিয়াছ যে, ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি বীরগণ তোমার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিবেন, কিন্তু তাহা কখনই হইবে না। কারণ তাঁহারা জানেন যে, এই রাজ্যে তোমাদের ও পাণ্ডবদের সমান অধিকার এবং সেই জন্য তাঁহারা তোমাদের উভয়ের প্রতি সমান স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস আছে যে পাণ্ডবগণ তোমাদের অপেক্ষা অধিক ধর্ম্মশীল; সুতরাং তোমার পিতার অন্নে প্রতিপালিত বলিয়া তাঁহারা বরং সমরে জীবন বিসর্জ্জন করিবেন, তথাপি ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরকে প্রহার করিবেন না। পুত্র, লোভের বশবর্ত্তী ব্যক্তি কখনই ইষ্টলাভে সমর্থ হয় না; তুমি লোভ পরিত্যাগ করিয়া শান্ত হও।"

পাষাণে বীজ অঙ্কুরিত হয় না। দুর্য্যোধনের কঠোর হৃদয়ে মাতার সদর্থযুক্ত বাক্য বদ্ধমূল হইল না। যুদ্ধ অনিবার্য্য হইল এবং উভয় পক্ষ আপনাদিগের আত্মীয়, বন্ধু ও অনুগত ব্যক্তিদিগকে লইয়া তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

দাবানলে যেমন অরণ্য ভস্মীভূত হয়, অষ্টাদশ দিবসব্যাপী মহাযুদ্ধে তেমনই কৌরব ও পাণ্ডবদল দগ্ধ হইল। কত সুকুমার শিশু, কত পলিতকেশ বৃদ্ধ সেই প্রচণ্ড অনলে জীবন আহুতি দিলেন। রাজান্তঃপুর পুত্রহীনা মাতার এবং পতিহীনা সতীর করুণক্রন্দনে আকুল হইয়া উঠিল। দূত প্রতিদিনের যুদ্ধের ঘটনা ধৃতরাষ্ট্রকে বর্ণনা করিয়া শুনাইত। "আজ আপনার তরুণবয়স্ক পৌত্র নিহত হইল." "আজ আপনার একমাত্র দুহিতা বিধবা হইল." "আজ আপনার পুত্রের বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া ভীম তাহার শোণিত পান করিল" এইরূপ সংবাদ প্রতিদিনই গান্ধারীদেবীর কর্ণগোচর হইতে লাগিল। যুদ্ধের পরিণাম যে এইরূপ হইবে তিনি তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন এবং তজ্জন্য হৃদয় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞানে যথোচিত ধৈর্য্যধারণ করিলেও মাতৃস্নেহের নিকট সংযম সহিষ্ণুতা পরাজিত হইত। কিন্তু সে অবস্থাতেও তাঁহার অধর্ম্মাচারী পুত্রগণ জয়লাভ করুক, ইহা তিনি ভাবিতে পারিতেন না। তাঁহার পুত্রগণের সুমতি হউক ঈশ্বরের নিকট তিনি সতত প্রার্থনা করিতেন, কিন্তু রণক্ষেত্র গমনের পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রগণ প্রণাম করিয়া বিদায় লইতে আসিলে তিনি বলিতেন,—"বৎসগণ, 'যতোধর্ম্ম স্ততোজয়' যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই জয়।" দেবি, তুমি ধন্যা!

যুদ্ধ সমাপ্ত হইল। পাণ্ডবেরা পঞ্চভ্রাতা মাত্র রক্ষা পাইলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের পুত্র ও আত্মীয়গণ এবং দুর্য্যোধনেরা শতভ্রাতা নিহত হইলেন। যুদ্ধ পণ্ডর কার্য্য, অসুরের কার্য্য; তাহাতে প্রবৃত্ত হইলে নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করা যায় না। স্বভাবতঃ ধর্ম্মভীরু পাণ্ডবগণও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কোন কোন স্থলে অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কপটযুদ্ধে কৌরবপক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরপুরুষকে এবং কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে বধ করিয়াছিলেন। শুনিয়া গান্ধারী দেবী দারুণ মর্ম্মপীড়া প্রাপ্ত হইলেন এবং অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ জন্য তিনি পাণ্ডবদিগের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার পুত্রেরাই সকল অনর্থের মূল, তখন তিনি ক্রোধ সম্বরণ করিলেন এবং পাণ্ডবদিগকে পূর্ব্ববৎ স্নেহদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন।

গান্ধারী দেবী বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই আপনার চক্ষু আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পুত্র কন্যা প্রসব করিয়াও কখন তাহাদিগের মুখ সন্দর্শন করেন নাই। বিধাতা তাঁহার পতিকে যে সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, তিনি স্বেচ্ছাক্রমে আপনাকে তাহা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধাবসানে মৃত পুত্রদিগকে দেখিবার জন্য তাঁহার একবার ইচ্ছা জন্মিল। সে দৃশ্য সুখের নয়, তাঁহার স্বামী যে সে দৃশ্য দেখিতে পাইবেন না ইহা ক্ষোভের বিষয় ছিল না। সেই জন্য তিনি চক্ষুর আবরণ দূর করিতে সম্মত হইলেন এবং বিধবা দুহিতা ও পুত্রবধূদিগকে সঙ্গে লইয়া রণক্ষেত্র দর্শনের জন্য গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি তাঁহার অনুগমন

করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কুরুপাণ্ডবযুদ্ধে স্বয়ং অস্ত্র ধারণ করেন নাই; তিনি অর্জ্জুনের সারথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রধানতঃ তাঁহারই বুদ্ধিকৌশলে পাণ্ডবগণ জয় লাভ করিয়াছিলেন; গান্ধারীদেবী ইহা জানিতেন। সেই জন্যই তিনি পাণ্ডবদিগের অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিজের মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

রণক্ষেত্রের দৃশ্য কি ভয়ঙ্কর! কি মর্ম্মভেদী! চতুর্দ্দিকে অসংখ্য হতাহত ব্যক্তির দেহ পতিত ছিল কাহারও অঙ্গ বিদীর্ণ, কাহারও হস্তপদ ছিন্ন এবং কাহারও মস্তক চূর্ণিত। কোন কোন হতভাগ্যের প্রাণ তখনও বহির্গত হয় নাই; প্রজাদিগের মধ্যে কেহ যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছিল, কেহ তৃষ্ণায় জল জল বলিয়া চীৎকার করিতেছিল এবং কেহ বা পিতা, মাতা, পত্নী ও পুত্রের কথা স্মরণ করিয়া অশ্রুপাত করিতেছিল। সৈনিকদিগের গলিতদেহের সঙ্গে মৃত অশ্ব হস্তী প্রভৃতির দেহ স্তূপাকারে পড়িয়া ছিল। কোন কোন স্থল শোণিতে কর্দ্দমাক্ত হইয়াছিল; অসংখ্য কৃমি ও মক্ষিকা তথায় বিচরণ করিতেছিল এবং চতুর্দ্দিক হইতে এমন বিকট দুর্গন্ধ উঠিতেছিল যে, কাহার সাধ্য সেখানে অবস্থান করে। মাংস-শোণিত-প্রিয় জীবগণ দলে দলে তথায় উপস্থিত হইয়া উল্লাসে মৃতদেহের মাংস ভোজন করিতেছিল। যোদ্ধপুরুষদিগের ব্যবহৃত অস্ত্র শস্ত্র চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ছিল এবং ভগ্ন রথ ও রথাঙ্গে রণভূমি দুষ্প্রবেশ্য হইয়াছিল। গান্ধারীদেবী একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, এক জন পরিচারিকা মৃত ব্যক্তিদিগের ও তাঁহার অনুগামিনী কুরুনারীদিগের পরিচয় দিল। রণক্ষেত্রের সেই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া গান্ধারীদেবীর হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইল। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কৃষ্ণ! অই দেখ আমার বধূগণ অনাথার ন্যায় আলুলায়িত কেশে রোদন করিতে করিতে স্ব স্ব পতি, পুত্র, পিতা ও ভ্রাতৃগণকে স্মরণ করিয়া তাহাদের মৃত দেহের নিকট ধাবিতা হইতেছে। সমরাঙ্গণ পুত্রহীনা বীরজননী এবং পতিহীনা বীরপত্নীগণে পূর্ণ হইয়াছে। ঐ দেখ গৃধ্রগণ বীরপুরুষদিগের শোণিতসিক্ত দেহ গ্রহণ পূর্ব্বক আনন্দে ভোজন করিতেছে। যাঁহারা যথাসময়ে বন্দিগণের স্তুতিপাঠ শ্রবণ করিতেন, আজ তাঁহাদিগকে শিবাগণের অশুভ ধ্বনি শ্রবণ করিতে হইতেছে। ঐ দেখ আমার বধূগণের সুকোমল বদনমণ্ডল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তাহারা বাষ্পাকুললোচনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। অনেকে বারম্বার বিলাপ ও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শোকে ও দুঃখে নিস্পন্দ হইয়া পড়িতেছে। ঐ দেখ কেহ পতির মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করিতেছে, কেহ পতির পদ অশ্রুজলে প্রক্ষালিত করিতেছে, কেহ বা পতির ছিন্ন মস্তক প্রাপ্ত হইয়া দেহের অন্বেষণ করিতেছে। আমি যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, আমার পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের মৃত দেহ দেখিতে পাই। বোধ হয় পূর্ব্বজন্মে আমি কোন ঘোর পাপানুষ্ঠান করিয়াছিলাম, নচেৎ আমাকে আজ এ দৃশ্য দেখিতে হইবে কেন? এই-

রূপ বিলাপ করিতে করিতে গান্ধারীদেবী যেখানে দুর্য্যোধনের মৃতদেহ পতিত ছিল সেই স্থানে আগমন করিলেন এবং সেই রুধিরাক্ত কলেবর বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া "হা পুত্র, হা দুর্য্যোধন!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, "কেশব! এই জ্ঞাতিবিনাশক সংগ্রাম সমুপস্থিত হইবার সময় দুর্য্যোধন আমাকে জয়াশীর্ব্বাদ করিতে কহিলে আমি বলিয়াছিলাম, 'বৎস! যেখানে ধর্ম্ম সেই স্থানেই জয়। তুমি যখন যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইতেছ না, তখন নিশ্চয়ই দেবতার ন্যায় স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবে।' পূর্ব্বে আমি এই কথা কহিবার সময় পুত্র নিহত হইবে বলিয়া কিছুমাত্র শোক প্রকাশ করি নাই, কিন্তু এক্ষণে বন্ধুবান্ধববিহীন মহারাজের কথা চিন্তা করিয়া নিতান্ত শোকার্ত্তা হইতেছি। ঐ দেখ দুর্য্যোধনের পত্নী, আমার শ্রেষ্ঠা পুত্রবধূ, মস্তকে করাঘাত করিয়া কখনও পতির, কখনও পুত্রের দেহ পরিমার্জ্জন করিতেছে। বাসুদেব! আমার পুত্র অধর্ম্মাচারী ছিল সত্য, কিন্তু যুদ্ধে সে ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য করিয়াছিল। একাকী সে পাণ্ডবদিগের সহিত সম্মুখ সমরে নিহত হইয়াছে। যদি শাস্ত্র সত্য হয়, তবে সে নিশ্চয়ই স্বর্গলোকের অধিকারী হইবে।"

"মাধব! আমার বধূদিগের অবস্থা দর্শন করিয়াই আমার মর্ম্মান্তিক ক্লেশ হইতেছে। আমার পুত্র বিকর্ণের তরুণবয়স্কা ভার্য্যার দিকে দৃষ্টিপাত কর। গৃধ্র, গোমায়ুদিগের আক্রমণ হইতে স্বামীর দেহ রক্ষা করিবার জন্য সে পুনঃ পুনঃ প্রয়াস পাইতেছে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতেছে না। ঐ দেখ আমার প্রাণাধিকা কন্যা দুঃশলা তাহার স্বামী জয়দ্রথের দেহ প্রাপ্ত হইয়া মুণ্ড অন্বেষণে উন্মত্তার ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবিতা হইতেছে। মাতা হইয়া এ দৃশ্য দর্শনে আমার মনে যাহা হইতেছে তাহা আমি কেমন করিয়া বুঝাইব? ঐ দেখ তোমার ভাগিনেয় অভিমন্যুর শোণিতসিক্ত কলেবর পতিত রহিয়াছে। মৃত্যুতেও তাহার মুখের লাবণ্য হ্রাস হয় নাই। হতভাগিনী উত্তরা বর্ম্ম উন্মোচন করিয়া তাহার অক্ষতপূর্ণ দেহ এক দৃষ্টিতে দর্শন করিতেছে। ঐ দেখ আচার্য্যপত্নী কৃপী দীনভাবে, অধোবদনে অবস্থান করিতেছেন। সামগায়কগণ অগ্নি আহরণ পূর্ব্বক যথাবিধানে আচার্য্যের চিতা প্রস্তুত করিতেছে। পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, আত্মীয় সকলকে নিহত দেখিয়া আমি আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না। হায় বিধাতঃ, আমাকে এ দৃশ্য দেখাবার জন্য জীবিত রাখিয়াছিলে কেন!"

গান্ধারী দেবী এইরূপ বিলাপ করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন এবং ক্ষণকাল পরে রোষভরে বলিলেন, "কৃষ্ণ! আমি সাধু মুখে শুনিয়াছি, তুমি নারায়ণ। কিন্তু যখন তুমি নরদেহ ধারণ করিয়া নরের ন্যায় পাপ-পুণ্যের অনুষ্ঠান করিতেছ, তখন তোমাকেও পরজন্মের সুখদুঃখ ভোগ করিতে হইবে। তুমি যেরূপ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, বাক্যবিশারদ এবং বীর্য্যশালী, তোমার যেরূপ সৈন্যবল ও বুদ্ধিবল, তাহাতে তুমি আরও একবার

অকপট চেষ্টা করিলে কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধ নিবারণ করিতে পারিতে বলিয়া আমার বিশ্বাস। কিন্তু তুমি উপেক্ষা করিয়া নিশ্চেষ্ট ছিলে। যদি নিশ্চেষ্ট ছিলে, তবে কোন পক্ষ অবলম্বন না করাই তোমার কর্ত্তব্য ছিল। তুমি যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ কর নাই সত্য, কিন্তু তোমার মন্ত্র অস্ত্র অপেক্ষা সহস্রগুণ ভয়ঙ্কর কার্য্য করিয়াছে। আমার পুত্রগণ অধর্ম্মাচারী বলিয়া যদি তুমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে, তবে পাণ্ডবগণ যে দিন অধর্ম্ম যুদ্ধে পরমধার্ম্মিক ভীষ্মকে রণশায়ী করিয়াছিল, সেই দিনই তাহাদিগকে বর্জ্জন করিলে না কেন? অধর্ম্মের প্রশ্রয়দানরূপ কার্য্যের ফলে তোমাকেও ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। তোমারও পুত্র, পৌত্র ও বান্ধবগণ এইরূপ জ্ঞাতিবিবাদে ধ্বংস হইবে এবং কুরুবধূগণ আজ যেরূপ বিলাপ করিতেছে তোমারও কুলনারীগণ এইরূপ পতিপুত্র-বান্ধব শোকে বিলাপ ও পরিতাপ করিবে।"

শ্রীকৃষ্ণ শুনিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন, "দেবি, তা আপনি যাহা বলিলেন, বহুদিন পূর্ব্বেই আমি তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছি। আমার যাহা অবশ্যকর্ত্তব্য, এক্ষণে আপনি তাহাই কহিলেন।"

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের অবসান হইল। পাণ্ডবগণ নিষ্কণ্টকে রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে ভক্তি ও সেবা দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন। তাঁহারাও শোকদুঃখ বিস্মৃত হইয়া তাহাদিগকে পুত্রস্থানীয় জ্ঞানে স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবদিগের গুণে তাঁহাদিগের কোন অভাব, কোন ক্লেশই রহিল না, কিন্তু তাঁহাদিগের পক্ষে শান্তি দুর্লভ হইল। হস্তিনাপুরী শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল, পতিপুত্রহীনা রমণীগণের ক্রন্দনে তাহা দিবারাত্রি আকুল থাকিত। প্রতিপদে পুত্রগণের স্মৃতি শোকার্ত্ত দম্পতীকে দগ্ধ করিত। তাঁহারা অরণ্যে গমন করিয়া তপস্যায় জীবন শেষ করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী গঙ্গাতীরস্থ এক রমণীয় আশ্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তথায় তাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠান, বেদপাঠশ্রবণ এবং শাস্ত্রালোচনায় পরম সুখে সময় অতিবাহিত করিতেন। ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির সর্ব্বদা তাঁহাদিগের সংবাদ লইতেন এবং কখন কখন আশ্রমে গিয়া তাঁহাদিগকে দেখিয়া আসিতেন। একদিন অন্তরাজ গঙ্গাদ্বার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যজ্ঞ সমাপন করিলে যাজকগণ সেই অগ্নি নির্জ্জন বনে নিক্ষেপ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ক্রমে সেই অনল বর্দ্ধিত হইয়া শুষ্ক কাষ্ঠ সংযোগে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী কুটীরে উপবেশন করিয়াছিলেন। অকস্মাৎ অগ্নির প্রচণ্ড গর্জ্জন ও আশ্রমবাসিগণের আর্ত্তনাদ তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হইল। দেখিতে দেখিতে হুতাশন প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কুটীর আক্রমণ করিলেন। 'আর রক্ষা নাই, পলায়ন করুন, পলায়ন করুন' এই বাক্য পুনঃ পুনঃ তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হইতে লাগিল। ধৃতরাষ্ট্র সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া গান্ধারীকে বলিলেন, "প্রিয়ে! তুমি

চক্ষুর আবরণ উন্মোচন কর, পথ দেখিতে পাইলে অনায়াসেই পলায়ন করিতে পারিবে। আমাকে সঙ্গে লইলে আমি তোমার ব্যাঘাত স্বরূপ হইব। তুমি পলায়ন কর; আমার জন্য চিন্তা করিও না।"

গান্ধারী বলিলেন, "না নাথ! এত দিন পরে কোন্ সুখের আশায় তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মপ্রাণ রক্ষা করিব? আসুন যে অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া উভয়ে মিলিত হইয়াছিলাম, সেই অগ্নিতে জীবন বিসর্জন করিয়া উভয়েই শান্তি লাভ করি।" গান্ধারীদেবী এই বলিয়া পতিকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন এবং তদবস্থায় উভয়েই অগ্নিতে ভস্মীভূত হইলেন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

মুখর-মুদ্রা।

তুমি বলিতেছ আমি নূতন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমার বয়স তোমাপেক্ষা অনেক অধিক। তুমি ভাবিতেছ যে আমি যীশু জন্মাইবার এক হাজার নয় শত সাত বৎসর পরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু আমি যীশু জন্মাইবার অনেক পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; এত পূর্ব্বে যে তাহা ধারণা করিবার শক্তি তোমার নাই। আমার যে বর্ত্তমান আকার দেখিতেছ ইহা আমার পরিচ্ছদ মাত্র। তোমার বস্ত্র জীর্ণ হইলে তুমি যেমন তাহা পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান কর, মানব-দেহ জীর্ণ হইলে তাহার অধিবাসী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যেমন নূতনে আশ্রয় গ্রহণ করে, আমরাও সেইরূপ এক রূপ জীর্ণ হইলে নূতন আকার গ্রহণ করিয়া থাকি। তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর যে আমার বয়স কত, তাহা হইলে হয় তো আমি তোমাকে বুঝাইতে পারিব না, কারণ তোমার যেরূপ ভাবে সময় মাপিয়া থাক সেরূপ ভাবে গণনা করিতে আমাদিগকে কেহ শিখায় নাই। তবে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে বহু সহস্র মন্বন্তর জীবন আমার প্রথম আলোক দর্শনের পর অতিবাহিত হইয়াছে; আমি কোন্ সময়ে কি ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না, তবে জ্ঞানোদয়ের পরক্ষণেই দেখিয়াছিলাম যে কঠিন পাষাণ-কণাসমূহ আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আমার উপরে ও নীচে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আকারের স্বজাতীয়েরা আমারই ন্যায় পাষাণের মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছিল। তাহাদিগের নিকট শুনিতাম যে, যে পাষাণখণ্ডে আমরা আবদ্ধ আছি দিবারাত্রি তাহার উপরিভাগ দিয়া জল বহিয়া যাইতেছে। জলের ঘর্ষণে প্রতিদিন শত শত পাষাণ ও সুবর্ণকণা মুক্ত হইয়া কোথায় চলিয়া যায়। পাষাণকণাগুলি যথাসাধ্য জলের সহিত যুদ্ধ করে ও পরিশেষে পরাস্ত হইয়া নিজেরাই ভাসিয়া

যায়। আমরাও তথৈবা করিতাম যে উপরের কণাগুলি ভাসিয়া গেলে আমরাও একদিন মুক্ত হইব, কিন্তু পাষাণকণাগুলি ঘোরতর আপত্তি করিত ও বলিত আমরা কখনই যাইতে দিব না। এইরূপে গ্রীষ্মের পর শীত ও শীতের পর গ্রীষ্ম কাটিয়া গিয়াছিল, কত দিন এইরূপে অতিবাহিত হইয়াছিল তাহার ধারণা আমার নাই। একবার শীতকালে শুনিলাম যে উপরের জলপ্রবাহ তুষারে পরিণত হইয়াছে ও জলের গতি রোধ হইয়াছে। এই সময়ে কিয়ৎ পরিমাণ জল সূক্ষ্ম পাষাণকণাগুলির মধ্যে পথ বাহির করিয়া পাষাণখণ্ডের গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। জল-প্রবাহ তুষারে পরিণত হইবার ২।১ দিন পরেই পাষাণের মধ্যস্থিত জলও কঠিন হইতে লাগিল, তরল জলের কাঠিন্য প্রাপ্তির সহিত আকার বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করিল, ক্রমে যে দিন পাষাণের মধ্যস্থিত সমস্ত জলকণাগুলি স্বচ্ছ তুষারে পরিণত হইল সেই দিন মহাশব্দের সহিত পাষাণখণ্ড বিদীর্ণ হইয়া গেল ও পাষাণের উপরিভাগ শত শত ক্ষুদ্র উপলখণ্ডে পরিণত হইল। কিন্তু দ্বিতীয় পাষাণখণ্ডের ন্যায় উপরের তুষারাবরণ উপলখণ্ডগুলিকে স্বস্থানে কিয়ৎ কালের জন্য রক্ষা করিল। শীত অতীত হইলে সূর্য্যোত্তাপে তুষার ক্রমশঃ গলিত হইতে লাগিল, প্রথমে উপরিভাগে ক্ষীণ স্রোতের শব্দ শ্রুত হইল, ক্রমে তাহা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, অবশেষে প্রবলবেগে একদিন জল আসিয়া অবশিষ্ট তুষারাবরণ ভাসাইয়া লইয়া গেল, আমরা মুক্ত হইলাম, প্রবল স্রোতের সম্মুখে পাষাণ-খণ্ডগুলি যে কোথায় চলিয়া গেল তাহা আর দেখিতে পাওয়া গেল না। এই পাষাণ-খণ্ডগুলির মধ্যে একটিতে আমি আবদ্ধ ছিলাম। মুক্ত হইয়া জলস্রোতে তাড়িত হইতে হইতে দ্রুতবেগে নিম্নস্থিত অপর একখানি বৃহদাকার পাষাণখণ্ডের উপরে পতিত হইলাম, বেগে পতিত হইবা মাত্র যে পাষাণখণ্ডে আমি আবদ্ধ ছিলাম তাহা শত শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল। ইহার পরে আমি যে খণ্ডটিতে রহিলাম তাহা বৃহৎ পাষাণখণ্ডের নিম্নে পতিত হইয়া জল-স্রোতে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। ঘূর্ণমান প্রস্তরখণ্ডদ্বয়ের ঘর্ষণে অতি শীঘ্রই আমি কতিপয় স্বজাতীয় পাষাণকণার সহিত মুক্ত হইলাম। মুক্ত হইয়া ভাসিতে ভাসিতে ক্রমে পর্ব্বতের নিম্নে উপস্থিত হইলাম তার পর একদিন রাত্রিকালে বায়ুতাড়িত তরঙ্গ বালুকা-সঙ্কুল তটভূমিতে আমাকে নিক্ষিপ্ত করিল। পরদিন প্রভাতে দেখিলাম যে আমার ন্যায় শত শত সুবর্ণকণা তটভূমিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, প্রথম সূর্য্যালোক আসিয়া তাহাদিগের উপর পতিত হইতেছে ও তাহাদিগকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে সলোমচর্ম্ম-পরিহিত কতক-গুলি মনুষ্য আসিয়া আমাদিগকে সংগ্রহ করিতে লাগিল। ইহাদিগের প্রত্যেকের হস্তে এক একটি জলপূর্ণ মৃণ্ময়পাত্র, তট-ভূমি হইতে মুষ্টি মুষ্টি বালুকা লইয়া জলে ধৌত করতঃ অপেক্ষাকৃত গুরুভার সুবর্ণ-কণাগুলি লইয়া চর্ম্ম মধ্যে সংগ্রহ করিতে লাগিল। এইরূপে প্রভাতের কিয়ৎক্ষণ

পর হইতে সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত এক মুষ্টি সুবর্ণ সংগ্রহ করিয়া সদোষে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। অপরাপর সুবর্ণকণার সহিত আমিও সেই দিন সংগৃহীত হইলাম। যে ব্যক্তি আমাকে সংগ্রহ করিয়াছিল সে অপরাপর সুবর্ণকণার সহিত ক্ষুদ্র চর্ম্ম-পেটিকায় আমাকে আবদ্ধ করিয়া নদীতীর পরিত্যাগ করতঃ বন মধ্যে প্রবেশ করিল। বনান্তরালে গুহা মধ্যে তাহার আবাসস্থান, আমার স্বামী সন্ধ্যার কিয়ৎকাল পরে গুপ্তগৃহে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে একটি বৃহদাকার চর্ম্ম-পেটিকার মধ্যে নিক্ষেপ করিল। এই চর্ম্ম-পেটিকার মধ্যে কিছু দিন বাস করিলাম, আমাদিগের আহরণকর্ত্তা প্রতিদিন নদীতীর হইতে মুষ্টি মুষ্টি সুবর্ণ-কণা সংগ্রহ করিয়া আনিত ও সেই চর্ম্ম-পেটিকার মধ্যে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিত, এইরূপে শত শত মুষ্টি সুবর্ণকণা সংগৃহীত হইল ও চর্ম্ম-পেটিকা প্রায় পরিপূর্ণ হইয়া আসিল।

একদিন প্রভাতে আমাদিগের স্বামী চর্ম্ম-পেটিকা লইয়া গুহা হইতে বহির্গত হইল ও নদীতীর অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিল, সমস্ত দিন চলিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে অপর একটি গুহায় আশ্রয় লইল, সেখানে দেখিলাম তাহারি ন্যায় কতকগুলি মনুষ্য একত্রিত হইয়াছে, সকলেই সলোম পশু-চর্ম্ম পরিধান করিয়াছে, প্রত্যেকের নিকটে এক বা ততোধিক চর্ম্মপেটিকা ও শাণিত প্রস্তরফলকযুক্ত ভল্ল বা ধনুর্ব্বাণ। সন্ধ্যাগমে মনুষ্যগুলি পাষাণে পাষাণ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিল ও শুষ্ক কাষ্ঠ-খণ্ডের রাশিতে অগ্নি সংযোগ করিয়া তদ্রাগে বিদ্ধ পশুমাংস দগ্ধ করিতে লাগিল। দগ্ধ পশুমাংস ভক্ষণ করিয়া, স্ব স্ব চর্ম্ম-পেটকাগুলির উপরে মস্তক ন্যস্ত করিয়া নিদ্রিত হইল। প্রভাতে সকলে পুনরায় নদীতীর অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিল ও মধ্যাহ্নে নদীতীরবর্ত্তী বন অতিক্রম করিয়া প্রান্তরে পতিত হইল। বন অতিক্রান্ত হইলে দৃষ্ট হইল যে বিশাল প্রান্তর মধ্যে শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া পথ চলিয়া গিয়াছে, মনুষ্য-চরণক্ষুণ্ণ পথে তৃণ জন্মে নাই, শ্যামল শস্যক্ষেত্রের মধ্যে শুভ্র পথ চলিয়া গিয়াছে ও শস্যক্ষেত্রগুলি অতিক্রম করিয়া প্রান্তরের মধ্যস্থিত বৃক্ষ-সমষ্টির মধ্যে আসিয়া শেষ হইয়াছে। বিশাল প্রান্তরের মধ্যবর্ত্তী বৃক্ষসমষ্টি দেখিলে দূর হইতে ক্ষুদ্র বন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু নিকটবর্ত্তী হইলে দৃষ্ট হইল যে, বৃক্ষতলে শুষ্ক তৃণাচ্ছাদিত অনেকগুলি কুটীর রহিয়াছে। চর্ম্মাবৃত মনুষ্যগুলি প্রান্তর অতিক্রম করিয়া কুটীরগুলির সন্নিধানে উপস্থিত হইল ও চর্ম্মপেটিকাগুলি ভূমিতে নামাইল। দেখিলাম বৃক্ষতলে সারি সারি বিপণী বসিয়াছে, প্রত্যেক বিপণীতে শ্বেত বস্ত্র ও উষ্ণীষ পরিহিত এক এক জন মনুষ্য বসিয়া আছে, তাহার চতুঃপার্শ্বে ধান্য, যব, গোধূম, লবণ, কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্র শর্করা প্রভৃতি নানাবিধ পণ্য ভারে ভারে সজ্জিত রহিয়াছে। প্রতি বিপণীতে চর্ম্মাবৃত মনুষ্য-গণ সুবর্ণকণার বিনিময়ে নানাবিধ শস্য, বস্ত্র ও লবণ প্রভৃতি ক্রয় করিতেছে। ক্রেতা আবশ্যক দ্রব্য অঙ্গুলিনির্দ্দেশে

বিক্রেতাকে দেখাইয়া দিতেছে ও চর্ম্ম পেটিকা হইতে সুবর্ণকণা লইয়া বিক্রেতার হস্তে অর্পণ করিতেছে, সে ব্যক্তি সুবর্ণ কণাগুলি তুলাদণ্ডে তৌল করিয়া স্বীয় বস্ত্র মধ্যে রক্ষা করিতেছে ও পরে বৃহত্তর তুলাদণ্ড লইয়া ক্রেতার অভীপ্সিতদ্রব্য প্রদান করিতেছে। আমার স্বামী আমার সহিত এক মুষ্টি অপরাপর সুবর্ণকণার পরিবর্ত্তে বৃহদাকার দুই খণ্ড লবণ ক্রয় করিল সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমার নূতন স্বামী বিপণীর অবশিষ্ট দ্রব্যগুলি পেটিকায় আবদ্ধ করিয়া পর্ণকুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিল ও প্রভাতে পেটিকাগুলি অশ্ব ও গোপৃষ্ঠে ন্যস্ত করিয়া প্রান্তর পরিত্যাগ করিল। রজনী দ্বিপ্রহর অতীত হইলে ভারবাহী পশুগুলি লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাষাণখণ্ড-নির্ম্মিত গুহা মধ্যে সে প্রবেশ করিল, পরে শুনিয়াছি ইহা গুহা নহে নগরের তোরণ।

গুহা মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম তাহার পরেই প্রশস্ত রাজপথ ও তাহার উভয় পার্শ্বে ক্ষুদ্র বৃহৎ সহস্র সহস্র গুহা বা গৃহ। রাজপথে কিয়ৎদূর চলিয়া আমাদিগের স্বামী একটি ক্ষুদ্র গুহা বা গৃহে প্রবেশ করিল ও বস্ত্র মধ্য হইতে সুবর্ণ কণাগুলিকে বাহির করিয়া কাষ্ঠখণ্ডনির্ম্মিত ক্ষুদ্রতর গুহায় আবদ্ধ করিল। প্রভাতে উঠিয়া পুনরায় আমাদিগকে লইয়া সে ব্যক্তি বহির্গত হইল ও প্রশস্ত রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইল। পূর্ব্ব রাত্রিতে রাজপথ প্রায় জনশূন্য নীরব দেখিয়াছিলাম, কিন্তু প্রভাতে দেখিলাম রাজপথে তিল মাত্র স্থান নাই, হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র গো ও মহিষগণ ভার বহন করিতেছে, এতদ্ব্যতীত গো, মহিষ, উষ্ট্র ও অশ্বগণ বর্ত্তুলাকার কাষ্ঠ খণ্ডদ্বয়ের উপর স্থাপিত মঞ্চগুলি টানিয়া লইয়া যাইতেছে, পরে জানিয়াছি ইহার নাম রথ, বস্ত্র পশুগুলিকে ও রথগুলিকে মনুষ্যগণ যদৃচ্ছানুক্রমে ইতস্ততঃ চালিত করিতেছে; নগরে আসিয়া দেখিলাম মনুষ্যগণ সর্ব্বজয়ী। রাজপথ অতিক্রম করিয়া আমাদিগের স্বামী একটি বৃহৎ পাষাণ-নির্ম্মিত গৃহে প্রবেশ করিল, প্রবেশ মাত্র বুঝিলাম গৃহটি একটি বিপণী, অসংখ্য স্ত্রী ও পুরুষ দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেছে। বিপণী শস্যের বা বস্ত্রাদির নহে, নানাবিধ সুবর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত দ্রব্যাদি ক্রীত ও বিক্রীত হইতেছে। আমাদিগের স্বামী বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে আমাদিগকে বাহির করিয়া একটি তুলাদণ্ডের উপরে নিক্ষেপ করিল, বিপণীর অধিকারী আমাদিগকে তৌল করিয়া আমাদিগের স্বামীকে এক মুষ্টি চতুষ্কোণ উজ্জ্বল সুবর্ণখণ্ড প্রদান করিল। আমাদিগের পূর্ব্ব স্বামী সুবর্ণখণ্ডগুলি লইয়া প্রস্থান করিল ও আমরা একটি লৌহপেটিকার মধ্যে অপরাপর সুবর্ণকণার উপরে নিক্ষিপ্ত হইলাম। (ক্রমশ)

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

গবাদি পশু সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

আমাদের দেশীয় গৃহপালিত পশ্বাদির অবস্থা অতিশয় শোচনীয়, উহাদের অবস্থা ক্রমশঃই অবনতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিলে গ্রাম্য পশ্বাদির বর্ত্তমান অবনতি দূর হইতে পারে সে বিষয়ে কেহই চিন্তা করিয়া দেখেন না। অথবা চিন্তা করিলেও আপনাদের নির্দ্ধারিত উপায় কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করেন না।

গো এবং মহিষ জাতির শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে ভারতবাসীর সুখ স্বচ্ছন্দতা একান্ত জড়িত। গো মহিষ এ দেশের কৃষিকার্য্যের এবং ভারবহনাদিকার্য্যের প্রধান সহায়। ইহারা কৃষকের একমাত্র সম্বল। ভারতবাসীর শারীরিক ও মানসিক শক্তি রক্ষার্থ গো এবং মহিষ-দুগ্ধ ও তজ্জাত নবনীত এবং ঘৃতাদি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই গো মহিষ-জাতির হীনাবস্থা ঘটিয়াছে। আমরা সময়ে সময়ে সংবাদপত্রে এ বিষয়ের আলোচনা দেখিতে পাই, এতদ্বারা অনুমিত হয় যে শিক্ষিত সম্প্রদায় গো-মহিষ-জাতির অবনতি জনিত ক্লেশ তীব্রভাবে অনুভব করিতেছেন। ইহা সাময়িক শুভলক্ষণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে এ অঞ্চলের প্রায় সর্ব্বত্রই গোশালা গো পূর্ণ, বাথান * মহিষপূর্ণ দেখা যাইত, কিন্তু এক্ষণে আর গোশালায় ও বাথানে সেরূপ গো-মহিষ-সংখ্যা দেখা যায় না। অনেক স্থলে গোশালা ও বাথান পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইয়াছে শতাধিক গো-মহিষ পালন এক্ষণে কিম্বদন্তীতে পরিণমিত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমরা এক টাকায় ২০ সের দুগ্ধ বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি, বর্ত্তমান সময়ে টাকায় ৩।৪ সের দুগ্ধও সকল সময় পাওয়া যায় না। দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় দুগ্ধে ও ঘৃতে নানারূপ কদর্য্য ও স্বাস্থ্যহানিকর দ্রব্য বহুল পরিমাণে মিশ্রিত হইতেছে। বিশুদ্ধ দুগ্ধ ও ঘৃত সংগ্রহ নিতান্ত কষ্টসাধ্য হইয়াছে অল্পাবস্থায় লোকের যে স্বাস্থ্যের হানি হইবে তাহার আর সন্দেহ কি!

গো-মহিষ জাতির অবনতিতে একদিকে যেমন দুগ্ধ ঘৃত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনই কৃষিকার্য্যেরও গুরুতর ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। ভূমিতে সার প্রদান ভিন্ন কৃষির উৎকর্ষতা সাধিত হইতে পারে না। এ দেশের কৃষক-সম্প্রদায় মধ্যে গোময় এবং গোমূত্র ভিন্ন অন্যপ্রকার সার ব্যবহারের প্রথা প্রচলন নাই, গো সংখ্যার অল্পতা নিবন্ধন ঐ সকল সার দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় সার-প্রদান ক্রমশঃ রহিত হইয়া আসিতেছে। সারের অল্পতা জন্য প্রচুর পরিমাণে শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত জন্মিতেছে।

আমাদের দেশে দিন দিনই সুবিস্তৃত চারণ-ভূমি সকল কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হওয়ায় উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যাভাবে গৃহপালিত

* যেখানে রাত্রিতে পশু সকল রুদ্ধ করিয়া রাখে

পশুসমূহ ক্রমশঃই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। জনসংখ্যার আধিক্য এবং শস্যক্ষেত্রের উর্ব্বরতাশক্তির হ্রাস হওয়াতে কৃষিজাত দ্রব্যাদি পূর্ব্বাপেক্ষা মহার্ঘ্য হইয়াছে। তদ্ভিন্ন কৃষকগণ গ্রামস্থ চারণ ভূমিগুলিতেও শস্যোৎপাদন করিতেছে। সেই জন্য এক্ষণে আর পূর্ব্বের ন্যায় চারণ-ভূমি দৃষ্টিগোচর হয় না। এ দিকে কালধর্ম্মে অর্থের প্রয়োজনীয়তা এবং অর্থ-লালসা বর্দ্ধিত হওয়ায় ভূম্যধিকারীরাও আয়বৃদ্ধির সুবিধা দেখিয়া প্রজার সহিত ঐ সকল ভূমির কর আদায়ের বন্দোবস্ত করিতেছেন। প্রচুর তৃণাভাবে পশুগণও ক্রমশঃই জীর্ণশীর্ণ কলেবর ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অকালে কাল-কবলে পতিত হইতেছে।

পশুপালন করিয়া যে বিশেষ লাভবান হওয়া যাইতে পারে সে বিষয়ে আমাদের দেশীয় পশুপালকদের জ্ঞান অতি সঙ্কীর্ণ। কাজেই পশুদিগের নিমিত্ত কর প্রদান করিয়া চারণ-ভূমি রাখা তাহারা নিতান্তই ক্ষতিকর বলিয়া মনে করে. ইংলণ্ডের কৃষিক্ষেত্রের বাৎসরিক কর গড়ে প্রতি বিঘা ৭৲ সাত টাকা. চারণ-ভূমির প্রতি বিঘার কর ১২৲ বার টাকা। ইহা ব্যতীত চারণ-ভূমি চাষের ব্যয় আছে। একখানি ভূমি চারণ-ভূমিতে পরিণত করিতে বিঘা প্রতি ১২৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকা ব্যয় হয়। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে সে দেশে চারণ-ভূমির আদর কত। এতাধিক ব্যয় করিয়াও ইংলণ্ডীয় পশু পালকগণ পশুপালন করিয়া বিলক্ষণ লাভ করিতেছে। বিগত ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের পার্ব্বত্য ভূমি বাদে অবশিষ্ট ১০ কোটী বিঘা ভূমি মধ্যে ৬ কোটী ভূমিই চারণভূমিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এ কথা শুনিলে হয় ত আমাদের দেশীয়গণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইবেন।

আমাদের প্রাচীন আর্য্যমহাত্মাগণ গো-চারণ-ভূমির কর গ্রহণ করা পাপজনক বলিয়া মনে করিতেন। আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মহর্ষি মনু স্বীয় সংহিতায় লিখিয়াছেন যে "ধনুঃ শতং পরীহারো গ্রামস্যান্তাৎ সমন্ততঃ। সম্যাপাতাস্ত্রয়োবাপি ত্রিগুণো নগরস্য তু॥" অর্থাৎ গ্রামের সীমা হইতে চারিদিকে এক শত ধনু (চারি শত হস্ত অথবা চারি হস্ত পরিমিত যষ্টি তিনবার প্রক্ষেপ পরিমিত স্থান গোচারণের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ তাহাতে কোন প্রকার শস্য বপন করিবে না। নগরের চতুর্দ্দিকে ঐ নিয়ম ইহার ত্রিগুণ স্থান রক্ষা করিবে। বর্ত্তমান কালে প্রায় সমস্ত ভূমিই বিবিধ শস্যে পরিপূর্ণ; চারণ-ভূমি বোধ করি অধিক চক্ষুগোচর হইবে না। বর্ত্তমান সময়ে লোকের যেরূপ মনোভাব লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে পাশ্চাত্য কিম্বা প্রাচ্য দৃষ্টান্ত যে কার্য্যকরী হইবে সে আশা ক্ষীণ, তবে ভূম্যধিকারীরা যদি গ্রামের চারণভূমি গুলির অল্পমাত্র কর গ্রহণপূর্ব্বক প্রজা-দিগকে বন্দোবস্ত করিয়া দেন, তাহা হইলেও কতকটা ফল দর্শিতে পারে; কিন্তু কেবল চারণভূমি নির্দ্দিষ্ট করিলেই যে যথেষ্ট হইবে তাহা নহে, চারণভূমিতে পশুদিগের আহারোপযোগী পুষ্টিকর তৃণাদি যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিতে

পারে তাহারও উপায় বিধান করা আবশ্যক হইবে।

প্রাচীনকালে হিন্দুদিগের প্রেতশ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে উৎকৃষ্ট লক্ষণাক্রান্ত বৃষ ছাড়িয়া দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। কিরূপ লক্ষণাক্রান্ত বৃষ উৎসর্গ করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে মহর্ষি কাত্যায়ন বলিয়াছেন "অব্যঙ্গ জীববৎসাঽঃ পয়স্বিন্যাঃ সুহোবনী। একবর্ণো দ্বিবর্ণো বা যোবাস্যাদষ্টকাসুতঃ॥" অর্থাৎ যে বৃষ অবিকলাঙ্গ, জীবিতবৎসা দুগ্ধবতীর পুত্র বলবান, একবর্ণ বা দুইবর্ণ বিশিষ্ট এবং অষ্টকা তিথিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে সেই প্রকার লক্ষণাক্রান্ত বৃষ উৎসর্গ করিবে। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনায়াসেই বুঝা যায় যে আর্য্য-ঋষিগণের উদ্দেশ্য কত মহৎ ছিল এবং গোজাতির উন্নতিসাধনবিষয়ে তাহাদের কত দূরদর্শিতা ছিল। এই উৎসর্গীকৃত বৃষের যাহাতে বলক্ষয় না হয় আর্য্য-ঋষিগণ তৎপক্ষেও যত্নের ত্রুটী করেন নাই। মহামুনি গোভিল বলিয়াছেন "বৃষভস্তু সমুৎসৃষ্টং কপিলাবাপিকামতঃ যোজয়িত্বা হলং কুর্য্যাৎ ব্রতং চান্দ্রায়ণং স্মরেৎ॥" অর্থাৎ যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক উৎসর্গীকৃত বৃষ কিম্বা কপিলা দ্বারা হল চালনা করে তবে তাহাকে দুইটি চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে। ঐ সকল বৃষকে সকলেই ভয় করিতেন! সুতরাং গোবংশবৃদ্ধির সহজ উপায় ছিল। গাভীদিগের সংযোগ-বিধানের নিমিত্ত ষণ্ড-রক্ষার বিশেষ প্রয়োজন হইত না। ক্রমে দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তার আরম্ভ হইলেও উৎসর্গীকৃত বৃষগুলিকে স্বেচ্ছামত বিচরণ করিতে দেওয়া হইত। সেই সময়েও বৃষাভাব নিবন্ধন গোবংশ-বৃদ্ধির তাদৃশ অসদ্ভাব হয় নাই। স্বেচ্ছা-বিহারী বৃষগুলি বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট ও বীর্য্যবান হইত, তাহাদের দ্বারা স্বচ্ছন্দে বিহারিণী বৎসতরী হইতে যে সকল সন্তান জন্মিত, তাহাও সমধিক বলিষ্ঠ হইত। অধুনা বৎসতরীগুলিকে গৃহস্থেরা গ্রহণ করে বলিয়া তাহাদের আর সেরূপ সন্তান জন্মে না। অবশেষে ইংরাজী ১৮৬৮ সালের মিউনিসিপাল ৬ আইন প্রচার হইলে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন গ্রাম ও নগরগুলিতেই পৌণ্ড অর্থাৎ অস্বামীক পশু আবদ্ধস্থান স্থাপিত হওয়ায়, প্রথমতঃ গ্রামস্থ ষণ্ডগুলিকেই আবদ্ধ করিয়া সুলভ মূল্যে বিক্রীত করা হইল। হৃষ্টপুষ্টকলেবর বৃষগুলি নিষ্ঠুর ক্রেতাদিগের হস্তে নিপতিত হইয়া কতকগুলি কসাইখানায় গোলীলা শেষ করিল ও কতকগুলি মুষ্কচ্ছেদিত হইয়া বাহকের ও হলচালকের কার্য্যে নিযুক্ত হইল. সুতরাং বৃষের সংখ্যা সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িল। অনন্তর ক্লতক্লীব ষণ্ড দ্বারা হলচালনপ্রথা প্রচলিত হওয়ায় ষণ্ডের সংখ্যা আরও অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে বহুসংখ্যক গাভীর পাল মধ্যেও দুই একটি পূর্ণবয়স্ক ষণ্ড খুজিয়া পাওয়া সুকঠিন। এতদঞ্চলে সংযোগক্রিয়া সম্পাদনের জন্য ষণ্ডরক্ষা করার পদ্ধতি প্রায় নাই বলিলেই হয়। অধিকাংশ স্থলেই যে সকল ষণ্ড বলদ বানাইবার জন্য রাখা হয়, সেই সকল অপরিণতবয়স্ক ষণ্ড দ্বারা সংযোগক্রিয়া

সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং সেই অপরিণত বয়সের নিস্তেজ ও দুর্ব্বল ষণ্ডের ঔরসে যে সকল সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, তাহারা কাজেই দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া থাকে এই প্রকারে আমাদের দেশীয় পশুদির সংযোগক্রিয়ার ব্যভিচারবশতঃ বংশপরম্পরায় তাহারা ক্রমশঃই খর্ব্বাকার, ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। শরীর দুর্ব্বল হইলে অতি অল্প কারণেই পীড়ার উৎপত্তি হয় এবং সেই পীড়া সহজেই কঠিন ভাবে পরিণত হইয়া প্রাণ বিনাশের কারণ হইয়া উঠে। অক্লীব ও কৃতক্লীবের সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে অক্লীব পশু সকলের প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত উদ্ধত, আর কৃতক্লীব পশু সকল স্বভাবতঃই নিরীহ। এই নিমিত্ত এক্ষণে হলচালনাদি শ্রমজনক কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য অনেকেই কৃতক্লীবকে অধিক মনোনীত করিয়া থাকেন। এই প্রকার সামান্য অসুবিধার জন্য পশুজাতির ভাবী উন্নতির পথের অন্তরায়স্বরূপ পুংপশু সকলের পুংত্ব বিনাশ করা নিতান্তই অনুচিত। প্রাচীন দূরদর্শী আর্য্যগণ গোবংশের ভাবী উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইবার আশঙ্কায় কৃতক্লীব গো দ্বারা হলচালনপ্রথার অনুমোদন করেন নাই। মহামুনি পরাশর বলিয়াছেন "স্থিরাঙ্গং নীরুজং দৃপ্তং বৃষভং বন্ধবর্জ্জিতং। যাহয়েদ্দিবসস্যার্দ্ধং পশ্চাৎ স্নানং সমাচরেৎ।" অর্থাৎ স্থিরাঙ্গ, নিরোগী, গর্ব্বিত ও অক্লীব বৃষ দ্বারা দুই প্রহর কাল পর্য্যন্ত হলবাহন করিয়া পশ্চাৎ স্নান করাইতে হইবে। বাহন সকল হলবাহনাদিতে যাহাতে ক্লিষ্ট কিম্বা দুর্ব্বল না হয় তৎপক্ষেও তত্ত্বদর্শী পরাশর বিধি নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, যথা—"হলমষ্টগবং ধর্ম্ম্যং ষড়্গবং ব্যবসায়িণাম্ চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবঞ্চ গবাদিনাম্।" অর্থাৎ ৮টি গো দ্বারা হলচালন করাই ধর্ম্মসঙ্গত, ছয়টি গো দ্বারা হলচালন করা ব্যবসায়ীর কার্য্য এবং চারিটি গো দ্বারা হলচালন করা নৃশংসের কার্য্য ও দুইটি গো দ্বারা হলচালন করা গোখাদকের কার্য্য। মহাত্মা পরাশরের উপরোক্ত মূল্যবান উপদেশ ও শাসনবাক্য উপেক্ষা করাতেই গোজাতির এতাধিক দুর্গতি ঘটিয়াছে। প্রাচীন আর্য্য-ব্যবস্থা অনুসারে আটটি গো দ্বারা যদি হলচালন করা যায়, তাহা হইলে প্রাতঃকাল হইতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে প্রতি জোড়া গরুর পক্ষে ১½ ঘণ্টামাত্র সময় লাগে, তাহার পরই বিশ্রাম জন্য অবসর পায়। ছয়টি বৃষ দ্বারা হল চালন করিলে প্রতি জোড়ার পক্ষে দুই ঘণ্টাকাল মাত্র পরিশ্রম করিতে হয়। চারিটি দ্বারা হল চালন করিলে প্রতি জোড়ার পক্ষে ৩ ঘণ্টাকাল পরিশ্রম করিতে হয়। বর্ত্তমান কালে দুইটির অধিক গরু ক্রয় করিতে কেহ ইচ্ছা করে না এবং কৃষকশ্রেষ্ঠের গৃহে গৃহে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে দুইটি কৃতক্লীব বৃষ দ্বারা হলচালন করাই তাহারা কর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যে পরিগণিত করিয়াছে। প্রতি হালে দুইটির অধিক গরু রাখিতে প্রায় কেহই ইচ্ছা করে না। দুইটি বাহন দ্বারা ব্যাপক কাল অবিশ্রান্ত অনাহারে হল চালিত হওয়ায় ক্রমেই যে

ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া তাহারা অল্পকাল মধ্যে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে, তাহা কেহ ভ্রমেও মনে করে না। বর্ত্তমান সময়ে দুইটির অধিক গো কিনিতে গেলেই অধিক অর্থ-ব্যয়ের আশঙ্কায় কেহই দুইটির অধিক গরু ক্রয় করিতে অগ্রসর হয় না। কিন্তু ইহা বিষম ভ্রান্তি! নিরন্তর পরিশ্রমে যখন বাহন সকল অল্পকাল মধ্যে ক্লিষ্ট হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করে, তখন বাধ্য হইয়াই পুনরায় সেই অর্থব্যয়ই করিতে হয়, ইহা অপেক্ষা অদূরদর্শিতা আর কি হইতে পারে? দূরদর্শী পরাশর এই ভাবি অনিষ্ট নিবারণের জন্যই দুইটি গো দ্বারা হল-চালকদিগকে "গোধাদকের" ন্যায় পাপী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে এতদপেক্ষা কঠোর শাসন আর কি হইতে পারে! এই সকল সদুপদেশ অগ্রাহ্য করা হেতুই কৃষকদিগের সমূহ ক্ষতি ও গবাদির এত দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে।

আমাদের দেশের গোশালাগুলি এত নিম্ন করিয়া প্রস্তুত করা হয় যে ঐ গোশালার মধ্যে আলোক কিম্বা বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং মেঝের আর্দ্রতা দূর হয় না। এই প্রকার নির্ম্মাণ দোষে উহা অত্যন্ত অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে। অতি ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট একখানা গোশালা মধ্যে অধিকসংখ্যক গরু সমস্ত রাত্রি দাঁড়াইয়া কাটায়। তাহাতে আবার অধিকাংশ স্থলেই মল-মূত্রাদি পরিষ্কার করা হয় না; গোশালার বেড়াগুলি আবার এরূপ বিশৃঙ্খল ভাবে প্রস্তুত করা হয় যে গোশালার পশুগুলি প্রবল বায়ু, বৃষ্টি ও দারুণ শীতের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হয় না। সুতরাং এরূপ গোশালা যে গোগণের স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে তাহা অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। গোশালা সম্বন্ধে মহর্ষি পরাশর লিখিয়াছেন "গোশালা সুদৃঢ়া যস্য শুচির্গোময়বর্জ্জিতা; তস্য বাহা বিবর্দ্ধন্তে পোষণৈরপি বর্জ্জিতা: সকৃন্মূত্র বিলিপ্তাঙ্গ বাহা যত্র দিনে দিনে, নিঃসরন্তি গবাং স্থানাৎ তত্র কিং পোষণাদিভিঃ।" অর্থাৎ যাহার গোশালা সুদৃঢ়, পবিত্র ও গোময়বর্জ্জিত তাহার গো সকল পোষণ অভাবেও সতত পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, কিন্তু যে স্থানে বাহন সকল সতত মল-মূত্রাদিতে বিলিপ্তদেহ থাকে, তাহার বাহন সকল দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অন্যরূপ পোষণ দ্বারা কি হইতে পারে?

বঙ্গদেশে "রাখাল" বলিতে চাষার একটি অজ্ঞান ও অজ্ঞাতশ্মশ্রু বালককে অথবা অকর্ম্মণ্য একটা নির্ব্বোধ চাষাকে বুঝাইয়া থাকে। ইহারাই পশুরক্ষার্থে নিযুক্ত। যাহারা আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ তাহারা পশ্বাদি রক্ষা করিতে কতদূর সমর্থ হইবে, কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। অনেক সময় উহারা অকারণে পশুগুলিকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার, নানাপ্রকারে যাতনা-প্রদান ও উপদ্রব করিয়া থাকে। রাখালগণ অধিকাংশ সময়ই তাহাদের অবস্থানের সুবিধাকর স্থানে পশুগুলিকে রাখিয়া থাকে। তথায় তাহাদের পান;-

হারের সুবিধা থাকুক বা না থাকুক সে বিষয়ে তাহারা ভ্রূক্ষেপও করে না। কি প্রকারে উহাদের বল বর্দ্ধিত, উদর পূর্ণিত, স্বচ্ছন্দ বিহার, পুষ্টি সাধিত ও স্বাস্থ্য রক্ষিত হয়, সে বিষয়ে উহারা নিতান্ত অনভিজ্ঞ। পালিত পশুদিগের জীবন কেবল রক্ষকের উপরই নির্ভর করে; সেই রক্ষক যদি তাহাদের জীবন রক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হয়, তবে আর তাহাদের জীবন রক্ষার উপায় কি?

ইউরোপ ও আমেরিকার গো-মেষাদির উন্নতির বিবরণ শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, 'কলিং' নামক একজন সাহেবের বর্ষেম দেশীয় "কমেথ" নামক একটি বৃষ ১১০ • এগার হাজার টাকা এবং তাহার "নিলী" নাম্নী গাভী ৪৭০০ চারি হাজার সাত শত টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল। এবং স্কটলণ্ড দেশবাসী প্রসিদ্ধ গো-পালক ডিউক অব আর্গ্যাইলের একটি বৃষের পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্য হইয়াছিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের প্রকাশ্য নিলামে কয়েকটি উৎকৃষ্ট গরু ১৬০০০।১৭০০০ ষোল সতের হাজার টাকা মূল্যে নিলাম হইয়াছিল। ইহা বলা বাহুল্য যে, ইংলণ্ডেও গরু সকল সচরাচর এত অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় না। উক্ত গরু সকল বিশেষ গুণলক্ষণাক্রান্ত ছিল বলিয়া এত উচ্চমূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল। তবে ইহা বলা আবশ্যক যে, খুব ভাল গরু ইংলণ্ডে হাজার টাকার কম মূল্যে সচরাচর পাওয়া যায় না। বিলাতে গরুর অবস্থা পূর্ব্ব হইতেই যে, এরূপ উন্নত ছিল, তাহা নহে। গো-জাতির উন্নতি এবং সেবা-পরিচর্য্যার গুণে তথায় এক একটি গাভী ২০।২২ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকে। এ কথা আমাদের দেশীয় ব্যক্তিগণ অনেকেই অবিশ্বাস করিবেন, কিন্তু বিলাতের বিশিষ্ট লোকের নিকট তত্ত্বানুসন্ধান করিলে তাঁহাদের ভ্রম নিশ্চয়ই দূর হইবার সম্ভাবনা। ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়, যে ভারত বাসী আর্য্যগণের এক কালে রোণকীয়া (৮২ সের) দুগ্ধদাত্রী গাভী ছিল, আজ কি না সেই আর্য্যবংশধরগণকে বিদেশীয় গাভীর দুগ্ধ প্রদানক্ষমতা বিষয়ে সংশয়-ছেদ এবং প্রতীতি জন্মাইবার জন্য ভিন্নদেশস্থ ব্যক্তির নিকটে তত্ত্বানুসন্ধান করার অনুরোধ করিতে হইল!

আমাদের দেশে দুগ্ধের নিমিত্ত এবং হলচালন ও শকটবহনাদি শ্রমজনক কার্য্য-সাধন জন্য গো, মহিষ প্রতিপালন করা হইয়া থাকে। অনেকেই এক শরীর হইতে এই উভয় উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা পাইয়া থাকেন, কিন্তু পরস্পর-বিরোধী লক্ষণ একাধারে থাকিতে পারে না। একটি অঙ্গ বিশিষ্ট রূপে বৃদ্ধি পাইলে অপর একটি অঙ্গের বৃদ্ধি সেই সঙ্গে হ্রাস হয়। যে গাভী বা মহিষী দৃঢ়কায় তাহা প্রায় দুগ্ধবতী হয় না এবং যাহারা কোমলাঙ্গী তাহারাই প্রায় অধিক দুগ্ধবতী হইয়া থাকে।

গর্ভাবস্থায় গর্ভিণী পশু যদি সতত অপ্রসন্ন থাকে তবে উৎকৃষ্ট পশুর সন্তানও অপকৃষ্ট হয়।

বিলোম-অনুলোমের ফল—হীনাবস্থার পুংপশু দ্বারা উন্নতাবস্থার স্ত্রীপশুর

গর্ভসঞ্চার হইলে প্রায়শই সন্তানগুলি হীনাবস্থাসম্পন্ন হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে দেখা যায়।

পূর্ব্বসংযোগ ক্রম—হীনাবস্থায় পুং-পশুসংযোগে উন্নতাবস্থার স্ত্রীপশুর দুই একবার সন্তান উৎপন্ন হইলে তাহার এই ক্রম সহজে অপনীত হয় না, অর্থাৎ পুনর্ব্বার উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পুংপশুসহযোগেও তাহার গর্ভে উৎকৃষ্ট সন্তান জন্মে না। ইহা বিশেষরূপে পরীক্ষিত. আমাদের দেশীয় পশুপালকগণ এই সকল তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত থাকায় পশুদিগের আভিজাত্যের ব্যভিচার ঘটিতেছে।

সংযোগের ফলাফল—অল্প দুগ্ধবতী পশুর গর্ভজাত পুংপশু অধিক দুগ্ধবতী স্ত্রী-পশুর সঙ্গে সংযুক্ত হইলে সেই গর্ভধারিণীর সেইবার প্রসূতাবস্থায় দুগ্ধের পরিমাণ অনেক কমিয়া যায়। ইহা শুনিতে আশ্চর্য্য-জনক বটে, কিন্তু অনেক স্থলে ইহা পরীক্ষিত হইয়া সত্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। সেই গর্ভে যদি স্ত্রীসন্তান জন্মে তাহা হইলে সেও অল্পদুগ্ধবতী হয়।

নবোপার্জ্জিত লক্ষণ বংশগত হইতে পারে—স্থান, কাল বা অবস্থাভেদে বা শিক্ষা গুণে নূতন লক্ষণ উৎপন্ন হইলে তাহাও বংশগত হইতে দেখা যায়। যাঁহারা নূতন লক্ষণাক্রান্ত পশাদি উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা বড়ই উপকারী।

পরিবর্ত্তন—আকার বা গুণের ভালর দিকে পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে জলবায়ু ও অবস্থা অনুকূল হওয়া আবশ্যক। তাহা প্রতিকূল হইলে বিপরীত দিকে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

মিশ্রণ-কার্য্য—নানাদিদেশীয় পুং-পশু দ্বারা মিশ্রণ-কার্য্য অধিক দূর পর্য্যন্ত চলে না। কারণ অতি মিশ্রিত হইলে স্ত্রীজন্তু সকল বলহীন হইয়া পড়ে। এই জন্য জন্তাদির উন্নতি করিতে হইলে এক এক প্রদেশের উৎকৃষ্ট জন্তু নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদের সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে, নচেৎ উন্নতি হয় না।

স্ত্রী ও পুংপশু একত্র বাসের ফলাফল—স্ত্রী ও পুংপশুদিগকে নিকট নিকট রাখিলে পুংপশুদিগের স্বাস্থ্যের হানি হইয়া থাকে, এবং স্ত্রীপশুরা শীঘ্র শীঘ্র গর্ভ ধারণ করে।

গর্ভকালীন ক্রম—প্রসব কালে কখন কখন সন্তানের এমন লক্ষণ দেখা যায়, যাহা কোন পূর্ব্ব পুরুষে ছিল না; মাতার চিন্তার উপর এই সকল লক্ষণের উৎপত্তি নির্ভর করে

সন্তান উৎপাদন—অতি নিকট সম্পর্কের এক জোড়া পুং ও স্ত্রী-পশু হইতে যে পাল উৎপন্ন হইল, সেই পাল বৃদ্ধির জন্য পালের স্ত্রী বা পুং-পশুর সহিত কখন সংযোগ স্থাপন না হয়, তাহা হইলে পশু বংশে বা পালে আর ভিন্ন পালের শোণিত প্রবেশ করিতে পারিল না। কতক দিন এইরূপ চলিতে পারে, এবং তাহার ফলও ভাল, কিন্তু অধিক এ নিয়মে বংশবৃদ্ধি হইলে বংশের অবনতি হয়।

মিশ্রজন্ম—উপরে যাহা বলা হইল, ইহা ঠিক তাহার বিপরীত। ইহার অর্থ

এক পালের সহিত অন্য পালের পুং বা স্ত্রী-পশুর সংযোগ-স্থাপন। ইহাতে অবশ্য জন্মের ঠিক থাকে না, কিন্তু অন্যান্য অনেক গুণ পাওয়া যায়, এক জাতির বল, দুগ্ধ দিবার ক্ষমতা প্রভৃতি গুণ ইহা দ্বারা অন্য জাতিতে উৎপাদন করা যায়।

আমাদের দেশীয় গৃহপালিত পশ্বাদি পীড়িত হইলে চিকিৎসাভাবে প্রায়শঃই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সদাশয় গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি পশুচিকিৎসা-পদ্ধতি শিক্ষাকল্পে পশুচিকিৎসাবিদ্যালয় (Veterinary College) স্থাপন করিয়াছেন, এতদ্বারা সমূহ উপকার সাধিত হইতেছে বটে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আশানুরূপ ফললাভ ঘটে নাই। বঙ্গভাষায় পশুচিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থাদির একান্ত অসদ্ভাব লক্ষিত হয়। এবম্বিধ গ্রন্থাদি প্রচার বিষয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোযোগ আকর্ষিত হওয়ার সময় উপস্থিত হইয়াছে। দেশের ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে এই অভাব অচিরেই পূর্ণ হওয়ার আশা করা যায়। দেশের স্থানে স্থানে পশুশালা (Dairy Farm) প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস ও সমীচিন বলিয়া মনে হয়। জৈনসম্প্রদায় পিঞ্জরাপোল স্থাপন করতঃ অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাঁহাদের সদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণীয় বটে। নিরক্ষর ও দরিদ্র কৃষক প্রভৃতির মধ্যে পশুপালনের উপকারিতা এবং তাহাদের স্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতিবিধায়ক সরল ভাষায় লিখিত প্রবন্ধাদি পাঠ প্রথা প্রচলিত করার চেষ্টাও সঙ্গত। গবাদি পশুবধের গতিরোধ করার চেষ্টাও কর্ত্তব্য হইলেও ইহা সর্ব্ব প্রকারে আমাদের আয়ত্তাধীন নহে; গবর্ণমেণ্ট, দেশের ধনী ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ মনোযোগী হইলে এ সম্বন্ধে সদুপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে। কলিকাতা প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরীতে গোপালকগণ যে নিষ্ঠুর ভাবে গবাদির প্রতি ব্যবহার করিয়া থাকে এবং তাহাদের প্রতি যত্নের যে অসঙ্গত ও অমার্জ্জনীয় শিথিলতা প্রদর্শন করে তাহাতে নিতান্ত লজ্জিত ও পরিতপ্ত হইতে হয়। ফলতঃ ইহারা পরোক্ষভাবে গোবধের সহায়তা করিতেছে বলিয়াই মনে হয়। কঠোর রাজবিধি প্রচলিত থাকা স্থলেও ইহারা গবাদির প্রতি নিষ্ঠুরতার একশেষ প্রদর্শন করিতেছে; ইহার প্রতীকার বাঞ্ছনীয় ও চিন্তনীয় বটে।

গৃহপালিত পশু মধ্যে হস্তী, অশ্ব, ছাগ, মেষ, কুক্কুর প্রভৃতির বিষয়েও আলোচনা কর্ত্তব্য, কিন্তু আমার শারীরিক বর্ত্তমান অবস্থায় এবং বার্দ্ধক্যজনিত দীর্ঘকাল চিন্তা করার ক্ষমতা বিলুপ্তপ্রায় হওয়ায় অদ্য উক্ত পশ্বাদি বিষয় আলোচনা করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়াছি, তরসা করি শ্রোতৃবর্গ আমাকে এই ত্রুটীর জন্য ক্ষমা করিবেন, আমা অপেক্ষা জ্ঞানী উৎসাহী ও যোগ্যতর কৃত্যাবগ সম্পন্ন ব্যক্তিগণ এবম্বিধ বিষয় আলোচনায় মনোযোগী হইলে অনেক ফললাভের আশা আছে। আমি কেবল মাত্র ইঙ্গিতে পথপ্রদর্শন করিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিতে ইচ্ছা করি। বস্তুতঃ গবাদি পশুর উন্নতি না হইলে আমাদের আর্থিক,

শারীরিক ও মানসিক উন্নতির আশা সুদূর-পরাহত ইহা বোধ হয় কাহাকেও বিশদ ভাবে বুঝাইতে হইবে না। উপসংহারে বক্তব্য এই যে অত্র বঙ্গের নানা দিগ্‌দেশ হইতে যে সমস্ত যশস্বী মহাত্মা সম্মিলনীর কার্য্যে যোগদান মানসে সমবেত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে বিশেষ সহকারে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা যেন কৃপা-পরবশ হইয়া গৃহপালিত পশ্বাদির অবনতির গতিরোধ করিবার এবং উন্নতির পথা আবিষ্কারের যথোচিত চেষ্টা করেন, অন্যথায় দেশের একটি প্রধান দুর্গতি দূরীভূত হইবে না এবং আমরাও ক্রমে কীণবস্তিক ও হীনকায় হইয়া বিলয় দশা প্রাপ্ত হইব। শারীরিক অসুস্থতা, তাহার হীন সম্বল ও আমার কীণমস্তিষ্ক লইয়া দুর্ব্বল লেখনী এতদপেক্ষা অধিক কিছু ব্যক্ত করিতে অক্ষম। শ্রোতৃবর্গের অনেক অমূল্য সময় নষ্ট করায় যে অপরাধ হইয়াছে তাহা মার্জ্জনীয়।*

শ্রীকমলকৃষ্ণ সিংহ শর্ম্মা।

পয়গম্বর

২

Islam means in its way Denial of self, Annihilation of self...That Mahomet's whole soul, set in flame with this grand Truth, vouchsafed him, should feel as if it were important and the only important thing, was very natural. That Providence had unspeakably honoured *him* by revealing it, saving him from death and darkness, that he therefore was bound to make known the same to all creatures; this is what was meant by 'Mahomet is the prophet of God.'—Carlyle.

সেই দিন এক ক্ষুদ্র অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ প্রাণ আরবের জীর্ণ-কঙ্কাল মধ্যে স্পন্দিত হইয়া উঠিল, যে দিন খোদেজা সর্ব্বান্তঃকরণে একেশ্বরবাদ গ্রহণ করিয়া স্বামীর শিষ্যা হইয়াছিলেন, যে দিন তিনি অতি বিশ্বাসের সহিত, গৌরববিমিশ্রিত অতিশয় স্নেহের সহিত মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—তোমার জয় হউক, আরবের মরু-গুরু বলিয়া তোমার পূজা করিব।

ঈশ্বরচিহ্নিত মহম্মদ সেই দিন মনে মনে ধ্রুবরূপে বুঝিলেন পৌত্তলিকতা ধর্ম্ম নহে—সে পথ ইসলামের নহে—একেশ্বরপূজাই পরম ধর্ম্ম। ভক্ত যখন মনে মনে বুঝিলেন যে ইহাই একমাত্র সত্য, তখন তাহা প্রচার করিবার জন্য তাঁহার স্বভাবই আকাঙ্ক্ষা হইল। তিনি যাহাকে সত্যপথ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, পৃথিবীর সকল

* সাহিত্য-পরিষদ উপলক্ষে ময়মনসিংহে পঠিত।

লোক যাহাতে সেই পথ চিনিতে পারে ভক্ত মহম্মদ তাহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য করিলেন। তাঁহার অন্তরের অন্তর হইতে কে যেন ডাকিয়া কহিল—'যাও বৎস, আর বিলম্ব করিও না, আমার অগ্রদূতরূপে অগ্রসর হও।' ঈশ্বরের আহ্বান শ্রবণে উল্লসিত, উৎসাহিত, শতগুণে বর্দ্ধিতশক্তি ঈশ্বর-দূত তখন আরবের সহস্রবর্ষের অতিবৃদ্ধ সংস্কার ও ধর্ম্মমতকে সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য নির্ভীক চিত্তে অগ্রসর হইলেন। বন্ধুর কণ্টকাকীর্ণ দীর্ঘ পথ! পুঞ্জীভূত সূচীভেদ্য অন্ধকার যেন প্রবল দানবের ন্যায় সেই দীর্ঘপথের প্রহরী কার্য্যে নিযুক্ত; তাহার প্রতি কণ্টক প্রতি উপলখণ্ড আরবের অন্তরতলস্থিত স্নেহ ও মমতায় বিজড়িত, প্রতি কণ্টকতরু শত বর্ষের প্রাণান্ত যত্নে লালিত বর্দ্ধিত পত্রপুষ্পফলে সুশোভিত হইয়াছে। কে এমন বীর আছে যে সেই সকল বৃক্ষের একটী পুষ্প বৃন্তচ্যুত করিবে—একটী পত্র বিচ্ছিন্ন করিবে—একটী শাখা অপসৃত করিবে! যে পাপ-হস্ত কলুষিত কুটিল চিত্তে উহা স্পর্শ করিবে, সহস্রফণা বিষধর গর্জ্জন করিয়া ফিরিতেছে—অমনি তাহাকে শত বেষ্টনে বাঁধিয়া দংশন করিবে! স্বর্গের আলোক মস্তকে ধারণ করিয়া স্বর্গদূত সেই অন্ধকার পথে অগ্রসর হইলেন।

কেহ কি তাঁহার সঙ্গে চলিল না? চলিল বই কি, যাহারা চলিলেন, আবু বাকর চলিল—আবু বাকরের করুণা যে সকল ক্রীতদাসদিগকে মুক্ত করিতে পারিল তাহারাও চলিল। ইসলাম-প্রচারের প্রথম তিন বর্ষ মধ্যেই প্রায় চল্লিশজন * সেবক আসিয়া দেবদূতকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল আত্মীয়-স্বজনের বিরাগ, ভ্রূকুটিকুটিল লোকমতের তিরস্কার, এমন কি প্রহার পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করিল না। উৎসাহিত মহম্মদ তখন তাঁহার স্বজনদিগকে সমবেত করিয়া প্রকাশ্য ভাবে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে খড়্গোত্তোলন করিলেন—সকলকে স্নেহ-বাক্যে ডাকিয়া কহিলেন—কে মুক্তি চাও আইস, আমি সহজ ও সত্যপথ দেখাইয়া দিতেছি। আজ আমি তোমাদিগকে যাহা দিতেছি, তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান আরব কাহারো নিকট পায় নাই। আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমাদিগকে ঐহিক ও পারত্রিক সুখে সুখী করিব। এই মুক্তি-মন্ত্র প্রচারে কেহ কি আমার সহায় হইবে না?

এ কি কথা! এ কি ধৃষ্টতা! পিতৃপিতামহের স্নেহ-স্মৃতির সহিত যে ধর্ম্মমত একসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে তাহার অপমান করিয়া পিতৃপুরুষের অপমান! সেই সভা ঘৃণায় রোষে ক্ষোভে নীরব হইয়া রহিল। স্বয়ং আবু তালেব উপস্থিত ছিলেন বলিয়া কেহ মহম্মদের উপর কোন অত্যাচার করিল না। সেই নীরব সভামণ্ডপে সেই

* With other additions, particularly from among slaves and poor persons, the number of the believer reached to nearly forty during the first three years of his mission —Arnold, p. 10.

Cf. In three years, I think, he had gained but thirteen followers. —Carlyle.

রোষকষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলী সমক্ষে ষোড়শবর্ষীয় ক্ষুদ্র আলি—আবু তালিবের সেই ক্ষুদ্র দেবশিশু বীরদর্পে কহিল "দেবদূত আমি তোমার সাহায্য করিব।"

আল্লা, শোভান আল্লা! বৃদ্ধ ধর্ম-যাজকের নবীন তরুণীর ক্ষুদ্র বালক কাণ্ডারী হইবে! শ্রোতৃমণ্ডলী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল! মহম্মদ স্তম্ভোদ্যম হইলেন না। পুনঃপুনঃ তাহাদিগকে সমবেত করিয়া, আপন মত প্রচার করিতে লাগিলেন। কাবার কোরেশ কর্তৃপক্ষগণ প্রতিদিন রুষ্ট হইতে লাগিলেন। অবশেষে কখনো ভয়প্রদর্শন, কখনো বা সুখ ও সমৃদ্ধির আশা-প্রদান এইরূপ নানা চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতে প্রয়াসী হইলেন। কখনো কখনো আবু তালিবকে পর্যন্ত ডাকিয়া কহিলেন "তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে সংযত কর—নহিলে তাহার বিপদ ঘটিবে।"

স্নেহপরায়ণ আবু তালিব মহম্মদের অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলেন। তীব্র ঈশ্বরপ্রেম যাহাকে উন্মত্ত করিয়াছে, ধরণীর রোষ তাহার কি করিতে পারে? অমৃতের সন্ধান যে প্রাপ্ত হইয়াছে, সে কি উহা গোপনে পান করিয়া তৃপ্ত হয়? তাহার সাধ হয়, সঙ্কল্প হয়, নিজে অমর হইব—পৃথিবীকেও অমর করিব। ইহাই মনুষ্যত্বের মহত্ব—এই মনুষ্যপ্রীতিই চিত্তশুদ্ধির লক্ষণ। খুল্লতাতের কাতর অনুরোধ শুনিয়াও মহম্মদ কাতর হইলেন না, কহিলেন—"যদি সূর্য্য আমার দক্ষিণ বাহুর উপর এবং চন্দ্র বাম বাহুর উপর দণ্ডায়মান হইয়া আদেশ করেন 'কান্ত হও, নহিলে মরিবে,' আমি তবুও নিরস্ত হইতে পারিব না।" ধন্য চিত্তবল, ধন্য ভক্তি! ইহাই মানুষকে দেবতা করে। সেই দেবশক্তির সম্মুখে কোন্ বিশাল স্থির থাকিতে পারে—কোন্ ঐরাবত ভাসিয়া যায় না? আবু তালিব সিক্তনয়নে কহিলেন—"তাই হোক্, বৎস! তাই হোক্। তোমার ধর্মমত প্রচার কর। আমি শপথ করিতেছি কখনো তোমাকে শত্রুর হাতে তুলিয়া দিব না।"

ব্যর্থ চেষ্টা, নিষ্ফল উদ্যম কোরেশ-সম্প্রদায়ের রোষ ও ঘৃণা আরো বৃদ্ধি করিয়া তুলিল। তাহারা দেখিল মহম্মদের গতিরোধ করিতে না পারিলে দেশ যায়, ধর্ম্ম যায়, সব ভাসিয়া যায়। কাবা! কাবা! পিতৃ-পিতামহ কর্তৃক শতবর্ষ ধরিয়া ভক্তি ভাবে পূজিত ধর্ম্মমন্দির—তাহার গৌরবও আর থাকে না! আবু তালিব শক্তিশালী—বনু হাসিম-সম্প্রদায়ও শক্তিসম্পন্ন। ধর্ম্মের জন্য না হউক সাম্প্রদায়িক দ্বেষ ও শক্তি-প্রিয়তার জন্য * তাহারা আপন পক্ষপুট দিয়া মহম্মদকে আবৃত ক'রয়া রাখিয়াছে। কোরেশে এমন বজ্র নাই যাহার স্পর্শে সেই সুদৃঢ় বর্ম্ম ভাঙ্গিয়া যাইবে, বিচূর্ণিত হইবে, ধরার ধূলির সহিত মিশিয়া যাইবে!

* Muhammad himself was safe under the protection of Abu Talib and the Banu Hashim, who, though they had no sympathy for the doctrines.....yet with the strong clan-feeling.....secured him from any attempt upon his life - Arnold, p. 11.

পয়গম্বরকে স্পর্শ করিতে না পারিয়া তাই কোরেশের লাঞ্ছিত অপমানিত বার্থ রোষ বজ্রবিক্রমে তাঁহার সহায়-সম্বলবিহীন দরিদ্র ভক্তদিগের শিরে নিপতিত হইল। তাহারা প্রহৃত কারারুদ্ধ নির্য্যাতিত হইতে লাগিল—কেহ বা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দিনের পর দিন প্রস্তরের উপর বক্ষ রাখিয়া মুক্ত পৃষ্ঠে অনল-সম সূর্য্যোত্তাপে রক্ষিত হইল! তবুও তাহারা একেশ্বরবাদ-মন্ত্র বিস্মৃত হইল না—

'এক ভিন্ন দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই, মহম্মদই তাঁহার দূত' বলিতে বলিতে অম্লানবদনে সকল যন্ত্রণা সহিতে লাগিল। মহম্মদ দেখিলেন দরিদ্র ভক্তদিগকে রক্ষা করিবার শক্তি তাঁহার নাই। তিনি সাগরপারে আবিসিনিয়ায় পলায়ন করিবার জন্য তাহাদিগকে পরামর্শ দিলেন। যাহাদিগের বদনে হাসি, নয়নে আলোক দেখিয়া মহম্মদ সংসারে সুখী হইতেন, যাহারা প্রসন্ন মুখে কথা কহিলে তাঁহার হৃদয় আনন্দ-পরিপ্লুত হইত, তিনি নিজে দুই হস্তে বক্ষ চাপিয়া তাহাদেরই নিন্দা ও অভিসম্পাত শিরে ধারণ করিলেন। সংসার বিষবৎ বোধ হইল না—ঈশ্বরপ্রেম ধরণীর সকল ধূলা ধৌত করিয়াছিল। তিনি বৃক্ষে, বৃক্ষপত্রে, শৈলে, শৈলচূড়ায়, মরুভূমে, মরুভূমির বালুকাকণায় ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন—অমৃত অপেক্ষা মধুর, শিশিরধৌত শেফালি অপেক্ষা নির্ম্মল, বহ্নি অপেক্ষা শুদ্ধ কি এক প্রেমপ্রবাহ তাঁহাকে সংসারের পথ দিয়া স্বর্গের সিংহদ্বার মুখে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। মানুষের রোষ, মানুষের ক্ষোভ, মানুষের অভিসম্পাত, বান্ধবের বিরাগ, স্বজনের শত্রুতা তাঁহাকে আর বিক্ষুব্ধ করিতে পারিল না। তিনি চক্ষু চাহিয়া ভগবানকে দেখিলেন, চক্ষু মুদ্রিত করিয়াও তাঁহাকেই দেখিতে পাইলেন। অনন্ত ব্যোম, অপার মরু-সমুদ্র, শ্যামা মেদিনী—তাঁহার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরমেশ্বরময় হইল।

কোরেশের ক্রোধ পলায়িত মুসলমানদিগকে ক্ষমা করিল না, তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিয়া আবিসিনিয়ার খ্রীষ্ট নৃপতির সিংহাসন সম্মুখে যাইয়া কহিল, পলায়িত ধর্ম্মবিদ্রোহী আরবদিগকে পরিত্যাগ কর। মুসলমানগণ কাতর কণ্ঠে আশ্রয় চাহিয়া কহিল—আমরা এত দিন অন্ধকারে নিমগ্ন থাকিয়া পৌত্তলিক ছিলাম। আমাদের দুষ্ট মনোবৃত্তি কাহারো শাসন মানে নাই। আমরা যাহার বাহুতে শক্তি দেখিয়াছি, শুধু তাহার নিকটেই অবনতশির হইয়াছি। খোদা একদিন দয়া করিয়া আমাদের এক জনকে মানুষ করিয়া দিলেন। তিনি বংশ-মর্য্যাদায়, চরিত্রে ও গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই দেবদূত আমাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, 'পৌত্তলিকতা ত্যাগ কর, চিরাচরিত কুসংস্কার দূর কর, একমাত্র পরমেশ্বরের আরাধনা কর। কুকর্ম্ম হইতে দূরে থাকিয়া সত্যানন্দ ও স্নেহপরায়ণ হও।' তিনি আরো কহিলেন—'কদাপি নারী-নিগ্রহ করিও না, অনাথের ধন লুণ্ঠন করিয়া সমৃদ্ধ হইও না। প্রতিদিন উপাসনা, দীনে দান ও উপবাসাদি করিয়া পরমেশ্বরের সমীপবর্ত্তী হও।' আমরা তাঁহার কথা শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু আমাদের স্বদেশ-

বাসী আমাদিগকে নিগ্রহ করিতেছে পুনরায় পৌত্তলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য বল প্রকাশ করিতেছে বলিয়া আমরা আশ্রয়-লাভের আশায় এখানে আসিয়াছি। দয়া করুণ, আমাদের প্রতি সবিচার করুন, আমাদের জীবন রক্ষা করুন।' খ্রীষ্টান নৃপতি মুসলমানদিগের কাতর নিবেদন শ্রবণ করিয়া কোরেশের দূতদিগকে ফিরাইয়া দিলেন, পলায়িত মুসলমান আশ্রয় পাইল।

কোরেশগণ যখন প্রতি মুহূর্ত্তেই আবিসিনিয়া হইতে বিজয়বার্ত্তা পাইবার প্রত্যাশা করিতেছিল, তখন একদিন শুনিল মহম্মদের পরম শত্রু উমর-ইবনু সে-স্বয়ং নব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন! উমর একদিন ক্রোধভরে অসি হস্তে রাজপথে বিচরণ করিতেছিলেন, ধর্ম্মদ্রোহী মহম্মদকে পাইলেই হত্যা করিবেন। অকস্মাৎ একজন আত্মীয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিল। সে কহিল 'উমর! মহম্মদকে কেন হত্যা করিবে? তোমার নিজ পরিবারের যাহারা নবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, পূর্ব্বে তাহাদিগেরই দণ্ড বিধান কর।'

রুষ্ট উমর গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—কে তাহারা? কোথায় তাহারা?

প্রত্যুত্তরে শুনিলেন 'তাহারা তোমার ভগ্নী ও ভগ্নীপতি!'

শুষ্কচ্যুত শায়কের ন্যায় তীব্রবেগে উমর ফাতিমার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তখনো তাঁহার তরবারি ধর্ম্মদ্রোহীর শোণিত লালসায় লক্ লক্ করিতেছিল। উমর দেখিলেন ফাতিমা স্বামীর সহিত কোরাণ-পাঠে নিযুক্তা। ফাতিমা। ফাতিমা! তাঁহারই স্নেহময়ী ভগ্নী ফাতিমা! মুহূর্ত্তমধ্যে উমর ভগ্নীপতিকে আক্রমণ করিলেন—তরবারির আঘাতে সৈয়দের দেহ ক্ষত বিক্ষত হইল। ফাতিমা ভ্রাতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অবিচলিত কণ্ঠে কহিল—'ঠিক ঠিক, আমরা মুসলমান হইয়াছি। আমরা পরমেশ্বরকে বিশ্বাস করি—আমরা তাঁহার দূতকেও বিশ্বাস করি। উমর! ইচ্ছা হয় আমাদিগকে বধ কর।'

কে কহিল? ফাতিমা? তাঁহারই ভগ্নী ফাতিমা! উমর দেখিলেন ফাতিমার নয়ন বদন বসন রক্তরঞ্জিত হইয়াছে—ঘন দীর্ঘশ্বাসে বক্ষ আন্দোলিত হইয়াছে—ফাতিমার নয়নে অনল ছুটিয়াছে। সে নয়নে, সে ললাটে শঙ্কার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। উমর ভগ্নীর হস্ত হইতে তাহার পবিত্র কোরাণ লইয়া উহার বিংশতি-সংখ্যক কাব্য পাঠ করিলেন। কি সুন্দর! কি মহান্! কি উচ্চভাব! উমর আরো পাঠ করিতে লাগিলেন, শেষে ব্যাকুল হইয়া কহিলেন—'ফাতিমা, ফাতিমা, আমাকে মহম্মদের কাছে লইয়া চল—আমার ধর্ম্মগ্রহণের কাহিনী আমি নিজে তাঁহাকে বলিব।'

উমর মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন—মহম্মদের বল বাড়িল। তিনি ছয় পদে দণ্ডায়মান হইবার স্থান পাইলেন। উমরের কাহিনী তাই ইসলামপ্রচারের ইতিহাসে স্মরণীয়। উমর একেশ্বর গ্রহণ করিলেন, এ দিকে আবিসিনিয়ায় প্রেরিত দূত ভগ্ন মনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পরাজয়বার্ত্তা প্রচার

করিল। মহম্মদ তখন ভক্তগণ সমভিব্যাহারে কাবার চতুর্দ্দিকে বসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন।

কোরেশের ক্রোধের আর সীমা থাকিল না। তাহারা ভাবিল, আমরা কাবার কর্ত্তা বলিয়া সমগ্র আরবের পূজনীয়, আর তুচ্ছ মহম্মদের সম্মুখে লাঞ্ছিত হইব! মহম্মদের আশ্রয়দাতা বলিয়া তাহারা অবিলম্বে বনু হাশিম এবং বনু মুত্তলিব-দিগকে সমাজচ্যুত করিল। কোরেশ-কর্ত্তার আদেশে কেহই আর তাহাদিগের নিকট সামান্য খাদ্য দ্রব্য পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে পারিল না। এদিকে অত্যাচার-স্রোত যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে লাগিল। নিরুপায় পয়গম্বর-দাসগণ প্রাণভয়ে আবিসিনিয়ায় পলায়ন করিতে লাগিল। বিরুদ্ধবাদিগণ দিবারাত্রি মহম্মদকে লাঞ্ছিত করিতে আরম্ভ করিল। তিনি যখন তন্ময় হইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন—মক্কার বার্ষিক উৎসবকালে যখন তিনি শতসহস্র তীর্থ-যাত্রীর সম্মুখে ধর্ম্মতত্ত্ব বিজ্ঞাপিত করিতে-ছেন, তখন তাঁহারই আত্মীয়গণ চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—'পালাও, পালাও, ধর্ম্মবিদ্বেষীর কথা কেহ শুনিও না।' শ্রোতৃ-মণ্ডলী তাঁহাকে ধিক্কার দিতে দিতে প্রস্থান করিল। কেহ বা বিদ্রূপ করিয়া কহিল, 'তোমার আপনার জন যদি তোমাকে বিশ্বাস না করে, তবে আমরা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব।'

পয়গম্বর যিনি, লাঞ্ছনা তাঁহার কি করিবে, অপমান তাঁহার কি করিবে? যিনি ভগবানে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার আবার মান-অপমান কোথায়? মহম্মদ প্রসন্নমুখে সমস্ত সহ্য করিতে লাগিলেন। কোরেশ-সম্প্রদায়ের অনেকে দেখিলেন মহম্মদ অসাধারণ পুরুষ ক্রোধ নাই, দ্বেষ নাই, বিরক্তি নাই, মুখে আশীর্ব্বাদ ভিন্ন অভিসম্পাত নাই। তাহাদের অনেকের প্রাণ মহম্মদের দুঃখে রোদন করিতে লাগিল। সুতরাং তিন বৎসর পর বনু হাশিম সম্প্রদায় পুনরায় কোরেশ-সমাজে গৃহীত হইল। দশ বৎসর ধরিয়া স্বসমাজের নিকটে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াও মহম্মদ যখন প্রতিদানে তীব্র বিদ্রূপ ভিন্ন আর কিছু পাইলেন না, তখন তিনি সমাজের বাহিরে তাইফ নগরে গমন করিলেন। তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া তাইফের অধিবাসি-গণও তাঁহাকে ইষ্টক প্রহার করিয়া বিতাড়িত করিল! মহম্মদ কাতর কণ্ঠে ভগবানকে কহিলেন—"আমার স্বজাতিকে আমি দিনরাত্রি ভাবিতেছি, তাহারা আমার আহ্বান শুনিলেই পলায়ন করে! আমি যতই তোমার চরণে মিনতি করিয়া বলি 'হে প্রভু উহাদের ক্ষমা কর', উহারা ততই কর্ণে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করাইয়া ঘৃণায় হাসি হাসিয়া দূরে চলিয়া যায়।"

এইরূপে দিন যাইতে লাগিল। এক দিকে ধর্ম্মপ্রচারের প্রাণপণ চেষ্টা, অপর দিকে অপধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য পৈশাচিক পণ। পৃথিবীতে এমন কয়জন লোক জন্মগ্রহণ করেন, যিনি এইরূপে জীবনের সুদীর্ঘ দশ বৎসর অতিবাহিত করিতে পারেন। শুধু বিশ্বাস—ভগবানের উপর—ধর্ম্মের উপর—নিজের উপর অটল বিশ্বাস।

বিশ্বাস হারাইলেই পদস্খলন অনিবার্য্য। যাঁহার আদেশে বিশ্ব চলিতেছে, গ্রহ ছুটিতেছে, উপগ্রহ অনুসরণ করিতেছে, তাঁহার আদেশে নরচিত্ত ফিরিবে না? অবশ্যই ফিরিবে। আজ না হয় কালি, না হয় দশ দিন পরে—অবশ্যই ফিরিবে। আমি তাঁহার ভক্ত তাঁহার দাসানুদাস - আমিই ফিরাইব। মহম্মদ চিত্ত স্থির করিয়া প্রত্যাদেশ পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভক্ত-সংখ্যাও অল্পে অল্পে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে আবার মক্কার উৎসব-কাল সমাগত হইল। শত সহস্র আরব কাবা দর্শন করিয়া পবিত্র হইতে আসিল। সেই জনসঙ্ঘের মধ্যে তত্ত্বচিন্তা-নিমগ্ন হইয়া বিচরণ করিতে করিতে মহম্মদ দেখিলেন মদিনার ৬।৭ জন লোক একত্রে ভ্রমণ করিতেছে।

মদিনা! প্রাচীন আরবের ইয়াস্রেব (Yathorib) যেখানে এক দিন ইহুদিদিগের রাজত্বকালে খজ্‌রজ (Khazraj) এবং আস্ (Aws) সম্প্রদায়গণ আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল এবং ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিয়া পঞ্চম শতাব্দীতে বিজয়ী ইহুদিদিগকে পরাজিত করিয়া রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিল। তখনো তথায় বিজিত ইহুদিগণ বাস করিত।

মহম্মদ সেই তীর্থযাত্রীদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন "তোমরা কে?"

"আমরা খজরজ-সম্প্রদায়ী আরব।"

"তোমরা কি আমার কাছে একটু বসিবে না, আমার দুইটা কথা শুনিবে না?"

তাহারা কহিল, 'কেন শুনিব না।' তাহারা মহম্মদের নিকট উপবেশন করিল। মহম্মদ তাহাদিগের নিকট নবধর্ম্ম প্রচার করিলেন। বহুকাল ইহুদিসংস্পর্শে থাকিয়া তাহারা জানিয়াছিল যে এক দিন না এক দিন দেবদূত আসিয়া পৃথিবীতে দেখা দিবেন এবং স্বহস্তে ইহুদির শত্রুদিগকে নিধন করিয়া ধর্ম্মবার্ত্তা প্রচার করিবেন। তাহারা মহম্মদের উজ্জ্বল বদন ও সরল ধর্ম্মব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া মনে করিল সেই তথাকথিত ঈশ্বরদূত আসিয়াছেন। তাহারা অবিলম্বে তাহার শরণাপন্ন হইয়া মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। মহম্মদ কহিলেন, "চল আমি তোমাদের সঙ্গে মদিনায় যাইব।"

তাহারা কহিল,—"না এখনো সময় হয় নাই। আমাদের স্বদেশবাসিগণ পরস্পর কলহ ও বিবাদে লিপ্ত হইয়া আছে। পরমেশ্বর বুঝি আপনাকে দিয়াই সে বিবাদের মীমাংসা করিবেন। আমরা দেশে যাইয়া নবধর্ম্ম প্রচার করি, তারপর আপনি যাইবেন।"

মহম্মদ স্বীকৃত হইলেন। সেদিন শুভক্ষণে মদিনার সহিত যে সম্বন্ধ ঘটিল, তাহাই উত্তর কালে ইসলাম-প্রচারের প্রধান পাদপীঠ স্বরূপ হইয়াছিল।

খজ্‌রজ-সম্প্রদায়িগণ যখন মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল তখন খজ্‌রজ এবং আস্-সম্প্রদায় মধ্যে নেতৃত্ব লইয়া বিষম বিবাদ চলিতেছিল। প্রতিদিন বিবাদ, প্রতিদিন রক্তপাত, প্রতি মুহূর্ত্তে অশান্তি, আশঙ্কা ও উদ্বেগ। নগরবাসিগণ দীর্ঘ কালের বিবাদে একান্ত ক্লান্ত হইয়াছিল,

তাই খজ্‌রজ কিম্বা আস্ না হইয়া অন্য যে-কেহ আসিয়া উপস্থিত হইলেই তাহারা আনন্দে তাহার শিরে নেতৃত্বের গৌরব-মুকুট তুলিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। ভক্তগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ঈশ্বর-দূতের আগমনকাহিনী প্রচার করিয়া নাগরিক-দিগের হৃদয় প্রস্তুত করিতে লাগিল। পর বৎসর কাবার উৎসবকালে দশজন খজ্‌রজ এবং দুইজন আস্ আসিয়া অকবায় (Aquabah) ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শপথ করিল—'আমরা এক পরমেশ্বরের পূজা করিব—চুরি, পরদার কিম্বা শিশু হত্যা করিব না। পরমেশ্বরের সদুপদেশ শিরোধার্য্য করিব। পরনিন্দা হইতে দূরে থাকিব। আমরা সুখে, দুঃখে পরমেশ্বরের পার্শ্বচর রহিব।'

এই বিশ্বাসী কর্ম্মশীল ভক্তের দল দেশে ফিরিয়া গৃহে গৃহে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিল। মদিনার ঘরে ঘরে মুসলমানের মুক্তিমন্ত্র ধ্বনিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মদিনার প্রতি আরব-পরিবারে মহম্মদ-ভক্ত জাগিয়া উঠিল। এই জাগরণ কিরূপে আরবের জাতীয় জাগরণে পরিণত হইয়াছিল, সে ইতিহাস পরে বলিতেছি।

পরবৎসর উৎসবকালে ভক্তগণ যখন মহম্মদকে শিরে বহিয়া মদিনায় লইয়া যাইতেছিল, তখন জয়বার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার চিত্ত পুলকিত হইয়া উঠিল। মহম্মদ অতি সংগোপনে ভক্তদিগকে লইয়া একটী সভা করিলেন। যাহারা তখনো মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল না, তাহারা সেইদিন সগৌরবে ইসলাম-মন্ত্র গ্রহণ করিল। কোরেশ প্রভুদিগের কর্ণে এ সংবাদ যাইয়া পৌঁছিল। তখন মহম্মদের আদেশে দুইয়ে দুইয়ে, তিনে তিনে ভক্তগণ সাবধানে মক্কা পরিত্যাগ করিয়া মদিনায় পলায়ন করিল, কোরেশ-ক্রোধে দগ্ধ হইবার জন্য মহম্মদ অবিচলিত চিত্তে তথায় রহিলেন, কাহারো কথা শুনিলেন না। স্বর্গগতা খাদিজার বিশ্বাসপূর্ণ সুন্দর মুখ তাঁহার হৃদয়ে শক্তি আনিয়া দিল।

কোরেশগণ দেখিল, আর আবু তালিব নাই, এখন কে মহম্মদকে রক্ষা করিবে। তাহারা যে মুসলমানকে পাইল তাহাকেই কারারুদ্ধ করিল এবং মহম্মদকে হত্যা করিবার জন্য গুপ্ত ঘাতক নিযুক্ত করিল! তিনি যখন শুনিলেন যে চল্লিশটী ভিন্ন বংশের চল্লিশজন লোক তাঁহার মুণ্ডচ্ছেদ করিবার জন্য অসি হস্তে ফিরিতেছে, তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া কৌশলে ইয়াস্রেব নগরে পলায়ন করিলেন। তদবধি ইয়াস্রেব মদিনা বা মদিনতি-ন্ন-নবি —পয়গম্বরের নগর নামে পরিচিত হইতেছে —সমগ্র মুসলমান জগৎ মহম্মদের সেই হেজিরা বা পলায়নকাহিনী চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তদবধি (৬২২ খৃঃ অঃ) বর্ষ গণনা করিতেছে।

মদিনায় আসিয়াই মহম্মদ উপাসনা ও উক্ত সম্মিলনের জন্য একটী মসজেদ নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি যদিও ধর্ম্মতত্ত্ব লইয়াই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি লোকতত্ত্বের অতীত ছিল না। তিনি দেখিলেন মদিনায় অসংখ্য

ইহুদির বাস। তাই সম্ভবতঃ তাহাদিগের সহানুভূতি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত মদিনার মসজেদে জেরুজালেম নগরের দিকে মুখ রাখিয়া উপাসনা করিতে অনুজ্ঞা প্রচার করিলেন। * শুধু ইহাই নহে, তিনি নানা উপায়ে ইহুদিদিগের সহিত সখ্যতা করিতে চেষ্টিত ছিলেন; কিন্তু যখন সমস্তই বিফল হইয়া গেল তখন হইতে তাঁহার আদেশে মুসলমানগণ মক্কার কাবার দিকে মুখ রাখিয়া উপাসনা করিতে লাগিল। যেদিন এই আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল, বলিতে গেলে সেই দিন হইতেই মুসলমানদিগের এক-জাতীয়তার সূত্রপাত হইয়াছে। সেই দিন হইতেই কাবা সমগ্র মুসলমান-জগতের প্রধান ধর্ম্মকেন্দ্ররূপে পরিচিত হইয়া ধর্ম্মের বন্ধনে ভক্তদিগকে বাঁধিয়া দিতেছে। এই বন্ধন সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত মহম্মদের আদেশে জীবনে অন্তত একবার মক্কাগমন প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া রহিয়াছে। মহম্মদ চিরাচরিত আরবীয় উপাসনা-প্রথারও অনেক অংশ গ্রহণ করিয়া এক জাতিনির্ম্মাণের সুবিধা করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

মহম্মদ—ঈশ্বরভক্ত ঈশ্বরচিহ্নিত বৃদ্ধ মহম্মদ, স্বজনপরিত্যক্ত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত হইয়া শেষে মদিনায় আশ্রয় লাভ করিলেন। খাদিজার শেষ স্মৃতি, আবু তালিবের শেষ স্মৃতি মক্কায় পড়িয়া রহিল! মক্কায় এত লোকের স্থান ছিল, শুধু মহম্মদের—ভগবৎ-প্রেমে-উদাসীন তুল্য মহম্মদের একটু স্থান হইত না? স্থান ছিল; তাঁহারও স্থান ছিল। শত্রুর বিদ্বেষ যতদিন মূক-উপেক্ষা রূপে দেখা দিয়াছিল, উপেক্ষা যখন মূর্ত্ত ঘৃণার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিয়াছিল, তখনো তিনি মক্কা ত্যাগ করেন নাই। শেষে যখন অপমান ও কুৎসা আসিয়া ঘিরিয়া ধরিল তখনো মক্কা ছাড়িলেন না। বিদ্বেষ যখন তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া তাঁহার জীর্ণ-দেহের উপর হস্ত বাড়াইল—সেই দেহ মধ্যে জগতের জন্য যে মহা-প্রাণ এত সহিয়াও বর্ত্তমান ছিল, শেষে তাহাকেই নির্ম্মম খল হস্তে টানিয়া বাহির করিতে চাহিল, তখন তিনি অনেক কৌশলে আত্মরক্ষা করিয়া মদিনায় আসিয়াছিলেন, কারণ যে ব্রত লইয়া তিনি পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, তাহার যজ্ঞ-বেদিই তখনো প্রস্তুত হইয়াছিল না!

মহম্মদ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া মদিনায় আসিলেন, কিন্তু কোরেশের বিদ্বেষ তাঁহার অনুসরণ করিল। এতদিনে তাঁহার বৃদ্ধ হৃদয়ে আরবের রক্ত ফুটিয়া উঠিল। কি! এত করিয়াও তৃপ্তি নাই! আজীবন চেষ্টা করিয়া কত নির্য্যাতন সহিয়াও প্রাণের কথা বুঝাইতে চাহিলাম, দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া সত্যপথ দেখাইতে চাহিলাম—ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিলে, শেষে বাঁচিবার অবসরও কাড়িয়া লইতে চাহিলে! যদি ক্ষীণ প্রাণ বহিয়া পলায়ন করিলাম—সেই ভগবানের নাম লইব বলিয়া

* The worshippers at first used to turn their faces in the direction of Jerusalem—an arrangement most probably adopted with the hope of gaining over the Jews. – Arnold.

জীবন রক্ষা করিলাম, তাহাও দিবে না? কোরেশগণ! তীক্ষ্ণ তরবারি হস্তে তাহার পথও রুদ্ধ করিবে! যে নগর আমাকে আশ্রয় দিয়াছে তাহাকে পর্য্যন্ত ধ্বংস করিবে? বেশ কর। আমিও আরব—আমিও রক্তসন্তান—আমিও মানব। আমি কি অস্ত্র লইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিব না?

মহম্মদ আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। কতকগুলি ক্ষুদ্র যুদ্ধের পর কোরেশগণ পরাজিত হইল। মহম্মদের জয়বার্ত্তা মদিনার চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইবামাত্র দলে দলে সমরপ্রিয় আরবগণ আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিল—ইসলাম গ্রহণ করিল। মহম্মদের সদয় ব্যবহার, সাম্প্রদায়িক কলহ মিটাইবার সুকৌশল, যুদ্ধে জিত জনপদ জায়গীর স্বরূপ ভক্তদিগের মধ্যে বিতরণ প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্যে তিনি জন-সাধারণের প্রিয় হইয়া উঠিলেন, সমগ্র আরব তখন মহম্মদের গুণানুবাদে মুখরিত হইয়া উঠিল। যে মহম্মদের নিকট আসিতে লাগিল, সে-ই তৃপ্ত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল এবং স্বদেশে গিয়া একেশ্বরবাদ প্রচার করিতে লাগিল। তার পর যখন মক্কা মহম্মদের করতলগত হইল, আরবগণ তখন চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া তাঁহার মন্ত্র গ্রহণ করিতে লাগিল। তাহারা যে সকলেই ধর্ম্মের জন্য ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল তাহা নহে, রাজনৈতিক কারণে তখন মহম্মদের পদানত হওয়া অত্যাবশ্যক হইয়াছিল। বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, শত্রুর কবল হইতে মুক্তি লাভের প্রয়াসী হইয়া তাহারা আরবের সেই জাতীয়-প্রচেষ্টার স্রোতে আপনাদিগকে ভাসাইয়া দিয়াছিল।*

মহম্মদের জীবন-যজ্ঞ সমাপ্ত হইল। তিনি প্রথমে মনে করিয়াছিলেন সমগ্র আরবজাতির জন্য একটী ধর্ম্ম প্রচলিত করিবেন—তাহা ত তিনি করিয়াইছিলেন, সেই সঙ্গে খণ্ডিত আরবকে একসূত্রে বাঁধিয়া দিবারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সে ব্যবস্থা কলহ-কোলাহলপূর্ণ আরবের ইতিহাসে নবীন, সে ব্যবস্থা সহজে উত্তেজিত আরব জাতির বিদ্বেষ-প্রবণতার নিকটেও অভিনব। প্রথমে তিনি চেষ্টা করিলেন যে তাঁহার স্বদেশবাসিগণ শুধু এক আল্লাকে পূজা করিবে এবং তাহাই করিতে গিয়া আরবের চিরপ্রচলিত সাম্প্রদায়িক শ্রেষ্ঠত্বের মূলেও কুঠারাঘাত করিলেন। সাম্প্রদায়িকতা ভাসিয়া গেল—তাহারই কবরের উপর পৌরহিত্যিক শাসনব্যবস্থা প্রচলন করিয়া তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের দূতরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন, তাঁহার রাজদণ্ডের অপমান করিবার ক্ষমতা আর কাহারো রহিল না।

* This acceptance of Islam would seem to have been often dictated more by considerations of political expediency, and was more frequently a bargain struck under pressure of violence than the out-come of any enthusiasm or spiritual awakening. They allowed themselves to be swept into the stream of what had now become a great national movement —Arnold, pp. 38-39.

যে আরব কখনো কাহারো আজ্ঞানুবর্ত্তী হয় নাই—দেশের একমাত্র প্রভু স্বীকার করিয়া কখনো কাহারো চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে নাই, সেই বহুরাজক স্বাধীন আরব মহম্মদের মন্ত্রশক্তি বলে তাঁহার চরণে প্রণত হইল—তাঁহাকেই একছত্র অধীশ্বর বলিয়া মাথায় তুলিয়া লইল! যে মরু আরব শত সম্প্রদায়ে সহস্র নেতার অধীনে চিরখণ্ডিত, চিরদুর্ব্বল, চির উপেক্ষিত ছিল—সেই আরব দেখিতে না দেখিতে সংযুক্ত হইল—এক হইল, শক্তিশালী হইল এবং বিশ্ব জয় করিয়া পৃথিবীর সম্মান পাইল। এক নেতৃত্ব ও এক ধর্ম্ম আরবকে দেখিতে না দেখিতে এমন ভাবে গড়িয়া তুলিল যে আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

ঘনান্ধকার-পরিবৃত অন্ধকার-নিমগ্ন আরবকে কে অকস্মাৎ প্রচণ্ড আলোক মধ্যে আনিয়া ফেলিল! মৃত আরবের কঙ্কাল মধ্যে কে এই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিল! জগতের আদিকাল হইতে যে দরিদ্র জাতি শুধু মেষপালন ও সুযোগ হইলে পরস্পর পরস্পরকে লুণ্ঠন করিয়াই কাটাইতেছিল, কে তাহাদিগকে পৃথিবীর অন্যতম ভাগ্য-বিধাতা করিয়া দিল? পয়গম্বর মহম্মদ। ভগবান তাহাদের মধ্যে সেই শক্তিশালী ভক্তকে প্রেরণ করিয়াছিলেন—ভক্তের মুখে নিজের বাণী প্রদান করিয়া তাঁহাকে বিজয়ী করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশ তাঁহার বাক্য বিশ্বাস করিল—তাঁহার স্বজাতি তাঁহার বাক্য মানিয়া লইল—অমনি চির-উপেক্ষিতের শিরে রাজমুকুট উঠিল—তার পর একশতাব্দী মধ্যে আরেবিয়া দিল্লী হইতে গ্রানাডা পর্য্যন্ত কলেবর বিস্তার করিল।

কিসে এমন হইয়াছিল? শুধু কি সেই অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন পয়গম্বরের শক্তি প্রভাবে? না—তাহা নহে, বিশ্বাসের বলে। বিশ্বাসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—বিশ্বাসই মৃতের দেহেও জীবনী সঞ্চার করে—বিশ্বাসই দুর্ব্বলকে শক্তি দেয়। যে জাতি বিশ্বাস করিতে শিখে সে জাতির ইতিহাস পৃথিবীর মহাপত্রে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়। আর যে জাতি বিশ্বাস করিতে বিস্মৃত হয়, সে যতই কেন উচ্চে থাকুক না, তাহার পতন রোধ করিতে পারে এমন শক্তিমান পয়গম্বর আজিও জন্ম গ্রহণ করেন নাই। শিক্ষাহীন ধর্ম্মহীন মরুচর আরববাসী তাহাদের কলকোলাহল মধ্যে একটী মাত্র সমুন্নত শ্রেষ্ঠ মানব মহম্মদ, আর তাঁহার পশ্চাতে অনন্ত কালের ক্ষুদ্র কণিকা একটী মাত্র শতাব্দী—যেন ভগবানের চরণস্পর্শে মহাকালের ঘূর্ণ্যমান অনলচক্রের একটী মাত্র স্ফুলিঙ্গ আকাশমার্গে নামিয়া আসিল—সেই একটী মাত্র স্ফুলিঙ্গ আসিয়া একটী অজানিত বালুময় বিশাল জনপদ স্পর্শ করিল—আর অমনি সেই অনন্ত বালুরাশি শক্তিশালী বিস্ফোরকের ন্যায় মুহূর্ত্তে প্রজ্বলিত হইয়া দিগ্‌দেশ উদ্ভাসিত করিয়া দিল। সে আলোকে ভারতবর্ষ, চীন, আফ্রিকা, আমেরিকা, স্পেইন কত দেশ আলোকিত হইয়া উঠিল! পৃথিবীর পয়গম্বরগণ তাই স্বর্গের বিদ্যুৎস্বরূপ। মানুষ ইন্ধনরূপে সেই বিদ্যুতের অপেক্ষা করে—সেই স্বর্গ-

তড়িতের স্পর্শ মাত্রেই তাহারা দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত করিয়া প্রজ্বলিত হয়।

দার্শনিক কার্লাইলের ভাষায় তাই কহিতেছি—

We cannot look, however imperfectly, upon a great man, without gaining something by him. He is the living light fountain, while it is good and pleasant to be near. The light which enlightens, which has enlightened the darkness of the world; and this not as a kindled lamp only, but rather as a natural luminary shining by the gift of Heaven.

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

মানবের জন্মকথা

মানুষের কতিপয় বিশেষ বিশেষ লক্ষণ সকল মুখ্য ভাবে অথবা গৌণ ভাবে, সম্ভবতঃ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। মুখ্য অপেক্ষা গৌণ ফলই অধিক। যে সকল অঙ্গগঠনের অথবা ধাতুর পরিবর্ত্তন দেহীর আচারব্যবহারের উপযোগী হয় না, আহার-প্রাপ্তির সুবিধা-জনক হয় না, এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করে না, সে সকল পরিবর্ত্তন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন হইতে রক্ষা হইতে পারে না, এ কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। কিন্তু কিরূপ পরিবর্ত্তন দেহীর উপযোগী সে সম্বন্ধে সাহস করিয়া নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে। আমাদিগের মনে রাখা আবশ্যক যে দেহীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদিগের জ্ঞান কত সামান্য। রক্তের ও কোষগুচ্ছের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইলে দেহী নূতন জলবায়ুর উপযোগী হয়, অথবা নূতন প্রকার খাদ্য সামগ্রী ব্যবহার করিতে সক্ষম হয়, সে সকল বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না, বলিলেই চলে। এ স্থলে সহ-পরিবর্ত্তনের কথাও আমাদিগের বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। জেফ্রয় দেখাইয়াছেন যে মানুষের কোন কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিবর্ত্তিত হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গও কখন কখন আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, যেন ঐ সকল পরিবর্ত্তন পরস্পরের সহিত এক সূত্রে বাঁধা। সহ-পরিবর্ত্তনের কথা ছাড়িয়া দিলেও, দেহের একাংশের পরিবর্ত্তনবশতঃ অপর অংশের ব্যবহার অল্প বা অধিক হইতে পারে। সুতরাং ঐ অংশের অভাবনীয় পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব। * উদ্ভিদের কীটদষ্ট ত্বক্ বিষপ্রভাবে ফুলিয়া ব্রণ উৎপাদন করে; টীয়া পাখীকে কোন কোন মৎস্য আহার দিলে, অথবা ভেকের বিষ দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট করাইলে,

* ইহার বংশানুগতিক ফল হওয়া এমন আর বীকৃত হয় না।

উহার পক্ষের বর্ণ আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হয়;—এ সকল কথা বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে দেহস্থ রসের পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে, তাহার ফলে অন্যান্য পরিবর্ত্তন উৎপন্ন হইতে পারে। আমাদিগের এ কথা বিশেষরূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, চিরাতীত কালে যে সকল পরিবর্ত্তন সিদ্ধ হইয়াছে তাহা দীর্ঘকাল দেহীর উপকার সাধনে ব্যবহৃত হইয়া আসাতে সম্ভবতঃ দেহে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, এবং দীর্ঘকাল বংশানুক্রমে চলিয়া আসিতে পারে।

এইরূপে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বিধিকে মুখ্য ও গৌণ ভাবে অনির্দ্দিষ্ট অথচ দীর্ঘ প্রসার দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু নেগেলীর উদ্ভিদবিষয়ক নিবন্ধ এবং ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকারদিগের জন্তুসম্বন্ধীয় মন্তব্য, বিশেষতঃ অধ্যাপক ব্রোকা সম্প্রতি যাহা বলিতেছেন, সেই সমস্ত পাঠ করিয়া আমি এখন স্বীকার করি যে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন-বিধিকে আমি যে পরিমাণ কার্য্যকর মনে করিয়াছিলাম বোধ হয় ততদূর উহার প্রসার নাই; যোগ্যতমের জয়বিধানকেও আমি বোধ হয় অতিরিক্ত বাড়াইয়াছিলাম, উহার প্রসারও বোধ হয় অতদূর নাই। আমার Origin of species নামক গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণে আমার মন্তব্য একটু পরিবর্ত্তন করিয়া শরীর-গঠনের মধ্যে যেগুলি উপকারজনক তাহাতেই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বিধিকে সীমাবদ্ধ করিয়াছি। কিন্তু কতিপয় বৎসর হইল যে সকল বৃত্তান্ত জানা যাইতেছে তাহাতে আমার ধারণা হইয়াছে যে, যে সকল অঙ্গগঠন এক্ষণে অনাবশ্যক বোধ হইতেছে তাহার উপকারিতা ভবিষ্যতে হৃদয়ঙ্গম হইবে; সুতরাং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবিধির অন্তর্গত হইবে। যাহা হউক যে সকল অঙ্গগঠন এক্ষণে উপকারী বা অপকারী কিছুই বোধ হইতেছে না, সে সকলের বিষয় আমি পূর্ব্বে যথাযোগ্য বিবেচনা করি নাই। ইহা আমার গ্রন্থের সর্ব্বাপেক্ষা বড় ভ্রম। আমার কৈফিয়তে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে আমার দুইটী লক্ষ্য ছিল—(১) ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীব স্বতন্ত্ররূপে সৃষ্ট হয় নাই, (২) জীব-বিবর্ত্তনের প্রধান কারণ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। অভ্যাসের বংশগত ফল প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকে বিশেষরূপে সহায়তা করিয়াছে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার মুখ্য প্রতিক্রিয়াও উহাকে কথঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক জাতীয় জীব কোন না কোন উদ্দেশ্যবশতঃ সৃষ্ট হইয়াছে, এ বিশ্বাস তৎকালে সকলেরই ছিল, আমিও উহার হাত একেবারে এড়াইতে পারি নাই। এই কারণবশতঃই আমি ধরিয়া লইয়াছিলাম যে অব্যবহার্য্য দেহাংশগুলি বাদে দেহের প্রত্যেক গঠনই উপকারজনক, যদিও কখন কখন সেই উপকার বুঝিতে পারা অসাধ্য হইয়া উঠে। মনে এইরূপ ধারণা থাকিলে সকলেই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বিধিকে অতীতকালে অথবা বর্ত্তমান সময়ে অতিরিক্ত প্রসার দিতে পারেন। যাঁহারা বিবর্ত্তন-বিধি স্বীকার করেন, অথচ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ

কেহ আমার গ্রন্থ সমালোচনা কালে বোধ হয় ভুলিয়া যান যে আমার উপরের লিখিত দুইটী বিষয়ে লক্ষ্য ছিল। এই হেতু আমি প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে অধিক শক্তিশালী মনে করিয়া ভ্রম করিয়াছিলাম। এই ভ্রম আমি সম্পূর্ণ স্বীকার করি না; তবে উহার প্রসার অতিরিক্ত বৃদ্ধি করিয়াছিলাম, এ কথা সম্ভবপর। যাহা হউক বিভিন্ন জীব স্বতন্ত্ররূপে সৃষ্ট হইয়াছে, এই মতকে খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়া উপকারই করিয়াছি, এ মত আশা করিতে পারি।

আমি এখন দেখিতে পাইতেছি যে সকল জীবদেহেই বিশেষতঃ মানবদেহে গঠনের এরূপ অনেক বিশেষত্ব আছে যাহা কোন কালেই তাহাদিগের উপকারে আসে নাই, এখনও আসে না। সুতরাং শারীর-তত্ত্ব সম্বন্ধে ও সকলের গুরুত্ব কিছুই নাই। প্রত্যেক জাতি ও ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রভেদ আছে তাহা কিরূপে উৎপন্ন হইল আমরা জানি না। পূর্ব্বানুবৃত্তিবশতঃ ঐ সকল উৎপন্ন হয় এ কথা বলিলে বিষয়টীকে কয়েক পুরুষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লওয়া যায় সত্য *; কিন্তু প্রত্যেক বিশেষত্বই কোন নিমিত্ত-কারণ হইতে জাত হইয়াছে ইহা নিশ্চয়। নিমিত্ত-কারণ সকল যাহাই হউক, উহারা যদিপি দীর্ঘকাল এক ভাবে এবং প্রবলরূপে কার্য্য করিতে থাকে, তাহা হইলে কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তি-গত প্রভেদ উৎপন্ন না হইয়া সুস্পষ্ট এবং স্থায়ী পরিবর্ত্তন উৎপন্ন হইবে; কিন্তু তাহারা শারীর-তত্ত্ববিষয়ক কোন গুরুত্ব হইবে না। নিমিত্ত-কারণ ঐরূপে কার্য্য না করিবার কোন হেতু নাই। পরিবর্ত্তিত দেহাংশগুলি উপকারজনক না হইলে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবশতঃ একভাবে স্থায়ী থাকিতে পারে না; ঐ হেতুতে অনিষ্ট-জনক পরিবর্ত্তন কালে পরিত্যক্ত হইতে পারে, এই মাত্র। প্রবর্ত্তক কারণ এক ভাবাপন্ন হইলে লক্ষণ সকলও স্বভাবতঃ একভাবাপন্ন হয়; এবং বহু ব্যক্তির অবাধ যৌন সম্বন্ধ হইলেও ঐরূপই হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী কালে একই জীব এই রূপে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; আর যতদিন প্রবর্ত্তক কারণ এক ভাবেই থাকে, এবং যৌন সংসর্গ সংঘটিত হয়, ততদিন ঐ পরিবর্ত্তন এক ভাবাপন্নই থাকিবে। এই সকল প্রবর্ত্তক কারণ সম্বন্ধে এবং তথা-কথিত স্বতঃপরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে উহারা যে পরিমাণে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফল, তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে জীবের ধাতুগত অবস্থার পরিণাম।

শ্রীশশধর রায়।

* কোন পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষ পুরুষের দেহে কোন বিশেষ লক্ষণ থাকিলে এবং তাহা দীর্ঘকাল লুপ্ত থাকিয়া পরবর্ত্তী কোন জীবের দেহে প্রকাশ পাইলে তাহাকে পূর্ব্বানুবৃত্তি বলে। এই বিধি দ্বারা পরবর্ত্তী জীবের ঐরূপ বিশেষত্বের ব্যাখ্যা করিলে এই মাত্র বলা হয় যে ঐ বিশেষত্ব পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকও ছিল; কিন্তু তাহাতে কথাটাকে কয়েক পুরুষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লওয়া হইল মাত্র। ঐ পূর্ব্বপুরুষের কি কারণে ঐরূপ হইয়াছিল তাহার ব্যাখ্যা করা হইল না কিন্তু নিমিত্ত-কারণ অবশ্যই ছিল; তাহা দূর হইল না। পূর্ব্বানুবৃত্তি-বিধি একণে আর পুরুষের পীড়ন হয় না।

বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায়

বৌদ্ধধর্ম দুইটি বৃহৎ পদ্ধতিতে বিভক্ত। প্রথম পদ্ধতি—হীনযান, দ্বিতীয় পদ্ধতি—মহাযান।

এখানে যান শব্দের পারিভাষিক অর্থ, উপায়। অর্থাৎ যে পথ দিয়া গেলে, যে উপায় অবলম্বন করিলে পুনর্জন্ম পরিহার করা যায় ও মোক্ষলাভ হয়। বুদ্ধের মৃত্যুর পর, যে সকল সম্প্রদায় গঠিত হয়, সেই সকল আদিম সম্প্রদায় কর্তৃক এই হীনযানের পদ্ধতি অনুসৃত হইয়া থাকে। সুতরাং এই পদ্ধতিটিই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। এই পদ্ধতি হীনযান নামে অভিহিত হইয়াছে; কারণ, এই পদ্ধতির ভক্তেরা কেবল নীতিধর্ম-পালন, ও বুদ্ধের উপদেশের যাহা বহিরঙ্গ কেবল তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে, মহাযানের যে সূক্ষ্ম ও গুহ্যধরণের পরমার্থ-বিদ্যা তাহার অনুশীলন করে না।

ইহাই আদিম বৌদ্ধধর্ম। আদিম বৌদ্ধধর্মসম্বন্ধে আমি পূর্বেই ব্যাখ্যা করিয়াছি। এ সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। মহাযানের কথা পরে বলিব।

আপাতত, Csoma de Coros যে চারিটি বৃহৎ বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায়ের কথা বলিয়াছেন, তাহারই শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে কিছু বলিব। এই চারি সম্প্রদায়ের নাম—বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক।

প্রথম—বৈভাষিক সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। শাক্যমুনির চারিজন শিষ্য ঐ চারি শ্রেণীর প্রতিষ্ঠাতা। শাক্যমুনির পুত্র রাহুল প্রথম শ্রেণীর অধিনেতা। তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন; তাঁহার শিষ্যেরা মোক্ষসূত্র সংস্কৃত ভাষায় পাঠ করিত এবং সকল পদার্থেরই বাস্তব সত্তা স্বীকার করিত। দ্বিতীয় শ্রেণী আপনাদিগকে মহামণ্ডলী নামে অভিহিত করিত, উহাদের অধিনেতা কাশ্যপ, জাতিতে ব্রাহ্মণ। তাঁহার শিষ্যেরা কোন এক অপভ্রংশ-ভাষায় মোক্ষসূত্র পাঠ করিত। তৃতীয় শ্রেণীর অধিনেতা শূদ্র উপালী এবং এই শ্রেণী আপনাদিগকে "বহুজনসম্ভ শ্রেণী" নামে অভিহিত করিত। এই শ্রেণীর শিষ্যেরা পৈশাচিক ভাষায় মোক্ষসূত্র পাঠ করিত। চতুর্থ শ্রেণীর অধিনেতা—শূদ্র যাতাক্ষণ। এই শ্রেণী আপনাদিগকে 'ধ্রুবনিবাস' বলিত; উহারা ইতর জনের ভাষায় মোক্ষসূত্র পাঠ করিত।

সাধারণত বৈভাষিকদিগের সম্প্রদায় দার্শনিক তত্ত্বালোচনার নিম্ন ধাপে অবস্থিত। উহারা শাস্ত্রের নিতান্ত ইতরসাধারণবোধ্য আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করিত; সমস্তই তাহারা বিশ্বাস করিত, কোন বিষয়েই বিচার-তর্ক করিত না।

দ্বিতীয়,—সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় সূত্রগ্রন্থাদিকেই স্বকীয় মতবাদের প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিত।

আবার সৌত্রান্তিকদিগের মধ্যেও কেহ কেহ সূত্রাদির প্রমাণ-মূলে এবং কেহ কেহ বিচার-তর্কের সাহায্যে স্বকীয় মত স্থাপনের চেষ্টা করিত।

তৃতীয়,—মাধ্যমিক সম্প্রদায়। প্রকৃত পক্ষে, মাধ্যমিকদিগের দার্শনিক মতবাদই বৌদ্ধদর্শন। এই দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ দার্শনিক নাগার্জ্জুন। ইনি প্রায় বুদ্ধের মৃত্যুর ৪০০ বৎসর পরে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের প্রথম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। মহাযান-প্রণালীর সংশ্লিষ্ট এই সর্ব্বপ্রথম দার্শনিক সম্প্রদায়।

এই সম্প্রদায়ের মতবাদ প্রজ্ঞাপারমিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই প্রজ্ঞাপারমিতা—দার্শনিক মতবাদসমূহের একটি বিপুল সঙ্কলন; ইহাতে এক লক্ষ সন্দর্ভ আছে এবং ইহা চারি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রজ্ঞাপারমিতার আক্ষরিক অর্থ—"যাহার দ্বারা প্রজ্ঞার পরপারে উপনীত হওয়া যায়।" এই সম্প্রদায় প্রজ্ঞাপারমিতার যেরূপ ব্যাখ্যা করেন তাহা দুই আত্যন্তিক মতবাদ হইতে দূরে অবস্থিত; অর্থাৎ আত্মা নিত্যকাল বিদ্যমান থাকে কিংবা মৃত্যুর পর আত্মার একেবারেই ধ্বংস হয়—এই দুই মতবাদের কোনটিই তাঁহারা অনুমোদন করেন না। প্রজ্ঞার গ্রন্থাদিতে যে মতবাদ বিবৃত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য এইমাত্র প্রমাণ করা যে, কি জ্ঞেয়, কি জ্ঞাতা, কাহারই বাস্তব সত্তা নাই। ঐ সকল গ্রন্থের সিদ্ধান্ত এই—বুদ্ধের নাম একটি শব্দ মাত্র এবং স্বয়ং বুদ্ধও একটি মায়া-বিভ্রমের অনুরূপ। মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের মূল-মত—শূন্যবাদ। "সংযোগজাত পদার্থ মাত্রই নশ্বর" এই যে শাক্যসিংহের বীজসূত্র, প্রাগুক্ত মতবাদ এই বীজসূত্রের পরিণতি মাত্র। কিন্তু, বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পর বৌদ্ধধর্ম্ম কোন্ পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল তাহা সহজেই বুঝা যায় ঐতিহ্যিক উপলব্ধি ও প্রাকৃতিক নিয়মের নির্দ্দিষ্ট সীমা না মানিয়া, ধ্যান চিন্তার আত্যন্তিক ঝোঁকে অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহের অনুসরণ করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্ম কল্পনা-বহুল কতকগুলি অদ্ভুত সিদ্ধান্তে উপনীত হইল। এমন কি, শেষে এইরূপ প্রতিপন্ন হইল যে, স্বয়ং বুদ্ধ, ব্যামোৎপন্ন পরিণাম-বিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহেন।

যে যুগে প্রামাণিক দলিলপত্রের অভাব ছিল সেই যুগের অধিকাংশ গ্রন্থ-কারেরা বৌদ্ধধর্ম্মের বৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, আমরা অবশ্য সে ভ্রমে পতিত হইব না। বৌদ্ধ-ধর্ম্মব্যাখ্যাতা পাদ্রি ধর্ম্মপ্রচারকগণ, কংফুচু-সম্প্রদায়ভুক্ত কৃতবিদ্য চীনবাসিগণ, এমন কি Degurgnesর ন্যায় সুপণ্ডিতগণ যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন তাহা এই—তাঁহারা বলিয়াছেন, প্রজ্ঞাপারমিতায় Vou-goey অর্থাৎ অ-সৎবাদ প্রতি-পাদিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে Remusat কিরূপ বলেন দেখা যাক :—"Degurgnes, "বা-হুয়াল-লিন্" হইতে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন :—এই বচনটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ কেহ Vou-goeiর অর্থে অ-সৎ বা অ-সত্তা বুঝিলেন, কেহ বা vou ও goei এই দুই

শব্দকে পৃথক করিয়া অর্থ করিলেন, অর্থাৎ vou অসৎ ও goei সৎ। আরও এই কথা বলিলেন, মূলে দুয়েরই মধ্যে মিল আছে।"

কিন্তু 'মা-তুয়ান্-লিনের' বচনটিতে একটি অতিসূক্ষ্ম পার্থক্য সূচিত হইয়াছে—তাহা তখনকার যুগে কেহ ধরিতে পারে নাই। 'Won-woei'—পূর্ণস্বরূপ; উপাধিবিহীন, সম্বন্ধহীন, ক্রিয়াহীন বিশুদ্ধ সত্তা; সেই পূর্ণস্বরূপ, সেই পরমাত্মা, সেই শূন্য, সেই কিছুই না, সেই অ-সৎ;—যাহার প্রতিযোগী —এই সমস্ত দৃশ্যমান্ ও অদৃশ্য জগৎ। এই পরম সত্তার কথা বলিতে গিয়া, ফো (শাক্য) ও লাওৎসুর দুই সম্প্রদায় অতীব অস্পষ্ট ও দুর্বোধ বাক্য প্রয়োগ করায় সুশিক্ষিত লোকদিগের নিকট উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন। যাহা ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, যাহাকে ধরা যায় না, তাহাকে ধরিবার ব্যর্থ চেষ্টা, এবং সেই চেষ্টাপ্রসূত মতবাদের অস্বাভাবিকতা যে, শিক্ষিত লোকের হাস্য উদ্রেক করিবে তাহাতে বিচিত্র কি। আমাদের উল্লিখিত গ্রন্থকারগণ যাঁহারা না বুঝিয়াই ঐ সকল মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাঁহারা এই কথা ক্রমাগত আবৃত্তি করিয়া থাকেন যে,—এই দুই সম্প্রদায় জগতের সত্তা অস্বীকার করে; তাহাদের মতে, 'কিছুই নহে' পদার্থই "যাহা কিছু সমস্ত" পদার্থের স্রষ্টা; এই সমস্ত পদার্থ "কিছুই নহে;" কেবল এই "কিছুই নহে" পদার্থেরই অস্তিত্ব আছে, এবং "ফো"-র ধর্ম্ম অর্থাৎ শাক্যমুনির যে ধর্ম্ম উহা শূন্যবাদেরই ধর্ম্ম। এই অপবাদ সকল দেশের শুষ্কতর্কী ও নিষ্ক্রিয়বাদী (quietest) দুঃস্বতাত্ত্বিকদিগের প্রতিই প্রযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু এই সকল বাক্য কি ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছিল তাহা দেখা আবশ্যক। এই সকল বাক্যের মধ্যে পরস্পর-বিরুদ্ধ অসঙ্গত কথা থাকা দূরে থাকুক, বরং এই সকল বাক্যের মধ্যে উচ্চ চিন্তা ও ধ্যানসমাধিসমুৎপন্ন বিরাট কল্পনারই পরিচয় পাওয়া যায়।"

এই সম্প্রদায়ের অবলম্বিত শূন্যবাদ ও অসৎবাদ-সম্বন্ধে A. Remusat যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহার সহিত Bournoufএর ব্যাখ্যাটিও যুক্ত করা আবশ্যক। Bournouf অবিদ্যা শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—জগতের বাস্তব সত্তা সম্বন্ধে যে মিথ্যা জ্ঞান তাহা কল্পনা হইতে উৎপন্ন। যে চিৎতত্ত্ব যখন একটা বিশেষ আকার ধারণ করে নাই, শরীর পরিগ্রহ করে নাই, —এই মিথ্যা জ্ঞান বা অবিদ্যা সেই চিৎ-তত্ত্বেরই প্রথম ক্রিয়া। তিনি আরও এই কথা বলেন,—কিন্তু এই অবিদ্যার যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইল তাহার আক্ষরিক অর্থ যদি গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, ইহার মূলে একটি চিৎতত্ত্ব আছে, একটি আত্মা আছে, একটি ব্যক্তি আছে—যে সত্যকে জানিতে পারে কিংবা না জানিতেও পারে। তাই Burnouf এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই চিৎতত্ত্বই প্রজ্ঞা-প্রভৃতির "চিত্ত" কিংবা "পুদ্গল" (পুরুষ। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, কার্য্যকারণবাদ স্বীকার করিলে, ঐ সঙ্গে চিৎতত্ত্বের সত্তাও স্বীকার

করা হইয়াছে এইরূপ বুঝায়। কেননা,—যেহেতু বিষয়ের সম্বন্ধে ভ্রমের সম্ভাবনা বা অজ্ঞানের সম্ভাবনা আছে, অতএব একটি বুদ্ধিমান বিষয়ী থাকাও আবশ্যক।"

যে তিন প্রমাণ ও যে দুই সত্যের দ্বারা এই শূন্যবাদ সমর্থিত হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে ;—

প্রথম প্রমাণ—কল্পনা বা ভ্রান্তি। ইহা কোন পদার্থের ঐকান্তিক সত্তায় বিশ্বাস,—যে সত্তা কেবল আমাদের কল্পনাতেই অবস্থিত এবং যাহার কোন বিশিষ্ট গুণ নাই।

দ্বিতীয় প্রমাণ—ভ্রমের ভিত্তি, অর্থাৎ যাহা কার্য্য-কারণ-সূত্রে কল্পিত হইয়াছে ; যথা, আত্মা, প্রভা, বুদ্ধি।

তৃতীয় প্রমাণ পরমার্থ। সেই অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা যাহা প্রমাণ করা যায় না, যাহা প্রত্যক্ষ করা যায় না—যেমন শূন্য কিংবা "আমি-না"। এইরূপে, মানুষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, যাহা কিছু সমস্তই শূন্য ; বিদ্যমান পদার্থমাত্রই কাল্পনিক ; কেননা, উহা অন্যের অপেক্ষা করে, অন্যের উপর নির্ভর করে।

তত্ত্ব দুইটি এই :—"সম্বৃতি সত্য" (relative truth) ও "পরমার্থ সত্য" (absolute truth । Schlagurveitর মতে, "সম্বৃতি হইতেই অবিদ্যা বা মায়ার উৎপত্তি ; ব্যক্তিগত ধ্যানসমাধির সাহায্যে কোন সিদ্ধপুরুষ যে বিদ্যা লাভ করেন এবং যাহার দ্বারা অবিদ্যাকে অপসারিত করিতে সমর্থ হয়েন, সেই বিদ্যাবিশেষই পরমার্থ।"

এই প্রণালী অনুসারে নির্ব্বাণে উপনীত হইতে হইলে, সংসারকে বিসর্জ্জন করিতে হয়, প্রবৃত্তিসমূহকে দমন করিতে হয়, সুখ-সম্ভোগ হইতে বিরত হইতে হয়, শুধু কল্পনাকে ধ্যানের বিষয় না করিয়া, ছয়টি অতীন্দ্রিয় সদ্‌গুণ লাভের জন্য যত্নপূর্ব্বক সাধনা করিতে হয়।

বৌদ্ধধর্ম্মের আর সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা এই নাগার্জ্জুনের সম্প্রদায় বহুশতাব্দী ধরিয়া সমধিক বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছিল। তাহার পর, যে, চতুর্থ সম্প্রদায়ের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি সেই আর্য্য-সংঘ-প্রবর্ত্তিত যোগাচার্য্য-সম্প্রদায় অন্ধযুগের সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়া অবিলম্বে প্রভূত বিস্তার লাভ করে এবং তৎপ্রযুক্ত মাধ্যমিক সম্প্রদায় একটা ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হয়। তথাপি, যখন ভারতভূমি হইতে বৌদ্ধেরা দূরীভূত হয়, এবং ভারতের অনেকগুলি বৌদ্ধ ভিক্ষু উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করে, সেই সময় মাধ্যমিক সম্প্রদায় আবার উত্থান করে, এবং নূতন নূতন গ্রন্থ লিখিয়া অথবা ভাষ্য লিখিয়া মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের মতবাদগুলিতে নূতন বল সঞ্চারিত করে। এই সম্প্রদায় "প্রসঙ্গ-মাধ্যমিক" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। নাগার্জ্জুনের সিদ্ধান্তগুলিকে আরও বেশী দূর লইয়া গিয়া, এই সম্প্রদায় স্বীকার করিল যে প্রাগুক্ত দুই সত্যের একই লক্ষণ ও প্রকৃতি, কিন্তু দুই বিভিন্ন অর্থ। উহাদের উভয়েরই দুইটি পথ ও দুই প্রকার মোক্ষ। প্রথম পথ দিয়া "সুখবতী" নামক স্বর্গে উপনীত হওয়া যায়। সেখানে মানুষ পূর্ণ সুখ সম্ভোগ করে। ধর্ম্মগ্রন্থাদির বর্ণনানুসারে, ইহা একটি বিশাল সরোবর ; এই সরোবরটি দুর্লভ সুরভি রক্তপদ্ম ও শ্বেতপদ্মে

সমাচ্ছন্ন। যে সকল সাধু পুরুষ এই আনন্দ-ধামে উপনীত হয়েন, তাঁহাদের জন্যই ঐ পুষ্পশয্যা বিরচিত। তাঁহারা পুনর্জ্জন্মনিয়মের অধীন না হইলেও ভববন্ধনে আবদ্ধ। সদ্-গুণের সাধনার দ্বারা এই স্বর্গে উপনীত হওয়া যায়।

দ্বিতীয় পথ নির্ব্বাণের পথ। অর্থাৎ সম্পূর্ণ মোক্ষের পথ। বুদ্ধির সর্ব্বোচ্চ উৎ-কর্ষ লাভ করিলে তবেই এই অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়।

এই সম্প্রদায়ের প্রধান মতটি "মধ্য" শব্দের দ্বারা সূচিত হয়। ইহাদের মতে, পারমার্থিক সত্তাও নাই, আপেক্ষিক সত্তাও নাই। যাহা কখনও ছিল না তাহাকে সৎ বলাও যায় না; আবার, যাহা বাস্তবিক আছে তাহাকে একেবারে অসৎও বলা যায় না—ইহাই মধ্য শব্দের বাচ্য। Schlagurwert এই সম্প্রদায়ের প্রযুক্ত কতকগুলি যুক্তির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন:—"যদি বৃক্ষ স্বকীয় বিশিষ্ট স্বভাবের গুণে বর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে বৃক্ষ যৌগিক পদার্থ নহে; কিন্তু তথাপি ইহা যৌগিক পদার্থ বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। যদি জাগতিক কোন পদার্থের নৈজিক সত্তা থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা তাহা দেখিতে পাইতাম, শুনিতে পাইতাম; কেননা, এ ক্ষেত্রে দর্শনজ্ঞান ও শ্রবণজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে একই হইত।—অনেক পদার্থেরই "সামান্য" গুণের কোন "বিশেষ" থাকিত না; কেননা উহা অবিভাজ্য অখণ্ড একত্ব; যদি আমি বলিয়া কোন পদার্থ থাকিত, তাহা হইলে সেই "আমি"কে এক বলিয়াই আমরা গ্রহণ করিতাম। তাহা হইলে পুনর্জ্জন্ম বৃক্ষ বর্দ্ধিত হইতে বাধ্য হইত না, কারণ সে বরাবর বিদ্যমান থাকিত।" "প্রসঙ্গ"-সম্প্রদায়ের মতে, আত্মা বা "আলয়ের" যে সত্তা তাহা ঐকান্তিক সত্তা, নিত্য সত্তা।

Csomaর শ্রেণীবিভাগ অনুসারে চতুর্থ সম্প্রদায়টি——যোগাচার্য্যদিগের সম্প্রদায়। উহাদের দর্শন-পদ্ধতি একটি ধ্যাননিষ্ঠপদ্ধতি এই দর্শন, এই মূল কথাটি হইতে যাত্রা আরম্ভ করে যে, ত্রিলোকের অস্তিত্ব কেবল আমাদের কল্পনাতেই বিদ্যমান এবং আত্মাই সকল পদার্থের মূলভিত্তি, আত্মাই মূর্ত্তিমান শব্দ। এই আত্মা নিত্য, "স্বচ্ছ ও স্থির জলে চন্দ্র যেরূপ প্রতিবিম্বিত হয়, আত্মাও সেইরূপ সকল পদার্থে প্রতি-বিম্বিত হইয়া থাকে।" আত্মা যে সংসার-চক্রে ভ্রমণ করে তাহার কারণ, সে তাহার বিশুদ্ধতা হারাইয়াছে। ত্রিলোক কল্পনামাত্র, ভ্রান্তিমাত্র—এই তত্ত্বটি উপলব্ধি করিলেই আত্মা স্বকীয় বিশুদ্ধতা পুনর্ব্বার লাভ করে এবং যোনিভ্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পায়। "যাহার যোগবল আছে সেই কেবল ধ্যানের দ্বারা মূল সত্তার যথার্থ প্রকৃতি উপলব্ধি করে।"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভ্রান্তি

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বৌদিদি নাছোড়বান্দা, অগত্যা কিশোরী-মোহনকে মিষ্টিমুখ করিতেই হইল। বৌদিদিকে অনেক তাল সামলাইতে হইতেছে, সে জন্য কিশোরীমোহনের জলযোগের উদ্যোগ পূর্ব্বে, বৌদিদি করুণার কতকটা সাহায্য লইতে বাধ্য হইলেন—যথা,—আসনপাতা, জল-আনা, ইত্যাদি। মেয়েটি ত বেশ, দিব্য ফুটফুটে টুকটুকে, কে এ কন্যা? ইহার সিঁথিতে ত সিন্দুর-বিন্দু নাই! তবে কি ইহার এখনও বিবাহ হয় নাই? কেন! এমন মেয়ের এখনও বিবাহ হয় নাই? কেন? বিবাহ যে কারণেই না হোক এ নিশ্চয়ই ম্যালথসের শিষ্য নহে? ম্যালথসের মহত্ব মেয়েরা বুঝিবে এমন দিন কি আমাদের দেশে আসিবে? এই মেয়েটির পরিচয় জানিতে কিশোরীর মনে বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল, কিন্তু বৌদিদিকে সে কথা বলিতে কিশোরীর কেমন বাধ বাধ ঠেকিতেছিল! কেন এ বাধা! কিশোরী তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার নিজের নিকটেই ইহা একটা রহস্য মনে হইতেছিল।

বৌদিদি বড় কৌতুক দেখিতেছিলেন। আজ কিশোরীর কথার বার্ত্তায়, ভাবে ভঙ্গীতে, যে কোমলতা প্রকাশ পাইতেছিল বৌদিদির সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষের অভিজ্ঞতায়, এটি আর কখনও পরিলক্ষিত হয় নাই। কিন্তু ঠাকুরপোর এ ভাব স্থায়ী কি সাময়িক সে সম্বন্ধে বৌদিদির বিশেষ সন্দেহ ছিল. যাহা হোক তিনি কিশোরীর বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা তাহার মুখ-দর্পণে প্রতিফলিত দেখিলেন! এবং করুণাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "কর, ঠাকুরপোকে প্রণাম কর।" লজ্জিতা সঙ্কুচিতা করুণা সে আদেশ পালন করিল। এই প্রণামে কিশোরী কিঞ্চিৎ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। মুখে বলিল "থাক্, থাক্, প্রণাম আবার কেন?" বৌদিদি উহার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "ও যে আমার ছোট বোন, তোমাকে প্রণাম করিবে তাতে আর দোষ কি?" তখন বৌদিদি করুণার বিস্তারিত পরিচয় কিশোরীর নিকট দিলেন!

করুণা লেখা পড়া বেশ জানে, ঘর সংসারের কাজেও সে খুব নিপুণা! তাহাদের গ্রামের জমিদার বাবুর একমাত্র পুত্রের সহিত করুণার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল, জমিদার বাবুর অবস্থা খুব ভাল, বিষয়-সম্পত্তি, সোণাদানা, লোক-লস্কর, হাতি-ঘোড়া, এ সবের কোন অভাব নাই। যখন এই সম্বন্ধের কথাবার্ত্তা হয়, তখন পাড়াপ্রতিবেশিনীর মধ্যে অনেকেই বলিয়াছিল, "গাঁয়ে ঘরে এমন ইন্দির তুল্য সোয়ামী পাওয়া কি কম ভাগ্যির কথা, করুণার সার্থক শিবপূজা!" পুরুষ মহলেও এ সম্বন্ধ লইয়া খুব আলোচনা চলিয়াছিল, কোথাও হর্ষ কোথাও দ্বেষ কোথায় আরও কত কি। কিন্তু করুণার কি জিদ্, সে সমবয়সীদের কাছে বলিল সেখানে কিছুতেই সে বিবাহ করিবে না। কথাটা ক্রমে

কর্তৃপক্ষের কাণে আসিল, আত্মীয় বন্ধুরা মেয়ের নির্লজ্জতায়, ততোধিক তাহার নির্লজ্জতা দেখিয়া, অবাক হইয়া গেলেন; কিন্তু এ 'অবাক' ভাব বেশী দিনের জন্য নহে। শীঘ্রই বাক্যের ঝড় বহিল, কিন্তু করুণা সে ঝড়ে অটল। শেষে এ বিবাহের জন্য বেশী পীড়াপীড়ি করিলে করুণা একটা বিষম কাণ্ড বাধাইবে কথায় বুঝিয়া করুণার মাতাপিতা কোন ওজরে এ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেন; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার বড় অপ্রকাশ রহিল না, এবং ইহার ফলও বড় বিষময় হইল, জমিদার বাবু নিজে তেমন জবরদস্ত লোক নন, তাই রক্ষা; কিন্তু তাহার পরিষদবর্গ আত্মসম্মানাহতা ক্রুদ্ধা, জমিদার-গৃহিণীর মনস্তুষ্টির জন্য বিবিধমতে অনিষ্ট সাধন আরম্ভ করিল। করুণার অনেক সম্বন্ধ আসে, সকলে পছন্দ করিয়াও যায়, কিন্তু সম্বন্ধ স্থির আর কোথাও হয় না। এইরূপে দুইবৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, করুণা এখন বেশ বড় হইয়াছে, আর বিবাহ না দিলে চলে না, জমিদার গৃহিণী ইহাতে বড় আনন্দিতা। তিনি তাঁর মনের ভাব সব সময় চাপিতে পারেন না। আমার সোণার চাঁদ ছেলের ঘাড়ে অপকলঙ্ক* দেওয়া! পুরুষ মানুষের আবার ও সবে দোষ কি! তা দেখা যাক্, মেয়ের কি রকম বিয়ে হয়।

এতক্ষণে কিশোরীর মনের একটা খটকা দূর হইল। এমন সুন্দরী কন্যার বিবাহ এতদিন কেন যে হয় নাই, তা তিনি এখন বুঝিলেন, সঙ্গে সঙ্গে করুণার প্রতি তার বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিল। বুঝি কিছু সহানুভূতি হইল।

আচ্ছা, কিশোরী এ মেয়ের জন্য যেমন করিয়া পারে একটি সুপাত্র স্থির করিবে। এবং সে কথা সে বৌদিদিকেও বলিল। আর কিশোরীর যে কথা সেই কাজ, সত্যই সে করুণার পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিল।

কিশোরী বিবাহ দিবার পক্ষপাতী নহে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাকে একটু নরম হইতে হইল। কি অত্যাচার! করুণার ব্যবহারে কিশোরীর মনে করুণার সঞ্চার হইল—এবং সেই করুণার খাতিরেই কিশোরী আপনার উচ্চ আসন হইতে একটু নামিতে বাধ্য হইয়াছে। তা ইহাতে আর এমন কি দোষ হয়? কি বল তোমরা?

যখন যে সংবাদ হয় কিশোরী বৌদিদিকে সে সংবাদ দিতে আসে। কখন কখন কোন সংবাদ না থাকিলেও কিশোরী অন্য কোন উপলক্ষেও সে বাটীতে আসে, কখন বৌদিদির সহিত সাক্ষাৎ করে, কোনবার বা করে না—করুণাকে কখন দেখিতে পায়, অনেক সময় পায়ও না। আচ্ছা করুণার দেখা না পাইলে কিশোরীর মন কি কিছু বিষণ্ণ হয়? যাহার জন্য কিশোরী অন্য পাত্র স্থির করিতে এত উৎসুক, তাহাকে দেখিতে না পাইলে কিশোরী চঞ্চল হইতে যাবে কেন? কিন্তু সতর্ক কিশোরী নিজের মনকে বেশী বিশ্বাস করে নাই, কোথায় যেন একটু চঞ্চলতা লক্ষ্য করিল—না আর না, এখন

* চাকে কলঙ্ক কথাবেদই নিয়ম, ইহাই বোধ হয় গৃহিণীর সাধন—লেখক

তবে, 'য পলায়তি স জীবতি

কিশোরী দুই এক দিন সে পথে হাটা বন্ধ করিল। কিন্তু করুণার জন্য পাত্রের সন্ধানে বিরত হইল না।

বৌদিদি ইহার কারণ আর খুঁজিয়া পান না। তিনি প্রথম হইতে যে সন্দেহ করিতেছিলেন, তাহাই কার্য্যে পরিণত হইল। ঠাকুরপো যে জালে আপনি জড়িত হইতেছিল, তাহা কাটিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার ভাব বুঝা কঠিন, কিন্তু এ কি হইল—এ যে হাসিতে হাসিতে কপাল ব্যথা! করুণা কি শেষে ফাঁদে পড়াইয়া পড়িল!

বৌদিদি সব বুঝিলেন, নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাই ত এই অনর্থ ঘটাইল বুঝিয়া মর্ম্মে মরিয়া গেলেন, মনে মনে একশতবার স্বীকার করিলেন, সত্যই স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী বটে,* ঠাকুরপোর সদাশয়তাকে করুণার প্রতি অনুরাগের লক্ষণ কেন মনে করিয়াছিলেন বলিয়া অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। সত্যই ত, কই, ঠাকুরপো তো এমন কোন ভাব প্রকাশ করে নাই, যাহাতে সে করুণাকে বিবাহ করিবে, বুঝা গিয়াছিল। হায়! এলোকেশী ঠাকুরাণী তোমার মন্ত্রিত্বে কি শেষে বৌদিদির কল্পনা-রাজ্য ছারখার হইয়া যাইবে, আর মাঝ হইতে সেই সোণার হরিণী করুণা বুঝি বা "পুড়ে হবে খুন!"

* পাঠিকা মহোদয়া, বৌদিদির এ মন্তব্যের জন্য লেখাকী লেখককে দায়ী করিবেন না, এ পক্ষ মহাজনের এই উক্তিকেই বরং প্রলয়ঙ্করী বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত।

তা যা হবার তা হইয়াছে, এখন কোন প্রকারে করুণাকে পাত্রস্থ করিলে দিদি নিশ্চিন্তা হন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কিশোরীমোহনকে বৌদিদি ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। এলোকেশী ঠাকুরাণীও হারি মানিয়া গেলেন। কিশোরী যখন বৌদিদিদের বাটীতে প্রায়ই যাতায়াত করিত তখন করুণাকে দেখিতে কিছু উৎসুক হইত এবং তাহার মুখের কথা শুনিতে, বা তাহার প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে যেন কিছু আগ্রহান্বিত হইত—প্রথম দৃষ্টিতে এ সকল লক্ষণ ত অনুরাগের বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু এখন যে আসলে সবই ফাঁকা, ষোল কড়াই কাণা। কিশোরী নিজেই করুণার একটি সুপাত্র জুটাইবার জন্য বড় ব্যস্ত। নিজে এমন সুপাত্র হইয়াও মৃগমদমত্ত কিশোরী-মৃগ, মৃগনাভির সন্ধানে কেন ছুটাছুটি করিতেছে, এ প্রশ্ন করিয়াও বৌদিদি কোন অনুকূল উত্তর পান নাই! করুণা যে কিশোরীরই করুণা প্রার্থনা করে, বৌদিদি একথাও ইঙ্গিতে জানাইয়াছিলেন, কিন্তু কিশোরী সে দিকে কাণ দেয় নাই, "চোরা না মানে ধর্ম্মের কাহিনী"!

শেষ কিশোরী একটি সুপাত্র জুটাইলেন! কিশোরীরই একটি বন্ধু, তিনি এতদিন কিশোরীরই মত বিবাহনিবারণী সভার একজন "প্রাকটিকাল সভ্য" ছিলেন, সম্প্রতি সে সভা হইতে নাম কাটাইয়া পূর্ব্বপুরুষের চিরাচরিত পথেই চলিতে উৎসুক

হইয়াছিলেন, তাহার এই কাপুরুষতায় সদল কিশোরী তাহাকে একেবারে নাস্তানাবুদ করিতেন, সহসা সেই শীকারের প্রতিই কিশোরীর লক্ষ্য পড়িল—এ প্রস্তাবে যে সে অস্বীকার করিবে না, কিশোরী ইহা নিশ্চয়ই বুঝিয়া নিজে ঘটক হইয়া তাহার নিকটেই বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিল। এ কি রকম!. ভূতের মুখে রাম নাম, বন্ধু ত প্রথম ব্যাপারই বুঝিতে পারিলেন না, এও কি কিশোরীর একটা বিচিত্রপাত্মক চাল না কি! কিন্তু না, কিশোরীর কথায় বার্ত্তায়, ভাবগতিকে, বন্ধুর মনে সে সন্দেহের আর স্থান রহিল না। বন্ধু এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। কৌশলে মেয়ে দেখানও হইল—বন্ধুর বড় আহ্লাদ, এমন মেয়ে যে সহসা ফুটিয়া যাইবে, এ আশা তাঁর ছিল না—কিশোরী, ভাই, তুমিই প্রকৃত বন্ধু বটে! তবে ত শ্মশানে বা রাজদ্বারে ছাড়াও বন্ধুত্বের পরিচয় অন্যত্রও পাওয়া গিয়া থাকে! বন্ধু মুরলী কিছু অধিক মাত্রায় উল্লসিত হইয়া উঠিলেন—কিশোরী তাহার প্রাণের বন্ধু, বিশেষ তাহারই কল্যাণে মুরলী এই লক্ষ্মী-স্বরূপিণী গৃহিণী পাইতেছেন, সে উচ্ছ্বসিত আনন্দের বেগ কিশোরীর নিকট তিনি কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না! কিন্তু এ কি! কিশোরীর এ কি ভাব! কিশোরী ত আজকাল আর বন্ধুর সুখে মন খুলিয়া আনন্দ প্রকাশ করে না! সে প্রফুল্ল, নির্ম্মল মুখ-ছবিতে কিসের ছায়া পড়িল! সে পূর্ণিমার চাঁদ সহসা কেন জলদজালে আচ্ছন্ন হইল?

না, না, ও কিছু নয়। ওটা বুঝিবার ভুল!

* * * *

বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল, আর তিন দিন মাত্র বাকী। কাল গাত্রে হরিদ্রা! গাত্র-হরিদ্রার উৎসবে বন্ধু মুরলী কিশোরীকে যোগ দিবার জন্য বিশেষ করিয়া ধরিয়া বসিলেন। কিশোরী ত হাসিয়াই খুন! মুরলীটা বলে কি। আমাকে না কি "নিতবর" হতে হবে! পাগলামি দেখ একবার।

পাত্রপক্ষের গাত্রহরিদ্রার উৎসব শেষ করিয়া, কিশোরী কন্যাপক্ষের বাটীতে উপস্থিত। আরে রাম! কিশোরীকে কে ও রকম ভূত সাজাইয়াছে দেখ! তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া বৌদিদি ত বৌদিদি, করুণার মুখেও হাসি ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য, পরক্ষণেই করুণার করুণ নয়ন দুটি, কিশোরীর নয়ন পথে পড়িল! আজ এ শুভ দিনে করুণার এ বিষণ্ণ ভাব কেন! তবে কি এ বিবাহে সে সুখী নহে? কিশোরী কিছু অন্যমনস্ক হইল, অন্যের অগোচরে বৌদিদি বলিলেন, "ঠাকুরপো, করুণা যে তোমার স্কুলের ছাত্রী হবে বলে জিদ ধরেছিল, কিন্তু মেয়েদের সেখানে প্রবেশ নিষেধ বলে আমি জোর করে গায়ে হলুদ দিতে বসিয়েচি! এ বিয়েতে সে যে কিছুতে রাজি নয়!" কিশোরী একটু হাসিল!

* * * *

ওগো বার বেলার আর দেরী নাই যে।
বাজা, বাজা, শাঁক বাজা! কইরে

চুলি কোথায়? শানাই কই? মিন্সের। ঘুমুলো না কি?

* * *

আরে ছো, করে কি, অমন করে চুপ হনুদে চুবিয়ে দিতে হয় কি! যা, জামা-কাপড় সব মাটি! একদম মাটি!

অই রে বড়বৌর এমন নাকাল কে করে?

আচ্ছা আচ্ছা! এক মাঘে শীত পালায় না।

(ক্রমশ)

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

রিজিয়া

Sultan Raziyat—may she rest in peace!—was a great sovereign and sagacious, just, beneficent, the patron of the learned, a dispenser of justice, the cherisher of her subjects, and of warlike talent; and was endowed with all the admirable attributes and qualifications, necessary for kings.—*Minhajuddin.*

ইতিহাস-বিখ্যাত সুলতান রজিয়ৎ-উৎ-দুনিয়া বঙ্গসাহিত্যে [দুশ্চকাব্যের নায়িকা] রিজিয়া নামে পরিচিত বহুবার বহুস্থানে রঙ্গমঞ্চে তাঁহার প্রণয়-লীলা অভিনীত হইয়াছে। সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের শৈল-রাজধানী শিলং নগরে অভিনয়ের আয়োজন হইয়াছিল; কিন্তু মুসলমানসমাজের আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে বলিয়া, রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষগণ লেখকের নিকট তারযোগে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—এই প্রণয় কাহিনী ইতিহাস-সম্মত কি না? বলা বাহুল্য, দুশ্চকাব্যোক্ত প্রণয়-কাহিনী কল্পনাপ্রসূত; কিন্তু এত সংক্ষিপ্ত উত্তরে কোন পক্ষেরই তৃপ্তিলাভের সম্ভাবনা নাই।

সে অনেক দিনের কথা। পাঠানসাম্রাজ্যের সংস্থাপন-চেষ্টার প্রথম আমলের কথা। তখন চারিদিকে মহাবিপ্লব। তাহার মধ্যে যাঁহারা ভারতবর্ষে মুসলমান-শাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের পক্ষে বাধাবিঘ্নের অভাব ছিল না। সেই বিপ্লবযুগে দিল্লীর মুসলমানসিংহাসনে যে বীর-বালিকা আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারই নাম সুলতান রজিয়ৎ-উৎ-দুনিয়া-ওয়া-উদ্দীন। তাঁহার রাজমুদ্রায় এইরূপ নামই মুদ্রিত রহিয়াছে। ইংরাজলেখকগণ তাঁহার নাম রাজিয়া বা রিজিয়া রূপে লিপিবদ্ধ করায়, বঙ্গসাহিত্যে প্রকৃত নাম বিকৃত ভাবে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

এই বীর-বালিকা যেরূপ ঘটনাচক্রে রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজ্যরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসের কথা হইলেও, কাব্যের ন্যায় চিত্তাকর্ষক। সুতরাং তাঁহার কাহিনী দুশ্চকাব্যে স্থান লাভ করিবার যোগ্য বলিয়াই কথিত হইতে

পারে। কিন্তু সে যুগের ইতিহাসের কথা লোকসমাজ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে বলিয়া, নাট্যকার বোধ হয় পুরাকাহিনীর যথাযোগ্য অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন স্বীকার করেন নাই।

সৌভাগ্যক্রমে এই যুগের একজন সমসাময়িক ইতিহাস-লেখক বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার নাম মৌলানা মিন্‌হাজ-ই-সিরাজ। তাঁহার গ্রন্থই মূলগ্রন্থ,—উত্তরকালের লেখকবর্গের প্রধান অবলম্বন। তাঁহার মূল এবং মেজর রাভার্টি-কৃত ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং রজিয়তের ঐতিহাসিক কাহিনী অবগত হইবার অসুবিধা নাই।

৬০৭ হিজরীতে কুতব-উদ্দিন আইবক পরলোক গমন করিলে, ইয়ল্‌তিমিস্ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহাকে নিয়ত যুদ্ধ-কলহে ব্যাপৃত থাকিয়া সিংহাসন রক্ষা করিতে হইত। এক দিকে হিন্দু, অপর দিকে মুসলমান আমীর ওমরাগণ, তাঁহার বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি মুলতানের নিকটে (উচ্ছা নামক স্থানে) একটি দুর্গ অবরোধ করিয়া অবস্থিতি করিবার সময়ে, মিন্‌হাজ তাঁহার শিবিরে আশ্রয় লাভ করিয়া, উত্তরকালে তাঁহার কৃপায় গোয়ালিয়রে কাজীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সুলতানের পুত্রকন্যার অভাব ছিল না; তন্মধ্যে রজিয়ৎ তাঁহার সর্ব্বাধিক স্নেহপাত্র হইয়াছিলেন। তিনি পিতার শাসন-সময়েই নানাবিষয়ে ক্ষমতা পরিচালনা করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। গোয়ালিয়রের যুদ্ধে জয় লাভ করিবার পর, সুলতান এক সনন্দ লিখাইয়া, রজিয়তকেই উত্তরাধিকারিণী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে আমীর ওমরাহগণ আপত্তি করায়, সুলতান বলিয়াছিলেন, "পুত্রগণ যৌবনসুলভ সুখাভিলাষে মগ্ন, তাহারা কেহই রাজ্য পালন করিতে পারিবে না।"*

বৃদ্ধ সুলতান পরলোক গমন করিলে, তাঁহার ইচ্ছা সফল হইল না। আমীর ওমরাহগণ শাহ তুরকান নাম্নী দাসীর গর্ভোৎপন্ন ফিরুজ শাহকেই সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়া দিলেন। তিনি কোষাগার উন্মুক্ত করিয়া, যথেচ্ছ বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাঁহার গর্ভধারিণী তাঁহার নামে যথেচ্ছ আজ্ঞাপ্রচারের সুযোগ লাভ করিলেন।†

* The Sultan replied "My sons are engrossed in the pleasures of youth, and none of them possesses the capability of managing the affairs of the country, and by them the government of the kingdom will not be carried out. After my death it will be seen that not one of them will be found to be more worthy of the heir-apparentship than she, my daughter—*Major Raverty's Tubakat-i-Nasiri*, Vol I, p. 639.

† Firuz Shah opened the doors of his treasuries and gave himself up to pleasure.....Such was his excessive appetite for pleasure, and sensual enjoyment, that the business of the country, the concerns of the state, and the regulation of the affairs of the kingdom fell into disorder and confusion—*Raverty*, Vol I, p. 652.

মৃত সুলতানের অন্যান্য বেগমগণ নিহত হইলেন, তাঁহার কুতব-উদ্দীন নামক এক পুত্রের চক্ষু উৎপাটিত হইল ;—অল্প দিনের মধ্যেই রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল! ফিরুজ এবং তাঁহার গর্ভধারিণী বাহুবলে বিদ্রোহদমনের চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু রজিয়তকে চক্রান্ত করিয়া নিহত করিবার চেষ্টা করায়, তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে লোকচিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। ছয় মাস ছাব্বিশ দিনের রাজ্যাভিনয়ের পর, ফিরুজ ও তাঁহার গর্ভধারিণী পরাভূত ও নিহত হইবার পর, রজিয়ৎ সিংহাসনে সংস্থাপিত হইলেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, সুলতান রজিয়তকে পিতার মতই নিয়ত অসি ধারণ করিয়া, রাজ্যরক্ষার চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। অবশেষে তিনি হিন্দুহস্তে বন্দিনী হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া, রজিয়ৎ এক হাব্‌সী সেনানীকে অন্তরক্ষকের পদে নিযুক্ত করায়, তুর্কী আমীর ওমরাহগণ ঈর্ষাপরায়ণ হইয়াছিলেন। রজিয়ৎ মৃত্যুর পূর্বে পুরুষের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া, সর্ব্বসমক্ষে গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, সেনা চালনা করিয়াছিলেন। তৎকালে অশ্বাধ্যক্ষ তাঁহাকে আরোহণব্যাপারে সাহায্য করিতেন। এই কয়টি কথা একত্র করিয়া, কেহ কেহ হাব্‌সী অশ্বাধ্যক্ষকেই রজিয়তের প্রণয়পাত্র মনে করিয়া, ইঙ্গিতে তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আদ্যন্তের সমালোচনা করিয়া মেজর রাভার্টি লিখিয়াছেন,—ইহা অযথা আক্রমণ মাত্র।* রজিয়তের ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া, কেহ দৃশ্যকাব্য রচনা করিলে, তাহার শেষ অঙ্কে একটু প্রণয়-কাহিনীর স্থান হইতে পারিবে। তিনি যখন হিন্দুশিবিরে বন্দিনী, সেই সময়ে কারাগারে আপন প্রণয়পাত্রকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ইক্তিয়ার-উদ্দীন-অল্‌তুনিয়া। উভয়ে এক সঙ্গেই শত্রুকারাগারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

মৌনপূজা

যে আরতি মহেশ্বর তোমার মন্দিরে
শঙ্খনাদে আপনারে করে না প্রচার,
যেই পূজা নিশিদিন অতি ধীরে ধীরে
স্নিগ্ধ ধূপসম স্নিগ্ধ সুগন্ধ সম্ভার
সঙ্গোপনে করে নিবেদন পদে তব
ব্যর্থ সে কি, বাক্যহীন কুসুমকোরক
নিঃশব্দে ফুটিয়া ধীরে বিলায় সৌরভ
দিকে দিকে, অনন্তের দীপ্তি প্রচারক
সূর্য্য চন্দ্র নিঃশব্দ প্রকাশ চিরদিন,
ধ্রুব নক্ষত্রের জ্যোতি অঙ্ক রজনীতে
নিয়মিত করে নিত্য ভ্রষ্ট লক্ষ্যহীন
ভয়ার্ত্ত মানব বৃন্দে, ভকতের চিতে
দেবতা আপনি অন্তর্যামী, পূজা তাঁর
অন্তরের পুণ্য প্রেম, ভক্তি পুষ্প আর।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

---

* I think the character of this Princess has been assailed without just cause. —*Raverty*, Vol. I, p. 642 note 3.

বঙ্কিম-চরিত

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের পূর্ব্বে এক অদ্ভুত শঙ্খধ্বনি হইয়াছিল। সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণে গ্রামের অধিকাংশ লোকেই পুত্র হইয়াছে মনে করিয়া দেখিতে যান। কিন্তু যাইয়া দেখেন, তখন পর্য্যন্ত পুত্র বা কন্যা কিছুই হয় নাই। আর শঙ্খধ্বনিই বা কোথা হইতে আসিয়াছিল, বা কে করিয়াছিল কেহই বুঝিতে পারেন নাই। আজি পর্য্যন্ত সে সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন—কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই সে রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

বাংলা ১২৪৫ অব্দে ৩রা আষাঢ় (ইং ২৭শে জুন ১৮৩৮ সাল) তারিখে শুভযোগে বঙ্কিমচন্দ্র পিতৃপুরুষের আবাসস্থান কাঁটালপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঐ দিন একটী বিখ্যাত দিন—কারণ পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ ঐ দিনে অনন্ত শয্যায় শয়ন করেন। শৈশবে বঙ্কিমচন্দ্র অতিশয় রুগ্ন ছিলেন। অনেকেই তাঁহার জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতিশয় রুগ্ন শরীর, কোন সামর্থ্য নাই, ইহার নিমিত্তই হউক বা অপর কোন কারণবশতঃই হউক, সে গ্রামের ভিতর বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় ধীর, শান্ত, নম্র বালক আর কেহ ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের মেধাশক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। কুলপুরোহিত মান্দারনিবাসী বিশ্বম্ভর ঠাকুর তাঁহার হাতে খড়ি দিয়াছিলেন। একদিনেই তিনি বাংলা বর্ণমালা শিখিয়া ফেলেন।

পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে এক গুরু মহাশয়ের হস্তে তিনি ন্যস্ত হয়েন। ছয় বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তিনি পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করেন। ইং এপ্রেল ১৮৪০খৃ যখন তাঁহার বয়স ৮ বৎসর সেই সময়ে তাঁহার পিতৃদেব যাদবচন্দ্র মেদিনীপুরের হাকিম, সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রকে পাঠশালা ছাড়িয়া মাতৃ-সমভিব্যাহারে মেদিনীপুরে যাইতে হয়। মেদিনীপুরে তিনি জিলা স্কুলে ভর্ত্তি হয়েন। সেখানে বালক বঙ্কিমচন্দ্র নিজ মেধাশক্তি গুণে বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিলেন। সকলেই শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন—একাদশ বর্ষের বালক বঙ্কিমচন্দ্র অতীত ইতিহাস ও আধুনিক ইতিহাস একেবারে কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং রোলিয়াস সাহেবের পুরাতন ইতিহাস ও হিউম সাহেবের ইংলণ্ডের ইতিহাস—অতি যত্ন সহকারে আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছিলেন। ১৮৫০ সালে পুনরায় তাঁহাকে মেদিনীপুর স্কুল হইতে হুগলী কলেজে আসিতে হয়। এইখানে তাঁহার মেধাশক্তি আশ্চর্য্যরূপে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল—তিনি প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রত্যেক বিষয়ে প্রথম হইতেন। তখনকার দিনে প্রবেশিকা বা এফ-এ, পরীক্ষা ছিল না, তাহার স্থানে জুনিয়ার ও সিনিয়ার স্কলারশিপ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই দুই পরীক্ষায় অতি উচ্চ প্রশংসার সহিত পাশ হইলেন, বিশেষতঃ গণিত ও পদার্থবিদ্যায় কেহই তাহার সমকক্ষ ছিল না। তিনি এই পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার জীবনের এই সময়কে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবজনক ও সুখী বিবেচনা করিতেন। নিম্নলিখিত উদাহরণটী পাঠকের বড়ই মিষ্ট লাগিবে। স্কুল ছাড়িয়া যখন তিনি কলেজে পড়েন, ইহা সেই সময়ের ঘটনা। কলেজে তিনি বড় একটা ক্লাসে বসিতেন না—মাষ্টার যখন ক্লাসে পড়াইতেছেন বঙ্কিমচন্দ্র তখন লাইব্রেরী-গৃহে নিজের মনোনীত পুস্তক পড়িতে ব্যস্ত। কাব্য, ইতিহাস, উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্র ডুবিয়া থাকিতেন। কেন বলিতে পারি না—যে লোক শেষ বয়সে কখনও কবিতা লেখেন নাই—লেখেন নাই বা কেন—ইচ্ছা থাকিলেও এক চরণ কবিতা মাথা হইতে বাহির হইত না—সেই লোক তখন কবিতার নামে অজ্ঞান। কোন কবিতাপূর্ণ পুস্তক সামনে পাইলেই বাস—আর কিছুই চাই না। পৃথিবী রসাতলেই যা'ক বা স্বর্গেই যা'ক—তাহে বঙ্কিমচন্দ্রের কিছুই আসিয়া যায় না। বাইরণ, কিট্‌স, শেলি, কোলরিজ্‌—ইহাদের লেখার বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ ভক্ত ছিলেন। বিশেষতঃ বাইরণের ছোট ছোট কবিতা তিনি মুখস্থ বলিতে পারিতেন। কলেজেও যাহা করিতেন—বাটীতেও তাহাই করিতেন। এমন কি পরীক্ষার সময়েও তিনি পাঠ্য পুস্তক অতি অল্প সময় পড়িতেন—যে সকল পুস্তক ক্লাসে একেবারে পড়ান হয় নাই, বঙ্কিমচন্দ্রের মন তন্ময় হইয়া সেই সকল পুস্তকের উপর ন্যস্ত। এবং এই অভ্যাস তাঁহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ছিল এবং তিনি ইহাতে পরিপক্ক বয়সে অনেক উপকার পাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু বিজাতীয় ভাষা শিখিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন নাই, সংস্কৃত ভাষাতেও বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। কলেজে পড়িবার সময়ে এক সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে ভর্ত্তি হয়েন এবং প্রত্যহ বৈকালে দুই তিন ঘণ্টা করিয়া যত্নসহকারে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। (ক্রমশ)

শ্রীদিনেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র

চরিত্রাঙ্কণী-প্রতিভা

ভারতচন্দ্র ও মুকুন্দরামের মধ্যে মনুষ্য-চরিত্র-চিত্রণ বিষয়ে প্রভেদ এই যে, ভারতচন্দ্র মনুষ্য-চরিত্র সম্পূর্ণরূপে দেখাইবার বিশেষ কোনও প্রয়াস করেন নাই, মুকুন্দরাম যে মনুষ্যচরিত্রগুলি আঁকিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ। কিন্তু ভারতচন্দ্রও সংক্ষেপে অনেক সাংসারিক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা বলিয়াছি। আমরা হরিহোড়ের উপাখ্যান হইতে এইরূপ সাংসারিক জ্ঞানের কিছু পরিচয় লইব। সংসার-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সেক্সপীয়র কালিদাসের যেমন "aphorism" (সূত্র) আছে, ভারতচন্দ্রেরও সেইরকম aphorism (সূত্র) আছে, তাহা কতকগুলি উঠাইয়া দিতেছি, এগুলি বাঙ্গলায় এখন প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। যথা—

"যুবতীর পাপপুণ্য ঘর থাকে মজে।"

যথার্থই সংসারের স্থিতি গৃহিণীর উপর নির্ভর করে। আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকান্তের উইলের সমস্ত দুর্ঘটনা সুগৃহিণীত্বের অভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কবি যথার্থই বলিয়াছেন যে অন্নপূর্ণার কৃপা বিনা কেহ অন্ন পায় না, যে গৃহিণী ভক্তিভরে সেই বিশ্বশক্তির পূজা না করে সে সত্যই গৃহিণীপণা জানে না। অন্নদার কৃপা হইলে "মাটিমুঠা ধর যদি সোণামুঠা হবে।"

"সেখানে দেবীর দয়া প্রিয়ীতি যেখানে।
যেখানে কন্দল দেবী না রহেন সেখানে॥"

ইহাও একটা অমূল্য উক্তি।

এইরূপ সাংসারিক জ্ঞানের পরিচয় ভারতচন্দ্রে আমরা সর্ব্বত্রই পাইয়া থাকি। বিদ্যাসুন্দর কাব্যেও এই সাংসারিক জ্ঞানের পরিচয় যথেষ্ট মিলিবে। সেখানেও এক একটী এমন কথা আছে যাহা আজকাল সকলের মুখে প্রবাদের ন্যায় বিরাজিত হইয়াছে।

"বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ॥"

* * *

"সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।"

* * *

"রসমূলরস যে করে নরের উপাসনা
সৈন্য বিনা কোনও কর্ম্ম না হয় ঘটনা।"

* * *

"সবার কর্ম্ম তারে সাজে,
অন্য লোকে লাঠি বাজে।"

* *

"ভবিষ্যৎ ভাবিয়া যে বর্ত্তমানে হরে

* *

"লোকে বলে পাপ কাজ ক'দিন লুকায়

* * *

"লোভের নিকটে ফাঁদ যদি পাতা যায়।
পশুপক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায়।
দেব উপদেব পড়ে তন্ত্র মন্ত্র ফাঁদে।
নিরাকার ব্রহ্ম দেহ ফাঁদে পড়ি কাঁদে॥"

* * *

"ইথে মৃত্যু বরঞ্চ বিষয় জানা চাই।"
বিনা যুদ্ধে ভঙ্গ দেওয়া কাপুরুষতাই॥

* *

"কলঙ্ক করিতে দূর কলঙ্ক করিব।
সহসা করিতে কর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রে মানা।
যে হয় করিব পিছে আগে যাউক জানা॥"

"নষ্ট নই নষ্ট সঙ্গে হয়েছে মিলন।
রাবণের দোষে যেন সিন্ধুর বন্ধন॥"

এমনি ভারতচন্দ্রের কাব্যের অন্যান্য অংশেও বহুল সাংসারিক তথ্যের সমাবেশ আছে। এই সাংসারিক জ্ঞানের অস্তিত্ববশতঃ তৎ-সৃষ্ট চরিত্রগুলি নিতান্ত অলীকরঙ্গরঞ্জিত হয় না। ভারতচন্দ্রের চরিত্রে তৎকালীন লোকের প্রতিমূর্ত্তি সহজেই দেখা যায়। ভবানন্দ মজুমদারের চরিত্রটী লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, সেই চরিত্রে ভারতচন্দ্র সে সময়কার বাঙ্গালী সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের একটা নিখুঁত ছবি তুলিয়াছেন। ভবানন্দের চরিত্রে যে বিষম দুরপনেয় কলঙ্ক ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছে, কবি লুকাইবার চেষ্টা করিলেও তাহা ঢাকা পড়ে নাই সত্য, কিন্তু সে দোষক্ষালনের প্রয়াস করিয়াছেন বলিতে

ভারতচন্দ্রকে বিশেষ নিন্দাভাজন হইতে হইবে না, কারণ তিনি যে রাজার আশ্রয়ে শান্তি, সম্মান ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, ভবানন্দ সেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্ব-পুরুষ,-ও সেই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, অতএব ভারতচন্দ্রের পক্ষে তাঁহার নিন্দা করা অসম্ভব। ভবানন্দের চরিত্রে ভারত-চন্দ্র একটু উচ্চতা-প্রদানের চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ভবানন্দ দেশের সর্ব্বনাশ করিয়া নিজের ভাল করিয়াছিল, কবি সে কথা লুকাইয়া তাহাকে একজন ভক্তবীর বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, এবং তাঁহার খাতিরে অনেক অদ্ভুত কথার অবতারণা করিয়াছেন। সত্য হউক বা না হউক এই উপলক্ষ্যে কিন্তু ভারতচন্দ্র নিজের কৃতিত্ব দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা আমরা আমাদিগের তৃতীয় প্রবন্ধে বলিয়াছি। চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন :—

বিপদি ধৈর্য্যমথাভ্যুদয়ে ক্ষমা,
সদসি বাক্‌পটুতা যুধি বিক্রমঃ।
যশসি চাভিরুচির্ব্যসনং শ্রুতৌ
প্রকৃতিসিদ্ধমিদং হি মহাত্মনাম্॥

পণ্ডিত কবি ভারতচন্দ্র বোধ হয় এই শ্লোক দেখিয়া তাঁহার ভবানন্দচরিত্র গড়িয়াছিলেন, তাহার উপর কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন্ত চরিত্র হইতেও কতক উপকরণ যে সংগ্রহ না করিয়াছিলেন, তাহা নহে। সে যাহা হউক, এই প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র দুই একটী ভাল কথা বলিবার অবকাশ পাইয়াছেন ও বলিয়াছেন।

"অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে।
"পুষ্পসঙ্গে কীট যেন উঠে সুর মাথে॥"

ভারতচন্দ্রের চরিত্রগুলি প্রায় আভাসেই চিত্রিত হয়, কিন্তু এই ভবানন্দের চরিত্র-বিষয়ে সে নিয়মের একটু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে; ভবানন্দের চরিত্র কবি একটু বিস্তৃত ভাবেই চিত্রিত করিয়াছেন। ভবানন্দের চরিত্রে কবি শুধু জ্ঞান, সৎসাহস ও ভক্তিরই সমাবেশ করেন নাই, রসিকতারও আরোপ করিয়াছেন। ফলতঃ ভারতচন্দ্রের পরিহাস-রসিকতা তাঁহার কাব্যের সর্ব্বত্রই দেদীপ্যমান। ভবানন্দের চরিত্রেও সেই সরস রসিকতা প্রকাশ পাইয়াছে।

বিদ্যাসুন্দর কাব্য কোনও গভীর উদ্দেশ্যে প্রণীত হয় নাই, ইহাই আমার বিশ্বাস; কিন্তু ইহাও সত্য যে কবি এই কাজে হাস্যরসের অবতারণার অনেক সুবিধা পাইয়াছেন, ও সে বিষয়ে একটু কৃতিত্বও দেখাইয়াছেন। ফলতঃ ইহা বেশ অনুভব করা যায়, কবি সে সময়কার সকলকারই উপর বেশ হাসিয়া হাসিয়া কষাঘাত করিয়াছেন। সে কষাঘাতের হস্ত হইতে রাজা-রাণী, ছোট-বড় কাহার কবি নিজেও বোধ হয় বাদ পড়েন নাই। বিদ্যাসুন্দর কাব্যকে কবি নিজে আদিরস-সংক্রান্ত কাব্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে এ কাব্যে আদিরসের বিন্দুমাত্রও নাই; ইহাতে হাস্যরস ভিন্ন অন্য কোনও রসই নাই, আছে কেবল উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়পরতা। ইন্দ্রিয়পরতার অসংযত ইন্দ্রিয়-বিকৃতিতে রস পাওয়া যায় না, ইহাতে কেবল মনে ঘৃণার ভাব উপস্থিত হয়। হইতে পারে যে, সে সময়কার লোকে এইরূপ কুৎসিত

আমোদ ভাল বাসিত, তাই কবি বিদ্যা-সুন্দরের সৃষ্টি করিয়াও নিস্তার পাইলেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যদি ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দরেই অশ্লীল ভাব প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে তত নিন্দা করিতাম না, কিন্তু তিনি কেন যে সবিশেষ নিন্দার যোগ্য তাহাও পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

যদি একটা সম্পূর্ণ চরিত্র চিত্রিত করিবার জন্য কোথাও অশ্লীলতার অবতারণা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে তাহা হইলে সে অশ্লীলতা ততটা দোষের নহে, এমন অশ্লীলতা সেক্সপীয়রে আছে, কালিদাসে আছে, মুকুন্দরামেও আছে। যথার্থতঃ তাহা হয় তো স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস—মনুষ্যের চরিত্রের অবশ্যম্ভাবী অভিব্যক্তি, সে স্থলে তাহাকে অশ্লীল বলিয়া বাদ দিলে হয় তো সেই চরিত্রের অঙ্গহানি করা হয়, তাই তাহা অশ্লীল হইলেও ততটা দোষের হয় না। ভারতচন্দ্রের বসুন্ধরচরিত্র অসংযত চরিত্র, কিন্তু তাহা এত স্বাভাবিক যে তাহাকে আমরা অশ্লীল বলি না; যৌবনমদমত্ত যুবক-যুবতীর পক্ষে বসুন্ধর-বসুন্ধরার মত ব্যবহার স্বাভাবিক। সেইরূপ তাঁহার নল-কুবরের চরিত্রও স্বাভাবিক—এত স্বাভাবিক যে তাহা যেন আমাদের নিত্য প্রত্যক্ষীকৃত। মানুষের—অন্ততঃ অধিকাংশ মনুষ্যের এমনই সময় এমনি মনের ভাব আসে—

"এমন শুনিয়া হাসিয়া চুলিয়া
ঘূর্ণিত রক্ত লোচনে।
মাথা হেলাইয়া অঙ্গ দোলাইয়া
জড়িত যুক্ত বচনে"

অতি মত্ত মদে না গণে আপদে
কহে কুবেরের বেটা।
এ নব বয়সে ছাড়িয়া এ রসে
কার পূজা করে কেটা॥
এ সুখ যামিনী এ নব কামিনী
এ আমি নব যুবক।
এ রস ছাড়িয়া পূজায় বসিয়া
ধ্যানে রব যেন বক॥"

তাই এই নলকুবরের চরিত্রকে কেহ অশ্লীল বলেন নাই—বস্তুতঃ ইহা অশ্লীল নহে। নলকুবর এখনকার বাবুদের পূর্ব্বপুরুষ, বাবুদের কাছে ধর্ম্মের কথা পাড়িলে তাহারই মত উত্তর পাওয়া যায়। অনেকের মুখে পিতৃধনগর্ব্বিত "রমানাথের ষাঁড়ের" বিবরণ শুনা গিয়াছে, সেই বিবরণ শুনিলে আমাদের মনে নলকুবরের কথা আপনা আপনি আসিয়া পড়ে।

কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের নায়ক ও নায়িকা অন্য ধাঁচের। কবি এই দুইটী চরিত্রে মানুষের একটা অতি কদর্য্য বৃত্তিকে এতটা প্রশ্রয় দিয়াছেন যে ইহাতে রস একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহাদের জাগরণে নিদ্রায়, শয়নে স্বপনে, নিকৃষ্ট দৈহিক আলিঙ্গন ভিন্ন অন্য কোনও চিন্তা নাই, এই দৈহিক মিলন কেবল চপলতাময়, প্রেমের সঙ্গে ইহার কোনও সম্পর্ক নাই। সমগ্র কাব্যখানি কেবল তুচ্ছ ইন্দ্রিয়-লোলুপতার বিকৃত নিদর্শনমাত্র। কবির সুন্দর একটা পশুরও অধম—ইন্দ্রিয়মদে একেবারে জ্ঞানহীন। কবির নায়িকারও প্রায় তদবস্থা; কুৎসিৎ ইন্দ্রিয়তাড়নে তাহারা উভয়েই হিতাহিত বিচারশূন্য, অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল

বাসনাময়। শুধু চরিত্র সম্পূর্ণ করিবার অনুরোধে কবি এই ইন্দ্রিয়পরতার চিত্র আঁকেন নাই, ইন্দ্রিয়পরতাই তাঁহার প্রধান উপকরণ, এই বিদ্যাসুন্দর কাব্য অশ্লীল —একটীও কুৎসিৎ বা অশ্রাব্য শব্দ না থাকিলেও ইহা অশ্লীল। হইতে পারে ইহা তাঁহার সময়ের দোষ; কতকপরিমাণে যে তাহা সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এমনও হওয়া সম্ভব যে বিদ্যা ও সুন্দরের চরিত্রের জীবন্ত উপকরণ কবি দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া যে বিদ্যাসুন্দর অশ্লীল নহে তাহা বলিবার উপায় নাই।

মুকুন্দরামেও দৈহিক মিলনের চিত্র আছে, কিন্তু তাহা যে বিদ্যাসুন্দরের দৈহিক মিলনের চিত্রের সমজাতীয় নহে, ইহা বুঝাইবার আবশ্যক করে না। ধনপতির খুল্লনা-সম্ভোগ যেখানে যে ভাবে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক, ভারতবর্ষীয় কবিরা স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক সম্ভোগ বর্ণনা করা কখনই একান্ত বর্জনীয় বলিয়া মনে করিতেন না; তাই মুকুন্দরাম তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাও বেশ বুঝিতে পারি যে মুকুন্দরাম এই ব্যাপার লইয়া বাড়াবাড়ি করেন নাই, এবং তাহাকে অনেক পরিমাণে প্রেম সংশোধিত করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার লেখনী এ বর্ণনার কালেও অসংযত হয় নাই, এবং কবির চিত্ত তৎসৃষ্ট চরিত্রের সম্পূর্ণতার প্রতি লক্ষ্যহীন হইয়া এই বৃত্তিকে প্রশ্রয় দান করে নাই।

বিদ্যাসুন্দর কাব্যের প্রধান দোষ স্ত্রী-চরিত্রের দুর্গতি করা। এ কাব্যে এমন একটীও স্ত্রী-চরিত্র অঙ্কিত হয় নাই যাহা জঘন্য নহে। এ কাব্যের স্ত্রীলোক মাত্রেই যেন দুষ্প্রবৃত্তিময়ী, ইন্দ্রিয়চপলা। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে স্ত্রীচরিত্রের কতক অবনতি হইলেও, ভারতচন্দ্রের সময়েও বাঙ্গালী ললনা বিদ্যাসুন্দরের নাগরিকাগণের মত চরিত্রহীনা হইয়া পড়েন নাই, তাহার প্রমাণ ভারতচন্দ্রের অন্যান্য কাব্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে। সুন্দর পুরুষ দেখিলেই কুলস্ত্রীরা লোলুপদৃষ্টিতে তাহার পানে চায়, এ কথা সত্য নহে, তাই এই ভাবে স্ত্রী-চরিত্রের অবনতি সাধনে কাব্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। সত্য বটে, এখানেও ভারতচন্দ্র বিষয় অল্প কবির কাছে পাইয়াছিলেন, এবং তাহাই মাজিয়া ঘষিয়া তাঁহার নিজস্ব যে ছন্দোভঙ্গী তাহাতে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি নির্দ্দোষ; কারণ কবির কার্য্য নির্ব্বাচন; পরের কাছ হইতে যাহা পাইলাম, সবই যে লইতে হইবে এমন কোনও লেখাপড়া নাই, অতএব ভারতচন্দ্র অনায়াসে রামপ্রসাদের এই কুৎসিৎ অংশটুকু বাদ দিতে পারিতেন। তাহা যখন তিনি করেন নাই তখন নিরপেক্ষ সমালোচকের কাছে তাঁহাকে অপদস্থ হইতেই হইবে। রাজা-রাজড়ার মেয়ে বিদ্যার পক্ষে যে কামোন্মত্ততা, অধৈর্য্য ও লজ্জাহীনতা শোভা পায়, নষ্টচরিত্রা হীরার পক্ষে যে বেহায়াপণা সঙ্গত, কুলকামিনীগণের পক্ষে তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত। যে কবি সেই চিত্র দেখাইতে কুণ্ঠিত হন নাই, তিনি যত মিষ্ট কথার সাহায্যেই তাহা প্রকাশ

করুন, মিথ্যা কথা লেখার অপরাধে তিনি দোষী এবং তাঁহার কাব্য শুধু এই কারণেই অশ্লীল। ইহাতে যে কেবল সময়েরই দোষ দেখা যায় তাহা নহে। কবির রুচি ও শিক্ষারও দোষ লক্ষ্য করিতে পারা যায়। যে বিকৃত রুচিবশতঃ ভারতচন্দ্র মহাদেবের চরিত্র ভ্রষ্ট করিয়া দেখাইতে কুণ্ঠিত হন নাই, সেই বিকৃত রুচিবশতঃই তিনি কুলকামিনীগণের চরিত্রও বিকৃত করিয়া জনসমাজে স্ত্রীজাতির মানহানি করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যাহা সুন্দর, তাহাকে সুন্দর বলিলে কোনও ক্ষতি নাই, যাহার নয়ন আছে সে সৌন্দর্য্য দেখিবে ও তাহার প্রশংসা করিবে। কালিদাস হিমালয়পুরীর কুললননাগণের মুখে মহাদেবের রূপের অগাধ প্রশংসা করাইয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া মহাদেবকে দেখিয়া তাহারা অধীর হইয়া পড়িয়াছিল এ কথা বলেন নাই ; তিনি বলান নাই

"হলদি জিনিয়া তনু চিকণিয়া
স্নেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে মাখি।"

সমগ্র বিদ্যাসুন্দরেই যেন স্ত্রীচরিত্রগুলি দুর্দশাগ্রস্ত বলিয়া মনে হয়। কুলকামিনীরা তো সুন্দরকে দেখিয়া পাগল। বিদ্যার সখীগুলা নিতান্ত স্বার্থপর, তাহারা প্রিয়ম্বদা বা অনসূয়া অথবা বৈষ্ণবকবির সখীর মত নহে। বিদ্যার যাহাই হোক, তাহারা নিজেদের বাঁচাইবার জন্যই ব্যস্ত। বিদ্যা নিজে বেহদ বেহায়া, আর সঙ্গে তাহার কথাবার্ত্তা যেন ধিক্কারজনক, শুধু তাহাই নহে, সে এত কামবশীভূতা ও অসংযতচরিত্রা যে চীরার মত স্ত্রীলোকের কাছেও তাহাকে উপদেশ পাইতে হয়। বিদ্যার মা যিনি রাজরাণী—তাঁহার কথাবার্ত্তা পাড়ার সর্ব্বপ্রধান কুটুনীর মত, একেবারে বিবেচনাশূন্য ও গাম্ভীর্য্যহীন। বিদ্যার সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তাও যেন ছোটলোকের মেয়ের মত, রাজার সঙ্গে কথাবার্ত্তাও তেমনি জঘন্য। হীরা মালিনী তো নামজাদা, বঙ্গে মুসলমানপ্রভাবে সমানীতা (সবে-আমদানী) কুৎসিৎব্যবসায়শালিনী স্ত্রীলোক। তাহার মত যে "কড়িতে সবই মিলে।" এমন স্ত্রীলোক স্বার্থপর ও নীচচেতা ত হইবেই। কিন্তু এই জাতীয় স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের ব্যবসায়ের খাতিরেই অনেক সাবধানে কাজ করিতে হয়, তাই মালিনী সমস্ত কাব্যের স্ত্রীচরিত্রগুলির মধ্যে একটু বুদ্ধিমতী। হীরার সপক্ষে এইটুকু বলা যায় যে সেও বিদ্যা ও সুন্দরের গুপ্ত মিলনের পক্ষপাতী ছিল না। অপরাপর স্ত্রীগণের চরিত্র "নারীগণের পতিনিন্দায়" প্রকাশ। স্ত্রীচরিত্রের প্রতি ভারতচন্দ্রের কোনও আস্থা ছিল বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু বিদ্যাসুন্দরে যেন তিনি কোমর বাঁধিয়া স্ত্রীচরিত্রের অপমান করিতে বসিয়াছিলেন। ইহা কি কেবলই সময়ের দোষ ? আমাদের পিতামহীরা কি যথার্থই এমনি চরিত্রহীনা ছিলেন ? তাহা যদি না হয় তাহা হইলে আমি শতবার বলিব যে বিদ্যাসুন্দর কাব্য অশ্লীল, অতিশয় অশ্লীল।

পুরুষচরিত্রগুলিও স্ত্রীচরিত্রের অনুরূপ। তাহাদের ঘটে যে বিন্দুবিসর্গ বুদ্ধি আছে বলিয়া বোধ হয় না। নম্বর ১ বেকুব—

সুন্দর, সে দৈবানুগৃহীত, পণ্ডিত ও সুপুরুষ, যাহাকে আনিবার জন্ত বীরসিংহ লোক পাঠাইয়াছিল, তাহার চুরি করিয়া সুড়ঙ্গ কাটিয়া বিদ্যা লাভ করিবার কি প্রয়োজন ছিল? যাহা সোজা পথে হইত তাহারই জন্ত বাঁকা পথ ধরিয়া কোটালের কাছে লাঞ্ছনা ভোগ করিবার কি প্রয়োজন ছিল? শুধু বেকুব নয়, পশু অপেক্ষাও বেশী কামপরতন্ত্র; তাহার উপর বেহায়ার হদ্দ। এই মহাপুরুষকে কবি "কালিকার কিঙ্কর" বলিয়া প্রচার করিতে লজ্জিত হন নাই। কালিকার সম্বন্ধে যখন এমন মত তখনকার লোকের মনে আসিয়াছিল, তখন যে তাহার কিছুদিন পরে রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব সহজ ও স্বাভাবিক হইয়াছিল তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

দ্বিতীয় মূর্খ—দেশের রাজা, বীরসিংহ। বংশের কলঙ্ক লোকে প্রাণপণে ঢাকিতে চেষ্টা করে, এই মূর্খ তাহাই সহরময় ঢাক বাজাইয়া রাষ্ট্র করিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল এবং অচিরে ও অনায়াসে তাহা করিল। মূর্খত্বের ইহা অপেক্ষা অধিক প্রমাণ আর কি পাওয়া যাইবে? যেমন রাজা তার উপযুক্ত কোটাল ধূমকেতু। অত্যাচারে সে বিশেষ মজবুত, আজকাল-কার পুলিস কর্ম্মচারীদিগের মতই মজবুত। ভাগ্যে তাহার একটা বুদ্ধিমান ভাই ছিল তাই সে এ যাত্রা উদ্ধার পাইল। তারপর একশত জন মিলিয়া একজনকে ধরিয়া লক্ষঝম্ফই বা কত? মূর্খ রাজার মূর্খ অনুচরেরা রাজকন্যার কলঙ্ক কাহিনী ঘোষণা করিবার জন্ত জগঝম্ফ বাজাইয়া বর্দ্ধমান সহর তোলপাড় করিয়া দিল।

তারপর মূর্খ রাজা আর কতকগুলি মূর্খ লইয়া প্রকাশ্য সভায় কন্যার কলঙ্ক প্রচারে সাতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। শুধু তাহাই নহে, শত শত পারিষদ বেষ্টিত হইয়া বেহদ্দ বওয়াটে সুন্দরের মুখে আপনার কন্যার রূপের উপর টীকা-টীপ্পনি এবং তাহার কামকলার বিজয়গাথা শুনিতে লাগিলেন। এ সকল মূর্খ যে ক্ষুদ্র শুক পক্ষীরও নিন্দার যোগ্য ও তাহার কাছেও উপদেশ প্রাপ্তির যোগ্য, তাহা কে অস্বীকার করিবেন। ভারতচন্দ্র এইখানে যদি রামপ্রসাদের অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত। রামপ্রসাদের বিদ্যা-সুন্দর ভাষায় ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের মত সুন্দর নহে বটে, কিন্তু ভাবে অনেক ভাল, অশ্লীল যথেষ্ট হইলেও রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর চরিত্রসৃষ্টি বিষয়ে ভারতচন্দ্র-রচিত কাব্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর শুধু মাধুর্য্যগুণে রামপ্রসাদের কাব্যকে কাণা করিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে রামপ্রসাদের চরিত্রগুলি প্রাণহীন নহে, এমন কি তাঁহার হীরা মালিনীও হৃদয়হীনা নহে। রামপ্রসাদের কাব্যে কৌশলও যথেষ্ট আছে, কোটাল কর্ত্তৃক চোর ধরা ব্যাপার তাঁহার কাব্যে অনেক পরিমাণে স্বাভাবিক ও কৌতূহলোদ্দীপক। ভারতচন্দ্রের বিদ্যা-সুন্দরে এক ছন্দ ভিন্ন সবই যেন সৃষ্টি-ছাড়া ও বেয়াড়া। তাই আমি বলিয়াছি যে ভারতচন্দ্রের কাব্য-সমষ্টি হইতে বিদ্যা-সুন্দর তুলিয়া দিলেও বিশেষ কোন ক্ষতি তো নাই-ই, বরং তাহাতে ভারতচন্দ্রের গৌরবই বৃদ্ধি পায়। (ক্রমশ)

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

ফিডো

সক্রেটিস্ নিজ আসনে সোজা হইয়া বসিয়া তাহার পদদ্বয় বক্র করিয়া হস্ত দিয়া ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ঐরূপ করিতে করিতে বলিলেন :—

"হে বন্ধুগণ মানুষেরা যাহাকে সুখ বলে সে এক আশ্চর্য্য পদার্থ এবং ইহার সঙ্গে দুঃখের সম্বন্ধটী কি চমৎকার! ইহারা কখনও একত্রে কোন মানুষের কাছে আসে না; অথচ যদি কেহ একটীকে ধরিয়া ফেলে তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর একটীকেও ধরিতে হইবে—ঠিক যেন দুটী যুক্ত হইয়া আছে।

তিনি আরও বলিতে লাগিলেন, "আমার বোধ হয় যদি ইসপের মনে এই ভাবটীর উদয় হইত, তাহা হইলে ইহা হইতে নিশ্চয় তিনি একটী গল্প রচনা করিতেন। বোধ হয় তিনি বলিতেন যে ঈশ্বর এই দুটী শত্রুকে যখন মিলাইবার চেষ্টা করিয়া দেখিলেন যে মিলাইতে পারিলেন না, তখন তিনি ইহাদের মস্তক দুটী বাঁধিয়া দিলেন। এই জন্য যখন একটী মাথা মানুষের কাছে আসে, তখন আর একটীও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিবেই আসিবে। আমার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছে। দেখ এই শৃঙ্খল পরিয়া আমার যতই কষ্ট হইয়াছিল, এখন দেখ তাহার অব্যবহিত পরে কত আহ্লাদ হইল।"

এই সময়ে সিবেস বলিলেন, "আমার একটী কথা মনে পড়িল। অনেকে আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে তুমি কি কবিতা রচনা করিয়াছ এবং সে দিন ইউেনাস আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন যে তোমার এখানে আসিবার পর কবিতা লিখিবার তাৎপর্য্য কি? তুমি ত ইহার আগে কখনও কবিতা লেখ নাই। ইউেনাসকে ইহার উত্তরে কি বলিব?"

সক্রেটিস বলিলেন "সিবেস, তুমি তাঁহাকে সত্য কথা বলিও। আমি কবিতা লিখিয়াছি, কিন্তু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইব বলিয়া লিখি নাই, যে হেতু তাঁহার সমকক্ষ হওয়া সহজ নয়। আমার কতকগুলি স্বপ্ন হইয়াছিল। তাহাতে কে আমাকে বলিয়া দিয়াছিল "হে সক্রেটিস্, তুমি কল্পনাদেবীর অর্চ্চনা করিও।" আমি এতদিন এই সকল স্বপ্নের অর্থ কি জানিতে চেষ্টা করিতেছি। আমার সমস্ত জীবনে সেই একটী স্বপ্ন কোন না কোন আকারে আসিয়াছে এবং এক কথা প্রতিবার বলিয়াছে, "সক্রেটিস্, তুমি কল্পনাদেবীর সাধনা করিও এবং ইহাই যেন তোমার জীবনের কার্য্য হয়।" তখন আমি মনে করিয়াছিলাম যেমন ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াদিগকে চাবুক মারিতে মারিতে দ্রুতবেগ করিতে হয়, সেইরূপ এই স্বপ্ন বারবার আসিয়া আমাকে দর্শন-শাস্ত্র চর্চ্চা করিতে বলিতেছে। তখন আমি মনে করিতাম যে দর্শন শাস্ত্র কল্পনাদেবীর রাজ্যে অতি উচ্চতম বিভাগ। সুতরাং আমি দর্শন-শাস্ত্রের চর্চ্চাতেই সতত নিযুক্ত থাকিতাম। কিন্তু আমার বিচার শেষ হইবার পর দেবভোগ বশতঃ আমার মৃত্যুর দিবস যখন স্থগিত ছিল, আমি তখন মনে করিলাম

স্বপ্নের অর্থ ইহাও হইতে পারে যে আমি কবিতা লিখিয়া কল্পনাদেবীর পূজা করি। তাহা যদি ঠিক হয় তাহা হইলে স্বপ্নের কথা অমান্য করা উচিত নয়, বরং স্বপ্ন যাহা বলিতেছে তাহাই করা উচিত। এতদিন যদি আমার ত্রুটি হইয়া থাকে তাহা হইলে কবিতা লিখিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য, আর প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করাও নিরাপদ নহে। সেই জন্য আমি প্রথমতঃ সূর্য্যদেবের উপর একটী সঙ্গীত রচনা করি। তারপর মনে করিলাম যে কবি সত্যও লেখেন এবং কল্পনাও রচনা করেন। কিন্তু আমি ত গল্প লিখিতে পারি না, সেই জন্য ইসপ্-রচিত একটী গল্প আমি কবিতাকারে রচনা করিলাম।

"হে সিবেস্, তুমি ইভেনাসকে এই কথা বলিও। তাঁহাকে আমার নমস্কার দিও এবং আরও বলিও যদি তুমি জ্ঞানী হও তাহা হইলে যত শীঘ্র সম্ভব সক্রেটিসের অনুগামী হও। আমাকে বোধ হয় আজই প্রস্থান করিতে হইবে। এথেন্সবাসিগণ এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছেন।"

এই কথা শুনিয়া সিমিয়াস বলিলেন ;—

"সক্রেটিস, তুমি ইভেনাসকে কি কথা বলিতেছ? আমি ইভেনাসকে অনেকবার দেখিয়াছি এবং তাঁহাকে যতদূর জানি নিশ্চয় বলিতে পারি যে তিনি তোমার পরামর্শ গ্রহণ করিবেন না।"

সক্রেটিস বলিলেন,—"কি! ইভেনাস কি একজন দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত নহেন?'

সিমিয়াস বলিলেন—'হাঁ, বোধ করি তিনি একজন দার্শনিক।" সক্রেটিস বলিলেন, "তাহা হইলে ইভেনাস কেন, যে কোন লোক দর্শনশাস্ত্র ভাল করিয়া পাঠ করেন তিনি নিশ্চয়ই আমার অনুবর্ত্তী হইতে ইচ্ছা করিবেন। যাহা হউক বোধ হয় তিনি আত্মহত্যা করিবেন না, কারণ শুনিয়াছি আত্মহত্যা বিধিসঙ্গত নহে।"

(ক্রমশ)

কৃষ্ণবিহারী সেন।

---

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

কৃষ্ণের চন্দ্রকান্তি !

রূপ এবং সৌন্দর্য্য ও যৌবনের নবীনতা সদা স্থায়ী রাখিতে চাহেন ? এই সদাকল্পক লেপন চারিবারমাত্রেই অর্থাৎ দাদ, চুলকানি, খামাচি, ছুলী, মেচেতা, কদাকার চিহ্ন, ব্রণ ইত্যাদি শীঘ্র আরোগ্য করিয়া চর্ম্মের কোমলতা, চাকচিক্য ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে রমণীগণের আদরের সামগ্রী। মূল্য ৸০ আনা, ডাঃ মাঃ ।০ আনা।

আফিম পরিত্যাগের ঔষধ।

যত অধিকদিনের আফিম সেবন কারী হউন না কেন, বিনা কষ্টে আফিমরূপ কালকূট বিষ পরিত্যাগ করিয়া শারীরিক গ্লানিশূন্য হইয়া বেশ স্ফূর্ত্তি, সচ্ছন্দতা এবং সতেজতা ও কান্তিপুষ্টি লাভ করিতে পারেন, অথচ কোন পীড়া হইবার সম্ভাবনা নাই। পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

কে, সি, বিশারদ,
৬৭ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

ভাদ্র] [৫ম সংখ্যা

বঙ্গদর্শন।

(নব পর্য্যায়)

একাদশ বর্ষ।

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা
১। সনাতনী	২৫৩	৭। ফিডো	৩০৭
২। রসায়নী বিদ্যার উন্নতি	২৬৩	৮। বঙ্কিম-চরিত	৩০৮
৩। দময়ন্তী	২৬১	৯। প্রাকৃত ভাষা	৩১০
৪। মানবের জন্মকথা	২৯৫	১০। মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র	৩১৩
৫। এক জোড়া দুল্ (গল্প)	২৯৮	১১। প্রভাতে (কবিতা)	৩১৬
৬। শাক্যমত	৩০৪	১২। সন্ধ্যায় (কবিতা)	৩১৬

এস্ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩১৮।

সাধনতত্ত্ববিচার।

শ্রীবামাচরণ বসু বিরচিত। বৈষ্ণব ধর্ম্মের উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বাদি অতি সরল ও সহজ ভাষায় লিখিত। মূল্য ৸০ বার আনা।

মজুমদার লাইব্রেরী ২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

মজুমদার লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য পুস্তক।

২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সিরাজদ্দৌলা

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয়, বি-এল্ প্রণীত। ভাষার মাধুর্য্যে, বর্ণনার ভঙ্গিমায়, যুক্তির সারবত্তায় এবং স্বাধীন গবেষণায় অক্ষয় বাবু বঙ্গ-সাহিত্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ২৲ দুই টাকা। অক্ষয় বাবুর "মীরকাশিম" ১৷৹

শ্রীশ্রীচৈতন্য-লীলামৃত

৺জগদীশ্বর গুপ্ত, বি-এল্ সম্পাদিত। চৈতন্যদেবের এমন বিশদ ও প্রকৃত জীবন-চরিত ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। শিক্ষিত সমাজ এই গ্রন্থকে চৈতন্যচরিত সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া থাকেন। "নবীন জ্ঞাতব্য ধর্ম্মতত্ত্বে পূর্ণ। ছবি সাত সম্পূর্ণ। মূল্য ৩৲ স্থলে ২৲ জগদীশ্বর বাবুর "মেঘদূত" ।৹ নীলাম্বর ৵১৹

শৈশবসঙ্গী

শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কবিবর রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আজ কাল বালকদিগের বই খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইয়াছে। ... শৈশবসঙ্গীর দ্বারা বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থের অভাব কতকটা দূরও হইবে আশা করি।" মূল্য ৸৹

দিনচর্য্যা

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রণীত। প্রত্যেক হিন্দুজীবনকে সুখের, মহৎ ও সার্থক করিবার জন্য ও আদর্শের পথে পরিচালিত করিবার জন্য অত্যাবশ্যকীয় গ্রন্থ। মূল্য ।৹

আশ্রম-চতুষ্টয়

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রণীত। জীবনের লক্ষ্য কি ও কোন্ আদর্শে তাহাকে গঠিত করা উচিত, এ গ্রন্থে তাহা যথাযথ আলোচিত হইয়াছে। মূল্য ।৹ আট আনা।

পঞ্চপ্রদীপ

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মজুমদার, বি-এ প্রণীত। নূতন ধরণের বই। ধনিকন্যা কাউন্ট টলষ্টয়ের গল্পের অনুকরণে আমাদের দেশের মত করিয়া গল্পগুলি লিখিত। বালক বালিকা ও স্ত্রীলোকদিগের পাঠ্য। পুরস্কারের যোগ্য। সুন্দর বাঁধাই, মূল্য ৸৵৹

সেক্সপিয়র

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় অনূদিত। প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে। ইহাতে "মিরান্দা," "রোমিও-জুলিয়েট," "তিনিস দেশের বণিক" "বাদশা লিয়র" এই কয়েকটি গল্প আছে। ১২ খানি সুন্দর হাফটোন ছবিতে সুশোভিত, সুন্দর বাঁধাই। মূল্য ৸৹

নববিধান সমাজের

তাঁদের বঙ্গানুবাদ পূর্ব্ববিভাগ ২৲ উত্তর বিভাগ ২৲ কোরাণশরিফের বঙ্গানুবাদ ৪৲ তাঁদেরের বঙ্গানুবাদ ১৲ তাপসমালা (৬ খণ্ড) ৩৲ জীবনের ১৲ মহাপুরুষ চরিত ১৲ মোহম্মদের জীবনী ৩৲ ব্রহ্মসঙ্গীত ২৲ আচার্য্য কেশবচন্দ্র (বিস্তৃত জীবন চরিত) ১১৲ শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম ১৷৹ গীতাসংগ্রহ ভাষা ৪৲ বেদান্ত দর্শন ৬৲ বিবিধ ধর্ম্মসঙ্গীত ২৲ ধর্ম্মপ্রদীপ ১৷৹ শাক্যমুনিচরিত ১৷৹ উপাধ্যায়ের বক্তৃতা ১৲ তত্ত্বকুসুমমালা ৵৹ ১৷ রজনী দর্শনেতা ৷৹ এমমহোমেন ও হোমহন ১৲ ধর্ম্মজীবন নীতি ৷৵৹ মহাপুরুষ ও তৎপ্রচারিত সুসমাচার ৸৹

সরল বর্ণজ্ঞান

ডাক্তার ব্রজনাথ সাহা প্রণীত। কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী অনুসারে শিশুদিগের বাঙ্গলা অক্ষর পরিচয়ের সচিত্র পুস্তক। সুন্দর ছবি। মূল্য ৵৹

পুরাতন বঙ্গদর্শন

১২০৯ হইতে ১৩১৬ সাল পর্য্যন্ত, প্রতি বর্ষের মূল্য ডাক মাশুল সমেত দুই টাকা।

মজুমদার লাইব্রেরী—২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

বঙ্গদর্শন

সনাতনী

সম্প্রতি "সনাতনী" নামক একখানি প্রবন্ধ-পুস্তক বাহির হইয়াছে। ইহার রচয়িতা, বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শনের" লেখক, "সাধারণী" ও "নবজীবনের" সম্পাদক, বঙ্গসাহিত্যের সমালোচক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পরিচয় বঙ্গীয় পাঠকের নিকট নূতন করিয়া দিতে হইবে কি? এ যুগের অনেক নবীন পাঠক হয় ত তাঁহাকে চিনিবেন না। সেই প্রাচীন বঙ্গদর্শনের যুগে কোন্ মাহেন্দ্র ক্ষণে বঙ্গসাহিত্যাকাশে সপ্তর্ষিনক্ষত্রের উদয় হইয়াছিল। সেই সপ্তর্ষির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ * ইঁহারা একে একে মাতৃক্রোড় শূন্য করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। এখন কেবল এক অক্ষয়চন্দ্র সেই স্বর্গযুগের স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া কোন ক্রমে বাঁচিয়া আছেন। তিনি তাঁহার "পিতা ও পুত্র" নামক জীবন-চরিতে ("বঙ্গভাষার লেখক" দ্রষ্টব্য) সেই সময়ের বহুতথ্যপূর্ণ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে বঙ্গদর্শনের উপর ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপর তাঁহার কিরূপ প্রভাব ছিল ইহারও অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, সেই অক্ষয়চন্দ্র এখন বৃদ্ধ। এই রবিকরসমুদ্ভাসিত বর্ত্তমান সাহিত্যাকাশে সেই চন্দ্রের আভা অনেকটা ম্লান দেখা যাইতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ম্লান হইলেও তাহা নিভে নাই, সে চন্দ্র যে অক্ষয়। অক্ষয়চন্দ্র কখনও নিভিতে পারেন না। তাহার প্রমাণ এই "সনাতনী"—যেমন গ্রন্থকারের নাম, তেমন গ্রন্থেরও নামকরণ। আধুনিক নবীন বঙ্গীয় পাঠক সেই বৃদ্ধের "সনাতনী" বাণী শুনিবেন কি না জানি না।

শোনা ত একান্ত উচিত। বাঙ্গলা সাহিত্যে যাঁহারা প্রবন্ধ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় ভূদেব, চন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন প্রধান। বঙ্কিমচন্দ্র ত সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইন্দ্রনাথও লিখিয়াছেন অনেক, কিন্তু সে সকল সংগ্রহ করা হয় নাই। জীবিত লেখকদিগের মধ্যে অনেক শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধলেখক আছেন। তাঁহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আসন সকলের উপরে

* এই যুগের ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ৺সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঘোষ, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহামহোপাধ্যায় হর-প্রসাদ শাস্ত্রী, প্রভৃতিও এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র—সম্পাদক।

সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ রচনাই সর্ব্বসাধারণের জন্য নহে। তারবিহীন টেলিগ্রাফের মত তাহা সকলের কানে লাগে না এবং অল্পলোকের কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে। তবে যাঁহাদের মরমে প্রবেশ করে, তাঁহারা সে লেখা পড়িয়া উন্মত্ত। অক্ষয়চন্দ্র সেই প্রাচীন বঙ্গদর্শনের যুগের সহিত আধুনিক কালের সংযোগ রাখিয়াছেন। তাঁহার মত সরল সতেজ সুললিত ভাষায়, সকলের বোধগম্য করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিতে বোধ হয় জীবিত লেখকদিগের মধ্যে আর কেহ পারেন না। লেখার গুণে তাঁহার প্রগাঢ় দার্শনিক প্রবন্ধও কাব্যের ন্যায় মধুর। কিন্তু এই মাধুর্য্য কেবল শ্রবণপথেই মিলাইয়া যায় না, ইহা চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তাহার স্থায়ী সাহায্য প্রদান করে। সর্ব্বোপরি তাঁহার অসাধারণ বিশ্লেষণ-শক্তি। আলোচ্যগ্রন্থে তাঁহার এই সকল গুণের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। ইন্দ্রনাথের ন্যায় তিনিও লিখিয়াছেন অনেক, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার অধিকাংশ রচনাই সংগৃহীত হয় নাই। তাঁহার সাহিত্যজীবনের উপর বিধাতার কি এক অভিসম্পাত আছে, তিনি একদিন আক্ষেপ করিয়া বলিতেছিলেন। আর তাঁহার এক প্রধান দোষ, তাঁহার Shyness (ভীরুতা), তিনি বড় সম্মুখের দিকে ঘেঁসিতে চান না। আজ কাল স্থানে স্থানে এত যে সাহিত্য-সম্মিলনী হইতেছে, কই তাঁহার কোনোটাতেই ত তাঁহাকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে দেখি না? তাহার ঐ এক মুখ্য কারণ। আরও এক কারণ তাঁহার আলস্য, চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার নিজের জীবন-চরিতে ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সব দোষ না থাকিলে, হয় ত "সনাতনী"র ন্যায় আরও কয়েক খণ্ড প্রবন্ধপুস্তক দ্বারা বঙ্গভাষা অলঙ্কৃত হইত। যাহা হউক সনাতনীর এই কবিপ্রতিম আবক্ষবিস্তৃত রজতশ্মশ্রু প্রবীণ লেখক কি বলিতেছেন শুনা যা'ক। চারিদিকে পরিবর্ত্তনের বন্যা ছুটিয়াছে। সেই জনকল্লোলের আঘাতে হিন্দুসমাজের বহুপ্রাচীন জরাজীর্ণ রক্ষাপ্রাচীর ভগ্নপ্রায় দেখিয়া তিনি তাঁহার "সনাতনী" পতাকা হস্তে প্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান। বৃদ্ধ বলিতেছেন—

"তোমরা 'শিক্ষিত' লোকে মনে কর, ধর্ম্মে সমাজে, শিক্ষায় দীক্ষায়—সকল বিষয়েই নিয়ত পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয়। * * * কিন্তু এটি একটি বিষম ভ্রমাত্মিকা ধারণা। যেমন পেষণী-চক্রে, একটি অপরিবর্ত্তনীয় কীলক কেন্দ্রে রাখিয়া পাথর ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ কি সমাজে, কি ধর্ম্মে কেন্দ্র-পদার্থ স্থির থাকে,—সেইটিকে বেষ্টন করিয়া, রক্ষা করিয়া নানা পদার্থ ঘুরিতে থাকে। সেই কেন্দ্র-পদার্থ অপরিবর্ত্তনীয়। তোমরা সমাজ-সংস্কারের মহোৎসাহে সেই কেন্দ্র-পদার্থ শুদ্ধ উড়াইয়া দিও না। তাহা হইলে সমাজের জাঁতা ঘুরিবে না, একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে।"

ধর্ম্ম ও সমাজের এই সকল কেন্দ্রপদার্থ কি, গ্রন্থকার তাহা একে একে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন যদি কেহ কোন বিষয়ের পরিবর্ত্তন করিতে

চাও, তবে তাহার ছালের খোসার পরিবর্ত্তন কর, ভিতরের সারে বা আঁটিতে হাত দিও না। যেগুলি সেই সার কথা, মজ্জার কথা, অপরিবর্ত্তনীয়া তিনি সেইগুলির নাম দিয়াছেন "সনাতনী।" আমি এখানে তাহার দুই একটি কথার আলোচনা করিব, আলোচনা করিয়া পাঠকের মূল গ্রন্থ পাঠের কৌতূহল উদ্রিক্ত করিব। কিন্তু আমার এক ভয় হইতেছে। আজ কাল অগ্রবর্ত্তী সংস্কারকদলের (Go-ahead reformers) কিছু বাড়াবাড়ি দেখা যাইতেছে। তাঁহারা হয় ত এই সকল কথাতে old-fashioned ideas অর্থাৎ বুড়ার দলের কুসংস্কার বলিয়া ছুঁড়ি করিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু এক ভরসা এই, যাঁহারা খোসা হইতে শাস, পিণ্টি হইতে সোণা, কাচ হইতে হীরক চিনিয়া বাহির করিতে পারেন—যাঁহারা শুধু বাহ্যিক চাকচিক্য দেখিয়া না ভুলিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ভিতরের সার পদার্থ খোঁজেন, এরূপ চিন্তাশীল লোকের এ দেশে এখনও অভাব হয় নাই। অক্ষয়চন্দ্রের লেখা তাঁহাদের নিকট সবিশেষ আদর লাভ করিবে সন্দেহ নাই।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ কাল অল্পবিস্তর সকলেই সমাজ-সংস্কারক। অর্থাৎ কেহই সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট নহেন। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সভ্যতার পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতের এরূপ ফল অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু এক দল সংস্কারক পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি ঐকান্তিক অনুরক্তি বশতঃ যতটা পরিবর্ত্তন আবশ্যক মনে করেন, আর এক দল তত বেশী পরিবর্ত্তন আবশ্যক মনে করেন না। আর প্রথম দল এই পরিবর্ত্তনের জন্য যতদূর অধীর ও অসহিষ্ণু, অন্য দল তত নহেন। অন্য দল বলেন "পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে তাহা ক্রমে হইবে, ক্রমে হইতেছে; সময় ইহার নিয়ন্তা, সে জন্য এত অধীর হইলে চলিবে কেন?" অগ্রবর্ত্তী দল কিন্তু তাহা মানিতে চাহেন না, তাঁহারা বলেন "সময় আবার কি করিবে? এ সব ত আমাদেরই হাত। ঐ দেখ না জাপান অল্পদিনের মধ্যে নিজের চেষ্টায় কি করিয়া তুলিয়াছে?" ইহার উত্তরে অন্যপক্ষ বলেন "জাপানের তুলনা ভারতে খাটিবে কেন? জাপানের যে কোন একটা নিজস্ব ছিল না। ভারতের নিজস্ব খোয়াইলে যে হিন্দুজাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ হইবে। সুতরাং যদি পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তবে আঁটি ঠিক রাখিয়া ছালের পরিবর্ত্তন কর।" সরকার মহাশয়ও এই কথা বলেন।

এই যেমন ধর্ম্ম একটা জিনিষ। জাপানে শিল্পবিকাশ, কলকারখানার বিস্তর উন্নতি হইয়াছে, পাশ্চাত্যজাতির আদর্শে সেখানে যাহাকে Materialistic Civilisation বলে তাহার চরম পরিণতি হইয়াছে. কিন্তু এ হেন সুসভ্য দেশের জাতীয় ধর্ম্ম কি তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। ধর্ম্মবিহীন সমাজ কতদূর স্থায়িত্ব লাভ করিবে, সে ভাবনা তাঁহারা ভাবুন। * কিন্তু আমাদের এই

* The Tokio Correspondent of the *Standard* writes:—"Government officials have come to the realisation of their utter powerlessness by the ordinary machinery to guide and control the ideals of the nation without religion of some kind"—Vide *Statesman*, dated, 18th June, 1911.

ভারতবর্ষে ধর্ম্মই সমাজের ভিত্তি। এই ধর্ম্মই এতাবৎ কাল কত উৎপীড়ন, উপদ্রব, বিপ্লবের মধ্য দিয়া হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। জাপানের দেখাদেখি এ হেন ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিলে আমরা বাঁচিব কি?

সমাজ-রক্ষার জন্য যেমন ধর্ম্ম চাই, তেমন খণ্ডধর্ম্মও চাই। ধর্ম্মের যেটা সার্ব্বভৌমিক রূপ, যেমন পরোপকার, তাহা লইয়া কোন মতভেদ নাই। কিন্তু এরূপ সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম সমাজের বন্ধন নহে। "এরূপ ধর্ম্মপ্রবণ মানব সংসারত্যাগী। তাঁহার পক্ষে হিন্দু মুসলমান নাই, স্নেহ নাই, প্রীতি নাই, বাৎসল্য নাই, শ্রদ্ধা নাই, প্রণয় নাই,—কেবল আছে এক উপকার। এরূপ মানব সংসারে অতি বিরল। ইঁহাদের হৃদয় অত্যন্ত সম্প্রসারিত; এরূপ সম্প্রসারিত যে, সে হৃদয়ের গভীরতা একেবারে নাই বলিলেও চলে। • • • যোর স্বার্থানুসন্ধায়ী হইতে যেরূপ সমাজের কোন উপকার নাই, সেইরূপ কঠোর ত্যাগী হইতে সমাজের বা দেশের কোনই উপকার নাই।" তাই গ্রন্থকার বলেন "ধর্ম্ম ও খণ্ডধর্ম্ম মানবসমাজে উভয়েরই সমান প্রয়োজন। হিন্দুয়ানী, খ্রীষ্টানী, মুসলমানী, এই সকল ধর্ম্মকে খণ্ডধর্ম্ম বলে। যেরূপ উপকারসাধনধর্ম্ম না থাকিলে মনুষ্যত্ব থাকে না; সেইরূপ বিভেদমূলক খণ্ডধর্ম্ম না থাকিলে জাতিত্ব থাকে না। এবং জাতিত্বই সমাজের মূল।"

কিন্তু সেই খণ্ডধর্ম্মকে জীবন্ত ভাবে হৃদয়ে ধারণ করিবার উপায় কি? উপায় শাস্ত্রসম্মত ধর্ম্মের আলোচনা বা অনুষ্ঠান। ইহার মধ্যে আর একটি কথা উঠিতেছে—"অনুষ্ঠাতার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কি ধর্ম্মেরও পরিবর্ত্তন হইবে, না ধর্ম্ম অপরিবর্ত্তনীয়?"

ইহার উত্তর ধর্ম্ম কখনও পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। "ধর্ম্মের প্রকৃতি সনাতনী। তুমি সবলই থাক, আর দুর্ব্বলই থাক, তুমি স্বাধীন থাক, আর পরাধীন থাক, ধর্ম্ম তোমার অবস্থার দিকে চাহিবে না। দুই লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে যে আত্মজ্ঞান মনুষ্যের সকল ধর্ম্মের সারভূত ছিল, আজিও তাহাই আছে। তুমি আমি অবস্থার দাস হইয়া সাধনা করিতে পারিব না বলিয়া যে, আত্মজ্ঞান ধর্ম্মের মধ্যে গণ্য হইবে না, কি সাধনা না করা জনিত ফল তোমাতে আমাতে স্পর্শিবে না, তাহা নহে।" • • • "তবে মানবপ্রকৃতির কোন কোন অপ্রতিবিধেয় পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেবল ধর্ম্মসকলের উপকরণ বা উপায় পরিবর্ত্তিত হয় মাত্র। মূল প্রকৃতি কখনও বদলায় না। সেই ধৃতিক্ষমাদি যাহা সত্যযুগের ধর্ম্ম ছিল, সেই ধৃতিক্ষমাদি এখনকারও ধর্ম্ম। যে আত্মজ্ঞান তখনও সর্ব্বদা অন্বেষণীয় ছিল এখনও তাহা আছে, তবে উপকরণের ইতর বিশেষ হইয়াছে মাত্র। এই উপকরণ বা উপায় ভেদে যে উপাসনাপ্রণালীর ভেদ আছে, আমরা শাস্ত্রে তাহা দেখিতে পাই। এই জন্যই শাস্ত্রে পাঁচ প্রকারের উপায় নির্ণয় করিয়াছেন।"

ধৃতিক্ষমাদি যদি সত্যযুগের ন্যায় এখনকারও ধর্ম্ম হয়, তবে যে যে আচার, যে যে আহারাদি-দ্বারা আত্মার এই সকল গুণের পুষ্টি হয়, তাহা সত্যযুগের ন্যায় এখনও

অবলম্বনীয়; আবার যে সকল আচার, যে সকল আহারাদি দ্বারা কামক্রোধাদি বিপরীত গুণের পরিপুষ্টি হইয়া ধৃতিক্ষমাদি গুণ নিচয় আত্মায় বিকসিত হইতে পারে না, সে সকল আচার-আহারাদি এখনও বর্জ্জনীয় সন্দেহ নাই। তাই বেদ স্মৃতি শিষ্টাচার ও আত্মতুষ্টি অর্থাৎ মনু যাহাকে ধর্ম্মের চারিটি লক্ষণ বলিয়াছেন সেই লক্ষণ মানিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে। ধর্ম্ম অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া ধর্ম্মের আচারও অপরিবর্ত্তনীয়। স্বেচ্ছাচারী হইয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—অসম্ভব কথা। মনু যাহাকে "আত্মতুষ্টি" বলিয়াছেন, তাহা স্বেচ্ছাচার নহে, আবার Consciencেও ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ের কষ্টিপাথর নহে। "য়ুরোপীয় Individuality হইতে এই স্বচ্ছন্দাচারের প্রভেদ এই যে, য়ুরোপীয় স্বেচ্ছাচার স্বপ্রধান, সনাতন ধর্ম্মের স্বচ্ছন্দাচার শাস্ত্রাচার ও সদাচারের মুখাপেক্ষা করে।"

এই য়ুরোপীয় individuality বা স্বেচ্ছাচার হইতে সেখানে ভোগের আতিশয্য হইয়াছে। তাই য়ুরোপ ভোগ-ভূমি, আর ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি। "য়ুরোপের ব্যবহারশাস্ত্রের মূলনীতি এই যে অন্যের ভোগেকোনরূপ ব্যাঘাত উৎপাদন না করিয়া তুমি তোমার নিজস্বই হউক, আর সাধারণেরই হউক, যে কোন বিষয় যে কোন ভাবে, উপভোগ করিতে পার।" "পাশ্চাত্য নীতি স্পষ্টাক্ষরে বলে যে, তোমার নিজের কোন ক্ষতি না করিয়া, তোমার প্রতিবেশীদের সুখ-স্বচ্ছন্দতায় কোনরূপ বিঘ্ন বিপত্তি না ঘটাইয়া, তুমি স্বেচ্ছাচারী হইতে পার।" কিন্তু সনাতন ধর্ম্মের শিক্ষা ঠিক ইহার বিপরীত। যম নিয়মের অনুষ্ঠান দ্বারা মানুষের স্বাভাবিক ভোগস্পৃহাকে সংযত করিয়া না আনিলে ধর্ম্ম লাভের সম্ভাবনা নাই। তাই এই কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে মানবের ভোগস্পৃহা নানাপ্রকারের বিধি বিধান দ্বারা সংযত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সনাতন ধর্ম্মের "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা" এই নিবৃত্তিবার্ত্তা ভারতের আর একটি "সনাতনী" বাণী। ইহার অন্য শাখা "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" দ্বারা বৌদ্ধজগৎ শাসিত।

ধর্ম্মের ন্যায় জাতিত্বও হিন্দুসমাজের আর একটি ভিত্তি। এ বিষয়ে গ্রন্থকার বলেন,—"আমরা যত দূর বুঝি তাহাতে এই মাত্র বুঝা যায় যে, জন্মভেদেই জাতির সৃষ্টি; বিবাহের নিয়মেই ইহার স্থিতি, এবং সঙ্কর বীজেই জাতকের জাতি নষ্ট। • • • গুণভেদে জাতিভেদ অসম্ভব কথা। আপনার গুণে সিভিলিয়ান হওয়া যায়, ইলবর্ট-বিলের গুণে সমান অধিকার পাওয়া যায়, কিন্তু কোনও বিধিব্যবস্থায় বাঙ্গালী ইংরেজ হইতে পারে কি? বিশ্বামিত্র, হয় মহা তপস্যা, না হয় মহা লাঙ্গা করিয়া, অথবা দুই করিয়া, ব্রাহ্মণের অধিকার পাইয়াছিলেন। তবু তিনি রাজর্ষি হইয়াছিলেন মাত্র; এত সাধ্যসাধনায়ও ব্রহ্মর্ষি হইতে পারেন নাই। উদার ব্যবস্থা থাকিলে, গুণ থাকিলে, এক জাতি উচ্চতর জাতির অধিকার পায়, দোষী হইলে নীচতর জাতির মত কোন কোন অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। বীজশুদ্ধিতে জাতির উৎপত্তি, কেবল বীজের অশুদ্ধিতেই জাতি নষ্ট হয়। অন্য কোন দোষ

গুণে জাত্যন্তর প্রাপ্তির কথা অসম্ভব। বিশেষ বিশেষ কার্য্য-দোষে ব্রাহ্মণ পতিত হইলে চণ্ডালের সমান হয়, চণ্ডাল হয় না।" যাঁহারা গীতার "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ" এই ভগবদুক্তি পড়িয়া, নিজেরাই ভগবানের স্থান অধিকার করিয়া লোক সকলকে "গুণ ও কর্ম্ম" অনুসারে উচ্চ নীচ জাতিতে বিভক্ত করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদিগকে উদ্ধৃত কথাগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে বলি। গ্রন্থকার বলেন "গুণভেদে জাতিভেদ অসম্ভব কথা।" গীতা বলেন "গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্ট হইয়াছে।" এই দুই বাক্যের কোন বিরোধ নাই। গীতার "গুণ" * অর্থে সত্ত্ব রজ তমো-মূলক জন্মগত সংস্কার, চাকুরির জন্য দরখাস্তে লিখিত qualifications" নহে। আবার "কর্ম্ম" হইতেছে—সেই সংস্কারমূলক স্বাভাবিক কর্ম্মপ্রবৃত্তি, ইহা ঠিক Occupation নহে। গীতা অন্যত্র স্পষ্টই বলিয়াছেন, স্বভাবোৎপন্ন গুণের দ্বারা ব্রাহ্মণাদির কর্ম্ম বিভক্ত হয়। † অর্থাৎ জন্মগত সংস্কার বলে যাহার যেরূপ কর্ম্মপ্রবৃত্তি সে সেইরূপ কর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। এই জন্মগত সংস্কার অপরিবর্ত্তনীয়, শিক্ষাদীক্ষার দ্বারা এই জাতি শক্তির উন্নতি হইতে পারে, কিন্তু ইহার আমূল পরিবর্ত্তন অসম্ভব। তবে একথাও ঠিক, আমাদের এই অধঃপতিত সমাজে কেবল বীজ শুদ্ধিতেই কোন জাতির উন্নতি হইবে না, তজ্জন্য শিক্ষা আবশ্যক। জাতীয় উন্নতির জন্য ব্রাহ্মণজাতির পুনরুত্থান সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলেন "ব্রাহ্মণ! যখন তোমার বিষয়-বাসনা ছিল না, সামান্যে সন্তুষ্ট থাকিতে, ব্রহ্মার ধ্যানে দিন যাপন করিতে, পরার্থ-চিন্তায় আনন্দ বোধ করিতে, তখন তুমি ঊর্দ্ধ হস্তে কেবল আশীর্ব্বাদ করিয়া সমগ্র সমাজের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়াছ,—আর আজি তুমি বৈষয়িক বৈভবের জন্য ব্যস্ত, কাজেই আজি তোমাকে দক্ষিণার জন্য দ্বারে দ্বারে জোড় হস্তে পরিভ্রমণ করিতে হইতেছে। জানি না কত দিনে তোমার চক্ষু উন্মীলিত হইবে।"

এ স্থলে গ্রন্থকারের সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত হইতে পারিলাম না। পাশ্চাত্য-ভোগ-লিপ্সা কোন কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মধ্যে সংক্রমিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। এখন ধনী মধ্যবিত্তগণের অনুকরণে কোন কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের পাকা কোঠা ও সোণার গহনা না হইলেও চলে না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া অধিকাংশ ব্রাহ্মণপণ্ডিত সেরূপ নহেন। তাঁহারা এখন ভিক্ষা করেন, কেবল পেটের দায়ে। যাঁহারা কোন পুরুষে চাকুরি করিতে অভ্যস্ত নহেন, তাঁহারা অন্নকষ্টে প্রপীড়িত হইয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হন। যে সকল শিষ্য ও যজমানগণ ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহাদিগের প্রতিপালন

---

* "গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি, তত্র সাত্ত্বিকস্য সত্ত্বপ্রধানস্য ব্রাহ্মণস্য শমোদমস্তপ ইত্যাদীনি কর্ম্মাণি, সত্ত্বোপসর্জ্জনরজঃপ্রধানস্য ক্ষত্রিয়স্য শৌর্য্য-তেজঃ প্রভৃতীনি কর্ম্মাণি, তম উপসর্জ্জনরজঃপ্রধানস্য বৈশ্যস্য কৃষ্যাদীনি কর্ম্মাণি, রজ-উপসর্জ্জনতমঃ-প্রধানস্য শূদ্রস্য শুশ্রূষৈব কর্ম্ম" ইত্যাদি। গীতা শঙ্করভাষ্য ৪।১৩।

† ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ। কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ। ১৮।৪১।

করিতেন, তাঁহাদের অধিকাংশই সে সকল ক্রিয়াকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছেন। কাজেই সে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এখন নিরন্ন। তাঁহারা পেটের দায়ে কত অপকর্ম্ম করিতেছেন তাহার সীমা নাই। এ জন্য সমাজই দায়ী। এ বিষয়ে সমাজের চক্ষু উন্মীলিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

অনেক শিক্ষিত লোকের ধারণা জাতিভেদ-প্রথা বৈষম্যের মূল, সুতরাং জাতীয় উন্নতির প্রবল অন্তরায়। ষোড়শ পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন, এ জগতে বৈষম্যের মধ্যেও সাম্য আছে, সেই সাম্য হইতে শৃঙ্খলা, শৃঙ্খলা হইতে সৌন্দর্য্য এবং সেই সৌন্দর্য্য হইতে মঙ্গল। সংসারে সামাজিক বৈষম্য ত চিরদিনই আছে এবং চিরদিনই থাকিবে। কেবল ভারতবর্ষ বলিয়া নয়, সকল দেশেই আছে। "সংসারে ধনী ও নির্ধন, চিরদিনই আছে, সকল দেশেই আছে, ইহাতে আবার শৃঙ্খলাই বা কি? সৌন্দর্য্যই বা কি? আর মঙ্গলই বা কি? ধনী ও নির্ধনে অতি সুন্দর শৃঙ্খলা আছে। 'দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়'—ধনী যদি নিজধন আপন বিলাসে ব্যয় না করিয়া, দরিদ্র পোষণে ব্যয় করেন, তবে দেখ দেখি সমাজ কেমন সুশৃঙ্খল হয়, কেমন সুন্দর হয়, কেমন মঙ্গলময় হইয়া উঠে।"

"শিক্ষিত-অশিক্ষিতে পার্থক্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহাতে কি সমাজের শৃঙ্খলা থাকে, না মঙ্গল হয়? ধনের ন্যায় বিদ্যাও কেবল দানে সার্থক হয়, কিন্তু ধন-দানে ও বিদ্যা-দানে পার্থক্য বিস্তর! ধন-দানে হরিশ্চন্দ্রের মত রাজাকেও পথের ভিক্ষুক হইতে হয়, কিন্তু বিদ্যাদানে দাতার আরও মূলধনের বৃদ্ধি হয়। বিদ্যার মূল্য নাই বলিয়া, চোরে চুরি করিতে পারে না বলিয়া, আর দানে বা কিছুতেই বিদ্যার ক্ষয় হয় না বলিয়া, ধন অপেক্ষা বিদ্যা গরীয়সী। এ হেন বিদ্যা স্বয়ং উপার্জ্জন করিয়া, যদি পাঁচ জনকে না দিলে, অথবা মূল্য লইয়া যদি তাহা বিক্রয় করিতে থাকিলে, তাহা হইলে তুমি বিদ্যার সৌন্দর্য্য ফুটিতে দিলে না, তা মঙ্গল হইবে কিরূপে? • • • • জগদীশ্বরের জল, বায়ু, আতপ, যেমন কর না দিয়া, মাশুল না দিয়া অমনই পাওয়া যায়, সেইরূপ সমাজে শিক্ষাও, ঐরূপ সহজে ও সুলভে পাওয়া চাই।"

"বলবান্ দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবে, পোষণ করিবে, যদি পারে ত দুর্ব্বলের চিত্তরঞ্জন করিবে, তবে সমাজের শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য থাকিবে ও মঙ্গল হইবে। • • • • ধনী-নির্ধনে, শিক্ষিত-অশিক্ষিতে, বলবান-দুর্ব্বলে এইরূপ সামঞ্জস্য-সাধন, শৃঙ্খলা-বন্ধন, না থাকিলে, কখনই সমাজে শান্তি, স্বস্তি ও মঙ্গল থাকিতে পারে না।"

প্রাচীন হিন্দুসমাজে জাতিভেদ সত্ত্বেও প্রচুর শান্তি স্বস্তি ও মঙ্গল ছিল। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সমাজে জাতিভেদ না থাকিলেও ঘোর অশান্তি ও বাঁচিবার জন্য সংগ্রাম প্রতিনিয়ত চলিতেছে।

"যদি জীবের জীবন, কেবল বাঁচিবার জন্য সংগ্রাম হয়, (struggle for existence) তবে সমাজও অবশ্য তাহাই হইবে; ধনীতে নির্ধনে,—জ্ঞানে অজ্ঞানে—সমর্থে অসমর্থে কেবল বিরোধ ও সংগ্রাম চলিবে, জীবনে

প্রফুল্লতা অন্তর্হিত হইবে, ধর্ম্মও তিষ্ঠিতে পারিবেন না। এই শান্তিময় হিন্দু সমাজে পাশ্চাত্য সমাজের এই অশান্তিকর ভাব আদর্শরূপে কলম বাঁধিয়া, সেই শান্তির প্রত্যাশা কেহ কখনই করিতে পারে না।"

"যে সকল সমাজ এখনও যৌবনের রাজসিকতার, দম্ভের, দর্পের অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাদের জীবন, সংগ্রাম বটে; কিন্তু সে ত আমাদের আদর্শ অবস্থা নহে, সে অবস্থা আমরা একরূপ ছাড়াইয়া আসিয়াছি। আমাদের অবস্থা স্থিতির অবস্থা। আমরা পরিষ্কার ভাষায় লিখিয়াছি, "সুখ চেয়ে স্বস্তি ভাল।" আমাদের শিক্ষার মূলে সন্তোষ; সুতরাং বৈদেশিকী, রাজসিকী শিক্ষায় আমরা ইহজীবন, সংগ্রামের ব্যাপার করিয়া তুলিব কেন? জগতের উৎকৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ আমাদের শৃঙ্খলান্বিত সমাজের পরিচয় দেয়, জগতের উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ আমাদিগকে সৌন্দর্য্য বুঝাইয়া দেয়, সমস্ত পুরাণশাস্ত্র মঙ্গলময়ের মঙ্গল বার্ত্তায় পূর্ণ। সেই সকল শিক্ষা-দীক্ষায় অনাস্থা করিয়া সংসারকে অশান্তির খনি, অমঙ্গলের আকর মনে করিব কেন?"

কিন্তু আমাদের পাশ্চাত্য গুরু বলিবেন—"ঐ ত যাঃ—তোমাদের অধঃপাতের মূল এইখানে। তোমরা যাহাকে স্বস্তি বল, সন্তোষ বল তাহার অপর নাম জড়তা ও অলসতা। ইহাই তোমাদের সর্ব্বনাশের মূল।" ইহার উত্তরে প্রবন্ধকার বলেন—

"আমরা বলি সন্তোষ সকল সুখের মূল। বিদেশীয়েরা বলেন সন্তোষ সকল দুঃখের আকর। সন্তোষ হইতে আলস্য আসে, আলস্য হইতে অভাবমোচনের শক্তি কমিয়া যায়, অভাবগ্রস্ত হইয়া আমরা নানা দুঃখ পাই। সুতরাং কি রাজনীতিতে কি সমাজনীতিতে অসন্তোষই সকল উন্নতির উপায়। কিন্তু যাঁহারা এইরূপ অসন্তোষের উপদেশ নিয়ত দিয়াছেন, তাঁহারাই এখন একটু ইতস্তত করিতেছেন। এখন রাজনীতি ক্ষেত্রে মহা অসন্তোষ দেখিয়া তাঁহাদের চক্ষু ফুটিয়াছে। বলিতেছেন, 'এরূপ অসন্তোষ ভাল নহে। আমরা রাজনীতির কথা তুলিব না; তবে সমাজে অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়া বা বৃদ্ধি করিয়া যাঁহারা সমাজের মঙ্গল কামনা করেন তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তির বা প্রকরণ পদ্ধতির প্রশংসা করিতেও পারিব না। অসন্তোষ—অধর্ম্ম। অধর্ম্মে কোন সমাজের বা ব্যক্তির বা পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে, এমন কথা বুঝিতে পারি না।

"বালকে আপনার অবস্থা বুঝে না, কাজেই সর্ব্বদা 'ইহা কই, উহা কই, ক্ষীর খাইব, মিঠাই খাইব' বলে। বালকের সেই অসন্তোষে প্রশ্রয় দিয়া তাহাকে অসন্তুষ্ট রাখা করিতে পারিলেই কি সুবুদ্ধিমানের কাজ হয়? না সেই বালককে বুঝাইতে হইবে যে—'বাপু আমরা ক্ষীর মিঠাই কোথা পাইব? যার যেমন সম্পত্তি, তাহার ছেলে পিলেরা সেই মতই খাইতে পায়,—আমাদের যেমন অবস্থা, সেই মত অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। তোমার জন্য মোটা আছে, লাড়ু আছে, তাহাই খাইয়া সন্তুষ্ট হও।' ফ যে, যে অবস্থার লোক হও না কেন, সন্তোষ সকলকেই শিখিতে হইবে, কেননা অপরিমীম উপকরণ থাকার সম্ভাবনা নাই।

এই যে চৌর্য্য, লাম্পট্য, দস্যুতা প্রভৃতি পাপ—এগুলি কি সন্তোষের ফল? না অসন্তোষের পরিণাম? নিশ্চয় অসন্তোষ হইতেই এই সকলের উৎপত্তি। সুতরাং সন্তোষই বাঞ্ছনীয়, অসন্তোষ নহে। তবে সন্তোষ হইতে আলস্য আসিয়া পড়ে—এ কথাও একেবারে ফেলিবার উপায় নাই। তবে, এখন আমরা যেমন 'পেট বড় ওস্তাদ' বুঝিয়া গৃহস্থালী বদলে পাকস্থলীকে ওস্তাদিতে বাহাল রাখিয়াছি, তাহারই তাড়নায় আলস্য ত্যাগ করিতেছি—সেইরূপ পূর্ব্বমত যদি গৃহস্থালীকে আবার ওস্তাদিতে বসাইতে পারি,—যদি অতিথিদেবতার পূজা, অবশ্য পোষ্যের পালন, পেটপূরণের মত প্রয়োজনীয় মনে করি, তাহা হইলে আমরা অলস হইবার অবসর পাইব না। পাঁচ জনকে দিয়া তবে পেট পুরাইতে হয়, এই ধারণা বদ্ধমূল থাকিলে আলস্য আর আমাদের উপর বল করিতে পারিবে না। এখন আবার একবার সেই শ্রাদ্ধের প্রার্থনা-বাক্য স্মরণ করুন। "আমার বংশে দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাউক * * * দেয় বস্তুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাউক।" যে ঐকান্তিকতা সহকারে ঐরূপ প্রার্থনা আপনার পিতৃপুরুষদের কাছে করিতে পারে, সে কি কখন আর অলস হইতে পারে? এখনকার দিনের বিজ্ঞেরা বলেন, "ষ্টাইল (style) না বাড়াইলে, উপার্জ্জন বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা হইবে কেন? সাংসারিক উন্নতি হইবে কি প্রকারে? আমরা বিনীত ভাবে সেই বিজ্ঞদিগকে জিজ্ঞাসা করি—ঐ প্রার্থনায় কি ষ্টাইল বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ পায় না? তবে, আমাকে কোপ্তা-কাবাব কারি-কটলেট দাও—সে কথা নাই বটে। 'গাড়ী দাও, জুড়ী দাও, সে কথাও নাই বটে—শাল দাও, রুমাল দাও, সে কথাও নাই বটে,'—তবে আমার বংশে দেয় বস্তুর বৃদ্ধি পাউক, বংশে দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাউক—এ কি শ্রীবৃদ্ধির কথা নহে? যে যত পরের দুঃখ দূর করিতে পারে, তাকে আমরা তত শ্রীমান্ মনে করি। সেই শ্রী লাভ করিবার জন্য আমরা ব্যগ্র—আমরা কখন অলস হইতে পারি কি?"

ভারতের চরম সুখের আদর্শ হইতেছে পরসেবায়। "সেবা পরম ধর্ম্ম,—মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ। * * * * সেবানন্দ-ভোগে মনের বল বাড়ে, মনুষ্যত্বের গৌরব অধিকতর বুঝিতে পারা যায়।" ভারতবর্ষে নিজের ভোগ বিলাস বিসর্জ্জন দিয়া পরসেবার কিরূপ বিধান রহিয়াছে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিব।

আজ রামদাস বাবুর পিতৃশ্রাদ্ধ। তিনি এই উপলক্ষে আত্মীয় অনাত্মীয় দীনদুঃখী অনেক লোককে প্রচুর লুচি মিঠাই মোণ্ডা দিয়া পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। কিন্তু সেদিন তিনি নিজে কি খাইলেন? তিনি অবশ্য সেই নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের সঙ্গে বসিয়া লুচি মিঠাই মোণ্ডা ভক্ষণ করিয়া রসনার তৃপ্তি সাধন করিতে পারিতেন। ইহাতে সেই নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদিগেরও মনে সুখ হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু শাস্ত্রের বিধান অন্যরূপ। শাস্ত্রের কঠোর আদেশ এই সে দিনও তাঁহাকে হবিষ্যান্ন অর্থাৎ আলোচাল কাঁচকলা খাইয়া থাকিতে

হইবে। তাহার মানে এই—তাঁহাকে নিজে কিছুমাত্র ভোগ না করিয়া অন্যকে ভোগ করাইয়া তৃপ্তি লাভ করিতে হইবে। যাঁহার মনে ইহাতে তৃপ্তি না হয়, তাঁহার শ্রাদ্ধক্রিয়া পণ্ড, তাঁহার পরলোকসেবা বৃথা। ইহাই ভারতের পরলোকের উচ্চ আদর্শ।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল, তবুও অনেক কথার আভাস দেওয়া হইল না। আর কেবল একটি কথা বলিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব। সেটি হইতেছে ভারতের আর একটি গোড়ার কথা, ভারতের খাঁটি নিজস্ব। আমি নারীর সতীধর্ম্মের কথা বলিতেছি। এ সম্বন্ধে গ্রন্থকারের সার কথা এই—মনুর মতে বিবাহ আট প্রকার ছিল। এক সময়ে স্বামী স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিয়াও বিবাহ করিত। কিন্তু বিবাহ যে ভাবেই হউক, উভয়ে এক বার সংমিলন হইলে সে নারী আর পুরুষান্তর গ্রহণ করিতে পারিবে না। শত সহস্র নারী কর্ম্মদোষে বা শিক্ষাদোষে অসতী পথচারিণী হইলেও সতীভাবের লেশমাত্র ব্যতিক্রম করিতে হইবে না। নারীর সতীত্ব-শক্তি সনাতনী। সেই সতীত্ব-শক্তি অব্যাহত রাখিয়া নারীজাতির উন্নতি করিতে হইবে। আর আজ কাল কোন কোন ব্রহ্মচর্য্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তনশীল যুবকের মুখে যে শুনা যাইতেছে সতীধর্ম্মের ভাব (chastity) কুসংস্কারমূলক—এই সকল বিপ্লবকারী ভাবের মত হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে হইবে।

এইরূপে আমরা একটির পর আর একটি সনাতনী বার্ত্তার আলোচনা করিয়া দেখিলাম পুস্তকের নামকরণ সার্থক হইয়াছে, আর গ্রন্থকার হিন্দুসমাজের এই অধোগতির দিনে তাঁহার সনাতনী বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া সমগ্র হিন্দুজাতির ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। যাঁহারা সমাজের ভাঙ্গা-গড়া করিতে উদ্যত, তাঁহারা যদি এই "Thus far, no further" খাটো-অঙ্কিত সনাতনী পতাকার সীমান্তরেখা স্থির রাখিয়া ভাঙ্গা গড়া করিতে পারেন তবেই সমাজের মঙ্গল, তবেই হিন্দুজাতি বাঁচিয়া থাকিবে, নতুবা তাহার রক্ষা-প্রাচীরের ভিত্তিগুলি আল্‌গা করিয়া দিলে ক্রমে হিন্দুজাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে। যাঁহারা হিন্দুজাতির পৃথক্ অস্তিত্ব লোপ করিয়া বিশ্বমানবের সহিত তাহার সম্মিশ্রীকরণ করিতে চান তাঁহাদের ঋষিত্ব অপেক্ষা কবিত্বই অধিক প্রশংসনীয়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করি তাঁহাদের সেই কল্পনা কল্পনাই থাকুক। গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকারও একটা আশার কথা বলিয়াছেন—"এখনকার দিনে স্বধর্ম্ম যেন কিছু ম্রিয়মাণ মত বোধ হইতেছে; এ ভাব থাকিবে না, অচিরে স্বধর্ম্ম আবার জীবন্তভাবেই পরিদৃশ্যমান হইবে।" আমরাও এই আশার আশ্বাস-বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলি—"ভগবান্ তাহাই করুন—তাহাই করুন।"

পরিশেষে বক্তব্য গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি ভুল আমার চোখে পড়িয়াছে। আশা করি তাহা দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধিত হইবে। "ধর্ম্মের পন্থা সনাতনী (৫২ পৃঃ) পন্থা শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ নহে, পুংলিঙ্গ—তাহার প্রমাণ "কঃ পন্থাঃ"। "ব্রহ্মৎ—একমেবাদ্বিতীয়ং।" (৯০ পৃঃ)—"ব্রহ্ম" নিশ্চয়ই

মুদ্রারাক্ষসের কৃতিত্ব, কিন্তু এ জন্য সেই রাক্ষসকে বধ করা উচিত। "সূর্য্যের অতি নিকটে বুধ তাঁহাকে পরিবর্ত্তন করিতেছে" (১২৮ পৃঃ)—এ স্থলে 'পরিবর্ত্তন' শব্দ চারিদিকে আবর্ত্তন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু এরূপ প্রয়োগ আর কোথায়ও দেখি নাই। "এই বিস্তীর্ণ ভারতক্ষেত্র কেবল মাত্র বিংশতিকোটি দাসের বাসভূমি" (১২ পৃঃ)—এখন আর বিংশতি কোটি নাই, বর্ত্তমান লোকগণনায় একত্রিংশ কোটি হইয়াছে। "নারীর সতীত্ব-শক্তি বা পতিব্রতা সনাতনী" (৶০ পৃঃ)—এ স্থলে পতিব্রতা স্থলে পাতিব্রত্য হইবে, সুতরাং এখানে তাহার বিশেষণ "সনাতনী"ও খাটিবে না। এই কয়টি ছাড়া আর কোন ভুল আমার চোখে পড়ে নাই।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

রসায়নীবিদ্যার উন্নতি

গত দুই বৎসরে জড়বিজ্ঞানের নানা বিভাগে যে উন্নতি হইয়াছে, তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। এই দ্রুত উন্নতিতে পুরাতন সিদ্ধান্তগুলি নূতন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, এখন দেখিলে তাহাদিগকে চিনিয়া লওয়া কঠিন হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হেলম্‌হোল্ৎ, হার্জ ও কেল্‌ভিন্ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ যে সকল সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত বলিয়া গিয়াছেন, এখনকার নূতন আবিষ্কারে তাহাদেরও পুনর্গঠনের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। শারীরবিদ্যা, জীবাণুতত্ত্ব ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানও উন্নতির পথে দ্রুত ধাবমান হইয়াছে। ভূতত্ত্ব, জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও মানবতত্ত্বের ন্যায় প্রাচীন শাস্ত্রও তাহাদের পুরাতন মূর্ত্তিগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই, কীটদষ্ট প্রাচীন পুঁথির জীর্ণ পাতা ত্যাগ করিয়া তাহাদিগকেও নবীন রূপ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ডাল্‌টনের অভিব্যক্তিবাদ বহু পূর্ব্বে প্রচারিত হইলেও, যাঁহারা ইহার সুপ্রতিষ্ঠার সহায় ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন এখনো জীবিত আছেন। বৃদ্ধ ওয়ালেস্ এখনো অভিব্যক্তিবাদ প্রসঙ্গে পুস্তকাদি লিখিতেছেন। কিন্তু সম্প্রতি জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল নূতন তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহাতে অভিব্যক্তিবাদেরও সংস্কারের প্রয়োজন দেখা যাইতেছে।

গত দশ বৎসরের মধ্যে রসায়নী-বিদ্যায় যে সকল উন্নতি ও পরিবর্ত্তনের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার আলোচনা করিতে গেলে, রেডিয়ম্ (Radium) ধাতুর আবিষ্কারের কথা মনে পড়িয়া যায়। এই অদ্ভুত জিনিসটি হইতে অবিরাম কয়েক জাতীয় তেজোরশ্মি ও তাপ নির্গত হয়। এগুলির মধ্যে একটিকে অতিসূক্ষ্ম জড়-কণিকা বা শক্তি-রশ্মিকা বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। ডাল্‌টন

তাম্রলৌহাদি ধাতু এবং হাইড্রোজেন্, অক্সিজেন্ ও গন্ধক প্রভৃতি অধাতুকে যে, মূল পদার্থ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, রেডিয়ম ও অপর ধাতু হইতে অতিসূক্ষ্ম অণুর নির্গমন দেখিয়া তাহা স্বীকার করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন। এই অণুগুলি হাইড্রোজেনের ন্যায় লঘু বস্তুর পরমাণু অপেক্ষাও অনেক ক্ষুদ্র। প্রায় হাজারটি কণিকা একত্র না হইলে, তাহারা গুরুত্বে বা আকারে এক পরমাণু প্রমাণ হাইড্রোজেনের সমান হয় না।

ডাল্‌টনের নিয়মে পরমাণুকে বিভাগ করা যায় না। রেডিয়ম্ জিনিসটা হাইড্রোজেন্, নাইট্রোজেন্ বা স্বর্ণ-রৌপ্যের ন্যায় একটা মূল পদার্থ, সুতরাং ইহার পরমাণু অবিভাজ্য হইবারই কথা। কিন্তু অবিভাজ্য পরমাণু গুলিকেই এখন বিভক্ত হইতে দেখিয়া প্রচলিত রাসায়নিক সিদ্ধান্তে বৈজ্ঞানিকদিগের বিশ্বাস শিথিল হইয়া আসিতেছে। কেবল রেডিয়মের পরমাণুই এই প্রকারে বিভক্ত হয় না, ইউরেনিয়ম্ (Uranium) প্রভৃতি আরো অনেক মূল-পদার্থের পরমাণুকে এই প্রকারে বিশ্লিষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে, এবং বিশ্লেষণের ফলে, যে অতি সূক্ষ্ম কণিকার উৎপত্তি হইতেছে, তাহারা আকৃতি-প্রকৃতি সকল জিনিসেই এক দেখা যাইতেছে। সকলে ভাবিতেছেন এই অতিসূক্ষ্ম কণিকাগুলিই বিশ্বের একমাত্র উপাদান এবং ইহাদেরই সংযোগ-বিয়োগে তাম্রলৌহ ও শিলামৃত্তিকা প্রভৃতি নানা যৌগিক-অযৌগিক উৎপন্ন হইয়া জগৎকে এত বিচিত্র ও এত সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে [illegible] যাইতেছে যে, তাম্রলৌহ বা হাইড্রোজেন্, নাইট্রোজেন প্রভৃতি সেই সত্তরটি মূল-পদার্থের কোনটিই প্রকৃত মূলপদার্থ নয়, সেই রেডিয়ম প্রভৃতি ধাতুর দেহনির্গত সূক্ষ্মকণাই বিশ্বের একমাত্র মূল জিনিস।

জগতের সমস্ত বস্তুই এক মূলপদার্থ দ্বারা গঠিত, এই মহাসত্যটির আভাস পাইয়া রসায়নশাস্ত্র কম গৌরবান্বিত হয় নাই। একই মহাশক্তিকে আশ্রয় করিয়া যে, একই পদার্থ বিচিত্র মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছে, ইহা দেশবিদেশের দার্শনিকগণ বহুপূর্ব্বে প্রকারান্তরে স্থির করিয়াছিলেন। বিজ্ঞান আজ সেই পরম সত্যটিকে চাক্ষুষ দেখাইবার উপক্রম করিয়া ধন্য হইয়াছে।

রেডিয়ম ধাতুর আবিষ্কারের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, ফ্রান্সের ভুবন-বিখ্যাত পণ্ডিত ক্যুরি সাহেবের পত্নী মাডাম্ ক্যুরিই ইহার সন্ধান পাইয়াছিলেন। অনেক মহিলা দ্বারা এই প্রকার একটা বৃহৎ আবিষ্কারের সূত্রপাত বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার। যাহা হউক রেডিয়ম্ আবিষ্কারের পর ফরাসী ও ইংরাজ বৈজ্ঞানিক ব্যতীত অপর কেহই এই জিনিসটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে পারেন নাই। পিচ্ ব্লেণ্ড (Pitch Blende) নামক যে আকরিক পদার্থ হইতে রেডিয়ম্ ঘটিত বস্তু সংগ্রহ করা হয়, তাহা পৃথিবীর সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না, কাজেই উহা সাধারণ বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট দুর্লভ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখন রেডিয়মের ন্যায় তেজোনির্গমনক্ষম প্রায় চব্বিশটি ধাতুর অস্তিত্ব জানা গিয়াছে। ইহাতে রসায়নবিদ্‌গণের গবেষণার খুবই সুবিধা হইয়াছে।

থোরিয়ম্ (Thorium) নামক ধাতুটি খুব দুর্লভ নয়। আজকাল গ্যাসের শিখার উপরে যে সাদা রঙের আবরণ লাগাইয়া আলোকের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইতেছে, তাহা সেই থোরিয়ম্‌ঘটিত উপাদানে প্রস্তুত। ইহার পরীক্ষায় জর্ম্মান্ পণ্ডিত অধ্যাপক হান্ (Prof. Otto Hahn) আরো কতকগুলি তেজোনির্গমনক্ষম নূতন পদার্থের আবিষ্কার করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত রেডিয়ম্ লইয়া যে সকল পরীক্ষা চলিতেছিল, তাহাতে বিশুদ্ধ রেডিয়মের ব্যবহার করা হয় নাই। ইহাকে বিশুদ্ধ আকারে পাইবার উপায় জানা ছিল না। কাজেই রেডিয়ম্ ও ব্রোমিনের (Bromine) মিশ্রণজাত রেডিয়ম্-ব্রোমাইড্‌কে নাড়াচাড়া করিয়া তৃপ্ত থাকা ব্যতীত আর উপায় ছিল না। সম্প্রতি মাডাম্ ক্যুরি বিশুদ্ধ রেডিয়ম্ প্রস্তুতের এক পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া গবেষণার এক বৃহৎ অভাব মোচন করিয়াছেন।

অধিক তাপ ও অধিক ঠাণ্ডায় পদার্থের অবস্থা কি প্রকার হইয়া দাঁড়ায়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা অনেক সময় আবশ্যক হয়। কিন্তু পদার্থকে খুব উষ্ণ বা শীতল করিবার উপায় বৈজ্ঞানিকগণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, কাজেই অনেক পরীক্ষা দুঃসাধ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়া আসিতেছিল। বৈদ্যুতিক চুল্লীতে এখন নানা পদার্থকে অনায়াসে তিন হাজার ডিগ্রি পরিমাণে উষ্ণ করা যাইতেছে। এক শত ডিগ্রি তাপে জল ফুটিতে আরম্ভ করে, ইহার তিন শত গুণ তাপ যে কত অধিক তাহা আমরা অনায়াসে অনুমান করিতে পারি। চাপ দিয়া ও শীতল করিয়া বায়ুকে জলের ন্যায় তরল পদার্থে পরিণত করা যাইতেছে। এই তরল-বায়ুর ন্যায় শীতল বস্তু এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। আজ কাল ইহা দ্বারা নানা পদার্থকে শীতল করিয়া অনেক পরীক্ষাদি হইতেছে।

হাইড্রোজেন্ বায়ুকে যে কোন কালে তরল করা যাইবে, পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকগণ তাহা কল্পনাই করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি ইহাও সুসাধ্য হইয়াছে। তরল-হাইড্রোজেনের তাপ, তরল-বায়ু অপেক্ষাও অনেক কম। উষ্ণতার সীমা সেণ্টিগ্রেডের শূন্য ডিগ্রিতে নামিলে জল বরফে পরিণত হয়। তরল-বায়ুর উষ্ণতা বরফের উষ্ণতা অপেক্ষা কেবল সাইট্রি ডিগ্রি মাত্র কম, কিন্তু তরল হাইড্রোজেনের উষ্ণতাকে এখন বরফের তুলনায় ২৫২ ডিগ্রি কম দেখা যাইতেছে। বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠক অবশ্যই জানেন, বৈজ্ঞানিকগণ পদার্থের একটা নিস্তাপ অবস্থা কল্পনা করিয়া থাকেন। উষ্ণতার মাত্রা বরফের শৈত্যের ২৭৩ ডিগ্রি নীচে নামিলেই সেই নিস্তাপ অবস্থা আসিয়া পড়ে। ইহাতে পদার্থের অণুর কম্পন রহিত হয় এবং সংকীর্ণ পাত্রে আবদ্ধ রাখিলেও এই অবস্থায় বায়বীয় পদার্থ চাপ-ধর্ম্ম ত্যাগ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তরল হাইড্রোজেনের সাহায্যে শীতল করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া, বৈজ্ঞানিকগণ সেই নিস্তাপ ও নিষ্পন্দ অবস্থার খুব কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আর কোন প্রকারে উষ্ণতাকে কুড়ি ডিগ্রি নীচে নামাইতে পারিলেই জড়ের সেই শুদ্ধ প্রকৃতির সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় হইবে।

প্রায় বারো বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের রয়াল ইনিষ্টিটিউসনের অধ্যাপক ডিওয়ার (Dewar) তরল হাইড্রোজেন্ প্রস্তুতের উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এখনো সেই উপায়েই হাইড্রোজেন্‌কে তরল করা হইতেছে।

বিজ্ঞানের কোন আবিষ্কারই এক বারের চেষ্টায় এক দিনে সুসাধিত হয় নাই। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া দীর্ঘকাল গবেষণা করিলে তবে অভীষ্টের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাতে যে অর্থ ব্যয় হয় তাহার পরিমাণ বড় অল্প নয়। যে তরল-বায়ু ও তরল-হাইড্রোজেন্ আজকাল নানা পরীক্ষায় প্রধান সহায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার প্রস্তুত-উপায়ের আবিষ্কারেও বহু ব্যয় হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার মণ্ড (Dr. Mond) নামক অনেক জর্ম্মান্ ধনী ইহার সমগ্র ব্যয় বহন করিয়াছিলেন। যাহা সত্য, তাহাকে কোন ক্রমেই ব্যক্তি বা জাতিবিশেষের সম্পত্তি করিয়া রাখা যায় না। ইহা জানিয়াও আধুনিক নানা আবিষ্কারের কর্তৃত্ব লইয়া নানা দেশের বৈজ্ঞানিকগণ বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। ইংরাজ বৈজ্ঞানিক ডিওয়ার সাহেবের গবেষণার আনুকূল্যে জর্ম্মানের দান সত্যই আধুনিক যুগের একটা নূতন কথা।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও জৈব রসায়ন-শাস্ত্রের (Organic Chemistry) বিশেষ কোন উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইত না। সেই পুরাতন কয়েকটি ব্যাপার লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ ব্যস্ত থাকিতেন। অনেকের বিশ্বাস ছিল, জৈব বস্তুকে আমরা বিশ্লেষ করিতে পারি, কিন্তু উপাদানগুলিকে একত্র করিয়া তাহাকে গঠন করিতে পারি না। এখনো যে বিশ্বাস সম্পূর্ণ অপনীত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না, তথাপি বৈদ্যুতিক চুল্লীর উষ্ণতা ও তরল হাইড্রোজেনের শীতলতাকে ব্যবহারে লাগাইয়া গত কয়েক বৎসরে বৈজ্ঞানিকগণ জৈব পদার্থের সংগঠনে কতকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন। প্রবীণ জর্ম্মান্ পণ্ডিতগণ বেঞ্চশালায় দিবারাত্রি পরীক্ষা করিয়া যে সকল রহস্যের সন্ধান পাইতেছেন, সে গুলিকেই কারখানার কাজে প্রয়োগ করিয়া বাণিজ্যের যে কত উন্নতি করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না।

যে গভীর বায়ুর আবরণ আমাদের পৃথিবীকে ঘিরিয়া রহিয়াছে অক্সিজেন্ ও নাইট্রোজেন্ নামক দুইটি স্বচ্ছ বায়বীয় বস্তু তাহার প্রধান উপাদান। সচরাচর আমরা যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, তাহাতে প্রচুর অক্সিজেন্ ও নাইট্রোজেন্ আছে, কিন্তু এগুলিতে উহারা সংযুক্ত অবস্থায় থাকে বলিয়া সেই সকল পদার্থ হইতে অক্সিজেন্ বা নাইট্রোজেন্ সংগ্রহ করিয়া কাজে লাগান কঠিন হয়। তা ছাড়া এ প্রকারে যে অক্সিজেন্ ও নাইট্রোজেন্ পাওয়া যায়, তাহার পরিমাণও অধিক হয় না। কিন্তু এই প্রকারে নাইট্রোজেন্ সংগ্রহ করা ব্যতীত আর উপায় ছিল না। মানুষ নাইট্রোজেনের সমুদ্রে ডুবিয়া থাকিয়াও মুক্ত নাইট্রোজেন্‌কে কি প্রকারে কাজে লাগান যাইতে পারে, তাহা জানিত না। গত কয়েক বৎসরের চেষ্টায় বায়ুর নাইট্রোজেন্‌কে আজ কাল নানা কার্য্যে প্রয়োগ করা হইতেছে।

নাইট্রোজেন্‌যুক্ত যে সকল পদার্থ আজ কাল ব্যবসায় বাণিজ্যে পরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের নাম করিতে গেলে, প্রথমেই নাইট্রিক্ এসিড্ নামক দ্রাবকের কথা মনে পড়িয়া যায়। কলকারখানার কাজে ইহার ন্যায় অত্যাবশ্যক বস্তু আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বায়ুর নাইট্রোজেন লইয়া নাইট্রিক্ এসিড্ প্রস্তুত করিবার জন্য দীর্ঘ কাল চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। সম্প্রতি ইহাদের চেষ্টা সার্থক হইয়াছে। বায়ুর নাইট্রোজেনে বিদ্যুৎ পরিচালন করিয়া ইংরাজ বৈজ্ঞানিক হান্‌পসন্ (Dr. William Hänpson) নাইট্রিক্ এসিড্ প্রস্তুতের এক উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই নরওয়ের এক বৃহৎ জলপপাতের নিকট এই উপায়ে এসিড্ প্রস্তুতের জন্য এক কারখানার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। জলপ্রপাতের শক্তিতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হইতেছে এবং তাহারই সাহায্যে নাইট্রিক্ এসিড্ প্রস্তুতের কার্য্য চলিতেছে।

সোরা (saltpetre) জিনিসটা আমাদের কম প্রয়োজনে লাগে না। জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য ইহা একটি উৎকৃষ্ট সার। তা ছাড়া বারুদ প্রভৃতি প্রস্তুতে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার আছে। স্বভাবতঃ নানা স্থলে যে সোরা উৎপন্ন হয়, এ পর্য্যন্ত তাহাই সংগ্রহ করিয়া লোকে কাজ চালাইত। নাইট্রোজেন্‌কেই ইহার প্রধান উপাদান দেখিয়া, বায়ুর নাইট্রোজেন লইয়া কোন প্রকারে জিনিসটাকে প্রস্তুত করিবার জন্য খুব চেষ্টা চলিতেছিল। বায়ুর ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ পরিচালন করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ সম্প্রতি কৃত্রিম সোরার প্রস্তুতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

আমোনিয়া জিনিসটাও নাইট্রোজেন্-প্রধান, এবং কারখানায় ইহার ব্যবহারও যথেষ্ট। বায়ুর নাইট্রোজেন্ হইতে ইহারও এক প্রস্তুত-উপায় অল্পদিন হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। অধ্যাপক হাবের (Haber) নামক জনৈক জর্ম্মান্ ইহার উদ্ভাবক। আমোনিয়া প্রস্তুতের নূতন কারখানার প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে। অনেকে আশা করিতেছেন, হয় ত অল্পদিনের মধ্যে জিনিসটা খুব সুলভ হইয়া দাঁড়াইবে।

ভূ-গর্ভ হইতে তাম্রলৌহ ও স্বর্ণরৌপ্য প্রভৃতি ধাতুগুলিকে যখন উদ্ধার করা হয়, তখন তাহারা বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে না। নানা বিজাতীয় বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া সেগুলি আকারে-প্রকারে এমন বিচিত্র অবস্থায় থাকে যে, সেগুলিকে ধাতু বলিয়া চিনিয়া লওয়া কঠিন হয়। এই সকল অবিশুদ্ধ ধাতুকে শুদ্ধ করিবার জন্য যে সকল উপায় প্রচলিত আছে, তাহাদের কোনটিই সহজ বা অল্পব্যয়সাধ্য নয়। স্বর্ণ বা রৌপ্যকে যদি ঠিক্ স্বর্ণ বা রৌপ্যের আকারেই খনিতে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে সেগুলি এত দুর্ম্মূল্য হইয়া দাঁড়াইত না। অনেক স্থলেই জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ধাতুকে শুদ্ধ করিতে হয়। গত ত্রিশ বৎসরের চেষ্টায় বিদ্যুতের সাহায্যে যে সকল শুদ্ধিপ্রথার আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা রাসায়ন-শাস্ত্রকে কম উন্নত করে নাই। স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র এই তিনটি প্রধান ধাতুকে আকরিক যৌগিক

পদার্থ হইতে আজকাল এত সহজে বিদ্যুৎ বাহির করা হইতেছে যে, তাহার বিবরণ শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। লৌহ জিনিসটা সুলভ হইলেও ইহাকে বিশুদ্ধ অবস্থায় সংগ্রহ করা বড় কঠিন। অথচ বিশুদ্ধ লৌহের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। সাধারণ লৌহে তার প্রস্তুত করিতে গেলে, যে শ্রম লাগে, বিশুদ্ধ লৌহ লইয়া কার্য্য করিলে তাহার শতাংশ শ্রমেরও আবশ্যক হয় না। তা ছাড়া বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদিতে এই প্রকার লৌহের চুম্বক ব্যবহার করিলে অল্প শক্তিতে অনেক কাজ আদায় করা যাইতে পারে। জর্ম্মানির লিপ্‌জিক্ (Leipsic) নগরের কারখানায় যে বিশুদ্ধ লৌহ প্রস্তুত করা হইতেছে, তাহা দ্বারা আজকাল অনেক যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া পরীক্ষা চলিতেছে। সাধারণ যন্ত্রের তুলনায় বিশুদ্ধ লৌহনির্ম্মিত কলে প্রায় আড়াই গুণ অধিক কাজ পাওয়া যাইতেছে। ইহা কম লাভের কথা নয়!

এক সূর্য্যের তাপই পৃথিবীর সমগ্র শক্তির ভাণ্ডারকে পূর্ণ করিয়া রাখে। যে কয়লা পোড়াইয়া আমরা বাষ্পযন্ত্র বা বিদ্যুতের যন্ত্র চালাইতেছি, তাহা উদ্ভিদের দেহে সঞ্চিত শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়। উদ্ভিদ্ আবার অতি প্রাচীন যুগে সেই শক্তি সূর্য্যতাপ হইতে আহরণ করিয়া দেহে সঞ্চিত রাখিয়াছিল। কাজেই কয়লার শক্তিকে সৌরশক্তিরই রূপান্তর বলিতে হয়। যে জলপ্রপাতকে শৃঙ্খলিত করিয়া আজকাল নানা কাজ করাইয়া লওয়া হইতেছে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, তাহাদের শক্তিও সৌরশক্তি। পর্ব্বত-চূড়ায় জলের সঞ্চয় সূর্য্যতাপেরই কাজ। এই জলই সেই সৌরশক্তিকে বক্ষে ধরিয়া রাখে এবং তার পরে নীচে নামিবার সময় তাহারই বিকাশ দেখায়। বুদ্ধিমান মানুষ এই সুযোগ ছাড়িতে চায় না, নিম্নগামী জলের প্রবাহ দ্বারা চাকা ঘুরাইয়া অনেক কাজ করাইয়া লয়।

কয়লায় যে শক্তি সঞ্চিত থাকে, পোড়াইলেই তাহা তাপালোকে পরিণত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। ক্ষয়ের সময় ষোল আনা শক্তিকেই যদি আমরা কাজে লাগাইতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের লাভ হয়, কিন্তু অতি উৎকৃষ্ট যন্ত্রেও কয়লা পোড়াইলে সমগ্র শক্তিকে আমরা কাজে লাগাইতে পারি না; অধিকাংশই বৃথা তাপালোক উৎপন্ন করিয়া এবং পার্শ্বের জলস্থলবায়ুকে অনাবশ্যক গরম করিয়া নিয়তই নষ্ট হইতেছে। হিসাব করিলে দেখা যায়, এই অপব্যয়ের পরিমাণ শতকরা ৮৫ ভাগ। অর্থাৎ এক শত ভাগ শক্তির মধ্যে কেবল ১৫ ভাগ মাত্র কল চালায়। এই অপচয় বড় অল্প নয়। দীর্ঘকাল এক প্রকার বাজে খরচের প্রশ্রয় দিতে থাকিলে, কয়লার অভাবে কল-কারখানা বন্ধ হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। এই সকল কারণে বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় কয়লা পোড়াইয়া, তাহার অধিকাংশ শক্তিকে কাজে লাগাইবার জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। গত কয়েক বৎসরের রসায়ন-শাস্ত্রের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, ইঁহারা উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে যেন কতকটা অগ্রসর হইয়াছেন। সাধারণ চুল্লীতে পোড়াইলে কয়লা হইতে যে কতক-

গুলি অনাবশ্যক বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহাই শক্তিকে ক্ষয় করায়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এই সকল বাষ্পকে ছাড়িয়া না দিয়া, তাহাদিগকে কলে পোড়াইবার ব্যবস্থা করিতেছেন এবং আংশিক কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। এই প্রকারে কয়লা পোড়াইতে আরম্ভ করিলে, এখন যে পরিমাণ শক্তি কাজে লাগানো যাইতেছে তাহার অন্ততঃ চতুর্গুণ শক্তি আমাদের করায়ত্ত হইবে বলিয়া আশা হইতেছে। তা ছাড়া কয়লার বাষ্প প্রস্তুত করিতে গেলে, যে আল্‌কাতরা ও আমোনিয়া উৎপন্ন হইবে তাহাও নষ্ট হইবে না।

এই ত গেল অজৈব রসায়নের (Inorganic Chemistry) উন্নতির কথা। জৈব রসায়নের নানা বিভাগে গত কুড়ি বৎসরে বহু উন্নতির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। কৃত্রিম রবার, কৃত্রিম শর্করা এবং নানা জাতীয় কৃত্রিম রঙ্গ ও গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া জর্ম্মানি প্রভৃতি দেশগুলি কি প্রকারে ধনশালী হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহার বিশেষ বিবরণ প্রদান নিষ্প্রয়োজন। কৃত্রিম নীল প্রস্তুতের উপায় উদ্ভাবনের পর হইতে আমাদের দেশ হইতে নীলের চাষ এক প্রকার লোপ পাইয়াই গিয়াছে। সুলভ কৃত্রিম রঙ্গ হাতের গোড়ায় পাইয়া লোকে এখন আর মহার্ঘ লাক্ষারস বা মঞ্জিষ্ঠা রঞ্জনকার্য্যে ব্যবহার করে না। যাহা হউক এই সকল কৃত্রিম জিনিসের প্রস্তুতোপায় কি প্রকারে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিতে গেলে জৈব রসায়নশাস্ত্রের অধিকারে আসিয়া পড়িতে হয়। আমরা প্রবন্ধান্তরে উহার আলোচনা করিব।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

দময়ন্তী

ভারতবর্ষের মানচিত্রে যে প্রদেশ এক্ষণে বেরার নামে পরিচিত, প্রাচীন কালে তাহা বিদর্ভ নামে অভিহিত হইত। বিদর্ভে ভীম নামে এক প্রজাবৎসল নরপতি রাজত্ব করিতেন। কুণ্ডিন নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল।

বিদর্ভ ধনধান্যে ভারতবর্ষের মধ্যে অতুল; এমন শস্য নাই, যাহা বিদর্ভে উৎপন্ন না হয়। বৎসরের মধ্যে যখনই ইহার শস্যক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, তখনই নয়ন স্নিগ্ধ হয়; বিশেষতঃ শরৎকালে ইহার শস্যক্ষেত্রের শোভার তুলনা হয় না। শ্যামাঙ্গী প্রকৃতি তখন উজ্জ্বল হাস্যে দশ দিক উদ্ভাসিত করিতে থাকেন। তাপ্তী, ভদ্রা, পূর্ণা প্রভৃতি স্রোতস্বতী শতশাখা প্রসারিত করিয়া বিদর্ভভূমিকে সুজলা সুফলা করিয়া রাখিয়াছেন। বিদর্ভের অধিবাসিগণ পরিশ্রমী ও ক্লেশসহিষ্ণু, সেই জন্য বিদর্ভের গৃহে গৃহে স্বর্ণাদি প্রতিষ্ঠিত আছে।

রাজা ভীমের ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না; কিন্তু ঐশ্বর্য্য থাকিলে কি হইবে, শূন্যগর্ভ ঐশ্বর্য্যও মানুষকে কখন সুখী করিতে পারে

না। তাঁহার প্রাসাদ মণিমুক্তার প্রভায় সমুজ্জ্বল থাকিত, কিন্তু বালকবালিকার সরল মধুর দৃষ্টিতে তাহা কখনও জ্যোতির্ময় হইত না। গায়ক-গায়িকাগণ সেখানে তানলয় বিশুদ্ধ সঙ্গীত করিত, কিন্তু শিশুগণের "আধো আধো" কথায় তাহা কখনও মধুময় হইত না। তাঁহার সভায় নর্ত্তক-নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিত; কিন্তু বালকবালিকাগণের কূর্দ্দনে ও ধাবনে তাহা কখনও প্রমোদময় হইত না। বহু পরিজনের মধ্যেও রাজা ও রাজমহিষী তথায় দিবারাত্রি নির্জ্জনতা অনুভব করিতেন এবং তাঁহাদিগের মনে হইত, এ শূন্য প্রাসাদবাসের অপেক্ষা অরণ্যবাস বরং শ্রেয়ঃ।

এইরূপে বহুদিন অতীত হইলে দমন নামে এক মহর্ষি রাজা ভীমের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি দর্শনে রাজমহিষী স্বয়ং তাঁহার পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি রাজ্ঞীর অকপট ভক্তি ও সেবায় প্রীত হইয়া বিদায় গ্রহণের সময় বলিলেন, "মহারাজ! আমি আপনার এবং রাজমহিষীর ভক্তিতে পরম প্রীত হইয়াছি। আমার বরপ্রভাবে আপনি তিনটী পুত্র এবং একটী কন্যারত্ন লাভ করিবেন।"

যথাকালে রাজমহিষী ক্রমে তিন পুত্র ও এক কন্যা প্রসব করিলেন। মহর্ষি দমনের অনুগ্রহে জাত বলিয়া রাজা পুত্রদিগের নাম রাখিলেন দম, দান্ত ও দমন এবং কন্যার নাম রাখিলেন দময়ন্তী। কুমারদিগকে এবং কন্যাটীকে দেখিয়া রাজা ও রাজমহিষী আপনাদিগকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিলেন।

বিদর্ভের রাজকুমারীগণ রূপগুণের জন্য সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধা ছিলেন। মহর্ষি অগস্ত্যের পত্নী লোপামুদ্রা দেবী এই বিদর্ভরাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রঘুরাজবধূ কুসুমপেলবা ইন্দুমতী এবং লক্ষ্মীস্বরূপিণী রুক্মিণীদেবীও বিদর্ভরাজবংশসম্ভূতা। সুতরাং দময়ন্তী যে রূপগুণে অপর রাজকুমারীদিগকে অতিক্রম করিবেন, তাহা কিছু অসম্ভব ছিল না। কিন্তু বিদর্ভদেশের সভায় প্রাচীনগণ বলিতেন, "এমন মেয়ে এ বংশে আর কখনও জন্মে নাই।"

দময়ন্তী ক্রমে যৌবনসীমায় উপনীতা হইলে রাজা তাঁহার বাসের জন্য অন্তঃপুরের মধ্যে এক স্বতন্ত্র প্রাসাদ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। দময়ন্তী তথায় সমবয়স্কা সখীগণের সঙ্গে আনন্দে বাস করিতেন। তিনি কখনও অন্তঃপুরমধ্যস্থ সরোবরে জলক্রীড়া করিতেন, কখনও উপবনে বিহার করিতেন এবং কখনও দেবালয়ে বসিয়া শাস্ত্রপাঠ শ্রবণ করিতেন। দময়ন্তীর সখীগণ তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরাগিণী ছিলেন; সঙ্গীতে, নৃত্যে এবং সদালাপে তাঁহারা দময়ন্তীর চিত্ত বিনোদন করিতেন।

রাজসংসারে ধনবান, বলবান, পুণ্যবান নানা জনের কথা আলোচিত হইয়া থাকে। কোথায় কোন্ ধনাঢ্য ব্যক্তি এক অনুপম বিহারোদ্যান প্রস্তুত করিয়াছেন, কে কোন্ সুলক্ষণাক্রান্ত অশ্ব বা হস্তী বহু মূল্যে ক্রয় করিয়াছেন, কোন্ রাজপুত্র অস্ত্রপরীক্ষায় অপর সকলকে পরাস্ত করিয়াছেন এবং কোথায় কোন্ রাজা আপনার সর্ব্বস্ব যজ্ঞান্তে ব্রাহ্মণসাৎ করিয়াছেন, রাজান্তঃপুরবাসিনী-

গণ সর্ব্বদা তাহা লইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন। অন্যান্য সকলের মধ্যে একজনের নাম সর্ব্বদা দময়ন্তীর কর্ণগোচর হইত। অতি মহৎ কার্য্য হইতে সাধারণ কার্য্য পর্য্যন্ত যে বিষয়ে লোকে তাঁহার নাম করিত। যদি কোন ব্রহ্মপরায়ণ, বেদ-বেদান্তবিৎ ব্যক্তির প্রসঙ্গ হইত, রাজপুরোহিত অমনি বলিতেন, "এক নিষধরাজ নল ভিন্ন আর কেহই ইঁহার সমকক্ষ নহেন।" যদি কোন রাজার সত্যনিষ্ঠার কথা উঠিত, তবে বক্তা বলিতেন "রাজ্যস্থিতির জন্য দুই একটী মিথ্যা বাক্য না বলেন, এরূপ রাজা দুর্লভ; শুনিয়াছি একমাত্র রাজা নলই কখনও কাহারও সঙ্গে মিথ্যাচরণ করেন না।" আবার যদি কোন সারথিকে তাহার কার্য্যের ত্রুটীর জন্য তিরস্কার করা হইত, সে অমনি বলিত "আমি মহারাজ নলের সারথ্য-কার্য্য করিয়াছি, মহারাজ স্বয়ং আমাকে অশ্বচালনা শিক্ষা দিয়াছেন।" রাজ্ঞী যদি কোন নূতন সূপকারকে অত্যধিক বেতন চাহিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন, সে অমনি বলিত, "আমি দশবৎসরের অধিক মহারাজ নলের প্রধান পাচক ছিলাম, মহারাজ স্বয়ং আমাকে পাককার্য্যে শিক্ষা দিয়াছেন, যদি আমি আপনাকে এবং মহারাজকে তুষ্ট করিতে না পারি, আমায় এক কপর্দ্দকও বেতন দিবেন না।"

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে দময়ন্তী ভাবিতেন, এই যে সর্ব্বজন-পূজ্য মহাপুরুষের নাম শৈশব হইতে শুনিয়া আসিতেছি, ইনি কে? ব্রহ্মবিদের নাম করিতে হইলে লোকে ইঁহার নাম করে, প্রজারঞ্জক রাজা বলিলে ইঁহার নাম অগ্রে উল্লিখিত হয়; আবার সূপকার ইঁহার নিকট পাককার্য্য শিক্ষা করিয়াছি বলিতে গৌরব বোধ করে, এই সর্ব্বগুণান্বিত পুরুষ কে? ইনি কি ইতিহাসোক্ত কোন প্রাচীন কালের ব্যক্তি না অধুনাতন কালের কোন পুরুষ? দময়ন্তী ভাবিতেন, ইনি যিনিই হউন, আমার নমস্য। এই রূপে নলকে না দেখিয়া, কেবল লোকমুখে তাঁহার প্রশংসা শুনিয়া, দময়ন্তী তাঁহাকে ভক্তি করিতে শিখিলেন।

একদিন রাজান্তঃপুরে এক তপস্বিনী আসিলেন। তিনি আজন্ম ব্রহ্মচারিণী, বেদ-বেদাঙ্গে পারদর্শিনী এবং তপোবলে অগ্নি-শিখার ন্যায় তেজস্বিনী। তীর্থপর্য্যটন উপলক্ষে তিনি নানা স্থান ভ্রমণ করিতেছিলেন। রাজা ভীমের ও রাজমহিষীর ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা শুনিয়া তিনি তাঁহাদিগকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া রাজাবরোধবাসিনীগণ দেবালয়ের অঙ্গনে সম্মিলিতা হইলেন। তপস্বিনী তাঁহাদিগের নিকট আপনার তীর্থপর্য্যটনের কথা বলিতে লাগিলেন। উত্তরে হিমাচলের যে চিরতুষারাবৃত শৃঙ্গে ভগবতী মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন এবং যাহা তাঁহার নামানুসারে এখনও গৌরী-শৃঙ্গ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা হইতে দক্ষিণ সমুদ্রের কূলে যেখানে ভগবতীর কুমারীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, মহাসমুদ্র ফেন পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া অবিরাম যথায় দেবীপূজা করিতেছে, সেই মহাতীর্থ পর্য্যন্ত ভারতের বহুতীর্থের কথা তিনি বলিলেন। বিস্মিতা পুরবাসিনীগণ মুগ্ধচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন,

এবং অবশেষে তপস্বিনীদেবীকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন। কেবল রাজ্ঞী, দময়ন্তী এবং তাঁহাদিগের দুই একজন অনুচরী তথায় রহিলেন। তপস্বিনী দময়ন্তীকে লক্ষ্য করিয়া রাজ্ঞীকে বলিলেন;—

"বৎসে! এই যে সর্ব্বসুলক্ষণা কুমারীকে দেখিতেছি, এটী তোমার কে?

রাজ্ঞী বলিলেন "এটী আমার কন্যা, মহর্ষি দমনের বরপ্রভাবে আমি এটীকে পাইয়াছি, তাই ইহার নাম রাখিয়াছি দময়ন্তী।" মাতার ইঙ্গিতে দময়ন্তী তপস্বিনীকে প্রণাম করিলে তিনি রাজ্ঞীকে বলিলেন, "মা! তুমি ভাগ্যবতী, তাই এমন কন্যারত্ন প্রসব করিয়াছ। এই কন্যার গুণে তোমার বংশ চিরস্মরণীয় হইবে। কন্যাটী দেখিতেছি বিবাহযোগ্যা হইয়াছে, কোথাও বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছ কি?"

রাজ্ঞী। না মা! এখনও সম্বন্ধ স্থির হয় নাই! একটীমাত্র মেয়ে, কোথায় কার হাতে দিব, সেই চিন্তায় মহারাজা এবং আমি দুইজনেই সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন আছি।

তপস্বিনী। বৎসে! তোমার কন্যার উপযুক্ত পাত্র একটী আমি বলিতে পারি। আমি নানা দেশ দেখিয়াছি; বহু রাজা ও রাজপুত্রের সহিত আমার পরিচয় আছে। কিন্তু কুলে, শীলে, ধনে, অর্থে এ কন্যার উপযুক্ত সেই একজন মাত্র রাজকুমার আমার লক্ষ্য হইয়াছে।

রাজ্ঞী উৎসুক হইয়া বলিলেন, "মা, সেটী কে?"

তপস্বিনী। বীরসেনের পুত্র নিষধ-দেশের রাজাকে।

রাজ্ঞী। আমরাও তাঁহার নাম সর্ব্বদা শুনিতে পাই, কিন্তু পাছে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন, এই আশঙ্কায় মহারাজ তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন নাই।

তপস্বিনী। বৎসে! যিনি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিবেন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যিনি সংসারধর্ম্ম পালনেচ্ছু, তিনি তোমার এ কন্যাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না। তোমার এই কন্যাটী কেবল রূপবতী নয়, ইহার মুখে আমি যেরূপ ভাব দেখিতেছি, সমাধিকালে কেবল ভগবতীতে মাত্র আমি সে ভাব দর্শন করি।

রাজ্ঞী। দেবি! আমার নিজের কন্যা, কোন প্রশংসা কর্ত্তব্য নয় কিন্তু সত্যই এমন সুশীলা, ভক্তিমতী বালিকা আমি আর দেখি নাই।

তপস্বিনী। আমি তোমার এখান হইতে নিষধরাজ্যে যাইব পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ ইচ্ছা আছে। নলের সহিত আমার পরিচয় আছে। যদি তোমার অসম্মতি না থাকে, আমি তোমার কন্যার বিষয় সেখানে কথা-চ্ছলে বলিতে পারি।

রাজ্ঞী। আপনি যাহা উচিত মনে করিবেন, তাহাতে কি আমার অসম্মতি হইতে পারে? যদি আপনার কৃপায় আমার দময়ন্তী সুপাত্রে পড়ে, তাহা হইলেও আমরা কৃতকৃতার্থ হই।

তপস্বিনী। তবে আমি বিদায় গ্রহণ করি। আগামী প্রভাতে আমি নিষধাভিমুখে যাত্রা করিব।

রাজ্ঞী ও দময়ন্তী তপস্বিনীকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

সেই দিন হইতে দময়ন্তীর হৃদয়ে এক ভাবান্তর উপস্থিত হইল। এত দিন যিনি তাঁহার ভক্তির পাত্র ছিলেন, এখন তিনি অনুরাগের পাত্র হইলেন। যাঁহাকে কেবল উদ্দেশে ভক্তি প্রদর্শন করিয়াই তাঁহার প্রাণ তৃপ্ত হইত, এখন তাঁহাকে দর্শনের জন্য তাঁহার হৃদয় উৎসুক হইল। দময়ন্তীর মনে হইল, নল তবে কোন ইতিহাস-বিশ্রুত অতীত কালবর্ত্তী পুরুষ নহেন। অবার্থ-বাদিনী তপস্বিনী দেবী বলিয়াছেন, তিনিই কেবল আমার উপযুক্ত পতি; পিতা-মাতারও নলের হস্তে আমাকে প্রদান করিতে আপত্তি নাই। সুতরাং এ অবস্থায় বয়োধর্ম্মে যে ভাব উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক, নলের সম্বন্ধে দময়ন্তীরও মনে সেই ভাব জন্মিল। নলের কথা পুনঃপুনঃ শ্রবণের জন্য তাঁহার অভিলাষ জন্মিল, এবং ভাবিতেন কিরূপে একবার তাঁহাকে দেখিতে পাই। ক্রমে নল-চিন্তা অজ্ঞাতভাবে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। অন্য কথাতে আনন্দ হইত না, অন্য চিন্তাতে তৃপ্তি বোধ হইত না। দময়ন্তী সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃতা হইলেন। তিনি কেবলই ভাবিতেন, "হায়! মানুষ মানুষকে না দেখিয়া কি এত ভাল বাসিতে পারে! হায়! আমি যাঁহার উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তিনি কি একবারও আমার কথা স্মরণ করেন? হয় ত তিনি আমার নামও শুনেন নাই! আমি এ কি করিলাম!"

কবিগণ বলেন, বিরহে প্রেমিক প্রেমাস্পদের সহিত তন্ময় হইয়া যায়। দময়ন্তী প্রত্যেক পদার্থে নলকে দেখিতেন, প্রত্যেক শব্দে তাঁহার কথা শ্রবণ করিতেন। মনের সেই অবস্থায় তিনি অন্তঃপুরস্থিত উপবনে একটী বিচিত্রদেহ হংসকে ধৃত করিলেন। হংস প্রাণভয়ে আপনার স্বাভাবিক ভাষায় কি উক্তি করিল। দময়ন্তী ভাবিলেন, হংস তাঁহাকে নলের কথা বলিতেছে। তিনি সস্নেহচিত্তে তাহাকে ছাড়িয়া দিলে হংস কলধ্বনি করিতে করিতে উত্তর দিকে ধাবিত হইল। দময়ন্তী ভাবিলেন হংস তাঁহার কথা বলিবার জন্য নিষধ-দেশে যাইতেছে।

এদিকে তপস্বিনী দেবীর মুখে দময়ন্তীর রূপগুণের কথা শ্রবণ করিয়া নলও তদ্গত-প্রাণ হইয়াছিলেন। স্বভাবতঃ সংযতচিত্ত হইলেও তাঁহার কার্য্যকলাপে তাঁহার অন্তর্গত ভাব ব্যক্ত হইত। সুধী রাজমন্ত্রী দেখিলেন, যে রাজা পূর্ব্বাপেক্ষা অন্যমনস্ক! কোন জটিল কার্য্যের মধ্যে সহজে প্রবেশ করিতে পারেন না। রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হয় না, সেই জন্য কোন কোন দিন হোমবেলা অতিক্রান্ত হইয়া যায়। কখনও প্রাসাদ-শিখরে একা বসিয়া তিনি চন্দ্রের দিকে চাহিয়া থাকেন, কখনও বা অকারণে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার স্বভাবতঃ সুন্দর মুখে কালিমা পড়িতেছিল, এবং দিন দিন কৃশ হইতেছিল। তাঁহার কপোলে অশ্রুকলঙ্ক লক্ষিত হইত। মন্ত্রী ভাবিতেন "এ সকলই অনুরাগ-লক্ষণ? কিন্তু নির্জ্জিতেন্দ্রিয় মহারাজের পক্ষে পরস্ত্রীচিন্তা ত সম্ভবপর নয়, তবে মহারাজ যাঁহার প্রতি অনুরাগী সেই ভাগ্যবতী কুমারী কে?" কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, অথচ নলকে কিছু

দিন রাজকার্য্যে উদাসীন দেখিয়া, মন্ত্রী উদ্বিগ্ন হইলেন।

তপস্বিনী দেবী নলের সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, রাজা ভীম রাজমহিষীর মুখে তাহা অবগত হইলেন। কিন্তু নলকে উপযুক্ত পাত্র জানিয়াও তিনি তাঁহার নিকট কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিতে পারিলেন না। তিনি মহিষীকে বলিলেন, "প্রিয়ে! যাচকরূপে কন্যাদানের জন্য প্রার্থী হওয়া আমাদের কুলাচারবিরুদ্ধ। আমাদিগের বংশের কুমারীগণকে অপর রাজা ও রাজপুত্রগণ বিবাহার্থ প্রার্থনা করিবেন, ইহাই আমাদিগের কৌলিক নিয়ম। সুতরাং আমি কোথাও প্রার্থী হইতে পারিব না। তবে আমি এক কার্য্য করিব। আমি দময়ন্তীর স্বয়ম্বর ঘোষণা করিয়া ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান রাজাকে সেই স্বয়ম্বরে নিমন্ত্রণ করিব। নল যদি দময়ন্তীর পাণিপ্রার্থী হন, তবে অবশ্যই এখানে উপস্থিত হইবেন, আর যদি উপস্থিত না হন, তবে তাঁহার নিকট কামনা করা বৃথা। সভাস্থ অপর রাজাদিগের মধ্যে দময়ন্তী যাঁহাকে মনোনীত করিবে, আমরা তাঁহাকেই কন্যা দান করিব।"

রাজ্ঞী এ প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন, তখন ভীম সভাসদ্‌দিগকে স্বয়ম্বরের বিপুল আয়োজনের জন্য আদেশ দিলেন। অল্প ক্ষণের মধ্যেই রাজকুমারীর স্বয়ম্বরের কথা নগর মধ্যে ঘোষিত হইল। পুরবাসীদিগের আনন্দের সীমা রহিল না। স্বয়ম্বর-ব্যাপার বহু বর্ষের মধ্যে ক্বচিৎ কখনও সংঘটিত হয়, সুতরাং সাধারণ জনগণ উৎসুকচিত্তে স্বয়ম্বর দর্শনের প্রতীক্ষায় রহিলেন। ক্রমে কুণ্ডিননগরী স্বয়ম্বরাহূত রাজা ও রাজানুচরগণে পূর্ণ হইতে লাগিল। নগরীর অদূরবর্ত্তী প্রান্তরসমূহে সহস্র সহস্র শিবির সন্নিবেশিত হইল; অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহিত এবং সৈনিকগণের কোলাহলে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। গৃহে গৃহে পতাকা উড্ডীন এবং পথে পথে তোরণ সমূহ নির্ম্মিত হইল। বণিকগণ আপনাদিগের বিপণী নানা জাতীয় দ্রব্যসমূহে এবং দীপমালায় সজ্জিত করিল। ক্রমে সমস্ত নগরী যেন অপূর্ব্ব উৎসববেশে সুশোভিত হইল।

আজ স্বয়ম্বরের দিন। রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থিত পথে দুর্ভেদ্য জনতা। নিমন্ত্রিত রাজগণ হস্তী, অশ্ব এবং রথে আরোহণ করিয়া প্রাসাদাভিমুখে চলিয়াছেন। তাঁহাদিগের যান, বাহন এবং বেশভূষা নাগরিকদিগের আলোচনার বিষয় হইয়াছে। কাহার হস্তী সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, কাহার অশ্ব কিরূপ সুলক্ষণাক্রান্ত, কাহার উষ্ণীষ বা শিরস্ক কিরূপ মূল্যবান। এই লইয়া নাগরিকগণ তর্কবিতর্ক করিতেছেন। বাতায়ন-দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া পুরাঙ্গনাগণ পুষ্প বর্ষণ করিতেছেন। সেই সঙ্গে দুই এক জন পলিতদন্ত শুভ্রকেশ বিবাহার্থী রাজাকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদিগের রহস্যালাপ চলিয়াছে। প্রহরীগণ বেত্র হস্তে অতি কষ্টে শান্তি রক্ষা করিতেছে। প্রাসাদের সম্মুখস্থিত সমভূমিতে সভার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দারু ও প্রস্তরনির্ম্মিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তম্ভের উপর বিশাল চন্দ্রাতপ প্রসারিত হইয়াছে।

স্তম্ভগুলি নানা জাতীয় পত্র, পুষ্প ও মাল্যে সুশোভিত। স্বয়ম্বরের স্থানটীকে সমভাবে বিভক্ত করিয়া প্রশস্ত পথসমূহ চলিয়া গিয়াছে; পথ সুগন্ধ বারি-সিক্ত এবং ধূলিহীন। তাহার উভয় পার্শ্বে সুধারোহণ-যোগ্য মঞ্চের শ্রেণী। নিমন্ত্রিত রাজগণ তাহাতে বিচিত্র বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া উপবেশন করিয়াছেন। নানাজাতীয় পুষ্পের সৌরভে এবং ধূপগন্ধে সভাস্থল আমোদিত হইতেছে। সুবেশ, সুকুমারবয়স্ক কিন্নরগণ ময়ূরপুচ্ছনির্ম্মিত ব্যজন এবং চামর লইয়া মঞ্চস্থ রাজগণকে ব্যজন করিতেছে। প্রাসাদ দ্বার হইতে মঙ্গলবাদ্য শ্রুত হইতেছে। কতক্ষণে কন্যা স্বয়ম্বরসভায় আগমন করিবেন, এই জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন।

এদিকে অন্তঃপুরে দময়ন্তী স্বয়ম্বরযোগ্য বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া মাতার চরণে প্রণাম পূর্ব্বক সভাপ্রদর্শনকারিণী ধাত্রীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং এক পরম সুন্দর তরুণবয়স্ক সুবেশ পুরুষ অন্যের অলক্ষিতভাবে গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার রূপলাবণ্যে কক্ষ উজ্জ্বল হইল, বিস্মিতা দময়ন্তী ভাবিলেন, মনুষ্যদেহে এমন রূপ সম্ভব নয়। ইনি কোন দেবকুমার হইবেন। এই ভাবিয়া তিনি আগন্তুককে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিলেন। আগন্তুকও দময়ন্তীর রূপে মুগ্ধ হইয়া অনিমেষ নয়নে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। দময়ন্তী বলিলেন—

"আপনি কে? কন্যান্তঃপুরে অপরিচিত পুরুষের প্রবেশ নিষেধ ইহা কি আপনি অবগত নহেন?"

আগন্তুক বলিলেন—

"কল্যাণি! আমি দেবগণের আদেশ ক্রমে আপনার নিকট আসিয়াছি। দেবাদেশের কোন স্থানে গমনই দোষাবহ নয়। আমার বক্তব্য শেষ হইলেই আমি স্বস্থানে প্রস্থান করিব।"

দময়ন্তী। দেবগণের যদি আমার প্রতি কোন আদেশ থাকে, বলুন।

আগন্তুক। দেবরাজ ইন্দ্র, শনি, যম এবং বরুণ আপনার অনুপম রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া এই স্বয়ম্বরসভায় উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা আপনাকে জানাইয়াছেন যে, আপনি তাঁহাদিগের মধ্যে এক জনকে পতিরূপে বরণ করুন। কখনও কোন মানবী যে সুখ ও যে সৌভাগ্যের অধিকারিণী হন নাই, আপনি তাহা প্রাপ্ত হইবেন।

দময়ন্তী। দূত! দেবগণ আমার পূজনীয়। আমি উদ্দেশে তাঁহাদিগকে প্রণাম করি; সামান্যা মানবীর প্রতি অভিলাষ করিয়া তাঁহারা আপনাদিগের দেবত্বের অবমাননা করিতে চান কেন?

আগন্তুক। সুশীলে! দেবগণ চিরদিনই জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে গুণের পক্ষপাতী। এই জন্যই দেবরাজ অসুরদুহিতা শচীকে এবং অগ্নিদেব মাহিষ্মতীরাজদুহিতা স্বাহাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইচ্ছা করিলে আপনিও শচী ও স্বাহার ন্যায় দেবীপদবাচ্যা হইতে পারিবেন। কঠোর তপস্যাতেও যে স্বর্গলাভ দুর্লভ আপনি স্বেচ্ছায় তাহা ত্যাগ করিবেন না।

দময়ন্তী। দূত! অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। আপনি দেবগণকে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিবেন, আমি পূর্ব্বেই এক জনকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করিয়াছি। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্যই আমার স্বয়ম্বরসভায় গমন। দেব দানব যিনিই হউন, এক্ষণে অপর কাহাকেও বরণ করিলে আমি সতীধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইব। দেবগণ ধর্ম্মের রক্ষক; আমি যাহাতে আমার মানব-পতিকে প্রাপ্ত হইতে পারি, তাঁহারা আমায় এই আশীর্ব্বাদ করুন।

আগন্তুকের মুখ ম্লান হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজকুমারী আপনি যাঁহাকে মনে মনে বরণ করিয়াছেন, তিনি কে, তাহা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি?

দময়ন্তী। আপনি দেবদূত! আপনার নিকট মনের কথা বলিতে ক্ষতি নাই। নিষধ-দেশের অধীশ্বর নলকে আমি মনে মনে বরণ করিয়াছি।

আগন্তুকের মুখ হর্ষপ্রফুল্ল হইল। তিনি বলিলেন "কল্যাণি! আমি বিদায় লইলাম, আপনার অভিপ্রায় আমি দেবগণকে জানাইব। আমিই নল, দেবগণের অনুরোধে আমি এই দৌত্যকার্য্যে আসিয়াছিলাম।"

কথাশেষের সঙ্গে সঙ্গেই দেবদূত অদৃশ্য হইলেন; গৃহ তখন অকস্মাৎ অন্ধকারে আবৃত হইল। দময়ন্তী ভাবিলেন এ কি স্বপ্ন, না দেবমায়া? সত্যই ইনি যদি নল হন তবে ইহাঁকে বরণ করিয়া আমার জীবন সার্থক হইবে। এই সময় তাঁহার সখী আসিয়া বলিল, "রাজকুমারি! ধাত্রী বেত্রবতী আপনার জন্য বহির্দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে, চলুন। শুনিয়া দময়ন্তী ইষ্টদেবতার চরণে প্রণাম করিয়া স্বয়ম্বরসভার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দেখিতে দেখিতে শঙ্খনিঃস্বনে ও বামা-কণ্ঠ নিসৃত উলুধ্বনিতে রাজপুরী মুখরিত হইল। বাদ্যকরগণ বাদ্য করিতে এবং বৈতালিকগণ উচ্চৈস্বরে স্তুতি পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। শুভমুহূর্ত্তে দময়ন্তী স্বয়ম্বর-সভায় পদার্পণ করিলেন। ভারতের প্রধান প্রধান রাজা ও রাজপুরুষগণ সেই মহাসভায় আসীন; চতুর্দ্দিকে অসীম জনতা; সকলেরই দৃষ্টি তাঁহার উপর; দময়ন্তীর হৃদয় কম্পিত হইল, পদদ্বয় যেন বলহীন বোধ হইল। দময়ন্তী ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া ধীরপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সভামণ্ডপে প্রবেশের সঙ্গে সহস্র সহস্র নেত্র তাঁহার উপর পতিত হইয়াছিল। রাজগণ দেখিলেন, অগ্রে পশ্চাতে অস্ত্রধারী পুরুষগণ; মধ্যে উজ্জ্বলবেশধারিণী মাঙ্গলিক দ্রব্য হস্তে কিঙ্করীগণ, তাহাদের মধ্যে স্বয়ম্বরযোগ্য বেশভূষায় সজ্জিতা দময়ন্তী। তাঁহার পরিধানে বালারুণ বর্ণের বসন, ললাটে চন্দন রচনা, কর্ণে অলকে, পুষ্পদাম, করে পুষ্প-মাল্য। সর্ব্বাঙ্গ রত্নালঙ্কারে বিভূষিত। তাঁহার অঙ্গের জ্যোতিতে রত্নালঙ্কার মলিন দেখাইতেছে। দময়ন্তীকে দেখিয়া রাজগণ ভাবিলেন যে, এতদিন পরে, বিধাতার সর্ব্বোত্তম সৃষ্টি দর্শন করিলাম। সৌন্দর্য্যের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু যে সৌন্দর্য্য দৃষ্টি-পাত হইতে পদক্ষেপ পর্য্যন্ত শারীরিক প্রত্যেক চেষ্টায় প্রকাশিত হয়, তাহাই প্রকৃত সৌন্দর্য্য। রাজগণ দময়ন্তীর দেহে সেই সৌন্দর্য্য দর্শন করিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন,

না জানি কোন্ ভাগ্যবান পুরুষ এই অনুপম কন্যারত্ন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

যে স্থল হইতে সমস্ত সভামণ্ডপ দৃষ্টিগোচর হয়, দময়ন্তী তথায় উপস্থিত হইলে রাজপুরোহিত দময়ন্তীর নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বলিলেন; "বৎসে! তোমার পিতার আমন্ত্রণে ভারতের প্রধান প্রধান রাজগণ এই সভাস্থলে আগমন করিয়াছেন। এই বেণ, অঙ্গ, কলিঙ্গ, বিদেহ, কোশল, মগধ, কাশী, গান্ধার, অবন্তী, পাঞ্চাল, মদ্র, সুরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের অধিপতিগণ তোমার অনুপম রূপগুণের কথা শ্রবণ করিয়া তোমার পাণিপ্রার্থী হইয়া এখানে উপস্থিত আছেন। তোমার পিতার ইচ্ছা যে, তুমি ইঁহাদিগের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ কর। শিষ্য, সংযম ও ব্রতানুষ্ঠান-গুণে তুমি হিতাহিত পরিজ্ঞানে সমর্থা, সেই জন্যই তোমার পিতা তোমার উপর এই ভার দিয়াছেন। প্রবীণ রাজবৈতালিক তোমার নিকট সভাস্থ রাজগণের প্রত্যেকের পরিচয় দিবেন, শ্রবণ করিয়া এবং পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া তুমি তোমার উপযুক্ত ভর্ত্তা নির্ব্বাচন কর।"

রাজপুরোহিত এই বলিয়া নীরব হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকের জনকোলাহল ও বাদ্য স্তব্ধ হইল। দময়ন্তী ধাত্রীর সঙ্গে প্রথমে প্রাগ্‌জ্যোতিষপতির নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজবৈতালিক তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। বয়োধর্ম্মে তাহার মস্তকের কেশ শুভ্র এবং শরীরের চর্ম্ম শিথিল হইয়াছিল। তাহার পরিধান চম্পকপুষ্পবর্ণের বস্ত্র, অঙ্গে অশোকপুষ্পবর্ণের উত্তরীয়। ললাটে গোরোচনা ও চন্দনে অঙ্কিত ত্রিপুণ্ড্রক, শিরে বিশাল উষ্ণীষ এবং করে স্বর্ণময় দণ্ড। প্রত্যেক রাজবংশের বিবরণ ও কার্য্যকলাপ তাহার পরিচিত। বৈতালিক প্রাগ্‌জ্যোতিষপতিকে লক্ষ্য করিয়া দময়ন্তীকে বলিল, "রাজকুমারি! আপনার সম্মুখে এই যে ইন্দ্রতুল্য পুরুষ বিদ্যমান, ইঁহার নাম সোমদত্ত। ইনি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি। ইঁহার বাহুবলে পরাস্ত হইয়া দুর্দ্ধান্ত কিরাতগণ ইঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। ইঁহার মাতঙ্গগণ ঐরাবততুল্য বলশালী। আপনি যদি ইঁহাকে বরণ করেন, তাহা হইলে নগরপ্রবেশকালে কিরাতসুন্দরীগণ অপরূপ নৃত্যগীত করিয়া আপনার অভ্যর্থনা ও আনন্দ বর্দ্ধন করিবে; এবং ইঁহার গিরিশিখরস্থ প্রাসাদে আরোহণের সময় আপনি ঐরাবতারূঢ়া ইন্দ্রাণীর ন্যায় শোভা পাইবেন।"

শুনিয়া দময়ন্তী একবার উৎসুক নয়নে প্রাগ্‌জ্যোতিষপতিকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে নমস্কার করিয়া অন্যত্র গমনের জন্য ধাত্রীকে ইঙ্গিত করিলেন।

ধাত্রী তথা হইতে বিদেহাধিপতির নিকট উপস্থিত হইলে বৈতালিক বলিল; "রাজকুমারি! এই রাজমণ্ডলীর মধ্যে আকৃতিতে এবং প্রকৃতিতে যিনি ব্রাহ্মণতুল্য, সেই বিদেহাধিপতি রাজা তৃণধ্বজ আপনার পাণিপ্রার্থী হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। ইঁহার সভা বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণে নিরন্তর পূর্ণ থাকে এবং ইঁহার অগ্নিহোত্র গৃহের ধূম কখনও বিরল হয় না। প্রাচীন বয়সেও ইনি কঠোর ব্রতানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ নহেন। সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য বলিয়াই অপত্য সত্ত্বেও ইনি পুনর্ব্বার

দারপরিগ্রহে ইচ্ছুক হইয়াছেন প্রতিদিন সামগানে উদ্বোধিত হইয়া শয্যা ত্যাগ করিতে যদি আপনার বাসনা থাকে, তবে আপনি ইহাকে বরণ করুন। অগস্ত্যের পার্শ্বে লোপামুদ্রার ন্যায় আপনিও যজ্ঞস্থলে ইহার পার্শ্বে শোভা পাইবেন।"

দময়ন্তী বিদেহরাজকে দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিলেন এবং ধাত্রীকে বলিলেন; "বেত্রবতি, চল, আমরা অন্যত্র গমন করি।"

ধাত্রী তখন দময়ন্তীকে লইয়া মগধাধিপতি ঋতিমানের নিকট উপস্থিত হইল; অন্যান্য রাজগণ উৎসুকচিত্তে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। বৈতালিক বলিল, "আর্য্যে! পর্ব্বতের মধ্যে যেমন বিন্ধ্য, বৃক্ষের মধ্যে যেমন শাল, রাজগণের মধ্যেও তেমনই এই মগধাধিপতি ঋতিমান। ইহার দুঃসহ বীর্য্য ইহার আকৃতিতে প্রকাশিত। ইহার জঙ্ঘা বৃষের জঙ্ঘার ন্যায় স্থূল, ইহার বক্ষস্থল কবাটের ন্যায় প্রশস্ত, এবং ইহার বাহুযুগল অর্গলের ন্যায় দৃঢ়। ইহার বাহু দ্বারা নিষ্পিষ্ট হইয়া কত প্রসিদ্ধ মল্ল যে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। ইহার মন্ত্রীর নাম সুদক্ষ, তাঁহারই পরামর্শে ইনি দুষ্কর রাজকার্য্য করিতে সমর্থ হন। ইহার রাজধানী গিরিব্রজপুর বহুবার শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হইলেও কখনও পরহস্তগত হয় নাই। যদি আপনার বীরপত্নী নামে অভিহিতা হইবার বাসনা থাকে, তবে আপনি ইহাকে বরণ করুন।"

তখন দময়ন্তী মস্তক নত করিয়া ঋতিমানকে নমস্কার করিলেন। ধাত্রী তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া কোশলপতি মীনকেতুর নিকট উপস্থিত হইল। দময়ন্তী চারুবেশধারী মীনকেতুর আপাদমস্তক একবার দর্শন করিলেন। বৈতালিক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল;

"রাজনন্দিনি, ভগবতী ভাগীরথী যাঁহার রাজ্যের দক্ষিণসীমা নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং পুণ্যতোয়া সরযূ যাঁহার রাজ্যকে ফল-পুষ্পে সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছেন, ইনি সেই দক্ষিণ কোশলপতি মীনকেতু। ইহার সভা নর্ত্তকীগণের নূপুরশিঞ্জনে সর্ব্বদা ধ্বনিত। সরযূতীরে ইনি শীতকালে বাসের জন্য যে চতুঃশাল ভবন এবং ভাগীরথীতীরে গ্রীষ্মকালের জন্য যে উত্তুঙ্গ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন পৃথিবীতে তাহাদিগের তুলনা নাই। পত্নীগণের সহিত ইনি কখনও সরযূতীরস্থ উপবনে বিহার করেন, কখনও ভাগীরথীতে জলক্রীড়া করেন। পরিচারিকাগণ ইহার শয্যা সদ্যঃপ্রস্ফুটিত পুষ্পে সর্ব্বদা সজ্জিত রাখে, এবং ইহার প্রাসাদ হইতে নিঃসৃত কস্তুরী-গন্ধে ইহার নগর সর্ব্বদা আমোদিত হয়। ইহার সরযূতীরস্থিত উদ্যান শোভাসম্পদে নন্দন-কাননকেও পরাজিত করে। যদি আপনি ইহাকে বরণ করেন, তবে দেবেন্দ্রাণী শচীও যে উদ্যান লাভ করিতে কামনা করেন, আপনি তাহার অধীশ্বরী হইবেন।"

এই সময় দূর হইতে নলকে দেখিতে পাইয়া দময়ন্তী কোশলপতিকে নমস্কারপূর্ব্বক তদভিমুখে গমন করিতে উদ্যতা হইলেন। দেখিয়া ধাত্রী বলিল, "রাজকুমারি! আপনার বামে অপর এক রাজকুমার রহিয়াছেন,

ইহাকে অতিক্রম করিয়া গমন কর্ত্তব্য নয়।" শুনিয়া লজ্জিতা দময়ন্তী সেই রাজকুমারের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন বৈতালিক বলিল ;—

"রাজকুমারি! আপনার সম্মুখে এই মহারাষ্ট্রপতি রুক্মরথ বিরাজিত আছেন। ইঁহার রথ রুক্ম অর্থাৎ সুবর্ণে নির্ম্মিত বলিয়া ইনি এই অনন্যদুর্লভ উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার রাজ্য সাগরান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত সেই জন্য জলে এবং স্থলে যে সকল দুর্লভ রত্ন উৎপন্ন হয় তাহা সমস্তই ইহার অধিকৃত। আপনি একবার ইঁহার আপাদমস্তক দর্শন করুন। দেখুন ইঁহার উষ্ণীষের হীরক শুক্রগ্রহের ন্যায় অপূর্ব্ব জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে, ইঁহার কণ্ঠের মরকতমালা যেন বসন্তকালীন লতার ন্যায় শোভা পাইতেছে। ইহার বাহুতে পদ্মরাগখচিত অঙ্গদ, করে সুবর্ণময় বলয় এবং কর্ণে মুক্তাখচিত কুণ্ডল। আপনি যদি ইঁহাকে বরণ করেন, তাহা হইলে ইনি ইঁহার ভাণ্ডারের সর্ব্বোত্তম রত্নসমূহ আপনাকে প্রদান করিবেন। সেই সকল রত্ন পরিধান করিলে পৃথিবীর রাজেন্দ্রাণীগণের কথা দূরে থাকুক, যক্ষরাজ কুবেরের মহিষীও আপনাকে অধিকতর সৌভাগ্যবতী বলিয়া ঈর্ষা করিবেন।"

বৈতালিকের কথা শ্রবণে দময়ন্তীর মুখ ঈষদ্ধাস্যে সমুজ্জ্বল হইল। তিনি ধাত্রীকে বলিলেন, "বেত্রবতি! চল আমরা সভামণ্ডপের উত্তর দিকে গমন করি।" ধাত্রী "তাহাই হউক" বলিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইল।

এইবার দময়ন্তী নলের সম্মুখে আসিলেন, তাঁহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইল ইচ্ছা হইল যে একবার ভাল করিয়া নলকে দেখিয়া লইবেন, কিন্তু লজ্জা আসিয়া তাঁহার চক্ষু অবরোধ করিল। তথাপি ঈষদ্দৃষ্টিতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, অল্পক্ষণ পূর্ব্বে যিনি দেবদূতরূপে তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ইনি তিনিই বটেন, কিন্তু স্বয়ম্বরবেশে তাঁহাকে আরও অধিক মনোহর দেখাইতেছিল। ইঙ্গিতজ্ঞ বৈতালিক একবার দময়ন্তীর মুখ লক্ষ্য করিল এবং করিয়া বলিল ;—

"রাজকুমারি! এই যে পাণ্ডীর্য্যমুখের চক্রবর্ত্তীলক্ষণোপেত পুরুষ আপনার সম্মুখে আসীন রহিয়াছেন, ইনিই বিশ্রুতকীর্ত্তি নিষধাধিপতি নল। বিধাতা একাধারে সকল গুণের সামঞ্জস্য দেখাইবার জন্যই ইঁহাকে সৃজন করিয়াছেন। পৃথিবীতে উত্তম, অধম এমন কোন কার্য্য নাই, যাহা ইহার অপরিচিত। বেদ, বেদাঙ্গে ইহার যেমন অসামান্য অধিকার, অশ্বচালনায় এবং রন্ধনকার্য্যেও ইহার তেমনি দক্ষতা। ইহার রূপ, যৌবন কামিনীজনের লোভনীয় হইলেও ইনি জিতেন্দ্রিয় এবং প্রতিবিধানে সক্ষম হইলেও ইনি শত্রুগণের প্রতি ক্ষমাশীল। ইহার বাহুবল এবং ইহার সদাচরণ দুই সমভাবে শত্রু জয় করিয়া থাকে। নিজের প্রাণ সংশয় করিয়াও ইনি বিপন্নকে উদ্ধার করেন, এবং সত্যের অনুরোধে নিজের অপ্রীতিকর কার্য্য করিতেও ইনি পরাঙ্মুখ নহেন। রূপে, গুণে, এবং শীলে সর্ব্বাংশে ইনি আপনার উপযুক্ত ; যদি ইচ্ছা হয় ইহাকে বরণ করিয়া আপনি আত্মগুণানুরূপ পতি লাভ করুন।"

দময়ন্তী বৈতালিকের কথা শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন দৃষ্টিতে নলকে দর্শন করিলেন। তাঁহার

কণ্ঠে মাল্যপ্রদানের জন্য তাঁহার হস্ত ঈষৎ উত্তোলিত হইল। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহার মুখ শুষ্ক হইয়া আসিল, তাঁহার বক্ষস্থল স্পন্দিত এবং পদযুগল কম্পিত হইতে লাগিল; তাঁহার ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বেদ দেখা দিল। তিনি মুহূর্ত্তের জন্য নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। ধাত্রী ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল "রাজকুমারি! আপনার এরূপ ভাববৈলক্ষণ্যের কারণ কি?" দময়ন্তী কোন উত্তর না দিয়া কেবল মঞ্চের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন, কিন্তু ধাত্রী কিছুই দেখিতে পাইল না। দময়ন্তী দেখিতেছিলেন যে, যে মঞ্চের উপর নল আসীন ছিলেন তাহার উপর অবিকল তাঁহারই ন্যায় আরও চার জন পুরুষ উপবিষ্ট আছেন। রূপে, বয়সে, বেশভূষায় তাঁহাদিগের পাঁচ জনের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। ইঁহাদিগের মধ্যে কে প্রকৃত নল, তিনি কাহাকে মালা দান করিবেন এইরূপ চিন্তায় দময়ন্তী ব্যাকুল হইলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল যে, দূত বলিয়াছিলেন দেবগণ আমার পাণিপ্রার্থী হইয়া সভায় আগমন করিয়াছেন, তবে কি আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ইহা তাঁহাদিগেরই ছলনা। দময়ন্তী কাতর হৃদয়ে মনে মনে বলিলেন, "দেবগণ; আপনারা ধর্ম্মের রক্ষক, নারীর পক্ষে সতীধর্ম্মের অপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম্ম আর নাই; আমার সতীধর্ম্ম যাহাতে অব্যাহত থাকে, আপনারা তাহা করুন।" নিমেষপাত না হইতে হইতে দময়ন্তী দেখিলেন যে মঞ্চস্থিত পাঁচজন নলের মধ্যে চার জনের আকারেঙ্গিতে অপরের হইতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। তাঁহারা নিমেষশূন্য, স্বেদহীন এবং মঞ্চের উপর উপবিষ্ট হইলেও ভূমি স্পর্শ করেন নাই। দেখিবামাত্র তিনি বুঝিলেন যে, ইহারা চারিজন দেবতা, অপর পুরুষই প্রকৃত নল। তখন তিনি প্রফুল্ল চিত্তে নলকে স্বয়ম্বরমাল্য প্রদান করিলেন এবং দাসীর হস্ত হইতে চন্দন ও অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার ললাটে চন্দনবিন্দু ও পদে অর্ঘ্যদান পূর্ব্বক নমস্কার করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সখীগণের উলুধ্বনিতে ও শঙ্খনিঃস্বনে সভামণ্ডপ পূর্ণ হইল। আবার দ্বিগুণিত রবে মুরজ মন্দিরা এবং বীণারবনি আরম্ভ হইল এবং বন্দিগণ তারস্বরে 'জয়জীব' উচ্চারণ করিতে লাগিল। সমবেত জনতাও মহোৎসাহে এই মঙ্গলবারতা ঘোষণা করিল। দেখিতে দেখিতে সমগ্র কুণ্ডিনপুরীতে এই আনন্দ সংবাদ প্রচারিত হইল। সকলেই একবাক্যে বলিলেন, রাজকুমারী যুক্ত পাত্রেই মাল্য দান করিয়াছেন। যথা কালে নল ও দময়ন্তীর বিবাহ সম্পন্ন হইল। নিমন্ত্রিত রাজগণ বিদর্ভরাজ কর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া, কোনরূপে মনোদুঃখ নিবারণ পূর্ব্বক, স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণও দম্পতীকে শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া স্বর্গপুরীতে প্রস্থান করিলেন।

বিবাহান্তে নল এবং দময়ন্তী নিষধরাজ্যে আগমন করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই দময়ন্তী প্রজা ও আশ্রিত জনের মাতৃস্থানীয়া হইলেন। ধার্ম্মিক দম্পতীর জীবন যে ভাবে অতিবাহিত হওয়া সঙ্গত, তাঁহাদিগের জীবন সেই ভাবে অতিবাহিত হইতে লাগিল। সঙ্গে এবং ব্রতাচরণে দময়ন্তী পতির সঙ্গিনী

হইলেন। বিবাহের যাহা উদ্দেশ্য তাহাও সফল হইল, যথাকালে তাঁহারা একটী পুত্র ও একটী কন্যা লাভ করিলেন। পুত্রের নাম হইল ইন্দ্রসেন, কন্যার নাম হইল ইন্দ্রসেনা। উভয়ে রূপে, গুণে পিতা মাতার অনুরূপ হইল।

কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ পৃথিবীতে কে কবে ভোগ করিয়াছেন অথবা নিরবচ্ছিন্ন সুখে কোথায় মনুষ্যত্বের পরীক্ষা হইয়াছে? সুবর্ণের পরীক্ষা অনলে, মনুষ্যত্বের পরীক্ষা দুঃখে। দময়ন্তীর জীবনে কয়েক বৎসরের মধ্যে এক মহা পরীক্ষা আরম্ভ হইল। সে পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই পৃথিবীর সতীশিরোমণিদিগের মধ্যে তাঁহার স্থান হইয়াছে। বিনা পরীক্ষায় নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ করিয়া যাইলে কে তাঁহার কথা স্মরণ করিত?

নলের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল, তাহার নাম পুষ্কর। নল যেমন ধার্ম্মিক, সদাশয় এবং জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, পুষ্কর ঠিক তাহার বিপরীত ছিল। নলের রাজ্য এবং ঐশ্বর্য্যের প্রতি এই পাপাত্মার দৃষ্টি ছিল, বিবাহের পর সাধ্বী দময়ন্তীরও উপর তাহার পাপ দৃষ্টি পতিত হইল। কিন্তু বলে নলের সম্পত্তি বা দময়ন্তীকে গ্রহণ সম্ভবপর নয় ভাবিয়া দুরাত্মা এক কৌশল অবলম্বন করিল। পুষ্কর অক্ষক্রীড়ায় নলের অপেক্ষা অধিক পারদর্শী ছিল; ভাবিল অক্ষক্রীড়ায় নলকে পরাজিত করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিবে। তখনকার ক্ষত্রিয়রাজাদিগের মধ্যে এই সংস্কার ছিল যে, যুদ্ধে বা অক্ষক্রীড়ায় আহূত হইলে পরাঙ্মুখ হইতে নাই। যিনি কখন পরাঙ্মুখ হইতেন, তিনি কাপুরুষ বলিয়া নিন্দনীয় হইতেন। অন্য সহস্রগুণ সত্ত্বেও নলের এই তৎকালপ্রচলিত অক্ষাসক্তি-দোষ ছিল। পুষ্কর নলকে অক্ষ-ক্রীড়ার আহ্বান করিলেন, নল প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। দিনের পর দিন ক্রীড়া চলিতে লাগিল। নল অবিচ্ছেদে পরাজিত হইতে লাগিলেন এবং যতই পরাজিত হইতে লাগিলেন, তাঁহার অক্ষাসক্তিও ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ভাণ্ডারের মণিমুক্তা হইতে অশ্ব-হস্তী, প্রাসাদ-উপবন পর্য্যন্ত পণ রাখিয়া নল ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। দিন নাই, রাত্রি নাই, নল কেবলই ক্রীড়ায় আসক্ত; বৃদ্ধ মন্ত্রী রাজকার্য্যের জন্য তাঁহার দর্শন পান না, দময়ন্তী একাকিনী শয়নগৃহে রাত্রি যাপন করেন, নল সকল দিন অন্তঃপুরে আসেন না। প্রজাগণের মধ্যে হাহাকার উঠিল, তাহারা বলিতে আরম্ভ করিল, মহারাজাকে কলি আশ্রয় করিয়াছে, নচেৎ তাঁহার এরূপ বুদ্ধিভ্রংশ হইবে কেন? অবশেষে একদিন প্রজাগণ মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া দময়ন্তীর নিকট আসিয়া বলিল "মা! রাজ্য যে যায়, আপনি মহারাজকে না বুঝাইলে কিছুই থাকিবে না।" দময়ন্তী নলের দেখা পান না, কেমন করিয়া বুঝাইবেন। এক দিন তাঁহার দেখা পাইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে সকল কথা বলিলেন এবং অবশেষে তাঁহার পদতলে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হইল না। নল কিয়ৎক্ষণ উদাস ভাবে দময়ন্তীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বিনা বাক্যব্যয়ে অক্ষশালায় গিয়া পুষ্করের সহিত ক্রীড়ায়

প্রবৃত্ত হইলেন। দময়ন্তীর প্রাণে দারুণ বেদনা লাগিল। তিনি যুক্তকরে দেবতাগণের নিকট পতিকে সুমতি দিবার প্রার্থনা করিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, নলের যেরূপ দ্যূতাসক্তি জন্মিয়াছে, তাহাতে কিছুই রক্ষা পাইবে না। পতির দুঃখের অংশভাগিনী হইবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। কিন্তু শিশু ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনা সে দুঃখ সহিতে পারিবে না বলিয়া তিনি তাহাদিগকে নিজের পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন।

এদিকে নল আপনার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিলেন। রাজ্য, ধন যাহা কিছু ছিল, সমস্ত শেষ হইলে নিজের পরিচ্ছদ, ধনু ও অস্ত্র পর্য্যন্ত পণে হারিলেন। পুষ্করের ইচ্ছা ছিল যে, নল নিষধকে ও দময়ন্তীকে পণ রাখিবেন। কিন্তু নল তাহা করিলেন না। দেখিয়া দুরাত্মা নলকে বলিল "নির্ব্বোধ! তুমি আর এখানে কেন? তোমার যাহা কিছু ছিল, সমস্তই ত হারাইয়াছ, এখন এ রাজ্য আমার, তুমি এখান হইতে প্রস্থান কর।" নল আর দ্বিরুক্তি করিলেন না; তৎক্ষণাৎ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিলেন। পতিগতপ্রাণা দময়ন্তীও প্রস্তুত হইয়া ছিলেন, শুনিবামাত্র এক বসনে তিনিও স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইলেন। রাজা ও রাণীকে তাদৃশ অবস্থায় গৃহত্যাগ করিতে দেখিয়া নগরে আর্ত্তনাদ উঠিল। কিন্তু দুরাত্মা পুষ্কর ঘোষণা করিয়া দিয়াছিল যে, যে কেহ নল ও দময়ন্তীকে কোনরূপ সাহায্য করিবে, সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। সুতরাং প্রজাহিতৈষী নল কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিলেন না। নগর ত্যাগ করিয়া তাঁহারা ক্রমে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। মস্তকের উপর নিদাঘসূর্য্য প্রখর কিরণ বর্ষণ করিতেছিলেন, পথ কুশসূচীতে ও কণ্টকে দুর্গম। তথাপি উভয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নলের হৃদয় যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতেছিল; তিনি ভাবিতেছিলেন, আমিই পতিপ্রাণা দময়ন্তীর এই কষ্টের কারণ। কিন্তু দময়ন্তীর মুখে বিষাদের চিহ্নমাত্র ছিল না। পাছে তাঁহাকে কাতরা দেখিলে নল লজ্জিত ও ব্যথিত হন, এই ভয়ে তিনি যথাসাধ্য নিজের ক্লেশ গোপন রাখিতেছিলেন। তিনি কখনও অরণ্যজাত বৃক্ষলতাদির পরিচয় জিজ্ঞাসায়, কখনও নিষধনগরী বা বিদর্ভ দেশ সেখান হইতে কতদূর এইরূপ প্রশ্নে নলকে অন্যমনা করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন। কিন্তু নলের পক্ষে পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হইবার সম্ভাবনা ছিল না; তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন, "প্রিয়ে! আমিই তোমার সকল কষ্টের কারণ। যদি তুমি আমার ন্যায় দুর্ম্মতিকে বরণ না করিতে তাহা হইলে তোমাকে আজ এ ক্লেশ ভোগ করিতে হইত না!"

দময়ন্তী বলিলেন, "নাথ! পত্নী কি পতির কেবল সুখের অংশভাগিনী, দুঃখের অংশভাগিনী নয়? আপনিই ত আমাকে অশ্বমেধযজ্ঞে সহধর্ম্মিণীর আসন দান করিয়া অক্ষয় গৌরবের অধিকারিণী করিয়াছেন, তবে আজ এই অরণ্যবাসে আমার পক্ষে কাতরা হওয়া কি কর্ত্তব্য? আপনার সঙ্গে এই অরণ্যবাস আমার পক্ষে স্বর্গবাসের তুল্য; পাছে আপনার ক্লেশ হয়, আমার কেবল সেই মাত্র চিন্তা।"

নল ও দময়ন্তী এক এক মাত্র বসন অবলম্বনে অরণ্যে আসিয়াছিলেন। এক দিন কতকগুলি সুবর্ণপক্ষ বিহঙ্গম ধৃত করিতে গিয়া নল আপনার বসনখানি হারাইলেন। তখন উভয়ে অবশিষ্ট বসনখানি অর্দ্ধার্দ্ধ অংশে পরিধান করিয়া অতি কষ্টে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বনের কটুতিক্ত ফলমূল আহার, বৃক্ষতলে বা গিরিগুহায় শয়ন এবং বিষাক্ত কীটপতঙ্গের দংশন উভয়ের শরীরকে ক্রমে কঙ্কালাবশেষ করিয়া তুলিল। দুঃশ্চিন্তায় নলের নিদ্রা আসিত না: দময়ন্তী যখন নিদ্রিতা হইতেন, নল তখন কেবল ভাবিতেন, "হায়! কতদিন আর এরূপে অতিবাহিত হইবে, কেমন করিয়া এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব? কি ছিল আর এ কি হইল?" কখনও তিনি মনে করিতেন, পুষ্কর আমায় অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত করিয়া আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে, যদি আমি অক্ষক্রীড়ায় তাহাকে কখন পরাস্ত করিতে পারি, তবেই আমার সকল ক্ষোভ দূর হয়। কিন্তু সে আমার অপেক্ষা ক্রীড়ায় নিপুণ, তাহাকে পরাস্ত করিবার মত বিদ্যা আমি কোথায় পাইব! শুনিয়াছি, অযোধ্যাধিপতিরাজা ঋতুপর্ণ অক্ষক্রীড়ায় পৃথিবীতে অদ্বিতীয়! কিন্তু তিনি কি আমাকে তাঁহার বিদ্যা দিতে সম্মত হইবেন? বোধ হয় না। আমি ক্ষত্রিয় জানিলে তাঁহার আশঙ্কা হইবে, যদি আমি কোন দিন তাঁহাকে ক্রীড়ায় আহ্বান করি, তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না। নল শেষে ভাবিলেন আমি ছদ্মবেশে রাজা ঋতুপর্ণের নিকট যাইব। পরিচর্য্যা দ্বারা প্রীত করিয়া হউক, বা আমার অধিকৃত কোন দুর্লভ বিদ্যা তাঁহাকে প্রদান করিয়া হউক, আমি তাঁহার নিকট অক্ষবিদ্যা শিক্ষা করিব। তাহা হইলে পুষ্করকে পরাজয় করিয়া পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ আমার পক্ষে দুরূহ হইবে না।" এইরূপ সঙ্কল্প নলের নিকট বড়ই উপযোগী বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিতে লাগিলেন, এ অবস্থায়, এই অর্দ্ধার্দ্ধ বসন পরিধান করিয়া দময়ন্তীকে সঙ্গে লইয়া কিরূপে ঋতুপর্ণের নিকটে যাইব? তাঁহার হৃদয় নিরাশায় কাতর হইল। আবার ভাবিলেন ইহার একটী সদুপায় আছে, দময়ন্তী যদি কিয়ৎকালের জন্য পিতৃগৃহে গিয়া অবস্থিতি করেন, তবে আমি সেই সময়ের মধ্যে অযোধ্যায় গিয়া অক্ষবিদ্যা শিখিয়া আসিতে পারি। কিন্তু দময়ন্তী কি আমাকে ছাড়িয়া একাকিনী পিতৃগৃহে যাইতে সম্মতা হইবেন? কখনই নয়; তবে উপায় কি? নল আর ভাবিতে পারিলেন না। অবসন্ন হইয়া শয়ন করিলেন।

এইরূপে দিন গত হইতে লাগিল। এক দিন নল দময়ন্তীকে বলিলেন, "প্রিয়ে! তুমি কিছুদিনের জন্য বিদর্ভে গিয়া থাক; আমি একটু চেষ্টা করিয়া দেখি, যদি কোনরূপে এ বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারি।"

দময়ন্তী বলিলেন, "নাথ! প্রাণ থাকিতে আমি তোমায় ছাড়িয়া যাইতে পারিব না। আমি পিতৃগৃহে গিয়া সুখে থাকিব, আর তুমি বনে বনে এই অবস্থায় কাটাইবে, ইহা কখনই আমার প্রাণে সহিবে না। চল উভয়ে বিদর্ভে যাই, পিতা তোমায় ইষ্টদেবতার ন্যায় সমাদরে রাখিবেন।"

নল। প্রিয়ে! আমি জানি যে তোমার পিতা মাতা আমায় অনাদর করিবেন না। কিন্তু আমি কেমন করিয়া তাঁহাদিগের নিকট মুখ দেখাইব? তোমার স্বয়ম্বর-কালে আমি চতুরঙ্গিণী বাহিনী লইয়া বিদর্ভে গিয়াছিলাম, এখন এ বেশে কেমন করিয়া যাইব? দরিদ্রাবস্থায় কুটুম্ব-গৃহে গমন অপেক্ষা মৃত্যু বরং শ্রেয়স্কর।

দময়ন্তী আর কিছু বলিলেন না। নল বুঝিলেন যে দময়ন্তী স্বেচ্ছায় তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবেন না। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, কিছু দিনের জন্য পৃথক না থাকিলে উদ্ধারের উপায় নাই, সুতরাং হৃদয় বিদীর্ণ হইলেও, উভয়কে সে ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু পতিগতজীবনা দময়ন্তীকে কোন্ প্রাণে তিনি একাকিনী সেই অরণ্যে ছাড়িয়া যাইবেন? কে তাঁহাকে হিংস্র পশুদিগের মুখ হইতে এবং হিংস্র পশুদিগের অধম দুরাচারদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবে? আবার তাঁহার মনে হইল ধর্ম্মই সতীকে রক্ষা করেন। কত নবীন ব্রহ্মচারিণী একাকিনী তীর্থ পর্য্যটন করিতেছেন, বিজনে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া তপশ্চর্য্যা করিতেছেন, কে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেছে? মনে দৃঢ় সঙ্কল্প জন্মিলে তাহার পরিপোষক যুক্তির অভাব হয় না। নল শেষে স্থির করিলেন যে, যখন উপায়ান্তর নাই, তখন দময়ন্তী নিদ্রিতা হইলে তিনি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন। দময়ন্তী যেরূপ বুদ্ধিমতী ও সাধুশীলা তাহাতে কোন্ না কোন্ উপায়ে তিনি পিতৃগৃহে পঁহুছিবেন। পরে উপযুক্ত সময়ে তিনি তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবেন, আর যদি বিধাতা প্রসন্ন না হন, তবে তাঁহার নিজের অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা হইবে; দময়ন্তী পিতৃগৃহে পুত্র, কন্যা দুইটীকে লইয়া কোনরূপে জীবন যাপন করিবেন। এই ভাবিয়া তিনি এক দিন দময়ন্তীকে বলিলেন;—

"প্রিয়ে! এই অরণ্যের উত্তর দিক্ দিয়া যে পথ পূর্ব্বমুখে গিয়াছে, তাহা দ্বারা অনায়াসে বিদর্ভে যাইতে পারা যায়। বণিক ও তীর্থযাত্রিগণ সর্ব্বদা সেই পথ দিয়া যাতায়াত করে; যদি কোন দিন তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি তাহাদিগের সঙ্গে অনায়াসে এই পথ দিয়া পিতৃগৃহে যাইতে পারিবে।"

নলের এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য কি, দময়ন্তী তাহা বুঝিতে পারিলেন, বলিলেন;—

"নাথ! তোমার কথায় আমার হৃদকম্প হইতেছে, তুমি কি আমায় পরিত্যাগ করিতে চাও? আমি তোমার চরণে কি অপরাধ করিয়াছি, কোন্ দোষে তুমি আমায় ত্যাগ করিবে?"

নল নিরুত্তর রহিলেন। কিন্তু দময়ন্তী চিন্তায় অস্থির হইলেন। স্বামীর সহিত তিনি এক বসন পরিধান করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার মন প্রবোধ মানিত না। রাত্রিকালে নলকে বাহু দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া তিনি নিদ্রা যাইতেন; এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইল।

একদিন পরিশ্রান্তা দময়ন্তী নলের পূর্ব্বেই নিদ্রাগতা হইলেন। তাঁহার বাহুদ্বয় শ্লথ হইয়া পড়িল, নল উপযুক্ত সময় বুঝিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। পরিধেয় বসনখানি

ছিন্ন করিয়া প্রস্থানের জন্য উদ্যত হইলেন। কিন্তু দময়ন্তীর ন্যায় পত্নীকে কোন্ পতি চক্ষুর জল না ফেলিয়া ত্যাগ করিতে পারে? নল নিদ্রিতা দময়ন্তীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অনিমেষ নয়নে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। পত্রের অন্তরাল দিয়া জ্যোৎস্নালোক দময়ন্তীর মুখে পড়িয়াছিল। বনবাস-ক্লেশে সে মুখ মলিন ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, তথাপি নলের বোধ হইল, পৃথিবীতে তাহার তুলনা নাই। দময়ন্তী তৃণশয্যার উপর শয়ন করিয়াছিলেন, নলের মনে হইল সেখানে যেন কেহ চম্পক-পুষ্প রাশীকৃত করিয়া রাখিয়াছে। তিনি যতই দেখেন, ততই তাঁহার আরও দেখিতে ইচ্ছা হয়। একবার ভাবিলেন, দময়ন্তীকে বক্ষে ধারণ করিয়া শেষ বিদায় গ্রহণ করিবেন, কিন্তু তাহা হইলে দময়ন্তী যে জাগিয়া উঠিবেন, পারিলেন না। শেষে নীরবে অশ্রুমোচন করিতে করিতে বিদায় লইলেন, কিন্তু পদ যেন শৃঙ্খলাবদ্ধ বোধ হইল। কিয়দ্দূর গমন করিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন, আবার নির্নিমেষ নয়নে দময়ন্তীকে দেখিলেন, আবার চলিলেন। এইরূপ দুই বার, তিন বার যাইলেন, আবার ফিরিলেন। শেষে ভাবিলেন, এইবার শেষ-দেখা দেখিয়া আসিব। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, দময়ন্তী তখনও গভীর নিদ্রায় অভিভূতা; কিন্তু তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিতেছে; জ্যোৎস্নালোকে সেই অশ্রুরেখা তরল সুবর্ণের ন্যায় দেখাইতেছে। নল আর দাঁড়াইতে পারিলেন না; নিদ্রিতা পত্নীর পার্শ্বে নতজানু হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "অন্তর্যামিন! তুমি সাক্ষী, আমি নিজের সুখের জন্য দময়ন্তীকে ত্যাগ করিতেছি না। যদি কোন দিন দময়ন্তীকে আবার নিষধের সিংহাসনে বসাইতে পারি তবেই ফিরিব, নতুবা এই শেষ বিদায়। তুমি সাধুর আশ্রয়; সতীর গতি; তুমি দময়ন্তীকে রক্ষা করিও।" নল এই বলিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং দময়ন্তীর দিকে আর দৃষ্টিপাত না করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

রাত্রিশেষের সঙ্গেই দময়ন্তীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন, নল পার্শ্বে নাই, তাঁহার বসন ছিন্ন, তিনি চমকিয়া উঠিলেন, ভাবিলেন এত দিন যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, আজ তাহা সত্যই ঘটিল। পতির এইরূপ ব্যবহারে সতীর হৃদয়ে লেশমাত্র বিরাগ বা অভিমান জন্মিল না, তিনি কেবলই ভাবিতে লাগিলেন, "দোষ আমারই; কেন আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম? নিদ্রা না যাইলে ত তিনি আমায় ছাড়িয়া যাইতে পারিতেন না।" কতবার তাঁহার মনে হইল নল হয় ত কৌতুক-ছলে কোথাও লুকাইয়া আছেন, এখনই আসিবেন; আবার ভাবিলেন, এখনও তিনি অধিক দূর যাইতে পারেন নাই; অনুসরণ করিলেই তাঁহার দেখা পাইব। এই ভাবিয়া দময়ন্তী নলের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু সেই দূরব্যাপী অরণ্যে সহসা কোথায় তাঁহার দেখা পাইবেন? তখন দময়ন্তী উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। কখনও পর্ব্বত-শিখরে উঠিয়া চারিদিক দর্শন করেন, আর চীৎকার করিয়া বলেন, "প্রভো! তুমি কোথায় একবার দেখা দাও।" কখনও

গিরিস্রোতের বালুকায় পদচিহ্ন দেখিয়া নল সেই দিকে দিয়া গিয়াছেন ভাবিয়া তাহার অনুধাবন করেন। কখনও উন্মাদিনীর ন্যায় পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা যাহাকে দেখেন নলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন। এইরূপে তিন দিন অতীত হইল, দময়ন্তীর আহার নাই, নিদ্রা নাই, কেবলই ছুটিতেছেন; শরীর আর সহ্য করিতে পারে না। এই অবস্থায় তিনি এক দিন এক প্রকাণ্ড অজগরের মুখে পতিত হইলেন। দময়ন্তীর শরীর অবসন্নপ্রায়, তথাপি প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিলেন, কিন্তু সর্প আপনার বিপুল দেহ লইয়াও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। দময়ন্তী শেষে পারিলেন না, ভূতলে পতিত হইলেন। আর রক্ষা নাই; মৃত্যু আসন্ন; সর্প একেবারে দময়ন্তীর উপর আসিয়া পড়িল। তিনি অঙ্গে তাহার শীতল স্পর্শ ও গুরু-ভার অনুভব করিলেন, তাহার মুখ হইতে গলিত ফেন তাঁহার অনাবৃত পৃষ্ঠে পড়িল ইহা বুঝিলেন; কিন্তু পরক্ষণে তাঁহার গ্রীবা সর্পের গ্রাসবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মনে হইল সর্প নিশ্চেষ্ট হইয়াছে। কৌতূহলী হইয়া তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, একটী সুতীক্ষ্ণ শরে সর্পের মস্তক বিদীর্ণ হইয়াছে, সর্প মৃত্যু-যন্ত্রণায় লাঙ্গুল দ্বারা সবলে ভূমিতে আঘাত করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখিলেন ধনুর্ব্বাণ হস্তে এক ব্যাধ বৃক্ষান্তরাল হইতে তাঁহার দিকে আসিতেছে। তখন দময়ন্তী আপনার বিপন্মুক্তির কারণ বুঝিতে পারিলেন এবং প্রাণদাতার নিকট কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের জন্য ধাবমান হইলেন। ব্যাধ নিকটে আসিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে দময়ন্তী বলিলেন; "আমি বিপদে পড়িয়া আমার স্বামীর সহিত এই বনে আসিয়াছিলাম। আমার স্বামী হঠাৎ কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে আমি এই সর্পগ্রাসে পড়িয়াছিলাম। আপনি দয়া করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, বিধাতা আপনার মঙ্গল করুন।"

দময়ন্তী এক বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, এক্ষণে আর এক বিপদে পড়িলেন। দুরাত্মা ব্যাধ দময়ন্তীকে দেখিয়া তাঁহার রূপে মোহিত হইয়াছিল; কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর বলিল; "সুন্দরি! তুমি আমার ঘরে চল, আমার ঘরণী হইয়া পরম সুখে থাকিবে।"

দময়ন্তী তাহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া বলিলেন, "নিষাদ! তুমি আমার প্রাণদাতা; আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞ; এমন কথা বলিও না যাহাতে তোমার উপর আমার অশ্রদ্ধা জন্মে। তুমি যাও, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন।"

ব্যাধ তখন তাঁহাকে কখনও মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা দিয়া কখনও বা ভীতি প্রদর্শন করিয়া নিজের পাপাভিলাষে সম্মত করাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু দময়ন্তী ঘৃণার সহিত তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখন পাপিষ্ঠ তাঁহার উপর বল প্রকাশের সঙ্কল্প করিল। তাঁহাকে ধরিবার জন্য দুই বাহু প্রসারিত করিয়া ধাবিত হইল। দময়ন্তী দেখিলেন মহা বিপদ, তিনি বিদ্যুৎবেগে তাহার নিকট হইতে সরিয়া যাইলেন, দেখিয়া ব্যাধও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

তখন তিনি যুক্ত করে কাতর ভাবে বলিলেন, "নারায়ণ! আমি অবলা, আমায় রক্ষা কর।"

বিধাতার লীলা কে বুঝিতে পারে? পূর্ব্ব হইতেই আকাশে মেঘ সঞ্চিত ছিল. অকস্মাৎ বিদ্যুদালোকে সমস্ত বনভূমি আলোকিত হইল, এবং প্রচণ্ড শব্দে দশদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া সমীপস্থ একটী উচ্চবৃক্ষের উপর অশনিপাত হইল। দময়ন্তী ও ব্যাধ উভয়েই ভয়ে অচেতন হইলেন, মুহূর্ত্ত পরে দময়ন্তী চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন, ব্যাধ গতাসু ও নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

নল পূর্ব্বে বিদর্ভগমনের জন্য যে পথের কথা বলিয়াছিলেন, দময়ন্তী এক্ষণে সেই পথ প্রাপ্ত হইলেন; দেখিলেন যে কতকগুলি বণিক আপনাদিগের পণ্যদ্রব্য অশ্ব, হস্তী ও বৃষভের উপর দিয়া সেই পথে গমন করিতেছে। দময়ন্তী তাহাদিগের অনুগমন করিতে লাগিলেন এবং সায়ংকালে তাহারা এক পার্ব্বত্য হ্রদের তটে বিশ্রামার্থ শিবির সন্নিবেশ করিলে তিনিও তথায় অবস্থিতি করিলেন। মধ্য রাত্রিতে কতকগুলি বন্যগজ জলপানার্থ সেই হ্রদে আসিয়া গ্রাম্যগজ দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তখন অতি দারুণ ব্যাপার ঘটিল। বণিকগণ নিঃশঙ্কচিত্তে হ্রদের তটে অবস্থিতি করিতেছিল। আক্রমণকারী বন্যগজ এবং পলায়নোদ্যত গ্রাম্যগজদিগের দ্বারা আহত ও মর্দ্দিত হইয়া অনেকেই প্রাণ ত্যাগ করিল। দময়ন্তী অতি কষ্টে রক্ষা পাইলেন, কিন্তু পলায়ন কালে কর্দ্দমে তাঁহার সর্ব্বশরীর সিক্ত হইল এবং কণ্টকে তাঁহার অঙ্গ রক্তাক্ত হইল। কুসংস্কারাপন্ন বণিকগণ মনে করিল যে, দময়ন্তী তাঁহাদিগের বিপৎপাতের কারণ; এই ভাবিয়া তাহারা দময়ন্তীকে বধ করিবার সঙ্কল্প করিল, সুতরাং তিনি তাহাদিগের সঙ্গ ত্যাগ করিলেন, এবং ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে চেদি-নগরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে ছিন্নবস্ত্র, মস্তকের কেশ রুক্ষ ও আলোলিত, শরীর কর্দ্দমে সিক্ত। দেখিয়া নগরের বালকগণ তাঁহাকে উন্মাদিনী বলিয়া স্থির করিল। তাহারা করতালি দিতে দিতে ও তাঁহার গাত্রে ধূলি নিক্ষেপ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। দময়ন্তী আশ্রয়ের জন্য তদবস্থায় পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হইলে রাজমাতা তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। দময়ন্তীকে নিরাশ্রয়া ও উৎপীড়িতা দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল। তিনি দাসী দ্বারা দময়ন্তীকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন এবং সস্নেহবচনে বলিলেন;

"ভদ্রে! তুমি কে? এই দুরবস্থাতেও তোমার আকৃতি দেখিয়া তোমাকে সামান্যা নারী বলিয়া বোধ হইতেছে না। তুমি এরূপ অবস্থায় একাকিনী ভ্রমণ করিতেছ কেন?"

রাজমাতার সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনে ও তাঁহার মধুর বাক্য শ্রবণে দময়ন্তীর হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন; "মা! আমার পরিচয় কি দিব? এক সময় আমি অতি ভাগ্যবতী ছিলাম,

আমার গৃহ ধন, ধান্যে পূর্ণ ছিল। কিন্তু আমার স্বামী দ্যূতক্রীড়ায় সর্ব্বস্ব হারাইয়া আমাকে লইয়া বনে আসিয়াছিলেন হঠাৎ তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। সেই অবধি আমি তাঁহাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।"

এই কথাগুলি বলিবার সময় দময়ন্তীর চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল; রাজমাতাও অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "বৎসে! তুমি কাতর হইও না। তুমি আমার এখানে থাক, আমি তোমার স্বামীর অন্বেষণে লোক পাঠাইব, তুমি যত দিন আমার এখানে থাকিবে তোমার কোন ক্লেশ হইবে না।"

রাজমাতার কথা শুনিয়া দময়ন্তী বলিলেন, "মা! আপনাকে দেখিয়া এবং আপনার কথা শুনিয়া আপনার নিকট থাকিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু আমার কয়েকটী নিয়ম আছে, আপনাকে তাহা রক্ষা করিতে হইবে। আমি কাহারও উচ্ছিষ্ট ভোজন বা পদধাবন করিব না। কোন পরপুরুষের সহিত বাক্যালাপ করিব না; আর যদি কোন পুরুষ আমার সতীধর্ম্মের অপমান করিতে চায়, তবে আপনি তাহাকে যথোচিত দণ্ড দিবেন।"

রাজমাতা "তাহাই হইবে" বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং আপনার কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, "সুনন্দে! আজ হইতে ইনি তোমার সখী হইলেন, ইনি তোমার সমবয়স্কা, তুমি ইহাকে ভগিনীর ন্যায় সদ্ব্যবহারে প্রীত করিবে।"

সুনন্দা মাতার আদেশে দময়ন্তীকে লইয়া আপনার প্রাসাদে গমন করিলেন এবং যথোচিত স্নেহে ও সদ্ব্যবহারে তাঁহার প্রীতি সাধন করিলেন। দময়ন্তী নিরুদ্বেগে চেদি-রাজমাতার আশ্রয়ে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে নল দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন; কিন্তু দময়ন্তী-চিন্তা প্রতিপদে তাঁহাকে অভিভূত করিতে লাগিল। তিনি কিয়দ্দূর অগ্রসর হন, আবার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখেন। তাঁহার মনে হয়, যেন দময়ন্তী ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছেন। কখনও তিনি শুনিতে পান, দময়ন্তী যেন করুণ চীৎকারে তাঁহাকে বলিতেছেন, "প্রভো! কোথায় যাও, এক বার দাঁড়াও, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" তিনি ফিরিয়া দেখেন, কেহ কোথাও নাই। কখনও তাঁহার মনে হয় বনের মধ্যে কে যেন বামাকণ্ঠে ক্রন্দন করিতেছে, তিনি অন্বেষণ করিয়া দেখেন, বায়ু বন-বেণুর ছিদ্রে প্রবেশ করিয়া শব্দ উৎপাদন করিতেছে, তাহাই তিনি দময়ন্তীর রোদন বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন, এইরূপে অগ্রসর হইতে হইতে তিনি একদিন দেখিলেন, শুষ্ক তৃণ ও কাষ্ঠ সংযোগে অরণ্যের মধ্যে অতি প্রচণ্ড অনল উত্থিত হইয়াছে। আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া তিনি দেখিলেন যে, চতুর্দ্দিকে অগ্নিপরিবেষ্টিত একটী স্থানে একটী বৃহদাকার সর্প পড়িয়া আছে। নির্ম্মোক পরিত্যাগের জন্য হউক বা অপর কোন কারণে হউক, সর্প নিশ্চেষ্ট ও চলৎশক্তিরহিত, কিন্তু শরীরে অগ্নির উত্তাপ লাগাতে বারম্বার শ্বাস ত্যাগ করিতেছে এবং জিহ্বা প্রসারণ করিতেছে। নল

বুঝিলেন আর অল্পক্ষণ পরেই সর্পটী অগ্নিতে ভস্মসাৎ হইবে। বিপদের সম্বন্ধে নল কখনও ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং সর্পটীর প্রাণরক্ষার জন্য তাঁহার প্রবল ইচ্ছা জন্মিল, কিন্তু স্বভাবক্রূর সর্পকে রক্ষা করিতে যাইলে তাঁহার নিজের কিরূপ বিপদের সম্ভাবনা, তাহাও তাঁহার মনে হইল। অবশেষে নিজের বিপদ সত্ত্বেও সর্পের প্রাণরক্ষা করাই কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি স্থির করিলেন, এবং, অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই বিপুলদেহ সর্পকে দুই হস্তে গ্রহণ করিয়া বাহিরে আনিলেন। কিন্তু কয়েক পদ আসিতে না আসিতে সর্প তাঁহাকে দংশন করিল। তথাপি নল তাহাকে ত্যাগ করিলেন না। নিরাপদ স্থানে আনিয়া রাখিলেন। এই সময় নল শুনিতে পাইলেন, কে যেন তাঁহার অন্তরতম প্রদেশ হইতে বলিতেছে "নল! এ কর্ম্মের পুরস্কার অবশ্যই আছে।" তিনি আর তথায় অপেক্ষা করিলেন না, অরণ্য হইতে বহির্গত হইয়া ক্রমে অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। নল দেখিলেন, সর্পবিষে তাঁহার অপর কোন ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু তাহার গরলে তাঁহার শরীরের চর্ম্ম বিবর্ণ ও মুখমণ্ডল বিকৃত হইয়াছে। তিনি ভাবিলেন, ছদ্মবেশে অবস্থানের পক্ষে এই বিধাতৃ-প্রেরিত নিগ্রহ এক রূপ অনুগ্রহই হইল।

তিনি অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া রাজা ঋতুপর্ণের নিকট সারথ্য-কার্য্য প্রার্থনা করিলেন। ঋতুপর্ণ একজন উপযুক্ত অশ্বপালক খুঁজিতেছিলেন, নলের কথোপকথনে প্রীত হইয়া তিনি তাঁহাকে নিজের অশ্বপালের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিলেন। নলের প্রদত্ত শিক্ষায় ঋতুপর্ণের অশ্বসমূহ অল্পদিনের মধ্যে সুশিক্ষিত ও অধিকতর কার্য্যপটু হইল, দেখিয়া ঋতুপর্ণ নলের উপর পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

এ দিকে বিদর্ভরাজ ভীম জামাতার ও দুহিতার দেশত্যাগের সংবাদ শ্রবণ করিয়া দেশে দেশে তাঁহাদিগের অন্বেষণে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেরিত দূত সুদেব নামক কোন ব্রাহ্মণ চেদি-রাজ্যে উপস্থিত হইয়া একদিন ঘটনাক্রমে দময়ন্তীকে দেখিতে পাইলেন। দময়ন্তীও তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া দাসী দ্বারা তাঁহাকে অন্তঃপুরে আনাইলেন। ক্রমে সকল কথা রাজমাতার কর্ণগোচর হইল। দময়ন্তীর পরিচয় পাইয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তিনি তাঁহার সহোদরার কন্যা। তখন রাজমাতা দময়ন্তীকে পরম আদরে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়া পরিজনসহ বিদর্ভে প্রেরণ করিলেন। ভীম ও তাঁহার মহিষী হারানিধি পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিলেন।

পিতৃগৃহে দময়ন্তী পরম আদরে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে শান্তি আসিত না। নলের জন্য দিবারাত্রি তাঁহার অশ্রুধারা বহিত; চিন্তায় তাঁহার শরীর দিন দিন কৃশ ও মলিন হইতে লাগিল। রাজমহিষী কন্যার অবস্থা রাজাকে বলিয়া নলের অন্বেষণে পুনর্ব্বার দেশে দেশে দূত প্রেরণের সঙ্কল্প করিলেন। দময়ন্তী দূতব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আপনারা নগরে গ্রামে, তীর্থে তপোবনে যেখানে যাইবেন, সর্ব্বত্র লোকের

নিকট এই কথা বলিলেন ; 'পত্নীকে সতত রক্ষা ও প্রতিপালন করা পরিণেতার অবশ্য কর্ত্তব্য ; তুমি কেন তাহার বিপরীতাচরণ করিলে ? তোমার পত্নী তোমাতে একান্ত অনুরক্তা, অরণ্যমধ্যে নিদ্রিতাবস্থায় তাহাকে একাকিনী রাখিয়া তাহার বস্ত্রার্দ্ধ ছেদন পূর্ব্বক তুমি কোথায় পলায়ন করিয়াছ ?' যদি কেহ এই কথা শুনিয়া কোন প্রত্যুত্তর দেয়, তবে আপনারা স্মরণ করিয়া তাহা আমাকে জানাইবেন এবং সেই ব্যক্তির নাম ধাম ইত্যাদি জানিয়া আসিবেন।" দময়ন্তী এই বলিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া বিদায় দিলেন।

অনন্তর বহুদিন পরে পর্ণাদনামা কোন ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিয়া দময়ন্তীকে বলিলেন "রাজকুমারি ! আমি তোমার পতির অন্বেষণে নানা স্থান পর্য্যটন করিয়াছি, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। আমি যেখানে যেখানে গিয়াছি, সর্ব্বত্র তোমার আদেশমত কথা বলিয়াছি, কিন্তু কোথাও কোন প্রত্যুত্তর পাই নাই। অবশেষে আমি অযোধ্যাধিপতি রাজা ঋতুপর্ণের সভায় গমন করিয়া তোমার আদেশমত কথা সকলকে শুনাইয়াছিলাম। তাহাতে রাজা বা রাজার পরিজনদিগের মধ্যে কেহ কোন উত্তর দেন নাই। কেবল রাজার এক সারথি, সেই সকল কথা শুনিয়া আমাকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া বারম্বার তোমার ও তোমার পুত্রকন্যাগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তাহার কথাবার্ত্তায় বোধ হইল, যেন সে তোমার বিপৎপাতে নিতান্ত দুঃখিত। রাজকুমারি ! সে কি পূর্ব্বে নিষধে তোমার সারথির কার্য্য করিয়াছিল ?" দময়ন্তী বলিলেন "তাহার নাম কি ?"

পর্ণাদ। তাহার নাম বাহুক।

দময়ন্তী। এরূপ নামের কাহারও কথা শ্রবণ হয় না। তাহার আকৃতি-প্রকৃতি কিরূপ ?

পর্ণাদ। সে দেখিতে অতি কদাকার তাহার শরীর বিকৃত ও বিবর্ণ। কিন্তু তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধানে যাহা জানিয়াছি; তাহাতে তাহাকে অতি মহৎবংশসম্ভূত বলিয়া বোধ হয়। সে সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয় এবং দয়াশীল। নিকৃষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত হইলেও সে অমাত্যের ন্যায় ঋতুপর্ণের বিশ্বস্ত ও সমাদরভাজন। রাজার অন্যান্য সারথি ও অশ্বপালগণ, তাহাকে অকপট ভক্তি করে। সে বিদ্বান ও শাস্ত্রজ্ঞ। লোকপরম্পরায় অবগত হইলাম ; অশ্বচালনায় তাহার ন্যায় সুদক্ষ ব্যক্তি পৃথিবীতে দুর্লভ।

দময়ন্তী। তাহার দৈনিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কোন কথা শ্রবণ করিয়াছেন কি ?

পর্ণাদ। তাহাকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিতে দেখিয়া আমি তাহার আচারব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছি। সে নিত্যস্নায়ী, অগ্নিহোত্রী, শুচি এবং সংযত। নিজের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিয়া অবকাশ পাইলে সে একাকী শাস্ত্রালোচনায় ও ধ্যানে সময় অতিবাহিত করে। কিন্তু ধর্ম্মশীল ও সকলের প্রিয়পাত্র হইলেও সে সর্ব্বদা ম্লান ও চিন্তাযুক্ত। শুনিলাম সে রাত্রির অধিকাংশ অশ্রুপাতে ও দীর্ঘ নিশ্বাসে যাপন করে। তাহার আর একটী অদ্ভুত অভ্যাস আছে ; সে তাহার একখানি জীর্ণ মলিন বস্ত্র যেখানে যাউক সঙ্গে লইয়া যায়। কখনও সেই জীর্ণ বস্ত্রখানি

বক্ষে রাখিয়া অশ্রুপাত করে। তাহার সম্বন্ধে আমি যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি সমস্তই বলিলাম, এক্ষণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয় কর।

দময়ন্তী উপযুক্ত পুরস্কার দানে পর্ণাদকে প্রীত করিয়া বিদায় দিলেন। পর্ণাদের কথা শুনিয়া তাঁহার ধারণা হইল যে, এই বাহুকই নল। কিন্তু দুই বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ জন্মিল। প্রথমে পর্ণাদ বলিলেন যে তিনি দেখিতে অতি কদাকার; নল ত কদাকার নহেন, তবে কি কোন আকস্মিক রোগে তাঁহাকে বিবর্ণ ও বিকৃত করিয়াছে? দ্বিতীয়, নল শাস্ত্রে ও শস্ত্রে তুলাপারদর্শী; যদি দুরবস্থা-বশতঃ তাঁহাকে অশ্বের তত্ত্বাবধায়ক হইতেই হইল, তবে তিনি অমাত্যের কার্য্য, সেনা-নায়কের কার্য্য গ্রহণ না করিয়া সারথির কার্য্য গ্রহণ করিলেন কেন? যাহা হউক নলের সহিত যখন বাহুকের এত সাদৃশ্য আছে, তখন কোন প্রকারে একবার বাহুককে দেখিতেই হইবে। এই ভাবিয়া দময়ন্তী মাতার নিকটে গমন করিলেন, এবং পর্ণাদ-কথিত সমস্ত বিষয় বর্ণন করিয়া বলিলেন, "মা! রাজা ঋতুপর্ণ ও বাহুককে এখানে আনিবার জন্য আমি একটী কৌশল অবলম্বন করিব। আপনি পিতাকে এখন কোন কথা বলিবেন না। একবার সুদেবকে আমার নিকট আনাইয়া দিন। সুদেব অতি বুদ্ধিমান ও কার্য্যক্ষম, তাহার দ্বারা আমার কার্য্য সিদ্ধ হইবে।"

রাজমহিষীর আদেশে সুদেব অন্তঃপুরে আসিলেন, তখন দময়ন্তী তাঁহাকে বলিলেন, "সুদেব! আপনি একবার অযোধ্যাধিপতি রাজা ঋতুপর্ণের নিকট গমন করুন। তাঁহাকে বলিবেন যে নল দীর্ঘকাল দময়ন্তীকে পরি-ত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিয়াছেন। কেহ তাঁহার সংবাদ বলিতে পারে না। সেই জন্য দময়ন্তী পত্যন্তর গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়া-ছেন; স্বয়ংবরের দিন নিকটবর্ত্তী। যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে আপনি অদ্যই বিদর্ভ মুখে যাত্রা করুন। আমার উদ্দেশ্য কি পরে জানিতে পারিবেন, এখন এ কথা, কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না।"

সুদেব "যে আজ্ঞা" বলিয়া বিদায় লইলেন এবং রাজা ঋতুপর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া দময়ন্তীর আদেশমত সমস্ত কথা জ্ঞাপন করিলেন। ঋতুপর্ণ দময়ন্তীর রূপগুণের কথা শুনিয়া পূর্ব্ব হইতে এরূপ আকৃষ্ট ছিলেন যে, তাঁহার দ্বিতীয় স্বয়ম্বর সম্ভবপর কি না তাহা একবারও বিচার করিলেন না। তিনি সুদেবকে বিদায় দিয়া বিদর্ভ গমনের উদ্যোগী হইলেন। দময়ন্তী অযোধ্যা হইতে বিদর্ভ গমনের পথের দূরত্ব ও দুর্গমত্ব বিবেচনা করিয়া কল্পিত স্বয়ম্বরের দিন এরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া-ছিলেন যে, বিশেষ সুশিক্ষিত অশ্ব ও সুনিপুণ সারথি ব্যতিরেকে কেহই সে পথ অতিক্রম করিয়া যথাসময়ে স্বয়ম্বরে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। ঋতুপর্ণ বাহুককে আহ্বান করিয়া বলিলেন;—

"বাহুক! বিদর্ভরাজদুহিতা দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর উপস্থিত; আমি অদ্যই বিদর্ভা-ভিমুখে যাত্রা করিব। তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছিলে যে অশ্বচালনায় তোমার সমকক্ষ কেহ নাই। অদ্য তুমি তোমার নৈপুণ্য প্রদর্শন কর। যদি তুমি যথাসময়ে বিদর্ভে উপস্থিত হইতে

পার, তুমি যে প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই পূর্ণ করিব।

দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর উপস্থিত, এই সংবাদে নলের হৃদয় যেন শেলবিদ্ধ হইল; আপাদমস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, কিন্তু তিনি ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "মহারাজের আজ্ঞা প্রতিপালনে যথাশক্তি চেষ্টা করিব, আপনি প্রস্তুত হউন।"

নল এই বলিয়া উপযুক্ত রথ ও অশ্ব নির্ব্বাচনের জন্য গমন করিলেন। ঋতুপর্ণের কথা শ্রবণ হইতে তাঁহার হৃদয় মনস্তাপে দগ্ধ হইতেছিল। তিনি ভাবিলেন, দময়ন্তীর ন্যায় পতিগতপ্রাণার পক্ষে পত্যন্তর-গ্রহণ কি কখনও সম্ভবপর? অথবা আমার ন্যায় পত্নীদ্রোহী নরাধমের শাস্তির জন্য বিধাতা অসম্ভবকেও সম্ভবপর করিতে পারেন। স্বচক্ষে দময়ন্তীর স্বয়ম্বর না দেখিলে আমার পাপের সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হইবে না, তাই বিধাতা আমাকে এরূপভাবে সেখানে লইয়া যাইতেছেন। আবার ভাবিলেন, "ইহা কখনই সত্য হইতে পারে না। চন্দ্রলেখা বরং স্নিগ্ধতা ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু দময়ন্তী কখনও ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারেন না। আমি দময়ন্তীর উপর অবিশ্বাস করিয়া আর পাপভার বৃদ্ধি করিব না।"

যথাসময়ে ঋতুপর্ণ বিদর্ভাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নল অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শনে দুর্গম গিরিসঙ্কট, পঙ্ককর্দ্দমপূর্ণ পথ এবং দুর্ল্লঙ্ঘ্য অরণ্যানী অতিক্রম করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিবসের পূর্ব্বে বিদর্ভনগরে উপস্থিত হইলেন। ঋতুপর্ণ তাঁহার অশ্বচালন-নৈপুণ্য, কার্য্যতৎপরতা ও শ্রমশীলতা দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত ও প্রীত হইলেন। নগরোপকণ্ঠে উপনীত হইয়া তিনি বাহুককে বলিলেন, "বাহুক! তোমারই গুণে আমি স্বয়ম্বরের পূর্ব্বে বিদর্ভে উপস্থিত হইতে পারিলাম। ইহাতে বোধ হইতেছে আমার মনস্কাম সিদ্ধ হইবে। যদি সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দময়ন্তী অদ্য আমাকে বরণ করেন, তবে আমি তোমাকে দশখানি গ্রাম, সহস্রসংখ্যক সুবর্ণ এবং রত্নখচিত উষ্ণীষ প্রদান করিব।" ঋতুপর্ণ জানিতেন না যে তিনি বাহুকের নিকট কি বিষ উদ্গীরণ করিতেছেন। বাহুক কোন উত্তর দিলেন না।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ঋতুপর্ণের সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। তিনি নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, স্বয়ম্বরের কোনও আয়োজন নাই। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, কেহ অলীক সংবাদ দানে তাঁহাকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে। তিনি ভাব গোপন করিয়া রাজা ভীমের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ভীম তাঁহার অকস্মাৎ আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি লজ্জায় প্রকৃত কারণ বলিতে পারিলেন না। "বহুদিন সাক্ষাৎ হয় নাই, এজন্য সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি" এইরূপ উত্তর দিলেন।

এদিকে দময়ন্তী উৎসুক হৃদয়ে ঋতুপর্ণের এবং তাঁহার সারথি বাহুকের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। দময়ন্তী নিশ্চয় জানিতেন যে, নলের ন্যায় অসাধারণ অশ্বচালনা-নিপুণ ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহ তাদৃশ অল্প কালের মধ্যে অযোধ্যা হইতে বিদর্ভে আসিতে পারিবেন না। এক্ষণে তাঁহার অত্যন্ত কর্ণ রথশব্দ শ্রবণ করিয়াই বুঝিতে

পারিল যে, এ রথ নিশ্চয়ই নলের দ্বারা চালিত। তিনি প্রাসাদ-শিখর হইতে বাহুককে দর্শন করিলেন, কিন্তু দূরতা ও নলের রূপবৈলক্ষণ্যের জন্য কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি পর্ণাদকে যে সকল কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, আপনার এক জন বিশ্বস্তা পরিচারিকাকে সেই সকল কথা বলিয়া বাহুকের নিকট প্রেরণ করিলেন। বাহুকের উত্তর শুনিয়া তাঁহার সন্দেহ দৃঢ়ীকৃত হইল। পরিচারিকা আসিয়া বাহুকের অনেক অলৌকিক শক্তির কথা বলিল। বাহুক বিনা অগ্নিতে কাষ্ঠ প্রজ্বলিত করিতে পারেন, বাহুকের দৃষ্টিমাত্র শূন্য কুম্ভ জলে পূর্ণ হয় ইত্যাদি অনেক কথা বলিল। কিন্তু দময়ন্তী অলৌকিক শক্তির অপেক্ষা লৌকিক গুণ দ্বারাই বাহুককে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি বাহুকের প্রস্তুত মাংস আনিয়া আহার করিলেন এবং পূর্ব্বসংস্কার-বশতঃ তাহা নলেরই প্রস্তুত ইহা বুঝিতে পারিলেন। তাহার পর তিনি আপনার পুত্র কন্যা দুইটীকে পরিচারিকার সঙ্গে বাহুকের নিকট প্রেরণ করিলেন। বহুদিন পরে পুত্রকন্যা দুইটীকে দেখিয়া বাহুকরূপী নল স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাহা-দিগকে ক্রোড়ে লইয়া বারম্বার তাহাদিগের মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু অশ্রুপ্লুত এবং শরীর রোমাঞ্চিত হইল। কিন্তু পাছে পরিচারিকা কিছু মনে করে, এই আশঙ্কায় তিনি বালক বালিকা দুইটীকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া বলিলেন, "ভদ্রে! আমারও এইরূপ দুইটী পুত্র কন্যা আছে; ইহাদিগকে দেখিয়া তাহাদিগের কথা স্মরণ হওয়ায় আমি আত্মসম্বরণ করিতে পারি নাই; তুমি এ জন্য কিছু মনে করিও না।"

পরিচারিকা ফিরিয়া আসিয়া দময়ন্তীকে সকল কথা বলিল।

দময়ন্তী বুঝিলেন আর সন্দেহের কারণ নাই, তথাপি একবার স্বচক্ষে বাহুককে দেখা কর্ত্তব্য এই ভাবিয়া তিনি তাঁহাকে অন্তঃপুরে আনয়নের জন্য মাতার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাজমহিষী ভীমের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বাহুককে অন্তঃপুরে আনাই-লেন। সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পর নল ও দময়ন্তী পরস্পরকে দর্শন করিলেন। হায়! উভয়েরই কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। নল দেখিলেন স্বয়ম্বর-সভায় যিনি সদ্যঃ প্রস্ফুটিত নলিনীর ন্যায় সৌরভে ও সৌন্দর্য্যে সহস্র সহস্র ব্যক্তির চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন, আজ তিনি দিবাবসানের পদ্মিনীর ন্যায় বিশুষ্কা ও পরিমলশূন্যা। দময়ন্তীর পরিধান কাষায় বসন, অঙ্গের বর্ণ মলিন; কেশজাল রুক্ষস্নানে জটিল ও তাম্রাভ; অধর ও কপোল পাণ্ডু বর্ণ। শরীরে অলঙ্কার নাই; সেই জীর্ণ বস্ত্রার্দ্ধে দেহের উপরিভাগ আবৃত করিয়া লজ্জা রক্ষা করিতেছেন। পতিব্রতার সেই বিষাদিনী মূর্ত্তি দর্শনে নলের হৃদয় বিদীর্ণ হইল। দময়ন্তীও দেখিলেন, নলের সেই গাম্ভীর্য্য-সুন্দর, বলিষ্ঠ, কোমল বপু রাহু-গ্রস্ত শশধরের ন্যায় ক্ষীণ ও নিষ্প্রভ হইয়াছে। তাঁহার নয়নে কালিমা এবং ললাটে চিন্তার রেখা পড়িয়াছে; সুগঠিত দেহ পরিচর্য্যায় রুক্ষ ও কঠোর হইয়াছে। শরীরের ত্বক্ বিকৃত ও বিবর্ণ। সে মূর্ত্তি দেখিয়া দময়ন্তী শিহরিয়া উঠিলেন। নলের

এতই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল যে, পূর্ব্বে যাহারা নলকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। কিন্তু সতীর নিকট পতি কি কখন অজ্ঞাত থাকিতে পারেন? দময়ন্তী বাহুকের প্রত্যেক অঙ্গে নলকে দর্শন করিলেন, এবং করিয়াই তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন। তাহার পর যাহা হইল, তাহা বর্ণন করা নিষ্প্রয়োজন। উত্তপ্ত অশ্রুর সহিত উত্তপ্ত অশ্রুর, দীর্ঘশ্বাসের সহিত দীর্ঘশ্বাসের এবং স্পন্দিত হৃদয়ের সহিত স্পন্দিত হৃদয়ের মিলন হইল। তাড়িতের সহিত তাড়িতের বিনিময় হইলে আকাশ এবং পৃথিবী যেমন শীতল হয়; পরস্পরের মধ্যে দীর্ঘসঞ্চিত বেদনা বিনিময় করিয়া উভয়েরই হৃদয় তেমনই শীতল হইল। বস্ত্রার্দ্ধ-ছেদনের রাত্রি হইতে তৎকাল পর্য্যন্ত উভয়ে কিরূপ সুখ দুঃখে যাপন করিয়াছিলেন, তাহা পরস্পরের নিকট বর্ণনা করিতে করিতে রাত্রি প্রভাতা হইল। কেহই একবার চক্ষু মুদিত করিতে পারিলেন না।

প্রভাতের সঙ্গে এই শুভ সংবাদ চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইল। বিদর্ভবাসিগণ এতদিন রাজা ও রাজমহিষীকে জামাতা ও দুহিতার শোকে ম্রিয়মাণ দেখিয়া সর্ব্বপ্রকার আনন্দোৎসব হইতে বিরত ছিল। এক্ষণে অভিনব উৎসাহে আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করিল। রাজা ঋতুপর্ণ যখন অবগত হইলেন যে তাঁহার সারথি বাহুকই নল, তখন তিনি দময়ন্তীর প্রতি লালসা প্রদর্শনের জন্য লজ্জায় অধোবদন হইলেন। তিনি নলের প্রার্থনা অনুসারে তাঁহাকে আপনার প্রতিশ্রুতি-মত অক্ষবিদ্যা প্রদান করিলেন এবং তাঁহার নিকট অশ্বচালন-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া হৃষ্টচিত্তে অযোধ্যায় প্রতিগমন করিলেন।

অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হওয়া অবধি নলের হৃদয় দিবারাত্রি দগ্ধ হইতেছিল। তিনি কয়েক দিন পরে দময়ন্তীকে বিদর্ভে রাখিয়া, শ্বশুরের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, নিষধে গমন করিলেন এবং পুষ্করকে অক্ষ-ক্রীড়ায় বা হয় দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। পুষ্কর প্রথম হইতেই দময়ন্তীর প্রতি আকৃষ্ট ছিল, পূর্ব্বে কখনও মনের ভাব প্রকাশ করিতে সাহস করে নাই। এক্ষণে ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া নির্লজ্জের ন্যায় বলিল "আজ আমার চিরপ্রার্থিত মনোরথ সফল হইবে। তোমার সমস্ত ধন সম্পত্তি জয় করিলেই দময়ন্তী আপনি আসিয়া আমাকে ভজনা করিবে। অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, শীঘ্রই দ্যূতারম্ভ হউক।"

উভয়ে অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। পুষ্কর ভাবিয়াছিল, পূর্ব্ববারের ন্যায় এবারও অনায়াসে জয়লাভ করিবে, কিন্তু তাহা হইল না। পুষ্কর প্রতিক্ষেপেই পরাজিত হইতে লাগিল। ক্রমে তাহার রাজ্য, ধন, প্রাণ পর্য্যন্ত নল অক্ষে জয় করিলেন। তখন তিনি পুষ্করকে বলিলেন, "নরাধম! মাতৃতুল্যা ভ্রাতৃজায়ার উপর তোমার লালসা? প্রাণবধই তোমার উপযুক্ত দণ্ড। কিন্তু তুমি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দ্য বিস্মৃত হইবার নয়, সেই জন্য আমি তোমাকে প্রাণভিক্ষা দিলাম, তোমার ধন সম্পত্তিও তোমাকে প্রত্যর্পণ করিলাম। আর এমন ব্যবহার করিও না, যাও;

আশীর্ব্বাদ করি, তুমি শতায়ু হইয়া সুখে জীবন যাপন কর।"

পুষ্কর কৃতজ্ঞচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিল। তখন নল বিদর্ভ হইতে দময়ন্তীকে স্বনগরে আনয়ন করিলেন, এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও প্রজাপালনে উভয়ে পরম সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। দময়ন্তী যেমন গুণবতী, নলও তেমনই গুণবান ছিলেন। সত্যরক্ষার জন্য দময়ন্তীর নিকট তাঁহার অকপট দৌত্য, হিংস্র সর্পকে অগ্নিদাহ হইতে রক্ষার জন্য নিজের প্রাণসংশয় করণ এবং পুষ্করের ন্যায় ভ্রাতাকে ক্ষমা তাঁহার মহানুভবতার অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি যে এক্ষণে "পুণ্যশ্লোক" এই অনন্যসাধারণ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপেই তাঁহার যোগ্য। দময়ন্তীর সহিত তাঁহার মিলন কাঞ্চনের সহিত রত্নের মিলনের ন্যায় পরস্পরের উপযুক্ত বলিয়াই বোধ হয়।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

মানবের জন্মকথা

উপসংহার

আমরা এই অধ্যায়ে দেখিলাম যে অন্যান্য জন্তুর ন্যায় মানব যেমন বর্ত্তমানকালে নানাবিধ ব্যক্তিগত প্রভেদের অধীন অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তনের অধীন, তেমনই তাহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণও নিশ্চয়ই ঐরূপ পরিবর্ত্তনের অধীন ছিল। বর্ত্তমানকালে ঐ সকল পরিবর্ত্তন যেরূপ সাধারণ বিধি ও জটিল বিধান সকল হইতে জাত হয়, পূর্ব্বকালেও তদ্রূপ সাধারণ কারণবশতঃই পরিবর্ত্তন সকল উৎপন্ন হইত। এখন যেমন সকল জন্তুই আহারসংস্থানের অপেক্ষাও অতিরিক্ত সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, মানুষের পূর্ব্ববর্ত্তিগণও তদ্রূপই হইত; ইহা নিশ্চয়ই জীবন-সংগ্রামের ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের মূলীভূত কারণ। দেহাংশ সকলের অতিরিক্ত ব্যবহারজনিত ফল বংশানুগত হইয়া প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের বিশেষ সহায়তা করিয়াছে;*—প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন এবং ঈদৃশ বংশানুক্রম পরস্পরের উপর নিয়তই প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিত। আমরা পরে দেখাইব যে অনেক লঘুতর লক্ষণ দাম্পত্য-নির্ব্বাচন হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। যে সকল অল্পসংখ্যক পরিবর্ত্তনের হেতু উল্লিখিত ভাবে হৃদয়ঙ্গম হয় না, তাহাদিগের প্রবর্ত্তক কারণ অজ্ঞাত; গৃহপালিত জীবের যে কারণে সময় সময় গুরুতর আকস্মিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, ঐ অজ্ঞাত কারণও তদ্রূপ। অসভ্য মানবের এবং অধিকাংশ চতুষ্পদের ব্যবহার দৃষ্টে বিবেচনা হয় যে, প্রাথমিক মানব, এবং তাহার বানরবৎ পূর্ব্ববর্ত্তিগণ সম্ভবতঃ সমাজমধ্যে বাস

* এই মত এখন আর পূর্ব্ববৎ স্বীকৃত হয় না।

করিত। খাঁটি সামাজিক জীবের মধ্যে সমাজের উপকারজনক পরিবর্ত্তন সকল সংরক্ষিত হইয়া অনেক সময় তদুপযোগী ভাবে ব্যক্তির পরিবর্ত্তন সাধিত করে। যে সমাজে সুলক্ষণযুক্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা অধিক সেই সমাজই সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং অন্য সুলক্ষণযুক্ত সমাজের উপর জয়যুক্ত হয়। যদিও ঐ প্রথমোক্ত সমাজের এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির অপেক্ষা অধিকতর লাভবান না হয়, তথাপি ঐ প্রথমোক্ত সমাজ সমষ্টিতে অপর সমাজের উপর জয়ী হইয়া থাকে। সমাজবদ্ধ কীটগণ এইরূপে অনেক আশ্চর্য্যজনক গঠন প্রাপ্ত হইয়াছে; ঐ সকল গঠন ব্যক্তির অল্পই উপকারে আসে, অথবা উপকারে আসেই না; দৃষ্টান্ত স্বরূপ মধুমক্ষিকার রেণু-সংগ্রাহক যন্ত্রের অথবা বিদ্ধ করিবার অস্ত্রের এবং বড় পিপীলিকার হুলের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সমাজবদ্ধ উচ্চশ্রেণীস্থ জন্তুর মধ্যে কাহারও অঙ্গগঠন কেবলমাত্র সমাজের উপকারের নিমিত্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কি না তাহা আমার জানা নাই; কিন্তু তাহাদিগেরও কোন কোন গঠন গৌণভাবে সমাজের উপকারজনক হয়। রোমশী ভল্লুক শৃঙ্গ এবং বেবুন বানরের বড় বড় দন্তও বোধ হয় পুংজাতীয়গণ স্ত্রীলাভের জন্যই অস্ত্ররূপ প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু উহা স্বীয় দলের রক্ষাকার্য্যেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা দেখাইব যে, কতিপয় মানসিক শক্তিলাভের হেতু এতদপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন; কারণ মনোবৃত্তি সকল প্রধানতঃ অথবা সম্পূর্ণরূপে, সমাজের হিতার্থই উৎপন্ন হইয়া থাকে ঐ সমাজস্থ ব্যক্তি তদ্বারা গৌণভাবে উপকৃত হয়।

উপরের লিখিত মতের বিরুদ্ধে অনেক সময় এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হয় যে পৃথিবীতে সমস্ত প্রাণী অপেক্ষা মানবই অধিক অসহায় এবং আত্মরক্ষার উপকরণ-হীন। সুতরাং প্রাথমিক অবস্থায় যখন মানব বর্ত্তমান কাল অপেক্ষাও সমুন্নত ছিল, তখন সে আরও অধিকতর অসহায় ছিল। ডিউক অব্ আর্গাইল বলেন যে "পশুর অঙ্গগঠন হইতে মানুষের অঙ্গগঠন দুর্ব্বলতা এবং অসহায়তার দিকে বিবর্ত্তিত হইয়াছে; সুতরাং এইরূপ বিবর্ত্তন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন-বশতঃ হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা অসম্ভব।" তিনি মানুষের নগ্ন এবং অরক্ষিত দেহ, বৃহৎ নখ দন্তের অভাব, তাহার বলহীনতা ও দ্রুত গামিত্বের অভাব, এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা আহার সংগ্রহ এবং বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার অক্ষমতার কথা উল্লেখ করেন। ডিউক মহাশয় এই সকল অভাবের উল্লেখ করেন, আমি আর একটীর উল্লেখ করিতেছি, যাহা আরও গুরুতর —মানুষ দ্রুতবেগে বৃক্ষারোহণ করিতে পারে না, সুতরাং শত্রু হস্ত হইতে ঐ রূপে আত্মরক্ষাও করিতে পারে না। যাহা হউক গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসিগণের পক্ষে দেহের লোম-হীনতা বিশেষ অনিষ্টজনক নহে, কারণ আমরা জানি যে বিবস্ত্র ফিউজিয়ানগণ অতি কঠিন জলবায়ুর মধ্যেও জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হয়। বানরের সহিত মানবের তুলনা করিয়া মানবকে অসহায় বলিতে হইলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে বানরগণের মধ্যে ও বৃহৎ দন্ত স্ত্রীলিঙ্গেরই আছে, পুংগণের নাই, এবং

স্ত্রীলাভার্থ অন্য পুংগণের সহিত দ্বন্দ্ব করিতেই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। তথাপি স্ত্রীগণ এই বৃহৎ দন্ত না থাকিলেও বাঁচিয়া আছে, মরে নাই।

মানুষের দেহের আয়তন এবং বলবিক্রম বিবেচনা করিলে ইহা বলা যায় না যে মানুষ সিম্পাঞ্জির ন্যায় কোন ক্ষুদ্র বানর হইতে অথবা গরিলার ন্যায় কোন বৃহৎ শক্তিমান বানর হইতে জাত হইয়াছে; সুতরাং বিবর্ত্তনবশতঃ মানব তাহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের অপেক্ষা বৃহত্তর এবং অধিক বলিষ্ঠ হইয়াছে অথবা ক্ষুদ্র এবং অধিক দুর্ব্বল হইয়াছে তাহা বলা যাইতে পারে না। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে গরিলার ন্যায় বৃহদাকার বলিষ্ঠ এবং হিংস্র জন্তুগণ যাহারা সর্ব্ব প্রকার শত্রু হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম, তাহারা বোধ হয় সমাজবদ্ধ হইত না; সুতরাং স্বজাতি-প্রেম, সহানুভূতি প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর মনোবৃত্তি উৎপন্ন হইবার বিশেষ বাধা হইত। এই সকল কারণে বোধ হয়, কোন অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল প্রাণী হইতে জাত হওয়াই মানবের পক্ষে বিশেষ অনুকূল কথা হইয়াছিল।

শক্তির অভাব, দ্রুতগতির অভাব, প্রাকৃতিক অস্ত্রের অভাব—মানবের এ সকল তাহার বুদ্ধিবৃত্তি এবং সামাজিকতা দ্বারাই পূর্ণ হইয়াছিল; অসভ্যাবস্থাতেও মানব আত্মরক্ষার নিমিত্ত বুদ্ধিবলে যন্ত্র অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়াছে, এবং সামাজিকতার গুণে পরস্পরের সাহায্য করিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার অপেক্ষা অধিক ভয়ঙ্কর পশু পৃথিবীতে কোথায়ও নাই, উত্তর মেরুপ্রদেশ অপেক্ষা প্রাকৃতিক অবস্থা কোথাও অধিকতর দুঃসহ নহে; তথাপি মানবের একটী ক্ষুদ্রতম জাতি অর্থাৎ বুশ্‌ম্যান্ দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করিতেছে, এবং খর্ব্বাকার এস্‌কুইমক্স্ জাতি উত্তর মেরু দেশের অধিবাসী। মানবের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ বর্ত্তমান কালের অতি নিম্নশ্রেণীর অসভ্যগণ অপেক্ষাও বোধ হয়, বুদ্ধিবৃত্তিতে এবং সামাজিকতায় হীন ছিল; কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই বুঝা যায় যে মানবের পশুলক্ষণ * সকল ক্রমে যতই অন্তর্হিত হইতেছিল, ততই যদ্যপি মানব বুদ্ধিবৃত্তিতে উন্নত হইয়াছিল, তাহা হইলে তাহারা জীবিত থাকিতে পারিতই, বরং বংশবিস্তার করিতেও সক্ষম হইত। যাহা হউক মানবের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ যদি কোন গ্রীষ্মপ্রধান মহাদেশে বাস করিত, অথবা ওয়াংওটাঙ্গের বর্ত্তমান আবাসভূমি, অষ্ট্রেলিয়া, নিউগিনী কিম্বা বোর্ণিও ইত্যাদি দ্বীপের ন্যায় কোন বৃহৎ দ্বীপে অবস্থিতি করিত, তাহা হইলে তাহারা বর্ত্তমানকালীয় অসভ্যগণের অপেক্ষা অধিক অসহায় এবং অরক্ষিত হইলেও বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইত না। ঐরূপ বৃহৎ কোন প্রদেশে এক দলের সহিত আর এক দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতাবশতঃ মানবের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের অধীন হইত; উপরন্তু অনুকূল অবস্থায় অভ্যাসের বংশানুগত ফল ঐ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের সহায়তা করিয়া মানবকে বর্ত্তমান উচ্চ পদবীতে উন্নীত করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইত।

শ্রীশশধর রায়।

* যথা বৃক্কারোহণ ইত্যাদি।

"এক জোড়া দুল্"*

মেরী যখন ছোট ছিল—তখন হইতেই আমি তাহাকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতাম। তাহার পিতা হেন্‌রি লেপেয়ার আমার একজন পুরাতন বন্ধু। তিনি একজন সুবিখ্যাত চিত্রকর, আর আমি, লেখক।

ক্রমে মেরীর বিবাহের বয়স হইল। প্রথম প্রথম বিবাহ-প্রস্তাবে মেরীর মত ছিল না। এ বয়সে বালিকারা যেমন করিয়া থাকে অচিরোদ্ভিন্নযৌবনা মেরী বিবাহের কথায় নানা আপত্তি দেখাইল, বাপের কাছে কাঁদিল। শেষে কিন্তু তাহার প্রণয়ীর প্রণয়-আবেদন অগ্রাহ্য করিতে পারিল না—বিবাহ করিতে রাজী হইল। তাহার প্রণয়ী—তাহারই পিতার একজন ছাত্র।

মেরীর বিবাহ-প্রস্তাব স্থির হওয়ায় আমি বাস্তবিকই বড় আনন্দিত হইলাম। মেরীকে খুসী করিবার জন্য আমার বহুদিনের সঞ্চিত একজোড়া বহুমূল্য হীরক-খচিত দুল্ তাহাকে আমার স্নেহের নিদর্শন-স্বরূপ উপহার দিব স্থির করিলাম, এবং স্বহস্তে তাহাকে এই দুল্‌জোড়াটি পরাইয়া দিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলাম।

মেরীর বিবাহের পূর্ব্বদিনে তাহার পিতৃগৃহে একটি নাচের মজলিস ছিল। সন্ধ্যার সময় যথাসময়ে আমার উপহারটি পকেটে করিয়া আমি লেপেয়ারের গৃহে উপস্থিত হইলাম এবং মেরীকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া স্বহস্তে দুল্‌জোড়াটি তাহার কর্ণে পরাইয়া দিয়া সস্নেহে তাহার নির্ম্মল ললাট চুম্বন করিলাম। আমার চুম্বনে জানি না কেন মেরী একটু কাঁপিয়া উঠিল—যেন সে স্পর্শ তাহার বালিকাহৃদয়ের কোন এক গোপন তন্ত্রে আঘাত করিল। যাহা হউক একটু সামলাইয়া মেরী আমাকে তাহার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া গেল।

তার পর নাচ সুরু হইল এবং বালিকা তাহার প্রণয়ীর সহিত নাচিতে লাগিল। আমি তাহার কাণে দুল পরাইয়া দিবার মিনিট কুড়ি পরে মেরী হঠাৎ অসুস্থ হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল।

মজলিসের সকলেই তাহার নিকট ছুটিয়া গেল—সকলে আগ্রহে তাহার সেবা করিতে লাগিল। তার পর জ্ঞান হইলে মেরী যখন উঠিয়া বসিল—তাহার মাতা তাহার দিকে সোৎকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মেরী তোমার দুল্?"

মেরী কাঁপিয়া উঠিল এবং দুল্ আছে কি না দেখিবার জন্য কাণে হাত দিয়া বলিল—"তাই ত! কাণে ত দুল্ নাই! কোথা গেল!"

সকলেই ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল—সমস্ত আমোদ-আহ্লাদ বন্ধ হইয়া গেল। নিমন্ত্রিতেরা ভয়ে লজ্জায় কেহ

---

* কোন ফ্রাঁক গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে গৃহীত।

কাহারো দিকে চাহিতে পারিতেছিলেন না। আমাদেরই মধ্যে নিশ্চয় কেহ না কেহ দুল্ লইয়াছে। সন্দেহটা কাহার উপর পড়িবে এই ভাবিয়া সকলেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। আমরা ভাবিলাম যে মেরী যখন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল এবং সকলে যখন তাহার কাছে ছুটিয়া গিয়াছিল—নিশ্চয়ই সেই সময়ে কেহ দুল্‌জোড়াটি খুলিয়া লইয়াছে; কিন্তু কেমন করিয়া এত লোকের মাঝখানে দুল্ খুলিয়া লইল—তাহা ভাবিয়া পাইলাম না।

সব চেয়ে দুঃখ যে আমার বেশী হইল তাহা বলাই বাহুল্য;—আমার এ স্নেহের উপহার বেচারী মেরীর ভোগে আসিল না। তা ছাড়া এই দুল্‌জোড়া আমার বিশেষ আদরের সামগ্রী ছিল—ইহা আমার স্বর্গীয়া স্ত্রীর দ্রব্য—মেরীও তাহা জানিত। মনে ভাবিলাম, ইহার বদলে মেরীকে আর একটা কিছু উপহার দিব। ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে এক সেট্ মূল্যবান চিনামাটির চায়ের বাসন কিনিয়া পরদিনই মেরীকে পাঠাইয়া দিলাম। মেরী পত্র লিখিয়া উপহার প্রাপ্তি ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল, সে পত্রের প্রতি ছত্রে তাহার সহৃদয়তা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছে, মেরী শেষে লিখিয়াছে যে আমার এই স্নেহের উপহার তাহার বসিবার ঘরের একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে এবং উপহারদাতাকে সর্ব্বদা স্মরণ করাইয়া দিবে।

সে পত্রে দুলজোড়াটির উল্লেখ-মাত্র ছিল না, ভাবিলাম পাছে সে দুর্ঘটনা স্মরণ করিয়া আমি বেদনা পাই তাই মেরী সে কথার উল্লেখ করে নাই। আমি এ বিষয়ে আলোচনা না করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম, সে কথা ভাবিয়া আর কি ফল? সে হারাণো দুল্ যে আর পাওয়া যাইবে, সে আশাও আমার ছিল না; কেননা এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে গেলে আরো কেলেঙ্কারী হইবে মাত্র, উল্টা আমাদের বন্ধুবান্ধবদের নামে একটা কলঙ্ক হইবে। এ সম্বন্ধে আর উচ্চবাচ্য না করাই সঙ্গত মনে করিলাম।

পরদিন বিবাহ—সে দিন মেরীর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ মাত্র হইয়াছিল, কোন কথা কহিবার সুযোগ হয় নাই। সেই দিনই সন্ধ্যার সময় মেরী তাহার স্বামীর সহিত চলিয়া গেল, তিন সপ্তাহ পরে তাহারা ফিরিবে।

• • • •

নবদম্পতি ফিরিয়া আসার প্রায় দুই সপ্তাহ পরে, আমি তাহাদের গৃহে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। অন্য কেহ আসিবার অনেক পূর্ব্বেই আমি তাহাদের গৃহে পৌঁছিয়াছিলাম—দেখিলাম আমার প্রদত্ত চায়ের সেট্‌টি বসিবার ঘরে, যেখানে সকলেরই চোখে পড়ে এমন স্থানে সাজান রহিয়াছে। বুঝিলাম মেরী তাহার কথা রক্ষা করিয়াছে।

আমি অনেকক্ষণ মেরীর অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম, মেরীর সাজসজ্জা তখনও শেষ হয় নাই। ভাবিলাম আমার মত বয়স্ক, পুরাতন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এত সাজসজ্জা করিবার কি প্রয়োজন ছিল।

অবশেষে মেরী আসিল, তাহার মুখে এমন একটা অব্যক্তভাব প্রকাশ পাইতেছিল তাহা বর্ণনা করা কঠিন। তাহার মনে কি

হইতেছিল তাহা অনুভবের চেষ্টা করিলাম। সে আমার কাছে আসিয়া, তাহার ক্ষুদ্র হাত দুখানি আমার হাতে রাখিল—তাহার চোখ দুটি অজ্ঞাতে আনত হইল—সে যেন আমার দিকে চাহিতে পারিতেছিল না। আমি তাহার মুখে একটা অদ্ভুত ভাবের আভাস পাইলাম। যেন নিতান্ত ভীত হইয়া সে আমার কাছে তাহার অপরাধ স্বীকার করিতে আসিয়াছে। তারপর সে যখন কোন প্রকার কুশল প্রশ্ন না করিয়া প্রথমেই বলিয়া উঠিল—"তুমি জান না আমি কতটা আঘাত পাইয়াছি"—তখন আমার আশ্চর্য্যের সীমা রহিল না। এতদিন পরে আমার সে হারাণো দুলের কথা পাড়িবার কি দরকার ছিল! আর সে কথা বলিতে তাহার এত সঙ্কোচই বা কেন? যাহা অতীত তাহা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল—আর সে কথা কেন? আমার নূতন উপহার—সেই পরের সেট্‌টিও—তার সামনেই রহিয়াছে, উপহারের কথা যদি বলিতে হয়, তবে সেই কথা বলিলেই ত চলে। তা'ছাড়া, মিঃ লেপেয়ারও ত সেই নাচের মজলিসের পর অনেক বারই হারাণো দুলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন; এ অবস্থায় সাধারণতঃ যেমন হয়, তিনি একই ভাষায়, একই ভাবে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। আর মেরী—তাঁর দুঃখ প্রকাশের ভাষায় যেন একটু অনুতাপের ভাব ছিল, ইহা আমার নিকট ভারী অদ্ভুত ঠেকিল। বোধ হয় আমার ভুল হইয়া থাকিবে, কিন্তু মন ঠিক বুঝিল না, আমি অন্য কথা পাড়িলাম বটে, কিন্তু মনটা সেই দিকে পড়িয়া রহিল, আমি বেশ লক্ষ্য করিলাম, আমার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে যেন নিতান্ত সঙ্কোচে মেরীর চোখ দুটি কতবার লজ্জানত হইতেছিল। আমার মত পুরাতন বন্ধুর সহিত ব্যবহারে যে স্বাভাবিক নিঃসঙ্কোচ, আজ মেরীর তাহা কোথায় গেল? যাহা হউক ক্রমে কথায় বার্ত্তায় সে ভাব কাটিয়া গেল এবং মেরীর পূর্ব্বের সেই বালিকাসুলভ চপলতা, সেই হাস্য কৌতুক কতকটা ফিরিয়া আসিল।

তার পর একদিন আমি মেরী, তার স্বামী ও পিতামাতাকে সান্ধ্যভোজের নিমন্ত্রণ করিলাম, সেই সঙ্গে আরও কতকগুলি লোককেও নিমন্ত্রণ করিলাম, তারা আমারই মত ঔপন্যাসিক এবং আমাকে তারা গুরুর মত মানিত। এই সান্ধ্যমিলনে লৌকিকতার কঠোর বন্ধন ছিল না—সকলেই বেশ বন্ধুভাবে মিশিয়া আমোদ করিতেছিল। আহারের পর সকলে আমার লেখার ঘরে গিয়া উপস্থিত, গল্প বেশ জমিয়া উঠিল। খাবার টেবিলে মেরীর হাস্য পরিহাস, আনন্দ বেশ সহজ স্রোতে প্রবাহিত হইয়া আমাদিগকে আনন্দ দান করিতেছিল—এখন সে তার স্বামীর পাশে শান্ত ভাবে বসিয়াছিল—তার মুখে সন্তোষ এবং একটা পরিপূর্ণ সুখের শান্ত জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছিল। সে মাঝে মাঝে অন্যের অলক্ষ্যে তার স্বামীর হস্ত স্পর্শ করিতেছিল—চারিদিকে এত যে গল্প, হাস্য-পরিহাস চলিতেছিল—সে সব যেন তাকে স্পর্শ করিতেছিল না।

আমার বন্ধুবর্গ কথায় কথায় আমার

উপন্যাসের সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। এক জন অন্তের মুখপাত্র হইয়া আমার বই-গুলির সুখ্যাতি করিতেছিলেন—এমন উচ্চ-অঙ্গের উপন্যাস আজকালকার দিনে দুর্লভ, এমন কল্পনা ইত্যাদি। আমার প্রণীত বইগুলি সেইখানেই আলমারীতে সাজানো ছিল—একে একে অনেকেই এক এক খানি বই উঠাইয়া লইলেন। সুখ্যাতির স্রোত চলিতেছিল—আমার সেই বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে কে বলিয়া উঠিল "বাস্তবিকই কি সুন্দর উপন্যাস! মানব-জীবনের বাস্তব চিত্র!"

আমি বিস্মিত হইলাম—এ যে মেরীর গলা। মেরী ত পূর্ব্বে কখনও এমন করিয়া আমার বইয়ের সুখ্যাতি করে নাই। অকস্মাৎ এতটা ভাবপ্রবণতা প্রকাশ করিয়া মেরী যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, ইহার পর উত্তরে আমার কিছু বলা নিতান্ত প্রয়োজন মনে করিয়া আমি মেরীর কাছে গিয়া বলিলাম,—"মেরী, তুমি যখন আমার লেখার এতটা পক্ষপাতী, তখন তোমার একসেট বই পাওয়া উচিত।"

"ঠিক কথা, কিন্তু আমার কাছে ত আপনার প্রায় সব বই-ই আছে! মনে হচ্ছে যেন—"

"আচ্ছা,—ঐ ত সব বই-ই সাজানো আছে; একবার আলমারীর কাছে গিয়ে দেখ না, কোনখানা নেই। যদি কোনো খানা বাদ পড়িয়া থাকে, সে খানা আমি তোমায় উপহার দিব।"

আমি তাকে আলমারীর নিকট লইয়া গিয়া একে একে বইগুলির নাম পড়িতে লাগিলাম। প্রথম তিনখান বইয়ের নাম শুনিয়া মেরী নিসঙ্কোচে বলিল—"এগুলো আমার আছে।" চতুর্থ খানা দেখাইয়া বলিলাম—"এ খানার নাম—'মিরিয়ম'—তোমার আছে?"

"মিরিয়ম! হাঁ!—না; না কই, মনে হচ্ছে না ত! বোধ হয় আছে!—না, না, মিরিয়মখানা আমার নিশ্চয়ই নেই।" বলিতে বলিতে মেরীর মুখমণ্ডল লজ্জারুণ হইয়া উঠিল—সে নিতান্ত অপরাধীর মত যেন ভীত হইয়া চুপ করিয়া গেল।

"আচ্ছা, তা' বেশ! এত গোলমালের দরকার কি? আমি তোমাকে আমার বইয়ের সম্পূর্ণ এক সেট তোমার নাম লিখিয়া উপহার দিব। তোমার যেগুলো আছে সেগুলো তুমি তোমার বন্ধু-বান্ধব-দিগকে বিলাইয়া দিতে পার—কেমন?"

কথামত পরদিন আমি স্বহস্তে নাম লিখিয়া এক সেট বই মেরীকে উপহার দিলাম। তার মধ্যে 'মিরিয়ম'-খানা দিতে ভুলিলাম না। আমি বেশ বুঝিলাম যে যদিও মেরী অস্বীকার করিল, কিন্তু এখানা তার নিশ্চয়ই আছে, শুধু আছে নয় সে নিশ্চয়ই একাধিক বার ইহা পড়িয়াছে। এই বইখানা সম্বন্ধে মেরীর সঙ্কোচ, তার গোলমেলে উত্তর শুনিয়া আমার মনে একটা খটকা উপস্থিত হইল—সন্দেহটা এত অদ্ভুত যে তাহা মনে স্থান দিতে আমি ইতস্তত করিতেছিলাম। বড় ইচ্ছা হইতেছিল যে তাহার সত্যতা প্রমাণ করি। কিন্তু মেরী তাহার বইগুলি আপনার শয়ন কক্ষে রাখিত—আমি কেমন করিয়া দেখিতে পাইব—তার 'মিরিয়ম' আছে কি না?

তা' ছাড়া সে যদি বইখানি লুকাইয়া ফেলে, আমি ধরিব কেমন করিয়া! কিন্তু কেন? এ লইয়া তার লুকোচুরী করার প্রয়োজন? তবে কি ইহার সহিত সেই দুল্ হারাণোর ব্যাপারের কোন যোগ আছে? হঠাৎ আমার চোখের সাম্নে হইতে যেন একখান পরদা সরিয়া গেল! 'মিরিয়ম' উপন্যাসের গল্পাংশ স্মরণ করিতে গিয়া আমি যেন মেরীর এ ব্যবহারের সম্যক অর্থ বুঝিতে পারিলাম, বালিকা-হৃদয়ের এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া আমার মন নিতান্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। ইহা কি সত্য—না আমার কল্পনা? যদি সেই হারাণো দুল্‌জোড়াটি, আমি যেখানে ভাবিতেছি সেইখানেই থাকে, তবে ত আমার এ সিদ্ধান্ত কেবল মাত্র আমার কল্পনা-প্রসূত নহে। আমি যতই ভাবিতে লাগিলাম, ততই আমার মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হইতে লাগিল যে, আমার সে উপহার মিঃ লেপেয়ারের ঘরে যেখানে মেরী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল তাহারই কাছা-কাছি কোনো জায়গায় আছে—অন্যত্র যায় নাই। অন্যের অজ্ঞাতে আমি কেমন করিয়া তাহা বাহির করিব?

মিঃ লেপেয়ার সাধারণত যে সময় গৃহে থাকেন না, আমি একদিন সেই রকম সময়ে তাঁহার বাটী গেলাম। আমি জানিতাম তিনি গৃহে নাই—চাকরকে বলিলাম আমি তাঁর জন্য অপেক্ষা করিব। যে ঘরে নাচ হইয়াছিল, আমি তার পাশের ঘরেই বসিলাম। 'বলরুমে'র পাশের বারান্দায় ক্ষুদ্র কৃত্রিম পাহাড়ের উপর একটি কৃত্রিম ফোয়ারা, তারই নিচে যে জলাধার ছিল, আমার লক্ষ্য সেই দিকে গেল। সে পাত্রটি বালুকাপূর্ণ—খুঁজিতে খুঁজিতে সত্যই সেই বালুকারাশির মধ্যে আমার উপহৃত সেই দুল্‌জোড়াটি রহিয়াছে। তবে কি আমার অনুমানই সত্য? এ বিষয়ে আমার যুক্তি-প্রণালী এইরূপ—মেরীর কথার ভঙ্গী, তার সঙ্কুচিত ভাব দেখিয়া আমি বেশ বুঝিলাম যে আমার প্রণীত 'মিরিয়ম' উপন্যাস তাহার আছে এবং নিশ্চয়ই সে বইখানি পড়িয়াছে—তবে এ কথা অস্বীকার করিবার হেতু কি? দুল্‌জোড়াটি হারাণোর দিনও মেরীর এমনি ত্রস্ত ভাব, অপরাধীর মত সঙ্কোচ লক্ষ্য করিয়াছিলাম। আমি অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া দুল্‌জোড়াটি আমার অনুমিত স্থানে পাইলাম। মেরীর এরূপ ব্যবহারের কারণ কি? আমারই 'মিরিয়ম' আমাকে পথ দেখাইল। একটা খেয়ালের মাথায় আমি এই ক্ষুদ্র উপন্যাসখানি লিখিয়াছিলাম, তখন কে জানিত যে আমার জীবনেই এই খেয়াল সত্যে পরিণত হইবে। আমার এই উপন্যাসের নায়িকা—একটি বালিকা, সে তাহার পিতার বয়সী একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে ভাল বাসিত—বালিকাহৃদয়ের এই অদ্ভুত রহস্য লইয়াই ইহা লিখিত। ঠিক যে কারণে বাল্যকালে ছেলেরা তাহাদের বয়স্কা পরি-চারিকা বা নিসম্পর্কীয়া মহিলার প্রেমে পড়িয়া থাকে—ইহাও কতকটা সেই রকম—এ বয়সে বয়স্ক লোকদিগকে সকল বিষয়ে আদর্শ এবং ভালবাসার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া মনে হয়। তার পর একটু বয়স ও জ্ঞানের সঙ্গে এটা কাটিয়া যায়। সরলহৃদয়া বালিকা মেরী, এমনি করিয়াই মনে মনে তাহার বালিকা-

হৃদয়ের পবিত্র প্রেম তাহার পিতৃবন্ধুকে সমর্পণ করিয়াছিল। নির্ব্বোধ বালিকা! সে যে মনে মনে আমাকে কতটা ভাল বাসিয়াছে, আমার কথা ভাবিয়া কত বিনিদ্র রজনী কাটাইয়াছে এবং কত ভয়ে ভয়ে সে তাহার এই ভালবাসা লোকচক্ষু হইতে গোপন করিয়া রাখিয়াছে—তাহা কে জানিবে। সে যে কত দিন সচকিত নেত্রে আমার আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছে, কত প্রাণপণ চেষ্টায় সে আপনার হৃদয়কে সংযত করিয়াছে, তাহার হৃদয়ের উদ্বেলিত ভাবস্রোত রুদ্ধ করিয়াছে, তাহা কে বুঝিবে? হায়! সে কি তখন এই ভালবাসার অযৌক্তিকতা, ইহার ফলাফল বিবেচনা করিয়াছিল—না তাহার সে ক্ষমতা ছিল? ক্রমে আমি বুঝিতে পারিলাম যে কেন সে আমার সে স্নেহোপহারসামগ্রী লুকাইয়া রাখিয়াছিল—কেন সে আমার স্পর্শে, আমার সস্নেহ চুম্বনে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। সে আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতার সহিত আমার প্রদত্ত চায়ের সেট, গ্রহণ করিয়া তাহার বসিবার ঘরে রাখিয়াছিল। আমার এই নূতন উপহার যে সর্ব্বদা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিবে! কিন্তু দুল্‌জোড়াটি—সে যে তার কাছে আমারই আদর-স্পর্শের, আমারই স্নেহালিঙ্গনের মত তাহার অঙ্গে সর্ব্বদা থাকিবে—এ কথা ভাবিতে সে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, তাই সে সে দু'টিকে হারাইয়া ফেলার ভাণ করিয়াছিল। আমি মনে মনে মেরীর স্ত্রীসুলভ বিচারশক্তির সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সে তাহার স্বামীকে ভাল বাসে—এখন আর সে আমাকে সে পরিপূর্ণ প্রেমের অংশ দিতে চাহে না—তাই আমার উপহার অঙ্গে ধারণ করিতে তার এত আপত্তি! সে হয় ত এই দুল্‌-জোড়াটি পরা স্বামীর প্রতি ভালবাসার ত্রুটি বলিয়া মনে করিয়াছিল। তাই সে বালিকা অন্তের অলক্ষ্যে দুল্‌জোড়াটি হাতের কাছে যে যায়গা পাইয়াছিল সেইখানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। সরলা বালিকা আত্মহৃদয়ের শক্তি না জানিয়া তাহার সীমা অতিক্রম করিয়াছিল, তাহার ফলে অত্যধিক মানসিক উত্তেজনায় সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, তখন তাহার কাণে দুল্ ছিল না।

আমি এমনি করিয়া বালিকা মেরীর প্রথম প্রেমের ইতিহাস মনে মনে গঠন করিলাম। সব কথা হাতে-কলমে প্রমাণ করিতে পারি—এমন মসলা আমার কাছে নাই। আমি আমার এই সন্দেহ প্রকৃত কি না মেরীর নিকট জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম—জানি না কোন্ শয়তান আমার মাথায় এই খেয়াল চাপাইয়া দিল।

সে দিন মেরীদের গৃহে বন্ধু-সমাগম হইয়াছিল। মেরী তাহার বন্ধুদিগের জন্য চা তৈয়ার করিতেছিল, আগন্তুকেরা গল্প করিতেছিলেন। আমি গিয়া কথাবার্ত্তায় যোগদান করিলাম। কথায় কথায় মানুষের মন যে একটা অদ্ভুত পদার্থ—এমনি একটা কথা উঠিল। আমি বলিলাম—"বাস্তবিকই মনুষ্য-হৃদয়ের রহস্য বিশ্লেষণের অতীত—তাহা যুক্তিতর্কের নিয়ম জানিয়া চলে না, অনেক সময়, আমরা আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তুকে শুধু ভালবাসি বলিয়াই ত্যাগ করি,—তাই অনেক সময় আমরা ভালবাসার

নিদর্শন সযত্নে রক্ষা না করিয়া বরং তাহা জলে ফেলিয়া দিই।"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে মেরীর হাত হইতে আমারই সেই প্রীতি-উপহার—একটা চায়ের পেয়ালা পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে আমি মেরীর পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম এবং তাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম—"মেরী, আমাকে এই ভাঙ্গা টুকরাগুলি দাও—আমি ঠিক এমনি একটা পেয়ালা তৈয়ার করাইয়া আনিব। নমুনা পাঠাইয়া দিলে আবার তোমার সেটি পূর্ণ হইতে পারিবে। কোন কথা না বলিয়া

সেই টুকরাগুলি কুড়াইয়া আমার হাতে দিল—আমি সেগুলি রুমালে বাঁধিয়া লইয়া গৃহে ফিরিলাম।

প্রতিশ্রুতি মত আমি পেয়ালার কয়েক খণ্ড মাত্র নমুনা স্বরূপ কারিগরের নিকট পাঠাইয়া, বাকী টুকরাগুলি এবং সেই ছুরি-জোড়াটি মেরীর বালিকা-হৃদয়ের অকলুষ প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ সযত্নে রাখিয়া দিলাম। আমার এই শুষ্ক জীবনে "ক্ষীণপুণ্যফলে" আমি যে প্রেমের আভাসমাত্র পাইয়াছিলাম আমারই সেই উপহারগুলি তাহার শেষ চিহ্ন রহিল।

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার।

শাক্য-মত

কোন কোন বৌদ্ধ-মূর্ত্তির পাদপীঠে বা প্রভামণ্ডলে একটি মন্ত্র উৎকীর্ণ হইত। নানা স্থানে আবিষ্কৃত বৌদ্ধ মূর্ত্তির ধ্বংসাবশেষে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বরেন্দ্র-ভূমিতেও তাহার নিদর্শনের অভাব নাই। মালদহ জেলার পাণ্ডুয়ার নিকটে আবিষ্কৃত বোধিসত্ত্ব-লোকনাথের পাদপীঠে, বগুড়া জেলার ক্ষেতলালে প্রাপ্ত লোকেশ্বরের প্রভামণ্ডলে, দিনাজপুর জেলার কাশীপুরে প্রাপ্ত চতুর্দ্দশভুজ অবলোকিতেশ্বরের পাদপীঠে, বালুরঘাটে সমানীত ব্যাখ্যান-মুদ্রাধারী বুদ্ধমূর্ত্তির পাদপীঠে, এবং দিনাজপুর-রাজবাটীতে সংরক্ষিত প্রস্তর-চৈত্যে এই মন্ত্রটি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট ইহা সুপরিচিত হইলেও, বঙ্গসাহিত্যে ইহার আলোচনা স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। মন্ত্রটি এই,—

"যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবা হেতুং তেষাং তথাগতো
হ্যবদৎ তেষাঞ্চ যো নিরোধ এবং বাদী,
মহাশ্রমণঃ ॥"

কোন কোন স্থলে "এবং বাদী" এই দুইটি শব্দ "এবম্বাদী" রূপেও উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এক সময়ে ইহা সমগ্র বৌদ্ধ-প্রভাবক্ষেত্রেই সুপরিচিত ছিল। যবদ্বীপাদি সুদূরদেশেও ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মন্ত্রটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইলেও, ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য সহসা প্রতিভাত হয় না।

ইহা বৌদ্ধমত-বিজ্ঞাপক, তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য কি? এক সময়ে তদ্বিষয়ে বাদানুবাদের অভাব ছিল না। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের অধ্যবসায়-গুণে ইহা ত্রিপিটকের অন্তর্গত বিনয়-পিটকের একটি সূত্র বলিয়া প্রকাশিত হইবার পর, ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য সুবিদিত হইয়াছে। অধ্যাপক হুভ্ ডেভিডস্ প্রথমে ইহার ব্যাখ্যাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনি বিনয়-পিটকের অনুবাদে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে,—"যাহা কিছু হেতু-প্রসূত, তথাগত [বুদ্ধদেব] তাহারও হেতুর ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং তাহার যাহা নিরোধ, তাহারও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ইহাই মহাশ্রমণের ধর্ম্ম-মত।"* এরূপ অনুবাদে প্রত্যেক শব্দের অর্থ প্রকটিত হইলেও, মন্ত্রটির প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত হয় না। তজ্জন্য টীকা আবশ্যক।

শাক্যসিংহের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার জন্মভূমিতে যে সকল মত ও বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে জন্মান্তর-রহস্য সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। লোকে বিশ্বাস করিত,—মৃত্যুই শেষ নহে, তাহা অবস্থান্তর-লাভ; এক জন্মের শেষে আর এক জন্মের আরম্ভ। ইহার শেষ না হইলে, মুক্তিলাভের উপায় নাই। শাক্যসিংহ এই প্রচলিত বিশ্বাস মানিয়া লইয়া, তাহাকে "ভব-চক্র" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, এবং কি উপায়ে তাহার গতিরোধ করা যাইতে পারে, তাহার আবিষ্কার-সাধনের জন্যই রাজসিংহাসন উপেক্ষা করিয়া সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—

"অনিচ্চং দুক্খং অনত্তং।"

অর্থাৎ

"অনিত্যং দুঃখং অনাত্মকম্।"

যাহা কিছু দেখিতেছ, সমস্তই এক ধর্ম্মাক্রান্ত,—অনিত্য, দুঃখময়, অপ্রকৃত। ইহার কারণ কি? শাক্যসিংহ বলিতেন, ইহার কারণ যাহা হউক, তাহা আমাদিগের বাহিরে নহে, অভ্যন্তরে; এবং তাহার নিরোধ-সাধনের শক্তিও আমাদিগের বাহিরে নহে, অভ্যন্তরে। তৃষ্ণাই কারণ, তাহার কারণ অবিদ্যা। যাহা দুঃখ, তাহাকে দুঃখ বলিয়া না জানা; তাহার হেতু কি, তাহা না জানা, তাহার নিরোধ কিরূপে সাধিত হইতে পারে, তাহা না জানা;—এই সকল "অজ্ঞানই" বিনয়-পিটকে "অবিদ্যার" পারিভাষিক অর্থ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অবিদ্যাই সকল হেতুর হেতু, এবং তাহার নিরোধই নিরোধ,—ইহা মানিয়া লইবার জন্য ভারতবর্ষের লোকসমাজ পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল; কিন্তু কি উপায়ে তাহা লাভ করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে মতভেদের অভাব ছিল না। শাক্যসিংহ "ধর্ম্মশীলের" সাধনকেই নিরোধ-সাধনের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এক দিক হইতে দেখিয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ শাক্য-সিংহের "অনিচ্চং দুক্খং অনত্তং" এই মূলমন্ত্রকে নিরাশার মন্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

* Of all objects which proceed from a Cause. The Tathagata has explained the Cause; And he has explained their cessation also: This is the doctrine of the great Samana.
Vinaya Texts, I. 146

কোটী কোটী লোকে এই নিরাশা-বাদকে স্বীকার করিয়াছিল কেন, তাহা তাঁহাদিগের নিকট রহস্যময় বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু ইহা নিরাশা-বাদ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না; লোকেও ইহাকে সেরূপভাবে গ্রহণ করে নাই। ইহা প্রাচ্য-সমাজে একটি চিরপুরাতন সুপরিচিত সত্যরূপে প্রতিভাত হইত। সেই সমাজে শাক্যসিংহ যখন সকলকে শুনাইলেন, ইহার হেতু আমাদিগের বাহিরে নহে, অভ্যন্তরে; ইহার নিরোধের উপায়ও আমাদিগের বাহিরে নহে, অভ্যন্তরে;—তখন লোকে সেই উপায় জানিবার জন্য এবং তাহা অবলম্বন করিবার জন্য স্বাভাবিক আগ্রহে দলে দলে তাঁহার শরণাগত হইয়াছিল। ইহাতে মানব-সমাজে এক নূতন আশা জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শাক্যসিংহের তিরোভাবের পর সাধকগণ দীর্ঘকাল "দশশীলকেই" একমাত্র উপায় বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। সমস্তই অনিত্য, দুঃখময় এবং অপ্রকৃত;—তাহার হেতু আমাদিগের বাহিরে নহে, অভ্যন্তরে; তাহার নিরোধের উপায়ও আমাদিগের বাহিরে নহে, অভ্যন্তরে,—এই মূল সত্যে আস্থাবান থাকিয়াও, সাধকগণ ক্রমে ক্রমে নিরোধ-সাধনের অন্যান্য পথেরও সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; এবং ভারতবর্ষে যত প্রকার সাধনপথ পরিচিত বা প্রচলিত হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে তৎসমস্ত একে একে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। এই রূপে শাক্যমত কালক্রমে আর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারে নাই; তাহা সকল মতের সঙ্গেই আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্য সংস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া, ধীরে ধীরে বৈদান্তিক মতে বিলীন হইয়া গিয়াছে। জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—

In the latter developments, the agnostic idealism of primitive Buddhism swung round into a materialistic theism which verges on pantheism, and when the second link of the Causal Chain, namely, *Samskara* comes closely to resemble the *modi* of Spinoza; and Nirvana or rather Puri-nirvana, is not different practically from the Vedantic goal: assimilation with the great universal soul:

"The dew-drop slips into the shining sea."*

"যে ধর্ম্মা"—মন্ত্রেও ইহারই আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই মন্ত্র যে যুগে সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইয়াছিল, সে যুগে শাক্যসিংহের মত ও বিশ্বাস ব্যক্তিগত মত ও বিশ্বাস বলিয়া পরিচিত ছিল না। তখন লোকে বহুসংখ্যক বুদ্ধের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত,—সকলের পক্ষেই বুদ্ধত্ব লাভের সম্ভাবনায় বিশ্বাস করিত;—এবং অবিদ্যাকে সকল হেতুর হেতু এবং তাহার নিরোধোপায়কেই নির্ব্বাণ লাভের পথ বলিয়া বিশ্বাস করিত। সে পথ তখন নানা ভাবে নানা সম্প্রদায়কে এক-লক্ষ্যের দিকে আকর্ষণ করিতেছিল। সুতরাং যে কোনও উপায়ে নিরোধ-সাধনে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা দেখিত, বৌদ্ধগণ তাহাকে আত্মসাৎ করিতে অসম্মত হইত না।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

* Waddell's Buddhism of Tibet, p. 122.

ফিডো

সক্রেটিস্,—আত্মহত্যাবিধি সঙ্গত নহে বলিয়া পালঙ্ক হইতে পদদ্বয় উত্তোলন করিয়া ভূমিতলে রাখিলেন এবং যতক্ষণ কথাবার্ত্তা চলিয়াছিল ততক্ষণ এইভাবে বসিয়াছিলেন।

সিবেস বলিলেন—"তাহা হইলে সক্রেটিস্ তোমার এ কথা কিরূপ হইল? তুমি একবার বলিতেছ আত্মহত্যা বিধিসঙ্গত নহে এবং আবার বলিতেছ যে দার্শনিক মাত্রেরই মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করা উচিত?"

সক্রেটিস্ বলিলেন—"সিবেস, তুমি এবং সিমিয়াস, ফিলোলাসের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে কি এ সকল বিষয় শোন নাই?"

সিবেস—না, বিশেষ কিছু শুনি নাই।

সক্রেটিস্—আমি যাহা শুনিয়াছি তাহাই বলিতেছি। আর যাহা শুনিয়াছি তাহা তোমাদিগকে বলিতেও কোন আপত্তি নাই। আরও দেখ আমি অন্য লোকে বাস করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। এখন সেই নিবাসস্থল কি সে বিষয়ে কল্পনা খাটান আমার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এখন হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত আর কোন্ ভাল বিষয় লইয়া সময় অতিবাহিত করা যায়?

সিবেস্—সক্রেটিস্, আত্মহত্যা বিধিসঙ্গত নয়, এ কথা কেন লোকে বলে? ফিলোলস্ যখন আমাদের সঙ্গে ছিলেন তখন বলিতেন এবং অন্যান্য সকলেও বলেন যে নিজ জীবন নষ্ট করা উচিত নয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমি কাহারও মুখে এ সম্বন্ধে সন্তোষজনক যুক্তি শুনি নাই।

সক্রেটিস্—ভয় নাই। তুমি শীঘ্রই কিছু শুনিতে পাইবে। তোমার পক্ষে ইহা আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে যে আত্মহত্যা সম্বন্ধে কেবল ঈশ্বরের নিয়ম অলঙ্ঘ্য ও অপরিবর্ত্তনীয়। সুতরাং অন্য বিষয়ে যে সকল যুক্তি দিতে পারা যায় তাহা এখানে খাটে না। কেহ কখন বলিতে পারে না,—যে কোন বিশেষ লোকের জীবিত থাকা অপেক্ষা মরণ ভাল; আর যাহাদিগের মরণই শ্রেয়স্কর তাহারা যদি নিজ হস্তে মরিয়া সুখী হইতে চায় তাহা তাহাদিগের পক্ষে ঘোর অধর্ম্ম। অন্য কোন উপকারী বন্ধু আসিয়া তাহাদিগকে মৃত্যুসদনে পাঠাইবে ইহার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। এই নিয়মটী অন্যায় বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু বোধ হয় ইহার ভিতর কোন একটী যুক্তি আছে। তত্ত্বে বলে যে আমরা মানবকুল দেবতাদিগের তত্ত্বাবধানে আছি, সে আশ্রয়ের নিয়ম ভঙ্গ করা কিংবা তাহা হইতে পলায়ন করা আমাদের পক্ষে উচিত নয়। এ কথাটী গভীর, ইহা সহজে বোঝা যায় না। তথাপি সিবিস্, আমরা এই পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া লইতে পারি যে দেবতারা আমাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন এবং আমরা তাঁহাদিগের সম্পত্তি। এ কথাটী কি সত্য বলিয়া বোধ হয় না?

সিবেস্—হাঁ।

সক্রেটিস্—এবং যদি তোমার ক্রীতদাস তোমার অমতে আত্মহত্যা করে তাহা

হইলে কি তুমি তাহার উপর ক্রুদ্ধ হও না; এবং যদি পার তাহাকে কি দণ্ড দাও না?

সিবিস্—নিশ্চয়ই।

সক্রেটিস্—সেইরূপ বোধ হয় ইহাও বলা যাইতে পারে যে যতক্ষণ না ঈশ্বর কোন বিশেষ প্রয়োজন দেখিবেন ততক্ষণ কোন লোক আত্মহত্যা করিতে পারিবে না।

সিবেস্—হাঁ, ইহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সক্রেটিস্! ইহা যদি সত্য হয় যে ভগবান আমাদিগের তত্ত্বাবধান করেন এবং আমরা তাঁহার সম্পত্তির একাংশ, তাহা হইলে তুমি যাহা বলিলে যে দার্শনিকেরা মরিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত এবং ইচ্ছুক, তাহা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। একজন নির্ব্বোধ তাহার প্রভুর হস্ত হইতে পলায়ন করিতে ইচ্ছা করিতে পারে। সে বিবেচনা করে না যে যদি তাহার প্রভু উত্তম হয়, তাহা হইলে পলায়ন করা দূরে থাকুক কায়মনোবাক্যে তাঁহার অনুগত থাকা উচিত সুতরাং সক্রেটিস্! তুমি যাহা বলিতেছ তাহার বিপরীত কথাই ঠিক বলিয়া বোধ হয়। জ্ঞানী লোকের মরিবার সময় দুঃখিত হওয়া উচিত। নির্ব্বোধেরা সে সময় আহ্লাদিত হয়।

সক্রেটিস্ এই কথা শুনিয়া সিবেসের আগ্রহ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং আমাদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—

"সিবেস সর্ব্বদা একটা যুক্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত এবং যে যাহা বলে তাহা একেবারে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নয়।"

সিমিয়াস্—সক্রেটিস্! সিবেস যাহা বলিলেন আমারও তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে। জ্ঞানী লোকেরা ভাল প্রভুর হস্ত হইতে কেন পলায়ন করিতে চাহিবে? আমার বোধ হয় সিবেস্ তোমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যুক্তি চালাইতেছে। কারণ তুমি বলিতেছ দেবতারা দয়াল প্রভু, অথচ তাঁহাদের ছাড়িতে চাহিতেছ এবং আমাদিগকেও ছাড়িতে চাহিতেছ। (ক্রমশ)

কৃষ্ণবিহারী সেন।

বঙ্কিম-চরিত

১৮৫৬ খৃঃ বঙ্কিমচন্দ্র সিনিয়ার স্কলারশিপ পাস করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইলেন এবং আইন পড়িতে আরম্ভ করিলেন, সেই সময়ে ১৮৫৭ খৃঃ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রথম স্থাপিত হয় এবং বঙ্কিমচন্দ্র সে সময়ে বহুসংখ্যক ছাত্রদিগের সহিত Matriculation পরীক্ষা দেন। পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৫৮ খৃঃ সর্ব্বপ্রথম B. A. পরীক্ষা প্রচলিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র কেবল Law lecture শুনিতে যাইতেন; কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যে একদিনও B. A. lecture গৃহে পদার্পণ করেন নাই। সুতরাং কেহ

বি, এ পরীক্ষা দিবেন। কিন্তু তখনও নিজের ক্ষমতার উপর খুব বেশী বিশ্বাস ছিল, সুতরাং পরীক্ষার ২।৩ মাস পূর্ব্বেই পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কোন রকমে কলেজের অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক-দিগের কাণে এ কথা পৌঁছিল। তাঁহারা শুনিলেন যে জীবনে কখনও B. A. lecture শোনেন নাই, এমন একজন Law Student B. A. পরীক্ষা দিবার মনস্থ করিয়াছেন; সুতরাং বাধ্য হইয়া খ্যাতনামা কলেজের অধ্যক্ষ ষ্টেটক্লিফ সাহেব ও ইতিহাসের অধ্যাপক কাওয়েল সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ডাকাইয়া তাঁহাকে অনেক প্রকারে বুঝাইয়া বলিলেন যে তিনি B. A. পরীক্ষা দিয়া কলেজের অবমাননা করিতে পারিবেন না, আর তাঁহারাও তাঁহাকে পরীক্ষা দিবার অনুমতি দিবেন না। বঙ্কিমচন্দ্র বেগতিক দেখিয়া বাধ্য হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার গ্রাপল সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলেন। এ দিকে Grapple সাহেব তখন জুরিস্-প্রুডেন্সের অধ্যাপনা সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রকে ভাল রকম জানিতেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের আশ্চর্য্য মেধাশক্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। Grapple সাহেব, Stateliffe এবং Cowel সাহেবের আপত্তি খণ্ডন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে বি, এ পরীক্ষা দিবার অনুমতি দিলেন। যখন পরীক্ষার ফল বাহির হইল তখন পূর্ব্বোক্ত সাহেবেরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিলেন বঙ্কিমচন্দ্র পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। সেই সময়ে সাহেবদের বিশেষ লজ্জা পাইতে হইয়াছিল। তাঁদের নিজেদের ব্যবহারের নিমিত্ত বঙ্কিমচন্দ্রকে ডাকাইয়া সাহেবেরা মিষ্ট কথায় সন্তুষ্ট করিলেন। তখনকার লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্ণর সকল দিক বজায় রাখিবার নিমিত্ত বঙ্কিমচন্দ্রকে ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট পদ প্রদান করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটী হইলেন, কিন্তু শেষ বয়সে ইহার নিমিত্ত তিনি বিস্তর অনুতাপ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন—জীবনে এমন একটা বিষম ভুল তিনি আর কখনও করেন নাই। ইহা তাঁহার জীবনের একটা দুর্ভাগ্য। তাঁহার পিতারও ইচ্ছা ছিল না যে পুত্র ডেপুটী হয়। যাদবচন্দ্র মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে পুত্র একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া অনেক টাকা অর্জ্জন করিয়া পিতাকে সাহায্য করিবেন ও নিজে একজন বড় মানুষ বলিয়া গণ্য হইবেন। তিনি পুত্রকে ঐ পদ পরিত্যাগ করিয়া আইন-পরীক্ষা দিয়া ওকালতী করিতে পরামর্শ দিতে প্রথমতঃ নিতান্ত ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু সে সময়ে ওকালতী বেশ সুবিধামত অর্থকরী ব্যবসা ছিল না। সেই সময়ে শ্রদ্ধেয় দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় ওকালতী করিতেন, তাঁহার সুবিধামত আয় হইত না। তিনি ঐ ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আরো একজন সহপাঠী আইন-ব্যবসায়ী হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট গল্প করিয়াছিলেন যে এক মাসের মধ্যে তিনি কেবল ১৸৹ আনা উপায় করিয়াছেন। যদি এ সকল অসুবিধা সহ্য করিয়া বঙ্কিমের মত উন্নতিশীল যুবা আইনব্যবসায়ী আরো দিন কতক অপেক্ষা করিতেন, তাহা হইলে

ভবিষ্যতে কি রকম হইত বলা যায় না, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা অর্থকষ্টহেতু পুত্রকে সে সুবিধা প্রদানে সম্মত হইলেন না। সুতরাং বাধ্য হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বাইশ বৎসর বয়সে অভিনব যৌবনে ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট হইয়া যশোহরে প্রেরিত হইলেন।

যশোহরে বঙ্কিমচন্দ্র ১৭ মাস ছিলেন। এইখানেই তিনি সর্ব্বপ্রথমে হাস্যরসের অবতার, সুরসিক খ্যাতনামা লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাটককার অমর দীনবন্ধুকে বন্ধুরূপে পাইয়াছিলেন।

শ্রীদিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাকৃত ভাষা

প্রাকৃতের মূল কোথায়? কোথা হইতে প্রাকৃত উৎপন্ন হইল? এই বিষয়ে দুই মত প্রচলিত আছে। এবং তাহা প্রাকৃত শব্দের মূলভূত প্রকৃতি শব্দের দ্বিবিধ অর্থ ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত।

(ক) প্রকৃতিতে যাহা জাত, বা প্রকৃতি হইতে যাহা আগত, তাহার নাম প্রাকৃত। এই প্রকৃতি কি? কেহ কেহ বলেন সংস্কৃত; কেননা, সংস্কৃত হইতেই তাহার উৎপত্তি; অতএব সংস্কৃত ভাষা প্রাকৃতের প্রকৃতি বা উপাদান-স্বরূপ, এবং প্রাকৃত তাহার বিকৃতি। হেমচন্দ্র ও প্রাকৃতচন্দ্রিকাকার প্রভৃতি এই মতাবলম্বী; * এবং এই মতই সাধারণত প্রচলিত, বিশেষত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতসমাজে ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

(খ) অপরেরা বলেন, প্রকৃতি অর্থাৎ নিসর্গ বা স্বভাবে যে ভাষা জাত হইয়াছে, অথবা প্রকৃতি অর্থাৎ নিসর্গ বা স্বভাব হইতে যে ভাষা আগত হইয়াছে, তাহার নাম প্রাকৃত; অপর কথায় প্রাকৃতিক অর্থাৎ নৈসর্গিক বা স্বাভাবিক ভাষার নাম প্রাকৃত। যাহার সংস্কার অর্থাৎ দোষাপনয়ন বা গুণাধান করা হইয়াছে, তাহার নাম সংস্কৃত; এবং যাহার তাহা হয় নাই, যাহা প্রকৃতি অর্থাৎ নিসর্গ বা স্বভাব হইতে যেরূপ জাত হইয়াছে, বা যেরূপ ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সেইরূপই আছে, তাহা প্রাকৃত। এই জন্য ঐ দুই শব্দ পরস্পর বিপরীতার্থবাচী।

আমরা সাধারণ মনুষ্যকে প্রাকৃত বলিয়া থাকি; এবং তাহার একমাত্র এই কারণ যে, সাধারণ মনুষ্যেরা প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাবে অবস্থিত; * তাহারা প্রকৃতি

* "অথ প্রাকৃতা।...প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং, তত্র ভবং, তত আগতং বা প্রাকৃতং।" হেমচন্দ্র, ৮,১,১।

"প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং তত্র ভবত্বাৎ প্রাকৃতং স্মৃতম্"—প্রাকৃতচন্দ্রিকা।

"প্রাকৃতস্য তু সর্ব্বমেব সংস্কৃতং যোনিঃ"—প্রাকৃত সঞ্জীবনী।

* শব্দরত্নাকরের এই অর্থে প্রাকৃত শব্দের নির্ব্বাচনটি বড় চমৎকার। উক্ত হইয়াছে—প্রাকৃতঃ প্রকৃষ্টম্ অকৃতম্ অকার্য্যং যস্য।" যাঁটি বৈয়াকরণিকগণের নিকট ইহার অধিক আশা করা যায় না, ইঁহাদের নির্ব্বাচনপটুতার পরিচয় পরে আরো পাওয়া যাইবে।

দেবীকেই প্রধানভাবে অনুসরণ করিয়া চলে, কৃত্রিম উপায়ে সুখ-স্বচ্ছন্দতা বা সৌন্দর্যবৃদ্ধি প্রকৃতির সহিত সংসৃষ্ট নহে ; প্রকৃতি তাহাদিগকে যেরূপ পরিচালিত করে, তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, সেইরূপেই তাহারা চলিয়া থাকে, তাহাকে অতিক্রম করিয়া গমন করে না। অপর পক্ষে যাঁহারা উচ্চ, তাঁহারা ঠিক প্রকৃতির অনুসরণে চলেন না, তাঁহারা নানা কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া সংস্কারে অর্থাৎ দোষাপনয়ন বা গুণাধানে প্রবৃত্ত হন, এবং তাহা দ্বারা সংস্কৃত হইয়া উঠেন।

মানুষের সম্বন্ধে প্রাকৃত শব্দটি যেরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, আলোচনীয় ভাষাসম্বন্ধেও তাহা সেইরূপভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে যে, স্বয়ং প্রকৃতি হইতে যে ভাষা জাত হইয়াছে,—প্রাকৃত সাধারণ লোকেরা যে ভাষা ব্যবহার করিত, তাহার নাম প্রাকৃত। বর্ত্তমান ভাষাতত্ত্ব-বিদ্‌গণের মধ্যে এই মতই সমধিক আদৃত দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা ক্রমশ এই উভয় মতই পরীক্ষা করিয়া দেখিব। যাঁহারা প্রথম মত পোষণ করেন, যাঁহারা বলেন যে, প্রকৃতি অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে জাত বলিয়া ইহার নাম প্রাকৃত, তাঁহারা প্রকৃতি শব্দের অর্থ সংস্কৃত ধরেন কেন, তাহার বিশেষ যুক্তি নাই। আলোচ্য ভাষায় সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য্য দেখিয়াই হয় ত তাঁহারা ঐ গৌণ অর্থ ধরিয়া থাকিবেন। কিন্তু যাঁহারা এই ভাষাকে বুঝাইবার জন্য প্রথমে প্রাকৃত শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি ঐ অভিপ্রায়ই মনে পোষণ করিতেন,—তাঁহারা যদি স্থির করিয়া থাকিতেন যে, সংস্কৃত হইতেই ঐ ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে, তাঁহারা ঐ ভাষার নাম প্রাকৃত না করিয়া, খুব সম্ভব, সংস্কৃত অথবা অপর কোন এতাদৃশ শব্দ প্রয়োগ করিতেন। বিশেষত এরূপ অবস্থায় বরং ইহার নাম বিকৃত অথবা বৈকৃত, কিম্বা অপর কিছু এইরূপ করা উচিত ছিল ; যাহা বিকৃত, তাহার এই নামই সোজা-সরল, প্রাকৃত নাম তাহার পক্ষে অত্যন্ত ঘুরান। প্রকৃতি শব্দে সংস্কৃত বুঝায়, ইহা ত কোথাও দেখা যায় না। সংস্কৃত শব্দ সাক্ষাৎ-পরম্পরা সম্বন্ধে বহুলভাবে রহিয়াছে বলিয়াও ইহাকে সংস্কৃতজাত বলিতে পারা যায় না, সংস্কৃতের সহিত ইহা অতি ঘনিষ্ঠ-ভাবে সম্বদ্ধ, ইহাই বলা সঙ্গত। কোন ব্যক্তি কোন ধনবানের অনুগ্রহে পরমসমৃদ্ধ হইয়া উঠিলেই তাহাকে সেই ধনবানের বংশে উৎপন্ন বলিয়া কেহ মনে করিলে তাহা ঠিক হয় না।

বাঙ্‌লা ভাষায়, বিশেষত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় সাধু বাঙ্‌লায় সংস্কৃত শব্দের প্রচুর প্রয়োগ দেখিয়া কেহ যদি তাহাকে সংস্কৃতমূলক বলেন, তবে তাহা ভুল করা হয় ; কেননা, তাহার অন্যান্য মূল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিপুণদৃষ্টিতে দেখিলে বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে, তাহা প্রাকৃতমূলক। রঙ্গালয়ের অভিনেতার বস্তুত মূলস্বরূপ কি, তাহা তাহার বর্ণ-চিত্র পোষাক-পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া থাকে ; ঐ সমস্ত অপনয়ন করিলে তাহার যে স্বরূপ প্রকাশ পায়, তাহাই

তাহার স্বকীয় রূপ বলিতে হইবে। কোন ভাষার মূলস্বরূপ জানিতে হইলে এই প্রণালীই অবলম্বন করা উচিত। আলোচ্য প্রাকৃত সম্বন্ধেও সেই কথা। ইহা সংস্কৃতের বিপুল সমৃদ্ধিতে সুসমৃদ্ধ, কিন্তু তাহা হইতে জন্মগ্রহণ করে নাই। ইহার মূলসম্বন্ধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি, এবং সংস্কৃতের পরিবর্ত্তন-সহিষ্ণুতা আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই ইহা বুঝা যাইবে।

ধরা যাউক, প্রাকৃত সংস্কৃত হইতে হইয়াছে; কিন্তু এই সংস্কৃত বলিতে আমরা কোন্ ভাষাকে বুঝিব? বেদভাষা, না রামায়ণাদির ভাষা? অপর কথায় বৈদিক সংস্কৃত, না লৌকিক সংস্কৃত? যাঁহারা বলেন যে প্রাকৃত সংস্কৃতমূলক, তাঁহারা লৌকিক সংস্কৃতকেই তাহার মূল বলিয়া মত প্রকাশ করেন, বৈদিক সংস্কৃতের কথা তাঁহারা কিছু বলেন না। বস্তুতঃ সংস্কৃত বলিতে লৌকিক সংস্কৃতকেই মুখ্যভাবে বুঝা যায়, কেননা পাণিনি প্রভৃতি পদপ্রকৃতির নিয়মরূপ সংস্কারের দ্বারা এই ভাষাকেই সংস্কৃত করিয়াছেন। বেদভাষা হইতে এই সংস্কৃত ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, ও তাহার সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া গৌণভাবে পরবর্ত্তীকালে বেদভাষাকেও বুঝাইতে সংস্কৃত শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন বেদভাষাকে সংস্কৃত বলিয়া গণ্য করিবার অপর কোন কারণ নাই। পাণিনি প্রভৃতির সংস্কারেই যে লৌকিক সংস্কৃতের নাম সংস্কৃত হইয়াছে, তাহা যেমন যুক্তিসিদ্ধ, সেইরূপ বাচনিক প্রমাণেও সমর্থিত। ষড়্ভাষাচন্দ্রিকাকার বলিয়াছেন—

"ভাষা দ্বিধা সংস্কৃতা চ প্রাকৃতী চেতি ভেদতঃ।
কৌমার পাণিনীয়াদি সংস্কৃতা সংস্কৃতা মতা।"*

ষড়্ভাষাচন্দ্রিকাকার সংস্কৃত ভাষার ঐরূপ লক্ষণ করিয়াও বলিতেছেন যে, সংস্কৃত হইতেই প্রাকৃত হইয়াছে :—"প্রকৃতেঃ সংস্কৃতায়াস্তু বিকৃতিঃ প্রাকৃতা মতা"—(ঐ)। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যাঁহারা প্রাকৃতকে সংস্কৃত-মূলক বলেন, তাঁহারা লৌকিক সংস্কৃতকেই তাহার মূল বলিতে ইচ্ছা করেন।

দণ্ডীর কাব্যাদর্শে (১,৩৩) সংস্কৃতের যে লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, এবং সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় তাহার যে ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, তাহাতেও ঐ কথাই বলা হইয়াছে—

সংস্কৃতং নাম দৈবী বাগ্ অন্বাখ্যাতা মহর্ষিভিঃ।
তদ্ভবস্তৎসমো দেশীত্যনেকঃ প্রাকৃতক্রমঃ॥"

তর্কবাগীশ মহাশয় ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন—
"দৈবী...বাক্ মহর্ষিভিঃ পাণিন্যাদিভিঃ, নামেতি প্রসিদ্ধৌ, সংস্কারসম্পন্নত্বাৎ সংস্কৃতম্ অন্বাখ্যায়তে সংস্কৃতেত্যখ্যায়া পশ্চাদ্ ব্যবহৃতা। ...পাণিন্যাদয়ো (হি তৈঃ) হি তত্তদ্ব্যাকরণসূত্রৈঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিবিভাগ-পরিকল্পনয়া নিত্যায়াঃ সংস্কৃতবাচঃ প্রতিপত্ত্যর্থং শিষ্যাণাং সংস্কারোপায়ঃ প্রদর্শিতঃ, ন তু বাক্ সম্পাদিতা, দ্বিতীয়া এবাখ্যানসম্ভবাৎ।"

কিন্তু মূল ও টীকাকার উভয়েই সংস্কৃতের তাদৃশ লক্ষণ স্বীকার করিয়াও বলিতেছেন যে, ঐ সংস্কৃত হইতেই প্রাকৃত হইয়াছে।

* এই গ্রন্থ এখনো মুদ্রিত হয় নাই, কেবল বিবরণ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। See "A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Govt Oriental Manuscripts Library, Madras, Vol. III, p. 1992.

এখন সংস্কৃত ভাষা হইতে প্রাকৃত হইতে পারে কি না, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য আমাদিগকে সংস্কৃত ভাষার প্রকৃতি বা স্বরূপ বা স্বভাবকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে, তাহার পরিবর্ত্তন আদৌ সম্ভব কি না। এবং তাহা করিতে হইলে আমাদিগকে বৈদিকভাষা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। (ক্রমশ:)

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র

চরিত্রাঙ্কণী প্রতিভা

মনুষ্যের দৈহিক বৃত্তি লইয়া যে কাব্য নাড়াচাড়া করে, যাহাতে মনুষ্যের হৃদয়ের কোনও পরিচয় প্রকাশিত হয় না, সে কাব্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। বিদ্যাসুন্দরের কোনও পাত্র-পাত্রীর যে হৃদয় আছে এমন মনে হয় না। সমগ্র কাব্যে সৌন্দর্য্যের লেশ মাত্র নাই; কবি মনুষ্যের একটা হেয় প্রবৃত্তির উপর সমস্ত কাব্যটীকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; সে ভিত্তি নিতান্ত অলক্ত। তিনি মনুষ্যহৃদয়ের কোনও কোমল বৃত্তি ফুটাইতে চেষ্টা করেন নাই, কোনও রস এই কাব্য মধ্যে মূর্ত্তিমন্ত হয় নাই, যে হাস্যরস আছে তাহাও এত পঙ্কিল যে নিঃসঙ্কোচে তাহা উপভোগ করিবার উপায় নাই। পতনোন্মুখ মুসলমান-জাতি যে জঘন্য রিপুর চর্চ্চাতে জীবন কাটাইত, ভারতচন্দ্র সেই রিপুর প্রবল প্রতাপ ঘোষণা করিবার জন্যই যেন এই কাব্যের রচনা করিয়াছেন, এবং উক্ত রিপুর সম্পূর্ণ বশীভূত একটা পশুরও অধম মনুষ্যকে কালিকার অনুগৃহীত ও শাপভ্রষ্ট দেবতা বলিয়া প্রচার করিয়া হিন্দুধর্ম্মের ও মনুষ্যত্বের অবমাননা, দেবত্বের অবমাননা ও কবি-নামের অবমাননা করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের শক্তি অল্প ছিল না, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার হৃদয় বড় সঙ্কীর্ণ; তাই সেই শক্তির অপব্যবহার ভিন্ন সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। এই হৃদয়হীনতার জন্য ভারতচন্দ্র কোনও রসকেই পরিপক্কতা দান করিতে পারেন নাই। আমরা দেখিয়াছি যে করুণ রসের চিত্র কাব্যের ভিতর থাকিলেও তদ্বারা আমাদের হৃদয় বিচলিত হয় না। কন্যার বিদায়ে মার হৃদয়ের ব্যথা তিনি স্বচ্ছন্দে "মেয়ে-কান্না" বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন। এই স্থলে কবিরঞ্জনও রায় গুণাকরকে পরাভূত করিয়াছেন! ফলতঃ অনেক বিষয় কবিরঞ্জনের কাছে ভারতচন্দ্রের শিক্ষা করিলে ভাল হইত। কবিরঞ্জনের সাহিত্য প্রভৃতা হীরার হৃদয়ে সাহিত সুন্দরের জন্য দুঃখের উদয় হইয়াছিল; ভারতচন্দ্রের হীরার ন্যায় সে সুন্দরের উপর অজস্র গালি বর্ষণই করে নাই। কবিরঞ্জন বিদ্যার বিদায়কালীন ঘটনা ও মনোভাবগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে

বর্ণনা করিয়া কতক পরিমাণে আপনার রসগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

ভারতচন্দ্রে ভাব নাই এ কথা সত্য নহে—তাঁহার কাব্যে ভাবের অভাব নাই, অভাব রসের। তাঁহার কাব্যে আমরা এমন কিছুই দেখিতে পাই না যাহা দ্বারা আমাদের হৃদয় উত্তেজিত, উদ্দীপিত, মর্ম্মাহত বা অভিভূত হইয়া পড়ে। তাঁহার মনুষ্য-চরিত্রজ্ঞতা ছিল, কিন্তু মনুষ্য-হৃদয়ের সহিত সহানুভূতি ছিল না। সেই জন্য তাঁহার অধিকাংশ চরিত্রই আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত—বিশেষতঃ দুঃখের কথা তিনি প্রায়ই অতি সংক্ষেপে কহিয়াছেন। স্নেহ, প্রেম, শোক, দুঃখ, উচ্চাভিলাষ, নৈরাশ্য, কুটিলতা এই সকল মনুষ্যহৃদয়ের বিভিন্নজাতীয় বৃত্তি ও ভাব, ইহারা সম্পূর্ণ ভাবে কোথাও তাঁহার কাছে ব্যক্ত হয় নাই।

মুকুন্দরামে উপস্থিত হইয়া, আমরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব লক্ষ্য করি। এখানে আর কিছুই আবছায়া নাই, এখানে মানুষকে মানুষ বলিয়া চিনিতে পারা যায়, এখানে মানুষের যাহা কিছু ক্ষুদ্রত্ব, যাহা কিছু মহত্ব, যাহা কিছু দেবত্ব আছে সবই প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের হৃদয়ে যে সকল বৃত্তি আছে, যে সকল জ্বালা-যন্ত্রণা আছে, যে উচ্চতা আছে, যে নীচতা আছে, ফলতঃ যত কিছু লইয়া মানুষ সংসারে বিচরণ করে, সবই স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত, কবির নিজ কথায় ব্যক্ত নহে, চরিত্র চিত্রিত করিবার সময় নাট্যকলার সাহায্যে ব্যক্ত। কবির কল্পনার চক্ষে যে মূর্ত্তি সমুদিত হয়, তিনি সেই মূর্ত্তিরই একটী নিখুঁত ছবি তুলিয়া রাখেন। মুকুন্দরামের কল্পনা নিজেই সমস্ত কাজ করিয়া রাখে না। পাঠকের কল্পনার জন্যও কিছু কার্য্য রাখিয়া দেয়। কবি কখনও নিজের চরিত্র লইয়া বিচার করিতে বসেন না, তিনি নিজ সৃষ্ট চরিত্রের মুখে যে কথা যখন যেমন স্বাভাবিক হয় ও সাজে, সেইরূপ কথা বসাইয়া যান নিজসৃষ্ট চরিত্রের পক্ষে যে কার্য্য স্বাভাবিক তাহাই করাইয়া যান, যে চিন্তা স্বাভাবিক তাঁহাই ভাবাইয়া যান; তার পর পাঠকদিগকে বিবেচনা করিবার অবসর দেন, কোন চরিত্রটী কেমন। তাঁহার চক্ষে ছোট বড় কেউ অবহেলার যোগ্য নহে কেহই উপেক্ষণীয় নহে। তাঁহার সরল হৃদয় ও শক্তিশালিনী কল্পনা মনুষ্যের কোনও ভাব, কোনও চিন্তা, কোনও অবস্থাকেই তুচ্ছ বলিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায় না। তিনি যখন একটী মনুষ্য বা রমণী সৃষ্টি করেন, তখন তাহার সমস্তটুকু গড়েন, কোনও অংশ ছাঁটছোঁট করিয়া, কে কেমন ভাবিবে, কে কি বলিবে বিবেচনা করিয়া একটা সম্পূর্ণ জীবকে অসম্পূর্ণ করিয়া গড়েন না। অবশ্য এ সকল স্ত্রী-পুরুষ কবির সময়কার সামাজিক বর্ণে রঞ্জিত হয়, কিন্তু তাহা হইয়াও প্রায় তাঁহার সকল চরিত্রগুলিই চিরন্তন মানুষ। এই সম্পূর্ণতাই কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য। এই স্থলেই কবি-দ্বয়ের প্রতিভার তারতম্য বুঝা যায়। সময়ের যে দোষ তাহা উভয় কবিতেই বিদ্যমান আছে,—কিন্তু কল্পনা-শক্তির ইতরবিশেষ লইয়াই কবিগণের মধ্যে যথার্থ প্রভেদের সূচনা হইয়া থাকে। ভারতচন্দ্র

মানুষ গড়িতে চেষ্টা করেন নাই—গল্প বলিয়া গিয়াছেন, গল্পের সঙ্গে যতটুকু মনুষ্য-চরিত্র আভাসে ফুটিয়াছে ততটুকুই তিনি ফুটাইয়াছেন, মনুষ্য সৃজন করিবার প্রয়াস তিনি কোথাও করেন নাই। তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি বা সাংসারিক জ্ঞানের বলে অনেক সময়েই আমরা তাঁহার সময়কার মনুষ্যগুলিকে এক রকম সঠিক ভাবেই দেখিতে পাই, কিন্তু সে চরিত্রগুলি কোনটাকেই আমরা সম্পূর্ণ দেখিতে পাই না। তাঁহার সর্ব্বদাই ভয় পাছে পুঁথি বাড়িয়া যায়—পাছে রাজসভায় শ্রোতৃবর্গ বিশেষতঃ রাজা নিজে শ্রান্ত হইয়া পড়েন; রাজকবিগণের এ একটা মস্ত বিপদ। তাহার উপর কবির চিত্তে কোনও একটা গভীর ভাব স্থায়ী হয় না, চকিতের মত সেই সকল ভাব, সেই সকল চিত্র তাঁহার মনে উদিত হয় এবং অধিক স্থলেই তাহারা হাস্যরসের বন্যায় ভাসিয়া যায়। কবির প্রকৃতি একটু তরল, তিনি হাসিতে পাইলে আর কিছু চাহেন না। মানসিংহের সৈন্য দারুণ ঝড়বৃষ্টিতে ভাসিয়া যাইতেছে—সেই দৃশ্য বর্ণন করিতে করিতে কবি ঘেসেড়ানীর বিপরীত শোক বর্ণনা করিয়া একাকীই হাসিয়া লইয়াছেন এবং বঙ্গসাহিত্যে 'চসার'-সৃষ্ট ওয়াইফ অব্ বাথের অবতারণা করিয়াছেন। শিবের রুদ্রমূর্ত্তি বর্ণনা ও দক্ষযজ্ঞনাশ বর্ণনা করিতে করিতে ভার্গবের দাড়ি-গোঁফ-বিরহিত মুখ মনে করিয়া হাসিয়া লইয়াছেন। এই হাস্য-তরঙ্গে হাবুডুবু খাইয়া কবি শোকতাপময়, আশা-উত্তেজনাময়, কৌটিল্য-চাতুর্য্যময় ক্ষুদ্রত্বমহত্ত্বময় মনুষ্যকে সম্পূর্ণরূপে দেখিবার অবসর পান নাই, প্রবৃত্তিও বোধ হয় পান নাই। কবি ভারতচন্দ্র প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে শিখেন নাই, তাই তিনি কাঁদাইতেও পারিতেন না। রাজদরবারে প্রতিপালিত হইয়া তাঁহার দৃষ্টি রাজারাজড়ার দিকেই বেশী আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাই তাঁহার কাব্যে বড় ঘরের বড় কথাই বেশী, সহজ মানুষের সোজাসুজি কথা, অথবা মনুষ্য-চরিত্রের বৈচিত্র্য আমরা বড় দেখিতে পাই না। ইহার উপর তাঁহার যে বিষম উপসর্গ—জগতে মদনের—নির্লজ্জ কামুকতার অখণ্ড প্রভুত্ব, কল্পনা; তাহাতেই তাঁহার সৃষ্টি-বিধায়িনী প্রতিভাকে অনেক পরিমাণে ম্লান করিয়া ফেলিয়াছে। ইঙ্গিতে আভাসে ভারতচন্দ্রে সংসারের বিষয়, মানুষের বিষয় অনেক কথা থাকিলেও, মানুষের মহত্ত্বেরও কতক পরিচয় থাকিলেও আমরা বলি যদি মানুষ দেখিতে চাও, যদি মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গে পরিচিত হইতে চাও তো কৃষ্ণনগরের রাজকবিকে ছাড়িয়া দামুন্যার দরিদ্র ব্রাহ্মণ কবির কাছে চল।

তবুও সত্যের খাতিরে এ কথা বলিতে হইবে যে ভারতচন্দ্রে যে সকল মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই তাহারা মানুষই বটে—মৃত আবছায়ার মতই দেখা যাউক যাহারা ভারতচন্দ্রের সৃষ্ট সংসার মধ্যে বিচরণ করে তাহারা রক্তমাংসের শরীরবিশিষ্ট নরনারী ভিন্ন আর কিছুই নয়। সেই জীবগুলি কতকগুলি মতের সমষ্টি বা প্রস্তরতত্ত্বের আধুনিক অদ্ভুত প্রস্তরতত্ত্বের উদাহরণ মাত্র নহে। কবি ভারতচন্দ্রের আর যতই দোষ

থাকুক তিনি সংসার বুঝিতেন, মানুষ চিনিতেন, মানুষের সকল বৃত্তির সহিত তাঁহার সহানুভূতি না থাকুক, তিনি মনুষ্যকে মনুষ্য বলিয়াই জানিতেন—নিজের মত-প্রকাশক যন্ত্র বিশেষ বলিয়া ভাবিতেন না। সুখের বিষয় অথবা আধুনিক সমালোচকের মতে দুঃখের বিষয় যে "বিশ্বজগৎ তাঁহার বা মুকুন্দরামের হৃদয়ে প্রবেশ যাচ্ঞা" করে নাই, তাই তাঁহাদের চক্ষু হইতে আমাদের শস্যশ্যামলা সুজলা সুফলা বঙ্গভূমিটী অপসৃত হইয়া যায় নাই, আর সেই বঙ্গভূমির সন্তান বাঙ্গালী—ছোট হোক বা বড় হোক—যেমন ভগবান্ তাঁহাদিগকে গড়িয়াছিলেন—তাঁহাদের হৃদয় হইতে বিতাড়িত হইয়া পর হইয়া যায় নাই। ভারতচন্দ্র একটু বাবু বনিয়া গিয়াছিলেন—একটু বিলাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন, এই তাঁহার দোষ; কিন্তু মুকুন্দরাম খাঁটি বাঙ্গালীই ছিলেন এবং বাঙ্গালীর সবটুকুই ভালবাসিতেন, তাই আমরা তাঁহার কাছ হইতে বাঙ্গালী-চরিত্রের যত কিছু জানিতে পারিয়াছি কোনও ঐতিহাসিকের কাছে জানিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। বাঙ্গালীর জীবন, বাঙ্গালীর চরিত্র তাঁহার প্রতিভার বলে আমাদের নয়নের সমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়াছে। (ক্রমশ)

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

প্রভাতে

আকাশে জাগিল আসন্ন উষার প্রথম আলোক রেখা
অতি ধীরে ধীরে দূর বহু দূর তটিনীতে দিল দেখা।
যোগী আছিলেন আকণ্ঠ ডুবিয়া, ঊর্দ্ধমুখে করজোড়ে
সে আলো আসিয়া পড়িল তাঁহার গভীর নয়ন ভ'রে।
চির দেবতার অতুল প্রকাশ জাগিল তাঁহার প্রাণে,
সহসা আকাশ উঠিল ধ্বনিয়া, সুগভীর স্তবগানে।
অদূর মন্দিরে খুলি গেল দ্বার শঙ্খ উঠিল বাজি
পূজারি রাখিল দেবতা চরণে প্রভাত ফুলের সাজি;
প্রতি ঘরে ঘরে বোলে বাতায়ন, শিশুরা জাগিল সবে
জাগিয়া উঠিল বিশাল ভুবন নবজীবনের রবে।

সন্ধ্যায়

আঁধার আকাশে মিলাইয়া আসে তপন কিরণ রেখা
শূন্য গগনে দেখা দেয় এক সান্ধ্য তারকা একা
সান্ধ সন্ধ্যা স্নান, স্তব্ধ স্তব গান, নয়ন মুদিত করে'
যোগী বসিলেন স্থির অবিচল ধেয়ান আসন পরে।
রুধিয়া পূজারি মন্দির দুয়ার স্নিগ্ধ প্রদীপ জেলে
শেষ করে পূজা দেবতার শিরে পুণ্য সলিল ঢেলে,
রুদ্ধ আগারে ঘুমাতে শিশুরে জননী করুণ গায়
আরতি শেষের শঙ্খ প্রতিধ্বনি সুদূরে মিলায়ে যায়।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

কলিকাতা ২১ নং হরিতকি বাগান লেনে কমার্শিয়াল যন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আইচ দ্বারা মুদ্রিত।

কৃষ্ণের চন্দ্রকান্তি!

রূপ এবং সৌন্দর্য্য ও যৌবনের নবীনতা সদা রক্ষা করিতে চাহেন? এই সমস্তের লেপন চর্ম্মরোগমাত্রই অর্থাৎ—দাদ, চুলকানি, মেচেতা, কদাকারচিহ্ন, ব্রণ ইত্যাদি শীঘ্র আরোগ্য করিয়া চর্ম্মের কোমলতা, চাকচিক্য ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে রমণীগণের আদরের সামগ্রী। মূল্য ৸০ আনা, ডাঃ মাঃ ৵০ আনা।

আফিম পরিত্যাগের ঔষধ।

যিনি অধিকদিনের আফিম সেবনকারী হইয়া নষ্ট হইয়াছেন, বিনা কষ্টে আফিমরূপ কালকূট বিষ পরিত্যাগ করিয়া শারীরিক স্নায়বিক সুস্থ হইয়া বেশ স্ফূর্ত্তি, সচ্ছন্দতা এবং সতেজতা ও পুষ্টিলাভ করিতে পারেন, অথচ কোন পীড়া হইবার সম্ভাবনা নাই। পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

কে, সি, বিশারদ,
৬৭ নং বেনিয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

আশ্বিন] [৬ষ্ঠ সংখ্যা

বঙ্গদর্শন।

(নব পর্য্যায়)

একাদশ বর্ষ।

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা
১। সাবিত্রী	৩১৭	৮। ভ্রান্তি (উপন্যাস)	৩৮১
২। বিলাতফেরতের বিপদ (গল্প)	৩৩৪	৯। মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র	৩৮৩
৩। অর্থনীতি	৩৪৭	১০। বিদ্যাসাগর	৩৮৮
৪। বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায়	৩৫৭	১১। অতৃপ্তি (কবিতা)	৩৮৮
৫। মাতুলের প্রতিহিংসা (গল্প)	৩৫৮	১২। বঙ্কিম চরিত	৩৮৯
৬। [illegible]	৩৭০	১৩। রবাহূত	৩৯৭
৭। অজন্তা দীপি	৩৭৩	১৪। কবিতাগুচ্ছ	

এস্ সমুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩১৮

সাধনতত্ত্ববিচার।

শ্রীরামাচরণ বসু বিরচিত। বৈষ্ণব ধর্ম্মের উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বগুলি অতি সরল ও সহজ ভাষায় লিখিত। মূল্য ৸০ বার আনা।

মজুমদার লাইব্রেরী, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানীর

পরীক্ষিত অব্যর্থ ঔষধ সমূহ

ও পুষ্পসার

এসেন্স।

আমাদের "এসেন্স" প্রতিযোগিতায় বিলাতী এসেন্সকে পরাজিত করিয়াছে। বিলাস-বাসিতার সৌরভ-সম্পদ্ গৃহকক্ষে উপভোগ করিবার জন্যই এসেন্সের সৃষ্টি! দাবদগ্ধ পল্লিতে সে সুখভোগে বঞ্চিত থাকা উচিত নহে। স্মরণ রাখিবেন, আমাদের যাবতীয় এসেন্সই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বাক্যে তাহার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। পরীক্ষা করিলেই পরিতৃপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। আমাদের প্রত্যেক এসেন্সের মূল্য বড় এক শিশি ১৲ এক টাকা, তিন শিশি ২৲ দুই টাকা। ছোট এক শিশি ।৵০ সাত আনা, তিন শিশি ১৷০ টাকা। ডাকমাশুল এক শিশির ৵০ আনা। তিন শিশির ৷৵০ আনা।

মাথাগরমের মর্ত্তব্য কি?

অনেকের অল্পকারণেই মাথা গরম হইয়া উঠে। তখন কাজকর্ম্মে মনঃসংযোগ হয় না, প্রাণ কেমন অস্থির হইয়া উঠে, ভাল কথাও তিক্ত বোধ হয়। আর মাথার ভিতরে নানারকম কষ্ট যাতনা হইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় মাথায় একটু "সুরমা" মাখিবেন, তৎক্ষণাৎ জ্বালা জুড়াইয়া যাইবে, সৌরভে প্রাণ প্রফুল্ল হইয়া উঠিবে। মাথা গরমের জন্য যাঁহাদের চুল উঠিয়া যায়, অথবা অল্পবয়সেই চুল পাকিতে আরম্ভ হয়, তাঁহারা বিনামূল্যে "সুরমা" একবার ব্যবহার করিলে চুলের সমস্ত দোষ অচিরাৎ নষ্ট হইবে। সুরমার সৌরভ—সুরমার গন্ধ এত, গায়ে আর কোন তৈল মেখিতে পাইবেন না। সত্যসত্যই ইহা সমস্ত কেশতৈলের সম্রাট্। এই তৈলের বিশুদ্ধ পরিমিত বড় একশিশি সুরমার মূল্য ৸০ বারআনা মাত্র ডাকাদি ৸০ তের আনা। ৵০ আনার টিকিট পাঠাইলে একশিশি নমুনা ও একখানি পুস্তিকা বিনামূল্যে দেওয়া হইবে।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকল প্রকার জারিত ধাতুঘটিত আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটী ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থাও পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী—ম্যানুফাক্চারিং কেমিষ্টস

১৯।১ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

বঙ্গদর্শন

সাবিত্রী

এক দিকে চন্দ্রভাগা অপর দিকে বিপাশা নদী; উভয়ের মধ্যস্থিত প্রদেশকে প্রাচীনকালে মদ্রদেশ বলিত। বহু শত বৎসর হইল, এই মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন।

রাজা অশ্বপতি যেমন সত্যনিষ্ঠ তেমনই জিতেন্দ্রিয় ও দানশীল ছিলেন। তাঁহার মহিষী মালবী দেবীও সর্ব্বাংশে স্বামীর অনুরূপা ছিলেন; তাঁহাদিগের উভয়ের গুণে প্রজাগণ তাঁহাদিগকে আপনাদিগের জনক-জননীর ন্যায় ভক্তি ও সম্মান করিত।

রাজা অশ্বপতির রাজ্য ধন-ধান্যে পূর্ণ ও সর্ব্ব সুখের আস্পদ হইলেও, অনপত্যতা বশতঃ, তাঁহার ও রাজমহিষীর হৃদয়ে শান্তি ছিল না। তাঁহারা উভয়ে সংযত চিত্তে বহু বর্ষ কাল সাবিত্রী দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন এবং অবশেষে দেবীর অনুগ্রহে এক অনুপমা কন্যারত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সাবিত্রী দেবীর প্রসাদে লব্ধ বলিয়া তাঁহারা কন্যার নাম রাখিয়াছিলেন সাবিত্রী। সাবিত্রী শুক্লপক্ষীয়া শশি-কলার ন্যায় দিনে দিনে বর্দ্ধিতা হইয়া ক্রমে যৌবন-সীমায় উপনীতা হইলেন।

একবার নবীন গ্রীষ্মাগমে মদ্রদেশ অতি রমণীয় শোভা ধারণ করিল। তরুলতাগণ বিকসিত পল্লবে বিভূষিত এবং বনভূমি অরণ্যজ মল্লিকার সৌরভে আমোদিত হইল। মুকুলিত সহকার-শাখায় উপবেশন করিয়া পিকবর পঞ্চম স্বরে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া তুলিল। রাজা অশ্বপতি, অপরাহ্ণে রাজকার্য্য সমাপন করিয়া, বিশ্রামার্থ অন্তঃপুরে গমন করিলেন। সন্ধ্যাসমাগমে রাজান্তঃপুর অসংখ্য দীপ-মালায় সমুজ্জ্বল হইল। দেবালয় হইতে শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনির সঙ্গে বেদপাঠ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল এবং ধূপ গন্ধে সমস্ত রাজ-ভবন আমোদিত হইল।

রাজা সন্ধ্যাবন্দনার পর অন্তঃপুরস্থিত একটী প্রকোষ্ঠে আসীন হইলেন; একজন কিঙ্করী ময়ূরপুচ্ছনির্ম্মিত ব্যজনী লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিল। রাজ-মহিষী, অদূরে, স্বতন্ত্র আসনে উপবেশন করিয়া পুষ্পমাল্য রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা মহিষীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন; "রাজ্ঞি! আজ সাবিত্রীকে এখানে দেখিতে পাইতেছি না কেন? অন্য দিন আমি সভা হইতে আসিবার পূর্ব্বেই সাবিত্রী আমার পদপ্রক্ষালনের জন্য ঝারিতে জল লইয়া দণ্ডায়মানা থাকে, আজ আমি এতক্ষণ আসিয়াছি, সাবিত্রীর তবে আমার

নিকট না আসিবার কারণ কি ?" রাজ্ঞী বলিলেন, "মহারাজ! কাল সাবিত্রীর কল্যাণব্রত উদ্‌যাপনের দিন, তাই সাবিত্রী আজ পূজার জন্য দেবালয়ে গমন করিয়াছে। সায়াহ্নিক হোম দেখিবে বলিয়া, বোধ হয়, এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আছে। কিন্তু আপনি এই সময় অন্তঃপুরে আসেন, সাবিত্রী জানে; সুতরাং সাবিত্রী আর বিলম্ব করিবে না, এখনই আসিবে।"

রাজা। আবার কি নূতন ব্রত? এই ত সে দিন সাবিত্রী এক ব্রত উদ্‌যাপন করিল। উপবাসে, উপবাসে সাবিত্রী যে শীর্ণা হইয়া যাইতেছে, তুমি তাহাকে নিবারণ কর না কেন ?

রাজ্ঞী। মহারাজ! আমি নিবারণের ত্রুটী করি না। কিন্তু ধর্ম্মকার্য্যে সাবিত্রী আমার বারণ শোনে না। বারণ করিলে সে কখনও আমার কথার প্রতিবাদ করে না, কিন্তু তাহার মুখখানি তখন এমন মলিন হইয়া যায়, সজল চক্ষু দুটীতে এমন কাতর-ভাব ব্যক্ত হয় যে, আমি স্থির থাকিতে পারি না; বলি, 'মা! তোমার যা ভাল বোধ হয় কর।' আর আমি দেখিয়াছি ব্রত, উপবাসেই সাবিত্রী যেন ভাল থাকে। ব্রতকালে স্নানের পর আলোলিত কেশে দেবীপ্রতিমার ন্যায় তাহার যে শোভা হয়, বেশভূষায় সজ্জিতা হইলে আমি কখনও তাহার তেমন শোভা দেখি নাই।

রাজা। সাবিত্রী আমার তপস্বিনী; ক্ষত্রিয়ের অপেক্ষা ব্রাহ্মণের লক্ষণই তাহাতে অধিক বর্ত্তমান। যদি একাধারে ক্ষত্রগুণ ও ব্রাহ্মণগুণ কাহাতেও বর্ত্তমান থাকে, তবে তাদৃশ ব্যক্তিই সাবিত্রীর উপযুক্ত পাত্র হইবেন।

রাজ্ঞী। মহারাজ! আজ আমি আপনার নিকট এই বিষয়েরই প্রসঙ্গ করিব ভাবিয়াছিলাম। ভাল হইল যে, আপনি নিজেই সাবিত্রীর বিবাহের কথা বলিলেন। সাবিত্রী ত বয়স্থা হইয়াছে, তবে আপনি তাহার বিবাহ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন কেন ?

রাজা। রাজ্ঞি! আমি নিশ্চিন্ত নই; কিন্তু সাবিত্রীর ন্যায় কন্যার উপযুক্ত পাত্র পাওয়া সহজ নয়। আমাদিগের সম্বন্ধ-যোগ্য কুলের অভাব নাই, কিন্তু দেখ, সাবিত্রীকে কেহই বধূরূপে গ্রহণ করিবার জন্য প্রার্থনা করে না। তুমি লক্ষ্য করিয়াছ কি না বলিতে পারি না; আমি দেখিয়াছি যে, তরুণবয়স্ক রাজপুত্রগণ সাবিত্রীর দিকে সাভিলাষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা দূরে থাকুক, তাহার মুখের দিকে চাহিতেও সাহস করে না। সাবিত্রীকে দেখিলে অনেক রাজকুমার সসম্ভ্রমে মস্তক নত করিয়া প্রস্থান করে।

রাজ্ঞী। মহারাজ! আপনি যাহা বলিতেছেন সত্য; কিন্তু সাবিত্রীর উপযুক্ত পাত্র সুপ্রাপ্য নয় বলিয়া কি সাবিত্রী চিরদিন কুমারী থাকিবে? যেরূপে হউক, তাহাকে ত পাত্রস্থা করিতেই হইবে।

রাজা। রাজ্ঞি! তুমি চিন্তিত হইও না। আমি ইহার উপায় ভাবিয়াছি। আমি সাবিত্রীরই উপর তাহার পতি-নির্ব্বাচনের ভার দিব।

রাজ্ঞী। এ কিরূপ কথা! আমরা

তাহার পিতা মাতা হইয়া তাহার উপযুক্ত পাত্র স্থির করিতে পারিলাম না, আর সে সংসারানভিজ্ঞা বালিকা, সে নিজের পতি-নির্ব্বাচন করিবে!

রাজা। রাজ্ঞি! অপর কেহ হইলে আমি এমন কথা বলিতাম না। কিন্তু সাবিত্রী যেরূপ বুদ্ধিমতী, সংযমচিত্তা এবং ধর্ম্মার্থদর্শিনী, তাহাতে তাহার উপর পতি-নির্ব্বাচনের ভার দেওয়া অসঙ্গত হইবে না। সাবিত্রী এখন বয়স্থা হইয়াছে, যদি আমরা তাহার জন্য পাত্র নির্ব্বাচন করি, আর সে পাত্র তাহার মনোমত না হয়, তাহা হইলে সাবিত্রী অসুখী হইবে, এবং সেই সঙ্গে আমরাও অসুখী হইব। কিন্তু সাবিত্রী যদি নিজের মনোনীত ভর্ত্তাকে বরণ করে, তবে সম্ভবতঃ কাহারও অসুখের কারণ থাকিবে না। আর তুমি নিশ্চয় জানিও ভাগীরথী মহাসমুদ্রেই আত্মসর্পণ করেন, ক্ষুদ্র জলাশয়ে পতিত হন না। সাবিত্রী কখনও অপাত্রে আত্মসমর্পণ করিবে না। আর যদি তাহার সহিত তুলনায় তাহার মনোমত পাত্র অপেক্ষাকৃত নিগুর্ণ হয়; তবে স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহের ন্যায় সেও সুবর্ণত্ব লাভ করিবে।

রাজ্ঞী। মহারাজ! আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন।

এই সময় অঙ্গনে মৃদু মৃদু নূপুরধ্বনি শ্রুত হইল। রাজ্ঞী বলিলেন, "মহারাজ! ঐ আপনার সাবিত্রী আসিতেছে।" তাঁহার কথা শেষ না হইতে হইতেই সখী-দ্বিতীয়া সাবিত্রী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সাবিত্রীর কেশদাম আলোলিত, ললাটে চন্দনবিন্দু, কণ্ঠে পুষ্পমালা, পরিধান অশোকপুষ্প বর্ণের বসন। তাঁহার উপ-বাসক্লিষ্ট মুখের উপর দীপালোক পতিত হওয়াতে তাহা দিবাশেষের পদ্মের ন্যায় মনোজ্ঞ দেখাইতেছিল। রাজা মুগ্ধনেত্রে সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। সাবিত্রী, মাতাপিতার চরণ বন্দনা করিয়া, পরিচারিকার হস্ত হইতে ব্যজনী লইয়া, পিতাকে বীজন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন,

"মা সাবিত্রি! তুমি আজ সমস্ত দিন উপবাস করিয়া আছ, তোমার আমাকে ব্যজন করিতে হইবে না। আমার শ্রীম-বোধ হইতেছে না।"

রাজা এই বলিয়া সস্নেহে কন্যাকে আকর্ষণ করিয়া আপনার পার্শ্বে বসাইলেন এবং আদর করিয়া তাঁহার চিবুক ধরিয়া বলিলেন, "মা! এই ত তুমি সেদিন আমার ও রাজ্ঞীর দীর্ঘজীবনের জন্য ব্রত করিলে। তবে আজ আবার কি ব্রত করিবে বলিয়া উপবাসী আছ?

সাবিত্রী। বাবা! পুরোহিত মহাশয় বলিতেছিলেন, আজ, কল্যাণপঞ্চমী; আজ উপবাস করিয়া দেবীপূজা করিলে প্রিয়জনের কোনরূপ অকল্যাণ হয় না। তাই আমি যাহাতে আমাদের প্রজাগণ দুর্ভিক্ষে ও অকালমৃত্যুতে ক্লেশ না পায়, সেই জন্য আজ উপবাস করিয়া আছি। কাল দেবীপূজা করিব।

রাজা। মা! তোমার মত কন্যা পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। আমরা যে দীর্ঘ-কাল কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলাম,

তাহা সার্থক হইয়াছে। কিন্তু মা! তুমি এখনও বালিকা, সর্ব্বদা উপবাসে শরীরকে ক্লেশ দিও না। অগ্রে নিজের শরীররক্ষা, পরে ধর্ম্মসাধন কর্ত্তব্য।"

সাবিত্রী। বাবা! উপবাসে আমার তেমন কষ্টবোধ হয় না; আর একটু কষ্ট স্বীকার না করিলেই বা ধর্ম্মোপার্জ্জন হইবে কিরূপে?

রাজ্ঞী। মহারাজ! আজ সাবিত্রী মহর্ষি দেবলের নিকট উপনিষদপাঠের সময় কি একটী সুন্দর আখ্যায়িকা শিখিয়াছে। আপনাকে এবং আমাকে এক সঙ্গে তাহা শুনাইবার জন্য সাবিত্রীর ইচ্ছা। আপনার অনুমতি পাইলে সাবিত্রী তাহা বলিতে পারে।

রাজা বলিলেন, "বেশ ত! মা সাবিত্রি! বল দেখি কি শিখিয়াছ?"

সাবিত্রী। বাবা! আখ্যায়িকাটী আমার বড় সুন্দর লাগিয়াছে। মহর্ষি যেমন বলিয়াছিলেন, আমি তেমন বলিতে পারিব না, তথাপি যতদূর পারি, বলিতেছি।

পূর্ব্বে দেবাসুরগণে তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। দেবগণ বহুবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর জয় লাভ করিলেন, অসুরগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। দেবগণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া অত্যন্ত গর্ব্বিত হইলেন; তাঁহারা ভাবিলেন, আমাদিগের নিজের বলেই অসুরগণ পরাজিত হইয়াছে, যুদ্ধজয়ের গৌরব সম্পূর্ণ আমাদিগেরই প্রাপ্য। তাঁহাদিগের মনের এইরূপ অবস্থায় তাঁহারা একদিন এক অদৃষ্টপূর্ব্ব জ্যোতি দেখিতে পাইলেন। সেই জ্যোতির নিকট অন্য সকল জ্যোতি মলিন হইল। তখন তাঁহারা ভাবিলেন, এই জ্যোতিস্বরূপ কে? আমরা ত ইঁহাকে জানি না, আমরা ইঁহার তত্ত্ব লইব। এই ভাবিয়া তাঁহারা আপনাদিগের মধ্য হইতে অগ্নিকে সেই জ্যোতির নিকট প্রেরণ করিলেন। অগ্নি সেই জ্যোতির নিকট উপস্থিত হইলে জ্যোতি হইতে অশরীরী বাণী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" অগ্নি বলিলেন, "আমি অগ্নি।"

জ্যোতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার শক্তি কিরূপ?" অগ্নি বলিলেন, "আমি ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্তমাত্রে এই ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ করিতে পারি।"

জ্যোতি বলিলেন, "ভাল! এই তৃণটীকে দগ্ধ কর।" এই বলিয়া তাঁহার সম্মুখে একটী তৃণ নিক্ষেপ করিলেন। অগ্নি বহু চেষ্টাতেও তাহা দগ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন না; লজ্জিত হইয়া দেবগণের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

তখন অন্যান্য দেবগণ বায়ুকে সেই জ্যোতির নিকট প্রেরণ করিলে পূর্ব্ববৎ অশরীরী বাণী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

বায়ু বলিলেন "আমি বায়ু।"

জ্যোতি বলিলেন, "তোমার শক্তি কিরূপ?" বায়ু বলিলেন, "আমি ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্তে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উৎপাটিত করিতে পারি।"

জ্যোতি বলিলেন, "ভাল! এই তৃণটী উঠাইয়া দূরে নিক্ষেপ কর।" তখন বায়ু বহু চেষ্টা করিয়াও সেই তৃণটীকে স্থানচ্যুত করিতে পারিলেন না, লজ্জিত হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

তখন স্বয়ং ইন্দ্র সেই জ্যোতির নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং প্রজ্ঞারূপিণী দেবী উষার নিকট অবগত হইলেন যে, ব্রহ্মই সেই জ্যোতিস্বরূপ, জগতের সকলেরই মূল তিনি। তদ্দর্শনে দেবগণ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদিগের নিজের স্বতন্ত্র শক্তি কিছুই নাই, সেই মূল শক্তি হইতেই তাঁহাদিগের শক্তি উদ্ভূত, তাঁহাদিগের দর্প চূর্ণ হইল।

সাবিত্রী এই বলিয়া বলিলেন, "বাবা! এই আখ্যায়িকাটী কি সুন্দর নয়?" রাজা বলিলেন, "অতি সুন্দর। তুমি যে মা! এখন শাস্ত্রানুরাগিণী হইতেছ, তাহাতে আমি পরম সুখী হইয়াছি। তোমার পুণ্যে আমার বংশ উজ্জ্বল হইবে।" রাজা এই বলিয়া মহিষীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে রাজমহিষীর ইঙ্গিতে পরিচারিকাগণ অন্যত্র চলিয়া গেল। তখন রাজা সাবিত্রীকে বলিলেন, "মা! তোমার নিকট আমাদিগের একটী অনুরোধ আছে।"

সাবিত্রী। অনুরোধ বলিতেছেন কেন, বাবা? আদেশ বলুন; আপনাদিগের আদেশ আমার সর্ব্বথা শিরোধার্য্য।

রাজা। বৎসে! তুমি ক্রমে যৌবনসীমায় উপনীত হইয়াছ, রমণীদিগের পক্ষে যে বয়সে সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হওয়া সঙ্গত, তোমার সে বয়স হইয়াছে। এক্ষণে উপযুক্ত পাত্রে পরিণীতা হইয়া তুমি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন কর, আমাদিগের এইরূপ ইচ্ছা। কিন্তু আমরা তোমার উপযুক্ত পাত্র দেখিতে পাইতেছি না, সেই জন্য আমরা স্থির করিয়াছি, তোমার ভর্তৃনির্ব্বাচনের ভার তোমারই উপর দিব।

সাবিত্রী শুনিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন রাজা পুনরায় বলিলেন, "মা! ইহাতে তোমার সঙ্কোচের বিষয় কিছু নাই; স্বয়ং পতি বরণ করিবার প্রথা আমাদিগের ক্ষত্রিয়-সমাজে অতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। আমি তোমাকে সেই সনাতনপ্রথারই অনুসরণ করিতে বলিতেছি। তুমি স্বেচ্ছাক্রমে পরিভ্রমণ করিয়া নগরে হউক, পল্লীতে হউক, জনপদে হউক বা তপোবনে হউক, আপনার উপযুক্ত পতি দেখিতে পাইলেই আমাকে আসিয়া তাঁহার পরিচয় দিবে, পরে আমি তোমাকে সম্প্রদান করিব।"

রাজমহিষী বলিলেন, "মহারাজ! সাবিত্রী এরূপ দেশদেশান্তরে পরিভ্রমণ করিবে, তাহাতে কোন বিপদের সম্ভবনা নাই ত?"

রাজা। বিপদের সম্ভাবনা কি? আমার রাজ্য সুশাসিত, তাহাতে উচ্ছৃঙ্খল ও অসদাচারী ব্যক্তি বিরল; আমি প্রজাগণকে পুত্রবৎ পালন করি, সুতরাং তাহারা আমার দুহিতার সম্বন্ধে কখনও অশিষ্ট ব্যবহার করিবে না। আমার প্রতিবাসী নৃপতিবর্গও আমার সহিত মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ। সুতরাং সাবিত্রী তাঁহাদিগের প্রজাগণেরও নিকট সমাদর প্রাপ্ত হইবে। সাবিত্রী একাকিনী যাইবে না। তাহার সখীদ্বয়, তাহার ধাত্রী এবং বৃদ্ধ সচিব সুপ্রজ্ঞও তাহার সহিত গমন করিবে; সুতরাং চিন্তার কোন কারণ নাই।

মহিষী বলিলেন, "আমি নিশ্চিন্ত হইলাম;" পরে সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মা! তোমার শরীর উপবাসে ক্লিষ্ট, রাত্রি ক্রমে অনেক হইয়াছে, তুমি গিয়া বিশ্রাম কর।"

সাবিত্রী মাতা পিতার চরণ বন্দনা করিয়া শয়নমন্দিরে গমন করিলেন।

বিপাশার বামতটে বহুযোজনব্যাপী অরণ্য; অরণ্যের একপ্রান্তে এক সুন্দর আশ্রম। কোন সময় মহর্ষি বশিষ্ঠ সেই আশ্রমে তপশ্চর্য্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তদবধি সেই আশ্রম তপোনিষ্ঠ ঋষিদিগের অবস্থিতি-ক্ষেত্র হইয়াছে। ঋষিদিগের সঙ্গে বানপ্রস্থাশ্রমী ব্যক্তিগণও তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। নানা দেশ হইতে বিদ্যার্থিগণও তথায় আগমন করিয়া স্ব স্ব অভীষ্ট বিদ্যার অনুশীলন করিতেন; সুতরাং সেই আশ্রম সর্ব্বদাই বেদাধ্যয়ন-শব্দে মুখরিত থাকিত। বিদ্যার্থী ঋষিকুমারদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহারা সকলে এক সঙ্গে অধ্যয়ন করিতেন, এক সঙ্গে পুষ্পচয়ন ও সমিধাহরণ করিতেন, এবং এক সঙ্গে গুরুর গোধন-রক্ষা ও নীবার-রোপণ করিতেন। কাহারও পীড়া হইলে অপর সকলে পীড়িতের রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেন; জনপদে যে সৌহার্দ্য দুর্লভ, ঋষিকুমারগণ তপোবনে তাহা প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইতেন।

একদিন পর্ব্বোপলক্ষে কয়েকটী ঋষিকুমার স্নানার্থ বিপাশাতীরে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিপাশার দুষার-স্নিগ্ধ বারিতে স্নান করিতে লাগিলেন, কেহ শিলাময় তটে উপবেশন করিলেন, কেহ পশ্চাদনুসরণকারী মৃগশাবকদিগের জন্য সরস তৃণ সংগ্রহে এবং কেহ বা স্নানান্তে পুষ্পচয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে দুইটী ঋষিকুমার, অপর সকলের নিকট হইতে কিঞ্চিদ্দূরে, একটী বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইয়া, কথোপকথন করিতেছিলেন। বেশে এবং বয়সে সমতুল্য হইলেও উভয়ের মধ্যে আকারে প্রচুর পার্থক্য ছিল। একজন দেখিতে সাধারণ ঋষিকুমারদিগের ন্যায়, কিন্তু অপরকে দেখিলেই বোধ হইত, ইনি প্রকৃত ঋষিকুল-সম্ভূত নহেন। তাঁহার দেহ উন্নত, বক্ষ বিশাল, স্কন্ধ, বাহু এবং উরু মাংসল। তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কমনীয়তার সঙ্গে যেন বীর্য্যবত্তা সুব্যক্ত হইতেছিল। তাঁহারা কৌতুকালাপ করিতেছেন, এমন সময় স্বর্ণবেত্রধারী এক সুবেশ পুরুষ তথায় উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "হে তপোবনবাসী ঋষিকুমারগণ! আপনারা অবগত হউন, মদ্ররাজদুহিতা সাবিত্রীদেবী এই তপোবনে অদ্য আগমন করিয়াছেন; আপনারা তাঁহার প্রণাম গ্রহণ করুন।"

শুনিয়া পূর্ব্বোক্ত ঋষিকুমারদ্বয়ের মধ্যে প্রথম দ্বিতীয়কে বলিলেন, "সখে সত্যবান্, দেখিলে ত আমার কথা সত্য কি না? আমরা ব্রাহ্মণ, আমাদিগের অদৃষ্ট চিরদিনই সমান; আতপতণ্ডুল ও অপক্ব কন্দমূলেই আমাদিগকে সংসারের সকল সাধ পূর্ণ করিতে হইবে; কিন্তু তোমরা ক্ষত্রিয়, তোমাদিগের ভাগ্য পরিবর্ত্তনশীল; আজ, এক যুদ্ধে পরাজিত

হইয়া হয় ত তোমরা ভিক্ষুক হইলে, কাল আর এক যুদ্ধে জয়ী হইয়া হয় ত এক বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হইবে। এই যে রাজকুমারী এখানে আসিতেছেন, কে বলিতে পারে যে, ইনি স্বয়ম্বর-সভায় তোমায় বরণ করিবেন না?"

সত্যবান। ভাই সত্যকাম! দেখিতেছি বিদ্যালাভ-প্রবৃত্তির অপেক্ষা ব্রাহ্মণীলাভ-প্রবৃত্তিই অধুনা তোমার বলবতী। তুমি সম্মত হইলে কৌশাম্বীতে তোমার পিতার নিকট সংবাদ পাঠাইতে পারি।

সত্যকাম। থাক্! সে কথা পরে হইবে। এখন চল। আমরা ত ভাই! তৈলাভাবে রুক্ষকেশা, বস্ত্রাভাবে চীরধারিণী এবং ব্রত-উপবাসে শীর্ণদেহা, তপোবন-বাসিনীদিগকেই দেখিতে অভ্যস্ত, এখন একবার রাজকন্যা কিরূপ দেখিয়া আসি! তোমার ত ভাই রাজকুলে জন্ম, বল দেখি, রাজকন্যারাও কি সাধারণ নারীগণের ন্যায় দ্বিভুজা, দ্বিনেত্রা?

সত্যবান। তা নয় ত কি? কিন্তু আমাদের রাজকন্যাদর্শনে যাইয়া লাভ কি? দেখ সূর্য্যদেব প্রায় মধ্যগগনে আসিয়াছেন, মহর্ষির যজ্ঞাবশেষ বিতরণের জন্য এই সময় আমাদিগকে অন্বেষণ করিবেন। বিলম্বে তিনি ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন। চল, স্নানান্তে আশ্রমে ফিরিয়া যাই।

এই বলিয়া উভয়ে স্নানার্থ নদীর দিকে অগ্রসর হইলেন। এই সময় পরিজনপরিবৃতা সাবিত্রীও সেই দিকে আগমন করিয়াছিলেন। বনপথ স্বভাবতঃ কুটিল; লতা-গুল্মের সন্নিবেশে নিকটস্থ বস্তুও লক্ষ্য হয় না। দুই দিক হইতে দুইটী বনপথ আসিয়া একটী উন্মুক্ত স্থানে মিলিত হইয়াছিল। সাবিত্রী এবং সত্যবান ঠিক সেই স্থলে আসিয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। চারি চক্ষু মিলিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের নেত্রের পলক, হৃদয়ের স্পন্দন রহিত হইল। উভয়েই ভাবিলেন, কি সুন্দর! কি মধুর! প্রথম বিস্ময়ের পর উভয়ে জীবনে যে ভাব কখনও অনুভব করেন নাই, ক্রমে সেই ভাব অনুভব করিলেন। উভয়েরই শরীর কণ্টকিত এবং ললাট স্বেদসিক্ত হইল। সলজ্জোচে উভয়ে সে স্থান ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কাহারও পদ উঠিল না। উভয়েই স্ব স্ব মনোগত ভাব গোপন করিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। প্রথম ঋষিকুমার বয়স্যের ভাব দেখিয়া বলিলেন, "সখে! গুরুদেবের যজ্ঞাবশেষ বিতরণের সময় হইয়াছে, তবে আশ্রম প্রতিগমনে বিলম্ব করিতেছ কেন?" সাবিত্রীর ধাত্রীও তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "রাজকুমারি। তপোবন-দর্শন ত দেখিতেছি ব্যর্থ হইল। চল অন্যত্র যাই।"

সাবিত্রী ধাত্রীর উদ্দেশ্য বুঝিয়া বলিলেন; "ধাত্রি! বহুপর্য্যটনে আমার শরীর শ্রান্ত হইয়াছে, চল রাজধানীতে ফিরিয়া যাই।" ধাত্রী বলিলেন "তাই হউক।"

অদ্য অশ্বপতি অন্য দিনের অপেক্ষা পূর্ব্বেই অন্তঃপুরে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার মুখ ম্লান, ঘন ঘন উত্তপ্ত নিশ্বাস বহিতেছে,

যেন কি নিদারুণ মনস্তাপ তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছে। তিনি শয়নকক্ষস্থিত একটী পর্য্যঙ্কের উপর উপবেশন করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তঃপুরে আগমন বার্ত্তা শুনিয়া রাজমহিষীও তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহিষী রাজার ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"মহারাজ! আজ আপনাকে এমন বিষণ্ণ ও স্ফূর্ত্তিহীন দেখিতেছি কেন? সাবিত্রী মনোমত পতি নির্ব্বাচন করিয়া আসিয়াছে, কোথায় আপনি আনন্দে তাহার বিবাহের উদ্যোগ করিবেন, না নির্জ্জনে অশ্রুপাত করিতেছেন? আপনার ভাব দেখিয়া আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে; কি হইয়াছে বলুন?"

রাজা। রাজ্ঞি! কি বলিব? সাবিত্রীর উপর তাহার পতি-নির্ব্বাচনের ভার দিয়া আমরা অতি নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য করিয়াছি। নিজেদের সর্ব্বনাশ নিজেরা ডাকিয়া আনিয়াছি?

রাজ্ঞী। কি হইয়াছে? সাবিত্রী কি কোন অপাত্রে আত্মসমর্পণ করিয়াছে?

রাজা। না রাজ্ঞি! সাবিত্রী সেরূপ কুমারী নয়; সাবিত্রী বশিষ্ঠাশ্রমে যে পাত্রের প্রতি অনুরাগবতী হইয়াছিল, অমাত্য সুপ্রজ্ঞ তাহার সম্যক পরিচয় আনিয়াছেন। তুমি শাল্বদেশের অধিপতি দ্যুমৎসেনের নাম শুনিয়াছ। বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে অন্ধ ও তাঁহার পুত্রকে বালক দেখিয়া শত্রুগণ তাঁহার রাজ্য অপহরণ করিয়াছিল। তিনি এক্ষণে পত্নীপুত্রসহ বশিষ্ঠাশ্রমে বাস করিতেছেন। সাবিত্রী নির্ব্বাসিত রাজা দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানকে পতিনির্ব্বাচন করিয়াছে।

রাজ্ঞী। মহারাজ, সত্যবান রাজ্যহীন, সম্পদহীন বলিয়াই কি আপনি এত দুঃখিত?

রাজা। না রাজ্ঞি! আমি সে জন্য বিন্দুমাত্রও দুঃখিত নহি। আমার দুঃখের কারণ তোমায় বলিতেছি। আজ দেবর্ষি নারদ আমার সভায় আসিয়াছিলেন। অমাত্য সুপ্রজ্ঞের নিকট সাবিত্রীর সত্যবানের প্রতি অনুরাগের কথা শুনিয়া আমি দেবর্ষিকে সত্যবানের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।

রাজ্ঞী। দেবর্ষি কি বলিলেন?

রাজা। দেবর্ষি বলিলেন, রূপে, গুণে, শীলে, সত্যবানের সমকক্ষ ব্যক্তি পৃথিবীতে কেহ নাই। সত্যবান জিতেন্দ্রিয়, ক্ষমাশীল, আত্মত্যাগী এবং উদারস্বভাব; কিন্তু এই সকল গুণ থাকিলে কি হইবে? এক দোষে সত্যবানের সকল গুণ ধ্বংস করিয়াছে।

রাজ্ঞী। কি দোষ?

রাজা। সত্যবান অতি অল্পায়ু। দেবর্ষি বলিলেন, অদ্য হইতে যে দিন সম্বৎসর পূর্ণ হইবে, সেই দিন সত্যবানের মৃত্যু হইবে।

শুনিয়া রাজ্ঞী চমকিতা হইলেন, তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি কাতরভাবে বলিলেন, "মহারাজ! এক্ষণে উপায়?"

রাজা। উপায় আর কি বলিব? সাবিত্রী যদি অন্য পতি নির্ব্বাচন করে,

তবেই রক্ষা, নচেৎ চিরদিনের জন্য আমাদিগকে শোকসাগরে ভাসিতে হইবে। তুমি সাবিত্রীকে এখানে ডাক, দুই জনে বুঝাইয়া দেখি, যদি কোন ফল হয়।

রাজ্ঞী। আমি এখনই তাহাকে ডাকিতেছি, কিন্তু সাবিত্রীকে আমি ভালরূপ জানি; তাহার মন একদিকে কুসুমের ন্যায় কোমল, অপরদিকে বজ্রের ন্যায় কঠিন। সে যাহা ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া মনে করিবে প্রাণান্তেও তাহার বিপরীত কার্য্য করিবে না। এখন উপায় ভগবান।

মাতা পিতার আহ্বানে সাবিত্রী অল্পক্ষণের মধ্যেই তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগের চরণবন্দনা করিয়া অতি মধুর স্বরে বলিলেন; "বাবা! আপনি আমাকে ডেকেছেন? কি আজ্ঞা বলুন।"

রাজা বলিলেন, "হাঁ মা! আমি তোমায় ডেকেছি; তুমি আমার কাছে এস!" এই বলিয়া অশ্বপতি দুহিতাকে আপনার পার্শ্বে পল্যঙ্কের উপর বসাইলেন এবং সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! তুমি এই কয়দিন কত নদী, বন, পর্ব্বত, দুর্গম স্থান ঘুরিয়া আসিয়াছ, তোমার কোন কষ্ট হয় নাই ত?"

সাবিত্রী। না বাবা! আমার কোন কষ্ট হয় নাই; আমি বরং এই কয়দিন বেশ আনন্দে কাটাইয়াছি। কত সুন্দর স্থান যে দেখিয়াছি, তাহার শেষ নাই। কোথাও পদ্মফুলে পুষ্করিণী আলো করিয়া রাখিয়াছে, কোথাও ক্রোশের পর ক্রোশ শ্যামল শস্যগুচ্ছ বায়ুভরে দুলিতেছে, কোথাও নির্ঝরগুলি কলকল শব্দে বহিয়া যাইতেছে, কোথায় পাহাড়গুলির চূড়ায় কালরঙের মেঘ আসিয়া লাগিয়াছে। নগরে এ সকল কিছুই নাই, কেবল ধূলি আর জনতা। আমার মনে হইয়াছিল, আপনি আর মা যদি সঙ্গে থাকিতেন, আমি এখানে আর ফিরিয়া আসিতাম না।

রাজা। মা! তুমি নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিয়াছ দেখিয়া আমরা পরম সুখী হইয়াছি। এখন তোমার সঙ্গে আমাদের দুই একটী প্রয়োজনীয় কথা আছে। তুমি যে ভর্ত্তৃ নির্ব্বাচন করিয়াছ, আমরা তাঁহার সম্বন্ধে সমস্ত অনুসন্ধান করিয়াছি। আমাদিগের উভয়ের অনুরোধ তুমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য পতি নির্ব্বাচন কর।

সাবিত্রী পিতার কথায় মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, তখন রাজা পুনর্ব্বার বলিলেন—

"মা! কেন আমরা এমন কথা বলিতেছি, তাহা শুন। আজ দেবর্ষি নারদ আমার সভায় আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে সত্যবানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহার বহু সদ্‌গুণের উল্লেখ করিয়া অবশেষে বলিলেন, সত্যবানের এই সকল গুণ থাকিলে কি হইবে? সত্যবান অতি অল্পায়ু; অদ্য হইতে যে দিন সম্বৎসর পূর্ণ হইবে, সেই দিন সত্যবান পরলোক গমন করিবে। এরূপ অল্পায়ু পাত্রে আত্মদান করিলে তোমাকে এবং তোমার সঙ্গে আমাদিগকেও চিরদিন দুঃখসাগরে ভাসিতে হইবে। মা! এখনও সময় আছে, বিরত হও।"

সাবিত্রীর পদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত যেন

একটী বিদ্যুৎরেখা ধাবিত হইল, কিন্তু তাঁহার মুখে কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইল না।

রাজ্ঞী বলিলেন, "সাবিত্রি! মহারাজ তোমায় যাহা বলিতেছেন, তাহা ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য নহে। তুমি সত্যবানকে দেখিয়া তোমার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়াছ মাত্র; পতিরূপে বরণ কর নাই; করিতেও তোমার অধিকার ছিল না; কারণ যতদিন পিতা কন্যাকে সম্প্রদান না করেন, ততদিন তাহার কাহাকেও পতিরূপে বরণের অধিকার জন্মে না। যখন সত্যবান অল্পায়ু বলিয়া তাহার সহিত বিবাহ আমাদিগের অনভিপ্রেত, তখন সত্যবানের পরিবর্ত্তে অপর কাহাকেও বরণ করিলে তুমি ধর্ম্মচ্যুতা হইবে না। পুত্রকন্যার পক্ষে মাতাপিতার আদেশ-প্রতিপালন পরম ধর্ম্ম, ইহা তুমি বিস্মৃত হইও না।"

সাবিত্রী বসিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন; করযোড়ে পিতামাতার সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া অতি বিনীত অথচ দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন; "বাবা! মা! আমি কখনও আপনাদিগের আদেশের অন্যথাচরণ করি নাই। পৃথিবীতে আপনারাই আমার দেবতা। দেবাদেবের ন্যায় আপনাদিগের আদেশ পালন করাই আমি ধর্ম্ম বলিয়া মনে করি। কিন্তু আজ আপনারা আমার প্রতি যে আদেশ করিতেছেন, তাহা পালন করিলে কেবল আমি নই, আপনাদিগকেও প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। আমি আপনাদিগের আদেশক্রমেই পতিনির্ব্বাচন করিয়াছি, স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া কিছু করি নাই। দেখুন, কর্ম্মাকর্ম্ম সম্বন্ধে মনই প্রমাণ। কারণ কর্ম্ম প্রথমতঃ মন দ্বারা নির্ণীত, পরে বাক্য দ্বারা অভিহিত এবং তৎপরে অনুষ্ঠান দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং আমি যাহা মনে স্থির করিয়াছি, তাহা একরূপ হইয়া গিয়াছে, বলিতে হইবে। এক্ষণে আমার পতি অল্পায়ু হউন আর দীর্ঘায়ু হউন, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে আমি অধর্ম্মভাগিনী হইব। আপনারা বলিতেছেন যে, তাঁহার পরমায়ু একবৎসর মাত্র, তাহা না হইয়া তাঁহার পরমায়ু যদি একদিন মাত্র হইত, তাহা হইলেও তাঁহাকে ত্যাগ করা আমার কর্ত্তব্য হইত না। অধিক কি বিবাহের পূর্ব্বে যদি আমাকে তাঁহার কোন অমঙ্গলের কথা শুনিতে হয়, তাহা হইলে আমি ভাবিব যে, আমি—"

সাবিত্রী আর বলিতে পারিলেন না, তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল; চক্ষুর জলে তাহার কপোলদ্বয় সিক্ত হইতে লাগিল। রাজ্ঞী কন্যার অবস্থা দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া সজলনয়নে সাবিত্রীকে বক্ষে লইলেন এবং অঞ্চলে তাহার চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া দিতে লাগিলেন। পত্নীর ও কন্যার অবস্থা দেখিয়া রাজারও চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল। রাজা, রাণী উভয়েই সাবিত্রীর প্রকৃতি জানিতেন, সুতরাং আর অধিক কথা বলার প্রয়োজন রহিল না। রাজা শেষে সাবিত্রীকে বলিলেন, "মা! তোমার

যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে, আমরা আশীর্ব্বাদ করি, যদি আমরা কায়মনোবাক্যে দেবী সাবিত্রীর পূজা করিয়া থাকি, তবে তোমাকে যেন বৈধব্য-ক্লেশ ভোগ করিতে না হয়।"

সাবিত্রী বিদায় লইলেন। মদ্ররাজ, তপোবনে দ্যুমৎসেনের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া, সাবিত্রীর বিবাহের আয়োজন করিবার জন্য মন্ত্রিগণকে আদেশ দিলেন।

শুভদিনে মহাসমারোহে সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর বিবাহ সম্পন্ন হইল। রাজা অশ্বপতি পরিজনবর্গের সঙ্গে তপোবনে গিয়া কন্যা সম্প্রদান করিলেন। কয়েক দিনের জন্য তপোবন উৎসবপূর্ণ হইল। বিদ্যার্থিগণ রাজদত্ত সুমিষ্ট ভোজ্যপানীয়ে, আশ্রমবাসিগণ বিবিধ কৌতুকদর্শনে এবং ঋষিপত্নী ও ঋষিবালিকাগণ বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারলাভে পরিতৃপ্ত হইলেন। বস্ত্রালঙ্কারের ব্যবহার লইয়া মহাকৌতুক উপস্থিত হইল। তপোবনবাসিনীগণ পূর্ব্বে কখন তাদৃশ অলঙ্কার দর্শন করেন নাই। সুতরাং কেহ কটিভূষণকে কণ্ঠভূষণ এবং শিরোভূষণকে প্রকোষ্ঠভূষণ করিলেন। কেহ নাসিকার অলঙ্কার কর্ণে এবং কেহ কর্ণের অলঙ্কার নাসিকায় পরিলেন। দেখিয়া রাজান্তঃপুরবাসিনীগণ অতি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিলেন। কয়েকদিন তপোবনে অবস্থানের পর রাজা ও রাণী জামাতা ও দুহিতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সাশ্রুনয়নে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

সাবিত্রীর পদার্পণের সঙ্গে দ্যুমৎসেনের আশ্রম নূতন শ্রী ধারণ করিল। কুটীরগুলির চতুর্দ্দিক পরিষ্কৃত, অঙ্গন মার্জ্জিত এবং পথগুলি কঙ্করশূন্য ও কণ্টকহীন হইল। আশ্রমের বৃক্ষলতাগুলি ফলপুষ্পে অধিকতর সুশোভিত এবং হোমধেনুটী অধিকতর দুগ্ধবতী হইল। অতিথিগণ আহারে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক তৃপ্তি বোধ করিতে লাগিলেন। রাজা দ্যুমৎসেন এবং তাঁহার পত্নী নববধূর পরিচর্য্যাগুণে শরীরে নব বল এবং হৃদয়ে নূতন স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেন। আর সত্যবান? তাঁহার মনের ভাব কি ব্যক্ত করিবার ভাষা আছে? দরিদ্র অর্থলাভে, রোগী স্বাস্থ্যলাভে, বিদ্যার্থী বিদ্যালাভে এবং ভক্ত আরাধ্য দেবতার প্রসাদলাভে যে তৃপ্তি অনুভব করে, সত্যবান এক সঙ্গে সেই তৃপ্তি লাভ করিলেন। তিনি ভাবিতেন, জন্মজন্মান্তরে কি এমন পুণ্য করিয়াছিলাম যে, তাহার ফলে বিধাতা আমাকে সাবিত্রীর ন্যায় সহধর্ম্মিণী প্রদান করিলেন। সাবিত্রীকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার স্বাভাবিক সদ্‌গুণগুলি আরও সজীবতা লাভ করিল। শাস্ত্রানুশীলনে তাঁহার অধিকতর নিষ্ঠা, জীবানুকম্পায় তাঁহার অধিকতর তৎপরতা এবং তপশ্চর্য্যায় তাঁহার অধিকতর ঐকান্তিকতা জন্মিল। তিনি ভাবিতেন, সাবিত্রীর যোগ্য পতি হইতে হইলে আমাকে গুণে, জ্ঞানে আরও শ্রেষ্ঠ হইতে হইবে।

যিনি নিজগুণে আশ্রমের পালিত মৃগটী হইতে স্বামী পর্য্যন্ত সকলকে এইরূপ তৃপ্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার মনের অবস্থাও একবার আলোচনা করা যাউক। সাবিত্রী

পরম পরিতৃপ্তা; কেবল পরিতৃপ্তা নহেন, আপনাকে কৃতার্থা বলিয়া ভাবিতেন। তিনি রাজকন্যা, গৃহকার্য্যে কখনও অভ্যস্তা ছিলেন না, কিন্তু আশ্রমে আগমন অবধি এমনি আনন্দের ও উৎসাহের সহিত সমস্ত কার্য্য করিতেন যে—গৃহস্থ-বধূদিগেরও মধ্যে তাদৃশ ব্যবহার দুর্লভ। দুষ্পার-শীত রাত্রেও তিনি বিপাশা হইতে জল আনিতেন, এবং প্রখর গ্রীষ্মের সময়ও তিনি অগ্নিতে দগ্ধপ্রায় হইয়া রন্ধন করিতেন। পাছে তাঁহার বৃদ্ধা শ্বশ্রূ তাঁহার ক্লেশ হইতেছে আশঙ্কায় স্বয়ং কোন কার্য্য করেন, এই ভাবিয়া তিনি সাংসারিক প্রত্যেক কার্য্য অগ্রেই করিয়া রাখিতেন। তাঁহার মধুর বচনে তাঁহার বৃদ্ধ শ্বশুরশাশুড়ীর প্রাণ শীতল হইত, তাঁহার স্মিতোজ্জ্বল মুখ তাঁহার পতির শয়নকক্ষ জ্যোৎস্নাময় করিত। সাবিত্রীর প্রফুল্লভাব দেখিলে যেন তিনি আজন্ম তপোবন-বাসে অভ্যস্তা ইহাই বোধ হইত।

কিন্তু প্রোজ্জ্বল মধ্যাহ্নেও যেমন মেঘের ছায়া সময়ে সময়ে পৃথিবীকে কালিমালিপ্ত করে, তেমনই এই আনন্দপূর্ণ সংসারে ঘন বিষাদ মধ্যে মধ্যে সাবিত্রীর হৃদয়াকাশ তিমিরাবৃত করিত। গৃহকার্য্য করিতে করিতে সাবিত্রী কখন কখন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেন, স্বামীর সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিবার সময় কখনও কখনও তাঁহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিত। স্বামী নিদ্রিত হইলে সাবিত্রী তাঁহার পার্শ্বে অনিদ্র অবস্থায় বসিয়া অনিমিষে তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিতেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহার নাসারন্ধ্রে অঙ্গুলিস্পর্শ করিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক বহিতেছে কি না পরীক্ষা করিতেন। কখনও সাবিত্রীর দরবিগলিত অশ্রু বক্ষে পতিত হওয়াতে সুষুপ্ত সত্যবান চমকিয়া উঠিতেন। সাবিত্রীর শরীর দিন দিন কৃশ এবং তাহার অঙ্গের জ্যোতি দিন দিন মলিন হইতেছিল। কেন এমন হইতেছে, তাহা কেহ বুঝিতে পারিত না। ঋষিপত্নীগণ ভাবিতেন, সাবিত্রী রাজকন্যা, সুখে সম্পদে প্রতিপালিতা, তপোবনক্লেশে এমন হইতেছে। তাঁহারা সাবিত্রীকে গৃহকার্য্যে সাহায্য করিতে আসিতেন; সাবিত্রী করে ধরিয়া, অনুনয় করিয়া তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতেন। সাবিত্রীর শাশুড়ী দেখিতেন, পুত্র পুত্রবধূর মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয়, অথচ বধূ মনোবেদনায় কাতরা। তিনি ইহার কারণ বুঝিতে পারিতেন না। ঋষিপত্নীদিগের ন্যায় তিনিও মনে করিতেন, তপোবনক্লেশেই বধূ এরূপ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। সাবিত্রী আশ্রমস্থ একটি শালবৃক্ষে অন্যের অলক্ষ্যে কতকগুলি সিন্দুর বিন্দু দিয়াছিলেন, বৃদ্ধা মহিষী দেখিতেন, বধূ মধ্যে মধ্যে হঠাৎ গৃহকার্য্য ছাড়িয়া সেই বিন্দুগুলি গণনা করিতে যায় এবং অশ্রু মোচন করিতে করিতে আবার আপনার কার্য্যে ফিরিয়া আসে; তিনি ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেন না। তিনি ভাবিতেন, সাবিত্রী বুঝি পিত্রালয়ে কোন ব্রত অভ্যাস করিয়াছে, তাই শালবৃক্ষে সিন্দুর বিন্দু অঙ্কন করিয়া তাহা গণনা করে। তিনি প্রতিদিন ইষ্টদেবতার নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিতেন "প্রভো! নিজের জন্য আর সংসারের কোন সুখ, কোন ভোগ চাই না। কিন্তু যদি

তোমার কৃপা হয়, তবে আমার এই সুশীলা বধূটিকে যেন শাল্বদেশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা দেখিয়া মরিতে পারি। সুখে, দুঃখে এইরূপে সাবিত্রীর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

ক্রমে দিনে দিনে পক্ষ, পক্ষে পক্ষে মাস, মাসে মাসে বৎসর পূর্ণ হইল। যে করাল রজনীতে সত্যবানের আয়ুঃশেষ হইবে বলিয়া নারদ বলিয়াছিলেন, তাহা নিকটবর্ত্তী হইল। সাবিত্রী গণনা দ্বারা সেই দিন পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়া ত্রিরাত্রি ব্রত গ্রহণ করিলেন। রাজা দ্যুমৎসেন সাবিত্রীর এই কঠোর ব্রত-গ্রহণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন "বৎসে! তুমি অতি তীব্র ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, দিনত্রয় উপবাস অতি দুষ্কর।" সাবিত্রী বলিলেন, "তাত! আপনি চিন্তিত হইবেন না, আপনাদিগের আশীর্ব্বাদে দুষ্কর হইলেও আমি ইহা পালনে সমর্থ হইব।"

ক্রমে নারদ-নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইল। সাবিত্রী অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রদীপ্ত হুতাশনে যথাবিহিত হোমকার্য্য সম্পাদন করিলেন। আশ্রমস্থ তপস্বিগণ এবং তাঁহার শ্বশুর ও শ্বশ্রূ তাঁহাকে "অবৈধব্য হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সাবিত্রী "তাহাই হউক" বলিয়া মনে মনে সেই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন।

এমন সময় সত্যবান প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ সংগ্রহার্থ স্কন্ধে কুঠার লইয়া অরণ্য গমনের জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। সাবিত্রী তাঁহার অনুগমন করিবার ইচ্ছা করিলে তাঁহার শ্বশুর ও শ্বশ্রূ বলিলেন, "মা! ত্রিরাত্র উপবাসে তোমার শরীর ক্ষীণ হইয়াছে; অরণ্যপথ অতি দুর্গম ও কণ্টকপূর্ণ; সত্যবান এখনি প্রত্যাগমন করিবে, তুমি অদ্য তাহার সহিত বনগমনের ইচ্ছা পরিত্যাগ কর।"

সাবিত্রী অতি বিনীত বচনে শ্বশ্রূকে বলিলেন "মা! আমি অদ্য যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে স্বামীর সহিত সর্ব্বদা একত্র অবস্থিতি করিবার নিয়ম আছে। বনগমনে আমার কিছুমাত্র ক্লেশ হইবে না। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে স্বামীর সহিত গমনে অনুমতি দিন।"

রাজা ও রাণী শুনিয়া "তাহাই হউক" বলিয়া অনুমতি দিলেন। সাবিত্রী প্রফুল্ল বদনে সত্যবানের সহিত অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। কোথাও বিবিধ বর্ণের কুসুমরাজি প্রস্ফুটিত রহিয়াছে, কোথাও বনপুষ্পের গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে, কোথাও ময়ূরগণ পুচ্ছবিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছে; কোথাও মৃগগণ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে; উভয়ে আনন্দে দেখিতে দেখিতে চলিলেন। কি জানি কখন কি হয়, এই আশঙ্কায় সাবিত্রীর প্রাণ প্রতিক্ষণে চমকিত হইতেছিল। কিন্তু সত্যবান তাহা জানিতেন না। তিনি কখনও তাঁহাকে অরণ্যের শোভা দেখাইয়া, কখনও অরণ্যচর প্রাণীদিগের প্রকৃতি বর্ণন করিয়া, এবং কখনও বা তাঁহার সহিত রহস্যালাপ করিয়া তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতেছিলেন। সত্যবান একবার বলিলেন;

"প্রিয়ে! আমি সত্য সত্যই ভাবিয়া পাই না যে, তুমি কি জন্য আমার ন্যায় ব্যক্তিকে বরণ করিয়াছিলে।"

সাবিত্রী বলিলেন, "নাথ! তুমি যদি নারী হইতে, তাহা হইলে সে কথা বুঝিতে পারিতে। পুরুষ হইয়া রমণীর মনের ভাব তুমি কেমন করিয়া বুঝিবে।"

সত্যবান। সাবিত্রি! আমাকে বরণ না করিয়া তুমি আর কোন রাজপুত্রকে বরণ করিলে তোমার আজ এত ক্লেশ হইত না। আমার দুর্ভাগ্য যে, একদিনের জন্যও আমি তোমাকে সুখী করিতে পারিলাম না।

সাবিত্রী। চিরদিনই কি সেই এক কথা! আমি কতবার বলিয়াছি, আমায় ও কথা বলিবেন না। আমার কিসের অভাব? ধন-রত্নের! তোমার ভালবাসায় আমি ত নিজেকে ইন্দ্রাণীর অপেক্ষা ভাগ্যবতী বলিয়া মনে করি। নারীর অলঙ্কারের সাধ কেন? স্বামীর চিত্তবিনোদনের জন্য। যখন বিনা অলঙ্কারে আমি তোমার চিত্তবিনোদনে সমর্থা হইয়াছি, তখন পৃথিবীর সকল রাজার সম্পদ যদি একত্র হয়, তাহা হইলে আমি তোমার পদের একটী ধূলিকণার অপেক্ষা তাহার মূল্য অধিক মনে করি না।

সত্যবান শুনিয়া পত্নীকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন; করিয়া বলিলেন "প্রিয়ে আমি ভাগ্যবান, নতুবা তোমার ন্যায় স্ত্রীরত্ন প্রাপ্ত হইব কেন?"

সম্মুখে একটী শুষ্ক বৃক্ষ দেখিয়া সত্যবান তাহা ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু দুই একবার কুঠারক্ষেপের পরেই তাঁহার সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। অকস্মাৎ দারুণ শিরোবেদনায় তাঁহাকে অভিভূত করিল এবং চতুর্দ্দিক অন্ধকারাবৃত বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। তিনি দণ্ডায়মান থাকিতে না পারিয়া "প্রিয়ে, আমায় ধর" এই বলিয়া পতনোদ্যত হইলেন। সাবিত্রী প্রস্তুত ছিলেন; তিনি বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া পতনোন্মুখ স্বামীকে বক্ষে ধারণ করিলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁহাকে তরুতলে নামাইয়া নিজের ক্রোড়ে তাঁহার মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক বস্ত্রাঞ্চলে তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিলেন। স্বামীর যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখ দেখিতে না পারিয়া সাবিত্রী একবার মুহূর্ত্তকাল চক্ষু মুদিত করিয়াছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিলেন, সত্যবানের চক্ষে পলক নাই; বক্ষে স্পন্দন নাই; বুঝিলেন নারদ-বাক্য সত্য হইল।

পৃথিবীতে এমন কোন কবি, কোন চিত্রকর আছেন, যিনি সাবিত্রীর তাৎকালীন অবস্থা ভাষায় বা তুলিকায় প্রকাশ করিতে পারেন? বনভূমি স্বভাবতঃ বিভিষিকাময়ী, সন্ধ্যাসমাগমে তাহা আরও ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই চতুর্দ্দিক প্রগাঢ় তিমিরে আচ্ছন্ন হইল এবং তরু, লতা, প্রস্তর, গুল্ম, সমস্তই অভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিল। কথোপকথনে উভয়ে আশ্রম হইতে বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং কোথাও মানুষের কণ্ঠস্বর পর্য্যন্ত শ্রুত হইতেছিল না। দূর হইতে মধ্যে মধ্যে বনচর প্রাণিগণের ভীষণ গর্জ্জন কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল এবং

অরণ্যোত্থিত বায়ু বৃক্ষশাখা সকল আন্দোলিত করিয়া এক এক বার বিকট শব্দে প্রবাহিত হইতেছিল। কিন্তু সাবিত্রী আজ ভীতিশূন্যা ; তাঁহার সকল সাধ সকল কামনা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সুতরাং তাঁহার আর ভয় কিসের ? তাঁহার নয়নের অশ্রু শুষ্ক হইয়া গেল, শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইল। তদবস্থায় তিনি অদূরবর্ত্তী কোন বৃক্ষমূলে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। নীবিড় অন্ধকারেও তাহা তাঁহার নিকট সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইল ; সাবিত্রী দেখিলেন, সে মূর্ত্তিতে কোন উগ্রভাব নাই, অথচ তাহা ভয়ঙ্কর, সে মূর্ত্তি শান্ত এবং বিকারশূন্য, অথচ তাহা দেখিলে আশা বা আনন্দ জন্মে না ; সে মূর্ত্তির চক্ষুতে পলক নাই, অথচ তাহার দৃষ্টি অন্তর্ভেদী ; তাহা রক্ত-মাংসে গঠিত নয়, অথচ তাহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুস্পষ্ট ও সুগঠিত। সাবিত্রী দেখিয়া প্রথমে মনে করিলেন, এ কি স্বপ্ন ? আবার পরক্ষণেই দেখিলেন, সত্যবানের নিশ্চল দেহ সম্মুখে শবরূপে পতিত রহিয়াছে, তবে ত এ স্বপ্ন নয়। তিনি উপনিষদ্ পাঠ-কালে নচিকেতা-উপাখ্যানে যে মৃত্যুদেবতার কথা পাঠ করিয়াছিলেন, এ কি সেই মৃত্যু-দেবতা ? সাবিত্রী ভাবিলেন, তাহা হইলে ত ভালই হয় ! এদিকে সেই ছায়াময়ী মূর্ত্তি এমনই তীব্র দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছিল যে, সাবিত্রী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি, ধীরে ধীরে, স্বামীর মস্তক ক্রোড় হইতে নামাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে সেই মূর্ত্তির উদ্দেশে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে ? আপনার অমানুষী মূর্ত্তি দেখিয়া আপনাকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান হইতেছে, আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন এবং নিজের পরিচয় দিয়া আপনি কি জন্য এখানে আসিয়াছেন, তাহা বলুন।"

ছায়াময়ী মূর্ত্তি বলিলেন, "আমি যম, তোমার স্বামী সত্যবানের আয়ুঃশেষ হইয়াছে, তাই আমি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে আসিয়াছি।"

যম এই বলিয়া ধীরে ধীরে সত্যবানের সংজ্ঞাশূন্য দেহের দিকে অগ্রসর হইলেন। সাবিত্রী দেখিতে পাইলেন, যমের স্পর্শমাত্র সত্যবানের দেহ হইতে এক অপূর্ব্ব পুরুষাকার তেজঃপদার্থ নির্গত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহ বিবর্ণ ও বিকৃত-দর্শন হইয়া গেল। যম সেই তেজোময় পুরুষকে গ্রহণ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সাবিত্রীও তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া যম দেখিলেন, সাবিত্রী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন। তখন তিনি বলিলেন, "সাবিত্রি ! নিবৃত্তা হও, ফিরিয়া গিয়া স্বামীর ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সম্পন্ন কর।"

সাবিত্রী বলিলেন, "প্রভো ! আমার স্বামী যেখানে নীত হইতেছেন, আমারও সেখানে গমন করা কর্ত্তব্য। গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালনই জ্ঞানলাভের প্রধান সোপান বলিয়া পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি জ্ঞানলাভের আশায় স্বামীর সহিত গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছিলাম। আপনি ধর্ম্মরাজ ! অকস্মাৎ আমার স্বামীকে গ্রহণ করিয়া আমার ধর্ম্মাচরণে ব্যাঘাত করিবেন না। আমার স্বামীকে যথায় লইয়া

যাইতেছেন, আমাকেও তথায় লইয়া চলুন।"

যম বলিলেন, "সুশীলে, আমি তোমার যুক্তিযুক্ত ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়াছি, সত্যবানের জীবন ব্যতীত তুমি অন্য যে বর প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই তোমাকে প্রদান করিব।"

সাবিত্রী তখন শ্বশুরের অন্ধত্বমোচন জন্য প্রার্থনা করিলেন। যম বলিলেন "তাহাই হইবে। তুমি পথশ্রমে শ্রান্তা হইয়াছ, এক্ষণে প্রতিনিবৃত্তা হও।"

সাবিত্রী বলিলেন, "প্রভো! আমি যখন স্বামীর সমীপে রহিয়াছি; তখন শ্রমে আমার ক্লেশ হইবে না। স্বামীই আমার একমাত্র গতি; আপনি আমার স্বামীকে যে স্থানে লইয়া যাইতেছেন, আমাকেও তথায় যাইবার অনুমতি দিন। সাধু-সমাগম কখনও নিষ্ফল হয় না, সেই জন্য ভাগ্যক্রমে যখন আপনার দর্শন পাইয়াছি, তখন আপনার নিকট অবস্থান করাই আমার কর্ত্তব্য।"

যম বলিলেন, "বৎসে! তোমার কথাগুলি যেমন হৃদয়রঞ্জন, তেমনি হিতকর। আমি তোমার কথায় পরম তৃপ্তিলাভ করিতেছি। তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন অন্য যে বর ইচ্ছা প্রার্থনা কর।"

তখন সাবিত্রী দ্বিতীয়বার শ্বশুরের পুনর্ব্বার রাজ্যপ্রাপ্তি প্রার্থনা করিলেন, এবং যমও "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। তদনন্তর প্রিয়বচনে যমকে পুনর্ব্বার প্রীত করিয়া সাবিত্রী পিতার বহুপুত্রলাভরূপ তৃতীয় বর প্রাপ্ত হইলেন। তথাপি তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন না দেখিয়া যম বলিলেন, "রাজপুত্রি! তুমি কৃতকার্য্য হইয়াছ, এক্ষণে গৃহে প্রত্যাগমন কর। কথাপ্রসঙ্গে তুমি অতি দূরপথে আগমন করিয়াছ।"

সাবিত্রী বলিলেন, "দেব! যখন আমি আমার স্বামীর সন্নিধানে রহিয়াছি, তখন ইহা দূরপথ নয়। আমার মন ইহা অপেক্ষা দূরতর পথে ধাবমান হইতেছে। অপক্ষপাত, ধর্ম্মানুমোদিত শাসনের জন্য আপনি ধর্ম্মরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ। আপনি সাধু; সাধুগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলে কখনও বঞ্চিত হইতে হয় না, সেই জন্যই আমি আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি।"

যম বলিলেন, "প্রিয়বাদিনি! আমি তোমার নিকট যেরূপ কথা শুনিতেছি, আর কাহারও নিকট সেরূপ কথা শুনি নাই। তুমি সত্যবানের জীবন ব্যতীত যে কোন বর প্রার্থনা কর।"

সাবিত্রী বলিলেন, "প্রভো! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাকে এই বর দিন, যেন আমি আমার পতি সত্যবানের ঔরসে কুলবর্দ্ধন, বলবীর্য্যশালী শতপুত্র লাভ করিতে পারি।"

যম বলিলেন, "পতিব্রতে! তাহাই হইবে। এক্ষণে প্রতিনিবৃত্তা হও, আর বৃথা শ্রম স্বীকারে প্রয়োজন নাই।"

সাবিত্রী বলিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি কৃতার্থা হইলাম। কিন্তু স্বামী বিনা আমি কোন সুখের বা কোন শ্রীর, এমন কি স্বর্গেরও অভিলাষিণী নহি। আপনি আমাকে শতপুত্রতা বর দিয়াছেন, অথচ আপনি আমার স্বামীকে হরণ করিয়া লইয়া

যাইতেছেন। আমি প্রার্থনা করি, সত্যবান জীবিত হউন, আপনার বাক্য সত্য হউক্।"

যম বলিলেন, "সাধুশীলে! বুঝিলাম, সতীর নিকট মৃত্যুও পরাজিত। এই লও, তোমার স্বামীকে গ্রহণ কর। আমি আশীর্ব্বাদ করি, পতিসুখে সুখিনী এবং পুত্র-পৌত্রাদি সমন্বিতা হইয়া, জীবনান্তে তুমি পতিব্রতা-লোক লাভ কর।" যম এই বলিয়া সত্যবানের দেহ হইতে গৃহীত সেই তেজোময় পুরুষকে সাবিত্রীর হস্তে সমর্পণ-পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। সাবিত্রীও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যথায় সত্যবানের মৃতদেহ পতিত ছিল, তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই তেজোময় মূর্ত্তির স্পর্শমাত্র সত্যবানের দেহে নবজীবন সঞ্চার হইল। তিনি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"প্রিয়ে! আমি শিরঃপীড়ায় অবসন্ন হইয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছিলাম। দেখিতেছি, রাত্রি অনেক হইয়াছে, তুমি আমাকে জাগ্রত কর নাই কেন?"

সাবিত্রী বলিলেন, "নাথ! তোমাকে অসুস্থ দেখিয়া জাগরূক করিতে আমার ইচ্ছা হয় নাই। এক্ষণে এই অন্ধকারে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের মধ্য দিয়া গমন কর্ত্তব্য নয়। উত্তরে কোনরূপে এই স্থানেই রাত্রি যাপন করি, প্রভাত হইলেই আশ্রমে গমন করিব।"

এদিকে রাজা দ্যুমৎসেন ধর্ম্মরাজের বরে চক্ষুলাভ করিয়াছিলেন। এই আকস্মিক সৌভাগ্যে তাঁহার ও রাজ্ঞীর আনন্দের ও বিস্ময়ের সীমা ছিল না; কিন্তু পুত্র ও পুত্রবধূর প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া তাঁহারা যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইলেন। তপোবন-বাসিগণ তাঁহাদিগকে যথোচিৎ সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল সত্যবান ও সাবিত্রী আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। হারানিধি প্রাপ্ত হইয়া রাজা ও রাজ্ঞী কৃতার্থ হইলেন। আশ্রমস্থ মুনিঋষিগণ সকলেই দ্যুমৎসেনের অকস্মাৎ চক্ষুলাভের সংবাদে বিস্মিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে সাবিত্রীর মুখে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহারা সেই পতিব্রতাকে ধন্যধন্য করিতে লাগিলেন। যমরাজ বলিয়াছিলেন যে, দ্যুমৎসেন আপনার হৃতরাজ্য পুনরায় প্রাপ্ত হইবেন; তাঁহার কথা অচিরাৎ সার্থক হইল। দ্যুমৎসেনের এক বিশ্বাসী মন্ত্রী যুদ্ধে শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি তাঁহাকে রাজধানীতে লইয়া যাইবার জন্য পুরবাসীদিগের সঙ্গে তপোবনে উপস্থিত হইলেন। রাজা ও রাণী ঋষি ও ঋষিপত্নীগণের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক পুত্র ও পুত্রবধূ সহ স্বরাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন। পিতামাতার অনুমতিক্রমে সত্যবান ও সাবিত্রী সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পরম সুখে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম ধার্ম্মিককে রক্ষা করেন, এই মহাবাক্য তাঁহাদিগের জীবনে সার্থক হইল।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু

বিলাত-ফেরতের বিপদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুপ্রভা মেয়েটিকে ঠিক সুন্দরী বলা যায় না। তাহার বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, তবে মুখ-চক্ষুর গঠন অনিন্দনীয়। আর, সে গঠনে বেশ একটা কমনীয় ভাব আছে। বয়স অষ্টাদশ বৎসর। তাহার পিতা বাবু অতুলচন্দ্র রায় একজন বিখ্যাত ব্রাহ্ম, বর্ত্তমান সময়ে আলিপুরের সবজজ। ভবানীপুর বকুলবাগান গলিতে তাঁহার বসতবাটী।

চারি বৎসর পূর্ব্বে সুপ্রভা ব্রাহ্মবালিকা-বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। আত্মীয় বন্ধুগণ সে সময় সকলেই মনে করিয়াছিলেন, সুপ্রভা এইবার বেথুন কলেজে ভর্ত্তি হইবে এবং ক্রমে ক্রমে বি-এ, এম-এ পাশ করিবে। কিন্তু তাহার পিতা বলিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করা পণ্ডশ্রম মাত্র, উহাতে রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা হয় না, উল্টা স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া যায়। তাঁহার মত এই যে 'হোমষ্টডি'ই আসল ষ্টডি—সুতরাং তিনি কন্যাকে কলেজে দিলেন না। লোকে পরোক্ষে বলিল, রায় মহাশয় ব্যয়বাহুল্যভয়েই এই অপকর্ম্মটি করিলেন। যাহা হউক সুপ্রভা এই চারি বৎসর ঘরে বসিয়া অনেক ইংরাজি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছে—যদিও তাহার পনেরো আনা অংশ উপন্যাস।

পিতার একমাত্র আদরিণী কন্যা বলিয়া সুপ্রভা বড় অভিমানী। তাহার একটি কুকুর আছে, সেটির নাম বিমলারাণী বা সংক্ষেপে বিমি। সুপ্রভা তাহার সহিত এমন ভাবে কথাবার্ত্তা কহে যেন সে মানবী। তাহার সমস্ত মনের কথা বিমির সহিত। সুপ্রভা মনে করে, অন্যান্য পশুপক্ষীর ন্যায় বিমিও অন্তর্য্যামী—তবে কথা কহিতে পারে না এই যা।

আসল কথাটাই এখনও বলা হয় নাই। নব্য ব্যারিষ্টার শ্রীযুত প্রকাশচন্দ্র চৌধুরীর সহিত সুপ্রভার বিবাহ। বৎসর দুই তিন হইল প্রকাশ বিলাত হইতে ফিরিয়াছে এবং ইতিমধ্যে তাহার কিছু 'প্র্যাক্‌টিস'ও জমিয়া গিয়াছে। হাইকোর্টের নিকট, প্রকাশ চেম্বার্স ভাড়া লইয়াছে। সেইখানেই তাহার আপিস, সেইখানেই বাসস্থান।

অপরাহ্ণকাল। দ্বিতলের একটি সুসজ্জিত কক্ষে, পিয়ানোর নিকট বসিয়া, সুপ্রভা একটি নূতন সঙ্গীত অভ্যাস করিতেছিল। তাহার মা আজ সন্ধ্যার সময় প্রকাশকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। প্রকাশ আসিলে সুপ্রভা আজ এই গানটি গাহিবে। বলা বাহুল্য, নিমন্ত্রণে এবং অনিমন্ত্রণে প্রকাশ প্রায়ই আসে। একমাস পরে শুভবিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। বালিগঞ্জে একটি ছোট বাড়ীও ঠিক হইয়াছে, বিবাহ হইলে নবদম্পতি সেইখানে বসতি করিবে।

পিয়ানো বাজিতে লাগিল—গানেরও মহলা চলিতেছে। শ্রোতা একমাত্র বিমি। পশ্চাতের দুই পদের উপর উচ্চ হইয়া বসিয়া ঊর্দ্ধকর্ণে, নিপুণ সমালোচকের মত বিমি গান শুনিতেছে। মাঝে মাঝে তাহার কাণ

দুটি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। মানব-ভাষায় এ কর্ণকম্পনের অনুবাদ সম্ভবতঃ—"বাঃ কি চমৎকার।"—এমন সময়ে বহিরঙ্গনে একখানি গাড়ী প্রবেশ করিবার শব্দ উঠিল।

এক মিনিট পরে সোণার চশমাধারিণী, বিংশবর্ষীয়া একজন মহিলা, মরক্কো চামড়ার একটি ছোট পেগি ব্যাগ হাতে করিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সুপ্রভা উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহাস্যমুখে বলিল—"মিস্ মল্লিক, আসুন আসুন। অনেক দিন পরে যে!"

বিমি তাঁহাকে দেখিয়া ভেক্ ভেক্ করিয়া উঠিল। সঙ্গীতে বাধা পড়িল বলিয়াই তাহার রাগ অথবা অন্তর্যামী হওয়াতে অন্য কোনও ভাব তাহার মনে উপস্থিত হইয়াছিল, বলা যায় না।

কুকুরের গায়ে এক থাবড়া মারিয়া সুপ্রভা বলিল—"কি অভদ্র তুই! চুপ কর্।"

মিস্ মল্লিক মুখখানি গম্ভীর ও বিষণ্ণ করিয়া বলিলেন—"মা কোথা?"

"ভিতরে আছেন। আসুন না।"—বলিয়া সুপ্রভা তাঁহাকে লইয়া অগ্রসর হইবার উপক্রম করিল। মিস্ মল্লিক তাহাকে হাত দিয়া ঠেলিয়া বলিলেন—"তুই আসিস্ নে। মিসেস্ রায়ের সঙ্গে আমার কথা আছে।"

তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া সুপ্রভা শঙ্কিত হইল। বলিল—"কেন, কি হয়েছে?" মিস্ মল্লিক উত্তর না করিয়া পর্দ্দা সরাইয়া ভিতরে করিলেন।

সুপ্রভা তখন পিয়ানো বন্ধ করিয়া খোলা জানালার কাছে একখানি সোফায় উপবেশন করিল। বিমি ডুড়ুক করিয়া উঠিয়া তাহার পার্শ্বে বসিল।

সুপ্রভা তখন কুকুরের মুখখানি ধরিয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিতে লাগিল—"বিমি কি হয়েছে রে? আমাকে যেতে দিলে না কেন? কি কথা? আমার বিষয় কোন কথা না কি? যদি তাই হয় তবে স্যাজ নাড়, নয় ত স্যাজ নাড়িস্‌নে।"

বিমি আদরে গলিয়া গিয়া সোফার উপর কাৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। সম্মুখের পদদ্বয় দিয়া সুপ্রভার হাতখানি আটকাইয়া তাহার সুকুমার অঙ্গুলিগুলিতে মৃদু মৃদু দংশন করিতে লাগিল সঙ্গে সঙ্গে তাহার লাঙ্গুল আন্দোলিত হইয়া সোফার উপর বিচিত্র চট্‌পটাধ্বনি সৃজন করিল।

"তুই ত সব জানিস্—কখ্‌খনো নয়—কখ্‌খনো নয়"—বলিতে বলিতে সুপ্রভা কুকুরকে কাতুকুতু দিতে লাগিল। তাহাতে বিমলারাণীর লাঙ্গুলান্দোলন কিছু মাত্র হ্রাস হইল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভিতরে একটি শয়নকক্ষের খোলা জানালার কাছে সুপ্রভার মাতা চেয়ারে বসিয়া ছিলেন, দাসী তাঁহার আলুলায়িত কেশদাম হস্তে লইয়া তাহার মধ্যে চিরুণী সঞ্চালন করিতেছিল। পার্শ্বে, মর্ম্মরমণ্ডিত একখানি ছোট গোল টেবিলের উপর এক শিশি সুগন্ধি তৈল রক্ষিত। প্রবেশদ্বারে পর্দ্দা ফেলা ছিল; বাহিরে দাঁড়াইয়া মিস্ মল্লিক বলিলেন—"আসতে পারি?"

কণ্ঠস্বর চিনিয়া গৃহিণী বলিলেন—"কে সরযূ? এস।"

মিস্ মল্লিক প্রবেশ করিয়া, গৃহিণীকে নমস্কার করিয়া, একখানি চেয়ার টানিয়া কাছে বসিলেন।

"তার পর সরযূ, অনেক দিন এদিকে আসনি যে। সব খবর ভাল ত?"

অন্যদিকে চাহিয়া বিষণ্ণস্বরে মিস্ মল্লিক বলিলেন—"ভাল নয়।"

"কেন, কি হয়েছে?"

সরযূ মুহূর্ত্তকাল নীরবে থাকিয়া ইংরাজিতে বলিলেন—"আপনার দাসীকে অন্যত্র যাইতে বলুন।"

আজ্ঞানুসারে দাসী কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। গৃহিণী তখন বলিলেন—"কি হয়েছে সরযূ? ব্যাপার কি?"

"সুপ্রভার সঙ্গে প্রকাশের বিয়ে কি স্থির?"

"স্থির বৈ কি। একমাস পরে দিন স্থির হয়েছে। কেন বল দেখি?"—গৃহিণীর কণ্ঠস্বর শঙ্কাকুল।

ব্যাগের কোমল হাতলটি অঙ্গুলির দ্বারা মুচড়াইতে মুচড়াইতে সরযূ বলিলেন—"বড় খারাপ সংবাদ নিয়ে এসেছি, মিসেস্ রায়। আমায় মাফ্ করবেন। এ বিয়ে হতে পারে না—ভেঙ্গে দিতে হবে।"

এ কথা শুনিয়া গৃহিণীর মুখ শুকাইয়া গেল। কম্পিত স্বরে বলিলেন—"বিয়ে ভেঙ্গে দিতে? কি সর্ব্বনাশ! কেন, কি হয়েছে?"

মুখখানি নত করিয়া মিস্ মল্লিক ধীরে ধীরে বলিলেন—"প্রকাশ—বিলেতে—বিয়ে করে এসেছে।"

"প্রকাশ বিলেতে বিয়ে করে এসেছে!"

"বিয়ে করে এসেছে।"

"বল কি!—তাও কি হতে পারে? অসম্ভব! প্রকাশকে আমরা বরাবর বেশ ভাল, ধার্ম্মিক ছেলে বলেই জানি, সে কি আমাদের এমন করে ঠকাবে? না না—এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। নিশ্চয়ই কোন শত্রুতে এ কথা রটনা করেছে। কে বলেছে বল ত?"

"কেউ বলেনি মিসেস্ রায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি নিজেই আবিষ্কার করেছি।"

"আবিষ্কার করেছ!—তুমি কি করে আবিষ্কার করলে?"

সরযূ তখন ধীরে ধীরে পেগি ব্যাগটি খুলিয়া একখানি চিঠি বাহির করিয়া মিসেস্ রায়ের হস্তে দিলেন।

খামখানির উপরিভাগে এক লাইন মোটা অক্ষরে লেখা আছে—"উইলিয়ম হোয়াইটলি লিমিটেড্।" তাহার নিম্নে একটা মোটা কসি। মধ্যস্থলে টাইপরাইটিং অক্ষরে লেখা আছে——

মিসেস্ পি, সি, চৌধুরী,

১৬২ অ্যাড্‌লেড্ রোড,

হ্যাম্পষ্টেড্।

যথাস্থানে একখানি লাল পেনিষ্ট্যাম্প আছে—তাহাতে পোষ্টাপিসের ছাপ।

কম্পিত হস্তে গৃহিণী খাম হইতে পত্রখানি মোচন করিলেন। ভিতরে ছাপা ও টাইপরাইটিং অক্ষরে যাহা লেখা ছিল তাহার অবিকল অনুবাদ এই——

উইলিয়ম হোয়াইট্‌লি লিমিটেড্‌
ধোপা বিভাগ।
ওয়েষ্টবোর্ণ গ্রোভ,
লণ্ডন।
২৬শে জানুয়ারি ১৯০৮

প্রিয় মহাশয়া,

আপনার কলাঙ্কার তারিখের পত্রের উত্তরে আমি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে আপনার একখানি রুমাল অনবধানতাবশতঃ গতবারের ধোলাই কাপড়ের সঙ্গে পাঠানহয় নাই। এ সপ্তাহের কাপড়ের সঙ্গে সেখানি যাইবে। আশা করি ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

আপনার বিশ্বস্তভাবে
উইলিয়ম হোয়াইটলি লিমিটেড।

মিসেস্‌ পি, সি, চৌধুরি
১২৬ আড্‌লেড্‌ রোড;
ব্রাম্পষ্টেড্‌।

পত্রখানি দুইবার পড়িয়া গৃহিণী বলিলেন—"এ কোন্‌ পি, সি, চৌধুরী? এ চিঠি তুমি কোথায় পেলে?"

"আমার ভাই প্রকাশের চেম্বার্স থেকে আমার পড়বার জন্যে একখানা উপন্যাস চেয়ে এনেছিল। সেই বইয়ের মধ্যে এ চিঠি পেয়েছি।"

শুনিয়া মিসেস্‌ রায় নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। সরযূ বলিতে লাগিলেন—

"কাল বৈকালে বইখানা এনে দিয়েছিল। কাল আর সেটা দেখবার অবসর পাইনি। আজ দুপুর বেলা বই খুলে দেখি, এই চিঠি তার মধ্যে। শিরোনামা পড়েই চম্‌কে গেলাম। ভাবলাম, কি ভয়ানক!—বিলেতে একজন মিসেস্‌ পি, সি, চৌধুরী ছিল? প্রথম মনে হল, শিরোনামায় হয় ত ভুলে মিসেস্‌ লিখেছে—চিঠি খুলে পড়লেই সন্দেহভঞ্জন হয়ে যাবে। আবার ভাবলাম, ভুলই হোক্‌ যাই হোক্‌, পরের চিঠি পড়বার আমার অধিকার কি? তখন আমার ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল,—'প্রকাশের সঙ্গে সুপ্রভার যখন বিয়ের কথা হয়েছে, তখন এ বিষয়ে অনুসন্ধান করবার অধিকার তোমার আছে।'—ভেবে দেখলাম, কথাটা ঠিক। যদি বাস্তবিকই প্রকাশ বিলেতে বিয়ে করে এসে থাকে, তবে সুপ্রভার সঙ্গে ত কোনমতেই তার বিয়ে হতে পারে না। যদি সে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেও এসে থাকে, তা হলেও নয়;—কারণ ব্রাহ্মসমাজে দ্বৈতবিবাহের পাপ প্রবেশ করবে, এ ত কোন মতেই হতে দেওয়া উচিত নয়। সুতরাং এ চিঠি দেখা, শুধু আমার অধিকার নয়—কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সমাজের কাছে, ধর্ম্মের কাছে এর জন্যে আমি দায়ী। এই রকম সাত-পাঁচ ভেবে চিঠি খানা খুলে পড়লাম। সন্দেহ ঘুচে গেল। লিখতে ভুল একবার হতে পারে—তিন তিন বার ভুল হয় না। ভিতরেও রয়েছে মিসেস্‌—আবার প্রিয় মহাশয়া।"

গৃহিণী কষ্টে কথা কহিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, তুমি যা বলছ, যদি তাই হ'ত, তাহলে সে স্ত্রীলোকের যেটা নিজের নাম, যেমন নেলি কি জেসি, তাই থাকত। মিসেস্‌ পি, সি লিখলে কেন?"

"সধবা স্ত্রীলোককে স্বামীর নামের আদ্যক্ষর দিয়েই লেখা নিয়ম। মিসেস্‌ নেলি চৌধুরী লিখলে বোঝাত যে বিধবা স্ত্রীলোক।"

"কেন, আমাদের দেশে মিসেস্‌

সরোজিনী গুপ্ত, মিসেস্ প্রভাবতী ঘোষ, এ রকম ত দেখে। তারা ত সধবা।"

সরযূ বিজ্ঞভাবে বলিলেন—"ও রকম দেখা ভুল। আমি বাবার কাছে শুনেছি।" —সরযূর পিতা একজন বিলাতপ্রত্যাগত ডাক্তার—সুতরাং আর কথা চলিল না।

গৃহিণী একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"পৃথিবীতে কাউকে বিশ্বাস করবার যো নেই। মেয়ের জন্যে মনের মত পাত্র পাওয়া আমাদের সমাজে কত শক্ত তা ত দেখছ। আশা করেছিলাম, সুপ্রভার একটা ব্যবস্থা হল—কিন্তু সবই পণ্ড হয়ে গেল।"—বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু দুইটি জলে পূর্ণ হইয়া আসিল। ইহা দেখিয়া সরযূ উঠিয়া বলিলেন—"আমি এখন আসি। চিঠি খানা রেখে যাব কি?"

"রাখ।"

সরযূ চিঠিখানি টেবিলের উপর রাখিলেন। গৃহিণী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—"এ কথা আর কাউকে বলেছ কি?"

"না। এখনও বলিনি।"

সরযূর হাত দুটি ধরিয়া গৃহিণী বলিলেন —"দেখ, এখন আর কারু কাছে এ কথা প্রকাশ কোরো না।"

"বেশ। আমি কাউকে বলব না। আমার যা কর্ত্তব্য আমি তা করলাম, এখন আপনাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আপনারা বিবেচনা করুন। তবে, একটা কথা বলে রাখি। প্রকাশের এক বিবাহ সত্ত্বেও, 'সে স্ত্রীকে ত ত্যাগই করেছে, সে সব চুকে গেছে' এই মনে করে যদি তার সঙ্গে সুপ্রভার বিবাহ দেবার চেষ্টা করেন, তা হলে এ কথা আমায় প্রকাশ করতেই হবে। ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ আমি কোন মতেই ক্ষুণ্ণ হতে দেব না—বন্ধুত্বের খাতিরেও নয়। নমস্কার।"—বলিয়া মিস্ মল্লিক প্রস্থান করিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই সুপ্রভা আসিয়া প্রবেশ করিল। দেখিল, জননী কাষ্ঠপুত্তলিকার মত নিস্পন্দভাবে বসিয়া। তাঁহার চক্ষু দুইটি হইতে ক্রোধ, ঘৃণা ও বিরক্তি উছলিয়া পড়িতেছে।

"কি হয়েছে মা?"—বলিয়া সুপ্রভা পার্শ্বস্থিত টেবিল হইতে পত্রখানি উঠাইয়া লইল। ঠিকানা পড়িয়া বলিয়া উঠিল— "এ কি মা? দেখব?"

"দেখ।"

পত্র খুলিয়া পাঠ করিয়া সুপ্রভা বলিল— "এ কি মা?"

মা বলিলেন—"প্রকাশের সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে পারবে না। সে বিলেতে বিয়ে করে এসেছে।"

সুপ্রভা পত্রখানি দ্বিতীয়বার পাঠ করিল। খামখানি পরীক্ষা করিল, ডাকঘরের ছাপ তারিখ দেখিল। তাহার পর চিঠিখানি সজোরে মেঝের উপর আছড়াইয়া ফেলিয়া, চক্ষে অঞ্চল দিয়া, দ্রুতবেগে নিজ শয়নকক্ষে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একঘণ্টা পরে, অতুলবাবুর একজন ভ্রাতুষ্পুত্র—সন্তোষচন্দ্র বাবু আসিয়া দর্শন

দিলেন। ইনি একজন নব্য ব্রাহ্ম—নীতি ও ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে কাহারও তিলমাত্র শিথিলতা দেখিলে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন এবং বিশেষ করিয়া বিলাত-ফেরত যুবকগণের উপর একেবারে খড়্গহস্ত।

সন্তোষ বাবু আসিয়াই খুল্লতাতপত্নীর শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"সুপ্রভা কোথা?

"শুয়ে আছে?"

"এখন শুয়ে? কেন, কোন অসুখ করেছে না কি?"

"না।"

'তবে ব্যাপার কি কাকীমা? তোমার চেহারাই বা এ রকম হয়ে গেল কেন? কেঁদেছ? তোমার চোখ লাল হ'য়ে উঠেছে, ফুলেছে।—কি হয়েছে বল ত?"

বিশেষ অনিচ্ছাসত্ত্বেও গৃহিণী তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন।

পত্র পড়িয়া, চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়া, দুই চক্ষু ঊর্দ্ধে তুলিয়া সন্তোষ বাবু বলিতে লাগিলেন—

"আমি ত গোড়া থেকেই জানি, একটা ব্যাঘাত হবেই হবে। তোমরা যে বিলাত-ফেরত বলে একেবারে অজ্ঞান হলে। বিলাতফেরতেরা কি সহজ লোক? এমন অপকর্ম্ম নেই যা তারা বিলেতে গিয়ে করে না। আর, এখানে ফিরে এসেই বা কি? এক একটি মদের পিপে বল্লেই হয়। শাস্ত্রী মশায় ডক্টর ছাত্তের যে চিত্র এঁকেছেন তা পড়েও ত লোকের চৈতন্য হল না! আর ব্রাহ্মসমাজের মেয়েদের যে কি রোগ হয়েছে—বিলাতফেরত নইলে তাঁদের পছন্দই হয় না। কেন রে বাপু—যারা বিলাত যায়নি তারা কি মানুষ নয়? আসল কথা কি জান? বিলাত-ফেরতের স্ত্রী হলে বেয়ারা খানসামা সবাই মেমসাহেব বলে ডাকবে। মাঠাকরুণ বলে ডাকলে যেন ওঁদের গায়ে জ্বর আসে—একেবারে অসহ্য। তা মেয়েদেরই বা দোষ দেব কি। এ কালের—এ যুগের দোষ। বাহ্য চাকচিক্য দেখেই সকলে মোহিত—ভিতরটায় পদার্থ কিছু আছে কি না, তা কেউ খোঁজ নেয় না। এ চিঠি তোমাদের হাতে পড়ল কি করে?"

"প্রকাশের চেয়ার থেকে একখানা বই কোন লোক পড়তে নিয়ে যায়। সে বইয়ের মধ্যে এ চিঠি ছিল। আচ্ছা তোমার কি মনে হয় সত্যিই প্রকাশ বিলেতে বিয়ে করে এসেছে?"

সন্তোষ বাবু পত্রখানি আবার পাঠ করিলেন। শেষে বলিলেন—"প্রমাণ ত অকাট্য।"

"আচ্ছা এও ত হতে পারে, বিলাতে হয় ত বিয়ে করেছিল, সে স্ত্রী মরে গেছে?"

সন্তোষ বাবু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"তা যদি হত তা হলে প্রকাশ ও কথা লুকোবে কেন? তা হলে স্পষ্টই বলত, বিলাতে আমি বিবাহ করেছিলাম বটে, কিন্তু এখন আমি বিপত্নীক। বেশ বোঝা যাচ্ছে সেখানে বিবাহ করেছিল, তার পর নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। ভেবে দেখেছে, সে স্ত্রীকে এ দেশে নিয়ে এলে লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না। একে নতুন ব্যারিষ্টার, পৈত্রিক

বিষয়সম্পত্তিও তেমন কিছু নেই, মেম-সাহেবের গাউনের বিল শুধতে শুধতেই দেউলে হয়ে যাবে। তাই তাকে ফেলে চলে এসেছে। কত লোক এমন করেছে, শুধুই কি প্রকাশ? রবিবাবুর 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্প পড়নি? প্রকাশ যাকে বিয়ে করেছিল সে হয় ত গরীবের মেয়ে, মিসেস্ অনাথবন্ধু সরকারের মত সাতসমুদ্র পার হয়ে এসে হাজির হতে পারবে না—তাই সুযোগ বুঝে নিশ্চিন্ত মনে সট্ কান দিয়েছে। উঃ—কি ভয়ানক কথা! কি বিশ্বাসঘাতকতা! সে হতভাগিনীর এখন উপায় কি হয়েছে তা ভগবানই জানেন। হয় ত দুই একটি ছেলে মেয়ে সুদ্ধ তাকে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছে। কি ঘোর অধর্ম্ম!"

দুইজনে কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। ভৃত্য চা আনিয়া দিল।

সেই কক্ষের প্রান্তে, সুপ্রভার শয়ন-কক্ষের রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে, বিমি শুইয়াছিল। চা পানের সময় বিমি প্রতিদিন হাজির থাকে, দুই একখানা বিস্কুট পায়। আজ তাহাকে নিকটে না দেখিয়া সন্তোষ বাবু একখানা বিস্কুট হাতে তুলিয়া ডাকিলেন —"বিমি বিমি বিমি।"

বিমি সেই খানে শুইয়া লাঙ্গুল নাড়িল —কিন্তু আসিল না। বিস্কুটের প্রতি তাহার এতাদৃশ ঔদাসিন্য পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই।

চা পান করিতে করিতে সন্তোষ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাকা মশায়, এখনও এলেন না?"

গৃহিণী বলিলেন—"আজ তাঁর আসতে একটু দেরী হবে। কাছারির পর কলকাতায় গেছেন—একটা কি সভা আছে।"

সন্তোষবাবুর চা পান শেষ হইলে, গৃহিণী বলিলেন—

"তুমি একটু বস। আমি সুপ্রভাকে দেখি।"

"না কাকীমা—সুপ্রভাকে এখন অনুতাপ করতে দাও—তাতে ওর অনেক উপকার হবে।"

গৃহিণী বলিলেন—"অনুতাপ করবে কেন? ওর কি অপরাধ? আহা বাছা কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছে। আমি গিয়ে ওকে ওঠাই।"

সন্তোষ দাঁড়াইয়া বলিলেন—"আমি আর বসব না, যাই। কাল এসে কাকামশায়ের সঙ্গে দেখা করব এখন।"

"না সন্তোষ, তুমি বস। আজ আবার একটা ভারি মুস্কিল হয়েছে। প্রকাশকে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছিলাম, সে হয় ত এখনি এসে পড়বে। আমার যে রকম মনের অবস্থা, আমি তার সঙ্গে বসে কথা-বার্ত্তা কইতে পারব না। অন্ততঃ তিনি বাড়ী না আসা পর্য্যন্ত তুমি থাক। তিনি সাতটার মধ্যেই আসবেন।"

সন্তোষ বাবু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"সে নরাধমকে এ বাড়ীতে আসতে দেওয়া উচিত কি?"

"আজ সে নিমন্ত্রিত, আজ ত আর তাকে তাড়িয়ে দিতে পারা যাবে না। তিনি আসুন, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় করা যাবে। শেষে ত বাড়ী বন্ধ করতেই হবে।"

"কিন্তু কাকীমা, আমি যে তার সঙ্গে বসে মন খুলে গল্পগুজব করতে পারি, এমন বোধ হয় না। হয় ত নিজেকে সামলাতে না পেরে কোন রূঢ় কথা বলে ফেলব।"

"ও প্রসঙ্গ তোমার তোলবার দরকার কি?—না, না—কোন রকম রূঢ়তা তার সঙ্গে কোরো না। সেটা অন্যায় হবে। তুমি তার কাছে বসে দুচারটে অন্য কথাবার্তা কইতে থেক, তোমার কাকা আসামাত্র তোমার ছুটি।"—বলিয়া গৃহিণী কন্যার শয়নকক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর প্রকাশচন্দ্র সিল্কলিয়ার ধুতি পরিয়া, আস্তির গিলা-করা পাঞ্জাবীর উপর রেশমী চাদরের বাহার দিয়া, আসিয়া উপস্থিত হইল। ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করিয়া দেখিল সন্তোষচন্দ্র বাবু বসিয়া, গ্রন্থপাঠ করিতেছেন।

"সন্তোষ বাবু যে, নমস্কার"—বলিয়া প্রকাশ তাঁহাকে সস্মিতভাবে অভিবাদন করিল।

সন্তোষ বাবু দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন —"আসুন—বসুন।"—তাঁহার মুখভাব ও কণ্ঠস্বর রাত্রিচর পক্ষীবিশেষের মত গম্ভীর। পুনরায় বসিয়া গ্রন্থে মনোনিবেশ করিলেন।

প্রকাশ ইঁহার প্রকৃতি পূর্ব্বাবধি অবগত ছিল। বলিল—"অত পড়বেন না—অত পড়বেন না—চোখ খারাপ হয়ে যাবে।"

সন্তোষ বাবু ভাবিলেন, অভ্যাগত নিকটে বসিয়া থাকিতে গ্রন্থ অধ্যয়ন করাটা শুভ্রতা হইতেছে না। কাকীমার অনুরোধ স্মরণ করিয়া, যথাসাধ্য প্রসন্নতা অবলম্বন করিয়া বলিলেন—"পার্কারের বই পড়ছিলাম। বড় ভাল বই। আপনি পড়েছেন?"

সন্তোষ বাবুকে একটু রাগাইবার অভিপ্রায়ে নিগ্রীহতার ভান করিয়া প্রকাশ বলিল—"হাঁ, পড়েছি বৈ কি। গিলবার্ট পার্কারের প্রায় সমস্ত উপন্যাসই আমি পড়েছি। ওখানা কোন্ উপন্যাস?"

সন্তোষ বাবু অন্তরে অন্তরে জ্বলিয়া বলিলেন—"উপন্যাস!—উপন্যাস কেন হবে? এ বিওডোর পার্কারের 'টেন সার্ম্মন্স'—ধর্ম্মগ্রন্থ।"

প্রকাশ বলিল—"ওঃ—না, ও সব পড়িনি।" সন্তোষবাবু আবার গ্রন্থে মনোনিবেশ করিলেন। ক্ষণপরে আত্ম-সম্বরণ করিয়া বলিলেন—"বিলেতে থাকতে সেখানকার ধর্ম্মজীবনের দিকটা একটু চর্চ্চা করেছিলেন কি?—পড়াশুনো নিয়েই ব্যস্ত, বোধ হয় সময় পান নি?"

"না, পড়াশুনো নিয়ে যে বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম, তা বলতে পারিনে। তবে মাঝে মাঝে গির্জ্জায় গিয়েছি বটে, তাও প্রায় মেয়েদের (escort) রক্ষক-স্বরূপ।"

সন্তোষ বাবু মনে মনে বলিলেন—"হুঁ!—রক্ষকস্বরূপ না ভক্ষকস্বরূপ।"—প্রকাশ্যে বলিলেন—"লণ্ডনে সোয়ালো ষ্ট্রীটে ভরজী সাহেবের যে খ্রীষ্টিক চর্চ্চ আছে সেখানে কখনও গিয়েছিলেন কি? শুনেছি মাঝে মাঝে ষ্টপফোর্ড ব্রুক সাহেব সেখানে এসে উপদেশ দেন। আমাদের ব্রাহ্ম-

সমাজের সঙ্গে তাঁদের যথেষ্ট সহানুভূতি আছে।"

প্রকাশ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল—কোথায় বল্লেন? সোয়ালো ষ্ট্রীট? সোয়ালো ষ্ট্রীট? কোন খানটা বলুন দেখি? হাঁ—মনে পড়েছে। পিকাডিলিতে একটা সোয়ালো ষ্ট্রীট আছে বটে। প্যালেসে যেতে আসতে সে ষ্ট্রীটের মুখটা দেখতে পেতাম—ভিতরে কখনও ঢুকিনি।"

সন্তোষ বাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"প্যালেসে যেতে আসতে?"

"হাঁ। না না রাজবাড়ীতে নয়। রাজবাড়ীতে আমার প্রতিদিধির সুযোগ ছিল না। প্যালেস হচ্চে মিউজিক হল অর্থাৎ ভ্যারাইটি থিয়েটর আর কি! একবার একটা বড় মজা হয়েছিল। এক লর্ড বিশপের স্ত্রী, সন্ধ্যাবেলা ট্রেণ থেকে ষ্টেশনে নেমে, ক্যাব নিয়ে কোচম্যানকে বলেছিলেন প্যালেসে নিয়ে চল। তিনি অবিশ্যি রাজপ্রাসাদ—বাকিংহাম প্যালেসে যাবেন। ক্যাবি করেছে কি, তাঁকে সোজা একে বারে প্যালেস মিউজিক হলে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত। মহিলাটি ত একেবারে বজ্রাহত—মূর্চ্ছা যান আর কি!"

"কেন বজ্রাহত কেন?"

প্রকাশ দুষ্টামির হাসি হাসিয়া চক্ষু দুইটি মিট মিট করিয়া বলিল—"মিউজিক হল জিনিসটে একটু - ওর নাম কি—ইয়ে কি না—not quite the proper thing you know"—বলিয়া প্রকাশ হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

শুনিয়া সন্তোষ বাবুও অর্দ্ধ বজ্রাহত হইলেন। ভাবিলেন—"আমাদের যুবকেরা বিলাতে গিয়ে বিবেকবুদ্ধি একেবারে বিসর্জ্জন দিয়ে বসে দেখছি। সে স্থানে যেতেন তা আবার জাক করে বলছেন। কাকা মহাশয় এখনও এলেন না—কতক্ষণ এই অকালকুষ্মণ্ডটার সঙ্গে বসে আমার কথা কইবার কর্ম্মভোগ করতে হবে জানিনে। আমার যে অসহ্য হয়ে উঠছে।"

বাড়ীর কাহাকেও এখনও পর্য্যন্ত না দেখিতে পাইয়া প্রকাশচন্দ্র একটু অধীর হইতেছিল। অন্য সময় সে যখন আসিত প্রায়ই দশ পনেরো মিনিট এই কক্ষে সুপ্রভাকে একাকিনী পাইত—পরে তাহার মা প্রভৃতি আসিতেন। প্রকাশ ভাবিতেছিল—আজ ভাল এক আপদ আসিয়া জুটিয়াছে। পর্দ্দার অন্তরালে ভিতর দিকে শব্দমাত্রে প্রকাশ চমকিয়া উঠিতেছিল। তাহার সতৃষ্ণ চক্ষু বার বার সেই পর্দ্দার পানে আকৃষ্ট হইতেছিল।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া সন্তোষ বাবু বলিলেন—"লণ্ডনে আপনি কোথা থাকতেন?"

"অ্যাড্‌লেড্ রোড হ্যাম্পষ্টেড্।"

"বাড়ী ভাড়া করে ছিলেন?"

"না অত টাকা কোথা?"

"তবে কি, হোটেলে?"

"হোটেলও নয়—সেও খুব ব্যয়সাধ্য। আমি রুমস্ নিয়ে ছিলাম। ল্যাণ্ডলেডির সঙ্গে বন্দোবস্ত।"

"মেসের বাসার মতন বুঝি? সেখানে শুধু পুরুষরাই থাকে, না স্ত্রীলোকও থাকতে পায়?"

"দুই, গরীব অবস্থার অনেক বিবাহিত ব্যক্তি, যারা আলাদা বাড়ী ভাড়া করে খরচ কুলোতে পারে না, তারাও রুমস্ নিয়ে থাকে। একটি শোবার ঘর একটি বসবার ঘর নিলে, কাজ চলে গেল।"

"আপনি কটি ঘর নিয়েছিলেন?"

ছটী। একটা শোবার একটি বসবার।"

সন্তোষ বাবু মনে মনে বলিলেন—"হ! একলা মানুষ, দুটো ঘরের প্রয়োজন কি? শোবার ঘরে কি বসা যায় না?"—প্রকাশ্যে বলিলেন—"বরাবরই কি হ্যাম্পষ্টেডে থাকতেন?"

"না। প্রথম বছর খানেক প্রিন্সেস্ স্কোয়ারে রুমস্ নিয়ে থাকতাম। গ্রীষ্মের ছুটিতে প্যারিসে বেড়াতে গেলাম—সেখানে অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল। ফিরে এসে হ্যাম্পষ্টেডে যাই ও দিকটা সহরতলী কি না, খরচপত্র একটু সস্তা।"

সন্তোষ বাবু স্বগত উক্তি করিলেন—"হ! প্রিন্সেস স্কোয়ারে থাকতেই বিবাহ করা হয়েছিল—প্যারিসে গিয়ে 'হনিমুন'—ফিরে এসে ব্যয়-সংক্ষেপের প্রয়োজন হল।" প্রকাশ্যে বলিলেন "থিয়েটরে প্রায়ই যেতেন বুঝি?"

প্রথম প্রথম বছর খানেক খুবই যেতাম। তার পর হ্যাম্পষ্টেডে গিয়ে ঘন ঘন যাওয়া আর হয়ে উঠত না—অনেকটা দূর কি না। তবে মাঝে মাঝে, কোন ভাল নাটকের অভিনয় হলে যাওয়া যেত।"

সন্তোষ বাবু মনে মনে বলিলেন "হ! শুধু দূর বলে নয়। আগে একখানা টিকিট কিনলেই হত, এখন যে দুখানা করে লাগবে। এত আর নিরীহ বাঙ্গালীর মেয়ে নয় যে ধমক খেয়ে চুপটি করে রান্নাঘরের কোণে বসে থাকবে, আর স্বামী মশায় আমোদ করে বেড়াবেন! এ বিলাতী মেম সাহেব, শক্ত খানি।"

প্রকাশ আর থাকিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল "বাড়ীর কাউকে দেখছিনে যে।"

সন্তোষ বাবু বলিলেন "কাকা মশায় কাছারি থেকে কলকাতায় গেছেন—সেখানে কি একটা সভা আছে। সুপ্রভা শুয়ে আছে, কাকীমাও বোধ হয় তার কাছে।"

প্রকাশ শঙ্কিত হইয়া বলিল "সুপ্রভা শুয়ে আছেন? কেন? তাঁর কিছু অসুখ করেছে না কি?"

"না।"

"তবে এখন শুয়ে কেন?"

"আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না।"—বলিয়া সন্তোষ বাবু আবার গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিলেন।

প্রকাশ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সুপ্রভা এমন অসময়ে শয়ন করিয়া, অথচ শারীরিক অসুস্থতার জন্য নহে—কারণ কি তাহাও সন্তোষ বাবু বলিতে অসম্মত। এতদিন যাতায়াত করিতেছে, আর কখনও ত এমন হয় নাই। হইল কি?

এমন সময় অঙ্গনে গাড়ীর শব্দ হইল। সন্তোষ বাবু বলিলেন—"কাকা মশায় এলেন বোধ হয়।"

কাছারির বেশে অতুল বাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন।—"প্রকাশ যে! কতক্ষণ এসে? সন্তোষ এসেছ? বস বস।" ইত্যাদি

প্রকার শিষ্টসম্ভাষণ করিয়া অতুল বাবু প্রকাশের নিকট বসিলেন। সভাতে কি হইয়াছিল, তাহারই গল্প করিতে লাগিলেন। সন্তোষ বাবু ছুটি পাইয়া, ভিতরে প্রবেশ করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সুপ্রভার শয়নকক্ষের সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র কামরা আছে, সেইটি তাহার নিজস্ব বসিবার ও পড়িবার ঘর। এই কক্ষে মিসেস্ রায় একটি সোফার প্রান্তভাগে বসিয়াছিলেন—সুপ্রভা তাঁহার কোলে মাথা দিয়া শয়ন করিয়াছিল। মা আদর করিয়া কন্যার গায়ে হাত বুলাইতেছিলেন। বিমি মেঝের কার্পেটের উপর চিন্তিতভাবে বসিয়া একদৃষ্টে সুপ্রভার মুখের পানে চাহিয়া ছিল।

সুপ্রভা বলিতেছিল, আর এখানে এক দণ্ড তাহার মন টিকিতেছে না—কল্য প্রভাতের গাড়ীতে সে হয় মুঙ্গের নহে ত মধুপুর চলিয়া যাইবে। মুঙ্গেরে তাহার দাদা এবং মধুপুরে তাহার পিসিমা আছেন।

মা বলিতেছিলেন, "উনি বাড়ী আসুন, পরামর্শ করিয়া যাহা হয় করা যাইবে। এত উতলা হইলে চলিবে কেন? যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে তাহার সঙ্গে বিবাহ হইল না ইহাতে আর দুঃখ কি? বরং সময় থাকিতে জানিতে পারা গিয়াছে সেই জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।"

মা কন্যাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু তথাপি কন্যার অশ্রুবর্ষণ কিছুতেই ক্ষান্ত হইতেছিল না। অঞ্চলাগ্র দিয়া তিনি কন্যার এবং নিজেরও অশ্রু মুছিয়া শেষ করিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময় বাহিরে দাঁড়াইয়া সন্তোষ বাবু বলিলেন—"কাকীমা—আসতে পারি?"

সুপ্রভা উঠিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া পর্দা টানিয়া দিল। সন্তোষ বাবু প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"সুপ্রভা কেমন আছে?"

গৃহিণী বলিলেন—"কাল সকালের গাড়ীতেই ও মুঙ্গের কিম্বা মধুপুর কোথাও চলে যেতে চায়।"

"মুঙ্গের অপেক্ষা বরং মধুপুরেই পিসিমার কাছে পাঠিয়ে দাও। সেখানে পাহাড় জঙ্গল প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে ওর মন শান্ত হবে।"

এমন সময় অতুল বাবু আসিয়া বলিলেন —"প্রকাশ ড্রয়িং রুমে বসে রয়েছে—তোমরা এখানে? সুপ্রভা কোথা?"

গৃহিণী তখন স্বামীকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। চিঠি খানিও দেখাইলেন।

সব শুনিয়া অতুল বাবু হতাশ হইয়া নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। দুই হাত দিয়া কপালটি টিপিয়া ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সন্তোষ বাবুকে বলিলেন —"প্রকাশকে এ কথা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে?"

"না—স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিনি। তবে কথায় বার্ত্তায় এমন সব বিষয় প্রকাশ পেয়েছে যাতে ওর সেখানে বিবাহ করাই সম্ভব বলে মনে হয়।" বলিয়া কোন্ কোন্ কথা হইতে সন্তোষ বাবু এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা বলিলেন।

অতুল বাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—

"না, না ওকে সাফ্ সাফ্ জিজ্ঞাসা করতে হবে। ও সব ঘোর প্যাঁচের কথার প্রয়োজন কি? আমি এখনি গিয়ে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করছি। চিঠি খানা দাও।" বলিয়া অতুল বাবু দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

সুপ্রভা নিজ শয়নকক্ষ হইতে সমস্ত কথাবার্ত্তাই শুনিতে পাইতেছিল। উৎকর্ণ হইয়া পিতার ফিরিবার পদশব্দ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

পাঁচ মিনিট পরে অতুল বাবু ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন "প্রকাশকে বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে আকাশ থেকে পড়ল। বল্লে 'Good Heavens! আমি বিলাতে বিবাহ করে এসেছি! নিশ্চয়ই না।—It is a vile calumny. কে বলেছে?' আমি তখন তাকে চিঠি খানা দেখালাম। চিঠি পড়ে সে হাসতে লাগল। বল্লে 'কি ভয়ানক! এ চিঠি থেকেই ত এত কাণ্ড হয়েছে? এ চিঠির অর্থ এই। বাড়ীর গিন্নিরাই সেখানে সাধারণতঃ ধোপা, মুদী, গোয়ালা, মাংসবিক্রেতা প্রভৃতির সঙ্গে যা কিছু কারবার করে থাকেন। পুরুষরা ও সব দেখে শোনে না। তাই আমি যখন তাদের চিঠি লিখলাম যে একখানা রুমাল আসে নি, তখন তারা ধরে নিলে যে বাড়ীর গিন্নিই ও চিঠী লিখে থাকবেন।"

গৃহিণী বলিলেন—"তোমার বিশ্বাস হয়?"

"কেন বিশ্বাস হবে না? আমি ত এতে অবিশ্বাসযোগ্য কিছুই দেখছিনে। ও আরও বলে, সম্প্রতি ওদের বন্ধু একজন নূতন ব্যারিষ্টার তাদের বাড়ীর মেয়েদের জন্যে বেশবিন্যাসের কতকগুলো জিনিষের মূল্যতালিকা চেয়ে বিলাতে কোন দোকানে চিঠি লিখেছিল। তারা মূল্যতালিকার মোড়কে ঠিকানা লিখে পাঠিয়েছিল মিস্ জে, সি, ঘোষ। সেই অবধি ওরা তাকে ঠাট্টা করে মিস্ ঘোষ বলে ডাকে।"

এই সময় কথা হইতেছে, এমন সময় প্রকাশ বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিল "আসতে পারি?"

অতুল বাবু তাহাকে লইয়া আসিলেন। প্রকাশ বসিয়া মিসেস্ রায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—

"আমি যা কৈফিয়ৎ দিয়েছি তাতেও যদি আপনাদের সন্তোষ না হয়, তা হলে আমি আমার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ দিতে পারি।"

গৃহিণী বলিলেন "কি প্রমাণ?"

"আমি যদি বাস্তবিকই সেখানে বিবাহ করেছিলাম এমন হয়, তা হলে ঐ চিঠির তারিখের পূর্ব্বে এবং পরে, প্রতি সপ্তাহে স্ত্রীলোকের উপযোগী অনেক কাপড়ও ত ধোপার বাড়ী গিয়াছিল?"

"সম্ভব।"

"বিলাতে ধোপা নিযুক্ত হলে, তারা একখানি ছোট বাঁধানো খাতা দেয়। প্রতি সোম বারে কাপড় ধুতে দেবার সময়, সেই খাতার একটা পৃষ্ঠায় কাপড়ের তালিকা লিখে দিতে হয়। সেই খাতা আর গত সপ্তাহের প্রাপ্য টাকা ময়লা কাপড়ের সঙ্গে ধোপার লোক এসে নিয়ে যায়। আবার

শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা ধোয়া কাপড়ের সঙ্গে সেই খাতাখানি ফিরে আসে তাতে তারা হিসাবও লিখে দেয় যেমন প্রত্যেক শার্ট ৪ পেনি, কলার এক পেনি, রুমাল আধ পেনি ইত্যাদি। আমার চেম্বার্সে বিলাতের পুরাণো কাগজপত্রের সঙ্গে আমার ধোপার খাতাখানিও আছে। কাগজপত্র গোছাতে গোছাতে আজই সকালে সেখানি আমি দেখেছি। আমার গাড়ী প্রস্তুত। আমি যদি এখনি চেম্বার্স থেকে সে খাতা খানি এনে আপনাদের দেখাতে পারি যে তার পাতায় পর পাতায় কোথাও স্ত্রীলোকের কাপড়ের কোন নামগন্ধ নেই, তা হলে আপনাদের বিশ্বাস হবে ত?"

গৃহিণী স্বামীর মুখের পানে চাহিলেন। অতুলবাবু বলিলেন—"প্রকাশ, তোমার কথায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছে—অন্ততঃ আমার ত হয়েছে। তোমার প্রতি যা সন্দেহ করা হয়েছিল, তার জন্য আমরা বিশেষ লজ্জিত। তবু আমি বলি তুমি সে খাতা খানি এনে সংশয়ের শেষ-রেখা কারু মনে যদি থাকে মিটাইয়া দাও।"

গৃহিণী বলিলেন—"আমারও মনে আর কোনও সংশয় নেই। খাতা এনে দেখান আমার জন্যে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। তবে যদি তুমি ইচ্ছে কর, এনে সুপ্রভাকে দেখাতে পার।"

"বেশ, আমি চল্লাম—" বলিয়া প্রকাশ নিষ্ক্রান্ত হইল।

* * *

অর্দ্ধঘণ্টা পরে প্রকাশের গাড়ী ফিরিল। প্রকাশ খাতাখানি হাতে করিয়া দুই তিনটা করিয়া সিঁড়ি ডিঙাইয়া উপরে উঠিতে লাগিল। ড্রয়িং রুমে আসিয়া দেখিল তাহা জনশূন্য। বাহিরের অন্ধকার খোলা বারান্দার কোণে কে যেন রহিয়াছে। প্রকাশ বাহিরে দাঁড়াইল। কাহার চুল হইতে যেন একটা সৌরভ ভাসিয়া আসিতেছে, রেশমি কাপড়ের খস্ খস্ শব্দও যেন শুনা গেল।

আরও কাছে সরিয়া গিয়া প্রকাশ চিনিতে পারিল—সুপ্রভা, তাহার কোলে বিমি।

আরও কাছে গিয়া প্রকাশ ডাকিল "সুপ্রভা।" মৃদুস্বরে উত্তর হইল—"কেন?"

"খাতা এনেছি। এই দেখ।"

সুপ্রভা খাতাখানি লইয়া ছুড়িয়া নীচে ফেলিয়া দিল।

প্রকাশ ক্ষোভে ও অভিমানে বলিল—"খাতা দেখতে চাও না? সন্দেহ মেটাতে চাও না? এই তোমার বিচার?"

সুপ্রভা তখন বিমিকে নামাইয়া দিয়া প্রকাশের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া তাহার বক্ষে মুখ লুকাইল।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

অর্থনীতি

(১)

নৈমিষারণ্যে একজন ঋষি ছিলেন তাঁহার নাম কেহ জানিত না। মহাতপা ঋষি পূর্ব্বে জলেরই উপর বসিয়া তপস্যা করিতেন। সহস্র বৎসর তপস্যার পর ধরিত্রী সন্তপ্তা হইয়া গলবস্ত্রে ঋষির সমক্ষে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, 'হে ঋষিপ্রবর আমার উপর বসিয়া তপস্যা করুন'।

ঋষিপ্রবর তবে তুষ্ট হইয়া ধরিত্রীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। সেই অবধি নৈমিষারণ্যে বাস।

বন শ্বাপদসঙ্কুল। বন্যজন্তু পালে পালে আসিয়া ঋষির তপস্যায় মুগ্ধ হইয়া পড়িত। কিন্তু তাহাদিগের নানাবিধ বিকট ও বেসুরাধ্বনি যোগের বিঘ্ন উপস্থিত করিল। একদিন ঋষিপ্রবর সকলকে ডাকিয়া বলিলেন 'হে মহোদয়গণ, আপনারা যদি অনুগ্রহ করিয়া একশত বিঘা জমি নির্ব্বিবাদে ছাড়িয়া দেন, তবে পূর্ব্বমত তপস্যা করি, নচেৎ এ স্থান হইতে চলিয়া যাই'। বন্যজন্তুগণ সকলে একমত হইয়া ঋষিকে একশত বিঘা ছাড়িয়া দিল। ঋষিপ্রবর তাহার চতুর্দ্দিকে বেড়া দিয়া পূর্ব্বের ন্যায় তপস্যায় রত হইলেন। তাঁহার তপস্যা অতি উগ্রভাব ধারণ করিল। আহার, নিদ্রা, কিছুই ছিল না। কেবল ধ্যানস্থ এবং মধ্যে মধ্যে সমাধিস্থ।

এইরূপে দশবৎসর তপস্যার পর ঋষি-প্রবর চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার আশ্রমের মধ্যে অরণ্যের ভাব আর নাই। সুন্দর আম্র, কাঁঠাল এবং হরিতকি গাছ। কোন দিকে বিল্ব এবং কদলী। কোথায়ও পুষ্পবাটিকা। এমন কি, এক স্থানে সুন্দর কুটীর শোভা পাইতেছে।

ঋষিপ্রবর প্রথমতঃ বিস্মিত এবং পরে কিঞ্চিত ক্রুদ্ধ হইয়া কুটীরের দিকে আসিলেন। কি আশ্চর্য্য! সেখানে একজন দিব্য নবরকান্তি যুবাপুরুষ বসিয়া কদলী ভক্ষণ করিতেছে।

সে ঋষিকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিল 'আমার নাম বলভদ্র, আমি গুরু-অন্বেষণে নৈমিষারণ্যে ফিরিতেছিলাম। আপনাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে আমার মুক্তিদাতা আপনিই হইবেন। আপনিই আমার গুরু'।

ঋষি বলিলেন 'কেন?'

বলভদ্র। যে একশত বিঘা জমি সত্ত্বেও বসিয়া তপস্যা করে এবং নিরা-হারে থাকে, সে ঈশ্বরের অবতার না হইয়া যায় না, কিংবা ঈশ্বরের সহিত তাহার নিশ্চয় সাক্ষাৎকার হইয়াছে। অতএব হে গুরু আমায় দীক্ষিত করুন।

ঋষিপ্রবর কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন 'তথাস্তু'।

সেই অবধি বলভদ্র ঋষির শিষ্য হইয়া অষ্টযোগাঙ্গের এক অঙ্গ লইয়া সাধিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সে নিরাহারে

থাকিত না। উদর পুরিয়া আম্র, কাঁঠাল খাইত। ক্রমে ধান্যচাষ আরম্ভ করিল, গরু আনিয়া গোশালা নির্ম্মাণ করিল, কুকুর বিড়াল আনিয়া সংসার বাড়াইল। তাহারাও যাহা খাইত, সেও তাহা খাইত। সকলে একত্র শয়ন করিত। ক্রমে আশ্রমে ময়ূর, হরিণ প্রভৃতি আসিয়া ধান ও কদলী খাইতে লাগিল এবং বলভদ্রের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিল। কি সুন্দর সংসার।

একদিন বলভদ্র প্রত্যূষে উঠিয়া দেখিল যে অনেকগুলি বানর ও ছাগল নির্ব্বিবাদে বসিয়া একতরফ হইতে তাহার ধান্য ও কদলী খাইতেছে। এমন সময়ে প্রভু-ভক্ত কুকুর আসিয়া নিবেদন করিল—

'ধর্ম্মরাজ, আপনি মেহনত করিয়া ধান চাষ করেন, এ ব্যাটারা বসিয়া খায়। আমার প্রাণে ইহা সহে না।'

বলভদ্র। কেন?

কুকুর। সব জিনিষেরই একটা অর্থ আছে এবং সেই অর্থের একটা নীতি আছে। অর্থ নহিলে ধর্ম্ম হয় না এবং ধর্ম্ম না সঞ্চয় করিলে মোক্ষ হয় না। অতএব মোক্ষের জন্য অর্থের দরকার। অর্থ সংগ্রহ করিতে গেলে 'কাম' চাহি। আপনি নিতান্ত বাসনাশূন্য, সুতরাং আপনি চিরকালই গুরুর ন্যায় বসিয়া তপস্যা করিতে থাকিবেন, কিন্তু মোক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই।

বলভদ্র ত্রস্ত হইয়া কহিল 'তবে উপায়।'

কুকুর। অর্থনীতির প্রথম অধ্যায়টা শিখুন।

(২)

সারমের বক্তৃতাপূর্ব্বক কহিল 'আপনি যে পরিশ্রম করিতেছেন তাহা মূলধন। জমিও একটা মূলধনের মধ্যে, তবে ভগবানের কৃপায় সেটা আপনার গুরুপ্রদত্ত। কিনিতে হয় নাই। নগদ মূলধনেরও দরকার হয় নাই। আপনার ন্যায় ঋণ-জন্মা পুরুষের অদৃষ্টই মূলধন। কেবল পরিশ্রমটুকুই আপনার খরচ। এই পরিশ্রমের গুণে আপনার জমা বাড়িতেছে, কিন্তু আপনি রাখিতে জানেন না। সকলে খাইয়া ফেলে। আপনার যাহা দরকার তাহা হইতে উৎপাদন বেশী করেন।

বলভদ্র। তবে কম করিয়া পরিশ্রম করি।

কুকুর। বাতে ধরিবে।

বলভদ্র। জমা করি?

কুকুর। ফল পচিয়া যাইবে, ধান ইঁদুরে খাইয়া ফেলিবে। বেবাগ বেচিয়া ফেলুন। খানিকটা দুর্ব্বৎসরের জন্য রাখুন।

বলভদ্র। বেচিয়া কি পাইব?

কুকুর। টাকা। টাকার আসলে কোন মূল্য নাই, কারণ টাকা খাওয়া যায় না, কিন্তু দশজনে মিলিয়া তাহার একটা দাম সাব্যস্ত করিয়াছে। দরকার হইলে টাকা দিয়া খাদ্যদ্রব্যাদি দাবি করিতে পারেন। টাকা সঞ্চয় করিয়া রাখা সুবিধা। ইচ্ছা হইলে সুদে খাটাইতে পারেন। যখন খাদ্যদ্রব্য প্রচুর জন্মায় তখন টাকার বদলে অনেক পাওয়া যায়। যখন দুর্ব্বৎসর তখন অনেক টাকা দিলে কম পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে

সুবিধামত কখন দ্রব্যের ব্যবসা, কখনও টাকার ব্যবসা, কখনও উভয়ের ব্যবসা করিলে ফলে এত টাকা হইয়া পড়িবে যে আপনি মহাধনী হইতে পারিবেন।

বলভদ্র। বিনা পরিশ্রমে?

কুক্কুর। আপনি বিনা পরিশ্রমে শত বিঘা জমি পাইয়াছিলেন, মনে নাই? ওটা অদৃষ্ট। যদি দেশে প্রচুর ফসল থাকে, তবে ধনসঞ্চয়ে বিশেষ লাভ আছে। ফসল না হইলেও দুর্ব্বৎসরের সময় দুর্ভিক্ষ নামক এক প্রথা আছে, তাহাতে কতক-গুলা লোক মরিয়া যায়। ফলে লোক-সমূহ প্রাণপণে সঞ্চিত টাকার সম্মান বজায় রাখিতে চেষ্টা করে।

বলভদ্র। এত টাকা লইয়া লাভ কি?

কুক্কুর (বিনম্রভাবে)। বর সংসার করিতে গেলে বিবাহ করিয়া স্ত্রী-পুত্রাদির বিস্তার করা কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে পূর্ব্বে যেমন হরিণ বানর এবং বন্যপশু প্রভৃতি খাইয়া যাইত, এখন অন্য জনপদের মনুষ্য খাইয়া যাইবে। দান পুণ্য যদি না করেন, চোরে ও তস্করে লুটিয়া লইবে।

বলভদ্রের বোধ হইল সেটা সম্ভব। গুরুদেবের নিকট পরামর্শ লইতে গেল।

ঋষি বৃক্ষে বসিয়া স্বভাবের শোভা দেখিতেছিলেন। বলভদ্রকে দেখিয়া রহস্য পূর্ব্বক বলিলেন 'বাবাজীবন খবর কি?'

বলভদ্র। আমি ঘাবিয়া দেখিয়াছি আমার পরিশ্রমটা বৃথা যাইতেছে, পরিশ্রম না করিলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায় না। পরিশ্রম করিলে প্রচুর ফসল হয় তাহা নষ্ট হইয়া যাইতেছে। পশুপক্ষী, চোর তস্কর, এবং বাজে লোকের পেটে না গিয়া সংসার পাতালে তাহা সার্থক হয়। পুত্র, কলত্র, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং উপযুক্ত পাত্রে দান করিলে মনের একটা শান্তি এবং সংসারের একটা সারত্ব অনুভূত হয়। অতএব বিবাহ করিব মনস্থ করিয়াছি।

ঋষি (হাস্যমুখে)। বেশ কথা। চেষ্টা করিয়া দেখ। আশীর্ব্বাদ করিতেছি তুমি নৈমিষারণ্যের রাজা হও। আমি বৃক্ষের উপরে থাকিয়াই তপস্যা করিব। দরকার হইলে গাছে চড়িয়া আমার সহিত দেখা করিও।

(৩)

বলভদ্র জাতিতে বৈশ্য। পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ ব্যবসায়ে সুনিপুণ। বিবাহ করিয়া চট্ করিয়া সংসার বাড়াইয়া ফেলিল। পরিশ্রম অবশ্য বাড়িয়াছিল কিন্তু পুত্রকন্যাগণ পিতার পরিশ্রমের ভার লাঘব করিয়া দিল। শত বিঘার স্থলে বহু সহস্র বিঘা জমি চাষ হইতে লাগিল। জমি বিলি করিয়া বহু প্রজা বসাইল। প্রজাদিগের পরিশ্রমে প্রচুর উৎপত্তি হইতে লাগিল। দোকান বসিল, বাণিজ্য আরম্ভ হইল। গাড়ী-ঘোড়া, অট্টালিকা, বস্ত্রাগার, ধর্ম্মাধিকরণ প্রভৃতি সংস্থাপনপূর্ব্বক আত্মীয়বন্ধুবর্গ একটা ছোট নগরীর পত্তন করিয়া বসিল। মহা কোলাহল, বাকবিতণ্ডা, দৌড়াদৌড়ি, মারামারি, লাফা-লাফি। সকলে সর্ব্বেসর্ব্বা। কাহার টাকা কে খায়, কোথাকার অর্থ কোথায় যায় কেহই জানে না। সাধু তস্কর একত্রে, অলস এবং পরিশ্রমী একত্রে, পরস্পরের প্রতি সন্দিহান, অথচ সভ্যতা সহকারে

মিষ্টালাপে ব্যস্ত। এমন সময়ে একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হইল 'নৈমিষারণ্যের রাজা কে?'

এটা বৌদ্ধযুগের কথা। নৈমিষারণ্য তখন সৌরাষ্ট্র নামক মহা জনপদে পরিণত হইয়াছে। অশোক ভারতবর্ষের সম্রাট্। নূতন পত্তন বলিয়া নৈমিষারণ্যের কোন কর ছিল না, সুতরাং সম্রাট্ ও রাজার কেহ খবর রাখিত না। গ্রামের মণ্ডলগণ ও প্রাদেশিক জমিদারগণ প্রজার সাহায্যে একরকম সাধারণতন্ত্র স্থাপন করিয়াছিল। ক্রমে বিলাসিতা ও ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি হইয়া অন্নের অনুপাতে পেটা চেহারার ধারণ করিল।

১। অনেক খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি হয়, তাহার পরিবর্তে কেবল টাকা কিংবা ভুয়া দ্রব্য আসে।

২। দেশের মধ্যে টাকা বাড়িয়া গিয়াছে, খাদ্য কম, অথচ লোকসংখ্যা বেশী।

৩। ভুয়া জিনিস তৈয়ারী করিবার পরিশ্রমীর মজুরি বেশী। উৎকৃষ্ট কৃষকের সংখ্যা কম। জমি সম্পূর্ণ আবাদ হয় না। অথচ জমির খাজনা ক্রমে বৃদ্ধি।

মোটের মাথায় বাজে জিনিস ও টাকা অনেক, কিন্তু অন্ন কম, তাহার উপর অনাবৃষ্টি। চাউল দুর্ম্মূল্য। উদরের উপর টান, আসন্ন দুর্ভিক্ষ। পরিশ্রমের মূল্য কমাইয়া, টাকার সমান বজায় রাখিবার জন্য দেশ বদ্ধপরিকর। বড়লোক মরিতে পারে না—কারণ তাহারাই সৃষ্টিমধ্যে উচ্চ। অথচ কৃষক মরিলে তাঁহারা লাঙ্গল ধরিয়া চাষ করিতে নারাজ। মুটিয়া মজুর পলাইলে, বড়লোকের বোঝা কাঁধে করিতে হয়, অথচ তাহাদের মজুরি বাড়াইয়া দিলে কিংবা কৃষকের খাজনা কমাইয়া দিলে সুখ-শয্যা, দাস, দাসী, অট্টালিকা প্রভৃতি ছাড়িতে হয়।

জমিদার ও ধনীবর্গ সকলেই স্থির করিলেন যে দেশে একটা খাড়া-সৈন্য (Standing army) চাহি, নচেৎ প্রসব-বেদনার (Labor question) ভয় এবং জমিদারী করের (Land Tax) আকার প্রকার শক্ত দাঁড়াইতেছে। কিন্তু খাড়া-সৈন্য করিতে গেলে রাজার পরামর্শের দরকার, কারণ এ সম্বন্ধে সাধারণতন্ত্রের অনেক দলের মধ্যে মহা অনৈক্য। খাড়া-সৈন্য না করিলে মহাজন, জমিদার প্রভৃতি মারা যায়। সুতরাং প্রশ্ন হইয়াছিল 'নৈমিষারণ্যের রাজা কে?'

জমিদারগণ স্বয়ম্ভু, অর্থাৎ বলভদ্রের বংশধর এবং তাঁহাদের আত্মীয় কুটুম্ব।

সকলে অনুসন্ধান করিয়া রাজার সন্ধান পাইল না। বলভদ্রের সন্তানগণের পিতা যে নৈমিষারণ্যের প্রথম অধিবাসী তাহা অনেকে জানিত, কিন্তু বলভদ্রতনয় জমীদারগণ বলিল 'ইদানীং তাঁহার কোন সন্ধান জানি না, আশ্রবে তল্লাস করহ'।

বহু সন্ধান করিয়া বলভদ্রের আশ্রম আবিষ্কৃত হইল। একশত বিঘার পরিবর্ত্তে সেটা এখন কেবল দশ বিঘা। সেই দশ বিঘায় বলভদ্র এখন নিজেই চাষ করে। বলভদ্রের পত্নী গরু রাখে। এইরূপে নৈমিষারণ্যের আদিম মনুষ্যসম্পত্তি

গোটাকতক রাখাল ও পুরাতন কুকুর লইয়া কুটীরের মধ্যে থাকে।

বলভদ্র অষ্টাঙ্গযোগের প্রায় চারি অঙ্গ সাবাড় করিয়াছে। নিশ্বাস-প্রশ্বাস যাহা কিছু প্রায় অভ্যন্তরেই বহে। ঋষিপ্রবর পূর্ব্বের ন্যায় বৃক্ষের উপর বসিয়া অন্তরীক্ষে ধ্যানাদি করেন।

একটা কোলাহল শুনিয়া বলভদ্র-পত্নী শশব্যস্তে কুটীরে গেল। বলভদ্র উৎকণ্ঠ হইয়া ককুরকে ডাকিল।

বলভদ্র। খবর কি?

কুকুর। নৈমিষারণ্যে আপনার রাজ্যাভিষেক!

খবর শুনিয়া বলভদ্রপত্নীর আতঙ্ক হইল। রাজসম্মানযোগ্য কোন জিনিস কুটীরে নাই। পরিধানে মোটা কাপড়। বসিবার স্থান নাই। এখনউপায়? বৃদ্ধ বলভদ্র ও বৃদ্ধা ক্ষেমঙ্করী ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

ইত্যবসরে কুকুর সসম্ভ্রমে বলিল—

'এক ছড়া কদলী ও সিঁদুর এখানে রাখুন। আর কিছুরই দরকার নাই। এটা অর্থনীতির দ্বিতীয় অধ্যায়।'

(৪)

সারমের বক্তৃতা পূর্ব্বক কহিল—

'ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আপনার নিজের যে সকল সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল এখন লোকসমষ্টির একত্রে তাহা হইয়াছে। সুতরাং আপনি যাহা করিয়া টিঁকিয়া আছেন, প্রত্যেক লোককে, কিংবা এক এক দল লোককে তাহা করিতে হইবে, নচেৎ দেশ উৎসন্ন হইয়া যাইবে।'

বলভদ্র। প্রকাশ করিয়া বল।

সারমেয়। তবে শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে আপনার পরিশ্রমলব্ধ চাউল ও কদলী বন্যপশুগণই সাবাড় করিত, আমি নিজে খাড়া-সেনাপতির মত থাকিয়া আপনার গৃহরক্ষা করিতাম মাত্র। পরে আপনি সংসার বৃদ্ধি করিয়া এই দেশ পত্তন করিয়াছেন। সে সংসার ঠিক বলভদ্র এবং কোম্পানীর মত দাঁড়ায় নাই। অর্থাৎ বলভদ্রের সংসার বলভদ্রের আচরণ অনুকরণ করে নাই। আপনি মোটা ভাত খাইয়া ও মোটা কাপড় পরিয়া দশ বিঘায় সস্ত্রীক জীবন ধারণ করিতেছেন, ঈশ্বরের ভজনা করিতেছেন, গীতাপাঠ করিতেছেন। কিন্তু নৈমিষারণ্যের অন্যপ্রকার অবস্থা। নূতন যুগের বলভদ্রগণ বেশভূষা, সাজ-সজ্জা ও ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া পরিশ্রমটা অলীক পদার্থের দিকে লইয়া গিয়াছে। তাহাদিগের সন্তানগণ সকলে চাষী নয়। কতকগুলি লোক আপনার ন্যায় বলভদ্রের চাষলব্ধ অন্ন বন্যপশুর ন্যায় বসিয়া খাইতেছে, এবং অন্যান্য জনপদ হইতে সেই প্রকারের বন্যপশু জুটাইতেছে। তাহারা চাষ করে না কিংবা যাহাতে অল্পপরিশ্রমে অনেক উৎপন্ন হয় তাহার চেষ্টা করে না। তাহাদিগের ময়ূরের ন্যায় পুচ্ছ ও হরিণের ন্যায় শৃঙ্গ, ও ব্যাঘ্রের ন্যায় দন্ত আছে মাত্র। বরং আপনার আশ্রমের বন্যপশুগণ ছিল ভাল। তাহারা নৈমিষারণ্যের পূর্ব্ব মালিক, আপনার বশে ছিল, স্নেহ করিত। তাহাদের কৃতজ্ঞতা ছিল। ইহাদিগের আত্মীয়তা থাকিয়াও নাই। তাড়াইলে যায় না। বলভদ্র-কোম্পানীর ক্ষেত্র

ভয়ানকরূপে আক্রান্ত, চাষিগণ ব্যতিব্যস্ত, মজুরগণ পলায়নোন্মুখ। অপর পক্ষের দলবল ইহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিতেছে, এইবার খাড়া-সৈন্ত করিবে। অলীক পদার্থের উপর শুল্ক কমাইয়া দিবে, ও অন্নের উপর বাড়াইয়া দিবে। বলভদ্র কোম্পানী ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। মজুরের মজুরি বাড়াইয়া দেও, জমির খাজনা কমাইয়া দেও, অপদার্থের উপর শুল্ক বাড়াইয়া দেও, তাহাদেরই বন্ধুবান্ধবকে খাড়া-সৈন্ত রাখ, দেশে ধর্ম্ম থাকুক, পরিশ্রমের মান বজায় থাকুক।

বলভদ্র। তাই ত! বড় শক্ত কথা। যে দেশে জমি কম তাহারা কি করিবে?

কুকুর। যখন তাহাদের সন্তানসন্ততি বৃদ্ধি হইয়াছিল অন্যদেশে যায় নাই, যেখানে জমি পড়িয়া আছে সেখানে চাষ করে নাই; ভুয়া সিন্ধের বিস্তার করিয়া অন্য দেশকে মুগ্ধ করিতেছে, এবং তাহা রক্ষার জন্য অগ্নি, বরুণ এবং পবনাদি জয় করিয়া প্রকাণ্ড সৈন্যসামন্ত স্থাপন এবং রণতরী সুসজ্জিত করিয়া রাখিতেছে। ইহাদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। ধরিত্রীর অবস্থা ক্রমেই শোচনীয়, অন্নের ক্রমেই অভাব। পৃথিবী জড়াইয়া মহা বিপ্লবের সম্ভাবনা।

বলভদ্র। এ সকল ত ইহাদেরই কর্ম্মফল।

কুকুর। অনেকের বটে, কিন্তু যাহারা পূর্ব্বধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া দশবিঘা জমি লইয়া আছে, তাহাদের দোষ কি? এখন ক্রমে ধীরে ধীরে দেশের নূতন প্রথা ভাঙ্গিয়া পুরাতন প্রথা অবলম্বন না করিলে মহা বিভ্রাট হইবার সম্ভাবনা। যত ছোট ছোট চাষী থাকে ততই ভাল। তাহারা সবল সুস্থকায় ও সনাতন ধর্ম্মে আস্থাবান হইবে ও ভক্তিপূর্ণ হইয়া ধর্ম্মপথে জ্ঞানানুশীলন করিবে। তাহাদেরই মধ্যে খাড়াসৈন্ত থাকিয়া নিজ নিজ প্রদেশ রক্ষা করিবে।

বলভদ্র। এ সকল বন্দোবস্ত করিবে কে?

কুকুর। বলভদ্র-কোম্পানী স্বয়ং ও তাহারা যে স্থলে অপারগ, সেখানে বলভদ্র-রাজা নিজে। তজ্জন্য ধর্ম্মাধিকরণ, বিদ্যালয়, ও মন্দির প্রভৃতির অনুষ্ঠান চাই, কর্ম্মচারীও চাই। কিন্তু জমি ছাড়া কেহই কিছু পাইবে না। যতদূর সম্ভব, বেতনের পরিবর্ত্তে জমি দেওয়া উচিত। যত ছোট ছোট চাষী হয় ততই ভাল। ততই জমির সফল বেশী পাওয়া যাইবে। ততই চোর তস্কর কমিয়া যাইবে। ততই ধর্ম্মসংস্থাপনের সানুকূল সমাজ হইবে।

সারমেয় এইরূপ বক্তৃতা দ্বারা বলভদ্রের পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া দিয়া একপার্শ্বে গিয়া লুকাইল। সেই সময় দলে দলে দেশের লোক আসিয়া জুটিল।

(৫)

দল একটা নয় অনেকগুলি। জমিদারের দল, পত্তনিদারের দল, ব্যবসাজীবীর দল, মহাজনের দল, কৃষকের দল, মজুরের দল, এবং ভিখারী বৈরাগীর দল ইত্যাদি।

সকল দলের অধিপতি আসিয়া সসম্ভ্রমে বলভদ্রকে অভিবাদন করত কহিল 'আমরা সকলে অদ্য আপনাকে নৈমিষারণ্যের রাজা করিলাম'।

বলভদ্র। কেন?

জলাধিপতি। যে স্বীয় অধিকার সত্ত্বেও দেশের ভার বাহুভূতকে ছাড়িয়া দিয়া নিজে নিষ্কাম সেই রাজা।

বলভদ্র। আমি যখন পূর্ব্বকালে এখানে আসিয়াছিলাম, তখন আমার শুরুর শত বিঘা জমি ছিল। তিনি চাষও করিতেন না, আহারও করিতেন না। আমি দশ বিঘা মাত্র এখন চাষ করি এবং সংসারও চালাই। তোমরা যে তাহা পার নাই তাহার কারণ কি ?

সকলে। তাহাই শুনিতে আসিয়াছি।

বলভদ্র। তবে শুন। অন্ন নহিলে শরীর থাকে না, শরীর নহিলে ধর্ম্ম সাধন হয় না, ধর্ম্মের পথে জ্ঞান, জ্ঞান নহিলে মানবজন্মের অর্থ নাই।

গুরু থাকিলে লোকে উপদিষ্ট হইয়া ও তদনুযায়ী কর্ম্ম করিয়া জ্ঞান সঞ্চয় করে। যাহাদের গুরু নাই তাহারা প্রবৃত্তির পথে গিয়া তৈয়ারী হয়, যেমন তোমরা।

তোমরা যতটুকুর অধিকারী তাহাই বলি। অন্ন আসল। প্রজা বাড়িবেই। অন্ন যোগাইতে হইবে। জমি চাষ ভিন্ন অন্ন হয় না। পরিশ্রম না করিলে জমি চাষ হয় না। সম্পূর্ণ পরিশ্রম করিলে যতটুকু জমিতে সম্পূর্ণ ফসল হয়, তাহার নাম ক্ষেত্র। গৃহস্থ এবং তৎপরিবারভুক্ত অক্ষম লোক তাহাতে প্রতিপালন হইতে পারে। মোটামুটী সেটা তিন বিঘা। আমি সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া কেবল দশ বিঘা রাখিয়াছি।

সকলে। কি অদ্ভুত বদান্যতা !

বলভদ্র। তিন বিঘার আয়, অর্থাৎ ফসল-উৎপাদন ও প্রাসাচ্ছাদনের খরচ প্রভৃতি বাদ দিলে বৎসরে ত্রিশ টাকা। নিবৃত্তির পথে জীবন যাপন করিলে ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু ভক্তি না থাকিলে ইচ্ছা করিয়া কেহ নিবৃত্তির পথে যায় না। ভক্তির দিন গিয়াছে। এখন সকলে ঠেকিয়া শিখিতে চাহে, তাহার নাম আত্মোৎকর্ষ।

প্রবৃত্তির পথে তৃষ্ণা মিটে না। যত খেয়াল বাড়ে, তত চাষের দিকে বীতস্পৃহা হয়, অন্য দিকে মন যায়। সে দিকে ব্যবসা বাড়ে। ক্রমে সে দিকে লোক-সংখ্যা বাড়ে, চাষীর সংখ্যা কমিয়া যায়। অন্ন পূর্ব্বের মত হয় না। অকুলান হয়।

এই প্রকার সমাজে অগ্নিমান্দ্য, জ্বর পীড়া প্রভৃতি বাড়ে ও লোক মরে, তাহাতে অনেকটা কুলাইয়া যায়। অবশেষে যাহারা পরিশ্রম করিয়াও সুখে দিনপাত করিতে পায় না, এবং যাহারা পরিশ্রম না করিয়াও সুখে থাকে তাহাদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি হয়। কখনও খানিকটা রফা হইয়া যায়, কিছু দান-ধ্যান বাড়ে, কিছু খাজনা কমে, কিছু বাজে জিনিসের উপর শুল্ক বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ফলে তাহার ক্ষণিক মীমাংসা হয় মাত্র।

সকলে। একেবারে মীমাংসা হয় না ?

বলভদ্র। না। প্রত্যেক বৎসরের এক রকম নূতন অবস্থা, সুতরাং প্রত্যেক বৎসরে রাজনীতি বদলানো উচিত। আপাততঃ এ বৎসরের জন্য আমার রাজনীতি শুন।

সকলে। আজ্ঞা করুন।

বলভদ্র। ঈশ্বর নামক পুরুষ জমির

প্রথম মালিক। তাহার পর যাহারা জমির দাবি করে তাহাদের চাষ করা চাই।

কিন্তু উভয়ের মধ্যবর্ত্তী লোকেরও দরকার। তাহারা শিক্ষা দেয় রক্ষা করে, ধন যোগায়, এবং মজুরিও করে। তাহাদের নিজের চাষের সম্পূর্ণ সময় থাকে না, সুতরাং অপরের সাহায্য লইতে হয়। এইরূপে দলবদ্ধ হইয়া প্রত্যেক ক্ষুদ্র প্রদেশ আত্মনির্ভর করিয়া থাকে, দুর্ব্বৎসরে এবং দুর্দ্দিনে একটি প্রদেশ অন্য প্রদেশকে সাহায্য করে।

নিজের শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারিবে যে চাষ কিরূপ কর্ষণই আত্মরক্ষা ও আত্মোৎকর্ষের উপায়। শরীর হইতেই অন্য একটি দেহের পত্তন হয়। সেই দেহ কর্ষণ করিলে, অর্থাৎ মানসিক পরিশ্রম করিলে, অন্য একপ্রকার ফসল হয়, তাহার ফলে জ্ঞান। মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব তাহাতেই।

চাষ ভিন্ন উপায় নাই। কি প্রকারে চাষ করিলে সুন্দর ফসল হয় এ প্রজাগণ সুখে থাকে ও জ্ঞান লাভ করে, তাহাই তোমাদিগের দ্রষ্টব্য।

(৬)

বলভদ্র পুনর্ব্বার বলিলেন ;—

'প্রত্যেক দলের আমার কথিত অর্থ-নীতি ভাবিয়া দেখা উচিত।

যত পরিশ্রম চাষের দিকেই নিযুক্ত কর। ছোট ছোট চাষীর দলে দেশ ভরিয়া যাউক। নূতন জমি আবাদ করিয়া যাও। তাহারাই সম্পূর্ণ সত্বাধিকারী হউক।"

জমিদারগণ। খাজনা ?

বলভদ্র। তোমরা যে খাজনা পাও তাহাতে কেবল বড় বড় অট্টালিকা, বেশভূষা, ও বিজাতীয় আহার এবং পানে খরচ করিতেছ। 'শিল্প' 'শিল্প' করিয়া খেপিও না, ওগুলি কেবল নয়নমুগ্ধকারী মাত্র। খাজনা জমাইয়া যদি ভূমির উৎকর্ষে খাটাইতে পার তবে পর দেখ, নচেৎ খাজনার সব প্রজাকে বেচিয়া ফেলিয়া অন্য জমি সংগ্রহ কর।

প্রজা। আমরা টাকা কোথায় পাইব ?

বলভদ্র। তোমরা টাকা জমাইয়া ব্যাঙ্কে স্থাপন কর, আমি রাজস্ব হইতে সাহায্য করিব। যাহারা টাকার ব্যবসা করে তাহাদিগের মধ্যে উপযুক্ত ও ধর্ম্ম-পরায়ণ মহাজনকে ব্যাঙ্কে নিযুক্ত করিয়া ভাল করিয়া চালাও। কেবল ভূমির উৎকর্ষেই টাকা নিযুক্ত কর।

জমিদার। প্রজাগণ দুষ্ট হইলে উপায় কি ?

বলভদ্র। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজা কখনও দুষ্ট হয় না। ভূমি কর্ষণরূপ পরিশ্রমের সুফল এই যে কুপ্রবৃত্তি দমন করিয়া রাখে। চাষ ছাড়িয়া দিলে উদরান্ন জুটে না। দশজনের মধ্যে একজন অপেক্ষাকৃত ধনী চাষী বিগড়াইলে বাকি নয় জন তাহাকে শাসন করিয়া থাকে, যেমন কর্ত্তা বিগড়াইলে গৃহিণী এবং পুত্রগণ তাহাকে দমন করিয়া রাখে। প্রত্যেক গ্রামবাসী এবং বর্ণাশ্রম একটি পরিবারের মত। ধর্ম্মই তাহাদিগের আশ্রয়।

জমিদার। ধর্ম্ম ত এক রকম উঠিয়া গিয়াছে।

বলভদ্র। (সরোষে)। ভারতবর্ষে মোটেই উঠে নাই। অন্নাভাবে হাপা আছে মাত্র। কর্মণই ধর্ম্ম। যোগই ধর্ম্ম। দেবালয়-প্রতিষ্ঠা ও প্রজাগণের হিতার্থে যাহা করিবে তাহাই ধর্ম্ম। প্রজা-সৃষ্টি ও ধর্ম্মের অনুশীলনই যজ্ঞের ফল। অতি অল্প ব্যয়ে ধর্ম্মের পথে দিন চলিতে পারে। পুনরায় ব্রাহ্মণগণকে এ শিক্ষা দিতে হইবে। তাহারা আত্মত্যাগপূর্ব্বক শিখাইবে। নচেৎ সে ব্রাহ্মণকে লাঙ্গল ধরিয়া চাষ করিতে হইবে। উপযুক্ত ব্রাহ্মণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দিবেন। শিল্পবিদ্যালয়, চিত্রবিদ্যালয়, সঙ্গীতবিদ্যালয়ের আদর্শও ধর্ম্মই হইবে। ইতিহাস, সাহিত্য কাব্য ও ব্যাকরণও ধর্ম্মের মহিমা বুঝাইবে। লোকসমূহের প্রবৃত্তি ও কর্ম্ম সেই আদর্শের দিকে যাইবে। আসুরিক সম্পদ ঠেলিয়া ফেলিয়া দৈবী সম্পদের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। যাহারা সে সম্পদের পথ দেখাইবে তাহাদিগকে সাধ করিয়া ধনরত্নে বিভূষিত করিও, কিন্তু তাহারা চাহিবে না।

জমিদার। যুদ্ধব্যবসায় উঠিয়া যাইবে?

বলভদ্র। সেটা রাজার লক্ষ্য। প্রাদেশিক পাপসমূহের দণ্ডের জন্য ধর্ম্মাধিকরণ ও স্বল্প সেনা যথেষ্ট। যুদ্ধবিগ্রহ সম্বন্ধে রাজাই দায়ী। তোমাদের সে বিষয় লইয়া তোলাপাড় করিবার দরকার নাই। যে দেশের অধিবাসী কেবলই কৃষক ও যেখানে অন্নের অভাব নাই, এবং যে দেশে সনাতন ধর্ম্মের পথে সকলে সংসারের অলীক ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ করিয়া থাকে, সেখানে যুদ্ধবিগ্রহ বড় কম। অধর্ম্ম আশ্রয় করিলেই বিপৎপাতের সূত্রপাত হয়।

জমিদারগণ। তবে আমাদিগকে মোটা ভাত ও মোটা কাপড় পরিধান করিয়া থাকিতে হইবে?

বলভদ্র। যাঁহার কৃপায় সূক্ষ্ম কাপড় ও মুখপ্রিয় অন্নব্যঞ্জনাদি, তাঁহার মন্দিরে গিয়া মধ্যে মধ্যে ধনসম্পদের আড়ম্বর করিও। সমাজের নিকট করিও না। রাজা হইতে প্রজার মান অধিক। পিতা হইতে পুত্রের আদর অধিক। তোমরা মোটা ভাত খাইয়া ও মোটা কাপড় পরিয়া তাহাদিগের মুখে যদি অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম অন্ন তুলিয়া দিতে পার, তবেই তোমাদিগের পৃথিবীতে স্থান থাকিবে, নচেৎ ভাসিয়া যাইবে। রাজা, বর্ণাশ্রম, সমাজ ও পরিবার কেবল ধর্ম্মের পথে টিকিয়া থাকে। পুত্র ও সন্তানের যে সম্বন্ধ, বিশাল রাজ্যে রাজা ও প্রজার ঠিক সেই সম্বন্ধ। গৃহের মায়া, মমতা স্নেহ, ন্যায় বিচার, ও আত্মত্যাগ, সমাজে ও রাজ্যশাসনে নিযুক্ত করিলে অনেক কঠিন প্রশ্নের সামঞ্জস্য হইয়া যায়।

(৭)

বলভদ্রের কথাগুলি অনেকের মনে ধরিয়াছিল। সকলে সনাতন ধর্ম্মের পথে গৃহ এবং পরিবার সংগঠন করিয়া, অবশেষে সেই জ্ঞান সমাজে সংযোজনা করিবার নিমিত্ত মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল।

বলভদ্র রাজা হইয়া হাতী ঘোড়া কিম্বা প্রাসাদ অধিকার করেন নাই। পত্নী

ক্ষেমঙ্করী দুঃখিতা হইয়া পড়িলেন। রাজার সারা দিনরাত্রি কেবল অমাত্য-বর্গকে পরামর্শ দিতেই যাইত, আহার নিদ্রার সময় থাকিত না। ক্রমে পরিশ্রমের অভাবে অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট আরম্ভ হইল। ক্ষেমঙ্করী বেগতিক দেখিয়া কলহ করিতে আরম্ভ করিল।

একদিন কলহটা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়া বলভদ্রের মূর্ত্তি অগ্নিময় হইয়া উঠিল। তিনি গুরুর নিকট চলিয়া গেলেন।

ঋষিপ্রবর পূর্ব্বাপর শমীবৃক্ষের উপর তপস্যায় রত। বলভদ্রকে দেখিয়া হাস্য-মুখে বলিল 'রাজন্! কুশলত?'

বলভদ্রচটিয়া বলিলেন 'মোটেই না; আপনি রাজা সম্ভাষণপূর্ব্বক আমাকে লজ্জিত করিবেন না।

ঋষি। বৎস! আমার জমি ছিল, পরিশ্রমও করি নাই, খাইতেও পাই নাই। তোমার জমি আছে, পরিশ্রমও করিতেছ, অথচ খাইতে পাইতেছ না। তুমি শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী, অতএব রাজা। যাহাদের পরিশ্রম করিয়াও অন্ন যুটে না, তাহারাই ভবিষ্যতের রাজা। তুমি অধিকারী হইয়াছ, এখন গূঢ় উপদেশ তোমাকে দিতে চাহি। দুইটী বলদ ও লাঙ্গলের সাহায্যে জগৎ চাষ করে। যোগিগণ ইড়া ও পিঙ্গলার সাহায্যে সুষুম্নারূপী লাঙ্গল চালাইয়া থাকেন। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত এই কার্য্যে ব্যস্ত। অহরহঃ যুক্তাবস্থায় ক্রিয়া করিতে পারিলে সে সিদ্ধপুরুষ ও গুরু। সিদ্ধির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তি হয়। জগৎ তাহারই সুখ ও সৌন্দর্য্য লইয়া ব্যস্ত।

এই রূপে কর্ষণের ফল অনবরত ব্যর্থ হইয়া যায়, কিন্তু গুরুর কৃপায় সকলে একই শৃঙ্খলে বাঁধা। লাঙ্গল হইতে গরু বাহিরে গেলে পুনরায় লাঙ্গলের মধ্যে লইয়া আসেন।

যে লোকেই হউক, চাষ করিলেই সে রাজা। যাহারা চাষ করিয়া মুক্তি পাইয়াছে সে রাজগুরু।

তোমাকে এখন গুরু হইবার পথ শিখাইয়া দিব। তুমি অনাহারে বৃক্ষের ডালে আসিয়া বৈস।

বলভদ্র। আমার কোন আপত্তি নাই। তবে ক্ষেমঙ্করী?

ঋষিপ্রবর সহাস্যে পূর্ব্বাভিমুখে অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইলেন। বলভদ্র স্মিতনয়নে দেখিল যে বৃদ্ধা জীর্ণা শীর্ণা ক্ষেমঙ্করী উৎফুল্ল আননে একটা বেদীর উপর দাঁড়াইয়া, বহু প্রজা তাহাকে নানাবর্ণের বস্ত্র ও খাদ্য দ্রব্যাদি আনিয়া দিতেছে। ক্ষেমঙ্করী কেবল বলিতেছে "ওমা, বুড়া-বয়সে আমি এত খাইতে পারিব না, কিন্তু সকলে বলিতেছে "না, মা খাও"।

সুরদাস

বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

Csoma প্রদত্ত চারিটি মুখ্য দার্শনিক সম্প্রদায়ের যে শ্রেণী-বিভাগ, তাহা ছাড়া অন্য শ্রেণী-বিভাগও বিদ্যমান আছে। নেপালের বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থের সংগ্রহ হইতে আর একটি শ্রেণীবিভাগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। Hodgson ও Bournoufএর গ্রন্থে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। Csoma প্রদত্ত শ্রেণী-বিভাগকে আমি প্রথম-আসন এই জন্য দিয়াছি যে উহা সাধারণের মধ্যে বেশী প্রচলিত এবং আর একটি সুবিধা এই যে, বৌদ্ধদর্শন খণ্ডন করিবার জন্য ব্রাহ্মণেরা যেরূপ শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন তাহার সহিত উক্ত শ্রেণীবিভাগের মিল আছে। নেপালী শ্রেণীবিভাগেও বৌদ্ধগণ চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। যথা—(১) স্বাভাবিক, (২) ঐশ্বরিক, (৩) কর্ম্মিক, (৪) যদৃচ্ছিক।

১। স্বাভাবিকদিগের সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত প্রাচীন; ইহা প্রকৃতিমূলক দর্শনের সম্প্রদায়। উহারা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। প্রকৃতি নিত্য এবং প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ—যাহার একটি অংশ বুদ্ধি—তাহাও নিত্য। প্রকৃতির দুইটি প্রকার-ভেদ—একটি, "নিবৃত্তি"—যাহাতে প্রকৃতির শক্তিগুলি স্বরূপে অবস্থিত এবং আর একটি, "প্রবৃত্তি"—যাহাতে শক্তিগুলি সজীব ও ভৌতিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতি এই অবস্থার মধ্যে আপনা হইতেই প্রবেশ করে। জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়—এই অবস্থা-পারম্পর্য্যেরই পরিণাম; ইহা ঐশ্বরিক ইচ্ছার পরিণাম নহে। স্বাভাবিক-সম্প্রদায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

ভৌতিক রূপ সকল প্রবৃত্তিমূলক ও ক্ষণস্থায়ী। সজীব রূপসমূহ—মানুষও যাহার অন্তর্ভূত—নিবৃত্তিমূলক অর্থাৎ এই সকল রূপ, স্বকীয় শক্তির প্রভাবে, প্রবৃত্তিতে পুনঃপুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিবার দিকে উন্মুখ। আত্মার নিয়তি সম্বন্ধে স্বাভাবিকেরা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক সম্প্রদায়ের মতে, নির্ব্বাণ অবস্থার মধ্যেও আত্মার ব্যক্তিত্বজ্ঞান থাকে; অন্য সম্প্রদায়ের মতে, আত্মা শূন্যতার মধ্যে নিপতিত হয়, একেবারেই ধ্বংস হইয়া যায়। অতএব এই সম্প্রদায় জড়বাদী।

২। ঐশ্বরিক সম্প্রদায় ঈশ্বরবাদী। উহারা এক অদ্বিতীয় জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বরকে স্বীকার করে। সেই ঈশ্বর আদিবুদ্ধ। কিন্তু উহারা ঈশ্বরের বিধাতৃত্ব কিংবা জগতের উপর ঈশ্বরের আধিপত্য স্বীকার করে না। আত্মশক্তি ব্যতীত, তপশ্চর্য্যা ও ধ্যান-সমাধির সাহায্য ব্যতীত মানুষ নির্ব্বাণে উপনীত হইতে পারে না। ধর্ম্ম ও পারমার্থিক সুখলাভ ঈশ্বর-নিরপেক্ষ; কিন্তু ঈশ্বরের স্বরূপে বিলীন হওয়াই মুক্তি।

৩। কর্ম্মিক-সম্প্রদায় কর্ম্মবাদী। Hodgson কর্ম্ম অর্থে বুঝেন—আত্মচৈতন্য-সহকৃত নৈতিক কর্ম্ম ধর্ম্মবুদ্ধির অনুশীলন

দ্বারা মানুষ পরমার্থ বা মোক্ষলাভে সমর্থ হয়।

৪। বস্তিকেরা প্রযত্নবাদী। হজসনের মতে, আত্মচৈতন্য-সহকৃত বুদ্ধির চেষ্টাই প্রযত্ন। বুদ্ধিকে সুপথে চালিত করিলেই মানুষ নির্ব্বাণে উপনীত হইতে পারে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক—এই শেষোক্ত দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভেদ এইটুকু যে, প্রথমোক্ত সম্প্রদায় ধর্ম্মকে বুদ্ধির অগ্রে স্থাপন করিয়া থাকে।

বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত মুখ্য দার্শনিক সম্প্রদায়গুলির বিবরণ সংক্ষেপে দিতে করিলাম। এ সম্বন্ধে আরও বেশী কিছু বলা আবশ্যক মনে করি না। বৌদ্ধধর্ম্মের মতগুলি কিরূপে ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা জন্মাইবার পক্ষে উক্ত বিবরণই যথেষ্ট। এই মুখ্য দার্শনিক সম্প্রদায়গুলি হইতে আরও অনেক বৌদ্ধসম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু আমি যে গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে বদ্ধ করিয়াছি তাহাতে ঐ সকল অবান্তর শ্রেণীর বিবরণ দেওয়া আমার পক্ষে একণে সম্ভবপর নহে। সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক যে যোগাচার্য্য সম্প্রদায়, সেই সম্প্রদায় হইতে উৎপন্ন একটি দার্শনিক সম্প্রদায়ের গ্রন্থ যখন আমি সমালোচনা করিব তখন সেই প্রসঙ্গে এই বিষয় সম্বন্ধে আবার কিছু বলা যাইবে। সেই গ্রন্থের নাম "কালচক্র"।

এই গ্রন্থখানি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। কারণ, যে তান্ত্রিক দর্শন হইতে, নব-বৌদ্ধধর্ম্মের সমসাময়িক সমস্ত গ্রন্থ যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে, "কালচক্র" সেই তান্ত্রিক দর্শনের ভিত্তিভূমি। নব-বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে যখন আলোচনা করিব তখন ঐ গ্রন্থের একটা স্থূল বিশ্লেষণ দেওয়া যাইবে।

আপাতত এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, পূর্ব্বোক্ত সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ই আদিম গ্রন্থগুলিকেই অর্থাৎ সাদাসিধা বৌদ্ধসূত্রগুলিকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করে। তাহারা মনে করে, ঐ সূত্রগুলিই সাক্ষাৎ শাক্যমুনির রসনা হইতে নিঃসৃত। ঐ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মূল বচন লইয়া কোন মতভেদ নাই, যাহা কিছু মতভেদ,—মূলের ব্যাখ্যা লইয়া।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাতালের প্রতিহিংসা

১

রামধন পোদ্দার কেশেডাঙ্গা গ্রামের সর্ব্ব প্রধান মহাজন। কৃষকেরা উচ্চ হারে সুদ দিয়া তাহার নিকট টাকা ধার লইত; কৃষকগণকে সে ধানেরও দাদন দিত। মহাজনী ও তেজারতি করিয়া রামধন কয়েক বৎসরের মধ্যে বেশ ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল; সে কাহারও নিকট একটি পয়সা সুদ ছাড়িত না, এবং কি করিয়া প্রাপ্য টাকা আদায় করিতে হয় তাহা সে ভালই

জানিত। মাসের শেষে কেহ তাহার দেনা শোধ করিতে যাইলে তাহার দেখা পাইত না. মাসকাবারের দুই চারি দিন পূর্ব্বে দেনা শোধ করিয়া কেহ যে তাহাকে বিশ পঁচিশ দিনের সুদ ফাঁকি দিবে, তাহার উপায় ছিল না।

রামধন গ্রামের কোন লোকের সহিত মিশিত না, পাছে মেশামেশি হইতে আত্মীয়তা ও আত্মীয়তা হইতে চক্ষু-লজ্জার সৃষ্টি হয়! এ বিষয়ে সে মফস্বলের ডেপুটি হাকিমগণের আদর্শস্থানীয় ছিল। প্রত্যহ প্রভাতে সে ক্ষেতের কাজ দেখিত, মধ্যাহ্নে খাতকদের সহিত তেজারতির হিসাব লইয়া ব্যস্ত থাকিত; এবং কাহার দলিল তামাদি হইতেছে, কাহার নামে দুই চারি দিনের মধ্যে নালিশ করা আবশ্যক, কাহার নিকট কত টাকার সুদ বাকি—ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনায় তাহার মধ্যরাত্রি অতীত হইত; কিন্তু রামধন ধার্ম্মিক ব্যক্তি. অর্থ-লাভের দিকে দৃষ্টি থাকিলেও ধর্ম্মের প্রতি সে উদাসীন ছিল না। সহস্র কার্য্যের মধ্যেও সে তাড়াতাড়ি একবার হরিনামের মালা গাছটা ফিরাইয়া লইত।

কেশেডাঙ্গার সন্নিকটবর্ত্তী ভগবানপুরে রামধনের বাড়ী। বার তের বৎসর পূর্ব্বে সে কেশেডাঙ্গায় আসিয়া একখানি মুদীখানার দোকান খুলিয়া বসে; দুই এক সের তেল নুন, চাউল, ডাল, মুড়ি, মুড়কী প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ভিন্ন তাহার দোকানে আর কিছু পাওয়া যাইত না; পাঁচটি টাকা মাত্র যাহার মূলধন, সে ইহার অধিক আর কি দোকানে রাখিবে? কিন্তু এই সকল সামগ্রী বিক্রয় করিয়া বিশেষ কিছু আয় হয় না দেখিয়া, সে আয়বৃদ্ধির জন্য একটি উপায় অবলম্বন করিল। স্বয়ং মুড়ি ভাজিয়া তদ্দ্বারা একটি চেঙ্গাড়ি পূর্ণ করিয়া, সে সেই মুড়ির চেঙ্গাড়ি লইয়া গ্রামের খামারে খামারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; চাষীদের দুই চারি মুঠা মুড়ি, জল খাইতে দিয়া সে দুই এক সের করিয়া ধান পাইত। দুই এক মণ ধান জমিলে সে তাহা হাটে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া আসিত। ইহাতে কিছু দিনের মধ্যে তাহার হাতে বিলক্ষণ দশ টাকা জমিয়া গেল।

কোন বিষয়ে রামধনের অপব্যয় ছিল না। সে কখন আট হাতের অধিক লম্বা ধুতি পরিত না, এবং কাছাটিকে অনাবশ্যক উপসর্গ মনে করিত। দুইবেলা আহার করিলে পাছে লক্ষ্মী কুপিতা হন, এই ভয়ে সে একবেলা সিদ্ধ পক্ক ভাত খাইত, রাত্রে হয় দুইখানি রুটী রুটি—না হয় যবের ছাতু খাইত। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে তাহার ব্যয় আরও কম ছিল; একটি পাকা কাঁঠাল দুই দিন তাহার ক্ষুধানল নির্ব্বাপিত করিত, সুতরাং সে সময় মধ্যে মধ্যে কাঠের খরচ বাঁচিয়া যাইত, রামধনকে কষ্ট করিয়া আর উনান জ্বালিতে হইত না।

এইরূপ মিতব্যয়িতার ফলে দশ বার বৎসরের মধ্যে সে দশ বার হাজার টাকার অধিকারী হইল। সুদে ও তেজারতিতে টাকা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে; কিছু দিনের মধ্যে গ্রামে সাড়া পড়িয়া গেল, রামধন

পোদ্দার 'টাকার কুমীর' অর্থাই বল, গ্রামের দরিদ্র প্রজারা রামধনকে ভয় করিতে লাগিল। সুদখোর মহাজনকে কেহই প্রায় শ্রদ্ধা করে না, প্রজারা রামধনকেও শ্রদ্ধা করিত না; প্রভাতে উঠিয়া কেহ তাহার নামও মুখে আনিত না, যদি প্রভাতে কেহ গাড়ু হাতে করিয়া মাঠে যাইবার সময় রামধনের দাড়িগোঁফবর্জ্জিত সুগোল মুখখানি দেখিতে পাইত, তাহা হইলেই তাহারা প্রমাদ গণিত! তাহারা বুঝিত, সে দিন ভগবান তাহাদের অদৃষ্টে কিছুই 'মাপান' নাই। গ্রামের রসিক লোকেরা দেখিয়া শুনিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিল 'বোগ্‌নো-ফাটা!' অর্থাৎ তাহার নামের এমনই মাহাত্ম্য যে, পিতলের বোগ্‌নো, যিনি অল্পতাপে সহজে বিচলিত হন না, তিনিও রামধনের নামের তাপ উনানের উপর ফাটিয়া চৌচির হন, অগত্যা রন্ধনাভাবে অনাহার,—ইতি মল্লিনাথ।

২

কেশেডাঙ্গা-অঞ্চলের প্রজারা দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় বুঝিতে পারিল, ধান্য-গোধূম, ছোলা, অরহর প্রভৃতি শস্যের আবাদে খরচা উঠিয়া বিশেষ কিছু লাভ থাকে না, মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিয়া যে কিঞ্চিৎ শস্য অবশিষ্ট থাকে, তাহা দুই মাস খাইতে না খাইতেই ফুরাইয়া যায়; ইহা অপেক্ষা পাট ও তিসির চাষ অনেক ভাল। সম্বৎসরের মধ্যে একই জমিতে পাট ও তিসি উৎপন্ন হইতে পারে; অথচ তাহা বিক্রয় করিলে মুঠা মুঠা টাকা ঘরে আসে, তাহাতে মহাজনের দেনা শোধ করিয়া সচ্ছল অবস্থায় বৎসর কাটিতে পারে; এমন কি, কৃষক-বধূর হস্তে রূপার পৈঁছা ও কন্যার পায়ে বাঁক মলও উঠিতে পারে।—কৃষকেরা ধান্য ও রবি শস্যের চাষ ছাড়িয়া দিয়া পাট ও তিসির আবাদ আরম্ভ করিল।

এই পরিবর্ত্তনে রামধন পোদ্দারের কোনও ক্ষতি হইল না। যাহারা পূর্ব্বে ধান্য বপনের জন্য তাহার নিকট বীজ সংগ্রহ করিত, তাহারই খোরাকের জন্য নগদ টাকায় ধান কিনিতে লাগিল, এবং কৃষকদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল হওয়ায় তাহারা রামধনের দেনা সুদে আসলে পরিশোধ করিয়া ফেলিল। গ্রামে হরিসংকীর্ত্তনের ধুম পড়িয়া গেল। পূর্ণ উদরে সংকীর্ত্তন জমে ভাল, সামান্য সামান্য কার্য্যে কুটুম্বিতা করিবার ইচ্ছাও বলবতী হয়; অনেকেই সমাদরে কুটুম্ব ভোজন করাইয়া অর্থের সদ্ব্যয় করিতে লাগিল। কেহ কেহ বাড়ীর চারিদিকে ঝাঁপের বেড়া ভাঙ্গিয়া মাটীর প্রাচীর দিল, আর সুযোগ বুঝিয়া গোবর্দ্ধনপুরের নিত্যানন্দ সাহা গ্রামের ভিতর একখানি আবগারীর দোকান খুলিয়া বসিল। রামধনের দোকানের অদূরে, গ্রাম্য ডাকঘরের পাশে একখানি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে শ্রীমান নিত্যানন্দ বাঁশের মাচার উপর দুইটি কেরোসিনের বাক্স সাজাইয়া আসর জমকাইয়া বসিল; কেরোসিনের বাক্সরূপ সিংহাসনে গৌড়েশ্বরীর সাদা সাদা বোতলের আবির্ভাব হইল, এবং ঝাঁপের বেড়ায় এক ফর্দ্দ

বালির কাগজে একটি বিজ্ঞাপন আঁটিয়া দেওয়া হইল। বিজ্ঞাপনে লিখিত ছিল—"আমি শ্রী নিত্যানন্দ সাহা সরকার বাহাদুরের হুকুমে দিশী সরাব ও গাঁজা আফিম্ বীক্রি করিতেছি। অতি উৎকৃষ্টো সদিশী সরাব।"

কেশেডাঙ্গার কৃষকেরা ইতিপূর্ব্বে কখন এই অমৃত-রসের আস্বাদন লাভ করে নাই; অধিক কি তাহারা এই হলাহলকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত। শ্রীমান্ নিত্যানন্দ কয়েকদিন উপবাসে কাটাইল, এক পয়সাও বিক্রয় করিতে পারিল না, তখন সে তাহার মুরব্বী রামধন পোদ্দারের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে গেল। রামধন কৃতকর্ম্ম মানুষ; দুই একছিলিম তামাক ও দুই একটান 'বড় তামাক' ভিন্ন সে অন্য কোন প্রকার মাদক দ্রব্য স্পর্শ করিত না, কিন্তু বন্ধুব্যক্তিকে সদুপদেশ দানে তাহার কিছুমাত্র কৃপণতা ছিল না। সে বুঝিয়াছিল যদি কোন প্রকারে একবার কেশেডাঙ্গার কৃষকদের মধ্যে মদ চালাইতে পারা যায়, তাহার মহাজনী ও তেজারতি হু হু শব্দে বাড়িয়া যাইবে। যাহার হাতে যাহা কিছু আছে কিছু দিনের মধ্যেই তাহা মদের বোতলে পরিণত হইবে, তাহার পর তাহাদিগকে অসত্যা ক্ষেতের ফসল, গৃহিণীর হাতের রূপার পৈঁছা, এমন কি, গাড়ু গামছা পর্য্যন্ত তাহার নিকট বন্ধক রাখিয়া মদের পিপাসা নিবারণ করিতে হইবে। দূরদর্শী রামধন পোদ্দার নিত্যানন্দকে পরামর্শ দিল, "ভায়া হে এখানে যদি ব্যবসা চালাইতে চাও, তবে ইংরাজ সদাগরদের মত চালাকী শেখ; মালের যাহাতে কাটতি হয় তাহার উপায় কর। যে সকল ইংরাজ সদাগর চায়ের ব্যবসা করে, তাহারা মালের কাটতি কমিতেছিল দেখিয়া কি করিয়াছিল জান না বুঝি? তাহারা দেশের ইতর ভদ্র সকল লোককে এক এক মোড়ক চা দিতে লাগিল। তাহাদের চাকর বাকরেরা পর্য্যন্ত তৈয়ারী চা পেয়ালা পেয়ালা লোককে বিলাইতে লাগিল, যিনি পয়সায় চা খাইতে পাইয়া কলিকাতা সহর ও সহরতলির মুটে, মজুর, গাড়োয়ান, বেহারা সকলেই চা ধরিল। কয়েক দিনের মধ্যেই মৌতাতটি বেশ জমিয়া উঠিল, সকালে এক পেয়ালা গরম চা না পাইলে তাহাদের কাজ মন লাগে না, প্রাণ উড়ু উড়ু করে, কাজেই তাহারা চায়ের সন্ধানে ঘুরিতে লাগিল। চায়ের সদাগরেরা যখন দেখিল ঔষধ ধরিয়াছে, তখন তাহারা হাত টানিয়া লইল, চা বিতরণ বন্ধ হইল। অগত্যা মুটে মজুরেরাও নগদ পয়সা ফেলিয়া এক এক পেয়ালা চা খাইতে বাধ্য হইল, এই উপায়ে এখন দেশে চতুর্গুণ চায়ের কাটতি বাড়িয়াছে। ইহারই নাম ব্যবসায়বুদ্ধি। ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে হইলে এই রকম ব্যবসায়বুদ্ধি চাই। এই বুদ্ধি বলেই আমি দুপয়সার মুখ দেখিতে পাইয়াছি। যদি তুমি দুপয়সা উপার্জ্জন করিতে চাও, তবে যেমন করিয়া পার চাষাদের মদ ধরাও। বেশী দিন নয়, ১৫।১২ দিন একটু ক্ষতি সহ্য কর, তাহার পর আর কিছু

করিতে হইবে না, খরিদ্দার তোমার দোকানে ছুটিয়া আসিবে।"

নিত্যানন্দ বলিল "এ খুব ভাল পরামর্শ বটে, কিন্তু আমার পুঁজিপাটা কম। এ ভাবে খয়রাত করিলে আমাকে মাস খানেক মধ্যে দোকান বন্ধ করিতে হইবে।"

রামধন বলিল "কোন চিন্তা নাই ভায়া, আমি যখন আছি তখন তোমার ভয় কি? আমি তোমাকে পঞ্চাশ বোতল মদের দাম আগাম দিব, কিন্তু ভবিষ্যতে তোমার যাহা লাভ হইবে তাহার অর্দ্ধেক আমার।"

নিত্যানন্দ বলিল, "আপনাকে না হয় অর্দ্ধেক লাভ দিলাম, কিন্তু আমি বিনি পয়সায় মদ খাইতে দিলে লোকে তাহা খাইবে কেন? ইহার উপায় কি?"

রামধন বলিল, "উহারও উপায় আছে, বুদ্ধি থাকিলে কি উপায়ের অভাব হয়?" রামধন নিত্যানন্দের কানে কানে কি বলিল। সে কথা শুনিয়া নিত্যানন্দ দন্ত বাহির করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িবার উপক্রম করিল; সাহ্লাদে বলিল, "এ খুব ভাল পরামর্শ, ইহাই করিতে হইবে।"

নিত্যানন্দ প্রসন্ন মনে প্রস্থান করিলে, রামধন সমস্ত দিন বৃথা গেল ভাবিয়া হরিনামের ঝুলিটি বাহির করিল, এবং তাহা ভক্তি ভরে মস্তকে স্পর্শ করিয়া বলিল 'হরি হে তোমারই ইচ্ছে!" সে ভক্তি বিহ্বল-চিত্তে মালা 'ফিরাইতে' বসিল।

৩

কয়েকদিনের পরে কোথা হইতে এক ধূম্রলোচন সন্ন্যাসী আসিয়া কেশেডাঙ্গা গ্রামের ষষ্ঠীতলায় আড্ডা ফেলিল। সন্ন্যাসীর যেমন দাড়ীগোঁফের ঘটা, মস্তকে সেইরূপ পিঙ্গলবর্ণ দীর্ঘজটা ও ললাটে রক্ত চন্দনের ফোঁটা; সন্ন্যাসীর সর্ব্বাঙ্গ ভস্মাবৃত, কটিদেশে কৌপিন, পৃষ্ঠে বাঘছাল বাঁধা, হস্তে সুদীর্ঘ চিমটা, এবং সঙ্গে একটি অল্পবয়স্ক চেলা। সন্ন্যাসী ষষ্ঠীতলায় চিমটে পুঁতিয়া 'কালী' 'কালী' শব্দে হুঙ্কার দিতে লাগিল। সেই হুঙ্কারধ্বনিতে গ্রামের স্ত্রীপুরুষ ষষ্ঠীতলায় আসিয়া কাতার দিয়া দাঁড়াইল। সকলে বুঝিল 'হাঁ সন্ন্যাসী বটে!'

সন্ন্যাসী-ঠাকুর কয়েক দিনের মধ্যেই গাঁজা খাইয়া ও লোকের হাত দেখিয়া গ্রামবাসিগণের হৃদয় জয় করিল। তাহার সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরময়ী কালী মূর্ত্তি ছিল শনি মঙ্গলবারে কারণাদি উপচারে কালী পূজা হইতে লাগিল। গ্রামের চাষারা প্রসাদ পাইয়া ধন্য হইল। মদ্যের প্রতি যাহাদের স্বাভাবিক অভক্তি ছিল, তাহারাও মায়ের প্রসাদ বলিয়া মন্ত্রপূত কারণ গলাধঃকরণ করিতে কুণ্ঠিত হইল না। এতদিন পরে নিত্যানন্দের দোকানে কিছু কিছু বিক্রয় আরম্ভ হইল।

গ্রামস্থ কৃষকগণের মধ্যে হলধর ঘোষের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সচ্ছল ছিল। কয়েক বৎসর তিসির ও পাটের চাষ করিয়া হলধর দুপয়সা সঞ্চয় করিয়াছিল; সে কঞ্চির বেড়া ভাঙ্গিয়া বাড়ীর চারিদিকে মাটীর প্রাচীর দিয়াছিল, এবং স্ত্রী লক্ষীমণি ও পুত্র দুলোকে দুই একখানি সোনাদানার গহনাও দিয়াছিল।

কিন্তু মা কমলা চিরচঞ্চলা; কিছু দিনের মধ্যেই হলধরের প্রতি তাঁহার অকৃপা হইল। সে অর্থলোভে ধান্য ও

অন্যান্য খাদ্য শস্যের আবাদ ছাড়িয়া দিয়া পাট ও তিসির চাষ আরম্ভ করিয়াছিল; কিন্তু হঠাৎ পাটের বাজার অত্যন্ত নামিয়া গেল এবং তাহার সুবিস্তীর্ণ তিসির ক্ষেত্রে এমন পোকা লাগিল যে, সেবারকার ফলনে জমির খাজনা পর্য্যন্ত উঠিল না! দাদন শেষ করিতেই সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষিত হইল। ইহার উপর আর এক উপসর্গ উপস্থিত! তাহার গোয়ালে যে সকল লাঙ্গল বলদ ছিল, হঠাৎ কি অনির্দ্দিষ্ট রোগে টুঁটি ফুলিয়া তাহারা গোপীনাথ সংবরণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ অনুমান করিল মুচিরা কৌশলে বিষ খাওয়াইয়া গরু মারিতেছে, সেবার চামড়ার দর অত্যন্ত মহার্ঘ্য হইয়া উঠিয়াছিল। দিন দিন এই রোগ সংক্রামক মূর্ত্তিতে গ্রামস্থ কৃষকগণের সর্ব্বনাশ করিতে লাগিল; তাহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হইয়া উঠিল। কৃষিকর্ম্ম একরূপ বন্ধ হইয়া গেল, কৃষকেরা হাহাকার করিতে লাগিল, কেবল মুচি-পাড়ায় দিবা রাত্রি আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল, তবসার চাঁইতে ক্ষুদ্র গ্রামখানি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, তাহাদের মদের মজলিস্, শুলজার! গো-মড়কে মুচির পার্ব্বণ! নিত্যানন্দ সাহা দুই হাতে পয়সা ছড়াইতে লাগিল। ইতিমধ্যে রামধন পোদ্দার একদিন খড়ম পায়ে দিয়া নিত্যানন্দের দোকানে উপস্থিত, রামধন জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন হে ভায়া, চল্‌ছে কেমন?" নিত্যানন্দ একগাল হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে কর্ত্তা, আপনার আশীর্ব্বাদে কিছু কিছু বিক্রী হচ্ছে!"—রামধন জিহ্বা দংশন করিয়া বলিল, "রাধেকৃষ্ণ! এও কি একটা কথা! সকলই হরির ইচ্ছে!" নিত্যানন্দ বলিল, "কেবল হরির নয়, মা কালীর ইচ্ছেও বটে!"

৪

বর্ষাকালে হলধরের স্ত্রী লক্ষ্মীমণি দুশ্চিকিৎস্য আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইল, গ্রামে ডাক্তার নাই, কয়েকদিন সে এক হাতুড়ে কবিরাজের বড়ি খাইল, রোগের উপশম না হইয়া ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল শেষে কবিরাজ জবাব দিয়া চলিয়া গেল, লক্ষ্মীমণিও স্বামীপুত্র রাখিয়া অভিশপ্ত সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

সংসারের সর্ব্ব প্রধান অবলম্বনটি হারাইয়া হলধর চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল। সন্ন্যাসীর অনুগ্রহে পূর্ব্বেই সে মা কালীর প্রসাদের মহিমা বুঝিয়াছিল, মনের কষ্ট নিবারণের জন্য আত্ম-বিস্মৃতি লাভের আশায় সে নিত্যানন্দের শরণ লইল। নিত্যানন্দ তাহাকে আনন্দ দানে কুণ্ঠিত হইল না; 'সরকারের আদেশে' সে যখন স্বদেশী গৌড়ীয় সুধা বিক্রয় করিতে বসিয়াছে, তখন সে শরণাগতকে কি করিয়া পরিত্যাগ করে? ক্রমে হলধরের পত্নীর অলঙ্কারগুলি, তৈজসপত্র, তাহার কৃষিক্ষেত্র, এমন কি, পৈত্রিক ভদ্রাসন পর্য্যন্ত রামধন পোদ্দারের নিকট বাঁধা পড়িল। 'হালের গরু' গুলি পঞ্চত্ব লাভ করায় পূর্ব্বেই তাহার কৃষিকর্ম্ম বন্ধ হইয়াছিল, সে রাখাল কৃষাণদের জবাব দিয়া মদের বোতলকেই সার করিল। কিন্তু সে তখন পর্য্যন্ত তাহার পুত্র দুলোর হাতের সোনার বালা,

গলার হেসো হার ও রূপার কোমর পাটা মদ বন্ধক দেয় নাই, মাতৃহীন পুত্রের অঙ্গ হইতে অলঙ্কারগুলি খুলিয়া লইতে তাহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। বোধ হয় তখন পর্য্যন্ত তাহার হৃদয় হইতে মনুষ্যত্বের শেষ চিহ্নটুকু বিলুপ্ত হয় নাই।

ধর্ম্মাত্মা মহাজন রামধন পোদ্দার যখন দেখিল হলধরের সর্ব্বস্ব তাহার হাতে আসিয়াছে, তখন সে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। সুদের টাকা চক্রবৃদ্ধি হারে দিন দিন স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু মাসে মাসে সুদের টাকা জোগাইতে না পারিলেও সে ঘটি বাটি বেচিয়া মদ খাইতে লাগিল। তাহার পুত্র ভুলো কোন দিন দু'মুঠা খাইতে পাইত, কোন দিন অনাহারে থাকিত, প্রতিবেশিনী গৃহিণীরা মাঝে মাঝে ছেলেটিকে কোন দিন বা দয়া করিয়া দুটি খাইতে দিত; কিন্তু সকলেরই অবস্থা প্রায় সমান, কে কাহাকে দেখে? ভুলো কখন কখন পিতার সহিত রামধনের দোকানে যাইত। এই উপলক্ষে রামধনের সহিত ভুলোর পরিচয় হইয়াছিল। রামধন এই মাতৃহীন শিশুকে একটু স্নেহ করিত, এবং কোন কোন দিন চিড়া মুড়কি, মুড়ি বা যবের ছাতু তাহাকে খাইতে দিত; এই ভাবে ভুলোর দিনপাত হইতে লাগিল। এই দরিদ্রের দেশে এরূপ নিরুপায় ভুলো অনেক আছে, কিন্তু ভগবান তাহাদিগকে অনাহারে মারেন না।

সুদের টাকার জন্য রামধন হলধরকে তাগিদ দেওয়ায় হলধর পলাইয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু লুকাইয়া থাকিলে মহাজনকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। একদিন অপরাহ্ণে রামধন টাকার তাগাদায় হলধরের গৃহে উপস্থিত হইল; সে দেখিতে পাইল, হলধর একখানি ছিন্ন চটে বসিয়া পানানন্দে বিভোর! সম্মুখে মদের বোতল, পাশে কয়েকমুষ্টি মুড়ি; তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ। উঠানে একটা কুল গাছের তলায় ছাই গাদার উপর একটা ক্ষুধিত কুকুর লোল জিহ্বা বাহির করিয়া ধুঁকিতেছে, এবং ভুলো ধূলিধূসরিত দেহে দাওয়ার উপর পড়িয়া ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

রামধন হলধরকে মদ্যপান করিতে দেখিয়া প্রথমে তাহাকে কতকগুলি তিরস্কার করিল। তাহার পর সুদের টাকা চাহিল। হলধর তখন মদ্যপানে উন্মত্তপ্রায়, সে রামধনকে কুৎসিত ভাষায় গালি দিল; এবং অবিলম্বে তাহাকে গৃহত্যাগ করিতে আদেশ করিল। রামধন তাহার নিকট অনেক টাকা পাইবে, টাকা দেওয়া দূরের কথা, আবার গালাগালি! রামধন কুষ্ঠভক্ত হইলেও তাহার হাতে একখানি বেতের লাঠি থাকিত, রামধন ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া হলধরের বোতলে বেত্রাঘাত করিল। কাচের বোতল সে আঘাত বরদাস্ত করিতে না পারিয়া শতখণ্ডে চূর্ণ হইল, এবং বোতলবাসিনী গৌড়েশ্বরী অভিমান ভরে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিল।

ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের কবল হইতে শিকার কাড়িয়া লইলে সে যেমন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, রামধনকে বোতল ভাঙ্গিতে দেখিয়া হলধরও সেইরূপ ক্রুদ্ধ হইল। সে উঠিয়া একলম্ফে

রামধন পোদ্দারকে আক্রমণ পূর্ব্বক ভূতল-শায়ী করিল। রামধন স্বল্পাহারী ক্ষীণজীবী মনুষ্য, সবলদেহ উন্মত্ত কৃষকের আক্রমণ সে সহ্য করিতে পারিল না। হলধর তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার গলার তিনকণ্ঠি মালা ও মাথার নাতিদীর্ঘ টিকিটা ছিঁড়িয়া লইল, সক্রোধে বলিল, "এখনই এখান থেকে দূর হও, এবার টিকি ছিঁড়িয়াই ছাড়িয়া দিলাম, ফের যদি এ মুখো হও, তাহ'লে তোমার মুণ্ডু ছিঁড়িব, মহাজন বলে রেয়াত করিব না।"

উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের চীৎকারে ভুলোর নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে ধরাশয্যা ত্যাগ করিয়া পিতার নিকট দৌড়িয়া আসিল; এবং তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বাবা, রামা জ্যাঠাকে কেন বকচিস্, জ্যাঠা আমাকে ভালবাসে, আমাকে খেতে দেয়।"

হলধরের তখন বাহ্যজ্ঞান ছিল না, সে পুত্রের গণ্ডে সবেগে চপেটাঘাত করিল। ভুলো মাটিতে পড়িয়া মুখব্যাদান করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। রামধন মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে উঠিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া প্রস্থান করিল, যাইবার সময় বলিয়া গেল, "দ্যাখ হলা, যদি তিন দিনের মধ্যে আমার সমস্ত টাকা সুদে আসলে শোধ না করিস্, তবে তোর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত বন্ধকী সম্পত্তি নীলাম করে নেব। তাতেও যেনা শোধ হবে না তখন তোকে জেলে পুরবো। যদি তা না করি—তবে আমার নাম রামধন পোদ্দার নয়; তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমার টিকি ছিঁড়িস্?"

৫

ক্ষান্ত গোয়ালী ক্ষুধার্ত্ত ভুলোকে ডাকিয়া একমুঠা পান্তা ভাত ও একটু কচুসিদ্ধ খাইতে দিল। ক্ষান্ত গ্রাম সম্পর্কে হলধরের মাসী।

সন্ধ্যার পর ভুলো একখানি ছেঁড়া কাঁথায় একটা ময়লা বালিস মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িল; এবং হলধর তাহার স্ত্রীর ময়ূরকণ্ঠি চেলির কাপড়খানি বাঁধা দিয়া যাহা পাইল, তাহা দুই গোতল মদে ব্যয় করিল। ক্ষুদ্র কুটীরে বসিয়া অনেকক্ষণ মদ্য পানের পর একটা দুষ্কর সংকল্প তাহার মস্তিকে আবির্ভূত হইল, সে একবার রক্তাক্ত নেত্রে তাহার নিদ্রিতপুত্রের দিকে চাহিল।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। বর্ষার অন্ধকারপূর্ণ রাত্রি, পল্লী পথে জনমানবের সাড়া শব্দ নাই, পল্লীবাসীরা সকলেই স্ব স্ব কুটীরের মৃৎপ্রদীপ নির্ব্বাপিত করিয়া শয্যা গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু এখনও রামধন পোদ্দারের দোকান ঘরে আলো জ্বলিতেছে, রামধন তাহার দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করিয়া একটিক্ষুদ্র মৃৎপ্রদীপের সম্মুখে বসিয়া জমা খরচ মিল করিতেছে। সহসা বাহির হইতে তাহার ঝাঁপে কে করাঘাত করিল।

রামধন খাতা হইতে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে ও?"

হলধর বিকৃত স্বরে বলিল "খদ্দের?"

মাসমাসের রাত্রি তিনটার সময় খদ্দের আসিলেও রামধন তাহাকে ফিরাইত না, কারণ সে জানিত খদ্দেরই লক্ষ্মী। রামধন উঠিয়া ঝাঁপ খুলিয়া দিল, এবং মৃদু দীপালোকে আগন্তুকের মুখ দেখিয়া ভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। হলধরের জবার মত লাল চক্ষু দুটি কপালে উঠিয়াছে, তাহার মুখে মদের বিকট দুর্গন্ধ; বাহুর কালো কালো শিরাগুলি ফুলিয়া

উঠিয়াছে, বিশৃঙ্খল রুক্ষ কেশগুলি মস্তকের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত, সে যেন দানবের চেহারা! তাহার নয়নে নরকানল প্রজ্বলিত, মুখে ক্রুর হাস্য, সে যেন পিশাচের হাসি।

হলধর রামধনের দোকানে প্রবেশ করিল, রামধন বাধা দিতে পারিল না, তাহার মুখে কথা সরিল না। সে দুরে দাঁড়াইয়া স্তম্ভিত ভাবে হলধরের আকার প্রকার দেখিতে লাগিল, তাহার পর সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "এত রাত্রে এখানে তোর কি কাজ?"—ভয়ে রামধনের পা দুখানি ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছিল।

হলধর বিকৃতস্বরে বলিল, "চুপ কর বেটা সুদখোর কড়ে, তুই বলেছিস্ তিন দিনের মধ্যে তোর সেনা সুদে আসলে শোধ না করলে আমাকে জেলে দিবি, আজই তোর পাওনা টাকা বুঝে নে! আমার কাছে কত টাকা পাবি, হিসেব কর, বের কর জমা খরচ।"

রামধন পোদ্দার একবার সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে হলধরের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, সে যে টাকা আনিয়াছে এরূপ তাহার অনুমান হইল না; কাপড়ের খুঁটে নোট বাঁধিয়া আনে নাই ত? তাহাই সম্ভব; রামধন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া হিসাবের খাতা বাহির করিল, মনোযোগের সহিত হলধরের হিসাব দেখিতে লাগিল, কেবল খরচ জমার ঘরে শূন্য!

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টার পর রামধন মুখ তুলিয়া বলিল, "শোন্‌রে হলা, তুই আমার কাছে সাত দফায় এককুড়ি পনের টাকা ধার লইয়াছিস্, তাহার সুদ হইয়াছে—সাতকুড়ি দশ টাকা, সুদে আসলে একশো পঁচাশি টাকা হয়েছে; টাকা এনেছিস্?"

হলধর বলিল, "একশো পঁচাশি 'ফচাশি' বুঝিনে, ক কুড়ি ক টাকা গোলমা করে কও।"

রামধন বলিল, "দূর বেটা তেমো গোয়ালা, একশো পঁচাশিতে ক কুড়ি কত টাকা তা জানিস্ নে? তোর কাছে ন' কুড়ি পাঁচ টাকা পাওনা আছে। একশো পঁচাশিতে ন' কুড়ি পাঁচ টাকা হয় কি না তোদের পাড়ার চৌকিদার নবাই বাগ্দীকে জিজ্ঞাসা ক'রস্।"

হলধর বলিল, "আমি কি কিছু বুঝি? আমি তো গরু, তুমি আমাকে জবাই না করে ছাড়বা না। সুদ কিছু বাদ দিতে হচ্ছে।"

রামধন বলিল, "তোদের মত ছোট লোকদের টাকা কড়ি ধার দেওয়াই ঝকমারি! কাঁদো কাটি করে টাকা নিয়ে যাস্, সুদ দিবার বেলায় মাথায় যেন বাজ পড়ে। আমি যে রকম কম সুদে টাকা ধার দিই, কোন বেটা মহাজন তা পারবে না। যাক্, সমস্ত টাকা যদি আজ মিটিয়ে দিস্—তা হলে মোটের উপর পাঁচ টাকা রেহাই দিতে পারি।"

অনেক বাকবিতণ্ডার পর পঁচিশ টাকা বাদ দিয়া ১৬০৲ টাকা লইয়া রামধন হলধরকে খালাস দিতে সম্মত হইল। সুদের পঁচিশ টাকার মায়া ত্যাগ করিতে হলধরের হৃদয় বিদীর্ণ হইল।

হলধর বলিল, "আমি যে তমঃসুক লিখে দিয়ে টাকা ধার নিয়েছি, তা কোথায় বের কর; খতের পিঠে লিখে দে সুদে আসলে সব টাকা শোধ করে গেলি।"

রামধন বলিল, 'বাহারে মজা! টাকার সঙ্গে দেখা নেই, আমি খতের পিঠে লিখে দেব সুদে আসলে সমস্ত টাকা পেয়েছি? একি ছেলের হাতের নাড়ু? আগে আমার টাকা মিটিয়ে দে, তার পর তোর তমঃসুক ফেরত নিস্।"

হলধর বলিল, "তুই কি মনে করেছিস টাকা না এনেই আমি দলিল ফেরত নিতে এসেছি? আমি তোর আর এক পয়সা দেনা রাখবো না। আমি নগদ টাকা আনিনি। টাকার বদলে যা এনেছি তা চটে বেঁধে তোর গোলার নীচে রেখে এসেছি। আমার কথায় 'বিশ্বেস' না হয়—চল্ আমার সঙ্গে, মাল দেখিয়ে দিচ্ছি।"

(৬)

রামধন পোদ্দার হলধরের কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না! হলধর কি টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া কোথাও হইতে কাহারও গহনাপত্র চুরী করিয়া আনিয়াছে? —চোরাই মালের কারবারও যে রামধনের না ছিল এমন নয়, কত দিন গভীর রাত্রে তাহার প্রতিবেশী রূপলাল স্বর্ণকার কত মূল্যবান স্বর্ণালঙ্কার তাহার জন্য গলাইয়াছে, কাজেই সে হলধরের কথা অবিশ্বাস করিল না। হলধর না জানি কি অলঙ্কার আনিয়াছে —ভাবিয়া রামধন কৌতূহলোদ্বেলিত হৃদয়ে তাহার লণ্ঠনটা জ্বালিল। এই লণ্ঠন সে সাড়ে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সরূপ নগরের হাটে দশ পয়সায় কিনিয়াছিল। লণ্ঠনের চারি খানি কাচের মধ্যে দুইখানি পেতলে লইয়াছিল, দুই টুকরা বালির কাগজ তাহার প্রতিনিধিত্ব করিতেছিল আর একখানি কাচ ভাঙ্গিয়াও নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই, তাহাতে কাগজের পটি লাগান। লণ্ঠনের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র কেরোসিনের টিমি, কালীতে এই অপরূপ লণ্ঠনটির অভ্যন্তর ভাগ আচ্ছন্ন। রামধন সেই লণ্ঠন জ্বালিয়া হলধরের সঙ্গে অদূরবর্ত্তী গোলার নিকট উপস্থিত হইল।

তখন হলধর এক অদ্ভুত কার্য্য করিল। রামধনের হাত হইতে লণ্ঠনটি কাড়িয়া লইয়া গোলার কাছে রাখিল, এবং এক লম্ফে তাহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক, উভয় হস্তে এমন জোরে তাহার গলা চাপিয়া ধরিল যে, রামধনের চীৎকার করিবারও শক্তি রহিল না। সে রামধনকে মাটীতে ফেলিয়া কর্কশ স্বরে বলিল, "ওরে হতভাগা সুদখোর, ঐ গোলার তলে চেয়ে দেখ, আমার ভুলোকে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ঐ চটে জড়িয়ে এনেছি। যদি তুই আমার খত ফিরিয়ে না দিস্, তা হলে এখনি চেঁচিয়ে পাড়ার লোক জড় করবো, তাদের বলবো রামধন পোদ্দার সাঁজের বেলা আমার ছেলেকে খাবার দিবে বলে ভুলিয়ে এনে গহনার লোভে তাকে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করেছে!—বল আমার খত ফেরত দিবি কি না? যদি মুখে বল্‌তে না পারিস্, তবে হাত তোল, আমি তোর সঙ্গে গিয়ে খত ফেরত নিচ্ছি।"

রামধন পোদ্দার মহাজনী করিয়া এ পর্য্যন্ত অনেক সুদ পরিপাক করিয়াছে, বিস্তর টাকা জমাইয়াছে, কিন্তু এমন বিভ্রাটে কখন পড়ে নাই। ভয়ে তাহার মুখ দিয়া উপক্রম হইল মুহূর্ত্তমধ্যে সে

তাহার সঙ্কটের কথা বুঝিতে পারিল, সে বুঝিল হলধর চীৎকার করিয়া লোক ডাকিলেই এখনই সেখানে পাড়ার সকল লোক আসিয়া জুটিবে, হলধর যে ঋণ পরিশোধের জন্য পুত্র হত্যা করিয়াছে এ কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না; সকলেই মনে করিবে সে গহনার লোভে হলধরের পুত্রকে হত্যা করিয়াছে, তাহাকে দায়রার আসামী হইতে হইবে, এবং যদি সে পূর্ব্ব জন্মের পুণ্যফলে কোনরূপে ঐ যাত্রা রক্ষা পায় তাহা হইলে মামলায় ব য়েই তাহাকে সর্ব্বশান্ত হইতে হইবে। ইহা অপেক্ষা হলধরকে দেনার দায়ে খালাস দেওয়া সহস্রগুণ শ্রেয়স্কর!—রামধন হাত তুলিয়া হলধরের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

তখন হলধর রামধনকে ছাড়িয়া দিল। রামধন উঠিয়া হলধরের সঙ্গে দোকানে আসিল। হলধরের বন্ধকী তমঃসুক তাহাকে ফেরত দিয়া বলিল, "সামান্য টাকার জন্য কেন তুই এমন সর্ব্বনাশ করলি? আমি তোকে দেনার দায়ে রেহাই দিলাম, তোর খত নে; কিন্তু মরাটার এখন কি গতি করা যায়; এ কথা কেউ জান্‌তে পারলে আমার হাতে দড়ি পড়বে।"

হলধর বলিল, "তবে আমার সঙ্গে চল, দীঘির ধারে পাকুড় তলায় পুঁতে রেখে আসি। তোর কোদালখানা সঙ্গে নে, আর লণ্ঠনটাও আন্। এই আঁধার রাতে সেখানে একা যাওয়া আমার কর্ম্ম নয়।"

রামধন ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কোদাল ও লণ্ঠন লইয়া বিজন অরণ্য পথে গ্রাম-প্রান্তবর্ত্তী দীঘির দিকে অগ্রসর হইল; হলধর একখানি ছেঁড়া চটে পুত্রের মৃতদেহ বাঁধিয়া লইয়া তাহার অনুসরণ করিল।—সুরাদেবী তখনও তাহার মস্তিষ্কে পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন।

(৭)

কার্য্যশেষে ফিরিবার সময় রামধন হলধরের দুই হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "দেখ হলা, আমি তোর অনেক উপকার করেছি, তুই আমার অনেক ধান খেয়েছিস, দেখিস যেন আমি কোন বিপদে না পড়ি।"

হলধর বলিল, "তোমার কোন ভয় নেই, কোথা থেকে কতকগুলো বেদে এসে এই গাঁয়ে আড্ডা ফেলেছে দেখনি? আমি পুলিসে এজেহার দিয়ে আস্‌বো—কাল সাঁজের ওক্তে তারা ভুলোকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে গহনার লোভে খুন করেছে। তুমি 'নিঃভাবনা'য় থাক।"

হলধর বাড়ী ফিরিয়া পুত্রশোক নিবারণের জন্য এক বোতল মদ লইয়া বসিল। মদ খাইতে খাইতে তাহার বুদ্ধি খুলিয়া গেল, সে মনে করিল, "যদি সকালেই কাঁড়িতে এ খবর না দিই, তবে পুলিসের লোক আমাকেই সাঁবে করবে; এখনও একটু রাত্রি আছে, ভুলোর হাত বাঁধা কোমরপাটা ও মল বেদেদের আড্ডার কাছে একটা গর্ত্ত করে পুঁতে রেখে আসি। পুলিশ তা খুঁজে বের করতে পারবে।"

মদের বোতলটি খালি করিয়া হলধরের মাথায় আর এক বুদ্ধি যোগাইল। সে বলিল 'বেদেদের দোষ কি, শুধু শুধু তাদের কেন ফাঁদে ফেলি; ঐ শালা পোদ্দারই যত নষ্টের গোড়া! ও যদি টাকার জন্য আমার অপমান না করতো, আমাকে ভয় না দেখাত, তাহলে কি ভুলো মরে? ওর জন্যই ভুলো মরেছে, ওকে সহজে ছাড়বো না, ওর যাতে ফাঁসি হয়—তাই করতে হবে।"

এই সংকল্প স্থির করিয়া হলধর এক খানি ছিন্ন মাদুরে শুইয়া পড়িল! নেশার ঘোরে সে মৃতবৎ পড়িয়া রহিল।

প্রভাতে হলধর তাহার কুটিরের বাহিরে আসিয়া ভুলোকে খুঁজিতে লাগিল। তাহার পর কাঁদিতে কাঁদিতে পুলিসের ফাঁড়িতে উপস্থিত হইয়া দারোগাকে জানাইল, পূর্ব্বরাত্রি হইতে তাহার শিশুপুত্র ভুলোকে পাওয়া যাইতেছে না; ভুলো সন্ধ্যার সময় রামধন পোদ্দারের সঙ্গে তাহার দোকানে গিয়াছিল, রামধন তাহাকে মধ্যে মধ্যে খাইতে দিত। ভুলো বাড়ী না আসায় সে রামধনের দোকানে গিয়া শুনিয়াছে ভুলো মুড়কী খাইতে খাইতে বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে বাড়ী ফেরে নাই, সমস্ত রাত্রি ও পরদিন বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত গ্রামের চারিদিকে ভুলোকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, অনুমান হইতেছে অর্থপিশাচ রামধন গহনার লোভে ভুলোকে খুন করিয়াছে।—হলধর রামধনের দোকান ও গোলা খানাতল্লাসীর প্রার্থনা করিল।

(৮)

পুলিশ জানিত রামধন টাকার মানুষ। ফৌজদারীর আসামীর উপর যদি মা লক্ষ্মীর দয়া থাকে, তাহা হইলে পুলিসের অনেক দারোগা জমাদারের কর্ত্তব্যানুরাগ শত গুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। কেশেডাঙ্গার দারোগা করিম বক্স মিঞা, জমাদার শিবশরণ তেওয়ারি ও দুইজন কনেষ্টবলকে সঙ্গে লইয়া সরে-জামিনে তদন্তে চলিলেন, এবং রামধনের দোকানে উপস্থিত হইয়া প্রথমেই তাঁহাকে বাঁধিবার হুকুম দিলেন।

তাহার পর রামধনের দোকান ও গোলা খানাতল্লাসী করিয়া পূর্ব্ববর্ণিত কোদালখানি পাওয়া গেল, তখনও তাহাতে কাদা লাগিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন যে গোলার নীচে হলধর ভুলোর মৃতদেহ চটে জড়াইয়া গুঁজিয়া রাখিয়াছিল, সেইখানে রক্তের দাগ দেখা গেল।

হত্যাপরাধ প্রতিপন্ন করিবার পক্ষে কর্ত্তব্যপরায়ণ মিঞা সাহেবের নিকট এই প্রমাণই যথেষ্ট রামধন পোদ্দার বুঝিল, আর তাহার নিষ্কৃতি নাই, সে দারোগা সাহেবের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া পূর্ব্বের সকল কথা সবিস্তারে বলিল।

দারোগা সাহেব প্রথমে তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন না, কিন্তু রামধন যখন তাঁহার বিশ্বাসের মূল্য স্বরূপ দুইশত টাকার একটা তোড়া তাঁহার সম্মুখে রাখিল, তখন রূপচাঁদের মোহিনী শক্তিতে রামধনের কোন কথা অবিশ্বাস্য মনে হইল না।

অতঃপর দারোগা সাহেব রামধনকে সঙ্গে লইয়া সদলবলে হলধরের বাড়ী

খেয়াও করিলেন। অল্প অনুসন্ধানেই একটা হাঁড়ির ভিতর হইতে ভূলোর গহনা গুলি বাহির হইয়া পড়িল। হলধর নেশার ঝোঁকে তাহার শেষ সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারে নাই. রামধনকে ফৌজদারীতে ফেলিতে হইলে গহনাগুলি যে তাহার ঘরে রাখিয়া আসা আবশ্যক, এ কথা জানিলেও মদের ঝোঁকে সে দিকে তাহার খেয়াল ছিল না। গহনাগুলি হাঁড়ির ভিতর হইতে বাহির হইলে দারোগার ইঙ্গিতে কনেষ্টবলেরা তাহার উভয় হস্ত দৃঢ়রূপে রজ্জু বদ্ধ করিল. জমাদার শিবশরণ তাহার গালে বিরাশি শিক্কা ওজনের এক চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "এখন বল বেটা সত্য কথা।"

সেই নিদারুণ চপেটাঘাতে হলধরের নেশা কাটিয়া গেল. তাহার হৃদয়ে অনুতাপের অনল জ্বলিয়া উঠিল। প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া নেশার ঝোঁকে সে কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে তাহা মনে পড়ায় তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল; সে আর কোন কথা লুকাইল না; যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সকল কথা দারোগা সাহেবের গোচর করিল; দীঘির ধারে গিয়া পুত্রের মৃত দেহ পুলিশকে দেখাইয়া দিল।

অতঃপর মহকুমার ফৌজদারী আদালত হইতে হলধর দাওরা সোপর্দ্দ হইল। জজ সাহেব জুরীগণের সহিত একমত হইয়া তাহাকে অপরাধী স্থির করিলেন, এবং সেই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের জন্য তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন।

বিচারের শেষ পর্য্যন্ত হলধর সম্পূর্ণ অচঞ্চল ছিল; জজ সাহেবের রায় শ্রবণ মাত্র সে উন্মাদের মত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; জজ সাহেবকে করযোড়ে বলিল, "ধর্ম্মাবতার ঠিক বিচার করেছেন, আমাকে তাড়াতাড়ি ভূলোর কাছে পাঠিয়ে দেন হুজুর, আমার আর সহ্য হচ্চে না, আমি মরে বাঁচি।"—যথাসময়ে তাহার প্রাণদণ্ড হইল।

হে বোতলবাসিনী, তরল-গরল-স্বরূপিণী শুভ্রদেহধারিণী, অমিতশক্তিশালিনী সুরেশ্বরী, তোমাকে নমস্কার! তোমার অনুগ্রহে পৃথিবীতে এমন কাণ্ড নিত্য ঘটিতেছে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ধর্ম্ম

মানুষের দুইটা দিক আছে—একটা বড়র দিক, একটা ছোটর দিক। দুইয়ের মধ্যে একটা ছেদও আছে, অথচ যোগও আছে। এই ছেদটাকেও রাখিতে হইবে, অথচ যোগটাকেও বাড়াইতে হইবে। অর্থাৎ, ছোট থাকিয়াও তাহাকে বড় হইতে হইবে। ইহারই মীমাংসা করা মানবজীবনের সর্ব্বপ্রধান চেষ্টা, এবং তাহার সকল চেষ্টার মূল। ছোটটাও সত্য, বড়টাও সত্য—কোনটাই স্বপ্ন বা মায়া নহে। দুইয়ের মধ্যে কিরূপে সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে, দেখা যাক

প্রথমতঃ আমাদের শরীরটার কথা লইয়াই দেখি। এটি একটি ছোট পদার্থ, ইহার বাহিরে একটি বড় পদার্থ আছে—তাহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। কিন্তু এই শরীর এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পৃথক পদার্থ নয়। কারণ শরীরটা আপনার মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ নয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিলে শরীরের কোন অর্থ বা উদ্দেশ্য নাই। শরীরের যাহা-কিছু চেষ্টা, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত সংযুক্ত। জন্মের পর হইতে আমরা সকল ইন্দ্রিয় দিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত মিশিতে চেষ্টা করিতেছি। এই যে মিলনের চেষ্টা ইহাই শরীরের সাধনা; সুতরাং ছোট শরীরের সহিত বড় ব্রহ্মাণ্ডের একটা সংযোগের চেষ্টা আছেই—ইহা প্রয়োজনের চেষ্টা ত বটেই—কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটা জিনিস আছে—তাহা পূর্ণতার আনন্দ। চক্ষুর সার্থকতা আলোকেই, কর্ণের সার্থকতা শব্দের অনুভূতিতেই হয়, জননীক্রোড়স্থ শিশু, কথা কহিবার মধ্যে যে আনন্দের পূর্ণতা, সেই আনন্দেই কলস্বরে অবিরাম কথা কহিতে থাকে। এইরূপ করিয়াই বিশ্বশরীর আমাদের এই ছোট শরীরটিকে প্রতিনিয়ত আনন্দের টানে আপনার প্রতি টানিতেছে—যেখানে তাহার অপূর্ণতা, আপনার সহিত মিলাইয়া তাহাতে সে পূর্ণতা দিতে চাহিতেছে। সে আহ্বান সে নিমন্ত্রণ প্রয়োজনের নিমন্ত্রণ নহে, তাহা মিলনের—আনন্দের—নিমন্ত্রণ।

তারপর দেখা যাক্—মানুষের মনের দিক। নানা প্রকারের প্রবৃত্তি প্রবৃত্তি প্রতিনিয়তই সে মনকে বাহিরের দিকে টানিয়া আনিতেছে। সকল মানুষের মন বলিয়া যে একটি বৃহৎ মনোলোক আছে তাহারই সহিত তাহাকে মিলাইবে, এই তাহাদের চেষ্টা—নহিলে স্নেহ প্রেম দয়া, ক্রোধ দ্বেষ লোভ কিছুতেই কোনো অর্থ থাকে না। সেইজন্য যুগে যুগে মানব কত রকমের রাষ্ট্রতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, পরিবারতন্ত্র গড়িতেছে, ভাঙিতেছে—কত বিপ্লব, কত রক্তপাতের মধ্য দিয়া তাহাকে এই বৃহৎ মনঃশরীরের সহিতে মিশিতে চেষ্টা করিতে হইয়াছে, হইতেছে। কারণ যেখানে এই বড় মনের সহিত তাহার মিল নাই, সেখানে সে অপূর্ণ, দীন; সে নেই তাহার দুর্গতি। তবুও এই যে পরিবার প্রতিবেশী দেশ এবং বিশ্বমানবসমাজের প্রতি স্তরে স্তরে মানবের আপন চিত্তবিস্তারের চেষ্টা—ইহা শুধু প্রয়োজনের চেষ্টা নহে; এখানেও ছোট মনের প্রতি বড় মনের অবিরাম আহ্বান রহিয়াছে। এই যে বড়র আহ্বানে বিচিত্রের মধ্যে শরীরের ও মনের নিয়ত বিস্তার—ইহার কি কোথাও শেষ নাই? কথাটা বুঝিয়া দেখিতে হইবে।

আমাদের এই যে ব্যাপ্তি, ইহা সমাস্থানের মধ্যেই, বা সমস্থান হইতেই ব্যাপ্তি। যাহা পাইবার তাহা আমরা যেন পাইয়া বসিয়া আছি,—অথচ প্রতিদিনই যেন শুধু সেই পাওয়ারই বিচিত্র পরিচয় চলিতেছে। আমরা অন্তর্গীন পথের মাঝে নাই, ঘরেই আছি। কিন্তু সে ঘর এমন বিচিত্র যে তাহার শেষ খোঁজাও পাই না, প্রতিদিনই তাহার অনন্ত বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইতেছি।

ইহার মধ্যেই সমাপ্তি এবং ব্যাপ্তি পাশাপাশি সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে গাছ, গাছ হইতে ফুল, ফুল হইতে ফল। প্রতি স্তরই আমাদিগকে আনন্দ দেয়; প্রতি স্তরই পূর্ণতার ছায়া। তাই বলিতেছিলাম ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমরা পরিসমাপ্তির স্বাদ পাই। তাই ব্যাপ্তি আনন্দময়। মানব-জীবনেও একদিকে তাহার বিচিত্র শক্তি বাহিরের বিচিত্রের দিকে ব্যাপ্ত হইতেছে, আর এক দিকে তাহার আপনার আনন্দ ভিতরের একের দিকে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

মানুষ কিসে বাঁচে? বাহিরের দিক হইতে হইলে বলিব নিশ্বাস প্রশ্বাসে, রক্ত-চলাচলে, পঞ্চভৌতিক কার্য্যপরম্পরায়। ভিতরের দিক হইতে হইলে বলিব—প্রাণের আনন্দে। বাঁচিয়া থাকিব এই যে আনন্দময় ইচ্ছা ইহাতেই আমরা নিশ্বাস প্রশ্বাস লই, খাই, শরীরের উৎকর্ষ সাধন করি; ইহাতেই আমাদের সমস্ত শক্তি সচেষ্ট হইয়া বিশ্বময় ছুটিতেছে। প্রাণের এই শক্তি, প্রাণের ব্যাপ্তির দিক; প্রাণের এই আনন্দ, প্রাণের সমাপ্তি বা একের দিক।

যেমন গানের তান। তাহা যে শুধু অন্তহীন নিয়ম-শৃঙ্খলকে অবলম্বন করিয়া প্রসারিত হয়, তাহা নহে; তাহাদের মূলে এক প্রধান জিনিস আছে—তাহা আনন্দ। যে গায়ক আপনার মধ্যে এই গানের মূল আনন্দে গিয়া পৌঁছিয়াছে—সে গানের সমাপ্তিতে পৌঁছিয়াছে। এই অন্তর্নিহিত আনন্দলোকটি আবিষ্কার করিতে পারিলেই কবির কাব্য, কর্ম্মীর কর্ম্ম স্বাভাবিক হয়—কবি বা কর্ম্মী তখন মুক্তিলাভ করেন। তাঁহাদের কাব্যে বা কর্ম্মে তখন আর বাহিরের ভাবনা থাকে না, তাহা নিজেদেরই প্রেরণা।

তবে, কথা আছে। আমরা অনেক সময় যাহাকে স্বাভাবিক ভাবি তাহাতে হয়ত বাস্তবিকই বাহিরের কোনো প্রবৃত্তির টান থাকে, কিম্বা অপরের নকল করি। কিন্তু এ যে বাহিরের টানে প্রবৃত্তির জোরে কাজ করা—ইহা জড়ের ধর্ম্ম। মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে অনেকে এইরূপ জড়ধর্ম্মাবলম্বী মানুষকে তাহারা ক্রীতদাসের মত খাটাইয়া লয়। কিন্তু মানুষ ত সম্পূর্ণ জড় নয়। তাই সে জড়ের মতন নির্ব্বিচারে হুকুম তামিল করিতে চায় না। তাই সে আপত্তি করে, তাই সে কাঁদিয়া বলে—

তারা কোন্ অপরাধে দীর্ঘ মেয়াদে
সংসার গারদে থাকি বল্।

সে অনুভব করে, প্রবৃত্তি-প্রেরণাই তাহাকে ভবের হাটে ছুড়িয়া দিয়া প্রতিদিনই পাক দিতেছে! তাই সে এ কয়েদ হইতে মুক্ত হইতে চাহে। সে জানে ইহাই তাহার চরম ধর্ম্ম নহে। সে জানে সে এক অসীম অনন্ত মুক্তিধনের অধিকারী, যাহা দেশকাল জরামৃত্যুর অতীত। আপনার সেই সত্য নিত্য পরিচয়টি লাভ করিবার জন্য তাহার চরম বেদনা সেই ভিতরকার আপনাকে, সেই মূলগত আপনাকে যতই লাভ করে ততই সে অমর হইয়া উঠে—কারণ প্রত্যেকের এই আপন পদার্থটি আনন্দময়। এই জন্যই শাস্ত্রে বলে—

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং" মানুষের সুখ তাহার আপনার মধ্যে, আর দুঃখ তাহার আপন হইতে ভ্রষ্টতায়।

কিন্তু এটা যেন কেহ না বোঝেন যে সুখ মানুষের স্বার্থসাধনের মধ্যে। মানুষ যখন যথার্থ আপনাকে পায় না, তখনই সে অর্থকেই চরম বলিয়া মানিয়া লয়, তখনই সে স্বার্থপর।—কিন্তু যে অর্থ তাহাকে কেবলই ঘুরাইয়া মারে কেবলই তাহাকে দুঃখ হইতে দুঃখে, অতৃপ্তি হইতে অতৃপ্তিতে লইয়া যায়—তাহাতে মানুষের সুখ নাই।

কিন্তু যখন আনন্দের আতিশয্যে মানুষ আপনার গভীরতম অন্তরের যথার্থ "আপনাকে" দেখিতে পায়, তখন বাহিরের সকল অর্থ তাহার নিকট তুচ্ছ হইয়া পড়ে—সে আপনার মধ্যে যে বড় জিনিষটিকে পায়, তাহার নিকট বাহিরের সকল অর্থই মূল্যহীন, তাই কৃপণও সে সময়ে ব্যয় করে, বিলাসী দুঃখ স্বীকার করে, ভীরুও প্রাণ বিসর্জ্জনে কুণ্ঠিত হয় না। তাহা সকল জিনিসের অপেক্ষা বড়—কেননা 'আপনা'র মধ্যে তাহার শেষ, তাহার মধ্যেই মানুষ আপনার সত্য পরিচয় দেখিতে পায়। এই যে মানুষ মনে মনে 'আপনাকে' দেখিতে পায়, ইহারই জন্য সে জড়ের মত নির্ব্বিকারে প্রবৃত্তি-প্রেরণায় খাটিতে চায় না। ইহারই জন্য সংসার তাহার নিকট গারদ। কারণ সে জানিতে পায় যে, সে জন্মদাস নহে—সে প্রভুত্বের স্বাধীন সম্পদের অধিকারী। প্রবৃত্তির প্রেরণা তাহার অভাবটাই শুধু জাগাইয়া তুলে; তাই সে মুক্তি চায়; প্রবৃত্তির প্রভুত্ব হইতে, বাসনা কামনা হইতে, সে মুক্ত হইতে চায়।

যখন সে মুক্তি আসে—যখন সে আপনার মধ্যে আপনাকে পায়, তখন আর তাহার কোনো নালিশ থাকে না। সে মুক্তি কিন্তু তাহার কর্ম্ম হইতে মুক্তি নহে—বরঞ্চ কর্ম্ম তখন আরো বাড়িয়া যায়।—কিন্তু সে কর্ম্ম তখন আনন্দময়—কর্ম্মই তখন আনন্দের মাপকাঠি হয়। দুঃখেই তখন সুখের গভীরতার পরিমাপ হয়। সেই যথার্থ আপনার সহিত তখন যাহাই যুক্ত করিয়া দেখি তাহাই সুন্দর তাহাই আনন্দময়; যাহা তাহার সহিত বিচ্ছিন্ন, তাহাই দুঃখদায়ক। তাই যতদিন না আপনাকে পাই, যতদিন শুধু প্রবৃত্তির তাড়নায় কর্ম্ম করিয়া বেড়াই, ততদিনই সংসার—গারদ। কিন্তু যখন আপনাকে লাভ করিয়া সংসারকে তাহার সহিত যুক্ত করিয়া দেখি, তখন বিচ্ছিন্নতার সকল ভার 'একে'র সহিত মিলিয়া সহজ হইয়া যায়, তাই তখন সংসার অমৃত ধাম।

এতক্ষণ আমরা শরীর ও মনের কথা লইয়া ছিলাম।—এখন দেখিতে হইবে—মানুষের যখন একের দিক, সমাপ্তির দিক, সেখানেও আমাদের সমস্যাটি আছে কি না।

সেখানেও সেই সমস্যা। সেখানেও মানুষের ছোট আপন বড় আপনের সঙ্গে মিলিতে চাহিতেছে। যখনি মানুষ আপনার আনন্দ পায় তখনি সে বড় আনন্দকে দেখিতে পায়। সেই বড় আত্মাকে দেখাই আত্মার স্বভাব।—সেই

বড় আনন্দকে জানাই আত্মানন্দের সহজ প্রকৃতি।—ইহার জন্য যে চেষ্টা তাহারই নাম ধর্ম্ম। মানুষের সকল কাজ সকল সৃষ্টির মধ্যে ইহারই বিকাশ। ইহা, মানুষের যাহা কিছু সবারই মূলগত। যুগযুগান্তের মূঢ় মহামারী ক্ষয় বিপ্লবের মধ্যেও ইহা লোপ পায় না। কারণ ইহা যে মানুষের স্বভাব।—ইহা না থাকিলে মানুষের নিত্যকার প্রয়োজন-সামগ্রীর কোন অভাব পড়ে না। তবু মানুষ তাহাকে ছাড়িতে পারে নাই। তাপধর্ম্ম অগ্নির স্বভাব, তাই প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে, সে জ্বলিতে চায়। প্রজ্বলিত, ধূমায়িত বা ভস্মাচ্ছন্ন সকল অবস্থাতেই সে আপনার স্বভাবকে পূর্ণ করিতে চায়—কারণ তাহাই ধর্ম্ম। মানুষেরও তাহার আপনাকে পরম আপনের মধ্যে চাওয়াই পরম ধর্ম্ম। তর্কে ইহাকে অস্বীকার করিতে পারি, মূলে কিন্তু পারি না। তাই শাস্ত্রে বলে—"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।" প্রতিদিনই মানুষের কোন না কোন প্রয়োজন মিটিতেছে। কিন্তু তাহার স্বভাবের চরম চেষ্টা রহিয়াছেই।

শিশু যখন চলিতে শেখে, তখন কতবার সে পড়ে তবু স্বভাব তাহার প্রকৃতির আকর্ষণকে কাটাইয়া বরাবর উঠিতে চাহে। ধর্ম্মও আমাদের সেই স্বভাব। যতই তাহাকে অস্বীকার করি, ততই সে বুঝাইতে চাহে—'আমি আছি।' সে বলে—স্থিতিকে পাইতেই হইবে, তাহা হইলে গতি আপনি আসিবে। আপনাকে পাও তাহা হইলে সকলের মূল পাইবে। জীবন তখন প্রাকৃতিক হইবে না, স্বাভাবিক হইবে। তখন স্বভাব প্রতিষ্ঠিত, তোমার কাছে প্রকৃতি অনুগত হইবে তখনি ধর্ম্ম সার্থক হইবে, জীবন চরিতার্থ হইবে।

এই চরিতার্থতার সহিত যাহা বিচ্ছিন্ন তাহাই মৃত্যু, তাহাতেই মানুষের দুঃখ। তাহাই অনুভব করিয়া অন্তরতম অন্তর হইতে এই ক্ষোভ উঠে—'যেনাহং নামৃতা-স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্।'

তাই, জীবনের কার্য্য ও বিশ্বের ব্যাপ্তির মধ্যে একটি পরমার্থকে দেখিতেই হইবে। নহিলে সমস্তই অর্থহীন—কেবল দুঃখের আকর। কর্ম্মের পর কর্ম্ম, ব্যাপ্তির পর ব্যাপ্তি, শুধুই পীড়া দেয়, শুধুই অবসাদ আনে। কিন্তু যেখানে তাহার সহিত এক সুগভীর পরিসমাপ্তির যোগ, সেইখানেই তাহা চির অমৃতের উৎস হইয়া দাঁড়ায়।

যে এক অখণ্ড পরিপূর্ণ আনন্দ হইতে বিশ্বজগৎ নব নব তাহার মত আকাশ হইতে আকাশে বিস্তীর্ণ হইতেছে, নানা দেশে নানা কালে নানা ইতিহাসে মানুষ তাঁহারই রাগিণী শিখিতেছে। ধর্ম্মের সঙ্গীতশালায় পিতা পুত্রকে সেই গান শিখাইতেছেন, পরমাত্মা হইতে আত্মায় সেই সুর সঞ্চারিত হইতেছে। অনেকের সেখানে তান কাটিতে পারে, তার ছিঁড়িতে পারে, সুর না মিলিতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য সকলেরই এক। সকলকেই সেখানে, সেই আনন্দলোকে, যন্ত্রে যন্ত্রে কণ্ঠে কণ্ঠে, হৃদয়ে হৃদয়ে, মিলিয়া গিয়া গুরুর সঙ্গে শিষ্যের যোগের সার্থকতা পরিপূর্ণ করিতে হইবে।

---

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মত "আত্মোৎসব" উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম।

তপন-দীঘি

(বরেন্দ্র-ভ্রমণ)

এবার নববর্ষারম্ভে এক সঙ্গে একটু অধিক ছুটি পাইবার সম্ভাবনা থাকায়, সেই সুযোগে একটি দুরধিগম্য নিভৃত অঞ্চল পরিদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে, অনুসন্ধান-সমিতি বহুপূর্ব্ব হইতে তাহার আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সমাচার অবগত হইয়া, মাননীয় দিনাজপুরাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুর যান-বাহনের ব্যবস্থা করায়, এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত করুণাময় করুণা বাবু পথ-প্রদর্শকের কার্য্যভার গ্রহণে সম্মত হইয়া পুনঃ পুনঃ আমন্ত্রণ করায়, সদস্যগণের পক্ষে "অনুকূল শুভহস্তের" অভাব ছিল না। কিন্তু সকল ব্যবস্থা স্থির হইবার পর, ঠিক সেই সময়ে ময়মনসিংহে সাহিত্য-সম্মিলনের বৈঠক বসিবার ব্যবস্থা হইলে, তাহার প্রবল প্রলোভন অতিক্রম করিয়া কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া, অনুসন্ধান-সমিতিকে বিলক্ষণ গঞ্জনা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

তখন বরেন্দ্রের বক্ষের ভূমি প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে সমধিক প্রতপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। রজনীযোগে গোযানে আরোহণ করিয়া, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন, এবং দিবাভাগে গজারোহণে, কখন বা পদব্রজে, এক একটি স্থানের জনসমাগমযুক্ত ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। পরিশ্রান্ত সদস্যগণের যথাসম্ভব বিশ্রামলাভের জন্য স্থানে স্থানে অনেকগুলি আশ্রয়-নিকেতন স্থিরীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু সকল দিন তাহাতে আশ্রয়-গ্রহণের সুযোগ ঘটিয়া উঠিত না;—কখন কখন প্রখর মধ্যাহ্নকালও ছায়াশূন্য উন্মুক্ত প্রান্তরমধ্যেই অতিবাহিত করিতে হইত।

এক দিন মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই মার্ত্তণ্ড-তাপ প্রখর হইয়া উঠিল;—হস্তিগুলি তাহার তেজঃ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া, আর অগ্রসর হইতে সম্মত হইল না। অগত্যা উপযুক্ত আশ্রয়-স্থানে উপনীত হইতে না পারিয়া, সদস্যগণকে একটি সরোবর-তীরে বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করিয়া, পত্রপুটে নদির সহিত মুড়কী সংযুক্ত করিয়া, মধ্যাহ্ন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইল। কিন্তু সে দিন তাহা এত উপাদেয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল যে তাহার কথা চিরদিন স্মৃতিপটে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। সে দিন সদস্যগণ বাঙ্গলার এক চিরপুরাতন পুণ্যতীর্থে উপনীত হইয়াছিলেন; এবং তীর্থযাত্রীর মতই তাহার মাহাত্ম্য অনুভব করিয়া, ভ্রমণ-ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন।

তাঁহারা যে সরোবর-তীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বরেন্দ্রভূমির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুবৃহৎ;—উত্তরদক্ষিণে এক মাইল দীর্ঘ,—বাঙ্গালীর পুরাকীর্ত্তির উল্লেখযোগ্য নিদর্শন, তাহার স্বচ্ছসলিল এখনও একখানি বিরাট দর্পণের ন্যায় নভস্তলকে প্রতিবিম্বিত করিয়া, ভূলোকে দ্যুলোক-শোভা উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহার তীরে উপবেশন

করিলে, সৌন্দর্য্য-গাম্ভীর্য্যে হৃদয়-মন পরিপূর্ণ হইয়া যায়;—পুরাকীর্ত্তির প্রকৃত মাহাত্ম্য মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভূত হইতে থাকে।

এই সরোবরের নাম এখন জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। কেহ ইহাকে "তপন-দীঘি," কেহ বা "তর্পণ-দীঘি" নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছেন। ইহা দিনাজপুর জেলার সুবিখ্যাত বাণগড়ের ধ্বংসাবশেষের উপকণ্ঠে, ছয় সাত মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। সেকালে ইহার নাম কি ছিল, তাহা অবগত হইবার উপায় নাই। লোকে বলে,—বাণ রাজা তর্পণ করিবার জন্য এই সরোবর খনিত করাইয়াছিলেন বলিয়া, ইহার নাম "তর্পণ-দীঘি।" ইহার এক তীরে একটি সম্পন্ন গ্রাম অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে,—তাহার নাম "তর্পণ" নহে, "তপন।" নিকটবর্ত্তী নিরক্ষর লোকে তাহাকে "তর্পণ"ও বলে না, "তপন"ও বলে না;—তাহারা বলে "ত ব ন।" ইহার মধ্যে কোনরূপ ঐতিহাসিক রহস্য নিহিত আছে কি না, তাহার আলোচনা আরম্ভ হয় নাই। নিকটবর্ত্তী স্থানের নামানুসারেই সরোবরের নাম প্রচলিত হইয়াছে; সরোবরের নিজের কোনরূপ নাম থাকিলেও, তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। "ত প ন" বা "ত ব ন" নামক স্থানের দীঘি বলিয়াই, ইহার নাম "তপন-দীঘি" হইয়া থাকিবে। জনসমাজ তাহার সহিত বাণ রাজার তর্পণ-ক্রিয়ার সম্পর্ক কল্পনা করিয়া লইয়া, তাহাকেই হয় ত "তর্পণ-দীঘি" নামের ঐতিহাসিক কারণ বলিয়া ব্যক্ত করিতেছে।

সরোবরটি পুরাতন হইলেও, অতি পুরাতন বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে পারে না। চারিদিকে যে পাহাড়ী আছে, সরোবর-খননকালে উত্তোলিত মৃত্তিকারাশি স্তূপীকৃত করিয়া, তাহাকে সুরক্ষিত করা হইয়াছিল, মৃত্তিকাস্তূপ এখনও সমুচ্চ প্রাকারের ন্যায় বর্ত্তমান আছে; বহুপুরাতন হইলে, তাহা সমভূমির সহিত মিশিয়া যাইত; সরোবরের জলও গভীরতা হারাইয়া, শৈবাল-শাদ্বলে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত। তীরের নিকটে কিয়দ্দূর কেবল জলজ তৃণ জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে; মধ্যস্থলের গভীর জল এখনও স্বচ্ছ এবং নিরাবিল! বাণগড় পুনর্ভবা-নদীর তীরে অবস্থিত ছিল; সুতরাং বাণ রাজার পক্ষে তর্পণের জন্য গড় হইতে তিন ক্রোশ দূরে, সরোবর খনিত করাইবার প্রয়োজন ছিল না। এই সকল তর্ক বিতর্ক পূর্ব্ব হইতেই অনুসন্ধান-সমিতির সদস্যগণকে সতর্ক করিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং নিরক্ষর লোকে নিকটস্থ স্থানকে কিরূপ নামে অভিহিত করিতেছে, তাহার অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল; এবং তাহারা যে "তর্পণ" বা "তপন" না বলিয়া, "তবন" বলিয়া থাকে, তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। *

* শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে মেজর রেণেল, স্বকৃত মানচিত্রে এই স্থানকে ত ব্ ব ন [Tubbone] বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে বুকানন হামিলটন ইহাকে তপন সাগর উল্লিখিত করায়, সেই নাম প্রচলিত হয়। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় তাহাই ত র্প ণ রূপে কথিত হইয়াছে। কিন্তু ত ব ন-নাম এখনও নিরক্ষর কৃষকগণ বিস্মৃত হইতে পারে নাই। সুতরাং এ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। বুকানন তর্পণ-বিষয়ক জনশ্রুতির উল্লেখ করেন নাই; তিনি ইহাকে বাণ রাজার তপস্যার স্থান বলিয়াই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

বাণগড়ের নাম সংস্কৃতসাহিত্যেও অপরিচিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। হেমচন্দ্রের কোষে শোণিতপুর, দেবীকোট এবং উমাবন বলিয়া তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুনর্ভবা-তীরে বাণগড়, তাহার পার্শ্বেই দেবীকোট. নানা ধ্বংসাবশেষ বক্ষে ধারণ করিয়া, অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার এই দেবীকোটে সেনা-নিবাস [দম্‌দমা] সংস্থাপিত করিয়া, এখানেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন! তাহার নিদর্শন-স্বরূপ ধ্বংসাবশিষ্ট দরগাদির চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। কেবল উমাবনেরই কোনও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এক সময়ে তাহারও কীর্ত্তিচিহ্নের অভাব ছিল না। দিনাজপুর-রাজবংশের মহারাজ রামনাথ ভূগর্ভ হইতে প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দিরাদির নানা প্রকার স্তম্ভ ও দ্বার আপন রাজবাটীতে লইয়া গিয়াছিলেন ; তাঁহার কর্ম্মচারী জীবনারায়ণও একটি অনিন্দ্যসুন্দর দেবীমূর্ত্তি রাজসাহীর অন্তর্গত নামকাণে (নিজ বাটীতে) লইয়া গিয়াছিলেন। তথাপি এখনও স্থানে স্থানে অনেক প্রাসাদ-শিলা পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার অনুসন্ধান-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া, সদস্যগণ সরোবরের পশ্চিমতীরে,—অনেক দূর পর্য্যন্ত,—দেব-মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। এক স্থানে তাঁহারা ভূগর্ভ খনন করিতে গিয়া, একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত বিরাট-মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ বাহির করিয়া ফেলিয়াছেন ;—তাহা এত বৃহৎ যে স্থানচ্যুত করিতে অশক্ত হইয়া, সদস্য-গণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। মূর্ত্তিটি বটুকভৈরবের বিরাট মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ বলিয়াই অনুমিত হইয়াছে। * এই সকল কারণে মনে হয়,—উমাবনের নাম তপোবন বলিয়া কথিত হইয়া, তাহাই কালে "তবন" নামে কথিত হইয়া থাকিতে পারে, এবং লোকে তাহাকেই ক্রমে "তপন" ও "তর্পণ" করিয়া লইয়াছে। ইহা অনুমান মাত্র ;—কিন্তু এখানকার স্তূপগুলি যথাযোগ্য ভাবে পরীক্ষিত হইলে, কালক্রমে হয় ত এই স্থানটিকে "উমাবন" বলিয়াই স্থিরীকৃত করিতে পারিবে।

যাহা হউক, এই অঞ্চলটি যে এক সময়ে বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী ছিল, এবং সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে এখানেই যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক প্রস্তর-নির্ম্মিত সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং তন্মধ্যে বরেন্দ্র-শিল্পিসোষ্ঠবচূড়ামণিগণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিল্প-চাতুর্য্যের পরিচয় সুব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এখনও তাহার নানা নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে। পুনর্ভবা-তীর হইতে এই সরোবর পর্য্যন্ত—প্রায় আট দশ মাইল পরিধি-মধ্যস্থ—এই দুরধিগম্য নিভৃত অঞ্চলটি বাঙ্গলার ইতিহাসের নানা উপাদান সম্প্রদান করিয়াছে। বাণগড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রথম মহীপালদেবের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে ; মনহলী-গ্রামের একটি পুষ্করিণী হইতে মদনপালদেবের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে ; এবং এই সুবৃহৎ সরোবরের নিকটে লক্ষ্মণসেনদেবের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত

* বঙ্গভূমিতে এ পর্য্যন্ত এত বড় প্রস্তরমূর্ত্তি অধিক দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ইহা সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে সংস্থাপিত হইবার যোগ্য।

হইয়াছে। * এতদ্ভিন্ন প্রাচীন-লিপির আবিষ্কার-ক্ষেত্র,—এত পুরাকীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ-পূর্ণ পুরাতন দুর্গের এবং দেবস্থানের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র,—এরূপ সুবৃহৎ সরোবরের পক্ষে যথাযোগ্য গৌরবক্ষেত্র বলিয়াই কথিত হইতে পারে। সুতরাং সদস্যগণ সরোবর-তীরে উপনীত হইয়া, সকল ক্লেশই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন।

এই সরোবরের উত্তরে একটি ক্ষুদ্র সরোবর বর্ত্তমান আছে। ১৮৭৩—৭৪ খৃষ্টাব্দের অন্নকষ্টের সময়ে, তাহার পঙ্কোদ্ধার কার্য্য আরব্ধ হইয়াছিল। তদুপলক্ষেই লক্ষ্মণসেনদেবের তাম্রশাসনখানি আবিষ্কৃত হয়। তপন-দীঘির নিকটে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া, তাহা "তপন-দীঘিলিপি" নামে পরিচিত হইয়া, এই সরোবরের নামকেও জগদ্বিখ্যাত করিয়া দিয়াছে।

তাম্রশাসনখানি আবিষ্কৃত হইবার পর, পরলোকগত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী চূড়ামণি মহাশয়ের সাহায্যে, তাহার পাঠোদ্ধার সাধিত করিয়া, দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্টমেকট্ সাহেব একটি পাঠ ও ইংরাজী অনুবাদ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। † তাম্রশাসন-খানি স্যর উইলিয়ম জোন্সের বিবরণের সম্পত্তিরূপে তাঁহার বিলাতের বাসস্থলীতে রক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র এই তাম্রশাসনখানি বিক্রয়ার্থ কলিকাতায় আনয়ন করিলে, বঙ্গসাহিত্য-সুহৃৎ পুণ্যশ্লোক শ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর তাহা ক্রয় করিয়া, রক্ষণাবেক্ষণার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হস্তে ন্যস্ত করিয়া, বাঙ্গালীর মুখ রক্ষা করিয়াছেন। *

এই তাম্রশাসনের দ্বিতীয় শ্লোকে, এবং গদ্যাংশের দুই এক স্থলে, প্রকৃত পাঠোদ্ধারে ত্রুটি ঘটিয়া থাকিলেও, অন্যান্য স্থলে চূড়ামণি মহাশয়ের এবং ওয়েষ্টমেকট্ সাহেবের যত্ন সফল হইয়াছিল বলিয়াই প্রশংসিত হইতে পারে। কিন্তু তাম্রশাসনখানি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হস্তগত হইবার পর, "এ পর্য্যন্ত যথারীতি প্রতিলিপি-সম্বলিত কোনও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই" বলিয়া, সেই অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ উদ্যম করিয়াছিলেন। ওয়েষ্টমেকট্-প্রকাশিত পাঠে যে সকল স্থলে ত্রুটি ছিল, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যমে তাহা সংশোধিত হয় নাই;—বরং পরিষৎ-পত্রিকায় যে পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে বহুসংখ্যক ভ্রম-প্রমাদ প্রবেশ লাভ করিয়াছে! †

* কাব্যোল্লাসের গৌড়পতির কুঞ্জরঘটাবর্ষে ইন্দুমৌলির প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবার কথা একটি শ্লোকে এক অন্তরালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল; তাহাও এই প্রদেশেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মুসলমান শাসনের প্রথম আমলের প্রস্তরলিপিও এই অঞ্চলেই দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে এখনও নূতন নূতন শিলালিপি আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা আছে। অনুসন্ধান-সমিতি তাহার পরিচয় লাভ করিয়াছেন।

(J. A. S. B. V. XLIV.)

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সপ্তদশ ভাগ ১৩৫ পৃষ্ঠা।

† "মুদ্রাকর-প্রেত" বঙ্গসাহিত্যেও, যথেষ্ট দৌরাত্ম্য করিয়া থাকে। সুতরাং তাহার অত্যাচারেও, পরিষৎ-পত্রিকার প্রকাশিত পাঠে, অনেক বর্ণাশুদ্ধি প্রবেশ লাভ করিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত পরিষৎ হইতে শুদ্ধিপত্র প্রকাশিত হয় নাই। প্রাচীন লিপির বিশুদ্ধ পাঠ মুদ্রিত না হইলে যে নানা অনর্থ উপস্থিত হইতে পারে, তৎপ্রতি এখনও দৃষ্টি নিপতিত হয় নাই।

একটি বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হইলে, এই শাসন-লিপির মর্ম্ম বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত হইতে পারিত। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার জন্য উদ্যম করেন নাই। এই লিপির অক্ষরগুলি বঙ্গাক্ষর;—সুস্পষ্ট ভাবে সমুৎকীর্ণ, এবং অনায়াসেই পঠিত হইবার যোগ্য। কোন স্থলে অক্ষরলোপে পাঠোদ্ধারের অসুবিধা উপস্থিত হয় নাই। তথাপি পরিষৎ-পত্রিকায় ইহার মূলানুগত পাঠ উদ্ধৃত হইতে পারে নাই কেন, তাহা বিস্ময়ের বিষয় বলিয়াই প্রতিভাত হয়।

স্বকীয় বিজয়-রাজ্যের সপ্তম সংবৎসরের তৃতীয় ভাদ্র-দিনে [২৬ পংক্তি] শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত-জয়স্কন্ধাবার হইতে [২২-২৩ পংক্তি] মহারাজাধিরাজ শ্রীবল্লালসেন দেব-পাদানুধ্যানপরায়ণ পরমেশ্বর পরম-বৈষ্ণব পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণ-সেন দেব [২৩—২৪ পংক্তি] ঈশ্বর দেব-শর্ম্মাকে [৪৪ পংক্তি] শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী বরেন্দ্রমণ্ডলে এতদ্বারা ভূমিদান করিয়াছিলেন।

এই ভূমিদানের প্রয়োজন [৪৬ পংক্তিতে] উল্লিখিত আছে। তাহার সুসঙ্গত পাঠ উদ্ধৃত করিতে অসমর্থ হইয়া, ওয়েষ্টমেকট্ সাহেব যে পাঠ মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে

"হস্ত হেমাশ্চ মহাদানে দক্ষিণায়েন,"

এবং "হেমাশ্বরথ মহাদানাচার্য্য" বলিয়া গ্রহীতার পরিচয় উল্লিখিত আছে। পরিষৎ-পত্রিকায় তাহাই অবিকল পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে এবং লিখিত হইয়াছে,—গ্রহীতা [illegible] ভূষিত।" বলা বাহুল্য, লিপিপ্রমাদে প্রকৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা প্রকটিত হইতে পারে নাই। প্রকৃত পাঠ "হেমাশ্বরথ-মহাদান;"—লক্ষ্মণসেনদেব ঐ দানকর্ম্ম সুসম্পন্ন করিবার জন্য যাঁহাকে আচার্য্য-কর্ম্মে বরণ করিয়াছিলেন, আচার্য্য-দক্ষিণা প্রদান করিবার জন্য তাঁহাকেই ভূমিদান করিয়াছিলেন। সুতরাং "মহাদানাচার্য্য" কাহারও উপাধি ছিল না; সেরূপ অনুমানের অবতারণা করিবারও কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

সুবর্ণপদ্ম-দান "মহাদান" নামে পরিচিত ছিল। তাহা ষোড়শ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। তাহারই এক শ্রেণী "হেমাশ্বরথ" নামে কথিত হইত। যথা:—

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি মহাদানানুকীর্ত্তনং।

ইত্যভিধায়,—

আদ্যন্তু সর্ব্বদানানাং ১ তুলাপুরুষ-সংজ্ঞিতং।
২ হিরণ্যগর্ভদানঞ্চ ৩ ব্রহ্মাণ্ডং তদনন্তরম্॥
৪ কল্পপাদপ-দানঞ্চ ৫ গো-সহস্রঞ্চ পঞ্চমং।
৬ হিরণ্যকামধেনুশ্চ ৭ হিরণ্যাশ্ব স্তথৈব চ॥
৮ পঞ্চলাঙ্গলকং তদ্বৎ ৯ ধরাদান স্তথৈব চ।
১০ হিরণ্যাশ্বরথ স্তদ্বৎ ১১ হেমহস্তিরথ স্তথা॥
দ্বাদশং ১২ বিষ্ণুচক্রঞ্চ ততঃ ১৩ কল্পলতাত্মকং।
১৪ সপ্তসাগর দানঞ্চ ১৫ রত্নধেনু স্তথৈব চ॥
১৬ মহাভূত-ঘট স্তদ্বৎ ষোড়শঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

হেমাশ্বরথ-মহাদানের দক্ষিণা যৎসামান্য হইতে পারে না। যৎসামান্য হইলে, তাহার জন্য তাম্রশাসনের আড়ম্বর প্রকাশিত হইতে পারিত না। কিন্তু তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—"প্রদত্ত ভূমি হইতে বৎসরে পঞ্চাশৎ কপর্দ্দক করস্বরূপ রাজকোষে আসিত।" তাম্রশাসনে

বা ওয়েষ্টমেকট্ সাহেবের পাঠে, অথবা পরিষৎ-পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত পাঠে,—সকল স্থলেই—দেখিতে পাওয়া যায়,—

"সংবৎসরেণ
কপর্দক-পুরাণ সার্দ্ধ-শতৈকোৎপত্তিকো।"

তাহার অর্থ "পঞ্চাশ কড়া কড়ি" হইতে পারে না। "সার্দ্ধশত"-শব্দে দেড়শত বুঝায়, "পঞ্চাশৎ" বুঝাইতে পারে না। "পুরাণ" একটি পারিভাষিক শব্দ;—তাহা ষোড়শ পণের সমান, সেকালের রৌপ্যমুদ্রার সমকক্ষ। যথা,—

"তে ষোড়শ স্যাদ্ধরণং পুরাণশ্চৈব রাজতঃ।
কার্ষাপণস্তু বিজ্ঞেয় স্তাম্রিকঃ কার্ষিকঃ পণঃ॥"

ওয়েষ্টমেকট্ সাহেব মূলানুগত প্রকৃত পাঠ উদ্ধৃত করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় শ্লোক ভিন্ন, অন্যান্য শ্লোক যথাযথরূপেই উদ্ধৃত হইয়াছিল। দ্বিতীয় শ্লোকেও কেবল দুইটি যুক্তাক্ষরের পাঠোদ্ধারে ত্রুটি ঘটিয়াছিল। তাঁহার উদ্ধৃত পাঠ এইরূপ :—

আনন্দোঽম্বুনিধৌ চকোরনিকরে
দুষ্কচ্ছিদাত্যন্তিকী
কল্পারে হতমোহতা রতিপতা
বেকোঽহমেবেতি ধীঃ।
যস্যামী অমৃতাত্মনঃ সমুদয়স্ত্যাশু-
প্রকাশভ্রম-
ত্যাস্তে ধ্যানপরম্পরাপরিণতং জ্যোতি-
স্তদাত্মানুদে॥

চূড়ামণি মহাশয় চতুর্থ চরণের প্রথম দুইটি যুক্তাক্ষর "ত্যাস্তে" বলিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। পরিষৎ-পত্রিকায় চতুর্থ চরণটি ওয়েষ্টমেকটের উদ্ধৃত পাঠের অবিকল নকল; এবং প্রথম চরণের "দুষ্কাচ্ছিদা আত্যন্তিকী" পাঠ সম্পূর্ণ নূতন! সেকালে "দুঃখ"-শব্দ "দুষ্খ"-রূপে লিখিত হইত; তাম্রশাসনেও সেইরূপেই তাহা উৎকীর্ণ রহিয়াছে;—ওয়েষ্টমেকট্ যে "দুষ্ক"-পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহাতে আকার সংযুক্ত করিয়া যে "দুষ্কা"-পাঠ মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহা তাম্রফলকে দেখিতে পাওয়া যায় না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম চরণের যে নূতন পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও তাম্র শাসনে বর্ত্তমান নাই। তাহাতে ছন্দোভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণের নিয়মভঙ্গও সংঘটিত হইয়াছে। দুঃখচ্ছিৎ + আত্যন্তিকী এই দুইটি শব্দ সন্ধিসূত্রানুসারে তাম্রপট্টে "দুষ্খচ্ছিদাত্যন্তিকী"-রূপে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। তাহাকে পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত "দুষ্কাচ্ছিদা আত্যন্তিকী"-রূপে গ্রহণ করিবার উপায় নাই। চতুর্থ চরণের প্রথম দুইটি যুক্তাক্ষর "ত্যাস্তে" বা "ত্যাস্থে" নহে,—তাহা "ত্যাত্রে" এবং তৎপরবর্ত্তী "ধ্যান"-শব্দ "র্য্যান"-রূপে তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। চন্দ্র অত্রিমুনির "ধ্যানপরম্পরা-পরিণত জ্যোতিঃ" বলিয়া যে পৌরাণিক প্রসিদ্ধি আছে ইহা তাহারই পুনরুক্তি মাত্র। তাম্রপট্টে এই শ্লোকটি যথাযোগ্যরূপেই উৎকীর্ণ হইয়াছিল। যথা,—

"আনন্দোঽম্বুনিধৌ চকোরনিকরে
দুষ্খচ্ছিদাত্যন্তিকী
কল্পারে হতমোহতা রতিপতা
বেকোঽহমেবেতি ধীঃ।
যস্যামী অমৃতাত্মনঃ সমুদয়স্ত্যাশু-
প্রকাশা-ভ্রম

তত্ত্বে ধ্যানপরম্পরাপরিণতং জ্যোতি-
স্তদাত্মানুদে ॥"

লক্ষ্মণসেনদেবের আরও দুইখানি তাম্র-শাসনে এই শ্লোক উৎকীর্ণ আছে। তন্মধ্যে, আনুলিয়ায় প্রাপ্ত তাম্রশাসনখানির [বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক উদ্ধৃত] পাঠ ১৯০০ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রিকায় বিশুদ্ধ ভাবেই মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া, পরিষৎ-পত্রিকায় [দশ বৎসর পরে] অন্যরূপ পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে কেন, তাহা বোধগম্য হয় না।

তপন-দীঘির তাম্রশাসনের প্রথম সাত শ্লোক আনুলিয়ার তাম্রশাসনেও উৎকীর্ণ আছে। কেবল অষ্টম শ্লোকটি তপন-দীঘির তাম্রশাসনের নূতন শ্লোক। তাহার প্রকৃত পাঠ ওয়েষ্টমেকট্ সাহেবের নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল। কিন্তু পরিষৎ পত্রিকায় তাহাও বিকৃতরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। যথা,—

"নৃপত্বদ্ভয়াদ্বিমুক্তবিষয়া তন্মাত্রনিষ্ঠীকৃত—
স্বাত্মা যাস্ত কথঞ্চনাম রিপব স্তস্ত-প্রয়োগাস্পদম্।
বৈরাস্যপ্রতিবিম্বিতেপি নিয়তত্বত্রেপি চক্ষুস্তৃণে
প্যাদ্বৈতেন যতস্ততোঽপি স পরোদেবঃ পরং
বীক্ষ্যতে ॥"

ইহার অর্থবোধ করিবার উপায় নাই! সেকালের লেখায় য-কার এবং প-কার দেখিতে প্রায় একরূপ ছিল; সুতরাং অর্থ-সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই, তাহার পাঠোদ্ধার করিতে হইত। তয়ের-নীচে-ব, এবং তয়ের-নীচে-প, দেখিতে প্রায় একরূপ। সুতরাং যাহা পরিষৎ-পত্রিকায় নি ষ ত ত্ব ত্রে পি বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত পাঠ, —নি প ত ত্ব প ত্রে পি, এবং যাহা চ ক্ষু স্তৃ ণে বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত পা , —চ ক্ষু স্তৃ ণে। পরিষৎ পত্রিকায় মুদ্রিত "নিষ্ঠীকৃত" শব্দ যে তাম্রফলকে নিষ্ঠীকৃত রূপেই উৎকীর্ণ রহিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। শ্লোকটি রচনা-কৌশলে উল্লেখযোগ্য হইলেও, প্রকৃত পাঠ উদ্ধৃত হয় নাই বলিয়া, পরিষৎ-পত্রিকা অবলম্বন করিয়া, তাহার অর্থবোধ করিবার উপায় নাই।

প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার-ব্যাপারে য-কার এবং প-কার বঙ্গসাহিত্যে নানা কৌতূহলোদ্দীপক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছে। বিশ্বকোষে [একাদশ ভাগের ৩১১ পৃষ্ঠায়] দেখিতে পাওয়া যায়,—"পাল-রাজের তাম্রশাসনে লিখিত আছে, ধর্ম্মপাল পিতা চক্রায়ুধকে পুনরায় কান্যকুব্জ-রাজ্য দান করিয়াছিলেন।" রঙ্গপুর শাখা-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাবলীভুক্ত পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী-সংকলিত গৌড়ের ইতিহাসে [৯৪ পৃষ্ঠায়] দেখিতে পাওয়া যায়;—"আমরাজ আপন দুর্দ্দান্ত পুত্র ইন্দ্ররাজ কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হন। ধর্ম্মপাল ইন্দ্ররাজকে পরাজিত করিয়া, আমরাজকে কান্যকুব্জ-সিংহাসনে পুনঃ সংস্থাপিত করেন।" ইহা ইতিহাস বলিয়াই মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে।

উভয় গ্রন্থেরই এতদ্বিষয়ক প্রমাণ এক খানি তাম্রশাসনের একটি শ্লোক। তাহা নারায়ণপালদেবের [ভাগলপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনের শ্লোক। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনা-নিবাসী ডাক্তার হুল্‌স্ এই শ্লোকের প্রকৃত পাঠ মুদ্রিত করিয়াছেন। যথা,—

"ত্রিত্বেন্দ্ররাজপ্রভৃতীনরাতী-

ভূপার্জ্জিতা যেন মহোদয়শ্রীঃ। *
দত্তা পুনঃ সা বলিনার্থযিত্রে
চক্রায়ুধায়ানতি-বামনায়॥"

বিশুদ্ধপাঠ মুদ্রিত হইবার বহুবৎসর পরেও, এই শ্লোকের "অর্থযিত্রে" [অর্থাৎ প্রার্থয়িত্রে] শব্দটিকে উভয় গ্রন্থেই "অর্থপিত্রে" বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে; এবং তাহাকেই প্রকৃত পাঠ মনে করিয়া, উভয় গ্রন্থকারই চক্রায়ুধকেই পিতা এবং ইন্দ্ররাজকে তাঁহার পুত্র মনে করিয়াছেন! † তাহাই ইতিহাসের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে।

বাঙ্গলার ইতিহাস নাই। কিন্তু ইতিহাসের উপাদানেরও অভাব নাই। তথাপি উপাদানগুলির যথাযোগ্য আলোচনার অভাবেই, ইতিহাস সংকলিত হইতে পারিতেছে না। তপন-দীঘির তীরে বসিয়া, সদস্যগণ এই সকল কথার আলোচনা করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাঙ্গলার ইতিহাসের জন্য আমরা কি করিতে পারিতাম, আর কি করিয়াছি, তাহার আলোচনা প্রীতিপ্রদ হইতে পারে না। আমরা যে এখনও যথাযোগ্য আয়োজন করি নাই, অথচ অনেক করিয়াছি বলিয়া "বিশেষজ্ঞ" সাজিয়া গর্ব্বান্ধ হইয়া উঠিতেছি, ইহাই আমাদিগের প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতেছে। পুরাতত্ত্বের নিদর্শন স্বরূপ যে সকল পুরাতন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার যথাযোগ্য বঙ্গানুবাদ সম্পাদিত হয় নাই;—সকল স্থলে প্রকৃত পাঠও উদ্ধৃত হইতে পারে নাই। ইহা আমাদিগের সাহিত্য-চর্চ্চার গৌরব বিঘোষিত করিতে পারে না।

বাঙ্গলার ইতিহাসের সহিত সম্পর্কবিশিষ্ট প্রাচীন লিপিগুলিকে অত্যুক্তিপূর্ণ বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। কারণ—তাহা সমসাময়িক লিপি। তাহার বিশুদ্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা সঙ্কলিত হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে,—বাঙ্গলার ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন পরাজয়ের ইতিহাস বলিয়া ধিক্কৃত হইতে পারে না। বাঙ্গলারও একদিন সকল বিষয়েই গৌরবের দিন ছিল। সে দিন বরেন্দ্রভূমির গৌড়াধিপতিগণের শাসন-ক্ষমতা আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ স্থানেই অবনত-মস্তকে স্বীকৃত হইত। সে দিন বাঙ্গালীর নৌ-বাহিনী ভাগীরথী-প্রবাহে প্রবর্ত্তমান থাকিয়া, বিজয়োল্লাস-বিজ্ঞাপক "হৌহৌরবে" দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিত; উত্তরাপথের অগণ্য রাজন্যবৃন্দ উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া বাঙ্গালীর নিকট বশ্যতা স্বীকার করিত; জলে স্থলে এক অনির্ব্বচনীয় বিজয়-গৌরব বাঙ্গালীর বাহুবল ও শাসন-কৌশলকে ভারতবিখ্যাত করিয়া তুলিত। তাহার ছায়াতলে উৎসাহ লাভ করিয়া, বাঙ্গালীর শিল্পকৌশল, স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যে, অলৌকিক রচনাকৌশলের উদ্ভাবন করিয়া, পৃথিবীর শিল্পকলাকে নবজীবন দান করিয়াছিল। তাহার কথা বিস্মৃত হইয়া, তাহার ধ্বংসাবশিষ্ট নিদর্শনরাশির পরিচয় লাভের জন্য চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত না হইয়া, বাঙ্গালী গান্ধার-শিল্পের, মাগধ-শিল্পের, দাক্ষিণাত্য-শিল্পের বিজয় ঘোষণা করিতেছে; ক্বচিৎ বঙ্গদেশে কোনও পুরাতন শ্রীমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেও, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বসন ভূষণে দাক্ষিণাত্য-শিল্পের প্রভাব বা অনুকরণচিহ্ন আবিষ্কৃত করিয়া, পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে!

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

* Indian Antiquary, Vol. XV, p. 303.

† ইহা তাঞ্জোর রাজেন্দ্রচোলের উদ্ধৃত পাঠের সকল রাজা।

ভ্রান্তি

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আজ করুণার বিবাহ। পাত্র মুরলীধর, মধ্যাহ্নে, ঘটক-বন্ধু কিশোরীমোহনকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। কিশোরীর সাধারণ বিবাহের ব্যাপারে বড় সহানুভূতি নাই, তা আপনারা জানেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে যে সে নিয়মের ব্যতিরেক ঘটিয়াছে, তারও পরিচয় পূর্ব্বেই পাইয়াছেন। সুতরাং কিশোরীমোহন এ নিমন্ত্রণ সাহ্লাদে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু মুরলীর এ কি ব্যবস্থা! বাড়ীশুদ্ধ লোকের আহারাদি হইয়া গেল, বেলাও একটা বাজিয়া যায়, তবু কিশোরীর ডাক পড়ে না, মুরলীর আজ আবার এ কি রোগ ধরিল? বাপু, বিবাহ-নিবারণী সভার দড়ি-দড়া ত ছিঁড়েচ, আর ঘণ্টা কয়েক পরে পরিণয়-সূত্রে সংসারে বাঁধা পড়্‌বে, তখন আবার ম্যাল্‌থাসের সমাজতত্ত্ব আলোচনা কেন? কিশোরীর বড় রাগ হইতেছিল, ভূতের মুখে রামনাম, কিন্তু কিছু যে বলিবার যো নাই, এখন সাপ হ'য়ে কাম্‌ড়িয়েছে, তাই আর ওঝা হয়ে ঝাড়্‌তে পাচ্চে না! কোন ঠাট্টা বিদ্রূপ কর্‌লে যদি মুরলীর মন বিগড়াইয়া যায়, কাজ নেই বাপু, ঘণ্টা কত চুপচাপ করে থাকাই ভাল! কিন্তু মুরলী যে থামে না! সহসা তাহার তত্ত্বজ্ঞান বাড়িয়া উঠিয়াছে। সে এখন বিবাহতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব আলোচনায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, কিশোরীও তত্ত্বজ্ঞানে অজ্ঞান হইয়া পড়েন, কিন্তু পাত্র ও কাল বিবেচনায় তিনি আজ এ স্রোতে গা ঢালিয়া দিতেছেন না। আর শুধু পেটে কি এ সব ভাল লাগে? কিশোরী যখন দেখিল, মুরলী কেবল সমাজ-তত্ত্বের কথাই কয়, আহার-তত্ত্বের কোন খোঁজ-খবরই লইতে চায় না, শীঘ্র যে লইবে তার কোন লক্ষণও দেখা যাইতেছে না, তখন সে মুখ ফুটিয়া বলিল, "কি হে, তোমার না হয় বিবাহের আনন্দে আজ পেট ভরে আছে, কিন্তু আমাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা-লোপের কোন কারণ ত এখনও ঘটে নাই, তর্ক কাল হবে, তত্ত্ব আলোচনা যত পার পরে দেখা যাবে, এখন খাবার ব্যবস্থার কি কর্‌চ বল, পিত্তি পড়ে যে মাঠে মাঠে হয়ে গেল।"

মুরলী যেন আকাশ হইতে পড়িল। তারপর সহসা কি যেন তার মনে পড়িয়া গেল, মুরলী বসিয়াছিল, লাফাইয়া উঠিল, ও তাই ত, কি অন্যায়ই হয়েছে, ছি, ছি, ছি, ভুল, একেবারে ভুল, বিষম ভুল। মুরলী নিতান্ত অপরাধীর মত তাহার এই ভুলের জন্য কিশোরীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বাটীর ভিতর ছুটিল, কিন্তু অন্ন ব্যঞ্জন যে সব উঠিয়া গিয়াছে, সে তখন ক্ষীর, ছানা, সন্দেশ ফল, ইত্যাদি আনাইয়া তাহার বাহিরের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল, বলিল, "কিশোরী ভাই! তোমার কপালে আজ অন্নপূর্ণা অন্ন যোগান নাই, কি করিব বল? এস জলযোগ কর, যদি ইচ্ছা হয় আমাকেও কিছু ভাগ দিতে পার।" বিবাহ বাটিতে এরই মধ্যে অন্ন শূন্য, কি অব্যবস্থা? মনে মনে বিরক্ত হইলেও কিশোরী মুখে কিছু প্রকাশ

না করিয়া একটু রহস্যের ছলে বলিল, "এখনই এত ভুল, দুদিন পরে দেখ্‌চি আমাদের মনেই থাক্‌বে না।"

"ভাত চড়াবে কি ?"

"না না, আর ও সব গোলযোগে কাজ নাই,—জলযোগেই খুব পেট ভরবে,"—

"তুমি তাই 'নিতবর' কিনা, তাই আজ তোমাকেও ভাত খেতে নাই,—বুঝেছ !"

"ও এতক্ষণ বুঝি, কৈফিয়ৎটা মনে এলো !"

• • • •

"তাই আর একটা মস্ত ভুল হয়েছে !"

"আবার মস্ত ভুলটা কি ?"

"বিনোদকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি !"

"বল কি ? সে ত তবে রক্ষে রাখবে না ? তোমার হলো কি ?"

"যাব না কি ?"

"উহু, তুমি গেলে হবে না। আমাকেই যেতে হবে !"

"তবে চল দুজনাতেই যাই !"

"তা হলে উলটো হবে, বলবে, আমার মনেই ছিল না, তুমিই, উদ্যোগী হয়ে আমায় নিয়ে গিয়েছ !"

"তা বটে, তবে তুমিই শীঘ্র যাও !"

"যাব এখন, এইত, ষ্টেসন হ'তে দশ মিনিটের পথ ! এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরব !"

"দেখো যেন ট্রেণ ফেল করো না !"

"দূর !"

"তা বটে, আমারও যেমন বুদ্ধি !"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অপেক্ষা হইতে উৎকণ্ঠা, উৎকণ্ঠা হইতে উদ্বেগ, উদ্বেগ হইতে সন্দেহ ! না আর কোন সন্দেহই রহিল না, নিশ্চয়ই মুরলীর কোন বিপদ ঘটিয়াছে—বেলা তিনটার সময় বিনোদের কাছে, মুরলী গিয়াছে—ছয়টা অতীত, সাতটা বাজে, নয়টার পর বিবাহ, কিন্তু এখনও মুরলীর দেখা নাই, কি ব্যাপার। বিবাহের বর সহজে কি এতটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে ? আজ কি অন্যত্র যাইতে আছে—মুরলীর কি বিবেচনার ত্রুটী। কিশোরীই বা কেন তাকে নিষেধ করিল না ! তখন বিনোদের বাড়ীতে লোক ছুটিল, হাঁটিয়া যাওয়ার সময় নাই, ট্রেণেও আর বিশ্বাস নাই, গ্রামে দিনুসর্দ্দার বড় ওস্তাদ ঘোড় সোয়ার, বড় পর উপকারী, —সে-ই ছুটিল,—!

সকলের দৃষ্টি পথের পানে ! সকলের কাণ ঘোড়ার খুরের শব্দের দিকে !

পাত্রীর বাটীতেও এ সংবাদ পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না, অন্তঃপুরে কান্নাহাটি পড়িয়া গেল ! জমীদার-গৃহিণী তবে কি এখানেও বাদ্ সাধিলেন ! আর, তবে,—তবে কি নিশ্চয়ই এ তাহাদেরই চক্রান্ত ! এ উপায়, শেষে কি জাতি কুল সবই যাবে !

সাড়ে আটটার মধ্যে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর দীনুসর্দ্দার ফিরিল ! কোথায় বা তোমার বিনোদ্ আর কোথায় বা মুরলী,—"কাকস্য পরিবেদনা !"

তখন দীর্ঘনিশ্বাসের ঝড় বহিয়া গেল ! প্রথম ভাবনা মুরলীর জন্য ! জলজীবন্ত মানুষটা তবে গেল কোথায় ? কোন একটা খবরও ত পাওয়া যেত !

• • • •

"আরে—এই যে বিনোদ তুমি কোথা হ'তে ? মুরলী তোমার কাছে যায় নি ?"

বিনোদ কথা কহে না! সে অবাক! তবে কি সত্যই মুরলী বিপন্ন!

* * * *

কে আছ, তোমরা, ওগো তোমরা কে আছ, একবার ঠাকুরপোকে ডেকে দাও না! বৌদিদির তখনকার সে মূর্ত্তি, দেখিলে পাষাণেরও বুক ফাটিয়া যায়! সব দোষ যে তাঁরই ঘাড়ে চাপবে! দোষ চাপে চাপুক, কিন্তু জাতিরক্ষার কি হবে! ঠাকুরপো! এ কি হলো!

ঠাকুর তুমিই বা কি করে?

এখন ঠাকুর, আর ঠাকুরপো!—বৌদিদির মুখে আর কোন কথা নাই!

কিশোরীর হাতে ও কার পত্র? বিনোদ তুমি এ চিঠি পেলে কোথায়? তবু ভাল—মুরলীর কোন বিপদ ঘটে নাই ত!

মুরলীর একটা সংবাদ পাইয়া ত তাহার বাটীর লোকে কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন, কিন্তু করুণার বিবাহের কি উপায়? সমস্ত রাত্রির মধ্যে কি মুরলী আসিয়া পৌঁছিবে না! ছোট, ছোট, ছুটে যাও—মুরলী যেখানেই থাক্ তাহাকে ধরিয়া আনিতেই হইবে! ভদ্রলোকের গ্রামে ভদ্রসন্তানের, ভদ্রকন্যার জাতি যাইবে,—না তাহা হইবে না। যেন,—বিবাহের লগ্ন বুঝি বহিয়া গেল—! কার এ টেলিগ্রাম! মুরলীর? মুরলী ইহার মধ্যে এতদূর চলিয়া গিয়াছে! তবে ত আর আজ ফিরাইবার কোন আশা নাই।

টেলিগ্রামের শেষটা কি? কি বল্লে, সেটা আর শুনিয়া কাজ নেই!

বিনোদ, তোমাদের এই কাজ! ছি, ছি আর তোমাদের বিশ্বাস করে—কোন আহাম্মক! তোমরা সব পার!

কি, ছাই হাস! ও হাসি আর এখন ভাল লাগে না!

তা ভাই, কিশোরী তুমি রাগ করো না, একটু মজা করা গেল!

মজা, এর নাম মজা?

(স্বগত) মজা বই কি! খুবই মজা!

(ক্রমশ)

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র

আজিকালিকার সভ্য পাঠকবৃন্দের অনেকেই হয় ত শিহরিয়া উঠেন, ব্রাহ্মণ কবি মুকুন্দরামের কাব্যের নায়ক কি না একটা তুচ্ছ ব্যাধ—অশিক্ষিত অসভ্য মাংসবিক্রয়ী ব্যাধ। অত রোম্‌রা চোম্‌রা নায়ক থাকিতে, অত রূপসী ষোড়শী থাকিতে কি না কাব্যের নায়ক-নায়িকা হইল—একটা ব্যাধ-দম্পতি? ইহাতে কি কাব্যে সৌন্দর্য্য সঞ্চারিত হইতে পারে, না ইহাকে সাহিত্য বলা সম্ভব হয়?

আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য কোনও ঐতিহাসিক তথ্যের অবতারণা বা বিচার করিবার ইচ্ছা করি না। কবিবর রবীন্দ্রনাথ ইহা হইতে যে ঐতিহাসিক

সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা তাহা আমাদিগের বিচারে প্রয়োজন নাই। আমরা ইহার উত্তর দিব অন্য দিক্ দিয়া। কবির শক্তি-মাহাত্ম্য প্রচার করা উদ্দেশ্য—ছোটকে বড় করা শক্তির কার্য্য। অতএব কবির কাব্যের নায়ক নীচ ব্যাধ এ কথা বলিলে অবশ্য ঠিক কথাই বলা হয়, এবং এ একটা স্থায্য কৈফিয়ৎ বটে, কিন্তু এই উত্তরই আমি যথেষ্ট মনে করি না। দিল্লীশ্বরের শক্তি যথেচ্ছাচারিণী ও তাহার ইচ্ছায় ছোট বড় হইত ইহা ঐতিহাসিক সত্য হইলেও, এ উত্তর এ ক্ষেত্রে সমস্ত সংশয় দূর করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। যাঁহারা কোনও না কোনও একটা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা পাইলেই সন্তুষ্ট হ'ন, তাঁহারা এ ব্যাখ্যাতে তৃপ্ত হইতে পারেন, কিন্তু ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা অভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই কালকেতুর উপাখ্যান হইতে আমার মতে যে ঐতিহাসিক সত্যের অনুভব হয়, তাহা অন্য রূপ। তাই আমরা সাহিত্যের লক্ষণ ধরিয়া এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

সাহিত্যদর্পণকার কাব্যের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা সে লক্ষণ ধরিয়াও কবিকঙ্কণের কাব্য বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইব না। আমরা দেখিতে পাই যে বাঙ্গলার প্রাচীন কাব্যগুলি অলঙ্কার-শাস্ত্র-কথিত নিয়মানুসারে গঠিত হয় নাই, তাহার অনেকটা কথা সাহিত্যের ধরণে লিখিত, প্রভেদ এই যে ইহারা পদ্যে বিরচিত এবং বেশীর ভাগই জনসাধারণের সমক্ষে চামর-ঝঙ্কিরাব সাহায্যে গীত হইবার উপযোগী করিয়া বিরচিত হইয়াছে। অতএব এ গুলিতে আমরা মহাকাব্যের অনেক লক্ষণই খুঁজিয়া পাইব না, কিন্তু সকল প্রকার কাব্যের একটী সাধারণ লক্ষণ আছে "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্"। আমরা সেই লক্ষণ অনুসারে আমাদিগের আলোচ্য কবিগণের কাব্য বিচার করিতে ইচ্ছা করি।

যাহা আস্বাদযোগ্য তাহাই রস। এই ব্যাধদম্পতির চিত্রে আস্বাদযোগ্য বস্তু কিছু আছে কি না তাহাই এখন আমরা দেখিব। সাহিত্যে আস্বাদযোগ্য বস্তু প্রধানতঃ মনুষ্য-হৃদয়ের সত্য প্রকাশ। মনুষ্যের হৃদয় যে সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত না হয় সে সাহিত্য রস-বিবর্জ্জিত হইতে বাধ্য। কিন্তু মনুষ্য-হৃদয় এমন একটা রহস্যময় ব্যাপার যে ইহার সত্য প্রকাশকালেই কবির যথার্থ পরিচয় পাইবার সুবিধা হয়। অনেক কবি মনুষ্য-হৃদয় ভুলিয়া গিয়া নিজের মত অথবা একটা কল্পিত আদর্শ নির্ম্মাণ করিতে বসেন। পুত্রশোকে কাঁদে না এমন মা কি কেহ দেখিয়াছেন? কিন্তু কোনও কবি সে দৃশ্যও আঁকিতে কুণ্ঠিত হন নাই, কারণ তখন তিনি মায়ের মাতৃত্ব ভুলিয়া গিয়া একটা মস্ত আদর্শ গড়িবার সংকল্পে আত্মহারা। ইহা সৌন্দর্য্য নহে—বিকৃতি। যাহা বিকৃত-অসত্য তাহা যতই উচ্চসুরে গীত হউক, তাহা যতই বড় ভাবব্যঞ্জক হউক, তাহা দ্বারা সৌন্দর্য্য প্রকাশ হয় না। সৌন্দর্য্যের প্রতিষ্ঠা সংযমে, সংযমের প্রতিষ্ঠা সত্যে। যে মাতৃ স্নেহ ভগবান রমণীহৃদয়ের সারস্নেহ, অমূল্যরত্নস্বরূপ প্রদান করিয়াছেন, তাহার উচ্ছেদ যে রমণী করিতে পারে, সে রমণী নহে, হয় সে পিশাচী নয় তো রাক্ষসী।

শোকের সংযম সম্ভবপর, কিন্তু পুত্রশোক ভুলিয়া অন্যকে প্রবোধ দেওয়া নিজের পুত্র-নাশে অপরের শোক দূর করিবার চেষ্টা করা শুধু অসম্ভব নহে, অসুন্দর। অনেকে বুঝিতে পারেন না যে চিত্তবৃত্তির সংযম একদিকে যেমন সুন্দর, চিত্তবৃত্তির উচ্ছেদ তেমনি অসুন্দর, চিত্তসংযম যেমন আবশ্যক ও উপকারী, স্বাভাবিক বৃত্তির বা ভাবের বিনাশ-সাধন প্রবৃত্তিরও সংযম তেমনি আবশ্যক। এ কথাগুলি একটা উদাহরণ স্বরূপ বলিলাম। ফলতঃ মনুষ্য তাবৎই মনুষ্য থাকে যাবৎ তাহার মনুষ্য-সুলভ বৃত্তি সকল লুপ্ত হইয়া যায় নাই। বাল্মীকি কৌশল্যার বা দশরথের রামবিয়োগ শোক বর্ণনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, রামের সীতা-বিয়োগ দুঃখও বর্ণনা করিতে বিরত হন নাই। মহাকবি কালিদাস কণ্বের হৃদয়কে শকুন্তলা-বিচ্ছেদ-কাতর দেখাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নাই। মহাযোগী মহাদেবকেও অবস্থার সবিশেষ সংস্থানবশতঃ "কিঞ্চিৎ পরিলুপ্ত ধৈর্য্য" বলিতে লজ্জিত হন নাই। কারণ তাঁহারা জানিতেন যে যাহা স্বাভাবিক তাহা সুন্দর, চিত্তবৃত্তি থাকা অসুন্দর নহে, তাহার অসংযমই অসুন্দর। বৃত্তি আছেই, তাহাকে দমন কর, ইন্দ্রিয় আছে তাহাকে নিগ্রহ কর; বৃত্তি লোপ করিলে, ইন্দ্রিয় একেবারে উচ্ছেদ করিলে তাহার সংযমই বা কি আর নিরোধই বা কি? কাষ্ঠ-প্রস্তরের ইন্দ্রিয়-বিকার নাই, ইন্দ্রিয়-সংযমও নাই, এবং কাজেই সংযমে যে সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয় তাহাও তাহাদের নাই। একদিকে ইন্দ্রিয়ের উন্মত্ত উল্লাস যেমন কুৎসিৎ অপরদিকে ইন্দ্রিয়বিনাশও তেমনি অসম্ভব, অতএব অসুন্দর। কবি যখন সৃষ্টি করিবেন তখন যদি নিজের মনের ভাব বা উচ্ছ্বাস অথবা নিজের মনগড়া আদর্শ বা মত না ভুলিতে পারেন তবে তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র একটা অলীক বর্ণে চিত্রিত হইবে। ছোট বড় গুণের সমষ্টিতে মানুষ, যিনি সেই মানুষের কেবল ছোট দিক দেখান, তিনিও যেমন ভ্রান্ত, তেমনি যিনি কেবল বড়দিকটাই দেখাইবার চেষ্টা করেন, অথবা সেই বড় দিকটা আবার বাড়াইয়া টানিয়া একটা প্রকাণ্ড আদর্শে খাড়া করাইতে চাহেন, তিনি হয় মানুষটাকে পশুতে, নয় একটা নির্জ্জীব অসত্য আকাশ-কুসুমে পরিণত করিয়া ফেলেন। এ সংসার কিন্তু তেমন নয়, সংসারে ভালও আছে মন্দও আছে, এই ভাল মন্দতে মিশামিশি হইয়াই মনুষ্যের চরিত্র। যদি মন্দ না থাকিত তাহা হইলে ভালর "কদর" কেহ বুঝিত না। সাহিত্যেও তাই মন্দেরও স্থান আছে, ভালর পাশে ভালর মহিমা প্রকাশের জন্য। কুমারসম্ভবে মদনের আবির্ভাব আছে ভস্ম হইবার জন্য, বিকারের আবির্ভাব আছে নিগৃহীত হইবার জন্য, যদি মদনই না থাকিত ও বিকারই না আসিত তো মদনভস্মের সাত্ত্বিকতা ও ইন্দ্রিয়বিকার চিত্তবলে নিরোধ করিবার সৌন্দর্য্য কোথা হইতে আসিত? অতএব সাহিত্যে সুন্দর ও অসুন্দর পাশাপাশি থাকিবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। সাহিত্যের দরবারে কেবল রাজ-রাজড়াই বসিবে তাহার কোনও লেখাপড়া নাই, ইহাতে যে কোনও নীচ-ব্যবসায়ী আসিতে পারে না অথবা কোনও হীন-চরিত্রের প্রবেশাধিকার

নাই এমন কোন কথাও নাই। মানুষ মাত্রেরই এখানে আসিবার অধিকার আছে, এবং মানুষ যদি যথার্থ মানুষ হয়, তাহা হইলে তো আছেই, শুধু অধিকার নয়, তেমন মানুষের সাহিত্যের দরবারে যথেষ্ট প্রয়োজন ও উপকারিতাও আছে। ব্যবসায় কর্ত্তব্যার্থে কৃত হইলে, তাহা যাহাই হোক তদ্দ্বারা ব্যবসায়ীর অপমান নাই। মহাবীর ইপামিনাওাস রাস্তা পরিষ্কার করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি কোনও অপমান বোধ করেন নাই। মহাভারতে ধর্ম্মব্যাধের উপাখ্যান আছে এবং সে যে কর্ত্তব্য শিক্ষা দিবার অধিকারী তাহাও কথিত হইয়াছে। আমরা ইহাতে জানি যে অনেক নীচব্যবসায়ী ধর্ম্মশিক্ষকের পদে সহজেই উন্নীত হইয়াছেন, পৌরাণিক যুগে নহে এই যুগেই। কবীর, রুইদাস প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। অতএব ব্যাধ হইয়াও সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে কোনও বাধা নাই। ব্যাধ হইলেও এ সংসারে তাহার একটা বিশেষ কার্য্য আছে, জগতে ঐশীশক্তির মহিমা প্রচার। দারিদ্র্য তো ভারতবর্ষে কখনও অনাদৃত হয় নাই, এখন বোধ হয় হইতেছে, কারণ এখন আমরা অর্থোপাসক ইউরোপের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছি। ইউরোপীয় কাব্যে দারিদ্র্যের সমাদর নাই, তাহা আমরা জানি, কিন্তু ভারতবর্ষীয় কবির কাছে, বিশেষতঃ মুকুন্দরামের যুগের কবির কাছে, দারিদ্র্য একটা বিশেষ অনাদরণীয় দোষ ছিল না। এখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে নীচব্যবসায়ী ও দরিদ্র বলিয়া কাহারও কাব্যের নায়কত্বে বাধা হইবার প্রয়োজন নাই। (ক্রমশ)

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

বিদ্যাসাগর *

গ্রন্থকারের ভাষায় বলি,—"বলা বাহুল্য,—বিদ্যাসাগর বলিলে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেই বুঝায়! ঠিক কথা, আমরা অন্যত্র বলিয়াছি —আজও বলিতেছি" পঙ্কজ বলিলে পঙ্কজকেই বুঝায়, বিদ্যাসাগর বলিলেও সকলে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেই বুঝিয়া থাকেন। তিনি সত্যই বিদ্যার সাগর—কিন্তু কেবল তাঁর প্রকৃত পরিচয় কি বিদ্যায়! বিদ্যাসাগর যথার্থই বিদ্যার সাগর, সে সাগরে অসংখ্য মণি-মুক্তার সমাবেশ! আবার সে সাগরও যে সে সাগর নয়, সে যে ক্ষীর-সমুদ্র; কিন্তু তবু কেবল বিদ্যাসাগর বলিলেই, তাঁর সম্বন্ধে সকল কথা বলা হয় না, তিনি যে দয়ার সাগর! বিদ্যার এবং দয়ার, হৃদয়ের এবং মস্তিষ্কের এরূপ সম-সমাবেশ আর কুত্রাপি দেখিয়াছি মনে হয় না!

সমালোচ্য গ্রন্থ "বিদ্যাসাগরে" গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় বিদ্যা-

* স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী (তৃতীয় সংস্করণ)—মূল্য কাপড়ে বাঁধা ১৸০ বাঁধাই ১।০—বঙ্গবাসীর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার প্রণীত।

সাগর মহাশয়ের বিদ্যার এবং দয়ার পরিচয় দিয়াছেন। এতটা পূর্ণ পরিচয়, অন্যত্র আছে বলিয়া স্মরণ হয় না। সম্প্রতি এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে। এই অভিনব সংস্করণে, অনেক নূতন বিষয়ের সন্নিবেশ দেখা গেল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম-সাময়িক বঙ্গের সমস্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবনী এ গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে—গ্রন্থকার অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহাদের মধ্যে অনেকের ছবিও এ গ্রন্থে দিয়াছেন। ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে মনস্বী ৺ রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সুবিস্তৃত আলোচনা, রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়দ্বয়ের সুলিখিত প্রবন্ধ গ্রন্থের পরিশিষ্টে দিয়াছেন—এই প্রকার নানা উপায়ে গ্রন্থকার এ অভিনব সংস্করণের উপযোগিতা বৃদ্ধি করিয়াছেন। সুতরাং নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, নূতন সংস্করণে গ্রন্থখানি উৎকৃষ্টতর হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্য জীবনীতে প্রকাশিত হয় নাই, এমন অনেক বিষয় প্রথম সংস্করণেই ছিল,—সেগুলির জন্য বিহারী বাবুকে যে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই পাঠ করা উচিত, সে রিপোর্ট কিন্তু সাধারণের দেখিবার উপায় ছিল না। বিহারী বাবু বিপুল শ্রমে তাহা সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থে দিয়াছেন। বিহারী বাবু 'ফাঁকির' উপর এ গ্রন্থ লেখেন নাই, তিনি বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যেখানে যাহা পাইয়াছেন, তাহাই সংগ্রহ করিয়া এই জীবনচরিতরূপ মধুচক্র রচনা করিয়াছেন। বঙ্গবাসী বহুদিন ইহা হইতে "আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি!" বিহারী বাবু তিল তিল করিয়া এই যে তিলোত্তমা রচনা করিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্যের মন্দিরে তাহা চিরদিন শোভা পাইবে।

কলির ধর্ম্ম দানে, দান-বীর ঈশ্বরচন্দ্র সেই ধর্ম্মই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাই আমাদের মনে হয়, বঙ্গের দেবতা ঈশ্বর-চন্দ্রের এই জীবনী প্রতি গৃহে শাস্ত্রগ্রন্থের ন্যায় পঠিত হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের আলোচনা যত বৃদ্ধি পাইবে মনুষ্যত্বের উন্মেষে ততই সহায়তা করিবে। মানবের চরিত্র গঠনে, এমন আদর্শ আমরা আর কোথায় পাইব—বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ, আশা করি, অধিক দিন এ গ্রন্থ বালকদিগের চক্ষুর অন্তরালে রাখিবেন না।

গ্রন্থকার, বিধবা-বিবাহের আলোচনায় কিছু অধিক সময় ও স্থান লইয়াছেন। মতভেদ থাকে থাক্, সে কথা সংক্ষেপে বলিলেই গোল চুকিয়া যাইত। শাস্ত্রীয় মীমাংসার ভার শাস্ত্রব্যবসায়িদিগের উপর দেওয়াই ত সঙ্গত! এই বিধবা-বিবাহ-ব্যাপার লইয়া গ্রন্থকার একটু বেশী দূর গিয়া পড়িয়াছেন—বোধ হয় এ সংস্করণে কোন কোন স্থানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর পূর্ব্বসংস্করণের ভাষার কঠোরতা তবু যেন কিছু কমাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু তীব্রতা একেবারে যায় নাই। তিনি যেন বিরুদ্ধ পক্ষের 'ব্রিফ' লইয়াছেন,—কাজেই নিজের সীমা লঙ্ঘন করিয়া ফেলিয়াছেন। সত্যের খাতিরে বলিতে হইতেছে, এ সকল

আলোচনা জীবনীর ও বর্ত্তমান জীবনী-লেখকের অধিকার ভুক্ত নহে। কিন্তু গ্রন্থকারকে আমরা ধন্যবাদ দি, বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে একটা মতভেদ সত্ত্বেও, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতের তীব্র সমালোচনা করা সত্ত্বেও গ্রন্থকার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি অন্যত্র যথাযোগ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। এখানে আমরা গ্রন্থকারের মহত্ত্ব দেখিয়া সুখী হইয়াছি। বিহারী বাবু যথার্থই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভক্ত। ভক্তিরসে অভিষিক্ত করিয়া এ জীবনী রচিত হইয়াছে বলিয়াই, গ্রন্থের মূল্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাই গ্রন্থকারের এ গ্রন্থ পড়িয়া এত তৃপ্তি জন্মে।

গ্রন্থের প্রথমে আমার নিবেদনে গ্রন্থকার বলিয়াছেন "যতগুলি বিষয় সংগ্রহ করিবার সংকল্প ছিল, শারীরিক অপটুতা বশতঃ তাহা করিতে পারি নাই, যদি ভগবৎ কৃপায় ইহার চতুর্থ সংস্করণ দেখিয়া যাইবার সৌভাগ্য আমার ঘটে তাহা হইলে মনের বাসনা অপূর্ণ না থাকিলেও থাকিতে পারে।"

তাই হোক, ভগবান করুন তাহাই হোক! বিহারী বাবু দীর্ঘজীবী হইয়া তাঁহার মনের বাসনা পূর্ণ করুন। কিন্তু আমাদের একটা অনুরোধ, আমরা বলি কি, বর্ত্তমান সংস্করণ কবে নিঃশেষ হইবে তাহার অপেক্ষা না করিয়া, এখন হইতেই বিহারী বাবু নূতন সংস্করণের জন্য প্রস্তুত হউন! তিনি বিজ্ঞ ও বহুদর্শী। রাবণের উপদেশের বিষয় তাঁকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া অবশ্য শোভন হইবে না।

এই নিবেদনের প্রথমে তিনি লিখিয়াছেন, আমার কোন কোন বন্ধু বলেন, যে, বিদ্যাসাগরের আরও বেশী সংস্করণ হওয়া উচিত ছিল। আমার লেখার গুণে নহে, বিদ্যাসাগরের নামের গুণে,—আমরাও বলি সত্যই এ গ্রন্থের আরও অধিক সংস্করণ হওয়া উচিত ছিল,—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামের গুণে ত বটেই, লেখার গুণেও বটে! লেখার গুণে এ গ্রন্থ সোণায় সোহাগা হইয়াছে। হরি নাম মিষ্ট, বড় মিষ্ট, আবার কণ্ঠের গুণে তাহার মিষ্টতা আরও বাড়িয়া যায়।

বিহারী বাবুর বিদ্যাসাগর-জীবনী সম্বন্ধেও আমাদের এই শেষ কথা।

অতৃপ্তি।

মার আগমন আশে,
সারা বঙ্গভূমি হাসে,
আমি কেন শুধু আজ আতঙ্কে ডরাই,
মা আমার! বুঝি কবে তোমারে হারাই!

সাধ না করিয়া মায়,
সাধনা মিটিল হায়,
পূজা সাঙ্গ না হইতে হবে বিসর্জ্জন!
চির দিন তরে সাধ রবে অপূরণ!

বঙ্কিম-চরিত

বাল্যাবস্থাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাহ হয়। তিনি নারাণপুরনিবাসী কোন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের এক সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কন্যা ও বর এক বাটীতেই শৈশবে শিক্ষিত হইতেন.—সেজন্য অতি শৈশব হইতেই দুই জনের মধ্যে সম্প্রীতি জন্মে। তারপর বঙ্কিমচন্দ্র হাকিম হইলেন। এদেশ ওদেশ ঘুরিয়া নগোয়ানে (Nagoan) বদলি হইলেন। গৃহে যুবতী সুন্দরী স্ত্রী রাখিয়া কর্ম্মস্থলে গেলেন। এখানে আর একটি ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। মাতামহদেব বলিতেন, বিবাহের পর যতদিন তিনি গৃহে ছিলেন (অর্থাৎ হাকিম হন নাই), স্ত্রী পিত্রালয়ে থাকিলে তিনি একটু গভীর রাত্রে শুধু ঘোড়া লইয়াই শ্বশুরালয়ে যাইতেন। নগোয়ানে থাকিতেই তিনি বিপত্নীক হইলেন। তখন তাঁহার বয়স ২২ বৎসর। যথাসময়ে স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ তাঁহার নিকটে পঁহুছিল। তিনি কর্ম্মস্থান হইতে বাটী আসিলেন। প্রথমা স্ত্রীর মাথার সোণার কাঁটা ও ফুল ও ফিতে নিজের বাক্সে তুলিয়া রাখিলেন। বাটীতে তাঁহার পিতৃদেব, অগ্রজদ্বয়, মাতা এবং গ্রামের বহুলোকই তাঁহাকে পুনরায় বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন। এদিকে সুরসিক কবি দীনবন্ধুও আসিয়া পড়িয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র এবং আরো ২।১ জন বন্ধুবান্ধব একত্র হইয়া নৌকাযোগে পাত্রীর অন্বেষণে চলিলেন এক স্থানগাছ তাঁহারা পাত্রী দেখিতে উঠিলেন। পাত্রীর পিতা অবস্থাপন্ন ধনবান্। পাত্রীটিও সুন্দরী। বাটীটি প্রকাণ্ড। "বিষবৃক্ষের" নগেন্দ্র দত্তের বাটীর বর্ণনা সকলেই পড়িয়াছেন—পৃথিবীতে এমন কোন লোক যদি থাকেন, যিনি পড়েন নাই, তাঁহাকে আমি পড়িতে বলি,—আমার বোধ হয়, দাদাবাবু ঐ বাটী সমস্ত দেখিয়া—নগেন্দ্র দত্তের বাটীর বর্ণনা লিখিয়াছিলেন। যথাসময়ে পাত্রী আসিল। সঞ্জীববাবু জিজ্ঞাসা করিলেন. "তোমার নাম কি ?"

পাত্রী। আমার নাম মনোরমা।

স। তোমার মামার বাড়ী কোথায়—কখনও কি সেখানে গিয়াছ ?"

পা। (ভ্রূভঙ্গীসহ উচ্চৈস্বরে) মামার বাড়ী আবার কোথায় !"

ঐ কথা শুনিয়া কাহারও মুখে আর অন্য কোন কথা নাই—কেবল উচ্চ হাস্য। বরটি পর্য্যন্ত হাসিতেছেন। তাঁহার আর কোন কথাবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই দেখিয়া সকলেই উঠিলেন। দীনবন্ধুবাবু "বাশবেড়ে"য় নামিলেন, সুতরাং সকলেই সেইখানে নামিলেন। সেখানে আবার তারাপ্রসন্নবাবু—বঙ্কিমবাবুর অতি নিকট আত্মীয়—আসিয়া জুটিলেন। এ কথা সে কথার পর তিনি জানিলেন, তাঁহারা পাত্রীর অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছেন। তিনি বলিলেন, তাঁহার সন্ধানে এক ভাল পাত্রী আছে। যেমন সুশ্রী. তেমনি নম্রা, তেমনি লজ্জাশীলা—ইত্যাদি। সঞ্জীববাবু জিজ্ঞাসা করিলেন 'পাত্রীটি কোথায় এবং অদ্য দেখিতে পাওয়া যায় কি না ?"

তারা। পাত্রী আমাদের হালিসহরেরই বিখ্যাত চৌধুরীমহাশয়ের বাটীর কন্যা। পাত্রীর মাতামহ কন্যাকে কুলীন করিয়াছেন, সেই জন্য পাত্রীর মাতা বৎসরের অধিকাংশ দিনই পিত্রালয়ে থাকেন। অদ্যই দেখিতে পাওয়া যাইবে। আমি একটু আগে যাই, তাঁহাদের সংবাদ দিই গে। আপনারা পশ্চাতে আসুন।

আর তাঁহাদের বিশ্রাম করা হইল না—সকলেই পাত্রী দেখিতে ছুটিলেন। পাত্রী দেখিয়া পছন্দ হইল, দিন ধার্য্যও হইল। বিবাহের আর ১০।১১ দিন বাকী রহিল। কন্যাপক্ষ হইতে একটু আপত্তি উঠিল যে, "এত অল্প সময়ের মধ্যে আমরা সব গুছাইতে পারিব না।"

সঞ্জীব। আপনাদের কিছুই গুছাইবার প্রয়োজন নাই—শুধু হরিতকী দক্ষিণাস্পর্শিয়াই কন্যার বিবাহ দিবেন। আমরা অনেক কন্যা দেখিয়াছি—কিন্তু এরূপ সুলক্ষণা, সর্ব্বগুণসম্পন্না, সুন্দরী কন্যা কোথাও পাই নাই; আষাঢ়ার ছুটির আর বেশীদিন নাই, সেই জন্য এত তাড়া।

যথাসময়ে,—সুদিনে, সুলক্ষণে, সুলগ্নে বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলেন। বিবাহ করিয়াই তিনি পত্নী (দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা) সমভিব্যাহারে কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলেন।

ইহার পর তাঁহার জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলীর কিছু কিছু পরিচয় দিবার ইচ্ছা রহিল। তাঁহার জীবনের দুইটি আশ্চর্য্য ঘটনা একটি "নিশীথ প্রেতিনী" একটী "ভীম-মূর্ত্তি-কাপালিক-দর্শন"। (ক্রমশ)

শ্রীদিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঝরা ফুল

ঝরাফুল।—গীতিকবিতা। শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য বারো আনা। —প্রথমেই পাঠককে অভয় দিয়া বলিতেছি, —ঝরা ফুল বাঙ্গালী কবির বাঙ্গলা কবিতা। ইউরোপের আমদানী 'কাব্যি' নহে, ঈষ ও বঙ্গ কবিতার সঙ্কর নহে; এবং এই উভয় শ্রেণীর অপভ্রংশের অক্ষম অনুকরণ নহে। "ঝরা ফুল" বিলাতীর বাগানের মাগ্‌নোলিয়া প্রাণী জোরার-গৌরবে মণ্ডিত হইবার স্পর্দ্ধা না করুক, মৌলিকতার গৌরবে ও খাঁটী কবিতার সৌরভে তাহার স্বাভাবিক অধিকার, তাহা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।

"ঝরা ফুলে"র কবি বাঙ্গলা দেশের ও বাঙ্গালী সমাজের কবি। বাঙ্গলার পল্লী তাঁহার কবিতার ধাত্রী। প্রতিভাশালী শ্রীযুত দীনেন্দ্রকুমার রায় "পল্লী-চিত্রে" ও "পল্লীবৈচিত্র্যে" বঙ্গপল্লীর ও বঙ্গ-প্রকৃতির ছবি আঁকিয়াছেন। করুণানিধানও সেই সৌন্দর্য্য-

সম্ভার লইয়া বাঙ্গলার কাব্যকুঞ্জে প্রবেশ করিয়াছেন। উভয়ের প্রতিপাদ্য এক, কিন্তু পথ স্বতন্ত্র। দীনেন্দ্রকুমার পল্লী-প্রকৃতির সুনিপুণ চিত্রকর। করুণানিধান তাহার ভক্ত উপাসক।

করুণানিধান কবি ও ভাবুক। তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মগ্ন। সেই সৌন্দর্য্য তাঁহার কবিতার প্রাণ। তাঁহার উদ্দেশ্য—, সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি, সৌন্দর্য্যের উপভোগ। সৌন্দর্য্যের অনুভূতিই তাঁহার ভাবুকতার নির্ঝরিণী। করুণানিধানের কবিতায় এই অনুভূতির প্রসাদে স্বর্গীয় সমবেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাই তিনি গাহিতে পারিয়াছেন,—

"দীর্ঘ আলের ক্ষেতের ধারে,
শরের বনে, বিলের পারে,
জড়িয়ে ধরে' চাষীর গলা,
ঢালব আঁখির নীর!"

এ সমবেদনা বাঙ্গলা দেশে সফল হউক।

আন্তরিকতা কবিতার—সাহিত্যের আত্মা। কবির "ঝরা ফুলে" সেই আন্তরিকতা সর্ব্বত্র সুপ্রকাশ। বঙ্গপল্লীর—বঙ্গপ্রকৃতির দুলাল-দুলালীরা নবীন কবির নিতান্ত আপনার। তাহারা তাঁহার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ। কবিতা লিখিবার জন্য তিনি তাহাদের সহিত কৃত্রিম সম্বন্ধ পাতান নাই। ক্ষুদ্র বনফুলে, দুর্ব্বা-ফুলের মখমলে, নিশার মুকুতা-দুলে তাঁহার যেমন অনুরাগ, পাটল গাভী ও পানকৌড়ী, গ্রাম্যবধূ, রাখাল ও কৃষাণেও তাঁহার তেমনই মমতা। এই মমতা তাঁহাকে কাব্যের খাতিরে ধার করিয়া আনিতে হয় নাই। তাঁহার মনেই মধুর মমতার উৎস উৎসারিত হইতেছে, বর্ণনার স্বাভাবিকতা দেখিয়া আমরা অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারি।

বাঙ্গলার নবীন কবিদের অঙ্কিত প্রকৃতির ছবি দেখিলে অনেক সময়ে রবীন্দ্রনাথের—

"এখনও তারে চোখে দেখিনি,
শুধু বাঁশী শুনেছি;
মন প্রাণ যাহা ছিল,
দিয়ে ফেলেছি!"—

এই গানটি মনে পড়ে! তাঁহারা ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের বাঁশী শুনিয়াই প্রকৃতিকে মন প্রাণ দান করেন; কখনও প্রকৃতিকে চোখে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের কবিতা পড়িয়া তাহা মনে হয় না। করুণানিধানের সৌন্দর্য্য-চিত্রে এরূপ বিড়ম্বনার পরিচয় নাই। যে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি মৃন্ময়ীর চিন্ময়ী মূর্ত্তি মানস-পটে বিভাসিত করে, নবীন কবি সেই দৃষ্টির অধিকারী।

"ঝরা ফুল" পড়িয়া মনে হয়,—তরুণ কবি সৌন্দর্য্যের কল্পকাননে প্রথম প্রবেশ করিয়াছেন, আর কুঞ্জপথের প্রথমেই যে সহজ সৌন্দর্য্যটুকু তাঁহার নয়নে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, কবি তাহা স্বয়ং উপভোগ করিয়াছেন।

এই ক্ষুদ্র গীতি-কবিতা-গুচ্ছে তাঁহার একটি বিশেষত্ব দেখিয়াছি। তিনি বনলক্ষ্মীর বরপুত্র। তিনি তরুর সাথী, লতার মিতে, ফুলের কবি! গ্রন্থের আদ্যোপান্তে বাঙ্গলার বনানীর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তিনি ছড়াইয়া দিয়াছেন। মাইকেলের 'সুগন্ধবহ' মলয়ের মত—

"সুবনে সবার কাছে কহিয়া বিলাসী
কোন কোন ফুল চুমি' কি ধন পাইলা!"

করুণানিধানও বঁধুদেবতার পুষ্পগাথা রচনা করিয়াছেন। মউল শালের ঝুরুঝ ভিড়, ফলে-ভরা পিয়াল-বন, পদ্মকোরক রক্তাধর, ধান-নাচানো মাঠ, দোপাটী, শিউলী ও শিউলী-কলি, ডাঁটের ফুলের গন্ধ মিঠে, কামিনীবন, পদ্মকোটা দীঘী, দুর্ব্বাশ্যামল নিম্নতল, মাধীবলতা, ভুবনভুলান পলাশ, তাল-বনানী, শতদল বধূ, মউল ফুলের মধুর গন্ধ, জহুরী চাঁপার সৌরভ, প্রস্ফুটিত কদম, সরমে ফোটা কেতকী, খোলো খোলো জাম, নাগকেশরের গন্ধ, ফুল চন্দ্রমল্লী, দীপ্তপ্রবাল পলাশবন, রজনীগন্ধা, বনতুলসীর মঞ্জরী, চাঁপার ছায়া, নতদৃষ্টি লজ্জাবতী, মোতিয়া বেলার গন্ধ, স্বর্ণ অতসীর পেলব জ্যোতিঃ, মধুমাসমতীর বীথিকা, তালিম ফুলের ফলানো রঙ্গ, নারিকেল গাছের ঘন কুঞ্জবনের আবছায়ে পথের ধূলায় লুণ্ঠিত কুন্দমালা, ফাগুন-মুকুল-মঞ্জরী, কাউয়ের ঝালর, পাটল গোলাপ, লতিকাবিতানে যূথিকার বাস, বৈশাখী চাঁপা, রক্তফলের বর্ত্তুলে ভরা বটের শাখা,—তাঁহার সৌন্দর্য্য চিত্রের উপাদান, বর্ণসম্ভার। বনলক্ষ্মীর প্রসাদী পুষ্পে কবির সাজি পরিপূর্ণ! তাঁহার মানসে বাঙ্গলার গৌরব পুষ্প সম্ভার! তাঁহার উপবনে বনলক্ষ্মীর বরপুত্র তরুপুঞ্জ।

এমন কি, যাহারা কাব্যজগতে চির-উপেক্ষিত তাহাদিগকেও কবি এই পুষ্প-সভায় সাদরে স্থান দিয়াছেন!—'দুর্গা দীঘীর ধারে'র 'কচী মনসার বেড়া', 'নোনা আতার সোনার গা', শুকনো পাতা, সবুজ মাঠের ফুটন্ত মটর-ফুল পর্য্যন্ত তাঁহার স্নিগ্ধ স্নেহামৃতে অভিসিক্ত।

কবি এই পুষ্প-রাজ্য হইতে অনেক সুন্দর উপমা আহরণ করিয়াছেন। তিনি লজ্জাবতীর সহিত নতদিঠির উপমা দেন। তাঁহার প্রীতি—স্বর্গের পারিজাত। মেঘে বর্ণ-বিকাশ দেখিয়া তিনি বর্ণনা করেন,—

"তালিম ফুলের রঙটি ফলান'
মেঘের কোলে!"

দুর্ব্বাদল তাঁহার হরিত মখমল! তাঁহার 'মনোহারিকা'র 'উজল ভুজবল্লরী',—

"কাঁটাহারা-তরুণ-গোলাপ-
শাখার মত চল্‌চলে।"

কবির স্বপ্ন-নারীদের কেশ-সৌরভেও বনলক্ষ্মীর প্রভাব!—

"তাদের চুলের ফুলের বাসে
গন্ধে হারায় গোলাপ বেলা!"

কবির নয়নে গোধূলি 'গোলাপ-পাটল' হইয়া নিবিয়া যায়। ললিত লতিকাবিতানে তাঁহার নর্ম্মসখী যূথিকার বসতি নীলাম্বরে যখন বিজলী চমকিয়া যায়, তখন কবির মনে প্রশ্ন উদিত হয়,—

"—আকাশের আখর
লিখিল গগনে কোন্ যাদুকর
অনলের ফুল ছড়ায়ে?"

নন্দনের হরিচন্দনও তাঁহার সুপরিচিত!—

"কণ্ঠে দোদুল হরিচন্দন
পরাগের ধূম উড়ায়ে।"

মানবের চরম পরিণাম লক্ষ্য করিয়া তিনি ভাবিয়াছেন,—

"পূর্ণ পক্ক ফলের মতন,
বৃন্তভ্রষ্ট টুটিবে জীবন।"

উপমাও চির হরিত বঙ্গ-বনানীর অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত

তাঁহার মাধবী-মুকুল শুভ্র ফাগুন-রাতে পুষ্পবাসে সকল লাজ ঢাকিয়া রাখে, পুষ্পডোর নীরব ভাষায় তাঁহার সহিত কি আলাপ করে!

কবি "বন্দনা"য় লিখিয়াছেন,—

"অঞ্জলি ভরি' এনেছি জননি!
কুসুম-রাজি;"

তাহা সত্য! "ঝরা ফুল" সার্থক হইয়াছে। ইহা ফুলের কবিতা, তরু-লতার মর্ম্মর গান! বনলক্ষ্মীর সুষমায়,—পুষ্পগৌরবে তিনি মার অর্ঘ্য রচনা করিয়াছেন। পাঠককে তাহারই পরিচয় দিলাম।

"ঝরা ফুলে"র কবি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে অনেক স্থলে কুবের-বৈভবের আরোপ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস,—প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য তাহাতে মলিন হয় নাই। অনেক স্থলে তিনি 'কমল-দলেও বর্ণের আরোপ' করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কবির প্রয়োগ-নৈপুণ্য তাহা অদ্ভুত, অস্বাভাবিক বা উদ্ভট বলিয়া মনে হয় না। নমুনা দেখুন,—

(১) "বর্ষা যখন ছড়িয়ে দেবে
মোতীর 'সাত নরী';"

(২) "কালো মেঘের রৌপ্য-পাড়ে
জরীর মতন রৌদ্রটুক।"

(৩) "সোনা আতার সোনার গায়ে
রবির কিরণ পিছ্‌লে পড়ে।

(৪) "দোলে গোধূলির সোনার নিশান
তাল-বনানীর শিরে।"

(৫) "শালুক-মেখলা পরেছে রাণীর
দীঘী।"

(৬) "দীপ্ত-প্রবাল পলাশ-বনটি
[illegible]

প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যের উপর উপমার বৈভব ঢালিয়া কবি, যে বর্ণনা-চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাও উপভোগের যোগ্য।

কবি দুই একটি শ্লোকে চমৎকার চিত্র আঁকিয়াছেন। তাঁহার প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা যেন Landscape। বাঙ্গলার অন্তঃপুরের পবিত্র চিত্রেও তিনি নিপুণতার ও চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন,—

"মনে পড়ে সেই তুলসীর মূলে
'সন্ধ্যা' দিতে,
মাটীর 'দেউটী' যতনে ঢাকিয়া
আঁচলটিতে;
ভক্তি-উজল মুখ-উৎপল,
আঁখি-পল্লব ঈষৎ-সজল,
চোখোচোখি পৌঁহে সিঁড়াতু চমকি'
পাটল সাঁঝে,
গৃহ-দেবতার ধূপ সুরভিত
দেউল মাঝে।"

এ বর্ণ-চিত্র প্রশংসনীয় প্রতিভাশালী চিত্রকরের তুলিকার যোগ্য।

"ঝরা ফুলে"র কবিতাগুলি 'ঈথরে' রচিত নহে। "ঝরা ফুলে"র পাপড়িগুলি বাঙ্গলার নিজস্ব পল্লীর সৌন্দর্য্যে অনুরঞ্জিত ও পল্লীবাসীর ক্ষুদ্র সুখ দুঃখে সুরভিত, human interestএ অনুপ্রাণিত। যে মানব-প্রীতি ও সহানুভূতির অন্তঃসলিল ধারা সমস্ত-ক্ষুদ্র কাব্যখানিকে স্নিগ্ধ করিয়াছে, তাহাও আধুনিক ইজ-বদ্ধ কাব্যে অত্যন্ত বিরল। করুণানিধান পল্লীজীবনের—'সুফলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা মলয়জশীতলা' দেশমাতৃকার নৈসর্গিক দেশকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভাল না [illegible]

কবির রচনা-রীতি সহজ, সরল, প্রাঞ্জল। কবি "বন্দনা"য় প্রার্থনা করিয়াছেন,—

"স্বচ্ছ, বিশদ, উজ্জ্বল ভাষা
দাও মা দাসে।"

মা তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। "ঝরা ফুলে"র ছন্দও প্রায় সর্ব্বত্র ভাবের অনুগামী। আর, শব্দ-চয়নেও শুণপণার পরিচয় আছে। দুই এক স্থলে যতিভঙ্গ ও মিলের দুর্ব্বলতা আছে। কালিদাস বলিয়াছেন,—

"একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষিবাঙ্কঃ।"

আশা করি, ভবিষ্যতে কাব্যের প্রসাধনে আরও অবহিত, আরও সাবধান হইবেন।

নবীন কবি কাব্যলক্ষ্মীর কুঞ্জের তরুবীথিতে প্রবেশ করিয়াছেন। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। তরুণ জীবনের আশায়, আনন্দে, উন্মাদনায় উচ্ছলিত হইয়া হৃদয়বীণার তারে ঝঙ্কার দিয়াছেন। সে ঝঙ্কার মধুর। সূচনা আশা-প্রদ। এই সৌন্দর্য্যবৈভব ও বর্ণনা-শক্তি যদি সাধনায় ও ভারতীর কৃপায় উপচিত হয়, কবি যদি কাব্যকুঞ্জের গন্তব্যপথে অগ্রসর হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তাহা হইলে বাঙ্গলা সাহিত্যে তাঁহার নাম থাকিবে। "ঝরা ফুলে" যে আভাস দেখিতেছি, তাহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হয়। আশীর্ব্বাদ করি, নবীন কবি করতালি ও মুদ্রাদোষের মোহ অতিক্রম করিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হউন, এবং যশোমাল্য লাভ করুন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

মোহিনী

(কোন সুন্দরী বালিকাকে দেখিয়া লিখিত হইল)

(১)

কোন্ সে মন্ত্রে কোন্ সে তন্ত্রে
কুহকিনী তুই যোগিনী ?
কোন্ সে যোগে কোন্ বিয়োগে
যাদুকরী তুই মোহিনী ?
হীন ও ক্ষীণ এ হিয়া-বীণ,
তা'তেও বাজালি সোহিনী !

(২)

চৌদিকে ধরা, আঁধার ভরা,
বিকট ঘোর তমস্বিনী,—
কেমনে কন্যা আলোক-বন্যা
আনিলি ওলো কুহকিনী ?
ঘুচিল মসী, হাসিল শশী,
জ্বলিল উজল রোহিণী।

(৩)

কত সে জপ, কত সে তপ,
কত সে কঠোর সাধনা
করিয়াছিনু, তাই লভিনু
তোরে কে তুবন ভূষণ

দরশে তোর　　নন্দিনি মোর
ফলিল আজি আরাধনা !

(৪)

অলক শুভ্র,　　টগর শুভ্র
বিলোকি' ও হাসি নন্দিনি।
আত্মা-বধূ　　পিয়েছে মধু,
নাচিছে কটিতে কিঙ্কিনী !
আজি সে মুক্তা　　হরষ-যুক্তা,
আর সে রবে না বন্দিনী !

(৫)

তোর ও অঙ্গে　　যমুনা রঙ্গে
বহিছে মোহিনি, বালিকা !
নদীর তীরে　　বীর সমীরে
শত শত ফুল-বাটিকা।
তোর ও দেহে　　ফুল-দেহে
হাসিছে রূপসী রাধিকা !

(৬)

খেলিছে অঙ্গে　　যমুনা রঙ্গে ;
ললিত ত্রিভঙ্গ নাচিছে !
দেবতা যত,　　নয়ন নত,
করযোড়ে কি গো যাচিছে !
এ কি রে রূপ !　　এ কি রে রূপ !
মোরও মায়া-ফাঁস কাটিছে !

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

পূজার আহ্বান

এখনো বোধন সানায়ের তান পশেনিক' কানে তোর,
ওরে রে প্রবাসী ভাঙ রে শিকল ভাঙ রে ঘুমের ঘোর।
ভুলে যাও আছে যত তুচ্ছ কাজ,
জন্মভূমি তোমা ডেকেছেন আজ,
সকল যন্ত্রী সকল কর্ম্মী সকল পরের দাস !
চল ছুটে চল, দিন বয়ে গেল ছিঁড়ে ফেল সব পাশ।

ছুড়ে ফেলে দাও সব দায়িত্ব প্রভুর গৃহের চাবি,
নিয়ে এস আজি অটল অবুঝ সব আবদার দাবি।
হোক্ শত গোল, ভুল কাটাকাটি,
থাক্ গোঁজামিল থাক্ খাটাখাটি,
হিসাব নিকাশ পলা'ক চুলোয় সকল বাঁধন হারা,
তুমি ছুটে আজি বাতাসে বেরোও ভাঙিয়া লৌহকারা।

বাঁশরীতে বাজে বারোঁয়া রাগিণী গৃহদ্বারে থাকি থাকি,
সব আয়োজন হইয়াছে শেষ তুমি শুধু আছ বাকী

একমাস হ'তে পথপানে চাওয়া,
জননীর নাই পাওয়া পরা নাওয়া.
লক্ষকাজের মাঝেও কে যেন বাতায়নে থাকে চেয়ে।
ঘুরে দিগন্তে প্রতি তরী পানে অনিমেষ তব মেয়ে॥

শিউলি কুসুমে আঙিনা ভরেছে আলপনা গেছে ঢাকা।
অলি পাখী ভুলে আবাহন সভা রচেছে দাড়িম শাখা।
কদলী কুঞ্জ 'কাঁদি' ভারে নত,
মালঞ্চে ফুল সঞ্চিত কত,
ধবলী আজিকে চালিতেছে দুধ, বাতাসি মোতিছে ঘরে।
দুরু দুরু বুকে কল্পনায় সুখে গৃহ যে গিয়াছে ভরে॥

এখনো নগর-আগারে ঘর্ম্ম মুছিছ, ফেলিছ শ্বাস,
পিঞ্জর দুয়ারে দাঁড়ায়ে ও পাখী হের আজি নীলাকাশ।
আসুক ঝঞ্ঝা, আসুক বৃষ্টি,
রসাতলে যাক সকল সৃষ্টি,
'ছুটে চলে' এস, নিয়ে টান ওন, ঠেল শকটের চাকা।
কিছু না হারা'য়ে, কিছু কাঁধে লয়ে, ছুটে চল কাদামাখা॥

কত ভুল হ'লো কি হ'বে ভাবিয়া, কত রয়ে গেল পড়ে।'
'তালিকা মতন বরাতী কয়টা কিনেছ ত ভাল করে?'
না হয় না হোক্ তুমি ছুটে যাও,
যাহা থাকে থাক্, লও যাহা পাও,
হাসিমুখে শুধু গৃহদ্বারে এস গোধূলির ধূলি মাখি'।
সেথা যে হৃদয় বড়ই ক্ষুধিত, তৃষিত যে বড় আঁখি।

শ্রীকালিদাস রায়।

———•———

১২৮৩

বঙ্গদর্শন

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র

আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে নীচ ব্যবসায়ী ও দরিদ্র বলিয়া কাহারও নায়কত্বে বাধা জন্মিতে পারে না। কিন্তু নীচ ব্যবসায় ও দারিদ্র্যই মুকুন্দরামের এ কাব্যের নায়কের নায়কত্বের হেতু নহে। কালকেতু ও ফুল্লরা কাব্যের নায়ক ও নায়িকা, দরিদ্র এবং হীন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত বটে, কিন্তু ইহাদের চরিত্রে যে সৌন্দর্য্য আছে, তদ্বারাই তাহারা কাব্যের নায়ক ও নায়িকা হইবার যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মনুষ্য ও দেবত্বের নিকট সম্পর্ক দেখাইবার জন্য কবি তাঁহার নায়ক ও নায়িকাকে শাপভ্রষ্ট দেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, অতএব বিশ্বনাথ কবিরাজও এখানে কবির ছল ধরিতে পারিবেন না। "তত্রৈকো নায়কঃ সুরঃ" ঠিক আছে। বলা বাহুল্য যে কবি কোনও আদর্শ গড়িতে বসেন নাই; তিনি কোনও একটা মস্ত গোছের স্বপ্ন দেখিয়া তাহা কুস্বপ্নে পরিণত করেন নাই। তাঁহার যে সরল ও প্রবল বিশ্বাস ছিল—মা যাহার প্রতি কৃপা করেন সে সকলই পায় ও মা যাহার প্রতি বিরক্ত হন সে সকলই হারায় —শুধু এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়াই তিনি কাব্য-প্রণয়নে ব্রতী হইয়াছেন। তিনি যে উপাখ্যান দ্বারা এই তথ্য সাব্যস্ত করিতে চাহিয়াছেন সেই উপাখ্যানে যে মনুষ্য-চরিত্রগুলি তাঁহাকে আঁকিতে হইয়াছে, তাহা তিনি সরল কল্পনার বলে সম্পূর্ণ করিয়া আঁকিতে পারিয়াছেন।

তাঁহার প্রথম উপাখ্যানের নায়ক কালকেতু ধর্ম্মকেতু নামক একজন ব্যাধের পুত্র। তাহার মা নিদয়া দেবীর প্রসাদে এই পুত্রটী লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মকেতু ও নিদয়ার চরিত্র যতটুকু কবি দেখাইয়াছেন তাহা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে তাহারা ধর্ম্মপরায়ণ সুগৃহস্থ, সম্পন্ন গৃহস্থ নয়, কিন্তু তথাপি অতিথিসৎকারাদি কার্য্যে রত। ইহাদেরই ঘরে দেবীর ইচ্ছায় শাপভ্রষ্ট ইন্দ্রকুমার নীলাম্বর কালকেতু রূপে অবতীর্ণ হইলেন। কালকেতুর শিক্ষাদি যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা ব্যাধের উপযুক্ত শিক্ষা; কালকেতুর খেলাধূলা বীর্য্যবান তেজস্বী বালকের মত। তাহার বিদ্যা ধনুর্ব্বিদ্যাতেই প্রায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

আমরা দেখিতে পাই যে ব্যাধ বলিয়া কথিত হইলেও এই ব্যাধনন্দনের সংস্কারাদি উচ্চ জাতির মতনই হইয়াছিল

ইহার নামকরণ, কর্ণবেধ, বিবাহাদি সংস্কার, বৈদিক মতে সম্পন্ন হইয়াছিল, অতএব বোধ হয় এই ব্যাধজাতি তখন নিতান্ত ঘৃণিত ছিল না। কিন্তু ইহাদের ব্যবসায় যে অসদ্ভাস্ত ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, অতএব সেই ব্যবসায়ের উপযোগী শিক্ষাই কালকেতু পাইয়াছিল। কালকেতু যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইতে না হইতে তাহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইল ও তাহার বিবাহ হইল। এই-বিবাহ ব্যাপার কবি সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন; কালিদাস যেমন অজ ও মহাদেবের বিবাহ বর্ণনা করিয়াছেন, সেই রূপ কবিকঙ্কণও করিয়াছেন। কবি কোন অঙ্গটাই বাদ দেন নাই; ঘটকালি হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহের শেষ বর কন্যার বাড়ী আসা পর্য্যন্ত সব খুঁটিনাটিই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। ইহারই ভিতর ঘটকের একটি জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তিও তুলিয়া রাখিয়া-ছেন সে মূর্ত্তি এখনও আমাদের চক্ষে প্রায়ই পড়ে। বিবাহ-উৎসবে কাহার আনন্দ, কাহার ব্যস্ততা, কাহার উৎসাহ, সকলই কবির এই চিত্র মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এই চিত্রে পাই না কেবল কালিদাসের সুন্দর উপমাগুলি; না থাকাই সম্ভব, কারণ অজ ও ইন্দুমতী এবং শিব ও গৌরীর সম্বন্ধে যে উপমা প্রয়োজন বা উপযুক্ত তাহা একটি ব্যাধ ও একটি ব্যাধনারীর সম্বন্ধে প্রযুক্ত করিলে শোভা পাইত কি না সন্দেহ। কবি একটি নিত্যব্যবহৃত উপযুক্ত উপমা ঘটকের মুখে বসাইয়াছেন—

সেই বর যোগ্য কন্যা তোমার দুহিতা।
খুঁজিয়া পাইল যেন হাঁড়ির মত সরা॥

উপযুক্ত কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া, পুত্রবধূ ঘরে আনিয়া ব্যাধদম্পতী এখন নিশ্চিন্ত মনে পুত্রের প্রতি সংসার-নির্ব্বাহের ভার দিয়া পুরাণাদি ধর্ম্ম-কথা শ্রবণে ও সাধুসঙ্গে জীবন পাত করিতে পারিলেন।

কালকেতু এমন বাপ মার ছেলে, অতএব তাহার বেশী বিদ্যা না থাকুক তাহার ধর্ম্মে মতি ছিল, কর্ত্তব্য নিষ্ঠা ছিল, জনক জননীর উপর ভক্তি ছিল। তাহার পত্নী ফুল্লরাও কর্ত্তব্যপরায়ণা। কালকেতু মৃগয়া করিয়া পশু আনিত, ফুল্লরা সেই সকল পশুর মাংস হাটে বিক্রয় করিত ও তদ্দ্বারা যে অর্থাগম হইত তাহা হইতে ভোজন সামগ্রী কিনিয়া বাটী ফিরিত। বাটী ফিরিয়া রন্ধন করিয়া শ্বশুর ও শ্বশ্রূকে তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করাইত। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পুত্র ও "কুলধর্ম্মরক্ষণের হেতু" "গৃহকর্ম্মে দড়" বধূ পাইয়া ধর্ম্মকেতু ও নিদয়ার কাল বড় সুখেই কাটিতে লাগিল। কিন্তু এ সুখের মোহে আবদ্ধ হইয়াই তাহারা থাকিল না, শেষ বয়সে এমন পুত্র ও পুত্রবধূকে ত্যাগ করিয়া পুণ্যতীর্থ কাশীধামে চলিয়া গেল। এই সামান্য ব্যাধদম্পতীর মনে ধর্ম্মপিপাসা সাংসারিক সুখকে পরাস্ত করিল। পিতৃ-মাতৃবৎসল পুত্র ও তাহার সহধর্ম্মিণী তাঁহা-দের বিচ্ছেদে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল; বেশভূষা ত্যাগ করিল, এবং মাসে মাসে 'সম্বল' যোগাইয়া নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিল। এতদিন ধর্ম্মকেতু ও নিদয়ার সংসার ছিল; তাহারা মুক্তিচিন্তায় সংসার ত্যাগ করিলে এখন কালকেতু ও ফুল্লরার

সংসার হইল। কালকেতু ও ফুল্লরা ধর্ম্ম-কেতু ও নিদয়ার সৎশিক্ষায় অনেক পরিমাণে সংশোধিত চিত্ত লইয়া সংসার-ধর্ম্ম করিতে লাগিল।

সংসার চলিতে লাগিল; আগেকার মতন কালকেতু মৃগয়া করিয়া আনে; ফুল্লরা তাহা বাজারে বিক্রয় করে এবং সঞ্চিত ধন হইতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। কিন্তু এই সামান্য অর্থ হইতে সংসারযাত্রা অতি কষ্টে নির্ব্বাহ হয়; উদ্বৃত্ত কিছু থাকে না, রোজ আনে রোজ খায়। কালকেতু তো আজকালকার লুচির ছক্কা খাওয়া সৌখীন বাবু ছিল না, তাহার খাই খরচটা বড় বেশী, কবি কহিয়াছেন—

শয়ন কুৎসিৎ বীরের ভোজন বিটকাল।

সাহসী কবি নিজ কাব্যের নায়কের এমন ভাবে বর্ণনা করিতে পশ্চাৎপদ হ'ন নাই। তিনি কালকেতুর ভোজন বর্ণনা করিয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে ফুল্লরার স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণতা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ফুল্লরা এখন গৃহিণী, সে কেমন করিয়া স্বামীকে আদর যত্ন করিত, কেমন করিয়া স্বামীর সুখ অন্বেষণ করিত, সকলি কবি দেখাইয়াছেন। একটি সমগ্র সাংসারিক চিত্র উন্মোচনার্থ কবি এই ভোজন ব্যাপার বর্ণনা করিয়াছেন। কালকেতুর সংসারে দারিদ্র্য কেন ঘোচে না তাহার ইহাই একটা মস্ত কারণ। ফুল্লরার দরিদ্র সংসার কিন্তু অশান্তির সংসার নহে। অশান্তি নাই বলিয়া দুঃখ নাই তাহা নহে। অন্ন চিন্তা ভয়ঙ্করী—অন্নচিন্তায় ফুল্লরা সর্ব্বদাই কাতরা, স্ত্রীজাতির চিরবাঞ্ছিত সাজ-সজ্জা তাহার কিছুই নাই, তাহাতে কি তাহার মনে খেদ নাই? খেদ আছে, তাহা কবি ঢাকেন নাই; ফুল্লরা তপস্বিনী নহে, ঋষিপত্নী নহে, সে সামান্যা ব্যাধরমণী, সৎশিক্ষাবশতঃ পতিসেবাপরায়ণা, অতএব অত দুঃখেও আত্মহারা নহে। মুকুন্দরাম স্বাভাবিক আদর্শ সৃজন করিতে জানিতেন না, তাই ক্ষুদ্র ব্যাধরমণীকে সর্ব্বাবস্থাতেই নিজের অদৃষ্টে সুখী করেন নাই। উপবাস-চিন্তা ফুল্লরাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য আত্মহারা করিয়াছিল—সেই মুহূর্ত্তে ফুল্লরা কায়মনোবাক্যে সতী হইয়াও নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়াছিল। ফুল্লরার তৈল বিনা কেশ রুক্ষ, বসন-ভূষণ বিনা অঙ্গ শোভাহীন, তাহার ঘর একটি তালপাতায় ছাওয়া বড়ে ঘর, বর্ষার বৃষ্টি আটকায় না, অর্দ্ধেক দিন ক্ষুদ কুঁড়া নয় আমানি খাইয়া দিন কাটে। ফুল্লরার দুঃখ কবি "বারমাস্যায়" সবিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন। এমন অবস্থাতেও যদি ফুল্লরা নিজের অদৃষ্টে ধিক্কার না দিত তাহা হইলে আমরা মনে করিতাম যে সে রক্তমাংসের শরীরযুক্তা রমণী নহে। কালকেতুর সংসারের দারিদ্র্য কবি নিপুণতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। ফুল্লরা ও কালকেতুর কথোপকথনকালে ও ফুল্লরা ও তাহার সখীর কথোপকথনে কবি কাব্য ভুলিয়া নাটক লিখিয়াছেন।

"ফুল্লরা বলেন বাসি মাংস না বিকায়।
আজি মহাবীর বল সফল উপায়॥
আছয়ে তোমার সই বিমলার মাতা।
লইয়া সেঙ্গাতি ভেট যাও তুমি তথা॥

ইহাতে দুই জনের কথোপকথন আছে

তাহা বলিয়া দিতে হইবে না বোধ হয়। এইরূপ—

আশাসিয়া আইস আইস কহে তার সই।
এতদিন দেখা নাই গিয়াছিলে কই॥
সই! বিধাতা করিল মোরে দরিদ্রের কান্তা।
চারি প্রহর দিন করি উদরের চিন্তা॥

প্রথম কয় ছত্রে ফুল্লরার প্রশ্ন ও কালকেতুর উত্তর, এবং দ্বিতীয় ছত্র চতুষ্টয়ে ফুল্লরার সখীর প্রশ্ন ও ফুল্লরার উত্তর লিপিবদ্ধ হইয়াছে; কবি মানসচক্ষে ইহাদের মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, কল্পনার কর্ণে তাহাদের বচনগুলি শুনিতে পাইয়াছিলেন, তাই সেই কথাগুলি যেমন শুনিতেছিলেন তেমনি লিখিয়া গিয়াছেন; একটা যে আর একটার উত্তর সে কথা বুঝাইয়া বলিবার তাঁহার অবকাশ ছিল না। রিক্ত হস্তে প্রত্যাগত স্বামীকে দেখিয়া ফুল্লরার মূর্ত্তি ও তাহার মনের ভাব, তাহার কথোপকথন ও কার্য্য, কালকেতুর কথা ও কার্য্য কবি প্রত্যক্ষ ও কর্ণগোচর করিয়াছিলেন। দুই সখীর বহুকাল পরে মিলন, দুই জনের আনন্দ, কবি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলেন ও অনুভব করিতে পারিতেছিলেন। সেক্সপীয়র, কালিদাসাদির মত কবিকঙ্কণ এ বিষয়ে অদ্ভুত ক্ষমতাশালী ছিলেন। তিনি যে চিত্র আঁকেন তাহা স্পষ্ট দেখিয়া আঁকেন।

আমরা দেখাইয়াছি যে ফুল্লরার এক মুহূর্ত্তের জন্য আত্মনিগ্রহিতে ধিক্কার দিবার প্রবৃত্তি আসিয়াছিল। যে কারণবশতঃ তাহার এই প্রবৃত্তি হইয়াছিল, ঠিক সেই কারণে কালকেতুর মনেও আপন অদৃষ্টে ধিক্কার দিবার ইচ্ছা জাগিয়াছিল। "অন্নচিন্তা ভয়ঙ্করী" তাহাকেও অভিভূত করিয়াছিল—কোন্ সংসারীকে না করে? তাহার চিন্তা ও তাহার দুঃখ ও আত্মগ্লানি কবি এমন সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে আমাদের চক্ষেও জল না আসিয়া থাকিতে পারে না।

"দুখিনী ফুল্লরা মোর আছে প্রতি আশে।
আজ কি কহিব মায়া আমি তাহার সকাশে॥
তৈল লবণের কড়ি ধার ছয় বুড়ি।
মণ্ডর ঘরের ধান ধারি দুই আড়ি॥
কিরাত পাড়াতে বসি না মিলে উধার।
হেন বন্ধুজন নাহি কেহ সহে ভার॥
এথাই নরক স্বর্গ বলে ভাগবতে।
কিবা সুখ পাইতে আমি আইনু মরতে॥
সুকৃতি পুরুষ জীয়ে সুখভোগ হেতু।
দুঃখ ভোগ করিবারে জীয়ে কালকেতু।

এখন দুঃখের সংসার, কিন্তু অশান্তির সংসার নহে, কারণ দুই জনেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট, তাই দারিদ্র্য-নিবন্ধন পরস্পরের উপর কাহারও বিদ্বেষ ভাব নাই, উভয়ের ভিতর মনোমালিন্য নাই। এত দুঃখেও ফুল্লরা জানিত যে—

স্বামী বনিতার পতি, স্বামী বনিতার গতি
স্বামী বনিতার সে বিধাতা।
স্বামীই পরম ধন, স্বামী বিনে অন্য জন
দেহ নহে সুখমোক্ষদাতা॥

সকলের উপর সুখ তাহার স্বামীর চরিত্রে বিশ্বাস; সে জানিত যে তাহার স্বামী দরিদ্র হইলেও সচ্চরিত্র ও নিষ্পাপ; সে জানিত যে তাহার স্বামীর স্নেহে তাহার আর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। এই জন্য কালকেতুর

সংসার দারিদ্র্যের হইলেও অশান্তি ছিল না। এই অশিক্ষিতা ব্যাধরমণী—যে হাড় মাংস বিক্রয় করিয়া খায়—সেও আমাদের চির-স্মরণীয়া সীতা সাবিত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত, অবস্থার বিভেদে হয় তো সে আদর্শ একটু খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে—কিন্তু তথাপি ফুল্লরার চরিত্রে ভারতবর্ষের রমণীর একটী জীবন্ত ছবি উঠিয়াছে। বোধ হয় ভারতবর্ষের বলা ঠিক হইল না, কারণ প্রেমময়ী রমণী জগতের সর্ব্বত্রই এমনই নির্ভরশীলা ও বিশ্বাসবতী।

কিন্তু আজ এই বড় দুঃখের দিনে বুঝি দুঃখিনী ফুল্লরার সে সুখও ঘুচিয়া যায়। আমরা দেখিয়াছি যে স্বামীর পরামর্শ মত সে সখীর বাটী হইতে ভোগ্য দ্রব্য ঋণ করিতে গেল, এবং তাহার স্বামী তাহার পরিবর্ত্তে হাটে মাংস বিক্রয় করিতে গেল। সখীর বাটী হইতে ফিরিয়া ফুল্লরা দেখিল তাহার পর্ণকুটীর রূপের জ্যোতিতে আলোকিত—এক অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী তাহার কুটীর আলো করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। সে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সবিস্ময়ে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, এবং তাহার উত্তরে জানিতে পারিল যে সে ব্রাহ্মণকন্যা, সপত্নীর জ্বালায় গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছে এবং কিছু দিন তাহার গৃহে থাকিতে চায়। কি সর্ব্বনাশ! তাহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; শেষে কি স্বামীর স্নেহেরও বখ্‌রাদার জুটিবে? সে যদি তখন জানিত যে আজ তাহার বড় সৌভাগ্য তাহা হইলে তাহাকে অত কষ্ট পাইতে হইত না, কিন্তু অভয়া তাহার সহিত আজ একটু পরিহাস (practical joke) করিতে বদ্ধ-পরিকর, তাই সে জানিল যে কোনও গৃহস্থ বধূই পতিগৃহ ত্যাগ করিয়া তাহার গৃহে বাস করিতে আসিয়াছে। অতএব তাহার মুখ খুলিল, অনেক সারগর্ভ উপদেশ দিয়া সে সেই অভ্যাগতাকে ফিরাইতে চেষ্টা করিল—শেষ তাহার সহিত গিয়া তাহার শাশুড়ী ননদকে বুঝাইবার ভার পর্য্যন্ত লইতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সুন্দরী জোর করিয়া বসিলেন যে তাঁহার আর সতীনের জ্বালা সহ্য হয় না, তিনি সেই খানেই থাকিবেন—

"কি আর জিজ্ঞাসা কর আইলাম তোমার ঘর,
বীরের দেখিতে নারি দুখ।
দিয়া আপনার ধন তুষিব বীরের মন
আজি হৈতে পাবে বড় সুখ॥

খাও পর যত তুমি সকল যোগাব আমি
আমাকে ত না বাসিহ ভিন্।
সমরে কানন ভাগে থাকিব বীরের আগে
আজি হৈতে সম্পদের চিন্॥"

কিন্তু সম্পদের লোভে ফুল্লরার মন টলিল না, সে সুন্দরীকে আবার বুঝাইতে লাগিল—

"তোরে দেখি যে উত্তম জাতি, দেবতা সমান কাঁতি
কোপ কর নীচের সমান।
ছাড়িয়া পতির পাশ, কেনে আইলে পরবাস
আপনার কি সাধিলা মান॥
যদি সতিনী কোন্দল করে, দ্বিগুণ বলিবে তারে
অভিমানে ঘর ছাড় কেনি।
কোপে করি বিষপান আপনি ত্যজিবে প্রাণ
সতিনের কিবা হবে হানি॥

অবলা অধম জাতি যদি থাকে এক রাতি
পরের ভবনে কদাচিত।
ছল ধরে বহু জন লোকে করে গঞ্জন
অবিচারে কৈলে অনুচিত॥"

কথাগুলি খাঁটি লাংসারিক জ্ঞানের পরিচয় দিতেছে। ফুল্লরার চরিত্রের একাংশ কবি এইরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। এই উপদেশ দিয়া ফুল্লরা অনেক পৌরাণিক কাহিনী বিবৃত করিল। উকীল যেমন একটা তর্ক উত্থাপিত করিয়াই তাহা নজীরের দ্বারা সমর্থন করিতে উৎসুক হয়, ফুল্লরাও তেমনি নিজের কথা পৌরাণিক কাহিনীরূপ নজীর দ্বারা সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তবী ভুলিবার নয়—অভাগতা এবার নূতন বোল ধরিল ;—

"ফুল্লরা সুন্দরি শুন ফুল্লরা সুন্দরি।
আইলাম বীরের দুঃখ দেখিতে না পারি॥
কুলের বহুরী আমি কুলের নন্দিনী।
আপনার ভালমন্দ আপনি সে জানি॥
মোর উপদেশে বা তোমার কিবা কাজ।
আপনি সে রক্ষা করি আপনার লাজ॥
আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে।
আনিল তোমার পতি বাঁধি নিজগুণে॥
হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ যায়া বীরে।
যদি বীর বলে তবে যাব স্থানান্তরে॥
আইলাম তোমার ঘর হিত করিবারে।
কত না নিষ্ঠুর বাণী বল বারেবারে॥

কথা একবর্ণও মিথ্যা নহে—যথার্থই বীর আজ নিজের "গুণে" এই সুন্দরীকে বাঁধিয়া আনিয়াছে ; অভয়ার পরিহাস-রসিকতা মুকুন্দ-কবি অনুভব করিয়াছেন ; এবং অভয়ার সহিত লুকাইয়া হাসিয়া লইয়াছেন। মুকুন্দরামের হাস্যরস নির্ম্মল আনন্দময়, ইহাতে কোন কুপ্রবৃত্তির সংস্পর্শ থাকে না।

যা হাসিতে থাকুন, এদিকে ফুল্লরার মাথায় বজ্রাঘাত ; 'বীর বাঁধিয়া আনিয়াছে নিজগুণে' শুনিয়া তাহার প্রাণ ছটফট করিতেছে, তাই এই নবীনা অতিথিকে তাড়াইবার জন্য সে এবার উপদেশ ছাড়িয়া নিজের অবস্থা বিবৃত করিতে লাগিল ; বার মাসে যে তাহার কত দুঃখ তাহা বিনাইয়া বিনাইয়া, নানা ছাঁদে বর্ণনা করিল ; আশা, যদি এই দুঃখের কথা শুনিয়া "মাগী" ভয়ে পালায়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, সেও যেমন ধনের লোভে প্রলোভিত হইবে না, সে স্ত্রীলোকও তেমনি নাছোড়বান্দা, তাহাকে ধনের অংশ না দিয়াও ছাড়িবে না। এদিকে যে ফুল্লরার একমাত্র শান্তির কারণ, এই দুঃখ সাগরের একমাত্র তরণী স্বামীর প্রতি বিশ্বাস, তাহাও যাইতে বসিয়াছে। ফুল্লরা আজ যথার্থ দুঃখিনী। তাহার দুঃখের আজ সীমা নাই। যখন কিছুতেই রমণীকে বিদায় করিতে পারিল না, এবং সেই সুন্দরী যুবতী তাহার স্বামী কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছে বলিয়া জোর করিয়া আত্মীয়তা পাতাইয়া নিজ ধনের অংশ দিতে চাহিতেছে, তখন তাহার মনে দারুণ সংশয় উপস্থিত হইল—তবে বুঝি সত্যই তাহার স্বামী এই রূপসীকে লইয়া আসিয়াছেন। তাহার এত দিনের বিশ্বাস—এতদিনের ভক্তি সব ভাসিয়া গেল ; সে বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর সন্ধানে বাহির হইল। ফুল্লরা দেশী খাঁটি স্বদেশী মেয়ে

বলিয়া স্বামীর উপর সন্দেহবশতঃ ভ্রমরের মত গৃহত্যাগ করিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গেল না, রমোলার মত স্বামীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল না, অভিমান বশীভূত হইয়া সহজ বুদ্ধিটুকু হারাইয়া বসিল না। সে তাহার সন্দেহের মীমাংসার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর সমীপে উপস্থিত হইল। স্বামীর সহিত বিবাদ-স্বামীর সহিত মিটানই ভাল এই স্বাভাবিক বুদ্ধিটুকু তাহার ঘটে তখনও বিদ্যমান ছিল। যে-রমণীর সেই বুদ্ধিটুকু লোপ পায় তাহার অনেক দুর্দ্দশা ঘটে; আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণকান্তের উইলে, এবং Mrs. Henry Wood (মিসেস্ হেন্‌রি উড) তাঁহার ঈষ্টলীন নামক গ্রন্থে তাহা দেখাইয়াছেন।

এদিকে কালকেতু ফুল্লরাকে কাঁদিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।—

শাশুড়ী ননদী নাহি নাই তোর সতা।
কার সনে দ্বন্দ্ব করা চক্ষু কৈলি রাঙা॥

ফুল্লরার উত্তরও তেমনি নির্ভীক ও স্বাভাবিক—

সতাসতী নাহি প্রভু তুমি মোর সতা।
এবে ফুল্লরার হৈল বিমুখ বিধাতা॥
কি দোষ দেখিলে প্রভু আজিকার স্বপনে।
দোষ নাহি দেখা কেন কর অপমানে॥
কি লাগিয়া বীর এবে পাপে দিলা মন।
যেই পাপে নষ্ট হৈলা লঙ্কার রাবণ॥
পিপীড়ার পালখ উঠে মরিবার তরে।
কাহার যোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে॥
বামন হইয়া হাত বাড়াইলে শশী।
আখেটীর ঘরে কোতা পাইবে উর্ব্বশী॥
শিয়রে কলিঙ্গ রাজা বড় দুরবার।
তোমারে বধিয়া জাতি লইবে আমার॥

পত্নী স্বামীর কাছে মনের জ্বালার কথা কহিতেছে, সেরূপে ছেঁদো কথার স্থান নাই, তাই কথাগুলি সহজ ও সরল। স্বামী স্ত্রীর যে সম্পর্ক তাহাতে আজ কথা ঢাকিবার অবসর নাই, ফুল্লরাকে স্বামীর নৈতিক চরিত্র সংশোধন করিতে হইবে, অতএব সে নির্ভীক ভাবে স্বামীকে তাহার পাপ-প্রবৃত্তির জন্য অনুযোগ করিল, তাহার ফলাফল বিবৃত করিয়া বুঝাইল। কিন্তু এই কথাগুলি শুনিয়া সত্যনিষ্ঠ সরল ধার্ম্মিক কালকেতুর ক্রোধের সীমা রহিল না; তাহার চিরসঙ্গিনী স্ত্রীর মুখে একি কথা! কালকেতু সত্য পত্নীভক্ত প্রজা নহে, কাজেই কথাবার্ত্তা কায়দা-দোরস্ত নহে, সে পাঁচটা দিব্য খাইয়া অথবা পাঁচটা মিথ্যা কথা বলিয়া সময় নষ্ট করিল না; তাহার উত্তর দৃপ্ত সতেজ ও নৈতিক বলের পরিচায়ক—আদৌ মোলায়েম নহে। ব্যাধ যুবকের উপযুক্ত, সভ্য বাবুর যোগ্য নয়—

পরস্ত্রী দেখিয়ে যেন নিদয়া জননী॥
বেকত করিয়া রামা কহ সত্য-ভাষা।
মিথ্যা হইলে চিয়াড়ে কাটিব তোর নাসা॥

ব্যাধযুবকের চরিত্রের মহত্ত্ব কোথায় —কেন সে একটা কাব্যের নায়ক হইবার উপযুক্ত তাহা এখানে প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যাধের মুখে যেমন কথা সাজে এ তেমনি কথা, কিন্তু এই কথাগুলি হইতে যে একটী সরল নৈতিক সচ্চরিত্রতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার উজ্জ্বল সৌকর্য্য,

সূর্য্যালোক যেমন সমস্ত সংসারকে আলোকিত করে তেমনি কবিকঙ্কণের সমস্ত কাব্যটীকে সৌন্দর্য্যালোকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে। এ সৌন্দর্য্য যদি আমাদের চরিত্রে থাকিত তাহা হইলে আজ আমাদের এত দুর্দ্দশা হইত না।

যাক্, এখন আমরা আবার এই ব্যাধ-দম্পতীর অনুসরণ করিব। কালকেতু ক্রোধ করিল বটে, নিজের চরিত্রে এমন দোষারোপ শুনিলে কাহার না ক্রোধ হয়? কিন্তু হঠকারিতা এই দম্পতীর চরিত্রে ছিল না, তাই সে স্ত্রীর সহিত, তাহার কথার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিবার জন্য হাট হইতে পসরা তুলিয়া গৃহে ফিরিয়া গেল। গৃহে আসিয়া দেখে সত্যই তো

আপনার বাসে।
তিমির ফেটেছে যেন তপন তরাসে॥
ভাঙ্গাকুড়া ঘরখান করে ঝলমল।
কোটী ভানু প্রকাশিত আকাশ মণ্ডল॥

অপূর্ব্ব দৃশ্য—অপূর্ব্ব অবসর! এই রূপের খনি—সৌন্দর্য্যের মণি—অযাচিতভাবে তাহার কুটীরে উপস্থিত, দরিদ্রের ঘরে ঐশ্বর্য্যের ডালি লইয়া, যুবকের ঘরে রূপ যৌবনের উপহার লইয়া, আত্মনিবেদন করিতে উৎসুক হইয়াছে। কালকেতু স্বাধীন, কালকেতু দরিদ্র, কালকেতু যুবক, এমন অবস্থায় রূপের জয় হইবার, প্রলোভনের জয় হইবার পক্ষে একমাত্র বাধা—নৈতিক চরিত্র-বল, ধর্ম্মে নিশ্চলা মতি। যে অবস্থায় পড়িয়া যুলিয়স-সিজার, মার্ক এণ্টনির মত বীর পুরুষেরা পতঙ্গবৎ বহ্নি-মুখে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ঠিক সেই অবস্থায় পড়িয়া আজ এই নগণ্য, অল্প-চিহ্নপরাহত, যৌবনমদমত্ত অশিক্ষিত ব্যাধযুবক, অসার সে ধনের প্রলোভন, রূপের প্রলোভন, যৌবনের আকর্ষণ তুচ্ছ করিয়া যে অপরূপ নৈতিক বলের পরিচয় দিয়াছে তাহাতে সে মনুষ্য মধ্যে উচ্চাসন প্রাপ্তির যোগ্য; যথার্থ মনুষ্যত্ব জাতি-বিচার মানে না, ব্যবসার বিচার করে না। রাজাধিরাজ দুষ্মন্ত যে মনুষ্যত্ব বশতঃ একটী কাব্যের নায়কত্ব দাবি করিতে পরিয়াছেন ঠিক সেই মনুষ্যত্ব, সেই আত্মসংযম, সেই চরিত্রবল আছে বলিয়াই ক্ষুদ্র ব্যাধ হইলেও কালকেতু কাব্যের নায়ক হইবার উপযুক্ত পাত্র। যে প্রশ্নের মীমাংসা করিতে আমরা প্রতিশ্রুত ছিলাম এই-খানে সেই প্রশ্নের মীমাংসা হইল। কেন যে কালকেতু নায়কত্ব প্রাপ্তির উপযুক্ত এতক্ষণে আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম।

কালকেতুর মনুষ্যত্ব সরল ও স্বাভাবিক, সরল ধর্ম্মবিশ্বাসের ফলে প্রসূত; ইহাতে কোনও বিপরীত ভাব মিশ্রিত নাই, ইহাতে কোনও কারসাজি দেখাইবার ইচ্ছা মিশ্রিত নাই। কালকেতুর আত্মসংযম লোক দেখাইবার জন্য নহে, লোক ভুলাইবার জন্য নহে, আত্মপ্রশংসা করিবার জন্য নহে, আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিবার জন্যও নহে। জলে যেমন নিম্নগামিত্ব স্বাভাবিক, তেমনি কালকেতুর চরিত্রে নিরহঙ্কার স্বাভাবিক, আত্মসংযম যেমন স্বাভাবিক, আত্মসংযমের জন্য গর্ব্বের অভাবও তেমনি স্বাভাবিক, কারণ ইহাই এই সরল ধার্ম্মিক যুবকের চরিত্রের নাধুর্য্য আমরা জানি যে এই

ব্যাধের অথবা এই ব্যাধচরিত্র প্রণেতা কবির হৃদয়ে বিশ্বজগৎ প্রবেশ যাচ্ঞা করে নাই, কিন্তু আমরা বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারি যে, যে শুভক্ষণে এই অশিক্ষিত অমার্জ্জিত ব্যাধযুবক স্বতঃ সমাগত সৌন্দর্য্য এবং অর্থের প্রলোভন অনায়াসে বর্জ্জন করিয়া, সংযমের মাহাত্ম্য জগতে প্রতিষ্ঠিত করিল, তখন বিশ্বজগৎ একবার তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্যগ্রাহিণী শক্তি লইয়া তাহাকে মনুষ্যত্বের উচ্চাসনে স্থাপিত করিয়া সৌন্দর্য্যাভিষেকে তাহার জীবনের সেই মুহূর্ত্তটীকে অনন্ত মুহূর্ত্তে পরিণত করিয়াছিল এবং প্রাচীন কবি মুকুন্দরামকে সৌন্দর্য্য-স্রষ্টা কবিগণের মধ্যে একজন অগ্রণী বলিয়া অকুণ্ঠিত ও আনন্দিত হৃদয়ে বরণ করিয়াছিল।

কবি মুকুন্দরাম যে মনুষ্যচরিত্র চিত্রিত করেন তাহাতে অসঙ্গতি দোষ থাকে না। সরলচিত্ত কালকেতু, চিরদিনই সরল; দারিদ্র্যে সরল, ধনী অবস্থাতেও সরল; দরিদ্র যুবক যেমন ধর্ম্মপরায়ণ, ধনী কালকেতুও সেইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ, পরহিতার্থী, দাতা। দরিদ্র ব্যাধ কালকেতু যেমন সকলের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ছিল, ভূম্যধিকারী কালকেতুও তেমনি সকলকার সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ রহিল। কবি মুকুন্দরাম কালকেতুর চরিত্রের পাশাপাশি আরও কয়েকটী চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন সকলগুলিই অশেষ কৃতিত্বব্যঞ্জক। সরলতার পাশে তিনি কূটতা দেখাইয়াছেন। ভাঁড়ুদত্ত ইহার মধ্যে প্রধান। ভাঁড়ুদত্ত একজন স্বার্থপর চতুর লোক, ইহার মতন লোকেরা নিজের স্বার্থ-সাধন করিবার জন্য সব করিতে পারে। ভাঁড়ুদত্তের বিষয় কবিবর রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন তাহাই আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিব। "কবি-কঙ্কণ চণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্তের যে বর্ণনা আছে সে বর্ণনায় মানুষের চরিত্রের যে একটা বড় দিক্ দেখানো হইয়াছে তাহা নহে,—এই রকম চতুর স্বার্থপর এবং গায়ে পড়িয়া মোড়লী করিতে মজবুৎ লোক আমরা অনেক দেখিয়াছি, তাহাদের সঙ্গ যে সুখকর তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু কবিকঙ্কণ এই ছাঁদের মানুষটীকে আমাদের কাছে যে মূর্ত্তিমান করিতে পারিয়াছেন, তাহার একটী বিশেষ কারণ আছে। তাঁহার এমন একটু কৌতুকরস লইয়া সে জাগিয়া উঠিয়াছে যে, সে শুধু কালকেতুর সভায় নয় আমাদের হৃদয়ের দরবারে অনায়াসে স্থান পাইয়াছে। ভাঁড়ুদত্ত প্রত্যক্ষ সংসারে ঠিক এমন করিয়া আমাদের গোচর হইত না। আমাদের মনের কাছে সুসহ করিবার ভাঁড়ু-দত্তের যতটুকু আবশ্যক, কবি তাহার চেয়ে বেশি কিছু দেন নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষ সংসারে ভাঁড়ুদত্ত ঠিক ঐটুকু মাত্র নয়, এইজন্যই সে আমাদের কাছে অমন করিয়া গোচর হইবার অবকাশ পায় না। ... কবিকঙ্কন চণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্ত তাহার সমস্ত অনাবশ্যক বাহুল্য বর্জ্জন করিয়া কেবল একটী সমগ্র রসের মূর্ত্তিতে আমাদের কাছে প্রকাশ পাইয়াছে।"

কবিকঙ্কণের সৃষ্টির ইহাই বিশেষত্ব—ভারতচন্দ্র হইতে তাঁহার প্রভেদ এই-খানেই। কবিকঙ্কণের চরিত্রগুলি একটী সমগ্রতার সহিত ফুটিয়া উঠে। (ক্রমশ)

শ্রীক্ষিতীন্দ্রলাল বসু।

প্রাচীন ভারত

পাটনা কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য এবং বিবিধ গ্রন্থপ্রণেতা সুপণ্ডিত ম্যাক্রিণ্ডল সাহেব, গ্রীশ ও রোমদেশীয় প্রাচীন গ্রন্থকারগণ প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে সকল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন বা স্ব স্ব গ্রন্থে প্রাচীন ভারত বিষয়ক যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, উহা সংগ্রহ করিয়া এবং ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ ও গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া ভারতবাসী এবং বস্তুতঃ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশবাসীরই প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। ভারতবাসীর উপকার করিয়াছেন, কারণ, আমরা প্রাচীন ভারতের একটী সুন্দর চিত্র, যাহা অন্যত্র পাইবার সম্ভাবনা নাই বা যাহা গ্রীক্ ও লাটিন্ শিক্ষা না করিলে অবগত হওয়া যায় না, এই সকল গ্রন্থে দেখিতে পাই। আমাদের প্রাচীন ভারত যে ঘোর তিমিরে আবৃত ছিল না, তাহা আমরা জানিতে পারি। এই সকল বৃত্তান্ত যে সকল চিত্র প্রতিভাত করে, অতীতের সেই মোহন চিত্র দেখিতে দেখিতে কাহার প্রাণে না অভূতপূর্ব্ব আনন্দরাশি উদ্ভূত হয়? পক্ষান্তরে, যে কোন বৈদেশিকই হউন না কেন, প্রাচীন ভারতের এই সকল সমুজ্জ্বল চিত্র, ভারতের স্বর্ণযুগের কাহিনী, পাঠ করিলে ভারতকে আর অসভ্য বর্ব্বরের দেশ বলিয়া তিনি ঘৃণা করিতে পারেন না।

অধ্যাপক ম্যাক্রিণ্ডল সাহেব গ্রীশ ও রোমদেশীয় পুস্তকাদি হইতে এই সকল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া ক্রমে ক্রমে ছয়খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রথম খণ্ডে, মেগাস্থিনিস নামক সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য প্রদেশের দূত তৎকালীন রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্তের রাজদরবারে বাস করিয়া ভারতবর্ষের যে আলেখ্য চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা এবং এরিয়ান নামক অন্যতম গ্রন্থকার যে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহারই প্রথমাংশ গ্রথিত করিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে ইরিথ্রিয়ান সাগরের বাণিজ্যের বিবরণ এবং এরিয়ানের শেষাংশ প্রকাশিত হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডে ম্যাক্রিণ্ডল টিসিয়াস বর্ণিত ভারতবর্ষের প্রাচীন বৃত্তান্ত, চতুর্থ খণ্ডে টলেমি নামক সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক কর্ত্তৃক বিবৃত বর্ণনা, পঞ্চম খণ্ডে আরিয়ন, কার্টিয়াস, জাষ্টিনস, সিকুলাস, প্লুটার্ক এবং ফটিনাস, মহাবীর আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণ সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং ষষ্ঠ বা শেষ খণ্ডে গ্রীশ ও রোমদেশীয় অন্যান্য গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের যে সকল কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ষষ্ঠ খণ্ডের বৃত্তান্ত নিম্নলিখিত গ্রন্থাদি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রথম—হেরোডটস নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রীশদেশীয় ঐতিহাসিক (যাঁহাকে "ইতিহাসের পিতা" Father of History বলিয়া উল্লেখ করা হয়) ভারতবর্ষ সম্বন্ধে

তাঁহার ইতিহাসে স্থানে স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল বৃত্তান্ত এই খণ্ডে প্রথম স্থান পাইয়াছে।

দ্বিতীয়—ষ্ট্রাবো নামক ভৌগোলিক তাঁহার ভূগোলের পঞ্চদশ খণ্ডে ভারতবর্ষের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; বলা বাহুল্য ইহাও এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

তৃতীয়—প্লিনি নামক প্রথিতনামা দার্শনিক, তাঁহার ইতিহাসে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ও উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিবরণ দিয়াছেন; ম্যাক্রিণ্ডল মহোদয় ইহাও সংগ্রহ করিয়াছেন।

চতুর্থ—ইলিয়ান নামক গ্রন্থকার ভারতবর্ষের পশ্বাদির কথা স্বরচিত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন; ইহাও গ্রন্থভুক্ত হইয়াছে।

পঞ্চম—রোমক সম্রাট কনষ্টাণ্টাইনকে একজন অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার "আলেক-জান্দারের পর্য্যটন কাহিনী' নামক এক সুলিখিত গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ম্যাক্রিণ্ডল এই বর্ণনাও স্বকীয় গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

ষষ্ঠ—কসমাস নামক এক গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থে তাম্রপর্ণী বা লঙ্কাদ্বীপের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; ইহাও সংগৃহীত হইয়াছে।

সপ্তম—অনেকগুলি গ্রন্থে ভারতীয় ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধগণের আলেখ্য আছে। ফার্ডেসানেস নামক এক গ্রন্থকার ভারতীয় দার্শনিকগণের চিত্র দিয়াছেন; ডিয়ন ক্রীসষ্টম ভারতীয় এক সুন্দর চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন; অন্যত্র তিনিই ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের এক বর্ণনা দিয়াছেন; পালাদিয়াস নামক অন্যতম গ্রন্থকার ভারতীয় জাতি ও ব্রাহ্মণগণের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত আরও অনেক গ্রন্থকার অনেক স্থলে সামান্য সামান্য কথা লিখিয়াছেন। এই ষষ্ঠ খণ্ডে এ সকল বৃত্তান্তই দেওয়া হইয়াছে।

অষ্টম—দায়নীসীয়স নামক এক গ্রন্থকার ষটপদীশ্লোকে "পৃথিবীর বৃত্তান্ত" নামক এক কাব্য লিখিয়াছিলেন; এই কাব্যের অন্তর্গত ৮২টী পদ ভারতবর্ষ সংক্রান্ত।

নবম—লেমনস নগরবাসী ফিলস-ট্রেটাস নামক গ্রন্থকার এপলনিয়াসের এক জীবনী প্রণয়ন করিয়াছেন; এ পুস্তকেও ভারতের উল্লেখ আছে।

দশম—নোনাস নামক গ্রন্থকার তাঁহার পুস্তকে ব্যাকাস কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ বিজয়ের বর্ণনা করিয়াছেন।

একাদশ—দায়দরস সিকুলাস পৃথিবীর যে ইতিহাস লিখিয়াছেন তন্মধ্যে 'সতীর' বৃত্তান্ত দিয়াছেন।

দ্বাদশ—উপরোক্ত অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ ব্যতীত অন্যান্য কয়েকখানি গ্রন্থে প্রাসঙ্গিকভাবে ভারতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাও সংগৃহীত হইয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে।

ম্যাক্রিণ্ডল সাহেব এই ষষ্ঠ খণ্ডের যে ভূমিকা লিখিয়াছেন তাহাতে এই সকল বর্ণনার আবশ্যকতা, মূল্য প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের

অনেক বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। ভারতবাসীরা নিজেরা ইতিহাস লিখিতেন না। যদিও তাঁহারা দর্শন, কাব্য এবং বিজ্ঞান বিষয়ক ভূরি ভূরি এবং মূল্যবান পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তত্রাপি ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে কোন পুস্তকই দেখা যায় না। প্রাচীন হিন্দুগণের মধ্যে ব্রাহ্মণগণই পণ্ডিত ও উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বরের ধ্যানে এবং এই প্রকার আধ্যাত্মিক ভাবে এরূপ লিপ্ত থাকিতেন যে অন্যান্য কোন বিষয়েই আবদ্ধ থাকিতেন না। এই জন্য অত্যাবশ্যকীয় ঘটনাগুলিও তাঁহারা লিপিবদ্ধ করেন নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ম্যাক্রিণ্ডল সাহেব আলেকজান্দারের অভিযানের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে কোন সংস্কৃত গ্রন্থেই ইহার বিবরণ বা উল্লেখ পাওয়া যায় না। যে সকল গ্রীক ব্যাকট্রিয়ান রাজা আফগানিস্থান বা উত্তর ভারতের প্রান্তদেশে রাজত্ব করিতেন, তাহাদেরও কোন উল্লেখ সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কি প্রকারে বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত করিয়া ব্রাহ্মণপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহারও কোন বিশেষ নিদর্শন কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এই সকল দৃষ্টান্তে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস গভীর তমসাচ্ছন্ন ছিল এবং গ্রীক ও রোমদেশীয় ইতিহাস ও পুস্তকাদিতে যে সকল বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা বস্তুতঃই অতীব মূল্যবান। ম্যাক্রিণ্ডল সাহেব বলেন যে এই সকল বর্ণনা না থাকিলে এইকালীন ভারতীয় ইতিহাসের কোন উপাদানই পাওয়া যাইত না। এই উপাদান সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করিয়াই প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের একটী "নকসা খাড়া" করা গিয়াছে।

ম্যাক্রিণ্ডল সাহেব যে সকল বৃত্তান্ত-সংগ্রহ করিয়াছেন উহাকে সাধারণভাবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—প্রথম যে সকল লেখক খৃষ্টীয় শতাব্দী আরম্ভ হইবার প্রারম্ভে নিজ নিজ পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা উহার পরে প্রণয়ন করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ আমরা প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থকারদিগের বিষয় আলোচনা করিব। কিন্তু এই শ্রেণীস্থ গ্রন্থকারদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—প্রথম যাঁহারা আলেকজান্দারের অভিযানের পূর্ব্বে স্ব স্ব গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা উক্ত অভিযানের পরবর্ত্তী কালে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাঁহারা অভিযানের পরবর্ত্তীকালে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা উক্ত অভিযানের ফলে অধিকতর বৃত্তান্ত সংগ্রহে যে সক্ষম হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। যাহা হউক, প্রথমোক্ত শ্রেণীর প্রথমোক্ত বিভাগে নিম্নলিখিত গ্রন্থকার ও তাঁহাদের পুস্তকের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রথম—করিয়ান্দা নিবাসী স্কাইলাক্স লিখিত বৃত্তান্ত; স্কাইলাক্স কাসপেটাইরাস হইতে সিন্ধুনদ দিয়া সমুদ্রে গিয়া বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; যাত্রা পারস্য রাজ দারিয়সের আদেশে সংঘটিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয়—মিলেটাস নগরবাসী হেকাটিয়স

য়াস লিখিত "ভূগোলে" ভারতীয় অনেক গুলি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

তৃতীয়—হেরোডোটাসের ইতিহাস; ইহার বিষয় পূর্ব্বে কথঞ্চিৎ উল্লেখ করা হইয়াছে।

চতুর্থ—খৃষ্টীয় চতুর্থ পূর্ব্ব শতাব্দীতে টিসিয়াস নামক এক গ্রন্থকার "ইণ্ডিকা" নামক পুস্তকে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক গুলি অত্যদ্ভুত কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন।

টিসিয়াসের বর্ণনা প্রকাশিত হইবার প্রায় সত্তর বৎসর পর আলেকজান্দারের অভিযান-ব্যাপার নির্ব্বাহিত হয়; অভিযানান্তর্গত গ্রীকীয়গণ ইহার পর টিসিয়াসের বর্ণনা কতদূর সত্য বা মিথ্যা তাহার সুস্পষ্ট আভাষ পাইয়াছিলেন। মহাবীর মাসিডনাধিপতির অভিযান অনেক গ্রন্থকারের মতে কেবল "সামরিক" অভিযান মাত্র নহে, এই অভিযানের ফলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক ঘটিয়াছিল, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। আলেকজান্দার স্বয়ং প্রসিদ্ধ দার্শনিক আরিষ্টটলের শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গীয় কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে অনেকেই সুশিক্ষিত ছিলেন। কেহ কেহ অভিযানসংক্রান্ত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ, কেহ কেহ সৈন্যবাহিনী যে সকল দেশের মধ্য দিয়া গমনাগমন করিয়াছিল ঐ সকল দেশের আচার, ব্যবহার, অধিবাসিগণের রীতিনীতি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল কর্ম্মচারিগণের মধ্যে টলেমী, আরিষ্টবুলাস, আলেকজান্দারের নৌসেনাপতি নিয়ার্কাস, রণতরীপরিচালক অনেসিক্রিটস, মাসিডনাধিপতির সেক্রেটারী ইউমিনিস, কারেস, কালিসথিনিস, ক্লিটার্কাস, পলিক্লিটাস, আনাক্সিমিনিস, ডিওনিটাস, বিটন, এবং কিসিলাস প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল লেখকগণের বৃত্তান্ত হইতে তৎকালীন ভারতের অনেক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়।

ইহাদের পরে, মেগাস্থিনিস, ডিমাকস এবং ডাইওনিসিয়াস দূতস্বরূপ সিরিয়া ও মিশর হইতে ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইঁহারাও ভারতবর্ষের অনেক বৃত্তান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। সুবিধার মধ্যে এই সকল বৃত্তান্তগুলি বিশ্বাসযোগ্য; কেননা ইহারা স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন বা স্বকর্ণে যাহা শুনিয়াছেন তাহাই স্ব স্ব পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভারতের সঠিক বৃত্তান্ত ইহারাই সর্ব্বপ্রথমে অন্যান্য জাতির নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং সে জন্য ইহারা বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আলেকজান্দারের কর্ম্মচারিগণ ভারতের সীমান্ত প্রদেশ মাত্রই দেখিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী গ্রীকদূতগণ তৎকালীন রাজধানী পাটলিপুত্র পর্য্যন্ত ভ্রমণ করায়, প্রথমোক্ত লেখকগণ অপেক্ষা যে অধিক বৃত্তান্ত সংগ্রহে সক্ষম হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহের কোন হেতু দেখা যায় না। মেগাস্থিনিসের বর্ণনা হইতেই বর্ত্তমান পাটনা বা তৎকালীন পাটলিপুত্রের (গ্রীকবর্ণিত পালি বোথ্রা) বর্ণনা পাওয়া যায় এবং তাঁহার বর্ণিত বর্ণনা হইতেই পাটলিপুত্রই যে বর্ত্তমান পাটনা তাহারও নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। মেগাস্থিনিস

পাটলিপুত্রেই চন্দ্রগুপ্তের (গ্রীক সান্দ্রা-কোটাস) দরবারে বাস করিতেন এবং চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার মহিষীর (সেলুকাস-দুহিতা) সহিত সাক্ষাৎকালে অনেক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এইস্থানে অবস্থানকালীন তিনি যে সকল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেন, তাহাই তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ইণ্ডিকা নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়া তৎকালীন ভারতের আলেখ্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে।

মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা হইতে পরবর্ত্তী অনেক লেখক ভারতের কথা সংগ্রহ করিয়া নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মেগাস্থিনিসের সমসাময়িক কালে এমন কি পরবর্ত্তীকালেও অনেকদিন পর্য্যন্ত তাঁহার বৃত্তান্ত কেহই বিশ্বাসযোগ্য বিবেচনা করিতেন না। ষ্ট্রাবো তাঁহাকে অনেকবার মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন; কিন্তু তত্রাপি মেগাস্থিনিসের গ্রন্থ হইতে ভারতীয় চিত্র নিজগ্রন্থে উদ্ধৃত করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করেন নাই। যাহা হউক, বর্ত্তমানে সকলেই মেগাস্থিনিসের বৃত্তান্ত বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করেন। ষ্ট্রাবোর অবিশ্বাসের প্রধান কারণ এই যে মেগাস্থিনিস তাঁহার ইণ্ডিকাগ্রন্থে অনেকগুলি অদ্ভুত মনুষ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এই সকল মনুষ্যের বৃত্তান্ত সংস্কৃত গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। সুতরাং পরিষ্কার রূপেই দেখা যাইতেছে যে মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে বাসকালীন লোকমুখে এই সকল মনুষ্যের কথা অবগত হইয়াই নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছিলেন।

ডিমাকস্ নামক অন্যতম গ্রীসীয় দূত ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু এই পুস্তকের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই অবগত হওয়া যায় না। এই মাত্র অবগত হওয়া যায় যে ডিমাকসের পুস্তক দুই খণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং ভারতবর্ষের আয়তন সম্বন্ধে তাঁহার বর্ণনা অত্যন্ত অতিরঞ্জিত হইয়াছিল। টলেমী ফিলাডেল্‌ফিয়াস কর্ত্তৃক প্রেরিত দূত ডাইওনিসিয়াস সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না।

মেগাস্থিনিসের গ্রন্থ রচনার কিছুকাল পরে পাট্রোক্লিস নামক অন্যতম গ্রন্থকার ভারতবর্ষ, কাস্পিয়ান সাগর প্রভৃতি প্রদেশ সম্বন্ধে এক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। পাট্রোক্লিস প্রথমতঃ সেলুকস নিকেটর এবং পরে প্রথম আন্টিয়োকসের কর্ম্মচারীরূপে কাস্পিয়ান সাগরস্থ প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত ষ্ট্রাবো পাট্রোক্লিসের বর্ণিত বৃত্তান্ত হইতে অনেক বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। পাট্রোক্লিসের বৃত্তান্ত তৎকালে অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত এবং ষ্ট্রাবো ও আলেকজান্দ্রিয়া পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ ইরাটস্থিনিস ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। ইরাটস্থিনিস ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার ভূগোলে যে সকল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রান্ত সীমায় অবস্থিত, ইরাটস্থিনিস এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

পলিবিয়াস নামক অন্যতম গ্রন্থকার পূর্ব্ব খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৪৪ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে) যে পুস্তক প্রণয়ন করেন,

তাহাতে খুব সম্ভবতঃ প্রাচীন ভারত-বিষয়ক মূল্যবান বৃত্তান্ত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় পলিবিয়াসের গ্রন্থের কোন চিহ্ন মাত্র নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সামান্য কয়েক পংক্তি মাত্র অবশিষ্ট আছে।

ইফিসাস নগরবাসী আর্টিমিদোরাস ১০০ পূর্ব খৃষ্টাব্দে তাঁহার 'ভূগোলে' ভারতবর্ষের কিছু কিছু বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও বিশেষ কিছু বিবরণ পাওয়া যায় না।

ফলতঃ দেখা যাইতেছে যে মেগাস্থিনিসের পরে আমরা প্রাচীন ভারতসম্বন্ধে যে সমস্ত বৃত্তান্ত পাই, তাহা বিশেষ মূল্যবান্ নহে এবং তাহাতে আমাদের আকাঙ্ক্ষারও তৃপ্তি হয় না।

অতঃপর, আমরা খৃষ্টের জন্মের পর যে সকল গ্রন্থকারের বৃত্তান্ত পাই, তাহারই আলোচনা করিব।

দুঃখের বিষয় এই সকল গ্রন্থকারই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ দিয়াছেন, তাহা বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়াই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিশেষতঃ ইহাদের মধ্যে কেহই ভারতবর্ষকে চক্ষেও দেখেন নাই। তবে, যতদূর বোধগম্য হয়, তাহাতে পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার এবং কসমসের লেখক সম্ভবতঃ লঙ্কা ও মালাবার কূলে আসিয়াছিলেন। কিন্তু উভয় গ্রন্থকারই নিজ নিজ গ্রন্থে অনেক আবশ্যকীয় বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাতে আমাদের প্রভূত উপকার হইয়াছে।

পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার কে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য এবং তিনি কোন সময়ে নিজ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট মতভেদ আছে। সে যাহা হউক, তাহার গ্রন্থ যে মূল্যবান, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। পেরিপ্লাস ব্যতীত, প্লিনি ভৌগোলিক টলেমি এবং আরও ২।১ জনের লিখিত পুস্তকে ভারতবর্ষের কথা দেখিতে পাই। পেরিপ্লাস ও টলেমি পাঠে ভারতীয় ভূগোলেও বাণিজ্যের অনেক কথা অবগত হওয়া যায়। টলেমি লঙ্কা দ্বীপের অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তবে তিনি ভারতবর্ষের যে ম্যাপ দিয়াছেন তাহাতে যথেষ্ট ভ্রম প্রমাদ আছে। টলেমির ভূগোল ব্যতীত আরও কয়েকখানি গ্রন্থে ভারতীয় ভৌগোলিক বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। পম্পোনিয়াস মেলা, সলিনাস, ডাইওনিসিয়াস এবং মার্কিয়ানাসের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মেলা সম্ভবতঃ ৪২ খৃষ্টাব্দে তাহার পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার বৃত্তান্ত সুন্দর নহে। সলিনাস ২৩৮ খৃষ্টাব্দে নিজ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন; তিনি প্লিনি-লিখিত বৃত্তান্তের উপরই নির্ভর করিয়াছেন; অনেক সময় প্লিনির ভাষা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ডাইওনিসিয়াস পদ্যে নিজ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে বিশেষ কিছু বিবরণ পাওয়া যায় না।

এতদ্ব্যতীত ক্লাসিক গ্রন্থে অনেক স্থলে প্রাচীন ভারতের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ম্যাক্রিণ্ডল সাহেব এই সকল বৃত্তান্ত সংগ্রহ ও অনুবাদ করিয়া আমাদের যে প্রভূত উপকার সাধিত করিয়াছেন সে

বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। সম্প্রতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত রজনীকান্ত গুহ মহাশয় মেগাস্থিনিস প্রণীত ইণ্ডিকার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াও বঙ্গবাসী মাত্রকেই কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। আশা করা যায়, ক্রমে ক্রমে এই সকল গ্রন্থগুলিই বঙ্গবাসীর পক্ষে সুলভ হইবে। কেবলমাত্র মৌলিক গবেষণা অপেক্ষা যে এই সকল প্রাচীন গ্রন্থ অনুবাদ করিলে যে ভাষার যথেষ্ট উপকার হইবে, তাহাও বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমদ্দার।

সবই আমার মনে

সবই আমার মনে!
যেখানে যা আছে পাপ ও পুণ্য,
স্তুতি ও নিন্দা তুচ্ছ ঘৃণ্য,
তোমাতে আমাতে যা কিছু ভিন্ন,
অন্য কেহ না গণে,
সবই আমার মনে।

যত কিছু আছে কালো ও কদর্য্য,
ভালো ও মন্দ ভয় ও ভর্ৎসা,
তোমাতে আমাতে যা কিছু বচসা,
না করে অন্য জনে,
সবই আমার মনে।

জালের উপরে ফেলিছে সে জাল,
কালের উপরে বাড়াইছে কাল,
ঘটাইছে তায় যত জঞ্জাল
নিত্য আমার সনে,
সবই আমার মনে।

অপরূপ এই মনের রাজ্য,
বিস্মিত হেরি তাহার কার্য্য,
রচিল কে তারে করিতে ধার্য্য
ভজ না, দিয়া রণে,
সন্ধান কর মনে।

শ্রীমতী হেমলতা দেবী।

স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেন

নরেন্দ্র প্রকৃত প্রস্তাবে নরেন্দ্রই ছিলেন। ধনসম্পত্তি বা ক্ষমতায় না হউক, মুহূর্ত্তে যে তিনি বর্ত্তমান বাঙ্গালী সমাজে নরেন্দ্র ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এরূপ ধর্ম্মপ্রাণ, এরূপ সরলবিশ্বাসী, এরূপ সরলহৃদয়, এরূপ নির্ভীক্, এরূপ পরোপকারী, এরূপ স্বদেশ-হিতৈষী, এরূপ স্বার্থহীন ও এরূপ উদারচেতা ব্যক্তি লোকসমাজে অতীব বিরল। বঙ্গমাতা আজ নরেন্দ্রকে হারাইয়া সত্য সত্যই দীনা হইয়াছেন।

নরেন্দ্রনাথের জীবনের প্রধান প্রধান কার্য্য ও ঘটনার কথা অনেকেই অবগত আছেন; সুতরাং এস্থলে তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছুর উল্লেখ করিব না। বিগত পনর বৎসরের অধিক কাল তাঁহার ঘনিষ্ট সংসর্গে আসিয়া আমি তাঁহাকে যেরূপ বুঝিয়াছিলাম, অদ্য তাহারই সামান্য আভাস প্রদানের চেষ্টা করিব।

স্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গল চিন্তাই যেন নরেন্দ্রনাথের হৃদয়কে সর্ব্বদা সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া থাকিত। অন্য কোনও চিন্তা যেন তাঁহার হৃদয়ে স্থানলাভ করিত না; যেন শয়নে স্বপ্নে ও জাগরণে তিনি কেবল স্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গল চিন্তাই করিতেন। অধঃপতিত ও নির্জ্জীব ভারতবাসিগণ যে যে উপায়ে নব জীবন লাভ করিয়া পুনর্ব্বার উন্নতির উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করিতে পারে, সেই সেই উপায়ের উদ্ভাবন ও প্রচারের নিমিত্ত তিনি সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। তাঁহার সাপ্তাহিক সংবাদপত্র "ইণ্ডিয়ান্ মিরারে" তিনি তৎসম্বন্ধে ক্রমাগত আলোচনা করিতেন। কোথায় কোন্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ অন্যায় বিচার করিয়াছেন, কোথায় পুলীশে অত্যাচার করিয়াছে, কেবল এই সকল সাময়িক বিষয়ের আলোচনায় তাঁহার দৈনিক সংবাদপত্রের স্তম্ভসমূহ পূর্ণ না করিয়া তিনি সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধসমূহে ভারতবাসিগণের দুর্দ্দশার কারণ, যে উপায়ে সেই দুর্দ্দশার মোচন হইতে পারে তাহার নির্দ্দেশ, রাজা ও প্রজার প্রকৃত সম্বন্ধ নির্ণয়, লোক শিক্ষাপ্রচারের আবশ্যকতা ও উপায়, যুবকগণের ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার আবশ্যকতা, নারীজাতির মধ্যে জ্ঞান ও সুশিক্ষা প্রচারের প্রয়োজনীয়তা, তাহাদের দুরবস্থামোচনের উপায়, সামাজিক কুপ্রথা সমূহের মূলোচ্ছেদ সাধন, কৃষি, শিল্প ও বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, হিন্দুগণের পক্ষে সমুদ্রযাত্রার উপকারিতা, উন্নত কৃষি, শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত য়ুরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে গমন ও অবস্থান করার

আবশ্যকতা, ইংরাজ রাজপুরুষ ও ভারতীয় প্রজাগণের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ভারতে ইংরাজশাসনের উপকারিতা, ভারতে ইংরাজশাসন যে বিধাতার বিধান এই তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করিবার আবশ্যকতা, ভারতে ইংরাজশাসনের সুপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা, ভারতীয় বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত প্রজাগণের মধ্যে সৌহার্দ্দ ও সদ্ভাব স্থাপনের উপায়, জগতের প্রধান প্রধান ধর্ম্মসমূহের সমন্বয় সাধন, সকল ধর্ম্মেরই প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধাপ্রদর্শন, সাত্ত্বিক বুদ্ধিলাভের জন্য ব্রহ্মচর্য্য পালন ও নিরামিষ ভোজনের প্রয়োজনীয়তা, হিন্দু ধর্ম্মের উচ্চ আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ হৃদয়ঙ্গম করিবার আবশ্যকতা, হিন্দুধর্ম্মের উচ্চ আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন, সেই উচ্চ আদর্শ হইতে বিচ্যুতি জন্য হিন্দুজাতির অধঃপতন—ইত্যাদি বিষয় সমূহের বিস্তারিত আলোচনা করিতেন। নূতন সংবাদ জানিবার জন্য কেহ "ইণ্ডিয়ান্ মিরার" পাঠ করিতে লালায়িত হইতেন না; কিন্তু "মিরারে" যে প্রধান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, তাহাই পাঠ করিবার জন্য সকলে আগ্রহান্বিত হইতেন। "মিরারে"র প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অনেকের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি প্রসারিত হইত, অনেকের চিত্তবৃত্তি মার্জ্জিত হইত, চিন্তা শক্তি জাগরিত হইত এবং হৃদয় প্রসন্ন হইত। নরেন্দ্রনাথ বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া এই সকল বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার এই সুদীর্ঘকালব্যাপিনী আলোচনার ফলে, ভারতবাসিগণের যে প্রভূত উপকার হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ইতিহাসলেখক মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। নরেন্দ্রনাথ সত্য সত্যই লোকসমাজের শিক্ষাগুরু ছিলেন। ভারতবাসিগণের বর্ত্তমান দুরবস্থার সময়ে তিনি যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার জীবনে সম্পূর্ণরূপে সার্থক হইয়াছিল।

নরেন্দ্রনাথের চরিত্রের একটী বিশেষত্ব ছিল যে, তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদাই ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশায় উৎফুল্ল থাকিত। আমি তাঁহাকে কখনও নৈরাশ্যের তিমিরগর্ভে নিমজ্জিত হইতে দেখি নাই। বঙ্গব্যবচ্ছেদের আন্দোলনের সময় যখন বাঙ্গালীরা রাজপুরুষগণের বিদৃষ্টিতে পতিত হইলেন এবং তাঁহাদের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার অনুষ্ঠিত ও তাঁহাদের কতিপয় ন্যায্য অধিকার সঙ্কুচিত হইল, তখন আমি একদিন কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিয়াছিলাম "আমি দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় দেখিতেছি। ভারতবাসিগণের উন্নতি বুঝি সুদূর পরাহত।" আমার কথা শুনিয়া তিনি যেন গর্জ্জিয়া উঠিলেন; তাঁহার চক্ষুদ্বয় যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন "আপনি কি বলিতেছেন! আপনি যুবক হইয়া হৃদয়ে এইরূপ নৈরাশ্য পোষণ করেন? আমি কিন্তু বৃদ্ধ হইয়াও একদিনের জন্যও নিরাশ হই নাই। ভারতাকাশে যে মেঘ দেখিতেছেন, ইহা চলিষ্ণু মেঘমাত্র; ইহা অচিরেই তিরোহিত হইবে। (It is merely a passing cloud) দিনের মধ্যে আকাশে কখনও মেঘ উঠে, কখনও বা ঝড়ও বহিতে থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া কি বিষণ্ণ হওয়া উচিত? ঝড় ও মেঘ চিরদিন থাকে না। ঝড় ও মেঘের পর আকাশে আবার জ্যোতির্ম্ময়

সূর্য্য উদিত হয়। জাতীয় জীবনেও মধ্যে মধ্যে এইরূপ ঝড় ও মেঘের আবির্ভাব হয়। ইহা বিধাতারই বিধান এবং আমাদের মঙ্গলের জন্যই এইরূপ হয়। যাহা অমঙ্গল বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহা হইতেই মঙ্গল প্রসূত হইবে। (Out of evil cometh good) আমাদের জাতীয় দুষ্কর্ম্মেরই স্বরূপ আমরা এত কষ্ট পাইতেছি। কিন্তু এই কষ্ট চিরদিন থাকিবে না। দুষ্কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই, আমরা পুনর্ব্বার সুখ ও শান্তি লাভ করিব।" এই বলিয়া তিনি সহসা নীরব হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন "আমরা আমাদের জীবনে দেখিতে পাই, আর না পাই, বাঁচিয়া থাকিলে, আপনারা দেখিতে পাইবেন ইংরাজশাসনে ভারতবাসিগণের প্রভূত মঙ্গল হইবে। ভারতবাসিগণ নবজীবন লাভ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। তীব্র-বেগে [by leaps and bounds] ভারত-বাসিগণের উন্নতি হইবে। ভারতবাসিগণের মঙ্গল সাধনের জন্যই বিধাতা ইংরাজদিগকে এদেশে আনয়ন করিয়াছেন। ইহাদের শাসন সময়ে ভারতবাসিগণের উন্নতি অবশ্য-ভাবিনী।" নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি দূরপ্রসারিণী ছিল, এবং তাহা যেন কোন্ এক অতীন্দ্রিয়-জগতের দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত হইত। তাঁহার কর্ণযুগল যেন স্বর্গপুরের কি এক অপূর্ব্ব অমৃতময়ী আশাবাণীর ঝঙ্কারে নিয়ত ঝঙ্কৃত হইত। এই কারণে, তিনি সর্ব্বদাই আশান্বিত হৃদয়ে কার্য্য করিতেন, তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদাই প্রফুল্ল থাকিত, এবং তিনি ফলাফলের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ থাকিয়া কেবল কর্ত্তব্য বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়াই স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া যাইতেন। নরেন্দ্রনাথ যোগী পুরুষ ছিলেন ; সাধারণ মনুষ্যের সহিত তাঁহার তুলনা হয় না। জীবনে ইহাকে যে সকলে ভাল করিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন, তাহাও মনে হয় না।

নরেন্দ্রনাথের চরিত্রের আর একটী বিশেষত্ব ছিল ধৈর্য্য। তিনি সর্ব্বদাই স্থির ধীর ও গম্ভীরভাবে কার্য্য করিতেন। আনন্দে তিনি কখনও অধীর হইতেন না ; দুঃখেও তিনি কখনও ম্রিয়মাণ হইতেন না। ফলা-ফলের প্রতিও তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। জাতীয় উন্নতি সাধনের জন্য যে যে মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইত, তাহাদের ফল যে তিনি নিজ জীবনে দেখিতে পাইবেন, তাহার আশাও তিনি করিতেন না। যথাসময়ে সমস্ত সৎকর্ম্মই সুফল প্রসব করিবে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তদ্দ্বারা ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের উপকার সাধন হইবে, এই চিন্তাতেই তাঁহার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইত। কর্ম্মটী সৎ ও তাঁহার বিবেকানুমোদিত হইলেই যথেষ্ট হইল। যাহা সৎ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইত, তাহাতে কখনও তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতির অভাব হইত না। তিনি আধুনিক যুবকসম্প্রদায়ের মধ্যে অসহিষ্ণুতা দেখিয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইতেন। বীজ বপন করিয়াই বৃক্ষের ফললাভের জন্য ব্যাকুলতাকে তিনি বাতুলতা বলিতেন। যুবকগণের এই অসহিষ্ণুতাদোষেই যে স্বদেশী আন্দোলন নিষ্ফল হইবে, তাহাও তিনি বলিতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, এই অসহিষ্ণুতাদোষেই

যে জাতীয় সদনুষ্ঠানগুলি বিনষ্ট হইতে বসিয়াছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই এখন বুঝিতে পারিতেছেন। নরেন্দ্রনাথ জীবনে ফলভোগের আশা না করিয়া ধীর-ভাবে সকল সদনুষ্ঠানে যোগদান করিতেন। সর্ব্বপ্রথমে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে অন্তরের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন যে, নব্যদল অসহিষ্ণু হইয়া বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন এবং ন্যায়, নীতি ও ধর্ম্মের সীমা অতিক্রম করিতেছেন, তখন তিনি ধীরে ধীরে তাঁহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের আতিশয্যের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে লেখনীসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। নির্ভীক নরেন্দ্রনাথ যাহা সত্য ও উচিত বুঝিলেন, তদনুসারেই কার্য্য করিতে লাগিলেন। ক্ষণেকের জন্যও লোকের নিন্দা ও প্রশংসার দিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। যে দিন হইতে নরেন্দ্রনাথ নব্যদলকে উচিত কথা বলিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের আতিশয্যের নিন্দা করিয়া তাঁহাদিগকে সংযতভাবে কার্য্য করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন, সেই দিন হইতেই তিনি নব্য-দলের বিরাগভাজন হইলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ যে অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া তাঁহাদিগকে সংযত হইতে উপদেশ দিয়া-ছিলেন, কিছুদিন পরে সেই অমঙ্গলই সংঘটিত হইল। এতদ্দ্বারা নরেন্দ্রনাথের দূরদর্শিতারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার উপদেশানুসারে কার্য্য হইলে, আজ স্বদেশী আন্দোলনের এই বিষময় ও শোচনীয় পরিণাম হইত না।

বঙ্গব্যবচ্ছেদ লইয়া বঙ্গদেশে যে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হয়, সেই সময়ে এবং তাহার পরেও কতিপয় বৎসর আমি প্রত্যহই "মিরারে"র জন্য প্রবন্ধাদি লিখিতাম। সেই সময়ে প্রায় সর্ব্বদাই নরেন্দ্রবাবুর সহিত আমার দেখাসাক্ষাৎ হইত এবং অনেক বিষয়ে অনেকক্ষণ আলোচনাও হইত। এই আলোচনার ফলে আমি তাঁহার মতামত বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তিনি ভারতে ইংরাজশাসনের উপকারিতা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন এবং যথার্থ রাজভক্তও ছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে গভর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ বা প্রসাদলাভের নিমিত্ত একদিনের জন্যও লালায়িত ছিলেন, তাহা নহে। লর্ড কর্জ্জনের শাসনকালের যে তীব্র অথচ ন্যায্য সমালোচনা "মিরারে" প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া "পাইও-নীয়রে"র ন্যায় কর্জ্জনভক্ত সংবাদপত্রকেও প্রশংসা করিতে হইয়াছিল। তিনি গভর্ণ-মেণ্টের প্রসাদলাভ প্রত্যাশায় নব্যদলের কার্য্যপ্রণালীর প্রতিবাদ করেন নাই। স্বদেশের মঙ্গলসাধনের জন্যই তিনি তাঁহা-দিগকে সাবধানে ও সংযতভাবে কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি একমাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়াই কার্য্য করিয়া-ছিলেন; তাঁহার অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল না।

সেই সময়ে নব প্রকাশিত কতিপয় সংবাদপত্র পাঠ করিয়া নব্যদল উত্তরোত্তর উত্তেজিত হইতেছিলেন। এই সকল সংবাদপত্র দেশের যে প্রভূত অমঙ্গল সাধন করিতেছিল, তাহা নরেন্দ্রবাবু বুঝিয়া-ছিলেন। এই সম্বন্ধে প্রায়ই আমাদের

আলোচনা হইত। সেই আলোচনার ফলে, তাঁহারই উৎসাহ বাক্যে উৎসাহিত হইয়া আমি "স্বদেশ" নামক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত করি। "স্বদেশ" প্রায় দেড়বৎসরকাল চলিয়াছিল। "স্বদেশ"-সম্পাদন ও "মিরারে"র জন্য প্রত্যহ প্রবন্ধলেখার জন্য অত্যন্ত পরিশ্রমবশতঃ আমার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং আমি প্রায় ছয় মাসকাল শয্যাগত হইয়া পড়িয়া থাকি। সেই সময়ে স্বদেশ বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হই, "স্বদেশ" উঠিয়া গেলে, নরেন্দ্রবাবু অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন। "সুলভ-সমাচার" প্রকাশিত হইবার কিছুদিন পূর্ব্বেও তিনি "ইণ্ডিয়ান্ মিরারে" "স্বদেশে"র তিরোধানের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। "স্বদেশ" সংবাদপত্রটি ভাল ছিল, কি মন্দ ছিল, তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আমার উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু তাঁহার উক্তির আলোচনা করিয়া বেশ বুঝা যায় যে, বাঙ্গালী পাঠক-গণের জন্য একটী সুলিখিত ও সুপরিচালিত বাঙ্গলা সংবাদপত্রের অভাব তিনি সর্ব্বদাই অনুভব করিতেন। এই কারণে, গভর্ণমেণ্ট যখন একখানি বাঙ্গলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত করিবার অভিপ্রায় করিয়া নরেন্দ্র-বাবুকে তাহার সম্পাদন ও পরিচালন-ভার-গ্রহণের নিমিত্ত অনুরোধ করেন, তখন তিনি সে অনুরোধ অবহেলা করা কর্ত্তব্য মনে করেন নাই। ইংরাজী ভাষায় পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি কেবল ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই পাঠ করিতে পারেন; কিন্তু এদেশে ইংরাজীভাষাভিজ্ঞের সংখ্যা অল্প বলিয়া-লে'কশিক্ষা প্রচারের জন্য যে মাতৃ-ভাষায় সুপরিচালিত বহু সংবাদপত্র থাকা উচিত, তাহা তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন। "সুলভসমাচারে"র ন্যায় একটী বহুজনপাঠ্য সংবাদপত্র প্রকাশিত করিতে গেলে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। ইচ্ছা থাকিলেও, অর্থাভাবে এইরূপ সংবাদপত্র প্রকাশিত করিবার সঙ্কল্প অনেককেই ত্যাগ করিতে হয়। গভর্ণমেণ্ট যখন সেই অর্থ প্রদান করিতে সম্মত হইলেন এবং নরেন্দ্রবাবুকে পত্র সম্পাদন করিতে অনুরোধ করিলেন, তখন তিনি লোক-সাধারণের মঙ্গলসাধনের নিমিত্তই তাঁহার হৃদয়ের চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার এই সুযোগ ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। "সুলভসমাচারে"র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করায়, অনেকেই তাঁহাকে যথেচ্ছা গালাগালি দিতেও ছাড়েন নাই। কিন্তু তিনি যাহা কর্ত্তব্য বুঝিয়াছিলেন, কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, তাহাই দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রহিলেন।

তাঁহার মনের দৃঢ়তা তাঁহার চরিত্রের আর একটী বিশেষত্ব ছিল। তিনি যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহা দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকিতেন, কদাপি তাহা হইতে বিচ্যুত হইতেন না। কোনও লোকহিতকর ব্যাপার সম্বন্ধে নরেন্দ্রবাবুকে লেখনী সঞ্চালন করিতে অনুরোধ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে সেই ব্যাপারের গুরুত্ব উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইত। কাহারও খাতিরে বা অনুরোধ-উপ-রোধে তিনি কদাপি লেখনী ধারণ করিতেন না। নরেন্দ্রবাবু চিরদিন বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন। বিশেষতঃ, বালিকাদের অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ার জন্য আমাদের জাতীয়

জীবন যে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে, তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। সেই কারণে, প্রায় ২১ বৎসর পূর্ব্বে বালিকাদের age of consent সম্বন্ধে যখন বঙ্গদেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখন সম্মতি বিষয়ে বালিকাদের বয়ঃক্রমবৃদ্ধির অনুকূলেই নরেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবল লেখনী সঞ্চালন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য, তিনি হিন্দুজনসাধারণের অতীব বিরাগভাজন হইয়াছিলেন; এমন কি, অনেক হিন্দুপাঠক তাঁহার দৈনিক পত্রিকা পাঠ করিতে বিরত হইয়াছিলেন। আমার যতদূর স্মরণ হয়, সেই সময়ে "অমৃতবাজার পত্রিকা" দৈনিক পত্রিকায় পরিণত হয় এবং "মিরারে"র গ্রাহক ও পাঠকের সংখ্যা অনেক কমিয়া যায়। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহাই দৃঢ়রূপে ধরিয়া রহিলেন। পরিশেষে সম্মতি বিষয়ে বালিকাদের বয়ঃক্রম বর্দ্ধিত হইয়া যখন আইন পাশ হইল, তখন তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। হিন্দুবিধবাগণের পুনর্ব্বার বিবাহ হওয়া তিনি যে নিতান্ত বাঞ্ছনীয় ও উচিত কার্য্য মনে করিতেন, তাহা নহে; কিন্তু সমাজের বর্ত্তমান দুরবস্থায় হিন্দুবালবিধবাগণের বিপথে যাওয়া অপেক্ষা পুনর্ব্বার বিবাহ হওয়া যে শ্রেয়ঃ, তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। এই কারণে, তিনি হিন্দুবালবিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহের সমর্থন করিতেন। বালিকাদের অধিক বয়সে বিবাহ হইলে, হিন্দুসমাজে বালবিধবার সংখ্যা অল্প হইবে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াও তিনি বালিকাগণের বিবাহের বয়ঃক্রম বাড়াইবার জন্য প্রকৃত যত্ন ও চেষ্টা করিতে ছিলেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি হিন্দু-বিবাহ-সংস্কার-সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রাচীন কালে আর্য্যগণ যে বালিকাদের অল্পবয়সে বিবাহ দিতেন না, এবং বালিকাদের যৌবন-বিবাহ যে অশাস্ত্রীয় নহে, তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। সেই বিশ্বাসবলে বলীয়ান্ হইয়াই তিনি বালিকাদের বিবাহের বয়ঃক্রম সীমা বর্দ্ধিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সমস্তই তাঁহার মনের দৃঢ়তার পরিচায়ক। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, স্বদেশী আন্দোলন-দ্বারা দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি হইবে, ইহা বিশ্বাস করিয়াই তিনি প্রথমে উক্ত আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন যে, কতকগুলি ব্যক্তি এই আন্দোলন অবলম্বন করিয়া অনেক গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন এবং জনসাধারণকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন, তখনই তিনি উক্ত আন্দোলনের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া উচ্চকণ্ঠে সকলকে সংযতচিত্ত হইতে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ এই ব্যাপারের উল্লেখ করিয়া তাঁহার চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা যে তাঁহার চরিত্রগত তেজ বা নির্ভীকতার পরিচায়ক, তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। রাজভক্তির সহিত স্বদেশের উন্নতি সাধন করাই তাঁহার সর্ব্ববিধ কার্য্যের মূলমন্ত্র ছিল। যাঁহারা তাঁহার এই মূলমন্ত্রের বিষয় অবগত ছিলেন, তাঁহারা জানিতেন যে নরেন্দ্রনাথ এক দিনের জন্যও তাঁহার নীতিপথ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই।

হিন্দুগণের পক্ষে সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রসঙ্গত ও কর্ত্তব্য কি না, তৎসম্বন্ধেও তিনি "মিরারে" যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছিলেন। সেই আলোচনার ফলে সমুদ্রযাত্রা প্রথা হিন্দু-সমাজের অনেক জাতির মধ্যে ইদানীং প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। নরেন্দ্রনাথ কেবল-মাত্র রাজনীতিক ব্যাপারের আলোচনাতেই নিমগ্ন থাকিতেন না, যাহাতে ধর্ম্ম, সমাজ এবং নীতিরও উন্নতি সাধিত হয়, তজ্জন্য তিনি সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন।

তিনি যে স্বদেশের মঙ্গল সাধনরূপ মহাব্রত হইতে একদিনের নিমিত্তও বিচ্যুত হন নাই, তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ "যুবক-গণের বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষাবিধায়িনী সভা"র প্রতিষ্ঠা। সকলেই জানেন যে, প্রতিবৎসর এই সভা হইতে বহুসংখ্যক যুবক য়ুরোপ আমেরিকা ও জাপানের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষার নিমিত্ত প্রেরিত হইতেছেন। অনেক যুবক কৃতবিদ্য হইয়া ইতিমধ্যেই স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নানা-বিধ শিল্পের কারখানা খুলিতেছেন। এই সভার প্রতিষ্ঠা দ্বারা কেবল যে ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যেরই উন্নতির পথ প্রশস্ত হইয়াছে, তাহা নহে; পরন্তু হিন্দুগণের সমুদ্রযাত্রা-প্রথাও সমাজে সমধিক রূপে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে।

তাঁহার চরিত্রের আর একটী প্রধান বিশেষত্ব ছিল—নির্ভীকতা। ভয় কাহাকে বলে, তাহা নরেন্দ্রনাথ জানিতেন না। তিনি যাহা সত্য ও অভ্রান্ত বলিয়া বুঝিতেন, লোকসমাজে তাহা প্রচারিত করিতে কদাপি কুণ্ঠিত হইতেন না। সত্য ও ন্যায়ের বলে বলীয়ান্ ছিলেন বলিয়াই তিনি একদিন বড়লাটের প্রাসাদেই ভারতের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর জেনেরাল্ লর্ড ডাফরিণকেও শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে মুহূর্ত্তের জন্যও ইতস্ততঃ করেন নাই। যাঁহারা সেই দিন নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়াছিলেন ও তাঁহার বাক্য শুনিয়া-ছিলেন, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে নরেন্দ্রনাথ যথার্থই পুরুষসিংহ। ডাফরিণের ন্যায় তেজস্বী লাটকেও এই পুরুষসিংহের নিকট মস্তক অবনত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। সেইদিন সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে নরেন্দ্রনাথ কেবল বাঙ্গালীরই গৌরব নহেন, সমস্ত ভারতবাসীরই গৌরব।*

---

* ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন্ হইতে যে Deputation লাট ডাফরিণের নিকট গিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নরেন্দ্রবাবুও ছিলেন। নরেন্দ্রবাবু তাঁহার "বেঙ্গলী" পত্রে এই ঘটনাটির যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই স্থলে উল্লেখযোগ্য—

"Never was this independence of character and unflinching courage more strikingly exhibited than on the occasion when a deputation of the Indian Association waited upon Lord Dufferin in the early eighties. After the deputation had presented their address, the Viceroy asked them to be seated and entered upon an informal conversation with the members. Babu Norendra Nath Sen was introduced, and as soon as he heard his name, the Viceroy flew into a rage. 'He asked what had made him write that false paragraph in the Indian Mirror mentioning a particular incident referred to in it. The deputation was somewhat taken aback at this sudden explosion of Viceregal indignation, but Babu Norendra Nath Sen was fully equal to the occasion. With firmness and dignity and without exhibiting the slightest excitement, he replied, "My Lord, I have not come here to be insulted under your Excellency's roof. Nor do I think it necessary, he added, to offer your Excellency an explanation of my conduct as the Editor of the 'Indian Mirror' Lord Dufferin, impulsive and generous, felt the justice of these observations and at once recovering himself said 'Mr. Sen, [you

নরেন্দ্রনাথের চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব ছিল, তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা। এরূপ ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি লোকসমাজে দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার ধর্ম্মমত অতিশয় উচ্চ ও উদার ছিল, তন্মধ্যে সামান্য মাত্রও সঙ্কীর্ণতা দৃষ্ট হইত না। তিনি হিন্দু, মোসলমান, খৃষ্টান্, ইহুদী, পারসী, বৌদ্ধ সকল ধর্ম্ম ও ধর্ম্মসম্প্রদায়কেই সম্মান ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার হৃদয়ের দ্বার সকলেরই জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। সকল শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মেরই সারাংশ যে এক এবং একই মহাশক্তি হইতে প্রসূত হইয়াছে, তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। সেই সারাংশের দিকেই যাহাতে সকলের দৃষ্টি পড়ে সেজন্য তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার লেখনী সঞ্চালন করিতেন। ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার এইরূপ উদার মত ছিল বলিয়াই তিনি থিওসফিষ্ট্ হইয়াছিলেন। থিওসফিষ্টেরা সকল ধর্ম্মকেই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন এবং সকল সত্যধর্ম্মেরই মূল যে এক, তাহাও বিশ্বাস করেন। সুতরাং থিওসফি বা তত্ত্ববিদ্যার বীজ তাঁহার অন্তরে পূর্ব্ব হইতেই নিহিত ছিল। এই বীজ নিহিত না থাকিলে, কেহ কখনও থিওসফিষ্ট হইতে পারেন না। মৈত্রী এবং সর্ব্বভূতে দয়া নরেন্দ্রনাথের চরিত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার ছিল। তিনি কখনও প্রাণিহিংসা করিতেন না। আজীবন তিনি নিরামিষাশী, মিতাহারী ও মিতাচারী ছিলেন। শুনিয়াছি তিনি পিপীলিকা প্রভৃতি জীবজন্তুকে প্রত্যহ স্বহস্তে খাদ্য যোগাইতেন; গড়ের মাঠে বেড়াইতে গিয়া তিনি কাক চিল প্রভৃতি পক্ষিগণকে এবং গড়ের মাঠের পুষ্করিণীমধ্যে যে সকল মৎস্য আছে, তাহাদিগকে প্রত্যহ আহার্য্য দিতেন। দুর্গোৎসব ও কালী পূজার সময় হিন্দুগণ ছাগ মহিষাদি বধ করিতেন বলিয়া তাঁহার হৃদয় অতিশয় ব্যথিত হইত। তজ্জন্য তিনি প্রতিবৎসর বলিদানের বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতেন। দুঃখ বা বিপন্ন ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন; প্রত্যহ কত ব্যক্তি যে তাঁহার অনুরোধ পত্রের জন্য তাঁহার বাটীতে আসিতেন এবং তিনি কত লোকের যে চাকরী করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সর্ব্বভূতের প্রতি যাঁহার এইরূপ দয়া ছিল, সকল মানুষকে যিনি এইরূপ ভাল বাসিতেন, তিনি যে মৈত্রীর উপাসক হইবেন, এবং মৈত্রীর অবতার ভগবান্ বুদ্ধদেবের ভক্ত হইবেন, তাহার আর বিচিত্রতা কি? তাঁহার চরিত্রের এই সৌন্দর্য্য যাঁহারা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন নাই তাঁহারাই নিতান্ত অজ্ঞের ন্যায় তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে নানাবিধ মন্তব্য প্রকাশিত করিয়া থাকেন।

কোনও কোনও সামাজিক ব্যাপারে তাঁহার মত কিছু উদার হইলেও, তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। তিনি বেদকে অপৌরুষেয় ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, ঋষিবাক্যে একান্ত ভক্তিমান্ ছিলেন, ব্রহ্মচর্য্যের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম

will permit me to apologize to you for what I have said and to withdraw my observations.' He then shook Norendra Babu by the hand, and the old relations of friendliness and confidence between the Viceroy and the deputation was immediately restored. Such was Babu Norendra Nath Sen in the prime of his life and in the plenitude of his powers and intellect."

করিয়াছিলেন, হিন্দুশাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে আস্থা প্রকাশ করিতেন, দেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন এবং যোগশাস্ত্রের উপদেশ মান্য করিতেন। আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতী বেদের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তিনি সেই ব্যাখ্যারই সবিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এই কারণে, আর্য্যসমাজের মতের প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। "মহাত্মা"গণের অস্তিত্বেও তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস ছিল। এইরূপ বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণও ছিল। একদিন এই বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার আলোচনা হয়। সেই আলোচনার সময়ে, তাঁহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি আমাকে যে সমুদয় প্রমাণ প্রদর্শন করেন, তদ্দ্বারা বুঝিতে পারি যে, তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ়ভিত্তিরই উপর স্থাপিত। তিনি সেই সমস্ত প্রমাণ অতিশয় যত্নসহকারে সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে যে ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং সেই ঘটনাসমূহের যাথার্থ্যের পোষকতার যে সমস্ত প্রমাণ সুরচিত করিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারা "মহাত্মা"গণের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না। নরেন্দ্রবাবুর ন্যায় সত্যবাদী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি যে কাহাকেও প্রবঞ্চনা করিবার নিমিত্ত মহাত্মাদের অস্তিত্বের কথা বলিতেন, তাহা বিশ্বাস করিতে আদৌ প্রবৃত্তি হয় না। মহাত্মাদের কথাপ্রসঙ্গে কত ব্যক্তি তাঁহাকে বিদ্রূপ ও উপহাস করিতেন, কিন্তু তদ্দ্বারা ক্ষণেকের জন্যও তাঁহাদের অস্তিত্বে তাঁহার বিশ্বাস বিচলিত হয় নাই। নিন্দা প্রশংসার প্রতি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি সর্ব্বদা নির্ভীকচিত্তে তাঁহার সংবাদপত্রে তাঁহাদের বিষয় লিখিতেন এবং সাধারণ সভাস্থলেও প্রার্থনার সময় তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ও কৃপা ভিক্ষা করিতেন।

একটী প্রবন্ধে নরেন্দ্রনাথের উন্নত হৃদয় ও চরিত্রের সম্যক্ পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার মহত্ত্বের সামান্য আভাস দিলাম মাত্র। তিনি যে একজন মহাপুরুষ ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার ন্যায় কয়জন সহৃদয়, উচ্চমনা ও স্বদেশবৎসল বাঙ্গালী বিদ্যমান আছেন? বিগত পঞ্চাশ বৎসর কাল ব্যাপিয়া নরেন্দ্রনাথ বাঙ্গালী তথা ভারতবাসিগণের জাতীয় জীবন সংগঠনে যে সহায়তা করিয়াছেন, ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখক তাহার মূল্য নিরূপণ করিবেন। ইতি ২৪শে ভাদ্র ১৩১৮ সাল।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

জৈব রসায়নের উন্নতি।

জৈব রসায়ন-শাস্ত্রের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে, ইহাকে একটা সম্পূর্ণ নূতন শাস্ত্র বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ সত্যই ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারেন নাই। প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্মমৃত্যু ও উন্নতি-অবনতি একটা সৃষ্টিছাড়া বিশেষ নিয়মে নিয়মিত হয় বলিয়া ইহাদের একটা বিশ্বাস ছিল এবং এই বিশ্বাসই তাঁহাদিগকে জৈব রসায়নের মূলতত্ত্বানুসন্ধানে নিরস্ত করিত। একই মহানিয়মের অধীন হইয়া যে, ধাতু-অধাতু, জড়-অজড় সকল বস্তুই ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থান করিতেছে এই মহাসত্যটিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণই প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন, সুতরাং ইহারা জীবরাজ্যের প্রণালীকে মানুষের দুরধিগম্য মনে করিতে পারেন নাই। গত কয়েক বৎসরে বৈজ্ঞানিকগণ নানা আবিষ্কার দ্বারা জৈব রসায়ন শাস্ত্রের যে উন্নতি করিয়াছেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর। অতি অল্পদিনের মধ্যে ইহারা প্রায় দেড়লক্ষ জৈব পদার্থের বিশ্লেষ করিয়া, তাহাদের খুঁটিনাটি ব্যাপার আবিষ্কার করিয়াছেন। এই কার্য্য যে, কত শ্রম ও কৌশলসাধ্য তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ অক্লান্ত পরিশ্রমে তাহার সুসাধন করিয়া বিজ্ঞানের একটা বৃহৎ অভাব মোচন করিয়াছেন।

খ্রিষ্টীয় কৌশলে যেমন কেবল ইট, চূণ ও কাঠ সুযুক্ত অট্টালিকায় পরিণত হয়, সেইপ্রকার অঙ্গার, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন্ ও নাইট্রোজেন্ প্রভৃতি কয়েকটি মূলপদার্থের অপূর্ব্ব সম্মিলনে এই জীবজগতের গঠন হয়। প্রকৃতি যে কৌশলে প্রাণী ও উদ্ভিদকে সৃষ্টি ও পোষণ করিতেছেন, তাহা আবিষ্কার করিয়া পরীক্ষাগারে জৈব পদার্থ প্রস্তুত করিবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগকে অভিভূত করিয়াছে। যে কৌশলে জড় জীব হইয়া দাঁড়ায় কোন্ কালে তাহা বিজ্ঞানের আয়ত্তে আসিবে কি না, তাহা অবশ্যই এখন বলা চলে না। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে সহজ জৈব পদার্থ প্রস্তুতের যে সকল উপায় জানা গিয়াছে, তাহা দেখিলে, বৈজ্ঞানিকগণ যে তাঁহাদের লক্ষ্যের অভিমুখে ক্রমেই অগ্রসর হইতেছেন তাহা বুঝা যায়।

জৈব পদার্থকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম, বসা অর্থাৎ চর্ব্বি; দ্বিতীয়, কার্বোহাইড্রেট্ অর্থাৎ অঙ্গার ও হাইড্রোজেন-যুক্ত সামগ্রী; তৃতীয় প্রটিনস্ অর্থাৎ দেহের মাংসাদির প্রধান উপাদান।

বহুদিন হইল ফরাসী বৈজ্ঞানিক বার্থলো (Berthelot) পরীক্ষাগারে কৃত্রিম চর্ব্বি প্রস্তুতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কৃত্রিম কার্বোহাইড্রেট্ আজ প্রায় কুড়ি বৎসর ধরিয়া মর্ত্যধামে প্রস্তুত হইতেছে। চিনি, ড্রিড্রিসটা এই শ্রেণীভুক্ত। এখন কৃত্রিম শর্করা বাজারেই সুলভ। কিন্তু গত দশ বৎসরের চেষ্টাতেও কেহ প্রটিন্ পদার্থটি প্রস্তুতের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু চেষ্টা নিরর্থক হয় নাই।

জীবনের ক্রিয়ায় প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহে যে সকল পরিবর্ত্তন হয়, তাহার প্রকৃতি এই চেষ্টায় প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। জীবনের ক্রিয়া ও রাসায়নিক ক্রিয়া যে অভিন্ন এখন তাহা স্বীকার করিতেই হইতেছে; পুষ্টি, বৃদ্ধি, সন্তান-জনন প্রভৃতি সকল জৈব ব্যাপারেরই মূলে রসায়নের মূলতত্ত্ব বর্ত্তমান। কৃত্রিম জৈব পদার্থ প্রস্তুত করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিকগণ জীবতত্ত্বের যে সকল রহস্যের কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানকে যথেষ্ট লাভবান করিয়াছে।

জৈব পদার্থের এক শ্রেণীর উপাদানকে বৈজ্ঞানিকগণ সেলুলোস্ (Cellulose) বলেন। ইহাতে কেবল অঙ্গার ও হাইড্রোজেনেরই প্রাধান্য দেখা যায়। গাছের ছাল, আঁশ, কাঠ এবং তূলা প্রভৃতি অনেক জিনিস এই পদার্থেই গঠিত। কৃত্রিম সেলুলস্ প্রস্তুতের উপায় আবিষ্কৃত হওয়ায়, এখন যে ইহা দ্বারা কত ব্যবহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা হয় না। এই সকল দ্রব্যের জন্য পূর্ব্বে মানুষকে যথেষ্ট ক্লেশ স্বীকার করিতে হইত। কাগজ, নির্ধূম বারুদ, কৃত্রিম রেসম, কৃত্রিম কেশ ও চর্ম্ম প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে এখন কৃত্রিম সেলুলসের ব্যবহার হইতেছে।

বাজারে আজকাল নানা জাতীয় রঙের গুঁড়া অল্পমূল্যে বিক্রয় করা হয়, সেগুলিকেও জৈব রসায়ন শাস্ত্রের উদাহরণ বলা যাইতে পারে। আল্‌কাতরা হইতে এই সকল রঙ প্রস্তুত করা হয়। জর্ম্মানি এই রঙের ব্যবসায়ে সকল জাতিকে পরাজিত করিয়াছে। অনেক সময় দেখা যায়, জৈব পদার্থকে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করিতে গেলে, অত্যন্ত অধিক ব্যয় হয়; কাজেই এই প্রকারে প্রস্তুত দ্রব্য বাজারে স্থান পায় না। কিন্তু রঙ সম্বন্ধে এ কথা বলা চলিতেছে না। আজকাল এত অল্প ব্যয়ে নানা জাতীয় কৃত্রিম রঙ প্রস্তুত হইতেছে যে, প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহজাত রঙের আর আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে না। শেফালি বা পলাশ ফুলের রঙে এখন আর কেহ বস্ত্র রঞ্জন করে না। জর্ম্মাণির রঙ এখন অলক্তক রসকেও নির্ব্বাসিত করিয়াছে। নীলের জন্য বিদেশে ভারতের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। সুলভ কৃত্রিম নীল এখন নীলের চাষের উচ্ছেদ করিয়াছে। বাঙ্গলাদেশে আর নীলের আবাদ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

রবার আধুনিক সভ্যতার একটা প্রধান উপকরণ। গাড়ীর চাকা, জুতার তলা, এবং গাছের কোর্ত্তা প্রভৃতির প্রস্তুতে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার আছে। তা'ছাড়া কল-কারখানার কাজে এবং সৌখীন ও খেলার জিনিস প্রস্তুতে ইহার ব্যবহার অপরিহার্য্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ পর্য্যন্ত রবারের জন্য রবার-গাছের চাষ করিতে হইত, কাজেই জিনিসটার মূল্যও বড় কম ছিল না। বহু চেষ্টার পর জর্ম্মাণির রসায়নবিদ্‌গণ কৃত্রিম রবার প্রস্তুতোপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। হিসাব করিলে দেখা যায়, প্রতি বৎসরেই এখন প্রায় কুড়িলক্ষ মণ রবারের ব্যবহার হইতেছে; ইহার মূল্য প্রায় তেইশ কোটি টাকা। বলা বাহুল্য অল্পদিনের মধ্যে বাজারে সুলভ কৃত্রিম রবার দেখা দিবে। আজ দশ বৎসর হইল

জর্ম্মান্ পণ্ডিত ডাক্তার হক্‌ম্যান্ কৃত্রিম রবার-প্রস্তুতের উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন।

যে সকল প্রাকৃতিক দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আমরা কাজ চালাই, সেগুলি সকল সময়ে ঠিক আমাদের মনের মত হয় না। কাজেই নানা আয়াসসাধ্য উপায়ে কার্য্যোপযোগী করিয়া সেগুলিকে কাজে লাগাইতে হয়। গাছের আঁশগুলি যদি কাগজের মত সাদা হইয়া জন্মাইত, তাহা হইলে কাগজ-প্রস্তুতের জন্য তাহাদিগকে নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আর সাদা করিতে হইত না। ইহার ফলে বাজারে কাগজ সুলভ হইত। বিশেষ বিশেষ জৈব পদার্থ প্রস্তুত করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিকগণ সেগুলিকে অবিকল প্রকৃতির অনুকরণে প্রস্তুত করার চেষ্টা করেন না, কৃত্রিম জৈব জিনিসগুলি যাহাতে ঠিক ব্যবহারোপযোগী হইয়া কারখানা হইতে বাহির হয়, তাহারি প্রতি সকলের দৃষ্টি আছে। রবার প্রস্তুত করিতে গিয়া, বৈজ্ঞানিকগণ রবারের অনুরূপ আরো কতকগুলি নূতন দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে এগুলি রবার অপেক্ষাও কার্য্যোপযোগী হইয়াছে।

কর্পূর জিনিসটা সম্পূর্ণ জৈব। জাপান সাম্রাজ্যের এবং ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জের অনেক স্থানে কর্পূর বৃক্ষের চাষ করিয়া ব্যয়-সাধ্য প্রক্রিয়ায় কর্পূর সংগ্রহ করা হইত। বলা বাহুল্য ইহাতে জাপানের যথেষ্ট লাভ ছিল। এখন বাজারে যে কর্পূর বিক্রয় হয় তাহার বারো আনা কৃত্রিম। আকৃতি প্রকৃতিতে ইহা অবিকল জৈব কর্পূরের অনুরূপ। আজ কাল স্ফটিক (Amber) জিনিসটা খুবই সুলভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চিরুণী, চুরুটের নল, গলার হার প্রভৃতি অনেক জিনিসই আজকাল অবিকল স্ফটিকের ন্যায় অর্দ্ধ স্বচ্ছ পদার্থ দিয়া গড়া হইতেছে। বলা বাহুল্য এগুলি আকরিক স্ফটিক নয়; বহু পরিশ্রমে রসায়নবিদ্‌গণ কৃত্রিম স্ফটিক প্রস্তুতের যে উপায়-উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা দুর্লভ স্বাভাবিক স্ফটিককে নির্ব্বাসিত করিয়াছে।

জৈব রসায়নশাস্ত্রের উন্নতিতে চিকিৎসা বিজ্ঞানও কম লাভবান হয় নাই। অষ্ট্রিচেন বা তাম্রকূটসার প্রভৃতি উদ্ভিদবিষ পূর্ব্বে উদ্ভিদ হইতেই সংগ্রহ করা হইত। এখন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তাহা কারখানাতেই অতি সহজে প্রস্তুত করা হইতেছে।

প্রাণীশরীরে আড্রেনালিন্ (Adrenalin) নামক এক পদার্থ আপনা হইতেই সঞ্চিত হয়। জীবনের কার্য্যে ইহার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। শরীরের কোন অংশে বিশেষ কারণে রক্ত আবদ্ধ হইয়া পড়িলে, সেখানে এই পদার্থটা স্বতই উৎপন্ন হইয়া রক্তের চাপকে নিয়মিত করে। সম্প্রতি ডাক্তার ষ্টলজ্ (Stolz) নামক জনৈক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রাণিশরীরেই এই পদার্থটিকে কয়লা হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করিয়াছেন। শরীরের কোন অংশে ইহার প্রলেপ দিলে, রক্তকোষগুলি সঙ্কুচিত হইয়া প্রলেপযুক্ত [redacted] রক্তশূন্য করে। অস্ত্রচিকিৎসায় এই পদার্থটি বিশেষ সহায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অস্ত্রপ্রয়োগে যখন বৃথা রক্তপাতের আশঙ্কা হয়, চিকিৎসকগণ তখন দেহের ক্ষয় অংশে ইহার প্রয়োগ দিবার

ব্যবস্থা করেন। ইহাতে রক্ত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, কাজেই অস্ত্র প্রয়োগে আর রক্তপাত হয় না।

জৈব-রসায়নের উন্নতিতে গন্ধদ্রব্যের প্রস্তুত-বিধির এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। ফুল সংগ্রহ করিয়া শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়া দ্বারা গন্ধ-দ্রব্য প্রস্তুত-প্রণালী এখন প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। ফুলের যে অংশ গন্ধের উৎপাদক তাহা বিশ্লেষ করিলে কতকগুলি মূল গন্ধ-দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এক গোলাপের আতরে এই প্রকার প্রায় কুড়িটি মূল গন্ধের মিশ্রণ আছে। রসায়নবিদ্‌গণ কৃত্রিম উপায়ে এই সকল মূল গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই প্রকারে প্রস্তুত গন্ধ-দ্রব্যগুলিকে নানা প্রকারে মিশ্রিত করিয়া ইহারা এখন শত শত সুন্দর গন্ধ-দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছেন। কৃত্রিম ফুলের আতরকে এখন সত্যই স্বাভাবিক আতর হইতে পৃথক করা কঠিন। গত বৎসরে এক জর্ম্মানি হইতেই প্রায় তিন কোটি মুদ্রার গন্ধ-দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

বঙ্কিম-চরিত

(নিশীথে প্রেতিনী দর্শন)

বঙ্কিমবাবু যখন কাঁথির (Contai) হাকিম, তখন তাঁহাকে প্রায়ই মফস্বলে তদারকে যাইতে হইত। তিনি রৌদ্রের উত্তাপ কখনও সহ্য করিতে পারিতেন না। যখনি কোথাও যাইতেন, হয় অতি প্রত্যূষে, না হয় সন্ধ্যায় যাইতেন। কাঁথি হইতে মফস্বলে যাইবার সময় সন্ধ্যায় বাহির হইতেন।

একবার একটা বড় [illegible] তাঁহাকে কাঁথি হইতে ৭।৮ ক্রোশ দূরে যাইতে হয়। তিনি বৈকালেই পাল্কীর ডাক বসাইয়া রওনা হইলেন। ইচ্ছা, শীঘ্রই কাজ সারিয়া রাত্রেই বাসায় ফিরিয়া আসিবেন। সঙ্গে যাইল খানসামা মুরলী, দুইজন বরকন্দাজ, আরদালি ও পাচক ব্রাহ্মণ। রাত্রি ৮টার পূর্ব্বেই গন্তব্য স্থানে পঁহুছিলেন। কর্ম্ম করিতে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। সেই দেশে হাকিম আসিলেই জমিদারের বাগানবাড়ী হাকিমকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। বঙ্কিমবাবুও সেইখানে গিয়া উঠিয়াছিলেন। পাচক ব্রাহ্মণ আহারাদি প্রস্তুত করিয়াছে, সুতরাং আহারাদি সেই-খানেই হইল। আহারাদির পর তিনি পাল্কী আনিতে হুকুম দিলেন। বঙ্কিমবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনেক গণ্যমান্য লোক আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই সেই

অমাবস্যার রাত্রিতে জনহীন দস্যুপ্রপীড়িত প্রান্তরের মধ্য দিয়া পথ অতিবাহিত করিয়া ফিরিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন। সুতরাং বঙ্কিমবাবুর সে রাত্রি সেইখানেই থাকা স্থির হইল। কিন্তু তিনি পাল্কী বিদায় করিলেন না—পাল্কী হাজির থাকিল।

বাড়ীটির বর্ণনা আমি যেরূপ দাদাবাবুর মুখে শুনিয়াছিলাম, তাহাই এখানে বিবৃত করিতেছি।

বাড়ীটি তিন মহল। চারিদিকে বাগান, বাগান উচ্চপ্রাচীরে বেষ্টিত। বাড়ী হইতে বাগানের ফটক অনেক দূরে। দিনমানেই, ফটকে মনুষ্য প্রবেশ করিলে, বাটী হইতে ঠাওর হইত না,—অতি ধুসরাকৃতি দেখাইত। সেই ফটকের সম্মুখে একটা বাদাম-গাছ ছিল। বাড়ীটির পশ্চাতে একটি ছোট দরজা। সেটি খিড়কি। তাহার পরেই, ঘনবৃক্ষসমাচ্ছাদিত বাগান। খিড়কির দোর দিয়া বাহির হইয়া খানিকটা উত্তর মুখে গেলেই একটি বৃহৎ-পুষ্করিণী, তাহাতে বাঁধা ঘাট। তথা হইতে পশ্চিম মুখে ফিরিলেই একটি ক্ষুদ্র পথ। পথের দুধারে তালবৃক্ষের শ্রেণী, একদিকে গোলাপের রাশি অপরদিকে অন্যান্য বাবতীয় পুষ্পের গাছ। সেই পথ ধরিয়া বরাবর গেলেই বাগানের শেষ সীমায় প্রাচীরে একটি দরজা আছে। সেই দরজা দিয়া বাহির হইলেই সদর রাস্তায় পড়া যায়। সদর রাস্তাটি বেশী চওড়া নহে। তাহার অপরদিকে একটি ক্ষুদ্র খাল। তাহার পরই মস্ত মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। বাড়ীটির প্রথম মহল পার হইয়া দ্বিতীয় মহলে যাইতে হইলে একটি বৃহৎ উঠান পার হইতে হয়। উঠানের মাঝখানে একটি শিউলিফুলের গাছ। দ্বিতীয় মহলের শেষ সীমায় ঘরটি বেশ বড়। সেই ঘরে একখানি পালঙ্কে বিছানা প্রস্তুত। দাদাবাবু সেই ঘরেই রাত্রিযাপন করিবেন স্থির করিলেন। মুরলী সেই গৃহে অমিদার-বাবুর গৃহ হইতে প্রেরিত একটি বৃহৎ সেজ জ্বালিয়া দিয়া, আল্‌বোলায় তামাকু সাজিয়া দিয়া গেল। ফিরিয়া যাইবার সময় মুরলী কহিল—"হজুর, আমরা কি তা হলে পাশের ঘরেই থাকিব—আপনি যদি রাত্রে ডাকেন—রাত্রে যদি কোন দরকার পড়ে।" দাদাবাবু বলিলেন "না, তোদের আর তাতে দরকার নাই। প্রথম মহলে যে ঘরটায় আমি বসিয়াছিলাম, সেই ঘরটায় তোরা থাকিস্। এই উঠান পার হইলেই সেই ঘর। রাত্রে তোরা একটু সজাগ থাকিস্—এক ডাকেই যেন উত্তর পাই।"

মু। যে আজ্ঞে—আমি তা হলে এখন যাই।

এই বলিয়া মুরলী চলিয়া গেল, দাদা-বাবুও দরজায় খিল দিয়া আসিয়া পালঙ্কে শুইয়া শটকায় তামাকু টানিতে টানিতে নিদ্রাভিভূত হইতে লাগিলেন। তারপর—তিনি বলিয়াছিলেন—তাঁহার যেন নিদ্রা আসিয়াছে, এমন সময়ে দরজায় সজোরে আঘাত—দুম্, দুম্, দুম্। তিনি [illegible] হইয়া [illegible], হয় [illegible] আবার কোন দরকারে আসিয়াছে—[illegible] রাগিয়া মুরলীকে ধমকাইতে ধমকাইতে [illegible] খুলিয়া [illegible] খুলিয়া [illegible] দেখিতে পাইলেন না। কাছেই বাতি [illegible]

ওাহাট খুলিয়া গৃহের বাহিরে চারিদিকে খুঁজিলেন, মনুষ্যসমাগমের চিহ্নও দেখিতে পাইলেন না। একটু বিস্মিত হইলেন। আসিবার সময় একটা বড় কুকুর পাশ দিয়া চলিয়া গেল। পুনরায় দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া শয়ন করিলেন। ভাবিলেন, এ শব্দ কোথা হইতে আসিল! হয় ত অপর কোন বাটীতে কেহ দরজায় আঘাত করিয়া থাকিবে—রাত্রিকাল, শব্দ বড় নিকট শোনায় —তাহাতেই হয় ত আমি এ দরজায় আঘাত মনে করিয়াছিলাম। আবার নিদ্রাভিভূত। পুনরায় দরজায় আঘাত—দুম্ দুম্, দুম্। আবার তিনি উঠিলেন, মনে মনে মহা-বিরক্ত হইলেন। ভাবিলেন, সেই যে কুকুরটাকে বাহিরে দেখিয়া আসিয়াছি, হয় ত সেই কুকুরটা এ গৃহে রাত্রিকালে থাকে। অদ্য দরজা বন্ধ থাকায় আসিতে পারিতেছে না, সুতরাং দরজায় আঘাত করিতেছে। কুকুরটাকে তাড়াইয়া দিবার মানসে দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলেন, কিন্তু এবারে কুকুর বা অন্য কিছু দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু তাঁহার স্পষ্ট বোধ হইল, দরজা খুলিবামাত্র কে যেন দ্রুতপাদবিক্ষেপে দরজার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল। তিনি এবার অধিকতর বিস্মিত হইলেন। কিছু না বলিয়া পুনরায় দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া শয়ন করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, এ বাটীটা চোর-ডাকাতের বাসস্থান। জমিদারবাবুর বাটী চাবিবন্ধ হইয়া পড়িয়া থাকে, কেহ থাকে না, এমত অবস্থায় চোর-ডাকাতের বাসস্থান হওয়াই বা বিচিত্র কি? যাই হোক, এবারে আর দরজা খুলিতেছি না। যদি খুলি তবে সাবধান হইয়া খুলিব। যখনি তিনি কোন মফস্বলে রাত্রিযাপন করিতেন, সঙ্গে একখানি ছোরা রাখিতেন, সেখানি বাহির করিয়া নিকটেই রাখিলেন। পুনরায় দরজায় আঘাত। এবারকার আঘাত অতি কোমল, অতি মৃদু। দাদাবাবু ভাবিলেন, বাঃ, রহস্য ত মন্দ নয়। এ কি, আমি সমস্ত রাত্রিই কি দরজা খুলিব ও দিব। যাই হোক্, দেখি কি ব্যাপার। এই ভাবিয়া এক হাতে বাতি, এক হাতে ছোরা লইয়া দরজা খুলিলেন। দরজা খুলিবামাত্র দেখিলেন, একটি সুন্দরী খর্ব্বকায়া যুবতী দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া। তাঁহাকে দেখিয়াই স্ত্রীলোকটি দ্রুত তথা হইতে পলাইয়া তৃতীয় মহলের দিকে গেল। দাদাবাবু ত অবাক্। ভাবিলেন, ব্যাপারখানা কি? নিকটেই জমিদারবাবুর বসত-বাটী; স্ত্রীলোকটি কে? চেহারায় বোধ হয় কোন বড় মানুষের বাড়ীর মেয়ে। তবে কি এ জমিদারবাবুর বাটীর কোন কুলকলঙ্কিনী, প্রত্যহ রাত্রিতে এ বাটীতে আসিয়া নিজ পাপবাসনা চরিতার্থ করে? দাদাবাবু ভাবিলেন, তাই যদি হয়, তবে পুরুষমানুষ কৈ? স্ত্রীলোকটি ত একা। এই গৃহেই হয় ত উহারা রাত্রিবিহার করে। আমি অদ্য রাত্রি এখানে থাকিব শুনিয়া পুরুষটি হয় ত অদ্য আসে নাই। স্ত্রীলোকটি অত শোনে নাই, তাহার নায়ক আসিয়াছে কি না, দেখিবার নিমিত্ত হয় ত আসিয়াছিল। আমায় দেখিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু ও মহলে কেন গেল? যাই হোক্, উহাকে ধরিতে হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি

অকুতোভয়ে দীপহস্তে সেই মহলে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, স্ত্রীলোকটি সেই মহলের বারাণ্ডার শেষ সীমায় দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। তাহাকে দেখিয়া সেও স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। যখন তিনি অতি নিকটে যাইলেন, তখন সেই স্ত্রীলোকটি বলিল, "মহাশয়, আপনি আমার পিছনে পিছনে আসিয়াছেন কেন? আমি ত আপনার কোন অনিষ্ট করি নাই।"

দাদা।—তুমি আমার কোন অনিষ্ট কর নাই, তাহা আমি জানি। আমার কোন অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা তোমার নাই। তুমি স্ত্রীলোক, আমার কি অনিষ্ট করিবে?

স্ত্রীলোক।—আপনার যদি সেই ধারণা, তবে আমার পিছনে কেন? যান না, আপনি শয়ন করুন গে না। আপনি কি বঙ্কিমবাবু?

দাদা—হাঁ আমি বঙ্কিমবাবু—আমার নাম তুমি কি প্রকারে জানিলে? আর এত রাত্রে তুমি একাকিনী এই জনশূন্য বাটীতে কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছ? জান, আমরা হাকিম। এরূপ অবস্থায় যখন তোমাকে পাইয়াছি, তখন তোমায় অমনি ছাড়িতে পারি না। তোমায় ধৃত করিব।

স্ত্রীলোক।—আমার পরিচয় পাইলে ও আমি কি অভিপ্রায়ে এত রাত্রে এখানে আসিয়াছি জানিতে পারিলে কি আপনি আমায় ছাড়িয়া দিবেন?

দাদা—সে কথা পরে বিবেচ্য। এখন বল দেখি, তোমার নাম কি? তুমি যে জমিদারবাবুর বাটীর মেয়ে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিয়াছি।

স্ত্রীলোক।—তবে শুনুন। আমার নাম "বিরহ"; আমি জমিদারবাবুর মধ্যম পুত্রবধূ। আমি প্রত্যহ রাত্রে এখানে আসি। যে গৃহে আপনি শয়ন করিয়াছিলেন, ঐ গৃহে আমি রাত্রিবাস করি। আমি কি অভিপ্রায়ে আসি, কেন আসি, তাহা বলিব না, আপনি চেষ্টা করিলেও তাহা জানিতে পারিবেন না। আপনি নিষ্ফল আমার পিছনে পিছনে আর আসিবেন না। আমারও সময় হইয়া আসিল, আমি চলিলাম। আমি যে এখন কোথায় যাইব, তাহার স্থিরতা নাই।

দাদা—তোমাকে আমি অমনি ছাড়িতে পারি না। আমার হাত হইতে কোথায় পলাইবে। কল্য প্রাতে জমিদারবাবুর মধ্যম পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তোমার তাঁহার জিম্মা করিয়া দিয়া সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিব।

স্ত্রীলোক।—আপনি বৃথা চেষ্টা করিবেন। আপনি আমায় ধরিতে পারিবেন না।

এই কথা শুনিয়া দাদাবাবু তাহাকে ধরিবার অভিপ্রায়ে হাত বাড়াইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য! হাত গিয়া দেয়ালে লাগিল, স্ত্রীলোকটি খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া দাদাবাবুর পশ্চাতে দাঁড়াইল। দাদাবাবু তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিবার অভিপ্রায়ে তাহার দিকে ফিরিলেন। সে তখন দৌড়াইতে আরম্ভ করিল, দাদাবাবুও তাহার পশ্চাৎ চলিলেন। স্ত্রীলোকটি বরাবর যাইয়া খিড়কী খুলিয়া বাগানে পড়িল। দাদাবাবুও সঙ্গে সঙ্গে বরাবর পুকুর ছাড়াইয়া তালগাছের সারির

ভিতর দিয়া বাগানের দরজা খুলিয়া একেবারে সদর রাস্তায় পড়িলেন। আগে আগে স্ত্রীলোক, পশ্চাতে দাদাবাবু, একেবারে বাগানের প্রথম ফটকের সম্মুখে। বাদাম-তলায় পাল্কী, পাল্কীর ছাদে একজন বাহক ঘুমাইতেছে। বাদামগাছের পশ্চাতেই একটা চাঁপাগাছের কাছে আসিয়া আর স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইলেন না। শুধু চাঁপাগাছটা বাতাসে দুলিতে লাগিল। এইবারে তাঁহার মনে একটু ভীতি-সঞ্চার হইল। মনে হইল, এই যে সম্মুখে স্ত্রীলোকটিকে দেখিতেছিলাম —চাঁপাগাছের কাছে আসিয়া কই আর ত তাকে দেখিতেছি না। এখন ত, বাতাস নাই—তবে চাঁপাগাছই বা অত দোলে কেন? তবে ত আমি একটা ছায়ামূর্ত্তির সহিত বেড়াইয়াছি। কাজটা ভাল করি নাই। ও বাটীতে আর ঢুকিতেছি না। এই স্থির করিয়া তিনি বেহারাদের জাগাইলেন। তাহারা অত রাত্রে ঐরূপ অবস্থায় বাবুকে দেখিয়া হতবুদ্ধি হইল।

দাদাবাবু একজন বেহারাকে হুকুম দিলেন, "যা, চাকরদের সব উঠাইয়া আন্।" সে গিয়া সকলকে উঠাইয়া আনিল। তখন তিনি সেই রাত্রি প্রায় ৪ ঘটিকার সময় লোকজন সমভিব্যাহারে ফিরিলেন। পরদিন বেলা ৮টার সময় বাসায় পঁহুছিলেন। কাঁথিতে আসিয়া ৪।৫ দিন যায়, তিনি ভাবেন, ব্যাপারখানা কি? একদিন সেই গ্রামের জমিদার-মহাশয়ের নিকট হইতে একজন গোমস্তা তাঁহার কাছে কি কার্য্যোপলক্ষে আসে। তাহাকে দাদাবাবু জিজ্ঞাসা করেন, "হাঁ হে, তোমাদের মেজবাবুর বৌটি কেমন?"

গোমস্তা।—আজ্ঞে সে বৌটি বড়ই সুন্দরী, ধীর, শান্তপ্রকৃতি ছিলেন।"

দাদা।—ছিলেন কি? তিনি এখন কোথায়?

গোমস্তা।—মহাশয়, দুঃখের কথা আর কি বলিব? যে বাড়ীতে আপনি ছিলেন, সেই বাড়ীতে একবার মেজবাবু সস্ত্রীক দিনকয়েক বাস করেন, একদিন জানি না কিরূপে মেজবৌটি পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গিয়া জলে ডুবিয়া যান। তাহাতেই তিনি মারা পড়েন।

দাদা—ওঃ, তাই বটে। তা, দেখ, তোমাদের বাবুকে বলো—সেই বৌটির গতি করিতে। বৌটি এখনও ঐ বাটীতে আছে।

শ্রীদিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানবের জন্মকথা

মানব এবং ইতর প্রাণিগণের মনোবৃত্তির তুলনায় পূর্ব্ব দুই অধ্যায়ে বুঝা গেল যে কোন নিম্নতর জীব হইতে উৎপন্ন হওয়ার পরিষ্কার চিহ্ন মানবদেহে বিদ্যমান আছে। কিন্তু এরূপ তর্ক উপস্থিত হইতে পারে যে, মানব এবং ইতর প্রাণিগণ মনোবৃত্তিতে যখন

এতদূর বিভিন্ন তখন ঐ সিদ্ধান্ত অবশ্যই ভ্রমাত্মক। নিশ্চয়ই এ বিষয়ে উভয়ের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক। চারির অধিক সংখ্যা যে গণিতে জানে না, যে সাধারণ সাধারণ বস্তুগুলিরও নাম ব্যবহার করিতে শিক্ষা করে নাই, অথবা মনোভাবগুলির নামও অবগত নহে এরূপ অতি অসভ্য মানবও সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চশ্রেণীস্থ বানরের তুলনায় অনেক বিভিন্ন। কুকুরের পূর্ব্বপুরুষ শৃগাল অথবা নেকড়ে বাঘের তুলনায় কুকুরকে যে পরিমাণ সভ্য অথবা উন্নত করা হইয়াছে, সে পরিমাণ যদ্যপি কোন উচ্চ শ্রেণীর বানরকে উন্নত ও সভ্য করা হয়, তাহা হইলেও তাহার সহিত মানবের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক রহিয়াই যাইবে। ফিউজিয়ান-গণ নিম্নশ্রেণীস্থ অতি অসভ্য জাতি; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যেও তিন জন বিগল্ নামক জাহাজে ছিল, উহারা ইংলণ্ডে কিছু দিন বাস করিয়াছিল এবং একটু ইংরাজী কথাও বলিতে পারিত। উহাদিগের স্বভাব, চরিত্র ও মনোবৃত্তি আমাদিগের সহিত প্রায় একপ্রকারই দেখিয়া আমি সর্ব্বদাই অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইতাম। যদি মানব ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীর কোন মনোবৃত্তি না থাকিত, অথবা ইতর জীবের অপেক্ষা মানবের মনোবৃত্তি যদ্যপি সম্পূর্ণ পৃথক ভাবের হইত, তাহা হইলে আমরা কখনই বিশ্বাস করিতে পারিতাম না যে আমাদিগের উন্নত মনোবৃত্তি সকল ক্রমে ক্রমে বিবর্ত্তিত ও পুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু মানবের এবং ইতর জীবের মনোবৃত্তি মধ্যে ঐরূপ কোন মৌলিক প্রভেদ না থাকা প্রমাণ করা যাইতে পারে। আর, এ কথাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে নিম্নশ্রেণীর বংসের সহিত উচ্চ শ্রেণীর বানরের মনোবৃত্তিতে যত প্রভেদ, বানরের ও মানুষের মধ্যে প্রভেদ তত অধিক নহে, তথাপি ইহাদিগের মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রমিক প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

নৈতিক ভাবেও সভ্য মানবের সহিত বর্ব্বর জাতীয়গণের প্রভেদ সামান্য নহে। সিন্ধু-পর্য্যটক * বৃদ্ধ বাইরণ যে বর্ব্বরের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সে তাহার পুত্রের হস্ত হইতে এক ঝুড়ি সিন্ধু-কণ্টক † পড়িয়া যাওয়ায় পুত্রকে হত্যা করিয়াছিল: তাহার সহিত (মানব প্রেমিক) হাওয়ার্ড অথবা ক্লার্কসনের কত প্রভেদ? যে অসভ্য মানব গুণবাচক প্রায় একটি শব্দও ব্যবহার করিতে জানে না তাহার সহিত সেক্‌স্‌পিয়ার ও নিউটনের প্রভেদ বিবেচনা করিলেই সভ্য এবং অসভ্য মানবের বুদ্ধির প্রভেদও বুঝা যাইবে। অত্যুন্নত জাতি সকলের শীর্ষস্থানীয় মনীষীগণের সহিত নিম্নতম বর্ব্বর জাতীয় মানবের বিশাল প্রভেদ; কিন্তু এতদুভয় মধ্যেও নানা শ্রেণীর অল্পাধিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি অনেক দেখা যায়; এই মধ্যবর্ত্তিগণের পরস্পরের প্রভেদ অত্যন্ত কম। সুতরাং ইহা অসম্ভব নহে যে, নিম্নতর বর্ব্বর হইতে উন্নত মানব ক্রমে বিবর্ত্তিত হইয়াছে।

মানব এবং উচ্চশ্রেণীস্থ স্তন্যপায়ী জীব মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির যে প্রভেদ তাহা মৌলিক নহে, এই কথাই বর্ত্তমান অধ্যায়ে প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছা আছে। এই বিষয়ের

* Navigator † Sea urchin (প্রাণীবিশেষ)

প্রত্যেক বিভাগ লইয়া স্বতন্ত্র সন্দর্ভ রচনা করা যায়, কিন্তু এ স্থলে সংক্ষেপেই আলোচনা করিব যখন মনোবৃত্তি সকলকে সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে শ্রেণীবিভাগ করা হয় নাই, তখন তাহাদিগকে যেরূপে শ্রেণী-বিভাগ করিলে আমার উদ্দেশ্যের অনুকূল হয় তদ্রূপ ভাবেই বিভক্ত করিব; আর তদর্থেই এরূপ সকল দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব যাহা আমার নিকট গুরুতর বোধ হইয়াছে; আশা করি, ইহা পাঠকের মনেও কিছু কিঞ্চিৎ ভাবের উদ্রেক করিবে।

দাম্পত্য-নির্ব্বাচন আলোচনা করিতে আমি অতিরিক্ত কয়েকটী বৃত্তান্তের উল্লেখ করিব, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে অতি নিম্নশ্রেণীস্থ প্রাণিগণেরও মনোবৃত্তি, যেমন বিবেচনা করা যাইত তাহা অপেক্ষা অনেক উন্নত। একই জাতীয় বিভিন্ন ব্যক্তিগণের মনোবৃত্তি সকল বিভিন্ন প্রকার দেখা যায়, ইহা বর্ত্তমান আলোচনার একটী গুরুতর কথা, সুতরাং এ স্থলে ইহার কতিপয় দৃষ্টান্ত দিব। কিন্তু এই বিষয় বিস্তৃত ভাবে লিখা অনাবশ্যক, কারণ আমি অনেক সময় অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইয়াছি যে যাঁহারা পক্ষী এবং অন্যান্য নানাবিধ প্রাণীর প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এক-বাক্যে স্বীকার করেন যে একজাতীয় ব্যক্তি সকলের মধ্যেও প্রত্যেক মনোবৃত্তি সম্বন্ধে অনেক ইতর বিশেষ আছে। অতিশয় নিম্ন-শ্রেণীস্থ জীবের মনোবৃত্তি প্রথমে কিরূপে উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা অনুসন্ধান করা আর জীবন কিরূপে প্রথমে উদ্ভূত হয় তাহার আলোচনা করা সমান কঠিন। যদি মানব কখন এই সকল বিষয় মীমাংসা করিতে পারে তবে সে সময় এখনও বহু দূর রহিয়াছে।

যখন মানুষের এবং মানবেতর প্রাণীর ইন্দ্রিয় সকল একই প্রকার, তখন তাহার মৌলিক সহজ জ্ঞানও অবশ্যই একরূপই হইবে। মানুষের এবং ইতর জীবের কতিপয় সহজ বৃত্তিও একই প্রকার; যথা আত্ম-রক্ষা, দাম্পত্যপ্রণয়, সদ্যঃজাত শিশুর প্রতি মাতৃস্নেহ, ঐ শিশুর স্তন্যপানেচ্ছা* ইত্যাদি। কিন্তু অব্যবহিত নিম্নশ্রেণীর জীবগণের তুলনায় মানবের সহজ বৃত্তির সংখ্যা কম। প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জের ওরাঙ্গওটান এবং আফ্রিকার সিম্পাঞ্জি মাচা বান্ধিয়া তাহার উপর নিদ্রা যায়। যখন এই উভয় জাতীয় জীবেরই অভ্যাস এক প্রকার, তখন এরূপ তর্ক করা চলিত যে ঐ অভ্যাস সহজ বৃত্তির ফল। কিন্তু আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি না যে ঐ উভয় জীবেরই অভাব তুল্যরূপ হওয়ায় এবং উভয়েরই বুদ্ধিবৃত্তি অনুরূপ থাকায় ঐরূপ ঘটে নাই। এই সকল বানর গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অনেক বিষাক্ত ফল খায় না; কিন্তু মানুষের তদ্রূপ কোন জ্ঞান নাই। আমাদিগের গৃহপালিত পশুগণকে ভিন্ন দেশে লইয়া গিয়া বসন্ত কালে ছাড়িয়া দিলে তাহারা অনেক সময় বিষাক্ত তৃণ

* একণে জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ বুঝিতে পারিতেছেন যে সদ্যোজাত শিশুর স্তন্য পান করিবার ইচ্ছা থাকে না; স্তনাগ্রভাগের সহিত শিশুর ওষ্ঠাধরের স্পর্শ ঘটিলে অজ্ঞাত প্রতিক্রিয়া-বশত (reflex action) তাহার ঐরূপ অভ্যাস হয় এবং তদ্রূপ কারণেই উহা পরে বলবতী হইয়া থাকে।

ওষধাদি আহার করে, কিন্তু পরিশেষে আর তদ্রূপ করে না; তদ্রূপ বানরগণও যে নিজের অথবা পিতা মাতার অভিজ্ঞতা হইতে আহারোপযোগী ফল সকলের বিষয় অবগত হয় না,এ কথা নিশ্চিত বলা যায় না। কিন্তু আমি এখনই দেখাইব যে, বানরগণের নিশ্চয় স্বভাবতই সর্পভীতি আছে এবং সম্ভবত অন্য হিংস্রজন্তুর ভয়ও তাহাদের স্বাভাবিক।

নিম্নশ্রেণীস্থ প্রাণিগণের সহিত তুলনায় উচ্চশ্রেণীস্থ প্রাণিগণের সহজবৃত্তি সকল সংখ্যায়ও কম এবং জটিলতায়ও কম; ইহা ভাবিবার বিষয়। কুভের বলিয়াছেন যে সহজবৃত্তি এবং বুদ্ধির মধ্যে বিপরীত অনুপাত;* এবং কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে উচ্চশ্রেণীস্থ প্রাণিগণের সহজবৃত্তির বিবর্ত্তনেই বুদ্ধিবৃত্তি জাত হইয়াছে; কিন্তু পুসে (Pouchet) একটী কৌতূহল-উদ্দীপক সন্দর্ভে দেখাইয়াছেন যে ঐ দুই বৃত্তি মধ্যে প্রকৃত পক্ষে কোন বিপরীত অনুপাত নাই। যে সকল কীটের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যজনক সহজ বৃত্তি আছে তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিও সর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চয়ই অধিক। সমেরু জীবশ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট জীব মৎস্য এবং উভচর, তাহাদিগের সহজবৃত্তির জটিলতা নাই। স্তন্যপায়িগণের মধ্যে বীবর সহজবৃত্তির উৎকর্ষতায় অতিশয় বিখ্যাত, এবং তাহার বুদ্ধিবৃত্তিও অধিক; মরগ্যানের The American Beaver and his works নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ যিনি পাঠ করিয়াছেন তিনি ইহা স্বীকার করিবেন।†

শ্রীশশধর রায়।

ফিডো

সক্রেটিস্—তাহা হইলে আমি প্রথমে যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই ত ঠিক হইল। যে লোক সমস্ত জীবন একপ্রকার মৃত্যুর অবস্থাতে অবস্থিতি করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহার সম্মুখে যখন মৃত্যু আসে সে কি তখন দুঃখিত হইবে? ইহা কি নির্ব্বোধের কার্য্য নয়?

সিমিয়াস—তাহা না ত কি?

সক্রেটিস্—সুতরাং হে সিমিয়াস, প্রকৃত জ্ঞানীরা কিরূপে মরিতে হইবে সর্ব্বদা এই শিক্ষা করে এবং তাহাদের কাছে মৃত্যুর কোন ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি নাই। এখন বিচার করিয়া দেখ যাহারা শরীরের সঙ্গে শত্রুতা করিয়া আছে এবং যাহারা আত্মাকে আপনাতে রাখিতে চায় তাহারা যদি বিচ্ছেদের সময় ভয় পায়, তাহারা যদি পরলোকে

---

* একটী কম হইলে আর একটী বেশী হয়, একটী বেশী হইলে, আর একটী কম হয় ইহাকেই বিপরীত অনুপাত বলে।

† গত ভাদ্রের মানবের তত্ত্বকথায় দুইটি ভুল আছে। অনুব্রত স্থলে সমুব্রত ও স্ত্রী স্থলে পুং ও পুং স্থলে স্ত্রী ছাপা হইয়াছে। ম: স:

যাইবার সময় আহ্লাদ প্রকাশ না করে তাহা হইলে তাহাদের ব্যবহার কি অন্যায় নহে? এমন অনেক লোক আছে যাহাদের কোন প্রিয় বন্ধু কিংবা সহধর্ম্মিণী কি পুত্র মরিয়া গেলে তাহারা সেই পরলোক যাইতে ইচ্ছা করে এবং সেখানে গিয়া যাহাদিগের জন্য তাহাদের হৃদয় ব্যাকুল তাহাদিগকে পাইতে চায়। যে জন জ্ঞানকে প্রকৃতরূপে ভালবাসে এবং যাহার পরলোকে গিয়া সেই জ্ঞানের সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশা আছে, সে কি মরিতে দুঃখ করে? তাহার কি পরলোকে যাইবার জন্য আহ্লাদ হয় না? যদি সে বাস্তবিক দার্শনিক হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে আহ্লাদিত হইবে, যেহেতু তাহার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে অন্য কোথাও বিশুদ্ধ জ্ঞান পাইবার সম্ভাবনা নাই। যদি এ কথা সত্য হয় তাহা হইলে তাহার পক্ষে মরণকে ভয় করা কি নিতান্ত অমঙ্গল নহে?

সিমিয়াস—হাঁ, বাস্তবিক ইহা অসঙ্গত।

সক্রেটিস্—যদি তুমি দেখ একজন লোক মরিবার জন্য ভয় পাইতেছে, তুমি কি ইহা ভাবিবে না যে সে জ্ঞানকে ভালবাসে না কিন্তু শরীরকে ভালবাসে, অথবা ধন কিংবা যশের মধ্যে এক কিংবা উভয়কে ভালবাসে?

সিমিয়াস—তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য।

সক্রেটিস্ আরও বলিতে লাগিলেন "যে জ্ঞানকে ভালবাসে তাহারই কেবল সাহস, মিতাচার এবং অন্যান্য ধর্ম্ম আছে, ইহা ঠিক বলা যাইতে পারে। এবং অন্যান্য লোকের যাহা ধর্ম্ম বলিয়া মনে হয় বাস্তবিক তাহা তাহার ধর্ম্ম নহে, কিন্তু তাহার বিপরীত। মানুষ মৃত্যুর বশীভূত হয় এই ভয়ে সে যদি তাহার মৃত্যুকে বাধা দেয় তাহা হইলে মৃত্যু অপেক্ষা অধিকতর অনিষ্ট আসিতে পারে। আমার কথা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু নিশ্চয় জানিও যে এই সকল লোকেরা ভীরু বলিয়াই এত সাহস দেখাইতে পারে। এই জন্যই অনেকে মিতাচারী হয় কারণ তাহারা জানে অমিতাচারী হইলে এমন অনেকগুলি সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইবে যাহা অমিতাচার হইতে পাওয়া যায় না। তাহারা কতকগুলি সম্ভোগের দাস বলিয়াই অন্য কতকগুলি সম্ভোগকে দমনে আনিতে পারে। ইহা ঠিক বিনিময়ের ন্যায়। যেমন টাকা অন্য টাকার সহিত বিনিময় করা যায় তেমনি একটা সম্ভোগ আর একটা সম্ভোগের সহিত কিংবা একটী ভয় আর একটী ভয়ের সহিত বিনিময় করা যায়। কিন্তু সে সকল টাকা অকৃত্রিম নহে। অকৃত্রিম টাকা কেবল জ্ঞান এবং তাহারই মূল্যে অন্যান্য পদার্থ বিনিময় করা উচিত।

এই বিনিময়ের অর্থ শরীরের কর্তৃত্ব হইতে আত্মাকে মুক্তি দেওয়া। সে বিনিময় হইলে, আত্মা অসৎ কামনা এবং প্রবৃত্তি হইতে নিস্তার পায়; যেহেতু শরীর হইতে নিষ্কৃতি পাইলেই লোক শুদ্ধ হয়, এবং শুদ্ধ হইলে সাহস, মিতাচার এবং প্রকৃত জ্ঞান আসে।

যাঁহারা তন্ত্রশাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারা যে বাল্যক্রীড়া করিয়া গিয়াছেন ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। একটী পুরাতন রূপক তাঁহারা সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন

তাহার ভিতরে গভীর সত্য নিহিত আছে। তাঁহারা বলেন, যে লোক দীক্ষিত এবং অভিষিক্ত না হইয়া যমপুরে গমন করে তাহাকে পঙ্কে পড়িয়া থাকিতে হয় এবং যে দীক্ষা দ্বারা শুদ্ধ হইয়াছে সে দেবতাদিগের সঙ্গে বাস করে। তান্ত্রিকেরা বলেন যে যষ্টিধারকের সংখ্যা অধিক, কিন্তু প্রকৃত তান্ত্রিক অল্প। প্রকৃত তান্ত্রিক কাহারা? আমার মতে যাহারা জ্ঞানকে প্রকৃতরূপে ভালবাসে। আজীবন কাল আমি তাহাদের সঙ্গ পাইবার জন্য কোন মতে ত্রুটি করি নাই। আমি ঠিক কাজ করিয়াছি কি না এবং তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছি কি না তাহা ভগবানের ইচ্ছায় পরলোকে যাইলে জানিতে পারিব এবং তাহা বোধ হয় অতি অল্পকালের মধ্যে ঘটিবে।"

সক্রেটিস্ যখন কথা শেষ করিলেন সিবেস তখন এই ভাবে বলিতে লাগিলেন—"হে সক্রেটিস্, তুমি যাহা বলিলে তাহা আর সকল বিষয়ে ঠিক, কেবল আত্মা সম্বন্ধে লোকে তোমার কথায় বিশ্বাস করে না। কারণ তাহাদের একটা সংস্কার আছে যে যখন এই শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হয় তখন আত্মা নাও থাকিতে পারে এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ইহার মৃত্যু হইতে পারে। এমন কি, শরীর হইতে প্রস্থান করিবার সময় আত্মা নিশ্বাস কিংবা ধূমের ন্যায় বহির্গত হইয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া আবার একত্র হইতে পারে না এবং তাহার অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু যদি তাহা বিক্ষিপ্ত না হইয়া আবার একত্রিত হইতে পারে এবং জীবনের দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পায় এবং তাহার অস্তিত্ব বিনষ্ট না হয় তাহা হইলে তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য ইহা আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু মনুষ্য মরিলে আত্মা থাকে এবং তাহার ক্ষমতা সকলও থাকে ইহা প্রমাণ করিতে হইলে অনেক যুক্তি এবং মীমাংসা করিতে হয়।"

সক্রেটিস্—হে সিবেস্, তুমি ঠিক বলিয়াছ, কিন্তু কি করিব বল? তোমার কি ইচ্ছা যে আমরা তর্ক করিয়া এখন এই সকল বিষয়ের মীমাংসা করি।

সিবেস্—এ সম্বন্ধে তোমার ভাব জানিতে পারিলে আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইব।

সক্রেটিস্ বলিলেন, "তুমি সত্য বলিতেছ। আমার বোধ হয় তোমার অর্থ এই যেমন আমি বিচারালয়ে আত্মসমর্থন করিয়াছি সেই ভাবে এখানেও এই অপবাদ হইতে আমাকে রক্ষা করি।"

সিমিয়াস বলিলেন, "তাহাই হউক।"

সক্রেটিস্—আচ্ছা এস, আমি আত্মসমর্থন করি; বোধ হয় বিচারালয়ের অপেক্ষা এখানে অধিক কৃতকার্য্য হইব। প্রথমতঃ আমি বিশ্বাস করি যে আমি অন্যান্য জ্ঞানী এবং উত্তম দেবতাদিগের নিকট যাইতেছি। এবং শুধু দেবতারা কেন সেখানে অনেক মৃত মনুষ্য আছেন যাঁহারা জীবিত লোকদিগের অপেক্ষা অনেক ভাল। আমি যদি এ কথা বিশ্বাস না করিতাম তাহা হইলে মৃত্যুর জন্য আমার দুঃখিত না হওয়া আমার খুবই অন্যায় হইত। কিন্তু সত্য বলিতে কি, আমার আশা আছে যে সেখানে আমি উত্তম লোকদিগকে দেখিতে পাইব, যদিও এ বিষয়ে আমি জোরের সহিত বলিতে ইচ্ছা

করি না। কিন্তু আমি যে দয়াল দেবতা-দিগের নিকট যাইব এ কথা অত্যন্ত বল এবং বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারি। এই জন্য আমার দুঃখ হইতেছে না এবং আমার যথেষ্ট আশা আছে যে মৃত্যুর পর আমাদিগের জন্য কিছু আছেই। সে কিছু ভাল লোকদিগের পক্ষেই ভাল, মন্দ লোকদিগের পক্ষে নয়।

সিমিয়াস—কিন্তু সক্রেটিস্ তুমি কি এই বিশ্বাস নিজেই লইয়া যাইবে, আর আমাদিগকে ইহা দিবে না? কারণ ইহা এমন এক জিনিস যাহা আমার মনে হয় আমাদের সকলেরই থাকা উচিত। আর যদি তুমি ইহার সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস জন্মাইতে পার তাহা হইলে ইহা তোমার আত্মসমর্থনেরও কাজ করিবে।

সক্রেটিস্—আমি চেষ্টা করিব। কিন্তু প্রথমে ক্রিটোকে জিজ্ঞাসা করা যাক এতক্ষণ তিনি আমাকে কি বলিবেন বলিয়া উৎসুক হইয়াছেন।

ক্রিটো—সক্রেটিস্, কেবল এই যে, যে লোক তোমাকে বিষ পান করাইবে সে বলিতেছে যে তুমি যত অল্প কথা কহিতে পার কহিও, যে হেতু সে বলিতেছে কথা কহিলে লোকেরা উষ্ণ হইয়া যায় এবং তাহা হইলে বিষ ভালরূপে কার্য্য করে না। সুতরাং দুই তিন বার পান করিতে হয়।

সক্রেটিস্—ও কথায় মনযোগ দিও না। সে বিষ দিবার জন্য প্রস্তুত থাকুক, দুইবার তিনবার যতবার আবশ্যক হউক না কেন!

ক্রিটো—আমি জানি তুমি কথা বলিবে, কিন্তু এই লোকটী যে অনেকক্ষণ ধরিয়া বিরক্ত করিতেছে।

সক্রেটিস্—উহার কথায় মন দিও না। এখন হে বিচারপতিগণ, আমার কথা শ্রবণ কর। যে লোক দর্শনশাস্ত্র অনুসন্ধানে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে সে মরিবার সময় সাহসী হয় এবং তাহার মনে এই আশা থাকে যে জীবন পরিত্যাগ করিলে পরলোকে গিয়া এক বিমল আনন্দের অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। ইহার যুক্তি তোমাদিগকে বলিতেছি শুন।

যাঁহারা জ্ঞানের শাস্ত্র যথার্থরূপে অনুধাবন করেন তাঁহারা মৃত্যু কি এবং কিরূপে মরিতে হইবে কেবল এই বিষয়ক চর্চ্চা করেন। এ কথা যদি সত্য হয় এবং ইহাও যদি সত্য হয় যে এই লোকেরা আজীবন আগ্রহ সহকারে কেবল মরণকে প্রতীক্ষা করিয়া আছে, তাহা হইলে ইহা কি নিতান্ত অসঙ্গত নহে যে, যে পদার্থকে তাঁহারা চিরজীবন সাধন করিয়া প্রতীক্ষা করিয়া আছে সে পদার্থটি আসিলে তাঁহারা দুঃখিত হইবেন?

এখন বল দেখি মৃত্যু বলিয়া কি কোন জিনিস আছে?

সিমিয়াস—অবশ্য আছে।

সক্রেটিস্—বল দেখি মৃত্যু কাহাকে বলে? শরীর হইতে আত্মা বিচ্ছিন্ন হওয়া; ইহাই কি মৃত্যুর অর্থ নহে? আত্মা শরীর হইতে এবং শরীর আত্মা হইতে মুক্ত হয় এবং অবশেষে উভয়ে পৃথক পৃথক হইয়া অবস্থিতি করে। মৃত্যুর অর্থ কি আর কিছু আছে?

সিমিয়াস—না। ইহাই মৃত্যুর অর্থ।

সক্রেটিস্ বলিতে লাগিলেন "অধিকাংশ লোকের শারীরিক সুখসম্ভোগ ভিন্ন অন্য কোন লক্ষ্য নাই। তাহাদিগের মতে এই সকল সুখ বিনা জীবন ধারণ করা ও মৃত্যু

হওয়া উভয়ই সমান। কিন্তু প্রকৃত দার্শনিকের উদ্দেশ্য সত্য উপার্জ্জন করা। শরীর সে সত্য উপলব্ধি করিতে পারে না যেহেতু শরীরের ইন্দ্রিয় সকল মনের চক্ষুকে অন্ধ করিয়া দেয় এবং সেই সকলের দ্বারা আমরা কুপথগামী হই। সেই জন্য দার্শনিকেরা শরীরকে একটি প্রতিবন্ধক বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন শরীর মানসিক কার্য্যের বাধা দেয় এবং যদি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর জ্ঞান পাইবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে আত্মাকে শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করা একান্ত আবশ্যক।

সেই জন্য যদি পরিষ্কার জ্ঞান পাইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমাদিগকে শরীর হইতে মুক্ত হইতেই হইবে, যেহেতু তাহা হইলেই আত্মা কি ইহা আপনা আপনি দেখিতে পাইবে। এবং সেই জ্ঞান আমরা কেবল মৃত্যুর পর পাইতে পারি, জীবিতাবস্থায় নয়। কারণ যতদিন আমরা শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকি ততদিন আমরা কোন বস্তু পরিষ্কার রূপে দেখিতে পারি না। তাহা হইলে এই দুইটার মধ্যে একটা ঠিক—হয় আমাদের পক্ষে জ্ঞান উপার্জ্জন করা কোথাও সম্ভব নহে, নয় ইহা কেবল মৃত্যুর পরই সম্ভব। যেহেতু মৃত্যুর পরই আত্মা শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে এবং আপনাতে আপনি অবস্থিতি করিবে। জীবিতাবস্থায়ও আমরা প্রকৃত জ্ঞানের নিকটবর্ত্তী হইতে পারি যদি আমরা শরীরের সংস্পর্শ সম্ভবমত ছাড়িয়া দিই এবং ইহার দ্বারা কোনরূপে দূষিত না হই যদি সংকল্প থাকে যে ঈশ্বর যত দিন না আমাদিগকে তাঁহার বন্ধন হইতে মুক্ত করেন ততদিন আমরা শুদ্ধ থাকিব। এইরূপে শরীরের জড়তা হইতে নিষ্কৃতি পাইলে আমরা আমাদিগেরই মত লোকের সঙ্গ ভোগ করিব এবং যাহা কিছু সত্য এবং শুদ্ধ তাহা আপনা আপনি উপলব্ধি করিব, ইহাই সার সত্য। অশুদ্ধ পদার্থ যে শুদ্ধ পদার্থকে ধরিয়া থাকিবে ইহা ভগবানের নিয়ম বিরুদ্ধ। প্রকৃত বিদ্যার্থীরা এইরূপ সত্য বিশ্বাস করিয়া অন্যকে শিক্ষা দান করিবে ইহাই তাহাদিগের কর্ত্তব্য। হে সিমিয়াস, তুমি কি এরূপ বিবেচনা কর না?

সিমিয়াস—নিশ্চয়ই।

সেক্রেটিস্—যদি এ কথা সত্য হয় তাহা হইলে আমি যখন পরলোকে যাইব তখন আমি যাহা পাইবার জন্য এ জীবনে এত আয়াস করিয়াছি তাহা সেখানে নিশ্চয়ই পাইব। সেই জন্য যে যাত্রায় এখন পদক্ষেপ করিতেছি তাহাতে আমার অনেক আশা আছে এবং যে ব্যক্তি সেই স্থানে যাইবার জন্য মনকে শুদ্ধ করিয়াছে তাহার আশা ভিন্ন আর কি আছে?

সিমিয়াস বলিলেন "নিশ্চয়।"

সক্রেটিস্—শুদ্ধির অর্থ কি? ইহার অর্থ আত্মাকে শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করা। শরীর হইতে পৃথক থাকিয়া আত্মার সমুদয় ভাব একত্রিত করিয়া নিজেতে বাস করা—ইহারই নাম শুদ্ধি।

সিমিয়াস—নিশ্চয়।

সেক্রেটিস—শরীর হইতে আত্মার নিষ্কৃতি এবং বিচ্ছেদ ইহাকেই কি লোকে মৃত্যু বলে না?

সিমিয়াস—নিশ্চয়।

সক্রেটিস্—তাহা হইলে এই প্রমাণ হইতেছে যে প্রকৃত জ্ঞানীরাই কেবল এই নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ব্যাকুল হন এবং যাহাতে আত্মা শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হয় তাহারই জন্য তাঁহারা কেবল চেষ্টা করেন; ইহা কি সত্য নহে? (ক্রমশ)

৺ কৃষ্ণবিহারী সেন।

শ্রীপঞ্চমী ও বাণীমূর্ত্তি

সারস্বতোৎসব চান্দ্রমাঘের শুক্লা পঞ্চমীতে হইয়া থাকে। সাধারণতঃ এই পঞ্চমী শ্রীপঞ্চমী বলিয়া খ্যাত। শ্রীপঞ্চমীকে অনেকে আবার বসন্ত পঞ্চমী বলিয়া জানেন এবং এই দিন হইতেই বসন্ত কাল আরম্ভ হইল বলিয়া বিশ্বাস করেন। পশ্চিম প্রদেশে উক্ত দিন হইতেই হোলি-উৎসব আরম্ভ হয় এবং বাসন্তী রংএর ধূতি উড়ানিরও বাহার লাগিয়া যায়। বাংলা দেশ বাহিরের সাজ-পোষাকে একটু অকবি, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিলক্ষণ কবি, কারণ ছাত্রমহল হইতে সরস্বতী পূজার সময় যত নিমন্ত্রণ পত্র বাহির হয়, তাহার প্রায় প্রতি পত্রেই কমলিনীর প্রস্ফুটন, ভ্রমর গুঞ্জন ও কোকিল কোকিল-বর মধুর কূজন-সংবাদ সহ বসন্তের আগমনসংবাদ বিঘোষিত হয়। চান্দ্রমাঘ যদি সৌর ফাল্গুনে পড়ে তবে বসন্তবর্ণনা সহ হয়, কিন্তু যদি চান্দ্রমাঘ সৌরমাঘের প্রবলশীতের মধ্যে উপস্থিত হয় তবে ওরূপ বসন্ত বর্ণনা কেবল অসহ বোধ হয় না, অন্য পক্ষে অশাস্ত্রীয় বলিয়াও ঠেকে। প্রাচীন শাস্ত্র বলে, মধু ও মাধব অর্থাৎ চৈত্র ও বৈশাখ এই দুই মাস বসন্ত কাল। কিন্তু অয়ন-চলন হেতু ঋতু অগ্রগামী হইয়াছে বলিয়া এখন লৌকিক ব্যবহারে ফাল্গুন ও চৈত্র মাসকে বসন্তকাল ধরা হয়। আরও বহুদিন পরে সৌরমাঘে বসন্ত আরম্ভ হইবে! কিন্তু যদি আমরা এখনই সৌরমাঘে বসন্ত বর্ণনা আরম্ভ করিয়া দিই তবে কি শাস্ত্রীয় ও কি লৌকিক, কোন ব্যবহার দিয়াই আমাদিগকে সমর্থন করিতে পারি না। আমরা পরলোক গত হইবার বহু বহু বর্ষ পরে, সৌরমাঘে বসন্ত আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা বলিয়া এখনও উহা আমাদের নিকট পারলৌকিক ব্যবহার ভিন্ন অন্য কিছুই বিবেচিত হওয়া উচিত নহে।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলের এক চেটী, চূতমুকুল দেখিয়া অনুমান করিয়াছিল যে মধুমাস উপস্থিত হইয়াছে। যদি কেহ এই নাটকীয় ন্যায়ের দ্বারায়, মাঘ মাসে আম্রমুকুল দেখিয়া, মধুমাসের আগমন সংবাদ ঘোষণা করেন তবে তাঁহাকে ঠকান শক্ত বটে, কিন্তু এরূপ হইলে আমাদের পঞ্জিকাকারগণ মধু মাসকে কোথায় স্থান দিবেন, তাহা লইয়া একটু গোলে পড়িবেন সন্দেহ নাই এবং অনেক বৃদ্ধকেই হয় ত আবার নূতন করিয়া মুখস্থ করিতে হইবে মাঘ ও ফাল্গুন এই দুই মাস বসন্তকাল।

শ্রীপঞ্চমীকে কেন বসন্ত পঞ্চমী বলে তাহার একটু নিগূঢ় কারণ আছে; এই কারণ সম্বন্ধে আমি যাহা অনুমান করি-এখন তাহাই বিবৃত করিতেছি। আমাদের দেশের সঙ্গীত শাস্ত্র যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে বসন্তরাগ ষড়রাগের অন্যতম। এই বসন্তরাগ কখন গাহিতে হয় কলাবিদ্‌গণ তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সঙ্গীত-দামোদর নামক গ্রন্থে আছে—

শ্রীপঞ্চম্যাঃ সমারভ্য যাবৎস্যাচ্ছয়নং হরেঃ।

তাবদ্বসন্তরাগস্তু গানমুক্তং মনীষিভিঃ ॥

শ্রীপঞ্চমী হইতে আরম্ভ করিয়া, হরিশয়ন পর্য্যন্ত মনীষিগণ কর্ত্তৃক বসন্তরাগ গীত হওয়া সঙ্গত অর্থাৎ চান্দ্রমাঘের শুক্লাপঞ্চমী হইতে চান্দ্রআষাঢ়ের শুক্লাদশমী পর্য্যন্ত বসন্তরাগ গাওয়া যুক্তিযুক্ত, অন্যসময়ে অযুক্ত।

শ্রীপঞ্চমী হইতে বসন্তরাগ গেয় বলিয়া উহার নাম বসন্ত পঞ্চমী, বসন্তকালের পঞ্চমী বলিয়া নহে। আমরা নাম সার্থক হেতু শ্রীপঞ্চমীকে বসন্তকালের পঞ্চমী ভাবিয়া বসিয়া আছি। কিন্তু আমরা যাহা করিয়াছি তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক; কারণ, "বসন্ত" এই নামে বৈচিত্র্যপূর্ণ, নবজীবনের সংবাদবাহী, চিরপুরাতন ও চিরনূতন, সকল মানবের নয়ন সমীপে স্বপ্রকাশ বসন্ত ঋতুর কথা মনে না হইয়া যদি কতিপয় স্বরজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রের পরিচিত বসন্তরাগের কথা আমাদের মনে হইত, তবে তাহা নিতান্তই অস্বাভাবিক ও অশোভন হইত। শ্রীপঞ্চমীতে এখন বসন্তকালের স্বত্ব বাণীপুত্রগণের কৃপায় কায়েমী হইয়া গিয়াছে, বসন্তরাগ বেচারা কাঁদিয়া কাটিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেও ডিক্রি পাওয়ার আশামাত্রও আর নাই।

শ্রীপঞ্চমীর কথাতেই, সরস্বতী পূজা ও উৎসব কতকালের এই প্রশ্নটি মনে উদিত হয়। এখন তদ্বিষয়েই দু'চারিটি কথা বলিতে চাই।

হিন্দুমাত্রই জানেন যে জলশুদ্ধির মন্ত্রে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু ও কাবেরীর উল্লেখ আছে। অন্য সকল গুলিই যখন নদী এবং সশরীরেও বর্ত্তমান, তখন অনুমান করিতে হয় সরস্বতীও নদী, কিন্তু এই সরস্বতী কোথায়? শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে উক্ত নদী রাজপুতানার মরুভূমিতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন যে বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্রের নিকট দিয়া না কি উক্ত নদী প্রবাহিত হইতেছে। মহাভারতে আছে সরস্বতীর সাত বোন, তাহার এক বোন কুরুক্ষেত্র দিয়া প্রবাহিত হইত। লুপ্ত বা অলুপ্ত যাহাই হউক উহার নদীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন যে পূর্ব্বে দৃশদ্বতী ও সরস্বতী তীরে আর্য্য উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। মনু বলেন ঐ প্রদেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলিত। ব্রহ্মাবর্ত্ত এক সময়ে যজ্ঞধূমে পূত ও ছন্দোচ্চারণে মুখরিত ছিল। সরস্বতী পূর্ব্বে নদীমাত্রই ছিলেন কিন্তু তাঁহার তীরে মন্ত্র রচিত ও ছন্দঃ গীত হওয়ায় সত্বরেই তিনি দেবীপদবাচ্যা হইয়া পূজিত হইতে লাগিলেন।

পণ্ডিতগণের উক্ত অনুমানের কোন মূল্য আছে কি না বুঝিতে হইলে বেদ অধ্যয়ন আবশ্যক, আমার তাদৃশ ক্ষমতা না থাকায় ৺রমেশচন্দ্র দত্তের ভাষান্তরিত ঋগ্বেদ হইতে কিঞ্চিৎউদ্ধৃত করিতেছি—

১ম মণ্ডল, ১ম অষ্টক, ৩য় সূক্ত

পবিত্রা অন্নযুক্তা, অন্নবিশিষ্টা, যজ্ঞফলরূপধনদাত্রী সরস্বতী আমাদিগের অন্ন বিশিষ্ট যজ্ঞ কামনা করুন। ১০।

সুনৃত বাক্যের উৎপাদয়িত্রী, সুমতি

লোকদিগের শিক্ষয়িত্রী সরস্বতী আমাদিগের যজ্ঞ গ্রহণ করিয়াছেন। ১১।

সরস্বতী প্রবাহিত হইয়া প্রভূত জল সৃজন করিয়াছেন এবং সকল জ্ঞানের উদ্দীপন করিয়াছেন। ১২।

অতঃপর ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৬১ সূক্তের দেবতাই হইতেছেন সরস্বতী, এবং ভরদ্বাজ ঋষি তাঁহাকে অন্নশালিনী, রক্ষাকারিণী, সপ্ততন্তিনী সম্পন্না বলিয়া স্তুতি করিতেছেন।

৭ম মণ্ডলের ৯৫ সূক্ত মধ্যে আছে—"হে সুভগে সরস্বতী! এই বশিষ্ঠ তোমার জন্য যজ্ঞের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছেন! হে শুভ্রবর্ণা দেবী বর্দ্ধিতা হও। স্তুতিকারীকে অন্নদান কর।"

অতিপূর্ব্বে কি ছিল তাহা জানার উপায় নাই। কিন্তু উপরি উক্ত মন্ত্রগুলি পাঠ করিলে মনে হয় না যে পূর্ব্বে ঋষিগণ সরস্বতীকে নদীমাত্র মনে করিতেন, পরে তাঁহাকে দেবী আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন; পরন্তু, এই মনে হয় যে ঋষিগণ সরস্বতীকে নদী বলিয়া জানিলেও সেই সময়েই তাঁহাকে সুনৃত বাক্যের উৎপাদয়িত্রী, অন্নদাত্রী, পালনকর্ত্রী, যজ্ঞভাগগ্রহণকর্ত্রী, শুভ্রবর্ণা দেবী বলিয়াও জ্ঞাত হইয়াছিলেন। যেমন বর্ত্তমান কালের ভক্তিমান্ ব্যক্তি গঙ্গাকে কেবলমাত্র নদী বলিয়া নয়, কিন্তু পাবনী-শক্তিরূপিণী, সুখমোক্ষবিধায়িনী ও অন্নস্বাস্থ্যদায়িনী দেবী বলিয়াও জানেন।

কোন কোন মন্দিরে, আমরা গঙ্গার যে মূর্ত্তি দেখিতে পাই, গঙ্গাকে দেবী ভাবিলেও ঠিক সে মূর্ত্তি গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া ভক্তের মনে উদিত হয় কি না সন্দেহস্থল। আমার মনে হয় বৈদিক ঋষির মনেও সরস্বতীর সেইরূপ কোন সুস্পষ্ট রূপ ফুটিয়া উঠে নাই; কালক্রমে সরস্বতীর নদীরূপা তনু বিলুপ্ত বা শ্রীহীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার মূর্ত্তি এমন উজ্জ্বল ও উজ্জ্বলতর বর্ণে চিত্রিত হইয়া ভক্তের মানস-নেত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, এখন শ্রীপঞ্চমীর দিনে উত্তম অধম সকল ভক্তগৃহেই তাঁহার কুন্দেন্দুধবলা, সিতাম্বরবাসিনী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে বাণীর বরপুত্রগণ বাস করেন বলিয়া শ্রীপঞ্চমীতে এ দেশে এত আনন্দ উৎসব দেখিতে পাই, এ কথা কথঞ্চিৎ সত্য হইলেও, সরস্বতী তীর হইতে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের বহুদূরে আগমনও যে তাহার একটি প্রধান কারণ নয়, এরূপ মনে হয় না। যেহেতু আমরা এখনও দেখিতে পাই যে, তীর্থবাসীর অপেক্ষা তীর্থযাত্রীর ও তীর্থ হইতে দূরস্থ অধিবাসীরই তীর্থদেবের প্রতি বেশী ভক্তি।

গঙ্গার দু' একটি মন্দির এখনও এ দেশে আছে, কিন্তু ঈশ্বর না করুন, যদি এই গঙ্গা অন্তর্হিতা হন, তবে এখনকার দু' একটি মন্দিরের স্থলে, হয় ত, শত শত মন্দির গড়িয়া উঠিবে ও গঙ্গাপূজার দিনে হয় ত আমরা প্রতি ভক্তগৃহেই—

চতুর্ভুজাং ত্রিনেত্রাঞ্চ সর্ব্বাবয়বভূষিতাম্।
রত্নকুম্ভাং সিতাম্ভোজাং বরদাময়প্রদাম্।
শ্বেতবস্ত্রপরিধানাং মুক্তামণিবিভূষিতাম্।
সিত মকর নিসন্নাং শুভ্রবর্ণাং ত্রিনেত্রাং।

মূর্ত্তিটি সশরীরে দেখিতে পাই। তাই আমার

মনে হয় যে ঋগ্বেদের সময় হইতেই সরস্বতী কেবল নদী নহেন, তিনি নদী ও দেবতা উভয়ই, কালক্রমে তাহার মূর্ত্তিটি নানা ভক্তের অন্তর্নিহিত ভাবধারায় পরিপুষ্ট হইয়াছে মাত্র। তিনি ছিলেন শুভ্রবর্ণা শ্রুত বাক্যের দেবতা—"বাক্‌বাদিনী"; বাদিনী শব্দের সহিত বাদন ও বাদ্য শব্দের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, কাজেই পরে তিনি হইলেন "বীণাপাণি" এবং বাক্ যখন লিখিত হইয়া গ্রন্থ হইয়া পড়িল, তখন সরস্বতীও পুস্তকধারিণী হইয়া পড়িলেন। আবার যাঁহার তীরে এত নলখাগড় জন্মিত, তিনি যদি সেকালের লেখনীর দেবতা না হইবেন, তবে আর কে হইবে! তিনি শুভ্রবর্ণা ও সিতাব্জবাসিনী চিরদিনই ছিলেন।

তার পর বাদন কলাবিদ্যার অন্তর্গত বলিয়া বীণাপাণি কেবল কবি ও গায়কের নহেন, সকল শিল্পীরই আরাধ্যা হইয়া পড়িলেন। বেদে ও মহাভারতে সরস্বতীর সপ্তভগ্নী বা সপ্তরূপ সকলেই নদী, কিন্তু পুরাণকার বলিলেন—

লক্ষ্মীর্মেধা ধরা পুষ্টি গৌরী তুষ্টি প্রভা ধৃতিঃ।
এতাভিঃ পাহি তনুভিরষ্টাভির্মাং সরস্বতি॥

কাজেই সরস্বতীর যে কোন কালেও অনেকরূপা তনু ছিল তাহা আমরা এখন প্রায় সম্পূর্ণই বিস্মৃত হইয়াছি।

বীণাপাণির মূর্ত্তি কল্পনা কেবল হিন্দু-ভারতই করে নাই, উহা বৌদ্ধজগতেও প্রচারিত ছিল। শাক্যসিংহের যে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম, তাহাতে সম্ভবতঃ বাণীর কোন মূর্ত্তির উল্লেখ নাই; কারণ যখন বাণী অমূর্ত্তরূপে, তথাগতের রসনাতেই ঋষসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন ভারতের কোন মন্দিরই সেই শ্রুত বাক্যের প্রশস্ত পীঠ হইবার স্পর্দ্ধা করে নাই। কিন্তু যখন বুদ্ধদেব মহানির্ব্বাণ লাভ করিলেন, যখন তাঁহার মহীয়সী বাণী স্মৃতিমাত্রেই পর্য্যবসিত হইল, তখন বৌদ্ধগণ সেই বাণীকে প্রজ্ঞাপারমিতা-রূপে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই প্রজ্ঞাপারমিতা এখনও তিব্বত, চীন, পূর্ব্ব উপদ্বীপে সযত্নে রক্ষিত ও পূজিত হইতেছেন। আরব, পারস্য, আফগানিস্থান প্রভৃতি স্থানেও বৌদ্ধপ্রচারকগণের দ্বারা বাণীর উক্ত মূর্ত্তি প্রচারিত হইবার কথা, এবং যদি একেশ্বরবাদের ভীষণ আন্দোলনে উক্ত মূর্ত্তিগুলি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না হইয়া গিয়া থাকে, তবে পশ্চিম এসিয়ার বৃহৎ বৃহৎ ধর্ম্মমন্দির-গাত্রে এখনও উহার নিদর্শন রহিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

এসিয়া ছাড়িয়া আফ্রিকায় উপস্থিত হইলে দেখা যায় যে তথাকার প্রাচীন সভ্য প্রদেশ মিশরে বাকবাদিনী "নিথ্" নামে পূজিতা হইতেন। আবার এসিয়া আফ্রিকা ছাড়িয়া ইউরোপখণ্ডের সভ্যতার কেন্দ্রস্বরূপ গ্রীস দেশে উপস্থিত হইলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে তথায়ও বাগ্‌দেবী তাঁহার কমলাসন স্থাপন করিয়াছিলেন।

প্রাচীন গ্রীসে বীণাপাণি "এথিনি" নামে পূজিতা হইতেন। পণ্ডিত, কবি, বাগ্মি-গণ এথিনি মন্দিরে উৎসবানন্দে মত্ত হইতেন এবং শিল্পী, ব্যবসায়িগণও বাগ্‌দেবীর পূজায় পরাঙ্মুখ ছিলেন না।

গ্রীসের পরই রোম। রোমস্থ বাগ্‌

দেবীর নাম ছিল মিনার্ভা। এথিনি দেবী যেমন শীত অন্তে পূজিতা হইতেন, মিনার্ভাও তেমনি, শীতের প্রায় অবসানে, ১৯শে মার্চ্চ তারিখে, ভক্তদিগের পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিতেন। আমাদের দেশে, চান্দ্রমাস গণনার স্থলে, যেমন মাসকে বদি ও সুদি এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়, প্রাচীন রোমেও তেমনি, মাসকে দুই ভাগে ভাগ করার রীতি ছিল, ঐরূপ বিভাগের নাম ছিল আইড্‌সের (ides) পূর্ব্ব ও idesএর পর। প্রতিমাসের ১৪ই তারিখকে "ides" বলিত। মিনার্ভা পূজার দিন ১৯শে মার্চ্চ, ides হইতে ধরিলে উহা ৫ম দিন বা ৫মী, পাঁচ এই সংখ্যাটিও দেবীর বড় প্রিয় ছিল বলিয়া রোমকগণ বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং এই শ্রীপঞ্চমীর প্রভাবও এসিয়া হইতে ইউরোপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

উৎসবের দিন মিনার্ভা-মন্দিরে কবি, নাট্যকার, নট, ভাট, বাদকগণ উপস্থিত হইতেন; বিদ্যালয় বন্ধ হইত, ছাত্রগণ গুরু-গৃহে দক্ষিণা লইয়া উপস্থিত হইতেন। অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারেই উহা আমাদের শ্রীপঞ্চমীর মতই ছিল। ভারতবর্ষ সর্ব্ব ব্যাপারেই না কি ইউরোপের নিকট ঋণী, এমন কথা মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া যায়, এই পৌত্তলিকতার ব্যাপারেও ইউরোপ উত্তমর্ণ ও আমরা অধমর্ণ কি না কেহ তাহার মীমাংসা করিলে ঔৎসুক্যের নিবৃত্তি হইতে পারে।

আমরা, এতক্ষণ দেখিতে পাইলাম যে, প্রাচীন কালে প্রায় সর্ব্বত্রই বীণাপাণির ভক্তের অভাব ছিল না. এখন দেখা যাউক সভ্যতার ও সৌন্দর্য্যবীর্য্যের আধারস্বরূপ, অপৌত্তলিক বর্ত্তমান ইউরোপ বাগ্‌দেবীর ভক্ত কি না! এই সুসংস্কারের দিনে, মিনার্ভা ও এথিনির পূজা করিলে, ইউরোপের পণ্ডিতগণ মুখ দেখাইতে পারেন না, তাই তাঁহারা এখন সেণ্টসিসিলিয়া নাম্নী এক মহাপ্রাণা রমণীরত্নকে সরস্বতীর পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। ইনি সর্ব্ব প্রথমে, খৃষ্টধর্ম্মমন্দিরে তন্ত্রীবাদ্যের প্রচলন করেন, কাজেই ইউরোপীয় কবিদের নিকট ইনি-ই এখন বীণাপাণি। সেণ্টসিসিলিয়ার পবিত্র দিনে কবিগণ কাব্যোৎসব করিয়া থাকেন। ইহাতে এই মনে হয় যে, সরস্বতীর পূজার প্রেরণা মানব-মনের কোন গভীরতর স্থানে নিহিত আছে, তাহা না হইলে পৌত্তলিক ও অপৌত্তলিক সকলের মধ্যে উহার বিকাশ দেখিতে পাইতাম না।

এই ত গেল বীণাধারিণী বিদ্যাদেবীর কথা; কিন্তু অবিদ্যাকে দূর করিতে হইলে, কেবল মধুর মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইলেই সকল সময় কার্য্যোদ্ধার হয় না, কখন কখন ভীষণ মূর্ত্তিও ধারণ করিতে হয়। তাই আমরা বীণাপাণির খড়্গপাণি মূর্ত্তিও দেখিতে পাই।

আমাদের দেশে সরস্বতীকে প্রণাম করিবার সময় "সরস্বত্যৈ নমোনিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমোনমঃ" এই মন্ত্র পাঠ করা হয়। এই ভদ্রকালী ও কাত্যায়নী কালিকাপুরাণ মতে একই দেবতা। কাত্যায়নীই দুর্গা, কাজেই দশমহাবিদ্যার সকল বিদ্যাই, বিদ্যাদেবী বাণী হইতে

অভিন্ন। "পবিত্রা" নামেও উহার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে সকল বিদ্যার ধ্যানে, বাণীমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে নাই কিন্তু তারা মূর্ত্তিতে ঐ ভাবটি প্রকটিত হইয়াছে। যেমন তন্ত্রসারে,—

নীলয়া বাক্‌প্রদা চেতি তেন লীলা সরস্বতী,
তারকত্বাৎ সদা তারা সুখমোক্ষপ্রদায়িনী।

আবার বৌদ্ধ জগতেও, প্রজ্ঞাপারমিতার রূপান্তর নীল সরস্বতী বা তারা মূর্ত্তির পূজা প্রচলিত আছে। নীল সরস্বতী বা তারা দয়াময়ী, কিন্তু খড়্গধারিণী রক্ষাকর্ত্রী; বর্ত্তমানকালে যে সমুদয় বৌদ্ধ তারা মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশ স্থলেই তারা খড়্গধারিণীরূপে নির্দ্দিষ্টা হইয়াছেন।

কেবল এসিয়াতেই বিদ্যাদেবীর খড়্গধারিণী মূর্ত্তি প্রচলিত নয়, ইউরোপীয় রোম ও গ্রীসেও বিদ্যাদেবী উক্ত ভাবে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অযোনিসম্ভবা এথিনি বা কি সশস্ত্র হইয়াই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হন। রোমেও মিনার্ভা, পরবর্ত্তী সময়ে রণচণ্ডিকারূপে (Goddess of War) পূজিতা হইতেন ও তখন রোমবাসিগণ পাঁচ দিনব্যাপী উৎসবে মত্ত হইতেন!

এই সকল উদাহরণ হইতে আমরা দেখিতে পাই যে বাণীর আরাধনা ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, সজ্ঞানে হউক অজ্ঞানে হউক, নীচভাবে হউক কি উচ্চভাবে হউক আমরা সকলেই করিতেছি। তিনি কাহারও কাছে খড়্গধারিণী, কাহারও কাছে বীণাপাণি, আবার কাহারও কাছে বা মেধাবৃত্তি পুষ্টি তুষ্টিরূপিণী। তিনি আনন্দরূপে, স্বপ্রকাশরূপে সকলের মধ্যেই আছেন ও ক্রমে ক্রমে আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন। আজ যদি বাণীশ্বরী আমাদিগকে ত্যাগ করেন, আমরা কলাই জড়ভরতে পরিণত হইব। আমাদের অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, জ্ঞানবিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, কাব্যকলা, সভ্যতা, ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি, কর্ম্মকোলাহল মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হইয়া যাইবে। তাই সর্ব্বদেশই বাণীভক্ত, সর্ব্ব জাতিই স্বল্প পরিমাণে হউক আর বহু পরিমাণেই হউক সেই বাণীর আনন্দরসময় কমলাসনের রসাস্বাদ করিয়া মাতোয়ারা।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন।

পাঠ-বন্ধু

(ক্ষুদ্র গল্প)

মস্ হেওয়ার্ড একজন খৃষ্ট ধর্ম্মপ্রচারিকা। কেনারাম বসু মহাশয় একজন পেন্সনপ্রাপ্ত সব জজ। তিনি কুমারীকে তাঁহার কন্যা ও পুত্রবধূকে ইংরাজী ও সূচির কার্য্য শিখাইতে আপনার গৃহে প্রবেশাধিকার দিয়াছেন। কুমারী সপ্তাহে দুই দিন শিক্ষা দিতে কেনারাম বাবুর গৃহে আগমন করেন। তিনি চলিয়া গেলে বসু মহাশয়ের স্ত্রী, কন্যা ও পুত্রবধূর পাঠাগারে গঙ্গাজল ছিটাইয়া খৃষ্টানীর পদস্পর্শে

অপবিত্র ঘরটী ও চৌকীগুলিকে শুদ্ধ করিয়া থাকেন। কেনারাম বাবু যখন প্রাত-হোটেল হইতে খানা আনাইয়া আপনার ভোজন কক্ষে বসিয়া আহার করেন, তাঁহার আহারান্তেও গৃহিণী গঙ্গাজলে তাঁহার ঘরটী, এমন কি সময় সময় কেনারাম বাবুকেও শুদ্ধ করিয়া লন। কখন কখন একটু গঙ্গাজল খাওয়াইয়া তাঁহার উদরস্থ অখাদ্য-গুলিকেও শুদ্ধ করেন। কিন্তু ইহা লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে কখনও কলহ হয় না, সময় সময় পরিহাস চলিয়া থাকে। স্বামী কদাচারী হইলে কি হইবে, গৃহিণী তাঁহাকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করেন, তাঁহার চরণামৃত পান করেন এবং গলবস্ত্র হইয়া প্রতিদিন তাঁহাকে প্রণাম করেন।

বলা বাহুল্য যে ঘরের মধ্যে দুই প্রকারের শিক্ষা চলিতেছে, একটা স্বদেশী একটা বিদেশী, একটা হিন্দুয়ানী ও একটা খৃষ্টানী; তবে পরিবারটী গৃহিণীর আদর্শেই গঠিত হইতেছে, কেননা গৃহিণী ধর্ম্ম-পরায়ণা, আর বাবুটী শুধু কদাচারী। মতামত যাহাই থাকুক কেনারামবাবুর প্রতি পরিবারস্থ সকলেরই ভালবাসা অতুল, তিনিও পরিবার-বৎসল ও অমায়িক।

আজ বুধবার, মেমসাহেবের পড়াইতে আসিবার দিন। ছাত্রীদ্বয় তাহাদের পড়িবার ঘরটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া সাজাইয়া গোছাইয়া এবং নিজেরা সভ্যতা-ব্যঞ্জক পোষাক পরিয়া শিক্ষয়িত্রীর অপেক্ষা করিতেছে, বাহির বাড়ীতে বাঘা কুকুরটা যখন বড়ই চিৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, তখন তাহারা বুঝিল যে মেমসাহেব আসিতেছেন, উভয়ে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে গেল, তিনি উভয়ের মুখ-চুম্বন করিয়া উভয়ের কাঁধের উপর দুই হাত দিয়া গলাগলি করিয়া পাঠাগারে প্রবেশ করিলেন।

বাইবেল পড়াইতে মেমসাহেব বলিলেন "দেখ ভগ্নীগণ প্রভু যিশু-খ্রীষ্টকে বিশ্বাস না করিলে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না। সাধু হইলে হইবে না, ধার্ম্মিক হইলে হইবে না, ঈশ্বরের ভক্ত হইলেও হইবে না, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের এক-জাত-পুত্র যিশুতে বিশ্বাস না করিবে সে পরিত্রাণ পাইবে না।" কন্যা কমলা এক কূট প্রশ্ন তুলিল, সে বলিল "যিশুতে বিশ্বাস কি অর্থে বলিতেছেন? মেরীর গর্ভে যিশু জন্মিয়াছিলেন এবং তিনি ক্রুশকাষ্ঠে প্রাণ দিয়াছেন, এই ইতিহাস বিশ্বাস করিলে যিশুকে বিশ্বাস করা হইবে; অথবা তিনি যেরূপ আচরণ করিয়াছেন অথবা করিতে বলিয়া গিয়াছেন সেইরূপ আচরণ করিলে পরিত্রাণ হইবে? যদি শেষের কথা সত্য হয় তবে ত অধিকাংশ খৃষ্টানেরই পরিত্রাণ নাই।" মেমসাহেব উত্তর করিলেন— "যিশু যে ঈশ্বরের পুত্র, পাপীর পাপ গ্রহণ করিতে সমর্থ, এই বিশ্বাস করিয়া তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে।" ইহার উপর কমলা কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময় হঠাৎ একটী যুবকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া উভয় পাঠিকা চঞ্চল হইয়া উঠিল। অবিলম্বে গৃহিণী উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন— "বিনোদ এসেছে, বিনোদ এসেছে।" মেম সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "বিনোদ কে?"

কমলা বলিল "আমার দাদা। অনেক দিনের পরে বাড়ী এসেছেন, আমরা তাঁহাকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছি।" মেমসাহেব বলিলেন "আচ্ছা, আমি দশ মিনিট অপেক্ষা করিতেছি।" মেমসাহেবের কথা শেষ হইতে না হইতে বিনোদ তাহার মায়ের সঙ্গে সেই ঘরের নিকটে আসিল এবং মেমসাহেবকে যথারীতি ইংরাজীতে অভিবাদন করিল, মেমসাহেব প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিলেন "আপনাকে দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম।" বিনোদ, প্রত্যুত্তরে বহু ধন্যবাদ জানাইল।

বিনোদ যেখানে একটী কেদারায় বিশ্রাম করিতে বসিল সে স্থান মেমসাহেবের ঘর হইতে দেখা যাইতেছিল। গৃহিণী পুত্রের স্বর্গাক্ত কলেবরে হাত-পাখার বাতাস করিতেছিলেন, কমলা তাড়াতাড়ি এক ঘটী জল আনিয়া দাদার পা ধোয়াইয়া দিল, শাশুড়ীর আদেশে সুরমা এক গ্লাস সরবৎ প্রস্তুত করিয়া আনিল, কিন্তু শাশুড়ীর সাক্ষাতে উহা স্বামীকে দিতে সঙ্কোচ অনুভব করিয়া ব্রীড়াবনত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল, বিনোদ সে লজ্জারুণ মুখশ্রী অধিকক্ষণ দেখিবার বাসনায় একটু দুষ্টামি করিয়া সরবতের গ্লাস লইবার কোন প্রয়াস করিলেন না, সুরমা বিনোদের এই কৌশল বুঝিয়া অন্যের অলক্ষ্যে স্বামীর প্রতি কটাক্ষ-পাত করিলেন—দৃষ্টি বিনিময় হইয়া গেল; অল্প সময়ের মধ্যে নয়নে, ইঙ্গিতে অনেক কথা হইয়া গেল। শেষ বিপন্না কমলাকে শাশুড়ী উদ্ধার করিলেন,—বলিলেন, "বউমা বিনুকে সরবৎ দাও,—" তখন বিনোদ হাত বাড়াইয়া কমলার হাত হইতে গ্লাস লইলেন। দশ মিনিট অতীত হওয়া মাত্র মেমসাহেব একটী ছোট ঘণ্টা বাজাইলেন, গৃহিণীর অনুমতি লইয়া কমলা ও সুরমা আবার পাঠাগারে গেল।

সেইদিন রাত্রে মিস্ হেওয়ার্ড তাঁহার বিলাতে কোনো প্রচারক বন্ধুকে একখানা পত্র লিখিলেন। রাত্রে লিখিলেন, কেন না পরদিন বৃহস্পতিবার বিলাতের ডাক যাওয়ার দিন। পরদিন এই চিঠী লিখিতে তাঁহার সময় হইত কি না জানি না, কিন্তু ব্যাপারটী তাঁহার প্রাণে এমনই খোঁচা মারিতেছিল যে উহা লিপিবদ্ধ না করিয়া তাহার সুনিদ্রা হইতেছিল না। পত্রখানি আমরা যথাযথ অনুবাদ করিয়া দিলাম—

"আমার প্রিয়—

আজ একটী বিশেষ ব্যাপার দেখিয়াছি, তাহার বিষয় তোমাকে না লিখিয়া আমি কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। আমি এখানে কোন মধ্যবিত্ত ভদ্র-আখ্যাধারী পরিবারে প্রভুর মহিমা প্রচার করিতে সপ্তাহে দুই দিন গিয়া থাকি, উক্ত পরিবারে দুইটী বালিকা আমার নিকট বাইবেল পাঠ করে, মেয়ে দুইটী সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী এবং বেশ ভদ্রস্বভাবা। গতকল্য যখন আমি তাহাদিগকে পড়াইতেছিলাম তখন তাহাদের একজনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও অন্য জনার স্বামী একটী যুবক বহু দিনের পরে বিদেশ হইতে বাড়ী আসিল, আমার ছাত্রীদ্বয় তাহাকে দেখিবার জন্য আমার নিকট ১০ মিনিটের ছুটি লইল। যেখানে তাহারা সকলে মিলিত হইয়াছিল সে স্থান

আমার দৃষ্টিগোচরে ছিল। আমি যাহা দেখিলাম তাহাতে বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইলাম। দেখিলাম যুবকের মাতা (এই পরিবারের গৃহিণী) চাকরাণীর মত একখানা পাখাহাতে করিয়া দাঁড়াইয়া যুবক পুত্রকে বাতাস করিতেছে, ভগিনীটী পা ধোয়াইয়া দিতেছে এবং স্ত্রী খানসামার কার্য্য করিতেছে। আমি শুনিয়াছিলাম হিন্দুরা স্ত্রীকে দাসীর ন্যায় মনে করে, কিন্তু বৃদ্ধা মাতা ও ভগিনীকেও যে দাসীর কার্য্যে নিয়োগ করে তাহা জানিতাম না। এই পরিবারে যে চাকর চাকরাণী কি বাবর্চ্চির অভাব আছে তাহা নহে, কিন্তু আমার মনে হয় পুরুষের অধিকার বজায় রাখার জন্যই ইহারা জোর করিয়া পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে দাসীর কার্য্যে নিযুক্ত করে। মেয়েদের দুঃখের সীমা নাই, বিশেষতঃ বৃদ্ধা মাতার কি কষ্ট! পুত্র তাহাকে দাসীর কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে, ইহা ভাবিলেও কত ক্লেশ হয়।

"আমাদের ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট গর্ব্ব করেন যে তাঁহারা দাসত্বপ্রথা তুলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকেই জানে না যে হিন্দুর মধ্যে এখনও দাসীত্বপ্রথা বজায় রহিয়াছে। আমার প্রিয় বন্ধু, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি—ইহার কি কোন প্রতিবিধান নাই?" ইত্যাদি।

প্রায় দুই মাস পরে বিলাত হইতে চিঠির উত্তর আসিল, তাহার মর্ম্ম এই—

"আমার প্রিয় মিস্ হেওয়ার্ড,

"তোমার পত্র পাইয়া মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইলাম. খৃষ্ট শিষ্যগণের জন্য পৃথিবীর কত দেশে যে কত কর্ম্ম রহিয়াছে তাহার অবধি নাই। জগতের সমস্ত অন্ধকার আমাদিগকেই দূর করিতে হইবে, আমাদিগকেই কন্দরে কন্দরে প্রদীপ জ্বালিতে হইবে। প্রভু যীশুখ্রীষ্ট আমাদের সহায় হউন।

"তুমি যে ঘটনা দেখিয়াছ তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। পণ্ডিতপ্রবর জেম্‌স্ মিল্ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে হিন্দুজাতি অতি অসভ্য। তাঁহার কথা অতীব সত্য। যাহারা হিন্দুজাতিকে সভ্য বলিয়া ঘোষণা করে ভারতবর্ষে তাহাদের পুস্তকের কাট্‌তি অত্যধিক হয়, কিন্তু তাহারা সত্যের প্রচারক নহে সত্যের আবরক। তুমি নিজে যখন দেখিয়াছ যে হিন্দুর মধ্যে দাসী-প্রথা এখনও বর্ত্তমান আছে তখন আর অন্য প্রমাণের প্রয়োজন কি?

"গবর্ণমেণ্ট কিছুই করিবেন না। তাঁহারা হিন্দুজাতিকে চটাইবেন না, তা খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার হউক আর না হউক। এ কাজ প্রচারকদিগকেই করিতে হইবে। আমি তোমার পত্র উপস্থিত করিয়া স্থানে স্থানে বক্তৃতা করিব এবং প্রচারকমণ্ডলীকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিব। আমাদের প্রচার-সমিতিতে তোমার চিঠি পেস করিব। আমাদের যে ফণ্ড আছে তাহাকে দ্বিগুণিত করিতে হইবে এবং প্রত্যেক হিন্দুর গৃহে গৃহে জেনানা-মিশনের কার্য্য চলিবে। যদি হিন্দু মেয়েদের মন 'প্রস্তুত' করিতে পার, তাহারা যদি কঠোর দাসত্বশৃঙ্খল ছিন্ন করিতে অভিলাষী হয়, তবে তাহাদের স্বাধীনতার উপর যাহাতে

কেহ হস্তক্ষেপ করিতে না পারে গভর্ণমেণ্ট অবশ্যই তাহা করিতে বাধ্য হইবেন। যদি ভীরুতাবশতঃ ভারত গবর্ণমেণ্ট না করেন, আমরা বিলাতে আন্দোলনের অগ্নি জ্বালাইব।" ইত্যাদি।

একদিন নিজের পত্রের নকল ও তাঁহার বন্ধুর প্রত্যুত্তর পত্রখানা হাতে করিয়া মিস্ হেওয়ার্ড কেনারাম বাবুর বাড়ী উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদের প্রীতিকর হইবে মনে করিয়া উহা ছাত্রীদ্বয়কে পড়িতে দিলেন। কোনো প্রয়োজনবশতঃ মিস্ হেওয়ার্ড আজ অপেক্ষা করিতে পারিলেন না; আগামী কল্য পড়াইতে আসিবেন এবং পত্র দুইখানা লইয়া যাইবেন বলিয়া গেলেন।

কমলা ও সুরমা অল্পই ইংরাজী শিখিয়াছিল, ইংরাজের হাতের অক্ষর পড়া তাহাদের পক্ষে কষ্টকর হইল। তাহারা উভয়ে পত্র দুইখানি কেনারামবাবুর হাতে দিল এবং উহার মর্ম্ম জানিতে চাহিল। কেনারাম বাবু পত্র পড়িয়া যেন অকূল সাগরে ভাসিলেন। যখন অর্থ করিয়া বুঝাইতেছিলেন তখন গৃহিণীও সেখানে আসিয়া উপস্থিত। পত্রের মর্ম্ম শুনিয়া সকলেই অবাক্। গৃহিণী রাগিয়া বলিলেন, "সে খৃষ্টানী, আমাদের হিন্দুর মর্ম্ম, হিন্দুর ধর্ম্ম কি করে বুঝ্‌বে?" বালিকা দুইটীও বড় ব্যথিত হইল। কেনারামবাবু চিঠী দুইখানি মেমসাহেবের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন এবং সেই সঙ্গে একখানা চিঠী দিলেন, তাহার মর্ম্ম এই—

"আপনি যে যত্নপূর্ব্বক এতদিন আমার কন্যা ও পুত্রবধূকে শিক্ষাদান করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে বহু ধন্যবাদ। কোনো বিশেষ কারণে তাহাদের পাঠ বন্ধ করিতে হইল, অতএব আপনাকে আর এখানে আসার পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে না। পুনরায় আপনাকে বহু বহু ধন্যবাদ দিতেছি।"

পাগড়িয়া পাখী।

বিষবৃক্ষের কয়েকটি চিত্র

কুন্দনন্দিনী

বিষবৃক্ষে কুন্দ কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি, কমনীয় কল্পনার ছবি—বাঙ্গালীর শান্ত সংযত পারিবারিক দৃশ্যের সম্পূর্ণ উপযোগী। কবির উদ্দীপ্ত কল্পনার ফল কপালকুণ্ডলার উপযুক্ত স্থান ভিন্ন পরিবৃত্তি নাধো, কবির অসাধারণ সঙ্গতিজ্ঞান তাহাকে ভিন্নাবস্থায় সংস্থাপিত করিয়াছে। সে চিত্র পাঠকের মনে বিস্ময়োৎপাদনে সমর্থ, তাহাতে চিত্রকরের ক্ষমতা সহজে অনুভূত হয়। কবি যেখানে অভিনবত্বে চমৎকৃত করিবার চেষ্টা না করিয়া, পরিচিত বস্তুর সমাবেশে, অনুপম শান্ত সৌন্দর্য্যের অবতারণে প্রয়াসী, সেখানে তাঁহাকে পাঠকের চিন্তা ও সূক্ষ্মানুভূতির অপেক্ষা করিতে হয়। পাঠক সে

অনুসন্ধানক্লেশ স্বীকার করিলেই দেখিতে পান, সহসা অনুভূত হইলেও, এক স্থলে কবির উদ্ভাবনশক্তি বা সৌন্দর্য্যসৃজনক্ষমতা অন্য স্থলাপেক্ষা ন্যূন নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের কুন্দকল্পনা তাঁহার কপালকুণ্ডলার সহিত তুলনা করিলে যে হীনপ্রভ হইবে আমরা এরূপ মনে করি না। তিনি কুন্দকে অপার্থিব প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, এবং কুন্দ যে পৃথিবীর হইয়াও এ পৃথিবীর নহে, আমরা দেখিয়াছি তাহা কুন্দের স্বপ্নদর্শন-ছলে তাহার জীবনপ্রারম্ভেই পাঠকসমীপে জ্ঞাপিত হইয়াছে। তৎপর নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে ভগিনী কমলমণির নিকট লইয়া গিয়া, কয়েকদিন তাহার হাবভাব পরিলক্ষণ করিয়া, বন্ধুবর হরদেব ঘোষালের নিকট লিখিতেছেন—

"কুন্দ নামে যে কন্যার পরিচয় দিলাম তাহার বয়স তের বৎসর। তাহাকে দেখিয়া বোধ হয় যে এই-ই সৌন্দর্য্যের সময়। প্রথম-যৌবন-সঞ্চারের অব্যবহিত পূর্ব্বেই যেরূপ মাধুর্য্য এবং সরলতা থাকে পরে তত থাকে না। এই কুন্দের সরলতা চমৎকার; সে কিছুই বুঝে না। আজিও রাস্তায় বালকদিগের সহিত খেলা করিতে ছুটে; আবার বারণ করিলেও ভীতা হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়। কমল তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতেছে। কমল বলে, লেখা-পড়ায় তাহার দিব্য বুদ্ধি। কিন্তু অন্য কোন কথাই বুঝে না। বলিলে বৃহৎ নীল দুইটি চক্ষু—চক্ষু দুইটি শরতের মত সর্ব্বদাই স্বচ্ছ জলে ভাসিতেছে—সেই দুইটি চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া চাহিয়া থাকে; কিছু বলে না—আমি সে চক্ষু দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হই; আর বুঝাইতে পারি না।

* * *

চক্ষু দুইটি যে কিরূপ, তাহা আমি এ পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারিলাম না। তাহা দুইবার এক রকম দেখিলাম না; আমার বোধ হয়, যেন এ পৃথিবীর সে চোক নয়; এ পৃথিবীর সামগ্রী যেন ভাল করিয়া দেখে না; অন্তরীক্ষে যেন কি দেখিয়া তাহাতে নিযুক্ত আছে। কুন্দ যে নির্দ্দোষ সুন্দরী, তাহা নহে। অনেকের সঙ্গে তুলনায় তাহার মুখাবয়ব অপেক্ষাকৃত অপ্রশংসনীয় বোধ হয়; অথচ আমার বোধ হয়, এমন সুন্দরী কখনও দেখি নাই। বোধ হয় যেন কুন্দনন্দিনীতে পৃথিবী ছাড়া কিছু আছে, রক্তমাংসের যেন গঠন নয়; যেন চন্দ্রকর কি পুষ্পসৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে। তাহার সঙ্গে তুলনা করিবার সামগ্রী হঠাৎ মনে হয় না। অতুলা পদার্থটি, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন শান্তভাবব্যক্তি—যদি, শরচ্চন্দ্রের কিরণসম্পাতে যে স্বচ্ছ সরোবরের ভাবব্যক্তি, তাহা বিশেষ করিয়া দেখ, তবে ইহার সাদৃশ্য কতক অনুভব করিতে পারিবে। তুলনায় অন্য সামগ্রী পাইলাম না।"

নগেন্দ্রের এ ভাষা তাঁহার কুন্দানুরাগ-রঞ্জিত নহে, তিনি কুন্দেতে যে অপার্থিব ভাব অবলোকন করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার বন্ধুবরকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য কুন্দের এই অপার্থিব-প্রকৃতি-মূলক সৌন্দর্য্যই নগেন্দ্রের হৃদয়ে তৎপ্রতি তাঁহার ভবিষ্যৎ প্রেমানুরাগের মূল নিহিত করিয়াছিল, যদিও তখনও তাহা কোনরূপ আকার ধারণ করে নাই। কুন্দ প্রকৃতই

এ পৃথিবী ছাড়া কিছুতে গঠিত ছিল—কেবল তাহার দৃষ্টি ও দেহলাবণ্যে নহে, তাহার প্রকৃতিতেও তাহা লক্ষিত হইত।

কুন্দের সরলতা প্রকৃতই চমৎকার, এবং সর্ব্বত্র তাহা লক্ষিত হইত। ত্রয়োদশ-বর্ষীয়া বালিকা, পিতৃশব-সংকার জন্য গৃহ হইতে অপসারিত হইল তবে পিতার মৃত্যু-সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইল। অবশ্য, পিতার অভাবে নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভাবিয়া কুন্দ তাঁহার মৃত্যুর কথা মনে আনিতে পারিতেছিল না। তথাপি ইহা কুন্দের সরলতার অপরিচায়ক নহে। মাতার স্বর্গলোক হইতে অবতরণের স্বপ্ন দর্শন করিয়া তৎপ্রতি কুন্দ এতদূর আস্থাবতী হইয়াছিল যে, পিতৃবিয়োগবিহ্বলা সরলা বালিকা প্রত্যাশাপন্নবৎ ক্ষণে ক্ষণে আকাশ-পানে তাকাইতেছিল,—যদি মাতা পুনরায় আকাশ হইতে নামিয়া আসেন তবে সে তৎসঙ্গে নক্ষত্রলোকে গমন করে। সে মনোমুগ্ধকর স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া প্রতিবেশীকন্যা, কুন্দের সমবয়স্কা এবং সঙ্গিনী চাঁপা, যদিও বিস্মিত হইয়াছিল, তথাপি বলিয়াছিল, "হাঁ! মরা মানুষ না কি আবার আসিয়া থাকে?"—তাহার পর, কলিকাতায় কমলের বাড়ীতে কুন্দের সেই সরলতার ছবি; যাহা দেখিয়া নগেন্দ্রনাথ মোহিত হইয়াছিলেন, যাহা নগেন্দ্র-নাথ স্বহস্তে আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সূর্য্যমুখীর কাতরাহ্বানে কমলমণি গোবিন্দ-পুরে আসিলেন। কুন্দের সহিত দেখা হইলে আলাপ হইল—"ও লো কুঁদী—কুঁদী মুদী মুদী—ভাল আছিস ত কুঁদী?"

কুন্দ অবাক হইয়া রহিল। কিছু কাল ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "আছি।"

"আছি দিদি—আমায় দিদি বলিবি—না বলিস্ ত ঘুমিয়া থাকিবি আর তোর চুলে আগুন ধরিয়ে দিব। আর নহিলে গায়ে আরসুলো ছাড়িয়া দিব।"

কুন্দ 'দিদি' বলিতে আরম্ভ করিল। অবলা, সরলা, বাক্যহীনা, বাক্‌চাতুরির অপ্রতিরুদ্ধ বাক্যস্রোতে নীরব হইয়া রহিল, যেন মন্ত্রাভিভূতবৎ, কমল যাহা বলাইতে চাহিল তাহাই বলিতে লাগিল। দত্তবাড়ী ত হরিদাসী বৈষ্ণবীর গান একটি সাধারণ ব্যাপার নহে। দেবেন্দ্র দত্তের চরিত্রাংশ চিত্রণ জন্য কেবল এ দৃশ্যের অবতারণ হয় নাই, ইহা সূর্য্যমুখী, কমলমণি, কুন্দনন্দিনী, সকল চিত্রেই এক এক রেখাপাত করিয়াছে! হীরার চরিত্র-বিকাশেরও ইহা উপায়স্বরূপ হইয়াছে।

হরিদাসী বৈষ্ণবীর গানে বিরক্ত হইয়া সকলে উঠিয়া গেলেন, কুন্দনন্দিনী হাবা মেয়ে, সে বৈষ্ণবীর নিকট বসিয়া রহিল, তাহার সহিত বাক্যালাপে কোন দোষ হইতে পারে, ইহা তাহার বুদ্ধিতে আসিল না। সংসার-জ্ঞান থাকিলে কোনরূপ দোষের কারণ পরিহার জন্যও কুন্দনন্দিনী স্থান ত্যাগে তৎপর হইত। অবশ্য কুন্দের নগেন্দ্রচিন্তাজনিত অন্যমনস্কতাও তাহার এ অসাবধানতার কারণ স্বরূপ হইয়াছিল। কুন্দনন্দিনী সরলা অবলা বলিয়াই স্বপ্নে মাতৃনির্দ্দেশের বিরুদ্ধে, তাহার প্রাণ-ঘাতিনী হীরা তাহার বিশ্বাসভাগিনী হইয়াছিল। কেবল বিশ্বাসভাগিনী নহে, কমলাপেক্ষাও হীরা তাহার প্রতি অধিকতর স্নেহশালিনী বলিয়া তাহার ধারণা জন্মিয়াছিল। এ সকলই কুন্দের সরল প্রকৃতির কথা। কিন্তু, সূর্য্যমুখ

এবং তৎপরে নগেন্দ্র কর্তৃক পরিত্যক্ত গোবিন্দপুরের বাড়ীতে, কুন্দ যখন গৃহিণী, কুন্দ যখন কর্ত্রী, তখন, গৃহিণী ভাবিয়া কেহ তাহাকে কোন কথা কহিলে, যখন তিনি ভাবিতেন তাহাকে তামাসা করিতেছে, দেওয়ানজী কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে, যখন তাঁহার বুক দুড় দুড় করিত, নগেন্দ্রনাথ তাঁহাকে পত্র লিখিতেন না, দেওয়ানজীর নিকট হইতে নগেন্দ্রনাথের পত্রগুলি চাহিয়া আনিয়া পড়িতেন এবং নিজের নিকট রাখিতেন, সেই পত্রগুলি দেওয়ানজী ফিরাইয়া চাহিবেন মনে করিয়া যখন তাহার মুখ শুকাইত, তখন তাহাকে বুঝিতে হইলে, তাহার সরলতার অর্থ সম্প্রসারণ করিতে হয়। তখন আমরা বুঝিতে পারি তাঁহার সরলতার অর্থ কেবল সংসারজ্ঞানের অভাব নহে, তাহা তাহার আত্মাস্তিত্বজ্ঞানবিহীনতাও বটে। ভীরুস্বভাবসম্পন্না, আত্মসংকোচপরায়ণা, কুন্দনন্দিনী আপনাকে অতি ক্ষুদ্র বলিয়া ভাবিতেন, এ সংসারে তিনি যে কেহ, তাঁহার যে কোন অধিকার আছে, ইহা তিনি কখনও মনে করিতেন না। কপালকুণ্ডলা, বিজন বনে বাস করিয়া, মনুষ্যসমাজের বাহিরে থাকিয়া, সেই এক স্বাধীনতার ভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, সমাজ-নিয়মের ধার ধারিতেন না—অথচ প্রকৃতির গঠনে, পবিত্র হৃদয়া নারীর প্রতিমা মহত্বের আধার বলিয়া মানুষে তাহাকে জানিয়াছিল। কুন্দনন্দিনী, মনুষ্য মধ্যে বাস করিয়াও, ইহ সংসারের লোক হইয়াও, যেন সংসারের সঙ্গে মিশিতেন না, যেন নির্লিপ্ত ভাবে, অন্যমনে, জীবনাতিপাত করিতেন। এ প্রকৃতির পোষকতার জন্য কবি ও আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন; বনবেষ্টিত, মনুষ্যসমাগমবিরহিত, ভগ্নগৃহে, একাকী পিতৃসেবায় নিরত থাকিয়া, সংসারসংস্রববিহীন ভাবে, কুন্দনন্দিনী আপনার ভিন্নলৌকিক প্রকৃতির ইন্ধন সংগ্রহ করিতেছিলেন। এ সংসারের কোন ভাবই কুন্দপ্রকৃতিতে বীজ নিহিত করে নাই, যতদিন এ সংসারে তিনি জীবন বহন করিয়াছিলেন, পার্থিব কোন কিছুরই অঙ্কুরোদ্গম তাঁহাতে লক্ষিত হয় নাই। প্রেম স্বর্গীয় জিনিস, এ স্বর্গের জীবের হৃদয়ে তাহা প্রকৃতিনিহিত হইয়াছিল, তাহাই তাঁহার এ জীবনে কলেবর ধারণ করিয়াছে, কেবল তাহাতেই তাঁহার অস্তিত্ব তাঁহার নিজের এবং অন্য জনের অনুভূতিগত হইয়াছে। বালো, পিতৃগৃহে, দেবোপম কান্তি দেখিয়া মহাপুরুষের মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া নগেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার যে প্রেমানুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল, যৌবনে, সে প্রেমপাত্রের নিরবচ্ছিন্ন সান্নিধ্যে, যে পর্য্যন্ত সে অনুরাগ নবজীবন প্রাপ্ত না হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত আমরা কুন্দের স্বাধীন অস্তিত্ব দেখিতে পাই না, সে পর্য্যন্ত কুন্দ কেবল মৃৎপুত্তলীর ন্যায় অন্যচালিত হইয়া আসিয়াছে। তারাচরণের সহিত তাহার পরিণয়ের কিছুই সে বুঝে নাই, তারাচরণের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ তাহা সে জানিত না, কেবল তারাচরণ যখন জোর করিয়া তাহাকে দেবেন্দ্র দত্ত প্রভৃতির সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিত, তখন ভাবিত, "এ কোথা হইতে আসিল, এ আমাকে এরূপে জ্বালাতন করে কেন?"

[illegible] পরতন্ত্রতা এবং পরোপ

কার-প্রবৃত্তি প্রবল করিয়া, কবি কপাল-কুণ্ডলা-চরিত্র মহত্বে উন্নীত করিয়াছেন; সে বৃত্তি হৃদয়ে থাকিয়া, কপালকুণ্ডলাকে কার্য্যশীলা করিয়াছিল। কুন্দনন্দিনীকে তিনি মনুষ্যসংসারে সংস্থাপিত করিয়াও, সে যেন এ সংসারের নহে, এ সংসার যেন তাহার জন্য নহে, এরূপ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; স্বদেশভ্রষ্ট হইয়া বিদেশে, এ হীনতর লোকে, এ দুঃখের সংসারে, যেন সে পর্য্যটকরূপে আসিয়াছিল। তাই কুন্দনন্দিনী সংসারজ্ঞানবিহীনা সরলা অবলা, তাই সে ভীরুস্বভাবসম্পন্না, এ সংসারে আত্ম-বিলোপোন্মুখী। কার্য্যনির্ব্বাহোৎপাদনক্ষম বৃত্তি, এরূপ অবস্থায় কুন্দনন্দিনীতে ন্যস্ত হইত না, তাই কবি কুন্দ-হৃদয়ে পবিত্র প্রেম নিহিত করিয়া কুন্দচরিত্রের সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

পাঠক এ সৌন্দর্য্যের সহিত সে চরিত্রের অন্যান্য সৌন্দর্য্য সংযোগ করিয়া দেখুন, কপালকুণ্ডলার ন্যায় বিস্ময়োৎপাদনে অক্ষম হইলেও, কুন্দনন্দিনীও মহত্ত্ববিহীনা নহে। কমল বলিল "কুন্দ আমার সঙ্গে চল।"

কুন্দের চক্ষে আবার জল পড়িতে লাগিল। কমল বলিল, "নহিলে নয়। সোণার সংসার ছারখার গেল।"

কুন্দ কাঁদিতে লাগিল। কমল বলিলেন, "যাবি? মনে করিয়া দেখ?—"

কুন্দ অনেকক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল "যাব।"

অনেকক্ষণ পরে কেন? তাহা কমল বুঝিল। বুঝিল যে, কুন্দনন্দিনী পরের মঙ্গল-মন্দিরে আপনার প্রাণের প্রাণ বলি দিল। নগেন্দ্রের মঙ্গলার্থ, সূর্য্যমুখীর মঙ্গলার্থ, নগেন্দ্রকে ভুলিতে স্বীকৃত হইল। সেই জন্য অনেকক্ষণ লাগিল। আপনার মঙ্গল? কমল বুঝিয়াছিলেন যে, কুন্দনন্দিনী আপনার মঙ্গল বুঝিতে পারে না।—নগেন্দ্রনাথ যে কুন্দের জন্য উন্মত্ত, কুন্দ তাহা বুঝিত না; ইহা কুন্দের সরলতা। প্রদোষান্ধকারে,-অন্তঃপুরোদ্যানে, সরোবরসোপানস্তরে, নগেন্দ্র-নাথ নিমজ্জনে-মরণ-সঙ্কল্প-চালিতা কুন্দনন্দিনীর পার্শ্বে উপনীত হইয়া, কুন্দনন্দিনীর সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন, তৎপ্রতি তাঁহার অপরিসীম ভালবাসা জানাইয়া, তাঁহাকে গৃহিণী করিতে চাহিলেন, কুন্দনন্দিনী বাক্যহীনার "না" দ্বারা সকল কথার উত্তর করিলেন। ইহা কুন্দনন্দিনীর হৃদয়মহত্ব। এ "না" অর্থব্যঞ্জক, ইহার অর্থ এই—"আমি তোমাকে দেখিয়াই সুখী, তোমাকে ভাল-বাসিয়াই আমার সুখ। তোমার ভালবাসা পাইবার আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়ে অপরি-মিত হইলেও, আমি তাহা পাইবার আশা করি নাই, আপনাকে পাইবার যোগ্যতাও মনে করি নাই। তথাপি তুমি যে আমাকে ভালবাস, ইহা জানিয়া আমি নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম, কিন্তু আমি নিজের সুখের জন্য তোমার এবং সূর্য্যমুখীর মঙ্গলের প্রতিগমন করিতে ইচ্ছা করি না।" কুন্দনন্দিনীর কথা ও কার্য্যে তাঁহার এইরূপ হৃদয়ভাবই প্রকাশিত হইতেছে, তাঁহার কথা ও কার্য্যে তাঁহার এই রূপ হৃদয়মহত্বই প্রমাণিত করিয়াছে। কবি তাঁহাকে মানবী করিয়া সৃজন করিয়াছেন, সেই মানবীচরিত্রের বশে কুন্দ তাঁহার নগেন্দ্রানু-

রাগের প্রতিদান আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, মনে করিয়াছেন নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর স্বামী না হইয়া তাঁহার স্বামী হইলে কত সুখী হইতেন। তথাপি, যদিও সরলতাবশতঃ তিনি সূর্য্যমুখীর উদ্যোগে নগেন্দ্রের সহিত তাঁহার পরিণয়ে আপত্তির কারণ বুঝিতে পারেন নাই, সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া গেলেই সে জ্ঞান তাঁহার জন্মিয়াছে, এবং তখন তিনি "কি করিলে আবার যেমন ছিল তেমনি হয়," তাহার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। কেবল ব্যগ্র হইয়াছেন তাহা নহে, পরিশেষে আত্মোন্মূলনপূর্ব্বক সূর্য্যমুখীর সুখকণ্টক নিবারিত করিয়াছেন। কবি, কুন্দনন্দিনীর বিষপানে প্রাণত্যাগ অধিকতর স্বভাবসম্ভাবিত করিবার জন্য, কুন্দের সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার পথ সহজ করিয়া দিবার জন্য, নগেন্দ্রনাথের তাঁহার প্রতি তাচ্ছিল্য ও নির্দ্দয়তায় সে ঘটনার অব্যবহিত কারণ সংযোজন করিয়াছেন। কিন্তু কুন্দনন্দিনীর প্রাণত্যাগের ইচ্ছা ঐ তাচ্ছিল্যজনিত অভিমান হইতে সমুদ্ভূত নহে, তাহা তাঁহার চরিত্রমাহাত্ম্য, সূর্য্যমুখীর সুখান্তরায়ের দূরীকরণ-মানস হইতে প্রসূত। ইহা তিনি মরণ সময়ে নিজমুখে নগেন্দ্রনাথকে বলিয়া গিয়াছেন। কবি কুন্দকে দেবলোক হইতে অবতীর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে নিস্পৃহা আকাঙ্ক্ষাহীনা, অতিমাত্রায় অধিক করিয়া গড়িলে কুন্দ দেবীই থাকিয়া যাইতেন। কিন্তু তাহাতে মানুষের কি লাভ হইত বলিতে পারি না। দেবতা মানুষাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাতে মানুষের কি? মানুষ, মানুষ হইয়া, মানুষের দুর্ব্বলতার-কারণ স্বার্থপরতার কারণ নীচতার কারণ আকাঙ্ক্ষাদি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া, যদি অন্যের মঙ্গলের জন্য, সংসারের মঙ্গলের জন্য, ত্যাগ স্বীকারে সমর্থ হয়, যদি মানুষ থাকিয়াই দেবত্বে উঠিতে পারে, তবেই তাহার গৌরব, এবং এরূপ চরিত্রই মানবশিক্ষার অধিকতর উপযোগী। তাহার পর, কুন্দকে মানবী-চরিত্র প্রদান না করিলে, কবি যেরূপে তাঁহার আখ্যায়িকার সমাধান করিয়াছেন তাহা সম্ভাবিত হইত না. তাহার সূর্য্যমুখী এবং নগেন্দ্র-চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ দুঃসাধ্য হইত, কেবল এক কুন্দকে নিষ্প্রয়োজনে দেবতা গড়িবার জন্য তিনি তাঁহার কাব্যের কত সৌন্দর্য্য অসৃষ্ট রাখিতে বাধ্য হইতেন। অতএব দেখা যাইতেছে, অনেক চিন্তা করিয়াই তাঁহাকে কুন্দনন্দিনীতে একটুকু মানবীত্বের সমাবেশ করিতে হইয়াছে। ইহা দ্বারা তিনি বহু প্রয়োজন সম্পন্ন করিয়াছেন, অথচ ইহাতে কুন্দচরিত্রেরও গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। সেইরূপ সূর্য্যমুখীর নিরবচ্ছিন্ন গাম্ভীর্য্যের মধ্যে ক্ষণিক ধৈর্য্যচ্যুতি দ্বারা তিনি তাঁহার প্রয়োজনবিশেষ-সাধনে তৎপরতা দেখাইয়াছেন। কুন্দনন্দিনীকে গৃহ-বহিষ্কৃতা করিয়া, সূর্য্যমুখী স্বামীর নিকট আপনাকে অপরাধিনী মনে করিতেছিলেন; তাই তাহার প্রতিপূরণস্বরূপ কুন্দনন্দিনীকে স্বামী দান করিয়া, তাঁহার গৃহত্যাগে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। অন্যথা, স্বামীসর্ব্বস্বার, পতিগত-প্রাণার এ সংকল্প সম্ভাবিত হইত না। আবার নিত্যপ্রসন্নতাময়ী, চিরপ্রেমময়ী, কমলকেও কবি একস্থলে তাঁহার প্রকৃতি লঙ্ঘন করাইয়াছেন। যে কমল, কুন্দের প্রণয়-নৈরাশ্যে, তাহার দুঃখে দুঃখী হইয়া, তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া, তাহার চোখের জল

মুছাইয়া দিয়াছিলেন, এবং আপনার চক্ষের জলে তাহার কেশদাম সিঞ্চিরসিক্ত করিয়াছিলেন, সেই কমল, নগেন্দ্রের রূঢ় বাক্যে ব্যথিত হৃদয়, সান্ত্বনা পাইবার আশায়, তৎসমীপে উপনীতা কুন্দকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। উভয় চিত্রই স্বাভাবিক। কুন্দের নিরাশ প্রণয়ের মর্ম্মবেদনা যখন কুন্দেতে আবদ্ধ ছিল, অন্য কাহারও অনিষ্টোৎপাদন করে নাই, কুন্দ তখন সহজেই কোমলহৃদয়া কমলের সমবেদনার পাত্রী হইয়াছিল; কুন্দের প্রণয়ানুরাগের সামরিক সাফল্যে যখন কমলের বড় ভালবাসার সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগিনী হইলেন, তখন কুন্দের প্রতি কমলের অপ্রসন্নতার কারণ উপস্থিত হইল। অথচ কমলের এই সাময়িক অপ্রসন্নতা, কেবল কুন্দনন্দিনীকে নহে, জগৎ-সংসারকেই শিক্ষা দিতেছে যে, "সকল সুখেরই সীমা আছে" জগৎ-সংসারকে বিষ-বৃক্ষের ফলের বিরুদ্ধে সতর্ক করিতেছে। পাঠক দেখিবেন বিষবৃক্ষে অনাবশ্যক কিছুই নাই, অতি সামান্য ঘটনাও কবির চিন্তা-প্রসূত এবং কৌশলরূপে ব্যবহৃত। তাই ভাবি, এত চিন্তা করিয়া বই লেখে কয়জন লোকে? অথবা, আমরা যাহা বিশেষ চিন্তার ফল বলিয়া মনে করিতেছি, অসাধারণ প্রতিভার নিকট তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইয়াছিল। সর্ব্বথা বিষবৃক্ষ একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ, জগতের সাহিত্যভাণ্ডারে এরূপ অমূল্য রত্নের সংখ্যা বড় অধিক নহে।—সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, নগেন্দ্রনাথ তাঁহার অনুসন্ধানে দেশত্যাগী হইয়াছেন। কুন্দনন্দিনী ভাবিতেছেন "সূর্য্যমুখীর এই দশা আমা হইতে হইল। সূর্য্যমুখী আমাকে রক্ষা করিয়াছিল—আমাকে ভগিনীর ন্যায় ভালবাসিত—তাহাকে পথের কাঙ্গালী করিলাম; আমার মত অভাগিনী কি আর আছে? আমি মরিলাম না কেন? এখন মরি না কেন? * * * যদি সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসে, তবে মরিব। আর তার সুখের পথে কাঁটা হব না।" সূর্য্যমুখী মৃতা এই বিশ্বাসে, নগেন্দ্রের বিষয়ের দানপত্রাদি লিখিত হইল, নগেন্দ্রনাথ তাহা রেজেষ্টারী করিবার জন্য গোবিন্দপুরে আসিলেন, শ্রীশ কমলও আসিলেন। কুন্দনন্দিনী কমলের নিকট সূর্য্যমুখীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিলেন কেন? তাঁহার ত সুখী হইবারই কথা। কেননা, সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগে নগেন্দ্রের হৃদয়ে যে ঝটিকা উপস্থিত হইয়াছিল, সূর্য্যমুখীর মৃত্যুর সঙ্গে সে ঝটিকা প্রশমিত হইয়া শান্তি আসিলে, কুন্দকে লইয়াই নগেন্দ্রের সংসার করিবার সম্ভাবনা। এ সম্ভাবনায় কুন্দের ত উৎফুল্ল হওয়াই স্বাভাবিক। তাহা না হইয়া, কুন্দ সূর্য্যমুখীর শোকে কাঁদিতে লাগিলেন। এ কি পার্থিব প্রকৃতি? না, কুন্দনন্দিনী ইহা স্বর্গলোক হইতে সঙ্গে আনিয়াছিলেন? পাঠক যদি কুন্দনন্দিনীর হৃদয়মহত্ত্ব সম্বন্ধে এখনও স্থির-বিশ্বাস না হইয়া থাকেন, তবে সে চরিত্রের সৌন্দর্য্যানুসন্ধানের পথে অগ্রসর হউন।—বিপরীতপ্রকৃতিক চিত্রের সমাবেশে চরিত্র-স্ফুরণক্ষমতা আমাদের কবির অতি অসাধারণ। বিষবৃক্ষে, কুন্দ-হীরা-চিত্রে, সূর্য্যমুখী-কমলমণির পার্শ্বে হৈমবতী চিত্রে,

নগেন্দ্রের সান্নিধ্যে দেবেন্দ্র-চিত্র-সংস্থাপনে, সে ক্ষমতা চরম স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। হীরা ও কুন্দ উভয়েই নিরাশ প্রণয়ের চিত্র। কিন্তু পাঠক দেখিবেন, এই নিরাশার প্রভাব চরিত্রদ্বয়ে কিরূপ ভিন্ন ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। হীরার অভিলাষ দেবেন্দ্রাভিমুখী, দেবেন্দ্রের অভিলাষ কুন্দাভিমুখী। কুন্দ হীরার ঈপ্সিত লাভের অন্তরায় বটে, কিন্তু কুন্দের তাহাতে কিছু দোষ নাই। তথাপি ঈর্ষানলদগ্ধা হীরা কুন্দের প্রাণনাশে কৃতসংকল্পা। এবং কুন্দ তাহার হৃদয়মধ্যে নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া থাকিলেও, হীরা বিষদানে তাহার সহায়তা করিয়া সে ঈর্ষাকলুষিত প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করিয়াছে। আর কুন্দ কি কাহারও প্রতি কখনও ঈর্ষা বা অনুরূপ প্রতিকূল ভাবে প্রণোদিত হইয়াছে? সূর্য্যমুখী কুন্দকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া, তাহার জীবনের একমাত্র সুখ নগেন্দ্রদর্শন, তাহা হইতেও তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। কুন্দ কি একটী কথাও সূর্য্যমুখীর বিরুদ্ধে কখনও ভাবিয়াছে বা বলিয়াছে? কেহ কি এমন ছিল, যাহার সম্বন্ধে নিজের প্রণয়নৈরাশ্য বা মনোদুঃখের জন্য, কুন্দ কোনরূপ বিরুদ্ধ ভাব হৃদয়ে পোষিত করিয়াছে, বা কোনরূপ মন্দ কথা তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়াছে? এও কি স্বর্গের প্রকৃতি নহে? আবার যদি স্বর্গের ছবির সহিত নরকের চিত্রের তুলনায় দোষের কথা না হয়, তবে, পাঠক, কবির ভিন্ন কাব্যের রোহিণীকে আনিয়া কুন্দের পার্শ্বে স্থাপিত করিয়া, একবার উভয় চিত্রের ফলাফল পরিদর্শন করুন। কুন্দ স্বর্গের জীব, এ পৃথিবীতে স্বর্গের দৃশ্য নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর প্রণয়ের সংস্রবে আসিয়া, সে স্বর্গসুখের ক্ষণিক ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকিলেও, তাহা দ্বিগুণিত করিয়া রাখিয়া গেল; আর রোহিণী নরকের জীব, সে যে পবিত্র-প্রণয়-মিলনের সংঘর্ষে আসিয়াছিল তাহার ধ্বংস সাধন করিয়া, ভ্রমরকে চিরদুঃখিনী করিয়া, গোবিন্দলালকে পতিত করিয়া, আপনার কর্ম্ম-ফলস্বরূপ, অপমৃত্যুর দ্বার দিয়া, নরকের অসহ্য যন্ত্রণা মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। কি আশ্চর্য্য প্রভেদ! কি অপরূপ বৈষম্য! বৈপরীত্যে চরিত্রস্ফূর্ত্তির কি অতুল্য দৃষ্টান্ত! কুন্দ প্রকৃতই কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি।*

শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিস্মৃত অতীতের ছায়া

সে কত কালের কথা তা' বলা যায় না। ইতিহাসের তখন সৃষ্টি হয় নাই। মানুষ তখন সমাজ নামক একটা পেষণ-যন্ত্রকে নিজের চারিদিকে নির্ম্মমভাবে গড়িয়া তোলে নাই। তখন মানুষ মানুষকে সহজ স্বাভাবিক প্রীতি দ্বারা নির্ম্মল ও সতেজ রাখিত। বড় ছোটর ভেদ তখন রাক্ষসী মূর্ত্তি ধারণ করে নাই।

* এ যেন কুন্দনন্দিনী কি রোহিণীর সহিত সমশ্রেণীক? সঙ্গীত-ও-রহস্য-রস-পণ্ডিত, স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়কে, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তাঁহার "মোহিনী" নামক ক্ষুদ্র গল্পে কুন্দকে কোনরূপে টানিয়া আনিয়া রোহিণীর সহিত এক শ্রেণীভুক্ত করিতে দেখিয়া উপরিউক্ত প্রবন্ধলেখক বিস্মিত হইয়াছিলেন। প্র: সে:

ধনীর অর্থ তখন বিলাস-বিভ্রমের পঙ্কিল আবর্ত্তে ঘনীভূত হইত না। যাহার আছে এবং যাহার নাই, পাশাপাশি বসিয়া তাহারা সহাস্যমুখে প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য-সূর্য্যের রশ্মি চন্দ্রের কিরণের মত সমান উপভোগ করিত। একের দুঃখে অন্যে দুঃখ প্রকাশ করিতে না পারিলেও, দুঃখ বোধ করিত। ভাষা শিশুর অর্দ্ধস্ফুট কথার মত মধুর ও যথার্থবোধক ছিল। মানুষ তখনও কুটিলতা শিখে নাই, অলঙ্কৃত মিথ্যা-দ্বারা সত্যকে বিধ্বস্ত ও মলিন করিয়া তুলে নাই। হিংসা, দ্বেষ, পীড়ন ছিল না তা' নয়; কিন্তু তাহারা কৌশল ও কপটতা মণ্ডিত হইয়া বিগুণ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে নাই। শিশুর হাসি কান্নার মত মানুষের প্রতি মানুষের প্রীতি বা বিদ্বেষ সহজে ও অনায়াসে ফুটিয়া উঠিত। মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলা তখন কাঁটা গাছের ঝোপের মত এমন ভাবে পরস্পরকে জড়াইয়া ধরে নাই যে দয়া কি রোষ, ভালবাসা কি হিংসা, বদান্যতা কি অহঙ্কার, পরোপকার কি উচ্চাভিলাষ, শিষ্টাচার কি চাতুরী, বুঝা কঠিন। অনেকে হয় ত বলিবেন তখনও মানুষের সম্যক পরিণতি হয় নাই; মানুষ তখন কেবলমাত্র পশুত্বের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। হইতে পারে। কিন্তু সেই সরল, সুন্দর, অকপট হৃদয় মানুষ কি আর কখনও ফিরিয়া পাইবে?

সেখানে অনন্ত জলধি নীল জলরাশি বিস্তীর্ণ করিয়া প্রকৃতি অনূঢ়া কন্যার ন্যায় স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান। কোন সীমা-শূন্য অনির্দ্দেশ্য বস্তু যেন তাহার আকর্ষণ। তাই উত্তাল তরঙ্গরাশি সিন্ধুর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া মধ্যে মধ্যে যেন তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাসের মত তাহার হৃদয় মথিত করিয়া অনন্তের অভিমুখে ছুটিতেছে, কখন বা 'উন্মাদের ন্যায় ফিরিয়া আসিয়া বেলাভূমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে। অদূরে কল্পিত শ্যামল ভূমিখণ্ড যেন স্পর্শালসে সিন্ধুবালার গায় ঢলিয়া পড়িয়াছে। সূর্য্যের রশ্মি নীলজলে ডুবিয়া গেলে নক্ষত্ররাজি যখন তিমিরাবরণের অন্তরাল হইতে মৃদু হাসিয়া উঁকি মারিতে থাকে, তখন চন্দ্রদেব নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া দীপ্ত আলোকে সমুদ্রকে আহ্বান করে। সমুদ্র সেই আহ্বানে তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করে, চাঁদও তালে তালে নাচিয়া, খেলিয়া, হাসিয়া কোন্ সময় ঘুমাইয়া পড়ে। এইরূপে কতদিন প্রকৃতির নগ্ন ক্ষেত্রে লীলাড়ম্বর চলিয়াছে কে বলিতে পারে?

পৃথিবী তখন জনবহুল ছিল না। সমুদ্রতরঙ্গচুম্বিত এই শ্যামল ভূমিখণ্ডের মধ্যভাগে অতি অল্প সংখ্যক নরনারী বাস করিত। বর্ত্তমান যুগের সভ্যতার কোন লক্ষণ সেই নিভৃত লোকালয়ে বিদ্যমান ছিল না। তাহারা বৃক্ষতলে অথবা পর্ণ-কুটীরে বাস করিত। গাছের পাতা কিম্বা বল্কল দ্বারা লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করিত। বনের ফল ও মৃগয়ালব্ধ মাংসের দ্বারা জীবন রক্ষা করিত। ঝরণার জল তাহাদের পিপাসা ও বৃক্ষের ছায়া তাহাদের শ্রান্তি দূর করিত। তাহারা এই বনরাজি পূর্ণ, সমুদ্রমেখলা ভূমিখণ্ডে ব্যাঘ্রশাবকের সঙ্গে খেলা করিত, পাখীর সঙ্গে গান

করিত, মৃগশিশুর সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করিত। কেহ তাহাদের হিংসা করিত না, রোষ করিত না, স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা করিত না। তাহারা স্বভাবজাত নির্ম্মল কুসুমের মত এই সমুদ্রতীরে জন্মিত, হাসিত, খেলিত, মরিত। সুখদুঃখের ছায়া তখনও ঘন হইয়া তাহাদের সমস্ত কর্ম্ম ও চেষ্টাকে কঠিন করিয়া তোলে নাই। জন্ম ও মৃত্যুর সঙ্গে আশা ও অবসাদকে জড়াইয়া দেয় নাই। জীবন মরণকে তাহারা সমান স্বীকার করিত। পুত্রের জন্মে উল্লাস কিম্বা মৃত্যুতে শোকে বিহ্বল হইত না। তাহারা প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম অতিক্রম করিবার দুরভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করিত না। তাহারা জানিত সূর্য্য যেমন প্রভাতে উদিত হয় ও সন্ধ্যার সময় অস্তগমন করে, তেমনি শিশু জন্মে ও বৃদ্ধ মরে। ইহা সমান, সহজ ও স্বাভাবিক। ইহাতে হর্ষ নাই, শোক নাই। দীর্ঘায়ত উন্নতবক্ষ সুদৃঢ় এই নরনারীকুল রৌদ্রের উত্তাপ, বৃষ্টি জল কিম্বা হিমকে শত্রু ভাবিয়া নানা কৌশলে আপনাদিগকে শৃঙ্খলিত ও জীর্ণ করে নাই। তাপ, হিম ও বায়ুর অবাধ স্পর্শে তাহাদের দেহ দৃঢ় ও সবল হইয়া উঠিত। রোগ তাহাদিগকে জীর্ণ ও ক্ষয় করিত না। বৃন্তচ্যুত পক্ক পল্লবের ন্যায় স্বাভাবিক নিয়মে কালপ্রাপ্ত হইলে তাহারা মৃত্যু দ্বারা কবলিত হইয়া পঞ্চভূতে মিশাইয়া যাইত।

তাহাদের বিধিবদ্ধ সমাজ ছিল না। আইন আদালত ছিল না; দণ্ড পুরস্কার ছিল না। এক আকাশ তল, একই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও সম্পদে পরিপুষ্ট হইয়া, তাহারা পরস্পরকে জড়াইয়া বাস করিত—কেহ কাহাকেও দলিত পীড়িত করিত না। পত্র, পুষ্প, ফল যেমন একই বৃক্ষের রসাকর্ষণ করিয়া পরিণতি ও সার্থকতা লাভ করে, তেমনি ইহারা প্রকৃতির বরে সম্মিলিত হইয়া থাকিত—দ্বেষ নাই, হিংসা নাই, বিরোধ নাই। প্রকৃতির এই তরুণ সন্তানগণ ঔদার্য্যে আকাশের মত, সরলতায় শিশুর মত, কোমলতায় পুষ্পের মত, সাহসে সিংহের মত, সহিষ্ণুতায় পৃথিবীর মত ছিল! দেশ ও কালের বেড়া ইহাদিগকে মুক্ত ও পীড়িত করিত না। হাস্য-কৌতুক-সুন্দর শিশুর মাথার উপর দিয়া যথানিয়মে যৌবন ও জরা বহিয়া যাইত; শিশু সুকুমার কান্তি হারাইয়া অচঞ্চলমুখে মৃত্যু আলিঙ্গন করিত—ক্ষোভ করিত না, সন্দেহ করিত না। পৃথিবীর এই আদিম অধিবাসিগণ প্রকৃতিকে কখন অস্বীকার করিত না। বিশ্বরাজ্যে যাহা কিছু আছে, তাহার সমস্তই তাহারা অকৃত্রিম ভক্তিবিনম্র সৌম্যের সহিত স্বীকার করিত। বিরোধ ও ঔদ্ধত্য তাহাদের শান্ত সুন্দর প্রকৃতিকে চঞ্চল ও প্রগল্‌ভ করে নাই। পরিপূর্ণ বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের নিকট তাহারা প্রকৃতভাবে আত্ম-নিবেদন করিয়াছিল। তাই যখন নবারুণ-কিরণে রঞ্জিত হইয়া ঊষা জলে, স্থলে, পত্রে, পুষ্পে পুলক সঞ্চার করিত, তখন বিস্মৃত কালের এই নিষ্কলঙ্ক নরনারীকুল মুক্তাম্বরতলে নতজানু হইয়া বিশ্বদেবতার নিকট তাহাদের হৃদয়ের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রেরণ করিত। অনন্ত বিস্মৃত

নীল সমুদ্রের ভীম জলকল্লোল ও প্রশান্ত নীলাকাশের দীপ্তিমান অসংখ্য সুন্দর নক্ষত্ররাজির মধ্যে উন্নত জ্ঞানের অসহিষ্ণু ক্ষুণ্ণতা প্রেরণ করিয়া তাহারা স্বভাব-সুন্দর হৃদয়ের উৎসকে ব্যর্থ করে নাই। ফুলের সুবাস, পাখিয়ার গান, বনস্পতির শোভা, সমুদ্রের তরঙ্গ, পর্ব্বতের স্থৈর্য্য, চন্দ্রের হাসি, আকাশের বিস্তার, তাহাদিগকে বিস্ময় ও পুলকে পরিপূরিত করিয়া রাখিয়াছিল। ইহার মধ্যে তাহারা জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া মৌনী ও অচঞ্চল থাকিত।

এইরূপে কত যুগ অতীত হইয়াছে। তাহার পর এক দিন হঠাৎ এই নিভৃত তপোবনের শান্তি আলোড়িত করিয়া এক দল সশস্ত্র লোক এই আত্ম-প্রীত নরসংহতিকে আক্রমণ ও পরাজিত করিল। তাহাদের প্রমত্ত জয়ধ্বনিতে সমুদ্র, বন ও কান্তার কাঁপিয়া উঠিল। বন্যজন্তুগণ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া চারিদিকে ছুটিতে লাগিল, এবং পলাইবার পথ না পাইয়া সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণ হারাইল। পরাভূত অধিবাসিগণ নির্ভীক ও স্থির ভাবে অদৃষ্ট নিয়তির অপেক্ষা করিয়া রহিল। যখন আক্রমণকারিগণ দেখিল শত্রু সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে, পুনরুত্থানের চেষ্টামাত্র নাই, তখন রক্তলোলুপ তরবারি কোষ-নিবদ্ধ করিয়া অধিকৃত প্রদেশে বিজয়নিশান উড়াইল। বিজয়ীদলের নেতা অধিকৃত রাজ্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অমাত্যগণ শৌর্য্য, বীর্য্য, কৌশল ও শ্রেষ্ঠতা অনুসারে রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত হইলেন। বিধিনিয়মে আবদ্ধ এক সুকৌশল শাসনযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল। বিজিত অধিবাসিগণ স্বাধীনতা হারাইয়া কঠোর কল্পিত নিয়মের দাস হইয়া পড়িল। উঠিতে বসিতে নিয়ম। এখন রাজাজ্ঞা ব্যতীত আর কিছু হইবার উপায় নাই। যে প্রকৃতি এতকাল স্নেহময়ী জননীরূপে সকলকে ক্রোড়ে সমান স্থান দিয়াছেন ও পরিপুষ্ট করিয়াছেন, তাহা এখন জয়দৃপ্ত রাজার সম্পত্তিরূপে পরিগণিত। রাজা দয়া করিয়া যাহাকে যাহা দিবেন তাহাই তাহার প্রাপ্য, তাহা ছাড়া তৃণটী পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবার অধিকার কাহারও নাই। রাজপুরুষগণ নিপুণ-হস্তে ব্যক্তিগত অধিকারের সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছে ও নির্ম্মম কঠোরতার সহিত তাহার সংরক্ষণ করিতেছে। প্রত্যেকের প্রয়োজন বিচার করিয়া রাজা ভূমি বণ্টন করিয়া দিলেন; এবং ভূমি-কর্ষণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার আদেশ দিলেন। উৎপন্ন শস্যে উৎপাদনকারী প্রজার সম্পূর্ণ অধিকার রহিল না, তাহাতেও রাজার দাবী। ক্রমে রাজার ভাণ্ডার স্ফীত হইতে লাগিল। যেখানে কোকিল-কূজিত কুঞ্জবন ছিল, সেখানে রাজার প্রমোদ ভবন নির্ম্মিত হইল। শিল্প ও কলা প্রাকৃত সৌন্দর্য্যকে হেয় ও বিধ্বস্ত করিয়া তুলিল। তপোবন নগরে পরিণত হইল। চারিদিকে উন্নত সৌধরাজি অতীত গৌরবের সমাধি নির্ম্মাণ করিল। সমাজের উপর রাজার যে অধিকার, গৃহে পিতা পুত্রের উপর, স্বামী স্ত্রীর উপর সেই অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। রাজা প্রজার নিকট দেবতা, ঈশ্বর; পিতা পুত্রের নিকট, এবং স্বামী স্ত্রীর নিকট ঠিক

তাই। একের আজ্ঞা অন্যের নিকট অলঙ্ঘনীয়, অবশ্য প্রতিপাল্য। এমন কি প্রজা রাজার এবং পুত্র পিতার সম্পত্তিরূপে গণ্য। এইরূপ কঠিন শৃঙ্খলের ভিতর হইতে সভ্যতার উন্মেষ হইতে লাগিল। আদিম অধিবাসিগণের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সকলই বিকৃত ও পরিত্যক্ত হইতে লাগিল। তাহাদের লাঞ্ছনার সীমা নাই। সভ্য সমাজে তাহাদের প্রবেশ নিষেধ—তাহারা বন্য, ইতর, অসভ্য। তাহাদের নগ্নদেহ ও সরল, সত্য, অকপট বাক্য ও আচার উপহাসের বিষয় হইয়া উঠিল। সত্য অসত্য মিশ্রিত এই অভিনব সভ্য-জীবনের সহিত তাহাদের কোন ক্রমেই যোগ হইল না। তাহারা ক্রমে ঘৃণার পাত্র হইয়া লোকালয় ত্যাগ করিল। বিজয়ী সভ্যগণ উৎসাহিত হইয়া ক্রমে দেশের পর দেশ, জনপদের পর জনপদ আক্রমণ করিয়া ভূপৃষ্ঠ কম্পান্বিত ও নরশোণিতে রঞ্জিত করিয়া তুলিল।

বিংশ শতাব্দির প্রদীপ্ত সভ্যতার আলোকে লুপ্ত অতীতের এই অস্পষ্ট চিত্রের মাঝখানে দাঁড়াইলে আমাদের কি মনে হয়? তুমি কি মনে করিবে জানি না। কিন্তু আমার মনে হয়, মানুষ সভ্যতার বড়াই যতই করুক, সভ্যতা মানুষের সুখবিধান করিলেও, আনন্দ হরণ করিয়াছে। এখন মানুষ অশেষ সুখে বেষ্টিত হইয়াও ম্লান ও নিরানন্দ। ইহার একটা বড় কারণ—সভ্যতা মানুষকে স্বার্থপরায়ণ করিয়া তাহার সুখের আকাঙ্ক্ষা এত বাড়াইয়া দিয়াছে যে তাহার পূরণ কখন হইবার নয়। মানুষ সুখের জন্য উন্মত্ত। সভ্যজগৎ সুখকেই যেন একমাত্র দেবতা করিয়া খাড়া করিয়াছে; এবং উর্দ্ধশ্বাসে তাহার অজ্ঞাত মন্দিরের দিকে ছুটিয়াছে। যদি কখনও দেবতা প্রসন্ন হন, এবং মানুষ সুখের চরম সীমায় উপনীত হয়,—আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইয়া মানুষ বিমল স্থির আনন্দ ও শান্তি লাভ করে, তখন এই বিশ্বব্যাপী ঘোর উন্মাদনার শেষ হইবে। কিন্তু সে আশা কোথায়? যে চেষ্টা দুঃখকে অস্বীকার করিয়া সুখের প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, তাহা কোন মতেই সফল হইতে পারে না। দুঃখ ছাড়া সুখের অস্তিত্ব নাই। দুঃখকে মানিয়া লইলে তবে তাহাকে জয় করা সম্ভব। যে দুঃখকে অস্বীকার করিয়া সুখ চায়, সে মৃগতৃষ্ণিকায় অন্ধ হইয়া ছুটিয়া মরে। বর্ত্তমান সভ্যতা এ কথা স্বীকার করে না। জ্ঞানই তাহার একমাত্র সহায়। সে জ্ঞানের সাহায্যে দুর্জ্ঞেয় লুক্কায়িত সুখের সন্ধানে প্রবৃত্ত। তাই প্রত্যহ অসংখ্য কৌশল উদ্ভাবিত হইতেছে। শুধু জড় প্রকৃতি এই জ্ঞান ও কৌশলের লক্ষ্য নহে। জল, স্থল, আকাশ আয়ত্ত করিয়া ইহা মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে, মানুষকে ধ্বংস করিতে ব্যস্ত। মানুষ মানুষের শ্রেষ্ঠ শত্রু হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের উপর মানুষের প্রীতি নাই, বিশ্বাস নাই, শ্রদ্ধা নাই। সকলেই নিজের সুখের জন্য লালায়িত। মানুষ সুখের জন্য মানুষকে কষ্ট দিতে, কিম্বা প্রয়োজন হইলে, বধ করিতে কত কৌশল, কত অস্ত্র, কত বিধানের সৃষ্টি করিতেছে। কপটতা, মিথ্যা ও নৃশংসতা সভ্যতার

অলঙ্কার স্বরূপ হইয়াছে। দুর্ব্বলকে পীড়ন করিয়া, ধ্বংস করিয়া, বলবানের বীরত্ব, কীর্ত্তি ও সুখ। কে তাহাকে রোধ করিবে? কিন্তু ইহাতে তাহার আনন্দ কৈ? সে সর্ব্বদা শঙ্কিত ও ত্রস্ত। ইহা বোধ হয় স্বাভাবিক। যে আত্ম-সুখের জন্য সকলের বল হরণ করিয়াছে, তাহার নিজের বল ও আধিপত্য পদ্মপত্রস্থিত শিশিরবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল ও অনিশ্চিত। যে নর পীড়ন দ্বারা সকলের মনে ভীতি সঞ্চার করিয়াছে, সে মনে মনে সকলকেই ভয় করে। সে সকলেরই কৃপাপাত্র তাহার মনে শান্তি নাই, আনন্দ নাই। সে বিপুল বিলাস-বাহুল্যে বেষ্টিত হইয়াও নিরন্তর ক্ষুব্ধ ও পীড়িত। সুখ তাহার পক্ষে অভিশাপ মাত্র। হায়! সভ্যতার কি এই পরিণাম? সভ্যতার গর্ব্বে স্ফীত হইয়া মানুষ কি একেবারে অন্ধ হইতে চলিয়াছে? মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ কি এত বিষময় হইয়া উঠিবে? গিরি, নদী, বন ও প্রান্তর; নক্ষত্র, আকাশ ও জলধি; এবং অগণিত প্রাণিকুল—ইহাদের সঙ্গে মানুষের প্রাণের যোগ কি একেবারে বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে? মানুষ এক কেবল প্রয়োজনের তাড়নাতেই কলের পুতুলের মত হাসিবে, খেলিবে, কাজ করিবে? যে প্রাণ সে একদিন শিশুর মত অকপটে সমস্ত বিশ্ব চরাচরে বিলাইয়া দিয়া সেই ভূমা মহান্ জগদাত্মার সঙ্গে আত্মীয়তা সম্বন্ধে যুক্ত করিয়া পরমানন্দে ভাসিয়াছিল, তাহার স্পন্দন কি সভ্যতা বিরুদ্ধ? যদি তাই হয়, তবে অসভ্য যুগের সেই দৈন্য-জড়িত সরল অকপট সত্য এবং পরিপূর্ণ শান্তি ও আনন্দরসে পরিপ্লুত বিশ্বজনীন মনুষ্যত্ব ফিরিয়া আসুক। আমি তাহাকে যুক্ত করে সমস্ত মনুষ্য জাতির মঙ্গলের জন্য আহ্বান করিতেছি।

শ্রীপঞ্চানন মজুমদার।

জাগরণ

পোহাল পোহাল বিভাবরী
পূর্ব্ব তোরণে শুনি বাঁশরী।
মাতে তরঙ্গ তরী অতি চঞ্চল
স্খলিত অংশুক কেতন অঞ্চল,
পল্লবে পল্লবে পাগল জাগল
লালস আলস পাসরি।

উদয় অচলতল সাজিল নন্দন,
গগনে গগনে বনে জাগিল স্পন্দন,
কনক কিরণ ঘন শোভন ভূষণ
নামিছে শারদা সুন্দরী।

দশদিক অঙ্গনে দিগঙ্গনাদল,
ধ্বনিল শূন্য ভরি শঙ্খ সুমঙ্গল,
চলরে চল চল তরুণ যাত্রি চল,
তুলি নব মালতী মঞ্জরী।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভ্রান্তি

নবম পরিচ্ছেদ

কিশোরী কি মস্কিলেই পড়িল! গ্রামস্থ ছোট বড় সকলের অনুরোধ, তার উপর যৌথিদির কাতর অনুনয়, সতাই এক ভদ্রপরিবারের জাতি যাইবার ভয়, কি বিপদই উপস্থিত! কিশোরী এই সম্বন্ধ স্থির করাতেই ত এত গোল—হায়,এখন ত সে ই সে নিমিত্তের ভাগী! সব দোষই ত প্রায় তা'র! হায় বন্ধু, তুমি বিবাহই যদি না করিবে, তবে এ প্রস্তাবে কেন স্বীকৃত হইয়াছিলে? তোমার মনে কি এই ছিল! শেষে কিশোরীকেই কি এ বিবাহ করিতে হইবে? না, কিশোরী ত এ জীবনে বিবাহ করিতে পারে না! মেয়েটি সুন্দরী, সুশীলা, শিক্ষিতা সবই বটে, বিবাহ করিতে হইলে এইরূপ পত্নী জুটিয়া উঠা সৌভাগ্যের কথাও বটে, কিন্তু কিশোরী কেমন করিয়া বিবাহ করিবে! নিজের প্রতিজ্ঞা, নিজে না হয় ভঙ্গ করা গেল, কিন্তু লোকে কি বলিবে! কত লোকে কত টিটকারি দিবে, দলের লোকেরা তাহাকে অশ্রদ্ধা করিবে,—এ সকল সহ্য কে করিবে? না, কিশোরী কিছুতেই বিবাহ করিবে না।

মেয়ের অদৃষ্টে যা আছে তাই হইবে, কিশোরী তার কি করিতে পারে? আচ্ছা, তার যাহাতে সুপাত্রে বিবাহ হয় তাহার চেষ্টা পুনরায় করিতে কিশোরী প্রস্তুত আছে। কিন্তু আজ বিবাহ না হইলে মেয়ের জাতি যাইবে যে! তা কিশোরী কি করিবে? কিশোরীর মনে মনে এই প্রকারের নানা তর্ক, নানা যুক্তি, নানা আন্দোলন উদয় হইতে লাগিল। সে মনকে খুব দৃঢ় করিয়া রাখিবার চেষ্টা করে, কিন্তু কাহারো অনুরোধে, কাহারো চক্ষের জলে ক্ষণিকের জন্য সে দৃঢ়তা কিছু শিথিল হইয়া পড়ে, আবার সে সে শিথিলতা দূর করিয়া মনকে বজ্রের মত কঠিন করিতে চেষ্টা করে।

কিশোরী মনে মনে অনেক যুঝিয়া শেষ পরাস্ত হইল। ইহাকেই বলে "প্রজাপতির পরিহাস"!

দশচক্রে ভগবান ভূত!

* * *

বাসর ঘরের আদর ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই কিশোরী একখানি পত্র পাইল।

"বন্ধু—

আমার প্রতি যে বিরক্ত হইয়াছিলে, আশা করি, সে বিরক্তি ভাব এখন আর নাই।

তোমার মনের ভাব এ ক্ষেত্রে আমি তোমার চেয়ে অধিক বুঝিয়াছিলাম, তাই আজ এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছি, প্রথম প্রস্তাবের সময় আমার মনে কোন দ্বিধা বা মাথায় কোন দুষ্টবুদ্ধি ছিল না, তুমি আমার জন্য যে ফাঁদ পাতিয়াছিলে,—সোণার বাঁধন ভাবিয়া তাহাতেই আবদ্ধ হইতে চাহিয়াছিলাম; কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ, সে ফাঁদ তোমার জন্য রাখিয়া আকাশের পাখী আকাশে উড়িলাম! যদি পার আবার পিঞ্জরাবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিও, কিন্তু

সোণার শিকলি চাই! তাহারা থাক, তোমার মনের নিগূঢ় ভাব বুঝিয়া এবং আর একজনের জীবনী ভাবিয়াই আমি দশের চক্ষে সমাজের চক্ষে হেয় হইলাম। তোমরা সুখী হইয়াছ জানিলে, দীর্ঘকাল তোমরা শান্তিতে আছ বুঝিলে, আমি হাসি মুখে সে সব লাঞ্ছনা সহিতে পারিব। ভগবান তোমাদিগের মঙ্গল করুন।

তোমাদের যুগলমিলন দেখিতে পাইলাম না এই দুঃখ, কিন্তু সে আশা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিলে, এ মিলনে বাধা হইত, বলিয়াই সে সুখে বঞ্চিত রহিলাম। ইতি।

তোমার স্নে—"

পত্রখানি পড়িয়া কিশোরী একটু অন্যমনস্ক ভাবে কি ভাবিতেছিল। তাহার এই ভাব লক্ষ্য করিয়া বাসরের কোন রঙ্গিণী কবিতা আওড়াইলেন,—

"পিঞ্জরে বসিয়া শুক মুদিয়া নয়ন,
কি ভাবিছ মনে মনে, অথবা তোমার
ভাবিবার বাস্তবিক আছে অধিকার।"

বাসরের হাসির রোলে কিশোরীর চমক ভাঙ্গিয়া গেল। অপ্রতিভ হইয়া সে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু আর বলা হইল না, বাসরের পট পরিবর্ত্তন হইল, সেই প্রবীণা ঠাকুরাণী দিদি রঙ্গমঞ্চে দর্শন দিলেন—তাঁহাকে দেখিয়া সত্যই কিশোরীর একটু আতঙ্ক হইয়াছিল; কিন্তু ঠান্‌দিদি বেতালা নন! তিনি হাসি মুখে বলিলেন, "আজ ভাই কোন শাপ দিতে আসি নাই—আজ আসিয়াছি আশীর্ব্বাদ করিতে, আমার আশীর্ব্বাদের ফল যেন শীঘ্রই ফলে!"

তারপর নানা জনে নানা রঙ্গ আরম্ভ করিল! করুণার হাসি মুখখানি দেখিয়া চলুন আমরা এখন বিদায় হই। (ক্রমশ)

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

গ্রন্থ সমালোচন।

সচিত্র অথি লিখিত সুসমাচার—আচার্য্য এ, জুসন কর্ত্তৃক লিখিত মূল্য ৸৹ বারো আনা।

বহুদিন হইতে খৃষ্টীয় প্রচারক সম্প্রদায় বাংলা ভাষায় জগতের এক অমূল্য গ্রন্থের অনুবাদ করিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন মহাপুরুষের জীবনীর সহিত বাঙ্গালীকে পরিচিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ঈশার পবিত্র চরিত্র এবং অমূল্য উপদেশ জানিবার জন্য অনেকেরই আগ্রহ হইয়াছে। এ গ্রন্থখানি সেই অভাব মোচনের জন্য লিখিত। আচার্য্য এ জুসনের এ চেষ্টা প্রশংসনীয়. তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যের একজন অনুরাগী। ইনি কিছুদিন পূর্ব্বে ডাক্তার সিলভেনাস রচিত "বালকের জ্ঞাতব্য" নামক ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছিলেন সে গ্রন্থের নাম "গুপ্ততত্ত্ব"। গ্রন্থখানির সুখ্যাতি আমরা অন্যত্র করিয়াছিলাম এই অনুদিত পুস্তকখানি বাঙ্গালী বালকদের বিশেষ উপযোগী। অদ্যকার আলোচ্য গ্রন্থখানির জন্য আচার্য্য এ জুসন যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহার এ চেষ্টার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কিন্তু ইহার ভাষাটি তেমন ভাল হয় নাই. এজন্য আমরা দুঃখিত, কারণ যেখানে উদ্দেশ্য মহৎ, ব্যর্থতা সেখানে সহানুভূতি ও দুঃখ আকর্ষণ করে। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে আচার্য্য এ গ্রন্থের ভাষার সৌকার্য্যার্থে বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

১৩০৮

বঙ্গদর্শন

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র

কালকেতুর উপাখ্যান পুরুষপ্রধান। আমরা দেখাইয়াছি যে এই কালকেতুর চরিত্র একটি উচ্চ সুরে বাঁধা, এই উচ্চ সুর ইহার শেষ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কবিকঙ্কণ পুরুষ-চরিত্র ভাল আঁকিতে পারেন নাই, এ কথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা কালকেতুর চরিত্র হয় বুঝিতে পারেন নাই, নয় বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই। অনেকে তাহার ধান্য ঘরে লুকানর প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া এই মত সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কালকেতুর চরিত্রে ইহা একটা দোষ সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার দ্বারাই তাহার সমস্ত চরিত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এ কথা কেহ যেন না ভাবেন। কালকেতু কোনও কালেই শিক্ষিত ছিল না, কবি বরাবরই তাহাকে ব্যাধের চরিত্রেই দেখাইয়াছেন; তাহার স্ত্রীর কুসংস্কারে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক গৃহ-কোণে লুকান,—স্ত্রৈণতার পরিচায়ক, কাপুরুষতার নহে; কারণ এই লুকাইবার প্রবৃত্তি ক্ষণমাত্র স্থায়ী হইয়াছিল, আপনিই সে মুহূর্ত্ত পরেই ঘর হইতে বাহির হইয়া কলিঙ্গরাজের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, এবং বন্দী হইয়াছিল। কালকেতু যে ভীরু বা কাপুরুষ নহে, তাহার পরিচয় কলিঙ্গ-রাজার সভায় প্রকাশ পাইয়াছে।—মৃত্যুর করালছায়া যাহার সম্মুখে বিস্তৃত সে যদি বলিতে পারে—

বেড়িয়াছি আপন তনু চণ্ডিকার পায়।
তোমার তাড়নে কালকেতু না ডরায়॥
অবধান কর রায় করি নিবেদন।
জনম হইলে হয় অবশ্য মরণ॥

তাহাকে কি কাপুরুষ বলা চলে?

কালকেতুর হৃদয় কত উচ্চ ছিল তাহা ভাঁড়ু দত্তের প্রতি পুনর্ব্বার কৃপা প্রকাশে জানা যায়। যে ব্যক্তি হইতে তাহার সর্ব্বনাশ সাধিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, যে এত লাঞ্ছনা এত যন্ত্রণা ভোগ করাইয়াছিল, তাহারও দুঃখ দেখিয়া যাহার হৃদয় গলিয়া যায়, সে কত বড় চিত্তবান্ তাহা ভাবিয়া দেখিলে কি আমরা বলিতে পারি যে কবিকঙ্কণ পুরুষ-চরিত্র আঁকিতে পারেন নাই? আমরা আধুনিক কাব্যনিচয়ে এমনি একটা সরল ধার্ম্মিক, সংযমী, ও হৃদয়বান্ মনুষ্যের চরিত্র দেখিবার জন্য উৎসুক আছি, এমনি একটা সুসঙ্গত চরিত্র-চিত্র দেখিতেচাহি, কিন্তু খুঁজিয়া পাই না। আজকালকার কবি একটা ভাব (Idea) ঠিক করিয়া লইয়া তাহাই বুঝিতে থাকেন, তাহাতে রক্তমাংসের মানুষ হয়

না। কেহ বা একটা মত গড়িয়া লইয়া তাহার পর সেই মত সমর্থন করিবার জন্য মনুষ্য-চরিত্র অঙ্কিত করেন; তাহাতে সুসঙ্গত চরিত্র সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। কালকেতু একটী খাঁটি মনুষ্যের চরিত্র, এত সুন্দর ও স্বাভাবিক যে এই চরিত্র শুধু ভারতবর্ষের মনুষ্যচরিত্র নহে, ইহা জাগতিক মনুষ্যের চরিত্র; কালকেতুর চরিত্রে যে সকল উপাদান বর্ত্তমান আছে, তাহা সকল দেশের সকল মনুষ্যের চরিত্রকেই উচ্চতা ও সৌন্দর্য্য দিতে পারে।

যেমন কালকেতুর চরিত্র তেমনি ফুল্লরার চরিত্রও স্বাভাবিক ও মধুর। ফুল্লরাও কালকেতুর মত সরলা, এবং জগতের সকল সতী-স্ত্রীর মত পতি-পরায়ণা। দেশের অবস্থা-বিশেষবশতঃ তাহার চরিত্রে কুসংস্কার ও কিছু ভীরুতা প্রবেশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার সাধারণ চরিত্রের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। সারল্যবশতঃ সে ধূর্ত্তের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল, স্বামীর বিপদেই সতীর বিপদ, কিন্তু তাই বলিয়া সে স্বামীর অমঙ্গল কামনা করে নাই। স্বামীর বন্ধনে তাহার হৃদয়ভেদী ক্রন্দন আমাদেরও হৃদয় বিচলিত করে। করুণ রসাবতারণে কবিকঙ্কণ সিদ্ধহস্ত। ফুল্লরার স্বামীর সুখে সুখ, স্বামীর দুঃখে দুঃখ, স্বামীর দারিদ্র্যে দারিদ্র্য, স্বামীর সৌভাগ্যে সৌভাগ্য। ইহাই জগতের সকল সতীর লক্ষণ। তাই বলিতেছিলাম যে ফুল্লরার চরিত্র, বঙ্গদেশের ব্যাধরমণীর চরিত্র বলিয়া কল্পিত হইলেও, ইহাতে সাধারণ রমণীত্ব এমন সুন্দর ও সহজ ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যে এই চরিত্র সকল দেশের সতী নারীর চরিত্রের দর্পণ স্বরূপ হইয়াছে।

এইরূপ স্বাভাবিক রেখার সাহায্যে মুকুন্দরামের সকল চিত্রই অঙ্কিত। লহনাই বল, খুল্লনাই বল, দুর্ব্বলাই বল, আর লীলাবতীই বল, সুশীলাই বল অথবা তাহার মাতাই বল, সকল চরিত্রই স্বাভাবিক, ধনপতি বা শ্রীমন্ত, জনার্দ্দন ওঝা বা অগ্নিশর্ম্মা পুরোহিত সকলেই যেন আমাদের চির-পরিচিত।

এ সকল চিত্রেও কবির কোনও আদর্শ-সৃষ্টির বিকট চেষ্টা লক্ষিত হয় না। সমস্ত ঘটনাগুলি যেন তাঁহার কাব্য মধ্যে কোনও একটা অনিবার্য্য কারণবশতঃ সংঘটিত হইয়া যাইতেছে, এবং সেই সঙ্গে তাঁহার চরিত্রগুলি যেন আপনা আপনি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। ঘটনাবলীর অবশ্যম্ভাবী ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার কাব্যের নর-নারী হৃদয়ের বৃত্তিগুলি, মনের ভাবাবলী, যখন যেমন স্বভাবানুযায়ী, তখন তেমনি প্রকাশ পাইয়াছে; তাহার ইতর বিশেষ করিবার জন্য কবি কোথাও চেষ্টা করেন নাই। খুল্লনা কাব্যের নায়িকা তাই বলিয়া যে সে সপত্নীর সহিত কলহ করিতে পারে না, তাহা নহে; বরং তাহা করাই সম্ভব, কারণ রক্তমাংসের শরীরে রাগ আছেই। স্বামীর গৃহে কোন স্ত্রীই অপমান সহ্য করিতে পারে না, তা সে স্বামীর অন্য পত্নীর কাছ হইতেই হউক, অথবা অন্য কাহারও কাছ হইতে হউক। সতীনের ঝগড়া চিরপ্রসিদ্ধ, কোনও স্ত্রী—বিশেষতঃ যে স্ত্রী স্বামীকে ভাল বাসে—সে স্বামীর প্রেমে কোনও অংশীদার সহ্য করিতে পারে না। "ন মানিনী

সংসহতেঽন্তসঙ্গমম্।" এই সপত্নীবিরোধ ভারতবর্ষে চিরপ্রসিদ্ধ, রামায়ণের সময় হইতেই ইহার সূত্রপাত হইয়াছে। মহর্ষি কণ্বকে তাই শকুন্তলাকে উপদেশ দিতে হইয়াছিল "কুরু প্রিয়সখিবৃত্তিং সপত্নীজনে।" লহনা যে খুল্লনাকে কুরূপা করিবার জন্য পতির নাম দিয়া পত্র জাল করিয়াছিল, ইহা তাহার বিষম অন্যায় হইলেও ঠিক এইরূপ স্বাভাবিকী প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াই কৈকেয়ী রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যে প্রতিষ্ঠা প্রার্থনা করিয়াছিল। লহনার স্বামী-হৃদয়রূপ রাজ্য যে অপরে আসিয়া কাড়িয়া লইতেছে এ যন্ত্রণা তাহার সহ্য হইল না, তাই লীলাবতীর উপদেশ তাহার ভাল লাগিল না, সে কোট করিয়া বসিল, খুল্লনাকে কুরূপা করিতে হইবে, তাহা হইলে বোধ হয় স্বামীর উপর তাহার প্রভাব ঘুচিয়া যাইবে। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে সে খুল্লনার উপর বিষম অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হইল না, তাহাকে ছাগল-রক্ষণে বাধ্য করিল। কিন্তু সকল স্ত্রীলোকের মত লহনা বিপরীতগামিনী চিত্তবৃত্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাই খুল্লনার প্রতি অত্যাচারও যেমন স্বাভাবিক, খুল্লনাকে সোহাগ করাও তাহার পক্ষে তেমনি স্বাভাবিক। যে স্বামীর ভালবাসার লোভে সে খুল্লনাকে উৎপীড়ন করিয়াছিল, সেই স্বামীর ভালবাসা হারাইবার ভয়েই আবার সে খুল্লনাকে আদর করিতেও পারিয়াছিল, তাহার কাছে ক্ষমা চাহিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, এবং তাহাকে বাড়াইতেও পারিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন রমণী-হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহ তাহার যথেষ্ট ছিল যে না তাহা নহে।

"পত্রের বচনে তারে দূর কৈনু দয়া।
অন্ন কুই দিয়াছি জাপুন মাথা খায়া॥

তার পর আবার লহনার মন ফিরিয়া গিয়াছিল—স্বামি-সমাগমে তখন আবার স্বামীর প্রেমলাভের আশায় এবং স্বামীকে খুল্লনার প্রতি বিরক্ত করিবার জন্য সে অনেক মিথ্যা কথা বলিয়াছিল। খুল্লনাকেও অনেক তোক বাক্য বলিয়া স্বামীসহবাসে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু এখন খুল্লনার বুক দশহাত হইয়াছে, সে কি আর লহনাকে ভয় করে? এইরূপে সপত্নীকলহ নানা রসে বিভূষিত করিয়া কবি সম্পূর্ণ ভাবেই চিত্রিত করিয়াছেন। খুল্লনার প্রভুত্ব লহনার পক্ষে যে কত দূর অসহ্য ছিল তাহা ধনপতির সিংহলপ্রবাস-প্রস্তাব শ্রবণে লহনার আনন্দে প্রকাশিত হইয়াছে। এই ব্যাপারে খুল্লনার নিরানন্দ লহনার মহা আনন্দ, তাহার একমাত্র কারণ এখন সে স্বামীর আদরে বঞ্চিত, বিশেষতঃ তাহার কপট ব্যবহার স্বামীর কর্ণগোচর হওয়ার পর হইতে এবং খুল্লনাকে পরীক্ষা দিতে বাধ্য হইবার পর হইতে স্বামী তাহার প্রতি বিরক্ত ও খুল্লনার প্রতি সেই মাত্রায় বেশী অনুরক্ত। এই বিষম দৃশ্য আর তাহার সহ্য হয় না, বরং স্বামীর বিচ্ছেদ সহনীয়, কিন্তু তাহার স্বামী যে আর এক জনের বশীভূত এ সে সহিতে পারে না।

সুয় পরে চক্ষু পড়িলে চক্ষে চক্ষে কথা।
আমার দিকে পিঠ পড়িলে করে হেঁট মাথা॥
সুয় দুয় সমান হইল এখন হৈল ভাল।
বিক্রমকেশরী জীয়া থাকুক চিরকাল॥

কবি ভারতচন্দ্র এই মনোভাবের কারণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

আপনি তো জান স্ত্রীলোকের ব্যবহার।
সতিনী লইলে পতি বড়ই প্রহার॥
বরঞ্চ শমনে লয় তাহা সহে গায়।
সতিনী লইলে স্বামী সহা নাহি যায়॥

স্বামী চলিয়া যাইবার পর আবার লহনা খুল্লনার প্রতি দয়াশীলা হইয়াছিল। কিন্তু সে দয়া তার বেশী দিন থাকে নাই, কারণ স্বামী লইয়া হিংসা ঘুচিতে না ঘুচিতে পুত্র লইয়া হিংসার উৎপত্তি হইল। একে সতীন, তাহার উপর আবার তাহার পুত্র বংশের প্রদীপ, এ জ্বালা কি সহজে সওয়া যায়? তাই লহনা পুত্রের প্রতি তত বিরক্ত না হইলেও পুত্রের জননীর প্রতি বিশেষ বিরক্ত হইয়া উঠিল। লহনা কেবল স্ত্রী, খুল্লনা স্ত্রী ও জননী। জননীর স্নেহ জননীর ঔৎসুক্য যা না হইলে কাহারও বুঝিবার উপায় নাই, তাই লহনা শ্রীমন্তের জন্য খুল্লনার ব্যগ্রতা বুঝিতে পারিত না, এবং না বুঝিয়া তাহাকে গালি দিত। কবি মুকুন্দরাম খুল্লনার চরিত্রে শুধু পতি-পরায়ণা রমণীই আঁকেন নাই, পুত্রবৎসলা জননীও আঁকিয়াছেন। এই চিত্রে মায়ের আনন্দ, মায়ের স্নেহ, মায়ের উৎসাহ, মায়ের ঔৎসুক্য, মায়ের ব্যথা সব প্রকাশিত হইয়াছে; এমন সহজ, সুন্দর ও সম্পূর্ণ মাতৃমূর্ত্তি আমরা অন্য কোনও কাব্যে দেখিয়াছি কি না সন্দেহ; যদি থাকে তো তাহা কুমার-সম্ভবে। আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যকাব্য নিচয়ে মাতৃস্নেহের চিত্র আছে সত্য, কিন্তু সেগুলিও যে সম্পূর্ণ তাহা বলিতে পারিলাম না। অস্বাভাবিক মাতৃমূর্ত্তি কিন্তু আমরা এখনকার কাব্যে অনেক দেখিতে পাই।

আয় আয় রে বাছা আয়।
কি লাগিয়া কান্দ বাছা কি ধন চায়॥
তুলিয়া আনিব গগণ ফুল।
একেক ফুলের লক্ষেক মূল॥
সে ফুলে গাঁথিয়া দিব যে হার।
প্রাণের বাছা মোর না কান্দ আর॥
গগণ মণ্ডলে পাতিব ফাঁদ
ধরিয়া আনিব গগণ চাঁদ॥
সে চান্দ আনি তোরে পরাব কৌটা।
কালি গড়ায়ে দিব সোনার ভেটা॥

ইত্যাদি ঘুমপাড়ান গান হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীমন্তের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত একটী অখণ্ডিত রসের সহিত খুল্লনার মাতৃস্নেহ ফুটিয়া উঠিয়াছে, সরল ও সহজ রাগরঞ্জিত হইয়া একটী পবিত্র মাতৃমূর্ত্তি জাগিয়া উঠিয়াছে। মা হওয়ার যত সুখ, যত দুঃখ খুল্লনা সবই অনুভব করিয়াছে। অথচ খুল্লনার চরিত্রে বল নাই তাহা নহে, সেই সুন্দর নৈতিক বল ছিল বলিয়া সে 'মাকে' বলিতে পারিয়াছিল

"সেই ছিরা দিয়াছ আপনি,
হাতে তুলে দিয়া নিবি পুন কেড়ে নাও যদি
তবে কি করিতে পারি আমি॥"

স্ত্রীজাতির দুর্ব্বলতা, স্ত্রীজাতির মধুরতা, স্ত্রীজাতীর ভালবাসা, স্নেহ-মমতা, সমস্তটুকু লইয়া কবি এই খুল্লনা-চরিত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এইরূপ পূর্ণতা আছে বলিয়া খুল্লনা কবির কাব্যের শ্রীমন্তোপাখ্যানাংশের নায়িকা।

চণ্ডী কাব্যের এই অংশে আরও অনেকগুলি স্ত্রী-চরিত্র আছে, তাহাদিগের মধ্যে দুর্ব্বলার চরিত্রে একটু বিশেষত্ব আছে। দুর্ব্বলা মহুয়া-জাতীয়া স্ত্রীলোক, কিন্তু মহুয়া অপেক্ষা ইহার চরিত্র কিছু রহস্যময়। লহনার হৃদয়ের মত দুর্ব্বলা দাসীর হৃদয়ের বৃত্তিও বিপরীতগামিনী। কিন্তু সে খাঁটি দাসী। দুর্ব্বলার চরিত্র আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে চাহি না, কিন্তু এইটুকু বলিতে চাহি যে এ সকল ছোট ছোট চরিত্রের নিপুণ চিত্রণ দ্বারা মুকুন্দরামের সৃষ্টি-কৌশল ও মনুষ্য-হৃদয়জ্ঞতা বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গলায় একটা চলিত কথা আছে "গোদা নড়ী ছাঁদন দড়ী তুমি কার? না, যখন যার কাছে থাকি তখন তার।" দুর্ব্বলা সেই গোদা নড়ী ও ছাঁদন দড়ী। এই দৃঢ়ভাব বুঝিতে না পারিয়া কবি ভারতচন্দ্র দুর্ব্বলা দাসীকে দুইভাগ করিয়া সাধী ও মাধীতে পরিণত করিয়াছেন। এই দুর্ব্বলাই কিন্তু শ্রীমন্তের ধাত্রী, স্নেহশীলা ধাত্রী। শ্রীমন্তের হৃদয়ে তাহার স্নেহ মৃত্যুকালেও জাগরূক ছিল, তাই মশানে বসিয়া শ্রীমন্ত বলিয়াছিলেন—

দুর্ব্বলাকে কহিবে প্রণাম।

• • • •

এ সব দুঃখের আদি বুঝাবে দুর্ব্বলা দিদি।

এই সকল পুরাণো ঝি আমাদের চিরপরিচিত, তাই দুর্ব্বলাকে দেখিয়াই আমরা চিনিতে পারি। কবি মুকুন্দরামের সূক্ষ্মদৃষ্টি সংসারের চারিদিকেই ধাবিত হইত। তিনি স্বচ্ছন্দে সব চরিত্রই নিপুণ ভাবে চিত্রিত করিতে পারিতেন। সেক্সপীয়র যেমন স্বচ্ছন্দতার সহিত Dogberry আঁকিয়াছেন, কালিদাস যেমন স্বচ্ছন্দতার সহিত একটী বীবরের চিত্র আঁকিয়াছেন, কবি মুকুন্দরামও তেমনি অনায়াস লীলা সহকারে দুর্ব্বলা, লীলাবতী, জনার্দ্দন ওঝা, অশ্রিশর্ম্মা পুরোহিত, কর্ণধার, বাঙ্গাল মাঝি প্রভৃতির চিত্র আঁকিতে পারিয়াছেন। ছোট হইলেও তাঁহার কোনও চরিত্রই অসঙ্গত নহে, নির্জ্জীব নহে। যাহার যেখানে হাসিবার কথা সে সেখানে হাসিয়াছে, যাহার যেখানে কাঁদিবার কথা সে সেখানে কাঁদিয়াছে, যাহার যেখানে যা করিবার কথা, সে সেখানে ঠিক তাহাই করিয়াছে; কবি কিছুই ঢাকিবার কিছুই উল্টাইবার চেষ্টা করেন নাই। অথচ ইহারই ভিতর হইতে এক একটী সুন্দরভাব এমন সরল রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, আমরা সেই সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারি না।

ধনপতির চরিত্র বিচার করিয়া দেখিলেই এ কথা বেশ বুঝা যাইবে। মুকুন্দরামের সব চিত্রগুলিই গৃহচিত্র, পৌরাণিক চিত্র নহে। দেবতার কথা ও অতিপ্রাকৃত কথা মিশিলেও তাহারা প্রধানত গৃহচিত্র। তাঁহার কাব্যে রাজা-রাজড়ার কথা আছে, কিন্তু তাহাদের প্রাধান্য নাই। ধনপতি সম্পন্ন গৃহস্থ, ব্যবসায় দ্বারা প্রভূত অর্থশালী, কিন্তু গৃহস্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে। গৃহস্থ লোক যেমন হয়, সেও তেমনি দোষে গুণে জড়িত। তাহার প্রথম অপরাধ এক স্ত্রী

সঙ্গে খুল্লনাকে বিবাহ। সমাজে একাধিক বিবাহ তখন প্রচলিত. বোধ হয় বেশী রকমই প্রচলিত ছিল, তাই ধনবান ও রূপবান ধনপতির খুল্লনাকে বিবাহ করা বড়ই সহজ হইল। কিন্তু এ বিবাহ দ্বারা সে নিজেও সুখী হইতে পারিল না, খুল্লনাকেও দারুণ জ্বালায় ফেলিল। রসিকা খুল্লনার রূপে ও রসিকতায় মুগ্ধ হইয়া ধনপতি আত্মহারা হইল; সঙ্গে সঙ্গে লক্ষপতিও (খুল্লনার পিতা) বরের রূপ, কুল ও ধন দেখিয়া পত্নী রত্নাবতীর তীব্র তিরস্কার ও হিতোপদেশ অবহেলা করিয়া কন্যাকে সতীনের ভয় থাকিলেও ধনপতির করে সমর্পণ করিল। ধনপতির এই বিবাহ রূপের মোহে, প্রাণের টানে নহে; তাই এ বিবাহে কেহই সুখী হইতে পারিল না। মাঝে হইতে শান্তিময় সংসারে একটা বিষম অশান্তির উদয় হইল; দুই সপত্নীর বিদ্বেষ-বহ্নি। অতএব কিছুদিন রূপের সহবাসে তাহার দিন সুখে কাটিলেও, পরিণামে তাহাকে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে খুল্লনারও নির্য্যাতনের সীমা ছিল না।

কবি এই নির্য্যাতন সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি এই ঘটনার সাহায্যে অনেকগুলি চরিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ধনপতি বিবাহ করিয়া আনিয়া খুল্লনাকে লহনার হস্তে সমর্পণ করিয়া,—বিদেশে চলিয়া গেল। সহনশীলা হিন্দু-স্ত্রী লহনা সপত্নী খুল্লনাকে বড় যত্নে রাখিল;—বড় সুখে প্রতিপালন করিতে লাগিল। যদি এই ভাবে চলিত তাহা হইলে সংসার সুখে চলিত। কিন্তু সংসারে এমন চরিত্রের নর-নারী অনেক আছে, যাহাদের প্রাণে পরের সুখ সহ্য হয় না; তাহারা একটা কোন অহেতুক বিদ্বেষবশত লোকের সর্ব্বনাশ না করিতে পারিলে হাঁফাইয়া উঠে। ধনপতি যখন খুল্লনাকে বিবাহ করিয়া আনে, তখন বোধ হয় এই সকল লোকের অস্তিত্ব সে অবগত ছিল না। তাহার উপস্থিতিতে সংসার একরকম চলিতে লাগিল, কিন্তু যেই সে দূরদেশে গমন করিল অমনি শান্তিময় সংসারে বিষবৃক্ষ রোপিত হইল, অথবা ধনপতির নিজের রোপিত বিষবৃক্ষেরই ফল ধরিল। দুর্ব্বলা দাসীর হৃদয়ে দুই সপত্নীর ভালবাসা সহ্য হইল না; সে লহনার হৃদয়ে সপত্নীর প্রতি ঈর্ষা-বীজ বপন করিয়া দিল। সেই ঈর্ষা-বীজ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষের ফল-স্বরূপ খুল্লনার ছেলি বা ছাগল চরান। এই ছেলি-রক্ষা রূপ সামান্য ব্যাপার লইয়া কবি মুকুন্দরাম অশেষ কবিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। একদিকে খুল্লনার অশেষ যন্ত্রণা যেমন প্রকাশিত হইয়াছে, আর একদিকে খুল্লনার হৃদয়ের মধুরতা,—তাহার সহশীলতাও তেমনি ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা মুকুন্দ-রামের চিত্রাঙ্কণপ্রতিভার বিচারকালে এই স্থলের অনেকগুলি চিত্র উদ্ধৃত করিয়াছি এবং দেখাইয়াছি যে কবিকঙ্কণের হৃদয় ভারতবর্ষের সকল মহাকবির মত প্রকৃতির সহিত একটা আশ্চর্য্য সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ। শকুন্তলার মত, উমার মত খুল্লনাও প্রকৃতিকে নিজের সখী, নিজের আত্মীয়া বলিয়াই জানিত। খুল্লনার দুঃখ এত স্বাভাবিক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহা দ্বারা করুণ-

রস যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমাদের হৃদয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে বাঙ্গলা-কাব্যে,—কি আধুনিক, কি পুরাতন,—এমন সুন্দর করুণ রসের চিত্র আর কোথাও দেখি নাই।

মুকুন্দরাম শ্রীমন্তের উপাখ্যানে স্ত্রী-প্রকৃতির অধিক সমাদর করিয়াছেন, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র, কারণ উপাখ্যানের প্রথমেই তিনি বলিয়া রাখিয়াছেন যে স্ত্রীলোকের পূজা-গ্রহণাভিলাষে চণ্ডী খুল্লনাকে সংসারে আনিয়াছেন। ধনপতির চরিত্র খুল্লনার চরিত্র পরিস্ফুট করিয়াছে মাত্র, এই চিত্রে আমরা কোন বিশেষ মহত্ব দেখিবার প্রত্যাশা রাখি না। ধনীর সন্তান সাধারণত যেমন হয়, ধনপতিও তেমনি। একাধিক বিবাহকারী ব্যক্তির সাধারণত যা হওয়া সম্ভব ধনপতি ঠিক সেই প্রকার। কখনও সে এ স্ত্রীকে ভুলাইতেছে, কখনও ও স্ত্রীকে ভুলাইতেছে, কখনও ইহার মন রাখিতেছে, কখনও আবার অন্যের মন রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু কেবল দুই স্ত্রীর মন যোগাইয়া যদি তাহার দিন কাটিত তাহা হইলে সে একরকম চালাইতে পারিত, কিন্তু লহনার অবিমৃষ্যকারিতায় শুধু খুল্লনাকে বিপন্ন হইতে হইল না, ধনপতিকেও বিষম সমস্যায় পড়িতে হইল। সভায় সম্মান পাইবার অধিকার রূপ ছিদ্র হইতে তাহার স্বজাতি বণিকেরা খুল্লনাকে লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিল। খুল্লনার অপরাধের মধ্যে সে লহনা কর্ত্তৃক ছাগরক্ষায় নিযুক্ত হইয়া একাকিনী বনে বনে বিচরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, অতএব তাহাকে বণিক্‌সভায় পরীক্ষা দিতে হইবে! ধনপতির তখনও রূপজ মোহ কাটে নাই, কাজেই সে মহা বিপদে পড়িল; খুল্লনাকে বারবার অনুরোধ করিল তাহার পরীক্ষা দিয়া কাজ নাই, সে টাকা দিয়া সকলকে নিরস্ত করিবে। সংসারী লোকে বিশেষত ধনী-সংসারী লোকে এমন করিয়াই এই রূপ সামাজিক অত্যাচারের হাত এড়াইতে চেষ্টা করে। কিন্তু খুল্লনার সুবুদ্ধি-বশত ধনপতি এই সামাজিক ব্যাপার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। খুল্লনার অগ্নি-পরীক্ষা হইয়া গেল। কবি অবশ্য এই অগ্নি পরীক্ষা সংক্রান্ত ঘটনাগুলি রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং প্রাকৃতের সহিত অতিপ্রাকৃতের সংমিশ্রণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে সতী-রমণীকে জগৎলক্ষ্মী আদ্যাশক্তি সর্ব্বদাই রক্ষা করিয়া থাকেন। খুল্লনার অগ্নি-পরীক্ষা হইয়া গিয়াছিল ইহার বহু পূর্ব্বেই। যখন সুন্দরী যুবতী লাঞ্ছিতা ও অপমানিতা খুল্লনা একাকিনী বনে বনে ভ্রমণ করিয়াও কায়-মনোবাক্যে পতিপরায়ণা থাকিতে পারিয়াছিল, তখনই তাহার যথার্থ অগ্নি-পরীক্ষা হইয়া গিয়াছিল। খুল্লনার সামাজিক পরীক্ষা জগতের সমক্ষে তাহার পবিত্রতা প্রচার করিয়াছে মাত্র। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় সতীত্ব-পরীক্ষার অনেক রকম উপায় সকল সমাজেই প্রচলিত ছিল, তাহার মধ্যে অগ্নিপরীক্ষা একটী। সেক্‌সপীয়রের সমসাময়িক নাট্যকার মিড্‌লটন তাঁহার চেঞ্জলিং (পরিবর্ত্তনশীলা) নামক নাটকে সতীত্ব পরীক্ষার এক ঔষধের

কথাও লিখিয়াছেন। তাহার বিবরণ বড় কৌতুকময়। ইংলণ্ডে অগ্নি-পরীক্ষা (trial by fire) তৃতীয় হেনরির রাজত্বে আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু ভারতবর্ষে মুকুন্দরামের সময়ও এইরূপ পরীক্ষার প্রচলন ছিল তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। যাহা হউক ধনপতি খুল্লনার সৎসাহস ও বুদ্ধির প্রভাবে আবার সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিল।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

তিব্বত-অভিযান।

তিব্বত-অভিযানের কথা এখনও বোধ হয়, অনেকেরই স্মরণ আছে। কিন্তু কি জন্য যে উহা প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার সঠিক সংবাদ অনেকেই জানেন না। আমরা প্রথমেই সে কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিব। তার পর অন্য কথা।

ভারত গভর্ণমেণ্ট বহুদিন হইতে রুসিয়ার গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া আসিতেছেন। ইংরাজ বিলক্ষণ জানেন, রুসিয়া কেবলমাত্র দুইটি পথে ভারতে প্রবেশ করিতে পারেন। প্রথম, আফগানিস্থানের পথ দ্বিতীয়-তিব্বত। আমীরের সহিত মিত্রতা সংস্থাপনের জন্য ইংরাজ কি প্রকার অর্থব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন। আমীরের বন্ধুতা-লাভের জন্য কাবুল যুদ্ধ ও তদুপলক্ষে সহস্র সহস্র সৈনিকের আত্মত্যাগ ও জলের মত অর্থব্যয়ের কথা কে না জানেন? এ সকল কিসের জন্য তাহা কি আবার বিশেষভাবে বলিতে হইবে?

পশ্চিম ভারতে আফগানিস্থানের যে স্থান, উত্তর ভারতে তিব্বত অধিকল সেই স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইংরাজ জানেন রুস যদি একবার তিব্বতের উপর প্রাধান্য সংস্থাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে কাশ্মীর, নেপাল, ভূটান প্রভৃতি হিম-রাজ্য সকল রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িবে। এতদ্ব্যতীত, ভারত তখন সম্পূর্ণ অরক্ষিত হইয়া পড়িবে। এই জন্য ইংরাজ তিব্বতের উপর প্রখর দৃষ্টি রাখিয়া আসিতেছেন। যাহাতে ইহার সহিত আফগানিস্থানের ন্যায় বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়, বহুদিবস হইতে তাহার যথোচিত চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

যে সময়ে বিশাল মোগল-সাম্রাজ্য অতি দ্রুত গতিতে ধ্বংসপথে অগ্রসর হইতেছিল, তখন কয়েক সহস্র গুর্খা সৈনিক নেপাল অধিকার করেন। তাহার পর তাঁহারা ক্রমে ক্রমে বিশাল হিমাচল প্রদেশের প্রায় সমস্ত রাজ্যগুলি হস্তগত করেন। অবশেষে ধনধান্যপূর্ণ নিম্নভূমির উপর তাঁহাদের দৃষ্টি পতিত হইল। তখন উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত অংশ ইংরাজ কোম্পানির পদানত। ইংরাজেরা গুর্খাদের নিকট নিতান্ত অপরিচিত। ইঁহারা যে কি প্রকার চতুর ও পরাক্রমশালী তাহা

গুর্খারা জানিতেন না। তাঁহারা মহারাষ্ট্র-জাতির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ইংরাজরাজ্য আক্রমণ করিলেন। ইংরাজসৈন্য চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া নেপালরাজ্য অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। গুর্খারা নিতান্ত দুর্ব্বল হস্তে অস্ত্র ধারণ করিতেন না। ইংরাজের তিনভাগ সৈন্য তাঁহাদের পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া হটিয়া আসিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যলক্ষ্মী চিরদিন ভারতবর্ষে ইংরাজের সহচরী। উঁহাদের চতুর্থ সৈন্যদল অক্টরলোনীর অধিনায়কতায় গুর্খাদের সমস্ত বল-বিক্রম অতিক্রম করিয়া নেপাল রাজধানী কাঠমণ্ডু অধিকারের উপক্রম করিলেন। এতদিনে গুর্খাদের চৈতন্য হইল। অবিলম্বে সন্ধি স্থাপিত হইল। ইংরাজ বীরজাতি—বীরের সম্মান জানেন। মহাবীর অক্টরলোনীর স্মৃতিরক্ষার্থ যে বিশাল মনুমেণ্ট নির্ম্মাণ করাইলেন, তাহা কলিকাতার সমগ্র ইমারতবৃন্দের উপর আপন মস্তক উন্নত করিয়া আজ পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

সিকিম এতদিন পর্য্যন্ত নেপালের অধীন ছিল। নেপালযুদ্ধের পর ইংরাজ উহা দখল করিয়া উহার প্রাচীন রাজবংশীয় একজনকে উহার সিংহাসনে বসাইলেন। উহার পর ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার জন্য যখন একটি শৈলাবাস নির্ম্মাণের প্রয়োজন হইল, তখন ডাক্তার ক্যাম্বেল সাহেবের পরামর্শানুসারে দারজিলিং সিকিম-রাজের নিকট হইতে গ্রহণ করা হয়।

গুর্খারা নেপাল রাজ্য গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে সমস্ত হিমালয় প্রদেশ তিব্বতের অধীন ছিল। বিশেষ, সিকিমরাজ বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া, সিকিমে তিব্বতের প্রাধান্য চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল। গুর্খারা সিকিম অধিকার করিবার পরও ঐ অধিকার অপ্রতিহত ছিল। তাহার পর, যখন সিকিম ইংরাজ-অধিকারভুক্ত হয়, তখন বস্তুত উহার সহিত তিব্বতের সমস্ত সম্বন্ধ রহিত হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সিকিমরাজ লাসায় দলাই লামার অনভিমতে কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। এক্ষণে যখন ইংরাজ দারজিলিং অধিকার করিয়া তথায় সহর সংস্থাপনে অগ্রসর হইলেন, তখন দলাই লামা মনে করিলেন যে, ইংরাজ তিব্বতের এত নিকটে বাস করা কখনও নিরাপদ নহে। তিনি তলে তলে সিকিমরাজকে ইংরাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। ইহার ফল শীঘ্রই ফলিল। সিকিমরাজের ইঙ্গিতে দুই জন প্রধান ইংরাজ কর্ম্মচারী নিহত হইলেন। ইংরাজ অবশ্য এই দুর্ব্ব্যবহার নীরবে সহ্য করিলেন না। শাস্তিস্বরূপ তাঁহারা সিকিমের কিয়দংশ অধিকার করিয়া লইলেন। ইংরাজ লামার কূট চাল বুঝিলেন বটে, কিন্তু তিব্বতের সহিত শত্রুতা করা তাঁহাদের সে সময়ে অভিমত ছিল না বলিয়া তাঁহারা ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধের পরিবর্ত্তে লামার নিকট এক দূত প্রেরণ করিলেন। এই দূত চুম্বী উপত্যকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। সর্দ্দার লামা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকার করিলেন। তিব্বতের সহিত

মিত্রতাসংস্থাপনের ইংরাজের ইহা দ্বিতীয় চেষ্টা। ব্রিটিস্ ভারতের প্রথম বড়লাট ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ তিব্বতে প্রথম ইংরাজ-দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকেও অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিতে হয়।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কোলম্যান মেকলে সাহেব (ইনি বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারি ছিলেন) লর্ড র‍্যানডল্ফ চর্চ্চ-হিল্ (ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারি) সাহেবের সাহায্যে চীন সম্রাটের নিকট হইতে লামা-প্রবেশের ছাড়পত্র সংগ্রহ করেন। তদনুসারে মেকলে সাহেব ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সিকিম পথে তিব্বত প্রবেশের চেষ্টা করেন। কিন্তু তিব্বতীয়েরা তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দিল না। অগত্যা তাঁহাকে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতে হয়। মেকলে সাহেবের নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, তিব্বতে সবলে প্রবেশ করেন। কিন্তু ভারতের তদানীন্তন বড় লাট ডফ্রীণের ইহাতে সম্মতি না থাকাতে অগত্যা তাঁহাকে নিরস্ত হইতে হয়।

ডফ্রীণের ঐ দুর্ব্বলতার ফল কিন্তু অচিরে ফলিল। চীনসাম্রাজ্যের ছাড়পত্র সত্ত্বেও মেকলে সাহেব ফিরিয়া যাওয়াতে তিব্বতীয়েরা মনে করিল, ইংরাজেরা তাহাদের ভয়ে তিব্বতে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। তাহারা অবিলম্বে একদল সৈন্য লইয়া সিকিম আক্রমণ করিল ও দারজিলিংএর ৩০ মাইল দূরে উপস্থিত হইল। এ সম্বন্ধে চীনসম্রাটকে জানান হইল বটে, কিন্তু তিনি উহার কোনও প্রকার উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করিলেন না। তখন ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল গ্র্যাহামকে সিকিম অভিমুখে প্রেরণ করা হইল। তিব্বতীয়েরা পরাজিত হইয়া জেলেপলা গিরিসঙ্কট পথে চুম্বী উপত্যকায় পলায়ন করিল। ইংরাজ অবিলম্বে উহা অধিকার করিলেন।

তিব্বতে একজন চীন কর্ম্মচারী (ইঁহার উপাধি অম্বান্) ইহার বহু দিবস পূর্ব্ব হইতে বাস করিতেন। এতদিন পর্য্যন্ত তিনি নীরবে অবস্থান করিয়াছিলেন। এক্ষণে সহসা তিনি ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া ইংরাজকে চুম্বী ত্যাগ করিতে বলিলেন। তখনও চীনের আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতার কথা কেহই জানিতেন না। তখনও চীন-জাপান যুদ্ধ হয় নাই। ইংরাজ তখনও পর্য্যন্ত চীনকে বিলক্ষণ সম্মান করিয়া চলিতেন। সুতরাং ইংরাজ বিনা বাক্যব্যয়ে চুম্বী ত্যাগ করিয়া আসিলেন। শুধু তাহাই নহে। এই যুদ্ধের পর ব্যয়স্বরূপ তাঁহারা তিব্বতের নিকট এক কপর্দ্দকও প্রাপ্ত হইলেন না। এই ঘটনার দুই বৎসর পরে (খ্রীঃ ১৮৯০) ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত দলাই লামার এক সন্ধি স্থাপিত হয়। * * চীনসম্রাট্ তিব্বতকে করদ রাজ্য বলিয়া পরিগণিত করেন। এই জন্য লাসায় তাঁহার একজন প্রতিনিধি বাস করেন। ইঁহার (উপাধি 'অম্বান্') সম্মুখে ১৭ই মার্চ্চ এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। তদনুসারে, লামা প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিব্বত ও ভারতের মধ্যে যাহাতে উত্তরোত্তর বাণিজ্যব্যাপার বৃদ্ধি হয় তদ্বিষয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন। ভারতের সহিত তিব্বতের ইহাই প্রথম

সন্ধি। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, লামা মহাশয় এক দিনের জন্যও স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন নাই।

ইহার তিন বৎসর পরে (খ্রীঃ ১৮৯০) ইংলণ্ডীয় গভর্ণমেণ্টের বিশেষ চেষ্টায় ভারতের সহিত চীনের এক সন্ধি স্থাপিত হয়। এতদনুসারে স্থির হয় যে, সমস্ত ইংরাজ ব্যবসায়ীরা অবাধে চুম্বী উপত্যকায় গমন করিতে পারিবেন ও বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিতে পারিবেন। কি জন্য ঠিক বলা যায় না, এই কার্য্যে ইংরাজ সর্দ্দার লামার কোনও প্রকার মতামত জিজ্ঞাসা করেন নাই। বোধ হয়, তাঁহারা তিব্বতকে করদ রাজ্য মনে করিয়া এই প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সন্ধি অনুসারে ইংরাজ যখন চুম্বীতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন তিব্বতীয় সৈন্য আসিয়া তাঁহাদিগকে বাধা দান করিলেন। তাঁহারা এই খানেই ক্ষান্ত হইলেন না। তিব্বত ও সিকিমের সীমান্ত স্তম্ভ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সিকিমের কিয়দংশ অধিকার করিয়া লইলেন ও অনেকগুলি ইংরাজ প্রজাকে বন্দী করিলেন। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইংরাজ চীনসম্রাট ও দলাই লামার নিকট পুনঃ পুনঃ অভিযোগ উপস্থিত করিয়াও কোনও প্রকার ফল লাভ করিলেন না।

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে (খ্রীঃ ১৯০০) ভারত গভর্ণমেণ্ট দলাই লামার সহিত মিত্রতা স্থাপনের জন্য একখানি পত্র প্রেরণ করেন। ঐ পত্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয় নাই। পর বৎসর পূর্ব্বপত্রের ন্যায় আর একখানি পত্র ও পুনরায় লামায় প্রেরণ করা হয়। ইহা লামার হস্তগত হয় বটে, কিন্তু তিনি উহা উন্মুক্ত না করিয়াই ফেরত পাঠাইয়া দেন। তিনি যদি এই খানেই ক্ষান্ত হইতেন, তাহা হইলে হয় ত তাঁহাকে নানাপ্রকার গোলযোগে পড়িতে হইত না। যখন ইংরাজ বারম্বার চেষ্টা করিয়াও তাঁহার কৃপাকণা লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন তিনি রুসসম্রাটের কৃপাভিক্ষার্থী হইয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিতেছিলেন। দুনিয়ার কারখানাই বুঝি এই প্রকার! তুমি যাহাকে একবার মাত্র দেখিতে পাইবার জন্য ব্যাকুল, সে আবার আর একজনের কণামাত্র কৃপার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিতে প্রস্তুত।

আমরা কিন্তু সর্দ্দার লামার বিশেষ অপরাধ দেখিতে পাই না। তাঁহার নিকট বহুদিন হইতে জারের কয়েকজন কর্ম্মচারী গুপ্ত ভাবে গমনাগমন করিতেছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বদা লামাকে বুঝাইতেন যে, ইংরাজের অভিসন্ধি ভাল নহে। কোনও প্রকারে তিব্বত অধিকার করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। ইংরাজ সিকিম অধিকার করাতে ঐ বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গেল। এই জন্য তিনি ইংরাজকে বিশেষ সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তিনি মনে করিলেন, ইংরাজ যে প্রকার পরাক্রান্ত তাহাতে তাঁহাদের কবল হইতে রক্ষা করিবার ক্ষমতা রুস ভিন্ন আর কাহারও নাই। এই জন্যই তিনি জারের বন্ধুত্ব লাভের জন্য একান্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এতদিন পরে ইংরাজের যেন চমক

ভাবিল। তখন কর্জ্জন বাহাদুর ভারতের রাজপ্রতিনিধি। তিনি সভেজে কলম ধরিলেন। তিব্বতকে আয়ত্তের মধ্যে না রাখিলে রুস যে অবিলম্বে ভারতের প্রতিবাদী হইয়া পড়িবে তাহা তিনি কর্ত্তৃপক্ষকে এমন পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে, বিলাতের মন্ত্রীসমাজ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। রুস যে তিব্বতে আধিপত্য লাভের জন্য একান্ত ব্যগ্র, তাহা সকলেই বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। তখন চীনের নিকট একজন বিশেষ উপযুক্ত দূত প্রেরণ করা হইল। এবার ইংরাজ ভিন্ন মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইলেন। এতদিন পর্য্যন্ত ইংরাজ চীনকে বিশেষ সম্মান করিয়া চলিতেন। এখন কিন্তু চীনের প্রকৃত অবস্থার কথা কাহারও অজ্ঞাত ছিল না। সেই জন্য ইংরাজ-দূত প্রথম হইতেই রুদ্র মূর্ত্তিতে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইহার ফল হাতে হাতে ফলিল। সম্রাট তিব্বতস্থ অম্বানের উপর এক কড়া হুকুম প্রচার করিলেন যে, তিনি যেন ইংরাজকে চুম্বী উপত্যকা পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে কোন প্রকার বাধা দান না করেন।

এই আদেশ বাহির হইবার পর ভারতে সাজসজ্জা আরম্ভ হইল। পলিটিকেল বিভাগের মেজর ইয়ংহজব্যাণ্ড সাহেব (Major F. E. Younghusband) তিব্বত গমনের জন্য দূত নিযুক্ত হইলেন। সিকিমের রেসিডেণ্ট হোয়াইট সাহেব (Mr. T. C. White) তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হইলেন। উইলটন্ (Mr. E. C. Wilton) ও ক্যাপটেন ওকনর (Captain W. F. O' Connor) যথাক্রমে চীন ও তিব্বতীয় দ্বিভাষীর কার্য্যে নিয়োজিত হইলেন। এই চারিজন ইংরাজ কর্ম্মচারী দুই শত শিখ সৈন্য সঙ্গে লইয়া ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে দার্জ্জিলিং ত্যাগ করিলেন। সম্বাজং ভারত তিব্বত সীমান্ত হইতে প্রায় ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। কথা ছিল অম্বান ও কয়েকজন তিব্বতীয় কর্ম্মচারী ঐ স্থানে উপস্থিত থাকিয়া ইংরাজ-দূতের সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য থাকিবেন। কিন্তু ইয়ংহজব্যাণ্ড তথায় কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি ঐ স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। ভারত-গভর্ণমেণ্ট চীনগভর্ণমেণ্টের নিকট সম্বাজংএ ওখানের অনুপস্থিতির কথা লিখিয়া পাঠাইলে উত্তর আসিল যে, ইংরাজ-দূতের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যে অম্বান পিকিংএ নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি পথিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে আর একজন অম্বান্ নিযুক্ত হইয়াছেন। ইতিমধ্যে একজন তিব্বতীয় উচ্চ কর্ম্মচারী লাসা হইতে সম্বাজং অভিমুখে রওনা হইতে আদিষ্ট হইয়াছেন। এই সংবাদ আসিবার কয়েক সপ্তাহ পরে যখন উল্লিখিত উচ্চ তিব্বতীয় কর্ম্মচারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন প্রকাশ পাইল যে, তিনি একজন অতি নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী। এই ব্যাপারে ইংরাজ-দূত নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহার সহিত আবশ্যকীয় কথার পরামর্শ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন।

ইতিমধ্যে তিনি বিশ্বস্তসূত্রে জ্ঞাত হইলেন যে, অপর কোনও চীন বা তিব্বতীয় কর্ম্মচারী আসার পরিবর্ত্তে, তিন সহস্র তিব্বতীয় সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। তিনি এই সংবাদে চিন্তিত হইলেন বটে, কিন্তু ভীত হইলেন না। ঐ সৈন্য যথাসময়ে আসিয়া পঁহুছিল। উহার সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী ইংরাজ-দূতকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যদি অবিলম্বে সঘাজং ত্যাগ না করেন, তাহা হইলে বিশেষ বিপদে পড়িবেন।

ঠিক ঐ সময়ে ইংরাজ সংবাদ পাইলেন যে, রুসের জনৈক প্রধান সামরিক কর্ম্মচারী লাসায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, ও সর্দ্দার লামাকে ইচ্ছামত পথে চালিত করিতেছেন। তাঁহারই মন্ত্রণানুসারে ৩০০০ সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। এই সময়ে নেপালাধিরাজ সংবাদ পাঠাইলেন যে, সর্দ্দার লামা ইংরাজকে আক্রমণ করিবার জন্য তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। এই প্রকার বিবিধসূত্রে ইংরাজ স্পষ্ট বুঝিলেন যে, অবিলম্বে প্রতিবিধানের বন্দোবস্ত না করিলে ভার-রাজ্য একদিন দারজিলিং পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। তখন ভারত-রক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিতে হইবে, এবং হয়ত সহস্র সহস্র ব্যক্তি প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে। সুতরাং বিলাতের মন্ত্রিসভা স্থির করিলেন যে, তাঁহাদের দূত অবিলম্বে গিয়াংসি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবেন; ঐ দূতকে রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত সৈন্যদল তাঁহার সহিত প্রেরিত হইবে; চুম্বী উপত্যকা অধিকার করিতে হইবে, ও যতদিন পর্য্যন্ত না তিব্বত তাঁহাদের সহিত স্থায়ী বাণিজ্য-সন্ধি সংস্থাপন করিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা চুম্বী ত্যাগ করিবেন না।

তিব্বত-অভিযানের ইহাই প্রকৃত কারণ। নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, ইংরাজকে নিতান্ত বাধ্য হইয়াই ঐ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল।　　(ক্রমশ)

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

চার্ব্বাক বা লোকায়ত দর্শন

মানবের পূর্ব্বতন অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, স্বাভাবিকতা এবং সরলতাই তৎকালের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। মানব স্বভাব এবং সরলতার ক্রোড়ে পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া, অনির্ব্বচনীয় কবিত্বযুক্ত নব শিশুতে পরিণত হইল। সুকুমার বালক যেরূপ সুন্দর কারুকার্য্যসম্পন্ন কোন একটী বস্তু দেখিলে আহ্লাদ ও বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়ে, সেইরূপ মানব যখন মহতী প্রকৃতির নগ্ন, স্থির, গম্ভীর সৌন্দর্য্য অবলোকন করিল, তখন তাহার মনে স্বতঃ বিস্ময় ও আনন্দ আবির্ভূত হইয়া তাহাকে আত্মহারা করিল। হীরকখচিত নক্ষত্র-

সমাকীর্ণ সুনীল গগণ, অনন্ত জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্য, সৌদামিনীযুক্ত কাদম্বিনীমালা, বিস্তৃত কানন প্রভৃতি প্রকৃতির বিভিন্ন অবয়ব যখন তাহার নয়নপথে পতিত হইল, তখন কল্পনা-শক্তি তাহার মানস-রাজ্য অধিকার করিয়া তাহাতে এক নূতন সৃষ্টির আবির্ভাব করিল। মানব-সমাজ যখন প্রকৃতির ক্রোড়ে পালিত এবং শিক্ষিত হয় তখন কবিতাই তাহার ভাষা এবং জীবনও কবিত্বময় হইয়া উঠে; কিন্তু যখন মানব-সমাজ জ্ঞানালোক ও বিচারশক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন আর তাহাদের ভাষায় কবিতার মোহময় উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল দর্শনশাস্ত্রের দুরূহ তত্ত্বের আলোচনাই দৃষ্ট হয়। তাই সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় মানব মন কল্পনা-শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া প্রকৃতির বিভিন্ন অবয়বকে জড়পদার্থ জ্ঞান করিল না; অপিচ অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন দেবতা জ্ঞানে স্তুতিবাদ এবং পূজা করিল। সূর্য্য প্রচণ্ড উত্তাপময় ও জ্যোতিষ্মান্ বলিয়া "সবিতা" নামে পূজিত হইল। এইরূপ মেঘ ও বস্ত্র এবং অনন্ত জলধি ইহারা ইন্দ্র এবং বরুণ আখ্যায় আখ্যাত হইল। এইরূপে দেবতাজ্ঞানে জড় প্রকৃতির স্তুতিগান হইতেই বেদের সৃষ্টি হইল (সাম্ ও ঋক্ ইহাদের মধ্যে প্রধান)। বৈদিককালে স্বভাবের মহত্ব এবং সৌন্দর্য্য মানবের মন বিভোর করিয়াছিল, সুতরাং তৎকালীন মানব, জড়জগৎ এবং প্রাণীজগৎ মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা নির্দ্ধারণ করেন নাই বা করিবার প্রয়াস পান নাই। বিচারশক্তি তখন তাঁহার মনে স্থান পায় নাই, এইরূপে বহুকাল কাটিয়া গেল।

বৈদিকযুগের মানব বহুকাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াও যখন সম্পূর্ণরূপে সন্তোষ লাভ করিতে পারিল না, তখন তাহার মন নূতন বস্তুতে আকৃষ্ট হইল। পূর্ব্বে যেরূপ সন্দেহ বিরহিত হইয়া প্রকৃতিকে দেবতাজ্ঞানে স্তুতিবাদ এবং পূজা করিয়াছে, এখন আর তাহা করিতে ইচ্ছা হইল না; এখন প্রতি পদে সন্দেহ আসিয়া মানবকে তত্ত্বজিজ্ঞাসু করিয়া তুলিল —'অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কি কোন ঐশী শক্তি দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে? না ইহা আপ্নোভব? মানব কোন্ অজ্ঞাত স্থান হইতে ইহ জগতে আগমন করিয়াছে এবং তাহাকে কোন্ গন্তব্য স্থানেই বা যাইতে হইবে? কোন্ শক্তি বলেই বা মানব জীবিত থাকিয়া আহার, বিহার, চিন্তা প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে?'—এই সকল প্রশ্ন যখন মনোমধ্যে উদিত হইল, তখন যুক্তি-শক্তি তাঁহার যথাযথ কারণ নির্দ্ধারণের চেষ্টা পাইয়া জ্ঞানালোক দ্বারা মানব-হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিল এবং বিশ্বতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব ও ঐশীতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় দুর্জ্ঞেয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান জন্য দর্শন-শাস্ত্রের সৃষ্টি হইল। কপিল, পতঞ্জলি, কণাদ প্রভৃতি বিভিন্ন দর্শনকারগণ তাঁহাদের স্বকীয় বিভিন্ন যুক্তি দ্বারা বিশ্ব-তত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন। কণাদ প্রোদ্ভাবিত পরমাণুবাদ (atomic theory) দ্বারা বিশ্বসৃষ্টি নিরূপণ করিলেন।

যে পরমাণুবাদ আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে পরিপুষ্ট করিয়া রসায়নশাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা গ্রীসদেশীয় ডিমোক্রাইটাস্ কর্ত্তৃক প্রথম জগতে বিঘোষিত হয় নাই, উহা ভারতবর্ষীয় কণাদের চিন্তার ফল।* কপিল, সাংখ্যদর্শনে মানবতত্ত্ব এবং ব্রহ্মতত্ত্ব বিচারে ইন্দ্রিয় (senses) মন (mind) বুদ্ধি (intellect) আত্মা (ego) প্রভৃতি-বিষয় অত্যাশ্চর্য্য যুক্তিশক্তি দ্বারা বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন। পতঞ্জলি তাঁহার যোগদর্শনে ব্রহ্মের সত্তা স্থির করিয়াছেন।

এই সকল দর্শনশাস্ত্রের প্রাদুর্ভাবে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তৎকালে মানব জ্ঞানের অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, এবং সেই সময়ই ভারতের গৌরবের সময় ছিল।

যে সময় পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাদিগের যশোরশ্মিতে ভারতভূমি প্রতিভাত হইতেছিল, তাহার বহুকাল পূর্ব্বে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের অব্যবহিত পরেই আর এক মহাত্মার আবির্ভাব হয়; ইনি বৃহস্পতি নামে আখ্যাত হইয়া আজও পর্য্যন্ত সকলকার পূজার্হ হইয়া আসিতেছেন এবং ইনি যে নূতন দার্শনিক মত প্রবর্ত্তন করেন তাহাই আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব। ইনি জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্ত কাহারও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হইলে তাহাকে "বুদ্ধির বৃহস্পতি" বলা হয়। যদিও তাঁহার সময়ে জ্ঞানের ও যুক্তির সমধিক সমুন্নতি হইয়াছিল তথাপি বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিশেষ কোন বিপর্য্যয় ঘটে নাই; কি রাজচক্রবর্ত্তীর প্রাসাদে কি দরিদ্রের পর্ণ কুটীরে সর্ব্বত্রই বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপের ক্ষমতা প্রসারিত হইত। বৈদিক যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডের মূলে অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে যাজ্ঞিকগণ দেবতাগণের সন্তুষ্টি সম্পাদন ব্যতীত আরও কোন উচ্চ বিষয় আশা করিত, তাহা "পরলোকে সুখভোগ।"

বৃহস্পতি বেদোক্ত ক্রিয়াকাণ্ডের উপর এবং যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের উপর বিশেষ আক্রমণ করিলেন; ক্রিয়াকাণ্ড প্রভৃতি সমস্তই বৃথা কার্য্য ও ব্রাহ্মণগণের ধূর্ত্ততার পরিচায়ক, ক্রিয়ার দ্বারা পরলোকে সুখাশা করা নির্ব্বোধের কর্ম্ম। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের একস্থানে লিখিত আছে, বৃহস্পতি গায়ত্রী দেবীর মস্তকে আঘাত করেন, তাহাতে তাঁহার মস্তক ছিন্ন ভিন্ন হয়; কিন্তু গায়ত্রী অমরী; তাঁহার মস্তিষ্কের প্রত্যেক বিন্দুতে বষট্‌কারের উৎপত্তি হইল। এই উপাখ্যান পাঠে স্পষ্ট বোধ হয় বৃহস্পতি বৈদিকধর্ম্ম বিনাশে বিধিমতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। মাধবাচার্য্য "সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে" বৃহস্পতির যে কয়টি মত উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন তদৃষ্টে বোধ হয় যে তাঁহার মতে প্রত্যক্ষ দর্শন এবং যুক্তিই দুজ্ঞেয় দার্শনিক মত প্রমাণিত করিবার একমাত্র প্রশস্ত উপায়; কল্পনা-শক্তি দার্শনিক মত প্রমাণ করিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এবং বৈদিক ক্রিয়াকলাপে এই প্রত্যক্ষদর্শনের প্রমাণাভাব আছে

* Maxmuller ও ভারতীয় কণাদের প্রাচীনত্ব তাঁহার "Six Systems of Indian philosophy" নামক গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন।

বলিয়াই তিনি বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডকে আক্রমণ করিয়া বলিয়াছেন—

"ন স্বর্গো নাপবর্গো বা
নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং
ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ॥"

"স্বর্গও নাই, অপবর্গও নাই, পরলোকে আত্মাও থাকে না, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম প্রভৃতিরও ক্রিয়া ফলদায়ক হয় না।" এই প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর বৃহস্পতির সমস্ত মত নির্ভর করে; এবং ইহাই বার্হস্পত্য দর্শনের ভিত্তিস্বরূপ। এবং এই প্রত্যক্ষ দর্শন প্রমাণ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের স্তম্ভস্বরূপ। যদি কোন ব্যক্তি বলেন হীরক আর কিছুই নহে কেবল অঙ্গার, সকলেই তাহাকে উন্মাদ বলিয়া বিদ্রূপ করিবে; কিন্তু সে ব্যক্তি যদি এক খণ্ড হীরককে গোলাকার বদ্ধ কাচপাত্রে রাখিয়া আতসী কাচের সাহায্যে দগ্ধ করিয়া ফেলে তাহা হইলে দগ্ধাবশিষ্ট ভস্ম, এবং অপর এক খণ্ড অঙ্গার পরীক্ষায় এক পদার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে; এবং কাচপাত্র মধ্যে কেবল অঙ্গারের অঙ্গারিকায় (carboinc acid gas) যাহা সচরাচর একখণ্ড অঙ্গারকে দগ্ধ করিলে পাওয়া যায় তাহা ভিন্ন অপর কোন পদার্থই অনুভূত হইবে না। * এ স্থলে যখন ঐ ব্যক্তি প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন যে হীরক ও অঙ্গার একই বস্তু, তখন ইহা অস্বীকার করিবার আর উপায় রহিল না। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণ আনুমানিক প্রমাণাপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। জন ষ্টুয়ার্ট মিল, কম্‌টে, প্রভৃতি ইউরোপীয় আধুনিক দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী। সংক্ষেপে আমরা বৃহস্পতির দার্শনিক মতের বিষয় দুই চারিটি কথা বলিলাম। তাঁহার নামানুযায়ী তৎপ্রবর্ত্তিত দর্শনকে বার্হস্পত্য দর্শন কহে এবং ইহা যে অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে ঠিক কোন্ সময় ইহার প্রবর্ত্তন কাল তাহা নির্ণয় করা অতি দুরূহ ব্যাপার। বার্হস্পত্য দর্শন এবং চার্ব্বাক-প্রকটিত দর্শন সম্বন্ধে কোন পৃথক গ্রন্থ পাওয়া যায় না, কেবল মাধবাচার্য্যকৃত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে বৃহস্পতির কতকগুলি মত পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশ অষ্টাদশ অধ্যায়ে এবং রামায়ণে রামচন্দ্রের বনগমন কালীন জাবালি কর্ত্তৃক উপদেশ হইতে বার্হস্পত্য দর্শনের অনেক মত পাওয়া যায়; সুতরাং পৌরাণিক কালের পূর্ব্বে এবং বৈদিক কালের অনেক বৎসর পরে বৃহস্পতির আবির্ভাবের সময় বলিয়া বোধ হয়। বার্হস্পত্য দর্শনের মধ্যে আমরা দুইটী বিষয় দেখিতে পাই, যথা (১) প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা পরীক্ষিত সকল বিষয়ই সত্য এবং তাহা স্বীকার্য্য, আর যাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণাভাব তাহা সমস্ত অসত্য এবং অস্বীকার্য্য। সুতরাং স্বর্গ, নরক, পরলোক, পরলোকগত আত্মা এই সকল বিষয়ের মূলে কোন সত্য নাই। (২) ইহজন্মের সুখই মানবের চরম উদ্দেশ্য এবং ইহার জন্য মানবের সচেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য, কারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদ মতে যখন ইহজন্মই মানবের সর্ব্বস্ব, পরজন্ম নাই তখন—

* Lavosier's experiment.

"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ,
ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।"

বৃহস্পতি ও চার্ব্বাক উভয়ে স্বতন্ত্র ব্যক্তি কি না তাহার বিশেষ প্রমাণ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না. স্বতন্ত্র হইলেও মতামত উভয়েরই এক, সুতরাং তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত দর্শনশাস্ত্র উভয়েরই নামানুযায়ী হইয়াছে। চার্ব্বাক বার্হস্পত্য, নাস্তিক এবং লোকায়ত প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়াছে। য়ুরোপখণ্ডের কি জাতীয় ইতিহাস, কি দার্শনিক ইতিহাস যাহাই অনুসন্ধান করা যাক না কেন তাহাতে শৃঙ্খলাবদ্ধ ঘটনাবলী প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাস কিম্বা দার্শনিক ইতিহাস অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে সমস্ত বিষয় অন্ধকার বলিয়া বোধ হয়, তবে যাহা কিছু নির্ণীত হয় তাহা অনেক স্থলেই কষ্ট-কল্পনাপ্রসূত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বৃহস্পতির নাম দেখিতে পাওয়া যায় এবং সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে বৃহস্পতির যে সকল দার্শনিক মত দেখিতে পাওয়া যায়. সেই সকল মত রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে পাওয়া যায়, এই সর্ব্বদর্শন এবং পুরাণাদির মধ্যে চার্ব্বাক নাম দেখিতে পাওয়া যায় না; যদি চার্ব্বাক এবং বৃহস্পতি একই ব্যক্তি হইতেন, তাহা হইলে সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে অন্ততঃ দুই এক স্থলেও চার্ব্বাকের নাম থাকিত; কিন্তু সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের শ্লোকগুলি বৃহস্পতির উক্তি বলিয়া লিখিত আছে। ইহা দ্বারা বৃহস্পতি এবং চার্ব্বাক যে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং পূর্ব্বোক্তের আবির্ভাবের সময় যে শেষোক্তের আবির্ভাব হয় নাই তাহা প্রমাণিত হইতে পারে।

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে রামায়ণ বিষ্ণুপুরাণের পূর্ব্বে বৃহস্পতির আবির্ভাব হইয়াছিল এবং চার্ব্বাক ও বৃহস্পতি উভয়ে পৃথক ব্যক্তি ও ভিন্ন সময় তাঁহাদের অভ্যুদয় কাল; কিন্তু চার্ব্বাকের আবির্ভাব বৃহস্পতির অনেক কাল পরে হইয়াছিল; মহাভারত-বর্ণিত কুরুক্ষেত্র এবং যুধিষ্ঠিরাদির রাজত্ব, রামায়ণ বর্ণিত ঘটনার অনেক শতাব্দী পরে ঘটিয়াছিল অর্থাৎ রামায়ণ ও বিষ্ণুপুরাণ মহাভারত অপেক্ষা অনেক প্রাচীন ইহা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। মহাভারতের শান্তি পর্ব্বে এক স্থানে লিখিত আছে যে চার্ব্বাক রাক্ষস দুর্য্যোধনের দূত স্বরূপ ব্রাহ্মণগণ শোভিত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সভায় আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে ভ্রাতৃদ্রোহী, কপট প্রভৃতি নানারূপ কুবাক্য প্রয়োগ করেন, তাহাতে ব্রাহ্মণগণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া ভৎর্সনা করতঃ হুঙ্কার ত্যাগ করেন, সেই হুঙ্কারে চার্ব্বাক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া বাতাহত বৃক্ষের ন্যায় পতিত হয়। মহাভারতের এই ঘটনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে পাণ্ডব ও কৌরববংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকালেই চার্ব্বাকের আবির্ভাব হয়। এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, নাস্তিকশিরোমণি চার্ব্বাক যদি এই চার্ব্বাকই হন তাহা হইলে বেদব্যাস ইহাকে রাক্ষস বলিয়াছেন কেন? তাহার উত্তর সম্ভবত এই যে নিশাচরগণ যেরূপ মুনিঋষিগণকে আক্রমণ করতঃ তাঁহাদের যাগযজ্ঞের বিশেষ বিঘ্ন ঘটাইত, সেইরূপ চার্ব্বাক বৃহস্পতির

দার্শনিক মত দ্বারা পদে পদে সামাজিক ব্রাহ্মণগণকে আক্রমণ করতঃ তাঁহাদের ক্রিয়াকাণ্ডের বিশেষ বিঘ্ন ঘটাইয়াছিলেন, এই জন্যই সম্ভবত তিনি রাক্ষস নামে অভিহিত হইয়া থাকিবেন।

আর্য্যগণ যখন এসিয়ার মধ্যভাগ হইতে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা প্রথমতঃ হিমালয় প্রদেশে বাস করিতেন। স্বাস্থ্যকর প্রদেশে বাস করিয়া এবং সর্ব্বদা আদিম অধিবাসীদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া শারীরিক উৎকর্ষ এবং ধৈর্য্য, মানসিক সহিষ্ণুতা প্রভৃতি বলের বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে জাতিবিভাগ এবং সামাজিক বন্ধনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম হয় নাই, সকলেই নিজ "স্বাধীন ইচ্ছার" ব্যবহার করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতেন, বিশেষত ইঁহারা দিন দিন দস্যুদিগকে জয় করিয়া নূতন নূতন প্রদেশ অধিকার করতঃ পার্থিব সুখ বর্দ্ধনার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারা হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে গ্রীষ্ম অনুগাঙ্গ প্রদেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা সুখের পরিবর্ত্তে শান্তির প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। মধ্য এসিয়া হইতে আসিয়া হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে বাসকালীন জাতিবিভাগ আর্য্যগণের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই। কিন্তু যখন তাঁহারা অধিবাসিগণকে জয় করতঃ জয়পতাকা সুদূর পূর্ব্বাঞ্চলে উড্ডীন করিয়া অনুগাঙ্গ প্রদেশে বাস করিতেছিলেন তখন তাঁহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি জাতিবিভাগের সূত্রপাত হয়। সুতরাং জাতিবিভাগ, সামাজিক নিয়ম প্রভৃতির কঠোরতায় স্বাধীন ইচ্ছা বলবতী থাকিলেও তাঁহারা স্বেচ্ছানুসারে সুখান্বেষণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। বৈদিক সময়ে যখন আর্য্যগণ হিমালয় প্রদেশে বাস করিতেন, তখন তাঁহারা সুন্দরী কামিনী, বহুসংখ্যক পুত্র, রাজ্য, ধন প্রভৃতি পাইয়া সংসারের সুখকে পরম সুখ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু অনুগাঙ্গ প্রদেশে বাসকালীন, সংসার তাঁহাদের নিকট সুখের আধার বলিয়া মনে হইল না; সংসারের স্তরে স্তরে দুঃখের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি দেখা দিতে লাগিল। কি প্রকারে দুঃখের করাল গ্রাস হইতে মুক্তি লাভ করিয়া চিরশান্তির শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, ইহাই চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল; এই প্রশ্নের উত্তর অনেক শতাব্দী পরে বুদ্ধদেব প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহুকাল পূর্ব্বে দর্শনকারগণও এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছিলেন। কপিল সাংসারিক দুঃখে মর্ম্মাহত হইয়া বলিয়াছেন "দুঃখের কারণ জন্ম, জন্মের কারণ কর্ম্ম, কর্ম্মের কারণ প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তির কারণ অজ্ঞানতা।" আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে কিরূপে জ্ঞান এবং দর্শনশাস্ত্রের বিকাশ হইয়াছিল; দার্শনিক সময়ে যখন জ্ঞানের বিমল ছটা অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিতেছিল, তখন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ প্রবৃত্তিকে শাসনে রাখিয়া সাংসারিক সুখ তুচ্ছ করতঃ মোক্ষমার্গের পথিক হইতেছিলেন। এতদ্দেশীয় অপরাপর দর্শনকারেরা দুঃখমিশ্রিত সংসারের সুখ

চাহেন না, তাঁহারা যে মোক্ষ প্রার্থনা করেন তাহাতে সুখ দুঃখ কিছুই নাই, সংসারের বন্ধন বিমোচন, প্রবৃত্তি দ্বেষের নির্ব্বাণ, আন্তরিক স্থৈর্য্য ইহাই তাঁহাদের কামনা। এই সময় সাংসারিক দুঃখ লোকের এতই ভার বোধ হইয়াছিল যে, তাহার প্রতীকারের নিমিত্ত সকলেই বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলেন। যখন তাঁহারা দেখিলেন মোক্ষমার্গই সাংসারিক দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিবার একমাত্র উপায় এবং মোক্ষলাভ করিতে হইলে সংসার-বন্ধনের বিমোচন আবশ্যক, তখন তাঁহারা পিতামাতা স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি সকলকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কালাকাল ভেদ না করিয়া সন্ন্যাস-আশ্রম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে যখন অধিকাংশ লোক গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিতেছিলেন তখন সমাজ মধ্যে মহাবিপ্লব হইবার উপক্রম হইল। যে দেশের লোক পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণের প্রতি, সমাজের প্রতি এবং স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে বিরত হইয়া নিজ নিজ স্বার্থের জন্য সমস্ত ত্যাগ করতঃ অরণ্যে বাস করে, সে দেশের বিপদ যে অনিবার্য্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রকৃতির নিয়ম এই যে, আঘাত করিলেই তাহার প্রতিঘাত আছে। এই প্রাকৃতিক নিয়ম কি ধর্ম্ম, কি রাজনীতি, কি সমাজ-নীতি সকল বিষয়েই সমভাবে প্রকটিত হইয়া থাকে। য়ুরোপখণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন মধ্যবিত্ত প্রজাগণ, রাজন্যবর্গ এবং জমিদারগণ কর্ত্তৃক অত্যাচার-পীড়িত এবং নানা রূপে নিগৃহীত হইতেছিলেন এবং সমাজে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল তখন সমাজের সুশৃঙ্খলার জন্য এবং পদদলিত প্রজাবৃন্দের পরিত্রাণের জন্য নেপোলিয়ন্ বোনাপার্ট নামক এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। রোম-রাজ্যের অধঃপতনের সময় যখন সামাজিক এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, এবং ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য, ও ধর্ম্মের মহান্ ভাব সমস্ত বিস্মৃত হইয়া লোকে কেবল কতকগুলি আড়ম্বরযুক্ত অশ্লীল পদ্ধতিকে ধর্ম্ম বলিয়া অনুসরণ করিত, সেই সময় ধর্ম্ম ও সমাজসংস্থাপন জন্য মহাত্মা ঈশার আবির্ভাব হইয়াছিল। এই প্রাকৃতিক নিয়ম শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দ্বারা বুঝাইয়াছেন—

"ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"।

যে সময় অধিকাংশ লোক সংসারের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া মোক্ষমার্গের পথিক হইতেছিলেন, সেই সময়ে সর্ব্ববিদ্যায় ও সর্ব্বদর্শনে পারদর্শী, কুশাগ্রবুদ্ধি পণ্ডিতপ্রবর চার্ব্বাক কর্ম্মক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। তিনি দেখিলেন সকলেই সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিতেছে এবং দার্শনিক মোক্ষবাদ সকলকে উক্ত পথের পথিক হইতে উৎসাহিত করিতেছে। কি উপায় অবলম্বন করিলে সংসারবৈরাগ্য-স্রোতের হ্রাস করিতে পারিবেন তাহার উপায় নির্দ্ধারণে বিশেষ উদ্যোগী হইলেন। কারণ তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সমাজের সকল ব্যক্তিই যদি কালাকাল ভেদ না করিয়া অরণ্যে বাস করেন তাহা হইলে শীঘ্রই সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিধ্বস্ত করিবে। এই জন্যই তিনি দার্শনিক-

দিগের মোক্ষবাদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া তৎকালীন লোকদিগের মানসিক ভাব পরিবর্ত্তন করিতে সচেষ্ট হইলেন।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে বৃহস্পতি দুইটী প্রধান মত লইয়া বার্হস্পত্য দর্শন প্রবর্ত্তিত করেন, (১) প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধান্ত সকল বিষয় সত্য এবং যাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব অর্থাৎ কেবল অনুমানসিদ্ধান্ত তাহা অসত্য; (২) পার্থিব সুখই সুখ। এক্ষণে চার্ব্বাক বৃহস্পতির দার্শনিক মতগুলি ও অন্য দর্শনকারের মত একত্রে সংমিলিত করিয়া স্বকীয় যুক্তি বলে এক অভিনব দার্শনিক মত প্রচার করিলেন; ইহাই চার্ব্বাক, নাস্তিক, বার্হস্পত্য বা লোকায়ত দর্শন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বৃহস্পতির সমুদয় দার্শনিক মত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে অনেকে বৃহস্পতির শিষ্য বলিয়া থাকেন।

জ্যামিতি, বীজগণিত প্রভৃতি বিদ্যায় যেরূপ কতকগুলি স্বীকার্য্য বস্তু (postulate) আছে, সেইরূপ বিশ্বতত্ত্ব এবং মানবতত্ত্ব নিরূপণের জন্য চার্ব্বাক চারিটী স্বীকার্য্য বস্তুর উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ। এই গুলি তেজ কর্ত্তৃক পরস্পর সম্মিলিত ও সংশ্লিষ্ট হইয়া একটী নূতন পদার্থে পরিণত হইয়াছে, ইহাই বিশ্ব। এই বিশ্বসম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক মত চার্ব্বাক কণাদের পরমাণুতত্ত্ব (atomic theory) হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

এই বিশ্বোদ্ভব সম্বন্ধে দুই প্রকার মত দার্শনিকদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ক্ষিতি, অপ্, মরুৎ প্রভৃতি তেজের সংশ্লিষ্টে উদ্ভূত হইলেও ইহার মূল কারণ স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (২) ক্ষিতি, অপ্, মরুৎ হইতে বিশ্বের উৎপত্তি, ব্রহ্ম প্রভৃতি কোন অতীন্দ্রিয় বস্তুকে মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। চার্ব্বাক প্রথমোক্ত মতটী অনুমানমূলক এবং দ্বিতীয়টী প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত, এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ ইহার মতে সত্যনির্দ্ধারণের মুখ্য উপায়। এক্ষণে দেখা যাউক প্রথমোক্ত মতটী অনুমানমূলক হইলেও কেন পরিত্যক্ত হইল; এবং দ্বিতীয়টী বা কেন গৃহীত হইল।

*অনুমান

ব্যাপ্তিজ্ঞান

প্রত্যক্ষ

বাহ্য আন্তর

অনুমান ব্যাপ্তিজ্ঞান সাপেক্ষ। ব্যাপ্তি বলিতে আমরা এই বুঝি যে অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই তিন কালকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকা। কিন্তু এই ব্যাপ্তিজ্ঞান কিরূপে হইতে পারে? যদি প্রত্যক্ষ দ্বারা হয় তবে কোন প্রকার প্রত্যক্ষ, বাহ্য না আন্তর? চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত কোন পদার্থের সন্নিকর্ষ ঘটিলে তাহার বাহ্য প্রত্যক্ষ হয়, সুতরাং এরূপ প্রত্যক্ষ, বর্ত্তমানে সম্ভব হইলেও ভূত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অসম্ভব, সুতরাং প্রত্যক্ষ দ্বারা ব্যাপ্তি-জ্ঞান প্রমাণিত হইল না। আন্তর প্রত্যক্ষ—

* See Maxmuller's "Six Systems of Indian Philosophy"—Kanad's and Gautama's System.

সুখ দুঃখ প্রভৃতি আন্তরিক অবস্থায় অতিরিক্ত বিষয়ের জ্ঞান নিমিত্ত মন বহিরিন্দ্রিয় সাপেক্ষ; সুতরাং বাহ্য প্রত্যক্ষ দ্বারা ব্যাপ্তি-জ্ঞান হইবার যে আপত্তি, মানস প্রত্যক্ষ দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞানেও সেই আপত্তি। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আদি কারণ ব্রহ্ম ইহা অনুমানমূলক; সুতরাং ইহার ব্যাপ্তিজ্ঞান থাকা আবশ্যক। কিন্তু ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমাদের কোনরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান নাই, কারণ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত ব্রহ্ম পদার্থের সন্নিকর্ষ ঘটে না অর্থাৎ বাহ্য প্রত্যক্ষ হয় না; এইরূপ মানস প্রত্যক্ষ দ্বারাও ব্রহ্ম নিরূপণ করা যাইতে পারে না। দ্বিতীয় মতটী প্রথমোক্তের ন্যায় অনুমানমূলীয় নহে। যখন আমরা ধূমে অগ্নির ব্যাপ্তি উল্লেখ করি তখন আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে বহ্নি ও ধূম ত্রিকালের সহচর; যখন আমরা জন্মগ্রহণ করি নাই তখন বহ্নি ধূমের সহচর ছিল, এখনও আছে, আবার আমাদের মৃত্যুর পরও থাকিবে। এইরূপ বিশ্বে ক্ষিত্যপতেজ-মরুতের ব্যাপ্তিজ্ঞান আছে, এবং এই ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রত্যক্ষ বাহ্যজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত। কারণ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষে এই প্রত্যক্ষ বাহ্যজ্ঞান হয়; ক্ষিত্যপতেজ মরুৎ সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ বাহ্যজ্ঞান আছে। এই দৃশ্যমান জগতে আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইহা উপলব্ধি করিয়া থাকি, এই উপলব্ধি বর্ত্তমানেও যেরূপ করি, ভূত ও ভবিষ্যতেও সেইরূপ করিতে সমর্থ। সুতরাং ক্ষিত্যপ্-তেজ-মরুৎ বিশ্বোদ্ভবের আংশিক কারণ বলিয়া নির্দ্ধারণ করাতে চার্ব্বাক প্রকৃত অনুমানমূলক দোষে পতিত হন নাই। বিশ্বের আদিকারণ ব্রহ্ম এই মত বিচারানুমোদিত, না ক্ষিত্যপ্তেজ-মরুৎই বিশ্বোদ্ভবের কারণ ইহাই সত্য, আমরা এ স্থলে তাহার বিচার করি নাই। কেবল আমরা এই দেখাইতেছি যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানানুসারে ব্রহ্ম বিশ্বের আদিকারণ হইতে পারে না, ক্ষিত্যপ্তেজমরুৎই ইহার মূল কারণ।

এই বিশ্বোদ্ভব সম্বন্ধে গ্রীসদেশীয় এপিকিউরাস্‌ও চার্ব্বাকের ন্যায় কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন. তিনি বলেন পরমাণু সমুদয় শূন্যমার্গে এবং স্বকীয় বেগ প্রভাবে পরিভ্রমণ করিতে করিতে পরস্পরের সহিত সংমিলিত হইয়াছিল এবং এই সম্মিলনে বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে, এই বিশ্বের মধ্যেই গ্রহ উপগ্রহ চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী প্রভৃতি সমস্তই রহিল, আবার এই পৃথিবীর মধ্যে বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী মানব প্রভৃতি সমস্তই ক্ষিতি, অপ, মরুৎ, ইহাতে তেজের সংস্পৃষ্টে উৎপাদিত হইয়াছে। মানব অন্যান্য পশু পক্ষী প্রভৃতি জীব হইতে জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পৃথক এবং ঐ সকল জীবাপেক্ষা উন্নত। এই জ্ঞান এবং বুদ্ধি মানব মধ্যে স্বাভাবিকরূপে নিহিত রহিয়াছে। এইরূপে মানব ইহলোকে জ্ঞান ও বুদ্ধি দ্বারা সুখে কালাতিপাত করিতে পারে; ইহলোকই মনুষ্যের সুখদুঃখের আবাসভূমি, সুতরাং ইহলোকে যাহাতে মনুষ্য সুখ-স্বচ্ছন্দে থাকিতে সমর্থ হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। পরলোক বা পরজন্ম চার্ব্বাকের মতে কিছুই নাই, কারণ

ইহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বহির্ভূত এবং সম্পূর্ণ অনুমানমূলক; সুতরাং ইহজন্মের সুখের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিবে, এবং পরলোকের জন্য কোনরূপ চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই; "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" ইহাই চার্ব্বাকের মূলমন্ত্র এবং "ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ" ইহা পরজন্ম অস্বীকার-জ্ঞাপক।

অনেকে বলেন জগৎ সুখ দুঃখে পরিপূর্ণ এবং সুখের অপেক্ষা দুঃখের ভাগই অধিক; সুতরাং এ জগতে প্রকৃত সুখ লাভ করা অসম্ভব। চার্ব্বাক এই মতের বিরুদ্ধে বলেন যেমন শস্য এবং কণ্টক থাকিলেও মৎস্যের আস্বাদ-সুখে কেহ বিরত হয় না, চন্দ্রে কলঙ্ক থাকা সত্ত্বেও চাতক সুধাপানে ক্ষান্ত থাকে না, সেইরূপ এ জগতে দুঃখ আছে বলিয়া, সুখান্বেষণে বিরত হওয়া নির্ব্বোধের কর্ম্ম। যেরূপ অন্ধকার আছে বলিয়াই আলোকের আদর, বিরহ আছে বলিয়া সম্মিলনে আনন্দ, সেইরূপ দুঃখ আছে বলিয়াই সুখ আমাদের আরামপ্রদ। চার্ব্বাকের "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" ইহার অর্থ আমরা এই বুঝি যে, সুখই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য; কিন্তু দেখা উচিত সুখ বলিতে, চার্ব্বাক কি প্রকার সুখ বলিতেছেন। পশুরা যাহাতে সুখ অনুভব করে মানবের পক্ষে সে সুখ প্রকৃত সুখ নহে, কারণ পশু অপেক্ষা মানব জ্ঞান ও বিচার-শক্তি দ্বারা উন্নত। সুতরাং জ্ঞানানুমোদিত সুখই প্রকৃত সুখ। সুখ দুঃখ লইয়া এপিকিউরাস্ অনেক কথা বলিয়াছেন, তিনিও চার্ব্বাকের ন্যায় সুখকে একমাত্র মঙ্গলস্বরূপ বলেন এবং এই সুখ উপভোগ করিতে হইলে বিবেককে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করা উচিত। এপিকিউরাসের মতে 'যে সুখ জীবনের উদ্দেশ্য', তাহা কামাসক্ত লম্পটদিগের সুখ নহে, কিন্তু যাতনা-বিরহিত শারীরিক সুখ এবং উদ্বেগশূন্য আত্মার প্রসাদই প্রকৃত সুখ।* তিনি বলেন কামনা তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) প্রকৃতিগত এবং আবশ্যকীয়, যথা আহার এবং পানের ইচ্ছা। (২) প্রকৃতিগত এবং অনাবশ্যকীয়, যথা কোন সুন্দর পরিচ্ছদাদির জন্য আকাঙ্ক্ষা। (৩) প্রকৃতিগত নহে এবং আবশ্যকীয়ও নহে, যেমন আজকাল আমাদের দেশের ধনবান্ লোকদিগের টাকা দিয়া পদবীক্রয় করার অভিলাষ। কামনা চরিতার্থ না হইলে দুঃখ উপস্থিত হয়; সুতরাং দুঃখ হইতে

* Epicurus declares :—"When we say pleasure is the end of life, we do not mean the pleasures of the debauchee or the sensualist as some from ignorable or from malignity represent, but freedom of the body from pain and of the soul from anxiety. For it is not continuous drinkings and revellings, nor the society of women, nor fare viands and other luxuries of the table that constitute a pleasant life but sober contemplation, such as searchs out the grounds of choice and avoidance and banishes those chimeras that harass the mind.—Bain's *Mental and Moral Science* Part II Page 52.

পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে প্রকৃতিগত এবং আবশ্যকীয় ব্যতীত সমস্ত কামনার হ্রাস করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কেবল কামনা চরিতার্থ না হইলে দুঃখ হয়, তাহা নহে, অধিচ মৃত্যু এবং পরজন্মে নরকাদি যন্ত্রণাজনিত দুঃখ মানবকে অভিভূত করে। আরিস্টটল্ বলিয়াছেন বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে সুখও বিভিন্ন। মনুষ্যের পক্ষে ইন্দ্রিয়জাত সুখ প্রকৃত সুখ নহে। প্রজ্ঞাজাত সুখই মানবের প্রকৃত সুখ, প্রজ্ঞা-নিয়ন্ত্রিত কার্য্য - (rational action) হইতে যে সুখোৎপত্তি হয় সেই প্রকৃত সুখ।

যেরূপ সুরা-উৎপাদক দ্রব্যচয় সমবেত হইলে তাহাদের মাদকতা শক্তি জন্মে, সেইরূপ ক্ষিত্যপতেজ-মরুৎ এই চারি ভূতের সংযোগে চৈতন্য উৎপন্ন হয়।* সুতরাং মৃত্যুকালে যখন চারিভূতের বিয়োগ ঘটিবে তখন চৈতন্যও বিলুপ্ত হইবে। দেহাতিরিক্ত আত্মা কোন স্থানেই প্রত্যক্ষ করা যায় না, যেখানে চৈতন্য লক্ষিত হয় সেখানেই তাহা দেহান্তর্গত, অতএব দেহের বিনাশে তাহার অবস্থিতি অসম্ভব। যখন আমরা বলি আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি পীড়িত, তখন দেহ এবং আত্মাকে বিভিন্ন জ্ঞান করা যাইতেছে না।† কিন্তু ইহাও আমরা বলিয়া থাকি, আমার হস্ত, আমার চক্ষু, আমার দেহ; তখন আত্মা এবং হস্ত, চক্ষু ও দেহ বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু বাস্তবিক এই গুলি ঔপচারিক প্রয়োগ। যেরূপ রাহুর মস্তক এবং রাহু অভিন্ন, কথার কৌশলে ভিন্ন বলিয়া বোধ হইলেও, আমার দেহ এবং আমি সেইরূপ অভিন্ন।

দেহাতিরিক্ত আত্মার প্রমাণ নাই, চার্ব্বাক মতাবলম্বীদিগের এই বাক্যের প্রতিবাদ করিতে বিজ্ঞানও অসমর্থ। যে সকল প্রাকৃতিক তত্ত্ব এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হইয়াছে তাহা বরং লোকায়তবাদের অনুকূল। বহুব্যাপী পর্য্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে জীব-দেহের স্নায়ুমণ্ডলের তারতম্যানুসারে মানসিক শক্তির তারতম্য ঘটে। মেষের এবং মনুষ্যের মস্তিষ্কের তারতম্য দেখিলেই উহাদের বুদ্ধির তারতম্য বুঝিতে পারা যায়। চৈতন্যসমন্বিত মানসিক ব্যাপার সমুদয় স্নায়ুমণ্ডলের উপর বিশেষত মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে, ইহা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। অতএব যখন দেহের কল ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং স্নায়ুমণ্ডল তদীয় উপাদাননিচয়ে পরিণত হইবে, তখন চৈতন্যও বিলুপ্ত হইবে, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস।

আজকাল আমেরিকা ও য়ুরোপের মধ্যে অনেকেই প্রেততত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন এবং তাঁহাদের দলও দিন দিন পরিপুষ্ট হইতেছে, যদি তাঁহারা সিদ্ধকাম হন তাহা হইলে দেহাতিরিক্ত আত্মার

---

* অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্ধানলানিলাঃ
চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে।
কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ।
সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে লোকায়ত বচনম্।

† অহং স্থূলকৃশোঽস্মীতি সামানাধিকরণ্যতঃ।
দেহস্যৈতাদৃশী সোঽয়ং ন ত্বং ন চ পরঃ।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইবে। আত্মা সম্বন্ধে চার্ব্বাক ও এপিকিউরাসের একই বিশ্বাস, তিনিও দেহান্তর্গত আত্মা ব্যতীত দেহাতিরিক্ত আত্মায় বিশ্বাস করিতেন না। মৃত্যু তাঁহার মতে চৈতন্যের বিলোপ, সুতরাং মৃত্যুকে ভয় করা যুক্তিসঙ্গত নহে। এপিকিউরাসের মতে জীবাত্মা "শক্তিসম্পন্ন মরুৎ" এবং ইহা সমস্ত দেহে প্রবাহিত হইয়া বিশেষত ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ বক্ষ মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া দেহকে চালিত করিতেছে।*

ঈশ্বরের সত্তা প্রমাণ করিতে অধিকাংশ দার্শনিক অনুমানের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু চার্ব্বাক অনুমানমূলীয় কোন বিষয় সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাহা আমরা পূর্ব্বে বিশদরূপে দেখাইয়াছি; সুতরাং তিনি ঈশ্বরের সত্তা সম্বন্ধেও বিশ্বাস করেন না, এই জন্য তিনি নাস্তিক বলিয়া পরিচিত।

চার্ব্বাক এবং ঐ মতাবলম্বী দর্শনকারগণের মতসমূহ মানব-সমাজের অনেক উপকার সাধন করিয়াছে। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, ইহলোক দুঃখময় নহে এবং সুখ পরিত্যাজ্য নহে। তাঁহারা শিখাইয়াছেন শাস্ত্র অপেক্ষা যুক্তিই প্রধান। তাঁহারা অনুমানের মূল পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া, নৈয়ায়িকদিগকে উক্ত মূলের প্রকৃত বলাবল বুঝিতে ও তাহা দৃঢ় করিতে সমর্থ করিয়াছেন। এবং প্রত্যক্ষ দর্শন, প্রমাণ ও যুক্তিবল দ্বারা বিজ্ঞানের তত্ত্ব নিরূপণের দিকে মানব মনকে নিয়োজিত করিয়াছেন।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দে।

বৌদ্ধধর্ম্মের দেবমণ্ডলী

G. De Lafont-র ফরাসী হইতে)

বৌদ্ধধর্ম্মের সূত্রগ্রন্থে ও অন্যান্য বৌদ্ধশাস্ত্রীয় গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, বুদ্ধদেব অসংখ্য স্বর্গীয় বোধিসত্ত্বদিগের সমভিব্যাহারে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। আরও দেখা যায়, দেবতারা স্ব স্ব স্থান ত্যাগ করিয়া বুদ্ধের সৎ-ধর্ম্ম শুনিবার জন্য আগমন করিয়াছেন। এইরূপ তাহার হেতু নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে:—হিন্দুদেবদেবীর পদমর্য্যাদার সোপান-পরম্পরা রক্ষা করিয়া, বৌদ্ধধর্ম্ম উহার সহিত একটা নূতন পর্য্যায় যোগ করিয়া দিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম চিত্তশুদ্ধিকে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছে। গ্রীক্ দেবমণ্ডলীর ন্যায় হিন্দু-দেবদেবীর চিত্ত বিষয়-তৃষ্ণায় পূর্ণ। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দু-দেবমণ্ডলীকে সোপানের শিখরদেশে

* Epicurus, who did not believe in the continued existence of the soul separate from the body, declared that there could never be any rational ground for fearing death, since it was simply a permanent extinction of consciousness. Bain's "*Mental and Moral Science.*"

Soul according to Epicurus, was a subtle but energetic compound of air, vapour, heat and another nameless ingredient; with its best parts concentrated in the chest, yet pervading and sustaining the whole body.—*Ibid*, part. II, p. 529.

স্থাপন করিতে অসমর্থ; শিখরদেশে স্থাপিত হইয়াছে—স্বর্গীয় দেবাত্মাগণ, ধ্যানের দেবতা, পবিত্রতার দেবতা, আলোকের দেবতা, পুণ্যের দেবতা ও বিজ্ঞানের দেবতা —এই পঞ্চ দেবতা ইহারা স্বর্গীয় বুদ্ধ।

Bournouf ও Hodgsonএর মতানুসারে এই পদ্ধতিটি এইরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে:—বৌদ্ধমতানুসারে, এক শ্রেণীর সিদ্ধপুরুষ মানববংশোদ্ভূত। তাঁহারা আত্মশক্তির প্রভাবে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। আর এক শ্রেণীর সিদ্ধপুরুষ আছেন তাঁহাদের উৎপত্তি ও প্রকৃতি নিরবচ্ছিন্ন অমূর্ত্ত ও আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর সিদ্ধপুরুষেরাই স্বর্গীয় বুদ্ধ। প্রথমোক্ত সিদ্ধপুরুষ—যাঁহারা 'মানুষি-বুদ্ধ' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন—তাঁহারা সংখ্যায় ৭ জন। এই সপ্ত বুদ্ধের মধ্যে শেষ বুদ্ধ শাক্যসিংহ। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে ৬জন বুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। শেষোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর বুদ্ধ অজাতবুদ্ধ বা ধ্যানীবুদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কেন এই নাম হইল তাহার হেতু নির্দ্দেশ করিতেছি। সর্ব্বোপরি আদিবুদ্ধের সিংহাসন। এই বুদ্ধ অনাদি, স্বয়ম্ভু, অসীম ও সর্ব্বজ্ঞ। তিনি ধ্যানশক্তির পঞ্চ চেষ্টার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ স্বর্গীয় বুদ্ধকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই প্রত্যেক সৃষ্ট বুদ্ধ, জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে স্বকীয় সত্তার মূলীভূত হেতুস্বরূপ ধ্যান ও বিজ্ঞান এই যুগল শক্তি প্রাপ্ত হন; এবং প্রত্যেক সৃষ্ট বুদ্ধ এই ধ্যান ও বিজ্ঞানশক্তির সাহায্যেই এক একটি স্বর্গীয় বোধিসত্ত্বকে উৎপাদন করে।

এইরূপে, বুদ্ধ ও স্বর্গীয় বোধিসত্ত্বগণ, অমূর্ত্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আদিবুদ্ধের ধ্যান হইতে প্রসূত।

এই বোধিসত্ত্বগণই জগতের প্রকৃত স্রষ্টা। এবং তাঁহাদের সৃষ্টি নশ্বর বলিয়া প্রত্যেক জাগতিক ধ্বংস বা প্রলয়ের পর, এই সপ্ত বোধিসত্ত্বের অন্যতম কর্ত্তৃক নূতন জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। বৌদ্ধদিগের মতে, সৃষ্টির তিন কল্প অতীত হইয়া গিয়াছে, আমরা এক্ষণে চতুর্থ কল্পে পড়িয়াছি; এই চতুর্থ কল্পে জগৎস্রষ্টা পদ্মপাণি। এই হেতু, তিব্বতবাসী ও নেপালীয়া পদ্মপাণিকে পরম ও অদ্বিতীয় দেবতা বলিয়া বিবেচনা করে। তিব্বতে এই দেবতা অবলোকিতেশ্বর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে ঈশ্বর অবলোকিত—কিনা—ধ্যানের বিষয়ীভূত।

এই পদ্ধতিটি ঐশ্বরিক সম্প্রদায়ের পদ্ধতি। স্বাভাবিক-সম্প্রদায়ও এই পদ্ধতিটি গ্রহণ করিয়াছে; কেবল, উহারা ইহার আধিভৌতিক ব্যাখ্যা দিয়া থাকে। আদিবুদ্ধের স্থানে উহারা স্বভাবকে স্থাপন করিয়াছে। স্বভাবের উপাধিগুলি ঈশ্বরের উপাধিরই অনুরূপ। এবং পঞ্চ ভূত, পঞ্চ ভৌতিক গুণ, পঞ্চ ইন্দ্রিয় পঞ্চবুদ্ধের অনুরূপ; অর্থাৎ উহারা ইন্দ্রিয়বিষয়ীভূত জগতের স্বাভাবিক ঘটনা সকলের বিশুদ্ধ সাক্ষাৎ মূর্ত্তি।

Bournoufএর মতে, এই দুই মতবাদ পরিবর্দ্ধিত-সূত্রগ্রন্থেরই মতবাদ; কেননা, সরল সূত্রগুলির মধ্যে উহাদের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু Hodgson বলেন, দিব্য-অবদান-গ্রন্থে তিনি আদিবুদ্ধের আভাস

পাইয়াছেন। আর একটি মতবাদের কথা যাগা বুর্ণুফ বিবৃত করিয়াছেন এবং যাহা Schmidtও স্বীকার করেন, তাহা এই খানে বুর্ণুফের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছিঃ —"প্রত্যেক বুদ্ধের তিনটি বিভিন্ন প্রকৃতি। এই এক একটি প্রকৃতি অনুসারে এক একটি জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। প্রথম প্রকৃতি কেবল প্রথম-জগতেই অর্থাৎ শূন্য-জগতে অধিষ্ঠিত। ইহা সূক্ষ্মাবস্থার (abstraction), প্রকৃতি, পূর্ণ (absolute) অবস্থার প্রকৃতি, স্বরূপাবস্থার প্রকৃতি। ইহাই নির্ব্বাণ-অবস্থাপন্ন বুদ্ধ। শক্তি ও সিদ্ধির মধ্যে অবস্থিত যে বুদ্ধ সেই বুদ্ধের অভিব্যক্তিই দ্বিতীয় প্রকৃতি। ইহাই ধ্যানী বুদ্ধ। মানবরূপের যে অভিব্যক্তি তাহাই তৃতীয় প্রকৃতি। তৃতীয় জগতে এই প্রকৃতির আবির্ভাব। ইহাই মানুষি বুদ্ধ। এই প্রকারে, বুদ্ধ একই সময়ে তিন জগতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, কেননা স্বরূপত বুদ্ধ অসীম।"

ফলতঃ শাক্যসিংহ ব্রাহ্মণিক দেব-মণ্ডলীকেই গ্রহণ করিয়াছেন, কেবল এই দেবমণ্ডলী তাঁহার শাসনাধীনে অবস্থিত। অবদানশতকে এইরূপ উক্ত হইয়াছে :— "যখন ভগবান বুদ্ধগণের চিত্তে কোন জাগতিক কল্পনার উদয় হয়, তখনই শাক্য, ব্রহ্ম ও অন্যান্য দেবগণ সেই চিন্তার কথা অবগত হয়েন।" আর একস্থলে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—যখন "মার" কোন বৌদ্ধ ভিক্ষুর ধর্ম্মকে জয় করিতে পারিল না তখন সে ব্রহ্মার সাহায্য প্রার্থনা করিল; ব্রহ্মা উত্তর করিলেন;—"ইহা নিঃসন্দেহ, আমার শক্তি অসীম, কিন্তু উহা তথাগতের কোন পুত্রের সমতুল্য নহে।" তা ছাড়া দেখা যায়, বুদ্ধদেব ধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠানের উপরে নৈতিক কর্ত্তব্যসমূহকে স্থাপন করিয়াছেন। সমস্ত ভারতে এই বিশ্বাসটি প্রবল যে, অসামান্য সাধুতা অলৌকিক শক্তিরই নিত্য সহচর। এই সূত্রেই, শাক্যসিংহ দেব-গণ হইতেও উচ্চ বলিয়া সাধারণে গৃহীত হয়। তাই আমরা দেখিতে পাই তিব্বত ও চীন প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধগণ কিয়ৎপরিমাণে দেবপূজার পদ্ধতি রক্ষা করিয়াছে। কেননা তাহাদের মতে, কেবল বৌদ্ধধর্ম্মকে রক্ষা করাই দেবতাদিগের কাজ।

A. Remusat এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে সমস্ত প্রাচ্যখণ্ডের পণ্ডিতমণ্ডলী ও শাক্যমুনির সম্প্রদায়সমূহ—যাঁহারা ইতর সাধারণের উর্দ্ধে আপনাদিগকে উন্নীত করিয়াছেন এবং যাঁহারা পৌরাণিক কাহিনীর অবগুণ্ঠন ভেদ করিয়াছেন, তাঁহারা এই বুদ্ধকে সকলের আদিতত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মতে, এই জগৎ ও মানব বুদ্ধগণ ঐ সর্ব্বাদিম মূলতত্ত্ব হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। কিন্তু Schmidt ও Csoma de Coros এই মতবাদকে খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, শাক্যপূজা অপেক্ষা আদিবুদ্ধের পূজা আরও আধুনিক।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হারবার্ট স্পেন্সারের মতে, অজ্ঞাত প্রতিক্রিয়া * সকল সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় এবং পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করায় তাহা হইতেই ক্রমে বুদ্ধিবৃত্তির প্রথমাবির্ভাব হইয়াছে, এবং অনেক সরল সহজ বৃত্তি ক্রমে ক্রমে অজ্ঞাত প্রতিক্রিয়ায় পরিণত হইয়াছে।†

উভয়ের প্রভেদ প্রায় লোপ হইয়াছে, যেমন নবজাত প্রাণী আপনা হইতে স্তন্যপান করে;—কিন্তু অপেক্ষাকৃত জটিল সহজবৃত্তি সকল বোধ হয় বুদ্ধিবৃত্তি হইতে উৎপন্ন হয় নাই, উহা হইতে পৃথকভাবে জাত হইয়াছে। যাহা হউক আমি ইহা অস্বীকার করিতে ইচ্ছা করি না যে, সহজবৃত্তি-মূলক কর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট ও শিক্ষা ব্যতীত নিষ্পন্ন হইবার ভাব ক্রমে অপনীত হইতে পারে এবং ইচ্ছামূলক কর্ম্ম তাহার স্থানে অধিকার করিতে পারে। পক্ষান্তরে যে সকল কর্ম্ম বুদ্ধিপূর্ব্বক করা হয় তাহার মধ্যে কতিপয় কর্ম্ম বংশানুক্রমে দীর্ঘকাল করিবার পর সহজ বৃত্তিমূলক কর্ম্মের ন্যায় হইয়া যাইতে পারে; এবং তখন ঐরূপে উহা বংশানুগতও হইতে পারে। সমুদ্রমধ্যস্থিত দ্বীপ-ভূমিতে যে সকল পক্ষী বাস করে তাহারা মানুষ দেখিলেই উড়িয়া যায়, ইহাই উপরোক্ত কথার একটি দৃষ্টান্ত স্থল। এইরূপ অবস্থায় এ সকল কর্ম্মকে মূলতঃ নিষ্কৃষ্ট হইয়া গিয়াছে বলা যাইতে পারে, কারণ উহা আর বুদ্ধিপূর্ব্বক অথবা ভূয়োদর্শন অনুসারে নিষ্পন্ন হয় না। কিন্তু জটিল সহজাত বৃত্তি সকলের অধিকাংশই বোধ হয় সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে। সরল সহজাত বৃত্তি সকল নানাভাবে পরিবর্ত্তিত হইলে তাহাদের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবশতঃ ঐ জটিল বৃত্তিগুলি জাত হইয়া থাকিবে। দেহের নানাস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তন অথবা ব্যক্তিগত প্রভেদ যেরূপ কারণবশতঃ হইয়া থাকে তদ্রূপ অজ্ঞাত কারণে মস্তিষ্ক পদার্থের উপর ক্রিয়া করতঃ বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত সরল সহজাত বৃত্তি সকলের পরিবর্ত্তন উৎপন্ন করে। আমরা ঐ সকল পরিবর্ত্তনের কারণ অজ্ঞাত থাকায় আপনা হইতেই পরিবর্ত্তন জাত হইল এইরূপ বলিয়া থাকি। কর্ম্মী পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকা অপত্য প্রসব করে না, সুতরাং উহাদিগের ভূয়োদর্শনের ফল অথবা অভ্যাসের পরিবর্ত্তন বংশানুগত হওয়ার উপায় নাই; এ অবস্থায় উহাদিগের অত্যাশ্চর্য্য সহজবৃত্তিগুলির বিষয় বিবেচনা করিলে আমার মনে হয় যে জটিল সহজাত বৃত্তি সকলের উৎপত্তি সম্বন্ধে উপরি লিখিত সিদ্ধান্ত ব্যতীত অন্য কোনও রূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না।

কর্ম্মী পিপীলিকা মধুমক্ষিকা এবং বিবর-(Beaver) দিগের আচরণ দৃষ্টে বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি এবং জটিল সহজাত বৃত্তি যুগপৎ বিস্ত-

* কোন কারণ উপস্থিত হইলে দেহীর অজ্ঞাতে দেহ যে প্রতিক্রিয়া নিষ্পন্ন করে; যেমন চক্ষের নিকটে আলো আনিলে চক্ষের তারা কুঞ্চিত হয়।

† এই মত এখন স্বীকৃত হয় না, বরং অজ্ঞাত প্রতিক্রিয়া হইতেই সহজবৃত্তি ক্রমে বিবর্ত্তিত হইয়াছে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

মান থাকা যদিও অসম্ভব বোধ হয় না, এবং যদিও কতিপয় কর্ম্ম যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা করিলেও অভ্যাসবশতঃ অজ্ঞাত প্রতিক্রিয়ার ন্যায় নিশ্চিত ও ত্বরিতভাবে করা যাইতে পারে, তথাপি স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের সহিত সহজাত বৃত্তির কিয়ৎ পরিমাণ বিরোধী ভাব থাকা অসম্ভব বোধ হয় না. কারণ সহজাত বৃত্তি মস্তিষ্ক পদার্থের বংশগত পরিবর্ত্তনের ফল। মস্তিষ্কের ক্রিয়া সম্বন্ধে অল্পই জানা আছে, কিন্তু আমরা ইহা বুঝিতে পারি যে বুদ্ধিবৃত্তির অত্যন্ত বিকাশ হইলে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ সকল অবশ্যই পরস্পরের সহিত অত্যন্ত জটিল অথচ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সংযুক্ত হইয়া যাইবে; তাহার ফলে মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যেকটী অংশ বোধ হয় স্ব স্ব পৃথক অনুভূতির অথবা ভাবের কর্ম্ম নির্দ্দিষ্টরূপে এবং বংশানুক্রমে নিষ্পন্ন করিতে কম সক্ষম হইবে; ইহারই নাম সহজবৃত্তি কম হওয়া। উপরন্তু বুদ্ধির হীনতা এবং নির্দ্দিষ্ট অভ্যাস গঠিত করিবার প্রবল চেষ্টার সহিত যেন একটা সম্বন্ধ থাকা বোধ হয়, যদিও তদ্রূপ স্থলে অভ্যাস বংশগত হয় না। একজন সূক্ষ্মদর্শী চিকিৎসক আমাকে বলিয়াছিলেন, যে সকল লোক একটু বেশী অবোধ, প্রায় জড়বৎ, তাহারা সকল কার্য্যই নির্দ্দিষ্ট নিয়ম বাঁধামত অথবা অভ্যাসবশতঃ করিতে চাহে এবং তাহাদিগকে ঐরূপ করিতে দিলে সুখী হয়।

আমি এই অবস্থার কথা উপস্থিত করা সঙ্গত বোধ করিয়াছি, কারণ উচ্চশ্রেণীস্থ জন্তুর এবং মানবের অতীত কর্ম্মজনিত স্মৃতি উহাদিগের ভবিষ্যৎ দর্শন, বুদ্ধি এবং কল্পনার উপর যেরূপ ফল উৎপন্ন করে, তাহার সহিত নিম্নশ্রেণীস্থ জন্তুর সহজবৃত্তি-মূলক ঠিক তদ্রূপ কর্ম্ম তুলনা করিলে মানবের মনোবৃত্তিকে আমরা সহজেই প্রকৃত অবস্থা হইতে ন্যূন বিবেচনা করিতে পারি। নিম্ন জীবগণের ঐরূপ কর্ম্ম করিবার যোগ্যতা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বশতঃ মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন হেতু ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক পর পর বংশে ঐ সকল জীবের জ্ঞানপূর্ব্বক বুদ্ধি পরিচালন করিতে হয় নাই। মিষ্টার ওয়ালেস দেখাইয়াছেন যে মানুষ বুদ্ধিপূর্ব্বক যে সকল কর্ম্ম করে বলিয়া বোধ হয় তাহার অনেক ভাগ প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধিপূর্ব্বক নহে, অনুকরণবশতঃ হইয়া থাকে;—এ কথা সত্য। কিন্তু মানুষের যে কর্ম্মে এবং নিম্নজীবগণের অনেক কর্ম্মের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ এই যে মানুষ অনুকরণ বৃত্তিদ্বারা প্রথম উদ্যমেই পাথরের কুড়ালি কিম্বা এক কাঠের ডিঙ্গা প্রস্তুত করিতে পারে না, তাহাকে অভ্যাস করিয়া শিখিতে হয়। কিন্তু বিবর বাঁধ দিতে কিম্বা জোলা কাটিতে এবং পক্ষী তাহার বাসা উত্তমরূপে অথবা প্রায় উত্তমরূপে নির্ম্মাণ করিতে এবং উর্ণনাভ তাহার অত্যাশ্চর্য্য জাল অতি উত্তমরূপে নির্ম্মাণ করিতে প্রথম চেষ্টাতেও যেরূপ সক্ষম হয়,বয়স হইলে এবং বহুদর্শিতা লাভ করিলে পরেও তদ্রূপই সক্ষম হয়।

বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, মানবের ন্যায় ইতর জন্তুগণও সুখ, দুঃখ, আনন্দ ও ক্লেশ অনুভব করে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। উহাদিগের শিশুগণ,

যথা কুকুরের ছানা, বিড়ালের বাচ্চা, ছাগলের ছানা প্রভৃতি মানবশিশুর ন্যায়ই পরস্পরের সহিত ক্রীড়াকৌতুকে আনন্দ অনুভব করে; এমন আর কিছুতেই করে না। পিপীলিকারাও খেলা করে; উৎকৃষ্ট পরিদর্শক পি, হিউবার ইহার বর্ণনা করিয়াছেন; তিনি দেখিয়াছেন, উহারা কুকুরের ন্যায় পরস্পরের পিছে পিছে দৌড়াদৌড়ি করে এবং কামড়াকামড়ি করে কিন্তু ব্যথা দেয় না।

আমরাও যেমন নানাবিধ ভাব কর্ত্তৃক উত্তেজিত ও বিচলিত হই, ইতর জীবগণও যে তাহাই হয়, এ কথা এত উত্তম প্রমাণিত হইয়াছে যে এ সম্বন্ধে বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা পাঠকের ক্লান্তি জন্মাইতে ইচ্ছা করি না। ভয়ে আমাদিগেরও যেরূপ অবস্থা হয় উহাদিগেরও তদ্রূপই,—পেশিগুলি কম্পিত হয়, হৃৎপিণ্ড ধক্ ধক্ করে, রক্তবেষ্টনী ঝিল্লিগুলি অবসন্ন হয়, এবং চুল খাড়া হয়। ভয় হইতে সন্দেহ জন্মে, উহা অধিকাংশ বন্য জন্তুর গুরুতর বিশেষত্ব। হস্তী ধরিতে যে সকল হস্তিনী নিযুক্ত করা হয় তাহাদিগের ব্যবহার সার ই টেনেণ্ট সাহেব যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে নিশ্চয়ই ধারণা হয় যে হস্তীনীরা ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রতারণা করে, এবং তাহারা যে প্রতারণা করিতেছে ইহা বিলক্ষণ বুঝে। আমাদিগের কুকুরগুলির আচরণ দেখিলে স্পষ্টই জানা যায় যে এক জাতীয় জন্তুর মধ্যে সাহস অথবা ভীরুতা সকলের সমান নহে। কোন কোন কুকুর এবং ঘোড়ার বদ্‌মেজাজী এবং একটুতেই বিরক্ত হয়; অপরগুলির স্বভাব ভাল। এই সকল ঘোষগুণ নিশ্চয়ই বংশানুগত। সকলেই জানেন ইতর জন্তুগণ কেমন ভয়ঙ্কর ক্রোধী, এবং কেমন স্পষ্টভাবে ক্রোধ প্রকাশ করে। অনেক দিন পরেও বহু ইতর জন্তু কৌশলে প্রতিহিংসা সাধন করে, ইহার অনেক (সম্ভবতঃ সত্য) গল্প প্রকাশিত হইয়াছে রেঞ্জার ও ব্রেম সাহেব বলেন আবেসিনিয়ার এবং আফ্রিকার যে সকল বানর তাঁহারা পুষিয়াছিলেন তাহারা প্রতিহিংসা করিত। প্রাণীতত্ত্ববিৎ সার অ্যাল্‌ফ্রেড রিণ্ডের সত্যপরায়ণতা অনেকেই জ্ঞাত ছিলেন; তিনি নিম্নলিখিত গল্পটী আমাকে বলিয়াছেন, ঐ ঘটনা তিনি স্বয়ং দেখিয়াছেন। উত্তমাশা অন্তরীপে এক উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারী একটী বানরকে অনেক সময় উৎপাত করিত; ঐ কর্ম্মচারী এক রবিবারে সৈন্যদিগের কাওয়াজ উপলক্ষে যাইতেছে দেখিয়া ঐ বানর একটী গর্ত্তমধ্যে কিছু জল ফেলিল এবং শীঘ্র একটু কাদা প্রস্তুত করিয়া ঐ কর্ম্মচারীর গায়ে ফেলিয়া দিল, তাহাতে দর্শকগণ সকলেই কৌতুক অনুভব করিয়াছিল। তৎপরে অনেক দিন ঐ বানর আনন্দিত ও বিজয়ী হওয়ার মত দেখাইত।

কুকুর প্রভুকে ভালবাসে, ইহা সকলেই জানেন। একজন প্রাচীন লেখক একটু ব্যঙ্গভাবেই বলিয়াছেন যে, "কেবল কুকুরই নিজের অপেক্ষা তোমাকে বেশি ভাল বাসে"।

মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যেও কুকুর তাহার প্রভুকে ভাল বাসা দেখায়। একটী কুকুরের দেহচ্ছেদ করিয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করা

কালে সে অস্ত্রকারীর হস্ত লেহন করিয়াছিল। মানবের জ্ঞানোন্নতি বিধান করতঃ ঐরূপ অস্ত্র ব্যবহার যদি সার্থক না হইয়া থাকে, অথবা ঐ ব্যক্তি যদি পাষাণ-হৃদয় না হয়, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অনুতাপ ভোগ করিয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীশশধর রায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি*

বিষবৃক্ষ

(১)

প্রয়োজন।

হাটুরিয়া নৌকা হটর হটর করিয়া যাইতেছে—আপনার প্রয়োজনে। খেয়া নৌকা গজেন্দ্রগমনে যাইতেছে— পরের প্রয়োজনে। বোঝাই নৌকা যাইতেছে না—তাহাদের প্রভুর প্রয়োজন মাত্র।

মাষ্টার বাবু।

এক্ষণে গ্রাণ্ট ইন এডের প্রভাবে গ্রামে গ্রামে তেড়িকাটা, টন্সাবাজ, নিরীহ ভালমানুষ মাষ্টার বাবুরা বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু তৎকালে সচরাচর "মাষ্টার বাবু" দেখা যাইত না।

আমাদের বক্তৃতা।

সমাজে তারাচরণ বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা এবং পৌত্তলিক-বিদ্বেষাদি সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া প্রতি সপ্তাহে পাঠ করিতেন .....মুখে সর্ব্বদা বলিতেন, "তোমরা ইট-পাটখেলের পূজা ছাড়, খুড়ী জেঠাইয়ের বিবাহ দাও, মেয়েদের লেখা পড়া শিখাও, তাহাদের পিঁজরায় পুরিয়া রাখ কেন? মেয়েদের বাহির কর।" স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এতটা লিবরালিটির একটা বিশেষ কারণ ছিল, তাঁহার নিজের গৃহ স্ত্রীলোকশূন্য।

সংসার।

কোথাও বা ভাণ্ডার মধ্যে দাসী, পাচিকা এবং ভাণ্ডারের রক্ষাকারিণী এই তিন জনের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত। ভাণ্ডার-কর্ত্রী তর্ক করিতেছেন যে, যে ঘৃত দিয়াছি, তাহাই ন্যায্য-খরচ—পাচিকা তর্ক করিতেছে যে, ন্যায্য খরচে কুলাইবে কি প্রকারে?

বিধবা-বিবাহ।

আর একটা হাসির কথা। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি

---

*। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-সম্রাট। তাঁহার গ্রন্থগুলি অমূল্য—পড়িলে তৃপ্তি হয় না, যত পড়ি ততই সুন্দর—যতবার পড়ি ততবারই নূতন। দেশে সমালোচকের অভাব নাই—বঙ্কিমচন্দ্রেরও অনেক সমালোচনা হইয়াছে—ভারতবর্ষের বিচারশালায় পর্য্যন্ত তাঁহার সমালোচনা হইতেছে—শুনিতেছি! তবে বন্ধুবর বঙ্গদর্শনসম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে আজ আবার বঙ্কিম-সূক্ত সংগ্রহ করিতেছি কেন? কবির সৃষ্টিকে বুঝিবার জন্য—নহে কবিকেই জানিবার জন্য। য়ুরোপীয় মনীষিদিগকে এইরূপে বুঝিবার একটা প্রথা প্রচলিত আছে বলিয়া জানি। এ পথ অনায়াসসাধ্য এবং অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণও বটে—কিন্তু অবলম্বনের অযোগ্য নহে।

বিধবা-বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে ?

বঙ্গলক্ষ্মী।

তুমি (সূর্য্যমুখী) পাগল হইয়াছ। নচেৎ তুমি স্বামীর হৃদয় প্রতি অবিশ্বাসিনী হইবে কেন ? স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাওই না। আর যদি নিতান্তই সে বিশ্বাস না রাখিতে পার—তবে দীঘির জলে ডুবিয়া মর।

চাটুকার।

সম্মুখে ভোক্তার ভোজন-পাত্রের নিকট উপবিষ্ট গৃহমার্জ্জারের মত একজন চাটুকার প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় নাক বাড়াইয়া বসিলেন।

বাঙ্গালীর সুখ।

সূর্য্যমুখী মনে মনে বলিতেছিলেন, "আমার সর্ব্বস্বধন! তোমার (নগেন্দ্রের) পায়ের কাঁটাটি তুলিবার জন্য প্রাণ দিতে পারি। তুমি পাপ সূর্য্যমুখীর জন্য দেশত্যাগী হইবে ? তুমি বড়, না আমি বড় ?"

মনুষ্যের দৌর্ব্বল্য।

প্রভাত-বায়ুর মন্দ-হিল্লোলে পুষ্প-ভারাবনত ক্ষুদ্র শাখা দুলিতেছে—পুষ্পহীন শাখা সকল দুলিতেছে না, কেননা, তাহারা নম্র নহে।

পুরুষের দুই বিবাহ।

তুমি বলিবে দুই বিবাহ নীতি-বিরুদ্ধ কাজ। তাই, কিসে জানিলে, ইহা নীতি-বিরুদ্ধ কাজ ? তুমি এ কথা ইংরেজের কাছে শিখিয়াছ, নচেৎ ভারতবর্ষে এ কথা ছিল না। কিন্তু ইংরেজেরা কি অভ্রান্ত ? য়িহুদীর বিধি আছে বলিয়া ইংরেজদের এ সংস্কার; কিন্তু তুমি আমি য়িহুদীবিধি ঈশ্বরবাক্য বলিয়া মানি না। তবে কি-হেতুতে এক পুরুষের দুই বিবাহ নীতি-বিরুদ্ধ বলিব ?

সীতার দেষ।

কমল। তুমি স্বামীর আজিকার আহ্লাদপূর্ণ মুখ দেখিয়া সুখী—তথাপি বলিতেছ, এ জ্বালায় মন পোড়ে কেন ? দুই কথাই কি সত্য ?

সূর্য্য। দুই কথাই সত্য। আমি তাঁর সুখে সুখী কিন্তু আমায় যে তিনি পায়ে ঠেলিলেন, আমার পায়ে ঠেলিয়াছেন বলিয়াই তাঁর এত আহ্লাদ !

কমল। তোমায় পায়ে ঠেলেছেন বলে, তোমার অন্তর্দাহ হতেছে। তবে কেন বল আমি কে ? তোমার অন্তঃকরণের আধখানা আজও আমিতে ভরা, নহিলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াও অনুতাপ করিবে কেন ?

দুঃখী।

দুঃখী না হইলে লোভে পড়িতে হয় না। যাহার যাহাতে অভাব, তাহার তাহাতেই লোভ।

সুখ ও দুঃখ।

অবিচ্ছিন্ন সুখ দুঃখের মূল; পূর্ব্বগামী দুঃখ ব্যতীত স্থায়ী সুখ জন্মে না।

সম্পূর্ণ সুখ।

প্রদোষে নগেন্দ্র শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, কুন্দনন্দিনী শিয়রে বসিয়া ব্যজন করিতেছেন। উভয়ে নীরবে আছেন। এটি সুলক্ষণ নহে; আর কেহ নাই—অথচ দুই জনেই নীরব-সম্পূর্ণ সুখ থাকিলে এরূপ ঘটে না।

ভালবাসা।

মনের অনেকগুলি ভাব আছে, তাহার সকলকেই লোকে ভালবাসা বলে। কিন্তু চিত্তের যে অবস্থায় অন্যের সুখের জন্য আমরা আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে স্বতঃ প্রস্তুত হই, তাহাকে প্রকৃত ভালবাসা বলা যায়। "স্বতঃ প্রস্তুত হই" অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞানে বা পুণ্যাকাঙ্ক্ষায় নহে।

মদন-শরর।

যে বৃত্তির কল্পিত অবতার বসন্ত সহায় হইয়া মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে গিয়াছিলেন...সে এই রূপজ মোহমাত্র। এ বৃত্তিও জগদীশ্বর-প্রেরিতা! ইহা দ্বারাও সংসারের ইষ্টসাধন হইয়া থাকে, এবং ইহা সর্ব্বজীবমুগ্ধকরী...ইহা প্রণয় নহে।

যথার্থ প্রণয়।

প্রেম বুদ্ধিবৃত্তি-মূলক। প্রণয়াস্পদ ব্যক্তির গুণসকল যখন বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পরিগৃহীত হয়, হৃদয় সেই সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি সমাকৃষ্ট এবং সঞ্চালিত হয়, তখন সেই গুণাধারের সংসর্গলিপ্সা এবং তৎপ্রতি ভক্তি জন্মে। ইহার ফল সহৃদয়তা এবং পরিণামে আত্মবিস্মৃতি-আত্ম বিসর্জ্জন। এই যথার্থ প্রণয়—ইহা রূপে জন্মেনা। প্রথমে বুদ্ধি দ্বারা গুণ গ্রহণ, গুণ গ্রহণের পর আসঙ্গ-লিপ্সা; আসঙ্গ-লিপ্সা সফল হইলে সংসর্গ, সংসর্গফলে প্রণয়, প্রণয়ে আত্ম বিসর্জ্জন, আমি ইহাকেই ভালবাসা বলি

রূপ, মোহ ও প্রণয়।

রূপ দর্শনজনিত যে সকল চিত্তবিকৃতি, তাহার তীক্ষ্ণতা পৌনঃপুন্যে হ্রাস হয়। অর্থাৎ পৌনঃপুন্যে পরিতৃপ্তি জন্মে। গুণজনিতের পরিতৃপ্তি নাই। কেননা, রূপ এক—প্রত্যহই তাহার একপ্রকার বিকাশ, নিত্য নূতন নূতন ক্রিয়ার নূতন হইয়া প্রকাশ পায়। গুণজনিত প্রণয় চিরস্থায় বটে—কিন্তু গুণ চিনিতে দিন লাগে। এই জন্য সে প্রণয় একেবারে হঠাৎ বলবান হয় না—ক্রমে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু রূপজ মোহ এককালীন সম্পূর্ণ বলবান হইবে।

ভালবাসার অবধি।

ভালবাসায় কখন অযত্ন করিবে না। কেননা ভালবাসাতেই মানুষের একমাত্র নির্ম্মল এবং অবিনশ্বর সুখ। ভালবাসাই মনুষ্যজাতির উন্নতির শেষ উপায় মনুষ্য মাত্রে পরস্পরে ভালবাসিলে আর মনুষ্যকৃত অনিষ্ট পৃথিবীতে থাকিবে না।

পথ।

যে সংসারত্যাগী, তাহার অন্ধকার-আলো, কুপথ-সুপথ সব সমান।

পরপ্রেমের শক্তি।

যাহারা পরোপকারী, পরপ্রেমে বলবান্, তাহারা কখনও শারীরিক বলের অভাব জানিতে পারে না।

আত্মহত্যা।

...দুঃখ যতই হউক না কেন, আত্মহত্যা মহাপাপ। কদাচ আত্মহত্যা করিও না। আত্মহত্যা নরহত্যা তুল্য পাপ।

বঙ্গনারী।

আমি চিরকাল স্বামীর চরণ ভিন্ন কিছুই জানি না—ইহাতে যদি পুণ্য থাকে, তবে সে পুণ্যের ফলে আমি স্বর্গ চাহি না; কেবল এই চাই, যেন মৃত্যুকালে স্বামীর মুখ দেখিয়া মরি।

পাপের দণ্ড।

লোকে বলে, ইহলোকে পাপের দণ্ড দেখা যায় না। ইহা সত্য হউক বা না হউক—তুমি দেখিবে না যে, চিত্তসংযমে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তি ইহলোকে বিষবৃক্ষের ফল ভোগ করিল না।

আশা।

যতদিন মানুষের আশা থাকে, ততদিন কিছুই ফুরায় না, আশা ফুরাইলে সব ফুরাইবে!

আদর্শ পত্নী।

সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী।...সংসারে সহায়, গৃহে লক্ষ্মী, হৃদয়ে ধর্ম্ম, কণ্ঠে অলঙ্কার। নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্ব্বস্ব!...প্রমোদে হর্ষ, বিষাদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি—কার্য্যে উৎসাহ।..দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ।...বর্ত্তমানের সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা, পরলোকের পুণ্য।

দুঃখের প্রায়শ্চিত্ত।

পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হয়, দুঃখের ত প্রায়শ্চিত্ত কেবল মৃত্যু।

যে শোকে রোদন নাই, সে যমের দণ্ড।

সপত্নী-প্রেম।

(সূর্য্যমুখীর মৃত্যু-সংবাদ) শুনিয়া কুন্দ কাঁদিল...কুন্দ বড় নির্ব্বোধ। সতীন মরিলে যে হাসিতে হয়, সেটা তার মোটা বুদ্ধিতে আসে নাই। বোকা মেয়ে সতীনের জন্যও একটু কাঁদিল। আর, তুমি ঠাকুরাণি! তোমার সতীন মরিলে তুমি যদি একটু কাঁদ, তা হইলে আমি তোমার উপর খুসী হইব।

ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম চির-কষ্টে রক্ষিত হয়, কিন্তু এক দিনের অসাবধানতায় বিনষ্ট হয়।

(২)

কপালকুণ্ডলা

তীর্থদর্শন।

যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাক, তবে তীর্থ-দর্শনে যেরূপ পরকালের কার্য্য হয় বাটি বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।

মাতৃ-হিংসা।

...সকলেই মৃত্যু নিকট নিশ্চিত করিলেন। পুরুষেরা নিঃশব্দে দুর্গানাম জপ করিতে লাগিল, স্ত্রীলোকেরা সুর তুলিয়া বিবিধ শব্দবিন্যাসে কাঁদিতে লাগিল। একটি স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়াছিল, ছেলে জলে দিয়া আর তুলিতে পারে নাই—সে-ই কেবল কাঁদিল না।

স্বভাব।

আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জ্জন করা যাহাদের প্রকৃতি, তাহারা চিরকাল আত্মোপকারীকে বনবাস দিবে—কিন্তু যতবার বনবাসিত করুক না কেন, পরের কাষ্ঠাহরণ যাহার স্বভাব, সে পুনর্ব্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে, তুমি অধম —তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?

দুঃখে নিদ্রা।

যখন শারীরিক ও মানসিক ক্লেশের অবসাদে চিন্তা উপস্থিত হয়, তখন কখনও নিদ্রা আসিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হয়। ...বোধ হয়, যদি এরূপ নিয়ম না থাকিত, তবে সাংসারিক ক্লেশের অপ্রতিহত বেগ মানুষ সকল সময়ে সহ্য করিতে পারিত না।

স্পর্শমণি।

বিচিত্র হৃদয় যন্ত্রের তন্ত্রীচয় সময়ে সময়ে এমন লয়হীন হইয়া থাকে যে, যত যত্ন করা যায় কিছুতেই পরস্পর মিলিত হয় না, কিন্তু একটি শব্দে, একটি রমণীকণ্ঠসম্ভূত স্বরে সংশোধিত হইয়া যায়, সকলই লয়বিশিষ্ট হয়, সংসারযাত্রা সেই অবধি সুখময় সঙ্গীত-প্রবাহ বলিয়া বোধ হয়।

বাঙ্গালী নীতি।

নবকুমার জানিতেন না যে বাঙ্গালী অবস্থার বশীভূত। অবস্থা বাঙ্গালীর বশীভূত হয় না।

রমণী ও বিবাহ।

বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম্মের সোপান; এই জন্য স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলে; জগন্মাতাও শিবের বিবাহিতা।

প্রণয়।

প্রণয় কর্কশকে মধুর করে, অসৎকে সৎ করে, অপুণ্যকে পুণ্য দান করে, অন্ধকারকে আলোকময় করে।

চিত্তের ধর্ম্ম।

চিত্তের ধর্ম্ম এই যে, যে মানসিক কর্ম্ম যত অধিকার করা যায়, সে কর্ম্মে তত অধিক প্রবৃত্তি হয়; সে কর্ম্ম ক্রমে স্বভাবসিদ্ধ হয়।

মনুষ্য-হৃদয়।

মনুষ্য-হৃদয় অনন্ত সমুদ্র, যখন তদুপরি ক্ষিপ্ত বায়ুগণ সমর করিতে থাকে, কে তাহার তরঙ্গমালা গণিতে পারে!

(অন্যত্র)

মনুষ্য-হৃদয় ক্লেশাধিক্য বা সুখাধিক্য একেবারে গ্রহণ করিতে পারে না। ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করে।

(অন্যত্র)

যখন মনুষ্যহৃদয় কোন উৎকট ভাবে আচ্ছন্ন হয়, চিন্তার একাগ্রতায় বাহ্যসৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য থাকে না, তখন অনৈসর্গিক পদার্থও প্রত্যক্ষীভূত বলিয়া বোধ হয়।

রূপবর্ণনা।

যদি এই রমণী (মতিবিবি) নির্দ্দোষ-সৌন্দর্য্যবিশিষ্টা হইতেন, তবে বলিতাম, পুরুষ-পাঠক! ইনি আপনার গৃহিণীর ন্যায় সুন্দরী। আর সুন্দরী পাঠকারিণি! ইনি আপনার দর্পণস্থ ছায়ার ন্যায় রূপবতী। তাহা হইলে রূপবর্ণনার একশেষ হইত।

বাঙ্গালীর স্ত্রী।

বাঙ্গালীরা আপন গৃহিণীকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী দেখে।

গহনা।

স্ত্রীলোকের গহনা থাকিলে সে না দেখাইলে বাঁচে না।

পরশপাথর।

পুরুষের বাতাসে যোগিনী গৃহিণী হইয়া যায়!

অপবিত্র আকাঙ্ক্ষা।

এই সুখাকাঙ্ক্ষা পার্ব্বতী নির্ঝরিণীর ন্যায় প্রথমে নির্ম্মল, ক্ষীণধারা বিজন

প্রদেশ হইতে বাহির হয়, আপন গর্ভে আপনি লুকাইয়া রহে, কেহ জানে না, আপনা আপনি কল কল করে, কেহ শুনে না। ক্রমে যত যায়, তত দেহ বাড়ে, তত পঙ্কিল হয়। শুধু তাহাই নয়, কখন আবার বায়ু বহে, তরঙ্গ হয়, মকর-কুম্ভীরাদি বাস করে। আরও শরীর বাড়ে, জল আরও কর্দ্দমময় হয়, লবণময় হয়, অগণ্য সৈকতচরভূমি মরুভূমি নদী হৃদয়ে বিরাজ করে, বেগ মন্দীভূত হইয়া যায়, তখন সেই সকর্দ্দম নদীশরীর অনন্ত সাগরে কোথায় লুকায়, কে বলিবে!

এক মৃণালে দুইটী কমল ফুটে না।

সংসার-রচনা।

মনুষ্যের চক্ষুকর্ণ যদি সমমুখগামী হইত, তবে মনুষ্যের দুঃখস্রোত শমিত কি বর্দ্ধিত হইত, তাহা কে বলিবে? সংসার রচনা অপূর্ব্ব কৌশলময়।

সংসার সুখময়।

রাগ করিয়া যাহা বলি, এ সংসার সুখময়। সুখের প্রত্যাশাতেই বর্হুলবৎ সংসার মধ্যে ঘুরিতেছি—দুঃখের প্রত্যাশায় নহে। কদাচিৎ যদি আত্মকর্ম্মদোষে সেই প্রত্যাশা সফলীকৃত না হয়, তবেই দুঃখ বলিয়া উচ্চ কলরব আরম্ভ করি। তবেই দুঃখ নিয়ম নহে, সিদ্ধান্ত হইল; নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র।

সংসারবন্ধনে রজ্জু।

তোমার আমার সর্ব্বত্র সুখ। সেই সুখে আমরা সংসার মধ্যে বদ্ধমূল; ছাড়িতে চাহি না। কিন্তু এ সংসার-বন্ধনে প্রণয় প্রধান রজ্জু।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

স্মৃতি *

এমনি দিনে—এই হেমন্তের পরিপূর্ণ মিলনোৎসবের দিনে—যে দিন প্রকৃতির কুঞ্জে কুঞ্জে মিলনের রাগিণী বাজিয়া উঠে, যে দিন পূর্ণিমার বিমল রজতালোকে বিশ্ব-প্রকৃতি হৃদয়-দেবতাকে পাইবার জন্য প্রেমের উন্মাদনায় আকুল হইয়া উঠে - সেই রাসপূর্ণিমার মিলন-সন্ধিক্ষণে আমরা শ্রীশচন্দ্রকে হারাইয়াছি।

শ্রীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তিন বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি কি কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহার হিসাব-নিকাশের দিন আসিয়াছে কি না জানি না। তথাপি মনে হয় যাঁহাদের আমরা হারাইয়াছি, বৎসরে বৎসরে তাঁহাদের মৃত্যুদিনে তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়া তাঁহাদের স্মৃতিকে উজ্জ্বল করিয়া রাখায় অলাভ নাই। যদি তাঁহাদের কাছে কিছু গ্রহণ করিবার, কিছু শিক্ষা করিবার থাকে তাহা হইলে বিস্মৃতির উপেক্ষায় সে শিক্ষা সে লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া লাভ নাই।

* স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্মৃতি-সম্মিলন উপলক্ষে লিখিত। গত রাসপূর্ণিমায় এই সম্মিলনে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ শ্রীশ বাবুর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীশচন্দ্রের উপন্যাসের দোষগুণ আলোচনা করিবার এ সময় নহে। শ্রীশচন্দ্রের রচনার একটী বিশেষত্ব বিশেষভাবে আমাদিগকে আকৃষ্ট করে। তাহা শ্রীশচন্দ্রের আদর্শ। শ্রীশচন্দ্র জীবনে বাঙ্গলার বর্ত্তমান যুগের দুইজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি গুরুরূপে বঙ্কিমচন্দ্রকে এবং বন্ধুভাবে রবীন্দ্রনাথকে পাইয়াছিলেন। এই দুই জন অসামান্য প্রতিভাশালীর সংস্রবে আসিয়াও শ্রীশচন্দ্র তাঁহাদের প্রভাব দ্বারা অভিভূত হন নাই, ইহা শ্রীশচন্দ্রের পক্ষে সামান্য প্রশংসার কথা নহে। ত্যাগে সংযমে পবিত্র, প্রেমে ভক্তিতে মধুর, হিন্দুর অনাড়ম্বর সরল নির্ম্মল জীবনকেই তিনি আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিক্ষেপ, চাঞ্চল্য, আড়ম্বর, ঐশ্বর্য্যকে তিনি কোথাও বড় করিয়া দেখান নাই। তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র বাঙ্গলার ছায়াশীতল স্নিগ্ধ পল্লীর গৃহ-তপোবন, শ্যামতরুসারিত ওষধিতরা প্রশস্ত প্রান্তর, ভাগীরথীর চিরপবিত্র স্নিগ্ধ গম্ভীর প্রসন্নসলিলধারা, অথবা পবিত্র উৎসব তরা দেবতার লীলাপ্রাঙ্গন। তাঁহার সৃষ্টিত চরিত্রগুলিও তাই—প্রেম, ত্যাগ, স্নেহতরা জগন্নাথ; সংযম, ত্যাগ, একনিষ্ঠতার আদর্শ নিস্তারিণী; সংযমময়ী, ধর্ম্মনিষ্ঠা, মধুরতাময়ী বহুগৃহের কল্যাণপ্রতিমা কুলকুমারী; জ্ঞানে, ভক্তিতে, মার্জ্জনিকতায় পরিপূর্ণ পুরন্দর সরল, পবিত্র, ত্যাগশীল, ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুর অপূর্ব্ব আলেখ্যচিত্র। পরমার্থপরতা, বৈরাগ্য এবং সন্তোষ—ইহাই হিন্দুজীবনের বিশেষত্ব। এবং এই বিশেষত্ব শ্রীশচন্দ্রের গ্রন্থে যেমন পরিস্ফুট এমন অন্য কোন গ্রন্থে নহে। কেহ হিন্দু আদর্শ গড়িতে বসিয়াও পশ্চিমের ঐহিকতা, বিলাস ও আড়ম্বরের মায়া অতিক্রম করিতে পারেন নাই, এবং কেহ বা ভারতবর্ষের ত্যাগ, ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং সন্তোষের উপর সার্ব্বভৌমিকতা ও সার্ব্বজনীনতার ছায়া ফেলিতে গিয়া সমস্ত ব্যাপারটাকেই অত্যন্ত জটিল, ও সমস্যাপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। কোথাও বা প্রতিভাশালী লেখক অবিরাম তর্কের দ্বারা হিন্দু আদর্শকে অত্যন্ত 'আড়ষ্ট' ও জটিল করিয়া তুলিয়াছেন; হিন্দু-জননী কোথাও বা তাহার হস্তে পড়িয়া উদারতা ও স্নেহশীলতার সঙ্গে জোর করিয়া 'অনাচার' মিশাইতে গিয়া কেমন যেন বিসদৃশ হইয়া উঠেন।

হিন্দুর মধ্যে উদারতার ও বিশ্বজনীনতার অভাব নাই; হিন্দু ইতর, ভ্রষ্ট, পতিত নির্ব্বিশেষে সকলকে বক্ষে ধারণ করিতে পারে—কিন্তু সে তর্কের দ্বারা নহে, বিচারের দ্বারা নহে—প্রেমের দ্বারা। তর্ক করিয়া বিচার করিয়া প্রেমিক হওয়া হিন্দু-আদর্শের বহির্ভূত।

শ্রীশচন্দ্র অনায়াসে, সহজে, স্বাভাবিক ভাবে হিন্দুর আদর্শে উপস্থিত হইয়াছেন। রামানন্দস্বামীর Psychic force বা গোরার সূক্ষ্মবিচারের সাহায্য না লইয়াও অতি অনায়াসে তিনি হিন্দু আদর্শের সরল সুন্দর ছবি স্বাভাবিক বর্ণে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। জগন্নাথ আচার্য্য তর্ক না করিয়াও বক্তৃতা না দিয়াও অতি সহজে হিন্দুর স্বাভাবিক

বিশ্বপ্রেমিক মূর্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছেন; নিস্তারিণী অতি সহজে হিন্দু বিধবার অটল ব্রহ্মচর্য্য, ভগবৎনিষ্ঠা ও পতিভক্তির আদর্শ দেখাইয়াছেন এবং হৈমবতী হিন্দুজননীর সরল উদার মধুর মাতৃত্বের মধ্যে হিন্দু রমণীর জীবনের আদর্শ সহজ ও স্বাভাবিক মূর্তিতে প্রচার করিয়াছেন। হিন্দু-জননীকে দেবী-চৌধুরাণীর মত 'কুস্তি লড়িয়া' গীতা পড়িয়া সমদর্শিতা শিখিতে হয় না এবং গৃহিণীপণা শিখিবার জন্য ডাকাইতির অভিনয় করিতে হয় না, এ কথা যদি হিন্দুসন্তানকে বুঝাইবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে শ্রীশ বাবুর উপন্যাস সে অভাব মোচন করিবে।

প্রকৃত হিন্দু আদর্শের প্রতি অসাধারণ অনুরাগ, ইহাই শ্রীশচন্দ্রের রচনার বিশেষত্ব; এবং অতি নিপুণভাবে সহজে সরল সুমিষ্ট ভাষায় এই অনুরাগের চিত্র আঁকিয়া তোলাই তাঁহার ঔপন্যাসিক জীবনের প্রধান কার্য্য। আমার মনে হয় এমন দিন আসিবে যে দিন হিন্দু নিজের বিশেষত্ব রক্ষার জন্য আপনার প্রনষ্ট আদর্শের দিকে লুব্ধনেত্রে চাহিবে, এবং সেই দিনে শ্রীশচন্দ্র আপনার উপযুক্ত আসন আপনি বাছিয়া লইবেন।

লেখকরূপে যাহাই হউন, আর এক কারণেও শ্রীশচন্দ্র বাঙ্গলার সাহিত্য-সমাজে শ্রদ্ধালাভের অধিকারী। তাহা শ্রীশচন্দ্রের অকৃত্রিম সাহিত্যানুরাগ।

অতি অল্পবয়সে শ্রীশচন্দ্র সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার ১২।১৩ বৎসর বয়সেরও রচনার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৭।১৮ বৎসর বয়সে তিনি মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন। এই সাহিত্যের প্রবল অনুরাগ হৃদয়ে বহিয়া তিনি নিয়মিত ভাবে সন্ধ্যার সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের চরণতলে গিয়া উপবেশন করিতেন এবং রাত্রে বাড়ীতে ফিরিয়া অনুরক্ত ভক্তের মত সন্ধ্যার কথা-বার্ত্তার সারাংশ আপনার ডায়ারিতে লিখিয়া রাখিতেন।

পরিণত বয়সে শ্রীশচন্দ্র কেবল স্বয়ং মাতৃভাষার সেবা করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন না। মাতৃভাষার সেবার জন্য তিনি যাহাকে নিকটে পাইতেন তাহাকেই উৎসাহ ও উপদেশ দিতেন। আমাদের মত ক্ষুদ্র এবং অক্ষম লেখকও তাঁহার উৎসাহ ও উপদেশ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। সাহিত্যের জন্য এমন আন্তরিক ও একান্ত অনুরাগ আমি অল্পলোকের মধ্যেই দেখিয়াছি। শ্রীশ-চন্দ্র অতিস্নেহময় ও সহৃদয় সমালোচক ছিলেন, তাঁহাকে কোন লেখা দেখাইলে তিনি কখনই লেখককে নিরুৎসাহ করিতেন না। যাহাতে তাহার লেখার উন্নতি হইতে পারে, সে জন্য স্নেহের সহিত যত্নের সহিত তাহাকে উপদেশ দিতেন। নবীন লেখকের পক্ষে সে স্নেহ সে উৎসাহ উপেক্ষার বস্তু নহে।

ব্যক্তিগত জীবনেও শ্রীশচন্দ্রের জীবন প্রচুর শিক্ষার স্থল ছিল। তাঁহার চিরপ্রফুল্ল, অমায়িক, স্নেহশীল হৃদয়ের মধ্যে অবিচলিত সাধুতা, সত্যনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যবুদ্ধি, নির্ভীক তেজস্বিতা অপূর্ব্বভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহার স্নেহ, ভালবাসা এবং প্রফুল্লতার অবধি ছিল না। যে কেহ তাঁহার সংস্রবে আসিত সে-ই তাঁহার স্নেহপূর্ণ অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইত। শ্রীশচন্দ্রের বহুবিস্তৃত

বন্ধুসংখ্যাই তাহার প্রমাণ। কিন্তু তাঁহার এই স্নেহকোমল আমোদপ্রিয় হৃদয়ের অন্তরালে সুদৃঢ় মেরুদণ্ড ছিল। অন্যায় অত্যাচার তিনি কিছুতেই সহ্য করিতেন না। এই কারণে সময়ে সময়ে তাঁহাকে উদ্ধত এবং সংকীর্ণচেতা কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হইতে হইত, কিন্তু তাহাতে শ্রীশচন্দ্র ভ্রূক্ষেপ করিতেন না।

শ্রীশচন্দ্রের অধিক আয় ছিল না, বহু পরিবারকে তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে হইত, কিন্তু এ অবস্থাতেও কেহ কখনো তাঁহাকে অসদুপায়ে এক কপর্দক গ্রহণ করিতে সম্মত করিতে পারে নাই। একবার কোথাও তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রে কোন জমীদার তাঁহাকে কার্য্যের জন্য প্রচুর অর্থ দিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলে শ্রীশচন্দ্র সতেজে উত্তর করিয়াছিলেন "যে দিন আমার এরূপ দুর্ম্মতি হইবে সে দিন যেন আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হয়!"

তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞানও অত্যন্ত প্রখর ছিল। দুরবস্থাগ্রস্ত দূর আত্মীয় বন্ধুকে তিনি নিয়মিত সাহায্য করিতেন, নিজের অভাব সত্ত্বেও সময়ে সময়ে ঋণ করিয়াও তিনি এই কর্ত্তব্যপালন করিতেন।

অসত্যকে শ্রীশচন্দ্র অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন এবং অতি শৈশব হইতে তিনি আপনার সন্তানগণের হৃদয়ে এই ঘৃণা দৃঢ় অঙ্কিত করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি বলিতেন সত্যকে পরিপূর্ণভাবে অবলম্বন করিলে আর কিছুরই আবশ্যক হয় না। সুতরাং শিশুদের সর্ব্বাগ্রে সত্যনিষ্ঠা শিক্ষা দেওয়া উচিত।

বন্ধুত্বের মর্য্যাদা শ্রীশচন্দ্র সর্ব্বদা রক্ষা করিতেন। শ্রীশচন্দ্রের মত সদালাপী, সহৃদয়, স্নেহশীল বন্ধু দুর্লভ।

শ্রীশচন্দ্র তাঁহার সংকল্পিত অনেক কার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার "রাইবনি দুর্গ" অসম্পূর্ণই রহিয়া গেছে। তাঁহার নিজের জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ "ডায়রি" ফাঁদিল করিয়া লিখিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল। তিনি নিজে "বঙ্কিম-প্রসঙ্গে" এই ইচ্ছার উল্লেখও করিয়াছিলেন। তাহাও ঘটিয়া উঠে নাই।

শ্রীশচন্দ্র সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নিরপেক্ষ না হইতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় যে শ্রীশচন্দ্রের মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্য যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং শ্রীশচন্দ্রের আসন কালসমুদ্রের তীরে শিথিলমূল বালুকারাশির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

ফিডো

সক্রেটিস—প্রথমে বিবেচনা করা উচিত যে মানুষের আত্মা মৃত্যুর পর Hadesএ অবস্থিতি করে কি না। একটী পুরাতন প্রবাদ আছে যে আত্মা মর্ত্ত্য হইতে পাতালে যায় এবং তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে জন্ম

গ্রহণ করে। যদি ইহা সত্য হয় যে মৃত্যুর পর আমাদিগের আত্মা পুনরায় জীবন লইয়া জন্ম গ্রহণ করে তাহা হইলে কথা হইতেছে যে মৃত্যু এবং পুনর্জ্জন্ম এই দুই অবস্থার মধ্যবর্ত্তি সময়ে তাহারা কোথায় থাকে? অবশ্য পরলোকে থাকে। যেহেতু যদি তাহাদের একেবারে অস্তিত্ব না থাকিত তাহা হইলে তাহারা পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে পারিত না। সুতরাং ইহাই যদি ঠিক হয় যে মৃত ব্যক্তিরা আবার জীবিত হয় তাহা হইলে পরলোক যে আছে ইহা সপ্রমাণ হইতেছে। এবং যদি এ বিষয় আমরা নিশ্চিত না জানি তাহা হইলে অন্য কোন প্রকার যুক্তির অবলম্বন করিতে হইবে।

জীবন ও মরণ, জাগরণ ও নিদ্রা, এই দুই অবস্থা বিবেচনা করিলে আমরা কি জানিতে পারি? সকল প্রকার পদার্থ তাহাদিগের বিপরীত কিংবা correlatives হইতে উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন হইয়া তাহাদের ভিতরে আবার প্রত্যাবর্ত্তন করে। যদি নিদ্রা আসে, তাহা হইলে নিদ্রা হইতে জাগ্রত অবস্থা আসিবেই আসিবে। এবং যদি জীবন হইতে মৃত্যু আসে তাহা হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইতে একটী নূতন জন্ম আসিবে। এই নিয়ম যে একদিকে সত্য, এক দিকে মিথ্যা হইবে তাহা কখনও হইতে পারে না। যদি জীবন হইতে এ জগতে মৃত্যু উৎপন্ন হয় এবং মৃত্যু হইতে জীবন না আসে তাহা হইলে জীবন এককালে পৃথিবী হইতে নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। কিন্তু দেখ, জন্মের পর জন্ম হইতেছে। ইহা সরল রেখার ন্যায় মৃত্যুতে না গিয়া বক্রভাবে জন্মেতে আসিয়া আবার পড়ে। সুতরাং জীবন মরণ একটী গোলাকার পদার্থ সদৃশ। জীব জন্ম হইতে মৃত্যুতে যায় এবং মৃত্যু হইতে আবার জন্ম আসে। এই পদ্ধতি চিরকাল চলিতেছে।

অতএব হে সিবেস্, যদি সকল জীবিত পদার্থের মৃত্যু হয় এবং যদি সকল মৃত পদার্থ পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ না করে তাহা হইলে কি অবশেষে পৃথিবীতে একটীও পদার্থ জীবিত থাকা সম্ভবপর হইবে?

সিবেস্—না। আমার মনে হয় তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সর্ব্বতোভাবে সত্য।

সক্রেটিস্—আমারও ইহা সত্য বলিয়া বোধ হয় এবং ইহা স্বীকার করাতে আমরা আত্ম-প্রবঞ্চনা করিতেছি না। বাস্তবিক জগতে পুনর্জ্জন্ম অর্থাৎ মৃত্যু হইতে জন্ম আছে। এবং কেবল যে আত্মার অস্তিত্ব আছে তাহা নয়, যাহারা ভাল তাহাদিগের ভাল এবং যাহারা মন্দ তাহাদের মন্দ হয়।

সিবেস্—সক্রেটিস্, তুমি বলিয়াছ যে আমরা যাহা শিক্ষা করিয়াছি তাহা স্মৃতি ভিন্ন আর কিছুই নয়। এ কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমরা এখন যাহা স্মরণ করি তাহা পূর্ব্বে আর এক সময়ে আমরা শিখিয়াছি। কিন্তু আমাদিগের আত্মার মানুষ আকারে আসিবার পূর্ব্বে যদি কোন অস্তিত্ব না থাকিত তাহা হইলে তুমি যাহা বলিতেছ তাহা অসম্ভব। সুতরাং এই যুক্তি হইতেও আত্মা যে অমর তাহার প্রমাণ পাইতেছি।

সিমিয়াস্—হে সিবেস, এ কথার প্রমাণ কি? সক্রেটিস যাহা বলিয়াছেন তাহা আমার মনে নাই। তুমি প্রমাণগুলি কি তাহা বল দেখি?

সিবেস—একটী উত্তম যুক্তিতে তুমি সমুদয় প্রমাণ দেখিতে পাইবে। কোন লোককে ভাল করিয়া একটী প্রশ্ন কর, সে আপনা আপনি তাহার ঠিক উত্তর দিবে। যদি বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং যুক্তি না থাকিত তাহা হইলে সে কখনও উত্তর দিতে পারিত না।

সক্রেটিস—সিমিয়াস্, মানুষের শিক্ষা যে স্মৃতি, বোধ হয় তুমি এ কথা বিশ্বাস কর না। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করিবে যে স্মৃতি পূর্ব্বজ্ঞাত বিষয়ের আলোচনা মাত্র। যেমন কোন একটী পদার্থ যদি আমরা কখনও জানিয়া থাকি তাহা হইলে যখনই সেই পদার্থটী আবার দেখিব সেই পূর্ব্ব দর্শনটী স্মরণ পথে আসিবে। কেবল যে সেইটী মনে পড়িবে তাহা নহে তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল পদার্থ সেই পদার্থটীর সঙ্গে কোন ভাবে যুক্ত ছিল তাহাদিগেরও প্রতিমূর্ত্তি তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিবে। যখন একটী পরিচ্ছদ কিম্বা বংশী দেখিতে পাই তখনই যে লোকটীকে তাহা ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি তাহার প্রতিমূর্ত্তি মনে পড়ে। সিমিয়াসকে যখন দেখি তখন সিবেসকে মনে পড়ে, যেহেতু সিমিয়াসকে সিবেসের সঙ্গে সর্ব্বদা দেখিতে পাই। এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতে পারা যায়। কিন্তু যখন একটী পদার্থ আর একটী পদার্থকে স্মরণ করাইয়া দেয়, আর সেই দুটি পদার্থে সৌসাদৃশ্য থাকে, আমাদের মনে এই ভাব হয় যে সেই সৌসাদৃশ্য সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইবার পূর্ব্বে কোন একটী বিষয়ের অভাব আছে। যেহেতু যত কেন সৌসাদৃশ্য থাকুক না একটী পদার্থ আর একটী পদার্থের একবারে সমান নয়। অথচ আমরা জানি যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সৌসাদৃশ্য বলিয়া একটী জিনিস আছে। এবং সাকার পদার্থ জানিবার আগে আমাদের মনে এই সৌসাদৃশ্য জ্ঞান আছে, যেহেতু যখনই আমরা দুটী সদৃশ পদার্থ দেখিতে পাই আমরা বুঝিতে পারি যে তাহাদিগের সৌসাদৃশ্য সর্ব্ব সুন্দর নহে। ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে সৌসাদৃশ্যের জ্ঞান আমরা বাহ্যজগত হইতে পাই না।

যে দুটী পদার্থে অসম্পূর্ণ ভাবে সৌসাদৃশ্য আছে ইহাদিগকে এক করিয়া ভাবা উচিত নহে। সংস্কার ও পদার্থে প্রভেদ এই যে সংস্কার সকল লোকের মনে এক এবং অপরিবর্ত্তনীয়; কিন্তু পদার্থের সাদৃশ্য কোন দুইটী স্থলে এক নহে। পদার্থের পরিবর্ত্তন সর্ব্বদাই হইতেছে এবং এক পদার্থ ভিন্ন লোকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন দেখায়।

নীতিজগতেও এই যুক্তি খাটে। পূর্ব্বজন্মে আমাদের অভীপ্সিত সৌন্দর্য্য, সদাশয়তা, ন্যায় এবং পবিত্রতার জ্ঞান ছিল, কিন্তু দেহধারণ করিবা মাত্র আমরা সেই জ্ঞান হারাইয়াছি। শিক্ষার দ্বারা আবার তাহা পাইতে পারি। সে শিক্ষার অর্থ কি? স্মরণ করা অর্থাৎ কালক্রমে যাহা হারাইয়াছি তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া।

হে সিমিয়াস্, আমরা তাহা হইলে এই সত্য পাইলাম না কি, সৌন্দর্য্য, সদাশয়তা প্রভৃতি যে সকল বিশুদ্ধ অশরীরী ভাব আমরা সর্বদা মুখ দিয়া উচ্চারণ করি, তাহা যদি বাস্তবিক থাকে এবং যদি আমরা দেখি ইহা বরাবরই আমাদের স্বভাবের একটী অঙ্গ আছে এবং আমরা ইন্দ্রিয়ের সকল ভাবগুলিই ইহার সহিত সর্বদা তুলনা করিয়া থাকি তাহা হইলে আমি কি বলিব না যে আমাদের আত্মাও আমাদের জন্মাইবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল? এখন এই ভাব যদি পূর্ব্বে বর্ত্তমান না থাকিত তাহা হইলে আমাদের এই বিচার নিষ্ফল হইত! অতএব ইহা কি সম্ভব নয় যে আমাদের আত্মাও ছিল এবং যদি একটী না থাকে ত আর একটীও ছিল না?

সিমিয়াস বলিলেন—"হে সক্রেটিস্, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে দুইটীরই এক প্রয়োজন আছে এবং আত্মা ও ভাব এই দুইটীই যে আমাদের জন্মাইবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল এই প্রমাণে আমাদের তর্কেরও সহজ নিষ্পত্তি হয়। কারণ আমার স্পষ্ট মনে হইতেছে যে, সৌন্দর্য্য ও সদাশয়তা প্রভৃতি যে সকল ভাবের বিষয় তুমি এই মাত্র বলিলে তাহা নিশ্চয়ই আছে। অন্ততঃ আমার মনে হয় ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ।

সক্রেটিস্—সিবেস্ কি বলে? উহারও সন্দেহ দূর করিতে হইবে। (ক্রমশ)

৺কৃষ্ণবিহারী সেন।

মুক্তা

(ক্ষুদ্র উপন্যাস)

"সুশীলা তবে আমি এখন আসি।" ঘরের ভিতর হইতে হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া অনিল সুশীলাকে এই কথা বলিল। সুশীলা বাগানের ভিতর একখানি মোড়ায় বসিয়া লেস সেলাই করিতেছিল; সে অন্যমনস্কভাবে মুখ তুলিয়া চাহিল।

অনিল বিংশবর্ষীয় কমনীয়কান্তি যুবক। তাহার আপাদমস্তক নিখুঁত সাহেবী সজ্জায় সজ্জিত, হাতে হ্যাট ও লাঠি। সুশীলা ষোড়শী, রূপবতী।

সে দিন ভবানীপুরের এই নিভৃত বাড়ী খানিতে বসন্তের বড় উপদ্রব হইয়াছিল। পরিষ্কার সাজান ক্ষুদ্র বাগানখানিতে বাছা বাছা নানাজাতীয় ফুল মনের আনন্দে হাসিতেছিল ও তীব্র আনন্দময় মধুর দক্ষিণ সমীরণের ভরে দুলিতেছিল। একদিকে বেলা যুঁই নিভৃতে আপন আপন প্রস্ফুট অমল সৌন্দর্য্য অতুল সৌরভে বিজ্ঞাপিত করিতেছিল। অপর দিকে ভূমিতে পড়িয়া শত শত বিলাতী ফ্যান্সী ফুল, তাহাদের কিশোর রূপের অপূর্ব্ব মাধুরী ও অবাক সরলতা লইয়া নীরবে আকাশের পানে চাহিয়া তাহাদের আপনার অজ্ঞাত অপরিমেয় সৌন্দর্য্য বিকশিত করিতেছিল।

এই শত শত কুসুম-গন্ধের ভিতর দিয়া প্রবাহিত দক্ষিণ সমীরণ যখন সুশীলার মুখের উপর কোমলস্পর্শে স্নেহ বিতরণ করিয়া ক্রীড়াভরে তাহার অবস্থবিন্যস্ত অলকা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতেছিল, তখন সুশীলার মন যে নিতান্ত শমতাযুক্ত ছিল তাহা নহে।

সুশীলা অন্যমনস্কভাবে বেস বুনিতেছিল। সে যে বিশেষ কিছু ভাবিতেছিল তাহা নহে। কিন্তু এই বসন্ত-সন্ধ্যার মধির উল্লাসে তাহার প্রাণটা কি জানি কি ভাবে আলোড়িত হইতেছিল, কোন এক অকারণ আকুলতা তাহার হৃদয়কে তাড়িত করিতেছিল। যখন সে তার আবেশময় পল্লবভারাক্রান্ত চক্ষু দুটি ধীরে ধীরে তুলিয়া অন্যমনস্কভাবে অনিলের মুখের উপর স্থাপিত করিল তখনও তাহার সম্পূর্ণ সংজ্ঞা ছিল না, তাহার প্রাণের ভিতর কি যেন একটা এলোমেলো বাতাস বহিতেছিল।

সে অনিলের বিদায়-সম্ভাষণ স্পষ্ট শুনিতে পায় নাই। তাই সে যেন স্বপ্নরাজ্য হইতে সদ্য উজ্জীবিত কোনও রূপকথার রাজকন্যার মত স্বপ্নের আবেগ-মাখা চলঢলে চোখ অনিলের মুখের উপর স্থাপিত করিল।

অনিল অগ্রসর হইল। সুশীলার সেই স্বপ্নাবেশময় চক্ষু দুটির উপর চাহিয়া চাহিয়া মৃদু হাসিয়া অগ্রসর হইল। বসন্ত-সন্ধ্যার সে-ও বসন্তের মত্ততার দাস হইল, তাহার প্রাণেও সুশীলার চাহনীতে কি এক উন্মত্ত ঝড় বহিয়া গেল, সে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইল। সুশীলার নিকট আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে আচম্বিতে আপনার বক্ষের কাছে লইল। মুহূর্ত্তের জন্য সুশীলা যেন আত্মহারা হইল, স্বপ্নবিভোরা বালা অনিলের কাঁধে মাথা রাখিল, কিন্তু অনিলের দ্বিতীয় আকর্ষণে চকিতের মধ্যে সংজ্ঞার সঞ্চার হইল। দেহে যেন বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল। সে বেগে অনিলের বাহুপাশ ছিন্ন করিয়া দূরে দাঁড়াইল, অনিলের দিকে একবার তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "আপনি কেমন করিয়া—" আর বলিতে পারিল না, অধরোষ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল, শরীর থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল; অবশভাবে সে তাহার মোড়ার উপর বসিয়া পড়িল কাপড়ে মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অনিল সুশীলার এই ব্যবহারে বড় অপ্রস্তুত হইয়া গেল। সে ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিল না। সে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। সুশীলাকে এরূপভাবে কাঁদিতে দেখিয়া তাহার বড় দুঃখ হইল, নিতান্ত অপরাধীর মত সে বলিল, "সুশীলা, যদি কিছু অন্যায় করিয়া থাকি, আমার এ ধৃষ্টতা কি ক্ষমা করিবে না, এমন মত্ততা আমার কল্পনায় কখনও আসে নাই—"

সুশীলা উঠিয়া দাঁড়াইল, তীব্রদৃষ্টিতে অনিলের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি কি সাহসে এখনও এখানে দাঁড়াইয়া আছেন?"

অনিল আবার কি বলিতে যাইতেছিল, বলা হইল না, সুশীলা ছুটিয়া গৃহের ভিতর চলিয়া গেল, সেখানে বিছানায় পড়িয়া বালিসে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

(২)

সুশীলা যোগেন্দ্র বাবুর একমাত্র কন্যা। যোগেন্দ্র বাবু নিজ কলিকাতার অধিবাসী নহেন, কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ কলিকাতায় বাস করিতেছেন। তিনি হিন্দু, কিন্তু নিষ্ঠাবান নহেন। যোগেন্দ্র বাবু সুশিক্ষিত ব্যক্তি এবং বড়লোক বলিতে যাহা বুঝায় তাহা না হইলেও তাঁহার ধনের অভাব নাই।

একমাত্র কন্যা সুশীলার জন্য যোগ্য বরের সন্ধান অনেক দিন হইল চলিতেছে, কিন্তু একটিও যোগেন্দ্র বাবুর সম্পূর্ণ মনোমত হয় নাই। আদরিণী কন্যার বিবাহের জন্য পিতার আগ্রহেরও আতিশয্য ছিল না। তাই সুশীলা পিতৃগৃহে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছিল। এই বিষয় লইয়া গৃহিণী কর্ত্তার সহিত অনেক তর্ক-বিতর্ক করিতেন, কিন্তু তাহাতে সুশীলার পাত্রস্থ হইবার সম্ভাবনা যে বড় অধিকদূর অগ্রসর হইত এরূপ মনে হয় না।

অনিল যোগেন্দ্র বাবুর কুটুম্ব, তাঁহার পিসতুত ভগিনীর দেবরপুত্র। সম্পর্ক অতিশয় ঘনিষ্ট না হইলেও উভয় পরিবারে যথেষ্ট আত্মীয়তা ছিল; এই জন্য অনিলের এ বাড়ীতে সদাসর্ব্বদা যাতায়াত ছিল। অনিল বি-এ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বিলাতযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। যাত্রা করিবার পূর্ব্বদিনে যোগেন্দ্র বাবুর পরিবারের নিকট বিদায় হইতে আসিয়াছিল। সেই দিন সন্ধ্যাকালে পূর্ব্বোক্ত ভাবে সুশীলার সহিত সাক্ষাৎ হইল।

পূর্ব্বে বহুদিন অনিল ও সুশীলার আলাপ হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল তাহাতেও সন্দেহ নাই, কিন্তু সে হৃদ্যতাকে কেহ কখনও প্রেম বলিয়া গ্রাহ্য করে নাই। অনিলের মনে মাঝে মাঝে একটা অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইত, সুশীলার ডব্‌ডবে চোখের দিকে চাহিয়া মাঝে মাঝে আত্মহারা হইত, কিন্তু এইরূপ পিপাসাকে সে অধিক প্রশ্রয় দেয় নাই; সে যোগেন্দ্র বাবুর পরিবারের বিশ্বাস ও স্নেহের অযোগ্য হইবে এই আশঙ্কা তাহাকে অত্যন্ত শান্ত করিয়া রাখিত। বিবাহের কথা তাহার কল্পনায় আসে নাই, আসিলেও সে সহজেই বুঝিতে পারিত যে সে কল্পনা বাতুলতা; কারণ, তাহার পিতা প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। যোগেন্দ্র বাবুর আচারে-অনুষ্ঠানে হিন্দুসমাজের সহিত বন্ধন যতই শিথিল হউক না কেন তিনি যে কন্যাকে নামকাটা ব্রহ্মের সঙ্গে বিবাহ দিয়া হিন্দুসমাজের সহিত সম্পর্ক একেবারে বিচ্ছিন্ন করিবেন এরূপ কোনও সম্ভাবনা ছিল না।

অনিলের মনে যদিও এইরূপ চাঞ্চল্য মাঝে মাঝে নিভৃতে কখনও দেখা দিত, সুশীলার মন সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ম্মল ছিল। তাহার মন শিশুর মত সরল, সে যে বয়স্থা হইয়াছে এ কথা কখনও সে বুঝিতে পারে নাই এবং তাহার বালিকা-স্বভাবের উপর প্রেমের বিন্দুমাত্র ছায়া-পাত কখনও হয় নাই। অনিলের সহিত তাহার যে সখিত্ব তাহাতে সে আনন্দ

উপভোগ করিত, অনিলের আলাপে সে অত্যন্ত আমোদিত হইত এবং অনিলকে আলাতন করা সে জীবনের একটা প্রকাণ্ড সার্থকতা মনে করিত। কিন্তু অনিলের প্রতি প্রেম কখনও জ্ঞাতসারে তাহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র অধিকার প্রচার করিতে পারে নাই।

এই বসন্ত-সন্ধ্যার মিলনে পরস্পরের বন্ধুত্বের এই বন্ধন হয় তো নূতন ভাবে উন্মেষিত হইতে পারিত, কিন্তু তাহা হইল না। ইহাতে বিপরীত ফল ফলিল।

সুশীলার হৃদয়ে বসন্তের প্রথম উন্মেষে একটা নূতন ভাবের মাদকতা আসিয়াছিল এবং তাহারই মোহে সে মুহূর্তমাত্র আত্মহারা হইয়াছিল।

কিন্তু যখন তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, সে তখন তীব্র যাতনা অনুভব করিল, একটা অসহ্য ঘৃণা ও হীনতার ভাব তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাহার স্বাভাবিক গর্ব্ব ও আত্মসম্মান অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়া যেন দ্বিগুণ বেগে তাহার সমস্ত চরিত্রকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। সে যে কিরূপ তুচ্ছ হীন নারীর মত কাজ করিয়াছে, অনিলের চক্ষে সে যে কত নগণ্য কত হীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাই স্মরণ করিতে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। অনিলের উপর দারুণ ক্রোধ জন্মিল, সে তাই আত্মহারা হইয়া কাঁদিতে লাগিল। সে যে আপনাকে এতটা হীন করিয়াছে তাহার জন্য আপনা অপেক্ষা সে অনিলকেই অধিক দোষী করিল।

কেবল ক্রোধ নহে, অনিলের চিন্তা অন্য প্রকারে তাহার নিকট দুঃসহ হইয়া উঠিল। অনিলের কথা মনে হইতেই সমস্ত ঘটনাটা যেন তীব্র আলোকে তাহার নিকট প্রতিফলিত হইতে লাগিল এবং সকল লজ্জা সকল ক্ষোভ অসম্ভব তীব্রতার সহিত তাহাকে দংশন করিতে লাগিল। ইহার পর অনিলের নাম মনে হইলেই তাহার মহালজ্জামণ্ডিত এই স্মৃতি, তাহার প্রতি এই ঘোর অপমানকর এই চিত্র, তাহার মানসপটে জাগিয়া উঠিত, সে নিজেকে নিতান্ত অপরাধী ও নিতান্ত হীন বলিয়া ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিত, তাহার হৃদয়ের সবগুলি প্রবৃত্তি যেন অবশ হইয়া পড়িত।

সে দিন সন্ধ্যায় সে বড় কাঁদিল। এই সকল চিন্তা ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা আকারে তাহার চিত্তে উঠিয়া তাহাকে দারুণ ক্লেশ দিতে লাগিল, সে কিছুতেই আপনাকে শান্ত করিতে পারিল না।

সুশীলার মা আসিয়া তাহাকে খাইতে ডাকিলেন, সে উঠিল না, বলিল—"বড় মাথা ধরিয়াছে কিছু খাইব না।" মা কিছু বলিলেন না, শুধু দেখিলেন সুশীলা কাঁদিতেছে। তাহার খাবার চাপা দিতে আজ্ঞা করিয়া স্বামীর নিকট গেলেন।

সুশীলার এক দূরসম্পর্কীয়া বিধবা পিসী ছিলেন, তিনি সুশীলার নিকট শুইতেন। সমস্ত বাড়ীর কাজকর্ম্ম মিটিলে তিনি শুইতে আসিলেন; সুশীলা যথাসম্ভব আত্মসংযম করিয়া পিসীর সহিত কথা কহিতে লাগিল। কিন্তু কোনও কথাই তাহার ভাল লাগিল না। পিসী যখন এক মনে কথা বলিয়া যাইতেছেন, তখন

সুশীলার মন অন্যমনস্ক ভাবে সেই দিনকার সেই এক ঘটনা কেবলই ঘুরিয়া ফিরিয়া আলোচনা করিতেছিল। পিসী বকিতে বকিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। সুশীলার গৃহ অসহ্য বোধ হইল উঠিয়া বারান্দায় বেড়াইতে লাগিল।

তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। সমস্ত জগৎ সুপ্ত.কেবল মাঝে মাঝে এক আধখানা ভাড়াটে গাড়ীর খড়খড়ানি ও তাহার সুকণ্ঠাভিমানী চালকের কর্কশ উচ্চ সঙ্গীত-ধ্বনি শুনা যাইতেছে। রাস্তায় গ্যাসের আলোগুলি নিবাতনিষ্কম্প স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া যেন কিসের প্রতীক্ষা করিতেছে, দীর্ঘ ঘনপত্র বৃক্ষ নীরবে যেন কোন মহামোহে আচ্ছন্ন হইয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ও সমস্ত আকাশ পাণ্ডু আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া বসন্তের পূর্ণচন্দ্র নীরবে হাসিতেছে। সুশীলা বারান্দায় একখানি ইজিচেয়ারে বসিয়া একদৃষ্টে চাঁদের দিকে চাহিয়া সমস্ত পৃথিবীরই মত নীরব নিশ্চল ভাবে একান্ত মনে এই এক দুঃখময় কথা ভাবিতে লাগিল।

বারান্দার পার্শ্বে তাহার পিতার ঘর। সেখানে তখনও উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছে। সুশীলা তাহা লক্ষ্য করে নাই, তাহার মন সে দিকে ছিল না। সহসা তাহার কর্ণ সে দিকে আকৃষ্ট হইল, সে শুনিতে পাইল তাহার পিতামাতা তাহারই বিষয় আলোচনা করিতেছেন; অনিলের নামও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সে শুনিতে পাইল। সুশীলা কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল।

(৩)

সুশীলার পিতা বলিলেন, দেখ "তোমার পাগলামী আজ অতিরিক্ত বেড়েছে বোধ হয়। তুমি অত্যন্ত সেকেলে লোক, একটা ছোঁড়া যদি একটা বারষছরের মেয়ের সঙ্গে কথা কয় তবেই তুমি একটা মন্দ কথা ছাড়া কিছু কল্পনা ক'রতে পার না! সুশীলা ও অনিলের মধ্যে যে ভাব তা'তে প্রেম ঢুকতে পারে না, সুশীলা আমার সে মেয়ে নয়।"

পিতার বিশ্বাসে সুশীলা গর্ব্ব অনুভব করিল, কিন্তু তাহার তখনই মনে হইল যে এ বিশ্বাসের অযোগ্য ব্যবহার ত আজ হয় নাই। নূতন করিয়া ঘৃণা তা'কে অভিভূত করিল।

মাতা বলিলেন, "তুমি মনে কচ্ছ মেয়ে তোমার দুধের বাছা আছে, সেইটাই যে তোমার মস্ত ভুল। মেয়ের বয়স যে ষোলর কোলে ষোল হ'ল। সোমত্ত বয়সের মেয়ে আর সোমত্ত বয়সের ছেলে এতটা মেশামেশি করলে মেয়ের কি ভাব হ'তে পারে সে একটু তলিয়ে বুঝে দেখ দেখি।

"রাখ, রাখ, তোমার ওসব সেকেলে বাজে কথা আর আমার সহ্য হয় না;—"

"তবু যদি আমি কিছু না দেখতুম।"

"কি দেখেছ? তা'রা লাফালাফি হাসাহাসি ক'রতে না হয় একসঙ্গে এমন একটা খেলা করছে যেটা তোমার কাছে নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয়েছে—"

"ওগো না গো না, আমি তো আর মেয়ের সং মা নই যে, যা' তা' একটা কথা

নিয়ে তোমার কাছে পাঠাবো। আজ সন্ধ্যে বেলায় বাগানে—"

তাহার পর মাতা যাহা বলিলেন তাহা এত মৃদুভাবে কথিত হইল যে সুশীলা কিছুই শুনিতে পাইল না। কিন্তু কথাটা যে কি হইল তাহা বুঝিতে সুশীলার বাকী রহিল না। সে ভাবিল, "মা-ও তবে সব দেখিয়াছেন"—তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হইল।

পিতা অবাক্ হইয়া বলিলেন "বটে!" তাহার পর বলিলেন, "যা'ক আপদ তো চুকে গেছে, সে তো কাল দেশান্তর যা'ক তারপর মেয়েকে পাত্রস্থ করি।"

মা অত্যন্ত চটিয়া গেলেন, "তোমার মত পুরুষ মানুষ দেখিনি। চোখে কিছুই দেখ না বল্‌লে কি বুঝতেও কিছু পার না? অনিলের সঙ্গে কি হয়েছে না হয়েছে তাতেই বুঝি ভারি একটা ব'য়ে গেল, আসল কথা যে মেয়ের বয়েস হয়েছে সেটা বুঝতে পারছ না, এখন যদি শীগ্‌গির বিয়ে না দেও তবে পরে পস্তাবে। গরীবের কথা বাসি হ'লে মিঠে লাগে গো।"

উত্তরে কিছুক্ষণ নীরবে রহিলেন, তাহার পর মাতা আবার বলিলেন "আর চুকেই বা গেল কোথায়। সেই অবধি মেয়ে পড়ে পড়ে উপুড় হ'য়ে কাঁদছে, কিছু খায় নি দায় নি। মনটা এখন কোথাও না বসলে দেশান্তরে কি মনজর করতে পারবে; ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের ডাকখানা তো বন্ধ হয় নি।"

ছি! ছি! ছি। মা কি বলিলেন। মায়ের কথা শুনিয়া সুশীলার বুক দশ হাত বসিয়া গেল; বাপ মায়ের কাছে সে কতটা নীচ হইয়া গিয়াছে তাহা ভাবিতে তাহার লজ্জায় বুক ফাটিয়া গেল। তাহার সম্মান যে জন্মের মত গিয়াছে, তাহার জীবন যে পিতামাতাও অনিলের কাছে সেই কলঙ্কের সহিত জড়িত থাকিবে, এ চিন্তা তাহার পক্ষে অসহ্য হইল।

সুশীলার যেন মনে হইতে লাগিল যে সমস্ত জগৎ তাহার পায়ের তলা হইতে সরিয়া গিয়াছে। সংসারে যেন এমন কেহ নাই যাহার কাছে সে আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। গৃহের সর্ব্বত্র তাহাকে অত্যন্ত অবনত মস্তকে সমস্ত অব্যক্ত অপমানের বোঝা ঘাড়ে করিয়া জীবন কাটাইতে হইবে।

সুশীলা নীরবে সে স্থান হইতে উঠিয়া পা টিপিয়া আপন কক্ষে গেল। চাকরা উঠাইয়া আহার করিল। শয্যায় যাইবার সময় প্রতিজ্ঞা করিল যে, সে পিতামাতার নিকট ব্যবহারের দ্বারা প্রমাণ করিবে যে অনিলের প্রতি তাহার কিছুমাত্র আকর্ষণ নাই।

(৪)

হিতে বিপরীত হইল। অনিলের সহিত তাহার মনের কোনও সংযোগ নাই এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য সুশীলা যেরূপ ব্যবহার করিতে লাগিল তাহাতেই তাহার মাতার বিশ্বাস অধিকতর দৃঢ় হইল। পরের দিন যখন অনিলকে ট্রেণে উঠাইয়া দিয়া যোগেন্দ্র বাবু ফিরিয়া আসিলেন, তখন সুশীলা তাহার মায়ের কাছে বসিয়া ছিল। যোগেন্দ্র বাবু আসিয়াই অনিলের যাত্রার সম্বন্ধে আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

সুশীলা আদ্যোপান্ত নীরবে মুখ নামাইয়া অন্যমনস্ক ভাবে শুনিল, একটিও কথা কহিল না। অনেকবার তাহার মনে হইয়াছিল যে এরূপ অস্বাভাবিক নীরবতা তাহার পক্ষে ভাল হইতেছে না; তাহার একটা কিছু কথা বলা উচিত; কিন্তু কি বলিবে খুঁজিয়া পাইল না। শেষে তাহার ব্যবহার যে অত্যন্ত সন্দেহজনক হইতেছে এই লজ্জাকর চিন্তায়ই তাহার কথা কহিবার শক্তি লুপ্ত হইল, লজ্জায় কর্ণমূল পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। যোগেন্দ্র বাবু কন্যার এই অপ্রত্যাশিত নীরবতা ও সঙ্কোচ লক্ষ্য করিলেন, তিনি বিশেষ চিন্তিত হইলেন

এইরূপ প্রতিদিনের ব্যবহারে অনিল সম্বন্ধে কোনও আলোচনা বা তাহার সম্পর্কিত কোনও আলাপে যোগদান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াই সুশীলা তাহার পিতামাতাকে আরও দৃঢ় ভাবে বুঝাইল যে অনিলের প্রতি তাহার প্রেম অত্যন্ত গভীর। সুশীলাও সে কথা বুঝিল। অনিলের সম্বন্ধে কোনও কথায় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে ব্যবহার করিতে সে যথেষ্ট চেষ্টা করিল, কিন্তু চেষ্টা করিয়া কখনও স্বাভাবিক হওয়া যায় না। কোনও বিষয়ে স্বাভাবিক ব্যবহার করিব বলিয়া কোমর বাঁধিয়া বসিলেই ব্যবহারটা পদে পদে অত্যন্ত অস্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। এ কথা সুশীলা বিলক্ষণ অনুভব করিল। মনে বড় দুঃখ হইল, সে বড় কাঁদিল। দুঃখে কষ্টে তাহার জীবনের গতি সম্পূর্ণ ফিরিয়া গেল, তাহার শৈশবোচিত সরল উচ্ছৃঙ্খলতা গিয়া একটী বিষাদ-গম্ভীর ভাব তাহার প্রত্যেক কার্য্যে প্রত্যেক কথায় দেখা যাইতে লাগিল। তাহার পিতামাতা লক্ষ্য করিলেন যে অনিলের সহিত বিদায়ের পরই সুশীলার এই ভাবান্তর হইয়াছে।

সুশীলা সব বুঝিল, বুঝিয়া মর্ম্মে মরিয়া গেল। অন্তরে অন্তরে সে দারুণ অপমানের বোঝা বহিয়া দিন কাটাইতে লাগিল।

(ক্রমশ)

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত।

খেলা-ঘর

খেলা ঘর পাতিয়াছি দু'জনে আবার,
শুষ্ক তৃণ পত্র ঢাকা দারুণ আঁধার
তরুগৃহ, রত্নদীপ নহে প্রজ্বলিত,
রত্নপথে চন্দ্রালোকে নহে প্রভাসিত,
উষার প্রথমরাগে সুধাকণ্ঠ স্বরে
শুদ্ধতা উঠে না জাগি মুহূর্ত্তের তরে,
স্বপ্নহীন চিরনিদ্রা এ দীন ভবনে,
রবি করে প্রাণ বায়ু বহে না স্বনে,
বিশ্বরূপ নিরাকার শুধু অনুভবে
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্ব বুঝিব কি তবে,
আরাধা নূতন করি আপনার হিয়া,
সুবর্ণের বিনিময়ে ধূলি মুষ্টি নিয়া,
কার্য্যক্ষেত্র মরুভূমি ফল শস্য তার
লাগিবেন দেবভোগে, এমনি অসার
জীবনের আরাধনা, স্নেহ অন্নদানে
পরিতৃপ্ত করিবারে কাতরে জীবনে।
পাষাণে গৃহবাস, প্রভাতের খেলা,
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে হায়, পদোষের বেলা
ফুরাইয়া আসিয়াছে, তবু খেলা-ঘরে
ছায়াবাজী অভিনয় দু'দিনের তরে।

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী।

গ্রন্থ-সমালোচনা

জ্যোতিঃ—শ্রীহেমলতাদেবী প্রণীত। মূল্য দশ আনা।

আমরা নানা মাসিক পত্রিকায় লেখিকার অনেকগুলি কবিতা পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছি। কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'নৈবেদ্যে'র পর দিনকতক এরূপ ধর্ম্মমূলক কবিতা লেখা একটা ফ্যাসান হইয়াছিল। কিন্তু যে ধর্ম্মপ্রাণতা, যে গভীর অনুভূতি এই প্রকার কবিতাকে সফলতা দান করে, তাহা না থাকিলে শুধু নকল কেবল বিড়ম্বনা। কবিতা পুস্তক সমালোচনা করিতে গিয়া এরূপ বিড়ম্বনা আমাদের অনেক ভোগ করিতে হয়। আজ কিন্তু 'জ্যোতিঃ'র কবির কবিতাগুলি পড়িয়া বাস্তবিক বড় আনন্দ পাইলাম, সে আনন্দ এই পূজারিণী কবির আনন্দেরই অংশমাত্র।

"একই সত্তা অন্তরে বাহিরে-ভেদে প্রকাশমান আছেন, সত্যের এই অনন্ত ধারণাই মনুষ্যত্বের উদ্বোধক"—কবি স্বর্গগত পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর এই অমূল্য উপদেশ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তাই তাঁহার কবিতা

"বিশ্বে যিনি রসাধার
অন্তরে অমৃত সার
উদ্ভাসিত সর্ব্বে যাঁর
দীপ্ত মহিমায়—"

সেই 'জ্যোতিঃপ্রতিমা'র বন্দনাগানে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। তাই তিনি ব্যাকুল কণ্ঠে গাহিয়া উঠিয়াছেন :—

"শুন শুন বিশ্ববাসী গূঢ় সমাচার
অখণ্ড চেতনা সূত্রে গাঁথা এ সংসার
অখণ্ড মঙ্গলে তাঁর বিচিত্র বিধান
অখণ্ড আনন্দে তাঁর পূর্ণ পরিণাম।

অখণ্ড অভেদ ঐক্যলাভ করিবারে
ধাইছে সকল গতি বিচিত্র আকারে
বহুগতি হবে যবে একেতে মিলন
বিশ্বের পরমরূপ হবে দরশন।

বিচিত্রের মধ্যে, বহুর মধ্যে যিনি এক, যিনি 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ' যিনি আনন্দরূপ এবং রসাধার,—আজ যে কবি মুক্তকণ্ঠে তাঁহার জ্যোতিঃপ্রতিমার দিকে আমাদের হৃদয়-মন আকর্ষণ করিবেন, তিনি আমাদের মনুষ্যত্ব উদ্বোধনের সহায়তা করিবেন—তাই আজ শ্রীমতী হেমলতা দেবীর এই কবিতাগুলির পরিচয় দিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। কিন্তু কবি যে আনন্দের সংবাদ আজ আমাদের কাছে আনিয়াছেন, তাহার সমগ্র অনুভব করার শক্তি আমাদের নাই, কাজেই প্রভূত সমালোচনারও অধিকারী নহি। তাই শুধু গ্রন্থ পরিচয় মাত্র দিয়া ক্ষান্ত রহিলাম। তবে একটা কথা বলা উচিত মনে করি, জ্যোতিঃর কয়েকটি কবিতার মধ্যে 'তত্ত্বজ্ঞানের কথা একটু অধিক মাত্রায় আসিয়া পড়িয়াছে।' কাব্যে এত তত্ত্ব সন্নিবেশ করিলে কাব্যের সৌন্দর্য্যের হানি হয়।

---

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গদর্শন

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র

ধনপতি খুল্লনার সৎ সাহস ও বুদ্ধির প্রভাবে সমাজে পুনরায় প্রতিষ্ঠা লাভের পর কবি ধনপতিকে সিংহল পাঠাইয়াছেন এবং সিংহলে পাঠাইবার পূর্ব্বে তাহার চরিত্রের এক সুন্দর ভাগ দেখাইয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, ধনপতি একজন ইষ্টনিষ্ঠ সরল ভক্ত। ধনপতির ইষ্টদেবতায় ভক্তি এত দৃঢ় যে ইহার জন্য সে তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা খুল্লনার সহিতও মনোমালিন্য করিতে কুণ্ঠিত নহে। এই সরল ভক্তির প্রভাবে সংসারী ধনপতি সহসা একজন মানুষের মত মানুষ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। শক্তি ছাড়িয়া শক্তির উপাসনা হয় না তাহা তখনও ধনপতি শুনে নাই সত্য, কিন্তু এ ভ্রান্তি থাকিলেও তাহার চরিত্রের দৃঢ়তা তাহাকে অনেকটা 'মার্টার' (martyr) এর* মহত্ত্ব প্রদান করিয়াছে। ধনপতির সিংহলে যাইবার পথে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা সে সকল ঘটনা হইতে এইটুকু বুঝিতে পারি যে ধনপতি জীবনের প্রতি যথেষ্ট মমতাবান্ ছিল; হইবারই কথা; সে রূপবান্, যৌবনশালী ধনী ও সুখী; গৃহে দুই ভার্য্যা, তাহার মধ্যে এক জন পুত্রসম্ভবা রূপবতী ও গুণবতী। এমন অবস্থায় জীবনে কাহার না মমতা হয়? এইরূপ জীবনে আস্থা, প্রাণভরা আশা লইয়া ধনপতি সিংহলরাজের সভায় উপস্থিত হইল এবং তাহার কাছে স্বচক্ষে দৃষ্ট কমলে কামিনীর বর্ণনা করিল। সে অবশ্য জানিত না যে ইহা মহাশক্তির প্রপঞ্চমাত্র, অতএব নির্ব্বিবাদে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিল, কমলে কামিনী না দেখাইতে পারিলে দ্বাদশ বৎসর কারাগারে বাস করিবে। রাজা স্বপ্নবলে কমলে কামিনী দেখিতে গেলেন, কিন্তু কমলে কামিনী তখন অন্তর্ধান করিয়াছেন, অতএব ধনপতি রাজাকে সে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখাইতে পারিল না। ফলে, তাহার একান্ত যন্ত্রণাপ্রদ কারাবাস ও দ্রব্যাদি লুণ্ঠন ঘটিল। দারুণ যন্ত্রণাকর কারাগারে ধনপতি বন্ধনদশায় অবস্থিত, এমন সময় মহামায়া তাহাকে স্বপ্ন দিলেন "মহামায়াকে পূজা কর, তোমার বন্ধন মুক্ত হইবে, ধন ফিরিয়া পাইবে, আবার সুখ পাইবে। না করিলে তোমার নিস্তার

* যিনি নিজ ধর্ম্মমত সমর্থনার্থ সক্রিয় পথ করেন, তাঁহাকে ইংরাজী ভাষায় 'মার্টার' বলে।

নাই, খুল্লনা হাটে সুতা বেচিবে, তুমি অশেষ কষ্ট পাইবে।" ধনপতির উত্তর যথার্থ ভক্তবীরের মত—

যদি বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণী।
মহেশ ঠাকুর বিনা অন্য নাহি জানি॥
জীবন ত্যজিব যদি নৃপ কারাগারে।
ঠাকুর মহেশ বিনা না স্মরি কাহারে॥

এই উত্তর শুনিলেই আমাদের হৃদয়ে আর একজন মহাভক্তের কথা মনে আসে। যবন হরিদাস কৃষ্ণভক্তি অপরাধে যবনরাজ-করে অশেষ উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও এমনি সতেজ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। কবির মনে সেই মহাপুরুষের চিত্র সম্ভবতঃ উদিত হইয়াছিল। ধনপতি সংসারী, সংসারীর সকল দোষগুণ তাহার ছিল; তবু এরূপ উত্তর তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। কবি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন যে ধনপতি নির্গুণ নহে—

যেন রূপ তেন গুণ উত্তম বেভার।
দেব দ্বিজ গুরুভক্ত শুদ্ধ সদাচার॥
দানে বলি কর্ণ সম উচ্চ অভিলাষ।
নাটক নাটিকা কাব্য যাহার অভ্যাস॥

অতএব তাহার চরিত্রে এমন ভক্তি বা ইষ্টনিষ্ঠা দেখিলে আমরা বিস্মিত হই না, বরং মনুষ্যহৃদয়ের বৈচিত্র্য অনুভব করিয়া আশ্বাসিত হই। মনুষ্যত্ব—পশুত্ব ও দেবত্বের সমষ্টি। একটী মনুষ্যের চরিত্রেই পশুত্ব ও দেবত্ব এত পাশাপাশি এবং এমন আশ্চর্য্য ভাবে সংমিশ্রিত থাকিতে পারে, এবং এমন বিস্ময়জনকভাবে তাহাদের বিকাশ হয় যে অনেক সময় আমরা সহসা বুঝিতে পারি না যে এরূপ হওয়াও সম্ভব। মনুষ্যহৃদয়ের এই বৈষম্যময়ী বৃত্তি যিনি যথাযথ চিত্রিত করিতে পারেন তিনিই যথার্থ চিত্রকর। ধনপতির চরিত্রের এই উচ্চতা তাহার রূপজ মোহের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না, অথচ তাহার এই দৃঢ়ভক্তি তাহার প্রত্যেক কার্য্যেই কবি দেখাইয়াছেন। মুকুন্দরাম জানিতেন যে মানুষ শুধু দৈহিক বৃত্তি ও ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষা মাত্রের সমষ্টি নহে; এই সকলের সহিত তাহার আত্মা কার্য্য করিতেছে, দৈহিক বৃত্তির কার্য্য ও আত্মার কার্য্য সমান ভাবের নহে; অনেক সময় বিপরীত পথাবলম্বী; তাই তিনি যেমন এক দিকে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য দেখাইয়াছেন অপর দিকে তেমনি আত্মার কার্য্যও দেখাইয়াছেন। তিনি একটী মানুষকে সম্পূর্ণভাবে দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন। মুকুন্দরামের সংসারাভিজ্ঞতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত, তাই তিনি সংসারের জীবগুলিকে তাহারা যেমন ঠিক তেমনই দেখিয়াছেন। তিনি ধনপতির দেহ মন হৃদয় ও আত্মা এ সকলেরই খবর লইয়া ধনপতিকে চিত্রিত করিয়াছেন। ধনপতির ইন্দ্রিয়বিকার আছে, কিন্তু ধনপতি হৃদয়হীন নহে, কবি তাহাকে পরের জন্য কাঁদাইতে পারিয়াছেন। বাঙ্গাল মাঝির পরিবারের জন্য সে দুঃখিত। মুকুন্দরাম কেবল কামের চিত্রই আঁকেন নাই; রূপজ মোহ দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাহারই সঙ্গে আত্মার কাছে এই মোহের পরাজয়ও দেখাইয়াছেন। ধনপতির প্রবল সংসারাসক্তি ও প্রাণের মায়া আছে, সংসারে তার অশেষ সুখের সম্ভাবনা আছে, সে প্রাণ রাখিতে চাহে। কিন্তু অতুল সুখ, সুখময় প্রাণ, দারুণ যন্ত্রণার ভয়, এ সকল

তাহার দৃঢ়ভক্তিকে টলাইতে পারে না, সেই একনিষ্ঠতার পরিবর্ত্তে সে শাপকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে, যন্ত্রণাকে অগ্রাহ্য করিতে পারে। এই ক্ষুদ্রত্ব ও মহত্ত্বের সমষ্টি ও রহস্যময় সংমিশ্রণে মানুষ, মানুষ। মানুষ এক দিকে যেমন নিয়বচ্ছিন্ন পশু নহে, অপর দিকে তেমনি কেবল আদর্শচরিত্র লইয়া বিচরণ করে না।

এ সংসারও ঠিক তেমনি রহস্যময়। এখানে যেমন হাসি আছে তেমনি ক্রন্দন আছে, যেমন দুঃখ আছে তেমনি সুখও আছে, দুই পাশাপাশি চলিয়াছে। ধনপতিকে কারাগারে অশেষ যন্ত্রণার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াই কবি স্বচ্ছন্দচিত্তে খুল্লনার সাধ-ভক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন। মুকুন্দরাম দৃঢ়ভক্তি দেখাইয়াছেন, অথচ সেই দৃঢ়ভক্ত ধনপতিকেও বিপদে ফেলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মহামায়ার ইচ্ছাই যে সংসারে প্রবল, কবি তাহাই দেখাইয়াছেন। মহামায়ার ইচ্ছাতে ধনপতি খুল্লনার প্রতি আসক্ত, আবার তাঁহার ইচ্ছাতেই সে তাহার প্রতি বিরক্ত। মহামায়ার ইচ্ছাতেই সে বিপদগ্রস্ত আবার তাঁহারই কৃপায় সে বিপন্মুক্ত; যতদিন মহামায়ার কৃপা না হইয়াছিল ততদিন সে শক্তি-বিচ্যুত শক্তকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল. যখন তাঁহার কৃপা হইল তখন তাহার জ্ঞান-চক্ষে শক্তিসমন্বিত শক্তের আবির্ভাব হইল। নিষ্ক্রিয় ঈশ্বর তাহাকে কূপ ধন মান দিতে পারেন নাই, শক্তির কৃপাতে সে আবার সব ফিরিয়া পাইল। কিন্তু এই যে মহামায়ার লীলা, ইহা মনুষ্যের চক্ষে অনেকটা রহস্যময়ী। অনেকে তাহাকে খামখেয়ালিও বলিতে পারেন। তাই যে সময়ে ধনপতি শক্ত ও শক্তির নিত্য সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া শরীর মন আত্মা পবিত্র করিতে পারিল, ঠিক সেই সময়েই কবি মহামায়ার দ্বারা তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করাইলেন. এ অপহরণ ধনরত্নের তুচ্ছ অপহরণ নয়, একেবারে তাহার কাছ হইতে তাহার প্রিয়তমা পত্নী খুল্লনা, প্রিয়তম পুত্র শ্রীমন্ত ও তাহার দুই পত্নীকে চিরকালের জন্য অপসৃত করাইলেন। মহামায়ার ইচ্ছা ভিন্ন ইহার আর কোনও কারণ নাই। সংসারে এমন ঘটনা নিত্য সংঘটিত হইয়া থাকে, কবি তাহা জানিতেন। এ সকল ঘটনায় মহামায়ার শাপ ও মহামায়া কর্ত্তৃক শাপ-বিমোচন ভিন্ন অন্য কোনও কারণই নাই, তাহা আমরা কত বার লক্ষ্য করিয়াছি। আমাদের বুদ্ধিতে সংসারের এই গভীর রহস্য অধিকাংশ সময়েই বিশ্বনিয়ন্ত্রী শক্তির খামখেয়ালি এবং অবিচার বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে, কিন্তু ভক্তকবি মুকুন্দরাম ইহাতে মায়ের ইচ্ছা স্পষ্ট দর্শন করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে থাকিতে পারিয়াছেন।

ধনপতির চরিত্র ও শ্রীমন্তের চরিত্র তুলনায় সমালোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, মহামায়ার ইচ্ছাই জগতে প্রবল। শ্রীমন্ত সরল বুদ্ধিমান্ উদ্‌যোগী বালক—জননীর শিক্ষায় মহামায়ার শক্তির উপর দৃঢ় বিশ্বাসশালী। এ চরিত্রটী একটী সরল রেখায় অঙ্কিত, ইহার ভিতর কোনরূপ মারপেঁচ নাই। এই সরলস্বভাব বীর্য্যসম্পন্ন বালকের চারি ধারে কবি আরও অনেকগুলি চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের সকলগুলি এই

চরিত্রের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিয়াছে। বালক শ্রীমন্ত মহামায়ার স্নেহের ধন—কবি মুকুন্দ-রামের প্রিয় মানস-পুত্র, কিন্তু তাই বলিয়া সে শান্ত "পিঠু" "গো-বেচারা"—আজকাল-কার বাঙ্গালীর ছেলের গর্ব্বের বিষয় নহে; সে বিলক্ষণ দুষ্ট, খেলায় সাথীদের নাকাল করিয়া আনন্দ অনুভব করে। খেলায় সে খুব মজবুত, বাল্যকালে সব খেলাই তাহার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু বালক খেলিতে যেমন মজবুত, পড়িতেও তেমনি; যখন পড়ায় মন দিল তখন তাহার স্বাভাবিক তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রভাবে অল্পকালেই বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিল। শুধু বিদ্যা-শিক্ষা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে তাহার জিজ্ঞাসা-প্রবৃত্তিও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। এই জিজ্ঞাসা-ব্যাপার লইয়াই শ্রীমন্তের জীবনস্রোত পরিবর্ত্তিত হইল। এক দিকে স্বীয় সরল প্রশ্নের গুরুকৃত "কৃষ্ণের ইচ্ছা"-রূপ সমাধানে অসন্তুষ্ট, পুনঃ-পুনঃকারী তীক্ষ্ণবুদ্ধি জিজ্ঞাসু বালক; অপর দিকে সেই প্রশ্নের মীমাংসায় অসমর্থ অসংযতচিত্ত ক্রোধী গুরু—অসঙ্গত উচ্ছৃঙ্খল ভাষায় শিষ্যতাড়নকারী চপলস্বভাব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ; এই দুই চিত্র কবি স্বাভাবিক ভাবে বর্ণিত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ কবি ব্রাহ্মণের পতন উজ্জ্বল বর্ণে দেখাইয়াছেন। এই অসংযতচিত্ত ব্রাহ্মণ শুধু শিষ্যকে অকারণ মর্ম্মপীড়া ও কুৎসিৎ গালাগালি দিয়া ক্ষান্ত হইল না, তাহার জননীকেও অকথ্য ভাষায় গালি দিল। জনার্দ্দন ওঝা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত নহে, বার্দ্ধক্য-সুলভ কোপন-স্বভাব ও আত্মাভিমান তাহাকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিল, সে এই দুই দোষের বশবর্ত্তী হইয়া নিরীহ বালকের হৃদয়ে বিষ ঢালিয়া দিতে কুণ্ঠা বোধ করিল না। পুত্রবৎসলা জননীর হৃদয়েও সে কুৎসা-কালকূট ঢালিয়া দিয়া তাহার জ্বালা নিবারণ করিল। যেমন জনার্দ্দন-চরিত্র, তেমনি তাহার স্ত্রী-প্রতিরূপ লহনা। সেও মায়ের প্রাণের ঔৎসুক্য ও ব্যথা বুঝিতে না পারিয়া খুল্লনাকে যথেষ্ট মর্ম্মপীড়িত করিতে ছাড়িল না—ঈর্ষা বড় নির্ম্মম, বড় কুৎসিত। ওথেলোর স্বপ্ন দেখিয়া ঈর্ষা-প্রপীড়িত ইয়াগো রাগের কোনও কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া বলিয়াছিল "I hate the Moor" (আমি মূরকে ঘৃণা করি)। লহনার মনেরও ঠিক সেই অবস্থা। কবি লহনার মুখে যে গালি বসাইয়াছেন তাহা লহনারই উপযুক্ত, জনার্দ্দন ওঝার মত সভ্য ভাষায় প্রযুক্ত নহে। মুকুন্দরাম নাট্যকার, তাঁহার পাত্রগুলি যেমন কথা কয় তিনি ঠিক সেই রকম লিখিয়া থাকেন। "উহার হাতে রান্ধা পাঁথা উহার পোরা গা। ঐ সে পরে পাটের শাড়ী ঐ সে সুতের মা॥" এই সকল কথার ভিতর হইতে হিংসা-বহ্নি ধক্ ধক্ করিয়া ফুটিয়া পড়িয়াছে।

যাহা হউক গুরুর এই বিষময় বাক্য শ্রীমন্তের চরিত্রে বিশেষ পরিপুষ্টই হইয়াছে—তাহার বিশেষ উপকারই সাধিত করিয়াছে। গুরুর এই অভব্য ব্যবহারে, সুখের কোলে পালিত, মাতৃস্নেহের নিবিড় আলিঙ্গনাবদ্ধ শ্রীমন্তের পিতৃদর্শন ও পিতার উদ্ধার-সাধন করিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। মায়ের প্ররোচনা, রাজার উপদেশ কিছুতেই তাহার সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা টলাইতে পারিল না।

ইহার ফলে শ্রীমন্ত কর্তৃক ধনপতির উদ্ধার সাধন হইল। কবি এই মধুর-হৃদয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বালকের চরিত্র বড় করুণ বড় সরল ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। ইহার সুখে আমরা সুখী হই ইহার দুঃখে দুঃখী না হইয়া থাকিতে পারি না, শ্রীমন্ত আমাদের আত্মীয় হইয়া পড়ে। ইহার কাতরতায় কঠিনহৃদয় কোতোয়ালেরও হৃদয় দ্রব হয়; ইহার ছোট ছোট দুর্ব্বলতাগুলিও আমাদের মিষ্ট লাগে। যতটুকু পর্য্যন্ত এই মিষ্টত্ব থাকিতে পারে কবি মুকুন্দরাম সেই পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াই শ্রীমন্তকে কাব্য হইতে অপসৃত করিয়াছেন। শ্রীমন্ত সংসারে থাকিয়াও সংসারের ধূলা কাদা মাখে নাই—ইহার ধূলা কাদা মাখা মূর্ত্তি দেখিতে আমাদের ভাল লাগিত না—কবির সূক্ষ্ম দৃষ্টি তাহা দেখিতে পাইয়াছিল।

শ্রীমন্তের চরিত্রের আশে পাশে কবি আর কতকগুলি চিত্র আঁকিয়াছেন—এবং কতকগুলি চরিত্র পুষ্টও করিয়াছেন। রাজা শালিবাহন তাহার মধ্যে এক জন। এই চরিত্রটী বোধ হয় কবি তাৎকালীন কোনও অত্যাচারী ভূমাধিকারীর চরিত্র দেখিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন, অথবা ইহাতে হয় তো ডিহিদার মহম্মদ শরিফের চিত্রের ছায়াপাত হইয়া থাকিবে। স্বার্থপর অত্যাচারী রাজার একটী নিরীহ বালককে বধ করিবার যেরূপ উৎসাহ, যে-কোনো অছিলা করিয়া পরস্বাপহরণে যেমন আগ্রহ—আবার "চাপ পড়িলে বাপ" বলিতেও তেমনি আগ্রহ। এইরূপ ক্ষুদ্র-চেতা লোক আমরা সংসারে প্রায়ই দেখিতে পাই। ধনপতি ইহার ও ইহার রাজ্যের লোকের যে বর্ণনা করিয়াছে তাহার এক বর্ণও মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না। এই ব্যক্তি শ্রীমন্তকে অসহায় দেখিয়া তাহার শত করুণ বিনয় অগ্রাহ্য করিয়া তাহার প্রাণ-হরণে উদ্যত হইয়াছিল, আবার তাহাকে শক্তির অনুগৃহীত দেখিয়া তাহার চরণে কন্যা উৎসর্গ করিতেও কুণ্ঠিত হইল না। শ্রীমন্তের বিবাহ লইয়া কবি বহুবিধ রসের অবতারণা করিয়াছেন—তন্মধ্যে করুণ রসই প্রধান। সুশীলার মাতার চিত্রটী বড় মনোরম। বলা বাহুল্য কন্যা-বিদায়ে জননীর ক্রন্দন এত করুণ ও এত স্বাভাবিক যে স্বভাবত করুণরসাবতারণে সিদ্ধহস্ত কবি এই ব্যাপারটীকে "মেয়ে কান্না" বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। সঙ্গে সঙ্গে জামাতাকে আরও কিছুদিন রাখিবার জন্য রাজরাণীর নানাবিধ কৌশল ও বাক্‌জাল-সৃজন কবি সুন্দর ও নির্ম্মল হাস্যরসের সাহায্যে বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মুকুন্দ কবির হাস্যরস কোথাও পঙ্কিল নহে, ইহা সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা উপভোগ-যোগ্য। মুকুন্দরামের হাস্যরস কোথাও ভাঁড়ামিতে নামে নাই। বরঞ্চ আমরা দেখিতে পাই যে মুকুন্দরাম অধিকাংশ স্থলেই মনুষ্য-চরিত্রের কোনও উপহাস্য বা নীচ অংশ অবলম্বন করিয়া তাঁহার হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন, অথবা তাঁহার হাস্যরস নিপুণ ভাবে করুণরসের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। সেক্সপীয়রের মতন তাঁহার হাস্যরসিকতা (humour) সংসারকে সম্পূর্ণ ভাবে দেখিবার ফলে বৈচিত্র্যময়। যে হাস্যরসের সাহায্যে তিনি মুরারি শীল, বা ভাঁড়দত্ত অথবা দুর্ব্বলা

দাসীর সৃষ্টি করিয়াছেন—সে হাস্যরস, খুল্লনার ধনপতির সহিত প্রথম সাক্ষাতে যে হাস্যরস ছুটিয়াছে, অথবা ফুল্লরার সহিত ভগবতীর কালকেতুকে লইয়া পরিহাসে যে হাস্য বিকশিত হইয়াছে কিম্বা উল্লিখিত রাজরাণীর কৌশল বিস্তারে যে হাস্যরস দেখা যাইতেছে, তাহারা সকলেই বিভিন্নজাতীয়, মনুষ্য-হৃদয়ের বিভিন্ন বৃত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, এবং মনুষ্যের নানা অবস্থার নানা ভাব অবলম্বনে প্রসূত। সমগ্র মনুষ্য-চরিত্রের উপর এই প্রশস্ত ও বিপুল শাস্ত দৃষ্টিই মহাকবির লক্ষণ এবং ইহা দ্বারাই কবি-কঙ্কণের মনুষ্যচরিত্রের সহিত আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ পাইতেছে। বাঙ্গালীর সংসারে কন্যার বিদায়, বিজয়ার মহামায়ার প্রতিমা বিসর্জ্জনের মত একটী অব্যক্ত ব্যথার সৃজন করে; সেই ব্যথার সহিত এই হাস্যরসের মিশ্রণ বৃষ্টির সহিত রৌদ্রের সম্মিলনের ন্যায় অশ্রু ও হাসি দুই লইয়া বিরাজ করিতেছে।

কিন্তু এত আদর এত কৌশল, শঙ্খের বিলাপ বিদ্রূপ, শ্বশুরের অনুরোধ, পত্নীর সোহাগ বহুবিধ আমোদের প্রলোভন কিছুতেই শ্রীমন্তকে বশীভূত করিতে পারিল না। আজ তাহার হৃদয় মাতৃদর্শনাকাঙ্ক্ষায় এত লালায়িত যে সে স্বচ্ছন্দে এই নাগপাশ ছিন্ন করিয়া ফেলিল। সে বুঝিয়াছিল

যার মা থাকে সে আনন্দে প্রাণ পায়।
যার মা না থাকে সংসার না জুয়ায়॥

আজ আমরা এই সুন্দর ভাব ভুলিতে বসিয়াছি—কিসের লোভে? কিসের লোভে আমরা স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীকে পর করিয়া "বাঙ্গালী-চরিত্রের" পত্নী ভক্তির আদর্শ হইয়া উঠিতেছি? হায়! বাহ্য-চাকচিক্যময় বিলাতী সভ্যতা তোমার আপাতমনোরম ভৌতিক আলোকে আমাদের চক্ষু এত আকৃষ্ট হইয়াছে যে আমরা নিজস্ব ভুলিয়া অনলাভিমুখী পতঙ্গের ন্যায় তোমার কবলিত হইয়া কৃতার্থ হইতেছি। আমরা আজকাল সকলেই জ্যেষ্ঠ, সকলেই সমাজসংস্কারক, সকলেই বচনবাগীশ—হায় সকলেই ভাই ও ভগিনীকে ফেলিয়া ডালক-ডালিকাকে মাথায় করিতে শিখিয়াছি। এই অন্ধকারে শ্রীমন্তের মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি আমাদের কি অল্প আলোকও দিতে সক্ষম হইবে না? কোনও সমালোচক দুঃখ করিতেছেন যে কবিকঙ্কণের পুরুষ-চরিত্রগুলি নিজের বলে দাঁড়াইতে পারে না, এবং কবিকঙ্কণ ভাল বিষয় পাইয়াও শিল্পীর ন্যায় তাহার সুব্যবহার করিতে পারেন নাই। কথাটা কি সত্য? এ কথা সত্য বটে কবিকঙ্কণের পুরুষগুলিই বল, স্ত্রীগুলিই বল সকলেই প্রথমে না হোক শেষ পর্য্যন্ত দেবশক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু যথার্থ ভাবিয়া দেখিলে ঐশীশক্তিতে বিশ্বাস করা ভিন্ন আর কোনও পথ আছে কি? কিসের জন্য পিতৃ-উদ্ধার ব্রতে ব্রতময়ী কর্ত্তিলিয়াকে সেক্সপীয়র মারিয়াছেন? কিসের জন্য পতিচিন্তাময়ী শকুন্তলাকে কালিদাস অত কষ্ট দিয়াছেন? তাঁহারা বুঝিতেন যে জগৎপরিচালিনী ঐশীশক্তির অচিন্ত্য রহস্যের সর্ব্বসময়েই বেশ বিশদ ব্যাখ্যা করা যায় না, সে রহস্য সর্ব্বদাই আমাদিগের বুদ্ধি ও চিন্তাকে পরাভূত করিয়া

আপনার কার্য্য সাধন করিয়া চলিয়াছে। ঠিক এই কথাই মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্যে বুঝাইয়াছেন। তাঁহার সৃষ্ট নরনারীরাও নিজ নিজ অদৃষ্টলিপির অনুযায়ী কার্য্য করিয়া গিয়াছে, ফলাফল চণ্ডীর ইচ্ছার অনুসারে হইয়াছে। বালক শ্রীমন্ত নিজের ইচ্ছাতেই পিতার উদ্ধার সাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছিল, সে সময়ে কে তাহাকে প্ররোচিত করিতে আসিয়াছিল? বিপদে পড়িয়া সে মা বিপদ্-বারিণীকে স্মরণ করিয়াছিল ইহা কি তাহার চরিত্রের দোষ? পিতার উদ্ধার সাধন না করিয়া সে চণ্ডীরও অনুরোধ রক্ষা করে নাই। এই অটল প্রতিজ্ঞাই তো শ্রীমন্তের চরিত্রের মূল ভিত্তি। ধনপতি যে অত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও অনায়াসে চণ্ডীর প্রলোভন উপেক্ষা করিল, ইহা কি চরিত্রের, নিজের বলে দাঁড়ান নহে?

আখ্যান-বস্তুর ব্যবহারে শিক্ষা-কৌশল আছে কি না আমাদের অতটা দেখিবার প্রয়োজন নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কবিকঙ্কণের কাব্যে ঘটনাপরম্পরা স্বাভাবিক ভাবে ঘটিয়া গিয়াছে। মনুষ্য-চরিত্রের বিকাশ কবির প্রধান লক্ষ্যস্থল। তাঁহার আখ্যাত-বস্তুর সুব্যবহারের (Plot interest) প্রতি তত সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকে না, সেক্সপীয়রেরও এই দোষ আছে। Furnivall (ফার্নিভাল) বলিয়াছেন—

"In the construction of his dramas Shakespeare's weakness seems to me to spring from his strength. That was characterisation. Give him a story that afforded scope for development of character, and he did not care much for a plot···Shakespeare cared for life and didn't bother himself about subject, object, idea, teleology, &c"

অর্থাৎ সেক্সপীয়রের নাটকগুলিতে যে দোষ আছে তাহা তাঁহার গুণ হইতে প্রসূত হইয়াছে—সে গুণ তাঁহার চরিত্র-সৃষ্টির ক্ষমতা। মনুষ্যচরিত্র বিকশিত করিতে পারা যায়—এমন একটী গল্প পাইয়া তিনি আখ্যান-বস্তুর সজ্জার জন্য চিন্তিত হইতেন না। তিনি মনুষ্যজীবনের অভিব্যক্তি দেখিতেন—বিষয়, উদ্দেশ্য, ভাব বা কার্য্য-কারণাদিকে গ্রাহ্যই করিতেন না।

আমরা এই নিবন্ধ মধ্যে যতদূর সম্ভব দেখাইতে প্রয়াস করিয়াছি যে মুকুন্দরামও মনুষ্যচরিত্রের বিকাশের প্রতিই আস্থাবান্ ছিলেন। ইহা হইলেও আমি এমন বিবেচনা করি না যে মুকুন্দরাম তাঁহার আখ্যান-বস্তুর নিতান্ত অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীমন্তো-পাখ্যানের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত গল্পটীতে অসঙ্গতি কোথাও আছে কি? পিতৃবৎসল পুত্র পিতার উদ্ধারের জন্য বহু কষ্ট সহ্য করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিল। দুঃখাবসানে এত সুখের মাঝেও তাহার দুঃখিনী জননীকে মনে পড়িয়া গেল, সে আর দেশে না গিয়া থাকিতে পারিল না। কোন প্রকার অনুরোধ বা প্রলোভন তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। তাহার পর পিতাকে স্বদেশে আনিয়া তাঁহার হৃদয়ে জ্ঞান-সঞ্চার দেখিয়া সে ধন্য হইল। আর তাহার জীবনের কার্য্য বাকী রহিল

না—কবি তাহাকে সংসার হইতে সরাইয়া লইলেন। দুই পত্নীর কথা অনেক কাব্যে আছে, কিন্তু কোন্ কবি তাহারই ভিতর হইতে একটী খুল্লনার সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন? আমি বুঝিতে পারি না যে শিল্পীর মত আখ্যান-বস্তুর ব্যবহার কেমন করিয়া করিতে হয়। বোধ হয় দুই একটা খুন-খারাপি, এক আধটা আত্মহত্যা প্রভৃতি না থাকিলে আজকালকার হিসাবে আখ্যানটা সম্পূর্ণ বা জমকালো হয় না। অন্ততঃ গোটাকতক নিরাশ-প্রণয়ের হা-হুতাশ থাকা তো চাই-ই!

শ্রীমন্তোপাখ্যানের শেষভাগে উপস্থিত হইয়াও আমরা কবির চরিত্রচিত্রণ ক্ষমতার ও সূক্ষ্মদৃষ্টির বিশেষ পরিচয় পাই। কবি শ্রীমন্তকে যে স্থলে উপস্থিত করাইয়াছেন, সে স্থলে আসিয়া শ্রীমন্ত সংসারের পঙ্কিল ধূলি ঝাড়িবার অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। সামাজিক নিয়মবশে সে একাধিক বিবাহ করিয়াছে। যদি কবি শ্রীমন্তকে আর অধিক দিন সংসারে রাখিতেন তাহা হইলে শ্রীমন্তের আর এক মূর্ত্তি আমাদিগকে দেখিতে হইত, কিন্তু নিপুণ শিল্পী মুকুন্দ কবি ঠিক এই সময় শ্রীমন্তের জীবনের উপর যবনিকা ক্ষেপণ করিয়াছেন। যাহারা চরিত্রের বিকাশ দেখিতে চাহেন তাঁহারা লহনার অভিমানের ও সুশীলার অভিমানের মধ্যে যে সূক্ষ্ম বিভেদ আছে, এবং ধনপতি কর্ত্তৃক লহনার অভিমান শান্তি ও শ্রীমন্ত কর্ত্তৃক সুশীলার অভিমান শান্তির ভিতরেও যে পার্থক্য আছে তাহা অনুভব করিয়া সুখী হইবেন। যে পর্য্যন্ত শ্রীমন্তের চরিত্রের মিষ্টত্ব নষ্ট হয় নাই—সেই পর্য্যন্ত কবির এই কাব্যে শ্রীমন্তের প্রয়োজন আছে ইহার পর আর তাহার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু শ্রীমন্তের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি তাহার পিতার দেহের উদ্ধার নহে—তাহার আত্মার উদ্ধার। ধনপতি ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া নিজের পুরুষত্বের দর্পে আচ্ছন্ন হইয়া, শিব ও শক্তিতে প্রভেদ দেখিত; কোনও "মেয়ে দেবতা" পূজা না করিবার জন্য তাহার একটা মস্ত অহঙ্কার ছিল. এই মেয়ে দেবতা পূজার জন্য সে খুল্লনার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিল অত দুঃখ কষ্ট হইতে যে পুত্র আত্মজীবন তুচ্ছ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিল, সে পুত্রকেও সে কুলঘ্ন পুত্র বলিয়া তিরস্কার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। ইহা দৃঢ়ভক্তির লক্ষণ সন্দেহ নাই, এবং এই দৃঢ়ভক্তি ধনপতির চরিত্রে উচ্চতা প্রদান করিয়াছে সেও সত্য, কিন্তু এ ভক্তি ভ্রান্ত ভক্তি, কারণ ইহার ভিত্তি নাই। শক্তি ও শক্ত সর্ব্বদা সম্মিলিত, পুত্রের প্রসাদে সে এই শিক্ষা পাইয়াছিল; পুত্রের প্রতি কৃপা করিয়া ভগবতী পিতাকে শিব ও শক্তির নিত্য সম্মিলিত মূর্ত্তি দেখাইয়া ভ্রান্ত ধনপতিকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। যে মুহূর্ত্তে ধনপতি নিজের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া, শিবসম্মিলিতা শক্তিকে প্রণাম করিয়া আত্মার উদ্ধার সাধন করিল সেই মুহূর্ত্ত তাহার জীবনের অনন্ত মুহূর্ত্ত; শুধু তাহার জীবনের নহে শ্রীমন্তের জীবনেরও অনন্ত মুহূর্ত্ত। কবি মুকুন্দরামের ইহাই সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা।

এ শিক্ষা দিবার জন্ত কবি কোনও বড় বড় কথা ব্যবহার করেন নাই, কোনও মত দার্শনিক সমস্যার অবতারণা করেন নাই, যেমন স্বাভাবিকতার সহিত তাঁহার সকল কথাই ব্যক্ত হইয়াছে,—তাঁহার কাব্যের যাহা সাধারণ লক্ষণ,—তেমনই স্বাভাবিক ঘটনা-পরম্পরা দ্বারাই ধনপতির চরিত্রের এই সুন্দর পরিণতি। ইহার সহিত অতিপ্রাকৃত মিশিয়াছে সত্য ; কিন্তু তাহা দ্বারা ধনপতির চরিত্রের ক্রমবিকাশের কোনও ক্ষতি হয় নাই।

কাব্যে যাঁহারা সর্ব্বদা বড় কথার অন্বেষণ করেন তাঁহাদের মুকুন্দরামের কাব্য দূরে রাখা ভাল, কারণ মুকুন্দরাম কথা সাজান না, ভাব ব্যক্ত করেন। যাঁহারা ভাবমাত্র খোঁজেন তাঁহারাও মুকুন্দরামের কাব্যে তৃপ্ত হইতে পারিবেন না ; কারণ মুকুন্দরাম জানিতেন যে মনুষ্য শুধু ভাব লইয়াই জগতে তিষ্ঠিতে পারে না। যাঁহারা কেবল আদর্শ খুঁজিয়া বেড়ান তাঁহারাও মুকুন্দরামের কাব্য পাঠে সে অভাব পূর্ণ করিতে পারিবেন না, কারণ মুকুন্দকবি মনুষ্য আঁকিয়াছেন, আদর্শ গড়েন নাই। কিন্তু যাঁহারা যথার্থ মনুষ্য-জীবনের চিত্র দেখিতে চাহেন, যাঁহারা মনুষ্যের ক্ষুদ্রত্ব, মহত্ব, সাধারণত্ব এ সবেরই সহিত সহানুভূতি করিতে পারেন, যাঁহারা মনুষ্যচরিত্রের সদ্গতি চিত্রিত দেখিতে ইচ্ছা করেন, যাঁহারা মত-পোষণ বা মত সমর্থন ও প্রকটন দ্বারা কাব্য পুষ্ট হয় এ কথা মনে না ভাবেন, যাঁহারা যথার্থ রসগ্রাহী ও রসপিপাসু, তাঁহারা মুকুন্দ-রামের চণ্ডীকাব্য পাঠ করিয়া, একাধারে কাব্য ও নাটকের রসাস্বাদন পূর্ব্বক কৃতার্থ হইতে পারিবেন সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। এই পুরাতন কাব্যে কথার চাকচিক্য নাই, কিন্তু সারবত্তা আছে ; ভাবের গৌরাম্ব্য নাই, অথচ ভাবের নিরাবিল প্রবাহ আছে ; রসসৃষ্টির বিকট প্রয়াস নাই, কিন্তু রসের পরিপক্কতা আছে। ইহাতে দার্শনিকতার কঠোরত্ব নাই, অথচ দার্শনিকের সারতত্ত্ব আছে, স্বদেশ-প্রেমিকতার বাগাড়ম্বর নাই, কিন্তু স্বদেশের মনুষ্যগণের প্রতি ভালবাসা আছে ; দেশের কথা আছে, দেশের আচার-ব্যবহার, সুখশান্তি, দুঃখদুর্দ্দশা সকলই প্রতিবিম্বিত আছে। যদি সংযত সৌন্দর্য্যের কোনও আকর্ষণ থাকে, যদি সংযমের কোনও মাহাত্ম্য থাকে তো এই প্রাচীন দরিদ্র গ্রাম্য কবি আজকালকার সকল কবির উপরে স্থান পাইবার যোগ্য, ইহাই আমরা এতক্ষণ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

ভারতচন্দ্র ও মুকুন্দরাম দুই যুগের দুই কবি, দুইজনেই ক্ষমতাশালী, দুইজনেই দেশের কথা, বাঙ্গালীর কথা, ঘরের কথা কহিয়াছেন। কিন্তু দুজনের বলিবার প্রথায় তেমনি প্রভেদ, যেমন সূর্য্যালোকে ও চন্দ্রালোকে প্রভেদ। ভারতচন্দ্রের চরিত্র-সৃষ্টি ও মুকুন্দরামের চরিত্র-সৃষ্টি বিচার করিয়া আমরা সেই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। মুকুন্দরাম আসল—ভারতচন্দ্র নকল ; মুকুন্দ-রাম সম্পূর্ণ—ভারতচন্দ্র অংশ ; ভারতচন্দ্র হাসি, মুকুন্দরাম মনুষ্যত্ব ; ভারতচন্দ্র উচ্ছৃঙ্খল, মুকুন্দরাম সংযত। তাই উপসংহারে আবার বলি মুকুন্দরামের চণ্ডী কাব্যের মতন আর একটী কাব্য যদি বাঙ্গলায় হয় তো

তাহা হইয়া কাজ নাই, এ কথা আমরা কখনই সাহস করিয়া বলিতে পারি না। আমাদের বিশ্বসংসার এই শ্যামলা শুভ্রজ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনী শুভদা বরদা বঙ্গভূমি; তাই বলি, হে আধুনিক বঙ্গকবি! একবার বিশ্বজগৎকে হৃদয় হইতে সরাইয়া রাখিয়া এই সুফলা সুফলা বঙ্গভূমির মূর্ত্তিটী দেখাও দেখি, সামুদ্রার দরিদ্র ব্রাহ্মণ কবির মত বঙ্গমাতার সন্তানগুলিকে একবার বাঙ্গালীর সম্মুখে দাঁড় করাও, ভাই ভাইকে দেখিয়া তৃপ্ত হউক, সন্তান মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া এই পুণ্যভূমির প্রেমে আবদ্ধ হউক। আজকালকার এত কাব্য এত সভ্যতার দিনেও আমি জোর করিয়া বলিতে পারি যে এই অমার্জ্জিত দরিদ্র গ্রাম্য কবি মুকুন্দরাম "মুকুন্দসম বাঙ্গালীর গানে"—অদ্বিতীয়; আজ এত আস্ফালনের, এত বড় কথার দিনেও কবি মুকুন্দরাম আমাদের শিক্ষার স্থল, আমাদের একমাত্র জাতীয় কবি। তাঁহারই কাব্যে আমরা "বাঙ্গলার মাটী, বাঙ্গলার জল" দেখিয়া তৃপ্ত হই, তাঁহারই কাব্যে আমরা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অতীত বার্ত্তা জানিতে পারি। তাই আমরা মুকুন্দরামের অমর কাব্যচর্চ্চা করিয়া আধুনিক কাব্যগগনের সমুদিত রবির সহিত প্রাণ মন ও তান মিশাইয়া বলিতেছি —

"কে বলে তোর দরিদ্র ঘর?
হৃদয়ে তোর রতন রাশি:
জানি গো তোর মূল্য জানি
পরের আদর কাড়ব না মা!
আমি তোমায় ছাড়ব না মা!
মানের আশে দেশ বিদেশে,
যে মরে সে মরুক ঘুরে;
তোমার ছেঁড়াকাঁথা আছে পাতা
ভুলতে সে যে পারব না মা!"

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

মানবের জন্মকথা

হোয়েওয়েল সুন্দর প্রশ্ন করিয়াছেন, "সর্ব্বজাতীয় স্ত্রীলোকেরই মাতৃস্নেহের দৃষ্টান্তগুলি এবং সকল জন্তুর স্ত্রী-গণেরই মাতৃস্নেহের উদাহরণগুলি পাঠ করিয়া কে সন্দেহ করিতে পারে যে উভয় স্থলেই তুল্য কারণ বিদ্যমান নাই?" অতিসম্ম সামান্য সামান্য বিষয়েও মাতৃস্নেহের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। রেঞ্জার দেখিয়াছিলেন যে সিবাসজাতীয় একটী আমেরিকান বানর তাহার শিশুসন্তানের দেহ হইতে মাছি তাড়াইতেছিল, এবং ডুবান্‌সেল দেখিয়াছিলেন যে হাইলোবেট্‌স্ জাতীয় একটী বানর স্রোতের জলে তাহার শিশুসন্তানগুলির মুখ ধোয়াইয়া দিতেছে। ব্রেম উত্তর-আফ্রিকায় যে সকল বানর ধরিয়াছিলেন তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন শ্রেণীর বানরী

পুত্র-শোকে মরিয়াই যাইত, বানরীদিগের পুত্রশোক এতই বেশী। পিতৃমাতৃহীন বানরশিশুদিগকে অন্য বানর-বানরীরা পুত্ররূপে গ্রহণ করিত এবং সাবধানে রক্ষা করিত। একটী বানরীর হৃদয় এতই উদার ছিল যে সে অপর জাতীয় বানরশিশুকে ত পুত্ররূপে গ্রহণ করিতই, কুকুর-বিড়ালের ছানাগুলিও অপহরণ করিয়া সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে লইয়া বেড়াইত। কিন্তু তাহার এত স্নেহ সত্ত্বেও, নিজের খাদ্যের ভাগ অপত্য-গুলিকে দিত না; ইহাতে ব্রেম সাহেব আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন, কারণ তাঁহার নিজের বানর-বানরীগুলি সর্ব্বপ্রকার খাদ্য-দ্রব্য সন্তান-সন্ততিগণের সহিত ভাগ করিয়াই আহার করিত। ঐ স্নেহ-পরায়ণা বানরীর পালিত একটী বিড়ালছানা তাহাকে হাঁচড়াইয়া দিলে সে অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিল; কিন্তু সে খুব বুদ্ধিমতী ছিল; সে তৎক্ষণাৎ ছানার পা পরীক্ষা করিল এবং বেশি ইতস্ততঃ না করিয়া উহার নখগুলি দাঁত দিয়া কাটিয়া ফেলিয়া দিল। পশুশালার রক্ষকের মুখে শুনিয়াছি যে একটী চাকসা বানরী এক রিসাস্ বানরকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু যখন একটী ড্রিল ও একটী ম্যান্‌ড্রিল বানর-শাবক তাহার গৃহের মধ্যে দেওয়া হইয়াছিল তখন সে তাহাদিগকে নিকটতর জাতি বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল, কারণ সে রিসাস্‌টীকে পরিত্যাগ করিয়া ঐ দুইটীকেই পুত্ররূপে লইয়াছিল। আমি দেখিয়াছিলাম যে ঐ রিসাস্‌টী ইহাতে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিল, এবং যখন সুবিধা পাইত তখন ঐ ড্রিল ও ম্যান্‌ড্রিল দুইটীকে, দুষ্ট বালকের ন্যায়, উৎপাত ও আক্রমণ করিত; তাহাতে ঐ বৃদ্ধা বানরী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইত। ব্রেম বলেন, প্রভুকে কেহ আক্রমণ করিলে বানর রক্ষা করে; এবং তাহার প্রিয় কুকুরকে অন্য কুকুরে আক্রমণ করিলে তাহাকেও রক্ষা করে। কিন্তু এ সমস্ত কথা সমবেদনা ও প্রভুভক্তি-সংক্রান্ত, ইহা পরে বলিব। ব্রেমের কতিপয় বানর যে সকল কুকুরের প্রতি অসন্তুষ্ট হইত তাহাদিগকে উৎপাত করিত; অন্যান্য জন্তুগণকেও নানা কৌশল করিয়া উৎপীড়ন করিত।

মনের জটিল ভাবগুলির অধিকাংশই আমাদিগেরও আছে, উচ্চ শ্রেণীর জন্তুগণেরও আছে। সকলেই দেখিয়াছেন, যদি কুকুরের প্রভু অন্য কুকুরকে ভালবাসেন তবে সে কেমন হিংসা করে; এইরূপ ঘটনা আমি বানরদিগের মধ্যেও দেখিয়াছি। ইহাতে বোধ হয় যে জন্তুগণ ভালও বাসে এবং ভালবাসা পাইতেও ইচ্ছা করে। জন্তুগণের প্রতিযোগিতা-বোধ আছে। উহারা প্রশংসা পাইতে ইচ্ছা করে। প্রভুর কাঁপি বহিয়া লইয়া যাইবার সময় কুকুর খুব আত্মপ্রসাদ অথবা অহংকার দেখায়। আমার বোধ হয় কুকুরের লজ্জা আছে; ভয় ত আছেই, সে পৃথক ভাব। বারংবার আহার চাহিতে হইলে কেমন একটু লজ্জার ভাব দেখায়। ছোট কুকুর দন্ত বাহির করিয়া খেউ খেউ করিলে বড় কুকুর তুচ্ছ করে, ইহাকে মহত্ত্ব বলা যাইতে পারে। অনেক পরিদর্শক উল্লেখ করিয়াছেন যে বানরের দিকে চাহিয়া হাসিলে সে অসন্তুষ্ট হয়। উহারা সময় সময় অকারণ পরের দোষ বিবেচনা করিয়া বিরক্ত হয়।

পশুশালায় একটী বানর উহার রক্ষক কোন পত্র কিম্বা পুস্তক লইয়া উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলে ক্রোধে অধীর হইত; আমি একবার দেখিয়াছি ঐরূপ অবস্থায় সে আপন পায়ের নলা কামড়াইয়া রক্ত বাহির করিয়াছিল। ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়াও কুকুরের রহস্য-বোধ আছে। একটু ছোট ছড়ি কিম্বা তদ্রূপ কোন দ্রব্য উহার সম্মুখে ফেলিয়া দিলে প্রায়ই একটু তফাতে লইয়া গিয়া ঐ দ্রব্য সম্মুখে করিয়া মাটির উপর বসিয়া যে পর্য্যন্ত প্রভু লইতে না আসেন সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে; তিনি আসিলে উহা লইয়া দৌড়িয়া চলিয়া যাইবে; এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিবে। এইরূপ তামাসা করিয়া সে খুব সুখ অনুভব করে।

এক্ষণে বুদ্ধিবৃত্তি ও তদ্মূলক ভাবসমূহের বিষয় উল্লেখ করিব। এগুলি বিশেষ গুরুতর, কারণ ইহা হইতে উন্নত মনোবৃত্তি সকল জাত হইয়াছে। ইতর জন্তু সকল উত্তেজনায় সুখ অনুভব করে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়, এবং ক্লান্তিতে কষ্ট বোধ করে। ইহা কুকুরের ব্যবহার দেখিলেই জানা যায়; রেঞ্জার বলেন বানরেরও ঐরূপ হয়। সকল জন্তুরই বিস্ময় আছে এবং তাহারা কৌতূহল প্রদর্শন করে। কৌতূহলবশতঃ তাহারা কখন কখন বিপদগ্রস্ত হয়; শিকারীরা নানারূপ কৌতুক দেখাইয়া উহাদিগকে আকর্ষণ করে। আমি হরিণের সম্বন্ধে এরূপ হইতে দেখিয়াছি; শ্যাময় হরিণ খুব সাবধান, তাহারা এবং বন্য হংসও এইরূপে আকৃষ্ট হয়। সাপ দেখিয়া বানরগণ স্বভাবতই ভীত হয়, ইহার দৃষ্টান্ত ব্রেস্ সাহেব নিজের বানরগুলির বর্ণনাতেই দেখাইয়াছেন; কিন্তু উহাদিগের কৌতূহল এত অধিক যে উহারা সময় সময় সাপের বাক্সের তালা তুলিয়া ঠিক মানুষের মত, না দেখিয়া থাকিতে পারে নাই। তাঁহার বর্ণনা পাঠ করিয়া আমার এতই আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল যে আমি একটা কুণ্ডলীকৃত কৃত্রিম সর্প লইয়া পশুশালায় বানরের ঘরের মধ্যে গিয়াছিলাম। তাহাতে বানরেরা যেরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল তদ্রূপ দৃশ্য আমি কমই দেখিয়াছি। তিনজাতীয় সিনোপিথিকাস্ বানর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভীত হইয়াছিল, তাহারা ঘরের এদিক হইতে ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল এবং ভীতিজনক তীব্র চীৎকার ধ্বনি করিতে লাগিল; ঐ চীৎকার অন্য বানরেরাও বুঝিতে পারিয়াছিল। কয়েকটী বানরশিশু এবং একটী এন্থ্রিস্ শ্রেণীর বানর ঐ কৃত্রিম সর্পকে গ্রাহ্যই করিল না। তৎপরে আমি বানরদিগের একটী বৃহদাহতন কামরায় ঐ কৃত্রিম সর্প মেঝের উপর রাখিয়া দিলাম। ক্ষণকাল মধ্যেই সমস্ত বানর উহার চারিদিকে একটী বৃহৎ বৃত্তাকারে ছুটিয়া গেল, এবং উহার দিকে এরূপ ভাবে একদৃষ্টে তাকাইতে লাগিল যে তাহা দেখিতে অত্যন্ত হাস্যাস্পদ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল। একটী কাঠের বল লইয়া তাহারা খেলা করিত, উহার কতকাংশ খড়ের নীচে ঢাকা ছিল। ঐ বলটী হঠাৎ নড়িয়া উঠিলে উহারা সকলেই পালাইয়া গেল। কিন্তু যখন একটা মরা মাছ, ইন্দুর, একটী তাজা কাছিম এবং অন্যান্য নূতন বস্তু তাহাদিগের ঘরে দেওয়া হইল তখন

তাহারা বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার করিল; কারণ প্রথমে ভীত হইলেও কিয়ৎপরেই নিকটে আসিয়া ঐ সকল পদার্থ পরীক্ষা করিয়া এমন কি হাত দিয়া নাড়িতে লাগিল। তাহার পর একটী বড় কানরার মধ্যে আমি একটী জীবিত সর্প কাগজের ব্যাগের মধ্যে রাখিয়া ব্যাগের মুখ ঢিলা করিতে বাঁধিয়াছিলাম। তখনই একটী বানর আসিয়া খুব সাবধানে ব্যাগের মুখ একটু খুলিয়া উহার ভিতরে উঁকি দিয়া দেখিবা মাত্র দৌড়াইয়া পালাইয়াছিল। তৎপর ব্রেস যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্রূপই দেখিলাম, কারণ তখন একটীর পর একটী এই ভাবে বানরেরা আসিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া মাথা উঁচু করিয়া ঐ খাড়া ব্যাগটীর তলায় সর্প না দেখিয়া থাকিতে পারিল না। ব্রেসের বানরগুলি টিকটিকি এবং ডেক দেখিয়াও অদ্ভুত রকম ভয় করিত; সে ভয় যদিও অমূলক, কিন্তু বোধ হয় ইহারা যে সর্পের সহিত সমজাতীয় জীব তাহা যেন ঐ বানরেরা বুঝিতে পারিয়াছিল। একটী ওরাংওটাং প্রথমবার কচ্ছপ দেখিয়াও অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল।　　(ক্রমশ)

শ্রীশশধর রায়।

বিবাহের পোষাক *

টেবিটা কিথ্ তাহার দোকানের জানালার ধারে বসিয়া একটী পোষাক সেলাই করিতেছিল। অসম্পূর্ণ সেই শুভ্র পোষাকটী তাহার পদপ্রান্তে অকলঙ্ক তুষার-তরঙ্গের মত লুটাইয়া পড়িয়াছে। অগ্নি-কুণ্ডের আলোকে গৃহটী আলোকিত। আগুনের উপর চায়ের কেত্‌লি বসান রহিয়াছে—ফুটন্ত জলের বাষ্পের বেগে কেত্‌লির ঢাকনাটা নাচিতেছিল এবং কেত্‌লি মুখে মধুর ধ্বনি বাহির হইতেছিল। পাশের আসবাবের উপরকার পিতলের সাজগুলি চক্‌চক্ করিতেছিল—যেন তাহারা সহাস্যে কেত্‌লির এই কাণ্ডটা দেখিতেছিল। সমস্ত ঘরটী আনন্দে ভরপুর—যেন হাসিতেছে। আজ টেবিটা যে গাউন তৈয়ার করিতেছে এমন পোষাক গ্রামে কেহ কখন দেখে নাই এবং বোধ হয় দেখিবে না।

গাউনটি প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে—শুভ্র রেশমী কাপড়, সাদা লেস্, তার উপর অকলঙ্ক মুক্তার কাজ। মিঃ প্রাউস্ গ্রামের মধ্যে প্রধান ধনী—তাঁহার কন্যার বিবাহ। তাঁহার ইচ্ছা কন্যাকে বিবাহের সময় এমন পোষাক দিবেন—যাহা সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাদেরও লোভনীয়। কিন্তু তাঁহার আক্ষেপ হইতেছে যে, এমন একটা সুন্দর

* ইংরাজী হইতে অনূদিত।

পোষাক তৈয়ারির ভার দেওয়া হইয়াছে—সামান্য গ্রাম্য কারিগর টেবিটা কিসের উপর। কিন্তু টেবিটা ছাড়া কয়েক গজ রেসমী কাপড় দিয়া আর কে এমন স্বপ্ন-সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতে পারিত!

সমস্ত গৃহটী যেন বিস্ময়ের সহিত টেবিটার এই আশ্চর্য্য সৃষ্টি, এবং ইহার ভাবী-অধিকারিণী লেভিনিয়ার হর্ষোৎফুল্ল মুখশ্রী নিরীক্ষণ করিতেছিল। টেবিটার কৃষ্ণতার উজ্জ্বল চক্ষু দুইটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি গাউনের উপর নিবদ্ধ ছিল—লেভিনিয়ার অকারণ উচ্ছ্বসিত হাস্য ও অজস্র বক্তৃতা—তাহার কাণে পৌঁছিতেছিল না।

"টেবিটা, চমৎকার হয়েছে! তুমি আমার জন্য কত পরিশ্রম করিয়া এমন সুন্দর গাউন তৈয়ার করেছ! জানি না কি বলে তোমায় ধন্যবাদ দেব!"

টেবিটা গম্ভীর ভাবে দোকানদারীর ভাষায় বলিল—"যে কাজের জন্য আমি পয়সা পাইব—তাহার জন্য ধন্যবাদ!"

"না, না, ও কথা বলো না! আমি কেমন করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো তাই খুজে পাচ্ছি না! বল, টেবিটা!"

আনন্দের উচ্ছ্বাসে লেভিনিয়া চঞ্চলপদে ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। লেভিনিয়া প্রতিদিন টেবিটাকে এই একই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে—টেবিটা কোন দিন তাহার জবাব দেয় নাই—আজ কিন্তু অত্যন্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল—"আমাকে একবার দু' মিনিটের জন্য এই পোষাকটী পরিতে অনুমতি দাও—কেবল একবারের জন্য।"

লেভিনিয়া হাসিয়া উঠিল,—বলিল,—"টেবি, এ আবার কি অনুরোধ! আর এর জন্যে অনুমতির দরকার? তুমি ত আমাকে না বলিয়াই—একবার কেন হাজার বার এ পোষাক পরিতে পারিতে!"

"হাঁ, পারিতাম বটে,—কিন্তু তোমার গাউন—তোমাকে না বলিয়া কেন পরিব? পোষাক তৈয়ার করিয়া আর কখন পরিতে আমার আগ্রহ হয় নাই। কিন্তু—এটার কথা স্বতন্ত্র—এটী আমি নিজে গড়িয়া তুলিয়াছি,—আজ একমাস ধরিয়া শয়নে, স্বপনে, জাগরণে—আমি কেবল এই পোষাকের কথাই ভাবিয়াছি—আমার নিজের মনের মত করিয়া ইহাকে গড়িয়াছি—যেন,—যেন—" টেবিটা বলিতে যাইতেছিল 'যেন আমার হৃদয়ের সমগ্র অতৃপ্ত বাসনা দিয়া ইহা তৈয়ার করিয়াছি।' কিন্তু সে কথা মুখ ফুটিয়া বাহির হইল না। টেবিটা অল্পভাষী—আধ্যাত্ম যত গভীর, তার প্রকাশ সেই পরিমাণ কম হইত।

আর লেভিনিয়া—সে-ই এক সময়ে তার প্রিয়তম বন্ধু ছিল—আজ সে তার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী—আজ সে তার প্রণয়ীকে তার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছে। আর দুদিন পরে তারই প্রণয়ীর সঙ্গে এই লেভিনিয়ার বিবাহ!

লেভিনিয়া হাসিয়া বলিল,—"তা বেশ ত গাউনটা তুমি পর না কেন! আমি বেশ জানি এই পোষাকটায় আমার চেয়ে তোমাকে মানাইবে ভাল—তোমাকে বেশী সুন্দর দেখাইবে! এ গ্রামে তোমার মত সুন্দরী কে? তোমার মত গড়ন,

চলন কার! তোমার মত অমন চোক্ পাইলে, অনেক মুখই সুন্দর হইয়া যাইত! জিম্ এখনোও তাই বলে।"

"এখনো!" লেভিনিয়া কি মনে করিয়া এ কথা বলিল টেবিটা তাহা বেশ বুঝিল। কিন্তু জিম কেন তা বলিবে—এখন লেভিনিয়া ছাড়া আর কাহারো সুখ্যাতি যে তার করিতে নাই! এখনো! টেবিটার পাণ্ডু মুখশ্রী আরক্ত হইয়া উঠিল।

সে তাড়াতাড়ি লেভিনিয়াকে বলিল—"তা এখন পোষাকটা রাখ ত।"

"তুমি বল—এবার যখন আসিব তখন তুমি পোষাক পরবে?"

"প্রতিজ্ঞা করিতে পারি না! তখন হয় ত এ ইচ্ছা থাকিবে না। তা ছাড়া আর কবে পরব? আজই রাত্রে আমার কাজ শেষ হইয়া যাইবে।"

লেভিনিয়া ধীরে ধীরে গাউন খুলিতেছিল—হঠাৎ তার মুখে যেন বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়িল—সে ধীরে ধীরে বলিল—"আমার দুটো কারণে মনে বড় কষ্ট হচ্ছে। একটা হচ্ছে যে, এ পোষাকে রবার্ট আমাকে দেখিতে পাইবে না—কেননা—"

টেবিটা বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—"রবার্ট—এখন তোমার রবার্টের কথা ভাবার অধিকার নাই! তার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ শেষ হইয়াছে। তা' ছাড়া এটা জিমের উপর অন্যায় করা হচ্ছে।"

লেভিনিয়ার সমস্ত মুখমণ্ডল লজ্জারুণ হইয়া উঠিল—সে একটু আবদারের স্বরে বলিল—"ভাই, আমাকে একটা কথা বলবে, আচ্ছা, তোমার সঙ্গে জিমের বিবাহের কথা কত দূর অগ্রসর হয়েছিল?—লোকে বলে—"

"লোকের কথায় কাণ দিও না। জিমের সঙ্গে আমার আবালোর পরিচয়—এই পর্য্যন্ত।"

"না—লোকে বলে যে তোমাদের বিয়ের প্রায় সব ঠিক হয়েছিল। জিমকে জিজ্ঞাসা করিলে সে রাগিয়া উঠে,—কোন কথা বলে না।"

"আমিও কোন কথা বলিব না—কেন না, বলবার আমার কিছু নেই। আর এ কথা নিয়ে জিমকে বা আমাকে বিরক্ত করার তোমার কি অধিকার? অনেক দিন হ'তে আমি তার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্বন্ধও ত্যাগ করেছি। লোকে নানা কথা বলিবে—আমি এ সংসারে একলা,—আমাকে পদে পদে সাবধান হইয়া চলিতে হয়! জিমের বুড়া মা-ই এ কথা প্রথম উঠায়! তার পর আমি যখন একলা পড়লাম—আমাদের বিষয়-আশয় সব বিক্রি হয়ে গেল—তোমার বাবা কিন্‌লেন, কেবল এক গলা দেনা ছাড়া আর আমার কিছু রইল না—তখন জিমের মা বেঁকে দাঁড়ালেন—"

"কিন্তু, জিম ত—"

"না, না,—জিম সে প্রকৃতির নয়—সে আশ্রয়হীনা বালিকার দুঃখ বোঝে—তার মন বড় কোমল।"

"ওঃ; তাই বটে!—হুঁ, তাই বুড়ী টাকার লোভে আমার দিকে ঝুঁকেছে। বুড়ো বুড়ীরা টাকাটাই বোঝে ভাল! আমার বাবার যদি টাকা না থাকত—তা'হলে

আজ রবার্টের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হ'ত না। কিন্তু তাও বলি—পুরুষগুলোর মনের স্থির নেই—তাই এখন রবার্ট আমায় ছেড়ে তোমার সঙ্গে—"

"থাক্ থাক্—লেভিনিয়া—তোমার প্রসাদে আমার দরকার নেই। তা' ছাড়া যখন তোমার টাকার দিকে রবার্টের নজর ছিল তখন সে আমার কাছে—"

"না—না কখনো নয়! তুমি একি কথা বলছো—আমার বাবাই ত—"

"আচ্ছা—ও সব কথা যাক্! ও সব কথায় আমার দরকার! এখন বাড়ী যাও, আমাকে এটা আজ শেষ করতে হবে। তোমার সঙ্গে আজ বাদে কাল জিম নীলের বিয়ে—এখন রবার্টের কথা ভাবা তোমার উচিত নয়।"

"হাঁ,—আমার সঙ্গে জিমের বিয়ে!" কথা বলিয়া লেভিনিয়া হাসিয়া উঠিয়া গৃহত্যাগ করিল, বিস্মিত টেবিটা একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া রহিল!

যদি এক ফোঁটা অশ্রু মুক্তাবিন্দুর মত টেবিটার তুষারধবল গণ্ডে গড়াইয়া পড়িয়াই থাকে তবে কা'র ক্ষতি? যদি শুভ-বিবাহের সেই পোষাকে সেলাই-করার সময় তার মুখে গভীর দুঃখের ছায়া পড়িয়াই থাকে—তবে কে তাহা দেখিতে আসিবে! সে যে একা!

সেলাইয়ের পর সেলাই—তাহার কমনীয় অঙ্গুলিচালিত তীক্ষ্ণ সূচটি সেই শুভ্র রেশমের বস্ত্র দিয়া ঝিক্ ঝিক্ করিয়া উঁকি দিতেছিল।

বাহিরের বসন্তের প্রভাতালোক ক্ষুদ্র গ্রামটীকে বিশ্বশ্রী প্রদান করিয়াছে। পুষ্পগন্ধি প্রাতঃসমীরণ গ্রাম্য পথটীকে আমোদিত করিতেছে। রাস্তার পর পারের বাড়ীগুলি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—জানালা দিয়া যুবতীদের কলকণ্ঠধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল—সকলে সাগ্রহে লেভিনিয়ার বিবাহের নানা বন্দোবস্তের গল্প করিতেছে! আর দুইদিন পরে জিম নীলের সহিত লেভিনিয়ার বিবাহ হইবে। জিম নীল—যে আশৈশব কেবল টেবিটাকেই ভাল-বাসিয়া আসিয়াছে। আজ আর টেবিটা তার কেহ নহে।

একদিন ছিল,—যখন টেবিটার গ্রামের মধ্যে সুন্দরীপ্রধানা বলিয়া খ্যাতি ছিল—আর আজ সে দরিদ্র—দেহে সে লাবণ্য নাই; তা ছাড়া লোকে এখন তার সহস্র খুঁত দেখিতে পায়। সে না কি কাহারো মত লইয়া চলে না,—কেবল স্কুল, আর গাছ, আর বাগান—এই সব লইয়াই থাকে—এবং রাত্রে অন্যমনস্ক হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া থাকার রোগও না কি তার আছে! তার মাথাটা খারাপ হইয়া গেছে। তা না হ'লে কি কেউ—যে তাহার প্রণয়ীকে ছিনাইয়া লইতেছে তারই বিবাহের পোষাক এত আগ্রহ করিয়া তৈয়ার করিবার তার দায় ? পাগল আর কি ?

টেবিটার বিরাম নাই—সে আপন মনে কাজ করিয়া চলিয়াছে। কেতলির জল তেমনি ফুটিতেছে, আর কেতলির মুখে তেমনি শব্দ হইতেছে। মেজের উপর তার পোষা কাল বিড়ালটী শুইয়া আছে—লাল কার্পেটের উপর কে যেন কালি ঢালিয়া

দিয়াছে। ঘুমাইতে ঘুমাতে বিড়ালটি এক এক বার শব্দ করিতেছে। গৃহের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আসবাবগুলি ঝক্ ঝক্ করিতেছে। সর্ব্বত্র আনন্দ! হায়! টেবিটার কোলের উপর তার দুঃখ স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য ঐ,পোষাকটা যদি না থাকিত।

টেবিটা হঠাৎ কাজ বন্ধ করিল। কেন সে জিমের ভাবী পত্নীর জন্য এত পরিশ্রম করিতেছে। জিমের চক্ষে লেভিনিয়ার সৌন্দর্য্য বাড়াইবার জন্য তার এত আগ্রহ কেন?

এমন সময়ে জানালায় একটা ছায়া পড়িল। লেভিনিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে—সে হাসিমুখে গৃহে প্রবেশ করিল।

"টেবি, ভাই,—আমি একটা কথা ভুলেই গিয়েছিলাম! আমার দুঃখের দ্বিতীয় কারণটা—পোষাকের মধ্যে কোনো জায়গায় একটু নীল রং দেবে—এক জায়গায় একটু নীল রং দিয়ে দাও।"

টেবিটা বিরক্তির সহিত ভ্রূকুটি করিয়া বলিয়া উঠিল—"না—তা কিছুতেই হবে না। এমন পোষাকে রঙীন ফিতা বসাইয়া আমি খারাপ করিতে পারিব না।"

"মুক্তোর সাদের মধ্যে—দু একটা নীল রংয়ের কুঁচো পাথর বসালে হয় না? নীল রংটা পরম। তা' ছাড়া নীল রংটা—"

"লেভিনিয়া গ্রাউস!—পোষাক তৈয়ার করিতেছি আমি—তুমি নও।"

"সে কথা ঠিক! আমার ত ঐ বোকামী" বলিয়া দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া লেভিনিয়া হাসিতে লাগিল।

"তা' হলে আর আমাকে বার বার বাধা দিতে এস না। যদি নীল রং না থাকলে যদি নেহাৎ-ই পরমও না হয় তবে পোষাকের নীচে নীল রংয়ের কিছু একটা পরো। এ জন্যে এমন পোষাকটা মাটি করো না। এটাকে সাদাই রেখো—ক্ষান না—অকলঙ্ক শুভ্রতাই প্রেম ও পবিত্রতার নিদর্শন।"

লেভিনিয়া যেন থমকিয়া গেল। তার পর হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা—বেশ—আমার কাছে ভাল নীল ফিতা আছে, তাই দিয়ে কাজ চালিয়ে নেব এখন।"

বলিয়া—লেভিনিয়া ত চলিয়া গেল—টেবিটা সেলাই বন্ধ করিয়া ভাবিতে লাগিল—লেভিনিয়ার জন্য আমি কেন এত খাটিয়া মরিতেছি—সে আমার কে! নির্ব্বোধ সে, পয়সা অপয়সা লইয়াই মত্ত—পবিত্র ভালবাসার মর্ম্ম সে কি বুঝিবে! সুখ ত ভালবাসায়—নীল ফিতা কি সে সুখ দিতে পারিবে! মাত্র এক বৎসর পূর্ব্বে যে জিম টেবিটাকে তাহার জীবনের সর্ব্বস্ব করিয়াছিল—আজ তার অন্তের সঙ্গে—এই নির্ব্বোধ প্রেমহীনা লেভিনিয়ার সঙ্গে—বিবাহ? কেন? কি তুচ্ছ কারণ ধরিয়া জিম তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে! সেই যে সর্ব্বসৌন্দর্য্যশালিনী জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে সে জিমেরই ভালবাসার কথা,—তার প্রথম চুম্বনের কথা ভাবিতে ভাবিতে বাগানে কি গোটাকত লাল ফুল ও লতা-পাতা সংগ্রহ করিয়াছিল—ইহাই কি এত গুরুতর অপরাধ—আর আশৈশবের এ বন্ধন এত তুচ্ছ যে এক দিনের এই ছুতা ধরিয়া সে তাহাকে ত্যাগ করিল! যাহার

প্রেমলাভে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি ভরিয়া গিয়াছে, কেন সে লতা পাতা "মন্তর-তন্তর" দিয়া বশ করিতে যাইবে! আর জিম—সে কি তার লেভিনিয়াকে জানে না, তাই লোকের কথাই সে বিশ্বাস করিল—একবার তাকে জিজ্ঞাসাও করিল না। অভিমানিনী কেমন করিয়া তার কাছে গিয়া প্রেম ভিক্ষা করিবে · কেমন করিয়া তার কাছে গিয়া সে আপনাকে নির্দ্দোষী প্রমাণ করিবে! এত অবিশ্বাস—তাহার সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালবাসার এই প্রতিদান,—তাহাকে মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ করিয়াছে।

তারপর—লেভিনিয়ার সহিত এই বিবাহ-প্রস্তাব টেবিটার রাগ না হইয়া দুঃখেরই কারণ হইয়াছে। সে নিশ্চয়ই জানে লেভিনিয়া জিমকে ভাল বাসে না—ভাল বাসিতে পারে না! হায় হতভাগ্য জিম—লেভিনিয়া তোমাকে কিছুতে সুখী করিতে পারিবে না!

টেবিটা জোর করিয়া মনকে বশ করিবার চেষ্টা করিল—হুকুমের জোরে অশ্রু রোধ করিয়া আবার সেলাই তুলিয়া লইল। এই যে এত যত্ন, এত প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া সে যাহারই হৃদয়ের পবিত্র প্রেমের বহিরাবরণের মত সুন্দর এই পোষাক তৈয়ার করিয়াছে—ইহা কি শুধু লেভিনিয়ার জন্য—ইহার প্রত্যেক অংশে প্রতি সেলাইটিতে যে তাহারই প্রেমের করুণ কাহিনী জড়িত আছে! লেভিনিয়ার প্রতি সৌহার্দ্য জিমের প্রতি তার আজীবনের ভালবাসা, তার আশা নিরাশা, তার ভয় ভাবনা যে এই গাউনটির প্রতি কুঞ্চনের মধ্যে রহিয়াছে, তাহা অন্তর্য্যামী ছাড়া আর কে জানিবে!

পোষাক তৈয়ারী করাই এখন তার ব্যবসায়—ইহাই তার একমাত্র জীবনোপায়। তার হাতের কাজের দক্ষতা দেখাইবার এমন সুযোগ এই ক্ষুদ্র পল্লীতে আর কবে হইবে? এ সব সত্ত্বেও সে প্রথমে এ কাজ লইতে অস্বীকার করিয়াছিল—তারপর অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মনকে দৃঢ় করিয়া সে এ কাজ হাতে লইয়াছিল। আজ তারই নিপুণ হস্তে এই লোকমনোহর গাউনটি প্রেমের পবিত্র মন্দিরের মত—তার সমস্ত হৃদয়ের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত নিদর্শনের মত গড়িয়া উঠিয়াছে!

এতক্ষণে গাউনটি সম্পূর্ণ হইল! দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া টেবিটা সযত্নে গাউনটিকে ভাঁজ করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া জানালার সামনে গিয়া দাড়াইল।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। পাঠশালার বন্ধনমুক্ত ছেলের দল আনন্দ-কল্লোলে গ্রামপথ মুখরিত করিয়া ছুটিয়াছে। সমস্ত দিবসের পরিশ্রমের পর চাষার দল শ্রম-মন্থরপদে গৃহে ফিরিতেছে। সান্ধ্যসমীরণ ধীরে সস্নেহে তাহাদের ঘর্ম্মাক্ত ললাট মুছাইয়া দিতেছে।

টেবিটার সাড়া পাইয়া তার পোষা বিড়ালটিও উঠিয়া দাঁড়াইল। আজ ক'দিন ধরিয়া সেটা একবারও আদর পায় নাই। কি ভাবিয়া টেবিটা জানালার পরদাটা টানিয়া দিল এবং সাবধানে ঘরের দরজায় চাবি লাগাইল।

তার এত যত্নের, এত পরিশ্রমের

গাউনটি সে একবার পরিয়া দেখিবে। ক্রমে একটি একটি করিয়া টেবিটা নিজের পোষাক খুলিয়া ফেলিয়া দিল। কি এক অতৃপ্ত বাসনার দুর্দ্দম অগ্নি তাহার চোখে মুখে সর্ব্বাঙ্গে জ্বলিতেছিল। কম্পিত হস্তে টেবিটা নূতন গাউনটি পরিল। পাশেই একখানি বড় আয়না ছিল—টেবিটা সেদিকে চাহিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। যাহা দেখিল তাহাতে স্তম্ভিত হইল—সে কি এত সুন্দর! কৈ এত দুঃখ-দারিদ্র্য ত তাহার সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত করিতে পারে নাই—তবে তার কপালে এ দুঃখ কেন? কেন সে জিমের ভালবাসা হারাইল! তারপর লেভিনিয়ার কথা মনে পড়িল—হিংসার জ্বালায় সে কুন্দদন্তে রক্তিম অধর দংশন করিল—ফুলধনুর মত ভ্রূযুগ আকুঞ্চিত হইল—না, না, এ পোষাক লেভিনিয়া পাইবে না! তার এত কষ্টের পোষাক লইয়া লেভিনিয়া যে সুন্দর হইয়া তাহারই প্রিয়তম জিমের মন মুগ্ধ করিবে—এ চিন্তা দুর্বিষহ হইয়া উঠিল। না, না—এর চেয়ে তার মরণ ভাল! হ্যাঁ—মরণ! লেভিনিয়ার এই বিবাহ-সজ্জা তাহার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবে, সে এই সুন্দর পোষাকে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবে! তারপর—তারপর যখন জিম আসিয়া তাহার সুশোভন দেহ, মৃত্যুর কোমল ছায়া স্পষ্ট সুন্দর শান্ত মুখশ্রী দেখিবে তখন হয় ত অজ্ঞাতে জিমের চক্ষে এক ফোঁটা অশ্রু দেখা দিবে! সে কি সুখের! তার এই তুষার-শুভ্র বেশ দেখিয়া হয় ত জিমের মনে আবার পুরাতন প্রেম ফিরিয়া আসিবে—সে কি সুখের! সেই ভাল! সেই ভাল! তবে, এস মৃত্যু—হে চিরশান্তি, হে অনন্তের চিররহস্যময় সখা, হে ধ্রুব সত্য, হে প্রিয়তম—তুমি এস—আজ এই বধূবেশে তোমাকেই বরণ করিয়া লই!

* * * * *

ও কে! দরজায় ধাক্কা দেয়! লেভিনিয়া! এস লেভিনিয়া—দেখিয়া যাও—এ বধূবেশে আমাকে তোমার চেয়ে কত সুন্দর দেখাইতেছে! লেভিনিয়া! আজ তুমি কত সুখী, ধনীর আদরিণী কন্যা,—আমার জিমের প্রিয়তম ভাবী পত্নী!—প্রেমে, আদরে গরবিণী—তবু দেখিয়া যাও আমি কত সুন্দরী!

দরজায় আবার শব্দ হইল।

"লেভিনিয়া, এস, শীঘ্র এস—একবার আমায় দেখ!"

কম্পিত পদে টেবিটা গিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল! "কে জিম!—জিম! না, না—যাও, যাও লেভিনিয়া তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে! এখন কেন আসিলে! একটু আগে আসিলে কি দোষ ছিল!"

"টেবিটা—টেবি—প্রিয়তমে—আমি এসেছি! আবার তোমার কাছে এসেছি! আজ আমাদের মুক্তি—লেভিনিয়া—"

"না, না! আর কেন? আসিলে যদি একটু আগে কেন আসিলে না!" ম্লানমুখে হাসি ফুটাইয়া—মৃত্যুচ্ছায়া পাণ্ডুর গণ্ডে প্রেমের অরুণিমা আনিয়া টেবিটা কহিল—আসিয়াছ ত আমাকে একবার এই বধূবেশে দেখিয়া যাও! ইহা আর লেভিনিয়ার

নহে—আমারই। যাও, যাও, তুমি তোমার লেভিনিয়ার কাছে ফিরিয়া যাও। আর তুমি বৃথা আসিয়াছ। ফিরিয়া যাও!"

"টেবিটা, আমায় ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। আজ আমি, আমার ভুল বুঝিয়াছি—লেভিনিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া রবার্টের কাছে গিয়াছে—সে তাকে ভালবাসে—আর আমি তোমার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছি—"

"না, না, মিছে তুমি যাও, আর মিথ্যা বলিও না—তুমি লেভিনিয়ার, তার কাছে ফিরিয়া যাও।"

"টেবিটা আমায় ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।"

"হায়! প্রিয়তম—একটু আগে কেন আসিলে না। আর ত ফিরিবার পথ নাই——"

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার।

বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি

(৩)

রাজসিংহ

মুসলমান ইতিহাসলেখকেরা অত্যন্ত স্বজাতি-পক্ষপাতী।

ইতিহাসের উদ্দেশ্য কখন কখন উপন্যাসে সুসিদ্ধ হইতে পারে।

হিন্দুর বাহুবল

এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুদিগের বাহুবলের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। ব্যায়ামের অভাবে মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গ দুর্ব্বল হয়। জাতি-সম্বন্ধেও সে কথা খাটে।

ঔরঙ্গজেবের অন্তঃপুরে নৃত্যগীত

ঔরঙ্গজেবের অন্তঃপুরে নৃত্যগীত কেহ না করিতে পারে, এমন আদেশ ঔরঙ্গজেব প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের অন্তঃপুরেই সে আদেশের অবমাননা ঘটিয়াছিল। • • • আমার স্থির বিশ্বাস ঐতিহাসিক সত্য আমার দিকে।

বীরপুরুষ স্ত্রীজাতির কখনও শত্রু নহে।

ছবিতে মানুষে অনুরাগ

অনুরাগ ত মানুষে মানুষে—ছবিতে মানুষে হইতে পারে কি? পারে, যদি তুমি ছবি ছাড়া বাকীটুকু আপনি ধ্যান করিয়া লইতে পার। পারে, যদি আগে হইতে মনে মনে তুমি কিছু গড়িয়া রাখিয়া থাক, তারপর ছবিখানিকে (বা স্বপ্নটাকে) সেই মনগড়া জিনিসের ছবি বা স্বপ্ন মনে কর।

রাজ্যশাসনে ভারত-মহিলা

ভারতবর্ষীয় মহিলারা রাজ্যশাসনে সুদক্ষ বলিয়া বিখ্যাত। পশ্চিমে কদাচিৎ একটা জেনোবিয়া, ইসাবেলা, এলিজাবেৎ বা

কাথারাইন পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের অনেক রাজকুলজায়ারাই রাজ্যশাসনে সুদক্ষ।

Politicianএর প্রয়োজন

জানা আছে, Politicianসম্প্রদায়ের একটা বড় প্রয়োজন-সংবাদ। কোথায় কি হইতেছে, গোপনে সব জানা চাই। ছুঁচ্‌খের মণির রামচন্দ্র হইতে বিসমার্ক পর্য্যন্ত সকলেই ইহার প্রমাণ।

রত্নমহাল

দিল্লী মহানগরীর সারভূত দিল্লীর দুর্গ; দুর্গের সারভূত রাজপ্রাসাদমালা। এই রাজপ্রাসাদমালার ভিতর অল্প ভূমি মধ্যে যত ধনরাশি, রত্নরাশি, রূপ-রাশি এবং পাপ-রাশি ছিল, সমস্ত ভারতবর্ষে তাহা ছিল না।

মা খুঁজিতে যে আসে, সে-ই ভালবাসে।

ভিক্ষুক না ডাকিতেই আসিয়া থাকে।

কোন্ দরিদ্র না দুনিয়ার বাদশাহী কামনা করে?

উড়িষ্যার কলঙ্ক

উড়িয়াদিগের কলঙ্ক আছে যে বড় ভাই মরিলে ছোট ভাই বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে বিবাহ করিয়া, তাহার শোকাপনোদন করে। এই শ্রেণীর একজন উড়িয়াকে আমি একদা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তোমরা "এমনি দুষ্কর্ম্ম কেন কর?" সে ঝটিতি উত্তর করিল "আজ্ঞে, ঘরের বৌ কি পরকে দিব?"

কে ভালবাসে?

ভালবাসা গরীব-দুঃখীর দুঃখ। সাহ-জাদীরা সে দুঃখ স্বীকার করে না।

দুর্ব্বলের অবলম্বন মিথ্যা কথা।

বিপৎকালে যে ইতস্ততঃ করে সেই মারা যায়।

ক্ষুদ্রের অহঙ্কার

সূর্য্যদেব অস্ত গেলে খদ্যোত কি জ্বলে না? শিশির ভরে নলিনী মুদিত হইলে ক্ষুদ্র কুন্দ কুসুম কি বিচলিত হয় না?

দস্যু

নেপোলিয়ান্ প্রভৃতি অনেক দস্যু সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন। রাজা হইলে লোকে আর দস্যু বলে না।

যুদ্ধকালে সকলেই চোর—সকলেই বঞ্চক।

রোদন

কাঁদিও না—কাঁদিলে যদি দুঃখ যাইত, তবে আমি (চঞ্চলকুমারী) কাঁদিয়া রূপনগরের পাহাড় ভাসাইতাম।

দরিয়া—শাহজাদী কেমন ভালবাসে? মবারক—শাহজাদীরা ভাল বাসে না।

দরিয়া—আমরা দুঃখী—আমরা ভালবাসি।

রূপবতী ভার্য্যা শত্রুস্বরূপ।—

কীর্ত্তিই রাজাদিগের রূপ।

শিক্ষার সুফল

আমরা গ্রীক ইতিহাস মুখস্থ করিয়া মরি—রাজসিংহের ইতিহাসের কিছুই জানি না। আধুনিক শিক্ষার সুফল!

খোদার এক ছাঁচ

জেবউন্নিসা তখনও জানিতেন না যে, বাদশাহজাদীরও ভুল হয়—যে খোদা

বাদশাহজাদীকে ও চাষার মেয়েকে এক ছাঁচেই ঢালিয়াছেন—ধন, দৌলত, তক্ত, তাউস্ সকলই কর্ম্মভোগ মাত্র, আর কোন প্রভেদ নাই।

বিষম শোক

যে দুঃখ কাহারও কাছে প্রকাশ করিবার নয়, তাহা সহ্য করা বড়ই কষ্ট।

হতাশের শোক

জেব-উন্নিসা আতর মাখা রুমালখানা চক্ষুতে দিয়াছিল, এখন (যখন শুনিল যে সর্পদষ্ট মবারককে কিছুতেই বাঁচান গেল না) পাথরে লুটাইয়া পড়িয়া চাষার মেয়ের মত মাথা কুটিতে লাগিল।

সুখ কিসে ?

কৈ শাহজাদী ! হস্তিদন্তনির্ম্মিত রত্নদণ্ড-ভূষিত পালঙ্কে শুইলেও ত চক্ষুর জল আসে না। তুমি যদি বাহিরে গিয়া দিল্লীর সহর-তলীর ভগ্নকুটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে, তাহা হইলে দেখিতে পাইতে কত লোক ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া কত হাসিতেছে। তোমার মত কান্না কেহই কাঁদিতেছে না।

ভারতে যুদ্ধবিদ্যা

যুদ্ধবিদ্যা, ইউরোপীয় বিদ্যা। আসিয়া খণ্ডে, ভারতবর্ষে ইহার বিকাশ কোন কালে নাই। যে পুরাণেতিহাসবর্ণিত আর্য্যবীরগণের এত খ্যাতি শুনি, তাঁহাদের কৌশল কেবল তীরন্দাজী ও লাঠিয়ালিতে।

ভারতে সেনাপতি

রামচন্দ্র অর্জ্জুনাদির সেনাপতিত্বের কোন পরিচয় পাই না। অশোক, চন্দ্র-গুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, শকাদিত্য, শিলাদিত্য—কাহারও সেনাপতিত্বের কোন পরিচয় পাই না। যাঁহারা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন, মহম্মদ কাশিম, গজনবী মহম্মদ, সাহাবুদ্দীন, আলাউদ্দীন, বাবর, তৈমুর, নাদের শের—কাহারও সেনাপতিত্বের কোন পরিচয় পাই না। আকবরের সময় হইতে এ সেনাপতিত্বের কতক কতক পরিচয় পাওয়া যায়। আকবর, শিবাজী, আহম্মদ আবদালী, হৈদর-আলি, হীরসিংহ প্রভৃতিতে সেনাপতিত্বের লক্ষণ, রণপাণ্ডিত্যের লক্ষণ দেখা যায়।

বীরের ইতিহাসে রাজসিংহ

ভারতবর্ষের ইতিহাসে যত রণপণ্ডিতের কথা আছে, রাজসিংহ কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহেন। ইউরোপেও এইরূপ রণপণ্ডিত অতি অল্পই জন্মিয়াছিল। অল্প সেনার সাহায্যে এরূপ মহৎ কার্য্য ওলান্দজ-বীর মুষ্কালা উইলিয়মের পর পৃথিবীতে আর কেহ করে নাই।

হাতে মারিলে যুদ্ধ হয় না, পেটে মারিতে হয়।

বাঙ্গালী

বার্টল ফ্রিয়ার একদা বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালী যুদ্ধ করিতে জানে না বলিয়া ঘৃণা করিও না, বাঙ্গালী একদিনে সমস্ত খাদ্য লুকাইতে পারে।

ঔরঙ্গজেব মার্ক আন্তনি বা অগ্নিবর্ম্ম ছিলেন না, কিন্তু মনুষ্য কখন পাষাণও হয় না।

সৈনিকের শিক্ষা

নাচগানে মন দিলে রাজপুত কি আর তোমাদিগের মত বীরপণা দেখাইতে পারিবে ?

কিন্তু মানুষ যাহা আজ চাহে, কাল (তাহাতে) তাহার ইচ্ছা থাকে না।

নিদ্রার ধর্ম্ম

যে নিদ্রা যাইব না প্রতিজ্ঞা করে, তন্দ্রা আসিলেও (তাহার) মধ্যে মধ্যে নিদ্রাভঙ্গ হয় ; তন্দ্রাভিভূত হইলেও একটু বোধ থাকে যে, আমার ঘুম হইবে না।

চিন্তা

সমস্ত দিনরাত্র আগুনের তাপের নিকট বসিয়া থাকিলে মানুষ যেমন হয়, চিতারোহণ করিয়া না পুড়িয়া কেবল ধূম ও তাপে অর্দ্ধ দগ্ধ হইয়া চিতা হইতে নামিলে যেমন হয়, জেব-উন্নিসাকে আজ তেমনই দেখাইতেছিল।

বিপদে শেষ অবলম্বন

...উদিপুরী একা বসিয়া আছে—সম্মুখে কুমারী মেরির প্রতিমূর্ত্তি এবং একটি ক্রুশ।.....বৃষ্টির দিনে দুঃখীর পুরাণ ছাতির মত আজ তাহা বাহির হইয়াছিল।

ঐশ্বর্য্য না বিষ ?

আল্লাহ্‌কেও মানি নাই, বেহেস্তও মানি নাই, খোদাও জানিতাম না, দীনও জানিতাম না। কেবল ভোগবিলাসই জানিতাম। আল্লা রহিম ! তুমি কেন ঐশ্বর্য্য দিয়াছিলে ? ঐশ্বর্য্যে আমার জীবন বিষময় হইল। তোমায় আমি তাই চিনিলাম না।

মনের ধর্ম্ম

প্রায় সকলেরই ইহা ঘটে যে, অধিক মানসিক যন্ত্রণার সময়, অধিকক্ষণ ধরিয়া একা মর্ম্মভেদী চিন্তায় নিমগ্ন হইলে মনের কোন কোন কথা মুখে ব্যক্ত হয়।

স্নেহ-শূন্য নারীহৃদয় জলশূন্য নদী—কেবল পঙ্কময়।

হিন্দু

হিন্দু, ক্ষুধার্ত্তের অন্ন যোগান পরমধর্ম্ম বলিয়া জানে ; অতএব হিন্দু শত্রুকেও সহজে উপবাসে মারিতে চাহে না।

নারীপ্রেমে অন্ধ মানুষ

মনুষ্য স্ত্রীজাতির প্রেমে অন্ধ হইলে আর তাহার হিতাহিত ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান থাকে না। তাহার মত বিশ্বাসঘাতক পাপিষ্ঠ আর নাই।

হিন্দু ও মুসলমান

গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে, কোন পাঠক না মনে করেন যে হিন্দু-মুসলমানের কোন প্রকার তারতম্য নির্দ্দেশ করা এই (রাজসিংহ) গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না ; মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না ; অথবা হিন্দু হইলে মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপই আছে। বরং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যখন মুসলমান এত শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল, তখন রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা অবশ্য শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু ইহাও সত্য নহে যে, মুসলমান-রাজাসকল হিন্দু-রাজাসকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট

অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম্ম আছে—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম্ম নাই—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক—সেই নিকৃষ্ট।

রাজা যেরূপ হয়েন, রাজানুচর এবং রাজপৌরজন প্রভৃতিও সেইরূপ হয়।

উইলিয়ম ও রাজসিংহ

.....ওলন্দাজ উইলিয়ম ও রাজপুত রাজসিংহ বিশেষ প্রকারে তুলনীয়। উভয়ের কীর্ত্তি ইতিহাসে অতুল। উইলিয়ম ইউরোপে দেশহিতৈষী ধর্ম্মাত্মা বীরপুরুষের অগ্রগণ্য বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন—এ দেশে ইতিহাস নাই, কাজেই রাজসিংহকে কেহ চেনে না।

---

(৪)

চন্দ্রশেখর

বালকের ন্যায় কেহ ভালবাসিতে জানে না।

বাল্যকালের ভালবাসা

বাল্যকালের ভালবাসায় বুঝি কিছু অভিসম্পাত আছে। যাহাদের বাল্যকালে ভালবাসিয়াছ, তাহাদের কয়জনের সঙ্গে যৌবনে দেখা সাক্ষাৎ হয়? কয়জন বাঁচিয়া থাকে? কয়জন ভালবাসার যোগ্য থাকে? বার্দ্ধক্যে বাল্য-প্রণয়ের স্মৃতি কত মধুর।

বালক ও বালিকা।

বালক মাত্রেই কোন সময়ে না কোন সময়ে অনুভব করিয়াছে যে, ঐ বালিকার মুখমণ্ডল অতি মধুর—উহার চক্ষে বোধাতীত গুণ আছে।

কেন?

একজন কেন আর একজনের পথ চেয়ে পড়িয়া থাকে? যদি তাই ঈশ্বরের ইচ্ছা, তবে যে যাকে পায়, সে তাকেই চায় না কেন? যাকে না পায়, তাকে চায় কেন?

যুবতীর হৃদয়

জল চঞ্চল; এই ভুবনচাঞ্চল্যবিধায়িনীদিগের হৃদয়ও চঞ্চল। জলে দাগ বসে না, যুবতীর হৃদয়ে বসে কি?

জুজুর ভয়

বাঙ্গালীর ছেলে মাত্রেই জুজু দেখিয়া ভয় পায়, কিন্তু এক একটি এমন নষ্ট বালক আছে যে জুজু দেখিতে চাহে।

সেকালের ইংরাজ

যাঁহারা ভারতবর্ষে প্রথম ব্রিটেনীয় রাজ্য সংস্থাপন করেন, তাঁহাদিগের ন্যায় ক্ষমতাশালী এবং স্বেচ্ছাচারী মনুষ্য-সম্প্রদায় ভূমণ্ডলে কখন দেখা দেয় নাই।

প্রভাত-বাবু

তোমরা অন্য শঠ, প্রবঞ্চক, ধূর্ত্তকে যত পার বিশ্বাস করিও, কিন্তু প্রভাত-বাবুকে বিশ্বাস করিও না।

ব্রাহ্মণ-পত্নী

আমরা ব্রাহ্মণের কন্যা, ব্রাহ্মণের স্ত্রী; আমরা মনে দৃঢ় থাকিলে পৃথিবীতে আমাদের বিপদ নাই।

ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত

চন্দ্রশেখর ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত, কিন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নহেন—ভিক্ষা গ্রহণ করেন না, কাহারও কাছে দান গ্রহণ করেন না।

পুরুষের চক্ষু

আমার মনে বোধ হয়, পুরুষ মানুষের চক্ষু কেবল মাথার শোভনার্থ—তাহাতে দেখিতে পায় না। কৈ, পুরুষে মেয়েমানুষের চাতুরী কখন টের পায়, এমন ত দেখিলাম না।

নিমজ্জমান ব্যক্তি

যে ডুবিয়া মরিতেছে সে অবলম্বনের যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচার করে না।

ভবিতব্য ও পুরুষকার

ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে? যাহা ঘটিবার, তাহা অবশ্য ঘটিবে। তাই বলিয়া পুরুষকারকে অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। যাহা কর্ত্তব্য তাহা অবশ্য ঘটিবে।

সব গ্রন্থ ভস্ম হয়, হৃদয়-গ্রন্থ ত ভস্ম হয় না

শুনিয়াছি লোক বড়মানুষ হইলে পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া যায়।

চাণক্য পণ্ডিত লিখিতে ভুলিয়াছেন; নিদ্রা স্ত্রীলোকের ষোল গুণ।

গলষ্টন জন্‌সন্‌কে বলিলেন "তবে বাতি ও দেশলাই লও। হিন্দু তেল পোড়ায় না—খরচ হইবে।"

ভয়ের স্বধর্ম্ম ভয়ানক বস্তুর দর্শন পুনঃ পুনঃ কামনা করে।

মৃত্যু

মৃত্যুর অপেক্ষা বিপদ নাই। যে স্বয়ং অহরহ মৃত্যুর কামনা করে, তাহার কিসের ভয়।

আশা থাকিতে মানুষ মরিতে পারে না।

জানিতাম না যে, মনুষ্যে গড়ে, বিধাতা ভাঙ্গে।

পাপ

পাপের অনর্থকতা আর সার্থকতা কি? বরং অনর্থকতাই ভাল।

যে সকল বিদ্যা উপার্জ্জন করিবে, সাবধানে প্রয়োগ করিও।

সুখ ও দুঃখ

কদাপি সন্তাপ হৃদয়ে স্থান দিও না। কেননা দুঃখ বলিয়া একটা স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। সুখ দুঃখ তুল্য বা বিজ্ঞের কাছে একই। যদি প্রভেদ কর তবে যাহারা পুণ্যাত্মা বা সুখী বলিয়া খ্যাত তাহাদের চিরদুঃখী বলিতে হয়।

দয়াময়

যিনি সর্ব্বজ্ঞ তিনি এই দুঃখময় অনন্ত সংসারে অনন্ত দুঃখরাশি অনাদি অনন্ত কালাবধি হৃদয় মধ্যে অবশ্য অনুভূত করেন। যিনি দয়াময়, তিনি কি সেই দুঃখরাশি অনুভূত করিয়াও দুঃখিত হন না? তবে দয়াময় কিসের? দুঃখের সঙ্গে দয়ার নিত্য সম্বন্ধ—দুঃখ না হইলে দয়ার সঞ্চার কোথায়?

পরোপকারী

যেই পরোপকারী সে-ই সুখী, অন্য কেহ সুখী নহে।

আশা

কবিগণ আশার প্রশংসায় মুগ্ধ হন। আশা সংসারে অনেক সুখের কারণ বটে,

কিন্তু আশাই দুঃখের মূল। যত পাপ কৃত হয় সকলই লাভের আশায়। কেবল সৎকার্য্য কোন আশায় কৃত হয় না।

মনের ধর্ম্ম

জোৎস্না ফুটিয়াছে। গঙ্গার দুইপার্শ্বে বহুদূর বিস্তৃত বালুকাময় চর। চন্দ্রকরে সিকতাশ্রেণী অধিকতর ধবলশ্রী ধরিয়াছে, গঙ্গার জল চন্দ্রকরে প্রগাঢ়তর নীলিমা প্রাপ্ত হইয়াছে, গঙ্গার জল ঘননীল, তটারূঢ় বনরাজী ঘনশ্যাম, উপরে আকাশ রত্নখচিত নীল। এরূপ সময়ে বিস্মৃতি জ্ঞানে কখনও কখনও মন চঞ্চল হইয়া উঠে।

মনুষ্যের গৌরব

এই যে নদীর উপকূলে যে বালুকাভূমে তরণী-শ্রেণী বাঁধা রহিয়াছে, তাহার বালুকা-কণার অপেক্ষা মনুষ্যের গৌরব কি?

সাহেবের খানসামা

পৃথিবীতে যত মনুষ্য আছে, ইংরেজদিগের মুসলমান খানসামা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব।

সুন্দর মুখ

সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র। বিশেষ সুন্দর মুখের অধিকারী যদি যুবতী স্ত্রী হয়, তবে সে মুখ অমোঘ অস্ত্র।

জড়প্রকৃতির দৌরাত্ম্য

তুমি গ্রাহ্য কর না কর, তাই বলিয়া ত জড়প্রকৃতি ছাড়ে না—সৌন্দর্য্যও লুকাইয়া রয় না। স্নেহময়ী মাতার ন্যায় সকল সময়ে আদর করিতে চায়।

কালের মাপ

বৎসরে কি কালের মাপ! ভাবে ও অভাবে কালের মাপ।

আকাঙ্ক্ষা

নিকটে আসিলে কে আকাঙ্ক্ষা পরিহার করিতে পারে?

জড়প্রকৃতি

তুমি জড়প্রকৃতি।.....তোমার দয়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই, জীবের প্রাণ নাশে সঙ্কোচ নাই; তুমি অশেষ ক্লেশের জননী অথচ তোমা হইতে সব পাইতেছি—তুমি সর্ব্বসুখের আকর সর্ব্বমঙ্গলময়ী সর্ব্বার্থসাধিকা, সর্ব্বকামনাপূর্ণকারিণী, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী.....কেন জীব লইয়া তুমি ক্রীড়া কর, তাহা জানি না—তোমার বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই, চেতনা নাই—কিন্তু তুমি সর্ব্বময়ী, সর্ব্বকর্ত্রী, সর্ব্বনাশিনী এবং সর্ব্বশক্তিময়ী। তুমি ঐশীমায়া, তুমি ঈশ্বরের কীর্ত্তি, তুমিই অজেয়।

চিত্তের ধর্ম্ম

নির্জ্জন, নীরব, অন্ধকার, মনুষ্যসন্দর্শন-রহিত, তাতে আবার শরীর ক্লিষ্ট, ক্ষুধা-পীড়িত, চিত্ত অনন্তচিন্তাশূন্য; এমন সময়ে যে বিষয়ে চিত্ত স্থির করা যায়, তাহাই জপ করিতে করিতে চিত্ত তন্ময় হইয়া উঠে।

ধ্যান

মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের পথ রোধ কর, ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত কর—মনকে বাঁধ, বাঁধিয়া একটি পথে

ছাড়িয়া দাও অন্য পথ বন্ধ কর—মনের শক্তি অপহৃত কর—মন কি করিবে? সেই এক পথে যাইবে—তাহাতে স্থির হইবে—তাহাতে মজিবে।

ইংরেজের মন্ত্র

যে দিন, একজন ইংরেজ দেশীলোকের ভয়ে পলাইবে, সেই দিন ভারতবর্ষে ইংরেজ-সাম্রাজ্য-স্থাপনের আশা বিলুপ্ত হইবে।

শুনিবার জন্য কে কবে সঙ্গীতের অবতারণা করে?

উজ্জ্বলে মধুরে

যখন তোমার গৃহিণী কর্ণাভরণ দোলাইয়া তিরস্কার করিতে করিতে তোমার পশ্চাদ্ধাবিত হন, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে।

অন্যত্র মঙ্গলাপেক্ষা স্বামীর কাছে অমঙ্গলও ভাল।

কর্ম্মঠ লোক

কর্ম্মঠ লোক কর্ত্তব্যানুরোধে অনেক সময় পরপীড়ক হইয়া উঠে।

রাজ্যরক্ষা

যাহার উপর রাজ্যরক্ষার ভার, তিনি স্বয়ং দয়ালু এবং ন্যায়পর হইলেও রাজ্যরক্ষার্থ পরপীড়ন করিতে বাধ্য হন। যেখানে দুই এক জনের উপর অত্যাচার করিলে সমুদয় রাজ্যের উপকার হয়, সেখানে তাঁহারা মনে করেন যে, সে অত্যাচার কর্ত্তব্য।

রাজ্য-স্থাপন

যাঁহার প্রকৃতিতে দয়া এবং ন্যায়পরতা নাই—তাঁহার দ্বারা রাজ্য-স্থাপনাদি মহৎ কার্য্য হইতে পারে না—কেননা, তাঁহার প্রকৃতি উন্নত নহে—ক্ষুদ্র। এ সকল ক্ষুদ্রচেতার কাজ নহে।

ওয়ারেন হেষ্টিংস দয়ালু এবং ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন।

দায়ে পড়িয়া ভগবদ্ভক্তি

কেহ বিস্মিত হইও না। যে ঈশ্বরকে না মানে, সেও বিপদে পড়িলে তাঁহাকে ডাকে—ভক্তিভাবে ডাকে।

স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার, কতদিন বশে থাকিবে জানি না।

দণ্ডদাতা

যে দুষ্ট, ভগবান্ তাহার দণ্ডবিধান করিবেন। তুমি আমি কি দণ্ডের কর্ত্তা।

অধম ও উত্তম

যে অধম, সেই শত্রুর প্রতিহিংসা করে; যে উত্তম, সে শত্রুকে ক্ষমা করে।

অনন্তধাম

যেখানে ইন্দ্রিয়ের কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই.....যেখানে রূপ অনন্ত, সুখ অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য যেখানে পরের দুঃখ পরে জানে, পরের ধর্ম্ম পরে রাখে, পরের জয় পরে গায়, পরের জন্য পরকে মরিতে হয় না, সেই মহৈশ্বর্য্য লোকে যাও।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

সাহিত্যে অনুপ্রাস *

সাহিত্যের আসরে অনুপ্রাসের অবাধ অধিকার। অনুপ্রাস সাহিত্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। : পদ্যে পদ্যে, গদ্যগুচ্ছে, গালগল্পে, গানগল্পে, গ্রাম্যগীতিতে, প্রীতিগীতিতে, স্তবস্তুতিতে, কৃষ্ণকীর্ত্তনে, কালীকীর্ত্তনে, সাধকসঙ্গীতে, সাধনসঙ্গীতে, ভগবানের গুণ-গানে, গুণিগণ যুগে যুগে অনুপ্রাসের গরিমা জ্ঞাপন করিয়াছেন। লিপিপটু সাহিত্যধুরন্ধর-গণের সরস বচনবিন্যাসে, বাগ্‌বিভবে, বাক্যের বাহারে, ছলাকলায়, কলাকৌশলে, কায়দাকরতবে, অনুপ্রাসের পূর্ণপ্রসর। এবারে সাময়িক সাহিত্য অস্থায়ী সাহিত্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ জানাইব। আগামী বারে খাঁটি সাহিত্য ধরিব।

২। পূর্ণিমা-মিলন, সাহিত্য-সম্মিলন, স্মৃতি-সম্মিলন, সখা-সম্মিলন, সখী-সম্মিলন, স্মৃতি-সভা, স্মৃতি-সৌধ, সঙ্গীত-সমাজ, সাহিত্য-সমাজ, সাহিত্য-সম্রাট্, সাহিত্য-সভা, সাহিত্য-সংবাদ, সাহিত্য-সমাচার, সাহিত্য-সমালোচনা, সাময়িক সাহিত্য, সাহিত্যসেবি-সম্প্রদায়, সাহিত্যিক সমস্তই সানুপ্রাস।

৩। আরও রহস্য রহিয়াছে। যেখানে বিন্দুমাত্র রস সেখানেই অনুপ্রাস। রসভাষ, রসাভাস, রসরঙ্গ, রঙ্গরস, রসগর্ভনির্ভর রচনা, আর স্বচয়িতা রহস্যরসিক রসরাজ রসিকরাজ রসরত্নাকর রসময় নাহা † (রসয়োরৈক্যং ইতি সুধীভিরিভাব্যম্।)

৪। পুস্তকপ্রবন্ধ যন্ত্রস্থ হইলে যন্ত্রণাস্থল হইয়া উঠে ইহার জন্যও অনুপ্রাস দায়ী! প্রকাশিত পুস্তকের সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত—অনুপ্রাসের অনুরোধ!

৫। মাসিক পত্রিকার মধ্যে জগজ্জ্যোতিঃ, প্রজাপতি, বামাবোধিনী, মৃতজীবন নবজীবন, নবনূর, সন্ধ্যাসী সুহৃদ্, সংসঙ্গ, সাহিত্য-সংবাদ, সাহিত্য-সংহিতা, শিল্প ও সাহিত্য, অনুপ্রাসের মান রাখিয়াছে। সখা ও সাথীতে অনুপ্রাস ছিল, শিশুজীবনে নাই, কিন্তু পৃষ্ঠপোষক মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীতে আছে। মাসিক পত্রিকায় কবিতাকুঞ্জ, চিত্রচয়ন, সহযোগি-সাহিত্য-সমালোচনা, সারসংগ্রহ বা সারসঙ্কলন। 'সাহিত্য'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশ সমাজপতি স্বয়ং।

৬। মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা ও ছোটগল্পের আয়েষ উচ্ছ্বাসে অনুপ্রাস উৎক্ষিপ্ত। যথা, কবিতার নমুনা—আলোকে আঁধারে, কায়া ও ছায়া, তন্দ্রাতুর, তোমরা ও আমরা, তোমাতে আমাতে, দেবদূত, ধরা পড়া, নববর্ষা, নারী ও বারি, পদ্মার প্রতি, প্রকাশ-পীড়ন, প্রেম-পরিণাম, মায়ের মন, রক্ষা কর, বালিকা বিধবা, বৈয়াকরণ-বৈঠক, শরতের সঙ্গীত, শান্তশীলা, সালগম-

---

* পূর্ণিমা-মিলন উপলক্ষে মদন মিত্রের গলিতে দীনবন্ধু মিত্রের বাটীতে (দীনবাসে) পঠিত। প্রবন্ধ-লেখক অনুপ্রাস অবলম্বনে কিছুকাল হইতে গভীর গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ তাহার একটি ক্ষুদ্র অংশ। অনুপ্রাস-স্থলে র ড়, গ জ, প ন, ল য, শ ষ স, ও দুই ব এক ধরা হইয়াছে।

† ইঁহার রচিত পুষ্পাঞ্জলি, আহার, হাইতন, সুধীসমাজে সুপরিচিত। ইনি ও ইঁহার সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র সরকার উভয়ের মিলনে 'মধুরমিলন' নামক মিলনান্ত নাটকের উদ্ভব।

সংবাদ, শোক ও সান্ত্বনা, স্নেহ-স্মৃতি। গল্পের নমুনা—কুকথা, পিতৃভক্তির পুরস্কার, প্রজাপতির পরিহাস, প্রায়শ্চিত্তের প্রতিশোধ, মণি-মঞ্জীর, মস্তকের মূল্য, মায়া-মরীচিকা, মাষ্টার মশায়, মিলনে মৃত্যু, মৃত্যু-মিলন, রসময়ীর রসিকতা।

৭। মাসিক পত্রিকায় জ্ঞানগর্ভ বা রসগর্ভনির্ভর প্রবন্ধ-নিবন্ধের নাম-নির্ব্বাচনেও অনুপ্রাস প্রকট। যথা—আবদারের আইন, উপনিষদের উপদেশ, কথা বনাম কাষ, কলিকালে কালোকপ, কুৎসা-কুমারী, গল্প ও অল্প, গরুর গাড়ী, গুরুবাটে গরবা, গোগ্রাস ভূমি, তাম্রশাসন প্রসঙ্গ, তেল-নুন-লকড়ী, নূতন নীলাম্বিকাবাদ, পরমাণু-প্রমাণ, পাস্তো পলিটিকস্, পুরাতন-প্রসঙ্গ, পুরাণ-প্রসঙ্গ, পুরীর পথে, পেন্থইন পক্ষী, প্রবাস-প্রসঙ্গ, প্রাসাদ-প্রসাদিকা, প্রিয়দর্শি-সম্বন্ধে পুনরালোচনা, মুখর মুদ্রা, বর্গীহাঙ্গামের বঙ্গবিজয়, বংশানুক্রম ও ব্যাধি, বজেট ও বোর্ড, বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য, বুরোক্রাসি ও বাবুক্রাসি, ব্যোম-বিহার, রাজা রসালু, রামায়ণের রচনাকাল, সংসার ও সন্ন্যাস, সহবৎ-শিক্ষা, সামাজিক সমস্যা, সারসত্য, সাহিত্য-সেবী, সফল স্বপ্ন, স্বপ্ন না স্মৃতি?

৮। গুরুগম্ভীরগবেষণাগর্ব্ব থাকিলেও পরিষৎ-পত্রিকা অনুপ্রাস-পরবশ, নামেই প্রকাশ। কমলাকর, টা টো টে, তর্পণ-দীঘির তাম্রশাসন, পরিক্রমা-পরম্পরা-প্রণেতা নরহরি, পর্ত্তুগীজ-প্রভাব ও পর্ত্তুগীজ-পদাঙ্ক, বাঙ্গালা-ব্যাকরণ, বাংলা বহুবচন বীমসের বাংলা-ব্যাকরণ, শঙ্কর ও শাক্যমুনি, সেখশুভোদয়া ইত্যাদি প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধের নামনির্দ্দেশে অনুপ্রাস প্রভূত পরিমাণে পাইবেন। পরিষৎ-পত্রিকাও অনুপ্রাসের গুণে মনোরঞ্জিকা। ইহাতে প্রকাশিত তালিকায়, প্রথম বাঙ্গালা-গদ্যগ্রন্থ প্রতাপাদিত্য, প্রণেতা রামরাম বসু, প্রথম বাঙ্গালা মুদ্রিত-পুস্তক-প্রণেতা হালহেড সাহেব, প্রথম বাঙ্গালা অভিধান অমরের অনুবাদ শব্দসিন্ধু, নীতি-বিষয়ক প্রথম পুস্তক কবিতামৃতকূপ, প্রথম উপন্যাস ফুলমণি ও করুণা, প্রথম নাটক প্রেম পঞ্চানন-প্রণীত, সর্ব্বত্র অনুপ্রাস। ইংলণ্ডের ইতিহাসও ইহার ভিতর আছে। ইহার উপর, পরিষৎ-পুস্তকাগারে, প্রাপ্ত পুস্তক পুথিতে প্রাচীন পুথি প্রকাশে, প্রজাবতী-পুরস্কারে, শাখা-সভায়, শাখাসমিতিতে, শব্দ-সমিতিতে, শব্দসঙ্কলনে, সাধারণ-সম্মিলন-সমিতিতে, সমাধি-স্তম্ভে, স্মৃতি-সৌধে, মর্ম্মর-মূর্ত্তির পাদপীঠে, আনুমানিক আয়ব্যয়ে, অনুপ্রাসের অনধিকারপ্রবেশ অনিবার্য্য।

৯। সংবাদ-পত্রের নামনির্দ্দেশেও অনুপ্রাস। যথা—সাপ্তাহিক সমাচারচন্দ্রিকা, শিক্ষা-সমাচার, রাজভাষায় রচিত রইস ও রায়ত, বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবাসী, বার্ত্তাবহ, বীরভূম-বার্ত্তা, মোহম্মদী, মহামায়া। দক্ষিণবঙ্গে সুলভ-সমাচার ও পূর্ব্ববঙ্গে বিশ্ববার্ত্তা সরকারের সরফরাজী করিতেছে। বসুমতী "নমো নারায়ণায়" বলিয়া অনুপ্রাসের অভাবটা সারিয়া লইয়াছেন। সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের প্রেরিত পত্রে, প্রবন্ধ-প্যারাগ্রাফের নামমালায়ও অনুপ্রাস, যথা—অভাব-অভিযোগ, অপহরণের অভিযোগ, আকগান আমীর, আমীরের আদেশ, আবেদনে আশা, কলম্বোর কাণ্ড, কাশীর কথা, ক্যাপিটালের কথা, কুলির কান্নাও,

গার্ড গ্রেপ্তার, গোমঠের ওগ, ডাকাতি বাতিক, দলাইলামা, নাবিকগণের নিমন্ত্রণ, নূতন নিয়োগ, পঞ্চায়তের পুরস্কার, পত্নীর প্রার্থনা, পারস্য-প্রসঙ্গ, পারস্য-সমস্যা, প্রিয়তমের প্রতিশোধ, পুলিস-প্রসঙ্গ, প্লেগ প্রতিষেধ, ভবিষ্যৎ ভাবনা, ময়দানে মৃতদেহ, মজঃফরপুরের মামলা, মানহানির মামলা, মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্টার, মোহন্তের মোকদ্দমা, বঙ্গবাসীর বয়োবৃদ্ধি, বর্দ্ধমান বেড়ুগ্রাম, বালক ও তামাক, বিমানে বিভীষিকা, বিষম বাত্যা বিষম বিভ্রাট, বিষম বিড়ম্বনা, বোমা-বিভ্রাট, ভূমি বন্ধ, ভূমিবিধান, ব্যাঘ্রে বিপদ্, শীকার-স্পৃহা, শুভ সংবাদ, শোকসভা, সন্ধির সর্ত্ত, সহর না শ্মশান, সাগরে সঙ্কট, সারা সেতু, সিংহ-শীকার, সেবাসেতু। দিল্লীদরবার ও সম্রাটের শুভাগমন সম্বন্ধে যে সব অনুপ্রাস অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেগুলি স্বতন্ত্র স্থানে সন্নিবেশিত করিব।

১০। পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতা ও প্রকাশকও অনুপ্রাসের পদপ্রান্তে পড়িয়া আছেন। তাঁহাদিগের পুস্তকরাশির মলাটেই যখন এত অনুপ্রাসের ঘটা, না জানি গ্রন্থের মধ্যে কত রস।

কবিতাকথা, কবিতাকদম্ব, কবিতাকলাপ, কবিতাকুসুম, কোমলকবিতা, নবকবিতা, পদ্যপাঠ, পদ্যপাদপ, পদ্যপুষ্পাঞ্জলি, পদ্য-প্রকাশ, পদ্যপ্রদীপ, পরীক্ষাপদ্ধতি, পরীক্ষা-সিন্ধুসেতু, পাঠশালা-পরীক্ষাবিধান, প্রকৃতি-পরিচয়, প্রকৃতিপাঠ, প্রথমপাঠ, প্রাথমিক প্রাকৃতবিজ্ঞান, বর্ণবোধ, বালকবোধ, বালবোধ, বোধবিকাশ, সচিত্র শিশুশিক্ষা, শিক্ষাসার, শিক্ষাসোপান, সংসন্দর্ভ, সরলসংস্কৃত, সংস্কৃতশিক্ষা, সংস্কৃতসোপান, সাহিত্যসন্দর্ভ, সাহিত্যসার, সাহিত্যসোপান, সাহিত্যসংগ্রহ, সুনীতিসন্দর্ভ, সুনীতিসোপান।

১১। শিশুশ্রেণীর উপযোগী উপহার-পুস্তকাদিও অনুপ্রাসে অনুপ্রাণিত। খুকুরাণীর খেলা, খেলাধূলা, খোকাখুকুর খেলা, চারু ও হারু, ছবি ও ছড়া, ছেলে ও ছবি, ছেলেখেলা, ছেলেভুলান ছড়া, ঝিকমিকে বই, ঝুমঝুমি, টুকটুকে বই, টুনটুনির বই, জীবজন্তু, পশুপক্ষী, ভূতপেত্নী, রং চং, রাক্ষসখোক্কস, শিশুতোষ শিশুসখা, হাসিখুসি, হাসিরাশি।

১২। খাঁটি সাহিত্য না হইলেও অনুপ্রাস সারসম্বল করিয়া অনেক লম্বচওড়া মলাটবৃত বহি তরিয়া যাইতেছে। যথা—কার্পাসকথা, কুলী-কাহিনী, শিকারকাহিনী, পত্র ও পাট্টাদি লিখনপ্রণালী, পরিমাপ-পদ্ধতি, পুরাতন পঞ্জিকার পরিশিষ্ট, প্রাথমিক পাটীগণিত, বৈষয়িক ব্যবহার, সচিত্র সীবন-শিক্ষা, সরল শরীরপালন, সার্ভে ও সেটল্‌মেণ্টদর্পণ, স্বাস্থ্যসহায়, সভ্যতাশিক্ষা, অনুপ্রাসের ঘনঘটায় সৎকাব্যভ্রান্তি ঘটায়। অভিধানের মধ্যে শব্দসার এবং শব্দসংজ্ঞা-বিশ্লোলি এবং ব্যাকরণের মধ্যে পালিপ্রকাশ ও ব্যাকরণ-বিভীষিকা অনুপ্রাসের দোহাই দিয়া সাহিত্যের আসরে স্থান পাইতে চাহে। 'পাকপ্রণালী' এবং 'আমিষ ও নিরামিষ আহারে' অনুপ্রাসরসে অপর রসের সঞ্চার করে।

১৩। যাঁহারা বিজ্ঞাপনের বাহারে ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিক্রয়ের বিস্তারে ব্যস্ত, তাঁহারাও সুকুমারসাহিত্যসৃষ্টির সহায়তা করেন। কবিত্ব অংশে তাঁহারাও কেহ কম নহেন।

আনন্দময়ীর আগমনে মনোমুগ্ধকর কারুকার্য্যে সুশোভিত পূজার পোষাক পরিচ্ছদ, কমলালয়ে বা শোভা-ভবনে বা শোভা-সদনে, বঙ্গবন্ধু বঙ্গবাসী বস্ত্রলক্ষ্মী বা বান্ধব বস্ত্রালয়ে, সজ্জিত থাকিয়া অনুপ্রাসের প্রভাবে চিত্তচাঞ্চল্য ও ব্যয়বাহুল্য ঘটায়।

রমণীরঞ্জন সৌখীন সামগ্রীতে অনুপ্রাসের অবসর অধিক। যথা, সাবিত্রী শাঁখা, সতী-শোভনা সিন্দুর, মনোমোহিনী টিপ, প্রভাবতী পাউডার, (স্ত্রীজাতির ব্যবহারে আসে বলিয়া বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ), চরণচাঁদ তরল আলতা, গোলাপ জল, সুরভিসার, সৌরভসার, এসেন্স, খস্‌খস্ সাবান, হাস্‌নাহানা, পাণের সেন্‌সেন। সৌখীন তৈল :— কমলাবিলাস, কামিনীকুসুম, কাশ্মীরকুসুম, কুন্তলকমলিনী, কুন্তলকান্তি, কুন্তলকুমুদিনী, কুন্তলকৌমুদী, কুন্দকুসুম, গোলাপগন্ধ কুন্তলীন, নবপুষ্পল, বসন্তবিরাজিনী, বেগম-বাহার, মধুমালতী, শেফালির সুষমা, সুকেশ ও সুরমা। অলকে 'অলোকা' লাগাইলেও অনুপ্রাস অনায়াসে আসে। ফুলাল তৈল তিল তৈলে অনুপ্রাস তরতরে, রিফাইন্ড্ রেড়ীর তেলে চট্‌চটে। রোল্ড্ গোল্ড্ বা মায়াপুরী মেটালে নির্ম্মিত যৌবনবাহার চুড়ী, বিনোদবাহার চুড়ী, স্বামিসোহাগিনী চুড়ী প্রভৃতি তেল ও তোলও এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বৃদ্ধের ব্যবহার্য্য চুলের কলপে,নেশার বশ বাঙ্গালী বাবুর অনুরা খাঁখীরা আমীরী তামাকে, বিজলীবিন্দু টিকায় অনুপ্রাস। সোণালী কালীতে অনুপ্রাস জল্‌জল্ করিতেছে। ন্যাংড়া ও লিচুর কলম হইতে ধানভানা কলে পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই অনুপ্রাস।

দোকান বা দ্রব্যের নাম :—আদর্শ আর্য্য নিবাস (আবাস হইলে সোণায় সোহাগা হইত), বান্ধব বোর্ডিং, শিয়ালদহ সরাই, হিন্দু হোটেল। ভাগ্যগণনা, দশকর্ম্ম দ্রব্যালয়, পুরাতন পুস্তকালয়, শ্রমজীবি-সম্প্রদায়, স্বাস্থ্যসহায় ঔষধালয়, শ্মশানপরিত্রাণাশ্রম, হিন্দু সৎকার সমিতি। ঔষধ :—জ্বরহর, যমানী জল, বিজয়া বটিকা, শান্তিসুধা, শরৎসুধা, সুধাসিন্ধু। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। 'নানান্ নকল। সাধু সাবধান।'

ইংরাজী শব্দ হইলেও বাঙ্গালা হরপে লিখিত নিম্ননির্দ্দিষ্ট দ্রব্য বা ব্যবসায়ীর নামে অনুপ্রাসের প্রয়াস আছে। ওয়েষ্টেড ওয়াচ, রেলওয়ে রেগুলেটার, হাফহন্টিং, ষ্টীলট্রাঙ্ক ও ক্যাশবাক্স, ড্যানজিন্, জারজিনা, নানালা, রুপ্রস্, কলেরা কিওর, ফিভর ফ্লুইড্, ঢোল কোম্পানীর এন্টিফেব্রিল পিল, অমৃত বসুর অপেরা অয়েল, সানলাইট সোপ, সুলেমানি সল্ট, সাইকল্ ষ্টে, লিপ্‌টন্‌স্ টী, টাম্বুলবাড়ী ষ্ট্যাণ্ডার্ড টী, আসাম সিল্ক ষ্টোরস্, স্বদেশী ইণ্ডেক্টস্ ষ্টোর, ন্যাশনাল নর্শারী, পিকক কেমিক্যাল ওয়ার্কস্, কুমারসিয়াল হল, ফিল্যানথ্রপিক ফার্ম্মেসি, প্যারাগন প্রেস্, প্রতিভাপ্রেস্, প্রেসিডেন্সী প্রেস্, মোহিনী মিল্, বেঙ্গল বেকারী, ইয়ার্ট ট্যানারি,ষ্টার থিয়েটার, বীণাপাণি ব্ল্যাক কালী, কলিকাতা কর্পোরেশন, কইকমিক কুকার, কাশীর কারমাইকেল লাইব্রেরী, কারলেকাব্‌স্ সার্কাস, কিং কোং, কার কোং, বি ব্রাদার্স।

ঔষধ কুইনাইনে অনুপ্রাস, কুইনাইন ক্যাপসুলে, টাইকো সোডা ট্যাবলয়েডে অনুপ্রাস. আবার পথ্য এরারুট পার্ল পাউডার বার্লি বিস্কুটে, মল্‌টেড মিল্কে, লজেঞ্জসে অনুপ্রাস।

চাঁদসীর চিকিৎসায় চমৎকার অনুপ্রাস। ঔষধের নাম—মনসাধ্য মলম, ফিটিং টিকি। কবিরাজ মহাশয়েরা নামেই কবি বলিয়া ধরা দিয়াছেন। তাঁহাদিগের ভারতভৈষজ্য-ভাণ্ডারে অনুপ্রাস অফুরন্ত। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় বিকৃত উচ্চারণে অনুপ্রাসের আলয়। স্বর্ণপর্পটী, স্বর্ণসিন্দুর, রসসিন্দুর, অনুপ্রাসরসে পরিপক্ক। পেটেণ্ট ঔষধ যথা :—দক্ষদাবানল, পশুপতি পাচন, বাতারি তারাতৈল, বাতবিজয় বটিকা, মহামেদরসায়ন, শক্তিসঞ্জীবনী সালসা, শিরঃ-শূলসংহারিণী বটিকা, শিলাজত্বাদি সিরাপ, শোণিত-শোধক সালসা, সঞ্জীবনী-সুধা, দাস্তদমন বটিকা।

প্রবন্ধপাঠান্তে যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ।*

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফিডো

সক্রেটিস্—সিবেস কি বলে? তাহারও ত সন্দেহ দূর করিতে হইবে।

সিমিয়াস্—যদিও যুক্তি তর্কে তাঁহার একটুও আস্থা নাই তথাপি আমার বিশ্বাস তিনিও এ যুক্তি স্বীকার করিয়াছেন। এখন তাঁহার মত লোকেরও ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে আমাদের জন্মের পূর্ব্বে আমাদের আত্মা সকল বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আমাদের মৃত্যুর পরও বিদ্যমান থাকিবে কি না ইহা আমার বিবেচনায় অদ্যাপি প্রতিপন্ন হয় নাই। সিবেস এই মাত্র লোক-সাধারণের যে ভীতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন যে মৃত্যুর পর আমাদের আত্মার উপকরণ সকল চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে এবং এইরূপে তাহাদের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হইতে পারে, তাহাও ও রূপ সিদ্ধান্তের প্রতিকূল। আমি এরূপ বিশ্বাস পোষণ করার পক্ষে কোন বাধা দেখিতেছি না যে, আত্মা সকল দেহ ধারণের পূর্ব্বে নানা উপাদান হইতে সংগৃহীত হইয়া অস্তিত্ব লাভ করিলেও দেহমুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে।

সিবেস্—সিমিয়াস্ তুমি ঠিক বলিয়াছ। আত্মা আমাদের জন্মাইবার পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল ইহার প্রমাণে আমরা কেবল মাত্র অবিনশ্বরতার অর্দ্ধেক প্রমাণ করিয়াছি। ইহা সম্পূর্ণ প্রমাণ করিতে হইলে আমাদিগকে সপ্রমাণ করিতে হইবে যে আত্মা মানবজন্মের পূর্ব্বে যেমন বিদ্যমান ছিল মৃত্যুর পরও সেইরূপ বিদ্যমান থাকিবে

* লেখক ললিত বাবুর বাটীতে বুঝি? বঃ সঃ।

সক্রেটিস্—হে সিমিয়াস ও সিবেস্, যদি তোমরা, আত্মা যে মৃত্যু হইতে জন্ম গ্রহণ করে—যাহার সত্যতা তোমরা এইমাত্র স্বীকার করিলে—তাহার সহিত এই বিচার মিলাইয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে ইহা আগেই প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। কারণ ইহা যদি হয় যে আত্মা পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল এবং তাহার কেবল মৃত অবস্থা হইতেই জন্ম হইতে পারে তাহা হইলে ইহাও কি সম্ভব নয় যে মৃত্যুর পরও ইহা বিদ্যমান থাকিবে, যখন ইহাকে আবার জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে! তাহা হইলে তোমরা যাহা চাও তাহা আগেই প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, আমি বিবেচনা করি যে তুমি ও সিমিয়াস এ সম্বন্ধে ভাল করিয়া বিচার করিবে, কারণ আমার বিশ্বাস যে শিশুদের ন্যায় তোমাদেরও ভয় হয় পাছে বাতাসে আত্মাকে, শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার সময়, উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং চারিদিকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়; বিশেষত যদি কাহারও ভয়ানক ঝড়ের সময় মৃত্যু হয়।

সিবেস হাস্য করিতে করিতে বলিলেন, "সক্রেটিস্, তুমি মনে কর যেন আমরা ভয় পাইয়াছি এবং যুক্তির দ্বারা আমাদের ভয়কে তাড়াইতে চেষ্টা কর। বরং ইহাও মনে কর যে আমরা ভয় পাই নাই, কিন্তু আমাদের ভিতর একটী বাল্যভাব আছে, যাহার জন্য আমাদের মনে এই ভয় আসিতেছে। সেই বাল্য-ভাবকে এমন ভাবে শিক্ষা দাও যেন ইহা আর মৃত্যুকে ভূত বলিয়া না দেখে।

সক্রেটিস্—তাহা হইলে দেখিতেছি তোমাদিগকে দিন দিন একটী মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে যে মন্ত্র পাঠ করিলে ভয় আপনা আপনি পলাইয়া যাইবে।

সিবেস—কিন্তু হে সক্রেটিস্, তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে সে মন্ত্রই বা কোথা পাব এবং সে যাদুকরই বা কোথা হইতে আসিবে?

সক্রেটিস্—হে সিবেস্, গ্রীস্ একটী প্রকাণ্ড দেশ এবং ইহার সীমার মধ্যে অনেক সৎলোক আছেন। ইহা ব্যতীত বিদেশীয় অনেক জাতি আছে। ইহাদের সকলকার ভিতর সেই যাদুকরকে অন্বেষণ করিতে হইবে। এই অন্বেষণে যত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করা উচিত তাহা তোমরা করিও, কেননা আর অন্য কি কাজে ইহা অপেক্ষা অর্থের অধিক সদ্ব্যয় হইতে পারে? তোমাদের ভিতরও অবশ্য এই যাদুকরের অনুসন্ধান করিতে হইবে, কারণ অন্য কোথাও তোমাদের অপেক্ষা ভাল যাদুকর না পাইতে পার।

সিবেস—অবশ্য এরূপ অনুসন্ধান করা উচিত। কিন্তু আইস আবার যুক্তিমার্গ অনুসরণ করি।

সক্রেটিস্—সকল পদার্থের প্রকৃতিভেদ নিরূপণ করা উচিত। যে সকল বস্তু অমিশ্রিত এবং অংশ-সমষ্টিযুক্ত নয়, যাহাদের কোন অংশ নাই, তাহারা অপরিবর্ত্তনীয় এবং অশরীরী। কিন্তু যাহারা মিশ্রিত এবং যাহাদের অংশ সকল বিচ্ছিন্ন করা যায়, স্বভাবতঃ পরিবর্ত্তনশীল এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় বলিয়া তাহারা অবয়ব-বিশিষ্ট। শরীর শেষোক্ত শ্রেণীর পদার্থ; ইহা মিশ্রিত, অংশবিশিষ্ট এবং ইহার রূপ

আছে। কিন্তু আত্মা এবং অন্য সকল অমিশ্রিত ভাব, ইহারা অন্য শ্রেণীর পদার্থ। ইহারা অশরীরী, অপরিবর্ত্তনশীল এবং ইহাদিগকে মনের দ্বারা অনুভব করিতে হয়। যেমন শরীর ও মন ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ, তেমনি তাহাদের কার্য্যও ভিন্ন ভিন্ন।

যখন আত্মা দর্শন, শ্রবণ কিংবা অন্য প্রকার ইন্দ্রিয় গোচর করিবার মানসে শরীরের সাহায্য গ্রহণ করে, তখন সে শরীরের জন্যই নিম্নে নামিয়া আসে এবং এমন সকল পদার্থের সহিত মিশ্রিত হয় যাহাদের কেবলই পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই সকল অস্থির পরিবর্ত্তনশীল পদার্থকে ধরিতে গিয়া আমাদের আত্মা সৎপথকে হারায় এবং মাতালের মত দিশাহারা হইয়া যায়।

কিন্তু যখন শরীরকে অতিক্রম করিয়া আত্মা নিজ দৃষ্টিবলে পদার্থসমূহকে চিন্তা করে তখন সে এই ক্ষণভঙ্গুর পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ, অনন্ত অমর রাজ্যে চলিয়া যায়। সেখানে পরিবর্ত্তন নাই, তাহা আত্মার নিজের রাজ্য। যখনই আত্মা সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হয় তখনই নিজ ক্ষমতা বলে সেই রাজ্যে বাস করিতে পারে, আর তাহাকে অস্থির হইয়া ভ্রমণ করিতে হয় না; ধ্রুব এবং অবিচলিত ভাবে কেবল গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকে।

আমাদিগের সকলকেই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে শাসন করা দেবতাদিগের কার্য্য এবং অধীন হইয়া সেবা করা মানুষের ধর্ম্ম। যদি প্রকৃতি আত্মাকে শাসন করিবার অধিকার এবং শরীরকে অধীনস্থ হইবার ভার দিয়া থাকে তাহা হইলে ইহা কি প্রমাণ হইল না যে আত্মা অপরিবর্ত্তনশীল এবং দেবস্বভাববিশিষ্ট। আরও দেখ মৃত্যুর পর দেহ একেবারে বিনষ্ট হয় না, ইহার অস্থি শিরা প্রভৃতি চিরকাল বর্ত্তমান থাকে।

আমাদিগের আত্মা নিরাকার এবং ইহার গতি এমন একটী জগতের দিকে যে জগৎ ইহার ন্যায় নিরাকার, উন্নত এবং বিশুদ্ধ। তাহা অদৃষ্ট এবং সেই স্থানে আত্মা গিয়া মঙ্গল এবং জ্ঞানবান ঈশ্বরের সহিত বাস করে। ইহা কি আমরা কল্পনা করিতে পারি যে উদৃশ আত্মা শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে আকাশের চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে? কখনই নয়। বরং ইহাই সম্ভব যে মৃত্যুর পর যদি আত্মা বিশুদ্ধ এবং নির্লিপ্ত থাকে এবং জীবিতাবস্থায় যদি ইহা কখন ইচ্ছা করিয়া শরীরের সংস্পর্শে আসে না এবং যদি আমাদিগের আত্মা আপনাতে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকেই চিরচিন্তা এবং ধ্যান করিতে থাকে তাহা হইলে বল দেখি ইহাই কি প্রকৃত বিজ্ঞান নহে এবং ইহাকেই কি সদা মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করা বলে না?

যখন আত্মা এই অবস্থায় পৃথিবী হইতে যাত্রা করে, তখন ইহা এমন লোকে গমন করে যে লোক নিরাকার, দৈব, অমর এবং চিন্ময়। সেই স্থানে আমাদের আত্মা সকল প্রকার মোহ, ভ্রান্তি, ভয়াদি, প্রবল রিপুকুল এবং মনুষ্যত্বের অন্য সকল প্রকার অবশ্যম্ভাবী কষ্ট এবং যন্ত্রণা হইতে এককালে নিষ্কৃতি পায়। বাস্তবিকই ইহার ভাগ্য অতি সুখের এবং সত্যসত্যই ইহা অনন্তকাল দেবতাদিগের সহিত বাস করে। (ক্রমশ)

শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন।

প্রবাহ

(সমালোচনা)

যে কয়েকটী বঙ্গমহিলা কবিতাকুসুমের হার গাঁথিয়া বঙ্গভারতীর কণ্ঠে পরাইয়াছেন, 'প্রবাহ'-রচয়িত্রী তাঁহাদের একজন। তাঁহার রচিত 'প্রবাহ' পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিলাম।

কোন কোন কবির সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের অনুযোগ এই যে, তাঁহাদের ভাব অস্পষ্ট, ভাষা দুরূহ। ভাবের অস্পষ্টতা দুই কারণে ঘটে। হয় তো কবির চিন্তাস্তর এত উর্দ্ধে স্থাপিত যে সাধারণ পাঠক তাহা ধরিতে ছুঁইতে পারেন না। কবি যে নক্ষত্রলোকে বিচরণ করেন ও নক্ষত্রের ভাষায় কথা কহেন, মর্ত্যবাসী সাধারণ মানব তত উপরে উঠিতে পারে না ও সেই দেবভাষা বুঝিতে পারে না। শুনিতে পাই, পরলোকগত ইংরাজ কবি ব্রাউনিং এই শ্রেণীর কবি। আবার আমাদের বঙ্গের কোন কোন কবি সম্বন্ধেও কেহ কেহ এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর কবিকুলের সমজদার পাঠক ভবিষ্যতে জন্মিতে পারেন। তখন তাঁহাদের কবিতা-লেখা সার্থক বলিয়া বিবেচিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের সাধারণ পাঠকগণ যে সেই কাব্য দ্বারা কোনরূপ উপকার প্রাপ্ত হন্ না ইহা সুনিশ্চিত। এ সব কবি 'Far ahead of their times'—'heralds of new ideas and new thoughts' ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহা ভিন্ন অন্য কারণেও কবিতায় অস্পষ্টতা ঘটে। কবির মনে একটী ভাবের স্ফুরণ হইয়াছে, কিন্তু এখনও সেই স্ফুলিঙ্গটী প্রজ্বলিত হয় নাই। কবি সেই অর্দ্ধস্ফুটিত ক্ষীণ ভাব-কণা লইয়া অমনি একটী কবিতা রচনা করিতে বসিলেন। সেই ভাব-কলিকাটী ভাল করিয়া বিকাশ হইতে দিলেন না ও নিজের মনের মধ্যে সেই ভাবটীকে assimilate (আত্মস্থ) করিলেন না। তাহার ফল এই দাঁড়ায় যে আমি নিজে যাহা ভাল বুঝি নাই, অন্যকে তাহা স্পষ্ট বুঝাইতে পারি না। যাহা আমি নিজের অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে পারি নাই, অন্যকে তাহা কিরূপে অনুভব করাইব? এই কারণে ভাবের জটিলতা ও কৃত্রিমতা হয়, আর রচনা প্রাণশূন্য হয়। সুখের বিষয় আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের মধ্যে কোন স্থলেই ভাবের অস্পষ্টতা ও জটিলতা নাই, সর্ব্বত্রই আন্তরিক ভাব অন্তরের ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। ভাব ও ভাষার সরল সহজ দ্রুত ও মধুর প্রবাহ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একভাবে চলিয়াছে।

'প্রবাহ' পুস্তকখানির প্রধান বিশেষত্ব ও অন্য কবিতা-গ্রন্থ হইতে পার্থক্য এই যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড কবিতায় গ্রথিত হইলেও 'প্রবাহ' একখানি সম্পূর্ণ কাব্য। নদী-প্রবাহে একটী তরঙ্গের সহিত তাহার পরবর্ত্তী তরঙ্গের যেমন যোগ থাকে, তেমনি 'প্রবাহে'ও একটী কবিতার সহিত তাহার পরবর্ত্তী কবিতার একটী যোগ

আছে। এই জন্য দুটী একটী কবিতা পড়িয়া এই পুস্তক খানির ভাল মন্দ বিচার চলে না, সম্পূর্ণ পুস্তকখানি না পড়িলে তাহাতে অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়।

'উৎসর্গ' 'প্রভাত' 'মধ্যাহ্ন' ও 'সন্ধ্যা' পুস্তকখানি এই চারি ভাগে বিভক্ত। 'উৎসর্গে গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার স্বর্গগতা জননী দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

'জননী আমার !
মমতার প্রতিমা আমার !
প্রীতিময়ী, স্মৃতিময়ী, উৎস করুণার,
স্নেহময়ী জননী আমার !

জননী আমার !
ধ্রুবতারা রূপিণী আমার !
নিশিদিন আঁখি আগে,
যদি তব ছবি জাগে,
ভয় কোথা পথ হারাবার ?
প্রীতিময়ী, তৃপ্তিময়ী, অমরাবাসিনী,
ধ্রুবতারারূপিণী জননী !

অনাবৃত হিমময় হৃদয় আমার,
চারি দিকে কঠিন তুষার,
তোমার প্রখর তেজে,
গলিয়া গিয়াছে সে যে,
নাহি আর কঠিন তুষার,—
আজি সে পাষাণ দেহে,
যে প্রবাহ বয় বহে,
শুন কলধ্বনি স্মৃতি তার।
জ্যোতির্ম্ময়ী জননী আমার
রবিছবিরূপিণী আমার !'

এই যে প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে ইহা একটী জীবনের প্রবাহ। সুখদুঃখ, আশা-নৈরাশ্য নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভিতর দিয়া মানুষ-জীবনের প্রবাহ যে ভাবে চলিয়াছে ইহা তাহারই একখানি ইতিহাস। যাঁহার স্নেহক্রোড়ে এই প্রবাহের উৎপত্তি, যে রবি-ছবিরূপিণী জ্যোতির্ম্ময়ী জননী দেবী পাষাণ-তুষার গলাইয়া প্রবাহের ধারা বহাইয়াছেন, তাঁহারই উদ্দেশে কলস্বরে স্তুতিগীত গাহিয়া 'প্রবাহ' বহিয়া চলিয়াছে।

ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। সংসারে প্রিয়জনের নিস্বার্থ প্রেমে আমরা পদে পদে সেই প্রেম-স্বরূপের প্রকাশ অনুভব করি। প্রেম যতই পার্থিব মলিনতা হইতে মুক্ত হয় যতই স্বার্থসম্পর্কশূন্য হয়, ততই সেই প্রেমে অনন্ত প্রেমস্বরূপের প্রকাশ অধিকতর অনুভব করা যায়। এই জন্য পতির প্রতি সতীর স্বার্থশূন্য প্রেমে ভগবদ্-আরাধনারই সূচনা করে। সন্তানের প্রতি জননীর নিষ্কলুষ স্নেহে নিখিল বিশ্বজননীর স্নেহের আভাষ লক্ষিত হয়, পিতৃমাতৃ সেবাতেও সকল-লোক-পিতামাতার সেবাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। পৃথিবীর এই সকল স্বার্থশূন্য নির্ম্মল প্রেম যখন মৃত্যুর অমর রশ্মিপাতে আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠে, যখন প্রিয়বস্তু দেবতারই মত দুর্লভ হন—যখন বিয়োগতপ্ত ব্যাকুল চিত্তের কেবলমাত্র তাঁহাকে দূরে রাখিয়া প্রেমভক্তিপুষ্পাঞ্জলী দিবারই অধিকার থাকে, তখনই তিনি তাঁহার পার্থিব মলিনতা ধৌত, সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ আনন্দ প্রেমময় মূর্ত্তিতে প্রিয়জনের হৃদয়ে প্রকাশিত হন। তখন স্বামী ও জগৎস্বামীতে, জননী ও জগজ্জননীতে প্রভেদ লোপ পাইয়া যায়। হিন্দুশাস্ত্রে যে পতিতে সতী স্ত্রীর নিকট স্বামী

নারায়ণ-স্বরূপ এবং সন্তানের নিকট পিতা-মাতা ঈশ্বর ও ঈশ্বরী বলিয়া লিখিত হইয়াছে, সেই কথার অর্থ এইরূপ স্থানে অতি স্পষ্ট বুঝা যায়। প্রবাহ-রচয়িত্রীর নিকট তাঁহার স্বর্গগতা জননী আরাধ্যা দেবী-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছেন। মায়ের যে স্নেহপূর্ণ নয়নের আলোকে সন্তানের জীবন-মূল প্রথম বিকশিত হইয়াছিল, দূর স্বর্গ-লোক হইতে সেই আলোকই আজ ধ্রুব-তারার মত জীবনের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। যে স্নেহের ছবি আজ পৃথিবী হইতে মুছিয়া গিয়াছে, লেখিকা একাগ্রধ্যানে সেই বিশ্বময়ী মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতেছেন। তাঁহার নীলাকাশে বিন্দু বিন্দু দীপ্তিচূর্ণ দেখিয়া মায়ের দুটী স্নেহপূর্ণ আঁখি মনে পড়ে। বর্ষার সন্ধ্যায় ম্লান শশী দেখিয়া মায়ের করুণা-সিক্ত দৃষ্টি মনে পড়ে; তাঁহার

'কোজাগর পূর্ণিমা-নিশীথে, জ্যোস্নাপ্লাবী
স্নেহ বাহুপাশে বাঁধি আদরে ধরণী
সস্নেহ চুম্বন তারে করে বার বার,
মনে পড়ে মায়ের সে স্নেহ-পারাবার।'

তাঁহার মনে হয়

যে তোমার কথা বলে' মা
কেলে দুটী ফোঁটা আখিজল,
ইচ্ছা হয় ধরি মাথায় আমার
তাঁহার দু'খানি পদতল।

'ভিক্ষা' কবিতায় জননীর নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করা হইয়াছে

'যেন মা! সে তোমারি মতন
জগতের প্রাণে ঢালে স্নেহ।
মমতার ভিক্ষা নিতে এসে
বিমুখে ফেরে না যেন কেহ।'

এই ভাবটী-ই 'করুণা' শীর্ষক কবিতার শেষাংশে জননীর যে চিত্র আছে তাহাতে আরও ভাল করিয়া ফুটিয়াছে। দৃষ্টান্তরূপে এই স্থানে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম—

'স্নিগ্ধ মূরতি, নয়নে বচনে
স্নেহের ছবিটী লেখা।
মধুর অধরে উঠেছে ফুটিয়া
স্নেহের হাস্যরেখা।
আছু ধরি তাঁর দুরন্ত বালক,
স্নেহে শিশু কোলে তাঁর।
আঙ্গিনায় কত সন্তান তাঁহার
খেলা করে চারিধার।
ছুটে আসে ছেলে, 'মা জননী' বলে
আঁচলে ঝাড়িয়া ধূলি
দুটী স্নেহ করে বেষ্টন করি
লইছেন কোলে তুলি।
বহে নির্ম্মল স্নেহ-পারাবার,
ঊর্ম্মি তাহার প্রীতি,
জগত ভরিয়া উঠে সঙ্গীত
মাতৃ মঙ্গল গীতি!'

মায়ের কি সুন্দর ছবি! এখন সন্তান বিশ্ববীণায় কেবল মাতৃমঙ্গলগীতই শুনিতে পাইতেছেন, এখন তাঁহার অন্নপূর্ণা জননীর রূপে জগত পূর্ণ, শিশু ক্রোড়ে জননী দেখিলেই তাঁহার মনে হয়

'জীবন সার্থক কর ধন্য ভাগ্য মানি
হের দেখ মূর্ত্তিমতী গণেশজননী।'

'অন্ধকার' শীর্ষক কবিতায়—

'গৃহহীন সুখহীন কে আছিস আজি;
মিশিছে রোদন কার তরঙ্গ-কল্লোলে,
মা আমার লও তারে তুলে লও কোলে।

. . . .

অসৎ সংসার—
বাহুতে বেষ্টন করি অনন্ত আঁধার,
চাহে তারে গ্রাসিতে নাশিতে একেবারে
মা আমার রক্ষা কর, রক্ষা কর তারে।'

এখানে নিখিল মাতৃপ্রেমে ব্যক্তিগত মাতৃ-প্রেম একেবারে মিশিয়া গিয়াছে।

তবুও মানব মনের আকাঙ্ক্ষার হাহা-কার একেবারে থামিয়া যায় না। তাই মাঝে মাঝে এপারে দাঁড়াইয়া ওপারের দিকে চাহিয়া প্রাণের ভিতর হইতে দীর্ঘশ্বাস উঠে—

'কেন এই ব্যবধান, মাঝে এ প্রবলা নদী,
এপার, ওপার!
হে আত্মা অন্তরযামী, করিতে পার না তুমি,
সব একাকার?'

এই আকাঙ্ক্ষা ও শান্তির বিরোধের ভিতর দিয়া জীবন-প্রবাহের গতি। 'প্রভাতে' সকলই সুন্দর সকলই মধুর বলিয়া মনে হয়, প্রভাতী জীবনের বাসনা কল্পনা সুখ দুঃখ সকলই স্নিগ্ধ। 'প্রবাহ'-রচয়িত্রী 'প্রভাত' অংশে সেই স্নিগ্ধ ছবি আঁকিয়াছেন। ভাই-বোনের ভালবাসায় পিতামাতার স্নেহে, বাল্যকালের স্নেহমধুর সুখস্বপ্নে তখন জীবন পরিপূর্ণ থাকে। বনবালিকারা পিতামাতার স্নেহ-পুষ্পোদ্যানে কেহ যুঁথী, কেহ কদম্ব, কেহ সূর্য্যমুখীর মত ফুটিয়া থাকেন। সেখানে—

'এক বৃন্তে প্রস্ফুটিত ফুলের মতন
এক স্নেহ সিন্ধু মাঝে উর্ম্মির মতন'

ভাই বোন স্নেহের বাঁধনে বাঁধা থাকে। সেই যে শৈশবের সন্ধ্যা,

'ছাদের উপর—
বিছানো মাদুর খানি, স্নিগ্ধ চন্দ্রকর,
ভাই বোন চারি পাশে তুমি মাঝে তার,
কি সুন্দর সন্ধ্যাকাল, জননী আমার!'

কিন্তু ক্রমেই জীবনপ্রবাহের গতি পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। 'কন্যা-সমর্পণ' ও 'কন্যা-বিদায়ের' দিন আসিয়া উপস্থিত হয়।

'ভাই বোন মিলি ছিল স্নেহ ডোরে গাঁথা
খসি সুতা হ'তে।
একটী অস্ফুট কলি আজি ভেসে গেলে
সংসারের স্রোতে।'

যে ক্ষুদ্র নির্ঝর এতদিন গুহার কোলে সুখস্বপ্নে নিমগ্ন ছিল সে এখন বহিস্রোতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আপনার জীবনের ক্ষুদ্র ধারা তাহাতেই মিশাইয়া দিল। এখন আবার নূতন পথে যাত্রা আরম্ভ হইল।

'ভাসায়ে দিল সে সিন্ধুসলিলে
ক্ষুদ্র তরণী খান,
কে জানে কোথায়, গিয়া হবে তার
যাত্রার অবসান?
মিলেছে যেথায় আকাশে সাগরে,
নীল অম্বরে নীল পারাবারে
যেথায় যামিনী বেঁধেছে মিলন
মনে হয় অনুমান
সেথা যদি যায় হবে বুঝি তার
যাত্রার অবসান!'

এ যাত্রা সঙ্গীহীন যাত্রা নহে, তরুণ জীবন আবার এক নূতন আশ্রয় পাইয়াছে। সে আশ্রয় নূতন হইলেই চির পুরাতন।

'আজ যে নূতন দেখা তোমায় আমায়
তা তো নয়, তা তো নয়,

বহুদিন হ'তে গোপনে গোপনে
হয়ে গেছে পরিচয়।
রুদ্র মূর্ত্তি তব দেখেছিনু আমি
মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মাঝে।
শান্ত ছবি তব দেখেছিনু আমি
পূর্ণিমার শশী সে যে।
আমার হৃদয়ে পেয়েছি তোমার
যত প্রেম, যত স্নেহ,
নূতন তো নয়, চিরদিন হ'তে
তুমি চির পরিচিত কেহ।'

এই আত্ম-বিসর্জ্জী প্রেম, পতির প্রতি সতীর প্রেম, স্বামীর জীবনের ভিতর আত্ম-স্মৃতি বিলুপ্ত করিয়াই বঙ্গরমণীর জীবন সার্থক হয়।

মধ্যাহ্ন জীবন কর্ম্মময়, লীলাময় নহে। 'মধ্যাহ্নে'র প্রথমেই 'নর্ম্মদা-প্রপাতে' নামক সুন্দর কবিতাটী অতিশয় স্থানোপযোগী হইয়াছে। তাহার পর 'দ্বিপ্রহর'

'হয়ে এল দ্বিপ্রহর বেলা,
এখন রাখিয়া দাও খেলা,
কিরণ হীরক চূর্ণ—মণ্ডিত মুকুট পরি
ধরারাণী রাজরাজেশ্বরী।
ঝকিতেছে রবি রশ্মি উজ্জ্বল জীবন সম
ঝকিতেছে রবিরশ্মি দীপ্তিময় মৃত্যু সম,
গৌরবিণী মেদিনী সুন্দরী।

* * * * *

থাক্, থাক্, ছায়া থাক্, অনল কিরণ-জ্বালা
প্রখর তপন!
মস্তকে ঝরুক বরিষণ
জাগ্রত জগতমাঝে কোথা যাবে কোন্ কাজে
চেয়ে দেখ হয়ে সচেতন।'

নবীন জীবনে, নবাশাতী স্নিগ্ধ সমীরণে, নৌকাযাত্রায় মনে হয়

'ভাসালো তরী সকাল বেলা,
ভাবিনাম এ জল-খেলা,
মধুরে বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।'

কিন্তু বেলা বাড়িলেই তুফান উঠে। প্রবাহে 'মধ্যাহ্ন' অংশে জীবনের এই চিত্র চিত্রিত হইয়াছে। কখনও তাপদগ্ধ কবি হৃদয়কে শান্ত করিবার উদ্দেশে বলিতেছেন—

'একবার শান্ত হয়ে অশান্ত হৃদয়
একেবারে হস্ না অস্থির,
দুঃখ সহিবার তরে এসেছিস যেথা,
ওরে তুই হৃদয় নারীর!'

আবার অধীরতা আসিতেছে,

'শূন্যে চাহি দিবস গণিবে
এত কে বা আছে ধৈর্য্যশীল?'

কিন্তু কেন এ মনের শূন্যতা? উত্তর স্বরূপ মনের ভিতর হইতে ধ্বনিত হইতেছে,

'তুমি হারা আমি একা তাই এত ভুল?'

তখন ব্যাকুল চিত্ত নতজানু হইয়া 'নির্ঝর ভিক্ষা' করিতেছে,

'দাও মোরে অমনি নির্ঝর—
যে নির্ঝরে জননীর কোলে
বসি শিশু হাসিমুখে ভাবে না বারেক
বিপদ আছে এ পৃথিতলে।
পথে পড়ে গিয়াছে পিছলে
ছুটে এল অমনি মা বলে,
আঁচলে মুছায়ে অঙ্গ মুখে চুমা দিয়ে
মা অমনি করিলেন কোলে।

নিশাকালে পড়েছে ঘুমায়ে,
এলায়ে পড়েছে অঙ্গ নিশ্চিন্তে ঘুমায়

যার পায় হাত খানি দিয়ে !'

এই সংসারের সুখ-দুঃখ-সংঘাতের ভিতর এতদিন আপনাকে লইয়া জীবন কাটিয়াছে। জীবনের যাহা পরিপূর্ণ সার্থকতা তাহা এতদিন কুয়াসার আড়ালে ছিল। এখন কুয়াসা অন্তে এক নূতন আলোক আসিয়া হৃদয়ের দ্বারে উঁকি দিয়াছে।

'কুয়াসা অন্তে শিশির মাখানো আলো,
উঁকি ঝুঁকি করে আসে পাশে চারিধার
কে জানে কেমনে খুলে গেছে যত দ্বার
আলো পেয়ে ঘরে সকলি মানায় ভালো।

কত লোক ঘরে আসে কত দিক হতে,
শুভ্র বসনে ম্লানবাস পরি কেহ,
শত কলরবে জাগিয়া উঠেছে গেহ,
কত নবসুখ নূতন নূতন ছায়া,
কত ছেলে মেয়ে ছুটাছুটী করে আসে,
কত মা আসিল বাছারে বুকেতে নিয়া,
উৎসব স্রোতে গৃহখানি যেন ভাসে।

* * * *

শোন্ শোন্ ওরে উন্মাদ মন মোর
জগত হয়েছে দুয়ারে অতিথি তোর !'

মধ্যাহ্নের কর্ম্মময় জীবনের আরম্ভ এই খানে। এখানে আপনার গড়া দুঃখ অশান্তির মোহ-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গিয়া জীবনে নূতন আলোকের আবির্ভাব হইয়াছে।

'অন্নভিখারী' 'করুণা,' 'পতিতা,' 'একবিন্দু জল' ও 'পবিত্রতা' এক সূত্রে গ্রথিত পাঁচটী কবিতা। এই কবিতা কয়টীতে সংসারের পীড়িত, দলিত ও পতিত দুঃখীর মর্ম্মভেদী দুঃখ উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে।

'মেঘে কি বর্ষে না বৃষ্টি আর,
বারিহীন হয়েছে সংসার ?
শুধু আছে পিপাসা প্রবল ?
শুখায়ে গেল কি ভরা নদী ?
একবিন্দু একবিন্দু জল !
দিবে না কি একবিন্দু জল ?
কারে বলি ? কেহ নাই নাই,
কণ্ঠে মোর জ্বলিছে অনল,
দাও, দাও, কৃপা করি দাও
একবিন্দু একবিন্দু জল !'

যন্ত্রণা-পীড়ীতের এই মর্ম্মভেদী প্রশ্নে সংসার কি উত্তর দিবে ? সত্যই কি মেঘে বৃষ্টি বর্ষণ করে না, নদীর জল শুখাইয়া গিয়াছে, জগতে কেবল প্রবল পিপাসাই আছে ? সত্যই কি পবিত্রতা পতিতের সংস্পর্শে কলুষিত হইবে বলিয়া দূরে সরিয়া যাইবে ? 'করুণা' ও 'পবিত্রতা' শীর্ষক কবিতায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

'আঁধারে আলোক কভু হয় না নির্ব্বাণ,
আলোক আঁধারে করে পুণ্য দীপ্তি দান।

* * * *

জননীর পাশে,
ধূলা কাদা মাখি যবে ছেলে ঘরে আসে,
মা তাহারে ঘৃণা করি নাহি দেন ফেলে,
কোলে তারে তুলে লন মুছিয়া অঞ্চলে।'

'সন্ধ্যা'য় সংসারের কর্ম্মকোলাহল শান্ত হইয়াছে। বাসনা এখন সন্ন্যাসিনীর বেশ পরিধান করিয়াছে। সুখ-দুঃখ হর্ষ-বিরোধ অতিক্রম করিয়া একখানি গভীর শোকের ছায়া ধূসরবসনা সন্ধ্যার ন্যায় প্রবাহের বারিরাশিতে ছায়া ফেলিয়াছে। কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার-ললাটে যেমন চাঁদের রেখা ফুটিয়া উঠে তেমনি সেই শোকের অন্ধকার পরাজিত করিয়া আনন্দের জ্যোতি ফুটিয়া

উঠিয়াছে। এখানে দুটী কবিতা হইতে কয়েক ছত্র তুলিয়া দিব।

"স্বপ্ন ও জাগরণ"

'কে নিল আমার মণি,কে করিল কাঙ্গালিনী
শূন্য তনু, কোথা আভরণ ?
স্নান করি গৃহে ফিরে, সিন্দুর পরিতে শিরে
কে নিল কাড়িয়া কোটা মোর,
মাহি পোহাইতে নিশি চন্দ্রমা পড়িল খসি
দেখ চাহি আঁধার অম্বর।'

"কি ক্ষতি আমার ?"

"লোকে যদি দুঃখী বলে কি ক্ষতি আমার,
এই যে হৃদয় মাঝে প্রাণের দেবতা রাজে
সুপ্রভ-প্রভায় যার আলো চারিধার।
হীরা অয়স্কান্ত মণি তুচ্ছ, তারে নাহি গণি,
প্রেমকান্ত মণিময় সিংহাসন তাঁর !
শত ইন্দু পড়ে খসি, প্রিয়ের মধুর হাসি
রূপরাশি ভরা এই মন্দির আমার !
কি স্নিগ্ধ সুবাস ছুটে, কি আলো ঝলকি উঠে
প্রাণ-দীপে করি যবে আরতি তাঁহার।
তবে এ জগত মাঝ আর তার কিসে কাজ,
প্রাণকান্ত আছে যার প্রাণের মাঝার !'

সন্ধ্যার শোকের অন্ধকারে প্রেমের কণক-প্রদীপ জ্বলিয়াছে, এখন নির্জ্জন মন্দিরে 'তিনি আর আমি।' 'সন্ধ্যা'র অনেকগুলি কবিতা এত সুন্দর যে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করা যায় না। 'মরণ আমার' কবিতায় মরণের যে মাতৃ-রূপ চিত্রিত হইয়াছে, তাহা সুন্দর ও সম্পূর্ণ মৌলিক।

গ্রন্থ শেষে লেখিকা 'অমারাত্রে' জননীকে শেষ উপহার দিয়াছেন।

'আজিকার দিনে অয়ি স্নেহময়ী দেবী, মোর
লহ উপহার,
যে অশ্রুতে তোমা তরে যদি এতদিন ধরে
গেঁথেছিনু হার,
প্রবল অনল ঘুমে যে মেঘের ঘরেছিল
হৃদয়ে সঞ্চার,
আজি সে প্রবল ধারে বরষিছে বিশ্ব বারি
লহ উপহার !'

জীবনের উদ্দেশ্য সাধনা, সাধনার ফল শান্তি। নদী উপল বন্ধুর পথে কত আঘাত সহ্য করিয়া কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তবে অনন্ত সমুদ্রে মিলিত হয়। প্রবাহের পরিণতিও সেই আনন্দ-সমুদ্রে।

'আমি চাহি চারিদিকে বিচিত্র ধরা
চিত্তের নাহি ওর,
বিশ্বের এই রূপ-পারাবারে
সাধ্য আমার নাহিক সাঁতারে,
মুগ্ধ হইয়ে শুধু থাকি চেয়ে
আনন্দে হৃদি ভোর,
মাধুরী সিন্ধু সম্মুখে, দাতা
দুটী আঁখি শুধু মোর।'

প্রবাহ-রচয়িত্রী তাঁহার নিজের জীবনের সুখ-দুঃখের ইতিহাস ধারাবাহিকরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। এই সমস্ত ভাবের প্রত্যেকটী তিনি নিজের জীবনে অনুভব করিয়াছেন, সেই জন্যই সেগুলি এত মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে।

কবিতাগুলির কোন কোন স্থলে ছন্দের দোষ ঘটিয়াছে, কবিতাগুলি যেরূপ পারম্পর্য্য অনুসারে লিখিত হইয়াছিল, গ্রন্থে কবিতাসন্নিবেশে অনেক স্থলে ঠিক এই ক্রম রক্ষিত হয় নাই। সম্ভবতঃ এ জন্য প্রকাশকই

অধিক দায়ী। ভরসা করি, ভবিষ্যৎ সংস্করণে এই ত্রুটী সংশোধিত হইবে।

এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে এই সকল কবিতার কোন কোনটীতে ভাবের নূতনত্ব নাই, হয় তো ইহার অনেক ভাব অন্য কবির গ্রন্থে থাকিতে পারে, এমন কি আছে। কিন্তু কাব্যজগতে সম্পূর্ণ নূতন ভাব দুর্লভ পদার্থ। যাহা অন্যে কেহ কখনও ভাবে নাই, আমি তাহা প্রথম আবিষ্কার করিয়াছি এরূপ কথা বোধ হয় কোন কবিই সাহস করিয়া বলিতে পারেন না। যিনি জগতের সমগ্র কাব্যগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন ও তাহা মনে রাখিয়া তাহা হইতে পৃথক্ সম্পূর্ণ নূতন ধরণের ভাব আবিষ্কার করিয়াছেন এ কথা কেবল তাঁহারই মুখে শোভা পায়। কিন্তু আমার বিশ্বাস কাব্যজগতে এরূপ মৌলিকতা-প্রকাশের কোন প্রয়োজন নাই। আমার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছে আমি তাহা লিখিয়াছি, আর একজনের মনে যে ভাব উঠিয়াছে তিনিও তাহাই লিখিয়াছেন। এইরূপ সকলেরই নিজের মনে চিন্তা করিবার অধিকার আছে এবং চিন্তা করিয়া সেই ভাব ব্যক্ত করিবারও অধিকার আছে। বিশেষতঃ যিনি স্বভাব-কবি তাঁহার মনে ভাবের উদয় হওয়া নিজের ইচ্ছাধীন ব্যাপার নহে; এইরূপে হয় তো একজনের মনের ভাবের সহিত আর এক জনের ভাবের মিল হইল, এইরূপ আশ্চর্য্য মিল অনেক সময় হইয়াও থাকে, তাই বলি একজন অপরের নিকট হইতে ভাব গ্রহণ করিয়াছেন এরূপ বলা অযৌক্তিক। তবে যাঁহার নিজের কোন কৃতিত্ব নাই, যিনি জানিয়া শুনিয়া অন্যের ভাব ধার করিয়া নিজের নামে প্রচার করিতে চাহেন, তিনি অবশ্য নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। ফল কথা এই, যাহার যেটুকু ব্যক্তিত্ব আছে সেই ব্যক্তিত্বটুকু লইয়া সাধনা করিলেই তাঁহার জীবন সার্থক হইল। এ সংসারে যেমন কোন দুইখানি মুখ ঠিক একরূপ নহে, কোন দুইটী লোকের গলার স্বর, হাতের লেখা বা গমন-ভঙ্গী একরূপ নহে, বাল্যকাল হইতে আপন প্রকৃতি অনুযায়ী বিকাশ হইয়া তাহার ভিন্নতা উৎপন্ন হয়, কবিত্ব শক্তির বিকাশও ঠিক সেইরূপ হইতে পারে। তাই স্বাভাবিক ভাবে যাহার বিকাশ হইয়াছে ক্ষুদ্র হইলেও এই বিশ্বধামে তাহার স্থান অবশ্যই আছে। কালের হাতে অথবা কর্ম্ম-নিয়ন্তা ভগবানের হাতে বিচারের ভার অর্পণ করিয়া প্রত্যেকেরই নিজ নিজ শক্তি-বিকাশের জন্য সাধনা করা উচিত।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

মুগ্ধা

বোম্বাই হইতে জাহাজ যখন ভারতের কূল ক্রমেই ছাড়িয়া যাইতে লাগিল, তখন স্বদেশের শত সহস্র স্মৃতি অনিলের মনের ভিতর ভিড় করিয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু তাহার সেই সহস্র স্মৃতির মধ্যে একটি পরম মনোজ্ঞ স্মৃতি তাহার চিত্তে উদিত হইয়া যুগপৎ প্রীতি ও ক্ষোভে তাহার চিত্ত বিশেষ-ভাবে আলোড়িত করিতেছিল, সেটি সুশীলার

অনির্ব্বচনীয় সুন্দর মুখমণ্ডল, তাহার অপূর্ব্ব লীলা-গতি, তাহার ক্রত মধুর উজ্জ্বল রজত-ধারার মত বচন-লহরী, আর সর্ব্বোপরি সেই বিদায়ের সন্ধ্যায় তাহার কোমল অঙ্গের মধুময় স্পর্শ। সেই স্মৃতি সেই মুহূর্ত্ত হইতে সর্ব্বক্ষণ অনিলের হৃদয়ের স্তরে স্তরে, তাহার শরীরের অঙ্গে অঙ্গে, আনন্দ তরঙ্গে প্রবাহিত হইতেছিল। অনিল নীরবে সেই স্মৃতির বিপুল আনন্দসার বিচ্ছেদের দুঃখ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে উপভোগ করিতেছিল। যখনই সে সেই সন্ধ্যার ঘটনা স্মরণ করিত তখনই সেই সন্ধ্যার অপর সকল স্মৃতি অভিভূত করিয়া এই এক মহীয়ান আনন্দস্মৃতি উপভোগ করিত, আর সব ভুলিয়া যাইত। সুশীলার পরবর্ত্তী ব্যবহার মনে হইত, সে কেবল তাহার স্নেহ ও ক্রোড়ে আবর্ত্তিম মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য্যের জন্য তাহার বেপথুমান অধরষ্টের অপূর্ব্ব লাবণ্যতরঙ্গের জন্য তাহার তীব্র অথচ কোমল অনিন্দ্য চক্ষুদ্বয়ের সেই দৃষ্টিমাধুর্য্যের জন্য; কেবল সেই অভিমানপরিপ্লুত শরীরের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য একখানি মহিমাময় ছবির মত তাহার মানস পটে অঙ্কিত হইয়াছিল।

যে ঘটনায় সুশীলার চিত্তকে ধিক্কারে পরিপূর্ণ করিয়াছিল তাহা অনিলের চিরক্ষুব্ধ প্রেমলালসার সকল বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। এখন আর তাহার কল্পনা কোনও সীমা স্বীকার করিতেছিল না, কোনও বাধা দুর্জ্জয় মনে করিতেছিল না; সে আপনাকে এক অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য রাজ্যে অধিষ্ঠিত করিয়াছিল। সুশীলার হৃদয় তাহার আয়ত্ত সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া, ঈশ্বরের করুণাময় রাজ্যে এমন দুইটি পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হৃদয় কখনই বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারিবে না এইরূপ মীমাংসা করিয়াছিল। অতএব সে আশার বিশাল পক্ষে উড্ডীয়মান হইয়া তাহার সুখ-সাম্রাজ্যের অনির্দ্দেশ্য সীমান্ত পর্য্যন্ত বিচরণ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিতেছিল না।

বিলাতে পৌঁছিয়া অনিল কেম্ব্রিজে গেল, সেখানে ট্রাইপস ও সিভিল সার্ভিসের জন্য যুগপৎ বিপুল পরিশ্রমের সহিত পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। তাহার সহাধ্যায়ীরা তাহার অধ্যবসায় ও পাঠের শক্তি দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। অনিল বড় কাহারও সহিত মিশিত না, কোনও খেলা-ধূলায় যোগ দান করিত না। এমন কি কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ডের নৌকায় দৌড় প্রতিযোগিতা পর্য্যন্ত সে দেখিতে যায় নাই। সামাজিক সম্মিলন ও ব্যায়াম-ক্রীড়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের জীবন; তাহাদের পক্ষে এই অদ্ভুত গ্রন্থকীট বাঙ্গালী যুবক একটা অপূর্ব্ব পরিহাসের বিষয় স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু অনিল কিছুতে আপনার পথচ্যুত হইল না। তাহার অটল সংকল্প, সেই বৎসরেই সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পর বৎসর দেশে প্রত্যাগমন করিবে, বিলম্ব করিলে তাহার সুশীলাতে কেন্দ্রীভূত সকল সুখ সকল আশা একেবারে তিরোহিত হইবে। তাহার স্থির বিশ্বাস ছিল যে সে যদি সার্ব্বিস পরীক্ষায় পাশ হইতে পারে তবে সুশীলার পিতার মুখমুল গোড়ামীর বাঁধও নিশ্চয় ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং তিনি Mr. A.

C. Roy, I. C. S.কে কন্যাদান করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিবেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সে ভূতের মত খাটিয়া পড়িতে লাগিল, তাহার শিক্ষকেরা (Crammers) প্রতি সপ্তাহেই তাহার পিতার নিকট পত্র লিখিতে লাগিলেন যে যদি এইরূপ ভাবে চলে তবে অনিল পরীক্ষায় অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিবে। অনিল স্থির করিল পরীক্ষার ফল বাহির হইলেই সে সুশীলার পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পত্র লিখিবে।

ইহার পর কয়েক মাস চলিয়া গেল। পরীক্ষার তিন মাস পূর্ব্বে অনিল একখানি পত্র পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে পত্রে সে জানিতে পারিল সুশীলার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। অনিল প্রায় উন্মত্তের মত হইল, কোন কাজে আর তাহার মন বসে না, পুস্তকগুলি তাহার দু'চক্ষের বিষ হইল। শিক্ষকেরা এক মাস বাদে লিখিলেন অনিলের আশা ক্রমেই অল্প হইয়া আসিতেছে, ফলে অনিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না।

সে জন্য অনিল কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইল না, তাহার জীবনের যে প্রধান আশ্রয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল তাহাতে তাহার হৃদয় বেদনায় জর্জ্জর হইয়াছিল. এ সমুদয় ক্ষুদ্র বেদনায় তাহার আর কিছুই করিতে পারিত না।

সুশীলার বিবাহ সম্বন্ধে তাহার একটা কিছু করা দরকার তাহা অনিল স্থির জানিয়াছিল। কিন্তু কি যে করিবে তাহা কোনও মতেই সে স্থির করিতে পারিতেছিল না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পরীক্ষার পর সে সুশীলাকে এক খানা পত্র লিখিল। পত্রখানি সুশীলার পিত্রালয়ের ঠিকানায় দিল যেন তাহার স্বামীর হাতে না পড়ে। তাহার প্রচ্ছন্ন প্রেমের সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এমন কেহ দেশে ছিল না যাহার নিকট এই পত্র পাঠাইয়া অনিল সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারে। তাই সে সুশীলার পিত্রালয়ের ঠিকানায় পত্র খানি পাঠাইল।

(৬)

অনিলের পত্র।

সুশীলা,

কি বলিয়া তোমাকে সম্বোধন করিব ভাবিয়া পাই না; ঘটনাচক্রে এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে তোমার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নাই। হয় তো আর সাক্ষাৎ না হইতে পারে, অন্ততঃ আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যেন তোমায় আমায় সাক্ষাৎ না হয়।

তবে কয়েকটা মনের কথা বলিবার আছে তাই তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিলাম। আজ প্রায় তিনমাস হইল সংবাদ পাইয়াছি যে তোমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এখন তুমি অপরের সহধর্ম্মিণী।

এ হতভাগ্যের কথা এখন তোমার স্মরণ না হইতে পারে, কিন্তু আমি তোমাকে আমার সম্বন্ধে কয়েকটা কথা শুনাইতে চাই। গত ৮ মাস যাবৎ আমি যে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়াছি তাহা তুমি জান না। ৫ মাস পরিশ্রমে যেরূপ সুফল হইয়াছিল তাহা দেখিয়া আমার শিক্ষকেরা অবাক হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে আমি নিশ্চয় পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিব।

কিন্তু তিন মাস হইল আমার জীবনে ঘোর বিপর্য্যয় ঘটিয়া গিয়াছে, আমার সব ফুরাইয়াছে, পরীক্ষা দিয়াছি বটে, কিন্তু পাশ হইবার কোন আশা নাই।

তাহার কারণ কে জান? তুমি। ৪ মাস শুরুতর পরিশ্রম করিয়া স্বাস্থ্যটিকে জন্মের মত হারাইয়াছি কেন জান? তোমার জন্য। স্বদেশ হইতে বিদায় হইয়া বড় আশা করিয়া আসিয়াছিলাম তোমাকে পাইব, তাই হাড় ভাঙ্গিয়া-পরিশ্রম করিয়াছি। তিন মাস পূর্ব্বে যখন শুনিলাম যে তোমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তখন জানিলাম যে আমার চেষ্টার আর প্রয়োজন নাই, আমার সকল ফুরাইয়াছে, আমার একমাত্র আশা নির্ম্মূল হইয়াছে। আমার পড়া শুনা চুলোয় গিয়াছে, ভগ্ন স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার আমার এমন অসম্ভব আশা হইয়াছিল কেন? অসম্ভব আশা আমি করিয়াছিলাম স্বীকার করি, কিন্তু তাহার কারণ ছিল। বিদায়ের দিন সন্ধ্যার সময় তোমাদের বাগানের সেই ঘটনায়, মূর্খ আমি মনে করিয়াছিলাম যে আমি তোমায় সম্পূর্ণ আপন করিয়া দেখিয়াছি। আমার সেই আকর্ষণে আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে যে গ্রন্থি গ্রথিত হইয়া গিয়াছিল, আমার মুগ্ধ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে ইহজন্মে বা পরজন্মে সে গ্রন্থি কখনও ছিন্ন হইতে পারে না। আমি দেখিতেছি সে সকল মিথ্যা, যাহা মিথ্যা ভাবিয়াছিলাম তাহাই দারুণ কঠোর সত্য।

এ সম্বন্ধে তর্কের অনেক কথা আছে। তুমি হয় তো তর্ক দ্বারা প্রমাণ করিতে পার যে বিবাহ করায় তোমার কোনও দোষ হয় নাই, আমারই সব বুঝিবার ভুল। কিন্তু তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, কেমন করিয়া তুমি তোমার স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার আদর গ্রহণ কর? আমার স্পর্শের বিন্দুমাত্র স্মৃতি কি তোমার শরীর বা মনে নাই? তোমার স্বামীর আলিঙ্গনে যখন বদ্ধ হও তখন কি সেই স্মৃতি তোমার সর্ব্বাঙ্গ শতমুখ বৃশ্চিকের মত দংশন করে না। যদি না করে তবে জানিব স্ত্রীজাতি নিতান্তই অসার। তবে আমার অপেক্ষাও যে তোমাকে বিবাহ করিয়াছে তাহাকে অধিক হতভাগ্য বিবেচনা করিব। কারণ, আমাকে তুমি ত্যাগ করিয়াছ। কিন্তু সেই ত্যাগেই আমি বুঝিয়াছি যে আমি তোমায় যে পূজা দিয়াছি তুমি তাহার যোগ্য নও। কিন্তু তোমার স্বামী নিত্য তাহার মুগ্ধ বিশ্বাসে তোমাকে আদর করিতে যাইয়া তোমার মিথ্যা আচারে প্রবঞ্চিত হইতেছে।

মনের দুঃখে কথাগুলি লিখিলাম, না লিখিলে আমার মনে শান্তি নাই তাই লিখিলাম। আশা করি, আমার স্মৃতিকে যেমন করিয়া অনায়াসে মুছিয়া ফেলিয়াছ, তেমনি অনায়াসে আমার এ অনুযোগের স্মৃতি মুছিয়া ফেলিয়া সুখী হইতে পারিবে। ইতি

অনিল।

(৭)

সুশীলার বিবাহ স্থির হইয়া গেলে সে হাতে স্বর্গ পাইল। তাহার অতীত জীবনকে

নিঃশেষ করিয়া মুছিয়া ফেলিবার সুযোগ এত দিনে বুঝি ভগবান মিলাইলেন।

বিবাহের পর বরকে যখন প্রথম দেখিল তখন তাহার মনে হইল যেন ভগবান স্বয়ং তাহার বিপদ ভঞ্জন করিবার জন্য আসিয়াছেন। তাহার দীর্ঘকালের আকাঙ্ক্ষিত স্বামীর প্রতি স্বাভাবিক প্রেম এই চিন্তায় এক অপূর্ব্ব ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় পরিপ্লুত হইয়া তাহার সমস্ত হৃদয় প্লাবিত করিল। প্রথম পরিচয় হইতেই তাহার হৃদয় স্বামীর একান্ত আশ্রিত ও অনুগত হইয়া উঠিল। তাহার ভাবপ্রবণ হৃদয়ের উদ্বেল ভাব-তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহার স্বামীর সমস্ত জীবন অল্প সময়ের মধ্যেই এক অপূর্ব্ব মাধুরীতে ভরিয়া দিল। নরেন্দ্রনাথ ও সুশীলার প্রেম তিন মাসের মধ্যেই সুশীলার পিত্রালয় ও শ্বশুরালয়ে প্রবাদ তুল্য হইয়া উঠিল।

সুশীলা অধিক দিন পিত্রালয়ে ছিল না। বিবাহের একমাস পর শ্বশুরালয়ে গিয়া সেই অবধি সেখানেই আছে। তিনমাস অতীত হইলে পিতা একবার তাহাকে আনিতে গিয়াছিলেন। শ্বশুর বৌমাকে বরাত দিলেন, কন্যা পিতাকে নানা রকম মিষ্টভাষে বুঝাইয়া দিল যে তাহার পক্ষে আরও মাস খানেকের পূর্ব্বে যাওয়া সম্ভব নয়।

ইহাতে যোগেন্দ্র বাবু ক্ষুণ্ণ হইলেন না। পরম প্রফুল্ল চিত্তে গৃহে ফিরিলেন। গৃহিণী বলিলেন, "মেয়ে আনার কি করিলে?" যোগেন্দ্র বাবু হাসিয়া বলিলেন, "মেয়ে এখন পর হইয়া গেছে তার আনা নেওয়া কি? সে আপনি বলিল সে আসিতে পারিবে না।"

গৃহিণী অপ্রসন্ন হইলেন, যোগেন্দ্র বলিলেন, "ওগো একবার যদি মেয়ের সে মুখ দেখতে তবে আর তাকে এখানে আনতে চাইতে না। সে সুশীলা আর নেই; গাল ভরা তার হাসি. সে ঘরে ঘরে যেন হরিণীর মত আনন্দে ছুটোছুটী কচ্ছে। আমার সেই পাগলী মেয়ে আবার যেন ফিরে এসেছে। এখানে কেমনটী হয়ে থাকতো, আর সেখানে কেমনটী হ'য়েছে। সেখানে সে ঢের ভাল আছে।"

গৃহিণী বলিলেন, 'আমি বরাবরই ব'লে এসেছি, সোমত্ত মেয়ের বিয়ে না দিলে কি আর তাদের সুখ থাকে আহ্লাদ থাকে। আমার কথা ফলালো তো' যোগেন্দ্র বাবু বলিলেন "তোমার কথা না ফলে পারে। তবে কি না তুমি কখনও ঠিক এই কথাটি বলো নি আর বিয়ে হয় নি বলে আমার মেয়ে মন খারাপ ক'রে থাকেনি। থাক সব ভাল যার শেষ ভাল। আর জামাই আর বেয়াই যা হয়েছে, এমন কুটুম্বিতা বহু তপস্যার ফল।"

গৃহিণীর তর্কটা মূলতুবী রহিয়া গেল, অন্য কথা আসিয়া পড়িল।

শ্বশুর চলিয়া গেলে নরেন্দ্র পা টিপিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঘরে একখানি আয়না ছিল. সুশীলা তখন তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া উপরে কুলুঙ্গী হইতে তাহার সেলাই নামাইতেছিল, নরেন্দ্র দেখিলেন তাহার মুখ এক অপূর্ব্ব আনন্দে উদ্ভাসিত। তাহার উদ্দাম যৌবনের সহজ প্রফুল্লতার উপর তীব্র সম্ভোগের আনন্দজ্যোতিঃ পড়িয়াছে, তাহার যৌবনশ্রী যেন পরতে পরতে উন্মেষিত করিয়াছে। দর্পণের ভিতর নরেন্দ্র তাহার

স্ত্রীর স্বচ্ছমুখের ভিতর দিয়া যেন দেখিলেন তাহার নির্ম্মল মধুময় হৃদয়খানি বড় মনোরম ভাবে বিকশিত রহিয়াছে। নরেন্দ্র আত্মহারা হইলেন। দ্রুত বেগে অগ্রসর হইয়া স্ত্রীকে বক্ষে চাপিয়া পশ্চাৎ হইতে তাহার গণ্ডে একটি উত্তপ্ত চুম্বন করিলেন।

ত্রস্তা হরিণীর ন্যায় সুশীলা সহাস্য বদন দ্বারের দিকে ফিরাইল, সহসা সঙ্কুচিত হইয়া সে আপনাকে ছাড়াইতে চেষ্টা করিল। যখন দেখিল সেদিকে কেহ নাই তখন বলিল, "তুমি ভারি দুষ্টু, কে কোথায় দেখবে সে ভয় কি নেই।"

নরেন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে সুশীলাকে ছাড়িয়া দিলেন, বলিলেন, "তোমার বাবার সঙ্গে কি আলাপ হ'ল।"

সুশীলা বলিল "আন্দাজ কর।"

নরেন্দ্র কিছু ভাবিয়া বলিলেন, "সোমবার যাবে ব'লেছ।" সোমবার দিন নরেন্দ্রনাথের এম-এ, পরীক্ষা আরম্ভ হইবার কথা।

"পারলে না, আমি ব'লেছি আমি জোড়ে যা'ব।"

নরেন্দ্র গম্ভীর ভাবে বলিল "সে কেমন ক'রে হ'বে, আমি তো এখন যেতে পারবো না, আমার পরীক্ষা যে সোমবার।"

"তা'র পর।"

"তা'র পর একবার দেশে যেতে হ'বে অনেক গুলো কাজ আছে।"

"তা'র পর।"

"সে হ'তে এখন এক মাস।"

হাসিয়া সুশীলা বলিল "আমি একমাস বাদেই যা'ব ব'লেছি।"

নরেন্দ্রনাথের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বলিল "সত্যি ?"

সুশীলা নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে বাহু বেষ্টন করিয়া বক্ষে মাথা রাখিয়া অপরিমেয় প্রেম-পরিপূরিত দৃষ্টি স্বামীর চক্ষে স্থাপিত করিয়া বলিল "সত্যি।"

নরেন্দ্রনাথ তাহার কোমল গণ্ডে মৃদু তাড়না করিয়া বলিলেন, "দুর পাগল, এইটা স্বামী পাগলা হ'লে তোমার বাপ মা কি মনে ক'রবেন। তা'র চেয়ে তুমি এখন যাও আমার সময় হ'লেই আমি পরে যাব এখন।"

"তবে কি তুমি আমায় তাড়িয়ে দিতে চাও ?" সুশীলা মৃদু হাসিয়া এই কথা বলিল।

নরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "বাপের বাড়ী যাওয়া কি এতই কষ্ট ?"

"কি সুখে সেখানে যা'ব ?"

নরেন্দ্রনাথ এ কথার জবাব দিতে পারিলেন না। পত্নীর এই আত্মগতত্তায় তাঁহার হৃদয়ে একটু অনির্ব্বচনীয় গর্ব্বের আবির্ভাব হইল প্রীতিতে চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আনন্দে চক্ষু ভরিল, আবেগের সহিত তিনি সুশীলার মুখ চুম্বন করিলেন।

ঠিক সেই সময় পিতা ডাকিলেন, নরেন্দ্র সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

প্রকৃত পক্ষে সুশীলা পিত্রালয়ে যাইতে মোটেই সম্মত নয়। পিত্রালয়ের সঙ্গে তাহার যে একটা লজ্জাকর স্মৃতি জড়িত ছিল সেইটিকে সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলাই। সে তাহার বিবাহিত জীবনের এক লক্ষ্য করিয়াছিল। সুতরাং সে সংকল্প করিয়াছিল যে পিত্রালয়ে যদি তাহাকে যাইতেই হয় তবে সে তাহার নূতন জীবনের সকল গৌরব লইয়া যাইবে। যেন অতীতের সকল স্মৃতির লজ্জা ও আত্মগ্লানি তাহার এই নূতন জীবনের উজ্জ্বলতার নিকট ম্লান হইয়া মিলাইয়া যায়। তাই সে জোড়ে না হইলে পিত্রালয় যাইবে না পণ করিয়া বসিয়াছিল।

(ক্রমশ)

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

বৌদ্ধ ত্রিতত্ত্বের গুহ্য অর্থ

বৌদ্ধ. ধর্ম্ম ও সংঘ—বৌদ্ধধর্ম্মের এই ত্রিতত্ত্ব। এই ত্রিতত্ত্বের তান্ত্রিক অর্থ—গুহ্য অর্থ কি তাহাই আমরা দেখাইব। যে প্রার্থনাগুলি পার্থিব সপ্ত বুদ্ধের প্রার্থনা বলিয়া প্রচলিত, তাহা ত্রিতত্ত্বের উদ্দেশে উক্ত হইয়াছে। সেই প্রার্থনা মন্ত্রটি এই :—"বুদ্ধকে নমস্কার, ধর্ম্মকে নমস্কার, সংঘকে নমস্কার, ওঁ!" সকলেই জানে এই ওঁ শব্দ, কি ব্রাহ্মণ্য কি বৌদ্ধ, উভয় ধর্ম্মেই ত্রিতত্ত্বের সাঙ্কেতিক চিহ্ন—একই চিহ্নের মধ্যে তিনটি শব্দের সমাবেশ। Remusat বলেন, "যাহা ত্রিরত্ন নামে অভিহিত হইয়া অর্থাৎ সেই পূজার্হ আরাধ্য তিন সত্ত্বা যাহাকে চীনভাষায় সান্-পাও বা সান-কুয়েই বলে, সেই তিনে বিশ্বের সমস্ত সত্ত্বা প্রত্যাবর্ত্তন করে ... কিন্তু এক্ষণে এইটুকু নির্দ্ধারণ করিতে বাকি আছে,—পরমার্থ বিশ্বাসের মধ্যে এই ধর্ম্মের স্থান কোথায় বিশেষত সেই ভিক্ষু-সংঘের স্থান কোথায়, যাহাকে উদ্দেশ করিয়া দেবতারা স্তবস্তুতি করেন, এবং যাহা অত্যুচ্চ ও অমূল্য বিশ্বাসের মূলতত্ত্বসমূহের আধার। যাহা সহসা প্রলাপ বলিয়া মনে হয় সেই শব্দগুলির সমন্বয় করা আবশ্যক এবং ইহাও দেখান আবশ্যক, কেমন করিয়া একই শব্দসমূহের দ্বারা উচ্চ সারতত্ত্ব-সমূহ (ত্রিরত্নের ভিতর এই সারতত্ত্বগুলি নিহিত) এবং ধর্ম্ম ও সংঘরূপ ভৌতিক পদার্থসমূহ যুগপৎ সূচিত হইয়া থাকে। মহাযানের মতানুসারে, বুদ্ধ হইতে অর্থাৎ বুদ্ধি হইতে, প্রজ্ঞা ও ধর্ম্ম প্রসূত হইয়াছে। এবং ধর্ম্ম ও প্রজ্ঞার মিলনে সংঘ উৎপন্ন হইয়াছে। বাহ্যতন্ত্রের মতবাদ অনুসারে এই তিন শব্দ—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ। কিন্তু ইহাদের বাহ্য অভিব্যক্তি কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা বিবেচনা করিলে বলা যায়, ভাবী বুদ্ধগণের যে বুদ্ধি সেই বুদ্ধ, প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্রের যে ধর্ম্ম সেই ধর্ম্ম, ও ভিক্ষুদের যে সমবায় তাহাই সংঘ। চীন ভাষায় এই সংঘ সেং-নামে অভিহিত হইয়া থাকে, এবং মিশনারিরা ইহাকে bonze আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। আসলে ইহার আক্ষরিক অর্থ—পৌরোহিত মণ্ডলী।" বৌদ্ধ অনুষ্ঠানপদ্ধতির গ্রন্থে, এই তিন শব্দের মধ্যে সম্পূর্ণ সামাভাব পরিদৃষ্ট হয়। ফেন্, (বুদ্ধ), ফণ (ধর্ম্ম), সেং (সংঘ)। চীনীয় প্রার্থনামন্ত্রের সংগ্রহগ্রন্থ হইতে এই স্তোত্রটি প্রাপ্ত হওয়া যায় :—"যাহা আধ্যাত্মিক, যাহা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে সমস্ত ধর্ম্মকায়কে পূর্ণ করিয়া আছে, সেই ত্রিরত্নকে—সেই সেং-ফেণ-ফণকে নমস্কার।" অর্থাৎ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের গুরুতন্ত্রানুসারে, ইহা বুদ্ধি, অনাদি শব্দ ও দুয়ের সম্মিলন, এবং বাহ্যতন্ত্রানুসারে, ইহা বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সংঘ।

তাই Remusat এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই ত্রিতত্ত্ব সমবায়-অর্থে "রত্ন" নামে সচরাচর অভিহিত হইয়া থাকে। চীন ভাষায় এই রত্নের নাম "পাও," মঙ্গলীয় ভাষায় "এর্দ্দেনি," এবং তিব্বতীয় ভাষায় "কন্-মচগ্";—এই সকল ভাষায় ইহা ঈশ্বরেরই নামান্তর। আরও তিনি বলেন, এই ত্রিতত্ত্ব—তিনে এক, একে তিন; চীনদেশীয় বৌদ্ধেরা ইহাকে ত্রিরত্ন বলে। তাহারা বলে, "সুই যুয়ান্ থি. সিংচ য়ি।" অর্থাৎ, এই তিন বস্তু স্বরূপতঃ এক।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিকাতা ২১ নং হরিতকি বাগান লেনে কল্পনিয়াল যন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আইচ দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

নবপ্রকাশিত সুবৃহৎ উপন্যাস

"পিশাচপুরোহিত"

মূল্য দেড় টাকা, ডাকমাশুল চারি আনা।

তান্ত্রিক-কুলপুরোহিতের অদ্ভুত লোমহর্ষণ প্রতিহিংসা কাহিনী। এবং ইংরাজপ্রধানী বাঙ্গালী যুবকের অজ্ঞাতকৃত পাপের ভীতি-বিস্ফোরণপ্রদায়ক, কল্পনাতীত কঠোর প্রায়শ্চিত্ত বিবরণ। আমার প্রাচীন হিন্দুর ঐশ্বর্য্য গৌরব ও পরাক্রমের কৌতূহলোদ্দীপক, চিত্তাকর্ষক, উজ্জ্বল চিত্র। প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও পোঃ মেহেরপুর কেলা নদীয়া গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

দুইখানি নূতন উপন্যাস।

আকার সুবৃহৎ! ছাপা কাগজ বাঁধাই অতি উৎকৃষ্ট॥

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

"জালমোহান্ত"

নবযুগের নূতন উপন্যাস। বাঙ্গালীর সাহস ও বুদ্ধি কৌশলের বিবরণ। লক্ষ টাকার জীবনপণের অপূর্ব্ব কাহিনী। জীবন যুদ্ধে দৈবশক্তির বিজয়-কেতন। প্রাচ্য সুধণ্ডের অলৌকিক রহস্যের ইতিবৃত্ত।

মূল্য দেড় টাকা।

পৌষ] [৯ম সংখ্যা

বঙ্গদর্শন

(নব পর্য্যায়)

একাদশ বর্ষ।

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা।
১। নীতিশিক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র	৫৬৫	৭। ঋষি-কবি (কবিতা)	৬১১
২। সাদা ও কালা	৫৭৬	৮। গান (কবিতা)	৬১২
৩। লজ্জা	৫৭৯	৯। অর্ঘ্য	৬১৩
৪। মানবের জন্মকথা	৫৯১	১০। অভিনন্দন	৬১৫
৫। বুদ্ধসংবাদ ...	৫৯৩	১১। মুক্তা	৬১৬
৬। মাদ্রাজী খাম্‌সামা	৬০০	১২। যথাকালে (কবিতা)	৬২০
১৩। অর্ঘ্য (কবিতা)	৬২০		

এস্ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৮।

সাধনতত্ত্বালোচনা।

শ্রীরামাচরণ বসু বিরচিত। বৈষ্ণব ধর্ম্মের উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বাদি অতি সরল ও সহজ ভাষায় লিখিত। মূল্য ৸০ বার আনা।

মজুমদার লাইব্রেরী ২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

রুষ-জাপান যুদ্ধের ইতিহাস।

৪৪ খানি অত্যুৎকৃষ্ট চাকুষ্টোন ছবি ও মানচিত্র, বহুমূল্য বিদেশী এ্যান্টিক কাগজে অতি সুন্দরভাবে মুদ্রিত প্রকাণ্ড পুস্তক। অল্প দিন মধ্যে জাপানীগণ কি অপূর্ব্ব রণকৌশলে ও বিক্রমবলে অদ্ভুত পৃথিবীর অধিপতি ও ইউরোপের গর্ব্ব প্রধান শক্তি রুষদিগকে প্রতিযুদ্ধে জলে ও স্থলে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া জগতকে বিস্মিত, চকিত ও স্তম্ভিত করিয়াছেন তাহা অবগত হওয়া সকলেরই নিতান্ত কর্ত্তব্য। এই পুস্তকে দার্শনেল, চাই আনজন প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে যে সকল অতি ভীষণ গোলা আবিষ্কার হইয়াছে তাহার দ্বারা পোর্টআর্থার প্রভৃতি মহাদুর্ভেদ্য দুর্গসমূহ কি প্রকারে বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহা মনোমুগ্ধকর ফটোচিত্র দ্বারা এমন সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে যে, পাঠকবর্গ যেন রুষ-জাপান যুদ্ধ প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন বলিয়া বোধ করিবে। অতি সরল ও সুস্পষ্ট ভাষায় লিখিত—অল্পশিক্ষিতা স্ত্রীলোকেরাও অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন পড়িতে পড়িতে শরীর রোমাঞ্চিত হইবে। পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় জাপানীগণের অদ্ভুত বীরত্ব ও জন্মভূমির জন্য অকাতরে প্রাণদান;—ইহা যে কত কৌতূহলোদ্দীপক ও রোমহর্ষণ ঘটনার পূর্ণ তাহা লেখনীর দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব। একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। উপহার দিবার পক্ষে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক। ইহা দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রতি খণ্ড ১০ টাকা। একত্র দুই খণ্ড লইলে ২৫০ টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র

মণিপুরের ইতিহাস

মণিপুর—চিরস্বাধীন দেশ—কি প্রকারে ইংরাজ অধিকারে আসিল—কীর্ত্তিচন্দ্রাদি আর্য্যরাজগণের শাসন-পালন-ব্যবস্থা—নাগ কুকি প্রভৃতি জাতিগণের রহস্যপূর্ণ বিবরণ—অত্যাশ্চর্য্য রক্তারক্তি, গোলকধাঁধা ব্যাপার, যুদ্ধ, বীরশ্রেষ্ঠ টিকেন্দ্রজিতের স্বদেশ প্রেম, বিচার, রাজনৈতিক গূঢ় রহস্যাদি, সুমিষ্ট সরল ভাষায় বিবৃত—ঠিক যেন উপন্যাস পড়িতেছেন বলিয়া বোধ হইবে। ১৬ খানি অত্যুৎকৃষ্ট ছবিসহ প্রায় ৩৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সুন্দর বাঁধাই, মূল্য ১৲ টাকা।

শিল্পী।

এই পুস্তকে গান, বীণ-শলাকা, কালী, ঝাঁড় এনামেলের প্রণালী, সুপরিচিত তৈল, এনেল পিণ্ট ও বার্ণিশ, এনগ্রেভিং, ফটোগ্রাফিং ইলেক্ট্রোসিটি প্রভৃতি সহস্র সহস্র বিষয়ের শিক্ষাপ্রণালী অসংখ্য চিত্রের দ্বারা বিশদরূপে প্রদর্শিত ও অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ইহার সাহায্যে সকলেই অনায়াসে নানাপ্রকার শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিয়া অর্থোপার্জ্জন ও স্বদেশের মনোরঞ্জন সাধন করিতে পারিবেন। বঙ্গভাষায় এরূপ বিস্তৃত শিল্পগ্রন্থ আর নাই। বঙ্গের সুসন্তান শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মাগণের দ্বারা বিশেষরূপে প্রণোদিত ৫৬ পৃষ্ঠার প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা। এইরূপ ১২ সংখ্যায় ১১৪২ পৃষ্ঠায় একখণ্ডের অগ্রিম মূল্য ৪৲ টাকা।

মনোমোহন লাইব্রেরী, ২০৩২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বঙ্গদর্শন

নীতিশিক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র

কেহ কেহ বলেন, কাব্যের উদ্দেশ্য কেবল সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। নীতিশিক্ষার সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। কাব্য ও উপন্যাস সুকুমার-কলার অঙ্গবিশেষ। সুকুমার কলা বা ললিত-কলার অধিকার কেবল সৌন্দর্য্যসৃষ্টিতেই পর্য্যবসিত। সে কেবল সৌন্দর্য্যের বাধাহীন, বিশুদ্ধ সৃষ্টিটিকে আকার দান করিয়াই ক্ষান্ত হইবে,—নীরস নীতি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে চেষ্টা করা তাহার পক্ষে অনধিকার-চর্চ্চা। অনধিকার-চর্চ্চার ফল কাব্যকে পণ্ড করা। ললিত-কলাও তেমনি বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ছাড়িয়া নীতিশিক্ষার দিকে মন দিতে গেলে সৌন্দর্য্যের ত অঙ্গ-হানি হইবেই, নীতিও ফলোপধায়িনী হইবে না, নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রই কেবল নীতির কারবার করিবার অধিকারী, ললিত-কলা সুকুমারী কোমলাঙ্গী নারী—নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র কঠোরমূর্ত্তি পুরুষ। সামাজিক ব্যবস্থায় যেমন পুরুষ ও রমণীর কর্ম্মবিভাগ আছে, সাহিত্যজগতেও তেমনি কর্ম্মবিভাগের নিয়ম আছে। নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র, কঠিন-প্রাণ, বলিষ্ঠদেহ পুরুষ;—তাহারাই নীতির ন্যায় শুষ্ক, কঠিন বিষয় লইয়া আলোচনা করিবে। ললিত-কলাকে কেবল কোমল, মনোরম, চিত্তরঞ্জন সৌন্দর্য্যসৃষ্টির ভার দেওয়া হইয়াছে। যাহাকে যে ভার দেওয়া হইয়াছে, তাহার তাহাই লইয়া সন্তুষ্ট থাকা উচিত। অন্যের কার্য্যের উপর হস্ত-ক্ষেপ করিতে গেলে কেবল বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে মাত্র।

কথাটা কিয়ৎ পরিমাণে সত্য হইলেও আমরা নীতির অধিকার সম্বন্ধে এরূপ একটা 'ধরাবাঁধা' নিয়মের পক্ষে 'ভোট' দিতে রাজি নহি। প্রধানতঃ সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই কাব্য-কলার কার্য্য হইলেও নীতির সঙ্গে তাহার কোন বিরোধ আছে বলিয়া আমাদের বোধ হয় না।

সাহিত্যের পূর্ণ উদ্দেশ্য মনুষ্যত্বের পূর্ণ-বিকাশের পক্ষে সহায়তা করা। সাহিত্যও মনুষ্যত্বেরই বিকাশ। মনুষ্যসমাজ পূর্ণ পরিণতির দিকে যত অগ্রসর হইবে, তাহার সাহিত্যও তত পূর্ণাঙ্গ হইবে। আবার উন্নত পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যও তেমনই মনুষ্যত্বগঠনের পক্ষে প্রতিনিয়তই সহায়তা করিবে। নীতি ও ধর্ম্মসূত্র মনুষ্যত্বের মূলীভূত সারসত্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। সাহিত্যের যে কোন বিভাগই হউক না কেন—এই "সারসত্য"-প্রচারই তাহার উদ্দেশ্য।

কোনটি প্রত্যক্ষ ভাবে এই সারসত্য লইয়া আলোচনা করিয়া থাকে ; যথা—ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতি, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি। আবার কোনটি বা পরোক্ষভাবে মূর্ত্তিভেদে এই সারসত্যের মহিমা কীর্ত্তন করে। কাব্যকলা এই শেষোক্ত শ্রেণীর। কাব্যকলার একটি উদ্দেশ্য মনুষ্যত্বের সারসত্যের প্রচার। যদি কোন কাব্য এরূপ থাকে যে তাহা এই সারসত্যের অনুগামী নহে, তবে তাহা কাব্য নামেরই যোগ্য নহে। সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই কাব্যের প্রধান কার্য্য বটে। কিন্তু সত্য ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে কি বাস্তবিক কোন প্রভেদ আছে। মহান্ সৌন্দর্য্য মহান্ সত্যেরই প্রতিবিম্ব, মহান্ সত্যকেই সে প্রচার করিয়া থাকে। যে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির মধ্যে সত্যের নির্ম্মল মূর্ত্তি প্রকাশ পায় না, যে সৌন্দর্য্য মনুষ্যত্বের চিরন্তন নীতিকে পদদলিত করে, সাহিত্যের রাজ্যে তাহার স্থান নাই। তাহা বিলাস-প্রসাধনগর্ব্বিতা অভিসারিকা বারাঙ্গনার চিত্র হইতে পারে, কিন্তু লীলাময়ী কল্যাণী নারীমূর্ত্তি নহে।

আমরা বলিয়াছি যে কাব্যকলা পরোক্ষ-ভাবে মনুষ্যত্বের সনাতন সত্য ও নীতির প্রচার করিয়া থাকে। পরোক্ষভাবে বলিতে আমরা কি বুঝিয়াছি সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম্ম-শাস্ত্র যুক্তি, বিচার ও ব্যবস্থা দ্বারা সত্যের প্রচার করিয়া থাকে—কিন্তু ললিত-কলা সেই সত্য আদর্শের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করে। ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র যুক্তি ও বিচার দ্বারা কোন্‌টি সত্য কোন্‌টি অসত্য তাহার নির্দ্ধারণ করে, সুনীতির অনুসরণে কি সুফল হয় ও দুর্নীতির অনুসরণে কি কুফল হয় তাহা প্রদর্শন করে ; ব্যবস্থার দ্বারা লোকের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অনুশাসিত করিয়া দেয়। কিরূপ কার্য্য সমাজস্থিতির অনুকূল—কিরূপ কার্য্যই বা সামাজিক বিপ্লব আনয়ন করে, তাহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হয়। যিনি সকল সত্য ও ধর্ম্মের উৎস, তাঁহার স্বরূপ কি, মনুষ্যত্বের চরমলক্ষ্য কি এবং কিরূপেই বা সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় তাহার গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনে যত্ন করিয়া থাকে। কিন্তু কাব্যকলা, চিত্র-কলা প্রভৃতি ললিতকলা, যুক্তি ও বিচার-মার্গের এই দুর্গমপথ অবলম্বন করে না বা ব্যবস্থার দ্বারা লোকের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অনু-শাসিত করিতেও প্রয়াস পায় না। সে ধর্ম্ম ও নীতির অনুসন্ধেয় এই সত্যকে সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করে। মানবের সম্মুখে সুন্দরের আদর্শ স্থাপন করিয়া সে সত্যকে মানবহৃদয়ের প্রিয় করিয়া তোলে। ইহা সত্য, ইহা অসত্য, ইহা ধর্ম্ম, ইহা অধর্ম্ম, এইরূপ বিধি নির্দ্দেশ করিবার সাহস তাহার নাই, কিন্তু প্রিয়-তমার মনোহারিণী বাক্যের ন্যায় সে ধর্ম্ম ও নীতিকে সুন্দর করিয়া মধুর করিয়া সকলের বরণীয়া করিয়া তোলে। যিনি পরম সত্য, যিনি পরম ধর্ম্ম, তাঁহার স্বরূপনির্ণয়ের দুষ্করব্রতে কখনই কাব্যকলা ব্রতী হয়-না। সেই চির-সুন্দর চিরসত্যের অনন্তসৌন্দর্য্যের যে ক্ষীণ আভাস সে ধরিতে পারে তাহাকেই আকার দান করিয়া সে মানবহৃদয়কে উন্নত ও মহৎ করিয়া তোলে—তাহাকে সফলতার দিকে লইয়া যায়। এ সম্বন্ধে

উত্তর-চরিত-সমালোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিম বাবুও এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিলে পাঠকেরা বোধ হয় তৃপ্ত হইবেন।

"কাব্যের উদ্দেশ্য নীতি-বিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ-সাধন—চিত্ত-শুদ্ধি-জনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা, কিন্তু নীতি-ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমটি গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য।"

(বিবিধ প্রবন্ধ)

এতক্ষণে বুঝা গেল, মুখ্য হউক, গৌণ হউক, সত্যনীতি-প্রচার কাব্যকলার একটী উদ্দেশ্য। কিন্তু সত্যের পূর্ণমূর্ত্তি সকলের চোখে পড়ে না। সত্যের স্থান-কালের ভেদ নাই। তাহা সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বকাল-স্থায়ী, সনাতন। তাহা মানব-সৃষ্টির প্রথম-যুগেও যেমন ছিল, বহু সহস্র বৎসর পরে আধুনিক যুগেও তেমনই আছে। জুদেশেও যেমন, ঋষিসেবিত ভারতভূমিতেও তেমন,—আবার আধুনিক সভ্যতার গৌরব-দীপ্ত ইউরোপেও তেমনই। তবে সকল স্থানে বা সকল সময়ে, সত্যের মূর্ত্তি সমান ভাবে লোকের চক্ষে প্রকাশ না পা'তে পারে। 'খনির তিমিরগর্ভস্থ মণির ন্যায় তাহা সকল সমাজে আবিষ্কার না করিতে পারে। অথবা আবিষ্কার করিলেও উপযুক্ত মণিকারের হাতে না পড়িয়া সে তাহার স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য দীপ্তি না পাইতে পারে। কলম্বসের আমেরিকা-আবিষ্কারের পূর্ব্বেও আমেরিকা মহাদেশ বর্ত্তমান্ ছিল। কিন্তু তাহা লোকচক্ষুর অজ্ঞাত ছিল, কলম্বস্ তাহাকে জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছিলেন। আবার আবিষ্কৃত হইলেও সত্যের অখণ্ড, বাধাহীন মূর্ত্তি সকলের দৃষ্টিতে পড়ে না। সাধারণ অল্পবুদ্ধি লোকে তাহাকে খণ্ডিত করিয়া দেখে। দেশকালের দ্বারা সীমাবদ্ধ করিয়া সত্যের বিশ্বরূপমূর্ত্তিকে বিকৃত করিয়া তোলে—তাহাকে ছোট করিয়া, সঙ্কীর্ণ করিয়া আপনাদের সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র হৃদয়ের অনুযায়ী করিয়া লয়। বিশাল সমুদ্রহৃদয়ে অনন্ত নীলাম্বরের প্রতিবিম্ব যেমন মহান্ দেখায়, 'সরার জলে' তাহার ছায়া পড়িলে তেমনই ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়।

প্রতিভাহীন, ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকেরা সত্যের খণ্ডিতমূর্ত্তিকেই ভ্রম করিয়া সত্য বলিয়া জগতে প্রচার করিতে থাকে। আপনাদের বিশেষ নিয়ম, বিশেষ অনুষ্ঠান, বিশেষ সামাজিক বিধিকেই সত্য বলিয়া পরিচিত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। সামাজিক স্বার্থ-পরতায় সত্যকে সীমাবদ্ধ করিয়া তাহাকে ছোট করিয়া বড় আনন্দ বোধ করিতে থাকে। চক্ষুরোগগ্রস্ত ব্যক্তির চক্ষুতে যেমন বস্তুর প্রকৃত প্রতিবিম্ব পড়ে না, তাহারাও তেমনি সত্যের প্রকৃতমূর্ত্তি বুঝিতে পারে না। কিন্তু দূরদর্শী, প্রতিভাশালী কবি সত্যের এই চিরন্তন, বিশ্বজনীন মূর্ত্তিকে আপনার হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত দেখিতে

পান,—তাহার সর্ব্বকালব্যাপী সনাতন মূর্ত্তিকে আরও উজ্জ্বল করিয়া জগতের সমক্ষে প্রকাশ করেন। স্থান-কালের ব্যবধান তাঁহার সর্ব্বগামী দৃষ্টিতে বাধা দিতে পারে না—কালের আবরণ, স্থানের ব্যবধান ভেদ করিয়া সত্যের নির্ম্মল, বিশ্বজনীন মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে। যে কবি এই বাধাহীন, বিশ্বজনীন সত্যকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন তিনিই মহাকবি। যিনি এই বিশেষ সমাজবদ্ধ, খণ্ড, ক্ষুদ্র সত্যকে ছাড়াইয়া মনুষ্যত্বের সনাতন সত্যগুলিকে প্রকাশ করিতে পারেন, তিনিই প্রতিভাশালী। প্রতিভা আর কিছুই নহে—এই দূরদর্শনের ক্ষমতা; খণ্ডকে, সীমাবদ্ধকে ছাড়াইয়া, অখণ্ড, পূর্ণ সীমাহীনকে প্রত্যক্ষ করিবার এই দৃষ্টি। তাই যে সমস্ত কবি এই বিশ্বজনীন সত্যকে যত প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—মনুষ্যত্বের সনাতন নীতিকে যত প্রচার করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই জগতে তত বড় কবি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন; এই হিসাবে সেক্সপীয়র, গেটে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, ও ব্রাউনিং ইউরোপের বড় কবি; ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস ও ভবভূতি ভারতের বড় কবি। তাঁহাদের প্রচারিত সত্যগুলি কেবল বিশেষ দেশ-কালেই সীমাবদ্ধ নহে,—তাহারা সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের জন্য, সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বযুগের লোকই তাহার ভিতরে বিশ্বসত্যের উজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে—সৌন্দর্য্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত সত্যকে ভাল বাসিয়া মনুষ্যত্বকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারিবে।

এই হিসাবে বঙ্গের বিখ্যাত বঙ্কিমচন্দ্র একজন মহাকবি। অসাধারণ প্রতিভাবলে বিশ্বসত্যের উজ্জ্বলমূর্ত্তি তিনি প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন—মনুষ্যত্বের বহু সনাতন নীতি জগতের সমক্ষে তিনি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কাব্য বা উপন্যাসাবলী কেবল লোকের চিত্তরঞ্জনের জন্য সৌন্দর্য্যের ক্ষণিক সৃষ্টিতেই পর্য্যবসিত নহে। সেগুলি মহান্ সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া বিশ্বের সারসত্য চিরন্তন নীতিকেই প্রচার করিয়াছে, তিনি কেবল বঙ্গের বা ভারতবর্ষের কবি নহেন, তিনি জগতের কবি। সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের লোক, তাঁহার কাব্যসৃষ্টিতে মনুষ্যত্বের সনাতননীতি শিক্ষা করিতে পারিবে। যদি বিশ্বজনীন সত্য প্রকাশের ক্ষমতার উপরেই মহাকবির নির্ভর করে—তবে বঙ্কিমচন্দ্র যে মহাকবি ছিলেন—সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। বঙ্গসাহিত্যের যদি এমন দিন হয় যে তাহা জগতের লোকের নিকট বহুলভাবে পরিচিত হইতে পারে তবেই বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান মানবসাহিত্যে স্থিরীকৃত হইতে পারিবে। তাঁহার গ্রন্থসমূহে যে কত অমূল্য সত্য ও নীতি নিহিত রহিয়াছে তাহার নির্ণয় করা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত। মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম তত্ত্ব-বিশ্লেষণে, মানব-হৃদয়-দর্শিতায়, লোকচরিত্রের অভিজ্ঞতায়, সৌন্দর্য্যের ভিতরে সত্যের নির্ম্মলমূর্ত্তি প্রকাশে বঙ্কিমচন্দ্র অদ্বিতীয়। যে সমস্ত বিশ্বজনীন সত্য ও নীতি তিনি তাঁহার অমূল্য গ্রন্থাবলীতে প্রচার করিয়াছেন—তাহার সকলগুলিকে সঙ্কলন ও আলোচনা করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। যেগুলি সহজেই স্থূল দৃষ্টিতে পড়িতে

পারে এখন দুই একটি সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমরা ক্রমে ক্রমে সেই গুলির আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

১। চিত্তসংযমের অভাবই মনুষ্যের অধঃপতনের কারণ।

মানুষের চিত্ত-ক্ষেত্র একটা সংগ্রাম-ভূমি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেব ও অসুর প্রতিনিয়তই এখানে সংগ্রাম করিতেছে। যখন দেবগণ জয়ী হন, তখনই তাঁহারা অমৃতের অধিকারী হন। এইরূপ পরস্পর-বিরোধী বৃত্তিনিচয় দ্বারা মানব-হৃদয় গঠিত। গীতায় ইহাকে দৈব ও আসুর গুণ বলা হইয়াছে। উপনিষদে ইহাকে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এই নাম দেওয়া হইয়াছে। একদিকে পশুলোক অন্যদিকে দেবলোক, মানুষ ইহাদের মধ্যস্থ জীব। অভিব্যক্তির ফলে মানুষকে সৃষ্টিপর্য্যায়ে এই যে স্থান দেওয়া হইয়াছে তাহা বড় বিপদময়, বড় দায়িত্বপূর্ণ। পশুলোক হইতে উপরে উঠিবার সময় পশুবৃত্তিগুলি মানুষ একেবারে ত্যাগ করিতে পারে নাই, আবার দেব লোকের নির্ম্মল বৃত্তিও তাহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। মানুষ যত এই পশুবৃত্তিগুলিকে পরাস্ত করিয়া দেববৃত্তিগুলিকে লাভ করিতে পারিবে, ততই সে পূর্ণ মনুষ্যত্বের বা দেবত্বের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে। আর যতই সে পশুবৃত্তির দিকে আকৃষ্ট হইবে ততই তাহার অধঃপতন হইবে। বাসনা বা প্রবৃত্তি এই পশুবৃত্তিসমূহের মূল; আর দেববৃত্তি সংযম বা নিবৃত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। পশুত্বের যে প্রধান তিনটি কাম, ক্রোধ ও লোভ * তাহা এই বাসনা হইতেই উদ্ভূত হয়। যিনি সংযম দ্বারা চিত্তকে যত শাসিত করিতে পারিবেন তিনিই তত মনুষ্যত্বের গৌরবের অধিকারী হইবেন। আবার যিনি বাসনাকে যত আশ্রয় করিবেন তিনিই তত ধ্বংসের মুখে যাইবেন। বাসনাই মনুষ্যের শত্রু। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে বাসনার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই মনুষ্যের অধঃপতন হইয়াছে। বাইবেলের সর্প, বাসনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার আকর্ষণেই মানবের আদি পিতার প্রথম অধঃপতনের কারণ। তারপরেও মানুষের যত অধঃপতন হইয়াছে বাসনাকেই তাহার মূল দেখা যায়। ভগবান্ বুদ্ধদেব কঠোর সাধনা দ্বারা বাসনাকেই মানবের দুঃখের কারণ বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন এবং বাসনা-ত্যাগই ধর্ম্মের সার বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। জগতের মহাগ্রন্থ 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'তেও এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে বাসনাকেই মানুষের দুঃখ ও অধঃপতনের কারণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং ইহাকে কি উপায়ে জয়

* অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়-
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু
ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্য উ প্রেয়ো বৃণীতে।
কঠোপনিষৎ ২।১

* ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ।
গীতা ১৬।২১

করা যাইতে পারে তাহার উপায় অনুসন্ধান করা হইয়াছে।

জগতে যত মহাকবি দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই বাসনাকে লইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। চিত্ত-সংযমের অভাবেই মানুষ বাসনার দিকে আকৃষ্ট হয় এবং একবার আকৃষ্ট হইলে আর তাহার রক্ষা থাকে না। এই চিত্ত-সংযমের অভাবে মানুষের কিরূপ অধঃপতন হয় তাহা মহাকবিরা বারোবারই দেখাইয়াছেন। মানব-হৃদয়ের এই যে চিরন্তন সত্য বঙ্কিমচন্দ্র তাহা বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন। তাই বাসনার আকর্ষণে, চিত্ত-সংযমের অভাবে মানুষের কিরূপ দুর্দ্দশা হয় তাহা তিনি পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছেন।

গোবিন্দলাল বড় সুখী ছিলেন। তাঁহার কোন বিষয়েরই অভাব ছিল না। রূপ, যৌবন, স্বাস্থ্য, সম্পৎ সকলই তাঁহার ছিল। নবীন বয়স, সুগঠিত দেহ, অতুলনীয় সৌন্দর্য্য, প্রিয়তমা পত্নী, তাঁহার কিসের অভাব ছিল? গোবিন্দলালের চরিত্র অতি নির্ম্মল ছিল, মনুষ্য মধ্যে তিনি সুখী ছিলেন। কিন্তু ফুলের মধ্যে যেমন কীট থাকে তেমনি এই সম্পূর্ণতার মধ্যেও একটু খুঁত ছিল। এই নির্ম্মল নীলাকাশ, ইহার এক কোণে কোথায় একটু মেঘের দাগ ছিল; গোবিন্দলালও বোধ হয় তাহা জানিতেন না। গোবিন্দলাল প্রিয়তমা পত্নী ভ্রমরের মধ্যেই পরিতৃপ্ত ছিলেন। এমন সাধ্বী প্রেমময়ী পত্নী, তাহাকে কে না ভালবাসে? আশৈশব যাহার সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ, আশৈশব যে হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যে শিক্ষা, সখী, সহধর্ম্মিণী, সেরূপ পত্নী যাহার আছে তাহার আবার অভাব কি? কিন্তু একটু অভাব ছিল, গোবিন্দলাল তাহা বুঝিতে পারেন নাই। ভ্রমর সর্ব্বগুণে গুণময়ী হইলেও ভ্রমরের রূপ ছিল না। গোবিন্দলালের যখন 'পূর্ণ যৌবন, মনবৃত্তি সকল উদ্বেলিত সাগর-তরঙ্গতুল্য প্রবল, রূপতৃষ্ণা অতি তীব্র', তখন 'ভ্রমর হইতে সে তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই।' কিন্তু গোবিন্দলাল তাঁহার হৃদয়ের এই অভাব জানিতেন না। প্রভাত 'শুক্লতারারূপিণী' রোহিণীকে যখন দেখিলেন, তখন এই অভাব প্রথম অনুভূত হইল, নিদাঘের নীলমেঘমালার মত রোহিণীর রূপ এই চাতকের লোচনপথে উদিত হইল, প্রথম বর্ষার মেঘদর্শনে চঞ্চলা ময়ূরীর মত গোবিন্দলালের মন রোহিণীর রূপ দেখিয়া নাচিয়া উঠিল; এই যে রূপ তৃষ্ণা, এই যে বাসনা—ইহাই গোবিন্দলালের সর্ব্বনাশের কারণ হইল।

প্রথম যখন গোবিন্দলাল বারুণীর ঘাটে রোহিণীকে দুঃখিতা ও রোরুদ্যমানা দেখিলেন তখন তাঁহার মনে পরদুঃখ-কাতরতার বেশী কিছুই হয় নাই। একটি সুন্দরী স্ত্রীলোককে কাঁদিতে দেখিলে কে না দুঃখিত হয়? বোধ হয় পথে, ঘাটে, মাঠে কোন সাধারণ স্ত্রীলোককে কাঁদিতে দেখিলে গোবিন্দলাল তত বেশী দুঃখিত হইতেন না। কিন্তু এমন সুন্দর বারুণীপুকুরের এমন সুন্দর ঘাটে এমন সুন্দর সন্ধ্যাকালে, এমন সুন্দর পুষ্পময়

বাগানে দাঁড়াইয়া, এমন সুন্দরী স্ত্রীলোককে কাঁদিতে দেখায় তাঁহার মনে বোধ হয় একটু বেশী লাগিয়াছিল। বোধ হয় তাঁহার মনে অলক্ষিতে একটু দাগ পড়িয়াছিল। অবশ্য তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। অমন অলক্ষিতে আমাদের মনে যে কত ভাবের মূল বসিয়া যাইতেছে তাহা কে বলিতে পারে?*

তাহার পরে উইল চুরি করিতে যাইয়া রোহিণী ধরা পড়িল এবং গোবিন্দলাল তাহার পক্ষে ওকালতী করিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া দিলেন। গোবিন্দলাল সুন্দরী রোহিণীর আর এক মূর্ত্তি এবার দেখিলেন—বিপন্না, বিবশা, হতমানিনী, ঈষৎগর্ব্বিতা মূর্ত্তি। তাহার মুখে জানিতে পারিলেন 'যে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধা, এ ভুজঙ্গিনীও সেই মন্ত্রে মুগ্ধা। রোহিণী তাহার প্রতি প্রণয়শালিনী।' একে অমন সুন্দরী তাহাতে তাঁহার উপর প্রণয়শালিনী। দাগ আরও গভীরতর হইল।

কিন্তু এ সবে কিছু হইত না। তারপর যাহা হইল, তাহাতেই কেবল আঘাতে গোবিন্দলালের হৃদয়কে দুর্ব্বল করিয়া দিল। রোহিণী মরিবার জন্য বারুণীপুকুরের জলে ডুবিল। গোবিন্দলাল জানিতে পারিয়া সোপান নিম্নে আসিয়া দেখিলেন 'স্বচ্ছস্ফটিকমণ্ডিত হৈমপ্রতিমার ন্যায় রোহিণী জলতলে শুইয়া আছে।' তাহাকে ভৃত্যের সাহায্যে উদ্যান-গৃহে লইয়া গেলেন এবং তাহার জীবনরক্ষার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। তখন সেই সংজ্ঞাহীনা নিশ্বাস-প্রশ্বাসরহিতা রোহিণীকে যেরূপ দেখা যাইতেছিল আমরা কবির কথাতেই তাহার বর্ণনা করিব—

"বাত্যাবর্ষাবিধৌত চম্পকের মত সেই মৃত নারীদেহ পালঙ্কে শয়মান হইয়া প্রজ্বলিত দীপালোকে শোভা পাইতে লাগিল। বিশাল, দীর্ঘবিলম্বিত ঘোরকৃষ্ণ কেশরাশি জলে ঋজু, তাহা দিয়া জল ঝরিতেছে। নয়ন মুদ্রিত; কিন্তু সেই মুদ্রিত পদ্মের উপর ভ্রমর জলে ভিজিয়া আরও অধিক কৃষ্ণ শোভায় শোভিত হইয়াছে। আর সেই ললাট—স্থির, বিস্তারিত, লজ্জাভয়বিহীন কোন অব্যক্ত-ভাববিশিষ্ট; গণ্ড এখনও উজ্জ্বল, অধর এখনও মধুময়, বান্ধুলীপুষ্পের লজ্জাস্থল। দেখিয়া গোবিন্দলালের চক্ষে জল পড়িল। বলিলেন 'মরি মরি কেন তোমায় বিধাতা এ রূপ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন; দিয়াছিলেন ত সুখী করিলেন না কেন?' এই সুন্দরীর আত্মঘাতের তিনিই যে মূল, এ কথা মনে করিয়া তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।"

কিন্তু গোবিন্দলালের কেবলই কি দুঃখ হইল? অমন রূপ দেখিয়া, সেই দুঃখের সঙ্গে একটু বাসনার অস্ফুট আভাস কি দেখা দিল না?

তারপর রোহিণীকে বাঁচাইবার জন্য নানা প্রকার প্রক্রিয়া করিতে হইল। কিন্তু গোবিন্দলাল যখন দেখিলেন যে নিশ্বাসপ্রশ্বাস বহাইবার জন্য রোহিণীর অধরে ফুৎকার দিতে হইবে—"সেই পক্কবিম্ব-বিনিন্দিত এখনও সুধাপরিপূর্ণ, মদন-

* মনোবিজ্ঞান ইহাকে subconscious region বলে।

মদোন্মাদে হলাহলকলসী তুলা রাঙ্গা অধরে অধর দিয়া চুৎকার দিতে হইবে," তখন ভাবিলেন "কি সর্ব্বনাশ! কে দিবে?" মালীকে বলিলেন সে বেচারা স্বীকৃত হইতে পারিল না। অগত্যা "গোবিন্দলাল তখন সেই রক্তরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগলে রক্তরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগল স্থাপিত করিয়া রোহিণীর মুখে চুৎকার দিলেন।" হায় গোবিন্দলাল কি করিলে? আপনার মরিবার পথ আপনি প্রস্তুত করিলে? যে শরের আঘাতে স্বয়ং মহাদেব পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন, তুমি ইচ্ছা করিয়া সেই শরে আহত হইতে গেলে? এতদিনে যথার্থই ভ্রমরের কপাল ভাঙ্গিল। "সেই সময়ে ভ্রমর একটা লাঠি লইয়া বিড়াল মারিতে যাইতেছিল। বিড়াল মারিতে লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া ভ্রমরেরই কপালে লাগিল।"

আগুণ জ্বলিল। দাঁড়িয়া উঠিয়া রোহিণী যাহা যাহা বলিল তাহাতে সে আগুণ আরও বাড়িয়া গেল। সেই নিস্তব্ধরাত্রিকালে নির্জ্জন উদ্যানগৃহে সদ্যোযৌবনপ্রাপ্তা সুন্দরী রোহিণী যখন তাহার তীব্র প্রেমের কথা, প্রেমজনিত দুঃখের কথা বলিল, বলিল যে গোবিন্দলালেরই জন্য সে মরিতে যাইতেছিল, তখন গোবিন্দলালের হৃদয়ে এক তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তাঁহার 'অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্' হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। রোহিণী চলিয়া গেলে গোবিন্দলাল সেই বিজন কক্ষমধ্যে মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আত্মজয়ের জন্য বল প্রার্থনা করিয়া ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন। বাণবিদ্ধ হরিণ যেমন যন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকে তেমনি রোহিণীর রূপবিদ্ধহৃদয় গোবিন্দলাল ভূমিতলে পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিলেন।

গৃহে ফিরিয়া গোবিন্দলালের হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। আত্মজয় করা তিনি বড় কঠিন বোধ করিতে লাগিলেন। রাত্রিদিন রোহিণীর রূপ তাঁহার হৃদয়মধ্যে উদিত হইতে লাগিল। মনে করিলেন যে বিষয়-কর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়া রোহিণীকে ভুলিবেন। মনে মনে শপথ করিলেন "মরিতে হয় মরিব, তথাপি ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী হইব না।" এই ভাবিয়া তিনি জমিদারীর পরগণা বিশেষ দেখিবার জন্য যাত্রা করিলেন।

এই সময়ে গোবিন্দলাল ও ভ্রমর উভয়েই বড় ভুল করিলেন এবং সেই ভুলেই উভয়ের সর্ব্বনাশ হইল। দাম্পত্যপ্রেম বড় মধুর, বড় পবিত্র, বড় অনাবিল। ইহা মানুষকে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে রক্ষা করে। মৃতসঞ্জীবনীর ন্যায় জীর্ণ পুরাতন মৃত হৃদয় নবশক্তি দিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া তোলে। কিন্তু এই প্রেমের প্রধান মন্ত্র বিশ্বাস ও মুক্তহৃদয়তা। দাম্পত্যপ্রেমের মধ্যে গোপনের স্থান নাই—ইহা দাম্পত্যপ্রেমের কণ্টকস্বরূপ। একবার এই কীট প্রবেশ করিলে প্রেমকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। গোবিন্দলাল যে দিন জলমগ্ন রোহিণীকে বাঁচাইয়া বারুণীপুকুর হইতে ফিরিয়া আসিলেন, সেদিন তাহার হৃদয়ের চাঞ্চল্য মুখে প্রতিফলিত দেখিয়া ভ্রমর আশঙ্কিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন। যদি

গোবিন্দলাল সব কথা খুলিয়া ভ্রমরকে বলিতেন, যদি নিজের হৃদয়ের চাঞ্চল্য, সংগ্রাম—নিজের হৃদয়ের দুর্ব্বলতা, সব ভ্রমরের নিকট অকপটে প্রকাশ করিতেন, তবে গোবিন্দলালের বিপদ হয় ত কাটিয়া যাইত। ভ্রমরের স্নেহে, ভ্রমরের প্রেমে, তাঁহার হৃদয়ে যে একটু মলিনতার দাগ পড়িয়াছিল, তাহা ধুইয়া যাইত। কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা করিলেন না, লজ্জায় সব কথা গোপন করিলেন। ভ্রমরের নির্ম্মল হৃদয়ে ইহাতে দাগ পড়িল। কথাটা না জানিতে পারিলেও একটা ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

গোবিন্দলাল পরগণায় গেলেন। এদিকে ভ্রমরের শতমুখে গোবিন্দলাল ও রোহিণীর কলঙ্ককথা নানারূপে রটিতে লাগিল। প্রথমে দাসীরা, পরে পাড়ার হিতৈষিণী আত্মীয় কুটুম্বিনীরা ভ্রমরের নিকট এ কথা প্রচার করিল। ভ্রমর তাহাতে বিচলিত হইলেন না। পরে স্বয়ং রোহিণী আসিয়া ভ্রমরকে একেবারে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিল। ভ্রমর অভিমানে স্বামীর নিকট এক কঠিন পত্র লিখিল। গোবিন্দলাল পত্র পাইয়া হতবুদ্ধি হইলেন, তাড়াতাড়ি গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু ভ্রমরের কুগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি গোবিন্দলালের আসিবার সংবাদ শুনিয়া তৎপূর্ব্বেই পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন, যদি স্বামী-স্ত্রীতে দেখা হইত, তাহা হইলে এ আঁধার কাটিয়া যাইত।

গোবিন্দলাল গৃহে আসিয়া শুনিলেন যে ভ্রমর পিত্রালয়ে গিয়াছে। শুনিয়া ভ্রমরের উপর অত্যন্ত রাগ ও অভিমান হইল। মনে করিলেন "এত অবিশ্বাস! না বলিয়া না জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল। আমি আর সে ভ্রমরের মুখ দেখিব না। যাহার ভ্রমর নাই, সে কি জীবন ধারণ করিতে পারে না?" তিনি এই সঙ্কল্পের বশবর্ত্তী হইয়া ভ্রমরকে ভুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভ্রমরকে সহজে ভোলা যায় না, সে যে অনেক দিন হইল হৃদয় অধিকার করিয়া আছে! "দুঃর্ব্বুদ্ধি গোবিন্দলাল মনে করিলেন—ভ্রমরকে ভুলিবার উৎকৃষ্ট উপায় রোহিণীর চিন্তা।" "অনেক কুচিকিৎসক ক্ষুদ্ররোগের উপশমের জন্য উৎকট বিষের প্রয়োগ করেন।" গোবিন্দলালও তাহাই করিলেন। তিনি ভ্রমরকে ভুলিবার জন্য রাত্রিদিন রোহিণীর চিন্তা করিতে লাগিলেন।

বাস্তবিকই কি গোবিন্দলাল ভ্রমরের এই সামান্য অপরাধের জন্য তাহাকে ত্যাগ করিতে বসিলেন? এই সামান্য একদিনের একটি দোষেই কি ভ্রমরের আবাল্য অকৃত্রিম প্রেমকে ভুলিয়া গেলেন? কথাটা এত সোজা নহে। যে পাপী সে নিজের হৃদয় জানে না। পাপ ধীরে ধীরে তাহার হৃদয় কিরূপে অধিকার করে তাহা সে বুঝিতে পারে না। রোহিণীর রূপ গোবিন্দলাল প্রথমদর্শনাবধি কোন দিনই ভুলিতে পারেন নাই। "রোহিণী প্রেতিনী দিবারাত্রি গোবিন্দলালের হৃদয়ে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছিল।" গোবিন্দলাল আত্মদমনের জন্য অবশ্য চেষ্টা করিতেন

যদি ভ্রমর এ বিষয়ে সাহায্য করিত তবে হয় ত গোবিন্দলালের চেষ্টা সফল হইতে পারিত। কিন্তু ভ্রমরের মূঢ়তায় গোবিন্দলালের মনের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। অবসর পাইয়া রোহিণীর রূপ ধীরে ধীরে গোবিন্দলালের হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল। গোবিন্দলালের পাপমন ভাবিল এই ত মহা সুযোগ। গোবিন্দলাল ভ্রমরের উপর রাগিয়া তাহাকে ভুলিতে চেষ্টা করিলেন। এই ছিদ্র দিয়া পাপ তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। নলের শরীরে কলির ন্যায় অলক্ষ্যে তাঁহার দেহে পাপ প্রবেশ করিল। গোবিন্দলাল ভাবিলেন "তাহাতে কি? হৃদয় ত খালি থাকিতে পারে না, 'ভ্রমরকে ভুলিতে হইলে রোহিণীকে ভাবিতে হইবে। যাহার ভ্রমর নাই সে কি প্রাণ ধারণ করে না?' আর ভ্রমর দোষী তাহাকে শাস্তি দেওয়া উচিত।" অতএব গোবিন্দলাল আত্মজয়ের কোন চেষ্টা করিলেন না;—রোহিণীর রূপসাগরে ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন, "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে। সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ—।" গোবিন্দলালের তাহাই হইল। ক্রমে রোহিণীর উপর আকাঙ্ক্ষা, শেষে তাহাকে পাইবার চেষ্টা। প্রথমে মনে করিলেন, রূপ দেখিব তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু রূপ তৃষ্ণা শেষে কামে পরিণত হইল। "গোবিন্দলালের অধঃপতন বড় দ্রুত হইল, কেননা রূপতৃষ্ণা অনেক দিন হইতে তাঁহার হৃদয় শুষ্ক করিয়া তুলিয়াছিল।"

এই সময়ে প্রতিকূল দৈব অনেকগুলি দুর্ঘটনা সংঘটিত করিয়া দিল। কৃষ্ণকান্ত রায়ের মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে গোবিন্দলালের দুশ্চরিত্রের কথা শুনিয়া কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালের পরিবর্ত্তে ভ্রমরকে সম্পত্তির অধিকারিণী করিয়া গেলেন। দুর্ভাগ্য গোবিন্দলাল মনে করিল "কি আমি স্ত্রীর অন্নদাস হইব? স্ত্রীর অন্নদাস হওয়া অপেক্ষা গৃহত্যাগ করা ভাল।" ভ্রমরের উপর সেই পূর্ব্ব স্নেহ থাকিলে হয় ত এরূপ মনে করিতেন না। এখন ভ্রমরকে তাঁহার আর ভাল লাগে না। সুতরাং যাহা কিছু ভ্রমরসম্পর্কীয়, তাহাও পূর্ব্বের মত তাঁহার নিকট প্রিয় নহে। ভ্রমরের সঙ্গে আবার দেখা হইল, কিন্তু সে পূর্ব্বপ্রেম আর ফিরিয়া আসিল না। একটা কঠিন ব্যবধান দুই জনের ভিতর যেন দৃঢ়ভাবে রচিত হইয়া গিয়াছিল। দিনের পর দিন গেল, দুইজনের হৃদয় পরস্পর দূর হইতে দূরতর হইতে লাগিল। প্রেমের আলো নিবিয়া যাইতে লাগিল, সেখানে অবিশ্বাসের অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিল। গোবিন্দলাল রোহিণীর চিন্তায় মগ্ন—ভ্রমর আপন হৃদয়-যন্ত্রণায় কাতরা। শেষে ভ্রমর পায়ে ধরিয়া গোবিন্দলালের কাছে বারবার ক্ষমা চাহিল—অসময়ে পিত্রালয়ে যাওয়ার জন্য কত বার মার্জ্জনা ভিক্ষা করিল, কিন্তু "গোবিন্দলাল কথা কহিল না। তাহার অগ্রে আলুলায়িতকুন্তলা, অশ্রুবিপ্লুতা, বিবশা, কাতরা, মুগ্ধা, পদপ্রান্তবিলুণ্ঠিতা সেই সপ্তদশবর্ষীয়া বনিতা।" গোবিন্দলাল কথা কহিল না, গোবিন্দলাল তখন ভাবিতেছিল "এ কালো! রোহিণী কত সুন্দরী—এর গুণ আছে তার রূপ আছে।

এত কাল গুণের সেবা করিয়াছি এখন কিছু দিন রূপের সেবা করিব।" ভ্রমর পায়ে ধরিয়া কাঁদিল "ক্ষমা কর, আমি বালিকা!" কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা শুনিল না। "গোবিন্দলাল রোহিণীকে ভাবিতেছিল। তীব্র জ্যোতির্ম্ময়ী অনন্তপ্রভাশালিনী, প্রভাত-শুক্রতারারূপিণী, রূপতরঙ্গিণী, চঞ্চলা রোহিণীকে ভাবিতেছিল।"

ভ্রমর উত্তর না পাইয়া বলিল—"কি বল?" গোবিন্দলাল বলিল "আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব।"

কিন্তু ভ্রমরের অপরাধ কি? ভ্রমর কি এত গুরুতর দোষ করিয়াছিল যে তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে? গোবিন্দলালও নিজের হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া তাহা বুঝিতে পারিল না। পাপী তাহা পারে না। মনকে সান্ত্বনা দিল ভ্রমরের অপরাধ 'অবিশ্বাস।" কিন্তু অবিশ্বাস কি এত গুরুতর অপরাধ? তাহার বিবেক বলিল "আসল কথা রোহিণী। রোহিণীতে প্রাণ পড়িয়াছে তাই আর কালো ভোমর ভাল লাগে না।" আমরাও তাহাই বলিব। ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে হৃদয়ে ধরিবার জন্য গোবিন্দলাল ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পাপী পাপ করিতে হইলে নানা 'অজুহাত' বা ছল খোঁজে, এবং এইরূপেই ধীরে ধীরে আত্ম-সংযমহীনতায় লোক ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়।

গোবিন্দলাল গৃহ ত্যাগ করিল, যাইবার সময় সেই "আবাল্য সখী, শিষ্যা, আশ্রিতা, দাসানুদাসী, তাহার কথার ভিখারী পত্নী তাঁহার পায়ে ধরিয়া কত মিনতি করিল। কিন্তু 'পতন্নবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ' গোবিন্দলাল তাহা শুনিল না। বোধ হয় একবার মনে ইতস্ততঃ হইয়াছিল, একবার ভ্রমরের জন্য চক্ষে জল আসিয়াছিল একবার "বালিকার অতি সরল যে প্রীতি, অকৃত্রিম, উদ্বেলিত, কথায় কথায় ব্যক্ত—যাহার প্রবাহ দিবারাত্রি ছুটিতেছে - ভ্রমরের সেই অমূল্য প্রীতি" মনে করিয়া তাহার কাছে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার আহ্বানের আর শক্তি ছিল না। পাপ তখন তাহার হৃদয়রাজ্যের রাজা, পাপ তাহাকে ফিরিতে দিল না। বলিল 'যাহা করিয়াছ তাহা আর এখন ফিরে না।' আর 'এত তাড়াতাড়িই বা কি, যখন মনে করিব তখনই ফিরিব।' এইরূপ হৃদয়ের অবস্থায় গোবিন্দলাল সংকল্পের দৃঢ়তার অভাবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। বরং চিন্তাকে বর্জ্জন করিবার জন্য "বহির্ব্বাটীতে আসিয়া সজ্জিত অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক কশাঘাত করিলেন। পথে যাইতে যাইতে রোহিণীর রূপরাশি হৃদয় মধ্যে ফুটিয়া উঠিল।"

তাহার পরের ঘটনাবলী আর বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' পাঠকমাত্রেই তাহা জানেন। কিরূপে গোবিন্দলাল অতঃপর রোহিণীরূপ তীব্র অগ্নিতে ঝাঁপ দিল, কিরূপে সে অগ্নিতে দগ্ধ হইল, সোণার সংসার শ্মশানে পরিণত হইল, কিরূপে হত্যাকারী গোবিন্দলাল মনুষ্যত্বের নিম্নতম শেষ সোপানে অবতীর্ণ হইল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যে অনলে গোবিন্দলাল

হত হইল দুর্ব্বল মনুষ্যপতঙ্গ অনেকেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া দগ্ধ হয়। শিক্ষক কবি তাই অতি নিপুণভাবে তাহার পরিণাম আমাদিগকে দেখাইয়াছেন।

(ক্রমশ)

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

সাদা ও কালা।*

পূর্ব্বে লোকে বিশ্বাস করিত, পূর্ব্বেই বা কেন বলি, এখনও অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে, কেননা, কুসংস্কার সহজে ধ্বংস হয় না, যে জগতের মহাজাতি সকল প্রাচীন (Ethnic) জাতি সকলের বিবর্ত্তনের ফল। রক্তের একতার উপরই তাহাদের একতা নির্ভর করে। শ্বেতকৃষ্ণ-ভেদে এই সকল জাতির মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্য রহিয়াছে। শ্বেতজাতি সকল চিরদিনই কৃষ্ণকায়দের উপর প্রভুত্ব করিয়াছে এবং জগতের সভ্যতা এই শ্বেতজাতিদিগেরই মস্তিষ্কের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। বর্ত্তমান সময়ে এই মত একটু বিশেষ শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল, কেননা সাদাই আজ জগতের উপর প্রভুত্ব করিতেছে। কিন্তু ইতিহাস হইতে দিন দিন এমন তত্ত্ব সকল আবিষ্কৃত হইতেছে যাহাতে শ্বেতের এই দাবী টিঁকিতেছে না। ইউরোপীয় সভ্যতার উপর কালার দাবী বেশ জোরের সঙ্গে আসিয়া পড়িতেছে। রোমানগণ সম্পূর্ণ শ্বেত না হইলেও গ্রীক্-রোমান-সভ্যতা শ্বেত সভ্যতা, কিন্তু ইহার পশ্চাতে কালার দান রহিয়াছে, অস্বীকার করিলে চলিবে না। আমরা এখন আর মিশর, বেবিলোন, আসিরিয়ার শিক্ষা ও সভ্যতা উড়াইয়া দিতে পারি না, কেননা, তাহা হইলে গ্রীকসভ্যতার গোড়া পাওয়া যাইবে না। শ্বেত কালার ধনেই ধনী; কালা আগে, শ্বেত পরে আসিয়াছে। এই ভারতীয় সভ্যতার কথাই বিচার করিয়া দেখা যাক্। আর্য্যগণ সাদা, কিন্তু ভারতের আর্য্যপূর্ব্ব অধিবাসী দ্রাবিড়গণ কালা। দ্রাবিড়গণের নিকট হইতে বহু রত্ন গ্রহণ করিয়া হিন্দু-আর্য্য (Hindu Aryan) সভ্যতার পত্তন ও পুষ্টি হইয়াছিল। শিবলিঙ্গ-পূজা দ্রাবিড়-গণের, আর্য্যগণ তাহা গ্রহণ করেন। পুনর্জ্জন্মবাদের সম্বন্ধেও বোধ হয় এ কথা বেশ জোর করিয়া বলা যায় যে আর্য্যগণ এই তত্ত্ব ভারতে আসিয়াই লাভ করিয়াছেন, দ্রাবিড় সংস্পর্শে। অন্য কোনও আর্য্য শাখায় এই মতের অসদ্ভাব—ইহার একটা প্রমাণরূপে উপস্থিত করা যাইতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞান জিনিষটি কি আর্য্যগণের না দ্রাবিড়গণের? অন্ততঃ অদ্বৈততত্ত্বটি আর্য্যেতর বস্তু বলিয়াই মনে হয়—আর্য্যের চিন্তা বহুর দিকে গতিবিশিষ্ট। ইউরোপের যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এক-নিষ্ঠ, তিনি আর্য্য

---

* সাদা—White, কালা—Coloured, উপজাতি—Caste জাতি—Race মহাজাতি—Nation

নহেন, ইহুদীবংশোৎপন্ন স্পিনোজা তো সে দিনের কথা। কিন্তু বহুপূর্ব্বে যখন ইউরোপীয় আর্য্যগণ একনিষ্ঠ ইহুদীজাতির নিকট হইতে ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তখনও তাহার একনিষ্ঠতা গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। ইহুদীর একেশ্বরকে তিন খণ্ড করিয়া তবে তাঁহাদের মনঃপূত হইয়াছিল।* ভারতেও যিনি অদ্বৈতবাদের সর্ব্বপ্রধান পাণ্ডা তিনিও আর্য্যবংশোৎপন্ন নহেন, দ্রাবিড়বংশসম্ভূত নাম্বুরী ব্রাহ্মণ। আরও একটা কারণে মনে হয় যে আর্য্যগণ দেশীয়দিগের নিকট হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথম প্রথম ক্ষত্রিয়গণের নিকট হইতেই ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। আর্য্য-দ্রাবিড়-মিশ্রণের ইতিহাসে এই কথাটার বেশ মীমাংসা পাওয়া যায়। প্রথমতঃ দ্রাবিড়রাজন্যবর্গই আর্য্যবিভাগ অনুসারে ক্ষত্রিয়রূপে আর্য্য-গণীর ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং এটা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যে, এই দ্রাবিড় ক্ষত্রিয়গণের নিকট হইতে অথবা তাঁহাদিগের দ্বারা প্রভাবিত আর্য্য-ক্ষত্রিয়গণের সংস্পর্শে দেবযাজী ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রথম শিক্ষা পাইয়াছিলেন। যে জাতির মধ্যে আচার্য্য শঙ্করের জন্ম, সেই জাতির পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট হইতে আর্য্যগণ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, এ কথা স্বীকার করিলে আর্য্যের কোনও রূপ গৌরবের হানি হইবে বলিয়া মনে হয় না। কেবল শ্বেত চর্ম্মের অহমিকাটা পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই বর্ণের অহঙ্কারের দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে। কালার কাছে সাদা বহু শিখিয়াছে, এখনও শিখিতেছে। সে দিনও জাপান কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে নহে, কিন্তু সন্ধিপত্রেও ভূপাতিত শত্রুকে কেমন করিয়া আলিঙ্গন করিতে হয় তাহা শ্বেতজাতিদিগকে শিক্ষা দিয়াছে। জগতকে শিখাইবার দিন কালার যায় নাই। চীন পার্লামেণ্ট স্থাপন করিয়া কালার কলঙ্ক দূর করিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কালা নিগ্রো যে উন্নতি দেখাইয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া কে আর বলিতে সাহস করিবে যে শরীরের রংয়ের মধ্যে ভগবান শ্রেষ্ঠতার একটি ছাপ দিয়া রাখিয়াছেন। জাতি লইয়া গর্ব্ব করিবার দিনের অবসান হইয়াছে।

কর্জ্জনরাজের বঙ্গমেধযজ্ঞের সর্ব্বপ্রথম হোতা রিজলী সাহেব যে বাঙ্গালীর প্রতি সম্ভ্রমের ভাব পোষণ করিবেন তাহা আমরা আশা করিতে পারি না। তিনি বলিয়াছেন বাঙ্গালী মঙ্গোল-মিশ্র দ্রাবিড় জাতি, এখানে সেখানে দু'এক কোঁটা আর্য্যরক্ত থাকিলেও থাকিতে পারে। ইহা লিখিয়া তিনি মনে করিয়াছেন, বাঙ্গালীকে

* "The reason for the majority being in favour of the three persons of the God-head at the Council of Nice may be easily accounted for. More than nine-tenths of the Christians of that age were gentile converts, to whom the idea of a plurality of gods was most familiar and acceptable."—Rammohan Roy.

খুব এক ঘা দিবেন। কিন্তু তিনি, প্রথমতঃ, ভুলিয়া গিয়াছেন বাঙ্গালী ও ইংরাজ শারীর বিদ্যার দিক হইতে এক পর্য্যায়ভুক্ত।—গোলশীর্ষ (meso-cephalic)। দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গালী কেন, পৃথিবীর কোন সভ্য জাতিই দ্রাবিড় মঙ্গোলমিশ্র হওয়াটাকে অপমানজনক মনে করিতে পারে না। শঙ্করাচার্য্য যে জাতিতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই জাতির সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে যিনি নারাজ তিনি জঙ্গলে যাইয়া বাস করিতে পারেন। অন্য দিকে আবার চীন জাপান যে জাতির অন্তর্ভূত সেই মঙ্গোলজাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা-সূত্রে আবদ্ধ হওয়াটাকে কে অপমানজনক মনে করিবে? জাপানের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য জগতের সভ্যজাতিদের মধ্যে একটা মহা হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায় নাই কি? তবে মিশ্রজাতি বলিয়া একটা আশঙ্কা হইতে পারে। কিন্তু সে আশঙ্কার কোন কারণ নাই। মিশ্রণে জাতির উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে।* বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত জাতি সুসভ্য বলিয়া পরিগণিত—ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মান—সকলেই মিশ্রজাতি। ইহুদীরা পর্য্যন্ত মিশ্রজাতি বলিয়া ধরা পড়িয়াছে। ফরাসী অতি মিশ্র মহাজাতি। অন্যূন ষাট বিভিন্ন জাতি এই মহাজাতি-সংঘটনে উপাদান সরবরাহ করিয়াছে। ভিজিগৎ, ভ্যান্ডাল, বেলজিয়ান্, হেলভেসিয়ান্, ফ্রাঙ্ক, ইহুদী প্রভৃতি বিপরীত ভাবাপন্ন জাতি সকলের রক্ত একত্র মিশ্রিত হইয়া ফরাসী মহাজাতির গঠন হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে জগতের শীর্ষস্থানস্থিত মহাজাতি সকলের সঙ্গে একাসনে স্থান পাইবার পথে ফরাসী কোনই বাধা অনুভব করে নাই। তারপর, যে আর্য্য আর্য্য করিয়া জগৎ এতকাল পাগল হইয়া ছুটিয়াছিল সেই আর্য্যজাতি ও আর্য্যসভ্যতাকে পণ্ডিতগণ কবি-কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিবার যোগাড়ে আছেন,—"The Aryan race and aryan civilisation are a simple invention." আমরা এতদূর স্বীকার না করিলেও এটা বেশ প্রমাণ হইতেছে যে আর্য্যজাতি অমিশ্র জাতি নহে এবং আর্য্য-সভ্যতা কোথাও নিরপেক্ষ স্বাধীন সভ্যতা নহে। আসল কথা এই বর্ত্তমান সময়ে জাতীয় একতা রক্তের একতা নহে, আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার একতা। সম্প্রতি পারিস সহরে একটি ভোজে অভ্যাগতগণ লাটিন জাতির একতা বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছিলেন। একজন নরদেহ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত সেখানে বসিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, যাঁহারা আপনাদের মধ্যে রক্তের একতা লইয়া গর্ব্ব করিতেছিলেন, তাঁহারা রক্তের হিসাবে কেহ বা লম্বশীর্ষ—যে পর্য্যায়ভুক্ত নিগ্রো; কেহ বা হ্রস্বশীর্ষ—যে পর্য্যায়ভুক্ত বাহ্মিজ; কেহ বা গোলশীর্ষ—যে পর্য্যায়ভুক্ত বাঙ্গালী। বাস্তবিক মানুষ এ পর্য্যন্ত জাতিবিচারে শরীরটাকে অত্যন্ত উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছে। কিন্তু মানুষ

* "The fecundity of the descendants of the Monguls is superior to that of men and women of the same colour."—*The Human Race* by Figuir.

কেবলমাত্র শরীর নহে বা শরীরই মানুষের সর্ব্বপ্রধান সম্পদ নহে,—"man doth not live by bread alone." মানুষের যে শরীর অপেক্ষাও উচ্চতর সম্পদ আছে, যে সম্পদ ভগবান সাদা কালা নির্ব্বিশেষে সকলেরই মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন এই কথা ভুলিয়া মানুষ আমি আর্য্য আমি ইহুদী, বলিয়া জগতে অনেক অনর্থ ঘটাইয়াছে, কিন্তু বুঝি শুভদিন আসিয়াছে, এখন সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে মহাজাতির অর্থ রক্তের সম্বন্ধ নহে, কিন্তু উদ্দেশ্য, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের একতা। যাঁহারা এক আদর্শ লইয়া একপথে ছুটিয়াছেন, তাঁহারাই একজাতি। শরীরের দিক ছাড়িয়া দিয়া আত্মার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বিবাদ মিটিয়া যায়। এই কথা মনে রাখিলে হিন্দু মুসলমান লইয়া এক মহাজাতি-সংগঠনের পথ হইতে বহু বাধা তিরোহিত হইয়া যাইবে।

শ্রীঅরবিন্দনাথ চৌধুরী।

লজ্জা

নীতিবেত্তা চাণক্য পণ্ডিত লজ্জাকে নারীর ভূষণ বলিয়াছেন। বাস্তবিকই বুঝি নারীর ইহা অপেক্ষা সুন্দরতর ভূষণ আর নাই। লজ্জায় স্ত্রীলোকের শোভা বহুপরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করে, তাই স্ত্রীযন্ত্রণা-প্রপীড়িতা রমণীর মনোজ্ঞ চিত্র কবিকুলের চিরপ্রিয় বস্তু, ও তাহা চিত্রিত করিবার অবসর পাইলে আর তাঁহারা ছাড়িতে পারেন না। সে সকল চিত্রগুলিও এত সুন্দর হয় যে আমরা সহজেই তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পড়ি। কিন্তু ভারতবর্ষের কবিকুল লজ্জা-নম্র রমণীর চিত্র যত ভাল বাসেন ইউরোপীয় কবিরা যেন ততটা ভাল বাসেন না, রমণীর লজ্জার আদর সভ্যসমাজমাত্রেই আছে, অথবা ইহা বলিলে আরও সত্য হয় যে মনুষ্যসমাজমাত্রেই আছে, কিন্তু ভারতবর্ষে যতটা আছে, ততটা অন্য কোনও দেশে নাই বলিলে অন্যায় হইবে না। কবি কালিদাসের এক একটা "লজ্জার" চিত্র এক এক খানি অনুপম রত্নের মত মনোরম; দেখিয়া মনে হয় স্ত্রীলোকের লজ্জা বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ; তাঁহার দৃষ্টি এই সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ও নিপুণ। শুধু কুমারসম্ভবেই তিনি ব্রীড়াময়ী গৌরীর কতগুলি সুন্দর ছবি তুলিয়াছেন তাহা দেখিলেই এ কথা বেশ বুঝা যাইবে।

বিধৃতা শৈলসুতাপি ভাব-
মৈঃ স্ফুরদ্বাস কদম্বকৈঃ।
সাচীকৃতা চারুতরেণ তস্থৌ
মুখেন পর্য্যন্তবিলোচনেন॥

তৃতীয় সর্গ।

নবপরিণয়লজ্জাভূষণাং তত্র গৌরীং
বদনমপহরন্তীং তৎকৃতাক্ষেপমীশঃ।
অপি শয়ন সখীভ্যো দত্তবাচং কথঞ্চিৎ
প্রমথমুখবিকারৈর্হাসয়ামাস মূঢ়ম্॥

সপ্তম সর্গ।

কবিবর বঙ্কিমচন্দ্রও স্ত্রীলোকের লজ্জার বড় মনোহর চিত্র আঁকিয়াছেন; দলনী

বেণুমের ও কুন্দনন্দিনীর লজ্জিতাবস্থার চিত্রগুলি এত মর্ম্মস্পর্শী যে তাহা একবার পড়িলে হৃদয়ে একেবারে মুদ্রিত হইয়া যায়।

হৃদয়ে লজ্জার উদয় অনেক কারণে হয় বটে, কিন্তু প্রণয়ের লজ্জাই সর্ব্বাপেক্ষা মনোহারিণী, এবং কবিগণ এই লজ্জারই সমাদর করিয়া থাকেন। লজ্জা পুরুষের হৃদয়েও আছে, বিশেষতঃ প্রণয়ে; কিন্তু লজ্জা স্ত্রীজাতিতে যত মধুর পুরুষে তত নহে, এবং স্ত্রীলোকেরা ইহা দ্বারা যতদূর অভিভূত হন, পুরুষ ততটা নয়। মৌন সম্মিলনে এই সুন্দর ভাবের উদয় বড়ই স্বাভাবিক ও সুন্দর।

তয়োঃ সমাপত্তিষু কাতরাপি
কিঞ্চিৎ ব্যবস্থাপিত সাধ্বসানি।
স্ত্রীসুলভাং তৎক্ষণমাত্মভব-
মনোজ্ঞ লোলানি বিলোকনানি॥

কুমারসম্ভব—৭ম সর্গ।

লজ্জার আকর্ষণী শক্তি প্রণয়ের প্রধান অবলম্বন, হৃদয়ের কঠিন বন্ধন। প্রণয়রূপ কোমল কুসুম নির্লজ্জতা-বিদ্যুতের তীব্র দীপ্তিতে ঝলসিয়া যায়, শুকাইয়া যায়। রমণীর রূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কিন্তু সেইরূপ যদি লজ্জার সাদ্ধ্যরাগে স্নিগ্ধ না হয় তাহা হইলে তাহা দ্বারা ইন্দ্রিয়মাত্র স্পৃষ্ট হইতে পারে, হৃদয় স্পৃষ্ট হয় না। অনেক সময় ইন্দ্রিয়ও তেমন রূপের বশীভূত হইতে চাহে না, সে আকর্ষণের পরিবর্ত্তে প্রত্যাহার-প্রবৃত্তির সৃষ্টি করিয়া নিজের অস্তিত্ব বিকল করে। লজ্জাসঙ্কুচিতা উর্ব্বশী পুরুরবার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল, লজ্জা-বিরহিতা রূপসর্ব্বস্বা উর্ব্বশী অর্জ্জুনের ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই। এ শুধু কাব্যের কথা নহে, ইহা বৈজ্ঞানিক পরিজ্ঞাত সত্য। Havelock Ellis লিখিয়াছেন:—"Modesty which may be provisionally defined as an almost instinctive fear prompting to concealment and usually centering around the sexual processes, while common to both sexes is more peculiarly feminine, so that it may almost be regarded as the chief secondary sexual character of women on the psychical side. The woman who is lacking in this kind of fear is lacking also in sexual attractiveness to the normal and average man."* সেক্ষপীয়রও বলিয়াছেন যে স্ত্রীলোকের সঙ্কোচ তাহার নির্লজ্জতা অপেক্ষা বেশী ভয়ানক (dangerous.)।

তাই আমাদের সাহিত্যে লজ্জানম্র নববধূর এত আদর, মুখরার বা নির্লজ্জার প্রণয়প্রাপ্তির আশা এত সুদূরপরাহত। এহেন লজ্জার উৎপত্তি লইয়া আমরা বড় গোলে পড়িয়াছি। সভ্যসমাজে লজ্জা এত আত্মীয়স্বরূপ, এত সহজ হইয়া পড়িয়াছে যে ইহা যে কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট বা অনির্দ্দিষ্ট সময়ে মনুষ্যের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, মনুষ্যসৃষ্টির সমসাময়িক নহে এ কথা ভাবিতেও যেন আমাদের একটু কষ্ট বোধ হয়। গগনের ললাটে সন্ধ্যার রক্তিমরাগ যেমন নিত্যদৃষ্ট প্রত্যক্ষীকৃত

* Psychology of Sex—Modesty.

স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য রমণীর মুখে চক্ষে লজ্জার আরক্তিম আভা তেমনি আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক ও স্বতঃবিকশিত বলিয়া বোধ হয়। কবির অনুরাগরঞ্জিত বর্ণোজ্জ্বল চিত্রে সংসারের প্রাত্যহিক ঘটনার মধ্যে লজ্জা আমাদের এত পরিচিত, এত পুরাতন সখী যে তাহাকে আমরা অনাদিকালাগত ঈশ্বরদত্ত গুণ বলিয়া মনে করিতে শিখিয়াছি। লজ্জা অবশ্য ঈশ্বরসৃষ্ট গুণ, চণ্ডী কহিয়াছেন

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা।"

তবে লজ্জা কি মনুষ্য-সৃষ্টির সহিত মনুষ্য-হৃদয়ের মহীয়সী শোভাস্বরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই? লজ্জা এখন মানুষের সহজাত সংস্কার, কিন্তু এমন সময় কি ছিল যখন মনুষ্য লজ্জা কি তাহা জানিত না? এমন সময় কি ছিল যখন যুবতীর হৃদয়ে অর্দ্ধপ্রকাশের অর্দ্ধগোপনের ইচ্ছা ছিল না, যুবতীর মুখে লজ্জার লোহিতাভা স্ফুটিত না, তাহার চক্ষু দর্শনোৎসুক্যসত্ত্বেও সঙ্কুচিত হইত না? এমন দিন কি ছিল যে প্রণয়ীকে প্রণয়িনীর হৃদয় বুঝিবার জন্য ব্যস্ত হইতে হইত না, অর্দ্ধব্যক্ত অর্দ্ধসুকায়িত প্রণয়ব্যক্তির চিহ্নগুলির প্রতি তাহাকে দৃষ্টি রাখিতে হইত না, তাহাকে ভাবিতে হইত না

অভিমুখে ময়ি সংহৃতমীক্ষিতম্
হসিতমন্যনিমিত্তকথোদয়ম্।
বিনয়বারিত বৃত্তিরতস্তয়া
ন বিগতো মদনো ন চ সংবৃতঃ॥

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্—২য় অঙ্ক।

এই প্রশ্নের মীমাংসা বড় কৌতূহলজনক। এ বিষয়ে দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকগণের মতামত অনুসন্ধান করিবার পূর্ব্বে মহাভারতের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হইতেছে। কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলের শকুন্তলা ও মহাভারতের শকুন্তলা দুইয়ে কত প্রভেদ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলেই এ সম্বন্ধে একটা ধারণা করিবার বেশ সুবিধা হইবে। দুষ্মন্তের সময় স্ত্রীজাতির লজ্জা আজকালকার মত পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না, তখনও লজ্জার অস্তিত্ব ছিল না তাহা নহে, কিন্তু তখন স্ত্রীজাতি পুরুষ সম্বন্ধে অনেকটা আত্মপ্রকাশক্ষম ছিলেন তখন শকুন্তলাকে আত্মপ্রকাশের জন্য কোনও ছল করিতে হয় নাই।

দর্ভাঙ্কুরেণ চরণঃ ক্ষত ইত্যকাণ্ডে
তন্বী স্থিতা কতিচিদেব পদানি গত্বা।
আসীদ্বিবৃত্তবদনা চ বিমোচয়ন্তী
শাখাসু বল্কলমসক্তমপি দ্রুমাণাম্॥

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্—২য় অঙ্ক।

কালিদাসের শকুন্তলা এই লজ্জাভিনয়ে দুষ্মন্তকে যেমন আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, মহাভারতের শকুন্তলা তেমন কিছুই করেন নাই, তিনি দুষ্মন্তের কাছে আত্মপ্রশংসা শুনিয়া 'লজ্জাং নাটয়তি' করেন নাই, সহজ ভাবে বলিয়াছিলেন যে "আচ্ছা, আমার পিতা আসুন, তিনি আমাকে তোমায় সমর্পণ করিবেন।" দুষ্মন্ত যখন তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া গান্ধর্ব্ব বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, তখন তিনি বলিলেন যে "বেশ, যদি আমার আত্মসমর্পণের ক্ষমতা থাকে তবে প্রতিজ্ঞা কর যে আমার ছেলেকে রাজা করিবে,

তাহা হইলেই আমি আত্মসমর্পণ করিতেছি।" এই মিলন সংঘটন করিবার জন্য তাঁহাকে প্রিয়ম্বদা বা অনসূয়ার সাহায্য লইতে হয় নাই, মনের কথা প্রকাশ না করিয়া অনর্থ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই; এ শকুন্তলা ব্রীড়াসঙ্কুচিতা, প্রণয়মুগ্ধা, মনোহারিণী, আত্মনির্ভরহীনা সুন্দরী নহে, কালিদাসের শকুন্তলার মত এ শকুন্তলা নিজের কথা নিজে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হয় নাই, নিজের জন্ম বিবরণ নিজে বিবৃত করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই, এ সকল কার্য্যের জন্য তাহার সখীর প্রয়োজন হয় নাই। লজ্জাবতী, মৌনস্মিত-শালিনী অব্যক্ত-ব্যথাধারিণী নায়িকা,—এই কালিদাসের শকুন্তলার পরিচয়। দুষ্প্রতেজস্বিনী অথচ বিনয়নম্রা, আত্মপ্রকাশে অসঙ্কোচসামর্থ্যশালিনী যুবতী—এই মহাভারতের শকুন্তলার বিশেষত্ব। দুষ্মন্তের শকুন্তলালাভ মহাভারতে যেমন ভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে আমাদের কল্পনাশক্তি আদৌ উত্তেজিত হয় না, বরঞ্চ আমরা সে ব্যাপারটাকে একটু নীরস, কবিত্ব-বিরহিত (prosaic) বলিয়া মনে করি। ইহাতে কবির শকুন্তলার সলজ্জ আত্মাবরণের ইচ্ছা ফুটিয়া উঠে নাই, ইহাতে কালিদাসের দুষ্মন্তের মত দুষ্মন্তকে কল্পনার সাহায্যে প্রণয়িনীর মন বুঝিবার চেষ্টা করিতে হয় নাই, তাহার প্রতি অনুরাগ-ইঙ্গিত, চেষ্টা লক্ষ্য করিয়া তাহার মন বুঝিতে হয় নাই। কালিদাসের শকুন্তলার চিত্রে কবির সুন্দর কৌশল উপলব্ধি করিতে পারা যাইলেও এই দুই চরিত্রের পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে দার্শনিকের ভাবিবার বিষয়ও যে কিছুই নাই তাহা আমরা মনে করিতে পারি না। আমরা এখন দার্শনিকদিগের মতামত জানিবার চেষ্টা করিব।

দার্শনিকদিগের মতে লজ্জা, ব্রীড়া, সংকোচ shame, modesty এবং shyness, একই শ্রেণীর অন্তর্গত, এবং ইহাদিগের উৎপত্তি একই কারণে হইয়া থাকে। অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে লজ্জা মনুষ্যের হৃদয়ে মনুষ্যসৃষ্টির সময় হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহা শিক্ষিত বা পরে উপার্জ্জিত বৃত্তি নহে। *) ডারউইন সে কথা স্বীকার করেন না, তিনি বলেন যে ভগবান মনুষ্য-হৃদয়ে সৃষ্টির সময় হইতেই লজ্জা অর্পণ করিয়াছিলেন তাহা স্বীকার করিলে, অভিব্যক্তিবাদের (Evolution) সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। অতএব তাঁহার মতে মনুষ্য লজ্জা লইয়াই জন্মগ্রহণ করে নাই, লজ্জা তাহাকে শিখিতে হইয়াছে। মহাভারতের শকুন্তলা চরিত্র কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে যেন এই মতের কথঞ্চিৎ পোষকতা প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া বোধ হয়। চণ্ডী বলিয়াছেন যে ঐশীশক্তি একাংশে জীবজগতে লজ্জা-রূপে বিরাজ করিতেছেন, এই উক্তি দ্বারা কি ডারউইনের মত খণ্ডিত হইতেছে? সে কথা ভাবিবার কোনও আবশ্যক নাই, কারণ যখনই যে সদ্‌গুণ বা সদ্‌বৃত্তি মনুষ্য-

* Sir C. Bell Bengers, quoted by Darwin.

† Expresions of Emotions in Man and Animals.

হৃদয়ে আরোপিত হউক না কেন তাহা ভগবানই আরোপিত করিয়াছেন, এবং সেই সময় হইতেই সেই বৃত্তিরূপে ভগবৎ-শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অতএব পৌরাণিকের সহিত বৈজ্ঞানিকের এতৎসম্বন্ধে কোনও বিরোধ কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। হ্যাভেলক এলিস্‌ও ডারউইনের মতাবলম্বী, তিনিও বলেন যে নানা কারণ বশতঃ মানুষের হৃদয়ে লজ্জার উৎপত্তি হইয়াছে। কোনও দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক যে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন যে মনুষ্যসৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে লজ্জার সৃষ্টি হয় নাই, তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না; কারণ আমরা দেখিতে পাই যে অসভ্য সমাজে, এমন কি পশুপক্ষীর মধ্যেও কোনও না কোনও আকারে লজ্জার অস্তিত্ব আছে। হ্যাভেলক এলিস তদীয় গ্রন্থে বহু অসভ্য সমাজের মধ্যে ব্রীড়ার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং তাঁহার মতে পশুদিগের মধ্যেও modesty (ব্রীড়া) দেখিতে পাওয়া যায়। পশুহৃদয়ে লজ্জা আছে, এ কথা অনেকে স্বীকার করেন না—Darwin বলিয়াছেন যে লজ্জাজনিত রক্তিমাভাধারণ মনুষ্যের অনন্যসাধারণ ভাবাভিব্যক্তির উপায়। মহাকবি কালিদাস পশুহৃদয়ে লজ্জার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তিনি লিখিয়াছেন—

লজ্জা তিরশ্চাং যদি চেতসি স্যা-
দশংসয়ং পর্ব্বতরাজপুত্র্যাঃ।
হং কেশপাশং প্রসমীক্ষ্য কুর্য্যু-
র্বালপ্রিয়ত্বং শিখিনঃ চমর্য্যঃ॥

কুমারসম্ভব—১ম সর্গ।

ডারউইনের মতে পশুদিগের লজ্জা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই তাহা কেবল মানুষেরই আছে, তাহাদের হৃদয়ে লজ্জা আছে কি না তাহা জানিবার বিশেষ কোন উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু পশুদিগের কার্য্য-কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিলে অনেক সময় মনে হয় যে তাহাদের মধ্যেও লজ্জার অভাব নাই, অন্ততঃ যৌনসম্মিলন সম্বন্ধে সামান্য পরিমাণে লজ্জাশীলতা তাহাদেরও আছে। It is on the sexual factor of modesty existing in a well-marked form even in animals that coquetry is founded." * অতএব অন্ততঃ স্ত্রীপুরুষ মিলন জন্য যে লজ্জা তাহা আদিম মনুষ্য-দম্পতী সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পায় নাই, এ কথা জোর করিয়া বলা একটু শক্ত। তবে সামাজিক লজ্জার পরিপুষ্টি ক্রমশঃ হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করিতে কোনও বাধা নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মানুষ সমাজে যাহা শিক্ষা করে, পশুগণ সেই মনুষ্যসমাজে আসিয়া সেই লজ্জাটুকু হারাইয়া ফেলে।

যাহা হৌক এখন লজ্জার উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদিগের মতের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

* Psychology of Sexes.—Modesty

* Havelock Ellis—Psychology of Sex.

crime—to shame from breach of the laws of etiquette—to modesty from humility—to modesty from an indelicacy—depends in all cases on the same principle; this principle being the sensitive regard for the opinion, more particularly for the depreciation of others, primarily in relation to our personal appearance, specially of our faces; and secondly through the force of association and habit in relation to the opinion of others on our conduct" *

অতএব তাঁহার মতে নিজের শরীর সম্বন্ধে বিশেষতঃ নিজের মুখের সম্বন্ধে পরের মতামত বিশেষতঃ নিন্দার সম্ভাবনার উপর বেশী মনোযোগ হওয়াই লজ্জোৎপত্তির প্রধান কারণ, পরে সেই অভ্যাস নিজের চরিত্র সম্বন্ধে পরের মতামতের উপর দৃষ্টিতেও প্রসৃত হইয়াছে। তিনি বলেন যে যদি কেহ অন্য কাহারও কোনও অঙ্গের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তবে সেযোক্ত ব্যক্তির মনে লজ্জার উদয় হয়। স্ত্রীলোকের মনেই এমনি লজ্জা বেশী আসে। লজ্জা যে এ কারণে উদ্ভূত হয় তাহা আমরা বেশ জানি। লজ্জার বিশেষজ্ঞ কবি কালিদাসও তাহা জানিতেন, তাই কুমার-সম্ভবের তৃতীয় সর্গে উমার লজ্জোৎপত্তির হেতু তিনি এইভাবে দেখাইয়াছেন—

"হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্যঃ
চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।
উমামুখে পক্কবিম্বাধরোষ্ঠে
ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি॥

কালিদাস সখীদের সমক্ষে রূপের অপমানেও পার্ব্বতীর হৃদয়ে লজ্জার বৃদ্ধির কথা বলিয়াছেন। এই চিত্রগুলি হইতে ডারউইনের মত যথার্থ বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে।

হ্যাভেলক এলিস্ বলিতেছেন—"That modesty, like all the closely allied emotions, is based on fear, one of the most primitive of the emotions, seems to be fairly evident. The association of modesty and fear is even a very ancient observation, and is found in the fragments of Epicharmas, while according to one of the most recent definitions; modesty is "the timidity of the body." Modesty is indeed the agglomeration of fears one of much earlier than human origin and supplied solely by the female, the other more distinctly human character and of social rather than sexual origin."

ইহার মতে ভয়ই লজ্জার উৎপাদক। Darwinএর মতের সহিত এ মতের বিশেষ কোন বিরোধ নাই, কারণ পরমতাপেক্ষিতা অনেকটা আশঙ্কার সহিত জড়িত। কে কি বলিবে সর্ব্বদা এই চিন্তার দ্বারা মনের একটা সশঙ্কিত অবস্থা উপস্থিত হয়, সেই সশঙ্কিত অবস্থাই ইঁহাদের মতে লজ্জার জন্মদাতা। এ ভয় প্রধান—যৌনসম্মিলন-

* Expressions of Emotions in Man and Animals.

সঞ্জাত, দ্বিতীয় সামাজিক কারণে সঞ্জাত। মাডাম সেলিক রেনুজ নাম্নী জনৈক পণ্ডিতা বলেন যে ব্রীড়া প্রধানতঃ পুরুষের বৃত্তি, ইহা কৃত্রিম উপায়ে স্ত্রীলোকে সঞ্চারিত করা হইয়াছে। "Modesty is masculine, shame attributed to women for two reasons; first because man believes that woman is subject to the same laws as himself; secondly because the course of human evolution has reversed the psychology of sexes, attributing to women the psychological results of masculine sexuality."

এখন পুরুষের লজ্জা অনেক পরিমাণে স্ত্রীলোকের অপেক্ষা কম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, তাহার কারণ প্রধানতঃ এই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে স্ত্রীজাতিকে বাল্যাবস্থা হইতেই লজ্জা শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই শিক্ষার ফলে অল্প সময়েই, বালিকাও লজ্জা করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। পুরুষের কাছে লোকলজ্জার তত প্রত্যাশা রাখে না, কিন্তু স্ত্রীলোকের কাছে সর্ব্বদাই তাহার প্রত্যাশা করে। যেখানে সামাজিকতা উন্নতিলাভ করিয়াছে, সেখানে তো কথাই নাই অসভ্য সমাজেও লোকে স্ত্রীজাতিকে নির্লজ্জা দেখিতে ভালবাসে না। লজ্জা যে স্ত্রীজাতির প্রধান শোভা এখন তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত, সভ্যাসভ্য সকল সমাজেই স্বীকৃত। লজ্জার দ্বারা মনুষ্যসমাজের যে অদ্ভুত উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। লজ্জা দ্বারা প্রণয়ের সূক্ষ্ম বিভেদ ও বৃত্তিগুলি পরিপুষ্ট হইয়া জগতে মনুষ্যজাতিকে কবিত্বশক্তিসম্পন্ন করিয়াছে, এবং বিবাহাদি সুপ্রথার প্রচলন দ্বারা নানা উপায়ে মনুষ্য-জাতিকে উন্নত অবস্থায় আনয়ন করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

Groos বলিয়াছেন যে স্ত্রীলোকের ব্রীড়ানম্র ব্যবহার না থাকিলে পুরুষের নিজ সদ্‌গুণ দ্বারা সেই সঙ্কোচ জয় করিবার প্রবৃত্তি আসিত না, এবং তাহা না-আসিলে মনুষ্যের উচ্চতমবৃত্তি যে প্রণয় তাহার মাহাত্ম্যপ্রকাশক প্রীতি কখনও কর্দ্দমক গীতও হইত না। অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে স্ত্রীলোকদের উপর জোর করিয়া সতীত্বরক্ষার ভার অর্পণ করাই লজ্জার উৎপত্তির কারণ। চার্লস লেটুর্ণ বলেন— "Modesty is par excellence a human sentiment and is totally unknown to the animals, although the procreative need inspires them with desires and passions essentially identical with what in man we call love; it is therefore certainly an artificial sentiment, and comparative ethnology proves that it must have resulted from the enforced chastity imposed on to women under the most terrible penalties"*

এই মতের সপক্ষে মহাভারতোক্ত দীর্ঘতমা ও উদ্দালক-পুত্র শ্বেতকেতুর উপাখ্যানের

* The Evolution of Marriage, 56.

উল্লেখ করা যাইতে পারে। পুরাকালে যখন স্ত্রীলোকেরা অনাবৃত ছিল তখন যে তাহাদের লজ্জা এখনকার মত পুষ্ট প্রাপ্ত হয় নাই, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। উদ্ভালকের পুত্রের মনে নিজ জননীর ব্যবহারে যে ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছিল তাহাই বিবাহপ্রথার প্রবর্ত্তক হইয়াছিল ইহাই পৌরাণিক উপাখ্যান। শ্বেতকেতু যখন নিজের ঘৃণা রমণীগণের মনে সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছিলেন তখনই তাহাদের মনে লজ্জার বীজ বপন করা হইয়াছিল, কারণ ইহা যে লজ্জা জন্মিবার অন্যতম কারণ তাহা বৈজ্ঞানিকেরাও স্বীকার করিয়া থাকেন। "But I am more convinced than ever that the fear of causing disgust—a fear quite distinct from that of losing a sexual lure or breaking a social etiquette—plays a very large part in the modesty of the more modest sex and in modesty generally." *

আমরা এতক্ষণ যাহা বলিয়াছি ও যে বৈজ্ঞানিকদিগের মত উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতে বেশ বুঝা যাইবে যে লজ্জার জন্মের দুইটী কারণ আছে, একটী অনাদিকালাগত, এবং অপরটী সামাজিকতা-প্রসূত। প্রথম কারণে শিক্ষার অভাবেও আত্মগোপনের প্রবৃত্তি আসে, এবং ইহাকেই আমরা যথার্থ লজ্জা বলিতে পারি। দ্বিতীয় কারণে যে চিত্তবৃত্তির উদ্ভব হয় তাহাকে আমরা ব্রীড়া অথবা সামাজিক লজ্জা বলি, ইহাকেই ইংরাজীতে modesty বলে। ইংরাজীতে যাহাকে shyness বলে তাহাকে আমরা সঙ্কোচ বলিতে পারি। তিনটী বৃত্তিই কিন্তু লজ্জারই অন্তর্গত, কেবল অবস্থা ভেদে নামান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র। নানা সমাজে নানা কারণে লজ্জার উৎপত্তি হয়। সামাজিক লজ্জার জন্মবৈচিত্র্য বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। বিলাতী সমাজে উন্মুক্ত-চরণ প্রদর্শন বড়ই লজ্জাজনক, কিন্তু মুখ না ঢাকিলেও চলে, আমাদের সমাজে মুখই ঢাকিবার বস্তু, চরণ সর্ব্বদাই অনাবৃত থাকে, অবশ্য ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে যে স্ত্রীজাতির সম্বন্ধেই এই কথা বলা হইতেছে। বৈজ্ঞানিকেরাও বলিয়াছেন যে মুখই লজ্জা ব্যক্ত হইবার প্রধান অঙ্গ, এবং এই কারণে জগতের, অন্ততঃ সভ্যজগতের সর্ব্বত্রই মুখের আবরণ ব্যবহার করার পদ্ধতি আছে। তাঁহাদের মতে বিবাহপ্রথা প্রচলিত হইবার পর হইতেই মুখাচ্ছাদন বস্ত্র (veil) ব্যবহার করার সূত্রপাত হইয়াছে। আমাদের দেশে veilএর পরিবর্ত্তে অবগুণ্ঠন ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। "This concealment of the face is more than a convention, it has a psychological basis." * মুখ ঢাকিতে পারিলেই অনেক পরিমাণে লজ্জার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, এই বিশ্বাস মনস্তত্ত্বের একটী বিচিত্র সমস্যা। মুখঢাকার সম্বন্ধে ডারউইন যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা জানিবার যোগ্য;—"It is however probable that primeval man before he had acquired much moral sensitiveness

* Havelock Ellis—Psychology of Sex.

would have been highly sensitive about his personal appearance, at least in reference to the other sex and he would consequently have felt distress at any dispreciatory remarks about his appearance, and this is our form of shame. And on the face is the part of the body which is most regarded, it is intelligible that any one ashamed of his personal appearance would desire to conceal this part of his body. The habit having been thus acquired would naturally be carried on when shame from strictly moral causes was felt: and it is not easy otherwise to see why under these circumstances there should be a desire to hide the face more than any other part of the body."

মুখের বা শরীরের অন্য কোনও অংশের আবরণ বস্ত্র দ্বারাই সাধারণতঃ হইবার সুবিধা হয়, তাই লজ্জার সম্বন্ধে বস্ত্রের এত আদর, কিন্তু যথার্থতঃ বস্ত্রের সঙ্গে লজ্জার কোনও বিশেষ সম্পর্ক নাই। যাঁহারা মূর্ত্তে বা জীবন্ত আদর্শ লইয়া চিত্র অঙ্কিত করেন, তাঁহারা বলিয়াছেন যে যাবৎ মনে কুভাব না আসে তাবৎ বিবস্ত্রা স্ত্রী আদর্শদিগের মনে লজ্জার উৎপত্তি সম্ভব নহে, হয়ও না। Dr. Maurice তাঁহার Trilby নামক পুস্তকে এই তথ্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন। চক্ষু নিমীলিত করা, হস্ত বা মুখস দিয়া মুখাবরণ এ সকল কার্য্য দ্বারাও লজ্জা তিরোহিত হয় তা। বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পর্য্যটকদিগের বিবরণ হইতে ইহাও জানা যায় যে অনেক বিবস্ত্র অসভ্য জাতির মধ্যেও লজ্জা বেশ স্পষ্টভাবে বিদ্যমান্ আছে। তাই হ্যাভেলক এলিস বলিয়াছেন—"That is the reason why nakedness in itself has nothing to do with modesty or immodesty; it is the condition under which the nakedness occurs which determine whether or not modesty will be roused."

নিজের প্রতি পরের দৃষ্টি পড়িলেই লজ্জার উদ্রেক হয়, এই কারণে লজ্জার অবস্থায় মানুষের সকল কার্য্য আত্মগোপনমূলক। লজ্জা যে কারণেই জন্মাক, প্রথমেই তদ্দ্বারা মনুষ্যজাতি একরূপ শারীরিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়ে, মাথা নামিয়া আসে, চক্ষু নিমীলিত হয়, মুখ বাঁকাইবার ইচ্ছা হয়। "The state of shame consists in a certain psychic lameness or inhibition sometimes accompanied by physical phenomena of paralysis such as sinking of the head, and inability to meet the eye. In shame there is always something present in consciousness which conflicts with the rest of the personality and cannot be brought into harmony with it, which can-

not be brought that is into moral (not logical) relationship with it."

এই অবস্থা এবং সাহিত্যদর্পণকার কথিত মুগ্ধার অনুরাগেঙ্গিত প্রায় একই প্রকার।

দৃষ্টা দর্শয়তি ব্রীড়াং সম্মুখং নৈব পশ্যতি।
প্রচ্ছন্নং বা ভ্রমন্তং বা তির্য্যক্ তং পশ্যতি প্রিয়ং॥

বহুধা পৃচ্ছ্যমানাপি মন্দমন্দমধোমুখী।
সগদ্গদ স্বরং কিঞ্চিৎ প্রিয়ং প্রায়েণ ভাষতে॥
অন্যৈঃ প্রবর্ত্তিতাং শশ্বৎ সাবধানা চ তৎকথাম্।
শৃণোত্যন্যত্র দত্তাক্ষী প্রিয়ে বালানুরাগিণী॥

তাই কবি বলিয়াছেন—

হস্তং কম্পয়তে রুণদ্ধি রসনা-ব্যাপার লোলাঙ্গুলীঃ,
ঘৌ হন্তৌ নয়তি স্তনাবরণতামালিঙ্গ্যমানা বলাৎ।
পাতুং পক্ষ্মলসনেত্রমুন্নমতঃ সাচীকরোত্যাননম্
বাঞ্ছেনাপাভিলাষপূরণসুখং নির্ব্বর্ত্তয়ত্যেব মে॥
মালবিকাগ্নিমিত্রম্

Darwin লজ্জিতাবস্থার পরিচয় দিবার উপলক্ষে এই সকল ইঙ্গিত ও চেষ্টার কথাই বলিয়াছেন—"Under a keen sense of shame there is a strong desire for concealment, we turn away the body, more especially the face, which we endeavour in some manner to hide. An ashamed person can hardly endure to meet the gaze of those present, so that he almost invariably casts down his eyes or looks askant"

লজ্জাজনিত চেষ্টা বা অঙ্গভঙ্গির পূর্ব্বেও লজ্জার প্রথম বিকাশ মুখে প্রকাশিত হয়। লজ্জায় মুখ আরক্তিম হইয়া উঠে ইহা কাহারও অবিদিত নাই এবং তদ্দ্বারা মুখের শোভা দ্বিগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়—তাই কবি কালিদাস উমার লজ্জিতাবস্থা বর্ণনকালে বলিয়াছেন,

সাচীকৃতা চারুতরেণ তস্থৌ
মুখেন পর্য্যন্ত বিলোচনেন॥

লজ্জাবতীর অথবা সাধারণতঃ লজ্জাগ্রস্তের মুখের এই সুন্দর এবং স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনকে ইংরাজীতে blushing বলে। "Blushing" সম্বন্ধে Darwin কহিয়াছেন —Blushing is the most peculiar and the most human of all expressions." ইহা কেবল মানুষেই আছে, অন্য কোনও পশুতে নাই। মনে লজ্জার উদয় হইলে সঙ্গে সঙ্গে মুখে রক্তের প্রবল উৎক্ষেপ হওয়ায় মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করে, সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি অন্যান্য অঙ্গও রক্তিমাভা ধারণ করে, ইহারই নাম blushing. কবি কালিদাস এই জন্যই লজ্জারঞ্জিতবদনা ইন্দুমতীকে অন্তর্নিবিষ্টপুষ্পাভরণা অশোক লতিকার সহিত তুলনা করিয়াছেন। লজ্জার ইহা একটী বিশেষত্ব, কারণ শরীরের এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন

(*) Hohencenser quoted by Havelock Ellis.

কোনও শারীরিক কার্য্য দ্বারা হয় না, ইহা সম্পূর্ণরূপে মানসিক ক্রিয়াসম্ভূত। লজ্জার এই মানসিক অংশই আমাদিগের পক্ষে বিশেষ লোভনীয়, বিশেষ গৌরবের বিষয়। ইহাতেই প্রেমের পুষ্টি, জগতের সুখবৃদ্ধি এবং প্রেমিকের অসীম আনন্দ। দার্শনিকেরা ও বৈজ্ঞানিকেরা যাহা ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন লজ্জার বিশ্লেষক কবি কালিদাসও তাহাই বলিয়াছেন,

"রমণীয়ঃ খলু নবাঙ্গনানাং
যদন বিষয়াসতারঃ।"

প্রণয়সংক্রান্ত লজ্জাতে, এবং বোধ হয় সাধারণতঃ সকল প্রকার লজ্জাতেই, মানসিক বৃত্তিগুলির বিপর্য্যয় সংঘটিত হয়, শারীরিক বৃত্তিগুলির স্তম্ভের সহিত এই প্রকার মনোবৃত্তিরও কার্য্যে অক্ষমতা উপস্থিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে লজ্জার প্রভাব বড় বেশী। তাই ইহার একটী ফল—কথা কহিতে না পারা। প্রণয়ে এবম্বিধ বাক্‌রোধ বড় সরল ও উপাদেয়; প্রথমসমাগমশঙ্কিতা নববধূর হৃদয়ের সৌন্দর্য্য কথা না কওয়ায় যেন আরও ফুটিয়া পড়ে। আমাদের দেশীয় সাহিত্যে তাই বিয়াট্রিসের মত বা পোরসিয়ার মত মুখরা নায়িকার সম্ভাবনা বা আদর নাই এবং লজ্জিতা নায়িকার সাহচর্য্যার্থ সখীর প্রয়োজন হয়। ভারতবর্ষীয় ললনাগণের চরিত্রে এই আত্মনির্ভরহীনতা এত সুন্দর যে তাহা কবি-চক্ষুর অগোচর থাকিতে পারে না। ভারতবর্ষের নববধূ প্রথমদর্শনে প্রিয়ের কাছে মুখ খুলিয়া বলিতে পারে না—

Thou know'st the mask of night
is on my face;
Else would a maiden blush bepaint
my cheek,
For that which thou hast heard
me speak to-night.

Romeo and Juliet—Act II, Sc. 2.

এমন হওয়া বৈজ্ঞানিকেরা মতে অসম্ভব * কিন্তু সে কথা এখন থাক। এত কথা বলিবার আগে, লজ্জায় ভারতীয় ললনা এত আত্মহারা হইত যে তাহার বচন নিঃসৃত হওয়া দুর্ঘট হইত, সে মর্ম্মের কথা মর্ম্মে রাখিয়া নিজের মধ্যে আপনাকে লুকাইতে চেষ্টা করিত, নচেৎ গৌরীর মত অথবা ইন্দুমতীর মত সখী দ্বারা মনের কথা প্রকাশ করিবার সুবিধা পাইলে প্রকাশ করিত।

"অথ বিস্তরনে গৌরী সন্দিদেশ মিথঃ সখীন্
দাতা যে ভূভৃতাং নাথঃ প্রমাণীক্রিয়তা-
মিতি।
তয়া ব্যাহৃতসন্দেশা সা বভৌ নিভৃতা প্রিয়ে
চূতযষ্টিরিবাভ্যাসে মধৌ পরভৃতোন্মুখী॥

কুমারসম্ভব—৬ষ্ঠ সর্গ।

দৃষ্টাপি সা হ্রীবিনিতা ন সাক্ষাৎ
বাগ্‌ভিঃ সখীনাং প্রিয়মভ্যনন্দৎ।
স্থলী নবাম্ভঃ স্পৃষতাভিবৃষ্টা
ময়ূরকেকাভিরিবাভ্রবৃন্দম্॥

রঘুবংশ—৭ম সর্গ।

আজ যাহার সখী নাই তাহার বোধ হয়
মনে রয়ে গেল মনেরই কথা
শুধু আঁখির জল মরম ব্যথা।

তবু বলি বলি করিয়া বলা হয় না, ধরি ধরি

* Vide Darwin—Emotions.

করিয়া ধরা যায় না, তখনি "লজ্জা বলে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না।" তাই বঙ্গকবির নায়িকা নায়ককে সব সমর্পণ করিতে পারিয়াও লজ্জাটুকু রাখিতে চায়, এবং তাই ভক্তি-শাস্ত্রে ভগবৎপদে লজ্জা সমর্পণই সর্ব্বোচ্চ ও মহামহিমমণ্ডিত আত্মসমর্পণ।

লজ্জা সুন্দর কিন্তু লজ্জার গোপনের ভাব বড় বেশী—

আমার হৃদয় প্রাণ সকলি করেছি দান
কেবল সরম খানি রেখেছি।
চাহিয়া নিজের পানে নিশিদিন সাবধানে
সযতনে আপনারে ঢেকেছি:
থাক্ বঁধু থাক ছেড়ে ওটুকু নিয়ো না কেড়ে
এ সরম দাও মোরে রাখিতে।
সকলের অবশেষ এই টুকু লাজ লেশ
আপনারে আধখানি ঢাকিতে॥

রমণী হৃদয়ের এই একটী অপূর্ব্ব মনোহর ও হৃদয়োন্মাদকর রহস্য, প্রণয়ের ইন্ধনস্বরূপ, কুসুমসুরভি মলয়ানিলের মত এই রহস্য স্ত্রীর স্বাভাবিক মধুরতা আরও বৃদ্ধি করে, হৃদয়ে বসন্তের মত একটা অব্যক্ত যাতনা-রঞ্জিত মধুর আবেশের সৃষ্টি করে, সে ভাব যেন বুঝিতে চাই বুঝিতে পারি না, বুঝাইতে চাই বুঝাইতে পারি না,

বুঝাতে পারিনে যেন সব দিয়ে তবু কেন
সবটুকু লাজ দিয়ে ঢেকেছি।

প্রাণে আকুল আকাঙ্ক্ষা, আত্মসমর্পণের উৎসুক বাসনা, হৃদয়—প্রিয়দর্শনাকাঙ্ক্ষায় লোলুপ হৃদয়—আপনা ভুলিয়া, উন্মদগতিতে আকাঙ্ক্ষিতের, চিরবাঞ্ছিতের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, চলিয়া চলিয়া যখন অভিমত বাসনার কেন্দ্রীভূত প্রিয়তমের কাছে উপস্থিত, ঠিক সেই সময়েই লজ্জা আসিয়া বলে "ছিছি ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না" অমনি সেই বেগবান উন্মাদ হৃদয় "থমকি থেমে যায় পথ মাঝে।" ঐ যে প্রণয়িনী বিরহিণী শকুন্তলা সখীদের সহিত কত পরামর্শ করিতেছে, কেমন করিয়া দুষ্মন্তকে হৃদয়ের কথা জানাইবে, তাহার মন্ত্রণা করিয়া প্রণয়-পত্রিকা রচনা করিতেছে, দেখা হইলে কত কথা কহিবে মনে মনে চিন্তা করিতেছে, যাহার হৃদয়ে আত্মসম্বরণ-শক্তিহারিণী প্রিয়সঙ্গম-কামনা জাগিয়া উঠিয়াছে সেই শকুন্তলার সমক্ষে যখন দুষ্মন্ত সমুদিত, তখন কোথায় তাহার হৃদয়ের মুখরতা, কোথায় তাহার কল্পনাময়ী আত্মপ্রকাশ-শক্তি? কোথা হইতে তাহার মূকতা ও মৌনতা আসিল?

"হৃদয়! তথা উত্তম্ভিষ দানিং ণ
কিম্পি পড়িবজ্জসি।"

কোথা হইতে আত্মপ্রকাশের পরিবর্ত্তে আত্মগোপনের চেষ্টা তাহার সমস্ত অস্তিত্বকে ঘেরিয়া বসিল? স্ত্রী-হৃদয়ের এই সুন্দর সমস্যা এই আধ সুপ্তি, আধ জাগরণ, আধ অন্ধকার, আধ আলোক, অর্দ্ধেক প্রকাশ, অর্দ্ধেক আবরণ রমণী-হৃদয়ের এই নিসর্গ-শালীনতা, কবিগণের মনোরমা প্রণয়িগণের হৃদয়-বন্ধনের সুকঠিন রজ্জু লজ্জা স্ত্রীজাতির প্রধান আভরণ, সব দিয়াও তাহারা এইটুকু ধরিয়া রাখিতে চায়—

শুন বঁধু শুন তবে, সকলি তোমার হবে
কেবল সরম থাকে আমারি।

কিন্তু ইহাতেও তো একটু যেন অহমিকা আছে, একটু নিজের প্রতি দৃষ্টি আছে, নিজের সহিত একটু লুকোচুরি আছে—

মধুর হইলেও এই অহমিকা সর্ব্বগ্রাসিনী, সর্ব্বাপহারিণী ভগবৎভক্তির একটু অন্তরায়, ভগবানের পদে সর্ব্বস্বার্পণ-প্রবৃত্তির প্রত্যবায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। কথায় বলে "লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়"—ভগবান্ ভক্তকে ডাকিয়া বলেন যদি হৃদয়ে ঘৃণা পোষণ করিবে তবে আমার কাছে আসিও না, যদি সংসারের ভয় করিবে তবে আমার প্রাপ্তির আশা করিও না, আর যদি লজ্জায় আত্মগোপন করিতে ইচ্ছা আছে, যদি আমার কাছে আপনাকে সম্পূর্ণ প্রকাশ না করিবে তাহা হইলে আমাকে চাহিও না, যদি ত্যাগ করিতে চাও তো সব ত্যাগ কর, নিজের জন্য কিছুই রাখিও না। লজ্জা ত্যাগে এই আধ্যাত্মিকতায় লজ্জার অস্তিত্বের সার্থকতা, লজ্জার মহত্ত্ব ও গুরুত্বের ইহাই প্রকৃষ্টতম প্রমাণ, এবং এই আধ্যাত্মিক লজ্জাত্যাগেই বৈষ্ণবকবির শ্রীরাধার প্রেমের সর্ব্ববিজয়িনী শক্তি প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীঅতেন্দ্রলাল বসু।

মানবের জন্মকথা

মানুষের অনুকরণবৃত্তি প্রবল, বিশেষতঃ অসভ্যগণের এই বৃত্তি অধিক প্রবল, ইহা আমি নিজেই দেখিয়াছি। মস্তিষ্কের কোন কোন পীড়া হইলে এই বৃত্তি অত্যন্ত অধিক বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অর্দ্ধশিরঃশূল পীড়ায়, মস্তিষ্ক স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা নরম হইতে আরম্ভ হইলে, কোন কোন রোগী নিজের ভাষার অথবা অন্য ভাষার শব্দ কেহ উচ্চারণ করিলে অজ্ঞাতসারে তাহা অনুকরণ করে, এবং তাহার সম্মুখে কেহ কোনরূপ অঙ্গভঙ্গী করিলেও তদ্রূপ ভঙ্গী করে। ডেসর্ বলিয়াছেন যে বানর অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর কোন জীবই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মানুষের কর্ম্ম অনুকরণ করে না, কিন্তু বানরেরা হাস্যাস্পদ নকলনবিস্, ইহা সকলেই জানেন। ইতর জন্তুগণ সময় সময় পরস্পরের অনুকরণ করিয়া থাকে। দুই জাতীয় নেকড়ে বাঘ কুকুর কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিল, উহারা কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ শব্দ করিতেও শিক্ষা করিয়াছিল; শৃগালও কখন কখন ঐরূপ ঘেউ ঘেউ করিয়া থাকে; কিন্তু এ সকলকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অনুকরণ করা বলা যাইতে পারে কি না সে পৃথক কথা। পক্ষীশাবক পিতামাতার সঙ্গীত-স্বর অনুকরণ করে, কখন কখন অপর পক্ষীরও করে, এবং টিয়াপাখী যে স্বর সর্ব্বদা শুনে তাহার অনুকরণ করিতে সমর্থ হয়, ইহা অনেকেই জানেন। ডুরো ডিলা মালি একটী কুকুরের বর্ণনা করিয়াছেন, উহাকে একটা বিড়ালে পালন করিয়াছিল; বিড়াল যেমন তাহার করতল চাটিয়া চাটিয়া মুখ ও কাণ ভিজায় অথবা ধৌত করে, ঐ কুকুরও তদ্রূপ করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিৎ অডুইন্ ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। আরও অনেকের নিকট হইতে আমি এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। সে সকলের মধ্যে একটী সংবাদ হইতে জানা যায় যে একটী বিড়াল তাহার

বাচ্চাদিগের সহিত একটী কুকুরের ছানাকে প্রতিপালন করিয়াছিল, কিন্তু শুদ্ধ দুগ্ধ খাওয়ায় নাই, তথাপিও ঐ কুকুরছানা উপরের লিখিত অভ্যাসটী অনুকরণ করিয়াছিল এবং যে ১৩ বৎসর কাল জীবিত ছিল, সে কাল ঐরূপ ব্যবহার করিত। ডুরো ডিলা মালির কুকুর একটী বল্ লইয়া খেলা করিত, উহাকে সে আপন পায়ের* তলা দিয়া গড়াইয়া দিত, এবং তৎপর ঐ বলের উপর লাফাইয়া পড়িত, ইহা সে বিড়ালের বাচ্চার নিকট শিখিয়াছিল। একজন আমাকে লিখিয়াছেন যে তাঁহার বাড়ীতে একটী বিড়াল ছিল, সে দুধের পাত্রের মুখ অপ্রশস্ত হইলে মাথা উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দিতে পারিত না, কিন্তু হাত প্রবেশ করিয়া দিত। এই বিড়ালের একটী বাচ্চা অল্পদিন মধ্যেই এই সঙ্কেত শিক্ষা করিয়াছিল, এবং যখন সুবিধা পাইত তখনই ঐ রূপ করিত।

অনেক ইতর জন্তুর পিতামাতা শাবকগণের অনুকরণ-বৃত্তির সাহায্যে, বিশেষতঃ উহাদিগের বংশগত সহজাত বৃত্তির সহায়তায়, উহাদিগকে শিক্ষা দেয়, এরূপ বলা যাইতে পারে। যখন বিড়াল তাহার বাচ্চাদিগের নিকট জীবিত ইন্দুর লইয়া আসে, তখন ইহা দেখা যায়; ডুরো ডিলা মালির যে প্রবন্ধ হইতে আমি উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি ঐ প্রবন্ধে তিনি বাজ পক্ষীর ব্যবহার যেরূপ পর্যবেক্ষণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে বাজ পক্ষী শাবকের নিকট মৃত চড়াই ও ইন্দুর উপর হইতে মাটিতে ফেলিয়া দেয়; উহা ঐ শাবক ধরিতে পারে না; তৎপর জীবিত পক্ষী আনিয়া শাবকের সম্মুখে ছাড়িয়া দেয়; এই রূপে উহাকে ধরিবার কৌশল এবং দূরত্ব বোধ শিক্ষা দিয়া থাকে।

মানুষের বুদ্ধির উন্নতি সম্বন্ধে মনোযোগ অপেক্ষা অধিক গুরুতর বৃত্তি আর নাই বলিলেই হয়। ইতর জীবগণের মনোযোগ আছে, ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। বিড়াল গর্ত্তের পার্শ্বে বসিয়া লক্ষ্য করিতে থাকে, এবং শিকারের উপর লক্ষ দিয়া পড়িবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করে। এইরূপ চেষ্টায় কখন কখন বন্য জন্তুগণ এমন অনন্যমনস্ক হইয়া পড়ে যে, ঐ সময় সহজেই তাহাদিগের নিকট যাওয়া যায়। এই বৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন বানরের মধ্যে কতদূর বিভিন্ন, তাহার এক কৌতূহলজনক প্রমাণ মিঃ বার্টলেট আমাকে জানাইয়াছেন। এক জন লোক খেলা দেখাইবার নিমিত্ত বানরকে শিক্ষা দিত; সে সাধারণ বানর একটী ৫ পাউণ্ড (৭৫৲ টাকা) মূল্যে জুওলজিকাল সমিতির নিকট হইতে খরিদ করিত। কিন্তু সে যদি কয়েক দিনের জন্য তিন চারিটী বানর রাখিয়া তাহার মধ্যে একটী পছন্দ করিয়া খরিদ করিতে পারে, তাহা হইলে প্রত্যেকটীর জন্য দ্বিগুণ মূল্য দিতেও সম্মত ছিল। যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে এত শীঘ্র সে কেমন করিয়া স্থির করিবে যে কোন বানরটী ভাল খেলিতে শিখিবে, তখন সে উত্তর দিল যে উহার শিক্ষা মনোযোগের উপর নির্ভর করে। যখন সে বানরের সহিত কথা কহে

* অগ্র-পদ।

ও কোন বিষয় বুঝাইয়া দেয়, তখন যদ্যপি দেওয়ালের উপরকার মাছি দেখিয়া কিম্বা তুচ্ছ বস্তু দেখিয়া তাহারমন সহজেই সেই দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, তবে তাহার শিক্ষা সম্বন্ধে আশা করা যায় না। যদি সে অমনোযোগী বানরকে দণ্ড দিয়া শিখাইতে চেষ্টা করে, তবে ঐ বানর বিরক্তভাব ধারণ করে। পক্ষান্তরে, যে বানর তাহার দিকে মনোযোগ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই শিক্ষা দেওয়া যায়।

ইহা বলাই একরূপ নিষ্প্রয়োজন যে ইতর জন্তুগণের স্মরণশক্তি আছে; তাহারা ব্যক্তি ও স্থান স্মরণ রাখিতে পারে। সার এণ্ড্রু স্মিথ আমাকে জানাইয়াছেন যে উত্তমাশা অন্তরীপে একটী বানর নয় মাস পরে তাঁহাকে চিনিয়া আহ্লাদিত হইয়াছিল। আমার একটী কুকুর ছিল, সে অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিতে পারিত না, দেখিলে খারাপ ব্যবহার করিত। আমি ৫ বৎসর ২ দিন পরে তাহার স্মৃতি-শক্তি কিরূপ থাকে তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়াছিলাম। আমি তাহার ঘরের নিকট গিয়া পূর্ব্বের ন্যায় উচ্চৈস্বরে শব্দ করিয়াছিলাম; সে কোন আনন্দের লক্ষণ দেখাইল না, কিন্তু তখনি আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহির হইয়া বেড়াইতে চলিল এবং আমার আদেশ পালন করিতে লাগিল, যেন ঠিক আধ ঘণ্টা মাত্র তাহার সহিত আমার অসাক্ষাৎ। ৫ বৎসর কাল তাহার মনে যে সকল ভাব নিদ্রিত ছিল, এক মুহূর্ত্তে তাহা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল। মিঃ হিউবার স্পষ্ট দেখাইয়াছেন যে পিপীলিকারাও স্বীয় দলের পিপীলিকাদিগকে চারি মাস অদর্শনের পর চিনিতে পারিয়াছিল। একটী ঘটনা পুনঃ পুনঃ ঘটিলে ইতর জন্তুরাও তাহার কাল-ব্যবধান কোনও না কোন প্রকারে বুঝিতে পারে। (ক্রমশ)

শ্রীশশধর রায়।

বুদ্ধ-সংবাদ

(৩)

(দীর্ঘনিকায়ের অন্তর্গত পায়াসি সুত্ত হইতে)

পরলোক ও ঔপপাতিক জীব*

কোন সময়ে আয়ুষ্মান্ কুমার-কাশ্যপ কোশল জনপদে মহান্ ভিক্ষুসংঘের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে 'সেতব্যা' নামক নগরে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য শিংশপাবনে বিহরণ করিতেছিলেন। রাজন্ পায়াসিও সেই সময়ে ঐ নগরে বাস করিতেন। ইহার মনে মনে এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইত যে পরলোক নাই, ঔপপাতিক জীব নাই, এবং সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্ম্মের ফল বা বিপাকও নাই।

* ইহার পালি মূল "ওপোপাতিকো সত্তো।" যে সকল জীব পরলোকে মাতা-পিতার বিনা সংসর্গেই উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে ঔপপাতিক সত্ত বলা হইয়া থাকে। উচ্চশ্রেণীর সমস্ত দেবই ঔপপাতিক, তাহারা স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধ বিনাই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

নাগরিকগণ কুমার-কাশ্যপের আগমন-বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইয়া উঠিলেন, কেননা, তাঁহারা জানিতেন যে, কুমার-কাশ্যপ সুপণ্ডিত ও পণ্ডিতোচিত বিবিধগুণসম্পন্ন। তাঁহারা ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন, এবং রাজন্য পায়াসিও তাহা দেখিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন।

ইঁহারা সকলেই শিংশপাবনে সমাগত হইলেন, এবং আয়ুষ্মান্ কুমার-কাশ্যপের সহিত যথোচিত সম্ভাষণাদি করিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর রাজন্য পায়াসি কুমার-কাশ্যপকে বলিলেন—"কাশ্যপ, আমি এই বলি এবং আমার এই মত যে, পরলোক নাই, ঔপপাতিক জীব নাই, এবং সুকৃত ও দুষ্কৃতকর্ম্মের ফল বা বিপাকও নাই।"

'রাজন্য, আমি ত এরূপ মতবাদী ব্যক্তিকে দেখি নাই বা শুনিও নাই। কিরূপে লোকে বলিতে পারে যে, পরলোক নাই, ঔপপাতিক জীব নাই, এবং সুকৃত ও দুষ্কৃতকর্ম্মের ফল বা বিপাকও নাই। ভাল, আপনাকেই আমি প্রশ্ন করিতেছি, আপনি যেরূপ পারেন সেইরূপেই উত্তর প্রদান করুন। হে রাজন্য, আপনি কি মনে করেন, এই যে চন্দ্র ও সূর্য্য, ইহারা কি এই লোকে অথবা পরলোকে রহিয়াছে? তাহারা দেব না মনুষ্য?'

'কাশ্যপ, চন্দ্র-সূর্য্য পরলোকে রহিয়াছে, এ লোকে নহে; এবং তাহারা দেব, মনুষ্য নহে।'

'তাহা হইলে, হে রাজন্য, ইহাতেই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, পরলোক আছে, ঔপপাতিক জীব আছে, এবং সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্ম্মসমূহের ফল বা বিপাকও আছে।'

'পূজনীয় কাশ্যপ, আপনি যাহাই কিছু বলুন না, আমার কিন্তু মনে হইতেছে যে, পরলোক প্রভৃতি নাই।'

'আচ্ছা, আপনি কি এরূপ কোনো কারণ দেখাইতে পারেন, যাহাতে আপনি বলিতে পারেন যে, পরলোক প্রভৃতি নাই?'

'হাঁ পূজনীয় কাশ্যপ, আছে বৈ কি; ঐ কারণেই আমার মনে হয় যে, পরলোক প্রভৃতি নাই।'

'কি কারণ রাজন্য?'

'কাশ্যপ, আমার এরূপ মিত্র, অমাত্য, জ্ঞাতি ও বন্ধুগণ আছেন, যাঁহারা প্রাণাতিপাত করেন, অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন, ব্যভিচার করেন, মিথ্যাকথা বলেন, এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ কার্য্যও করিয়া থাকেন। তাঁহারা যখন ব্যাধিপীড়িত হন, অত্যন্ত কাতর ও আতুর হইয়া পড়েন, এবং আমি বুঝিতে পারি যে, আর ইঁহারা বাঁচিবেন না, তখন আমি তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলি যে,"কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এইরূপ মত প্রকাশ করেন ও বলেন যে, যাহারা প্রাণাতিপাত করে, অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করে, বা ব্যভিচারাদি করিয়া থাকে, তাহারা মরণের পর এই শরীর নষ্ট হইলে নিরয়ে গিয়া উৎপন্ন হয়।" আপনারাও ত প্রাণাতিপাত প্রভৃতি করিয়াছেন, অতএব মৃত্যুর পর আপনারাও নিরয়ে উৎপন্ন হইবেন। বন্ধুগণ, আপনারা যদি (সত্যসত্যই) মৃত্যুর পর নিরয়ে গিয়া উৎপন্ন হন, তাহা হইলে আপনারা আসিয়া আমাকে বলিবেন যে,

পরলোক আছে, ঔপপাতিক জীব আছে, এবং সুকৃত ও দুষ্কৃতকর্ম্মের ফল বা বিপাক আছে। আপনাদের কথায় আমি শ্রদ্ধা করি, বিশ্বাস করি, আপনারা যাহা দেখিয়াছেন, তাহা আমার নিজের দেখাই হইবে।" তাঁহারা "ভাল, তাহাই হইবে" এই বলিয়া আমার কথা স্বীকার করিয়াও এখানে ফিরিয়া আগমন করিয়া আমাকে সে সংবাদ দেন না, এবং কোনো দূতও প্রেরণ করেন না। হে কাশ্যপ, এই কারণেই আমার মনে হয় যে, পরলোকাদি নাই।'

'হে রাজন্ আচ্ছা আপনাকেই আবার আমি প্রশ্ন করিতেছি, আপনি যেরূপ পারেন সেইরূপই ইহার উত্তর প্রদান করুন। আপনার লোক-জনেরা যদি কোন অপরাধী চোরকে আপনার নিকটে আনিয়া দেখাইয়া বলে যে, এই ব্যক্তি চুরি করিয়াছে, আপনি ইহার যথোচিত দণ্ড বিধান করুন, তাহা হইলে আপনি তখন এই আদেশ প্রদান করেন যে, "দৃঢ় রজ্জু দ্বারা ইহার বাহু পশ্চাৎ দিকে অতি শক্তরূপে বন্ধন কর, এবং ক্ষুর দিয়া ইহার মস্তক মুণ্ডিত করিয়া দাও; অনন্তর উচ্চশব্দে বাজনা বাজাইতে বাজাইতে ইহাকে এক পথ হইতে অপর পথে, এবং এক চতুষ্পথ হইতে অপর চতুষ্পথে লইয়া বেড়াও; অবশেষে নগরের দক্ষিণ দ্বার দিয়া ইহাকে বাহির করিয়া দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়া বধ কর।" আপনার লোকেরাও সেই আদেশ "যে আজ্ঞা" বলিয়া গ্রহণ করে এবং তাহাকে সেইরূপে বধ্য ভূমিতে লইয়া গিয়া উপবেশন করায়। হে রাজন্, সেই চোর যদি ঘাতকগণকে বলে যে,"আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, ঐ গ্রামে আমার জ্ঞাতিবন্ধু আত্মীয়-স্বজন আছেন, তাঁহাদিগকে একটু দেখা দিয়া আসিতেছি", তাহা হইলে সেই চোর তক্ষণ অবসর পায়,অথবা বিলাপ করিতে করিতেই তাহাকে ঘাতকগণ বধ করিয়া ফেলে?'

না কাশ্যপ, সে ঘাতকগণের নিকট অবকাশ পায় না; বিলাপ করিতে করিতেই তাহাকে ঘাতকগণ বধ করিয়া ফেলে?'

'রাজন্, সে চোরও মানুষ, এবং ঘাতকগণও মানুষ; কিন্তু তথাপি সে ঘাতকগণের নিকট একটু অবসর পায় না; আর আপনার সেই প্রাণাতিপাত প্রভৃতি দুষ্কৃতকারী জ্ঞাতি-বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনগণ নিরয়ে উৎপন্ন হইয়া নিরয়পালের নিকটে অবকাশ পাইয়া আপনার নিকটে বলিয়া যাইবে যে, পরলোকাদি আছে!'

'আপনি যাহাই বলুন কাশ্যপ, আমার মনে হইতেছে পরলোকাদি নাই!'

'আচ্ছা, যে কারণে আপনার মনে ঐরূপ হয়, তাহা প্রকাশ করুন।'

'আমার এরূপ অনেক জ্ঞাতি-বন্ধু আত্মীয়-স্বজন আছেন, যাঁহারা কখনো প্রাণাতিপাত প্রভৃতি দুষ্কৃতকার্য্য করেন না। তাঁহারা যখন অত্যন্ত পীড়িত হন, এবং আমি জানিতে পারি যে, আর তাঁহাদের জীবনের আশা নাই, তখন আমি তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলি যে, "আপনারা ত কখন প্রাণাতিপাত প্রভৃতি দুষ্কৃতকার্য্য করেন নাই, অতএব সেই শ্রমণ ব্রাহ্মণগণের বাক্য যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আপনারা

সুগতি স্বর্গলোকে জন্ম গ্রহণ করিবেন। আপনারা যদি সেই স্বর্গলোকে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমাকে আসিয়া বলিবেন যে, পরলোক প্রভৃতি আছে। আপনাদের কথায় আমি শ্রদ্ধা করি, প্রত্যয় করি, আপনারা যাহা দেখিবেন, তাহা আমার নিজেরই দেখা হইবে।" তাঁহারা আমার কথা স্বীকারও করেন, কিন্তু তাঁহারা আসিয়া বলেন না, বা দূতও প্রেরণ করেন না। এই কারণে আমার মনে হয় যে, পরলোক প্রভৃতি নাই।'

'ভাল, এ বিষয়ে আপনার নিকটে একটি উপমা প্রদর্শন করিব। মনে করুন, কোন ব্যক্তি মলকূপের মধ্যে পতিত হইয়াছে, আর আপনি নিজের কোনো ভৃত্যকে আদেশ করিলেন যে, তাহাকে ঐ মলকূপ হইতে উঠাইয়া তাহার গাত্র হইতে মল-সমূহ অপনীত করিয়া দাও। ভৃত্য তাহা করিলে আবার আপনি তাহাকে আদেশ করিলেন যে, ইহার শরীরে তিনবার সাদা মাটি লেপিয়া, তৈলাভ্যঙ্গ করিয়া সুগন্ধচূর্ণ দ্বারা গাত্র-মার্জ্জন করিয়া বেশ ভাল করিয়া ধুইয়া আন, এবং তাহার পর ইহাকে মহার্ঘ্য মাল্য, মহার্ঘ্য বিলেপন ও মহার্ঘ্য বস্ত্র পরিধান করাও। তাহাকে এইরূপ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া প্রাসাদের উপরে লইয়া যাও, এবং পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপভোগ্য উপভোগ-সামগ্রী প্রদান কর। এখন সেই পূর্ব্বোক্ত কূপ পতিত পুরুষ প্রাসাদের উপরে গিয়া এবং তাদৃশ উপভোগ-সামগ্রী লাভ করিয়া পুনর্ব্বার সেই মলকূপে নিমগ্ন হইবার জন্য আসিতে ইচ্ছা করে কি?'

'না কাশ্যপ, সে আসিতে ইচ্ছা করে না।'

'কি জন্য?'

'কেননা মলকূপ অশুচি, দুর্গন্ধ, ঘৃণাস্পদ ও প্রতিকূল।'

'হে রাজন্, দেবগণের পক্ষে মনুষ্য সহ এইরূপই অশুচি, দুর্গন্ধ, ঘৃণাস্পদ ও প্রতিকূল। অতএব আপনার সেই জ্ঞাতি-বন্ধু আত্মীয়স্বজনগণ কি সেখান হইতে আগমন করিয়া আপনাকে বলিতে পারেন যে, পরলোকাদি নাই? অতএব আপনি মনে স্থির করুন যে পরলোকাদি আছে।'

'কাশ্যপ আপনি যাহা কিছু বলুন না, আমার মনে হইতেছে যে, পরলোকাদি নাই।'

'তাহার কারণ কি?'

'এই কারণ যে, প্রাণাতিপাত প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত আমার জ্ঞাতিবন্ধু আত্মীয়-স্বজনেরা যখন জীবনান্তকর পীড়ায় গুরুতর ভাবে পীড়িত হন, তখন আমি তাঁহাদিগকে গিয়া বলি যে,"কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন যে, প্রাণাতিপাত প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পর ত্রয়স্ত্রিংশ ("তাবতিংস")-নামক দেবগণের স্বর্গে উৎপন্ন হইয়া তাঁহাদের সহচর হন। ঐ শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের কথা সত্য হইলে আপনারাও সেইরূপ হইবেন। যদি আপনারা সত্য সত্যই ঐরূপ হন, তাহা হইলে আপনারা আসিয়া আমাকে বলিবেন যে, পরলোকাদি আছে। আপনাদের কথায় আমি শ্রদ্ধা করি, আপনারা দেখিলে আমার নিজে দেখাই হইবে।" তাঁহারা আমার কথা স্বীকার করেন, কিন্তু কৈ তাঁহারা নিজেও

আসেন না, বা দূতও প্রেরণ করেন না। অতএব জানিতেছি পরলোকাদি নাই।'

'ভাল রাজন্য, আপনাকেই আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি যেরূপ পারেন উত্তর প্রদান করুন—মনুষ্যগণের একশত বৎসরে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের এক অহোরাত্র হয়, এতাদৃশ ত্রিংশৎ অহোরাত্রে তাঁহাদের এক মাস, এইরূপ দ্বাদশমাসে এক সংবৎসর, এবং এতাদৃশ দিব্য সহস্র বৎসর ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের আয়ু। আপনার যে সকল জ্ঞাতি-বন্ধু ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের স্বর্গে উৎপন্ন হইয়া তাঁহাদের সহচর হইয়াছেন, হে রাজন্য, আপনার সেই সমস্ত জ্ঞাতিবন্ধুর মনে যদি এইরূপ হয় যে, আমরা দুই বা তিন অহোরাত্র এখানে দিব্য উপভোগ-সামগ্রী ভোগ করিয়া বিহরণ করি, তাহার পর গিয়া রাজন্য পায়াসিকে এই সংবাদ প্রদান করিব," তাহা হইলে কি তাঁহারা আপনাকে ঐ সংবাদ প্রদান করিতে পারেন?'

'না কাশ্যপ, তাহা তাঁহারা পারেন না। কেননা, আমরা তাহার বহুপূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইব। কিন্তু কাশ্যপ, আপনাকে কে বলিল যে, ত্রয়স্ত্রিংশনামক দেবগণ আছেন, এবং তাঁহাদের আয়ু এই প্রকার দীর্ঘ? আপনার কথায় ত কেবল বিশ্বাস করিতে পারি না যে, ঐ দেবগণ আছেন এবং তাঁহারা এতই দীর্ঘায়ু?'

'রাজন্য, যে ব্যক্তি জন্মান্ধ, সে শুক্ল, কৃষ্ণ, নীল, পীত, লোহিত, কোনো রূপই দেখিতে পায় না, সে সম-বিষম স্থানও দেখিতে পায় না, এবং চন্দ্র-সূর্য্যকেও দেখিতে পায় না। এখন সেই জন্মান্ধ যদি এইরূপ বলে যে, "শুক্ল প্রভৃতি রূপ নাই, সম-বিষম স্থান নাই, এবং চন্দ্র-সূর্য্যও নাই; আবার শুক্ল প্রভৃতি রূপের, সম-বিষম স্থানের, এবং চন্দ্র-সূর্য্যের দ্রষ্টাও কেহ নাই; কেননা, আমি জানিতেও পারিতেছি না, দেখিতেও পাইতেছি না।" তাহা হইলে সেই জন্মান্ধের এই কথা কি সমীচিনরূপে বলা হয়?'

'না কাশ্যপ; কেননা শুক্ল প্রভৃতি রূপও আছে, সম-বিষম স্থান ও আছে, এবং চন্দ্র-সূর্য্যও আছে; আবার তাহাদের দ্রষ্টা পুরুষও আছে। সেই জন্মান্ধ যদি বলে যে, "আমি ইহা জানিতাম না, আমি ইহা দেখিতেছি না, অতএব ইহা নাই," তাহা হইলে সে সমীচিন কথা বলে না।'

'হে রাজন্য, প্রকৃত সম্বন্ধেও এইরূপ। আপনি যে আমাকে বলিতেছেন যে "কে আপনাকে বলিল যে ত্রয়স্ত্রিংশনামক দেবগণ আছেন এবং তাঁহাদের আয়ু এতদূর দীর্ঘ? কেবল আপনার কথায় ত আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না যে, ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ আছেন এবং তাঁহারা এইরূপ দীর্ঘায়ু?" ইহাতে আপনি জন্মান্ধেরই ন্যায় প্রতিভাত হইয়াছেন।

'হে রাজন্য, আপনি যেরূপ মনে করিতেছেন সেইরূপ এই মাংসচক্ষুর দ্বারা পরলোক দেখিতে পাওয়া যায় না। যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অরণ্যের নিভৃত বনযুক্ত সমতল ভূমি বা প্রান্তদেশ অথবা অপর কোন বাসস্থান আশ্রয় করিয়া অপ্রমত্ত

হইয়া উৎসাহী হইয়া সংযতচিত্তে বিহার করিতে করিতে দিব্য চক্ষু বিশোধিত করেন, তাঁহারা সেই অতিমানুষ বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা এইলোক ও পরলোককে দেখিতে পান, * এবং ঔপপাতিক জীবকে দেখিয়া থাকেন। আপনি যেরূপ মনে করিয়াছেন সেরূপ এই মাংস-চক্ষুর দ্বারা পরলোক দেখা যায় না। অতএব আপনি মনে স্থির করুন যে, পরলোকাদি আছে।'

'মাননীয় কাশ্যপ, আপনি যাহা কিছু বলুন না, আমার কিন্তু মনে হইতেছে যে পরলোকাদি নাই।'

'ভাল, কারণ উল্লেখ করুন।'

'কাশ্যপ, আমি এখানে দেখিতে পাই যে, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শীলবান্ এবং কল্যাণধর্ম্ম আচরণ করেন, তাঁহারাও ইচ্ছা করেন যে, আমরা বাঁচিয়া থাকি, তাঁহারা মরিতে চাহেন না; তাঁহারা সুখ ইচ্ছা করেন, এবং দুঃখকে প্রতিকূল ভাবেন। ইঁহাদিগকে এইরূপ দেখিয়া আমার মনে হয় যে, এই শীলবান্ ও কল্যাণধর্ম্মী শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ যদি জানিয়া থাকেন যে, "এ স্থান হইতে মৃত হইলে আমাদের শ্রেয় হইবে," তাহা হইলে ত তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গেই বিষপান করিবেন, বা শস্ত্র আহরণ করিবেন, বা উদ্বন্ধন করিবেন, অথবা উচ্চস্থান হইতে পতিত হইবেন। কিন্তু যেহেতু তাঁহারা (সত্যসত্যই) জানেন না যে, "এখান হইতে মৃত হইলে আমাদের শ্রেয় হইবে" সেই জন্যই তাঁহারা বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন, মরিতে ইচ্ছা করেন না; সুখ ইচ্ছা করেন, এবং দুঃখকে প্রতিকূল বলিয়া মনে করেন। কাশ্যপ, ইহাও একটি কারণ, যাহাতে আমার মনে হয় যে পরলোকাদি নাই।'

'আচ্ছা; হে ব্রাহ্মণ, এস্থলে আমি একটি উপমা প্রদর্শন করিব। পূর্ব্বে কোন এক ব্রাহ্মণের দুইটি স্ত্রী ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একটির এক পুত্র উৎপন্ন হয়। এই পুত্রটি যখন দশবর্ষীয় বা দ্বাদশবর্ষীয় হয় তখন দ্বিতীয় স্ত্রী গর্ভবতী হন এবং সেই সময়েই ব্রাহ্মণ পরলোক গমন করেন। অনন্তর সেই বালক মাতার সপত্নীর নিকট গমন করিয়া বলিল যে, 'এই ধনধান্য রজত কাঞ্চন প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই আমার, আপনার ইহাতে কিছু নাই, পিতার পর আমিই উত্তরাধিকারী, অতএব তৎসমুদয় প্রদান করুন।" ব্রাহ্মণী বলিলেন "বৎস, আমার প্রসব পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, যদি আমার পুত্র হয় তবে সেও এক অংশ পাইবে, আর যদি কন্যা হয় তবে তোমার তাহাকেও ভোজনাদি দিতে হইবে।" * বালক ইহাতে নিবৃত্ত না হইয়া দুইবার তিনবার ঐ কথা বলিলে ব্রাহ্মণী ধনলোভে মনে করিলেন যে 'গর্ভ বিদীর্ণ করিয়া দেখি যে পুত্র বা কন্যা হইয়াছে।" অনন্তর তিনি সত্যসত্যই শস্ত্র গ্রহণ করিয়া গর্ভগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক উদর বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন, এবং এইরূপে নিজের জীবন, গর্ভ ও ধন সমস্তই বিনষ্ট

* এখানে পাঠভেদ আছে :—(১) ইমস্মেব লোকং পস্সন্তি পরমেব;" (২) "ইমস্মেব লোকং পস্সন্তি পরঞ্চ।"

* মূলপাঠ "ওপভোগগা" অথবা "উপভোগগা।"

করিলেন। সেই মূর্খ ব্রাহ্মণী অবিচার পূর্ব্বক উত্তরাধিকার পাইবার ইচ্ছা করিয়া যেমন অনীতিবশত বিপত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল, আপনিও সেইরূপ অবিবেচনা পূর্ব্বক পরলোকের অন্বেষণ করিতে গিয়া মূর্খের ন্যায় বিপদ্‌গ্রস্ত হইবেন। হে রাজন্, শীলবান্ ও কল্যাণধর্ম্মাচারী শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ অপরকে পরিপক্ক করেন না, যাহাতে তাহা পরিপক্ক হইতে পারে তজ্জন্য পণ্ডিতেরা কালের অপেক্ষা করিয়া থাকেন। শীলবান্ কল্যাণধর্ম্মাচারী শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের জীবনের প্রয়োজন আছে। তাঁহারা যত দীর্ঘকাল অবস্থান করিতে পারেন, ততই অধিক পুণ্য উৎপাদন করিতে পারেন। তাঁহারা লোকানুকম্পা হেতু বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, দেব ও মনুষ্যগণের প্রয়োজনের জন্য, হিত ও সুখের জন্য নিজের জীবন যাপন করেন। এই কারণেও আপনি জানুন যে পরলোকাদি আছে।'

'কাশ্যপ, আপনি যাহাই বলুন না, কিন্তু আমার মনে হইতেছে পরলোকাদি নাই।'

'কারণ উল্লেখ করুন।'

'কাশ্যপ, আমার লোকেরা কোন অপরাধী চোরকে আনয়ন পূর্ব্বক দেখাইয়া বলে যে, "এই ব্যক্তি অপরাধী, চোর; ইহার যথোচিত দণ্ডবিধান করুন।" তখন আমি তাহাদিগকে এইরূপ বলি যে, জীবনাবস্থাতেই ইহাকে একটি বৃহৎপাত্রে (কুম্ভী=কুণ্ড=কুঁড়া) প্রবিষ্ট করাইয়া সেই পাত্রের মুখ আচ্ছাদিত করিয়া দাও। অনন্তর আর্দ্র চর্ম্ম দ্বারা ঐ পাত্র আবদ্ধ করিয়া তাহাতে বহুবার আর্দ্র মৃত্তিকার লেপ প্রদান কর এবং তাহার পর চুল্লীর উপর উঠাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান কর।" তাহারা আমার আদেশে সেইরূপই করিয়া থাকে, এবং যখন আমরা মনে করি যে, ঐ মানুষটির মৃত্যু হইয়াছে, তখন তাহার জীবকে দেখিবার ইচ্ছায় চুল্লী হইতে নামাইয়া ও মৃত্তিকার লেপাদি অপনয়ন করিয়া ধীরে ধীরে ঐ পাত্রের মুখটি অপাবৃত করি, এবং সাবধানে অবলোকন করিয়া থাকি; কিন্তু কৈ তাহার জীবকে ত নির্গত হইতে দেখি না। এই জন্যও আমার মনে হয় যে, পরলোকাদি নাই।'

'আচ্ছা, তাহা হইলে আপনাকেই এখানে প্রশ্ন করিতেছি; আপনি যেরূপ পারেন, উত্তর করুন। আপনি কি কখন দিবসে নিদ্রিত হইয়া স্বপ্নে উদ্যান, বা বন, বা পুষ্করিণী, অথবা পৃথিবীর রমণীয়তা সন্দর্শন করিয়াছেন?'

'হাঁ কাশ্যপ, করিয়াছি।'

'ভাল, সেই সময়ে কি আপনাকে কুব্জ-বামন-কুমারিকা প্রভৃতি রক্ষা করিয়া থাকে?

'হাঁ, সেই সময়ে তাহারা আমাকে রক্ষা করিয়া থাকে।'

'আচ্ছা, তাহারা কি তখন আপনার জীবকে প্রবিষ্ট বা নির্গত হইতে দেখিয়াছে?'

'না কাশ্যপ।'

'হে রাজন্, সেই সময় ত আপনিও

জীবিত থাকেন, এবং তাহারাও জীবিত থাকে; কিন্তু তথাপি যখন তাহারা আপনার জীবকে প্রবিষ্ট বা নির্গত হইতে দেখিতে পায় না, তখন আপনি মৃত ব্যক্তির জীবকে প্রবিষ্ট ও নির্গত হইতে দেখিবেন? অতএব অবগত হউন যে, পরলোকাদি আছে।' (ক্রমশ)

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

মান্দ্রাজী খানসামা

মান্দ্রাজের সুবিখ্যাত 'ডন্‌বার, হিলিংডন এণ্ড কোং' নামক সদাগর কোম্পানীর সিনিয়ার পার্টনার মিঃ ডন্‌বার বহু অনুসন্ধানে যে সর্দ্দার খানসামাটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার নাম মিণ্ডয়েল। মিণ্ডয়েল ডন্‌বার পরিবারের দাসদাসীগণের উপর সর্দ্দারী করিত। মিণ্ডয়েল খানসামা-সমাজের 'মণ্ডল' ছিল; বড় বড় সাহেবদের সকল খানসামাই তাহার উপদেশে চলিত, বিপদে তাহার নিকট সাহায্য পাইত, আনন্দে উৎসবে তাহাকেই তাহাদের দলপতি করিত। খানসামা-সমাজে তাহার মান-সম্ভ্রমের সীমা ছিল না। বাজারের দোকানদার মাত্রেই মিণ্ডয়েলের খাতির করিত।

মান্দ্রাজের মাউণ্ট রোড সন্নিহিত তেনাম্‌পেট্ পল্লীতে মিণ্ডয়েলের বাড়ী। তাহার সাংসারিক অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল; সে লোকজনকে টাকাকড়ি ধার দিত। বাজারের নিকট তাহার কয়েকখানি দোকানঘর ছিল, তাহা ভাড়া দিয়াও সে অনেক টাকা পাইত।

মিণ্ডয়েলের আকৃতি ও পরিচ্ছদ সাধারণ মান্দ্রাজী খানসামাদিগের অপেক্ষা অধিক জমকালো। তাহার কালো গোল মুখে ভাঁটার মত চক্ষু দুটি অতি উজ্জ্বল। দাড়িগোঁফ কামানো, সম্মুখের দাঁতগুলি উঁচু, মুখে বসন্তের দাগ, মাথায় প্রকাণ্ড সাদা পাগড়ি, তাহাতে পাখার কাজ; মিণ্ডয়েলের মত সুকৌশলে আর কোনও খানসামা পাগড়ী বাঁধিতে পারিত না, এমন কি, তাহার মনিবপত্নী মিসেস্ ডন্‌বার পর্য্যন্ত তাহার পাগড়ীর 'তারিফ' করিতেন।

দীর্ঘকাল ডন্‌বার পরিবারে চাকরী করিয়া মিণ্ডয়েল তাঁহাদের যথেষ্ট বিশ্বাস-ভাজন হইয়াছিল, মনিব যাহাতে কোনও রূপে ক্ষতিগ্রস্ত না হন সে দিকে তাহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল; কিন্তু তাহার দুই একটি চরিত্রগত দুর্ব্বলতাও ছিল। তন্মধ্যে লড়াইয়ের জন্য 'মোরগ' পোষা একটি।

আমাদের দেশে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে পূর্ব্বে 'বুলবুল' পোষা একটা রোগ ছিল। এখনও কলিকাতা অঞ্চলের অনেক মুসলমান খানসামার হাতে 'বুলবুলে'র খাঁচা দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নশ্রেণীর মান্দ্রাজীরা বুলবুলের পরিবর্ত্তে মোরগ পোষে, বাজি রাখিয়া 'মোরগে'র লড়াই বাধায়। লড়াইয়ে যাহার মোরগ জয় লাভ করে, সমাজে তাহার বড় মান। মান্দ্রাজ অঞ্চলের অনেক বড় বড় সাহেবের

খানসামার লড়াইয়ে মোরগ আছে; মিগুয়েলেরও ছিল।

মেম সাহেব অর্থাৎ মিসেস্ ডন্‌বার মুরগীর লড়াইয়ের উপর বড় পররাগী ছিলেন; তিনি মিগুয়েলকে একাধিক বার বলিয়াছিলেন, যদি সে লড়াইয়ের জন্য মোরগ পোষে, তবে তিনি তাহাকে দূর করিয়া দিবেন, কিন্তু মিগুয়েল তাহার বাতিক ছাড়িতে পারিল না। মিঃ ডন্‌বারের কুঠীর এক ধারে খানসামাদিগের বাসের জন্য কতকগুলি চালা নির্দ্দিষ্ট ছিল, মিগুয়েল তাহার মোরগ সেখানে লুকাইয়া রাখিত, মেম সাহেব 'হাওয়া খাইতে' বাহির হইলে সে তাহাকে বাজারে বা অন্য কোন খানসামার আড্ডায় লইয়া গিয়া লড়াই বাধাইত। মিঃ ডন্‌বারের হাতার মধ্যে মোরগের লড়াই অনেকদিন পূর্ব্বে বন্ধ হইয়াছিল।

মিসেস্ ডনবার একটু কৃপণ ছিলেন; এ দিন তিনি বাজারে বাহির হইয়া এক স্থানে দেখিলেন কতকগুলি সুন্দর সুন্দর 'সেকেন্‌হ্যাণ্ড' চেয়ার নিলামের জন্য সজ্জিত আছে। তিনি মিগুয়েলকে কয়েকখানি চেয়ার দেখাইয়া তাহা নির্দ্দিষ্ট দিনে নিলামে কিনিবার জন্য তাহাকে আদেশ করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তিনি বা তাঁহার স্বামী নিলাম ডাকিলে জিনিসগুলির দর বাড়িয়া যাইবে, কিন্তু খানসামা অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে তাহা কিনিতে পারিবে।

নিলামের দিন প্রভাতে মিসেস্ ডন্‌বার মিগুয়েলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু তাহাকে কুঠিতে পাওয়া গেল না। তিনি পুনঃ পুনঃ ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "বট্‌লার কোথায়?" কিন্তু কেহ তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিল না। অন্যান্য খানসামারা জানিত মিগুয়েল বাজারে গিয়াছে, কিন্তু সে তখন পর্য্যন্ত বাজার হইতে ফিরিয়া আসে নাই, এ কথা মেম-সাহেবের নিকট প্রকাশ করিতে তাহাদের সাহস হইল না। কারণ বাবুর্চ্চি ও বট্‌লার বাজারে গিয়া বিলম্ব করিলে মেম সাহেবের মেজাজ বড় গরম হইয়া উঠিত; এবং মিগুয়েল মেম সাহেবের নিকট গালি খাইলে সে দিন মিগুয়েল অন্যান্য খান-সামাকে নিগৃহীত করিতে ছাড়িত না।

মিসেস্ ডন্‌বার অধীর ভাবে বলিলেন "সে কোথায় গেল, তাহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা কর্।"

কিচেন অর্থাৎ পাকশালার প্রান্তে মিগুয়েলের বাসগৃহ; সেখানে সে সস্ত্রীক বাস করিত। দুই তিন জন খানসামা মিগুয়েলের স্ত্রীর নিকট ছুটিল। এবং তাহাকে তাহার স্বামীর সন্ধান জিজ্ঞাসা করিল। স্বামী তখন পর্য্যন্ত বাজার হইতে আসে নাই, এ কথা বলিতে তাহারও সাহস হইল না। সে বলিল, "আমার মা এইমাত্র কহিল, আমার স্বামী তাহাকে দেখিতে গিয়াছে!"

মিসেস্ ডন্‌বার বিরক্তি ভরে বলিলেন "রাস্কেল!"। মিগুয়েল সেই মুহূর্ত্তে উপস্থিত থাকিলে হয় ত তাঁহার নয়নবহ্নিতে ভস্মীভূত হইত। অন্যান্য ভৃত্যেরা বুঝিল আজ সর্দ্দারের ভাগ্যে বিস্তর লাঞ্ছনা আছে।

মিঃ ডন্‌বার ঠিক সেই সময়ে আফিসে বাহির হইতেছিলেন তাঁহাকে দেখিয়া মেম

সাহেব বাঁশির মত সুরে বলিলেন, "That idiot Miggle has forgotton all about the auction to-day. Will you look in at the room and, if he is not there, do your best to secure those chairs. I have set my heart upon them."

মিঃ ডনবার বারান্দা হইতে নামিতে নামিতে বলিলেন, "Very well, my dear."

মিঃ ডন্‌বার আফিসে হাজিরা দিয়া মেম সাহেবের হুকুম তামিল করিতে চলিলেন; নিলাম স্থলে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, অনেক দেশীয় লোক নিলাম ডাকিতে আসিয়াছে, তাহাদের জন্য দুই চারি জন ফিরিঙ্গীও আছে। তিনি ভিন্ন ইউরোপীয়ান আর একজনও নাই। দেশীয় লোকগুলির গা-খোলা, মাথায় পাগড়ীও নাই, তাহাদের সকলেরই মাথা কামানো, মধ্যস্থলে চুল টিকির গোছা। মিঃ ডন্‌বার কোন দিকে তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্যকে দেখিতে পাইলেন না। বস্তুতঃ কোনও সাহেবের খানসামাকেই তিনি সেখানে উপস্থিত দেখিলেন না। সাদাকোটধারী শুভ্রপাগড়ী-পরিহিত ভৃত্য একজনও নাই।

অন্যান্য সামগ্রী নিলামের পর চেয়ার গুলির 'ডাক' আরম্ভ হইল। মিঃ ডন্‌বার অগত্যা স্বয়ং ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু চুলটিকিধারী একটা চুলোদর মাদ্রাজী ক্রমাগত 'ডাক' চড়াইতে লাগিল। মিঃ ডন্‌বার তাহার স্পর্দ্ধা দেখিয়া মনে মনে বড় গরম হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তিনি স্থির করিলেন যত টাকাই ডাক হউক, তিনি চেয়ার কয়খানি লইবেন, কারণ মেম সাহেবের তাহা পছন্দ হইয়াছে।—যাহা হউক ক্রমাগত "ডাকাডাকিতে' পুরাতন চেয়ারের দর নূতনের দরকেও ছাড়াইয়া উঠিল; কিন্তু তথাপি নাছোড় মাদ্রাজীটা পিছাইল না!—তখন মিঃ ডন্‌বার চোখ-মুখ রক্তবর্ণ করিয়া, সেই মাদ্রাজীর দিকে ঘুঁষি উদ্যত করিয়া একদম্ পঁচিশ টাকা দর চড়াইয়া দিলেন!—এবার মাদ্রাজীটা সরিয়া গেল। চেয়ারগুলি সাহেবের নামেই 'বিড্' হইয়া গেল।

সেই দিন সন্ধ্যার পর ডিনরের সময় মিণ্ডয়েল পাগড়ী বাঁধিয়া পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া মিঃ ডন্‌বারের চেয়ারের পশ্চাতে আবির্ভূত হইল। মিঃ ডন্‌বার নীরস স্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বটলার, আজ তুমি নিলামে যাও নাই কেন? মেমসাহেব কি তোমাকে চেয়ার-গুলি নিলামে কিনিতে বলেন নাই?"

মিণ্ডয়েল দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া বলিল, "হাঁ, হুজুর; আমিও সেখানে গিয়াছিলাম, মেম সাহেবের হুকুমে আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিলাম ডাকিয়াছিলাম। মেম সাহেব আমাকে বলিয়াছিলেন, 'বটলার, অন্য যে কেহ চেয়ারগুলি ডাকে ডাকুক, তুমি আমার জন্য তাহা কিনিতেই চাও'।"

মিঃ ডন্‌বার ছুরি ও কাঁটা ফেলিয়া বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে বটলারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, বটলারের কথার মর্ম্ম তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

মিনিট দুই চুপ করিয়া থাকিয়া মিঃ

ডন্‌বার বলিলেন, "তুমি নিলাম ডাকিতে গিয়াছিলে!—কৈ, আমি ত সেখানে তোমাকে কি তোমার মত কোনও লোককে নিলাম ডাকিতে দেখি নাই।"

মিগুয়েল সবিনয়ে বলিল, "কিন্তু আমি হুজুরকে দেখিয়াছিলাম। আমি প্রায় শেষ পর্য্যন্ত নিলাম ডাকিয়াছিলাম, কিন্তু শেষে হুজুর যখন রাগ করিয়া ঘুঁসি তুলিলেন, তখন আমি আর ডাক চড়াইলাম না।

মিঃ ডন্‌বার সবিস্ময়ে বলিলেন, "সে কি তুমি? তোমার গা খোলা, মাথায় টিকি, না ছিল পায়ে কোট, না ছিল মাথায় পাগড়ী!"

মিগুয়েল দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, 'হাঁ হুজুর সে আমি, বট্‌লার মিগুয়েল।"

মিঃ ডন্‌বার বিরক্তি ভরে বলিলেন, "আমার বট্‌লারের গায়ে কোট নাই, মাথায় পাগড়ী নাই! A most disgraceful figure for a respectable butler to cut, upon my word!"

এই তিরস্কারে মিগুয়েলের মুখ চুণ হইয়া গেল। সে অনুতপ্ত স্বরে বলিল, "নিলাম ডাকিবার সময় আমি কখনও পোষাক করিয়া যাই না। বড় বড় সাহেবদের বট্‌লারকে নিলাম ডাকিতে দেখিলে ধূর্ত্ত নিলামদারেরা জিনিসের দর ভারী চড়াইয়া দেয়।"

মিঃ ডন্‌বার নিঃশব্দে ডিনার শেষ করিলেন।

পরদিন প্রভাতে মিগুয়েল দৈনিক হিসাবের খাতা খানি লইয়া ধীর পদ-বিক্ষেপে প্রভুপত্নীর খাস্ কামরায় (Boudoir) প্রবেশ করিল। মিসেস্ ডন্‌বার হিসাব পরীক্ষা শেষ করিয়া সকোপ দৃষ্টিতে মিগুয়েলের মুখের দিকে চাহিলেন।

মিগুয়েল মেম সাহেবকে চিনিত, তাঁহার 'চাহনি' দেখিয়া সে প্রমাদ গণিল।

মিসেস্ ডন্‌বার গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "মিগুয়েল!"

মিগুয়েল দুই-এক পদ সরিয়া আসিল।

মিসেস্ ডন্‌বার বলিলেন, "মিগুয়েল, তুমি ভারী আহাম্মক!"

মিগুয়েল নীরবে দণ্ডায়মান রহিল।

মিসেস্ ডনবার বলিতে লাগিলেন, "তুমি জান তোমার সোফামীর জন্য চেয়ার ক'খানা কিনিতে আমার দুশো টাকা লাগিয়াছে। দুশো টাকা! দুশো টাকায় এক ডজন উৎকৃষ্ট নূতন চেয়ার কিনিতে পাওয়া যায়। মিথ্ তুমি বড় বোকা, আমার 'ডগবয়' তোমার চেয়ে বুদ্ধিমান, আমার ইচ্ছা করে তোমার পরিবর্ত্তে তাহাকে আমার 'বট্‌লারি' দিই।"

এই অপমান-কশাঘাতে মিগুয়েল অত্যন্ত আহত হইল; তাহার মনে হইল, যেন সাহেব তাহাকে অন্যায় তিরস্কার করিতেছেন, সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। অস্ফুট স্বরে বলিল, মেম সাহেব আমাকে নিলাম ডাকিতে হুকুম দিয়াছিলেন; তাহার পর আমাকে বিশ্বাস না করিয়া হুজুরকে নিলাম ডাকিতে পাঠান। হুজুর আফিসের কাজে পাকা, নিলাম ডাকের কি জানেন? তিনি পুরাণো চেয়ার গুলা—তার মধ্যে একখানা আবার ভাঙ্গা

—তিন শুণ দামে কিনিয়া লইলেন। হুজুর যদি বট্‌লারের কাজ করেন, তবে আর আমার এখানে থাকিবার আবশ্যক কি? 'ডগবয়' আমার চেয়ে বুদ্ধিমান, এ কথা শোনার চেয়ে আমার চাকরীতে ইস্তফা দেওয়া ভাল।"

পতি নিন্দা শুনিয়া সতী ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, বিশেষতঃ তাঁহার স্বামীর নির্ব্বুদ্ধিতায় তাঁহার এ ক্ষতি হইয়াছে, বট্‌লারের কোনও দোষ নাই, এ কথা বলিতে মিগুয়েল সাহস করিল, তাহার এত স্পর্দ্ধা!—মিসেস্ ডন্‌বার সক্রোধে বলিলেন, "তা বেশ, ইচ্ছা হয় চাকরীতে ইস্তফা দেও। আমি তোমার মত বট্‌লার অনেক পাইব। মনিবের সঙ্গে পাল্লা দিয়া নিলাম ডাকে এমন বুদ্ধিমান চাকরে আমার আবশ্যক নাই।"

মিগুয়েলের বিশ্বাস ছিল সে না থাকিলে মেম সাহেবের একদণ্ড চলিবে না। চোখা জবাব পাইয়া সে বড় মর্ম্মাহত হইল; তাহার আত্মসম্মান জাগিয়া উঠিল, মিগুয়েল বলিল, "মেম সাহেব তবে আমাকে জবাব দিতেছেন?"

মিসেস্ ডন্‌বার বলিলেন, "হাঁ, তোমাকে আগামী মাসের ১ লা হইতে জবাব দিলাম। তুমি এখন যাও, তোমাকে আমার আর কিছুই বলিবার নাই। ভাগ্নামাসের কয়দিন খুব হুঁসিয়ার হইয়া কাজ করিবে, নতুবা তোমাকে আমি সার্টিফিকেট দিব না বিনা সার্টিফিকেটে জবাব হইলে তুমি আর কোন ভদ্রলোকের বাড়ী চাকরী পাইবে না।"

বিশ বৎসর চাকরীর পর প্রভুপত্নীর এই ব্যবহার! বারান্দায় আসিয়া মিগুয়েল অশ্রু-ত্যাগ করিতে লাগিল। তাহার জবাবের কথা দাসদাসীগণের কাণেরও শুনিতে বাকী রহিল না, তাহার দুঃখে সকলেই দুঃখিত হইল। আয়ার সহিত তাহার অনেক দিন হইতে মনোমালিন্য চলিতেছিল, সে-ও বট্‌লারের পদচ্যুতির কথা শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ করিল। পিয়ন, ভিস্তি, মশালচি, বাবুর্চ্চি, 'পাখাপুলার', ধোপা, ঝাড়ুদার, মালি, সহিস, কোচম্যান, এমন কি, 'ডগ-বয়' পর্য্যন্ত আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল এমন দয়ালু মনিবের আর তাহারা পাইবে না।

ক্রমে মাস শেষ হইল। মিগুয়েলের বিদায়ের দিন আসিল। মিগুয়েল তাহার পোষাকি কোটটি গায়ে আঁটিয়া, মাথায় পাগড়ী দিয়া প্রভুপত্নীর সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং গম্ভীর ভাবে নূতন বট্‌লারকে তাহার 'চার্জ্জ' বুঝাইয়া দিল। তাহার পর প্রভুপত্নীর হস্তে ভাণ্ডারের চাবিটি প্রদান করিল।

মিসেস্ ডন্‌বার দেশীয় ভৃত্যের এরূপ তেজস্বিতা দেখিবার আশা করেন নাই, তিনি নিঃশব্দে মিগুয়েলের প্রাপ্য বেতন ও প্রশংসাপত্রখানি তাহার সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন। মিগুয়েল তাহা কুড়াইয়া লইয়া মেম সাহেবকে সেলাম করিল, তাহার পর ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। মিগুয়েলের স্ত্রী দূরে দাঁড়াইয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে লাগিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মিগুয়েল তাহার জিনিস পত্র গুছাইয়া লইয়া মোট বাঁধিল, এবং এক খানি গাড়ী ডাকিয়া তাহাতে

জিনিস পত্র গুলি তুলিয়া স্বামীরীতে অঞ্চপূর্ণ-নেত্রে প্রভুগৃহ পরিত্যাগ করিল। এক দিনেই বিশবৎসরের সঞ্চয়পুঁজি।

মিঃ ডন্‌বারের নূতন বট্‌লার কাজ আরম্ভ করিল, কিন্তু সংসারে বিশৃঙ্খলার সীমা রহিল না। চারিমাসের মধ্যে মিসেস্ ডন্‌বার আলাতন হইয়া উঠিলেন, সাংসারিক ব্যয় প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল, তথাপি যখন যেটি আবশ্যক তাহা পাইবার উপায় রহিল না। মাসে তিনবার করিয়া বট্‌লার বদল হইতে লাগিল। কাহার কোন্ দিন চাকরী যাইবে, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না।

দ্বিতীয়বারকে পরিত্যাগ করিয়া যে বট্‌লারের হস্তে ভাণ্ডারের চাবি দেওয়া হইল, সে লোকটি যেমন কাঞ্জিল, তেমনই চোর। সে এই পদের যোগ্য নহে। সাহেবদের ভাল বট্‌লারেরা নানা উপায়ে দু'পয়সা উপার্জ্জন করে বটে, কিন্তু তাহারা ইতর তস্কর নহে, কিন্তু এই নব নিযুক্ত বট্‌লারটি বাতি, চা, সাবান, রুটি, মাখন, পেয়ালা, ছুরি, চামচে, তোয়ালে, যাহা পাইত চুরি করিত। একদিন মিসেস্ ডন্‌বার দেখিলেন সে চিনির আধার হইতে মুঠা মুঠা চিনি তুলিয়া পকেটে ফেলিতেছে। সেই দিনই তাহার চাকরী গেল।

এই চোরের পরিবর্ত্তে যে বট্‌লার নিযুক্ত হইল সে ভয়ানক মাতাল। কেবল মদে নহে তা'এও তাহার অরুচি ছিল না। মদ খাইয়া নেশা না পাকিলে সে তাহার উপর ভাং চুকিত। চক্ষু দুটি জবা ফুলের মত লাল, কাজকর্ম্মের বিন্দুমাত্র পারিপাটা ছিল না, কাচের ডিস্, পেয়ালা, শিশি বোতল ভাঙ্গিয়া চুরমার করিত, দুই বোতল মদ খরচ হইলে পাঁচ বোতল খরচ লিখিত। একদিন ডিনারপার্টিতে নিমন্ত্রিত পুরুষ ও মহিলাগণের সম্মুখে সে মদমত্ত অবস্থায় এমন বেয়াদবি আরম্ভ করিল যে, তাহাকে বাঁধিয়া গুদাম ঘরে ফেলিয়া রাখিতে হইল। যখন সে প্রকৃতিস্থ থাকিত, তখনও নিয়ম মত কোনও কাজ করিতে পারিত না। মিসেস্ ডন্‌বার তাহার ব্যবহারে আলাতন হইয়া তাহাকে বিদায় দিলেন।

তাহার পর যে বট্‌লারটি আসিল সে ভয়ানক কলহপ্রিয়, বাবুর্চ্চি হইতে আরম্ভ করিয়া সহিস কোচমান পর্য্যন্ত সকলের সহিত সে অষ্টপ্রহর কলহ করিত। মিঃ ডন্‌বারের বাঙ্গলাখানি হাটে পরিণত হইল।

তাহাকে বিদায় দিয়া মিঃ ডন্‌বার যে বট্‌লারটিকে আনিলেন, সে কাজ কর্ম্ম কিছুই জানিত না, সে কেবল প্রভুর নহে, অন্যান্য ভৃত্যের জিনিস পত্র পর্য্যন্ত চুরি করিতে আরম্ভ করিল এবং আত্মীয় পরিচয়ে কতক-গুলি নিষ্কর্ম্মা নেশাখোরকে মিঃ ডন্‌বারের বাঙ্গলায় আশ্রয় দান করিল. ইহার ফলে বাবুর্চ্চিখানা হইতে আস্তাবল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র দিবারাত্রি হাটের গণ্ডগোল চলিতে লাগিল, গঞ্জিকার ধূমে মিঃ ডন্‌বারের বাঙ্গলা ধূমায়মান হইয়া উঠিল।

দেখিয়া শুনিয়া মিঃ ডন্‌বার অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন, মিসেস্ ডন্‌বারও অতঃপর কি কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ভৃত্যবিভ্রাট মাদ্রাজে বাস করা অতঃপর তাঁহাদের অসম্ভব মনে হইতে লাগিল। প্রত্যহ এক ডজন তস্করের

সহিত 'বুঝাপড়া' করিতে করিতে মিসেস্ ডন্‌বারের বিড়ম্বনার সীমা রহিল না।

অবশেষে চারি মাস পর একদিন প্রভাতে মিসেস্ ডন্‌বার দেখিলেন তাঁহার 'ব্রেক ফাষ্ট টেবিলে' কোনও প্রকার বিশৃঙ্খলা নাই। যেখানে যে জিনিসটি থাকা আবশ্যক, সেই খানেই তাহা রহিয়াছে; কৌচ কেদারায় আর এক ইঞ্চি ধূলা জমিয়া নাই; বাবুর্চ্চিখানায়, আস্তাবলে, ভৃত্য-নিবাসের হট্টকোলাহল নিরস্ত হইয়া সেখানে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে টেবিলের ভৃত্যগণের পরিচ্ছদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; ঠিক সময়ে টেবিলে 'ব্রেক ফাষ্ট' প্রস্তুত। এদিকে প্রায় প্রত্যহই মিঃ ডন্‌বারের আফিসে যাইতে বিলম্ব হইত, যথা সময়ে খাবার প্রস্তুত হইত না। —তিনি হঠাৎ এই সৌভাগ্যের কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। গাড়ী খানি পর্য্যন্ত ঠিক সময়ে গাড়ী বারান্দায় উপস্থিত!—নূতন বট্‌লারের কর্ত্তব্যজ্ঞান কি অকস্মাৎ ফিরিয়া আসিল? স্বামী স্ত্রী উভয়েই আনন্দিত ও আশ্বস্ত হইলেন।

প্রাতর্ভোজন শেষ করিয়া মিসেস্ ডনবার ভাণ্ডার ঘরে আসিয়া ভাণ্ডারের জিনিস পত্র পরীক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় সাদা চাপকান পরিহিত শুভ্রপাগড়ীধারী মিণ্ডয়েল আসিয়া লম্বা সেলাম দিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইল।

পুরাতন ভৃত্যকে দীর্ঘকাল পরে সম্মুখে সমাগত দেখিয়া মিসেস্ ডন্‌বারের হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সে হর্ষ গোপন করিয়া তিনি নীরব স্বরে মিণ্ডয়েলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও?"

মিণ্ডয়েল সংক্ষেপে বলিল, "আমি আবার আসিলাম।"

মিসেস্ ডন্‌বার বলিলেন, "আমি ত তোমাকে ডাকি নাই।"

মিণ্ডয়েল বলিল, "ডাকেন নাই বটে, কিন্তু আমার অভাবে আপনার সংসারের কাজ কর্ম্ম কেমন সুনিয়মে চলিতেছে তাহা আমার জানিতে বাকী নাই; আমি বাঁচিয়া থাকিতে আপনার সর্ব্বনাশ কিরূপে দেখিব? তাই আমি আবার আসিলাম।"

মিসেস্ ডন্‌বার বলিলেন, "বেশ করিয়াছ, এই নাও ভাণ্ডারের চাবি, বাবর্চ্চিকে আটা ও চিনি বাহির করিয়া দাও, সহিস ঘোড়ার দানার জন্য পাঠাইয়া আছে—তাহাকে দানা বাহির করিয়া দাও।" মিণ্ডয়েলের হাতে চাবি দিয়া মিসেস্ ডন্‌বার নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

দেশী কেরাণী ভিন্ন ভারতে ইংরাজের রাজ্য চলিতে পারে, কিন্তু দেশীভৃত্য ভিন্ন এদেশে ইংরেজের সংসার চলে না।

মিণ্ডয়েল তাহার প্রভুর সংসার পরিচালনের ভার গ্রহণ করিল। দশ দিনের মধ্যে সংসারে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিল। নিরপদস্থ পরিচারকবর্গ তাহার অনুগত হইয়া চলিতে লাগিল। দুই মাস পূর্ব্বে একটি নূতন 'ডগবয়' নিযুক্ত হইয়াছিল, মিণ্ডয়েল যে বিশ বৎসর ধরিয়া এই সংসারে বটলারি করিয়াছে তাহা সে গণিত না, আগন্তুকের কর্ত্তৃত্ব তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল, সে পদে পদে মিণ্ডয়েলের আদেশ

অগ্রাহ্য করিতে লাগিল। মিণ্ডয়েল তাহার অবাধ্যতা দেখিয়া তাহাকে তিরস্কার করিলে সে বলিল, "আমি কি তোমার চাকর?"—মিণ্ডয়েল বলিল "বটে', আচ্ছা থাক্ তুই।"

পরদিন দৈনন্দিন হিসাব দাখিলের সময় মিণ্ডয়েল মিসেস্ ডন্‌বারকে বলিল "মেম সাহেব, আমি এই 'ডগবয়'টাকে তাড়াইতে চাহি, এ হতভাগা থাকিলে কুকুরগুলা না খাইয়া মরিবে।"

মিসেস্ ডনবার সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

মিণ্ডয়েল বলিল, "কুকুরের ভাতের জন্য উহাকে যে চাউল দেওয়া হয়, তাহার অর্দ্ধেক সে বিক্রয় করে। পয়সা দিয়া চোর পুষিবার আবশ্যক কি?"

সেই দিনই ডগ্‌বয়কে বরখাস্ত করা হইল। সে বুঝিতে পারিল—বট্‌লারের অবাধ্য হওয়াতেই তাহার এই শাস্তি! কিন্তু মেমসাহেবের আদেশের উপর আপিল ছিল না, তাহাকে যাইতে হইল।

পদচ্যুত ডগবয় মিসেস্ ডনবারের কোচ্‌ম্যানের আত্মীয়, ডগবয়ের পদচ্যুতিতে কোচম্যান মিণ্ডয়েলের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল। সে মিণ্ডয়েলকে অপদস্থ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। সে জানিত মেম সাহেব মোরগের লড়াইয়ের উপর বড় চটা, সুতরাং একদিন সে মিণ্ডয়েলের অসাক্ষাতে মিসেস্ ডন্‌বারকে জানাইল, বটলার তাহার ঘরে একটা প্রকাণ্ড 'লড়াইয়ে মোরগ' আনিয়া রাখিয়াছে, মেম সাহেব যখন বাহিরে যান তখন অন্যান্য সাহেবদের খানসামা মোরগ লইয়া তাহার কাছে আসে, আর বাবুর্চ্চিখানার হাতায় মোরগের লড়াই আরম্ভ হয়।

মিণ্ডয়েলের বিরুদ্ধে অন্য কোনও অভিযোগ হইলে মিসেস্ ডন্‌বার হয় ত তাহা অগ্রাহ্য করিতেন, কিন্তু এই অভিযোগ যে সত্য, এ বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

পরদিন প্রভাতে প্রাতর্ভোজনের পর মিসেস্ ডন্‌বার মিণ্ডয়েলকে তাঁহার খাস কামরায় ডাকাইলেন।

মিণ্ডয়েল তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "মিগ্‌ল!"

মিণ্ডয়েল করযোড়ে বলিল, "হুজুর।"

মিসেস্ ডন্‌বার বলিলেন, "আবার তুমি আমার কুঠিতে মোরগের লড়াই আরম্ভ করিয়াছ?"

মিণ্ডয়েল বলিল, "হাঁ হুজুর, কথাটা মিথ্যা নয়, কিন্তু সকল কথা শুনিলে আপনি বুঝিতে পারিবেন আমার বিশেষ দোষ নাই। আপনি যাহাতে গোসা করেন এমন কাজ কি আমি ইচ্ছা করিয়া করিতে পারি? কাল বৈকালে আপনি হাওয়া খাইতে বাহির হইলে একজন চিড়িয়াওয়ালা কয়েকটা লড়াইয়ে মোরগ বিক্রয় করিতে আনিয়াছিল, সে আমাকে তাহা কিনিতে অনুরোধ করিলে আমি বলিলাম, 'আমি উহা কিনিব না; আমাদের মেম সাহেব মোরগের লড়াইয়ের উপর বড় গরহাজী, আমি তাঁহার অবাধ্য হইতে পারিব না।'—লোকটা সে কথা না শুনিয়া দুইটা মোরগ বাহির করিয়া তাহাদিগকে লড়াই করিতে লাগাইয়া

দিল। শেষে আমি তাহাকে গালি দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি।"

মিসেস্ ডন্‌বার বলিলেন, "কিন্তু আমার আদেশ অমান্য করিয়া তুমি কেন সেখানে মোরগের লড়াই করিতে দিলে? লড়াই আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই কেন তাহাকে তাড়াইলে না?"

মিশুয়েল গম্ভীর ভাবে বলিল, "না, তা তাড়াই নাই, লড়াই দেখিবার জন্য আমার একটু লোভ হইয়াছিল, আমার অপরাধ হইয়াছে হুজুর, এ জন্য আমি জরিমানা দিতেছি।"

মিশুয়েল পূর্ব্বদিন মোরগের লড়াইয়ে বাজি জিতিয়া দশ টাকা লাভ করিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি রুমাল হইতে টাকা দশটি খুলিয়া মিসেস্ ডন্‌বারের সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিল।

স্বীয় অপরাধের জন্য বট্‌লার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জরিমানা দিল দেখিয়া মিসেস্ ডন্‌বার ক্রোধ ত্যাগ করিলেন, তিনি স্মিতমুখে টাকাগুলি গণিয়া লইয়া বলিলেন, "বট্‌লার, তুমি অনেক টাকা জরিমানা দিলে, এ যে তোমার আধমাসের বেতন!"

মিশুয়েল অনুতপ্ত স্বরে বলিল, "হাঁ হুজুর, কিন্তু কাজটা বড় অন্যায় হইয়াছে। মোরগে মোরগে লড়াই বাধাইয়া মজা দেখা ভারি অন্যায় কাজ। আমার অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড দিয়াছি।"

মিসেস্ ডন্‌বার বলিলেন, "সে চিড়িয়া-ওয়ালাকে তাহার পর তাড়াইয়া দিয়াছ তো?"

মিশুয়েল বলিল, "হাঁ হুজুর, যেমন লড়াই শেষ হওয়া, অমনই তাহাকে তাড়া করা। ভারি অন্যায় কাজ!"

মিসেস্ ডন্‌বার বলিলেন, "খুব অন্যায়, আমি অনেকবার তোমাকে সাবধান করিয়াছি, কিন্তু তোমার এ রোগ সারিল না। দেখ বট্‌লার, আমার কুঠিতে বার দিবস যদি মোরগের লড়াই হয়, কি এখানে লড়াইয়ে মোরগ আমদানি কর, তাহা হইলে তাহা জবাই করিয়া 'রোষ্ট' করিবার জন্য আদেশ দিব।

মিশুয়েল বলিল, "হুজুরের হুকুম আমার মনে থাকিবে, আমি বাবুর্চ্চিকে বলিয়া দিব, লড়ায়ে মোরগ দেখিতে পাইলেই সে যেন তাহা জবাই করিয়া 'রোষ্ট' করে।"

মেম সাহেব বট্‌লারের ব্যবহারে খুসী হইয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। তিনি বুঝিলেন, মিশুয়েল চাকরী যাইবার ভয়ে দশটাকা দণ্ড দিয়া গেল।

মিশুয়েলের মোরগ লইয়া লড়াই করা দূরে থাক, সাহেবের কুঠীতে লড়াইয়ে মোরগ পোষাই তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। এমন নেশা সে কি করিয়া ছাড়ে? আর না ছাড়িয়াই বা উপায় কি?—কিন্তু মিশুয়েল অপেক্ষা তাহার স্ত্রীর অসুবিধাই অধিক হইল। মিশুয়েলের লড়াইয়ে মোরগের মত দিগ্বিজয়ী মোরগ মান্দ্রাজে খানসামামহলে আর দ্বিতীয় ছিল না। এই মোরগটির নাম 'কুঙ্কী'। মিশুয়েলের ভাই রঘু ব্রহ্মদেশে এক জন ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ারের খানসামা ছিল, রঘু তাহার প্রভুর সহিত উত্তর ব্রহ্মে অবস্থান কালে অনেক টাকা মূল্য দিয়া কুঙ্কীকে ক্রয় করিয়াছিল, রঘু ছুটী লইয়া মান্দ্রাজে

আসিবার সময় মুন্সীকে সঙ্গে আনিয়াছিল, এবং মিওয়েলকে ভ্রাতৃবাৎসল্যের নিদর্শন স্বরূপ পাখীটি উপহার দিয়াছিল। মুন্সী দেখিতে একটি ছোট খাট ময়ূরের মত। মান্দ্রাজের কোনও মোরগ এ পর্য্যন্ত মুন্সীকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারে নাই। মিওয়েল প্রতি সপ্তাহেই বাজি রাখিয়া লড়াই বাধাইত এবং বাজি জিতিয়া সপ্তাহে দশ পনের টাকা লাভ করিত। মেম সাহেবের কড়া আদেশের পর এই উপরি আয় বন্ধ হইয়া গেল, ইহাতে মিওয়েলের স্ত্রী বড়ই দুঃখিত হইল।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মিওয়েলের স্ত্রী একজন সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার বিপদের কথা জানাইল। সন্ন্যাসী মুন্সীর একটি পালক মন্ত্রপূত করিয়া দিল, বলিল, এই পালকটি দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম মেম সাহেবের 'স্যুপে' মিশাইয়া দিলেই তিনি মুন্সীর প্রতি বিদ্বেষ ভাব ত্যাগ করিবেন, 'মুন্সী'কে অন্য মোরগের সহিত লড়াই করিতে দেখিলে আর তাঁহার গোসা হইবে না।

মিওয়েলের স্ত্রী হাতে স্বর্গ পাইল, কার্য্যোদ্ধারের জন্য সে বাবুর্চ্চির শরণাপন্ন হইল; দশটাকা উৎকোচ পাইয়া বাবুর্চ্চি মুন্সীর দগ্ধ পক্ষ মেম সাহেবের স্যুপের সহিত মিশাইয়া দিল, এবং মেম সাহেবের মতি পরিবর্ত্তনের আশায় বসিয়া রহিল, কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের কথা তাহারা মিওয়েলকে বলিতে সাহস করিল না।

পরদিন প্রভাতে মিসেস্ ডন্‌বার ফুলের বাগান, ঘোড়ার আস্তাবল, গোশালা প্রভৃতি ঘুরিয়া বাবুর্চ্চিখানায় প্রবেশ করিলেন, তুক' সফল হইয়াছে কি না পরীক্ষার জন্য বাবুর্চ্চি মুন্সীকে খাঁচা সমেত বাবুর্চ্চিখানার বাহিরে রৌদ্রে রাখিল। প্রভাত-রৌদ্র-স্পর্শে 'মুন্সী' সহর্ষে ডাকিয়া উঠিল। মিসেস্ ডন্‌বার দেখিয়াই চিনিলেন, ইহা লড়াইয়ে মোরগ। বাবুর্চ্চিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ মোরগ কার?"

বাবুর্চ্চি বলিল, "মিওয়েলের, হুজুর।"

মিসেস্ ডন্‌বার কোনও কথা না বলিয়া স্থানে প্রস্থান করিলেন; মিওয়েল বাজার হইতে আসিয়া মেম সাহেবকে খরচ বুঝাইয়া দিতে গেল।

কাজ শেষ হইলে মিসেস্ ডন্‌বার বলিলেন, "মিগ্‌ল!'

মিওয়েল সরিয়া আসিয়া বলিল, "হুজুর!"

মিসেস্ ডন্‌বার বলিলেন, "বাবুর্চ্চি-খানায় একটা লড়াইয়ে মোরগ দেখিলাম, মোরগটি তোমার?"

মিওয়েল মুখ চুণ করিয়া বলিল, "হাঁ হুজুর!"

মিসেস্ ডন্‌বার গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তুমি পুনর্ব্বার আমার অবাধ্য হইয়াছ? তুমি এ মোরগ রাখিতে পাইবে না, হয় উহা বিক্রয় কর না, হয় কাহাকেও দান কর।"

মিওয়েল বলিল, "উহা বিক্রয় করিতে পারিব না হুজুর।"

মিসেস্ ডন্‌বার বলিলেন, "তবে কাহাকেও দান কর।"

মিওয়েল বলিল, "উহা বহুমূল্য সামগ্রী কাহাকেও দান করিতে পারিব না।"

এবার মিসেস্ ডন্‌বার সক্রোধে বলিলেন, "কি! আমার আদেশ পালন করিবে না? আমার বাড়ীতে ও পাখীর স্থান নাই, উহাকে ত্যাগ করিবে কি না?

মিণ্ডয়েল অন্তিম সাহসে ভর দিয়া বলিল, তাহা পারিব না হুজুর, প্রাণ থাকিতে ইহা অন্যকে দিতে পারিব না।"

মিসেস্ ডন্‌বার ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "তুমি ইচ্ছা করিলে পাখীটার প্রাণরক্ষা করিতে পারিতে, কিন্তু তোমার সে ইচ্ছা নাই। আমার আদেশ আজ সন্ধ্যার সময় উহাকে জবাই করিয়া আমাদের জন্য রোষ্ট করিবে। উহার যে মূল্য হয় আমার কাছে পাইবে।"

মিণ্ডয়েল অস্ফুট স্বরে বলিল, "আচ্ছা হুজুর, তাহাই হইবে।"

মিসেস্ ডন্‌বার মনে করিয়াছিলেন তাঁহার এই আদেশ শুনিয়া বট্‌লার কাতর ভাবে মোরগের প্রাণ ভিক্ষা করিবে। মিণ্ডয়েল মোরগটি হস্তান্তরিত করিতে সম্মত হইলে তিনিও আদেশ প্রত্যাহারে সম্মত ছিলেন। কিন্তু মিণ্ডয়েল সেরূপ কোন প্রার্থনা করিল না। মিসেস্ ডন্‌বার অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। মিণ্ডয়েল ভাবিল, স্বহস্তে মুন্সীকে বধ করিতে হয় তাহাও ভাল, 'মুন্সী' যে অন্যের হইবে ইহা সে সহ্য করিতে পারিবে না।

মেম সাহেবের নিকট হইতে বাবুর্চ্চিখানায় আসিয়া মিণ্ডয়েল দেখিল বাবুর্চ্চির ছয় বৎসরের শিশু পুত্র মুন্সীকে 'দানা' খাওয়াইতেছে, সে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অশ্রুরুদ্ধ নেত্রে সস্নেহে মুন্সীর দিকে চাহিয়া রহিল; পরাধীন জীবনের কঠোরতা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ পরে সে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাহার স্ত্রীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। মিণ্ডয়েলের স্ত্রী তখন কারির জন্য মাংস কাটিতেছিল।

মিণ্ডয়েল ভগ্ন স্বরে বলিল, "মেম সাহেব মুন্সীকে জবাই করিবার হুকুম দিয়াছেন।"

মিণ্ডয়েলের স্ত্রী যেন আকাশ হইতে পড়িল, ছুরি খানা তাহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল!

কিন্তু সে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে বাবুর্চ্চি বলিল, "না, তা কখন হইবে না। আমরা বাজার হইতে একটা মোটা সোটা বড় দেখিয়া মোরগ কিনিয়া আনিব, মেম সাহেব উভয়ের তফাৎ বুঝিতে পারিবেন না।"

মিণ্ডয়েল হতাশ ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে কোন কাজের কথা নয়, মেম সাহেবের হুকুম তামিল করিতে হইবে। এই পর্য্যন্তই মুন্সীর পরমায়ু, আমরা কি করিব?"

অপরাহ্নে পাঁচটার সময় মিসেস্ ডন্‌বার বাবুর্চ্চিখানায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল হঠাৎ মুন্সীর বধের আজ্ঞা প্রদান করিয়া তিনি অন্যায় করিয়াছেন। তাঁহার আদেশ প্রত্যাহারের জন্যই তিনি বাবুর্চ্চিখানায় এই অসময়ে আসিয়াছিলেন।

মিসেস্ ডন্‌বার দেখিলেন মুন্সীকে কয়েক মিনিট পূর্ব্বে জবাই করা হইয়াছে, ছিন্নকণ্ঠ বিগলিত শোণিত প্লাবিত দেহে

মাটীতে পড়িয়া ঝট্‌পট্‌ করিতেছে, অদূরে মিওয়েল পাশে হাত দিয়া বসিয়া আছে, আর বাবুর্চ্চির উলঙ্গ ছেলেটা ঝুলীর জন্য মাটীতে পড়িয়া কাঁদিতেছে। ঝুলীকে সে বড় ভাল বাসিত।

এই করুণ দৃশ্যে মিসেস্ ডন্‌বার অত্যন্ত বিচলিত হইলেন, তিনি মিওয়েলকে তীব্র স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি, বট্‌লার? আমি তোমাকে আজ সন্ধ্যার সময় পাখীটা জবাই করিতে বলিয়াছিলাম, তুমি আমার হুকুম তামিল কর নাই কেন?"

মিওয়েল বলিল, "সন্ধ্যার সময় জবাই করিলে ডিনারে অনেক বিলম্ব হইত হুজুর। জবাই করিয়া অনেক ক্ষণ উহাকে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে।" মিওয়েলের কথা বাধিয়া গেল।

মিসেস্ ডন্‌বার বলিলেন, "এত তাড়াতাড়ি করা তোমার ভাল হয় নাই। আমি আমার হুকুম রদ করিতে আসিয়াছিলাম, পাখীটাকে হত্যা করা হউক, এ ইচ্ছা আমার ছিল না।

মিওয়েল অস্ফুট স্বরে বলিল, "এই পর্য্যন্ত উহার পরমায়ু, হুজুর।"

বাবুর্চ্চির ছেলেটা মৃত বিহঙ্গটি বুকে তুলিয়া লইয়া ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিল। মিসেস্ ডন্‌বার বড় বিচলিত হইলেন, তাঁহার চক্ষুর পাতা আর্দ্র হইল। তিনি কোন রূপে সাহস সম্বরণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু এই ঘটনার পর মিওয়েল সড়াইয়ের জন্য আর কখন মোরগ পোষে নাই।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ঋষি-কবি

তরুণ শৈশবে ছিলে মায়ের কোলের ছেলে
ঘরের সন্তান,
মধুর কাকলি বাণী ছুটাত অমৃত আনি
জননীর প্রাণ,
জাগিত মুখের পরে অনিমেষ স্নেহভরে
মায়ের নয়ান,
যে আনন্দ অনিবার নিশাশেষ-অন্ধকার
ঘেরে থাকে অরুণ-বয়ান,
যে স্নেহ শীতলছায় কিরণ জীবন পায়,
ধরণীরে আলো করে দান,
মায়ের প্রাণের মায়া দিল সেই স্নেহ ছায়া
ছিলে যবে কোলের সন্তান!

২

গৃহ-কোণ পরিহরি বীণাটি সম্বল করি
প্রথম যৌবনে
ছেলেখেলা দূরে ফেলে যেদিন বাহিরে এলে
এ বঙ্গভুবনে,
পথে বাটে গৃহে দ্বারে প্রান্তরে বনের ধারে
নদী-কলস্বনে,
বীণার রাগিণী তব কি মোহিনী অভিনব
সঞ্চারিল অবাধ পবনে,
বঙ্গমাতা স্নেহভরে সেই দিন বক্ষ 'পরে
বসালেন তোমারে যতনে,
মায়ের অকূল হতে দেশের প্রান্তর পথে
অভিষেক নবীন জীবনে!

৩

হে কবি সুরের পান্থ, সম্মুখে প্রসার শান্ত
সন্ধ্যা আসে ঘিরে,
কোথা ঘর, কোথা দেশ, সকল সীমার শেষ
প্রচ্ছন্ন তিমিরে,
দেশ কাল ব্যবধান হয়ে আসে অবসান
অতি ধীরে ধীরে,
তাই ও বীণার সুরে আপনি উঠিছে পূরে
সে রাগিণী আজি ফিরে ফিরে,
নাই যার দেশ কাল যার নিত্য সুরজাল
প্রবাহিত অনন্ত সমীরে,
দেবর্ষি বিশ্বজনপ্রাণ চিরদিন সেই গান
ত্রিভুবনে বাজান গভীরে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

গীত *

উঠ বঙ্গভূমি মাতঃ ঘুমায়ে থেকোনা আর
জ্ঞান-তিমিরে তব সুপ্রভাত চলো হের।
উঠেছে নবীন রবি নব জগতের ছবি,
নব 'বাল্মীকি-প্রতিভা', দেখাইতে পুনর্ব্বার।
হের তাহে প্রাণভরে, সুখতৃষ্ণা যাবে দূরে,
ঘুচিবে মনের ভ্রান্তি, পাবে শান্তি অনিবার।
'মণিময় ধূলিরাশি' খোঁজ যারা দিবানিশি,
ওভাবে মজিলে মন, খুঁজিতে চাবে না আর॥

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

* 'বাল্মীকি-প্রতিভা' নাটকের অভিনয়ে তরুণ রবীন্দ্রনাথকে বাল্মীকির ভূমিকায় দেখিয়া রচিত।

অর্ঘ্য*

যে সুমহৎ কার্য্য সম্পাদনের গৌরবে গৌরবান্বিত করিবার নিমিত্ত আজ আমাকে এখানে দাঁড় করান হইয়াছে, তাহার যোগ্যতা আমার আছে কি না তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন এবং সে বিচার বিবেচনা করিয়া নিজের অযোগ্যতা দেখাইয়া আহ্বানকারী পরিষদের হাত এড়াইবার ইচ্ছা আমার মোটেই ছিল না ও নাই। জানি, এবং বহুতর স্থানে দেখিয়াছি যে প্রায়শঃ অযোগ্য হস্তেই কার্য্যভার ন্যস্ত হয় এবং ভারবহনকারী অযোগ্য পুরুষকে পশ্চাৎপদ হইতেও কমই দেখিয়াছি। যদি জগতের প্রথাই এই, তবে আমিই বা অন্যকে পথ ছাড়িয়া দিয়া হঠাৎ বিনয়ী, স্বার্থত্যাগী, জিতাত্মা, যোগী হইয়া উঠিব কেন, তাহার কোন সঙ্গত কারণ দেখিতে পাইলাম না। তাই আজ পরিষদের আহ্বান অনুসারে সে আদেশ মস্তকে লইয়া বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যগুরু কবীন্দ্র রবীন্দ্রের অর্ঘ্যবহন করতঃ আমি অদ্যকার সভায় সমুপস্থিত হইয়া নিজকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিতেছি।

যুগ অতীত হইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু বহুকাল পূর্ব্বে একবার ইন্দ্রপ্রস্থে ধর্ম্মনন্দনের রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে অর্ঘ্যাধিকারীর নির্ব্বাচনে বড় গোলই বাধিয়াছিল, কুরুরাজ যুধিষ্ঠির বড় বিপদে পড়িয়া, সর্ব্বনীতিজ্ঞ, সর্ব্বতত্ত্বদর্শী, ত্যাগধর্ম্ম-পরায়ণ, ভগবদ্ভক্ত মহাবীর পিতামহ ভীষ্মের শরণাপন্ন হইলে তিনি পুরুষোত্তমকেই অর্ঘ্যাধিকারী নির্ব্বাচন করিয়া দেন; অবশিষ্ট গোলযোগ যাহা কিছু ছিল সে ভার চক্রপাণি যজ্ঞেশ্বর স্বয়ংই লইয়াছিলেন। বর্ত্তমানক্ষেত্রে পিতামহকল্প পরিষদ্‌কে অর্ঘ্যাধিকারীর অনুসন্ধানে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই, কারণ আজ বঙ্গদেশের সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিলে সর্ব্বথা যোগ্যপাত্র একই এবং তিনি সর্ব্বতোভাবে অদ্বিতীয়। দুরাশার দুঃসাহসিক প্রেরণায় অধীর হইয়া স্পর্দ্ধিত প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দাঁড়াইবেন এরূপ নামকুলতিলক, শিশুপালকল্প উন্মাদ কেহ বঙ্গদেশে আছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না, সুতরাং আরব্ধ যজ্ঞানুষ্ঠান বিঘ্নবিহীন হইয়া নিষ্পন্ন হইবে ইহাই আমাদের ঐকান্তিক ভরসা।

জাতীয়জীবন গঠিত হইবার পূর্ব্বে বা তাহার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সাহিত্য গঠিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজন সাধন জন্য যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাঁহাদের কর্ম্মের পুরস্কার দিবার ক্ষমতা মর্ত্ত্য মানবের সাধ্যাতীত, তাঁহাদের ঋণ অপরিশোধনীয়। সরস্বতীর সেবককে যথাযোগ্য পুরস্কার দিবার মত ধন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে নাই, তবে সাধ্যানুসারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্যম দেখিলে হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়, মনে হয় ভক্তিভাজনকে ভক্তি করিতে, শিক্ষাগুরুকে সম্মান করিতে, যাঁহার যাহা প্রাপ্য তাঁহাকে তাহা দিতে যখন শিখিয়াছি, তখন আমরা নিঃশেষে

---

* কবি-সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে টাউন হলের সভায় লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

মনুষ্যত্ববিহীন আজও হই নাই এবং কোন দিন জীবন-সংগ্রামের পথে পৃথিবীর দশের সম-পাদবিক্ষেপে চলিতে পারিব এ আশা আমাদের একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

ভারতের সুপ্তিজালজড়িত নিশীথে বিপুলা বঙ্গভূমি বহুকাল নিস্তব্ধ হইয়াছিল। রামমোহনের গভীর ঔপনিষদিক মন্ত্রে অর্দ্ধ জাগ্রত অবস্থায় আমরা নিশীথিনীর শেষ যাম বা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের উপলব্ধি করিয়াছিলাম মাত্র, কিন্তু তখনও তরুণ অরুণের প্রথম কিরণপাতে কোকিল-কূজন সূচিত হয় নাই। মধুসূদনের মেঘনাদ আমাদের নিদ্রাজড়িত চক্ষের ঘুমঘোর একেবারে বিদূরিত করিতে পারে নাই, হেমচন্দ্রের শৃঙ্গনিনাদে আমরা জাগিলাম না দেখিয়া তাহা বাজিয়া বাজিয়া নিঃশেষে নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

তার পরে জাতীয়-জীবন-প্রভাতের স্নিগ্ধোজ্জ্বল-অরুণালোকপাতের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সুধাবিস্রবী কণ্ঠনিঃসৃত অমরসঙ্গীতে বঙ্গভারতীর কুঞ্জকানন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। অপূর্ব্ব ইন্দ্রজাল-প্রভাবে তিনি যে অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবল বঙ্গের নহে দেশকালপাত্র-নির্ব্বিচারে সমস্ত বিশ্বের হৃদয়ের ধন হইয়া রহিয়াছে! এই নিরানন্দ দেশে আনন্দ-উৎসের অপরূপ সৃষ্টি তাঁহারই এবং আমাদের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বসুন্ধরার বন্দনাগীতি তাঁহারই কণ্ঠে প্রথমোচ্চারিত।

প্রচণ্ড কালের অখণ্ড নিয়মে যখন তিনি অন্তর্হিত হইলেন, তখন ক্ষণেকের জন্য একবার মনে হইয়াছিল বুঝি পোষণাভাবে অপ্রাপ্তবয়স্ক বঙ্গসাহিত্যশিশু অকালবৃন্তচ্যুত পুষ্পমঞ্জরীর মত অসময়েই শুষ্ক হইয়া যাইবে। কিন্তু সর্ব্বকার্য্যকারণের নিয়ন্তা বিশ্বেশ্বর ভগবানের কৃপায় আজ পরমানন্দে বলিতে পারিতেছি যে তিনি আমাদিগকে সে দুঃখ দেন নাই।

বঙ্কিমের জীবদ্দশাতেই যে কিশোর রবির কিরণসম্পাতে বঙ্গভারতীর কবিতাকুঞ্জে কুসুমরাজি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কালক্রমে সেই রবির উজ্জ্বল তেজে আজ সমগ্র ভারতভূমি উজ্জ্বলিত. সেই সাহিত্যরাজরাজেশ্বর তাঁহার মনোরত্নশালার নিভৃত মণিপ্রকোষ্ঠ হইতে নানাবিধ মহার্ঘ্য ও অমূল্য রত্নরাজি আহরণ করিয়া শিশু সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত করতঃ বিশ্বসাহিত্য-সমাজের নিকটে আজ তাহাকে দাঁড় করাইয়াছেন। অঙ্গদ, কুণ্ডল, বলয়, কেয়ুর প্রভৃতি দিব্যাভরণভূষিত তরুণ বঙ্গসাহিত্যের রূপচ্ছটায় দশদিক যে আজ উদ্ভাসিত হইয়াছে, ইহা, কবিবর, একক তোমারই কৃতিত্বে তোমারই অক্লান্ত পরিশ্রম ও অকুণ্ঠিত মুক্তদানের ফলে। আজ তোমার বীণার অমৃতনিষ্যন্দি ঝঙ্কারে বঙ্গসাহিত্য-কুঞ্জের সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত; তোমার অনুগামিগণ তোমার সুরে গান গাহিয়া, তোমার ছন্দে কবিতা পড়িয়া, তোমারই অনুকরণে গদ্য রচনা করিয়া, নিজ নিজ শ্রমের সাফল্য লাভ করিতেছেন। সাহিত্য-নিকুঞ্জের প্রত্যেক পত্র-পুষ্পে, বল্লরী ও কিশলয়ে, আজ তোমার সুধাময় সুর অনুরণিত রহিয়াছে।

কবীশ্বর, তোমার সম্বর্দ্ধনার জন্য আজ আমরা সমবেত হইয়াছি, কিন্তু জানি না

কেমন করিয়া তোমার ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী সাহিত্যসম্রাটের সম্বর্দ্ধনা করিতে হয়। আমাদের এ "অর্ঘ্য" দীনের অর্ঘ্য তাহা তুমি জান। কিন্তু প্রীতির দান বলিয়া গ্রহণ করিও, সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বফলদাতা বিশ্বপিতার নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি তিনি তোমার শতায়ুঃ বিধান করিয়া দেশ ও সাহিত্যের মঙ্গলপথে তোমাকে সতত নিয়োজিত রাখুন। ইতি।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

অভিনন্দন*

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের নবাভ্যুদয়ে নূতন প্রভাতের অরুণ-কিরণ-পাতে যখন নবশতদল বিকশিত হইল, ভারতের সনাতনী বাগ্দেবতা তদুপরি চরণ অর্পণ করিয়া দিগন্তে দৃষ্টিপাত করিলেন। অমনি দিঙ্মণ্ডল প্রসন্ন হইলেন, মরুদ্গণ সুখে প্রবাহিত হইলেন, বিশ্বদেবগণ অন্তরীক্ষে প্রসাদপুষ্প বর্ষণ করিলেন, ঊর্দ্ধব্যোমে রুদ্রলোকের অভয়ধ্বনি ঘোষিত হইল, নবপ্রবুদ্ধ সপ্তকোটি নরনারীর হৃদয় মধ্যে ভাবধারা চঞ্চল হইল। বঙ্গের কবিগণ অপূর্ব্ব স্বরলহরীর যোজনা করিয়া দেবীর বন্দনাগানে প্রবৃত্ত হইলেন; মনীষিগণ স্বহস্তাবচিত কুসুমোপহার তাঁহার শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

কবিবর, পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ব্বে এক শুভদিনে তুমি যখন বঙ্গজননীর অঙ্কশোভা বর্দ্ধন করিয়া বাঙ্গালার মাটি ও বাঙ্গালার জলের সহিত নূতন পরিচয় স্থাপন করিলে, বঙ্গের নব-জীবনের হিল্লোল আসিয়া তখন তোমার অর্দ্ধস্ফুট চেতনাকে তরঙ্গায়িত করিয়াছিল; সেই তরঙ্গাভিঘাতে তোমার তরুণজীবন স্পন্দিত হইল; সেই স্পন্দন-প্রেরণায় তোমার কিশোর হস্ত নব নব কুসুমসম্ভার চয়ন করিয়া বাণীর অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইল। তোমার পূর্ব্বগামিগণের স্নিগ্ধনেত্র তোমাকে বর্দ্ধিত করিল; অনুগামিগণের মুগ্ধনেত্র তোমাকে পুরস্কৃত করিল; বাগ্দেবতার স্মেরাননের শুভ্রজ্যোতি তোমার ললাটদেশে প্রতিফলিত হইল। তদবধি বাণীমন্দিরের মণিমণ্ডিত নানাপ্রকোষ্ঠে তুমি বিচরণ করিয়াছ; রত্নবেদির পুরোভাগ হইতে নৈবেদ্যকণা আহরণ করিয়া তোমার দেশবাসী ভ্রাতা-ভগিনীকে মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়াছ; তোমার ভ্রাতা-ভগিনী দেবপ্রসাদের আনন্দ-সুধা পান করিয়া ধন্য হইয়াছে। বীণাপাণির অঙ্গুলিপ্রেরণে বিশ্বযন্ত্রের তন্ত্রীসমূহে অনুক্ষণ যে ঝঙ্কার উঠিতেছে, ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে তোমার অগ্রজাত কবিগণের পশ্চাতে আসিয়াও তুমি তাহা কর্ণগত করিয়াছ; হর্ষরূপিণী গায়ত্রীকর্ত্তৃক গন্ধর্ব্বরক্ষিত অমৃতবলের দেবলোকে নয়নকালে মর্ত্ত্যোপরি যে ধারাবর্ষণ হইয়াছিল, পৃথিবীর ধূলিরাশি

* এই সম্বর্দ্ধনা সম্পর্কে টাউন হলের সভায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে লেখক পরিষৎ-সম্পাদক কর্ত্তৃক পঠিত।

হইতে নিষ্কাশিত করিয়া নরলোকে সেই অমৃত-কণিকার বিতরণে তোমার সহকারিতা গ্রহণ দ্বারা তাঁহারা তোমায় কৃতার্থ করিয়াছেন। পঞ্চাশৎ সংবৎসর তোমাকে, অঙ্কে রাখিয়া তোমার শ্যামা জন্মদা তোমাকে স্নেহপীযূষে বর্দ্ধন করিয়াছেন; সেই ভুবনমনোমোহিনীর উপাসনাপরায়ণ সন্তানগণের মুখস্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশ্বপিতার নিকট তোমার শতায়ুঃ কামনা করিতেছেন।

কবিবর, শঙ্কর তোমায় জয়যুক্ত করুন।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

মুগ্ধা

(৮)

সুশীলার পিত্রালয়ে সুখ ছিল না। পিত্রালয়ের প্রতি গৃহ ও আসবাব তাহার পক্ষে বিষতুল্য। তাহার অতীত জীবনের সেই বিষময় স্মৃতির সহিত যাহা কিছু জড়িত তাহাই সুশীলা তীব্রতম বিষের মত বর্জ্জন করিত। তাহার সহিত যে কেহ কোনও মতে জড়িত, তাহার প্রতি সে একটা নিদারুণ বিদ্বেষ অনুভব করিত। সেই জন্য সে পিতামাতার, বিশেষতঃ মাতার প্রতি সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে পারিত না। এখানে আসিয়াও তাহার এক আনন্দ তাহার স্বামী; তাই সে যখনই অবকাশ পাইত নরেন্দ্রনাথকে ঘরে আটক করিয়া রাখিত। নরেন্দ্রনাথও আনন্দের সহিত আপনাকে বন্দী স্বীকার করিতেন। সুশীলার পিতামাতা কন্যার এই পতিগতপ্রাণতা দেখিয়া প্রীত হইলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাতার মাতৃহৃদয় তাহার সুস্পষ্ট অবহেলায় দারুণ অভিমানে ভরিয়া উঠিল।

সুশীলা এখানে আসিয়া তাহার স্বামীকে আরও অধিক আবেগে যেন আঁকড়িয়া ধরিল। যেন সে মুহূর্ত্তমাত্র স্বামীর অঙ্কচ্যুত হইলে কি এক দারুণ দুঃখময় আত্মগ্লানির মহা গহ্বরে ডুবিয়া যাইবে। তাহার স্বামীই যেন তাহার জীবন সম্মানযোগ্য করিবার একমাত্র উপায়, দারুণ শঙ্কাময় জগতে তাহার সুখের একমাত্র আশ্রয়। তাহার স্বামীও তাহাকে পরম আদরেই বক্ষে জড়াইয়া রাখিয়াছিলেন, তাই সে সকল দুঃখ, সকল শঙ্কা বিস্মৃত হইয়া এক অপূর্ব্ব মনোহর মোহে আত্মহারা হইয়া স্বামীর বুকে পড়িয়া থাকিত।

একদিন রাত্রে পূর্ণচন্দ্র আকাশে হাসিতেছিল। যখন সুশীলা ঘরে আসিল তখন নরেন্দ্রনাথ জানালার কাছে বসিয়া তন্ময় চিত্তে বাগানের দিকে চাহিয়া ছিলেন। যোগেন্দ্রবাবুর মনোরম উদ্যানে চন্দ্রালোকের অপূর্ব্ব খেলা দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ আত্মহারা হইয়া চাহিয়া রহিলেন। স্বামীকে উদ্যানের দিকে চাহিতে দেখিয়া সুশীলার মনের ভিতর খট্ করিয়া কি যেন বাধিল; একটা তড়িৎ প্রবাহের তীব্র কম্পনে যেন তাহার উৎফুল্ল

হৃদয়বৃত্তিগুলি নিমিষে অবসন্ন হইয়া গেল। সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পর মুহূর্ত্তে সে মুখ ফিরাইয়া সামান্য বৃথা কার্য্যে নিযুক্ত হইল, তাহার চিত্তের এই ভাব লইয়া স্বামীকে সম্ভাষণ করিতে তাহার সাহস হইল না।

সুশীলা যে ঘরে আসিয়াছে নরেন্দ্রনাথ তাহা টের পান নাই তিনি এক দৃষ্টে প্রকৃতির মাধুরী দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার কথা কহিতে যতই বিলম্ব হইতে লাগিল সুশীলা ততই অস্থির হইতে লাগিল। একটা প্রকাণ্ড অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় তাহার হৃদয় পীড়িত হইতে লাগিল। সুশীলা অন্যমনস্ক ভাবে টেবিল পরিষ্কার করিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার হাত হইতে একটি কাচের গেলাস পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল।

সেই শব্দে নরেন্দ্রনাথ ফিরিয়া চাহিলেন। সুশীলা তখন মুখ নীচু করিয়া ভাঙ্গা কাচগুলি কুড়াইতেছে। নরেন্দ্রনাথ ব্যস্তভাবে উঠিয়া আসিলেন, বলিলেন "দেখো যেন হাত কেটো না।"

কিন্তু সত্য সত্যই সুশীলার হাত কাটিয়া গেল। নরেন্দ্র অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া একটু নেকড়া ছিঁড়িয়া সেখানে জলপটি বাঁধিয়া দিলেন। সুশীলা ভাঙ্গা কাচগুলি কাগজে করিয়া লইয়া বাগানের দিককার জানালা দিয়া ফেলিয়া দিল। তাহার পর সে জানালা বন্ধ করিয়া অনেকটা সুস্থ হইয়া বিছানায় স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া বসিল। জানালাটা বন্ধ করিয়া তাহার হৃদয় অনেকটা সুস্থ হইয়াছিল; সে মনে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে লাগিল যে তাহার হাত কাটিয়া সে একটা কঠোর পরীক্ষা হইতে উদ্ধার পাইয়াছে। না হইলে আজ সে একটা বিপদে পড়িত।

নরেন্দ্র যখন নিশ্চিত জানিলেন যে সুশীলার ব্যথা সম্পূর্ণ সারিয়াছে তখন বলিলেন "তোমাদের বাগানটী বড় সুন্দর, চল না চাঁদের আলোয় একটু বেড়িয়ে আসি।"

সুশীলার জিহ্বা একটু জড়াইয়া আসিল, সে একটু বিবর্ণ হইল, কিন্তু মৃদু আলোকে তাহা নরেন্দ্রের চক্ষে পড়িল না। সুশীলা বলিল, "আমার শরীরটা বড় অবসন্ন হইয়াছে, আমি এখন ঘুমাইব।" নরেন্দ্র বাক্যব্যয় না করিয়া শুইয়া পড়িলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই নরেন্দ্র ঘুমাইয়া পড়িল।

কিন্তু সুশীলার ঘুম হইল না। আজ তাহার হৃদয়ে একটা নূতন তুফান বহিতে লাগিল। আজকার পরীক্ষা অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া তাহার যে একটা আত্মপ্রসাদ আসিয়াছিল, তাহা শীঘ্রই দারুণ আত্মগ্লানিতে পরিণত হইল। আপনার বিস্মৃত হীনতা আবার শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া তাহার হৃদয়কে অভিভূত করিল, লজ্জায় ঘৃণায় সে মরিয়া গেল। অত্যন্ত যন্ত্রণায় কণ্টকময় শয্যায় জাগ্রত হইয়া সে কেবলই এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল।

সে একবার মনে করিল সেদিনের সকল কথা স্বামীকে বলিয়া তাহার হৃদয়ভার লঘু করিবে। নরেন্দ্র কি তাহাকে বিশ্বাস করিবেন? তাহাকে কি তবে পূর্ব্বেরই মত ভাল বাসিতে পারিবেন? কে যেন তাহার মনের ভিতর হইতে বলিয়া দিল, সকল কথা বলিলে সে সব হারাইবে। তাহার জীবন-

স্বরূপ যে পতির অমূল্য প্রেম তাহা চির জীবনের মত অন্তর্হিত হইবে।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইল, পূর্ণিমার চাঁদ পশ্চিমে চলিয়া পড়িল। জানালা দিয়া তাহার বিমল আলোক বিছানায় আসিয়া পড়িল ও নরেন্দ্রের সুপ্ত শান্ত প্রফুল্ল মুখে সেই আলোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সুশীলা উঠিয়া বসিল, চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল তাহার সেই চিরদয়িত সুন্দর সরল বিশ্বাসপূর্ণ মুখের পানে চাহিয়া তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। সে স্থির করিল "ইঁহার কাছে কিছু লুকাইব না। সরল ভাবে সকল কথা খুলিয়া বলিলে আমাকে ইনি অবিশ্বাস করিবেন না।" "কাল বলিব" বলিয়া স্থির সংকল্প করিয়া চিত্ত অনেকটা সুস্থির করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রত্যূষে উঠিয়া তাহার প্রতিজ্ঞার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, কোনও কথা বলিতে সাহস হইল না। ভাবিল রাত্রে বলিব।

(৯)

সেই দিন দ্বিপ্রহরে সুশীলা সেই ঘরে আসিয়া দেখিল স্বামী চিঠি লিখিতেছেন। মুহূর্ত্তের জন্য সে সকল কথা বিস্মৃত হইয়াছিল। হাসিতে হাসিতে পা টিপিয়া স্বামীর পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু নরেন্দ্র তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "সাত দিন চোরের একদিন সাধুর; আজ তোমাকে ধরিয়াছি, উপযুক্ত শাস্তি দিব।" হাসিতে হাসিতে স্বামীর আলিঙ্গন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া সুশীলা বলিল, "তুমি চুপি চুপি বসে কার কাছে চিঠি লিখছো তাই দেখতে আসছিলাম।"

নরেন্দ্র বলিলেন, "আজ বৃহস্পতিবার তাই আমার বিলাতের একটী বন্ধুর কাছে চিঠি লিখতে বসেছি। অনেক দিন হল তা'র চিঠি পেয়েছি জবাব দেওয়া হয় নি। বেচারা অনেক দুঃখ ক'রে চিঠি লিখছিল।"

"কেন?"

"সে হতভাগার কাব্যি রোগ ধরেছে। সে মনে মনে বিশ্বাস করে বসেছে যে সে দারুণ প্রেমে পড়েছে। বিলেত যাবার আগে না কি কোন একটী মেয়েকে খুব ভাল বাসতো। আশা করেছিল বিলেত থেকে ফিরে এসে তাকে বিয়ে করবে। সেই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। তাই সে একেবারে অস্থির হয়ে জীবনটা নষ্ট করতে বসেছে।"

সুশীলা নিতান্ত সহৃদয়তার সহিত বলিল, "বিয়ের আগে ভাল-বাসা-বাসিটা কিছু না। ওটা একটা প্রকাণ্ড মূর্খতা।"

"তুমি আমি না হয় এখন সে বিষয়ে প্রকাণ্ড জ্ঞানী হয়ে বসেছি, কিন্তু অনিল বেচারা তো তা জানে না, সে একেবারে অস্থির হয়ে পড়েছে। এবার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ হবার তার বিশেষ আশা ছিল, কিন্তু সে যে রকম ভাবে লিখেছে তাতে সে পরীক্ষায় কিছুতে পাশ করতে পারবে না।"

পূর্ব্ব হইতেই সুশীলা কথা কহিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল, অনিলের নাম করিতে সে একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। হাত পা হিম হইয়া আসিল, সে বিছানায় বসিয়া পড়িল, মাথা বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। সহসা সে অচেতন হইয়া বিছানায় পড়িয়া গেল।

নরেন্দ্র ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। লোকের ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি লাগিয়া গেল; ডাক্তার আসিল, বাড়ীতে মহা হলস্থূল পড়িয়া গেল। বহুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে সুশীলা চক্ষু মেলিল। তখন তাহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল। বুক যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করিতেছে। ডাক্তার অনেকক্ষণ যত্নের সহিত পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "সুশীলার হিষ্টিরিয়া হইয়াছে, বিশেষ চিন্তার কারণ নাই।"

তখন কলিকাতার বড় বড় ডাক্তার ডাকা হইল, সকলে আসিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন হিষ্টিরিয়াই স্থির; ইহার জন্য গোড়া হইতেই সুচিকিৎসা করা আবশ্যক।

(১০)

ডাক্তারদের পরামর্শে নরেন্দ্র সুশীলাকে লইয়া দার্জ্জিলিঙ্গে গেলেন, সেখানে যাইয়া প্রাণপণ করিয়া তাহার সুশ্রূষা ও চিত্ত-বিনোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই সুশীলার রোগ সারিল না। সদা সর্ব্বদা বুকের ভিতর ধক্‌ধকানি, হাত পা ঘণ্টায় ঘণ্টায় হিম হইয়া আসে, সুশীলার কেবলই মনে হয় সে তখনি মরিবে।

একদিন দার্জ্জিলিঙ্গে তাহাদের শৈল-শিখরস্থ শীতল গৃহে নরেন্দ্র ও সুশীলা বসিয়া ছিল। সুশীলা একখানি ইজি চেয়ারে বসিয়া রহিয়াছে, নরেন্দ্র পাশে একখানি চৌকীতে বসিয়া তাহাকে কমলা লেবু ছাড়াইয়া দিতেছেন ও মধুর আলাপে তাহাকে তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। থাকিতে থাকিতে সুশীলার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। ব্যস্ত হইয়া নরেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সুশীলা বলিল, "বসো, তুমি ব্যস্ত হয়ো না, আমার কিছু হয়নি।" তাহার বুক যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল কিন্তু সে তাহা প্রকাশ করিল না।

নরেন্দ্র বলিলেন, "তুমি কাঁদিতেছ কেন?" সুশীলার চক্ষু আরও জলে ভরিয়া উঠিল, সে বলিল "তুমি আমার জন্য, এত করিতেছ কেন? দিন নেই রাত্রি নেই এমন করে তুমি অনবরত আমার শুশ্রূষা করছো, তোমার এ কষ্ট দেখলে আমার বড় দুঃখ হয়।"

নরেন্দ্র অগ্রসর হইয়া সুশীলার গলা জড়াইয়া ধরিলেন, বলিলেন, "সুশীলা তুমি কি জান না তুমি আমার কি? তোমার জীবন তোমার সুখের জন্য আমি যাহা কিছু করি কিছুই আমার মনোমত হয় না। যদি কোনও অসাধারণ আত্মত্যাগ করে তোমার রোগ সারাতে পারতাম তবে হয় তো আমার মনে শান্তি হত।"

সুশীলা বলিল, "তুমি আমায় এত ভাল বাস, আমি তাহার যোগ্য নই। এ ছার প্রাণ রক্ষার জন্য তুমি এত করছো, কিন্তু আমি তো বাঁচবো না।"

"পাগল! তোমার জীবনের কোনও আশঙ্কা নাই। সাবধানে সুশ্রূষা না করলে তোমার সমস্ত জীবনটা অকর্ম্মণ্য হয়ে যাবে তাই তোমার জন্য এত যত্ন, তুমি মিথ্যা ভয় করো না।"

"মরিতে আমি ভয় করি না, তোমার কোলে মাথা রেখে মরা আমার কামনার

বিষয়, কিন্তু তুমি যে আমায় এত ভালবাস তাই আমার মরিতে দুঃখ।"

সুশীলার অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িল। নরেন্দ্র তাহাকে চুম্বন করিলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সুশীলা বলিল, "মরিব আমি নিশ্চয়, কিন্তু মরিবার আগে তোমাকে একটা কথা বলিতে হইবে। সে কথা এখন আমি বলিতে পারিব না, যখন আমার মরণ নিশ্চয় হইবে, তখন জ্ঞান থাকিতে থাকিতে আমাকে স্মরণ করাইয়া দিও, আমি তোমায় সে কথা না বলিয়া মরিলে, স্বর্গেও আমার শান্তি হইবে না।"

নরেন্দ্র সুশীলার চিবুক ধরিয়া আদরে তাহাকে চুম্বন করিলেন। (ক্রমশ)

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত।

যথাকালে

যৌবনে এলে না তুমি শিবানী আমার।
বুঝি বুড়া ক্ষেপা বর, রিক্ত সন্ন্যাসীর
ভস্মরাগ, জটাভার, শতছিন্ন চীর
একমাত্র আকিঞ্চন কুমারী হিয়ার!
তাইত বহু বর্ষ ধরি আছ প্রতীক্ষায়,
হে চির কিশোরী মোর অনূঢ়া প্রেয়সী,
প্রৌঢ় প্রণয়ীর লাগি। শান্ত গরিমায়,
অশান্ত যৌবন মোর উচ্ছল সরসী
স্বচ্ছ আরসীর মত যবে শুষ্ক হবে,—
সে দিন আসিবে তুমি, নিস্তরঙ্গ বুকে
অচঞ্চল ছায়াখানি ফেলিবে নীরবে,
স্পন্দহীন মিলনের পরিপূর্ণ সুখে
ভরি দিবে, বক্ষ মোর। তারা-উদয়ায়,
সহসা উঠিবে বাজি তোমায় আমায়।

সুরেশ্বর শর্ম্মা।

অর্ঘ্য *

পাই নাই খুঁজে 'নেতের পাছুড়ি'
'বিশ আড়া ধান' আনিনি, কবি!
এনেছি কেবল হৃদয়ের প্রীতি
বিকচ কমল কোমল-ছবি।
পরগণা লিখে সঁপিতে কবিকে
কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গে নাহি;
আঁখি জলে শুধু করি' অভিষেক
স্বর্ণ-আসনে বসাতে চাহি।
জীবনের বহু শূন্য প্রহর
ভরিয়া তুলেছে বীণার তানে,
অন্ধ যামিনী হেসেছে পুলকে,
যে হাসি হাসিতে অন্ধ জানে।
তোমার যোগ্য কি দিব অর্ঘ্য?—
কোথা পাব মোরা?—ভাবি গো তাই।
জনক রাজার মত কোথা পাব
হিরণশৃঙ্গ হাজার গাই?
ব্রহ্মে এখন আছ নিগমন
কাব্য-লোকের লোচন রবি।
স্বর্গে বসিয়া আশিষিছে তোমা
ব্রহ্মবাদিনী বীচক্নবী।
শ্রদ্ধার স্রক্ চন্দন আর
অনুরাগ-ধারা এনেছি মোরা,
তোমার যোগ্য নাহিক অর্ঘ্য—
তবু লও প্রীতি রাগীর ডোরা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

---

* কবি সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে রচিত।

পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত

ব্রহ্মসংহিতা ও ভক্তিবাদ

অপূর্ব্ব মহাগ্রন্থ। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই মহাগ্রন্থ স্বয়ং দাক্ষিণাত্য হইতে জন্মভূমিতে আনয়ন করিয়া শ্রীল জীবগোস্বামী দ্বারা টীকা লেখান। সেই মূল ও টীকা এবং মূলের ও টীকার পৃথক্ পৃথক্ অনুবাদ এবং মঙ্গলাচরণ ও ভক্তিসারোদ্ধার দ্বারা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এক অভিনব ও পৃথক্ সম্প্রদায় দ্বারা মূলে শ্লোকাদির ব্যাখ্যা ও প্রমাণ দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্ম হইয়াছে, তৎসহিত ভক্তিই যে মুক্তির একমাত্র কারণ এবং "রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি" তাহা ভক্তিরসে বুঝান হইয়াছে। ঐরূপ গ্রন্থ, এমন সংগ্রহ, এমন আলোচনা কোন গ্রন্থে নাই। বঙ্গভাষার টীকা মহারত্ন। বৃহৎ পুস্তক, সুন্দর ছাপা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই ও কাগজ। মূল্য ছই টাকা মাত্র।

মজুমদার লাইব্রেরী, ২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফাল্গুন] [১১শ সংখ্যা

বঙ্গদর্শন

(নব পর্য্যায়)

একাদশ বর্ষ।

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা।		বিষয়	পৃষ্ঠা।
১। সম্রাট্-সম্বর্দ্ধনা	৬২১	৭।	হিন্দুর ধর্ম্ম	৬৪৫
২। সম্রাট্ প্রসঙ্গ	৬২৪	৮।	বিবিধ প্রসঙ্গ ...	৬৫৬
৩। শিক্ষা, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা	৬২৯	৯।	নির্ব্বাণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত	৬৬১
৪। উচ্ছলতা	৬৩৫	১০।	প্রেমপীড়ার প্রতীকার	৬৬৪
৫। কিভো	৬৩৮	১১।	নীতিশিক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র	৬৭০
৬। মুক্তা (উপন্যাস) ...	৬৪০	১২।	কবি অভিষেক (কবিতা)	৬৮৯

এস্ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিসন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৮

সাধনতত্ত্বলহরী।

শ্রীরামচরণ বসু বিরচিত। বৈষ্ণব ধর্ম্মের উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বাদি অতি সরল ও সহজ ভাষায় লিখিত। মূল্য ৸০ বার আনা।

মজুমদার লাইব্রেরী, ২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

পৃথ্বী-প্রদক্ষিণ বৃত্তান্ত

৪৪ খানি অত্যুৎকৃষ্ট হাফ্‌টোন ছবি ও ম্যাপসহ, বহুমূল্য স্বদেশী এ্যান্টিক কাগজে অতি সুকল্পরূপে মুদ্রিত প্রকাণ্ড পুস্তক। অল্প ও মধ্যস্তরোক্ত কুদ্রকায় জাপানীগণ কি অপূর্ব্ব রণকৌশলে ও বিজ্ঞানবলে অর্দ্ধ পৃথিবীর অধিপতি ও ইউরোপের দর্প চূর্ণ করিয়া শক্তি কুরচিগণকে প্রতিমুহূর্ত্তে জলে ও স্থলে, সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া জগতকে বিস্মিত, চকিত ও স্তম্ভিত করিয়াছেন তাহা অবগত হওয়া প্রত্যেক মনোযোগীর অবশ্য কর্ত্তব্য। এই পুস্তকে সার্পেল, হাই আক্সপ্লোসিভ প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে যে সকল অতি ভীষণ গোলা আবিষ্কার হইয়াছে তাহার দ্বারা পোর্টআর্থার প্রভৃতি মহাদুর্গেরা দুর্গসমূহ কি প্রকারে বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহা মনোযোগের ফটোচিত্র দ্বারা এমন সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে যে, পাঠকবর্গ যেন রুশ-জাপান যুদ্ধ স্বচক্ষে দেখিতেছেন বলিয়া বোধ হইবে। অতি সরল ও সুস্পষ্ট ভাষায় লিখিত—অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকেরাও অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন পড়িতে পড়িতে শরীর রোমাঞ্চিত হইবে। পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় জাপানীগণের অদ্ভুত বীরত্ব কষ্টসহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের প্রমাণ;—ইহা যে কত কৌতূহলোদ্দীপক ও রোমহর্ষণ ঘটনায় পূর্ণ তাহা লেখনীর দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব। একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। উপহার দিবার পক্ষে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক। ইহা দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রতি খণ্ড ১০ টাকা। একত্র দুই খণ্ড লইলে ২৷৷০ টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

শান্তিপুরের ইতিহাস

অতিপুরে—চৈতন্যদেব কেন—কি প্রকারে হরিনাম অধিকারে আনিল—গৌড়ীয়গোস্বামি আচার্য্যগণের শাসন-পালন-প্রথা—নানা কুরীতি প্রভৃতি জাতিগণের জ্ঞাতব্যপূর্ণ বিবরণে—অমাত্যবর্গের চক্রান্ত, রোমহর্ষণ ব্যাপার, যুদ্ধ, বীরশ্রেষ্ঠ টিকেন্দ্রজিতের বীরত্ব, রাজনীতির গূঢ় রহস্য ও সুমিষ্ট সরল ভাষায় বিবৃত—ঠিক যেন উপন্যাস পড়িতেছেন বলিয়া বোধ হইবে। ১৬ খানি অত্যুৎকৃষ্ট ছবিসহ প্রায় ৩৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ সুন্দর বাঁধাই, মূল্য ১৲ টাকা।

শিল্পী।

এই পুস্তকে সাবান, দীপ-শলাকা, কালী, কাঁচ এনামেলের দ্রব্যাদি, সুগন্ধি তৈল, এসেন্স পিন্ট ও বার্ণিশ, এনগ্রেভিং, ফটোগ্রাফি ইলেক্ট্রিসিটি প্রভৃতি সহস্র সহস্র বিষয়ের শিক্ষাপ্রণালী অথবা চিত্রের দ্বারা বিশদরূপে প্রদর্শিত ও অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ইহার সাহায্যে সকলের অনায়াসে নানাপ্রকার শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিয়া অর্থোপার্জ্জন ও স্বদেশের মঙ্গলসাধন করিতে পারিবেন। বস্তুতঃ এরূপ বিস্তৃত শিল্পগ্রন্থ আর নাই। দেশের সুসন্তান শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মাগণের দ্বারা বিশেষরূপে প্রশংসিত ২৬ পৃষ্ঠার প্রতি সংখ্যার মূল্য ৷৵০ আনা। এইরূপ ১২ সংখ্যায় ১১৫২ পৃষ্ঠায় একখণ্ডের সম্পূর্ণ মূল্য ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—ভারতী, ২১৷১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বঙ্গদর্শন

সম্রাট্-সম্বর্দ্ধনা

সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ, ভারতরাষ্ট্রের সনাতন-সাক্ষীস্বরূপিণী দিল্লীনগরীতে আসিয়া আপনার রাজ্যাভিষেকোৎসব দ্বিতীয় বার সম্পন্ন করিতে সংকল্প করিয়াছেন, এ সংবাদে প্রথমে ভারতের প্রজাবর্গের মনে বিবিধ পরস্পর-বিরোধী ভাবনার উদয় হইয়াছিল। এক দিকে একদল লোকে, আপনাদের সনাতন আদর্শ ভুলিয়া ও দেশের বর্ত্তমান বাস্তবতার প্রতি বিন্দুমাত্রও দৃক্‌পাত না করিয়া, নবজাত স্বদেশপ্রেমের উদ্দাম উৎসাহে প্রমত্ত হইয়া, নানাপ্রকারের অহিতাচারের দ্বারা রাজপুরুষদিগের ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য নষ্ট করিতেছিলেন। অন্যদিকে, এই সকল অহিতাচারকে কল্পনার তুলিকায় অতিরঞ্জিত করিয়া, ভূতপূর্ব্ব বড়লাট মিণ্টো বাহাদুর ও তাঁহার সদস্যগণ, বিবিধ কঠোর বিধান প্রবর্ত্তিত করিয়া, দোষী-নির্দ্দোষী নির্ব্বিশেষে প্রজাসাধারণের প্রাণে একটা গুরুতর অস্বোয়াস্তি উৎপাদন করিতেছিলেন। রাজা-প্রজার পরস্পরের মধ্যে যে সরল শ্রদ্ধা ও সদ্ভাব ব্যতিরেকে কদাপি কোথাও দেশের প্রকৃত শান্তি রক্ষিত ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে না,—ক্রমশঃই যেন সে শ্রদ্ধা ও সদ্ভাব হ্রাস হইয়া পড়িতেছিল। রাজপুরুষেরা যা' কিছু ভাল মন্দ করেন, তৎপ্রতিই যেন প্রজার প্রাণে নানা সন্দেহের ও বিরুদ্ধ-ভাবের সঞ্চার হইতেছিল। এই যখন দেশের অবস্থা, তখন সম্রাট সম্রাজ্ঞী সস্ত্রীক ভারতে আসিবেন শুনিয়া, প্রজার মন বিবিধ ভাবের সংঘাতে অন্তরে অন্তরে উদ্বেলিত হইয়া উঠা বড় বিচিত্র নহে।

দেশে তখনো ঠিক শান্তি স্থাপিত হয় নাই। যারা অশান্তি উৎপাদন করিতেছিল, তাহাদের হাত তখনো একেবারে গুটাইয়া যায় নাই। তারা যে কি করিতে পারে না পারে, সাধারণ লোকে তার কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। এ অবস্থায় সম্রাটের আগমনে কত যে বিপৎ-পাতের আশঙ্কা আছে, ইহা ভাবিয়া চিন্তাশীল লোকে বড়ই আকুল হইলেন। বিদ্বেষক্লিষ্ট লোকে না করিতে পারে এমন তো কিছুই নাই। যারা ইংরেজকে ক্ষেপাইয়া ভারতের প্রজা-সাধারণের উপরে অসহনীয় উৎপীড়ন আনিতে চায়, এইরূপ তাড়না দ্বারা দেশে একটা সাংঘাতিক বিপ্লব ঘটাইতে পারিলেই, জনগণের স্বরাজস্বাধীনতা সম্প্রসারিত ও সুপ্রতিষ্ঠ হইবে, এই উন্মাদিনী কল্পনার কুহকে পড়িয়া যারা বিদেশী ভাবের ও বিদেশী ভাবের একটা বিকট প্রজাশক্তি জাগাইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছে, এমন অর্ব্বাচীন ও

অসমসাহসিক কাজ কিছুই তো নাই, যাহা তারা বন্ধ করিতে পারে। দেশের সাধুবুদ্ধি যে ইহাদিগকে সংযত ও শাসিত করিবে, একদিকে তারও কোনো অবসর ছিল না। রাজবিধির ও রাজকীয় শাসনের কঠোরতার দ্বারা এ সকল বৈপ্লবিক ভাব জগতের কুত্রাপি অঙ্কুরে বিনষ্ট বা সমূলে উৎপাটিত হয় নাই; ভারতেই যে অঘটন ঘটিবে, তারই সম্ভাবনা কোথায়? এই সকল ভাবিয়া ধীর, শান্ত, প্রীতিমান প্রজাবর্গও সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী এই অশান্তিপ্রধূমিত ভারতে আসিয়া পুনরায় আপনাদের রাজাভিষেকোৎসব সম্পন্ন করিবেন, এ সংবাদের আনন্দ নিশ্চিন্ত চিত্তে ভোগ করিতে পারে নাই; কি করিলে সকল দিক রক্ষা পায়—এই চিন্তায় তাহারা অধীর ছিল, কিন্তু সে উদ্বেগ মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিতে পারে নাই।

সম্রাট ভারতে আসিবেন। ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও রাজকর্মচারিগণ তাঁহার অভ্যর্থনা করিবেন। সিপাহীসান্ত্রী তাঁহাকে দুর্ভেদ্য দুর্গের মত ঘেরিয়া থাকিবে। পুলিশ-পাহারা এই দুর্গের প্রান্ত-পরিখার ন্যায় দাঁড়াইবে। প্রজা-সাধারণের চক্ষুগোচর তিনি হইবেন কিরূপে? প্রজার কল্যাণে সম্রাট্-সম্বর্দ্ধনা হইবে, কিন্তু সে সম্বর্দ্ধনার মঙ্গলগীতির ক্ষীণতম প্রতিধ্বনি মাত্র, যোজনাতিস্থিত উৎকর্ণ প্রকৃতিপুঞ্জের কর্ণগোচর হইবে, সাক্ষাৎভাবে, নিকটে যাইয়া সে আনন্দ-উৎসবে যোগ দেওয়া তাদের ভাগ্যে তো কদাপি ঘটিবে না। ইংরেজ প্রজাসাধারণের মধ্যে যে ভাবে ইংরেজরাজ অভয়ে ও অকুণ্ঠায় বিচরণ করেন, ভারত-সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ তো সেরূপ ভাবে ভারতের প্রজাসাধারণের মধ্যে বিচরণ করিবার অবকাশ পাইবেন না। আর তাই যদি হয়, সম্রাট্ বিলাতে থাকিতে যেমন ভারতের প্রজামণ্ডলীর অগোচরে থাকেন, এখানে আসিয়াও যদি সেইরূপই থাকেন, তবে যে উদ্দেশ্যে এত সময়, শক্তি ও অর্থ ক্ষয় হইল, তাহা সফল হইবে কিরূপে? ভারতের প্রজাগণের ভাগ্যে রাজদর্শনের সৌভাগ্যলাভ হওয়া তো দূরের কথা, পক্ষান্তরে এ পুণ্যসঞ্চয়ের চেষ্টামাত্রেই দর্শনপিপাসু রাজভক্ত প্রজাকে ভারতের নিত্য-উদ্যতদণ্ড ও চির-উদ্যতস্বভাব পুলিশপ্রহরীর প্রহারভাগী করিবে। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া, অনেক লোকই সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী ভারতে আসিবেন শুনিয়াও, দেশের মঙ্গলকল্পে কোনো প্রকারের আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে সাহস পায় নাই।

কিন্তু বিধাতার কৃপায় সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ আপনার অসাধারণ মানসিক বল ও লোকোত্তরচরিতসুলভ সৌজন্যের দ্বারা লোকে যাহা একান্ত অসম্ভব বলিয়া ভাবিয়াছিল, তাহাই সাধন করিয়া গিয়াছেন। মুখে যে যাহা বলুক না কেন, সত্য কথাটা এই যে, আজ পর্য্যন্ত ভারতের প্রজাবর্গ কখনো ইংরেজাধিকারে আপনাদের অন্তরে সত্য রাজভক্তির এমন প্রেরণা অনুভব করে নাই। রাজভয় তাদের সর্ব্বদাই ছিল, এখনো আছে। এই ভয় হইতে যে সশঙ্কিত মর্য্যাদা উৎপন্ন হয়, রাজপুরুষেরা

সর্ব্বত্রই সে মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। প্রতাপসম্পন্ন রাজশক্তির পক্ষে, আপনার স্থিতি ও দেশের শান্তির জন্য এরূপ মর্য্যাদাই সচরাচর যথেষ্ট হয়। কিন্তু এ মর্য্যাদা আর প্রকৃত ভক্তিতে প্রভেদ অনেক। আর ভক্তি বস্তু নিতান্ত নিরাকারে কদাপি সম্ভবে না। নিরাকার অদ্বৈতের ধ্যান সম্ভব, ধারণা সম্ভব, তাহাতে সমাধিমগ্ন হওয়াও সম্ভব। কিন্তু ভক্তি সম্ভব নহে। রাজদর্শন রাজভক্তির প্রাণ। রাজার ঐশ্বর্য্যে প্রজা আপনাকে ঐশ্বর্য্যশালী মনে করিবে; রাজার গৌরবে প্রজা আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিবে, রাজার মধ্যে সে আপনাকে খুঁজিয়া ডুবাইয়া দিয়া, তাঁহাকে ভিতর দিয়া আপনিও রাজা সুখসম্ভোগ করিবে, ইহাই রাজ-ভক্তির চরম সাধ্য। আর রাজা নিয়তই চক্ষুর অন্তরালে, প্রজার সঙ্গে সর্ব্বপ্রকারের প্রত্যক্ষসম্বন্ধশূন্য হইয়া যদি বাস করেন, রাজাকে প্রজা যদি কেবল তাঁহার কর্ম্ম-চারিগণের শাসনদণ্ডের অন্তরালেই দেখে, সাক্ষাৎভাবে তাঁহার সৌম্য মানুষী মূর্ত্তি যদি তাদের নয়নগোচর না হয়, তিনি যে তাদের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী, তাদের সন্তোষেই তাঁর সন্তোষ, তাদের আনন্দেই তাঁর আনন্দ, তাদের শ্রীসৌভাগ্যই তাঁর রাজকীয় শ্রীসম্পদের একমাত্র নিদর্শন, ইহা যদি প্রজা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে না পায়, তবে সে রাজাকে ভয় করিতে পারে, মর্য্যাদা দিতে পারে, তাঁর শাসন মানিয়া চলিতে পারে, তাঁর রাজারক্তাখ, নীরস কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায়, প্রাণ পণ্যন্তও দিতে বিসর্জ্জন করিতে পারে,—কিন্তু প্রকৃত যে রাজভক্তি তাহা কখনই লাভ করিতে পারে না। এই রাজভক্তি এতদিন ব্রিটিশ ভারতে ফুটিবার অবসর পায় নাই; সর্ব্বথা অঙ্কুরিত হইয়াছিল কি না, তাহাই সন্দেহের কথা। কিন্তু সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের এবারকার ভারতাগমনে এটী হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

সম্রাট-সম্রাজ্ঞী আসিবেন শুনিয়া ভারতের হৃদয় প্রথমে তেমন স্পন্দিত হয় নাই। তাঁরা যেদিন বোম্বাই পৌঁছিলেন, সেদিনও সে হৃদয়ে বড় কোনো সাড়া পড়ে নাই। তাঁরা যেদিন দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন, আর সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ, দিল্লীতে পৌঁছিয়াই যখন মহারাণার প্রাচীন বংশমর্য্যাদা মনে করিয়া, দরবারে উপস্থিতি হইতে সে মহারানীকে অব্যাহতি দান করিলেন, তখনই প্রথমে ভারতের অসাড় হৃদয় সর্ব্বপ্রথমে যেন একটু স্পন্দিত হইয়া উঠিল। সেদিন বুঝিলাম, পঞ্চম জর্জ্জ মানীর মান রাখিতে জানেন। তাঁর অন্তঃপ্রকৃতি লোকোত্তরদিগের মহদাশয়ের আধার। একদিন এই বিশাল ভারতক্ষেত্রে উদয়পুরের মহারাণা শ্রেষ্ঠতম রাজচক্রবর্ত্তীর মর্য্যাদা ভোগ করিয়াছিলেন। ভারতের রাষ্ট্রীয় আকাশে কত নক্ষত্রের উদয়, কত নক্ষত্রের পতন হইল, কিন্তু মহারাণার ভক্তের সে প্রাচীন মর্য্যাদা কখনো যায় নাই। মহারাণা এখন রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধে বনচারীর মতই বাস করিতেছেন। কখনো পূর্ব্বপুরুষ-দিগের ভক্ত ছাড়িয়া আপনার ক্ষুদ্র রাজ্যের বাহিরে আসেন নাই। এবার, এই প্রথমে, তাঁকে এ কাজ করিতে হয়। সম্রাট স্বয়ং

দরবার করিবেন, এ অবস্থায় রক্ষিত রাজন্যবর্গের কারো এ উৎসব হইতে অনুপস্থিত থাকা লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ ভাল দেখাইবে না। তাই মহারাণা আসিলেন। কিন্তু কালপ্রভাবে যাহাই যখন কর্ত্তব্য হউক না কেন, কালও মানুষের বংশপরম্পরাগত ভাব ও অভিমানকে নষ্ট করিতে পারে না। এই অভিমানের কোনো মূল্য নাই সত্য, কিন্তু মানুষের অযৌক্তিক অভিমানকে যে মর্য্যাদা দিতে পারে, সেই কেবল অসাধারণ মহাশয়তা দ্বারা সে অভিমানকে তুষ্ট করিয়াই, সংবৃত করিতেও সক্ষম হয়। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মহারাণার সঙ্গে ব্যবহারে, এই অলৌকিক মহাশয়তারই পরিচয় প্রদান করেন। এই সামান্য ঘটনা হইতেই বোঝা গেল, সম্রাট এটী দৃঢ় করিয়া বুঝিয়াছেন যে অসি দিয়া হৃদয় জয় হয় না, হৃদয় দিয়াই হৃদয় পাইতে হয়। এই জন্যই বলি এই ঘটনাতে, দিল্লি পৌঁছিবামাত্রই, সম্রাটের উদারহৃদয়-সংস্পর্শে ভারতের অসাড় হৃদয় প্রথমে স্পন্দিত হইয়া উঠে।

তার পর যেদিন, দরবারক্ষেত্রে, আপনার মুখে সম্রাট বঙ্গবিভাগজনিত বাঙালীর তীব্র হৃদয়বেদনার উপশমের জন্য ভাঙা বাংলাকে পুনরায় সংযুক্ত করিবার ব্যবস্থা জ্ঞাপন করিলেন, সেদিন কেবল বাঙালী নহে, সমগ্র ভারতের প্রকৃতিপুঞ্জ দেখিল যে সম্রাটের ভারতাগমন বিফল হইল না। ইহাতে সম্রাট কেবল যে ভাঙা বাংলাকেই জোড়া লাগাইলেন, তাহা নহে। বাঙালীর ভাঙা প্রাণকেও আবার যেন জুড়িয়া দিলেন। বাঙালী ভাবের মানুষ। সে প্রেমও দিতে জানে, মানও করিতে জানে আর সে যখন মান করে, তার সে মান এমনই দুর্জ্জয় হইয়া উঠে যে, তাহাতে সর্ব্বশক্তিমান বিধাতাপুরুষকে পর্য্যন্ত বিচলিত করিয়া তুলিতে পারে। যেখানে প্রেম নাই, সেখানে মানও নাই। বাঙালীই প্রথমে ইংরেজরাজকে আপনার অহেতুকী প্রেম দিয়াছিল। বাংলার নায়কেরাই—জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, কৃষ্ণচন্দ্র, রায়দুর্লভ, মিরজাফর, এঁরাই প্রথমে, ইংরেজ-প্রতিনিধি ক্লাইবকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—

এস, এস, বঁধু এস, আধ আঁচরে বসো।

সে প্রেম লইয়া, ইংরেজরাজ আজ এত বড় ভারতরাষ্ট্রের মহাসিংহাসনে বসিবার অবসর ও অধিকার পাইতেন না। আর প্রেম অনেক সহিতে পারে প্রেম সেবার শ্রম সহিতে পারে দারিদ্র্যের অনাহারকেও তুচ্ছ করিতে পারে,—প্রেম সর্ব্বসহ। পারে না সহিতে কেবল উপেক্ষা। কক্ষন যেদিন বাঙালীর এই উদার প্রেমকে উপেক্ষা করিলেন,—সেদিন তাহার সেই পুঞ্জ প্রেমের শক্তিতেই এ দুর্জ্জয় মান জাগিয়া উঠিল। এ মান তর্জ্জন গর্জ্জনে ভাঙে না। ভাঙে কেবল প্রিয়দর্শনে। ভাঙে কেবল মধুর সম্ভাষণে। আর এ মান ভাঙাইতে পারেন কেবল এক জন। পঞ্চম জর্জ্জ মনে হয় যেন বাঙালার এই দুর্জ্জয় মান ভাঙাইবার জন্যই এবার ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁর মধুর সম্ভাষণে, তাঁর বিনয়-সৌজন্যে, সর্ব্বোপরি বাংলার হৃদয়-বেদনার সঙ্গে তাঁর আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশে, বাংলার এই দুর্জ্জয় মান

ভাঙ্গিয়াছে। কেবল এই একমাত্র ফল-লাভের জন্যই যদি সম্রাট ভারতে আসিতেন, তাহা হইলেও তাঁর এ আসা সম্পূর্ণরূপেই সার্থক হইত।

এবার রাজায় প্রজায় সাক্ষাৎ শুভদৃষ্টি হইয়াছে। রাজার অনুরাগ জাগিয়াছে, প্রজার ভক্তিও বিকসিত হইয়াছে। এ কি কম কথা? এতকাল ইংলণ্ডের রাজা, উপাধিমাত্র গ্রহণ করিয়া ভারতের সম্রাট হইয়াছিলেন। এ যাবৎকাল ইংরেজ-প্রজাই ভারতসম্রাটের পরাপ্রকৃতি হইয়াছিল, ভারতের অপরিমেয় প্রজাপুঞ্জ তাঁর মায়াপ্রকৃতি বলিয়াই পরিগণিত ছিল। সম্রাটের ভারতাগমনে মনে হয় যেন, সে মায়া কাটিয়াছে। এবং যে আমরাও বুঝি তাঁর পরাপ্রকৃতিরই অন্তর্ভূত হইয়া গেলাম। এও কি কম কথা? এই ভাবের প্রেরণায়, এই আশার আলোকে, তাই আজ ভারতের আপামর সাধারণে শাসনের ভয়ে নয়, কিন্তু অকৈতব সৌহার্দ্যের প্রেরণায় বলিতেছে—

সম্রাট-সম্রাজ্ঞী দীর্ঘজীবী হউন।

সম্রাট্-প্রসঙ্গ

ভারতসম্রাটের শুভাগমনে প্রজার কিরূপ প্রকারের কল্যাণ সাধিত হইতেছে, সাধারণ লোকে এখন এই কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছে। এ প্রশ্ন স্বাভাবিক, কিন্তু তাহার উত্তর দেওয়া সহজ নয়। ইংরেজের রাষ্ট্রতন্ত্রে রাজার স্থান, আমাদের সাংখ্যদর্শনে পুরুষতত্ত্বের ন্যায়। সাংখ্যের পুরুষ নিষ্ক্রিয়, জগতের নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল কার্য্যাবলীর সঙ্গে তাঁহার কোনো প্রকারের সাক্ষাৎসম্বন্ধ নাই। প্রকৃতিই এই সকল পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া থাকেন। অথচ পুরুষের অধিষ্ঠান ব্যতীত প্রকৃতি আপনিও অচল এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া থাকেন; তাঁর কোনো কর্ম্মের শক্তি ও সামর্থ্য থাকে না। ইংরেজের রাষ্ট্রযন্ত্রে সর্ব্বপ্রকারের কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা মন্ত্রীসমাজ। রাজা স্বয়ং কোনো কিছুরই সূচনা করিতে পারেন না। মন্ত্রীসমাজই দেশের বিধিব্যবস্থা নির্দ্ধারণ ও প্রণয়ন করেন। পার্লেমেণ্ট সে সকল অনুমোদন করেন। রাজা কেবল তার উপরে আপনার মোহর অঙ্কিত করিয়া দেন মাত্র। রাজার সহি না পাইলে, কোনো বিধানই দেশে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না, আর মন্ত্রীদলেরও নিজের কোনো অধিকার, কোনো শক্তিসামর্থ্য নাই। তাঁরা রাজার শক্তিতেই শক্তিশালী; রাজার অধিকারের ছায়াতেই, তাঁদের রাজ্যশাসনের অধিকার রক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত। রাজা দেশের রাষ্ট্রীয় কার্য্যাকার্য্যের জন্য স্বয়ং দায়ী নহেন। এ দায় মন্ত্রীদের। অমঙ্গল হইলে মন্ত্রীদলকেই জবাবদিহি করিতে হয়। মঙ্গল হইলে তাঁরাই লোকের প্রীতিভাজন হইয়া, দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া রাজকার্য্যপরিচালনের অধিকার ভোগ করিয়া থাকেন। রাজার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের যখন এইরূপই

সূক্ষ্ম সম্বন্ধ, তখন কোন্ কাজের মধ্যে কতটুকু পরিমাণে রাজার হাত থাকে ইহা নির্ণয় করা কঠিন।

* * * *

ভারতসাম্রাজ্যের শাসনভারও রাজার উপরে নহে, কিন্তু মন্ত্রীসমাজের উপরেই ন্যস্ত রহিয়াছে। ইংরেজ-মন্ত্রীসমাজই ভারতশাসনসংক্রান্ত সকল বিষয়ের শেষ মীমাংসা করিয়া থাকেন। এ দেশে যেমন জেলার কর্ত্তা ম্যাজিষ্ট্রেট, ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তা কমিশনার; কমিশনারের কর্ত্তা ছোটলাট ও তাঁহার সদস্য সভা ছোটলাটের কর্ত্তা যেমন বড়লাট ও তাঁহার সদস্যসভা; সেই রূপ বড়লাট ও তাঁর সদস্যসভার কর্ত্তা বিলাতের মন্ত্রীসভার অন্যতম সভ্য ভারত-সচিব। তাঁর হাতে এবং যখন যে মন্ত্রীদলের অঙ্গীভূত হইয়া ভারতসচিব কাজ করেন, সেই মন্ত্রীদলের হাতেই ভারতের শাসন-সংক্রান্ত সকল বিষয়ের শেষ মীমাংসার ভার ন্যস্ত রহিয়াছে। ভারতশাসন সম্বন্ধেও রাজাকে আপনার মন্ত্রীদলের মুখাপেক্ষী হইয়া চলিতে হয়। মন্ত্রীদলের অনভিমতে তিনি স্বয়ং কোনো কিছুই করিতে পারেন না। তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করিতে পারেন, আপনার মতামত তাঁদেরে জ্ঞাপন করিতে পারেন, বিষয়বিশেষে তাঁদেরে উপরোধ অনুরোধও করিতে পারেন, কিন্তু মন্ত্রীদলকে ডিঙাইয়া রাজ্যশাসনসম্বন্ধীয় কোনো কাজ করা ইংলণ্ডের রাষ্ট্রতন্ত্রে রাজার অধিকারের একান্ত বহির্ভূত। রাজার সঙ্গে মন্ত্রিদলের গুরুতর মতভেদ উপস্থিত হইলে, মন্ত্রিগণ তখনই পদত্যাগ করিয়া থাকেন, এবং রাজাকে তদ্মুহূর্ত্তে অন্য মন্ত্রী নিয়োগ করিতে হয়। তখন এই নব-নিয়োজিত মন্ত্রীদলই আবাল্য রাজ্যের সকল প্রকারের কার্য্যাকার্য্যের জন্য দায়ী হন। রাজাকে কখনো সাক্ষাৎ-ভাবে এ দায় গ্রহণ করিতে হয় না। ভারতশাসনের সকল প্রকার দায়-অদায় এই মন্ত্রীদলেরই উপরে। তারও ভালোমন্দের জন্য কেবল তাঁরাই দায়ী।

* * *

এ সকল সত্ত্বেও ইংলণ্ডের রাজা যে একেশ্বর-সার্ব্বভৌম হইয়া আছেন, এমন বলা যায় না। সাক্ষাৎভাবে রাজকার্য্যের কোনো দায়-অদায় গ্রহণ না করিয়াও, রাজা পরোক্ষভাবে অনেক মঙ্গলকার্য্যের সহায়তা করিতে পারেন ও সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের রাজা-প্রজার সম্বন্ধটা এমন একটা সুন্দর, স্নিগ্ধ, সুকোমল সহজভাবে ধারণ করিয়াছে যে, এখানে রাজার ইঙ্গিতে যে সকল কাজ সাধিত হয়, স্বেচ্ছাচার রাষ্ট্র-তন্ত্রে রাজার প্রবল প্রতাপের বলেও সে সকল কাজ এমন নির্ব্বিরোধে সম্পন্ন হওয়া সহজ নহে। এই জন্যই সাক্ষাৎভাবে রাজা রাজকার্য্যের সঙ্গে একরূপ নির্লিপ্ত থাকিয়াও পরোক্ষভাবে অনেক সদনুষ্ঠানের সূচনা ও অনেক দূরদর্শিনী নীতির প্রবর্ত্তন করিতে পারেন।

* * *

সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জকে তাঁর মন্ত্রীদল ভারতে পাঠান নাই, এ ব্যাপারের সূচনা সম্রাটের আপন ইচ্ছাতেই হয়। তিনি ভারতের বর্ত্তমান শাসনসমস্যার দুরূহ জটিলতা উপলব্ধি করিয়া, এ সময় এখানে

একবার আপনি উপস্থিত হইয়া, বিবিধ আশা-ও-ভীতি-তাড়িত প্রজাপুঞ্জকে আশ্বস্ত করিবার সংকল্প করেন। এ সাধু সংকল্প সম্রাটের। মন্ত্রীদল পরে তাহার সমর্থন করেন মাত্র। এখানে তাঁর সমক্ষে কি কি অনুষ্ঠান তাঁর নামে অনুষ্ঠিত হইবে, ইহাও সম্রাট স্বয়ংই একরূপ নির্দ্ধারণ করেন। মন্ত্রীদল এ বিষয়ে সম্রাটের আদেশ স্বীকার করিয়া, তাহার সমর্থন করিয়াছেন মাত্র। অবশ্য এ কথা বলা আবশ্যক যে, মন্ত্রীদল এ সকল অনুষ্ঠানের বিরোধী হইলে, সম্রাট্ স্বয়ং কিছুই করিতে পারিতেন না। তথাপি এ সকলের সূচনা বহুলপরিমাণে সম্রাট্ হইতে হইয়াছে বলিয়াই, আজ ভারতের প্রজাপুঞ্জের আন্তরিক ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা পঞ্চম জর্জ্জেরই অভিমুখে এতটা পরিমাণে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

* * *

সম্রাটের শুভাগমনের প্রথম ফল এই যে, ইহাতে বাংলাদেশের ও বাঙালী জাতির এই সপ্তবর্ষব্যাপী তীব্র মনোবেদনার শান্তি হইয়াছে। সম্রাট স্বয়ং এখানে আসিয়া যদি এ কাজটী না করিতেন, তবে ইহা নিতান্তই দুষ্কর হইয়া পড়িত। এই সাত বৎসর কাল বাংলাদেশে একটা প্রকাণ্ড বিরোধ জাগিয়াছিল, এই বিরোধের দ্বন্দী-প্রতিদ্বন্দী ছিলেন, একদিকে রাজপুরুষেরা, অপর দিকে প্রজা-সাধারণে। রাজপুরুষেরা ভাঙ্গা বাংলা আপনারা আবার জোড়া লাগাইতে পারিতেন না। সেইরূপ করিতে গেলে তাঁদের প্রতাপ ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইত। প্রজাসাধারণে সেদিন হইতে রাজপুরুষদিগের অনুগ্রহ-ভিক্ষার নিষ্ফলতা প্রত্যক্ষ করিয়া আপনাদের শক্তি ও সংযমের দ্বারা আপনাদের ঈপ্সিত সাধনের সংকল্প করিয়াছে, সেদিন হইতেই রাজপুরুষদিগের পক্ষে স্বকৃত কার্য্যের প্রত্যাহার অসম্ভব হইয়া পড়ে। লাট কর্জ্জনের শাসনকালের অবসানে, ইংলণ্ডে যখন লিবারেল দল প্রবল হইয়া মন্ত্রীপদ অধিকার করিলেন, মহামতি মর্লে বাহাদুর যখন ভারতসচিবের পদ গ্রহণ করিলেন, আর তার কিছুদিন পরেই যখন দেশের বিক্ষুব্ধ অবস্থা দেখিয়া, নববঙ্গের নূতন ছোটলাট স্যার্ বেমফাইলড্ ফুলারকে বিদায় দেওয়া আবশ্যক হইল, সে সময়ে নূতন মন্ত্রীদল অতি সহজেই প্রকাশ্যভাবে—কর্জ্জন-নীতি বর্জ্জন করিতে পারিতেন, তাহাতে লিবারেল দলের উদারতাই প্রমাণিত হইত, রাজশক্তির দুর্ব্বলতা প্রতিপন্ন হইত না। কিন্তু মর্লে মহোদয় ইহা করিলেন না। এই ভ্রান্তির জন্য কে দায়ী, বলা কঠিন। ভূতপূর্ব্ব বড়লাট মিণ্টো বাহাদুরই এর জন্য দায়ী ছিলেন, না মর্লে বাহাদুর আপনি এই সুযোগ হেলায় হারাইয়া ফেলেন,—বাহিরের লোকের পক্ষে এ সমস্যা ভেদ করা সম্ভব নহে। যাহা হউক সে সময়ে যাহা করা হইল না, আর যার ফলে দেশে আন্দোলন ও অশান্তি ক্রমশঃই প্রবলতর হইয়া উঠিতে লাগিল, তার পরে আর রাজপুরুষদিগের পক্ষে সে কাজটা করা সম্ভব রহিল না। তখন হইতে নূতন মন্ত্রীসমাজও এই বিরোধে সামিল হইয়া গেলেন। মধ্যস্থ সাজিয়া এই বিবাদ মিটাইয়া দিবার উচ্চ অধিকার তাঁরা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিলেন।

* * *

আর ঠিক এই সকল কঠিন সঙ্কটেই নিয়মতন্ত্র-শাসনের নিত্য নির্লিপ্ত রাজার বা সম্রাটের অদ্ভুতপূর্ব্ব কল্যাণ-প্রভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে। স্বেচ্ছাচার রাষ্ট্রতন্ত্রে রাজা বা সম্রাট্ সর্ব্বদাই রাজপুরুষ ও প্রজাসাধারণের মধ্যে কোনো বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে আপনি তাহার সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়েন। স্বেচ্ছাচারতন্ত্রে রাজপুরুষেরা সম্পূর্ণভাবে রাজার বা সম্রাটের আদেশাধীন হইয়া কাজ করেন। তাঁদের কার্য্যাকার্য্যের জন্য সাক্ষাৎভাবে রাজাকেও অনেক পরিমাণে দায়ী হইতে হয়। নিয়ম-তন্ত্র শাসনে রাজমন্ত্রিগণ সাক্ষাৎভাবে রাজার আদেশের অধীন নহেন। তাঁরা প্রজাসাধারণের প্রতিনিধিরূপে পার্লেমেণ্টের বা অন্য কোনো নামের প্রজাপ্রতিনিধিসভার সঙ্গ হইয়া রাজ্যের বিধিব্যবস্থাদির প্রণয়নের সহায়তা করেন, মন্ত্রীদল সাক্ষাৎভাবে তাঁদেরই অধীন হইয়া থাকেন। এখানে শাসনকার্য্যের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য রাজা বা সম্রাট সাক্ষাৎভাবে দায়ী হইতে পারেন না। এই জন্যই ইংলণ্ডের ন্যায় নিয়মতন্ত্রাধীন রাষ্ট্রে—"রাজা কোনো অন্যায় অনুষ্ঠান করিতে পারেন না"—The King can do no wrong—এই সূত্র শাসননীতির মূলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে। এখানে রাজ-পুরুষদিগের সঙ্গে প্রজার কোনো গুরুতর বিরোধ বাধিলে, রাজা স্বয়ং তাহাতে কিছুতেই লিপ্ত হন না, এবং লিপ্ত হন না বলিয়াই, প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, তিনি স্বচ্ছন্দে আপনি মধ্যস্থ হইয়া এই বিবাদ মিটাইয়া দিতে পারেন। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ভারতে আসিয়া আপনি যেন মধ্যস্থ হইয়া তাঁর রাজকর্ম্মচারী ও প্রজাবর্গের মধ্যে এই সাত বৎসর ধরিয়া যে চলিয়াছিল, তাহার মীমাংসা করিয়া বিরোধ গিয়াছেন। তাঁহার শুভাগমনে দেশের এই একটা মহৎ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে।

* * *

এটা যে কত বড় কল্যাণ, তাহা বুঝিতে হইলে, এই কয় বৎসরের অবস্থা একবার স্মরণ করিয়া দেখা আবশ্যক। এই সাত বৎসর বাংলার রাজপুরুষেরা ও প্রজা-সাধারণে যেন একটা বিকট দুঃস্বপ্ন দেখিতে-ছিলেন। শাসক ও শাসিতের মধ্যে এমন একটা ভাব ক্রমে দাঁড়াইতেছিল, যাহাতে দেশের সাধারণ হিতকর কার্য্যে রাজশক্তি সম্যক মনোনিবেশ করিবার অবসর পাইতে-ছিল না। দুষ্টের দমনের চেষ্টাতেই রাজ-পুরুষগণের সমুদয় শক্তি ও সময় যেন নিয়োজিত হইতেছিল। শিষ্টের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিতেছিল। এরূপ অবস্থায় রাজ্যের চিরন্তন কল্যাণের পথ ক্রমশঃই সংকীর্ণতর ও বাধাসঙ্কুল হইয়া উঠিতেছিল। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ভারতে আসিয়া ভঙ্গ বন্ধকে পুনরায় সংযুক্ত করিয়া দিয়া অনেক পরিমাণে এই পথকে প্রশস্ত ও স্বচ্ছন্দ করিয়াছেন।

* * *

শিক্ষা, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা

একদল স্বদেশহিতৈষী দেশের জনসাধারণের মধ্যে "শিক্ষা-বিস্তারের" জন্য নিরতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এই জন্য তাঁহারা রাজপুরুষদিগের শরণাপন্ন হইয়া রাজবিধানের দ্বারা দেশের লোককে জোর করিয়া লেখা পড়া শিখাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে তাঁহাদের সদ্ভদয়তার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু দেশের অবস্থা ও অভাবের অভিজ্ঞতা প্রমাণিত হয় কি না, সন্দেহের কথা।

এই চেষ্টার পশ্চাতে একটা অসত্য লুকাইয়া আছে। সর্ব্বাগ্রে সেই অসত্যটাকেই টানিয়া বাহির করা আবশ্যক। সে অসত্যটা এই যে বর্ণপরিচয় ও শিক্ষা, ইংরেজিতে যাকে লিটারেসি (literacy) ও এডুকেশন (education) বলে এ দুই এক বস্তু। আমাদের দেশের শতকরা নিরনব্বই জন ক, খ, পড়িতে পারেন না, সুতরাং তাঁরা অশিক্ষিত। বিলাতের শতকরা নিরনব্বই জনেরও বেশী লোকে এ, বি, সি, পড়িতে পারেন, অতএব তাঁরা শিক্ষিত। এই একটা অসদ্যুক্তি এই সাধুচেষ্টার অন্তরালে দাঁড়াইয়া আছে। অসদ্যুক্তির উপরে যে প্রয়াস প্রতিষ্ঠিত, তার প্রতিবাদ করা আবশ্যক।

আমাদের দেশে কখনো বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে শিক্ষার এরূপ ঘনিষ্ঠ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ছিল না। অতি প্রাচীন কালে, যে কালের জ্ঞানগরিমায় আধুনিক হিন্দুও আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন, সে কালে আমাদের লিপির প্রচার হয় নাই, কিন্তু শ্রুতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। আমাদের সনাতন শাস্ত্র শ্রুতি-প্রতিষ্ঠিত। গুরুপরম্পরা মুখে শিষ্যপরম্পরা শ্রেষ্ঠতম বিদ্যা শুনিয়া শিখিতেন, পড়িয়া শিখিতেন না। লিপি যখন প্রতিষ্ঠিত হইল, তার পরেও, এমন কি অতি অল্প দিন পূর্ব্বে পর্য্যন্ত, আমাদের দেশের শিক্ষা ও পাণ্ডিত্য এই শ্রুতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। লিপি স্মারকচিহ্ন রূপে ব্যবহৃত হইত; মূলশিক্ষা গুরুমুখেই প্রচারিত হইত। মানুষের মুখে যে সত্য প্রচারিত হয়, তার একটা স্বাভাবিকী সজীবতা থাকে। কেতাবের সাহায্যে যে শিক্ষা লাভ হয়, তাহার সেইরূপ সজীবতা থাকা আদৌ সম্ভব নহে। কেবল যে উচ্চাঙ্গের শিক্ষাই এই রূপে গুরুমুখে প্রচারিত হইত, তাহাও নহে। সাধারণ লোকের সাধারণ শিক্ষাও এই উপায়েই প্রচারিত হইত। কথকেরা, কীর্ত্তনীয়ারা, পুরাণাদির পাঠকেরা, সাক্ষাৎ ভাবে জনসাধারণের মধ্যে যাইয়া, একই সঙ্গে তাহাদিগকে শিক্ষা ও আমোদ প্রদান করিতেন। এই জন্য আমাদের দেশে বর্ণজ্ঞান-অভাবেও কদাপি সৎশিক্ষার একান্ত অভাব হয় নাই।

ফলতঃ বর্ণপরিচয় বা লিটারেসী নাই বলিয়া যাঁরা আমাদের দেশের জনসাধারণকে একান্ত অজ্ঞ ও অশিক্ষিত মনে করেন, তাঁরা শিক্ষা ও জ্ঞান বলিতে কি যে বুঝেন, ইহা ভাল করিয়া ধরিতে পারি না। যদি অন্য-দেশের জনসাধারণের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখা যায়, তবে আমাদের দেশের সাধারণ লোক যে অপরদেশের সমশ্রেণীর লোক

অপেক্ষা কোনো বিষয়ে হীন বা অজ্ঞ, এমন কথা কিছুতেই বলিতে পারা যায় না। ইংরেজ জনসাধারণের বর্ণজ্ঞান আছে। তাঁরা নিজেদের প্রয়োজনীয় বিষয় মোটামোটি বেশই বুঝিতে পারেন। দেশের খবরাখবর মোটামোটি অনেকটা রাখেন। খবরের কাগজ পড়িয়া, মাঝে মাঝে বাহির দুনিয়ার খবরাখবরও জানিয়া থাকেন। এ সকলই সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁদের শিক্ষা যে আমাদের দেশের সাধারণ লোকের শিক্ষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এ কথা স্বীকার করা যায় না। তাঁরা যেমন তাঁদের দৈনন্দিন কাজকর্মের কথা জানেন ও বোঝেন; আমাদের দেশের সাধারণ লোকেও তাঁদের নিজেদের কাজকর্মের কথা তেমনই জানেন ও বোঝেন। তাঁদের যা কাজ আমাদের হয় ত সে কাজ নাই; এ জন্য পরস্পরের মধ্যে স্বল্পবিস্তর পার্থক্য থাকিতে পারে। কিন্তু এই পার্থক্যে শিক্ষার পার্থক্য বোঝায় না। কেবল বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্য দ্বারাই শিক্ষার পার্থক্য বোঝায়। আর এই বুদ্ধির মাপেই পরস্পরের শিক্ষার ওজন করিতে হইবে। ওজন এখানে বিষয়ের নহে, বিষয়ীর; জ্ঞেয়ের নহে, জ্ঞাতার। আর এই মাপে যদি বিলাতের সাধারণ লোকের সঙ্গে আমাদের সাধারণ লোকের তৌল করা যায়, তবে যে বিলাতের দিকে দাঁড়িপাল্লাটা কণামাত্রও ঝুঁকিয়া পড়িবে, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা কদাপি এ কথা স্বীকার করিবেন বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না।

ইংরেজ তাঁর পার্লেমেণ্টের খবরাখবর কিছু রাখেন। পার্লেমেণ্টের দলাদলির খবরটা ভালো করিয়াই জানেন। কোন্ দলের কখন হার হইল বা জিত হইল, এটাও জানেন ও বোঝেন। কিন্তু যে সকল বিষয় লইয়া দুই দলে এত বাক্‌যুদ্ধ হয়, তার বেশী কিছু বোঝেন বলিয়া মনে হয় না। পার্লেমেণ্টের সভ্যনির্ব্বাচন সময়ে সভ্য-নির্ব্বাচকদিগের বুদ্ধির চালনার উপরে যতটা হার-জিত নির্ভর করে, নির্ব্বাচনপ্রার্থীদিগের মোটরগাড়ীর চালনার উপরে তদপেক্ষা শতগুণে অধিক নির্ভর করিয়া থাকে। নির্ব্বাচনপ্রার্থী যতখানা মোটরগাড়ী জোগাড় করিতে পারেন, তত পরিমাণে তাঁর পৃষ্ঠপোষকদিগের সংখ্যা বাড়িয়া যায়। যেখানে যত কলকারখানা আছে, সেখানে কারখানার কর্ত্তারা মেষপালের ন্যায় আপনাদের অধীনস্থ শ্রমজীবিদলকে আপনার দলের নির্ব্বাচনপ্রার্থীকে ভোট দিবার জন্য তাড়াইয়া লইয়া যান। কোনো স্থলেই বুঝিয়া শুনিয়া, আপনার বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া, জনসাধারণে আপনাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার যথাযোগ্য বিষয়ে প্রয়োগ করেন না। তাঁরা যে রাজনীতির বা সমাজনীতির জটিল সমস্যার কণামাত্রও বুঝেন, এ কথা কিছুতেই বলা যায় না। বিলাতে যে ভাবে এ সকল জটিল সমস্যার আলোচনা হইয়া থাকে, তাহা লক্ষ্য করিয়াও, এ কথা বলা সম্ভব হয় না। এই সকল আন্দোলন-আলোচনায় সত্যপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা যতটা থাকুক না কেন, জনগণকে ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রলোভন দেখাইবার চেষ্টা তদপেক্ষা শতগুণে অধিক হইয়া থাকে। এই স্বার্থটুকুই তাঁরা বোঝেন। দু'পয়সা কিসে আসিবে বা থাকিবে, এটাই তাঁরা দেখেন। ইহাতে যতটুকু বুদ্ধির

যা শিক্ষার প্রয়োজন, ততটুকু বুদ্ধি ও শিক্ষা তাঁহাদের হইয়াছে। এও যে ভালো করিয়া বুঝেন তা'ও নয়। এখানেও চতুর লোকে আপন ইচ্ছামত তাঁদের যেরূপ বোঝায়, তেমনি তাঁরা বুঝিয়া থাকেন। ইহাতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বা দূরদৃষ্টি, দু'এর কোনটারই প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আর এতটুকু বুদ্ধি বা এতটুকু শিক্ষা কি আমাদের দেশের জনসাধারণেরই নাই, বা কখনো ছিল না? এঁরাও কি যে সকল বিষয়ের সঙ্গে নিজেদের দৈনন্দিন কর্ম্মাকর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা বুঝেন না বা সে বিষয়ে বুদ্ধিচালনা করিতে পারেন না? এঁদের পার্লেমেণ্টের দলাদলি নাই, গ্রামের সামাজিক দলাদলি তো আছে। ইংরেজ পার্লেমেণ্টের দলাদলিতে যে বুদ্ধি প্রয়োগ করেন, আমাদের জনসাধারণে গ্রামের দলাদলিতে সেইরূপ বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইংরেজ আপনার ব্যবসা বোঝেন, আমাদের দোকানী-পসারীরা কি ততটুকু পরিমাণে নিজেদের ব্যবসায় বোঝেন না? তবে ইংরেজের ব্যবসার ধরণধারণ আলাহিদা, আমাদের প্রকৃতি স্বতন্ত্র বলিয়া আমাদের ব্যবসার ধরণধারণ পৃথক্। ইংরেজের দেশে ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতার নিরতিশয় তীব্রতা হইতে যে আকারের ব্যবসায়-বুদ্ধি সেখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেরূপ তীব্র প্রতিযোগিতা এদেশে নাই বলিয়া, সে আকারের ব্যবসায়-বুদ্ধি এখানে এখনো গজাইতে পারে নাই। এ সকল তারতম্য আছে, সত্য। কিন্তু এ সকল বিভিন্ন সামাজিক অবস্থা ও আদর্শের ফল, বর্ণজ্ঞানের তারতম্যের ফল নহে।

ইংরেজ লিখিতে পড়িতে জানেন বলিয়া, তারতের যে সকল লোক লিখিতে পড়িতে জানেন না, তাঁদের অপেক্ষা বেশি বুদ্ধি রাখেন, এ কথা সত্য নহে। বরং আমাদের দেশের লিপিপরিচয়বিহীন জনসাধারণে যেরূপভাবে জটিল বিষয় বুঝিয়া থাকেন, সেরূপভাবে কোনো জটিল বিষয়ে বুদ্ধি প্রয়োগ করিবার শক্তি ইংরেজ জনসাধারণের এখনো জন্মায় নাই। আমি ইংরেজ শ্রমজীবীদিগের মধ্যে এই তিনবৎসর কাল অনেক চলাফেরা করিয়াছি। তাঁদের ভাল ও মন্দ, ক্ষমতা ও অক্ষমতা, দুই বিলক্ষণ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি। কি রাষ্ট্রনীতি, কি অর্থনীতি, কি ধর্ম্মনীতি, কি সমাজনীতি, কোনো বিষয়েই যে তাঁহাদের বুদ্ধি আমাদের বর্ণপরিচয়হীন জনসাধারণের বুদ্ধি অপেক্ষা বেশি খেলিতে পারে, কদাপি ইহা দেখি নাই। যে কথা আমাদের তথাকথিত অশিক্ষিত লোকেরা সহজ বুদ্ধিতে ধরিয়া ধরিতে পারেন ইংরেজ-সমাজের জনসাধারণের কথা দূরে থাক, অপেক্ষাকৃত কৃতবিদ্য লোকেও সে সকল কথায় সে পরিমাণে বুদ্ধি নিবেশ করিতে পারেন কি না, সর্ব্বদাই মনে এই সন্দেহ উঠিয়াছে। আর এ সকল দেখিয়া শুনিয়া কেমন করিয়া বলিব যে, বর্ণপরিচয় নাই বলিয়া, আমাদের দেশের লোকেরা, ইংরেজ জনসাধারণের চাইতে কোনো অংশে অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত।

মোট কথা এই, বর্ণপরিচয়েই যে শিক্ষালাভ হয়, তাহা নহে। গত চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আমাদের নিজেদের সমাজেই কি, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই? আমাদের

মাতৃস্থানীয়ারা আজি কালি যে কেতাব-পড়া শিক্ষাকে লোকে শিক্ষা বলে, সে শিক্ষালাভ করেন নাই। বর্ণপরিচয় তাঁদের অনেকেরই ছিল না। অথচ এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে আমাদের কন্যাস্থানীয়া যে সকল আধুনিক মহিলারা শিক্ষার গৌরবে গরিয়সী হইয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা আমাদের মাতৃস্থানীয়া ভদ্রমহিলারা কোনো অংশে স্বল্পবুদ্ধিমতী বা স্বল্পজ্ঞা, বা স্বল্পকর্মকুশলা ছিলেন না। স্বচ্ছ বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, চরিত্রের স্থৈর্য্য ও সংযম, মনের বল, হৃদয়ের উদারতা ও চালচলনের শোভনতা, শিক্ষার প্রামাণ্য হয়, তবে এ সকল বিষয়ে যে আমাদের পূর্ব্বকার "অশিক্ষিতা" ভদ্রমহিলাগণ কোনো অংশে আধুনিক শিক্ষিতা মহিলাদের অপেক্ষা হীন ছিলেন না, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

আধুনিক শিক্ষা যাঁরা পাইয়াছেন, দুনিয়ার অনেক খবর তাঁরা জানেন, যাহা আমাদের মাতৃস্থানীয়েরা জানিতেন না। আবার আমাদের মা'এরা এমন অনেক কথা জানিতেন, যা এঁরা জানেন না। এঁরা বই পড়িয়া ইংলণ্ডের রাজবংশাবলীর নাম ও ইতিহাস শিখিয়াছেন, তাঁরা বই না পড়িয়াও ভারতের প্রাচীন পুরাণাদির ইতিকথা নখদর্পণের মত আপনাদের অধিগত করিয়াছিলেন। এঁদের শিক্ষা বিদেশাভিমুখীন, তাঁদের শিক্ষা স্বদেশাভিমুখীন ছিল। এঁদের শিক্ষা বাহিরের বিষয় লইয়া বুদ্ধিকে বিচলিত করিতেছে, তাঁদের শিক্ষা ভিতরের বিষয় জাগাইয়া বুদ্ধিকে স্থির করিত। বেশ কম এই। নতুবা এঁরা লিখিতে পড়িতে জানেন বলিয়াই সুশিক্ষিত, তাঁদের বর্ণপরিচয় ছিল না বলিয়া, তাঁরা অশিক্ষিত ছিলেন, এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না।

আজও সেই শিক্ষাই থাকুক্ বা যাঁকিবে, এ কথা বলি না। আগেকার শিক্ষাও অপূর্ণ ছিল, এখনকার শিক্ষাও সেইরূপই অপূর্ণ রহিয়াছে, এই কথাই প্রমাণ করিতে চাই। সে শিক্ষাকে ছাড়িয়া নহে, তাহাকে লইয়া, তারই উপরে, তারই সঙ্গে যুক্ত করিয়া, তারই স্বাভাবিক প্রসারণের দ্বারা নূতন শিক্ষা ও শিক্ষিতব্য বিষয়ের প্রতিষ্ঠা করিলে তবে বর্ত্তমানের উপযোগী পূর্ণাঙ্গ শিক্ষালাভ হইবে, অন্যথা নহে, এই কথাই বলিতে চাই। কিন্তু এ দিকে এখনো প্রায় কোন চেষ্টা হয় নাই। অধিকাংশ লোকের মনেই একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে যে বর্ণপরিচয় ছিল না বলিয়া প্রাচীনারা অশিক্ষিত ছিলেন, বর্ণপরিচয় জন্মিয়াছে বলিয়া নবীনারা সুশিক্ষিত; এই ভ্রান্তির নিরসন হওয়া আবশ্যক।

যেমন স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে, সেইরূপ জনসাধারণের শিক্ষা সম্বন্ধেও এই ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়া আছে। এই ভ্রান্তির উপরেই বর্ত্তমান চেষ্টা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই ভ্রান্তি বিদূরিত হইলে, প্রকৃত শিক্ষার উপায় উদ্ভাবন সহজ ও সহজ হইবে।

দেশের অপরাপর বিষয়ে যেমন, এক্ষেত্রেও সেইরূপই উপর হইতে ও বাহির হইতে, বাহিরের আদর্শে ও উপরওয়ালার আদেশে, সমাজের উপরে সংস্কারের বোঝা চাপাইবার যে চেষ্টা হইতেছে, সংস্কারের সফলতার জন্যই, তার তীব্র প্রতিবাদ হওয়া

আবশ্যক। যেখানেই প্রয়োজন উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে কোনো বিশেষ আয়োজনের ব্যবস্থা আরম্ভ হয়, সেখানেই তাহা কৃত্রিম, বহির্মুখীন, ও অকল্যাণকর হইবেই হইবে, ইহা বোঝা উচিত। এইরূপ ব্যবস্থাকেই পরধর্ম্ম বলে। এই পরধর্ম্ম সভ্যসভ্যই ভয়াবহ।

জোর করিয়া, রাজাদেশে, জনসাধারণের মধ্যে যে বর্ণজ্ঞান-বিস্তারের চেষ্টা হইতেছে, ইহার প্রয়োজন এখনো আমাদের দেশে উপস্থিত হয় নাই। বিলাতে যে সার্ব্বজনীন সাধারণশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তার পশ্চাতে ইংরেজ-সমাজের একটা স্বাভাবিক ও সহজ প্রয়োজন উপস্থিত ছিল। সে প্রয়োজন দুই দিক দিয়া উপস্থিত হয়। এক দিকে যখন কলকারখানার প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হইল, তখন এই সকল কলকারখানায় যে সকল শ্রমজীবী কাজ করিতে গেল, তাদের বর্ণপরিচয় আবশ্যক হইয়া উঠিল। কল-ঘরের বিধি-নিষেধগুলি মুখে বলিয়া, কলে কলে এত লোককে তাদের কাজের ব্যবস্থা বোঝান অসম্ভব। তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়া, মুদ্রিত উপদেশ ও বিজ্ঞাপনের দ্বারা এ কাজ করা সহজ দেখিয়া, মহাজনেরা আপনাদের ব্যবসায়ের খাতিরে নিজ-নিজ অধীনস্থ শ্রমজীবীদিগকে বর্ণজ্ঞান শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কেবল এই কারণে সার্ব্বজনীন লেখাপড়া শিখান আবশ্যক হয় নাই। কতক লোককে লেখাপড়া শিখাইলেই, এ প্রয়োজন সাধিত হইতে পারিত। কিন্তু অন্য দিকে, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সকলকেই একটু লেখাপড়া শিখানো আবশ্যক হইল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে পার্লেমেণ্টের সভ্যগণ দেশের ধনী-সম্প্রদায় কর্ত্তৃকই মনোনীত হইতেন। আপামর সাধারণের সভ্যমনোনয়নের অধিকার ছিল না। তত দিন পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণের পক্ষে লেখাপড়া জানার বিশেষ প্রয়োজনও উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু যে দিন হইতে জনসাধারণে অল্পে অল্পে এই অধিকার লাভ করিতে লাগিলেন, সেই দিন হইতে তাঁহাদের মধ্যে এই বর্ণপরিচয়-প্রচারেরও প্রয়োজন হইতে লাগিল। ১৮৬৭।৬৮ খৃষ্টাব্দে গ্লাডষ্টোন যখন গৃহস্থমাত্রকেই এই অধিকার প্রদান করিলেন, তখন রাজনৈতিক প্রয়োজনে সার্ব্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। * এ ব্যবস্থা না করিলে, পার্লেমেণ্টের সভ্যনির্ব্বাচন-কার্য্য সহজ হইতে পারিত না। রাজনীতিকেরা সহজে জনসাধারণের মধ্যে আপন আপন মন্তব্যাদি প্রচার করিতে পারিতেন না। সে অবস্থায় পার্লেমেণ্টের সভ্যনির্ব্বাচন কঠিন ও অযথা জটিল ও ব্যয়-বহুল হইয়া পড়িত। এই বিবিধ প্রয়োজনে বিলাতে সার্ব্বজনীন সাধারণশিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। সেখানে এই আয়োজন প্রয়োজনের অনুসরণ করিয়াছে। এই জন্য বিলাতে সাধারণ শিক্ষা-বিস্তারের একটা স্বাভাবিকতা ও সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ ব্যবস্থা না করিলে, রাজকার্য্য-পরিচালনা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের

* ডিজরেলি এই বিধানের ঘোরতর প্রতিবাদ করেন, কিন্তু প্রতিবাদ যখন নিষ্ফল হইল, তখন তিনি বলিলেন যে এবার "we must educate our masters" এখন আমাদের প্রভুদের (অর্থাৎ জনসাধারণকে) লেখাপড়া শিখাইতে হইবে।

শ্রীবৃদ্ধিসাধন, দুঃখের কোনটাই সহজ হইত না। নতুবা জনসাধারণের জ্ঞানোন্নতির জন্য একান্ত ব্যাকুল হইয়া যে ইংরেজ-সমাজের নেতৃবর্গ এই সাধারণশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, এরূপ কল্পনা করা যায় না।

আমাদের দেশে এখনো এরূপ কোনো স্বাভাবিক প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই। এ অবস্থায় পরের পৃষ্ঠে ভ্রক্ষ দর্শনে নিজের ভ্রূক্ষহীন পৃষ্ঠ সংযোগে কণ্ডূয়নের ন্যায়, জোর করিয়া রাজকীয় ব্যবস্থার সাহায্যে এ দেশে সার্ব্বজনীন শিক্ষা-প্রচলনের চেষ্টা কেবল যে নিষ্প্রয়োজন তাহা নহে, তাহার ফলে অনাবশ্যক কণ্ডূয়ন হেতু একটা নূতন ব্যাধি সৃষ্টি করা হইবে। ইহাতে সমাজের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণেরই আশঙ্কা বেশী।

ফলতঃ আমাদের দেশের সাধারণলোকে যে কখনো লেখাপড়া শিখেন নাই, এমনো নহে। যখনই ভিতর হইতে প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে, তখনই তাঁরা আগ্রহাতিশয় সহকারে লেখাপড়া শিখিয়াছেন। অতি প্রাচীন কালে, বৌদ্ধযুগে, যখন ভগবান বুদ্ধদেবের উপদেশাদি পালিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তখন দেশের সাধারণ স্ত্রীপুরুষে, ধর্ম্মের প্রেরণায়, ভক্তির উৎসাহে, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিবার লোভে, লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। এখনো বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব যেখানেই আছে, বৌদ্ধশ্রমণেরা সেখানেই ধর্ম্মার্থে সাধারণ জনগণকে লেখাপড়া শিখাইয়া থাকেন। ব্রহ্মদেশে এই জন্য যে পরিমাণে সাধারণ শিক্ষা প্রচলিত, ভারতের কোনো প্রদেশে সে পরিমাণে নাই। বৌদ্ধযুগের বহুকাল পরে আমাদের এই বাংলা দেশে, মহাপ্রভুর সময়ে যখন আর একবার বাংলা ভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থ রচিত হইতে লাগিল, তখন বহুসংখ্যক স্ত্রীপুরুষ, আপনাদিগের অন্তরস্থ ভক্তির প্রেরণায়, আপনাদের সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক সাধু মহাজনগণের গ্রন্থাদি পাঠ করিবার জন্য বর্ণজ্ঞান লাভ করিতে আরম্ভ করেন। কোম্পানীর রাজত্বের প্রারম্ভে বাংলাদেশের বৈষ্ণবমণ্ডলী মধ্যে সাধারণ শিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষা, উভয়ই অনেকটা প্রচলিত ছিল। আর কোনো সম্প্রদায় মধ্যে সেরূপ ছিল না। এই উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষার প্রয়োজন ভিতর হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং এই উভয় ক্ষেত্রেই বর্ণপরিচয় লাভ করিয়া লোকে আপনার কল্যাণ সাধনেই নিযুক্ত হইতেন। তাহাতে তাঁহাদের বুদ্ধির বা চরিত্রের, দু'য়ের কিছুরই কোনো হানি উপস্থিত হয় নাই।

বিলাতে, আপামর সাধারণের মধ্যে জোর করিয়া যে বর্ণজ্ঞান প্রচার করা হইতেছে, তাহাতে এ সকল অমঙ্গল তিল পরিমাণেও নিরাকৃত হয় নাই, এই সার্ব্বজনীন শিক্ষা-বিস্তারের ফলে, এক দিকে যেমন দেশের প্রায় সকল লোকই লিখিতে পড়িতে শিখিতেছে, সেইরূপ অন্য দিকে, সমগ্র সমাজের বিদ্যা বুদ্ধি ক্রমশঃ নিম্নস্তরে নামিয়া পড়িতেছে। ইংরেজি সাহিত্যের বর্ত্তমানে যে অধোগতি দেখা যাইতেছে, এই সার্ব্বজনীন লেখা পড়া শিখাইবার ব্যবস্থা তাহার অন্যতম প্রধান কারণ। সাহিত্য পূর্ব্বকালে সাহিত্যিকের আত্মবিকাশেই আপনার চরম সার্থকতা অন্বেষণ করিত। যাঁরা গ্রন্থাদি রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, দারিদ্র্য অনেক সময়েই তাঁহাদের নিত্য সহচর ছিল। সাহিত্য

তখন সাধনারূপে গৃহীত হইত। অর্থোপার্জ্জনের ফন্দিতে পরিণত হয় নাই। যাঁদের কিছু বলিবার থাকিত, যাঁরা অন্তরে বাগ্দেবীর প্রেরণা অনুভব করিতেন, বিদ্যার প্রতি যাঁদের অহেতুকী, অকৈতব প্রেম অঙ্কিত, সে কালে তাঁরাই আপনাদের আত্মচরিতার্থতা লাভের জন্য গ্রন্থাদি রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। কখনো কখনো সমাজের অর্থশালী লোকেরা সাহিত্যিকের সেবা করিয়া, পরোক্ষভাবে জ্ঞানের সেবাতে নিযুক্ত হইতেন। এখন আর সে দিন নাই। গ্রন্থ-রচনা এখন একটা ব্যবসায়ের মত হইয়া উঠিয়াছে। যার বলিবার কিছুই নাই, জগতে দিবার কোনো কিছু নাই, অন্তরে যার কোনো প্রকারের প্রতিভার প্রেরণা নাই, এমনো বহু সংখ্যক লোকে, আজি কালি বিলাতে কেবল মাত্র জীবিকা উপার্জ্জনের লোভে গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহারা ভাবার সাধনা করে, ভাবের ধার ধারে না। আর অপরাপর ব্যবসায়ের লোকেরা যেমন পণ্য উৎপাদনের আয়োজন করিবার সময়, বাজারের অবস্থা বিচার করিয়া থাকে, কোন্ ছাঁচের কোন্ পণ্য বাজারে চলে বেশী বা চলিবার সম্ভাবনা বেশী, ইহাই ভাবে ও সেই হিসাবে বস্তু প্রস্তুত করে; ইংরেজ-সমাজে এখন সাহিত্য-ব্যবসায়ীরাও সেইরূপই করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই জন্য ইংরেজি সাহিত্য ক্রমশঃই অতিশয় লঘু হইয়া উঠিতেছে। ইহাতে সমাজের চিন্তা-শক্তি হ্রাস ও রুচি বিকৃত হইয়া পড়িতেছে। আমাদের দেশে বিলাতী ছাঁচে জনসাধারণের মধ্যে জোর করিয়া বর্ণপরিচয়-প্রচারের চেষ্টা হইলে যে অন্তর্বিধ ফল উৎপন্ন হইবে, সে আশারই বা কোনো কারণ আছে কি?

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

উজ্জ্বলতা

মনুষ্য-চরিত্রে যত প্রকার দুর্ব্বলতা আছে, তাহার মধ্যে একটিকে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বোধ হয়। সেটি নিজ শরীরকে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার চেষ্টা। কি অসভ্য কি বর্ব্বর, কি বালক কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী কি পুরুষ সকল শ্রেণীর মানুষই অঙ্গ-শোভাবৃদ্ধির জন্য লালায়িত। ধর্ম্মযাজকগণ যতই কেন বলুন না মানবদেহ ক্ষণভঙ্গুর, অল্প কয়েক দিনের পর মাটীর শরীর মাটীতে মিশাইবে, এই যে সুন্দর শরীর দেখিতেছ ইহা পোকাদের আহার্য্য ভিন্ন কিছুই নহে ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু তাঁহাদের কথা কে শোনে? দুই চারিটি যোগী তপস্বী ভিন্ন তাঁহাদের কথা বড় কেউ গ্রাহ্য করে না।

শরীরের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য মানুষ যে কত রকম উপায় আবিষ্কার করিয়াছে তাহার সীমা নাই। সোণা রূপা মণি-মুক্তা হীরা প্রভৃতি উজ্জ্বল পদার্থ মানুষ বহু কষ্টে যুগ যুগান্তব্যাপী পরিশ্রমের ফলে আবিষ্কার করিতেছে, কেবল শরীরের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য। এমন কি নিতান্ত বর্ব্বর মানুষও ধাতু-দ্রব্যের কিম্বা অন্য কোন রঙিন চাকচিক্যময়

পদার্থের অলঙ্কার পরিতে ভালবাসে। মানুষ যতই সভ্য হইতেছে, ততই অধিকতর চাকচিক্যময় দ্রব্যের জন্য পাগল হইতেছে। রূপার চেয়ে সোণার আদর বেশী, কারণ রূপার চেয়ে সোণার উজ্জ্বলতা অধিক। আবার সোণা রূপার বর্ণ ক্রমে মলিন হইতে পারে, কিন্তু চুণী পান্না মুক্তার বর্ণ শীঘ্র মলিন হয় না। সেইজন্য সোণা রূপা অপেক্ষা এই সকল দ্রব্যের বেশী আদর। আর সোণা রূপা চুণী পান্নার উজ্জ্বলতা আলোতে ফোটে, অন্ধকারে ফোটে না। কেবল এক হীরকের উজ্জ্বলতা অন্ধকারেও ফোটে। এই জন্য হীরার আদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

হীরা মণি মুক্তা সোণা রূপার অলঙ্কার সর্ব্বদা পরা সুবিধাজনক নহে, অনেক সময়ে এ গুলি বোঝা বলিয়া মনে হয়। আবার সোণা রূপা মণি মুক্তায় সর্ব্ব শরীর ঢাকে না। কিন্তু মানুষ চায় কিসে সর্ব্বদা শরীরের সবটুকু উজ্জ্বল হইবে। তাই মানুষকে অন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে। মানুষ শীত গ্রীষ্ম হইতে শরীর রক্ষার জন্য বস্ত্র-ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। বস্ত্র-ব্যবহারের আদিম কারণ এই, পরে বস্ত্র-ব্যবহারের উদ্দেশ্য লজ্জানিবারণ, ক্রমে ইহা একটি শিষ্টতার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। স্বাস্থ্য ও সভ্যতার খাতিরে মানুষ বস্ত্র দ্বারা শরীরের কতকাংশ—কেহ বা সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া রাখিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু মানুষ উজ্জ্বলতার জন্য ব্যাকুল বলিয়া সেই বস্ত্রকে নানাপ্রকার উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া পরিতে ভালবাসে। প্রথমতঃ কার্পাস বস্ত্রই ব্যবহৃত হইত, কিন্তু শীঘ্র মলিন হয় বলিয়া মানুষ তাহা লাল, নীল, কাল প্রভৃতি রঙে চিত্রিত করিয়া পরিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সে সকল উজ্জ্বল রঙও আবার বেশী দিন থাকে না, ব্যবহার করিতে করিতে উঠিয়া যায়। তখন মানুষ অনেক অনুসন্ধান করিয়া রেশম পশম প্রভৃতি স্বভাবতঃ উজ্জ্বল বস্ত্রবয়নোপযোগী পদার্থের আবিষ্কার করিল। এই সকল সুতায় রঙ না করিলেও চলে। ইহা দ্বারা নির্ম্মিত বস্ত্র স্বভাবতঃ উজ্জ্বল হয়। কিন্তু তাহাতেও মানুষের তৃপ্তি নাই। সেই স্বভাবতঃ উজ্জ্বল বস্ত্রকে অধিকতর উজ্জ্বল করিবার জন্য তাহার উপর আবার কত রঙ চড়াইল। কেবল কি তাহাই? সেই সকল রঙিন রেশমী বস্ত্রকে আরও বেশী উজ্জ্বল করিবার জন্য তাহার মধ্যে মধ্যে সোণা-রূপা গালিয়া দিল। এইরূপে বেণারসী বস্ত্রের আবিষ্কার হইল। কিন্তু ইহাতে মানুষের উজ্জ্বলতার আকাঙ্ক্ষা ষোলকলায় পূর্ণ হইয়াছে কি না কে বলিবে? যদি হীরা গলাইয়া তাহা দিয়া রেশমী কাপড়ের ছোপ দেওয়া যায়, তখন বোধ হয় এই উজ্জ্বলতার স্পৃহা চরমে উঠিবে।

মানুষ কিন্তু বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা শরীরকে শতগুণে উজ্জ্বল করিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই। বস্ত্র ও অলঙ্কারে শরীরকে শতগুণে উজ্জ্বল করে সন্দেহ নাই, তবুও মানুষের মনে একটা মস্ত আপ্‌সোস্ থাকিয়া গেল। শরীরের এরূপ অঙ্গ আছে যাহা বস্ত্র ও অলঙ্কার দিয়া ঢাকে না। অথচ সেই মুখ ও হাত সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার উপায় কি? উপায় শীঘ্রই জুটিল। হরিদ্রা চন্দন, সিন্দুর, আলতা, পাউডার পমেটম রঙ্গ প্রভৃতি জিনিষ সেই আপ্‌সোস্ দূর করিবার জন্য আবিষ্কৃত

হইল। এখন মুখে পাউডার, চোখে কাজল, চুলে পমেটম সুসভ্য সমাজে উৎকৃষ্ট ফ্যাসন্ বলিয়া গণ্য। এমন কি আমার বোতাম,-পীরের জুতা পর্য্যন্ত উজ্জ্বল হওয়া দরকার। উজ্জ্বল কালো বার্ণিস্ জুতা ("Patent leather shoes") না পরিলে রাজদরবারে প্রবেশ নিষেধ।

এইরূপে মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সমগ্র শরীরকে উজ্জ্বল করিয়াও মানুষের তৃপ্তি নাই। মানুষের বাসভবন, গৃহসজ্জা, ভোজনপাত্র, প্রভৃতি যাহা কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্য আছে,—যে সকল দ্রব্যের মধ্যে, যে সকল দ্রব্য লইয়া মানুষ সর্ব্বদা থাকে, সে গুলিকেও উজ্জ্বল করিয়া রাখিতে ভাল বাসে। পাছে কোন মলিন দ্রব্যের সংস্পর্শে মানুষের বহুযত্ন-সঞ্চিত উজ্জ্বলতার হানি হয়! পাছে কোন মলিন দ্রব্যের মলিন রেখাপাতে তাহার দেহের শ্রী নষ্ট হয়! মানুষ যতই সুসভ্য হইতেছে ততই তাহার এই উজ্জ্বলতার আকাঙ্ক্ষা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এই উজ্জ্বলতার আকাঙ্ক্ষা এবং সেই আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি-সাধন-চেষ্টাকে বর্ত্তমান সময়ে সভ্যতার একটি বিশেষ অঙ্গ বলিয়া মনে হয়।

এই উজ্জ্বলতার আকাঙ্ক্ষা সকল মানুষেরই লক্ষণ সন্দেহ নাই, কিন্তু তবুও পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতিতেই ইহা বেশী দেখা যায়। ইহার কারণ কি? স্ত্রীজাতি ত পুরুষাপেক্ষা বেশী সুন্দর। তবে তাঁহাদের সৌন্দর্য্য-স্পৃহা এত অধিক কেন? কি কারণে তাঁহাদের রূপ-শোভাবৃদ্ধির জন্য সিল্ক, সাটীন, চেলি বেনারসী, বোম্বাই পারসী, নীলাম্বরী পিতাম্বরী প্রভৃতি কত রকম বহুমূল্য উজ্জ্বল বস্ত্র প্রতিনিয়ত প্রস্তুত হইতেছে? কি কারণেই বা স্বর্ণকার ও জহুরীগণ তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গে সোণা রূপা মণি মুক্তার আলোকচ্ছটা স্ফুরণ করিবার জন্য দিবারাত্রি মাথা খাটাইয়া নিত্য নূতন ফেসনের চূড়ী ব্রেসলেট, হার নেকলেস্ টায়রা মুকুটের উদ্ভাবন করিতেছে? আবার আরও এক আশ্চর্য্য ঘটনা এই স্বভাবতঃ যিনি যত অধিক সুন্দরী বসন-ভূষণের কৃত্রিম আলোকে উজ্জ্বল দেখাইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার তত অধিক? ধন-স্পৃহার ন্যায় উজ্জ্বলতা-স্পৃহারও সীমা নাই এই উজ্জ্বলতা-স্পৃহা মানবসমাজকে পাগল করিয়া রাখিয়াছে।

এই দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি কোথায়? হারানিধির পুনঃ-প্রাপ্তিতে চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহনক্ষত্রাদির ন্যায় মানবাত্মারও উজ্জ্বলতা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যে জ্যোতির জ্যোতিঃ পরম-জ্যোতিঃ হইতে চন্দ্র-সূর্য্যাদি তাহাদের উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, মানবাত্মা তাহার সহিত অভিন্ন। কিন্তু মানুষ তাহা বুঝিতে পারে না। বুঝিতে না পারিলেও, মানুষ কি ছিলাম কি হারাইয়াছি এইরূপ একটি অপরিস্ফুট অভাব বোধ করিয়া মণিহারা ফণীর মত তাহার অনুসন্ধানে এই সংসার-চক্রে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহারি আত্মা যেন পুনঃপুনঃ আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতেছে "আমি প্রকাশ হইব—আমি প্রকাশ হইব। মায়া, তোমার আবরণ অপসারিত কর। আমি স্বয়ং-প্রকাশ-স্বরূপ, আমাকে আবৃত করিয়া রাখে কাহার সাধ্য? ঐ দেখ চন্দ্র ফুটিতেছে, সূর্য্য ফুটিতেছে, তারা ফুটিতেছে, ফুল ফুটিতেছে—ইহারা জড় হইলেও যার

করা উজ্জ্বলতা বিকীরণ করিয়া ফুটিতেছে। আর আমি সেই পরমজ্যোতি-স্বরূপ হইয়া আবৃত থাকিব? কখনই না। আমার স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা আমাকে ফিরাইয়া দাও, আমি উজ্জ্বল হই।"

কিন্তু মায়ার আবরণ ভেদ করা কঠিন ব্যাপার। যে মহাপুরুষ তাহা ভেদ করিতে পারেন, তাঁহার আত্মার স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা প্রকাশ পায়। এমন কি কাচের আধার-মধ্যস্থ দীপশিখার ন্যায় তাঁহার আত্মার জ্যোতিঃ জড়দেহ ভেদ করিয়া ফুটিয়া বাহির হয়। তিনি আর কৃত্রিম উজ্জ্বলতার আকাঙ্ক্ষা করেন না। আর মায়ার অধীন, মায়াচ্ছন্ন জীব আমরা;—আমরা হৃদয়ের সেই চিরন্তন হাহাকার কথঞ্চিৎ প্রশমন করিবার জন্য কৃত্রিম উজ্জ্বলতার জন্য লালায়িত হই।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

ফিডো

সক্রেটিস্—কিন্তু যদি আত্মা জীবিতাবস্থায় কেবল শরীরের সেবা করিয়া থাকে এবং শারীরিক রিপু ও সম্ভোগ দ্বারা এতদূর বিভ্রান্ত হইয়া থাকে যে স্পর্শ, আহার, পান বা ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার উপায়ভূত এই শরীর ব্যতীত আর কাহাকেও সার বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না; বরং, যাহা শরীরী চক্ষুর নিকট নিরাকার এবং অন্ধকারময় কিন্তু বিজ্ঞানের চক্ষে পরিষ্কার এবং প্রত্যক্ষ, তাহাকে ঘৃণা ও ভয় করে এবং তাহা হইতে পলায়ন করে; তাহা হইলে তুমি কি মনে কর যে আত্মা এতদবস্থায় থাকিয়া মরণের পর নির্ম্মল এবং অকলঙ্কিত থাকিতে পারে?

সিবেস্—কখনই না।

সক্রেটিস্—অকলঙ্কিত থাকা দূরে থাকুক, আমার বোধ হয় যে সেই আত্মা আবার শরীরী মূর্ত্তিতে বদ্ধ হইয়া পড়িবে, যেহেতু সদা একসঙ্গে থাকিয়া এবং সর্ব্বদা শরীরের জন্য ভাবিত থাকায় শরীর আত্মার এক অংশ হইয়া পড়ে। এই শরীরযুক্ত আত্মা শরীরের ন্যায় জড়বৎ আকারযুক্ত এবং নিতান্ত পার্থিব। যখন শরীর আত্মাকে পাইয়া বসে, তখন আত্মা সেই ভাবেই অবনত হইয়া পড়ে এবং অদৃশ্য রসাতলের ভয়ে আবার এই বাহ্যিক জগতে ফিরিয়া আসে। এখানে সেই আত্মা পুনরায় ফিরিয়া আসিলে কেবল মৃত মনুষ্যের গোরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। আমরা মধ্যে মধ্যে গোরস্থানের নিকট এইরূপ আত্মার ছায়া কখন কখন দেখিতে পাই। এরূপ ছায়া আর কিছু নয় কেবল যে সকল আত্মা পৃথিবী হইতে অপরিষ্কৃত হইয়া চলিয়া যায় তাহাদেরই আকার। তাহাদিগের অপরিষ্কার ভাব আছে বলিয়া তাহাদিগকে এই প্রকার ছায়ারূপে দেখা যায়। ইহারা সৎলোকের আত্মা নহে। দুর্বৃত্ত লোক পূর্ব্ব জীবনের পাপ-সমূহের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এইরূপ আকার ধারণ করিয়া পৃথিবীময় ভ্রমণ করে। এইরূপ ভ্রমণ তাহারা চিরকাল

করিবে যতদিন পর্য্যন্ত না তাহারা আর একটী শরীরে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহাদিগের ভিতরে শরীরের মায়া আছে, সেই হেতু তাহারা পুনর্ব্বার শরীর লইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং তাহারা যেরূপ জীবন অবলম্বন করিয়াছিল, তদনুরূপ শরীর পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হয়।

সিবেস্—কিরূপ শরীর তাহারা প্রাপ্ত হয়?

সক্রেটিস্—কেন, আমার বোধ হয় যাহারা পূর্ব্বজন্মে ঘোর পেটুক এবং পানাসক্ত ছিল কিম্বা কেবল রিপু-চরিতার্থতায় মগ্ন ছিল এবং কোন প্রকারে আত্মসংযম করিতে পারে নাই তাহারা গর্দ্দভ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে। এবং যাহারা অন্যায় আচরণ, স্বেচ্ছাচার এবং দুর্দ্দান্ত ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, তাহারা নেকড়ে বাঘ, শিকরে পাখি এবং চীল হইয়া পুনর্ব্বার জন্মাইবে। যে আকারেই তাহাদিগের জন্ম হউক না কেন তাহা তাহাদের প্রবৃত্তির অনুরূপ হইবে। যাহারা দর্শনশাস্ত্রের সাহায্য না লইয়া কেবল অভ্যাসবশতঃ ন্যায় আচরণ এবং মিতাচার অভ্যাস করিয়া আসিয়াছে, তাহারাই প্রকৃত সুখী এবং তাহারাই উত্তম স্থানে যাইবার অধিকারী।

সিবেস্—তাহারা সুখী কি ভাবে?

সক্রেটিস্—যেহেতু তাহারা আবার সামাজিক ভদ্র ব্যবহার লইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে পারে। মধুমক্ষিকা, বোলতা কিম্বা পিপীলিকা হইয়া, অথবা এমন হইতে পারে যে তাহারা সৎলোক হইয়া মনুষ্যদিগের মধ্যে আবার জন্মাইতে পারে।

কিন্তু যে লোক সমস্ত জীবন জ্ঞানচর্চ্চাতে সমর্পণ করে নাই, যে লোক এই পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে নাই, যে লোক প্রকৃতজ্ঞানকে ভালবাসে নাই সে কখনও দেবতাদিগের সমকক্ষ হইতে পারে না। এই জন্য জানিবে প্রকৃত জ্ঞানীরা সর্ব্বপ্রকারে নিষ্কাম হইয়া থাকেন। তাঁহারা কোন প্রকারের কামনার বশীভূত হন না।

সিবেস্—কেনই বা তাঁহারা কামনার বশীভূত হইবেন?

সক্রেটিস্—সেই জন্য বলিতেছি যে যাঁহারা আত্মার জন্য ব্যাকুল এবং যাঁহারা শরীরের চরিতার্থতা সাধনে পরাঙ্মুখ, তাঁহারা কখন সাধারণ লোকের মত চলেন না। এই সকল লোক কোথায় যাইতেছে তাহা জানে না। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী কখনও জ্ঞানশাস্ত্রের বিরোধে গমন করেন না। যে দিকে সেই জ্ঞানশাস্ত্র যাইতে বলিবে সেই দিকে তাঁহারা যান।

সিবেস্—ইহার কারণ কি?

সক্রেটিস্—যিনি জ্ঞানী তিনি জানেন যে তাঁহার আত্মা শরীরের দ্বারা বদ্ধ এবং দৃঢ়ভাবে যুক্ত; সমুদয় জগৎকে যেন একটী কারাগারের লৌহদণ্ডের ভিতর দিয়া তিনি দেখেন। তিনি আরও জানেন যে তাঁহার আত্মা অজ্ঞানরূপ পঙ্কে মগ্ন আছে এবং তাঁহার শরীররূপ কারাগার কামনা-চরিতার্থতার হেতু সর্ব্বদা এত বলবান। সেই বল মানুষের কামনা হইতে উৎপন্ন। সেই জন্য বলা যাইতে পারে যে মানুষ আপনাকেই আপনি বন্দী করে।

প্রকৃত বিজ্ঞান আত্মাকে অতি ধীরভাবে নিষ্কৃতি পাইতে শিক্ষা দেয়। তাহার মতে চক্ষু কর্ণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সংস্কার হয় তাহা ভ্রান্ত এবং প্রবঞ্চনাপূর্ণ। সেই জন্য

সে আত্মাকে বলে—ইতস্ততঃ পার ইন্দ্রিয় হইতে বিচ্ছিন্ন হও এবং আপনাতে প্রবেশ করিয়া আত্মসংবৃত হও। আপনাকে ছাড়া আর কাহাকেও বিশ্বাস করিও না এবং যে সত্তা ইন্দ্রিয়ের অতীত যাহাকে আপনা আপনি চিন্তা করা যায়, সেই সত্তা যাহা বলিবে তাহাও বিশ্বাসযোগ্যই। এতদ্ব্যতীত যাহা কিছু মনোবৃত্তির দ্বারা পরিবর্ত্তনশীল এবং নানারূপবিশিষ্ট বলিয়া উপলব্ধি কর তাহা সমুদয় মিথ্যা, যেহেতু ইহারা সাকার এবং ইন্দ্রিয়রাজ্যের পদার্থ। যে পদার্থ তুমি আপনা আপনি দেখিতে পাও, যাহা দেখিবার জন্য চক্ষু কিম্বা কর্ণের প্রয়োজন নাই, তাহাই নিরাকার চিন্ময় রাজ্যের বস্তু। যে প্রকৃতজ্ঞানের প্রার্থী সে শরীর হইতেই একেবারে নিষ্কৃতি পাইতে চায়। সে সকল প্রকার আনন্দ এবং কামনা, কষ্ট এবং ভয় মন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়, কারণ যে লোক এই সকল দ্বারা বিচলিত হয় তাহার দুর্ভাগ্য নিতান্ত সামান্য নহে। (ক্রমশ)

৺ কৃষ্ণবিহারী সেন

মুগ্ধা

(

বর্ষার প্রাদুর্ভাবে নরেন্দ্র সুশীলাকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিলেন। তখন সুশীলার শরীর অনেকটা সুস্থ ও সবল হইয়াছে, কিন্তু ব্যায়রাম একেবারে সারে নাই। প্রায়ই বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করিয়া হাত পা হিম হইয়া আসে, কিন্তু সে ভাব অতি অল্পক্ষণ থাকে। কলিকাতায় আসিয়া সুশীলা পিত্রালয়েই যাইল, নরেন্দ্রও দু'চার দিন সেখানেই রহিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় সুশীলা অলস ভাবে বিছানায় শুইয়া শুইয়া সমস্ত অবস্থা আলোচনা করিতেছিল। ধীরভাবে ভাবিয়া চিন্তিয়া সে দেখিল সে আর বিলম্ব করা তাহার পক্ষে উপযুক্ত নয়। কেবল যে সে আত্মগোপন করিয়া নিজেকে অপরাধী বিবেচনা করিতেছিল তাহা নহে। তাহার মনে হইতেছিল যে অনিলের সহিত নরেন্দ্রের যেরূপ সৌহার্দ্দ্য তাহাতে কথাটা একদিন বাহির হইয়া পড়িবেই। তখন আর তাহার সকল অবস্থা বুঝাইয়া বলিবার অবকাশ থাকিবে না। সুতরাং সেই দিন আসিবার পূর্ব্বে লজ্জার মাথা খাইয়া সব কথা বলিয়া ফেলা দরকার। সুশীলা স্থির করিল, "আজ রাত্রেই তাঁহাকে সকল কথা বলিব, আমার অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে।"

পাশের ঘরে যোগেন্দ্র বাবু আসিয়া সুশীলার মাতাকে বলিলেন, "জামাই তো এখনি যেতে চায় গো।"

গৃহিণী বলিলেন "এত হঠাৎ! সন্ধ্যা হয়েছে, খাওয়া দাওয়া করে আজকের রাতটা থেকে কাল সকালে গেলেই হবে।"

"আমি তা বলেছিলাম, কিন্তু সে কিছুতেই শুনলে না। আজই না কি তার যাওয়া দরকার, কি একটা কাজ আছে।"

সুশীলার মাথায় বাজ পড়িল। তাহার কল্পিত সকল আয়োজন ব্যর্থ হইল। কিন্তু সে তাহার হৃদয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রচ্ছন্ন ভাবে একটু আরামও উপলব্ধি করিল, তাহার ভাগ্য-পরীক্ষার দারুণ সময়টা যে কিছু দিন পিছাইয়া গেল তাহাতে সে অপ্রসন্ন হইল না।

কিন্তু যখন কিছুকাল পরেই সে শুনিল যে নরেন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন তাহার সহিত দেখাও করিয়া যান নাই, তখন সে কাঁদিয়া ফেলিল, দারুণ অভিমানে সে বিছানায় পড়িয়া লুটিয়া কাঁদিতে লাগিল। একটা কঠোর সন্দেহ থাকিয়া থাকিয়া তাহাকে পীড়িত করিতে লাগিল। সত্য কি নিতি জানিয়াছেন? অনিল কি চিঠিতে সব কথা তাঁহাকে খুলিয়া লিখিয়াছে? এই আশঙ্কায় তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

পরদিন সুশীলা অনিলের পত্রখানা পাইল। তখন সে একেবারে বসিয়া পড়িল। দেখিল পত্রখানা তিনমাস পূর্ব্বের লেখা। ছাপ দেখিয়া বুঝিল পত্রখানা এখানে খোলা হইয়াছিল। সে ঠিক বুঝিল পত্রখানা তাহার স্বামীর হাতে পড়িয়াছিল। তিনি তাহা খুলিয়া দেখিয়াছেন।

পত্রখানি দার্জ্জিলিং যাইবার পূর্ব্বেই আসিয়াছিল। তখন সুশীলার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ, তাহাকে চিঠি দেওয়া হয় নাই। নরেন্দ্র অজ্ঞানকৃতভাবে চিঠিখানা বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিলেন, এতদিন তাহার কথা মনে পড়ে নাই। দার্জ্জিলিং হইতে ফিরিয়া বাক্স খুলিতেই চিঠিখানার উপর দৃষ্টি পড়িল। অনিলের হস্তাক্ষর দেখিয়া নরেন্দ্র একটু চমকিত হইলেন। ঔৎসুক্যবশতঃ চিঠিখানা খুলিলেন। চিঠিখানা শক্ত করিয়া আঁটা ছিল না, সহজেই খুলিয়া গেল। চিঠি পড়িয়া নরেন্দ্র স্তম্ভিত হইলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ বাড়ী চলিয়া গেলেন, এবং অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহা পুনরায় আঁটিয়া তাকে ফেলিয়া দিলেন।

(১২)

অনিল যে কেন সুশীলাকে চিঠিখানা লিখিয়াছিল তাহা সে জানিত, তবু এ কথা সে নিজের কাছেও স্বীকার করিত না। সে কেবল এই বলিয়া আপনাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিত যে দুঃখের আতিশয্যে সে সুশীলাকে মনের কথা না জানাইয়া থাকিতে পারে নাই বলিয়াই চিঠি খানা লিখিয়াছিল। যা হোক অনিল বড় নিঃস্বার্থ প্রেমিক ছিল না; সুশীলাকে কষ্ট দেওয়াই তাহার অভিপ্রেত ছিল। এমন কি চিঠিখানা সুশীলার স্বামীর হাতে পড়ুক এরূপ একটা প্রচ্ছন্ন অভিলাষও সে পোষণ করিত। কিন্তু তবু সে কেবলই মনকে চোখ ঠারিত।

প্রকৃত পক্ষে তাহার প্রথম দুঃখ-বেগ প্রশমিত হইলে সে সুশীলাকে একটা খুব বড় রকমের শিক্ষা দিবে মনে মনে এইরূপ স্থির করিল। এমন একটা কিছু তার করা চাই যাহাতে সুশীলা মনে মনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবে। সে অন্ত সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াটা সর্ব্ব প্রথমে কর্ত্তব্য বলিয়া সে মনে করিল। সে যদি দেশে একটা প্রকাণ্ড রিভিলিয়ান হইয়া ফিরিতে পারে এবং কোন রমণীললামকে বিবাহ করিয়া সুশীলাকে অবজ্ঞার সহিত তাহাই দেখাইতে পারে, তবে সুশীলা যে মনে মনে পুড়িয়া মরিবে সে

বিষয়ে তাহার কোনও সন্দেহ ছিল না। সুশীলার তখন হয় তো মনে হইবে যে ইচ্ছা করিলেই এত বড় একটা লোকের গৃহিণী সে হইতে পারিত; বিশেষতঃ যখন সে অন্য স্ত্রীলোককে অনিলের সঙ্গে দেখিবে তখন ত সে নিশ্চয় হিংসায় পুড়িয়া মরিবে।

এই স্থির করিয়া আবার সে বিপুল চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের সহিত পড়াশুনা আরম্ভ করিল। তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার জন্য সে কিছুমাত্র গ্রাহ্য করিল না ভূতের মত খাটিতে লাগিল।

আর এক দিকে সুশীলার মোহ কাটাইবার জন্য সে সেখানকার হীনচরিত্র রমণীদের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ করিল, এবং মাতালের পাপও তাহার ভিতর প্রবেশ করিল।

এত করিয়াও সে পরিশ্রমের বলে সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল এবং এক বৎসর পরে চাকরীতে যোগদান করিবার জন্য কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

(১৩)

নরেন্দ্রনাথ যখন অনিলের পত্রখানি পাইলেন তখন তাঁহার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মাথায় উঠিল! মুহূর্ত্ত মধ্যে পৃথিবী তাহার কাছে অন্ধকার হইয়া গেল, তাঁহার যেন আর এই বিশাল বিশ্বের মধ্যে দাঁড়াইবার ঠাঁই রহিল না। সে অবস্থায় কি কর্ত্তব্য তাহা তিনি কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ স্বভাবতঃ অতি ধীরপ্রকৃতি, এবং সুশীলার প্রতি তাঁহার প্রেম অপরিমেয়। সেই জন্য তিনি স্থির করিলেন, সহসা কোনও কার্য্য করাই সঙ্গত নয়, ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবেন। অতএব সর্ব্ব প্রথম কর্ত্তব্য সুশীলা হইতে দূরে যাওয়া। তিনি তাই করিলেন।

বাড়ীতে আসিয়াই তিনি অনিলকে এক-খানি পত্র লিখিলেন। তাহাতে তিনি অনিলের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাহাকে তাহার নিরাশ-প্রণয়ের বিস্তারিত কাহিনী লিখিয়া জানাইতে লিখিলেন। তাহার প্রণয়িনী যে তাঁহারই স্ত্রী, এ কথার কিছুমাত্র আভাস দিলেন না। মনে মনে আশা করিলেন যে হয় তো অনিলের পত্র সুশীলাকে বিশ্বাস করিবার কোনও একটা পথ বাহির করিয়া দিবে। একবার মনে হইয়াছিল সুশীলাকে সামনা সামনি কথাটা জিজ্ঞাসা করিবেন, কিন্তু সাহস হইল না। তাঁহার আপনার উপর এতটা বিশ্বাস ছিল না। ভাবিলেন পাছে কি করিতে কি করিয়া ফেলিবেন, তাই সুশীলা হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিলেন।

এদিকে সুশীলা দারুণ যাতনায় ছট্ ফট্ করিতেছিল। একবার স্বামীকে সম্মুখে পাইয়া সকল কথা ব্যক্ত করিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া গেল। তাহার পিতা তাহার অবস্থা দেখিয়া দুই একবার জামাইকে আনিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু জামাই এটা ওটা ওজর করিয়া এড়াইতে লাগিল। যোগেন্দ্র বাবু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বাড়ী ফিরিলেন। তাঁহার সহৃদয় চিত্ত সহজেই বুঝিল তাঁহার জামাই মেয়েতে একটা কিছু গুরুতর মনোবাদ উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার প্রতিকারের উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না।

দুই মাস যখন অতীত হইয়া গেল তখন সুশীলা মুখ ফুটিয়া মাকে বলিল আমাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া দেও। মাতা তাহাতে আপত্তি করিলেন না. সুশীলা শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেল।

যখন সে গাড়ী হইতে নামিল তখন তাহার স্বামী, তার শ্বশুর ও দেবরের সঙ্গে বাহিরের ঘরে বসিয়া ছিলেন। তাহাকে আসিতে দেখিয়া স্বামী মৃদু হাসিয়া একবার তাহার দিকে দৃষ্টি করিলেন। সে দৃষ্টি দেখিয়া সুশীলা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল। তাঁহার পূর্ব্বের মত সেই সৌম্য মূর্ত্তি ও মধুর হাস্য দেখিয়া সে অবাক্ হইয়া গেল। তবে কি সবই তাহার ভুল? তাহার স্বামী কি অনিলের পত্র দেখেন নাই? সে স্বামীর নিকট প্রত্যাখ্যান পত্যাশা করিয়াছিল. এ মৃদু মধুর হাস্য তাহার কল্পনায় আসে নাই।

বউ হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় বাড়ীতে একটা হলস্থুল পড়িয়া গেল। শাশুড়ী বধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন. সুশীলা বলিল,- "আপনারা তো আর মেয়েকে স্মরণ করবেন না, তাই আপনিই আসতে হল।"

শাশুড়ী বলিলেন, "সে কি কথা মা, তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী, তোমায় খবর নেব না সে কি কথা? তবে ছেলেও বলে উনিও বলেন যে. এত বড় অসুখটা গেল, দু'দিনবাপের বাড়ী থাক। তা আপনি এসেছ ভালো করেছ মা, তোমার আপনার বাড়ী তুমি আপনি আসবে সে তো ভাল কথা।"

ননদিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বৌদি দাদাকে ছেড়ে বুঝি আর থাকতে পারলে না?"

সুশীলা হাসিয়া বলিল, "কি করি ভাই, কৃষ্ণচন্দ্র যখন মথুরায় রাজা হয়ে বসলেন, তখন রাধিকাকেই সাধিতে সেখানে যাইতে হইয়াছিল। তোমার দাদার লীলা তো কৃষ্ণলীলার চেয়ে কম নয়। তোমাদের মত ননদিনী-সত্যভামার হাতে বেশী দিন ফেলিয়া রাখিয়া কি শেষে একেবারে বেহাত করিব।"

ননদ বৌকে ঠোনা মারিয়া সরিয়া পড়িলেন। সেখানে গিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হইল।

নরেন্দ্র মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো. শরীর বেশ সেরেছ তো?"

অভিমানিনীর মান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সুশীলা বলিল "সে খবরে কি তোমার প্রয়োজন আছে? আমি বাঁচি-মরি তাতে তোমার কি?"

নরেন্দ্রনাথ বলিলেন. "বটে দুদিনেই কি পূর্ব্বের কথা সব ভুলে গেলে?

"সে দিন আর এ দিনে ঢের তফাৎ। এ দু'মাসের মধ্যে কি এ বাড়ী থেকে ও বাড়ী একটা সংবাদও নিতে পারলে না!" বলিয়া সুশীলা কাঁদিয়া ফেলিল।

"পাগল! তুমি মিছে কাঁদ কেন? কাজকর্ম্মের ভিড়ে যেতে পারিনি। আর দু'মাস কি বেশী দিন?"

সুশীলা আর কিছু বলিতে পারিল না, দেখিল আপনি বোকা বনিয়া বসিয়াছে। কেবলি কাঁদিতে লাগিল। সে-রোদন সম্বরণ করিলে নরেন্দ্র বলিলেন, "কি মনে করে এলে?"

এ কথার উত্তর সুশীলা কি দিবে ভাবিয়া পাইল না। শেষে মুখ ফুটিয়া বলিল, "একটা কথা তোমাকে বলিব বলিয়াছিলাম; মরণ তো হইল না, সেই কথাটা এখনি বলা দরকার বলিয়া আসিয়াছি।"

নরেন্দ্র বলিলেন "সে কথাটা কি বলা এতই দরকার? আমি তো তোমার কাছে কিছু জানিতে চাই নি।"

সুশীলার মুখে আসিল, "তুমি জানিতে চাওনি বলেই তো আমি যাচিয়া আসিয়াছি।" কিন্তু সে কথা সে বলিল না, বলিল "না সে কথা আমার না বলিলেই নয়।"

"ইচ্ছা হয় বলিতে পার, কিন্তু তোমার কোনও গোপনীয় কথা থাকিলে আমি তাহা শুনিতে চাই না।"

"তোমার কাছে আমার লুকাইবার কি আছে? তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব!" বলিয়া সুশীলা আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

নরেন্দ্রনাথ একটু গম্ভীর হইলেন, "তিনি অনুভব করিতেছিলেন যেন থিয়েটারে অভিনয় করিতে বসিয়াছেন। স্ত্রীর সঙ্গে কেমন ভাবে ব্যবহার করিবেন দুইমাস যেন তাহারই আবৃত্তি করিয়াছেন, এবং সেই শিক্ষার যেন আজ পুনরাবৃত্তি করিতেছেন। তাঁহার কথাগুলির মধ্যে কোনও আন্তরিকতা ছিল না।

আসল কথা, দিন দুই পূর্ব্বে নরেন্দ্রনাথ অনিলের পত্রের উত্তর পাইয়াছেন। তাহাতে অনিল সমস্ত বৃত্তান্ত সরলভাবে ব্যক্ত করিয়াছে। তবে সুশীলা যে তাহার প্রতি তীব্র কটাক্ষ ও পরুষ উক্তি করিয়াছিল সে কথা লিখিতে ভুলিয়াছিল। পত্র পাইয়া নরেন্দ্রনাথের মনে হইল তিনি নিষ্ঠুর ভাবে প্রবঞ্চিত হইয়াছেন। তেমনি একটা নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা লইবার ইচ্ছা মনে জাগিয়া উঠিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তায় নিদারুণ প্রতিহিংসার উপায় স্থির করিলেন। তিনি স্বভাবতঃ ধীরপ্রকৃতি, তাই অত্যন্ত শান্ত ভাবে ভাবিয়া চিন্তিয়া স্ত্রীকে তুষানলে দগ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। স্থিরচিত্তে তিনি অনিলের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনিল আসিলে তবে তাঁহার প্রতিহিংসার আয়োজন সম্পূর্ণ হইবে। সুতরাং স্থির করিলেন অনিল আসিবার পূর্ব্বে স্ত্রীর সহিত কোনও রূপ অসদ্ব্যবহার করিবেন না বা তাহাকে জানিতে দিবেন না যে তিনি সকল জানিয়াছেন। সেই জন্য তিনি এ অভিনয়ে নিযুক্ত হইলেন।

এখন আর সুশীলার সে কথা বলা হইল না, নরেন্দ্রনাথ অন্য কথায় সে কথা চাপিয়া দিলেন। সুশীলা নরেন্দ্রনাথের ভাবান্তর কতকটা লক্ষ্য করিল, কিন্তু ব্যবহারে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে নরেন্দ্র চিঠি দেখিতে পান নাই। যখন তাহার এইরূপ স্থির বিশ্বাস হইল তখন আবার তাহার সে সঙ্কল্প শিথিল হইল। যত লজ্জা আসিয়া তাঁহার মনের উপর চাপিয়া বসিল। আর সে সে কথা বলিতে পারিল না। (ক্রমশঃ)

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত।

হিন্দুর ধর্ম্ম

হিন্দুধর্ম্ম কথাটা আধুনিক, শাস্ত্রীয় নহে। শাস্ত্রে ইহার নাম সনাতনধর্ম্ম। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে এই সনাতনধর্ম্মের সবিস্তার বর্ণনা আছে। সে আলোচনা আর একদিন করিব। কিন্তু শাস্ত্রীয় না হইলেও, লোক-সমাজে হিন্দুধর্ম্ম কথাটা খুবই চলিয়া গিয়াছে। হিন্দুর ধর্ম্মকেই এখন লোকে হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া জানে। হিন্দুও আপনার ধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া জানেন। আর হিন্দুর ধর্ম্মই যদি হিন্দুধর্ম্ম হয়, তবে হিন্দু কে, সকলের আগে তারই মীমাংসা হওয়া আবশ্যক।

আজিকালি এ মীমাংসা করা সহজ নহে। একদিন হিন্দু বলিতে জগতের লোকে সিন্ধু নদের দেশের লোককে বুঝিত। হিন্দু শব্দ যাবনিক, সংস্কৃত নহে। সংস্কৃতে যাকে সিন্ধু বলে, যবনজিহ্বায় তাহাই হিন্দু হইয়া যায়। অতিশয় প্রাচীন কালে, মোহম্মদের জন্মের বহুসহস্রাব্দ পূর্ব্বে, খ্রীষ্টের জন্মের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে, আসিরীয়, বেবিলোনীয় প্রভৃতি বিদেশীয়েরা, আমাদের দেশে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন। এখন যেমন, সেকালেও সেইরূপই সিন্ধুনদ আমাদের উত্তরপশ্চিম দ্বারে প্রহরী হইয়া ছিলেন। আমাদের সিন্ধু, তাঁদের জিহ্বায় হিন্দু হইয়া যায়। সিন্ধু যে দেশের সীমানা, সে দেশ হিন্দু-নাম লাভ করে। সে দেশের লোকেরাও হিন্দু বলিয়া পরিচিত হয়। সেই অতি প্রাচীন কালে, ভারতবর্ষের লোকেরাই হিন্দু বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ভারতবর্ষের যে ধর্ম্ম, তাহাই হিন্দুর ধর্ম্ম বা হিন্দুধর্ম্ম নাম প্রাপ্ত হয়।

এই কারণে হিন্দুধর্ম্ম চিরদিনই লোকের ধর্ম্ম হইয়া আছে, মতের ধর্ম্ম হইয়া উঠে নাই। এই ভারতবর্ষে কখনো একটা মত, বা একটা সম্প্রদায় ছিল না। অথচ এই সকল বিভিন্ন মত, পন্থা ও সম্প্রদায়ের মধ্যে মোটামুটি একটা সাধারণ ভাব এবং আদর্শও বিদ্যমান ছিল। তখন হিন্দু কে, তার চেহারায়, তার কথাবার্ত্তায়, তার চাল-চলনে, তার শিক্ষা ও সাধনায় আপনা হইতেই ধরা পড়িত। অথচ সে বিশেষত্ব টুকু যে কি, নিক্তির ওজনে তাহাকে তৌল করিয়া পৃথক করা সম্ভব ছিল না। আজো কি, এ কথা সত্য নয়? হিন্দুত্ব যে কি তাহা হিন্দুর চেহারায়, চালে, চরিত্রে, আপনি যেন বাহির হইয়া পড়ে। অঙ্ক কষিয়া বীজগণিতের সমস্যার ন্যায়, তাহার মীমাংসা করিতে হয় না।

কিন্তু যে জিনিস যত সহজে, আপনা হইতেই বোঝা যায়, তার বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দেওয়া অনেক সময়েই সেই পরিমাণে যেন কঠিন হইয়া পড়ে। হিন্দু কে, ইহা দেখিয়া ঠাওর করা যত সহজ, ভাষায় বর্ণনা করা তত সহজ নয়। খৃষ্টিয়ান্ কে, মুসলমান কে, বৌদ্ধ কে, এ সকলের উত্তর ভাষায় দেওয়া যায়। এঁদের কতকগুলা নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ আছে। যিশুখৃষ্টের ধর্ম্ম যে যাজনা করে, সেই খৃষ্টিয়ান্। মোহম্মদের ধর্ম্ম যে যাজনা করে, সেই মুসলমান। বুদ্ধদেবের পন্থা যে অনুসরণ করে, সেই বৌদ্ধ। এ কথা বলা সহজ, বোঝাও একান্ত কঠিন নয়। বাইবেল-গ্রন্থে যিশুর জীবন ও উপদেশ

লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। বাইবেল পড়িলেই খৃষ্টীয়ান কে তাহা একরূপ বুঝিতে পারি। কোরাণ পড়িয়া মুসলমানের ধর্ম্ম চেনা যায়। বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠে, বুদ্ধদেবের প্রদর্শিত পন্থা যে কি, তাহাও মোটামুটি জানা সম্ভব। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্মের এইরূপ কোনো বিশেষ প্রবর্ত্তক নাই। এখানে কোনো অবতার বা মহাপুরুষের অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রাধান্য নাই। হিন্দুধর্ম্মে কোনো শাস্ত্রবিশেষের এরূপ অনন্য-প্রতিযোগী প্রামাণ্য নাই। কোনো একটা বিশেষ নিয়মে বা তত্ত্বে, পন্থায় বা সাধনে, হিন্দুধর্ম্ম কদাপি আবদ্ধ হয় নাই। এখানে অনেক অবতারের, অনেক মহাপুরুষের, অনেক শাস্ত্রের, অনেক মন্ত্রের, অনেক তন্ত্রের, অনেক আচারানুষ্ঠানের, অনেক ব্রতনিয়মের, অনেক ক্রিয়াকলাপের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই, আর এ সকলের মধ্যে যে কোনো একটা অনতিক্রমণীয় ঐক্য আছে, তাহাও লোক-চক্ষে ধরা পড়ে না।

বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।

বেদ সকল পরস্পর হইতে ভিন্ন, স্মৃতি-সকল পরস্পর হইতে ভিন্ন, তিনি মুনিই নন, যাঁর মত অপর মুনির মত হইতে অভিন্ন নহে—ইহাই তো হিন্দুধর্ম্মের সনাতন প্রকৃতি।

সত্য বটে, মনু কহিতেছেন যে হিন্দুর ধর্ম্ম বেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম যে ভাবে বাইবেলের উপরে প্রতিষ্ঠিত, মোহম্মদীয় ধর্ম্ম যে ভাবে কোরাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুর ধর্ম্ম ঠিক সেই ভাবে ও সেই অর্থে যে বেদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, এমন কথাই কি বলিতে পারা যায়? যে অর্থে সাধারণ খৃষ্টানেরা বাইবেলের অতি-প্রাকৃত প্রামাণ্যে বিশ্বাস করেন, হিন্দু কি কখনো এইরূপ আপনার বেদের অতিপ্রাকৃত প্রামাণ্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পাইয়াছেন? মুসলমানেরা যে ভাবে কোরাণ-সম্বন্ধকে ফেরেস্তা গেব্রিয়েলের হাত দিয়া স্বয়ং খোদা-তালার প্রেরিতপুরুষ বলিয়া মনে করেন, হিন্দু কি কখনো আপনার বেদকে সে চক্ষে দেখিতে চাহিয়াছেন? যিহোবা যেরূপ আপনার আঙ্গুল দিয়া প্রস্তর-ফলকে ইহুদীদিগের শাসনের জন্য দশাজ্ঞা খুদিয়া, সিনাই পর্ব্বতে, মুসার হাতে দিয়াছিলেন,—হিন্দুর শাস্ত্রে অনেক অদ্ভুত অলৌকিক কথা আছে, কিন্তু বেদ সম্বন্ধে কি সেরূপ কোনো অলৌকিক কিম্বদন্তীর আভাষ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়? বাইবেল কুত্রাপি আপনার অকিঞ্চিৎকরতার কথা স্বয়ং সাহস করিয়া প্রচার করিতে পারেন নাই। কোরাণ কোথাও আপনার প্রামাণ্য অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠতর কোনো প্রামাণ্য আছে, এমন কথা বলিয়াছেন কি? কেবল হিন্দুর বেদই এ অসমসাহসিকতা দেখাইয়াছেন। শাস্ত্রের প্রামাণ্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে উপনিষদ বলিতেছেন,—বেদিতব্য বিদ্যা দ্বিবিধ; এক অপরা, অন্য পরা। আর ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ, প্রভৃতি বেদের ষড়ঙ্গ এই সমুদায় অপরা বিদ্যা। যাহা দ্বারা সেই অক্ষয় পুরুষকে অধিগত করিতে পারা যায় তাহাই পরা বিদ্যা।

আর এই অক্ষয় পুরুষকে মানুষ কখনই একান্তভাবে অধিগত করিতে পারে নাই,

কখনো পারিবেও না। এ সেই সাধনা যার সিদ্ধি আছে, কিন্তু শেষ নাই। এ যে সেই জানা, যাতে যত জানি ততই আরো জানিবার বাকি থাকে। সুতরাং এখানে কেহই এমন কথা বলিতে পারেন না যে তুমি কাল যাহা জানিয়াছিলে, তাহাতেই সকল জানা শেষ হইয়া গিয়াছে, তার উপরে আর কিছুই জানিবার নাই। কাল যাহা পাইয়াছ, তাহাই চূড়ান্ত, তার বেশী আর কিছু এখানে পাইবার নাই। প্রাচীনতম কালে মন্ত্রদর্শী ঋষিরা সকল জ্ঞাতব্য জানিয়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন, আর নূতন মন্ত্রের প্রকাশের অবসরমাত্র নাই। কি জ্ঞানে, কি ভোগে, কি সেবায় অক্ষর পুরুষ সম্বন্ধে এরূপ নিঃশেষ সাধনা কল্পনাও করা যায় না। বরং—

জনম অবধি হম রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে পর রাখনু,
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

এই সাধ্যের এই কথা। সুতরাং নবীন সাধককে কেবলই প্রাচীনতম সাধনা ধরিয়া চলিতে হইবে, নবীন তত্ত্বদৃষ্টিকেও কেবল পুরাতন বংশপরম্পরাগত তত্ত্বেরই রোমন্থন করিতে হইবে, কোনো নূতন পন্থা আবিষ্কৃত, কোনো নূতন বেদ প্রকাশিত হইবে না, হইতে পারে না,—হিন্দু যতই কেন ঋষিত্ব ও রক্ষণশীল হউন না, কদাপি এমন অদ্ভুত কথা বলেন না। হিন্দুর ধর্ম্মে অবতার এক নহে, বহু ও অনন্ত। যুগে যুগে হিন্দুকে অধর্ম্মের দুর্ভার হরণার্থে মর্ত্ত্যভূমে অবতীর্ণ হন।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত,
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।

যখনই যখনই, হে ভারত, ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃজন করিয়া থাকি। আর এইরূপ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া হিন্দুর অবতারগণ যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। এই যুগধর্ম্মের অর্থই এই যে এক যুগের যাহা ধর্ম্ম, অপর যুগের ধর্ম্ম তাহা হইতে বিভিন্ন। সুতরাং যাহা পাইয়াছি, তাকেই কেবল ধরিয়া থাকিতে হইবে; নূতন সত্য, নূতন তত্ত্ব, অর্জ্জন অসম্ভব, কেবল প্রাচীনেরই সব সাধনা করিতে হইবে; নূতনের জন্য তপস্যা অনাবশ্যক, কারণ নূতন সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই; হিন্দু কদাপি এ কথা বলেন না। শাস্ত্রবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের প্রাচীর দ্বারা আপনার নিত্যমুক্ত আত্মাকে মোহবশতঃ সযত্নে আবেষ্টিত করিয়া, কোনো লোকবিশেষে এরূপ কথা বলিলেও, যে সাধারণ হিন্দুসাধনা যুগযুগান্ত ব্যাপিয়া হিন্দুর চরিত্র ও ইতিহাসের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে সনাতন সাধনায় এরূপ বদ্ধভাবের স্থান নাই। এখানে সকলই মুক্ত।

অতএব হিন্দুর সনাতন সাধনায়, খৃষ্টীয়ানের বাইবেল বা মুসলমানের কোরাণের মত, বেদ প্রকৃতপক্ষে কোনো পুস্তকবিশেষে আবদ্ধ নহে। হিন্দু যাহাকে বেদ বলেন, যে বেদের উপরে, এক অর্থে সত্য সত্যই হিন্দুর ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, সে বেদ কেবলমাত্র প্রাচীন কিম্বদন্তীর উপরে প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। হিন্দুর বেদের প্রামাণ্যে কোনো অপ্রাকৃতত্বের দাবী-দাওয়া নাই। বেদের

প্রামাণ্য মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের অপরোক্ষানুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই অপরোক্ষানুভূতি সার্ব্বজনীন বস্তু। সকলেরই এই অপরোক্ষানুভূতিলাভ সহজ নয়, কিন্তু সাধ্যায়ত্ত। সাধন অবলম্বনে, সিদ্ধির অনুকূল অবস্থালাভে, মানুষমাত্রেই এই ঋষিত্ব লাভ করিয়া মন্ত্রের বা তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাইতে পারেন। এক জন্মে না হউক, বহু বহু জন্মে মানুষ তত্ত্বসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হইতে পারেন। এখানে অলৌকিক বা অমানুষিক কোনো কিছুই নাই। চাই কেবল মানুষী সাধনার ও ভাগবতী করুণার অহেতুকী যোগাযোগ। এই যোগাযোগ ঘটিয়া যুগে যুগে নূতন নূতন মন্ত্রের প্রকাশ ও নূতন নূতন বেদের প্রচার হইয়াছে। একদিন ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব, এই চারি খানা বেদই ছিল। ক্রমে মহাভারত পঞ্চম বেদরূপে পূজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের ভাগবতজন মধ্যে শ্রীশ্রীমদ্ভাগবৎ পুরাণ বেদেরই মত প্রামাণ্য ও পূজনীয় হইয়া আছে। ক্রমে নানা পুরাণ, নানা তন্ত্র, কোনো খানা বা সকল হিন্দুর নিকটে, কোনো কোনো গ্রন্থ বা সম্প্রদায়বিশেষের নিকটে প্রামাণ্য শাস্ত্র বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। আধুনিক সময় পর্য্যন্ত এরূপ নূতন নূতন বেদের প্রচার চলিয়া আসিয়াছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক মহাজনগণের চরিত্রকাহিনী ও উপদেশাবলী তাঁহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায় মধ্যে বেদেরই মতই প্রামাণ্য ও মান্য হইয়া আছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সমাজে শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, মারাঠা-ভাগবতমণ্ডলী মধ্যে মহাভাগবত তুকারামের অভঙ্গ, বেদেরই মত পূজা পাইতেছেন।

সুতরাং ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব, এই চারিখানি বেদে যে ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই হিন্দুর ধর্ম্ম এমন কথা বলা যায় না। এই বেদ-চতুষ্টয়কে যাঁরা প্রামাণ্য বলিয়া মান্য করেন তাঁরাই হিন্দু,—হিন্দুর শাস্ত্রসাহিত্য পড়িয়া, হিন্দুর ইতিহাস আলোচনা করিয়া, হিন্দুসমাজের মত ও আচার-বিষয়ে অশেষ-বিচিত্রতা দেখিয়া, এ কথা কে সাহস করিয়া বলিবেন? আর বেদ চারিখানাও তো কোনো মতবিশেষের ঐকান্তিক পোষকতা করেন না। বেদের উপদেশেও পরস্পর-বিরোধী অনেক কথা দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ বিরোধ বেদোপদেশে আছে বলিয়াই, এই বিরোধ ভঞ্জনের জন্য ব্রহ্মসূত্র ও ধর্ম্ম-সূত্র-প্রচারের প্রয়োজন উপস্থিত হয়। ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত যেরূপ বেদের জ্ঞানকাণ্ড-সম্বন্ধীয় উপদেশের পরস্পর-বিরোধের মীমাংসা করিয়াছেন, ধর্ম্মসূত্র বা পূর্ব্বমীমাংসা সেইরূপ কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশের পরস্পর বিরোধভঞ্জনের প্রয়াস পাইয়াছেন। যেখানে বিরোধ নাই, সেখানে মীমাংসার আবশ্যক হয় কি? দুইখানি মীমাংসা-শাস্ত্র যখন প্রচারিত হইয়া, হিন্দুগণের মধ্যে প্রামাণ্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখনই বেদ যে একই উপদেশ দেন নাই, একই তত্ত্ব প্রচার করেন নাই, একই পন্থা প্রদর্শিত করেন নাই, ইহা মানিয়া লইতেই হইবে। আর এই অদ্ভুত বিচিত্রতাই হিন্দুর ধর্ম্মের অসাধারণ শক্তির ও সার্ব্বজনীনতার প্রমাণ।

যাঁরা বেদচতুষ্টয়কে হিন্দুর ধর্ম্মের ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁরা ও বেদে যে কেবল

একই পন্থার উপদেশ দিয়াছেন, এমন কথা তো বলেন না। বেদকে তাঁরা দুই ভাগে বিভক্ত করেন। এক কর্ম্মকাণ্ড, অপর জ্ঞানকাণ্ড। আর এই কাণ্ডদ্বয়ের মধ্যে শৈশব-যৌবনের ন্যায় কোনো অবস্থার বা অধিকারের পৌর্ব্বাপর্য্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে যে সকল যাগযজ্ঞাদি উপদিষ্ট হইয়াছে, সেগুলি শেষ করিয়া, পরে জ্ঞানকাণ্ডের সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে, জ্ঞানপন্থী কোনসম্প্রদায় কদাপি এ কথা স্বীকার করেন নাই। অন্যপক্ষে, কর্ম্মপন্থী বৈদিক সম্প্রদায়ও আপনাদের কর্ম্মানুষ্ঠানকে জ্ঞানপন্থার নিকৃষ্টতর সোপান বলিয়া কখনই গ্রহণ করেন নাই। তাঁরা এই কথাই বলিয়াছেন যে, কর্ম্মেই কর্ম্মের সফলতা, তাহা কদাপি জ্ঞানাপেক্ষা করে না।

তার পর, বেদকে যাঁরা প্রামাণ্য বলিয়া মানেন, তাঁরা সকলেও তো একই প্রকারের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। ভরদ্বাজ মীমাংসকেরা বেদের কর্ম্মকাণ্ডের যে প্রকৃতির প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, জ্ঞানকাণ্ডের তো সেই একই প্রকৃতির প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। তাঁরা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে কর্ম্মপন্থীদের পক্ষে বেদ-বিধান যে ভাবে গৃহীত হওয়া চাই, জ্ঞানমার্গাবলম্বীদের পক্ষে সেরূপ কখনই হইতে পারে না। যাঁরা যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া স্বর্গাদি ভোগের অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষা করিবেন, তাঁহাদিগকে বিনা বিচারে বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কর্ম্মের ক্রমক্ষ সম্বন্ধে, কোন্‌টা আগে করা চাই, কোন্‌টা পরে করা চাই, এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে সে সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য তাঁরা বিচার আলোচনা করিতে পারেন, এই বিচারালোচনায় পূর্ব্বমীমাংসা তাঁহাদের সহায় হইবে। কিন্তু কোন্‌টা যুক্তিসঙ্গত, কোন্‌টা অযৌক্তিক, কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা অসত্য, এ সকল প্রশ্নে তাঁহাদের অধিকার নাই। কর্ম্মকাণ্ডে এরূপ যুক্তিতর্কের আদৌ অবসর মাত্র নাই। কারণ কর্ম্মমাত্রেই ফলাপেক্ষী। কর্ম্মের প্রামাণ্য যজমানের জ্ঞানবুদ্ধিতে নাই, কেবল তাহার বিহিত ফল-উৎপাদনী শক্তিতেই সে প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। যাগযজ্ঞ করিলে মরণান্তে স্বর্গাদি লোক প্রাপ্তি হয়। হয় কি হয় না, ইহার মীমাংসা বুদ্ধির দ্বারা, প্রজ্ঞার দ্বারা, কোনো প্রকারের যুক্তিতর্কের বা বিচার-আলোচনার দ্বারা হয় না, হইতে পারে না। আগে ইহজীবনে, যথাবিহিত ভাবে, ঐই সকল যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তার পর, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তার সত্যাসত্যের প্রমাণের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। মৃত্যুর পরে, যদি যথানির্দ্দিষ্ট স্বর্গাদিলাভ হয়, তবেই সেই বেদোপদেশের প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে, অন্যথা নহে। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধি-বিচারের অবসর কোথায়? কৈ? ফলাপেক্ষী কর্ম্মমাত্রেরই এই দশা। তার প্রামাণ্য স্বাহিরে, ভিতরে নহে। কুইনিন্ খাইলে জ্বর আরোগ্য হয়, ইহার প্রামাণ্য যেরূপ সর্ব্বথা অনুষ্ঠানসাপেক্ষ, অর্থাৎ আগে জ্বর হউক, তার পর সেই জ্বরের বিরাম অবস্থায় কুইনিন্ সেবন কর, তার পর বসিয়া দেখ, যে জ্বরের একবার বিরাম হইয়াছে, তাহা আবার ফিরিয়া

আইসে কি না, তখন কথাটা সত্য কি অসত্য, প্রামাণ্য কি অপ্রমাণ্য, তার ঠিকানা হইবে। আগে হইতে, অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে, শুষ্ক জ্ঞানের সূত্র ধরিয়া, যুক্তিতর্কের জোরে এ বিষয়ের প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। এ ক্ষেত্রে, অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে অবিচলিত শ্রদ্ধা, অনুষ্ঠানকালে নিষ্ঠা, অনুষ্ঠানান্তে প্রমাণের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। কর্ম্মকাণ্ডের প্রামাণ্য এই শ্রেণীর। কর্ম্মকাণ্ডের অনুসরণ যাঁরা করিবেন, অবিচারিতভাবেই তাঁহাদিগকে বেদবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া চলিতে হইবে। এখানে নিজেদের স্বানুভূতির উপরে নির্ভর করা চলে না; চেষ্টামাত্রেই যুক্তিতর্কের বহির্ভূত। যেখানে বিচারের কোনোই অবসর নাই, সেখানে, যদি ইচ্ছা হয়, তুমি যাইও না। সে পথ তোমার জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু যদি ইচ্ছা করিয়া সেখানে যাও, তবে বিচারবুদ্ধিকে বাঁধিয়া যাও। সেখানে বিচারবুদ্ধিচালনার চেষ্টা যে একান্তই অযৌক্তিক। সাঁতার কাটা জলেই সম্ভব। স্থলে তো সম্ভব নয়। তুমি শুকনো ডাঙ্গায়ও পড়িয়া থাকিবে, আর সাঁতার কাটিবার সখটুকুও মিটাইতে যাইবে, এ কি একান্তই মূঢ়তা নহে? সেইরূপ কেবল জ্ঞানমার্গেই স্বানুভূতির স্থান ও মর্য্যাদা আছে। সেখানেই তোমার আমার বিচার-বুদ্ধি চলে, চলিতে পারে। কর্ম্মপন্থায় চলে না, সে পথের আলো তোমার চ'খে নাই। সেখানে চক্ষু বন্ধ করিয়া, বেদের হাত ধরিয়া, মীমাংসাকে সাথী করিয়া, বিশ্বাসভরে চলিতে হইবে। তার আর অন্য ব্যবস্থা নাই।

এ তো গেল, একশ্রেণীর প্রামাণ্য। এ প্রামাণ্য ফলাপেক্ষী। এখানে 'ফলেন পরিচীয়তে'—ফলের দ্বারা প্রমাণ পরিচয় করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু আর এক শ্রেণীর প্রামাণ্যও আছে। সে প্রামাণ্য ফলসাপেক্ষ নহে। সে প্রামাণ্য জ্ঞানসাপেক্ষ। বেদের জ্ঞানকাণ্ডের প্রামাণ্য এই শ্রেণীর। কর্ম্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য—স্বর্গাদি ফল দান। জ্ঞানকাণ্ডের উদ্দেশ্য—ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করা। কর্ম্মকাণ্ডের লক্ষ্য—ভোগ। জ্ঞান-কাণ্ডের লক্ষ্য—মুক্তি। এই মুক্তি ক্রিয়ার ফল নহে। ক্রিয়ার ফলকে শাস্ত্রে অন্ত-বন্ত বলে। মুক্তি অন্ত-বন্ত নহে। যাহা অন্ত নহে, তাহাই নিত্য। এই জন্য হিন্দুর শাস্ত্র মুক্তিকে নিত্যসিদ্ধ বলিয়া থাকেন। জীব নিত্যমুক্ত। জীবের বন্ধন সত্য নহে, কল্পিত। রাজপুত্র আপনার রাজাধিকার ভুলিয়া গিয়া যদি চীরবসন পরিধান করিয়া, ভিখারী হইয়া বেড়ায়, ও মুষ্টি অন্নের জন্য কাতর স্বরে, পরের দ্বারে আর্ত্তনাদ করে, তার ক্লেশ যতই কেন সত্য হউক না দারিদ্র্যটা যে অজ্ঞতা-প্রসূত ও অসত্য ইহা মানিতেই হইবে। সে যে কত বড় ধনী, ইহা জানে না বলিয়াই তার দারিদ্র্য। জীবের বন্ধনও সেইরূপ। জীব নিত্যমুক্ত। জীব নিত্য-শুদ্ধ বুদ্ধ। হিন্দু সন্ধ্যাবন্দনা কালে যে বলেন:—

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি, ব্রহ্মাস্মি ন চ শোকভাক্,
সচ্চিদানন্দরূপোঽহম্, নিত্যমুক্তস্বভাববান্।

আমি দেবতা, অপর কেহ নহি; আমি ব্রহ্ম শোকভোক্তা নহি; আমি সচ্চিদানন্দ;

স্বরূপ, নিত্যমুক্তস্বভাবসম্পন্ন—কথাটা হিন্দুর চিন্তাতে, অভিজ্ঞাতে, বিচারে ও সিদ্ধান্তে অতিশয় সত্য। এই কথাটাই হিন্দুর ধর্ম্মের মূল কথা। এইখানেই হিন্দুর ধর্ম্মের পুচ্ছপ্রতিষ্ঠা। আর কেবল হিন্দুই যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ও নিত্যমুক্তস্বভাবসম্পন্ন তাহা নহে। জীবমাত্রেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ। মর্ত্যশরীরমাত্রেই অমৃতের পুত্র। আর হিন্দু বলেন,—"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—আত্মাই পুত্ররূপে জাত হয়েন। স্বরূপতঃ পিতা-পুত্রে অভেদ,—আকারে বিভিন্ন মাত্র। জীব ও ব্রহ্মে যে ভেদ তাহা আকারে মাত্র, স্বরূপে নহে। স্বরূপতঃ ব্রহ্ম যেমন নিত্য বুদ্ধমুক্ত, জীবও সেইরূপ নিত্যমুক্ত-স্বভাববান্। সুতরাং মুক্তিতে আমার অধিকার আছে, তোমার অধিকার নাই,—হিন্দুর ধর্ম্মে এ কথা আসৌ উঠে না। মুক্তি আমার যেমন নিত্য-সিদ্ধ বস্তু, তোমারো সেইরূপ নিত্যসিদ্ধ বস্তু। ব্রাহ্মণের যেমন চণ্ডালেরও সেইরূপ। এই পরম অধিকার সকলেরই আছে। এই চরম লক্ষ্য সকলেরই সমান। হিন্দু যে অধিকারী-ভেদের কথা বলেন, তাহা কেবল পথের কথা—কে কোন্ পথে যাইবে তারই বিচার-বিবেচনামাত্র,—কিন্তু বিশাল বিশ্বের নিখিল পন্থা দশদিক্ হইতে যাইয়া চরমে যে পরম পদে পরিসমাপ্তি লাভ করিতেছে, সেখানকার কথা নহে। অধিকারী-ভেদ উপায়ের বিচিত্রতাই প্রচার করে, উদ্দেশ্যের একতা নষ্ট করে না। আর করে না এই জন্য যে, হিন্দুর মুক্তি অন্য-বস্তু নহে। মুক্তি সার্ব্বজনীন। স্বর্গাদির প্রামাণ্য ফলদাপেক্ষ। মুক্তির প্রামাণ্য জ্ঞান-সাপেক্ষ। জ্ঞানৈকসাধ্যমুক্তম্—কেবল জ্ঞানের দ্বারাই এই মুক্তিলাভ করা যায়। যাগযজ্ঞ তপস্যাদির দ্বারা শাস্ত্রবিহিত স্বর্গাদি বিভিন্ন লোকপ্রাপ্তি সম্ভব হইতে পারে; হিন্দুর শাস্ত্র এই কথা বলেন। কিন্তু এ সকলের কিছুতেই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না। কেবল জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তিলাভ করিবে।

আর মুক্তি যখন একমাত্র জ্ঞানলভ্য বস্তু হইল, তখন মুক্তির পন্থা যে শাস্ত্রে উপদেশ করিবে, তাহাকেও কেবল জ্ঞানেতেই আপনার প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আমার বুদ্ধিকে জাগ্রত করা, আমার প্রজ্ঞাকে প্রবুদ্ধ করা, আমার অনুভূতিকে সচেতন করা, এই মোক্ষ-উপদেশের চরম লক্ষ্য। কারণ জ্ঞান-মাত্রেই অনুভূতিতে যাইয়া পরিসমাপ্তি লাভ করিবে। অনুভূতিপর্য্যন্তং জ্ঞানং। যে জ্ঞান অনুভূতিতে পর্য্যবসিত হয় না, তাহা সত্য নাও হইতে পারে, তাহা জ্ঞানাভাস মাত্র; তাহার স্বতঃপ্রামাণ্য হয় না। প্রকৃত জ্ঞানমাত্রেই আপনি আপনার প্রমাণ প্রদান করে। আমি চক্ষে যাহা দেখিতেছি, কাণে যাহা শুনিতেছি, রসনায় যাহা আস্বাদন করিতেছি, ত্বকে যাহা স্পর্শ করিতেছি,—তৎসকলের কি আর অন্য প্রমাণান্তরের অপেক্ষা থাকে? এ সকল জ্ঞান স্বতঃপ্রামাণ্য, স্বয়ং সিদ্ধ। এই জন্য যে উপায়ে এই সকল বিষয়-জ্ঞান লাভ করা যায়, সেই উপায়কে শাস্ত্রে প্রমাণের মধ্যে প্রথম প্রমাণ বলিয়া ধরা হয়। তাহার নাম প্রত্যক্ষ। হিন্দুর প্রমাণত্রয়ের মধ্যে এই প্রত্যক্ষই প্রথম প্রমাণ। ইহা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ, আপনি আপনার প্রমাণ। ইহা

আপনার প্রামাণ্যের জন্য অপর কোনো প্রমাণের উপরে নির্ভর করে না। দ্বিতীয় প্রমাণ—অনুমান ও উপমান। এই প্রমাণের প্রামাণ্য কিন্তু স্বয়ংসিদ্ধ নহে। প্রত্যক্ষের উপরে অনুমান ও উপমানের প্রামাণ্য নির্ভর করে। পর্ব্বতোবহ্নিমান্ ধূমাৎ—এখানে ধূম প্রত্যক্ষ বস্তু। আর এখানে অগ্নি অপ্রত্যক্ষ হইলেও, ধূমের সঙ্গে অগ্নির যে নিত্যসম্বন্ধ তাহা পূর্ব্বপ্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং এই দুই প্রত্যক্ষের উপরে, সর্ব্বথাই অগ্নির প্রতিষ্ঠারূপ অনুমানের প্রতিষ্ঠা হয়। উপমান সম্বন্ধেও এই কথা। অনুমানের ন্যায় উপমানও প্রত্যক্ষের উপরে প্রতিষ্ঠিত। উপমান ও অনুমান—এই দ্বিবিধ প্রমাণই প্রত্যক্ষের উপরে প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যক্ষেরই রূপান্তর মাত্র। কিন্তু হিন্দু আরো এক প্রমাণের কথা বলেন—তার নাম আগম। আধুনিক-শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকে আগমকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে রাজি নহেন। কিন্তু তাঁরা এটা তলাইয়া দেখেন না যে আগমও প্রত্যক্ষেরই সমকক্ষ প্রমাণ। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় সাক্ষাৎকারের উপরে প্রতিষ্ঠিত আগম অতীন্দ্রিয় সাক্ষাৎকারের বা আত্মসাক্ষাৎকারের উপরে প্রতিষ্ঠিত। বস্তুসাক্ষাৎকার প্রত্যক্ষের যেমন, ঠিক সেইরূপ আগমেরও প্রাণ। প্রত্যক্ষের বিষয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, আগমের বিষয় অতীন্দ্রিয়, ধ্যান ও সমাধিগ্রাহ্য, দুএর মধ্যে প্রভেদ এই। বস্তুতন্ত্রতা দুইএরই সমান, বস্তুর স্বরূপভেদে আগম ও প্রত্যক্ষের বিভিন্নতা।

আর বস্তু একজাতীয়, না দুইজাতীয়? যদি জগতের যাবতীয় জ্ঞের বিষয় একজাতীয় মাত্র হয়, অর্থাৎ কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুই জগতে বস্তুরূপে গৃহীত হইতে পারে, অপর কোনো বস্তু আর জগতে নাই, এই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আগমের প্রয়োজন ও প্রামাণ্য দুই নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং আগম যদি না মানিতে হয়, তবে ইন্দ্রিয়াতীত কোনো কিছু যে আছে বা থাকিতে পারে, কিম্বা থাকিলেও তাহা যে মানুষের জ্ঞানগম্য এ কথাটা আগে অস্বীকার করিতে হইবে। যাঁরা ইন্দ্রিয়াতীত সত্যে বিশ্বাস করেন না, হিন্দুর শাস্ত্রে কেবল তাঁহাদিগকেই নাস্তিক বলে। হিন্দুর অভিধানে নাস্তিক আর নিরীশ্বর এক কথা নহে। সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর হইলেও, এই জন্য কদাপি নাস্তিক বলিয়া নিন্দিত হন নাই। হিন্দুর মধ্যে কেবল লোকায়তিকেরাই নাস্তিক উপাধি পাইয়াছিলেন। লোকায়তিকেরা অতীন্দ্রিয় সত্যে বিশ্বাস করিতেন না। তাঁরা একমাত্র প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষপ্রতিষ্ঠিত অনুমান ও উপমানকেরিকেই প্রামাণ্য প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতেন। আগমে বিশ্বাস করিতেন না। আগমে যাঁরা বিশ্বাস করেন না তাঁরাই কেবল নাস্তিক। এই জন্য হিন্দু বলেন, নাস্তিকাঃ বেদনিন্দকাঃ। বেদকে যাঁরা অগ্রাহ্য করেন, অস্বীকার করেন, অমান্য করেন, তাঁরাই নাস্তিক।

আর বেদ অর্থ এখানে, ঋক্, সাম, যজুঃ প্রভৃতি নহে। কারণ উপনিষৎ স্বয়ং এ সকলকে অপরা বিদ্যা বলিয়াছেন। বেদ অর্থে এখানে আগম বুঝিতে হইবে। এমন হিন্দু আছেন, যাঁরা এ সকল বেদকে মানেন নাই। শিখেরা হিন্দু; কিন্তু ঋক্, সাম, প্রভৃতি বেদচতুষ্টয়ের সর্ব্বথা প্রামাণ্য

তাঁরা স্বীকার করেন নাই। জৈনেরাও হিন্দুগোষ্ঠিভুক্ত, কিন্তু তাঁরাও এই সকল বেদাধীন নহেন। কিন্তু এঁরা সকলেই আগম মানেন। এঁরা সকলেই অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাস করেন। এঁরা সকলেই অতীন্দ্রিয়সাক্ষাৎকার যে জীবের পক্ষে সম্ভব, ইহা স্বীকার করেন। এবং আপন আপন সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা যে এই অতীন্দ্রিয়সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াই, ধর্ম্মোপদেশ দান ও সাধনপন্থা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করেন। শিখ, জৈন, প্রভৃতি ধর্ম্ম ঋগ্বেদাদি না মানিয়াও, আস্তিক্যের মর্য্যাদা হইতে কখনো ভ্রষ্ট হন নাই। "নাস্তিকাঃ বেদনিন্দুকাঃ" এখানে বেদ বলিতে যদি কেবল ঋগ্বেদাদিই বুঝাইত, তাহা হইলে হিন্দুর মধ্যে শিখ জৈনাদি এবং হিন্দুর বাহিরে, ইহুদীয়, ইরাণীয়, খৃষ্টীয়, মোহম্মদীয় প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্মই নাস্তিক্যদোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে। ইহা কি কখনো সম্ভব? উদার হিন্দুধর্ম্ম কদাপি এইরূপ ভাবে জগৎস্থ ধর্ম্মকে নাস্তিক বলিতে পারেন না। হিন্দুর ধর্ম্ম, খৃষ্টীয় বা মোহম্মদীয় ধর্ম্মের ন্যায়, কদাপি আপনাকেই জীবের মুক্তির একমাত্র পন্থা বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। যে হিন্দু নয়, তার পরমপুরুষার্থলাভে অধিকার নাই, এমন কথা হিন্দু কল্পনাও করিতে পারেন না। গীতা বলেন—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়েন মায়য়া।

—হে অর্জ্জুন ঈশ্বর সকল ভূত প্রাণের হৃদ্দেশে বিরাজিত থাকিয়া, যন্ত্রারূঢ়ের মত তাহাদিগকে মায়াপ্রভাবে চারিদিকে চালাইতেছেন। ইহা সকল হিন্দুরই বিশ্বাস। এই সার্ব্বজনীন ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠা ও ঈশ্বর-কর্ত্তৃত্ব যে ধর্ম্ম বলেন, সে ধর্ম্মে যে কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষ বা পন্থাবিশেষ এই সার্ব্বজনীন ঈশিত্বের বা নিয়ন্তৃত্বের বাহিরে আছেন, বা থাকিতে পারেন, এমন কথা কখনই বলিতে পারেন না। হিন্দুর ধর্ম্মে লোকমাত্রেই মুক্তির অধিকারী। মুক্তি সকলেই পাইবে। মুক্তির পন্থাও অনন্ত। আর এই অনন্ত পন্থার প্রত্যেক পন্থাই অতীন্দ্রিয় সাক্ষাৎকারের বা আগমের উপরে প্রতিষ্ঠিত। বেদেও আগম আছে, পুরাণেও আগম আছে, তন্ত্রেও আগম আছে, বাইবেলেও আগম আছে, কোরাণেও আগম আছে, অভেস্তাতেও আগম আছে। যেখানেই যখনই মানুষ সংযতচিত্তে আপনার অন্তরস্থিত সাক্ষীস্বরূপ অন্তর্য্যামী পুরুষকে পাইবার চেষ্টা করিয়াছে, এক জন্মে না হউক বহু জন্মে, সে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে, এবং এই আত্মসাক্ষাৎকার লাভের দ্বারাই তাহার অন্তরে, ধ্যানযোগে, আগমেরও প্রকাশ হইয়াছে। এইরূপে আত্মসাক্ষাৎকারলব্ধ যে সত্য, তাহারই নাম আগম। খৃষ্টের এই আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছিল; এবং এই অবস্থায় তিনি যে সকল সত্যের প্রত্যক্ষলাভ করিয়াছিলেন, ও তার মধ্যে যেগুলি আপন শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন, বাইবেলের নূতন খৃষ্টকে কেবল সেগুলিই আগমপদবাচ্য—অন্যগুলি নহে। এইরূপ বাইবেলের পুরাতন পুস্তকেও ইহুদীয় প্রবক্তাগণের মধ্যে অনেকেরই আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছিল, তাঁহাদের

সেই আত্মসাক্ষাৎকারজনক সত্যের উপদেশ যেখানে যতটুকু আছে, তাহাও আগম। গোটা বাইবেল, বা গোটা কোরাণ, বা গোটা অভেস্তা এ সকল সবই আগম নহে। এ সকলে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য অনেক বিষয়ের উল্লেখ আছে। ফলতঃ প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি প্রমাণ-প্রতিষ্ঠিত বিষয় সকল ধর্মপুস্তকেই বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল আগম নহে। এ সকলকে হিন্দুর শাস্ত্রে অর্থবাদ বলে। এই সকল অর্থবাদের প্রামাণ্য ইন্দ্রিয়-প্রতিষ্ঠিত প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি, আগম নহে। এ সকলে হিন্দুর প্রমাণশাস্ত্রের প্রথম দুই প্রমাণেরই অধিকার—এখানে আগমের অধিকার নাই। হিন্দুর মীমাংসা-শাস্ত্রে বলেন যে ঈশ্বর যখন জীবকে বিভিন্ন জাতীয় বিষয়ের জ্ঞানলাভের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয় দিয়াছেন, এক বিষয়ের জ্ঞান লাভার্থে কদাপি একাধিক ইন্দ্রিয়ের ব্যবস্থা করেন নাই, তখন যাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করা যায়, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই যার পক্ষে প্রকৃষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ, সেরূপ বিষয়ের জ্ঞানলাভার্থে আগমের শরণাগত হওয়া একান্তই নিষ্প্রয়োজন। বিধাতা সৃষ্টির কুত্রাপি এরূপ আতিশয্যের ও অপচয়ের ব্যবস্থা করেন নাই। বিশ্বে এরূপ অনর্থকতা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সুতরাং প্রত্যেক ইন্দ্রিয় যেমন আপনাধিকারেই প্রামাণ্য, অন্য ইন্দ্রিয়ের অধিকারে, তাহার কাজও অসাধ্য, প্রামাণ্যও নহে; সেইরূপ

[illegible] অধিকারে প্রত্যক্ষই প্রামাণ্য,

[illegible]নে কাজও নাই প্রামাণ্যও

[illegible] অতিশয় দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছিলেন। তাই হিন্দুর মীমাংসা-শাস্ত্রের প্রথম কথাই—অদৃষ্টার্থকং শাস্ত্রং অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ নহে, তাহাই কেবল শাস্ত্রের বিষয়। শাস্ত্রের এই সংজ্ঞা আবিষ্কার করিবামাত্র, বেদাদিগ্রন্থে যাহা কিছু দৃষ্ট ও অনুভাবিক, যাহা কিছু ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের উল্লেখ বা বর্ণনা আছে, তৎ-সমুদয় শাস্ত্র-প্রামাণ্যের বাহিরে পড়িয়া, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের ও এই প্রত্যক্ষের উপরে প্রতিষ্ঠিত অনুমানাদির বিচারাধীন হইয়া পড়িল। অতএব বেদের যে যে স্থলে এমন ঘটনার বর্ণনা আছে যাহা ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা জানা সম্ভব, যে যে স্থলে কোনো লোক-চরিত্র অঙ্কিত আছে তৎসমুদয়, সংহিতা-ভাগেই থাকুক বা ব্রাহ্মণভাগেই থাকুক, কিম্বা উপনিষদেরই অন্তর্ভূত হউক, আগমাধিকারের বহির্ভূত হইয়া গেল। এ সকল অর্থবাদমাত্র, আগম নহে। যে সকল নিয়মে অপরাপর ইতিকথার বা বস্তুবর্ণনার সত্যাসত্য লোকে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, বেদের এই সকল অর্থবাদেরও সত্যাসত্য সেই সকল লৌকিক নিয়মেই নির্দ্ধারিত হইবে। অলৌকিক আগমের দোহাই দিয়া এ সকলকে লৌকিক বুদ্ধিবিচারের অতীত করিয়া রাখিবার চেষ্টা অযৌক্তিক ও অশাস্ত্রীয়। কিন্তু যাহা সত্য সত্যই অদৃষ্ট, যে সকল বিষয়ে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের কোনো প্রামাণ্য নাই, থাকা সম্ভব নহে,—সেই সকল বিষয়ই কেবল শাস্ত্র-প্রামাণ্যের দাবী করিতে পারে। সুতরাং সমগ্রবেদই যে আগম, এমন কথা আর রহিল কৈ?

তার পর, আর্য্যমীমাংসকগণ অদৃষ্টার্থক

শাস্ত্রং, এই বলিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। মানুষের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের অধিকারের বাহিরে এমন অনেক বিষয় তো থাকিতে পারে, যার সঙ্গে তার ইষ্টানিষ্টের কোনোই সম্পর্ক নাই। তাহা কি কেবল অদৃষ্টার্থক বলিয়া শাস্ত্রের প্রামাণ্য ও সম্মান লাভ করিবে? হিন্দু উত্তর করিয়াছেন—না। যদি প্রত্যক্ষাতীত বিষয়ে উপদেশদানই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে মানবের কুতূহল-কণ্ডূয়ন নিবৃত্তি মাত্র যেন শাস্ত্রযোনি বিধাতাপুরুষের নিতান্ত ঈপ্সীত ব্যাপার হইয়া উঠে। এরূপ অনর্থক কুতূহল-নিবৃত্তির জন্য লৌকিক পিতা বা শিক্ষকও তো কখনো একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন না। কোনো লৌকিক পিতা বা গুরুও তো আপনার সন্তান বা শিষ্যকে কেবলমাত্র কুতূহলনিবৃত্তির জন্য শক্তি ও সময় অপচয় করিতে উপদেশ দেন না। বিশ্বপতি, বিশ্বগুরু অখণ্ডজ্ঞানময় ভগবান জীবের জন্য এরূপ ব্যবস্থা করিবেন, ইহা কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং অদৃষ্টবিষয়মাত্রেই জ্ঞানদান করা আগমের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। ইহা বিচার করিয়া, প্রথমে যে মীমাংসা-সিদ্ধান্ত অদৃষ্টার্থকং শাস্ত্রং, এই সংজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন, সেই সিদ্ধান্তই পরিণামে, মোক্ষপ্রতিপাদকং শাস্ত্রং—এই সংজ্ঞা প্রচার করেন। প্রথমে যাবতীয় জ্ঞেয়কে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়, এক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অপর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অতীত। যাহা ইন্দ্রিয়াতীত তাহাকে জানিবার পন্থা আগম। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের প্রমাণ প্রত্যক্ষ। অতীন্দ্রিয় বিষয়ে প্রমাণ আগম। তার পর অতীন্দ্রিয় বিষয়ও দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। এক, যাহার সঙ্গে জীবের মুক্তির সম্পর্ক আছে; অন্য, যার সঙ্গে মোক্ষ-উপদেশের কিম্বা সেই উপদেশের বিষয়ীভূত পারমার্থিক তত্ত্বের কোনো সম্পর্ক নাই। নানা প্রকারের ইন্দ্রজালাদিও অতীন্দ্রিয় ব্যাপার। কিন্তু এ সকলের কোনো প্রকারের মোক্ষসম্পর্ক নাই। সুতরাং বেদের যে সকল ভাগে ইন্দ্রজালাদির কথা আছে, তাহা অদৃষ্টার্থক হইলেও, আগমের বহির্ভূত হইয়া পড়িল। কেবল যাহাতে মোক্ষ প্রতিপন্ন করে, তাহাই আগম, মোক্ষপ্রতিপাদকং শাস্ত্রং,—এই সংজ্ঞায় এই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আর মোক্ষ সার্ব্বজনীন বস্তু। জীবমাত্রেই মোক্ষাধিকারী। সুতরাং যে আগমের উপরে হিন্দুর ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, তাহাও সার্ব্বজনীন, সাম্প্রদায়িক নহে। আর আগম-প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই হিন্দুর ধর্ম্ম কেবল হিন্দুরই ধর্ম্ম নহে, ইহা বিশ্বের ধর্ম্ম, বিশ্বজনীন। তারই জন্য হিন্দু কোনো অবতার-বিশেষের কিম্বা মহাজনবিশেষের নামে, আপনার ধর্ম্মের নামকরণ করে নাই। হিন্দু বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু তিনি নিজে বৈষ্ণব হইলেও, তাঁর ধর্ম্ম বৈষ্ণব ধর্ম্ম নহে, কিন্তু সনাতন ধর্ম্ম। তিনি শিব-শক্তির ভজনা করিয়াছেন, ও করিতেছেন, কিন্তু সম্প্রদায়-বিচারে, শৈব বা শাক্ত হইলেও, তাঁর ধর্ম্ম শৈবধর্ম্ম বা শাক্তধর্ম্ম নহে, কিন্তু সনাতন ধর্ম্ম। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নাম

মাত্র। এ সকলে ভিন্ন ভিন্ন পন্থাই নির্দ্দেশ করে। এ সকল এক একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্ম নহে। এই জন্যই হিন্দুর ধর্ম্ম বলিতে, লোকতঃ ও শাস্ত্রতঃ কেবল সনাতন ধর্ম্মই বোঝায়।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

কেহ কেহ আক্ষেপ করিতেছেন যে, ভাঙ্গা বাংলা জোড়া লাগিল বটে, কিন্তু দ্বিধা বিভক্ত হইয়াও বাংলার যে গৌরব-গরিমা নষ্ট হয় নাই, যেরূপ ভাবে বঙ্গভঙ্গ রহিত হইয়াছে, তাহাতে সে গৌরব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বাংলা বহুদিন হইতে কেবল বাংলা ছিল না। ইংরাজশাসনের প্রথম হইতেই বেহার ও উড়িষ্যা বাংলার অন্তর্গত হইয়াছিল। আর ভাঙ্গা বঙ্গকে যুক্ত করিতে যাইয়া বেহার ও উড়িষ্যাকে তাহার অঙ্গ হইতে ছিন্ন করা হইল। বঙ্গভঙ্গের ফলস্বরূপ আমরা দুইটী পৃথক্ ও বড় বাংলা পাইয়াছিলাম। বঙ্গভঙ্গ রহিত হইয়া এখন একটী ছোট বাংলা পাইলাম। বাঙালীর লাভ হইল কৈ?

* * *

কিন্তু আমরা বাঙালীর লাভালাভের দ্বারাই কি ভারতের বিশাল জাতীয় জীবনের ইষ্টানিষ্টের বিচার করিব? বাংলা অঙ্গ, ভারত অঙ্গী। বাঙালী অংশ, ভারতসমাজ অংশী। এই তো সত্য কথা। আর অঙ্গীর সার্থকতা ও অসার্থকতার দ্বারাই অঙ্গের লাভালাভের বিচার করিতে হয়। অন্যথা এ বিচার হয় না, হইতে পারে না। আর অঙ্গ যেখানেই অঙ্গীর কল্যাণ-অকল্যাণের সন্ধান না করিয়া কেবল আপনার ক্ষুদ্র সুখ-সুবিধা অন্বেষণ করে, সেখানেই তার সঙ্গে অপর অঙ্গের বিবাদ বাধিয়া যায়। অঙ্গ যেখানে ঐকান্তিক ভাবে অঙ্গীর মধ্যেই আপনার সফলতা অন্বেষণ করে, আপনার স্বার্থকে অঙ্গীর অধীন করিয়া রাখে, সেখানে অঙ্গে অঙ্গে সদ্ভাব ও সামঞ্জস্য আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে। বেহার ও উড়িষ্যা বাংলা হইতে পৃথক্ হইয়া বাংলার লাভালাভ কি হইল না হইল, সে বিচারের পূর্ব্বে বেহার ও উড়িষ্যার লাভালাভ কি হইবার সম্ভাবনা, তারই বিচার করা প্রয়োজন। এই বিচারে, বেহার ও উড়িষ্যার অনিষ্ট হইল, এরূপ সিদ্ধান্তই স্থির যদি হয়, কেবল তাহা হইলেই এই নূতন ব্যবস্থা অমঙ্গলকর হইয়াছে, এরূপ বলা যাইতে পারিবে, অন্যথা নহে।

* * *

বাংলার সঙ্গে যুক্ত থাকিলে বেহারের কতকটা উপকার হইত, আপাততঃ এ কথা অস্বীকার করা যায় না। লোক-শিক্ষা ও লোকচরিত্র বাংলায় যে ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে, বেহারে এখনো সে ভাবে ফুটিয়া উঠিবার তেমন অবসর পায় নাই, ইহা সত্য।

আর এ অবস্থায় বেহারে একটী স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলে, রাজকর্ম্মচারিগণের মতামত যেভাবে লোকমতকে উপেক্ষা করিয়া, শাসনকার্য্যে প্রবল হইয়া থাকিবে, বাংলায় সেরূপ হইবার আর আশঙ্কা নাই। তখনই রাজকর্ম্মচারিগণের সঙ্গে বেহারের লোকমতের বিরোধ উপস্থিত হইবে, তখনই বেহারের লোক-নায়কগণ আপনাদের এই অক্ষমতা উপলব্ধি করিবেন। লোকমতের দ্বারা শাসনকার্য্য স্বল্পবিস্তর নিয়মিত হইলে, জনগণের যে কল্যাণ সাধিত হয়, বেহারে স্বতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, আপাতত কিছুদিনের জন্য সে কল্যাণের কথঞ্চিৎ হানি হইতেও বা পারে। কিন্তু এ আশঙ্কা বেশী দিন থাকিবে না। বাংলায় যেমন অল্পে অল্পে লোকমত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে, এই নব প্রতিষ্ঠিত স্বতন্ত্র শাসনাধীনে থাকিয়া, এই শাসনযন্ত্রের সঙ্গে সময় সময় বেহারের লোকমতের যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে, তাহারই দ্বারা সে প্রদেশে জনমণ্ডলীর শিক্ষা ও চরিত্রবিকাশের সঙ্গে প্রাদেশিক লোকমতও শক্তি সঞ্চয় করিয়া, ক্রমে আত্মপ্রকাশে ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইয়া উঠিবে। বাংলার ভিতরে চিরদিন পড়িয়া থাকিলে এই শক্তি সংগ্রহ করিতে যতটা সময় লাগিত, সম্ভবতঃ স্বতন্ত্র শাসনাধীনে ততটা সময় লাগিবে না। তারপর যাহা কিছু লোকমত বেহারে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা যখন আপনা হইতেই বাংলার সহিত সংযুক্ত থাকিতে রাজি নয়, তখন আর এ বিষয়ে বাঙালীর কোনো আপত্তি উত্থাপন করা একেবারেই সঙ্গত হয় না। ভঙ্গ বঙ্গকে যুক্ত করিয়া সম্রাট ও সম্রাটপ্রতিনিধি বাংলার লোকমতের প্রতি যে সম্মান ও আস্থা প্রদর্শন করিলেন, বেহারের লোকমতের প্রতি সেই সম্মান ও আস্থা প্রদর্শনের জন্যই বেহারকে স্বতন্ত্র শাসন দান করা কর্ত্তব্য হইয়াছে।

* * *

কেহ কেহ একটা কাল্পনিক একতার অনুসরণ করিয়া এরূপ প্রকারের শাসনবিভাগের প্রতিবাদ করেন, জানি। তাঁরা ভাবেন ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিকতা যে পরিমাণে নষ্ট হইয়া যাইবে, সেই পরিমাণে ভারতে এক ঘননিবিষ্ট জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে। তাঁরা ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্মকে ভাঙ্গিয়া একটা ধর্ম্মে পরিণত করিতে চান। ভারতের বিবিধ সমাজকে ভাঙ্গিয়া একটা একাকার সমাজতন্ত্র গড়িতে চান। এ দেশে যে নানা ভাষা ও নানা সাহিত্য আছে, সে গুলিকেও তাঁরা নষ্ট করিয়া ভারতব্যাপী একটা ভাষার ও একটা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চান। সমাজবিবর্ত্তনের যে সোপানে আজ ভারত আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে সোপানে এরূপ প্রকারের একতা গড়িয়া তোলা যে সম্ভব নহে, এ কথা তাঁরা ভাবেন না, বা বোঝেন না। আর সম্ভব হইলেও এরূপ একতা যে বাঞ্ছনীয় নহে, ইহাও ইঁহাদের ধারণাতে আসে না। নিম্নস্তরের একতা একাকারের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। উচ্চস্তরের একতা ব্যষ্টির স্বাতন্ত্র্যকে ও নিজস্ব স্বভাবকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নষ্ট করে না, বরং সে স্বাতন্ত্র্য ও সে স্বভাবকে ফুটাইয়া তুলিয়াই, তারই উপরে এক মহতী একতার প্রতিষ্ঠা করে। জীবজগতে এরূপ একতাই সর্ব্বথা প্রশস্ত। জীবের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত। জীব অঙ্গী, তার অঙ্গ সকলের মধ্যে কি কোনো একতা নাই? চোকে, কাণে, নাসিকায়, ত্বকে, রসনায় এ সকলের মধ্যে কি একটা নিগূঢ় একতা নাই? এদের একতা যখন নষ্ট হয়, তখন জীবের জীবনসঙ্কট উপস্থিত হইয়া থাকে। এই একতা অঙ্গীয় একত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত। চক্ষুতে দেখে, কাণে শোনে, রসনায় রস আস্বাদন করে, নাসিকায় গন্ধ গ্রহণ করে, এরা কেহ আপনার কাজ ছাড়িয়া অপরের কাজ করে না। একের অধিকারে

অপরের কার্য্য অসাধ্য। অথচ সকলে আপন আপন অধিকারে থাকিয়া, আপনার প্রকৃতি অনুযায়ী আপনার উৎকর্ষ সাধন করিয়াই, অঙ্গীর সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকে। অঙ্গরূপে তারা প্রত্যেকে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র। অঙ্গীর মধ্যে তারা সকলে পরস্পরের সঙ্গে অতি নিগূঢ় সম্বন্ধে আবদ্ধ। আপন অধিকারে তারা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। অঙ্গীর মধ্যে তারা পরাধীন ও পরতন্ত্র। কিন্তু সে পরও তাদের আপনার, এত আপনার যে তারা নিজেরাও তাদের ততটা আপনার নহে। এরূপ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের উপরে যে একতা প্রতিষ্ঠিত, তাহাই উচ্চতর একতা। জীবজগতে এই একতাই সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ রহিয়াছে। সমাজ-জীবনেও আমরা এই আদর্শের একতারই অনুসরণ করিয়া থাকি। যেমন সমাজ-জীবনে ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহাও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। ব্যষ্টির স্বতন্ত্র সার্থকতার ভিতর দিয়াই সমষ্টিকে এ ক্ষেত্রে আপনার সমাক সার্থকতার অন্বেষণ করিতে হয়। আর সমষ্টির সমগ্রতার মধ্যেই ব্যষ্টিকেও আপনার বিশেষ সার্থকতা লাভ করিতে হয়। এই একতা স্বাতন্ত্র্যকে বিনাশ করে না, কিন্তু স্বাতন্ত্র্যকে ফুটাইয়া, স্বাতন্ত্র্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই, এই উচ্চতর একতা প্রতিষ্ঠা ও পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে। এই যখন জাতীয়জীবনের একতার মূল, তখন বেহারীকে ভাঙ্গিয়া বাঙালী করিতে হইবে, অথবা উড়িষ্যার বিশেষত্বকে লোপ করিয়া বাঙালীর সাধারণত্বে ডুবাইয়া দিতে হইবে, নতুবা জাতীয় একতা প্রতিষ্ঠিত হইবে না,—এরূপ কথা আর বলা যায় কি? অতএব বেহার এবং উড়িষ্যা বাংলা হইতে পৃথক্ হইল বলিয়া, জাতীয় একতার ব্যাঘাত জন্মিবে, এ আশঙ্কার আর স্থান রহিল কৈ?

* * *

একটা পুরাতন সম্বন্ধ সহসা ভাঙ্গিয়া গেলে, কিছু অসুবিধা, কিছু ক্ষতি হইয়াই থাকে। এ ক্ষেত্রেও যে এরূপ ক্ষতি বা অসুবিধা হইবে না, এমন কল্পনা করা যায় না। কিন্তু এ অসুবিধা ও এ ক্ষতি সাময়িক ও সাময়িক হইবে। পরিণামে ইহাতে বাংলা, বেহার, উড়িষ্যার ও সমগ্র ভারতের কল্যাণ হইবেই হইবে। আর আপাততঃও এই ব্যবস্থায় একটী অতি মহৎ কল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়া আশা হয়। ইংরেজ-রাজত্বে একদিন বেহার ও উড়িষ্যায় বাঙালী অগ্রে প্রভুত্ব করিয়াছিলেন। ক্রমে বেহার ও উড়িষ্যায় যত আধুনিক শিক্ষা বিস্তার হইয়াছে, ততই বাঙালীর এই প্রভুত্বের উপরে আঘাত পড়িয়াছে। রাজকার্য্যে ও ওকালতি প্রভৃতি উচ্চতর ব্যবসায়ে বাঙালীর সঙ্গে বেহারী ও উড়িয়া শিক্ষিত-সমাজের একটী তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এই কারণে বেহারী ও উড়িয়া উভয়েই এখন বাঙালীকে ঈর্ষার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই প্রতি-দ্বন্দ্বিতা হইতে বেহারে ও উড়িষ্যায় সমগ্র বাঙালী জাতির উপরে একটা বিদ্বেষভাব জাগিয়া উঠিতেছে। ইহার ফলে বাঙালীর শিক্ষা ও সাধনার প্রভাব বেহারে ও উড়িষ্যায় ক্রমেই ক্ষীণতর হইতেছে। বিধাতাপুরুষ ভারতের এই নবযুগে বাঙালীকে যে পদে বৃত করিয়াছেন, যে কার্য্যভার বাঙালীর উপরে অর্পণ করিয়াছেন, বাঙালী ভারতে উচ্চতম, বিশুদ্ধতম, ভক্তিপ্রণোদিত, ভগবদ্ভাব-উদ্ভাসিত জাতীয়-জীবনের আদর্শ সাধন ও প্রচার করিবে, এই মহৎ কর্ম্মে ভগবান যে বাঙালীকে ডাকিয়াছেন, এই ঈর্ষাতে ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে কর্ম্মের ব্যাঘাত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। এ অবস্থায় বেহার ও উড়িষ্যায় স্বতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাজসরকার কর্ম্মপ্রার্থী বাঙালীর যতই ক্ষতি করুন না কেন, সম্রাট ও সম্রাট-প্রতিনিধি বাঙালীজাতির ও সমগ্র ভারতের যে মহৎ কল্যাণের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন, ইহা অস্বীকার করা যায় কি?

* * * *

কলিকাতা হইতে রাজধানী দিল্লীতে উঠিয়া গেল বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করিতেছেন। সত্য বটে, ইংরেজের রাজধানী না হইলে, কলিকাতা, সুতানটী ও গোবিন্দপুর এই তিন খানা পুরাতন গ্রামের আজ যে অদ্ভুত অভ্যুদয় লাভ হইয়াছে, তাহা কদাপি সম্ভব হইত না। কিন্তু এখন, এই দেড়শত বৎসরের অধিককাল এই সম্পদ ভোগ করিয়া, কলিকাতা এমন এক স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, যাহাতে রাজপ্রতিনিধির স্থানান্তর গমনে তাহার কোনোই ক্ষতির আশঙ্কা নাই। কলিকাতার অভ্যুদয় ব্যবসাবাণিজ্যগত। আর রাজপ্রতিনিধি বা ভারতসরকার বৎসরের মধ্যে পাঁচ মাস কাল কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন বলিয়া, ব্যবসাবাণিজ্যের যে কোনো বিশেষ সুবিধা হইত, এখন তাঁহারা আর এখানে থাকিবেন না বলিয়া যে সে সুবিধা নষ্ট হইয়া গেল, ইহা একান্তই কল্পিত আশঙ্কা। কলিকাতার বাণিজ্য রাজপ্রতিনিধির অবস্থিতি হইতে উৎপন্ন হয় নাই, রাজপ্রতিনিধি কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকিলে সে বাণিজ্যের কোনো হানিরও সম্ভাবনা নাই। কলিকাতার বাণিজ্যের উৎপত্তি বঙ্গোপসাগর ও গঙ্গা হইতে। ইংরেজ যদি প্রথম হইতেই দিল্লীতে যাইয়া রাজধানী স্থাপন করিতেন, তাহা হইলেও বাংলাদেশের স্বাভাবিক বাণিজ্য-পথের কলিকাতা বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোনো না কোনো নগর উত্তর ভারতের বাণিজ্য-কেন্দ্র হইয়া উঠিত। ফলতঃ ইংরেজ এদেশে আসিবার বহুকাল পূর্ব্ব হইতে, বাংলায় তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি অসাধারণ অভ্যুদয়সম্পন্ন নগর বিদ্যমান ছিল। ইংরেজ কোম্পানীর সময়েও হুগলী, চন্দননগর প্রভৃতি বাণিজ্য বিষয়ে কলিকাতার সমকক্ষ ছিল। বাণিজ্য বিষয়ে বাংলার এ প্রাধান্য জলপথের প্রশস্ততা হইতে জন্মিয়াছে। আর এই সুবিধা যতদিন থাকিবে, ততদিন শুদ্ধ রাজধানী কলিকাতা হইতে উঠিয়া গেল বলিয়া, বাংলার কিম্বা কলিকাতার ব্যবসাবাণিজ্যের কোনো ক্ষতির আশঙ্কা হইতেই পারে না। রাজধানীই যেন দিল্লীতে উঠিয়া গেল, আমাদের গঙ্গা, আমাদের সাগর, আমাদের সুফলা সুফলা শস্যশ্যামলা এই সোণার বাংলা, আর এই অভ্যুদয়সম্পন্ন বাঙালীজাতি, ইহাদিগকে তো রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীতে বা তন্নিকটবর্ত্তী রাজপুতনার মরুভূমে সরাইয়া লওয়া সম্ভব নহে। আর যতদিন এ সকল কলিকাতার আশে পাশে থাকিবে, ততদিন কলিকাতার প্রাধান্য খর্ব্ব হওয়া একান্তই অসম্ভব। যেখানে ধন আছে, যেখানে যাতায়াতের সুবিধা আছে, যেখানে জনমণ্ডলীর মধ্যে সম্পদসৌখিনতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, ব্যবসাবাণিজ্য সর্ব্বদা সেখানেই গিয়া আপনার ঘর বাঁধিয়া থাকে। বোম্বাই ও করাচি ভিন্ন পশ্চিম ও উত্তর ভারতের কলিকাতার মত কোনো উৎকৃষ্ট বন্দর নাই। এবং বোম্বাই সহরের ও গুর্জ্জর দেশের পার্শী ও বাণিয়া সম্প্রদায় ভিন্ন, বাঙ্গালী সমাজের মত আর কুত্রাপি এমন সম্পদ সৌখিনতাও দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং এক বোম্বাই ভিন্ন বাংলার মত ব্যবসার উপযোগী এমন ক্ষেত্রও আর কুত্রাপি নাই। রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে উঠিয়া গেলে, বাংলার ব্যবসায়বাণিজ্যের যদি কোনো ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে, তবে এই জন্য যে বাঙালী জাতিরই শ্রেষ্ঠত্ব বা আধিপত্য হ্রাস হইবে এরূপ আশঙ্কারই বা কারণ কি? ইংরেজেরা সূর্য্য নন, বাঙালীও সূর্য্যকান্তমণি নন, যে ইংরেজের কাছে আছেন বলিয়াই বাঙালীর শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবগরিমা। বাঙালীর শ্রেষ্ঠত্ব তাহার মাথায়। ইংরেজ রাজ্যের সঙ্গে তার কোনো ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতা হইতে এ সম্পদ উৎপন্ন হয় নাই। বাঙালী কেবল মোসাহেবী করিয়া বড় হয় নাই। বাঙালীর গৌরব রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্র-লাল, বঙ্কিমচন্দ্র,—এঁদের হইতে। আর

বাংলায় ইংরেজের রাজধানী ছিল বলিয়াই এখানে এই সকল মহাপুরুষের অভ্যুদয় হইয়াছিল, এমন বলা যায় না। যে দেশে এঁরা জন্মিয়াছিলেন, যে জাতিকে এঁরা আপন আপন সাধনসম্পৎদানে গরীয়ান ও বলবান করিয়া গিয়াছেন সে দেশ ও সে জাতি যতদিন থাকিবে, ততদিন ভারতে বাংলার যে স্থান তাহাও অক্ষুণ্ণ থাকিবেই থাকিবে। যাঁহারা সরকারের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লী চলিল বলিয়া বাঙালীর প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছেন, বাঙালী জাতির প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচয় তাঁহারা পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বাঙালী আজ ভারতে কেন, সমগ্র পৃথিবীতে আপনার স্থান পাইয়াছে। এ পদে বিধাতা তাহাকে বরণ করিয়াছেন। যতদিন না বাঙালীর ভারতকে এ জগতকে যা দিবার আছে তাহা সে নিঃশেষ করিয়াছে, ততদিন তার এ অভ্যুদয় ও অধিকার নষ্ট হইবার নহে। নিজেদের জাতের শক্তিসাধ্যের উপরে যাঁহাদের আস্থা ও নিভর নাই, কেবল তাঁরাই রাজধানীর পরিবর্ত্তনে বাংলার সৌভাগ্যহানির ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন।

* * *

রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে যাইবে বলিয়া কেবল যে কলিকাতার বা বাংলার কোনো অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, তাহা নহে, প্রত্যুত ইহা দ্বারা দেশের ভবিষ্য রাষ্ট্রীয় উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে বলিয়াই আশা হয়। কলিকাতা ইংরেজের নিজের সৃষ্টি। এখানকার যা' কিছু সকলই ইংরেজ-শাসনের সঙ্গে জড়িত। ভারতের সনাতন সাধনা ও চিরন্তন জাতীয়জীবনের সঙ্গে কলিকাতার কোনো বিশেষ সম্বন্ধ নাই। এই ইংরেজপ্রতিষ্ঠিত নগরীর পশ্চাতে ভারতের প্রাচীনতর ইতিহাসের কোনো পুণ্যস্মৃতি কোনো গরিমাময়ী উদ্দীপনা বিদ্যমান নাই। ইংরেজ-রাজ যতদিন কলিকাতাকেই আপনার কেন্দ্রস্থান ও পীঠস্থান করিয়া রাখিয়াছিলেন, ততদিন ভারত-ইতিহাসের সঙ্গে তাঁহার কোনো গভীর একাত্মতা স্থাপিত হয় নাই। দিল্লীতে যাইবার এই সংকল্পে বৃটিশরাজ ভারতের সনাতন জীবন-স্রোতের সঙ্গে আপনার অধুনাতন জীবন-স্রোতকে মিশাইতে চাহেন, ভারতবাসীকে আপনার করিয়া, আপনিও ভারতবাসীর আপনার জন হইয়া যাইতে চান, এই শুভসমাচার জগতে প্রচার করিতেছেন। দিল্লী ভারতের! দিল্লী একদিন ছিল ইন্দ্রপ্রস্থ। হিন্দুসম্প্রদায়ের পীঠস্থানরূপে ইন্দ্রপ্রস্থের প্রতিষ্ঠা। সে ধর্ম্মরাজ্য কালগুণে যখন নষ্ট হইয়া গেল, মুসলমানেরা যখন বিদেশ হইতে ভারতে আসিয়া, ভারতের সনাতন জীবন-স্রোতে আপনাদের জীবন-স্রোত মিলাইয়া দিলেন, তখন তাঁরা এই দিল্লীতেই আপনাদের সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থান প্রতিষ্ঠিত করেন। দিল্লী ছিল হিন্দুর হইল মুসলমানের। এখন দিল্লী হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই। গঙ্গা-যমুনাসঙ্গমের ন্যায়, দিল্লীতে হিন্দু ও মুসলমানের রাষ্ট্রশক্তি ও রাষ্ট্রনীতি পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক নূতন শক্তি, নূতন আদর্শ, নূতন সাধনার সৃষ্টি করিয়াছিল। দিল্লীর ভগ্নাবশেষ হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের কীর্ত্তি গাথায় মুখরিত হইয়া আছে। ইংরেজ দিল্লীতে যাইয়া তথায় ত্রিবেণী-সঙ্গমের প্রতিষ্ঠা করিবেন। এ অতি সাধু সংকল্প। ইহার পশ্চাতে ভারতভাগ্যবিধাতার হস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই ত্রিবেণী হইতে নবভারতের নব অভ্যুদয়ের সূচনা হইবে।

নির্ব্বাণ-সম্বন্ধে বিভিন্ন মত

G. De Lafonta ফরাসী হইতে

প্রথমে নির্ব্বাণ-সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ্যিক সম্প্রদায়-সমূহের অন্তর্ভূত দার্শনিকদিগের কিরূপ মত তাহাই দেখা যাক্। যখন বৌদ্ধধর্ম্ম পূর্ণ বিকাশ লাভ করে, "লঙ্কাবতার" নামক সেই সময়কার একটি বৌদ্ধ গ্রন্থে তাহাদিগের মত অবগত হওয়া যায়।

কতকগুলি তীর্থকারের মতে, বুদ্ধিবৃত্তির নিরোধ, পঞ্চভূতের নিরোধ ও ইন্দ্রিয়বৃত্তির নিরোধই—নির্ব্বাণ। তাহার ফলে, মনন-ক্রিয়া রহিত হয়, সুতরাং চিৎ-তত্ত্বের উচ্ছেদ হয়। অন্যদের মতে,—উপরোক্ত মতের বিপরীত,—আত্মার, পুরুষের, জীবের, ব্যক্তির অবিনশ্বর অস্তিত্বই নির্ব্বাণ।

কাহারো কাহারো মতে, পূর্ণজ্ঞান, সত্য ও প্রকৃত মার্গের পরিণামই নির্ব্বাণ; কাহারো বা মতে, নির্ব্বাণ বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জ্জনের ফল।

কিন্তু উল্লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থ, এই সকল মতকে শাস্ত্র-সম্মত ও প্রকৃত মত বলিয়া স্বীকার করে না। আবার যদি ব্রাহ্মণ্যিক সম্প্রদায় ছাড়িয়া বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের নিকট আসি সেখানেও বিভিন্ন মত দেখিতে পাইব। এই সম্বন্ধে, স্বাভাবিক-সম্প্রদায়ের দুই শাখার দুই বিভিন্ন মত। এক শাখার বিশ্বাস,—নির্ব্বাণে, ব্যক্তি-সত্তার বোধটি অক্ষুণ্ণ থাকে, আবার অন্য শাখা-সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, ব্যক্তি-সত্তার বোধটি একেবারেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ঐশ্বরিক সম্প্রদায়ের মতে, আত্মা আদিবুদ্ধের মধ্যে এবং মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের মতে, আত্মা প্রজ্ঞার মধ্যে, অর্থাৎ পরম জ্ঞানের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়।

তিব্বতের লামারা বলে যে, নির্ব্বাণ লাভ করিয়াও যদি কোন সিদ্ধপুরুষ বিশ্বমানবের হিতসাধন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি নির্ব্বাণ শিক্ষা দিবার জন্য মানবদেহ ধারণ করিতে পারেন। এ স্বাধীনতা তাঁহার আছে।

মোট কথা, যে শব্দটির উপর, নির্ব্বাণ-সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাখ্যা সংস্থাপিত—তাহা "শূন্য"। অতএব, সর্ব্বাগ্রে এই শব্দটির লক্ষণ নিরূপণ করা আবশ্যক; তাহা হইলেই বুঝা যাইবে, কিরূপে এই সকল মত-পার্থক্য উৎপন্ন হইল। বৌদ্ধদিগের মতে, শূন্য আঠার প্রকার।

ইহাতেই সপ্রমাণ হইতেছে, এই শূন্যের অর্থ নাস্তিত্ব নহে; কেননা, নাস্তিত্বের প্রকার-ভেদ অসম্ভব—উহা একমাত্র। হজ্‌সন্ বলেন—"বৌদ্ধদিগের পারমার্থিক অর্থে শূন্য শুধু বিশ্বজনীন সত্তা নহে, পরন্তু সকল পদার্থেরই সত্তাগত বিভিন্ন অবস্থা—তাহা জীবনব্যাপারের বাহিরে বিশ্রামের অবস্থাও হইতে পারে, সমাধির অবস্থাও হইতে পারে। বৌদ্ধদের মতে, এই অবস্থা প্রকৃতির

নিত্য অবস্থা। প্রকৃতির মধ্যে শক্তি নিত্য বিদ্যমান, কিন্তু উহা নিত্য প্রকটিত হয় না; তখনই প্রকৃতি সমস্ত নশ্বর গুণ-বিরহিত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।"

ব্রাহ্মণদিগের মতে, একটা জগতের প্রলয়, ও আর একটা নূতন জগতের সৃষ্টি—এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী যে ব্যবধান-কাল, তাহাই শূন্য। এই প্রলয়-দশায়, যাহা কিছু আছে সমস্তই ব্রহ্মের মধ্যে লয় প্রাপ্ত হয়। এই প্রলয়-দশা অ-চিরস্থায়ী; প্রলয়ের পরে ব্রহ্মা আবার সৃষ্টি করেন। যাহারা প্রকৃতিকে নিত্যস্থায়ী বলে, সেই বৌদ্ধদিগের মতে, ইহা একই প্রণালী, কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে প্রকৃতির স্থানে ঈশ্বরকে স্থাপন করা হইয়াছে। এবং যেহেতু এই প্রকৃতি অবিনশ্বর, অতএব শূন্য কখনই নাস্তিত্ব হইতে পারে না।

এক্ষণে প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ কতকগুলি য়ুরোপীয় পণ্ডিতের মত সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাক্।

"কোলব্রুকের বিবেচনায়, নির্ব্বাণ অস্তিত্ব-বিলোপ নহে, পরন্তু একটা চির-বৈরাগ্যের অবস্থা। বুর্নুফ্ এই সম্বন্ধে তাঁর মত স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করেন নাই, কেবল ইঙ্গিত আভাসে বলিয়াছেন মাত্র। তিনি বলেন—"শূন্য শব্দটি হইতে আমার মনে হয়, চিত্তবৃত্তির বিলোপের মধ্যে বুদ্ধ পরম মঙ্গল দেখিয়াছিলেন . . তাহার পর, এই মতবাদ হইতে প্রজ্ঞাবাদ Pyrronisme এবং নাগার্জ্জুনের ন্যায় অন্য সম্প্রদায়দিগের শূন্যবাদ যে উৎপন্ন হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি। কিন্তু কি প্রজ্ঞাবাদ কি শূন্যবাদ—শাক্যমুনির ধর্ম্মোপদেশ-নিঃসৃত সূত্রসমূহের মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে ইহার কোনটারই উল্লেখ নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মোক্ষমূলরের মতে, নির্ব্বাণ—জীবনের পূর্ণাবস্থা। Oldenburg স্বকীয় মত এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন—"যদি বৌদ্ধধর্ম্মকে শূন্যবাদের ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত কর এবং এই নাম হইতে তাহাকে একেবারেই উদ্ধার করিতে চেষ্টা কর—তাহা হইলে, বুদ্ধ ও তাঁহার আদিশিষ্যদিগের বিবেচনায় যাহা সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বিবেচিত হইত সেই সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে তোমার ভুল বুঝা হইবে মাত্র। তাহা ছাড়া আর কোন ফল হইবে না।" Remusat হইতে যে অংশ ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছিলাম তাহাও স্মরণ করিয়া দেখ।

Barthelmy St. Hilaire-এর মতে, বৌদ্ধধর্ম্ম নাস্তিত্বের ধর্ম্ম, এবং তাঁহার এই মতকে আর একটু স্পষ্টতর করিবার উদ্দেশে তিনি বলেন—"বুদ্ধ কোন প্রকার ঈশ্বরই স্বীকার করেন না, তিনি ঈশ্বরকে একেবারেই আমলে আনেন না,—এমন কি, ঈশ্বরকে স্পষ্টাক্ষরে অস্বীকার করাও তিনি আবশ্যক মনে করেন নাই।" কিন্তু M-Obry তাঁহার "বৌদ্ধ নির্ব্বাণ" নামক গ্রন্থে এবং Foucaux তাঁহার "নির্ব্বাণ-সম্বন্ধে বৌদ্ধমত" নামক গ্রন্থে, উক্ত মত সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করিয়াছেন।

Hodgeson বলেন—"তাহাদের সন্দেহ-জনক শূন্যতার অর্থে আমি অস্তিত্ব-লোপ বা অনস্তিত্ব বুঝি না, প্রত্যুত আমি এইরূপ

বুঝি যে, নিবৃত্তির অবস্থায়, প্রাকৃতিক শক্তি-সমূহ যে অসীম সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়, অথবা ইন্দ্রিয়জগতের সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ যে সূক্ষ্মতত্ত্বে পরিণত হয় তাহাই নির্ব্বাণ সর্ব্বাদিম সত্তার একটা বিশেষ অবস্থা ও প্রণালীই নির্ব্বাণ ; ইহা সূক্ষ্মতত্ত্বের চরম ও চূড়ান্ত অবস্থা ; যে সকল বিশেষ বিশেষ বিকার আমাদের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির গ্রাহ্য, উহা সেই সকল বিকার-বিশেষের বাহিরে অবস্থিত। Wilson তাঁহার সংস্কৃত অভিধানে, নির্ব্বাণের অর্থ করিয়াছেন,—শূন্যতা, আকাশ। অতএব তিনিও হজ্‌সনের অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

বুর্ণুফ্ স্বীকার করেন যে, নির্ব্বাণের অবস্থায়, ব্যক্তিসত্তা পদার্থসমূহের মূলতত্ত্বে লয় প্রাপ্ত হয় ; ইহা সম্পূর্ণরূপে সত্তার বিলোপ নহে, পরন্তু যে সকল কারণে সত্তার প্রকাশ হয়, সেই সকল কারণের লোপ হয় মাত্র। ইহা সাংখ্য যোগ মতবাদের কতকটা কাছাকাছি ; শূন্যবাদ বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম-দর্শন হইবে, ইহা বুর্ণুফ্ কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহেন না। Schobelএরও এই মত। তাঁহার মতে, ব্যক্তিসত্তা অন্তর্হিত হয়, কিন্তু "আমি"র মধ্যে যেটুকু অবিনশ্বর, তাহা বিশ্বজনীন বস্তুর মধ্যে, জাগতিক পরমাণুর মধ্যে প্রবেশ করে।

এখন এই বিষয়ে স্বয়ং বুদ্ধের কি মত তাহা বলিয়াই এই প্রবন্ধ শেষ করিব। বুদ্ধ যদিও স্পষ্টাক্ষরে নির্ব্বাণের কোনরূপ ব্যাখ্যা করিতে স্বীকৃত হন নাই, কিন্তু তিনি নির্ব্বাণাবস্থাকে অস্তিত্বের বিলোপ মনে করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। "পরিনির্ব্বাণ-সূত্রে" এইরূপ একটি বচন আছে—"যাহা একেবারেই কিছুই-না, তাহা তির্থিক ও নিগ্রন্থদিগের প্রতিপাদিত মোক্ষের অনুরূপ ; কিন্তু পূর্ণ মোক্ষাবস্থা সেরূপ নহে।"

উহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে নিজের ধরণে স্বাধীনভাবে ইহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারে, এই জন্য বুদ্ধ নির্ব্বাণের প্রকৃতি বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। তাই এইরূপ বলা যাইতে পারে, যতগুলি বৌদ্ধসম্প্রদায়, এই সম্বন্ধে মতও ততগুলি। এখনকার একজন হিন্দু পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন—"কি ব্রাহ্মণিক, কি বৌদ্ধ, নির্ব্বাণসম্বন্ধীয় সমস্ত মতই —হিন্দুরা মানবের চরমগতি সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন তাহারই একটা সার-সংগ্রহ মাত্র।" সে যাহা হউক এ কথা দৃঢ়রূপে বলা যাইতে পারে, বর্ত্তমান কালের অধিকাংশ বৌদ্ধের বিশ্বাস,—নির্ব্বাণাবস্থায় ব্যক্তি-সত্তা বিলুপ্ত হয় না। বস্তুতঃ ইহাই নেপাল, তিব্বত, চীন ও মঙ্গোলিয়ার বৌদ্ধদিগের বিশ্বাস। দাক্ষিণাত্য ও সিংহল-বাসী বৌদ্ধদিগের মতে, নির্ব্বাণ পরম-আধ্যাত্মিক অবস্থা, অনস্তিত্বের অবস্থা নহে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রেমপীড়ার প্রতীকার *

আজ পর্য্যন্ত প্রেমের প্রকৃতি সম্বন্ধে অন্যূন ২৬২টী বৈজ্ঞানিক অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে—ব্যক্তিগত অভিমতের ত সংখ্যাই নাই। প্রেমের বৈচিত্র্য ও অপূর্ব্বত্বের কথা স্মরণ করিলে ইহাকে বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু এই অসংখ্য মতবাদের অধিকাংশই কেবল শারীর তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্ত্রী-পুরুষের যৌন আকর্ষণের হেতু ও পরিণামের আলোচনাই ইহাদের ভিত্তিভূমি।

এই শ্রেণীর মতবাদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক সোপেনহৌরের অভিমতই সর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষজনক। সোপেনহৌরের মতে, "যে জাতিগত বিশেষত্ব স্ত্রীপুরুষের ব্যক্তিগত হৃদয়-বৃত্তির সাহায্যে আপনার অস্তিত্বকে চিরস্থায়ী করিতে চাহে তাহারই নাম প্রেম।" সহজ কথায় সোপেনহৌরের মতে পিতামাতার মধ্যে প্রেম থাকিলে সন্তান যেরূপ উৎকৃষ্ট হয়, প্রেম না থাকিলে তেমন হয় না।

কিন্তু ইহা দ্বারা প্রেমের মনস্তত্ত্ব ভাল বুঝা যায় না। আমার মনে হয় প্রেমিকের ভাব, চিন্তা, আবেগ প্রভৃতির মানসিক ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে এবং দেখান যাইতে পারে যে অন্যপ্রকার চিত্তবৃত্তির সঙ্গে প্রেমের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।

মনস্তত্ত্বের সাহায্যে প্রেমিকের মানসিক অবস্থা ও "প্রেমে পড়ার" প্রণালী সম্বন্ধে কি জানা যায় একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

প্রেম একটী জটিল বৃত্তি। প্রেমিকের চিত্তে প্রণয়িনী সম্বন্ধে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নানা বিচিত্র ভাবের উদয় হয়—যথা মিলনে আনন্দ, বিরহে বিষাদ, প্রণয়িনীর উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা, অপকারীর প্রতি ক্রোধ ইত্যাদি। সুতরাং প্রণয়িনীকে আশ্রয় করিয়া প্রেমিকের চিত্তে নিরন্তর নানা জটিল ভাবের উদয় হয়। বলা বাহুল্য অধিকাংশ স্থলেই এই সকল বিচিত্র ভাবের সঙ্গে পাশব-বৃত্তি জনিত আকর্ষণও অল্পাধিক পরিমাণে মিশ্রিত থাকে। সুতরাং প্রেম একটী জটিল হৃদয়বৃত্তি।

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়বৃত্তিরই মূলে একটী করিয়া "মূলভাব" থাকে এবং এই মূল-ভাবকে আশ্রয় করিয়াই অন্যান্য ভাবরাশি উথলিয়া উঠে। প্রেমের মূলভাব প্রণয়িনী-সমাশ্রিত। নানা প্রকার মানসিক ব্যাধির মূলভাব বা স্থিরভাবের সঙ্গে প্রেমের এই প্রবল মূলভাবের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

মানসিক জীবনের সজীবতার মূলে হৃদয়-বৃত্তি। হৃদয়-বৃত্তির দ্বারা চালিত না হইলে চিত্তে কিছুতেই সজীবতা জন্মে না। অল্পাধিক আবেগ ব্যতীত চিন্তার উদ্ভব হয় না এবং অতি প্রবল হৃদয়বেগ ব্যতীত কোন মৌলিক

* লণ্ডন "কিংস্" কলেজের অধ্যাপক উইলিয়ম ব্রাউন এম্. এ, ডি, এস্. সি লিখিত প্রবন্ধ অবলম্বনে।

চিন্তা জন্মে না। সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ব্যালজাকের রচনাবলী ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ-স্থল। ব্যালজাক্ গভীর রাত্রে উগ্র কাফি এবং প্রবল উত্তেজনার মধ্যে আপনার জগদ্বিখ্যাত উপন্যাসরাজি রচনা করিতেন।

সুতরাং প্রেমে সমস্ত হৃদয়-বৃত্তি প্রবল-ভাবে একটী বিষয়ের উপর কেন্দ্রীভূত হওয়ায় বুদ্ধি-বৃত্তিরও এক নূতন প্রকারের সমাবেশ ঘটে। এই সমাবেশের ফলে বুদ্ধি-বৃত্তির এরূপ পরিবর্ত্তন হয় যে, কেবল যে সকল ভাব ও ধারণা প্রণয়িনীর প্রতি উচ্চ ধারণার পরিপোষক, সেইগুলিই বুদ্ধি দ্বারা গৃহীত হইয়া স্মৃতিপটে মুদ্রিত হয়, তাহার দোষ বা অভাব কিছুতেই চক্ষে পড়ে না। প্রণয়ীকে প্রণয়িনীর দোষ বা হীনতা সম্বন্ধে চেষ্টা করিয়া ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে হয় না। তাই প্রণয়ীর মনে হয়

"চিত্তে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগান্
রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু।
স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে
ধাতুর্বিভুত্বনুচিন্তা বপুশ্চ তস্যাঃ।"

এই খানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে অনেক সময় দেখা যায় যে ঘৃণা প্রেমের অনুরক্ত সহচর। আলফ্রেড ডি মুসেট এবং "জর্জ্জ স্যাণ্ডের" জীবনী এই প্রেম ও ঘৃণার অদ্ভুত সংমিশ্রণের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রণয়িনী "জর্জ্জ স্যাণ্ড" সম্বন্ধে ডি মুসেট লিখিয়াছেন—"ঘৃণা ও বিরাগের প্রবল ঝটিকা কাটিয়া যাইবার পরেই আমার হৃদয়ে এমন বিপুল প্রীতির উদ্রেক হইত যে, সেই প্রীতির আবেগ উচ্ছ্বাসে তাহাকে আমার স্বর্গের দেবী বলিয়া মনে হইত। তাহাকে অপমানিত করার পর ১৫ মিনিট না যাইতে যাইতে আমাকে তাহার চরণ-তলে পতিত হইতে হইত। তাহাকে গালি দেওয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইত।" "জর্জ্জ স্যাণ্ড"ও তাঁহার প্রণয়ী ডি মুসেট সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে "তাহার প্রকৃতি এমনি অদ্ভুত ছিল যে, যে দিন সে পরিপূর্ণ প্রীতি লইয়া শয়ন করিত, তাহার পর দিন নিদ্রাভঙ্গে যুদ্ধ ও হত্যার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিত, আবার যে দিন গালি দিতে দিতে শুইতে যাইত, তাহার পর দিন নিদ্রাভঙ্গে প্রীতি ভরে আশীর্ব্বাদ করিত।"

হৃদয়-বৃত্তিমাত্রেরই অবসাদ বা অতিরিক্ত উত্তেজনার ফলে বিপরীত বৃত্তিতে পরিণত হইবার আশঙ্কা থাকে। প্রেমের ঘৃণায় পরিণতি ইহারই অন্যতম উদাহরণ। অনুরাগের সঙ্গে বিরাগেরও যেন নিত্য সম্বন্ধ। জাতিগত স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্যই প্রেমের সৃষ্টি। সুতরাং এই জাতিগত উদ্দেশ্যের সঙ্গে যখনই ব্যক্তিগত অসুবিধা বা অসুখের বিরোধ ঘটে, তখনি চিত্তে বিরাগের উদ্রেক হয়।

প্রেমের সঙ্গে হিংসারও ঘনিষ্ঠ সংস্রব। এমন কি, কোন কোন বুদ্ধিমতী মহিলা প্রণয়ীকে উপযুক্ত সময়ে হিংসা প্রকাশ করিতে না দেখিলে তাহার প্রেমের গভীরতা সম্বন্ধেই নিঃসন্দেহ হইতে পারেন না। প্রেমের সঙ্গে হিংসার ঘনিষ্ঠতা কেন, এ কথা ভাল বুঝা যায় না। মনে হয়, অনেক স্থলে স্বামিত্ব-বোধের আঘাতপ্রাপ্তি হইতেই

হিংসার উদ্ভব। আমি যাহাকে সম্পূর্ণ নিজের মনে করি, তাহার সম্বন্ধে অন্য কাহারও অধিকারের আভাসমাত্রও আমার পক্ষে পীড়াকর। যাহা হউক এক্ষণে—"প্রেমে-পড়ার" প্রণালীর মানসিক ব্যাপারের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

প্রেমে-পড়ার আদিম সোপান—(১) প্রশংসার ভাব (২ শারীরিক ও মানসিক সুখের সম্ভাবনাজনিত উত্তেজনা এবং (৩) আশা। এই আদিম সোপান উত্তীর্ণ হইলেই প্রণয়ীর চিত্তে প্রণয়িনীর মধ্যে আবিষ্কৃত গুণরাশি "দানা বাঁধিয়া" উঠিতে থাকে। প্রণয়ীর হৃদয় বৃত্তি প্রণয়িনীর মধ্যে নানা গুণরাশি আবিষ্কার করিতে থাকে এবং তাহার বাসনা আকর্ষণকেন্দ্ররূপে সেই সমস্ত গুণরাশিকে নির্দ্ধারিত এবং দোষ ও হীনতা সমূহকে দূরে নিক্ষিপ্ত করিতে থাকে।

এই সময়ে বুদ্ধি এক একবার মাথা তুলিতে থাকে। তাহারই ফলে সন্দেহের উদ্রেক হয়। কিন্তু এই সন্দেহ স্থায়ী হয় না। ভাব দ্বারা আবিষ্কৃত গুণরাশি বুদ্ধির সাহায্যে নূতন শ্রী ধারণ করে এবং হৃদয়ে স্থায়ী প্রেমের প্রতিষ্ঠা হয়।

এইখানে কথা উঠিতে পারে যেখানে "দেখিল আর মজিল," সেখানে এই সকল বিভিন্ন সোপানপরম্পরার অবসর কোথায়? সেখানে গুণরাশির ধীরে ধীরে "দানা বাঁধার" আর প্রয়োজন হয় না। সেখানে প্রবল বাসনা একেবারেই হৃদয় মধ্যে প্রিয়তমার মোহিনী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করে।

কিন্তু আমার মনে হয় প্রেমের এই সকল মানসিক সোপানপরম্পরার অন্তরালে আর এক গুপ্ত সোপান লুক্কায়িত আছে আমাদের জাগ্রত চৈতন্যের অন্তরালে আর এক প্রকার অদৃশ্য চৈতন্য কার্য্য করে। অনেক সময়ে কোন বাহ্যতঃ অযৌক্তিক কার্য্য করিয়া মনে হয় "এমন কাজ আমি কেন করিলাম?" এইরূপ কার্য্যের মূলে আমাদের হৃদয়তলগত অস্ফুট-চেতনা। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, বিভিন্ন চিত্তের মধ্যে নীরবে ভাবের আদান-প্রদান চলে।* এই ভাববিনিময় জাগ্রত চেতনা অপেক্ষা অস্ফুট চেতনার উপরেই সমধিক প্রভাব বিস্তার করে।

দুইটী হৃদয়ের মধ্যে অনুরাগের সঞ্চার হইলে, প্রকৃতিগত সাদৃশ্য-বশতঃ তাহাদের মধ্যে ভাবের নীরব আদান-প্রদান সবেগে চলিতে থাকে এবং এই আদান-প্রদান দ্বারা উভয়ের অস্ফুট চেতনার মধ্যে আকর্ষণের বেগ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে থাকে। এই ঘনীভূত বেগই প্রবল হৃদয়-বৃত্তিরূপে প্রকাশিত হয়।

উপন্যাসলিখিত প্রতিবেশী বালক-বালিকার বাল্যপ্রেম বোধ হয় ভাষার সাহায্য না লইয়াও এই নীরব উপায়েই সংসাধিত হইয়া থাকে। সেই জন্য মনে হয়, পাত্রপাত্রীর অস্ফুট চেতনার মধ্যে ভাবের অবাধ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া দিলে "ঘটকালি" অপেক্ষা অধিক ফললাভ হয়।

প্রেমের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে উপরে যে অভিমত প্রকাশিত হইল, তাহা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, প্রেমের সঙ্গে নানা মানসিক ব্যাধির যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এক একটা "স্থিরভাব" উন্মাদের চিত্তে বদ্ধমূল হইয়া থাকে, সে ভাবকে সে কিছুতেই অপসারিত করিতে পারে না। প্রেমেও প্রণয়ী-প্রণয়িনীর চিত্তে পরস্পরের সম্বন্ধে একটা স্থির ভাবের উদ্রেক হয়, যাহার ফলে প্রণয়ী-হৃদয় আকুলকণ্ঠে গাহিয়া উঠে

"পাশরিতে করি মনে পাশরা না যায়গো।
কি করিব কি হবে উপায় ?"

তার পর অন্যান্য রোগের যেমন একটা "প্রকাশ পাইবার সময়" থাকে, প্রেম-রোগেরও তেমনি। এই সময়টা প্রণয়ী ছটফট করিতে থাকে, শরীরে ও মনে একটা অস্বস্তি ও অবসাদ অনুভব করে, তাহার ইচ্ছাশক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং সময়ে সময়ে সমস্ত স্বভাবেরই আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে। যাঁহারা আমাদের দেশের প্রেমপীড়িত নায়িকাকুলের হৃদয়ে "উশীর-লেপন" ও পত্রপত্রে শয়নের ব্যাপার অবগত আছেন এবং বৈষ্ণব কবির অমরলেখনী-নিঃসৃত "কালিয়া বঁধুর সনে নব পরিচয়ের" ফলে রাধিকার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এ সকল লক্ষণের বিস্তারিত আলোচনা বাহুল্যমাত্র।

প্রকৃত প্রেম অনেক সময় এত প্রবল হইয়া উঠে যে সে মোটেই "অভিব্যক্তি-বাদের" নিয়ম মানিয়া চলে না এবং অনেক সময়ে উন্নততর নবজীবন সৃষ্টি করার পরিবর্ত্তে আপনারই বিনাশের কারণ হয়। কাব্যে, ইতিহাসে, উপন্যাসে এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

তার পর সকলের যেমন সকল রোগের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সমান সম্ভাবনা থাকে না, প্রেম-রোগেরও তেমনি। কেহ কেহ অতি সহজেই প্রেমে পড়ে, আবার কেহ "কুন্দ শুভ্র নবকান্তি সুরেন্দ্র-বন্দিতা" উর্ব্বশীকে দেখিয়াও নির্ব্বিকারভাবে মুখ ফিরায়। শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার সময়েই সহজে শরীরে রোগ প্রকাশ করে। শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতা ও ক্লেশের সময়ই প্রেমরোগের আক্রমণের পক্ষেও অতি শুভ অবসর। সাহিত্যে এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বন্দী অবস্থা, কারাগৃহ এবং রোগ-শয্যাই যে প্রেমের আক্রমণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, এ কথা সকল দেশেরই কথা-সাহিত্যে পুনঃ পুনঃ সমর্থিত হইয়াছে।

তার পর যেমন কোন কোন রোগ (বসন্ত ইত্যাদি) একবার হইয়া গেলে সে রোগের দ্বারা পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা অত্যন্ত কমিয়া যায়, প্রেমরোগও একবার কাটিয়া গেলে সে রোগের দ্বারা পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা প্রায়ই থাকে না। "বিষবৃক্ষের" নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুর পর আর যে সূর্য্যমুখীর প্রতি অবিশ্বাসী হয় নাই এবং "চন্দ্রশেখরের" শৈবলিনী ব্রাহ্মণপণ্ডিত স্বামীর পূজার্চ্চনার আয়োজনে মন না দিয়া আর যে দ্বিতীয় প্রতাপের সঙ্গে "অগাধজলে সাঁতারে" প্রবৃত্ত হয় নাই, এ কথা বেশ সাহস করিয়াই বলা যাইতে পারে। "রোহিণী"কে ছাড়ার পর গোবিন্দলাল যে আর প্রেমের চর্চ্চা করে নাই গ্রন্থেই তাহার পরিচয় এবং "নৌকাডুবির" রমেশ বেচারা হেমনলিনীর হাত এড়াইয়া যে

একেবারে "বিবা হইয়া গিয়াছিল তাহাতেও সন্দেহ করিবার অবসর নাই।

রসিক পাঠক হয় ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যাহারা একই সময়ে একাধিক ব্যক্তির প্রেমে পড়িয়া যায়, তাহাদের সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম কিরূপে খাটে? এক ব্যক্তির একই সময়ে বহু ব্যক্তির প্রেমে পড়ার সম্বন্ধে আমাদের সুগভীর সন্দেহ আছে। যদি দৈবক্রমে এমন কেহ প্রেমগ্রস্ত থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে "ব্যতিক্রমের" মধ্যেই ধরা কর্ত্তব্য।

উল্লিখিত বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস-বর্ণিত অসংখ্য প্রেমের ভীষণ পরিণামের কথা স্মরণ করিলে এবং প্রতিদিনের সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রণয়ঘটিত হত্যা ও আত্মহত্যার কথা পাঠ করিলে প্রেম যে ব্যাধিবিশেষ এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহই থাকে না। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে অস্বাভাবিক প্রেম ব্যাধি হইলেও স্বাভাবিক প্রেমে ব্যাধির লক্ষণ কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু এই স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক প্রেমের মধ্যে সীমারেখা কোথায়?

কিন্তু প্রেম যদি ব্যাধি হয় তাহা হইলে ইহার প্রতীকারের উপায় কি? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আমাদের স্ফুট চেতনা অপেক্ষা অস্ফুট চেতনার সঙ্গেই প্রেমের সম্বন্ধ অধিক। সুতরাং প্রেম-ব্যাধির প্রতীকারের জন্য হৃদয়তলগত অস্ফুট চেতনায় উপনীত হওয়া আবশ্যক। এই অস্ফুট চেতনায় উপনীত হইবার জন্য এক নূতন প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই প্রণালীর নাম "চি-ভবিশ্লেষণ"। ভিয়েনা-নিবাসী অধ্যাপক ফ্রয়ড ইহার আবিষ্কর্ত্তা এবং ইহা তদীয় শিষ্য জুরিক-নিবাসী অধ্যাপক ইয়ং কর্ত্তৃক হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি মানসিক ব্যাধির প্রতীকারে বিশেষরূপে পরীক্ষিত।

এই চিত্ত-পরীক্ষা-প্রণালী অনেকটা আদালতে প্রচলিত সাক্ষীর জেরার অনুরূপ। প্রভেদের মধ্যে এই যে সাক্ষীর নিকট হইতে প্রকৃত কথা বাহির করিবার জন্য যেমন এক একটা সম্পূর্ণ বাক্যের "টোপ" ফেলিতে হয়, ইহাতে এক একটী শব্দের দ্বারাই সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়

ত্রিশ হইতে একশতটী শব্দ লইয়া (ইহার মধ্যে প্রতি তৃতীয় শব্দটী রোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং অবশিষ্ট দুইটী যে কোন শব্দ) একটী একটী করিয়া রোগীর নিকট পড়িয়া যাইতে হয় এবং প্রত্যেক শব্দটী শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর মনে যে শব্দটীর উদ্রেক হয়, তাহাকে সেইটী বলিতে হয়। রোগী কি উত্তর দেয় এবং রোগীর উত্তর দিতে কত সময় লাগে তাহার সূক্ষ্ম হিসাব রাখিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে এমন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহার সাহায্যে উত্তর আপনি লেখা হইয়া যায় এবং সময়ের $\frac{1}{5}$ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত ধরা যাইতে পারে।

উত্তর দিবার সময়ের পরিমাণ এবং উত্তরের প্রকৃতি দেখিয়া মনস্তত্ত্ববিৎ রোগীর স্ফুট চৈতন্য ও অস্ফুট চৈতন্যের তদানীন্তন অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারেন। হিষ্টিরিয়া রোগে দেখা যায়, কোন কোন কথার উত্তর দিতে রোগীর অস্বাভাবিক দীর্ঘ সময় লাগে।

যেখানে সহজ লোকের উত্তর দিতে ২।৩ সেকেণ্ড সময় লাগে, সেখানে তাহাদের ৭।৮ সেকেণ্ড লাগিয়া যায় এবং রোগী কোন কোন কথার উত্তর আদৌ দিতে পারে না। এই সকল স্থলে বুঝা যায় যে রোগী কোন ভাবগত আঘাত পাইয়াছে এবং সেই আঘাত তাহার স্ফুট চৈতন্যের নিম্নে অস্ফুট চৈতন্যে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেই জন্য এই আঘাতের ফলে যে অনিষ্ট ঘটিতেছে রোগী সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

শরীরের মধ্যে কোন বাহ্য বস্তু প্রবেশ করিলে বা শরীরের অভ্যন্তরে কোন বিষাক্ত স্ফোটকের সঞ্চার হইলে তাহার যেরূপ চিকিৎসা এ ক্ষেত্রের চিকিৎসাও তাহারই অনুরূপ। বাহ্যবস্তু বা স্ফোটককে অস্ত্রের সাহায্যে বাহির করিয়া দিলে যেমন রোগ-মুক্তির সম্ভাবনা, অস্ফুট চৈতন্যগত এই ভাবমূলক আঘাতকেও তেমনি স্ফুট চৈতন্য ও যুক্তির রাজ্যে বাহির করিয়া আনিলে এই মানসিক ব্যাধির নিবৃত্তি সম্ভাবনা।

প্রেম এবং অন্যান্য মানসিক ব্যাধি-বিশেষের সঙ্গে অস্ফুট চৈতন্যের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ,এ কথার আলোচনা পূর্ব্বেই করিয়াছি। সেই জন্যই প্রেমিকের কার্য্য ও চিন্তাপ্রণালী অনেক সময়েই অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক হইয়া পড়ে। "মেঘদূতে"র বিরহী যক্ষের অচেতন মেঘকে সম্বোধন করিয়া সুদীর্ঘ প্রণাপোক্তি হিমরজনীতে নগেন্দ্রনাথের বাতায়নতলে দাঁড়াইয়া কুন্দনন্দিনীর "নগ-নগ-নগেন্দ্র" উচ্চারণ এবং শৈবলিনীর অজ্ঞাতকুলশীল লরেন্স্ ফষ্টরের সঙ্গে গৃহত্যাগ—সমস্তই এই তত্ত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ

সুতরাং "চিত্তবিশ্লেষণ"-প্রণালীর সাহায্যে অস্ফুট চৈতন্যগত এই বিকৃতিকে যুক্তি ও বুদ্ধির সূর্য্যালোকে টানিয়া বাহির করিতে পারিলেই যে এই ব্যাধির নিবৃত্তি হইতে পারে, এ বিষয়ে সন্দেহ করার কোন কারণ নাই। অবশ্য সাধারণ ও স্বাভাবিক প্রেমের প্রতীকারের তত প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যেখানে মিথ্যা সন্দেহ ও অভিমান প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর জীবনকে যন্ত্রণাময় করিয়া তুলিয়াছে, যেখানে অন্ধ প্রেমের প্রবল আবেগ জীবনকে কর্ত্তব্যের পথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে বা যেখানে "নিরাশ প্রণয়" ভবিষ্যৎ ক্ষয়রোগের সূচনা করিতেছে, সেখানে যে চিকিৎসার প্রয়োজন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এবং যেখানে চিকিৎসার আবশ্যক সেখানেই এই প্রণালী বিশেষ ফলদায়ক।

প্রণয়ী-প্রণয়িনীর মধ্যে অকারণে কোন বিরোধ ঘটিলে উভয়কে পৃথক পৃথক ভাবে একই শব্দসমষ্টি দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে অতি সহজেই "ভিতরের খবর" বাহির হইয়া পড়ে এবং তাহারাও নিজেদের অকারণ চিত্তবিকৃতির হেতু কি বুঝিতে পারিয়া আপনা হইতেই রোগমুক্ত হয়।

বঙ্কিম বাবু যদি আপনার নায়ক-নায়িকার উপর একবার এই প্রণালীর পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে কি প্রমর মরিত, রোহিণী মরিত, না কপাল-কুণ্ডলা ও নবকুমার ভাগীরথীর "বসন্ত-বাতাহত" খরস্রোতে অমন করিয়া ভাসিয়া যাইত? না সীতারামের হিন্দুরাজত্ব-প্রতিষ্ঠার বিরাট স্বপ্ন চুরমার হইয়া যাইত?"

কিন্তু সীতারামের হিন্দুরাজত্ব যাক্, এখনো এই প্রণালী অবলম্বিত হইলে আমাদের অনেক ভাবপ্রবণ যুবকযুবতীর সুখের সংসাররাজ্য যে রক্ষা পাইতে পারে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

"চিত্তবিশ্লেষণ" পরীক্ষার পর, পরীক্ষা দ্বারা আবিষ্কৃত রোগের কারণ সম্বন্ধে রোগীর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করিয়া তাহার ভাবস্রোতকে অন্যদিকে ফিরাইয়া দিতে পারিলেই রোগ একেবারে নির্ম্মূল হয়।

এই প্রণালী সম্বন্ধে পাঠকের মনে যদি কোন সন্দেহের উদ্রেক হয় তাহা হইলে তিনি নিজেকে একবার রোগীর স্থলাভিষিক্ত করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, পঠিত শব্দগুলি প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার অস্ফুট চৈতন্যকে আঘাত করিয়া হৃদয়ে এমন সকল ভাবের উদ্রেক করিতেছে, যে ভাব তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। পরিশেষে "স্বর্গীয়" প্রেমের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধঘোষণার জন্য যাঁহারা আমাদের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবেন, তাঁহাদিগের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন যে, আমাদের প্রতিদিনের তথাকথিত প্রেম অধিকাংশ স্থলেই আদৌ "স্বর্গীয়" নহে। ইহা পাশবপ্রবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং মানসিক ব্যাধির সঙ্গে ইহার বিশেষ সৌসাদৃশ্য। এই কামজ প্রেম সময়ে সময়ে মানুষকে আত্মবিসর্জ্জন বা আত্মবিনাশে প্রবৃত্ত করিলেও, ইহা প্রকৃতপক্ষে স্বার্থমূলক। সুতরাং ইহার প্রতীকার বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রেমের যে স্বর্গীয় মূর্ত্তি আছে, তাহার নাম প্রীতি। ইহা স্নেহ, প্রেম, ভক্তিরূপে জগতের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত। এই বিশ্বপ্রীতির অবাধ প্রসার হউক। কিন্তু যে প্রেম মানসিক ব্যাধিমাত্র, তাহার প্রতীকারে মানুষ যত্নবান না হইবে কেন?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

নীতিশিক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র

(২)

এই অধঃপতনের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত বিষবৃক্ষের নগেন্দ্রনাথ। গোবিন্দলালের ন্যায় নগেন্দ্রনাথও সর্ব্বগুণে গুণময় ও সর্ব্ব সুখে সুখী ছিলেন। "জগদীশ্বর তাঁহাকে সকল সুখের অধিপতি করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। কান্ত রূপ, অতুল ঐশ্বর্য্য, নীরোগ শরীর, সর্ব্বব্যাপিনী বিদ্যা, সুশীল চরিত্র, স্নেহময়ী সাধ্বী স্ত্রী, এ সকল সকলের ভাগ্যে প্রায় ঘটে না নগেন্দ্রের এ সকলই ঘটিয়াছিল। প্রধান পক্ষে নগেন্দ্রনাথ নিজ চরিত্র গুণেই চিরকাল সুখী। তিনি সত্যবাদী অথচ প্রিয়ংবদ, পরোপকারী অথচ ন্যায়নিষ্ঠ, দাতা অথচ মিতব্যয়ী, স্নেহশীল অথচ কর্ত্তব্য কর্ম্মে স্থিরসংকল্প।"

এরূপ সর্ব্বগুণান্বিত, সর্ব্ব সুখে সুখী ব্যক্তিরও অধঃপতন ঘটিয়াছিল। কারণ—সেই এক বিশ্বজনীন কারণ।—সেই বাসনা ও চিত্তসংযমের অভাব, সেই রূপতৃষ্ণা ও কাম।

নগেন্দ্রের কিছুরই অভাব ছিল না। ধন-সম্পদ্, রূপ-যৌবন সকলই তাঁহার ছিল। তাঁহার দেশে সম্মান, বিদেশে যশঃ, পত্নী-প্রেমেরও অভাব হয় নাই। এমন সাধ্বী, স্নেহময়ী পত্নী কে পাইয়া থাকে? সূর্য্যমুখীর নিকট অবিচলিত, অপরিমিত, অকলুষিত স্নেহরাশি তিনি পাইয়াছিলেন। কিন্তু তবু তাঁহার অধঃপতন হইয়াছিল—এই বাসনার বশে, এই রূপ-লালসায়। এই বাসনাই বিষবৃক্ষ: যিনি ইহা রোপণ করেন তাঁহাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। নগেন্দ্র, দেবেন্দ্র, কুন্দ, হীরা, সকলেই তাহাদের স্বরোপিত বিষবৃক্ষের ফলভোগ করিয়াছিল। প্রথম যখন নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে দেখিলেন, তখন তাহার মনোমুগ্ধকরী কৈশোরাবস্থা, নব যৌবনসঞ্চারের প্রাক্কালে তরুণীর যে বিশ্ববিমোহন রূপ হয়—সেই রূপ নগেন্দ্রের চোখে পড়িল। আমরা তাঁহার নিজের কথাতেই সেই অতুলনীয় রূপের বর্ণনা করিব।

"তাহাকে (কুন্দকে) দেখিয়া বোধ হয় এই সৌন্দর্য্যের সময়। প্রথম যৌবন-সঞ্চারের অব্যবহিত পূর্ব্বেই যেরূপ মাধুর্য্য ও সরলতা থাকে, পরে তত থাকে না। ***

"কুন্দ যে নির্দ্দোষ সুন্দরী তাহা নহে। অনেকের সঙ্গে তুলনায় তাহার মুখাবয়ব অপেক্ষাকৃত অপ্রশংসনীয় বোধ হয়। অথচ আমার বোধ হয় এমন সুন্দরী কখনও দেখি নাই। বোধ হয় যেন কুন্দনন্দিনীতে পৃথিবী ছাড়া কিছু আছে, রক্তমাংসের যেন গঠন নয়; যেন চন্দ্রকর কি পুষ্পসৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে। তাহার সঙ্গে তুলনা করিবার সামগ্রী হঠাৎ মনে হয় না। অতুল্য পদার্থটী, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন শান্ত ভাবব্যক্তি, যদি শরচ্চন্দ্রের কিরণ-সম্পাতে যে স্বচ্ছ সরোবরের ভাবব্যক্তি তাহা বিশেষ করিয়া দেখ, তবে ইহার সাদৃশ্য কতক অনুভূত করিতে পারিবে। তুলনার অন্য সামগ্রী পাইলাম না।"

এই কিশোরী সুন্দরীর রূপ নগেন্দ্রনাথের বড় ভাল লাগিয়াছিল। প্রথমে রূপের প্রতি চিত্তের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ তদতিরিক্ত কিছুই হয় নাই। কিন্তু ঘটনাচক্রে কুন্দ নগেন্দ্রের অন্তঃপুরবাসিনী হইল। নগেন্দ্র তাহাকে শশিকলার ন্যায় দিনে দিনে পরিবর্দ্ধমানা দেখিতে লাগিলেন। তাহার কৈশোর হইতে যৌবনের সঞ্চার ও তাহা হইতে যৌবনের পূর্ণাবস্থা সকলই তাঁহার চোখের উপর হইতে লাগিল। সেই নবযৌবনা সুন্দরীকে যদি নগেন্দ্রনাথ প্রতিনিয়ত দেখিতে না পাইতেন, তবে হয় ত বিস্মৃত হইতে পারিতেন। কিন্তু রাত্রিদিন সেই বহ্নিশিখা তাঁহার হৃদয়ের অতি নিকটে থাকিতে থাকিতে তাহাতে আগুণ ধরিয়া উঠিল। কুন্দনন্দিনীর প্রতি তাঁহার বাসনার সৃষ্টি হইল। নগেন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি সাধ্যমত চিত্ত-দমনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই অবস্থার বৃত্তান্ত আমরা কমলের নিকট সূর্য্যমুখীর পত্র হইতে জানিতে পারি। "যে দিকে কুন্দনন্দিনী থাকেন সাধ্যানুসারে নগেন্দ্র সে দিকে নয়ন ফিরান না। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে তাহার নাম মুখে আনেন না। এমন কি তাহার প্রতি কর্কশ

ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহার প্রতি বিনা দোষে ভৎসনাও করেন। কখন কখন তাঁহার চক্ষু অন্যমনে এদিকে ওদিকে কুন্দের জন্য যেন চাহে। আবার কুন্দকে দেখিলেই নয়ন ফিরাইয়া লন। কুন্দের কণ্ঠস্বর শুনিবার জন্যই কাণ তুলিয়া থাকেন। সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক—কথা বলিলে উত্তর দেন না। কুন্দের বালবৈধব্যের কথায় দুঃখ প্রকাশ করিতে শুনিলে নগেন্দ্রের চক্ষুতে জল আসে। 'কুমুদ' বলিয়া ডাকিতে কুন্দ বলিয়া ফেলেন এবং অপ্রতিভ হন।" সূর্য্যমুখী ঠিকই ধরিয়াছিলেন। এ সব কুন্দের প্রতি আকর্ষণ-ব্যাধির লক্ষণ। যদি কুন্দ তাঁহার পক্ষে সামান্য স্ত্রীলোক হইত তবে নগেন্দ্র এরূপ করিতেন না।" তাহার প্রতি নগেন্দ্রের হৃদয় আকৃষ্ট, অথচ তিনি তাঁহার হৃদয়দমনের চেষ্টা করিতেন ইহাই এই সকলের অর্থ।

এইরূপে হৃদয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে নগেন্দ্রের হৃদয় বিক্ষুব্ধ হইতে লাগিল। নগেন্দ্রের শরীর শীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। মেজাজ রুক্ষ হইয়া উঠিল। প্রিয়তমা পত্নী সূর্য্যমুখীর উপর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। যে প্রজাদিগকে তিনি প্রাণসম ভাল বাসিতেন, তাহাদিগের আবেদন শুনা দূরে থাকুক, দরোয়ান দিয়া হাঁকাইয়া দিতে লাগিলেন। এমন কি দুর্ভাগ্য! নগেন্দ্রনাথ চিত্ত-বিস্মৃতির জন্য মদ্যপান আরম্ভ করিলেন। সূর্য্যমুখী জানিতে পারিয়া তাঁহাকে মদ্যত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলে বলিলেন—"সূর্য্যমুখী, আমি মাতাল, মাতালকে শ্রদ্ধা হয় আমাকে শ্রদ্ধা করিও। নচেৎ আবশ্যক করে না।"

শেষে নগেন্দ্র আর পারিলেন না। বাসনার সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। কুন্দকে লাভ করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। একদিন নির্জ্জনবাপ্পীতীরে কুন্দকে পাইয়া তাহাকে স্পষ্টই বলিলেন "শুন কুন্দ! আমি বহুকষ্টে এতদিন সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু আর পারিলাম না, কি কষ্টে যে বাঁচিয়া আছি, তাহা বলিতে পারি না। আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনি ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি। ইতর হইয়াছি। মদ্য খাই। আর পারি না। তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। শুন কুন্দ! এখন বিধবা-বিবাহ চলিত হইতেছে—আমি তোমাকে বিবাহ করিব। তুমি বলিলেই বিবাহ করি।"

সূর্য্যমুখী যখন নগেন্দ্রের মনোভাব জানিতে পারিলেন তখন নিজে উদ্যোগী হইয়া কুন্দের সঙ্গে স্বামীর বিবাহ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নগেন্দ্র ভাবিলেন এ বিবাহে সূর্য্যমুখী যখন স্বয়ং উদ্যোগী তবে আর কাহার আপত্তি। আমি ত অন্যায় কিছু করিতেছি না। বিধবা-বিবাহ ত শাস্ত্র-সম্মত! কিন্তু নগেন্দ্রনাথ বুঝিলেন না যে এই ন্যায়ের 'অজুহাতে' তাঁহার হৃদয় তাঁহাকেই ফাঁকি দিতেছে;—আর সূর্য্যমুখী! নগেন্দ্র যদি জানিতেন যে সূর্য্যমুখী তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য কিরূপ আত্ম-বলিদান করিয়াছে!

কুন্দকে পাইয়া নগেন্দ্র অত্যন্ত সুখী হইলেন। নবীনত্বের আনন্দে কে না মুগ্ধ হয়? বিশেষতঃ রূপের আকর্ষণ বড় তীব্র; রূপ-ভোগ-লালসা মানবের মন একবার অধিকার করিলে যতক্ষণ তাহার আকাঙ্ক্ষার

পরিতৃপ্তি না হয়, ততক্ষণ তাহাকে দগ্ধ করিতে থাকে। ইহা তীব্র সুরার মত উন্মাদকরী। যে একবার আস্বাদ পাইয়াছে, সে ইহা না পাইলে কিছুতেই থাকিতে পারে না। কিন্তু সুরামত্তের যেমন পানশেষে অবসাদ উপস্থিত হয় তেমনি রূপাকাঙ্ক্ষীরও বাসনার বস্তুকে একবার পাইলে আর তাহার প্রতি সে আকর্ষণ থাকে না। ক্রমে অতৃপ্তি জন্মিতে থাকে। কুন্দনন্দিনীর উপরে নগেন্দ্রের কিরূপ প্রেম হইয়াছিল? সূর্য্যমুখীর উপর নগেন্দ্রের যে প্রেম ইহা সে প্রেম নহে। সূর্য্যমুখীর প্রতি নগেন্দ্রের প্রেম—অনাবিল, নিষ্কলুষ, সংযত ও পবিত্র দাম্পত্যপ্রেম—ইহাকে 'গুণজ প্রেম' বলা যায়। ইহা চিরস্থায়ী—ক্ষয় ত হয়ই না—বরং 'দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধমানা।' আর কুন্দের প্রতি যে প্রেম তাহা "রূপবতীর রূপভোগ-লালসা", ভালবাসা নহে। যেমন ক্ষুধাতুরের ক্ষুধাকে অন্নের প্রতি প্রণয় বলিতে পারি না, তেমনই কামাতুরের চিত্তচাঞ্চল্যকে রূপবতীর প্রতি ভালবাসা বলিতে পারি না। সেই চিত্ত চাঞ্চল্যকেই আর্য্য কবিরা মদন শরজ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা "সর্ব্বজীব-মুগ্ধকরী।" ইহা অত্যন্ত তীব্র—লোকের হৃদয় সহসা আকর্ষণ করিয়া বসে—কিন্তু ইহা চিরস্থায়ী নহে। রূপের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ, সুতরাং এই রূপজমোহ রূপের নূতনত্ব লোপের সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পাইয়া যায়। "রূপদর্শন জনিত যে সকল চিত্তবিকৃতি, তাহার তীব্রতা পৌনঃপুন্যে হ্রাস হয় অর্থাৎ পৌনঃপুন্যে পরিতৃপ্তি জন্মে।"

এই তীব্র মোহময় রূপজ মোহের ফলেই নগেন্দ্র কুন্দের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই এই মাদকতা দূর হইতে লাগিল, কুন্দকে পাইয়া কিছু দিন তার রূপ ভোগ করিতে না করিতেই নগেন্দ্রের চিত্তে অবসাদ উপস্থিত হইল। কুন্দের রূপের নবীনতা তাঁহার নিকট যত মলিন হইতে লাগিল, তাঁহার চিত্তও তত বিমুখ হইতে লাগিল। এদিকে সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিলেন। এই আঘাতে নগেন্দ্রের হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। যদিও কুন্দের প্রতি নগেন্দ্র আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু সূর্য্যমুখী তাঁহার হৃদয় কোন দিনই ত্যাগ করেন নাই, "সূর্য্যমুখীর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় স্নেহ কেবল দুইদিনের জন্য কুন্দনন্দিনীর ছায়ায় আবৃত হইয়াছিল। এখন সূর্য্যমুখীকে হারাইয়া তাহা বুঝিতে পারিলেন। সূর্য্য অস্ত গেলে বুঝিতে পারি সূর্য্যদেবই সংসারের চক্ষু, সূর্য্য বিনা সংসার আঁধার।" তাই সূর্য্যমুখী যখন চলিয়া গেলেন তখন নগেন্দ্র আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, তিনি মোহমুগ্ধ হইয়া কি 'কোহিনূর' হারাইয়াছেন তাহা এতদিনে জানিতে পারিলেন। এই খানে নগেন্দ্রনাথের কৃতপাপের শাস্তি আরম্ভ হইল। তিনি যে বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহার ফল ভোগ করিতে লাগিলেন। নগেন্দ্রনাথের মত সর্ব্বগুণান্বিত চরিত্রবান ব্যক্তি বাসনার সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া যে রূপ বহ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিলেন, এই অধঃপতনই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট শাস্তি। কিন্তু আরও শাস্তি তাহার জন্য অবশিষ্ট ছিল। সূর্য্যমুখীর অভাবে নগেন্দ্রের এখন কিছুই ভাল লাগিল না; সকলই শূন্যময়,

অন্ধকারময় হইল। কুন্দনন্দিনীকে লইয়া আর তিনি গৃহে থাকিতে পারিলেন না। কুন্দ তাঁহার চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিল; তাহার মুখদর্শন আর তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। সংকল্প করিলেন যে সূর্য্যমুখীর জন্য তিনিও গৃহত্যাগ করিবেন, দেশে দেশে তাঁহার সন্ধান করিবেন। তাঁহাকে পাইলে গৃহে ফিরিবেন, নচেৎ নহে। সন্ধান করিতে করিতে নগেন্দ্রনাথ প্রথম জানিলেন যে সূর্য্যমুখী আর ইহলোকে নাই তখন নগেন্দ্রনাথের যে দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। মধুপুর হইতে ফিরিবার পথে নগেন্দ্র ভাবিয়া দেখিলেন যে তাঁহার নিজের দোষে তাঁহার সব শেষ হইয়াছে। তাঁহার ইহকালের আশা-ভরসা, সুখ-শান্তি সকলই ফুরাইয়াছে। ভগবান তো সকলই তাঁহাকে দিয়াছিলেন—রূপ, যৌবন, স্বাস্থ্য, সম্পৎ, বিদ্যা, যশঃ, ধন মান, মানুষের যা প্রার্থনীয় কিছুতেই তাঁহাকে বঞ্চিত করেন নাই; ইহার অপেক্ষাও যে ধন দুর্লভ, যে একমাত্র সামগ্রী এ সংসারে অমূল্য—অশেষ প্রণয়শালিনী সাধ্বী ভার্য্যা, ইহাও তাঁহার প্রসন্ন কপালে ঘটিয়াছিল।" এই সকল সুখের সামগ্রী তিনি নিজের দোষে নিজের পাপে হারাইয়াছেন। এমন তাঁহাপেক্ষা আর অসুখী কে আছে? তাঁহার মত নরাধম আর কে আছে? "এই দেশের রাজকারাগারে এমন কে নরঘ্ন পাপী আছে যে আমার অপেক্ষা সুখী নয়? আমা হতে পবিত্র নয়? তারা অপরকে হত করিয়াছে, আমি সূর্য্যমুখীকে বধ করিয়াছি। আমি ইন্দ্রিয় দমন করিলে সূর্য্যমুখী বিদেশে আসিয়া কুটিরদাহে মরিবে কেন? আমি সূর্য্যমুখীর বধকারী; কে এমন পিতৃঘ্ন মাতৃঘ্ন পুত্রঘ্ন আছে যে আমার অপেক্ষা গুরুতর পাপী?" মনে করিলেন এ জীবন সূর্য্যমুখী-বধের প্রায়শ্চিত্তে উৎসর্গ করিব। সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া যে সকল ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন আমিও সেই সকল ভোগ করিব; সকল বিষয়বাসনা সুখসম্পত্তি ত্যাগ করিব। যেখানে যেখানে অনাথা স্ত্রীলোক দেখিব, সেই খানে প্রাণ দিয়া তাহার উপকার করিব।

তারপরে কিরূপে নগেন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রের বাড়ী আসিলেন, কিরূপে সূর্য্যমুখীর সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া হতবুদ্ধি পাগলের মত হইয়া গেলেন, কিরূপে অতিকষ্টে ভগ্নহৃদয়ে গোবিন্দপুরে ফিরিলেন তাহার বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নাই। তারপর সেই ভয়ঙ্কর রাত্রি—সেই কটিকাবিক্ষুব্ধ প্রকৃতির কঠোরমূর্ত্তি—সেই শয়নগৃহ—সেই সূর্য্যমুখীর স্মৃতিবিজড়িত প্রকোষ্ঠ; নগেন্দ্রের সেই অসীম যন্ত্রণা, স্মৃতির দহনে নগেন্দ্রের সেই তুষানল প্রায়শ্চিত্ত, সেই ছায়া-মূর্ত্তি, নগেন্দ্রের ব্যাকুল কাতরতা, সে সকলই 'বিষবৃক্ষের' পাঠক জানেন। বোধ হয় অনুতপ্ত নগেন্দ্রের এই অরুদ্ধ যন্ত্রণা দেখিয়া বিধাতার দয়া হইল। নগেন্দ্র শেষে সূর্য্যমুখীকে পাইলেন। কিন্তু কুন্দ মরিল। কৃতপাপের শেষ শাস্তি-চিহ্নস্বরূপ একটী বিষাদরেখা চিরদিনের তরে নগেন্দ্রের হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়া গেল।

কেন নগেন্দ্রনাথের এই গভীর অধঃপতন হইল, ইহার উত্তরে আমরা বলিয়াছি যে—তাঁহার বাসনা ও চিত্তসংযমের অভাব।

কিন্তু নগেন্দ্রনাথ ত যথাসাধ্য চিত্তসংযমের চেষ্টা করিয়াছিলেন। গোবিন্দলালও প্রথম প্রথম চিত্তসংযমের চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষে কতকটা ভ্রমরের উপর ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া, কতক বা মোহমুগ্ধ হইয়া, ইচ্ছা করিয়াই রোহিণীর রূপবহ্নিতে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। তেমন আত্মদমনের চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ ত শেষ পর্য্যন্ত হৃদয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তবে কেন তাঁহার এরূপ দুর্দ্দশা হইল? ইহার উত্তর বড় রহস্যময়। মানব-হৃদয়দর্শী কবির নিজের ভাষাতেই আমরা তাহার উত্তর দিব—"দুঃখী না হইলে লোভে পড়িতে হয় না। যাহার যাহাতে অভাব, তাহার তাহাতেই লোভ। কুন্দনন্দিনীকে সুতীক্ষ্ণ লোচনে দেখিবার পূর্ব্বে নগেন্দ্র কখন লোভে পড়েন নাই, কেননা কখনও কিছুরই অভাব জানিতে পারেন নাই। সুতরাং লোভ সংবরণ করিবার জন্য যে মানসিক অভ্যাস বা শিক্ষা আবশ্যক, তাহা তাঁহার হয় নাই। এই জন্যই তিনি চিত্তসংযমে প্রবৃত্ত হইয়াও সক্ষম হইলেন না। অবচ্ছিন্ন-সুখ দুঃখের মূল; পূর্ব্বগামী দুঃখ ব্যতীত স্থায়ী সুখ জন্মে না।"

অধঃপতনের তৃতীয় দৃষ্টান্ত সীতারাম। গোবিন্দলাল ও নগেন্দ্রনাথের অপেক্ষা সীতারামের অধঃপতন আরও শোচনীয়। গোবিন্দলাল মোহমুগ্ধ হইয়া আপন প্রিয়তমা, আবাল্যসহচরী পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া কুলটার রূপবহ্নিতে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, বিশেষ আত্মসংযমের চেষ্টা করেন নাই। নগেন্দ্রনাথও রূপমুগ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি শেষ পর্য্যন্ত হৃদয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। শেষে পরাস্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কুন্দকে কুলটার কলঙ্কে কলঙ্কিত করেন নাই। তাহাকে বিবাহ করিয়া সমাজবন্ধন ও নীতির কতকটা সম্মান করিয়াছিলেন। কিন্তু সীতারাম আপনার ধর্ম্মপত্নীর মোহমুগ্ধ হইয়া ধ্বংসের পথে উপনীত হইয়াছিলেন। সীতারাম উচ্চবংশসম্ভূত, বীর, চরিত্রবান, ধার্ম্মিক। তিনি স্বদেশভক্ত, মুসলমানকে পরাস্ত করিয়া হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুতরাং সীতারাম অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ। এমন সীতারামেরও বাসনার জন্য, রূপের তৃষ্ণায় অধঃপতন হইল। আর সে বাসনা, সে রূপতৃষ্ণা কাহার প্রতি? আপন ধর্ম্মপত্নী সহধর্ম্মিণীর প্রতি। ইহার দ্বারা কবি দেখাইয়াছেন যে, বাসনা মাত্রেই, রূপতৃষ্ণা মাত্রেই মানুষের শত্রু—তাহার ধ্বংসের কারণ। ধর্ম্মপত্নী ও সহধর্ম্মিণীর সহিত মানবের যে সম্বন্ধ, তাহার মধ্যে বাসনার স্থান, কামনার স্থান আছে বটে; কিন্তু তাহাই সেই সম্বন্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। সেই সম্বন্ধ ধর্ম্মের উপর, মানবজীবনের পবিত্র সাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত। যখন সেই সম্বন্ধ রূপতৃষ্ণা ও বাসনা মাত্রে পরিণত হয়, তখন তাহার দ্বারাও মানুষের অধঃপতন হইতে পারে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংস সঙ্গস্তেষূপজায়তে
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥
(গীতা ২। ৬২, ৬৩।)

অর্থাৎ কোন বিষয়ের ধ্যানের দ্বারা তাহার প্রতি আসক্তি, আসক্তি হইতে কাম, কাম হইতে তাহার অপরিতৃপ্তিতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে লোকের ধ্বংস হয়। মহাকবি সীতারামের চরিত্রে এই জলন্ত সত্য অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হইয়াছে দেখাইয়াছেন।

শ্রী সীতারামের পত্নী হইলেও কারণ বশতঃ বিবাহের পর আর তার সীতারামের সহিত দেখা হয় নাই। সীতারাম আরও দুই বিবাহ করিয়াছিলেন। নন্দা ও রমা। সুতরাং শ্রীর অভাব তিনি কোনদিনই অনুভব করেন নাই। যখন শ্রীকে সীতারাম প্রথম দেখিলেন, তখন বুঝিতে পারিলেন শ্রী কত সুন্দরী; দেখিলেন শ্রী "অশ্রুপূর্ণ বর্ষাবারিনিষিক্ত পদ্মের ন্যায় অনিন্দ্যসুন্দরী" বলিলেন "তুমি শ্রী এত সুন্দরী।" শ্রী তাঁহাকে ভ্রাতা গঙ্গারামের প্রাণরক্ষার জন্য অনুরোধ করিল, সীতারাম প্রাণ দিয়াও গঙ্গারামকে বাঁচাইবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। শ্রী চলিয়া গেল, ভাবিলেন "শ্রী এমন শ্রী তা ত জানি না, আগে শ্রীর কাজ করিব, তারপর অন্য কথা।" আরও "হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে আর কে রাখিবে?" শেষের কথা শ্রী সীতারামকে বলিয়াছিল।

প্রথম সাক্ষাতেই শ্রী সীতারামের মনে এইরূপ গভীর দাগ টানিয়া দিল। সীতারাম শ্রীর সেই অলোকসামান্য রূপ দেখিলেন। শুনিলেন "হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?" সীতারামের মনের গতি পরিবর্তিত হইয়া গেল। তারপর রণক্ষেত্রে শ্রীর সেই "সিংহবাহিনী মূর্ত্তি।" মহা-মহীরুহের শ্যামল পল্লবরাশি মণ্ডিত চণ্ডীমূর্ত্তি; দুই পাহাড়ে দুই চরণ স্থাপন করিয়া বামহস্তে এক কোমল শাখা ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তে অরুণ ঘুরাইতে ঘুরাইতে ডাকিতেছে "মার মার! শত্রু মার!" অরুণ ঘুরিতেছে, অনাবৃত আলু-লায়িত কেশদাম বায়ুভরে উড়িতেছে, দৃপ্ত পদভরে বৃহৎ শাখা দুলিতেছে, উঠিতেছে, নামিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে সেই মধুরিমাময় দেহ উঠিতেছে, নামিতেছে—যেন সিংহ-বাহিনী সিংহপৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া রণরঙ্গে নাচিতেছে। যেন মা অসুরবধে মত্ত হইয়া ডাকিতেছেন, "মার! মার! শত্রু মার!" শ্রীর আর লজ্জা নাই, কোন ভয় নাই, বিরাম নাই, কেবল ডাকিতেছে "মার! শত্রু মার! দেবতার শত্রু! মানুষের শত্রু! হিন্দুর শত্রু! আমার শত্রু! মার শত্রু মার!" উত্থিত বাহু কি সুন্দর, স্ফুরিত অধর, বিস্ফারিত নাসা, বিদ্যুন্ময় কটাক্ষ, স্বেদাক্ত ললাটে স্বেদ বিজড়িত চূর্ণকুন্তলের শোভা। সকল হিন্দু সেই দিকে চাহিতেছে, আর "জয় মা চণ্ডিকে" বলিয়া রণে ছুটিতেছে। গঙ্গারাম প্রথমে মনে করিতেছেন যে, "যথার্থই চণ্ডী অবতীর্ণা।" সে মূর্ত্তি যে দেখিল সে আর ভুলিতে পারিল না। সীতারামও দেখিলেন। যেটুকু বাকি ছিল সম্পূর্ণ হইল, সীতারাম বুঝিলেন; সেই সিংহবাহিনী মূর্ত্তি প্রতিভেদ করিয়া তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃস্তলে প্রবেশ করিল। যুদ্ধাবসানে শ্রীর সঙ্গে দেখা হইলে সীতারাম শ্রীকে বলিলেন "তুমি আমার স্ত্রী, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব না।

বিনা অপরাধে স্ত্রীত্যাগ ঘোরতর অধর্ম।" এই বলিয়া থাকিবার জন্য শ্রীকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। কিন্তু সে 'প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী' এই কথা শুনিয়া শ্রী আর সীতারামের কথা শুনিল না, সীতারামকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। অন্ধকারে যে কোথায় মিশাইল, সীতারাম আর দেখিতে পাইলেন না।

শ্রী চলিয়া গেল, কিন্তু সীতারাম তাহাকে ভুলিতে পারিলেন না। শ্রী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, কিন্তু তাঁহার হৃদয় শ্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারিল না। শ্রী যে সীতারামের মনের মধ্যে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। যখন শ্রীকে সীতারাম দেখেন নাই, তখন তাহার কথা মনে হয় নাই। বিশেষতঃ তাঁহার একদিকে নন্দা একদিকে রমা—একদিকে সম্পদ আর একদিকে সুখ। শ্রীর কথা তাঁহার মনে হইতে পারে নাই। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে শ্রীকে এবং তাহার সেই অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দেখিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। শ্রীকে দেখেন নাই সে তো ছিল ভাল, কিন্তু দেখা দিয়া শ্রী বড় গোলযোগ বাধাইয়া গেল। শ্রীর চাঁদপানা মুখ খানা, চলচলে ঢলঢলে, জলভরা, চোখদুটো বড় গোল করিয়া গেল। কেবলই কি রূপের মোহ? আ ছি ছি! তা না! তবে তার রূপেতে, তার দুঃখেতে, আর সীতারামের অকৃত অপরাধে, এই তিনটায় মিশিয়া গোলযোগ বাধাইয়া দিল। তা যা হউক, তার একটা বুঝা পড়া হইতে পারিত!—কিন্তু সেই সিংহবাহিনী মূর্ত্তি! আ মরি মরি, এমন কি আর হয়?"

"সেই সিংহবাহিনী মূর্ত্তি সীতারামের অন্তর দগ্ধ করিতে লাগিল। সীতারাম শ্রীর অনেক অনুসন্ধান করিলেন। নদীতটে, বনমধ্যে, জনশূন্য প্রান্তরে যে দিকে যে দিকে শ্রীর যাওয়া সম্ভব, সর্ব্বত্র তাহাকে খুঁজিলেন। কিন্তু অতলজলে রত্ন হারাইয়া গেলে আর যেমন তাহা পাওয়া যায় না, শ্রীকেও সীতারাম আর তেমনি খুঁজিয়া পাইলেন না। কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত বস্তু যত দুর্লভ, যত দুষ্প্রাপ্য হয়, ততই তাহা আমাদের নিকট প্রিয় হইয়া উঠে। যাহাকে ইহ জগতে খুঁজিয়া পাইলাম না, ইহজীবনে সে-ই প্রিয়। তাই শ্রী সীতারামের হৃদয়ে প্রিয়ার উপর বড় প্রিয়া, হৃদয়ের অধিকারিণী। শ্রীর অনুপম রূপমাধুরী তাঁহার হৃদয়ে তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল, শ্রীর গুণ এখন তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক হইতে লাগিল।" কিন্তু হায় কোথায় সে শ্রী! সীতারাম ভূষণা ত্যাগ করিয়া মহম্মদপুরে আসিয়া রাজ্য-স্থাপন করিলেন। আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। মহম্মদপুরে সুরক্ষিত সুসম্বদ্ধ নগর স্থাপিত হইল। হাট বাজার বিপণিতে তাহা সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। সীতারাম গড়, গড়খাই, প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া নগর-রক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন। বন্দুক গোলা বারুদের কারখানা জন্মিয়া গেল। অস্ত্রধারী সৈন্যসামন্তে মহম্মদপুর সজ্জিত হইয়া উঠিল। সীতারাম এই রাজ্যস্থাপনব্যাপারে বড় উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। কিন্তু এই বিপুল কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও এই অবসরহীন কঠোর পরিশ্রমের মধ্যেও সীতারাম শ্রীকে ভুলিতে পারেন

নাই। বরং কতকগুলি কারণেবশতঃ স্ত্রীকে তাঁহার আরও মন্দ হইতে লাগিল।

সীতারামের কনিষ্ঠাপত্নী রমা বড় বালিকাবুদ্ধি, ভীরুস্বভাবা। সে ভীরু-প্রকৃতি সাধারণ বাঙ্গালী রমণীরই মত কোমলস্বভাবা, স্নেহশালিনী; কিন্তু এই স্নেহই তাহাকে আরও ভীরু করিয়া তুলিল। এই সব উদ্যোগ-আয়োজনে, এই স্বাধীন-রাজ্যস্থাপনের প্রয়াসে ভীরু রমা বড় ব্যাকুলা হইয়া উঠিল। মুসলমানের সঙ্গে লড়াই হইবে, তবে ত স্বামী পুত্র মারা যাইবে, সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবে, এই মনে করিয়াই রমার প্রাণ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। রমা সীতারামকে বড় পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল, এ সব ছাড়িয়া দাও, ফৌজদারের পায়ে গিয়া পড়, তিনি ক্ষমা করিবেন। সীতারাম অবশ্য সে কথা শুনিলেন না। তখন রমা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল। ক্রমে কাঁদাকাটি, কান্নাহাটি, ঘ্যানঘ্যান, প্যান-প্যান, হাতে-ধরা, পায়ে-ধরা, মাথাখোঁড়া সব অস্ত্রই রমা সীতারামের প্রতি ত্যাগ করিতে লাগিল। উঠিয়া পড়িয়া তাহার পিছনে লাগিল, সীতারাম বিরক্ত হইয়া রমার সংসর্গ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। রমার এই বিরক্তি-কর আচরণে সে সীতারামের চক্ষুশূল হইয়া উঠিল। তখন সীতারাম শ্রীর অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। মনে হইল "হায় এ দিনে যদি শ্রী আমার সহায় হইত!" "যে বৃক্ষাক্রূঢ়া মহিষমর্দ্দিনী অঞ্চলসঞ্চেতে সৈন্য সঞ্চালন করিয়া রণজয় করিয়াছিল, যদি সেই শ্রী সহায় হয় তবে সীতারাম কি না করিতে পারেন? তখন শ্রীষ্ট শ্রীত্রিদিন সীতারামের মনে জাগিতে লাগিল. রমার দোষে সীতা-রামের হৃদয়স্থিত সেই চিত্রপট দিন দিন আরও উজ্জ্বলপ্রভাবিশিষ্ট হইতে লাগিল।" সেই চিত্রপটের কাছে রমাও নয় নন্দাও নয়। অবশ্য নন্দা রমার মত ভীরুস্বভাবা নহেন। মুসলমান হইতে নন্দার কোনো ভয় নাই। নন্দা স্বামীর সাহসেই সাহসিনী। যখন সীতারামের সাহস আছে তখন নন্দার ভয় কি? নন্দা কেবল প্রাণপাত করিয়া পতিপদ-সেবায় নিযুক্তা। মাতার মত স্নেহ, কন্যার মত ভক্তি, দাসীর মত সেবা, সীতারাম সকলই নন্দার কাছে পাইতেছিলেন, কিন্তু তাহাতেই কি সীতারামের সকল অভাব পূর্ণ হয়? বীর, হিন্দুরাজ্য-স্থাপয়িতা, স্বদেশ-ভক্ত, কর্ম্মবীর, মহারাজা সীতারামের সহ-ধর্ম্মিণী কই? "যে তাঁহার উচ্চ আশার আশাবতী, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার ভাগিনী, কঠিন কার্য্যে সহায়, সঙ্কটে মন্ত্রী, বিপদে সাহস-দায়িনী, ভয়ে আনন্দময়ী, সে কই? বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী ভাল, কিন্তু সমরে সিংহবাহিনী কই? তাই নন্দার ভালবাসায় সীতারামের পদে পদে শ্রীকে মনে পড়িত, পদে পদে সেই সংক্ষুব্ধা সৈন্যসঞ্চালিনীকে মনে পড়িত। 'মার মার! শত্রু মার! দেশের শত্রু! হিন্দুর শত্রু! আমার শত্রু মার!' সেই কথা মনে পড়িত। সীতারাম তাই মনে মনে সেই মহিমময়ী সিংহবাহিনী মূর্ত্তি পূজা করিতে লাগিলেন।" এইরূপে ক্রমে ক্রমে শ্রীর প্রতি সীতারামের উন্মাদকর প্রেম জন্মিতে লাগিল। শ্রীর প্রতি সেই উন্মাদকর প্রেম সীতারামের চিত্ত অধিকৃত করিল। তাহার স্রোতে নন্দা রমা ভাসিয়া গেল।

মনের যখন এইরূপ অবস্থা, যখন শ্রীর চিন্তার স্রোতে সীতারামের মন ভাসিয়া চলিয়াছে, তখন জয়ন্তীর অনুগ্রহে সীতারাম একদিন শ্রীকে পাইলেন। সীতারাম প্রথমে আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার আর তেমন আনন্দ রহিল না। সীতারাম যেন বুঝিতে পারিলেন যে, এ আমার সে শ্রী নহে। "বুঝি দেখিলেন সে স্থিরমূর্ত্তি অবিচলিতধৈর্য্যসম্পন্না, অশ্রুবিন্দুমাত্রশূন্যা, উদ্ভাসিতরূপরশ্মিমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিনী, মহামহিমময়ী এ যে দেবী প্রতিমা! বুঝি এ শ্রী নহে।" সীতারাম কহিলেন "শ্রী তুমি মহিষী হইয়া রাজপুরী আলো কর।"

শ্রী কহিল "আমি সন্ন্যাসিনী, সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছি—আমি তোমার মহিষী পদের যোগ্যা নহি।"

সীতারাম। পতিভক্তির সন্ন্যাস-অধিকার নাই। পতিসেবাই তোমার ধর্ম্ম।

কিন্তু হায়, যে সর্ব্বকার্য্য ত্যাগ করিয়াছে। তাহার পতিসেবাও ধর্ম্ম নহে। দেবসেবাও ধর্ম্ম নহে।

সীতারাম অনেক বুঝাইলেন। বুঝাইলেন যে ইহলোকে স্বামী-সেবাই রমণীর পরম ধর্ম্ম—অন্যধর্ম্ম তাহার নাই। অন্যধর্ম্ম তাঁহার পক্ষে কুশিক্ষা। বুঝাইলেন যে, তিনি তাহাকে কত ভাল বাসেন, তাহার জন্য এ পাঁচবৎসর দেশে দেশে নগরে নগরে কত অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। বলিলেন যে—তিনি স্বামী, তিনি রাজা; শ্রীর উপর তাঁহার অধিকার আছে। তিনি শ্রীকে যাইতে দিবেন না। কিন্তু শ্রী কিছুতেই শুনিল না। শ্রী সন্ন্যাসের কথা, কর্ম্মত্যাগের কথা, সর্ব্বভূতে ভালবাসার কথা, নিষ্কাম ধর্ম্মের কথা, ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণের কথা—কত কি কথা বলিল। বলিল—সীতারাম স্বামী, রাজা, উপকারী, তিনি জোর করিলে থাকিতে হইবে। কিন্তু তিনি মহিষী হইতে পারিবেন না। তিনি রাজপুরীতে বাস করিতে পারিবেন না—তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র কুটিরের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রী সেখানে সন্ন্যাসিনীর মতই বাস করিবে রাজা তাঁহার সঙ্গে একাসনে বসিতে পারিবেন না। ধর্ম্মাচরণ ভিন্ন অধর্ম্মাচরণ করিতে পারিবেন না। অন্যথা হইলে বিষপ্রয়োগে শ্রী আত্ম-হত্যা করিবেন।

তাহাই হইল—শ্রীর কথাই থাকিল। রাজা শ্রীর জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, শ্রী যাহা যাহা বলিল সকলই করিলেন। বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন যে শীঘ্রই তাঁহার সংস্পর্শে শ্রীর সন্ন্যাস ঘুচিয়া যাইবে। কিন্তু, তাহা ত হইল না। সীতারাম অনন্ত বহ্নিরূপিণী শ্রীকে লইয়া খেলা করিতে গিয়া আপনি পুড়িয়া মরিলেন।

চিত্তবিশ্রাম নামে এক নূতন ভবন শ্রীর জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। রাজা সেখানে শ্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতে লাগিলেন। সন্ন্যাসিনী শ্রী সেখানে বাঘছাল পাতিয়া বসিত—রাজা তাঁহার সম্মুখে পৃথকাসনে বসিতেন। আলাপ যাহা হইত তাহা প্রণয়ী স্বামীস্ত্রীর মত নহে। রাজা ভাল-বাসার কথা বলিতেন;—শ্রীর জন্য কত অনুসন্ধান করিয়াছেন, কত কষ্ট করিয়াছেন তাহা বলিতেন। শ্রী বলিত ধর্ম্মের কথা

তাহার কথা, শাস্ত্রের কথা, যতী সন্ন্যাসীর কথা, কত নদনদী পর্ব্বত অরণ্যপূর্ণ দেশ-দেশান্তরের কথা।

শুনিতে শুনিতে সেই পৃথক্ আসনে বসিয়াও রাজার বড় বিপদ হইল। আগুন ত জ্বলিয়াই ছিল, এবার ঘর পুড়িল। শ্রীর সেই অপূর্ব্ব সিংহবাহিনী মূর্ত্তি সীতারামের হৃদয়ে পূর্ব্বেই আগুন জ্বালিয়াছিল, কিন্তু এবার শ্রীর যে মূর্ত্তি সীতারাম চক্ষে দেখিলেন তাহাতে তাঁহার সর্ব্বনাশ ঘটিল। এ কি রূপ? সেই সিংহবাহিনী কি এই সন্ন্যাসিনীর কাছে লাগে। "যে শ্রী বৃক্ষ-বিটপে দাঁড়াইয়া আঁচল হেলাইয়া ভঙ্গভঙ্গ করিয়াছিল, রূপে এ শ্রী তাহার অপেক্ষা অনেক গুণে রূপসী। শরীরের স্বাস্থ্য এবং মনের বিশুদ্ধি শতগুণে বাড়িয়াছিল, তাই রূপও শতগুণ বাড়িয়াছিল। সদ্য-প্রস্ফুটিত পারিজাতপুষ্পের যেমন পূর্ণস্বাস্থ্য কোথাও অপুষ্ট নয়, কোথাও অঙ্গহীন নয়, কোথাও বিবর্ণ নয়, কোথাও বিশুষ্ক নয়, সর্ব্বত্র মসৃণ, সম্পূর্ণ, স্নিগ্ধ, সুবর্ণ—শ্রীর তেমনই স্বাস্থ্য;—শরীর সম্পূর্ণ, সেই জন্য শ্রী প্রকৃতির মূর্ত্তিমতী শোভা। একটুমাত্র ইন্দ্রিয়ভোগের ছায়া নাই, কোথাও চিন্তার চিহ্ন নাই, সর্ব্বত্র সুমধুর, সহাস্য, সুখময়ী —এ ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তির কাছে সে সিংহ-বাহিনী মূর্ত্তি কোথায় দাঁড়ায়।"

তারপর সেই মনোমোহিনী কথা। রূপসী সন্ন্যাসিনী শ্রীর মুখে সেই মনোমোহিনী কথা। সেই জ্ঞানগর্ভ, মধুময়, অমৃতবর্ষিণী—কখনও মনোরঞ্জক, কখনও কৌতূহলোদ্দীপক কথা। শুনিতে শুনিতে সীতারামের চিত্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। সেই রূপ আর সেই কথা—এই দুই মোহ একত্র মিশিলে কোন অ-সিদ্ধ ব্যক্তির রক্ষা আছে! সীতারামের অনেক দিন ত আগুন জ্বলিয়াছিল, এখন ঘর পুড়িতে লাগিল! শ্রী হইতে সীতারামের সর্ব্বনাশ হইল।

এইরূপ মোহমুগ্ধ হইয়া সীতারাম শ্রীর প্রতি ক্রমেই তীব্রভাবে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। প্রথমে সীতারাম চিত্তবিশ্রামে প্রত্যহ সায়াহ্নে আসিতেন, কিছুক্ষণ থাকিয়া চলিয়া যাইতেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে লাগিল। শেষে চিত্তবিশ্রামেই রাত্রিতে থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। ক্রমে প্রাতে রাজবাড়ীতে ফিরিতে দেরী হইতে লাগিল। শেষে মধ্যাহ্নও চিত্ত-বিশ্রামেই যাপন করিতে লাগিলেন। রাজবাড়ীতে যাওয়া সীতারাম পরিত্যাগ করিলেন। চিত্তবিশ্রামেই রাজকার্য্য হইতে লাগিল। অবশেষে রাজকার্য্য পরিদর্শন করা সীতারাম পরিত্যাগ করিলেন। রাজকর্ম্মচারীরাই তাহা করিতে লাগিল। ফলে রাজকার্য্য বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। সুবিধা পাইয়া কর্ম্মচারীরা চুরি করিতে লাগিল। রাজস্ব ঠিকমত আদায় হইত না, নবাবসরকারেও ঠিকমত টাকা পৌঁছিত না। সর্ব্ববিষয়ে অনাটন উপস্থিত হইল। সৈন্যেরা বেতন না পাইয়া কার্য্য ত্যাগ করিতে লাগিল। রাজশাসনের অভাবে নগরের দুর্গের কোন শৃঙ্খলা আর রহিল না, রাজ্য প্রায় অরক্ষিত হইয়া উঠিল। সুশাসনের অভাব দেখিয়া নাগরিকেরা

অপর ত্যাগ করিতে লাগিল। নরমরপুর যায় যায় হইল। দেখিয়া শুনিয়া শ্রী সীতারামকে বলিল "মহারাজ হয় রাজকার্য্য পালন করুন, অথবা আমার সঙ্গে সন্ন্যাসী হইয়া বনে চলুন।" কিন্তু সীতারাম কিছুই করিতে পারিলেন না। তাঁহার ভোগলালসা প্রবল! সন্ন্যাসী হইয়া যাইবার শক্তি ছিল না। আবার শ্রীকে ছাড়িয়া রাজকার্য্যেও মনোযোগ দিতে পারিলেন না।

সীতারামের বড় দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল। গ্রীকদেশের পৌরাণিক কাহিনীতে টেণ্টালসের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। দেবতার শাপে টেণ্টালস Tantalus কণ্ঠ জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিত। পিপাসায় প্রাণ যাইত, কিন্তু জলপান করিতে পাইত না। সম্মুখে অগাধ জলরাশি, পিপাসায় প্রাণ যাইতেছে, অথচ তাহার পান করিবার অধিকার ও শক্তি নাই। যদি এ কষ্ট কেহ বুঝিতে পারেন, তবে সীতারামের কষ্ট তিনি কিয়ৎ পরিমাণে অনুমান করিতে পারিবেন। শ্রী যদি নন্দার মত রাজমহিষী হইয়া অন্তঃপুরে থাকিত, তবে সীতারামের এরূপ অবস্থা হইত না। অথবা সন্ন্যাসিনী হইলেও যদি এমন রূপসী, এমন মধুরবচনবর্ষিণী সন্ন্যাসিনী না হইয়া "সোজারকম সন্ন্যাসিনী" হইত তাহা হইলেও বুঝি এমন হইত না। "কিন্তু এই ইস্ক্রানীর মত সন্ন্যাসিনী যাযাবরালে বসিয়া মধুরুই করিতে থাকিবে আর সীতারাম কুকুরের মত তকাতে বসিয়া মুখপানে চাহিয়া থাকিবে,—অথচ সে সীতারামের স্ত্রী! পাঁচবৎসর ধরিয়া সীতারাম তাহার জন্য প্রাণপাত করিয়াছিলেন। এ দুঃখের কি আর তুলনা হয়!" পতঙ্গ যেমন কাচাবরণাবৃত আলোকের চতুর্দ্দিকে বৃথাই ঘুরিতে থাকে, আগুনকে ছুইতে না পাইয়া পুনঃপুনঃ কাচাবরণে প্রহত হইয়া পড়িতে থাকে, সীতারামের সেই দুর্দ্দশা হইল। "শেষে সীতারাম আর সহ্য করিতে না পারিয়া মনে মনে সংকল্প করিলেন, শ্রীর উপর বল প্রয়োগ করিবেন।" কিন্তু সীতারাম ত নিতান্ত পশু নহেন। শ্রীর উপর অন্তরে ভালবাসাও ছিল। তাই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করা দুঃসাধ্য বোধ হইতে লাগিল।

ইত্যবসরে শ্রী সীতারামের অন্তঃপুর হইতে পলায়ন করিল। তখন সীতারামের মনের যে অবস্থা হইল তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

ধ্যায়তোবিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥

শ্রীকে রাত্রিদিন ধ্যান করিতে করিতে শ্রীর প্রতি প্রথমে আসক্তি, পরে আসক্তি হইতে তাহার উপর কামের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এখন এই কামের পরিতৃপ্তি করিতে না পারিয়া সীতারাম ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন। চিত্তবিভ্রমে সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীকে দেখিয়া মনে করিলেন এই শ্রী-হরণের মূল, তাই যে জয়ন্তীকে সীতারাম একদিন 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, তাহাকেই সর্ব্বজনসমক্ষে উলঙ্গ করিয়া চণ্ডালদ্বারা বেত্রাঘাত করিতে হুকুম দিলেন। রাজ্যের লোক ত্রস্ত হইল কিন্তু ইহাতেও ক্রোধের

শেষ হইল না। কামনার ক্রোধ সহজে শান্ত হয় না। তাহার লালসা পরিতৃপ্ত না হইলে ক্রোধের শমন হয় না। সীতারাম হুকুম দিলেন রাজ্যে যেখানে যত সুন্দরী যুবতী আছে আমার ভোগের জন্য ধরিয়া লইয়া আইস। জাতিবিচার নাই, পাত্রবিচার নাই, হুকুমে অনুচরেরা বলপূর্ব্বক কাহাকেও স্বামীর কোল হইতে, কাহাকেও পিতার আশ্রয় হইতে, কাহাকেও বা পুত্রের স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিয়া সীতারামের কাছে কাড়িয়া আনিতে লাগিল। কিন্তু

ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি।

হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

যত ভোগ করিতে লাগিলেন তৃষ্ণাই তাঁহার ক্ষুধা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইল। ধর্ম্মভয়ে মানভয়ে সতীত্বনাশভয়ে লোকে সেই অরক্ষক রাজ্য ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। মন্ত্রী, সেনাপতি, সৈন্য, কর্ম্মচারী সকলে মহম্মদপুর ত্যাগ করিয়া পলাইতে লাগিল। হাট-বাজার লোকশূন্য হইল, মাঠ ঘাট খালি হইল; নগর প্রায় জনশূন্য প্রান্তরে পরিণত হইল। কিন্তু বুদ্ধিভ্রষ্ট সীতারামের চৈতন্য হইল না। তিনি চিত্তবিভ্রমে সুন্দরীমণ্ডল পরিবেষ্টিত হইয়া কামলালসা পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। শেষে একদিন ঘুমন্তের কর্ণে বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় মুসলমানের কামানধ্বনি মহম্মদপুরের দুর্গদ্বারে সুন্দরী-মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী সীতারামের কর্ণে ভীষণ শব্দে পশিয়া উঠিল। রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ভোগ, বিলাস সকলই বিলীন হইয়া গেল। কোথায় গেল সেই সুন্দরীমণ্ডল—কোথায় গেল সেই চিত্তবিভ্রম—কোথায় গেল সেই বিলাস-লীলা! মুসলমানের কামানের আগুনে সেই সুন্দর মহম্মদপুর—সীতারামের প্রাণপাত করিয়া স্থাপিত সেই হিন্দুরাজ্য—শ্মশানে পরিণত হইল। সীতারাম কোনরূপে পলায়ন করিলেন। তাঁহার শেষ পরিণাম কি হইল তাহা কেহই বলিতে পারিল না।

(ক্রমশ)

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

কবি-অভিষেক *

"আমি আসিয়াছে অনেক পথী শুনাতে গান
অনেক যন্ত্র আনি,
আমি আনিয়াছি বহিতেরী নীরব প্রাণ
এই দীন বীণাখানি।"

বঙ্গ বাণীর অঙ্গনে শুভ
শঙ্খ উঠেছে বাজি'
মিলিয়াছে আসি' অযুত ভক্ত
নব উৎসবে আজি।
স্নেহ-গৌরবে আজি জননীর
উজ্জ্বল মুখছবি,
অর্চ্চিত বর- পুত্র তাঁহার—
চির-উপাসক—কবি।

২

শৈশবে যারে দিয়াছিলা মাতা
সাধের স্বর্ণ বীণা,
শত সুখে দুখে আজো তা'র করে
বাজিছে বিরামহীনা।
বিশ্ব সমাজ মুগ্ধ আজি সে
মোহিনী বীণার তানে,
ঝঙ্কার তা'র ভূলোক ছাড়িয়া
ছুটে দ্যুলোকের পানে।

৩

সুপর্ণ সম সুরপুরী হতে
সুধা করি' আহরণ,
বিনতা মাতার হীনতা লজ্জা
কে করেছে বিমোচন!
সাধনা কাহার এনেছে বঙ্গে
নূতন ভাবের ধারা
নিখিলের স্রোতে মিশিছে যে আজি
টুটিয়া পাষাণকারা!

৪

কাহার দিব্য প্রতিভাকিরণ
পরশে, পুলকভরে
অযুত চিত্ত- শতদল দল
ফুটিয়াছে থরে থরে!
কা'র তুলিকায় উঠেছে ফুটিয়া—
লভিয়া অমর তনু—
বিশ্বাং হেন তীব্র বেদনা,
বাসনা-ইন্দ্রধনু!

৫

কাহার 'প্রাণের শ্রেষ্ঠ বিকাশ'
মানসী- পুণ্যক্ষণে
নব বসন্ত আনিল বহিয়া
বঙ্গ-কুঞ্জবনে!
সোণার তরণী বাহিয়া এনেছে
কোন্ সে কর্ণধার
ভুবনমোহিনী জননীর ঘরে
স্বর্ণ শতদার!

---

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের টাউন হলে সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে লিখিত।

৬

কাহার হৃদয়ে দীপ্ত অচল
মধুর প্রেমের আলো,
কে বেসেছে দীনা মর্ত্যভূমিরে
স্বর্গ-অধিক ভাল!
মুক্ত কণ্ঠে ঘোষিয়া অভেদ
পূজা আর ভালবাসা,
শিখায়েছে দিতে 'বিশ্বপ্রিয়া'র
পদে যত সুখ আশা!

৭

পশি' বিচিত্র প্রকৃতি রাণীর
গোপন অন্তঃপুরে,
কে শুনেছে তা'র আনন্দগীতি
ধ্বনিত অনাদি সুরে;
বুঝেছে অকূল সিন্ধুর ভাষা—
জননীর স্নেহাবেশ!
হেরেছে নয়নে চিরসাথী সেই
মরণের বরবেশ!

৮

সে যে সেই কবি।— কবিতালক্ষ্মী
উৎসব-সভাতলে
অম্লান বর- মালা আনিয়া
দিয়াছিল যা'র গলে।
অভিষেকে তা'র আজি আনন্দে
বহে মধু সমীরণ,
ফুল্ল-আননা দিক্‌বালাগণ
করে ফুল বরিষণ।

৯

ধন্য সে কবি; বঙ্গ-ভারতী
আশিষ সলিলধারে
অভিষেক করি' অটল আসনে
আজি বসায়েছে তা'রে।
ললাটে স্নিগ্ধ চন্দন-টীকা
অঙ্কিত করি' ধীরে
আপনি জননী যশের মুকুট
পরাইয়া দিলা শিরে।

১০

অধরে আজি মঙ্গল-গাথা
উঠিছে অযুত স্বরে—
কাব্য-গগন থাক্ চিরদিন
ভাবের রবি-করে।
কবির যোগ্য ভকতে অর্ঘ্য
কিবা আছে উপচার!
হৃদয়ের প্রীতি অঞ্জলি শুধু
আনিয়াছি উপহার।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

---

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গদর্শন

চরিত-চিত্র

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা—একদিক্

রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা করিয়া, বাঙালী আজ আপনাকেই লোক সমক্ষে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছে। কোনো জাতির যখন আত্ম-চৈতন্যের উদয় হয়, তখন তারা এইরূপ করিয়াই আপনাদের সমাজের মহৎলোক-দিগের মহত্ত্বের সমাদর করিয়া, পরোক্ষভাবে আপনাদিগকে বাড়াইয়া তুলে। যে গুণের আদর জানে না, সে আপনিও গুণহীন হইয়া পড়িয়া থাকে। যে যোগ্য ব্যক্তির উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা করিতে কুণ্ঠিত হয়, সে আপনিও যোগ্যতাভ্রষ্ট হইয়া রহে। বাঙালী একদিন গুণীর আদর ভুলিয়া গিয়াছিল। যোগ্যের সম্বর্দ্ধনা যে সমাজের একটা অতি প্রধান কর্ত্তব্য, বাংলার সমাজ একদিন এ বিধানকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের অস্তাদীলা তার সাক্ষী। কিন্তু বাংলার সে আত্মবিস্মৃতি ক্রমে ঘুচিয়া যাইতেছে। এই কয় বৎসরে তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এই সম্বর্দ্ধনাও তারই প্রমাণ।

রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা—আর এক দিক্

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুদ্ধ আপনার প্রতিভা-বলেই এইরূপ সমুদ্ধ রাজসিক সম্বর্দ্ধনা পাইয়াছেন, একেবারে এত বড় কথাটা বলিতেও সঙ্কোচ হয়। সরস্বতীর বরপুত্র হইয়াও, রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্মীর কোমল অঙ্কেই ভূমিষ্ঠ হন। আজীবন তিনি সেই সম্পদের মধ্যেই লালিত-পালিত, সেবিত-বর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কেবল কবি বা মনীষী নহেন। তিনি "প্রিন্স্" দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী ঠাকুর বংশের কুল-প্রদীপ। বাংলার বুনিয়াদী ও ইংরাজের বানানো রাজ-রাজড়ার সঙ্গে তাঁর পরিবার-পরিজনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তাঁর কুলের গৌরব ও ধনের গৌরব, রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক কবি-প্রতিভার সঙ্গে মিলিত হইয়া স্বর্ণ-সোহাগা যোগ সম্পাদন করিয়াছে। এরূপ যোগাযোগ সংসারে অতি বিরল। এই শুভযোগ না হইলে আজ রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর দ্বারা যে সমারোহসহকারে

সম্বর্ধিত হইয়াছেন, সেরূপ ভাবে সম্বর্ধিত হইতেন কি না সন্দেহের কথা।

ইহাতে রবীন্দ্রনাথের অগৌরবের কথা কিছুই নাই। যেখানেই নানা ভাবের, নানা চরিত্রের, নানাবিধ শিক্ষাদীক্ষাপ্রাপ্ত নানা লোকে সমবেত হইয়া, একসঙ্গে কোনো পূজা-অর্চ্চনার আয়োজন করে, সেখানে এরূপ ভাবের খিচুড়ী পাকিয়া যাইবেই যাইবে। এ ক্ষেত্রে কখনো সকলে এক ভাবাপন্ন হইয়া আসে না। কেহ বা অর্চ্চিতের রূপে মুগ্ধ হইয়া আসে, কেহ বা তাঁর গুণে বশ হইয়া আসে; কেহ বা স্বার্থের সন্ধানে কেহ বা পরমার্থের অন্বেষণে আসে। আর কেহ বা সম্পূর্ণরূপেই উদাসীন ও উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে, শুধু যজ্ঞের জনতা বৃদ্ধি করিবার জন্যই পূজাস্থানে আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এই সকলের দ্বারা উপাসকের অধিকারই জ্ঞাপিত হয়। উপাসকের ক্ষুদ্রতার দ্বারা কুত্রাপি উপাস্যের যোগ্যতার কোনো হানি হয় না। যিনি যে ভাবেই রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনায় যোগ দিন না কেন, তাঁর ভাব তাঁহাকেই কেবল ক্ষুদ্র বা মহৎ করিয়াছে, তদ্দ্বারা রবীন্দ্রনাথের যোগ্যতার কিছুই হ্রাস-বৃদ্ধি হয় নাই। এ যোগ্যতা রবীন্দ্রনাথের কুলের নহে। এ যোগ্যতা তাঁর কৌলিক ধনমর্য্যাদার নহে। এ যোগ্যতা তাঁর অলৌকিক কবি-প্রতিভার। তাঁর পৈত্রিক কুল ও ধনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই কবি-প্রতিভার এরূপ মণিকাঞ্চন যোগ না থাকিলে, বাঙ্গালী হয় ত আজ এইভাবে তাঁর সে শুদ্ধ সাত্ত্বিকী যোগ্যতার সম্বর্দ্ধনা করিত না। কিন্তু তাহাতে কেবল আমাদেরই হীনতা প্রকাশিত হইত, রবীন্দ্র-প্রতিভার অযোগ্যতা প্রমাণিত হইত না।

বাংলা সাহিত্যে ও বাঙ্গালী জীবনে রবীন্দ্রনাথ

বাংলা-ভাষা ও বাংলা-সাহিত্যকে যাঁহারা এই কালে অভূতপূর্ব্ব শ্রীসম্পদে বিভূষিত করিয়াছেন; বাঙ্গালীর জ্ঞান ও বাঙ্গালীর ভক্তিকে, বাঙ্গালীর আদর্শ ও বাঙ্গালীর আশাকে, বাঙ্গালীর ধর্ম্ম ও বাঙ্গালীর কর্ম্মকে যাঁরা ইদানিন্তনকালে নানা প্রকারে ফুটাইয়া ও বাড়াইয়া তুলিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথ যে তাঁদের অগ্রণীদলভুক্ত এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। ডাক্তার যেমন শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া শারীর-তত্ত্ব অধ্যয়ন করেন, সাহিত্য-সমালোচক যদি সেই প্রণালীতে রবীন্দ্রনাথের চিত্তের ও চরিত্রের বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করেন, তবে এদিক ওদিক দিয়া, অনেক অপূর্ণতা খুঁজিয়া পাইবেন, জানি। বাংলার অপরাপর শ্রেষ্ঠ কবিদিগের তুলনায় রবীন্দ্রের প্রতিভার সমালোচনা করিলে, তিনি তাঁদের চাইতে কোথায় বড় বা কোথায় ছোট, এ সকল কথা লইয়া অনেক তর্ক-বিতর্ক উঠিতে পারে, ইহাও মানি। বাংলা গদ্যে রবীন্দ্রনাথের দান কতটা ও স্থান কোথায়, এ প্রশ্ন লইয়াও মতভেদ হইতে পারে, স্বীকার করি। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মের সাধনা ও সমাজের আদর্শ সর্ব্ববাদীসম্মত হওয়া সম্ভবই নহে। এ সকল মতান্তর অনিবার্য্য। কিন্তু এ সকল খণ্ডতা দ্বারা কোনো মহিমময়ী প্রতিভার বিচার-বিবেচনা হয় না, হইতেই পারে না। কোনো কিছুরই সত্যকে তার আংশিকতার মধ্যে খুঁজিয়া

পাওয়া যায় না। রূপের যাচাই করিতে হইলে যেমন তাহাকে সমগ্রভাবে দেখিতে হয়, ভাগ ভাগ করিয়া দেখিলে সত্য দেখা হয় না; রূপ-বস্তুটা সমগ্রেই থাকে, একত্বেই বিরাজ করে, খণ্ডে খণ্ডে পৃথক্‌ভাবে তাহাকে পাওয়া যায় না; নাক, কাণ, চোক, হাত, পা, কটি, চুল, রং এ সকল খুঁটিনাটি ধরিলে প্রকৃত রূপের পরিচয় পাওয়া যায় না, তার ঠিক মূল্য নির্দ্ধারণও সম্ভব হয় না। অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মনীষীদিগের অলৌকিক প্রতিভার বিচারও সেইরূপ সমগ্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই করিতে হয়। টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া, তাহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, ওজন করিতে গেলে, সত্যিকার বস্তুটা যে কি ও কত বড়, তাঁর সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয় না। যাঁরা খুঁটিনাটি ধরিয়া রবীন্দ্র-প্রতিভার বিচার-আলোচনা করিতে যাইবেন, তাঁরা কদাপি সে প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় পাইতে পারিবেন না। রবীন্দ্র কবি। রবীন্দ্র ঋষি। রবীন্দ্র শক্তিশালী লেখক। রবীন্দ্র জনপ্রিয় লোকনায়ক। জাতীয় জীবনের বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে রবীন্দ্র ধর্ম্মপ্রচারক ও সমাজ-সংস্কারক। এই ত্রিশ বৎসর কাল, তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন বিভাগে আত্মপ্রকাশের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইয়াছে। ঋজু কুটিল ভাবে, তির্য্যক্ গতিতে, তাঁহার জীবন ও কর্ম্মস্রোত এই পঞ্চাশৎবৎসর কাল এক নিত্য লক্ষ্যাভিমুখে ছুটিয়াছে। তিনি নানা সময়ে নানা কথা কহিয়াছেন। নানা মত প্রচার করিয়াছেন। নানা আদর্শের অনুসরণ করিয়াছেন। অথচ তাঁর জীবনে ও চিন্তায় ভাবে ও কর্ম্মে, এই সকল বিভিন্ন আদর্শ ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া যাঁহা সর্ব্বদা আত্মপ্রকাশের প্রয়াস পাইয়াছে, সে বস্তু এক, বহু নহে। সে বস্তুর রূপ অনেক, কিন্তু স্বরূপ এক। সেই স্বরূপেই রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রের প্রতিভাকে বুঝিতে হইলে, সর্ব্বাদৌ তার এই ভিতরকার স্বরূপটিকে ধরিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ

আর আপনার স্বরূপে রবীন্দ্র জ্ঞানীও নহেন, কর্ম্মীও নহেন, কিন্তু শুদ্ধ কবি। এই কবি-বস্তু যে কি, তাহা দেখিলে চেনা যায়, কিন্তু মুখে বলিয়া বোঝান সহজ নহে। রসাত্মক বাক্যকে কাব্য বলা যাইতেও পারে, কিন্তু রসাত্মক বাক্যরচনায় নিপুণতা থাকিলেও, কেহ সত্য সত্য কবি নাও হইতে পারেন। চোকে যাহা দেখা যায় না, তাহাই দেখা; কাণে যাহা শোনা যায় না, তাহাই শোনা; যাহা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ নহে, তাহারই প্রত্যক্ষ লাভ করা, আর এ সকল অতীন্দ্রিয় বিষয়কে প্রত্যক্ষ করিয়া ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ রূপরসের সঙ্গে তাহাদিগকে মিলাইয়া দিয়া, এক অদ্ভুত অদ্ভুত ভাব-জগতের সৃষ্টি করা, ইহাই কবির সত্যধর্ম্ম। প্রকৃত কবি তর্ক করেন না, যুক্তি করেন না, বিচার করেন না, আলোচনা করেন না, কেবল আপনার অন্তশ্চক্ষুস্থিত সত্য ও সৌন্দর্য্য দেখেন, আর এই রূপে যাহা দেখেন, তাহাই ভাষার তুলিকায় আঁকিয়া লোকসমক্ষে ধারণ করেন। এই অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিই কবির প্রাণ। এই জন্য ঋষিদিগের ন্যায় কবি ও দ্রষ্টা, কিন্তু দার্শনিক

নহেন, জ্ঞাতা কিন্তু বৈজ্ঞানিক নহেন। দার্শনিক সম্যক বিচারের উপরে আপনার সিদ্ধান্তকে স্থাপন করেন। কবি শুদ্ধ আত্মানুভূতির উপরে সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বিচারের জন্য চারিদিক্ দেখা আবশ্যক। শুদ্ধ অনুভূতির জন্য এরূপ সম্যকদর্শন নিষ্প্রয়োজন। আমরা আজিকালি যাহাকে বিজ্ঞান বলি, যাহা প্রকৃতপক্ষে কেবল জড়বিজ্ঞান মাত্র, এই বিজ্ঞানও বিষয়ীকে পশ্চাতে রাখিয়া বিষয়কেই সর্ব্বথা এগিয়ে দেয়। জ্ঞাতার নহে, কিন্তু জ্ঞেয়ের প্রকৃতি ও গুণাদির পরীক্ষা করাই এই বিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং এই বিজ্ঞানও জ্ঞেয় বিষয়ের বিশ্লেষণ করিয়া তাহার গুণ ও ক্রিয়াদি আবিষ্কার করিতেই ব্যস্ত। এই পথে যে ভাবের যতটুকু সত্য পাওয়া যায়, বৈজ্ঞানিক তারই অন্বেষণ করেন। কিন্তু কবির পথ এ নহে। কবি বস্তুর ভিতরকার গুণাগুণের প্রতি লক্ষ্য করেন না, কিন্তু বস্তু-সাক্ষাৎকারে তাঁর আপনার অন্তরে কোন্ রসের কতটা উদ্রেক হইল, তাহাই দেখেন ও আস্বাদন করেন। বৈজ্ঞানিক যেরূপ বস্তু-তন্ময়তা চাহেন, কবির সেরূপ বাহ্য বস্তু-তন্ময়তার একান্তই প্রয়োজনাভাব। বৈজ্ঞানিকের অধিকার বাহিরে, বিষয় জগতে। কবির অধিকার ভিতরে, অন্তর্জগতে। বৈজ্ঞানিক বহির্ম্মুখীন ও বিষয়াভিমুখীন। কবি অন্তর্ম্মুখীন ও আত্মাভিমুখীন। বৈজ্ঞানিক বাহিরের প্রামাণ্য না পাইলে, সত্যের প্রতিষ্ঠা হইল বলিয়া বিশ্বাস করেন না। কবি ভিতরের ভাবের, রসের, আত্মানুভূতির প্রামাণ্যকেই সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট মনে করিয়া বাহিরের প্রামাণ্যের প্রতি উদাসীন হইয়া থাকেন। কবিতে ও বৈজ্ঞানিকে এই প্রভেদ। অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মানুভূতি, এই সকলই কবি-প্রতিভার স্বরূপ। এই স্বরূপ-লক্ষণ যে কবির কবিত্বে যতটা বেশী প্রকাশিত হয়, তাঁর কবি-প্রতিভাকেই সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা

এই কষ্টিপাথর দিয়া পরীক্ষা করিলে, রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভাকে কেবল বাংলার নহে, সমগ্র সভ্যজগতের কবিসমাজে অতি উচ্চ আসন দিতেই হইবে। শব্দ-সম্পদে রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ কবি আরও আছেন। চিত্রাঙ্কনের চাতুর্য্যেও তাঁর সমকক্ষ কিম্বা তাঁহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিল্পীও পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু রসানুভূতির তীক্ষ্ণতা ও অধ্যাত্ম-দৃষ্টির গভীরতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পরে, বাংলায় জন্মিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। আর কালধর্ম্ম-বশতঃ বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যেও যতটা প্রসারতা ফুটিয়া উঠিবার অবসর পায় নাই, যুগপ্রভাবে রবীন্দ্রনাথে সে প্রসারতা ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তবে রবীন্দ্রনাথ অনুভূতির বিস্তৃতিতে ও অনুভাব্য বিষয়ের বিচিত্রতাতে যতটা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন, অন্য দিকে সেই পরিমাণে তাঁর রসানুভূতির গভীরতা ও বাস্তবতা বৈষ্ণব-কবিদিগের অপেক্ষা হীন বলিয়াই মনে হয়। বৈষ্ণব-কবিগণ কেবল কবি ছিলেন না, অতি উচ্চ অধিকারের সাধকও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথেরও ধর্ম্মপিপাসা

প্রবল। সাধনের আকাঙ্ক্ষাও বহুদিন হইতেই জন্মিয়াছে। আপনার অলৌকিক কবি-প্রতিভার স্ফুরণেই তিনি জীবনের সার্থকতা লাভ হইল মনে করেন না। ধর্ম্মকে এবং ব্রহ্মকে না পাইলে, তাঁর সকলি বিফল ও ব্যর্থ হইয়া গেল,—রবীন্দ্রনাথের এ ভাবটা ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিতেছে। তাঁর আপনার সম্প্রদায় মধ্যে যে সাধন প্রচলিত আছে, সে সাধনেও রবীন্দ্রনাথ এখন আর উদাসীন নহেন। কিন্তু বৈষ্ণব-কবিদিগের সাধনায় এমন একটা বস্তুতন্ত্রতা ছিল, আমাদের এই নবীনযুগের প্রযুক্ত সাধনায় সে বস্তুতন্ত্রতা নাই। প্রাচীন ধর্ম্ম সকলেই গুরুমুখী। সকলেই অবতাররূপে বা গুরুরূপে ভগবানের একটা বহিঃপ্রকাশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বৈষ্ণব-কবিগণ ভগবানের বিবিধ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছিলেন এক অন্তরে—চৈত্যগুরুরূপে; অপর বাহিরে—মোহান্ত-গুরুরূপে। এই জন্যই তাঁদের সাধনা যুগপৎ অন্তর্মুখীন ও বস্তুতন্ত্র হইয়া ছিল। রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তে ও সাধনায় কেবল চৈত্যগুরুরই স্থান আছে, বৈষ্ণবেরা যাঁহাকে মোহান্তগুরু বলেন, তার স্থান নাই। ভগবান চৈত্যগুরুরূপে জীবের অন্তরে, তার ভিতরকার জ্ঞানভাবাদির ভিতর দিয়া, তার আনুভূতিকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হন। চৈত্যগুরুকে অগ্রাহ্য করিলে চলে না। কিন্তু এই চৈত্যপ্রকাশ আংশিক, পূর্ণ নহে। এই প্রকাশে জীবের অহংবুদ্ধি ভগবানকে ওতপ্রোতভাবে ঘেরিয়া থাকে। এখানে জীব অনেক সময় আপনার প্রাকৃত বুদ্ধির সিদ্ধান্ত ও অসংস্কৃত প্রবৃত্তির খেয়ালকেই আপনার ইন্দ্রিয়বিকারপ্রসূত বিবিধ রসরাগে রঞ্জিত করিয়া, ভগবৎপ্রকাশ বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকে। মোহান্তগুরু এই ভ্রম নিরস্ত করিয়া থাকেন। চিত্তে যে ভগবৎ-প্রকাশ হয়, তাহা যখন মোহান্তগুরু বা সদ্‌গুরুতে তাঁর যে অধিষ্ঠান হয়, তার সঙ্গে মিলিয়া যায়,—চৈত্যপ্রকাশ ও মোহান্ত-প্রকাশ যখন একে অন্যের সমর্থন ও পরস্পরকে প্রতিষ্ঠিত করে, তখনই ভিতর-কার আদর্শ ও ভাব সত্যোপেত ও বস্তুতন্ত্র হয়। বৈষ্ণবসাধনাতে ভিতর-বাহিরের এই অপূর্ব্ব সমাবেশ আছে বলিয়া, বৈষ্ণব-কবিগণ একান্ত অন্তর্মুখীন হইয়াও, অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কদাপি বস্তুতন্ত্রতা-ভ্রষ্ট হন নাই। রবীন্দ্রনাথের সাধনার সঙ্গে তুলনায় বৈষ্ণবকবিদিগের সাধনার ইহাই বিশেষত্ব। আর এই বস্তুতন্ত্র সাধন গুণেই তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে কোনো কোনো দিকে একান্তভাবেই অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন, নতুবা তাঁদের প্রতিভা ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাতে জাতিগত শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট-ভেদে কোনো বিশেষ তারতম্য আছে কি না সন্দেহ।

রবীন্দ্রনাথের অন্তর্মুখীনতা।

যে ঐকান্তিকী অন্তর্মুখীনতা ও রসানুভূতি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত করে, তাহাই আবার তাঁর দুর্ব্বলতারও মূল কারণ হইয়া আছে। একদিক দিয়া একান্ত অন্তর্মুখীন প্রতিভা যেমন আপনার ভিতরকার ভাব গ্রহণ করিয়া থাকে ও তাহাতেই একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করে, অন্যদিকে সেইরূপ সকলই একান্তভাবে

বাহিরের প্রেরণারও অধীন হইয়া রহে। একান্ত অন্তর্মুখীন প্রতিভা সত্যের এক-দেশমাত্র প্রত্যক্ষ করে। সত্য কেবল বাহির লইয়া নহে, কেবল ভিতর লইয়াও নহে। বাহির ও ভিতর, সত্যের এই দুই অঙ্গ। এই দুই অঙ্গে সত্য পূর্ণতা লাভ করে। বাহিরের সঙ্গে ভিতরের যে সম্বন্ধ তাহা আকস্মিক নহে, অঙ্গাঙ্গী। একটীকে ছাড়িয়া, অপরটীকে ধরা সম্ভব নহে। "যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে," এ কথা যেমন সত্য; যাহা পাই না ব্রহ্মাণ্ডে, তাহা আসে না ভাণ্ডে, এ কথাও তেমনি সত্য। ভাণ্ডকে ছাড়িয়া ব্রহ্মাণ্ড অন্ধকার। ব্রহ্মাণ্ডকে ছাড়িয়া ভাণ্ড শূন্য, নিরাকার। আর অন্ধকার ও নিরাকার উভয়ই জ্ঞান-সীমার বহির্ভূত। দুইএর কোনোটাকেই জ্ঞানগোচর করা সম্ভব নহে। একান্ত অন্তর্মুখীন বুদ্ধি ও প্রতিভা কেবল ভাণ্ডেতেই, কেবল ভিতরকার অনুভূতির মধ্যেই, সত্যের প্রামাণ্য অন্বেষণ ও প্রতিষ্ঠা করিতে চায়; ব্রহ্মাণ্ডের বা বহির্বিষয়ের প্রামাণ্যের প্রতি ভ্রূকুপাতও করে না। ইহার ফলে মতে ও সত্যে, কল্পনাতে ও বস্তুতে মূলতঃ কোনো প্রভেদ আর থাকে না। এ অবস্থার পরিণামে কেবল ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই বস্তুর প্রামাণ্য হইয়া দাঁড়ায় এবং একমাত্র অনুভূতিই সত্যের আসন অধিকার করিয়া বসে। সত্যের সার্ব্বজনীনতা রাখা তখন একান্তই দুষ্কর হইয়া উঠে। যে তত্ত্বে এই সার্ব্বজনীনতা রক্ষা পায়, রবীন্দ্রনাথ এখনো সে তত্ত্বকে ভাল করিয়া ধরিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আর তাঁর অলৌকিক প্রতিভার ঐকান্তিকী অন্তর্মুখীনতাই এ পথে সিদ্ধির অন্তরায় হইয়া আছে।

রবীন্দ্রনাথের বাহ্যপ্রেরণার অধীনতা

কিন্তু মানুষ যতই কেন অন্তর্মুখীন হউক না, কিছুতেই সে বাহিরের প্রেরণার হাত এড়াইতে পারে না। বৈদান্তিক সাধনে বাহিরের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকারের সম্বন্ধ ছেদনের পন্থা ও প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সে পথ সন্ন্যাসীর পক্ষেই প্রশস্ত, গৃহীর পক্ষে সাধ্যায়ত্ত নহে। সে পথে চলিতে গেলে, যথাসম্ভব বিষয়ের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকারের সম্পর্ক ছেদন করা আবশ্যক হয়। রবীন্দ্রনাথ সে পথের পথিক নন। "ভিক্ষাশনঞ্চ জীবিতম্"—তাঁর জীবনের ধর্ম্ম বা আদর্শ নহে। রবীন্দ্রনাথ গৃহী। রবীন্দ্রনাথ এখন সংযমী, কিন্তু কখনো সন্ন্যাসী ছিলেন না। সুতরাং বাহিরের সম্পর্ক ও প্রেরণা হইতে তিনি মুক্তিলাভ করেন নাই। আর এই জন্যই ক্ষণে ক্ষণে বহির্বিষয়ের তাড়নায়, বাহিরের অভিনব অবস্থার বা অভিজ্ঞতার আঘাতে, এক একবার রবীন্দ্রনাথের মনগড়া জগৎ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায় ও তাঁহাকে আবার নূতন করিয়া জীবনের সমস্যাভেদে নিযুক্ত হইতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের উপরে তাঁর পিতার চরিত্রের ও সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত ও আদর্শের প্রভাব।

এই ঐকান্তিকী অন্তর্মুখীনতা রবীন্দ্র-নাথের পৈত্রিক বস্তু। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেও ইহা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। আধুনিক যুগের ধর্ম্মসংস্কারকদিগের ইহা

একরূপ সাধারণ ধর্ম্ম বলিলেও হয়। যে ব্যক্তিস্বাভিমান আমাদের দেশে ও অন্যত্র শাস্ত্রগুরুর প্রয়োজন ও প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়া, আপনার ধর্ম্মের প্রামাণ্যকে একান্ত ভাবেই প্রাকৃত বুদ্ধি-বিচারের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হয়, তাহা এই ঐকান্তিকী অন্তর্মুখীনতারই ফল। এই অন্তর্মুখীনতার আতিশয্য হইতেই, ইংরাজীতে যাহাকে Subjective individualism বলে, তাহার উৎপত্তি হয়। এই নিঃসঙ্গ স্বানুভূতির উপরেই বহুদিন হইতে আমাদের ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে। যাঁরা শাস্ত্রগুরু বর্জ্জন করিয়া ধর্ম্মসাধনে প্রয়াসী হইবেন, তাঁদের পক্ষে এই Subjective individualism বা ব্যক্তিগত অনুভূতির হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব ও অসাধ্য। ব্রাহ্মসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক রাজর্ষি রামমোহন শাস্ত্রও মানিতেন, গুরু-গ্রহণও করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার নিজের ধর্ম্মের প্রামাণ্য শুদ্ধ স্বানুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রাকৃত জনে যে শাস্ত্রপ্রামাণ্যে বিশ্বাস করে, রামমোহন সেরূপ শাস্ত্রপ্রামাণ্য মানিতেন না, সত্য। কিন্তু ভারতের প্রাচীন ঋষি-সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তেও এইরূপ অতিপ্রাকৃত শাস্ত্রপ্রামাণ্য গৃহীত হয় নাই। রামমোহন এই বিষয়ে প্রাচীন ঋষি-পন্থা অবলম্বন করিয়া, যোগবাশিষ্ঠের নির্দ্দেশ অনুসারে, সুশাস্ত্র, সদ্‌গুরু ও স্বানুভূতি এই তিনের একবাক্যতার উপরেই সত্যের ও ধর্ম্মের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজার পরবর্ত্তী ব্রাহ্ম-আচার্য্যগণ ঠিক এই পথ ধরিয়া চলেন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র উভয়েই শাস্ত্রের প্রামাণ্য ও সদ্‌গুরুর প্রয়োজন অস্বীকার করিয়া, প্রথমে শুদ্ধ স্বানুভূতির উপরেই ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চান। আর শুদ্ধ স্বানুভূতির উপরে ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিলে, ব্যক্তিগত মতামতে ও সার্ব্ব-ভৌমিক সত্যে, প্রবৃত্তির প্ররোচনাতে ও ধর্ম্মের প্রেরণাতে যে বস্তুতঃ কোনই প্রভেদ রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়, মহর্ষি ও ব্রহ্মানন্দ উভয়েই ক্রমে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা উভয়েই পরে, আপনাদের সম্প্রদায়কে নিঃসঙ্গ ও নিরঙ্কুশ স্বানুভূতির অরাজকতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য আপনারাই শাস্ত্রপ্রবর্ত্তক হইয়া পড়েন। মহর্ষি প্রথম বয়সে বেদের প্রামাণ্য অগ্রাহ্য করিয়া, শেষ জীবনে আপনার সঙ্কলিত ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থকেই ব্রাহ্মসম্প্রদায় মধ্যে শাস্ত্রের আসনে বসাইয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ ভগবৎ-প্রেরণাতেই সঙ্কলিত হয়, ও এই গ্রন্থে সঙ্কলিত শ্রুতিসকলের যে ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও যে তাঁর নিজের কল্পিত নয়, কিন্তু সর্ব্বতোভাবেই ঈশ্বরানুপ্রাণিত, মহর্ষি ইদানিং বহুবার এই কথা বলিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ন্যায়, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও এক সময়ে প্রাচীন শাস্ত্র-সংহিতাকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার শিষ্যমণ্ডলীর স্বানুভূতির অনিয়ন্ত্রিত প্রভুত্বে সমাজে অরাজকতার ও যথেচ্ছাচারের প্রতিষ্ঠার আশঙ্কা করিয়া,

শেষে আপনিই "নবসংহিতা" প্রণয়ন করেন। কেশবচন্দ্রের নববিধানমণ্ডলী মধ্যে এই "নবসংহিতা" হিন্দুর মনুসংহিতার ন্যায় স্বীকৃত ও সম্মানিত হইয়া আছে। কিন্তু এ সকল চেষ্টা সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে নিঃসঙ্গ আত্মভূতি বা Subjective individualismএর প্রভাব এখনো অপ্রতিহত রহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের পরিবার ও সমাজ

রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিকী অন্তর্মুখীনতা এই নিঃসঙ্গ আত্মভূতির বা Subjective individualismএরই রূপান্তর মাত্র। এ বস্তু তাঁর পৈতৃক ও সাম্প্রদায়িক। যে শিক্ষা ও সাধনাতে এই অন্তর্মুখীনতাকে বস্তু-সংস্পর্শে সংযত ও শোধিত করিতে পারিত, রবীন্দ্রনাথ সে শিক্ষা ও সাধনা লাভ করেন নাই। কলিকাতার আধুনিক আভিজাত্য সমাজ একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বাস করেন। সহরের সমাজে, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রযুক্ত মেশামেশির অবসর ও প্রবৃত্তি থাকিতেই পারে না। সকলেই আপন আপন সংসার ও স্বার্থের সন্ধানেই ফেরে, একে অন্যের সঙ্গে আলাপ-আত্মীয়তা করিবার অবসর পায় না। যাঁদের অন্নচিন্তা নাই, সঞ্চিত ধন যাঁহাদিগকে দৈনন্দিন জীবিকা-উপার্জনের শ্রম ও ব্যস্ততা হইতে মুক্তি দিয়াছে, তাঁরাও কেবল আপনার সমশ্রেণীর ধনীজনের সঙ্গেই আলাপ-আত্মীয়তা করেন, জনসাধারণের সঙ্গে কোনোরূপ ঘনিষ্ঠতা তাঁদের জন্মিতেই পারে না। পল্লীসমাজে ধনী-নির্ধনের মধ্যে, বিজ্ঞ ও অজ্ঞের মধ্যে, লোকে যাহাদিগকে ভদ্র বলে ও যাদের ইতর বলে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যেরূপ হইয়া থাকে, এবং এই জন্য যেরূপ একটা মেশামেশি খোলাখুলি ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, বড় বড় সহরে, বিশেষ আজিকালিকার দিনে, তাহার একান্তই অভাব হয়। এই মেশামেশির অভাবে কলিকাতার বড়-লোকদের পক্ষে দেশের আপামর সাধারণের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে কোনো যোগাযোগ স্থাপন করা একরূপ অসম্ভব ও অসাধ্য। ইহাদের জীবনের অন্তঃপুরে জনসাধারণের প্রবেশ পথ নাই। জনসাধারণের জীবনের অন্তঃপুরেও ইঁহাদের কোনো প্রবেশ পথ নাই। চারিদিকের দীনদরিদ্রেরা কিরূপে দিনপাত করে, তাদের সংসারের সমস্যা, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়ের আবেগ, জীবনের সংগ্রাম, কোন্ দিক দিয়া, কি ভাবে যে উঠে পড়ে, প্রতিবেশী ধনী-সম্প্রদায় তার কিছুই জানিতে পারেন না। তাঁরা আপনাদের ত্রিতল-প্রাসাদের ছাদ হইতে গরীবের খোলার চালা ও মাটীর দেয়াল মাত্র দেখেন। ঐ চালার নীচে, ঐ দেয়ালের আড়খানে, ঐ ক্ষুদ্র, জঞ্জালময়, কুটির-প্রাঙ্গণে, কত আশা, কত ভয়, কত অনুরাগ, কত বিরাগ, কত লোভ ও কত ত্যাগ যে দিনরাত্রি কত ছুটাছুটি করিতেছে, সেখানে জীবে ও শিবে কি যে মাখামাখি, কি যে লীলাখেলা, কি যে হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি লাগিয়া আছে, এ সকল দেখিবার অবসর ও বুঝিবার অধিকার তাঁহাদের হয় না। তাঁদের নিজেদের জ্ঞানের, ভাবের, ভোগের,

বিলাসের, সখের ও সৌখীনতার জগৎটাই তাঁদের কাছে প্রত্যক্ষ ও সত্য এবং ইহার বাহিরে যে বিশাল সমাজ পড়িয়া আছে, সেটা তাঁহাদের অপ্রত্যক্ষ ও অজ্ঞাত।

রবীন্দ্রনাথ এই ধনী-সমাজে জন্মিয়া, তাহারই মধ্যে বাড়িয়া উঠেন। তার উপরে মহর্ষি আপনার ধর্ম্মমতের জন্য সমাজচ্যুত হওয়াতে, তাঁর পরিবারবর্গের জীবন কলিকাতার সাধারণ ধনী সম্প্রদায়ের জীবন অপেক্ষাও সংকীর্ণতর হইয়া পড়ে। রবীন্দ্রের উদার প্রাণ, এই সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আপনার স্বাভাবিক মুক্তভাব আস্বাদন করিবার জন্য, আশৈশবই এক সুবিশাল কল্পিত জগৎ রচনা করিয়া, তাহারই মধ্যে বিহার ও বিচরণ করিয়াছে। তাঁর আপনার পরিবারের দুচারটী প্রাণের সঙ্গেই রবীন্দ্রের প্রাণের প্রত্যক্ষ ও সত্য যোগাযোগ ছিল। এই গুটিকয়েক আধারেই রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাৎভাবে লোকচরিত্র অধ্যয়ন ও পর্য্যবেক্ষণ করিবার অবসর প্রাপ্ত হন। স্নেহের, প্রেমের, ভক্তির এই গুটিকয়েক প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের উপরেই রবীন্দ্রনাথ আপনার বিচিত্র রসজগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এর বাহিরে তিনি যাহা গড়িতে গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভার ঐন্দ্রজালিক প্রভাবই প্রকাশিত হইয়াছে, সত্যের স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ শতরঙ্গপালিচামণ্ডিত ত্রিতল প্রাসাদকক্ষে বসিয়া, মানসচক্ষে কর্দ্দম-মর্দ্দিত পিচ্ছিল পল্লীপথ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সুচিক্কণবপু, সুমার্জ্জিতরুচি, স্বজনবর্গে পরিবৃত থাকিয়া, সুদূর দরিদ্রপল্লীর শুষ্কদেহ, রুক্ষকেশ নরনারী সকলের অপূর্ব্ব তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। অলৌকিক কবি-প্রতিভার এ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়িক প্রভাব সর্ব্বত্রই থাকে। আর এইরূপ মায়িক সৃষ্টির এমন একটা মোহিনী শক্তিও থাকে, যাহাতে মানুষকে এমন করিয়া মাতাইয়া তুলিতে পারে যে, সত্যিকার সুখদুঃখের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ সর্ব্বদা সকলকে সেরূপভাবে মাতাইয়া তুলিতে পারে না। কল্পনার তুলিকায় দারিদ্র্যদুঃখ অঙ্কিত করিয়া, সেই চিত্র-সহায়ে দারিদ্র্যের মধুটুকুই আমরা আস্বাদন করিয়া থাকি, তার তীক্ষ্ণ হুলটা আমাদের গায়ে বিঁধে না। উৎকৃষ্টতম তৈলচিত্র যেমন কতকটা দূরে দাঁড়াইয়াই দেখিতে হয়, একান্ত নিকটে গেলে, বর্ণের বহুলতা চক্ষুগোচর হইয়া চিত্রের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া ফেলে, জন-চিত্র সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। এ সংসারে ধনী-দরিদ্র শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সকলেরই মধ্যে ছায়াতপের ন্যায় ভালমন্দ মিশিয়া আছে। দূর হইতে ভালটুকুই আমরা অনেক সময় দেখি, মন্দটুকু চক্ষে পড়ে না। এইজন্য দরিদ্র ধনীকে ঈর্ষা করেন, আর কখনো কখনো ধনীও যে আপনার বিষয়ের দুর্ভাবনার ও প্রতিদিনের জীবনের অসার কৃত্রিমতা দ্বারা একান্ত পীড়িত হইয়া, পর্ণকুটিরের সরল, সহজ জীবনের প্রতি লোলুপদৃষ্টি প্রেরণ করেন না, এমনো নহে। কিন্তু প্রমোদপ্রাসাদ হইতে কল্পনার দূরবীক্ষণসহায়ে, দূরস্থিত পর্ণকুটিরের

অনাবিল প্রেমলীলা প্রত্যক্ষ করাতে যে আনন্দ জাগিয়া উঠে, সেই পর্ণকুটিরের জীর্ণকন্থার কীটানুলীলা ও নীর্ণদেহ, নীর্ণপ্রাণ কুটিরবাসীদিগের কলহ-কোলাহল প্রত্যক্ষ করিলে আর সে আনন্দটুকু থাকে না। বস্তু সংস্পর্শে এই কল্পিত জগৎ চক্ষের পলকে মায়াপুরীর ন্যায় শূন্যে মিলাইয়া যায়।

আমি এ কথা ভুলি নাই যে, তাঁর পৈত্রিক জমিদারী তত্ত্বাবধানের ভার কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া রবীন্দ্রনাথের উপরেই ন্যস্ত ছিল। এবং এই উপলক্ষে তিনি বহুকাল শিলাইদহ ও অন্যান্য স্থানে থাকিয়া সাক্ষাৎভাবে বাংলার পল্লীজীবন পর্য্যবেক্ষণ করিবার অবসরও পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই বাহ্য যোগ নিবন্ধনই যে সে জীবনের অন্তঃপুরে তিনি প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিলেন, একেবারে এ মীমাংসা করা যায় না। বড় বড় জমিদারীর "বাবুদের" সঙ্গে তাঁহাদের প্রজাসাধারণের কোনো প্রকারের ঘনিষ্ট ও প্রযুক্ত মেশামিশি কুত্রাপি সম্ভব হয় না। রবীন্দ্রনাথের উদার অন্তরে এইরূপ যোগাযোগ স্থাপনের বলবতী আকাঙ্ক্ষার উদয় হওয়া স্বাভাবিক। সাংসারিক ধনপদাদির অবস্থার আকস্মিক তারতম্যকে অগ্রাহ্য করিয়া, মানুষ বলিয়াই মানুষকে শ্রদ্ধা ও প্রীতিভরে প্রাণে টানিয়া লইবার জন্য একটা লালসা ধর্ম্মপ্রাণ রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে যে সময় সময় আকুল করিয়া তুলিয়াছে, ইহাও সত্য। সাংসারিক অবস্থার তারতম্য মানুষে মানুষে যে ব্যবধানের সৃষ্টি করে, আপনার আচারব্যবহারে ও সন্তানগণের শিক্ষাদীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ সে ব্যবধানটাকে ঘুচাইবার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন, ইহাও জানি। কিন্তু এ সকল সাধুচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের প্রাণের উদারতা মাত্রই প্রকাশিত হয়, সে সকল চেষ্টার সফলতা তো আর সপ্রমাণ হয় না। বড় ছোট উভয় পক্ষের সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতির উপরেই এ সকল চেষ্টার সফলতা নির্ভর করে। আর এ আত্মবিস্মৃতিলাভ কোনো পক্ষেরই সহজ নহে। বিশেষতঃ পাশ্চাত্যজনসুলভ সৌহার্দ্য ও বিশ্বমানবপ্রেমে কিছুতেই এরূপ আত্মবিস্মৃতি জন্মানো সম্ভব হয় না। এ আত্মবিস্মৃতিলাভ করিতে গেলে, ধনীকে ধনের মূল্যটা ভুলিতে হয়, জ্ঞানীকে জ্ঞানের প্রাধান্যটা ভুলিতে হয়, ললিতকলার উপাসককে ললিত-লালিত্যের সুকুমার অনুভূতিটা ভুলিতে হয়, আর ধার্ম্মিককে অপরের ধর্ম্ম হইতে আপনার ধর্ম্মটা যে শ্রেষ্ঠ, এই ভাবটা পর্য্যন্ত একেবারে বিস্মৃত হইতে হয়। যেখানে সমাজের সাধারণ বিধিব্যবস্থা আপনা হইতেই ধনী ও নির্ধনের, বিজ্ঞ ও অজ্ঞের, ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিকের মধ্যে কোনো প্রকারের আত্যন্তিক ব্যবধান প্রতিষ্ঠার ব্যাঘাত না জন্মায়; যেখানে সামাজিকজীবনে ধনী দরিদ্রের সঙ্গে দৈনন্দিন কার্য্যকলাপের মধ্যে নিঃসঙ্কোচে ও নিরভিমান সহকারে মেশামিশি করেন না; যেখানে বিজ্ঞেরা আপনাদের বিজ্ঞতার উত্তুঙ্গ শৃঙ্গেই খৃষ্টীয়-কথা-প্রসিদ্ধ সেণ্ট্ সাইমনের মত, দিবানিশি বসিয়া রহেন, অজ্ঞের ন্যায় অজ্ঞের সঙ্গে প্রযুক্ত ভাবে মিশিবার প্রবৃত্তি ও অবসর লাভ করেন না; যেখানে ধার্ম্মিক একচক্ষে

আপনার সম্প্রদায়গত সিদ্ধান্ত ও সংস্কারাদির শ্রেষ্ঠতা ধ্যান করেন, আর অপর চক্ষে অন্য সম্প্রদায়সকলের সিদ্ধান্ত ও সংস্কারাদির হীনতা দেখিয়া সেগুলিকে উন্নত ও বিশুদ্ধ করিবার জন্য একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন;—সেখানে এ ব্যবধান নষ্ট করা কেবল অসাধ্য যে তাহা নহে, চেষ্টামাত্রেই যে ব্যবধানকে নষ্ট করিতে যাওয়া হয়, তাহাকেই আরো বাড়াইয়া তোলে। এই জন্য এই শতাধিক বৎসরের অশেষ চেষ্টাতেও মার্কিণ সমাজে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের সামাজিক ব্যবধানটা নষ্ট তো হয়ই নাই, বরং এই সাধুচেষ্টারই ফলে শ্বেতকৃষ্ণে বাহিরের আইন কানুনের বৈষম্য যে পরিমাণে কমিতেছে, ভিতরকার মনের ব্যবধানটা যেন সেই পরিমাণেই আরো বাড়িয়া যাইতেছে। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার আধুনিক আভিজাত সমাজে জন্মিয়া তাহারই অন্নে, তারই দোষগুণের ভাগী হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছেন। এই সমাজে এই ব্যবধানটা চিরদিনই আছে। কলিকাতার বড় বড় জমিদারদের জমিদারীতে এ ব্যবধানটা স্থায়ী হইয়া গিয়াছে। সেখানে না আছে গজার কুলের আদর, না আছে তার বিদ্যার গৌরব, না আছে তার চরিত্রের মর্যাদা। মহর্ষির জমিদারীতেও এ সকলের কোনো বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই। আর বহুকাল হইতে তাঁহাদের জমিদারীতে যে সকল জমিদারী-আচার-নিয়ম প্রবর্তিত রহিয়াছে, তার দ্বিপনন্তী পর্যন্ত যতদিন প্রজাবর্গের স্মৃতিতে জাগরূক থাকিবে, ততদিন তাহাদের পক্ষে আপনাদের প্রজাদের অগৌরব বিস্মৃত হইয়া, একান্ত সংযুক্তভাবে জমিদারবাবুদের সঙ্গে মেশামেশি করা সম্ভবই নয়। আর প্রজারা যতদিন না এ অকুণ্ঠা লাভ করিয়াছে, ততদিন কেবল জমিদারের উদারতার বা বিদ্যমানপ্রেমে পরস্পরের মধ্যকার পুরুষানুক্রমিক ব্যবধানটা কিছুতেই ঘুচিবারও নহে। আর এই ব্যবধান নষ্ট হয় নাই বলিয়াই, আপনার জমিদারীর পল্লীসমাজের মাঝখানে বহুদিন বাস করিয়াও, ঔদার্যসাধনের আন্তরিক আগ্রহ চেষ্টা সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথ সে সমাজের প্রাণের অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করেন নাই। অতি নিকটে থাকিয়াও, বাংলার পল্লীজীবন ও বাঙালীর সাচ্চা প্রাণটা চিরদিনই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া আছে।

রবীন্দ্রনাথের মানসিক সৃষ্টি ও মায়াশক্তি

রবীন্দ্রনাথের অনেক সৃষ্টিই এইরূপ মায়িক। ঊর্ণনাভ যেমন আপনার ভিতর হইতে তন্তু বাহির করিয়া অদ্ভুত জাল বিস্তার করে, রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ আপনার অন্তর হইতেই অনেক সময় ভাবের ও রসের তন্তু সকল বাহির করিয়া, আপনার অদ্ভুত কাব্য সকল রচনা করিয়াছেন। তাঁর কাব্য যেমন কচ্চিৎ বস্তুতন্ত্র হইয়াছে, তাঁর চিত্রিত লোকচরিত্রেও অনেক সময় এই বস্তুতন্ত্রতার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষুদ্র গল্প লিখিয়াছেন, দুচারখানি বৃহদাকারের উপন্যাসও রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁর চিত্রিত চরিত্রের প্রতিরূপ বাস্তব জীবনে কচ্চিৎ খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। কেবল

রবীন্দ্রনাথ যেখানে আধুনিক ইংরেজের বা তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের চরিত্র চিত্রিত করিতে গিয়াছেন, সেখানেই তাঁর চিত্রগুলি অসাধারণ বস্তুতন্ত্রতা লাভ করিয়াছে। এ বিষয়ে "গোরা"র হারাণ বাবুটী অপূর্ব্ব বস্তু হইয়াছে। কিন্তু এরূপ গুটিকতক চিত্র ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের অনেক সৃষ্টিই মায়িক। আর যেমন তাঁর কাব্যে ও গল্পে এই মায়ার প্রভাব বেশী, সেইরূপ তাঁর সমাজসংস্কারের প্রয়াস ও ধর্ম্মের শিক্ষাও বহুলপরিমাণে বস্তুতন্ত্রতাহীন হইয়াছে। তিনি একটা কল্পিত স্বদেশ রচনা করিয়া, তাহারই উপরে একটা সত্য স্বদেশী সমাজ গড়িয়া তুলিতে গিয়াছিলেন। সে মায়ার সৃষ্টি কিছুদিন পরে আপনাতে আপনিই মিলাইয়া গিয়াছে। শৈশবই রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মের রচনায় ও উপদেশে এই মায়ার প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তাঁর স্বাদেশিকতা কেবল শৈশবেই নয়, আজি পর্য্যন্ত বহুল পরিমাণে বস্তুতন্ত্রতাহীন হইয়া আছে। আর আজ তিনি যে এক বিশাল "বিশ্বমানব" কল্পনা করিয়া তাহারই উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করিতেছেন,—তাহারও প্রতিষ্ঠা প্রত্যক্ষেও নয়, আগমেও নয়, কিন্তু তাঁর অলৌকিক কবিপ্রতিভার অঘটন-ঘটনপটীয়সী মায়াশক্তিতে।

আর মায়ার মোহিনী শক্তিই আছে, তৃপ্তিদানের অধিকার নাই। এ সংসারে মায়াধীন জীব নিত্যই, পাই পাই, পাই না; ধরি ধরি, ধরিতে পারি না;—এরূপ অপূর্ণ চেষ্টা ও অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় চঞ্চল হইয়া মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক সৃষ্টিও পাঠকের প্রাণে এই চিরলোলুপ ও নিত্য-অতৃপ্তভাবের সঞ্চার করে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য অনেক সময়ই চিত্তকে মুগ্ধ করে, কিন্তু স্নিগ্ধ করিতে পারে না। জ্ঞানের, ভাবের, কর্ম্মের পিপাসা বাড়াইয়া দেয়, কিন্তু সে পিপাসার নিবৃত্তি করিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে সকল সর্ব্বদাই কাণে বঁধু ঢালে, প্রাণে পিয়া সাড়া দেয়, বুদ্ধিকে যাইয়া জাগাইয়া তোলে, কিন্তু পাঠককে কচিৎ কোনো স্থির সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়। রবীন্দ্রনাথ একবার "ততঃ কিম্?" নামে একটী উপাদেয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁর নিজের লেখাতেও প্রায় সর্ব্বদাই ঐ দুর্দ্দমনীয় প্রশ্নটা জাগিয়া রহে। রবীন্দ্রনাথের রচনা সর্ব্বদাই বড় মিষ্ট লাগে, কিন্তু সর্ব্বদাই আবার তার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অপূর্ণতা ও অতৃপ্তিবোধ জাগিয়া উঠে। ইহাও মায়ারই ধর্ম্ম।

রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব ও ঋষিত্ব—ভাব ও অভাব

কিন্তু রবীন্দ্রের কবিপ্রতিভার অলৌকিক শক্তিকে মায়িক বলিলে তার কোনই গৌরবের হানি হয় না। কবিত্বের শক্তি সর্ব্বদাই মায়িক। অশরীরীকে শরীরীধর্ম্মে বিভূষিত করা, অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়কে নামরূপ দিয়া জ্ঞানাধিকারে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করা, ইহাই কবি-প্রতিভার সাধারণ ধর্ম্ম। ইহাকেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াধর্ম্ম বলে। কবি-প্রতিভা যে কদাপি এই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে না, তাহা নয়। সেখানে কবি শুধু কবি নহেন, কিন্তু সাধকও, সাধনা বলে কবি যেখানে আত্ম-

সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, সেই নিগূঢ় তত্ত্বের উপরেই আপনার কবিকল্পনাকে গড়িয়া তুলেন, সেখানে তাঁর প্রতিভা এই মায়াকে অতিক্রম করিয়া যায়। সেখানে কবি ঋষিত্ব লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের এই পরমপদলাভের অনেক যোগ্যতাই আছে, অভাব কেবল এক বস্তুর। যে বস্তুর অভাব পূরণ করিবার জন্য যিশু যোহনের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার নিকটে দীক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যাহার জন্য শ্রীচৈতন্য ঈশ্বরপুরীর শরণাগত হন, যে সংস্কারের অভাবে অধ্যাত্মজীবনের উপকরণ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকিতেও তাহা কদাপি ফলপ্রসূ হয় না, রবীন্দ্রনাথের অভাব সে বস্তুর। এই সংস্কারের অভাবেই রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক কবি-প্রতিভা এখনো মায়াতীত সত্যলোক ও ব্রহ্মলোক অধিকার করিতে পারিতেছে না। য়ুরোপপর্য্যটনে না যাইয়া রবীন্দ্রনাথ যদি ভারতের পুণ্যতীর্থভ্রমণে আজ বাহির হন, তবে হয় ত, ভগবৎ প্রসাদে, ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোনো 'সাধুবৈদ্যের' সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া এ অভাব পূরণ করিতে পারিতেন। কিন্তু আজ না হউক, এক দিন এ অভাব তাঁর পূর্ণ হইবেই হইবে। তাঁর ক্ষয়োন্মুখ সংসার বেশি দিন তাঁহাকে মনগড়া সিদ্ধান্তের এবং কল্পিত সংস্কারের মায়াজালে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

সাহিত্যে অনুপ্রাস *

২

কালী-কলম-কাগজের ব্যাপারে অনুপ্রাস স্বতঃসিদ্ধ। পুস্তকাকারে প্রকাশিত, বই বাঁধান, প্রিয়পাঠক সম্বোধন, অশুদ্ধশোধন, পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্জ্জিত, অনুকরণ ও অনুসরণ, করকমলে (উপহার), মূলতমূল্য, টীকাটিপ্পনী ফুটনোট, ক্রমশঃ প্রকাশ্য, পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর, পূর্ব্বপীঠিকা, সর্ব্বত্রই অনুপ্রাস। বিবাহবাসরে বিবাহ-সাহিত্য প্রীতি-উপহার ও ব্রাহ্মসভায় শোকস্মৃতি, শোকসঙ্গীত, শৌককাব্য প্রভৃতিতে পর্য্যন্ত অনুপ্রাস। সৌখীন সাহিত্যিক অনুপ্রাসে অনুরক্ত।

কবিকুল চিরকালই অনুপ্রাসের অনুকূল। কেহ নামে, কেহ উপাধিতে, অনুপ্রাসের ছাপ মারিয়া কবিত্বের দাবী সপ্রমাণ করিয়াছেন। আবার কেহ বা গ্রন্থের নামনির্দ্দেশে, কেহ বা নায়ক-নায়িকা ও ইতর পাত্রপাত্রীগণের পরিচয়-প্রসঙ্গে, অনুপ্রাসের অবতারণা করিয়াছেন। ক্রমে দেখাইতেছি।

প্রাচীন ও নবীন গ্রন্থকারের নামে বা উপাধিতে অনুপ্রাস, যথা—কবিকঙ্কণ (তাঁহার কাব্যের নায়ক কালকেতু,

* প্রবন্ধে ণ ন, শ ষ স, ঙ ং, জ য, ড় ড়, ও ছুই ব এক ধরা হইয়াছে।

নায়িকার নাম লইয়া নায়িকাভেদ, পুরনা-সুরনা), রসসাগর, নরহরি, মাইকেল মধুসূদন, মদনমোহন, মনোমোহন, দামোদর, চণ্ডীচরণ, চারুচন্দ্র, চন্দ্রশেখর কর, বঙ্কুবিহারী কর, দুর্গাদাস (লাহিড়ী), নগেন্দ্রনাথ (বসু), নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য), রামেন্দ্রসুন্দর, কান্তকবি (রাজসাহীর রজনীকান্ত), ময়মনসিংহের মনোমোহন সেন, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রঙ্গপুরের সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় যে সকল উত্তরবঙ্গীয় প্রাচীন কবির নাম প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে কমললোচন, রতিরাম, কবিবল্লভ, লালদয়াল, দ্বিজ জগন্নাথ, জগজ্জীবন, শিবপ্রসাদ বক্সী, নীলকমল লাহিড়ী, পণ্ডিত পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ, দামোদর দেব, রাম সরস্বতী, রাম রায়, রাজা রুদ্রকান্ত রায়, শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত, প্রভৃতি নামে বা উপাধিতে অনুপ্রাসের পূর্ণপ্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। সর্ব্বজন-প্রিয় কাশীদাস-কৃত্তিবাস যুগলমূর্ত্তিতে অনুপ্রাস-বদ্ধ। দাশরথি রায় ও মতিলাল রায় কাব্যকণ্ঠ ও অনুপ্রাসের পেশাদার উপাসক।

বৈষ্ণবসাহিত্য রসবহুল, সুতরাং তথায় অনুপ্রাসের পূর্ণপ্রভাব। বিদ্যাপতির নিজের নামে না থাকিলেও তাঁহার আশ্রয়দাতা মুরুব্বি শিবসিংহের নামে অনুপ্রাস আছে। চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, বৈষ্ণবদাস, প্রভৃতি প্রাচীন পদকর্ত্তা সমষ্টিভাবে অনুপ্রাসের দাস। চণ্ডীদাসের রজকিনী রামী অনুপ্রাসের মানে মণিনী। গ্রন্থাদির নামে তদপেক্ষা অনুপ্রাস। রুক্মকীর্ত্তন, গোপীগীতা, গোপীগোষ্ঠ, চমৎকারচন্দ্রিকা, বৃন্দাবনবিলাস, ব্রজবিহার, বৈষ্ণববন্দনা, সখীসংবাদ। মান ও মাথুর একত্র অনুপ্রাসরসে সিক্ত। নদীয়ার গৌরাঙ্গ রসের নবগোরা। তাঁহার চরিতগ্রন্থের নামে অনুপ্রাস ঢল ঢল করিতেছে। যথা, চৈতন্যচন্দ্রিকা, চৈতন্যচরিত, চৈতন্যচরিতামৃত, জানি না চিনিবাসচরিতামৃত এই গোত্রের কি না। বঙ্গভাষায় লিখিত না হইলেও (কবিকর্ণপুর-কৃত চৈতন্যচন্দ্রোদয় এবং গীতগোবিন্দ উদাহরণস্বরূপ উল্লিখিত হওয়া উচিত।

রঘুনন্দনের রামরসায়নে ও অনুপ্রাস আছেই, গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নামও অনুপ্রাস-ডোরে বদ্ধ। প্রাচীন পুস্তক পদ্মাপুরাণ, মনসামঙ্গল, গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী, গোবিন্দচন্দ্রগীত, প্রভৃতিতে অনুপ্রাস, প্রাচীন পদাবলীতে প্রসাদপদাবলীতে অনুপ্রাস। গ্রন্থকার বালবলভিরাজে অনুপ্রাস, গ্রন্থ প্রজ্ঞাপারমিতায় অনুপ্রাস। ঘনরামের সেনানায়ক মহানন্দ, রায়গুণাকরের বেড়েভেড়ের কৌতুক, হরিহোড়, মহামায়া, মালিনী মাসী, বীরসিংহের কন্যা বিদ্যা, (শুণ) সিন্ধুর পুত্র সুন্দর, সাধী মাধী দাসী, অনুপ্রাসের মায়া কাটাইতে পারে নাই।

রামায়ণে নলনীল, গয়গবাক্ষ, হনুমান্, জাম্বুবান্ (অনুপ্রাসের খাতিরে জাম্ববান্ জাম্বুবান্ সাজিয়াছে), সুষেণ, মহীরাবণের পুত্র অহিরাবণ, কৈকেয়ী, মন্দোদরী, মায়ামৃগ, স্বর্ণসীতা, বালিবধ, জনস্থান, রামের রাজ্যাভিষেক, পিতৃসত্যপালনার্থ বনবাস, পাতালপ্রবেশ, সগরসন্তান, কৌশিক, শক্তি-

শেল, রামরাবণে রণ, কুম্ভকর্ণ, সকলেই অনুপ্রাসের তালে তালে নৃত্য করিতেছে। তাই প্রাচীন কবি বড় কথাটাই বলিয়াছিলেন—

কুম্ভকর্ণে ককারোঽস্তি
ককারোঽস্তি বিভীষণে।
কথং জ্যেষ্ঠে কুলশ্রেষ্ঠে
ককারো নাস্তি রাবণে॥

মহাভারতে কৌরবপাণ্ডব, দুর্য্যোধন-দুঃশাসন, দ্রোণাচার্য্য-কৃপাচার্য্য, বৃষকেতু-বৃষসেন, নরনারায়ণ, কৃপকৃপী, কৃষ্ণকৃষ্ণা, উত্তর-উত্তরা, হিড়িম্ব-হিড়িম্বা, বলভদ্র-সুভদ্রা, অম্বা-অম্বিকা-অম্বালিকা, বভ্রুবাহন, বিচিত্রবীর্য্য, দেবব্রত, সত্যবতী, জনমেজয়, বৈপায়ননিষ্য বৈশম্পায়ন, বেদব্যাস, ঘৃতাচী, হাহাহুহু, সব্যসাচী, কুরুকুল, পঞ্চপাণ্ডব, পাঞ্চালীর পঞ্চপতি, পাশুপত অস্ত্র, শরশয্যা, বারণাবত, গোগ্রহ (বা গোগৃহ) সর্পসত্র, বারোবছর বনবাস, সশরীরে স্বর্গারোহণ, সবই অনুপ্রাসের ধাপে ধাপে।

লঙ্কাকাণ্ড-কুরুক্ষেত্রে অনুপ্রাসের আভাস আছে। আবার রামের প্রতিদ্বন্দ্বী পরশুরাম, রাবণের অরি রাম, কৃষ্ণের শত্রু কংস, সীতার সখী সরমা, সাবিত্রীর স্বামী সত্যবান্।

ইংরাজ-রাজত্বের বাঙ্গলা-সাহিত্যে যুগপ্রবর্ত্তক রাধানগরের রাজা রামমোহন রায়ের নামে অনুপ্রাস এবং তাঁহার প্রণীত গৌত্তলিকপ্রবোধে অনুপ্রাস। নব্যসভ্য-বিধায়ক, কলিকাতা কমলালয়, পুরুষ-পরীক্ষা, রামারঞ্জিকা, নবনারী, প্রথম নভেল ফুলমণি ও করুণা, প্রায় প্রথম নভেল আলালের ঘরের দুলাল, প্রায় প্রথম নাটক কুলীনকুলসর্ব্বস্ব, নবনাটক, শরৎসরোজিনী নাটক, কোথাও অনুপ্রাসের আটক নাই।

বীরসিংহবাসী বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ-বিচার, বহুবিবাহ-বিচার, বেতাল-পঞ্চবিংশতি,—এখানে পুস্তকের নামের ভিতর ও অনুপ্রাস আছেই, গ্রন্থ ও গ্রন্থকারে মিলিয়াও অনুপ্রাস হইয়াছে। মদনমোহনে অনুপ্রাস, শিশুশিক্ষায়ও অনুপ্রাস। রামদাস সেনের মরুরহস্য, বিবেকানন্দের বীরবাণী, বিহারীলালের বন্ধুবিয়োগ, বাউল বিংশতি, প্রেমপ্রবাহিণী, সঙ্গীতশতক, নিসর্গসন্দর্শন, স্বপ্নদর্শন, সাধের আসন, দ্বিজেন্দ্রলালের দুর্গাদাস, রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রাণী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কবিতা-সুন্দর্শন, শশাঙ্কমোহন সেনের শৈলসঙ্গীত ও সিন্ধুসঙ্গীত, এ সব আধুনিক পুস্তকের নামের ভিতর অনুপ্রাস, আবার গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নামে মিলিয়াও অনুপ্রাস। পদ্মাপাতের প্রমথনাথ নামে অনুপ্রাস, আবার প্রমথনাথ ও তৎপ্রণীত পদ্মায় মিলিয়া অনুপ্রাস। বিদ্যা-সাগরের বর্ণপরিচয়, মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদবধ, বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ, বঙ্গবাসীর বিহারীলালের বিদ্যাসাগর, বঙ্কবিহারী ধরের বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বিধুশেখরের বিবাহ-মঙ্গল, সৌরীন্দ্রমোহনের শেফালি; এ সব স্থলে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নামে নামে মিলিয়া অনুপ্রাস। দুর্গাদাস লাহিড়ীর রাণী ভবানী ও রাজা রামকৃষ্ণ, নগেন্দ্রনাথ বসুর বিশ্বকোষ, নরেন্দ্রনাথের গৃহহারা,

চারুচন্দ্রের পুষ্পপাত্র, সতীশচন্দ্রের বাঙ্গালীর বল, দীননাথ সেনের স্বতিলাপী. এ সব স্থলে গ্রন্থকারের নামেও অনুপ্রাস, গ্রন্থের নামেও অনুপ্রাস। সৌরীন্দ্রমোহনের যৎকিঞ্চিৎ ও গ্রন্থের ফের অনুপ্রাসের ফেরফের।

তারাশঙ্করের রাসেলাসে, অক্ষয়-কুমারের বাহ্যবস্তুতে, ভূদেবের পারিবারিক প্রবন্ধে, রামগতি ন্যায়রত্নের বস্তুবিচারে, রাজনারায়ণ বসুর সেকাল ও একালে, যশোর জেলার মাইকেল মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারীতে, তিলোত্তমায়, ব্রজাঙ্গনা-বীরাঙ্গনা কাব্যযুগ্মে অনুপ্রাস।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা যেমন উচ্চদরের, তাঁহার অনুপ্রাস-প্রবণতাও সেই অনুপাতে। তাঁহার কপালকুণ্ডলা, কমলাকান্ত, কৃষ্ণকান্ত, বিষবৃক্ষ, রাধারাণী, কেহ অনুপ্রাস-ছাড়া নহে। হৃষীকেশের পুত্র ব্যোমকেশ, শ্রীশচন্দ্রের পুত্র সতীশচন্দ্র, নগেন্দ্রের জ্ঞাতি-ভ্রাতা দেবেন্দ্র দত্ত, এ সব স্থলে অনুপ্রাস; কুন্দনন্দিনীতে অনুপ্রাস, মণিমালিনীতে অনুপ্রাস, মনোরমার পত্রপত্রিতে অনুপ্রাস, ললিতলবঙ্গলতায় অনুপ্রাস, সুভাষিণীতে অনুপ্রাস, শিবসাক্ষাৎ স্বয়ংবরা দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমায় অনুপ্রাস, অভিরাম-স্বামীতে, ভীমদেব ঘোসলবীশে, চন্দ্রচূড়ে অনুপ্রাস। অনুপ্রাসের অনুরোধে মৃণালিনীর বিতিন মণিমালিনী ও গিরিজায়ার মিলন দিগ্বিজয়ের সঙ্গে। শৈবলিনীর সাঁতারে অনুপ্রাস পাওয়ার।

কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'মা না মহাশক্তি' অনুপ্রাসে অতিভক্তির পরিচয় দেয়। প্রভাতচিন্তা, নিশুতচিন্তা, নিশীথচিন্তা গ্রন্থত্রয় অনুপ্রাসসূত্রে গ্রথিত। দীনবন্ধুর কমলে কামিনী ও যমালয়ে জীবন্ত মানুষে (লীলাবতীকেও ললিত-লীলাবতী বলিয়া ধরিয়া লইতে পারেন) ও হেমচন্দ্রের বীরবাহুতে অনুপ্রাস। নবীন নামই যখন অনুপ্রাসের অধীন, তখন তাঁহার মৈত্রাবরুণি-নিশীথযজ্ঞে ও অমিতাভ-অমৃতাভ, রঙ্গমতী-ভানুমতীতে, যুগে যুগে অনুপ্রাস থাকিবেই ত। রমেশচন্দ্রের বঙ্গবিজেতায় অনুপ্রাস, আবার অমলা-কমলা সরলা-বিমলায় কাণ ঝালাপালা। জীবনপ্রভাত ও জীবনসন্ধ্যা একত্র সংসার ও সমাজ একত্র, অনুপ্রাস-জড়িত। চন্দ্রনাথের ফুল ও ফল, বেতালে বহুরহস্য, সংযমশিক্ষা, প্রত্যেক খানিতে অনুপ্রাস। শকুন্তলা-তত্ত্ব ও সাবিত্রী-তত্ত্ব একত্র অনুপ্রাসবদ্ধ। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধুমতী শৈশবসহচরীতে অনুপ্রাস, পূর্ণচন্দ্র বসুর সাহিত্যচিন্তা সমাজচিন্তা একত্র অনুপ্রাসসূত্রে গ্রথিত। লালমোহন বিদ্যানিধির আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা (সাধারণ উচ্চারণে আবস্থা); কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সদ্ভাবশতক; তারকনাথ গাঙ্গুলির হরিষে বিষাদ; সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের সবিতা-সুদর্শন, বর্ষবর্ত্তন, মাঘকমল; হরিশ্চন্দ্র মিত্রের নির্ব্বাসিতা সীতা; রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যকলাপ; রাজকৃষ্ণ রায়ের উৎকট বিরহ বিকট মিলন, বনবীর, কুপোকাৎ, জগা পাগলা, গোঁজেল গঙ্গা, আর নায়িকাযুগল হিরণ্ময়ী কিরণময়ী; দামোদরের মা ও মেয়ে, মৃন্ময়ী, কমল কুমারী, নবাবনন্দিনী, শুক্লবসনা সুন্দরী,

মনোমোহনের প্রণয়পরীক্ষা, রামের রাজ্যাভিষেক, ঠাকুরদাসের শারদীয় সাহিত্য ও বঙ্গান্তে কুৎসাকুমারী, বিপ্রদাসের যুবক যুবতী, পাকপ্রণালী, সর্ব্বত্র অনুপ্রাস।

বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, বীরবাণী, আনন্দচন্দ্রের মাতৃমঙ্গল পরমার্থপ্রসঙ্গ, দেবীপ্রসন্নের যোগজীবন, পুণ্যপ্রভা, বিবেকবাণী, কৃষ্ণকুমার মিত্রের বুদ্ধদেব, রাজা রাণী, চণ্ডীচরণ সেনের টম কাকার কুটীর, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কমলকুমার এবং অন্যান্য লেখকের উপনিষদের উপদেশ, ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব, ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান, ইত্যাদিতে দৃষ্ট হইতেছে যে কোন সম্প্রদায়ের লেখকই অনুপ্রাসে পশ্চাৎপদ নহেন। 'সীতা' ও 'পলাশবন' প্রণেতা 'সীতা' ও 'অশোকবন' লিখিলে সব দিক্ রক্ষিত।

রাণী মৃণালিনীর মনোবীণায় অনুপ্রাসের ঝঙ্কার। কল্লোলিনী প্রতিধ্বনিতেও অনুপ্রাসের ধ্বনি শুনি। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর অশ্রুকণা ও অর্ঘ্য, স্বদেশিনী ও সন্ন্যাসিনী, যুগে যুগে অনুপ্রাস। পতিপ্রাণা ধানকুমারীর শুভসাধনা ও শিল্পপ্রসঙ্গে অনুপ্রাস অঙ্গহীন নহে। বিপত্নীক চন্দ্রশেখর উর্ব্বশীপ্রেম না লিখিয়া প্রেমপ্রলাপ লিখিলে সমতি-রক্ষা হইত। বঙ্কিমের চন্দ্রশেখরও সৌখীন সাহিত্যিক হইলে পত্নীপলায়ন লিখিতে পারিতেন।

দেবী স্বর্ণকুমারীর বর্ণবোধ, গল্পস্বল্প, ফুলের মালা, কাহাকে, লজ্জাসুন্দরী দেবীর আমিষ ও নিরামিষ আহার, দ্বিজেন্দ্রনাথের সপ্তসর্গে সমাপ্ত স্বপ্নপ্রয়াণ (কবিকল্পনার সপ্তসর্গও বলিতে পারেন), জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঘাড়ে পড়ে রাবণবধ, হিতে বিপরীত," রবীন্দ্রনাথের কড়িও কোমল, (রবিরাহুরচিত মিঠেকড়ায়ও অনুপ্রাস) কবিকাহিনী, কথা ও কাহিনী, কণিকা, ক্ষণিকা, গল্প-গুচ্ছ, গোড়ায় গলদ, রাজা ও রাণী, শিশু, সুধীন্দ্রনাথের সম্পাদিত স্বল্পায়ুঃ সাধনা,—বলেন্দ্রনাথের প্রেম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, দেখাইতেছে যে ঠাকুর পরিবারও অনুপ্রাসের অতীত নহেন।

[স্বপ্নপ্রয়াণে অজস্র অনুপ্রাস, প্রণিধানপূর্ব্বক পড়িলে পাইবেন। যথা কল্পনাকুমারী, কাননকামিনী, মনোমন্দির, মায়ামোহ, আনন্দ-সরসী, লজ্জা-লজ্জা সখী, নন্দননগর, বিলাসপুর, বিষাদপুর, সমর-শান্তি, শ্রেয়ঃ প্রেয়ঃ, শমদম, সখ্যরস, দাস্যরস, রুদ্ররস, বীররস, স্বপ্নস, রসাতলরাজ, মহীশমহিষ, প্রণতিপথ, বিশ্ববন, শান্তিসিন্ধু, 'শ্রদ্ধা নামে সতী, সত্য তার পতি।' বাস্তবিক বইখানি অনুপ্রাসের খনি, পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে বিচিত্র অনুপ্রাস।]

শশধরের ত্রিদিববিজয়-রাঘববিজয় কাব্যযুগ্মে অনুপ্রাস। জলধরের পুরাতন পঞ্জিকা (পুরাতন হইলেও নিত্যই নব), দীনেশচন্দ্রের জড়ভরত (সম্প্রতি চলিয়াছে), রায় সাহেবের সাহিত্য-সাধনা, কাহিনী ও কাঞ্চন, ভক্তের ভগবান্, বঙ্গের শেষবীর, বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম, রাণীভবানী, হেমেন্দ্রপ্রসাদের মৃত্যুমিলন, ক্ষীরোদপ্রসাদের কবিকাননিকা, প্রভাতকুমারের গল্পগ্রন্থাবলী ষোড়শী, মণিলালের কল্পকথা, যতীন্দ্রমোহনের রেখা ও লেখা একত্র ফকিরচন্দ্রের পথের

কথা, শৈলেশচন্দ্রের চিত্রবিচিত্র, সত্যেন্দ্রনাথের বেণু ও বীণা, তীর্থসলিল তীর্থরেণু একত্র, সুরেশ কণিকা, রমণীমোহন ঘোষের মঞ্জরী ও মুকুর একত্র, দীনেন্দ্রকুমারের পল্লীচিত্র, পল্লীবৈচিত্র্য একত্র (পল্লীচিত্রও প্রকাশিতপ্রায়) মহিমময়ী, নন্দনে নরক, পিশাচ পুরোহিত, (পত্নী কি প্রেতিনীর কতদূর?) আর কত বলিব? গ্রামেন্দ্রসুন্দরের বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা, জগদানন্দের প্রকৃতি-পরিচয়, নিত্যকুমারের সাহিত্যসেবী ও শিক্ষা-সমালোচনা, প্রমথনাথের কথা বনাম কাব্য, অনুপ্রাসের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

থিয়েটারে সুকুমার সাহিত্যের হাট জমজমাট। নট-নটী, পটপরিবর্ত্তন, ষ্টার থিয়েটার, ক্লাশক্লাস (থিয়েটার দুর্গাদাস দে, সর্ব্বত্র অনুপ্রাস। তাহার উপর নির্ব্বাচিত নৃত্যগীত সোণায় সোহাগা। নাটকনাটিকা পঞ্চরং প্রহসনের নামনির্দ্দেশে অনুপ্রাসের ঘোর ঘটা। (বঙ্গের প্রাণিক গিরিশচন্দ্রের গিরিশগ্রন্থাবলী ও তাঁহার অন্য শোককাব্য গিরিশগৌরব ইহার পোষক প্রমাণ। তৎপ্রণীত অভিনয় ও অভিনেতা, কবিতাকুঞ্জ, বিবিধ প্রবন্ধও উল্লেখ-যোগ্য।) যথা ঐকাকার, কমলেকামিনী, কুবুজ ও দরজী, কৃপণের ধন, খাসদখল, গ্রহের ফের, চাটুজ্যে মুখুজ্যে, চোরের উপর বাটপাড়ি, জীবনে মরণে, ডিস্‌মিস্, তিলতর্পণ, (নীলদর্পণের ছায়া?), দেলদার, দোললীলা, দৌলতে দুনিয়া, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, পরপারে, পাণ্ডবগৌরব, পারস্যপ্রসূন, পাষাণে প্রেম, প্রতাপাদিত্য, প্রাণের টান, প্রেমের প্রতিদান, ফণীর মণি, বজা কি সাজা, মণিহরণ, মধুরমিলন, মনের মতন, মলিনমালা, মুকুলমুঞ্জরা, মোহিনীমায়া, যৎকিঞ্চিৎ, ব্যাপ্তসা কি ভ্যাপ্তসা, রংরাজ, লক্ষ্মণবর্জ্জন, বঙ্গবিক্রম, বড়দিনের বখ্‌শীশ, বড়বৌ, বাবু, বাহবা বাতিক, বিষমঙ্গল, বিবাহ-বিভ্রাট, বুদ্ধদেব, বেল্লিক বাজার, বোধনে বিসর্জ্জন, বৈজয়ন্তবাস, ব্রজবিহার, ব্রাহ্মণ-বিভ্রাট, শাস্তি কি শাস্তি, শিরহী ফরহাদ, সৎসঙ্গ, সম্মতিসঙ্কট, সাবাস আটাশ, সীতার বনবাস, সোণার সংসার, সংসার, হরিরাজ। 'দাদা ও আমি'র উত্তোর 'গাধা ও তুমি'; 'করমেতি বাই' এর উত্তোর 'মকরে বিতাই'? সঙ্গীতশাস্ত্রসম্বন্ধে:—কণ্ঠকৌমুদী, গীতসূত্রসার, তরঙ্গমালা, তারিণীতরঙ্গসঙ্গীত, জ্ঞানানন্দগীত, কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্যামাসঙ্গীত, সদ্ভাবসঙ্গীত, সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন, সঙ্গীত তরঙ্গ, সঙ্গীতসার, সঙ্গীতসার-সংগ্রহ, সরলসঙ্গীত, সরলস্বরলিপিশিক্ষা, সাধক সঙ্গীত, সাধনসঙ্গীত, স্বদেশ সঙ্গীত, সেতারশিক্ষা।

বটতলার বাজে বই বাদে যে সব বইএর বিষয় বিশেষভাবে বলা হয় নাই, তাহার ফর্দ্দ:—

অ—অকুলসহরী, অবলাবান্ধব।

ক—কবিতাকুঞ্জ, কবিতাকুসুম, কাকলী, কাননকুসুম, কাব্যকথা, কাব্যকুসুমাঞ্জলি, কারাকাহিনী, কারাকুসুমিকা, কিন্নরকানন, কুপিতকৌশিক, কুলীকাহিনী, কুলীনকাহিনী, কুসুমে কীট, কৌতুককণা।

গ—গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ, গরীবের গান, গুরুগোবিন্দ, গোপীগোষ্ঠ, জ্ঞানগর্ভ।

চ—চণ্ডীদাসচরিত, চিত্তচিন্তা

জ—জগৎগুরু জননীজীবন, জাতীয়জীবন।
ত—তরুণতাপস, তারকেশ্বরতথ্য, ত্রিকাল-দর্শিদর্পণ।
দ—দারোগার দপ্তর, দৈবীবার্ত্তা।
ন—নগনলিনী, নন্দনকানন, নবীনা জননী, নারীনীতি, নিত্যানন্দচরিত
প—পঞ্চপুষ্প, পঞ্চপ্রদীপ, পঞ্চোপাখ্যান, পতিব্রতা, পদ্মপুষ্পাঞ্জলি, পদ্যোপাখ্যান, পবিত্রপ্রণয় কাব্য, পাগলের প্রলাপ, পারস্য-প্রসূন, পার্থপরাজয়, পার্থপরীক্ষা, পিতল প্রতিমা, পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব, প্রীতিগীতি, প্রীতিও পূজা, প্রেম ও প্রকৃতি, প্রেম-পরিণাম, প্রেমপ্রতীক্ষা, প্রেম-প্রস্রবণ।
ব—বঙ্গবিজয়, বঙ্গে বর্গী বড়বৌ, বাইশক বিমনসা, বারুণীবিলাস, বিজয়বসন্ত, বিবিধ বিধান, বিলাতী বনিতা, বিশ্ববৈচিত্র্য, বীরেন্দ্রবিনাশ, বৃদ্ধবাণী, বৃষবৃদ, বৃন্দাবন-বৃত্তাবলী
ভ—ভক্ত ও ভগবান্, ভারতভ্রমণ, ভাববল্লী
ম—মঙ্গলময়ী, মন বৃন্দাবন, মা আমার কালো কেন ? মিলনমন্দির, মুক্তার মালা
র—রাজা সীতারাম রায়
ল—ললিতলবঙ্গ
শ—শত্রুসংহার, শাক্যসিংহ, শান্তিসুধা শুম্ভসংহার, শুম্ভনিশুম্ভবধ, শোকস্মৃতি, শিব ও শক্তি, শিক্ষা সঙ্কট (বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিব্যবস্থার প্রতিবাদ), (শ্রী) কৃষ্ণের কলঙ্ক কেন ?
স—সংসঙ্গ, সতীপ্রশস্তি, সপত্নী সরো, সপ্ত সম্বোধন, সর্ব্বানন্দ সর্ব্ববিদ্যা, সাধকসহচর, সাহা সমাজের ইতিহাস, সাহিত্য-সংযোগ (পদ্যপ্রয়াস), সুনীতিসুধানিধি, সুরবালা শূরবালা, সুশীলমালতী, সোণার খনি, সোণার সতীন, সৌভাগ্য-সোপান, স্বদেশ ও সরমা।

ইতি বেদব্যাসের বিশ্রাম।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

নীতিশিক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র

২। আত্মসংযম ও ইন্দ্রিয়-দমনেই যথার্থ বীরত্ব। আত্মজয়ী ব্যক্তিই মনুষ্য-মধ্যে দেবতা।

যেমন আত্মসংযম ও ইন্দ্রিয়-দমনের অভাবে মানুষের অধঃপতন হয়, মানুষকে পশু অপেক্ষাও অধম করিয়া ফেলে; অন্যদিকে তেমনই যিনি আত্মসংযমে বলবান্ ও ইন্দ্রিয়দমনে শক্তিশালী, তিনিই বীর। তিনিই দেবতার পদবীতে উন্নীত হন। মানুষের মধ্যে যে প্রকৃতিজ দ্বন্দ্ব নিয়তই ক্রিয়া করিতেছে সেই দ্বন্দ্ব হইতেই বাসনার সৃষ্টি এবং বাসনাই দুঃখের মূল। যিনি এই বাসনাকে ও দুঃখকে জয় করিতে পারেন, তিনিই মনুষ্য মধ্যে ধন্য, ভগবান্ মানুষকে এত 'খেলো'—এত লঘু করেন নাই যে তিনি ক্রীড়নক হস্তে তাহাকে এই বিশ্বসংসারে খেলা করিতে পাঠাইয়া দিবেন। তিনি মানুষকে বীরের উপাদানে

গঠিত করিয়া এই সংসারে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছেন। তাই তাহার জন্য এত যুদ্ধের আয়োজন, এত বাসনা, এত প্রলোভন—তাহার বিরুদ্ধে এত অগণ্য শত্রুর সমাবেশ। তাহাকে তিনি এই সব শত্রু জয় করিয়া যশের মুকুট পরিতে অবসর দিয়াছেন—মানুষের প্রতি তাঁহার এত দয়া!

'বীর কাহাকে বলে' এই কথার উত্তরে নানা পণ্ডিতে নানা কথা বলিয়াছেন। সে সকলের সার মর্ম্ম অনুধাবন করিলে ইহাই পাওয়া যায় যে কোন মহৎকার্য্যে যিনি আত্মোৎসর্গ করিতে পারেন তিনিই বীর। যুদ্ধ করিয়া নরহত্যা করিলেই কিছু বীর হয় না। চেঙ্গিস্ খাঁ, তৈমুর বা আলেকজেন্দর ইহারা আততায়ীর ন্যায় অন্যের দেশে পড়িয়া লুণ্ঠন ও নরহত্যা করিয়াছিল, ইহাদিগকে বীর বলিতে পারি না। ওয়াসিংটন, গ্যারিবল্ডি বা প্রতাপ সিংহ বীর—কেননা তাঁহারা স্বদেশরক্ষার্থে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে বুদ্ধ, চৈতন্য বা যীশুখৃষ্ট যুদ্ধ করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা বীরশ্রেষ্ঠ। আবার বিদ্যাসাগর, হাওয়ার্ড বা উইলবারফোর্স—ইঁহারা জীবনে হয় ত অস্ত্র স্পর্শ করেন নাই, কিন্তু যে নরসেবার জন্য ইঁহারা প্রাণপাত করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় বীরত্ব আর কি আছে? তাই বলিতেছিলাম যে, মহৎকার্য্যে আত্মোৎসর্গই বীরত্ব। পরার্থে কর্ম্ম বা লোকহিতের ন্যায় মহৎকার্য্য আর দ্বিতীয় নাই। লোকহিতব্রতীর ন্যায় বীরও আর নাই। কিন্তু এই পরার্থে কর্ম্ম বা লোকহিতের মূলে কি? স্বার্থ-বিসর্জ্জন! যে আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থকে বৃহৎ স্বার্থে বিসর্জ্জন দিতে পারে সে-ই লোকহিতব্রতে অধিকারী। বাসনা হইতেই স্বার্থের সৃষ্টি। সুতরাং বাসনা ত্যাগ না করিলে স্বার্থত্যাগ করা যায় না। ইন্দ্রিয়সমূহই বাসনাসৃষ্টির মূল। যে শুধু এই ইন্দ্রিয় দমন ও বাসনা ত্যাগ করিতে পারে সে-ও মহাবীর। আবার যিনি পরহিতার্থে এই ইন্দ্রিয় দমন ও বাসনা ত্যাগ করিতে পারেন তাঁহার বীরত্বের তুলনা নাই—তিনি মনুষ্যমধ্যে দেবতা। বঙ্কিমচন্দ্রের অমর তুলিকা এই নরদেবতার আদর্শও চিত্রিত করিয়াছে, আমরা এখন তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।

প্রতাপ ও শৈবলিনী বাল্যাবধি পরস্পরকে ভাল বাসিয়াছিল। তাহারা এক-গ্রামবাসী, পরস্পর জ্ঞাতি। শৈশব হইতে পরস্পরের খেলার সাথী—শৈশব হইতে পরস্পরে নদীতীরে, বনমধ্যে একত্র বিচরণ করিত। পরস্পরের সাহচর্য্যে আনন্দানুভব করিত, কখনও নদীতীরে বসিয়া নৌকা গণনা করিত, নীলাকাশে চাহিয়া তারার শোভা দেখিত, আম্রকাননে বনদেব ও বনদেবীর মত ক্রীড়া করিত, ফুলের মালা গাঁথিয়া পরস্পরকে পরাইত, কখনও বা নদীবক্ষে সাঁতার দিয়া পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিত। এইরূপে উভয়ের মধ্যে প্রীতিবন্ধন হইতে লাগিল। বয়সের সঙ্গে সেই প্রীতি ক্রমে বাড়িয়া গভীর প্রণয়ে পরিণত হইল। কিন্তু হায়, ভালবাসা হইলে কি হয়—সে ভালবাসায়

বুঝি দেবতার অভিশাপ ছিল! সমাজের চক্ষে যে এ জগতে তাহাদের পরস্পরের মিলনের কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু শৈবলিনী তাহা বুঝিতে পারিল না। শৈবলিনী মনে ভাবিতে লাগিল যে প্রতাপকেই সে পতিরূপে পাইবে।

ষোড়শবর্ষীয় কিশোর প্রতাপ তাহা বুঝিয়াছিল; বুঝিয়াছিল যে এ জীবনে তাহাদের মিলনের সম্ভাবনা নাই, এ জীবনে তাহাদের ভালবাসার সফলতা হইবে না। জীবন থাকিতে এ প্রণয় যাইবে না। কিন্তু সারাজীবন এ নিষ্ফল প্রণয় বহিতে বদ্ধ হইয়া কাজ কি? কিশোর বুঝি প্রতাপ মনে করিলেন যে, এ জীবনের সঙ্গে ইহকালে এ প্রণয়ের সমাধি হওয়াই ভাল। তাই একদিন শৈবলিনীকে ডাকিয়া উভয়ে গঙ্গায় সাঁতার দিলেন. বহুদূরে মধ্যগঙ্গায় আসিয়া প্রতাপ বলিল 'শৈবলিনী এই আমাদের বিয়ে।' শৈবলিনী বলিল 'আর কেন—এই খানেই।' প্রতাপ ডুবিল. কিন্তু শৈবলিনী ডুবিতে পারিল না। এই খানেই প্রতাপ ও শৈবলিনী এ দুইজনের চরিত্রের গতি স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। প্রতাপের হৃদয়ে বীরত্বের বীজ ছিল; —সে প্রণয়ের জন্য প্রাণ দিতেও কাতর নহে। কিন্তু শৈবলিনীর হৃদয় দুর্ব্বল;— সে আত্মসুখ-পরায়ণা। তাই সে ডুবিতে পারিল না। মনে করিল 'প্রতাপ আমার কে?' সে ফিরিয়া কূলে উঠিল। কিন্তু হায়,শৈবলিনী তুমি ডুবিলেই ভাল করিতে!

প্রতাপ মরিবার জন্য ডুবিল, কিন্তু তাহার মরা হইল না। চন্দ্রশেখর শর্ম্মা নামে একজন ব্রাহ্মণ নৌকারোহণে যাইতেছিলেন—তিনি প্রতাপকে জল হইতে উঠাইয়া প্রাণরক্ষা করিলেন, পরে এই চন্দ্রশেখরের সঙ্গেই শৈবলিনীর বিবাহ হইয়াছিল।

তাহার পর আট বৎসরের ঘটনা কবি বিশেষ কিছু বলেন নাই। যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে. এই আটবৎসরে প্রতাপ চন্দ্রশেখরের অনুগ্রহে নবাব সরকারে চাকরী পাইয়াছিলেন ও নিজ গুণে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি জমিদার, তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকা, দেশ-বিখ্যাত নাম। তিনি চন্দ্রশেখরের প্রতিবাসী কন্যা রূপসীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

রূপসীকে বিবাহ করিয়াছেন? তবে কি প্রতাপ আর শৈবলিনীকে ভাল বাসিতেন না—শৈবলিনীকে ইতিমধ্যেই ভুলিয়া গিয়াছেন কিন্তু হায়. প্রণয় কি কখনও ভোলা যায়? যে হৃদয়ে একবার প্রণয়ের দাগ পড়ে--পাষাণ-রেখার ন্যায় সে যে চিরকাল তাহাতে অঙ্কিত হইয়া থাকে। কস্তুরীগন্ধের ন্যায় তাহার সৌরভস্মৃতি বুঝি জন্মান্তরেও অন্তরকে পুলকিত করিতে থাকে। প্রতাপ শৈবলিনীকে ভুলেন নাই বা ভুলিবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এ প্রণয়ের এ জীবনে সফলতা নাই, ইহা বুঝিয়া প্রতাপ প্রাণত্যাগেই উদ্যত হইয়াছিলেন। পরে যখন শৈবলিনীর বিবাহ হইল, চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর স্বামী হইলেন, তখন প্রতাপ বেদগ্রামের সংস্রব ত্যাগ করিলেন। বিবাহ করিয়া সংসারী হইলেন।

বিষয়কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া বোধ হয় শৈবলিনীকে ভুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

প্রতাপ যদিও শৈবলিনীর সংস্রব ত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বিধাতা অন্যরূপ ব্যবস্থা করিলেন। একদিন প্রতাপ শুনিলেন যে শৈবলিনী ইংরাজের নৌকায় বন্দিনী। শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের পত্নী। চন্দ্রশেখর প্রতাপের প্রাণদাতা, গুরু, উপকারী; চন্দ্রশেখর হইতেই প্রতাপের সকল। সুতরাং কৃতজ্ঞ প্রতাপ শৈবলিনীকে উদ্ধার না করিয়া কিরূপে থাকিতে পারেন? প্রতাপ আপনার বীরত্ব ও কৌশলবলে শৈবলিনীর উদ্ধার সাধন করিলেন। এ বীরত্ব ও কৌশল প্রতাপেরই উপযুক্ত।

কিন্তু ইহার পরে প্রতাপ যে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিলেন, তাহার তুলনায় ইংরাজের নৌকায় তাঁহার বীরত্ব তুচ্ছ। শৈবলিনী ভুলক্রমে প্রতাপের গৃহেই আনীতা হইয়াছিলেন। যে কক্ষমধ্যে শৈবলিনী ছিলেন, প্রতাপ অতর্কিতে সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যাইয়া কি দেখিলেন?

"দেখিলেন পালঙ্কে শয়ানা শৈবলিনী"

* * যেন "শ্বেত শয্যার উপরে কে নির্ম্মল প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে; যেন বর্ষাকালে গঙ্গার স্থির শ্বেতবারি-বিস্তারের উপর কে প্রফুল্ল শ্বেতপদ্মরাশি ভাসাইয়া দিয়াছে। মনোমোহিনী স্থির শোভা।"

"দেখিয়া প্রতাপ সহসা চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না।" "অনেকদিনের কথা তাঁহার মনে পড়িল—অকস্মাৎ স্মৃতি-তরঙ্গ মথিত হইয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ প্রহত হইতে লাগিল।" এই সেই শৈবলিনী—এই সেই তাহার সঙ্গিনী বাল্যসখী—যাহার সঙ্গে তিনি নদীতীরে বনমধ্যে কত ক্রীড়া করিয়াছেন, অনন্ত নীলাকাশতলে বসিয়া কত নক্ষত্র-শোভা দেখিয়াছেন,—জাহ্নবীবক্ষে সন্তরণ করিয়া কত আনন্দানুভব করিয়াছেন। যাহার প্রেমের জন্য একদিন তিনি এ পৃথিবী ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন; এখনও যাহার প্রেম হৃদয়ের অন্তঃস্থলে পাষাণ-রেখার ন্যায় অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে—এই সেই শৈবলিনী। আজ আর সে স্ফুটনোন্মুখী কমলকলিকা নহে—আজ পূর্ণযুবতী। বিকশিতা, প্রফুল্লাদিনী পদ্মিনী—জ্যোতির্ম্ময়ী স্থির সৌদামিনী। প্রতাপ চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না। সৌন্দর্য্যমুগ্ধ হইয়া বা ইন্দ্রিয়বশ্যতায় নহে। সাধারণ দুর্ব্বল-হৃদয় মানুষের তাহা হইতে পারিত—হয় ত এই প্রবল আঘাত সে সহ্য করিতে পারিত না। কিন্তু প্রতাপ যে ইন্দ্রিয়জয়ী মহাবীর। তাঁহার হৃদয় বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইল না, তিনি কেবল সহস্র স্মৃতির দ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া অন্যমন বশতঃ সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কিন্তু শৈবলিনী সে বেগ সহ্য করিতে পারিল না। শৈবলিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। প্রতাপ জল আনিয়া মূর্চ্ছিতা শৈবলিনীর মুখমণ্ডলে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। "সে মুখ শিশিরনিষিক্ত পদ্মের মত শোভা পাইতে লাগিল। জল কেশগুচ্ছ সকল আর্দ্র করিয়া, কেশগুচ্ছ সকল ঋজু করিয়া ঝরিতে লাগিল, কেশ পদ্মাবলম্ব শৈবালবৎ শোভা পাইতে

লাগিল।" এইরূপ মূর্চ্ছিতা, আর্কেশা সুন্দরীর শোভা গোবিন্দলাল একবার দেখিয়াছিলেন, দেখিয়া গোবিন্দলালের চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়াছিল--তাঁহার সর্ব্বনাশের বীজ রোপিত হইয়াছিল। প্রতাপও দেখিলেন। কিন্তু প্রতাপ গোবিন্দলাল নহেন। ইন্দ্রিয়-দমী প্রতাপ তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না।

সংজ্ঞাপ্রাপ্তা শৈবলিনী যাহা যাহা বলিল তাহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতাপ বলিলেন "তোমার মরণই ভাল।"

শুনিয়া শৈবলিনী কাঁদিল। পরে বলিল "আমার মরাই ভাল—কিন্তু অন্যে যাহা বলে বলুক, তুমি আমায় এ কথা বলিও না। আমার এ দুর্দ্দশা কাহা হতে? তোমা হতে। কে আমার জীবন অন্ধকারময় করিয়াছে? তুমি। কাহার জন্য সুখের আশায় নিরাশ হইয়া কুপথ সুপথ জ্ঞানশূন্য হইয়াছি? তোমার জন্য। কাহার জন্য আমি গৃহমধ্যে মন রাখিতে পারিলাম না? তোমারই জন্য। তুমি আমায় গালি দিও না।"

প্রতাপ বলিলেন, "তুমি পাপিষ্ঠা, তাই তোমায় গালি দিই। আমার দোষ ঈশ্বর জানেন, আমি কোন দোষে দোষী নহি। ঈশ্বর জানেন, ইদানীং আমি তোমাকে সর্প মনে করিয়া, ভয়ে তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম। তোমার বিষের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম। তোমার নিজের হৃদয়ের দোষ, তোমার প্রবৃত্তির দোষ। তুমি পাপিষ্ঠা, তাই আমার দোষ দাও। আমি তোমার কি করিয়াছি?"

শৈবলিনী গর্জ্জিয়া উঠিল--বলিল "তুমি কি করিয়াছ? কেন তুমি, তোমার ঐ অতুল্য দেবমূর্ত্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে? আমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনকালে ওরূপের জ্যোতিঃ কেন আমার সম্মুখে জ্বালিয়াছিলে? যাহা একবার ভুলিয়াছিলাম, আবার কেন তাহা উদ্দীপ্ত করিয়াছিলে? আমি কেন তোমাকে দেখিয়াছিলাম? দেখিয়াছিলাম ত তোমাকে পাইলাম না কেন? না পাইলাম ত মরিলাম না কেন! তুমি কি জান না, তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল। তুমি কি জাননা যে, তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে যদি কখনও তোমাকে পাইতে পারি, এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি। নহিলে কষ্টের আমার কে?"

কি হৃদয়োন্মাদকরী চিত্তবিভ্রমজনক কথা! গ্রীকদেশের পৌরাণিক কাহিনীতে সাইরেনের গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। তাহাদের স্বর ও সঙ্গীত এমনই মধুর যে সহজেই মনুষ্য তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে এবং শেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এমন কি গ্রীকবীর জ্ঞানী ইউলিসিস পর্য্যন্ত সেই মোহে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছিলেন। প্রতাপও সেইরূপ 'সাইরেনের' মোহনবাণী শুনিলেন। সেই বাল্যপ্রণয়িনী, সুন্দরী, পূর্ণযুবতী, তাঁহার প্রেমপীড়িতা শৈবলিনীর মুগ্ধকরী কথা শুনিলেন।—শুনিলেন যে শৈবলিনী তাঁহারই প্রেমবহ্নিতে দগ্ধ হইতেছে; তাঁহারই জন্য গৃহধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে। তিনিই তাহার ধ্যান, তিনিই তাহার জ্ঞান। ইহা সহ্য করা বুঝি প্রতাপের পক্ষেও কঠিন হইয়া

উঠিল, বুঝিতিনি নিজ হৃদয়ের দৃঢ়তার প্রতি ঈষৎ সন্দিহান হইলেন। তাই প্রতাপ সেখানে আর দাঁড়াইতে সাহস করিলেন না—বা পারিলেন না। 'বৃশ্চিকদষ্টের ন্যায় পীড়িত হইয়া সে স্থান হইতে বেগে পলায়ন করিলেন।' যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন কাপুরুষতা বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু এই প্রলোভনের যুদ্ধ—ইহা হইতে পলায়নই সময় বিশেষে বীরত্ব। প্রতাপের এই পলায়নেও বীরত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রতাপ পলায়ন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে গভীর চিন্তার রেখা পড়িল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে শৈবলিনী তাঁহাদের বাল্যপ্রণয় আজও ভুলিতে পারে নাই। বরং তাহা বৃদ্ধি পাইয়া প্রবল আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হইয়াছে। বুঝিতে পারিলেন যে শৈবলিনী সম্পূর্ণ তন্ময়প্রাণা, তাঁহার প্রেমে আত্মবিস্মৃতা, হিতাহিতজ্ঞান-শূন্যা।—তাঁহার জন্যই স্বামী ত্যাগ করিয়া, গৃহ ত্যাগ করিয়া দুঃসাহসিকের মত ইংরাজের নৌকায় আসিয়াছে। প্রতাপ বড় চিন্তিত হইলেন, শৈবলিনী কেবল পরস্ত্রী নয়—তিনি তাঁহার গুরু, প্রাণদাতা চন্দ্রশেখরের পত্নী। তাঁহার জন্য চন্দ্রশেখরের গৃহে সুখ নষ্ট হইবে—চন্দ্রশেখরের কলঙ্ক রটিবে? না প্রতাপ তাহা হইতে দিবেন না। শৈবলিনীকে ফিরাইতে হইবে—তাঁহার প্রতি শৈবলিনীর যে প্রেম তাহা তাহাকে জোর করিয়াও ভুলাইতে হইবে।

প্রতাপ ইংরাজের নৌকায় বন্দী হইলেন, কিন্তু শৈবলিনীর কৌশলে উভয়ে পলায়ন করিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। যখন সেই "অনন্তদেশব্যাপিনী, বিশালহৃদয়া, ক্ষুদ্র বীচিমালিনী নীলাম্বরময়ী তটিনীর বক্ষে চন্দ্রকর সাগর মধ্যে ভাসিতে ভাসিতে, প্রতাপ ও শৈবলিনী উভয়ে সাঁতার দিতেছিলেন, তখন প্রতাপের পূর্ব্বকথা মনে পড়িল,—মনে পড়িল আর একদিন এমনই দুইজনে সাঁতার দিয়াছিলেন, ভাবিলেন এই ত সময়—এই সময়ে শৈবলিনীকে ফিরাইতে চেষ্টা করিতে হইবে। প্রতাপ বুঝিয়াছিলেন যে শৈবলিনী সম্পূর্ণরূপে তাঁহার প্রেমবিহ্বলা।—তাঁহার জন্য শৈবলিনী অনায়াসে প্রাণ ত্যাগ করিতে পারে—প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম যে প্রেম তাহাও বোধ হয় তাঁহার জন্য ত্যাগ করিতে পারিবে। প্রতাপ সেই দুঃসাহসিক কার্য্যের জন্য সংকল্প করিলেন:

প্রতাপ শৈবলিনীকে বলিলেন "মনে আছে যে আমি মনে করিলে ডুবিতে পারি?"

শৈবলিনী শঙ্কিতা হইয়া বলিল "কেন প্রতাপ? চল তীরে উঠি।"

প্র। আমি উঠিব না। আজি মরিব। প্রতাপ কাষ্ঠ ছাড়িল।

শৈ। কেন প্রতাপ?

প্র। তামাসা নয়—নিশ্চিত ডুবিব—তোমার হাত।

শৈ। কি চাও প্রতাপ? যা বল তাই করিব।

প্র। একটী শপথ কর, তবে আমি উঠিব।

শৈ। কি শপথ—প্রতাপ?

প্র। এই গঙ্গার জলে—

শৈ। আমার গল্প কি ?

প্র। তবে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বল—

শৈ। আমার ধর্ম্মই বা কোথায় ?

প্র। তবে আমার শপথ ?

প্রতাপ বুঝিলেন যে শৈবলিনীর ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ধ্যান-ধারণা সকলই তিনি। ধর্ম্মের জন্য কিছুই সে করিবে না—কিন্তু তাঁহার জন্য সকলই করিতে পারে। তাই বলিলেন 'তবে আমার শপথ।'

শৈ। কাছে আইস—হাত দাও।

প্রতাপ নিকটে গিয়া বহুকাল পরে শৈবলিনীর হাত ধরিলেন।

শৈবলিনী বলিল "এখন যে কথা বল, শপথ করিয়া বলিতে পারি—কতকাল পরে প্রতাপ ?"

প্র। আমার শপথ কর, নহিলে ডুবিব। কিসের জন্য প্রাণ ?

শৈ। তোমার শপথ, কি বলিব—তুমি যা বলিবে, ইহজন্মে তাহাই আমার স্থির।

প্রতাপ অতি ভয়ানক শপথের কথা বলিলেন। কি শপথ কবি তাহা বলেন নাই। কিন্তু আমাদের তাহা বুঝিতে বাকী থাকে না। তাঁহাকে একেবারে ভুলিতে হইবে—তাঁহার ভালবাসা, তাঁহার স্মৃতি শৈবলিনী একেবারে ত্যাগ করিবে—শৈবলিনীকে এই শপথ করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু হায় এ যে শৈবলিনীর পক্ষে 'অসাধ্য, প্রাণান্তকর' শপথ। শৈবলিনী বরং প্রাণ ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু এ শপথ কিছুতেই করিতে পারিবে না। বলিল "এ সংসারে আমার মত দুঃখী কে আছে প্রতাপ ?" প্রতাপ বলিলেন "আমি।" বাস্তবিকই ত প্রতাপের মত দুঃখী আর কে আছে ? এইরূপ হৃদয়বিদারক কথা যাহাকে শুনিতে হয় বাস্তবিক তাহার মত দুঃখী আর কে আছে ? ইহা শুনিয়া কাহার না চিত্ত বিচলিত হয়—কাহার না জীবন—সমাজ—ধর্ম্ম সকলই অসার বোধ হয়। কিন্তু বীর প্রতাপ ইহাতেও বিচলিত হইলেন না। তিনি আজ স্থিরসঙ্কল্প করিয়াছিলেন—সে সঙ্কল্প হইতে কিছুতেই বিচ্যুত হইলেন না। বলিলেন "আইস তবে দুজনে ডুবি।" কিন্তু তাহার জন্য প্রতাপ ডুবিবে, শৈবলিনী তাহা কিরূপে সহ্য করিবে ? প্রতাপ যে শৈবলিনীর প্রাণাপেক্ষাও প্রাণ। বলিল "আমি শপথ করিব। কিন্তু তুমি একবার ভাবিয়া দেখ। আমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতেছ, আমি তোমাকে চাহি না, তোমার চিন্তা কেন ছাড়িব ?" জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন শেষ তৃণ গাছি পর্য্যন্ত অবলম্বনের জন্য হতাশভাবে আঁকড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করে, শৈবলিনী সেইরূপ বলিল "আমি তোমাকে চাহি না—তোমার চিন্তা কেন ছাড়িব ?" কিন্তু প্রতাপ তাহাতেও রাজি নহেন, অত টুকু পর্য্যন্ত তিনি শৈবলিনীকে রাখিতে দিবেন না। সম্পূর্ণভাবে তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। প্রতাপ আবার ডুবিতে চেষ্টা করিলেন। অগত্যা শৈবলিনী সেই ভয়ঙ্কর শপথ করিল। বলিল "শুন, তোমার শপথ ! আজি হইতে তোমাকে ভুলিব। আজি হইতে আমার সর্ব্বসুখ জলাঞ্জলি। আজি হইতে আমি মনকে দমন করিব। আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।" প্রতাপের সংকল্প সিদ্ধ হইল। গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন "চল তীরে উঠি।"

হায়, প্রতাপের হৃদয় কে বুঝিবে? সম্মুখে বালাপ্রণয়িনী, তাহারই প্রেমে বিহ্বলা যুবতী, প্রাণাপেক্ষা প্রিয় যে প্রেম, তাহাই ত্যাগ করিতে যাইয়া, মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে; ছিন্নমুণ্ড ছাগ যেমন 'ধড়ফড়' করিতে থাকে তেমনই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।—আর প্রতাপ তাহাই দেখিতেছেন!—কর্ত্তব্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, পরের মঙ্গলের জন্য সমস্তই অবিচলিতচিত্তে দেখিতেছেন। দৃষ্টের তুলনা নাই—এ বীরত্বের সীমা নাই। ঊর্ব্বশী-কথী অর্জ্জুনের বীরত্বেরও বোধ হয় ইহার সঙ্গে তুলনা হয় না।

ইহার পরে শৈবলিনী নিরুদ্দিষ্টা হইলেন। প্রতাপ শৈবলিনীর সন্ধান না পাইয়া চঞ্চল হইলেন। তৎপর হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হইল। মনে করিলেন লরেন্স ফষ্টরই এই সব বিপত্তির মূল। সে না হইলে শৈবলিনী সম্ভবতঃ গৃহত্যাগ করিত না, চন্দ্রশেখরের সর্ব্বনাশ হইত না—এত দুর্ঘটনাও ঘটিত না। লরেন্স ফষ্টর হইতে সমস্ত ইংরাজ জাতির উপর প্রতাপের ক্রোধ হইল। মনে করিলেন ইংরাজ জাতিকে বঙ্গদেশ হইতে তাড়াইতে হইবে। সে সময় মীরকাসিমের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ চলিতেছিল। প্রতাপ দলবল লইয়া মীরকাসিমের সহিত যোগ দিলেন।

উদয়নালার যুদ্ধে প্রতাপ যখন তাঁহার সৈন্যাগ্রভাগে অশ্ব ছুটাইয়া চলিতেছেন তখন রমানন্দ স্বামী, চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর সঙ্গে দেখা হইল। প্রতাপ তাঁহাদিগকে নিরাপদ স্থানে লইয়া গেলেন। তৎপূর্ব্বে শৈবলিনী কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিয়া রমানন্দ স্বামীর যোগবলে শুদ্ধচিত্তা হইয়াছে। সে তখন স্বামীতে চিত্তসমর্পণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে প্রতাপকে একপাশে ডাকিয়া লইয়া বলিল "স্বামী যদি আমায় পুনর্ব্বার গ্রহণ করেন, তবে মনের পাপ লুকাইয়া রাখিয়া তাঁহার প্রণয়ভাগিনী হওয়া কি উচিত হয়?"

প্র। কি করিতে চাও?

শৈ। পূর্ব্বকথা সকল তাঁহাকে বলিয়া ক্ষমা চাহিব।

প্রতাপ চিন্তা করিলেন, বলিলেন, "বলিও। আশীর্ব্বাদ করি তুমি এবার সুখী হও!" এই বলিয়া প্রতাপ নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এ অশ্রুবিসর্জ্জন সুখের। শৈবলিনী যে তাঁহাকে ভুলিয়া সুখী হইতে পারিবে—এই মনে করিয়া প্রতাপের আনন্দ হইল—প্রতাপ সুখী হইলেন। এ অশ্রু দেবতার অশ্রু। কিন্তু শৈবলিনী আবার বলিল—"আমি সুখী হইব না। তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই"—

প্র। সে কি শৈবলিনী?

শৈ। যতদিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার; কতদিন বশে থাকিবে জানি না। এ জন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।"

প্রতাপ আর সেখানে দাঁড়াইলেন না। দ্রুতবেগে অশ্ব ছুটাইয়া রণক্ষেত্রে ধাবমান্ হইলেন। চন্দ্রশেখর তাঁহাকে অনেক নিষেধ করিলেন—অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু প্রতাপ শুনিলেন না। কেন প্রতাপ এরূপ করিলেন? চন্দ্রশেখর যাহা মনে করিয়া-

ছিলেন শুধু কি সেই জন্য? শুধু কি ললাটের উপর ক্রোধের বশবর্তী হইয়া? তাহার উত্তর সম্মুখযুদ্ধে পতিত মুমূর্ষু প্রতাপ রমানন্দ স্বামীকে নিজেই দিতেছেন—

"শৈবলিনী বলিয়াছিল যে, এ পৃথিবীতে আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না হয়। আমি বুঝিলাম, আমি জীবিত থাকিতে শৈবলিনী বা চন্দ্রশেখরের সুখের সম্ভাবনা নাই। যাহারা আমার পরম প্রীতিপাত্র, যাহারা আমার পরমোপকারী, তাহাদিগের সুখের কণ্টকস্বরূপ আমার এ জীবন রাখা অকর্তব্য বিবেচনা করিলাম। তাই আপনাদিগের নিষেধসত্ত্বেও এ সমরক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিতে আসিয়াছিলাম। আমি থাকিলে শৈবলিনীর চিত্ত কখনও না কখনও বিচলিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমি চলিলাম।"

ধন্য প্রতাপ—ধন্য বীর যুদ্ধক্ষেত্রে অসি হস্তে তুমি যে বীরত্ব দেখাইয়াছিলে, এ বীরত্ব তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক!

প্রতাপের কথা শুনিয়া রমানন্দ স্বামীর চক্ষে জল আসিল; বলিলেন, "এ সংসারে তুমিই যথার্থ পরহিতব্রতধারী। আমরা ভণ্ড মাত্র।.....ব্রহ্মাণ্ডজয় তোমার এই ইন্দ্রিয়-জয়ের তুল্য হইতে পারে না—তুমি শৈবলিনীকে ভালবাসিতে?"

"সুপ্তসিংহ যেন জাগিয়া উঠিল। সেই শার্দূলাকার প্রতাপ, বলিষ্ঠ, চঞ্চল, উন্মত্তবৎ হুহুঙ্কার করিয়া উঠিল—বলিল "কি বুঝিবে, তুমি সন্ন্যাসী; এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে, আমার এ ভালবাসা বুঝিবে? কে বুঝিবে, আজি এই ষোড়শ বৎসর আমি শৈবলিনীকে কত ভাল বাসিয়াছি। পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি—আমার ভালবাসার নাম জীবনবিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা; শিরে শিরে, শোণিতে শোণিতে, অস্থিতে অস্থিতে, আমার অনুরাগ অহোরাত্র বিচরণ করিয়াছে। কখনও মানুষে তাহা জানিতে পারে নাই—মানুষে তাহা জানিতে পারিত না—এই বৃদ্ধাকালে আপনি কথা তুলিলেন কেন? এ জন্মে এ অনুরাগে মঙ্গল নাই বলিয়া এ দেহ পরিত্যাগ করিলাম। আবার মন কলুষিত হইয়াছে—কি জানি শৈবলিনীর হৃদয়ে আবার কি হইবে? আমার বুদ্ধি স্থির ইহার উপায় নাই—এই জন্য মরিলাম।"

এতক্ষণে আমরা প্রতাপের হৃদয়ের পরিচয় তাঁহার নিজ মুখেই পাইলাম। তিনি কি শৈবলিনীকে ভাল বাসিতেন না? বাসিতেন। কিন্তু সে ভালবাসা সাধারণ ভালবাসা নহে। পাপচিত্তে তিনি শৈবলিনীর প্রতি আসক্ত হন নাই—তাঁহার ভালবাসার নাম জীবন বিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা প্রণয়-স্পদের জন্য আত্মবলিদান। ভালবাসিয়া কে কবে ভুলিয়াছে! প্রতাপও তাঁহার বাল্য প্রণয় ভুলেন নাই। এই প্রেম তাঁহার শিরায় শিরায় অস্থিতে অস্থিতে অহোরাত্র জ্বলিয়াছে সেই দুর্জ্জয় অগ্নিকে তিনি ঔর্ব্ব ঋষির ন্যায় হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন—সেই ভীষণ বিষ তিনি নীলকণ্ঠের ন্যায় পরহিতার্থ পান করিয়াছেন! কর্ত্তব্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, পরহিতের জন্য তিনি আপনার হৃদয়ের সহিত অহোরাত্র যুদ্ধ করিয়াছেন। এ বীরত্বের তুলনা নাই, এ আত্মসংযমের মূল্য নাই। শুরু, নীতিবিৎ বলিতে পারেন ইহাতে আর কি হইল? ইহাতে যে প্রতাপ রিপুর বশবর্ত্তী

দুর্ব্বল মানব ইহাই প্রত্যক্ষ পাইল। তিনি শৈবলিনীকে ভুলিতে পারেন নাই—তাঁহার প্রেমকে বিসর্জ্জন দিতে পারেন নাই। তবে আর তাঁহার কি বীরত্ব রহিল? তাঁহার চিত্ত ত কলুষিত, কিন্তু মানবহৃদয়দর্শী বলিবেন যে, প্রতাপ যদি শৈবলিনীকে একেবারে ভুলিতে পারিতেন—তাঁহার প্রেম যদি অদর্শনে হৃদয় হইতে একেবারে মুছিয়া যাইত, তবে প্রতাপ হয় দানব, অথবা দেবতা হইতে পারিতেন—মানুষ হইতেন না। আমরা দানব বা দেবতা চাই না—আমার মানুষ চাই। আত্মজয়ী, ইন্দ্রিয়দমী, ত্যাগী, বীর মনুষ্য চাই। ভগবান্ মানুষকে শত্রুবেষ্টিত করিয়া দিয়াছেন। সেই শত্রু সকলকে জয় করিয়া যে আপনার বীরত্ব দেখাইতে পারে, আমরা এমন আদর্শ চাই। মানব হৃদয়বিৎ কবি যথার্থই বলিয়াছেন—

" বিকার হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।
(কুমারসম্ভবম্)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও উপদিষ্ট হইয়াছে—

যততোহপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥
(গীতা)

এই সমস্ত ভাবিয়া আমাদেরও রমানন্দ স্বামীর ন্যায় প্রতাপকে বলিতে ইচ্ছা করে—"ইন্দ্রিয়জয়ে যদি পুণ্য থাকে, তবে অনন্ত স্বর্গ তোমারি। যদি চিত্তসংযমে পুণ্য থাকে, তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান্ নহেন। যদি পরোপকারে স্বর্গ থাকে তবে দধীচির অপেক্ষাও তুমি স্বর্গের অধিকারী।"

এই পুণ্যচরিত্র বোধ হয় জগতের সাহিত্যে অতুলনীয়। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন "এই চরিত্র লিখিতে লিখিতে তাঁহার লেখনী পুণ্যময়ী হইবে।" আমরাও বলি এই মহৎচরিত্রের আলোচনায় আমাদের অকিঞ্চিৎকর লেখনীও আজ ধন্য হইল।

চিত্তসংযম ও আত্মজয়ে যে বীরত্ব তাহার আর এক চিত্র "রজনী"র লবঙ্গলতা। লবঙ্গলতা যখন কিশোরী সেই সময়ে অমরনাথের সঙ্গে প্রায়ই তাহার সাক্ষাৎ হইত। অমরনাথের নিকট লবঙ্গলতা "ক'য়ে করাত, ব'য়ে ঘরাত" লিখিতেন। তাঁহাদের পরস্পরের বিবাহ সম্বন্ধের কথাও হইয়াছিল। লবঙ্গলতা উদ্ভিন্নযৌবনা—স্ফুটনোন্মুখী গোলাপকলিকা;—তাহার হৃদয়ের বৃত্তিরাশি সুকোমল কুসুমের দলমালার ন্যায় কেবল ফুটিয়া উঠিতেছে। এই সময়ে অমরনাথ—শিক্ষিত, অশেষ রূপগুণশালী, যুবক অমরনাথ—লবঙ্গলতার দৃষ্টিপথে পড়িলেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। অমরনাথের ন্যায় লবঙ্গলতার হৃদয়েও প্রেমের সঞ্চার হইল। এই প্রেমের পরিচয় একান্তে আমরা বিশেষ কিছুই পাই না—কিন্তু পরে নানা ঘটনায় আমরা ইহা বুঝিতে পারি।

কিন্তু বাল্যপ্রেমে বোধ হয় অভিশাপ আছে। কোন বিশেষ কারণে অমরনাথের সঙ্গে লবঙ্গলতার বিবাহ হইল না। তৎপরিবর্ত্তে তিনি ষষ্টিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ রামসদয় মিত্রের দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী হইলেন। একে লবঙ্গলতা প্রণয়ে নিরাশ

হইলেন ; তার পর তিনি যুবতী, রূপসম্পন্ন বৃদ্ধ। এরূপ ক্ষেত্রে একজন হৃদয়হৃদয়া সাধারণ রমণীর পক্ষে অবস্থা বড় শোচনীয় হইতে পারিত। তাহার হৃদয় অশান্তিপূর্ণ ও জীবন বিষময় হইয়া উঠিত। "চন্দ্রশেখরে"র শৈবলিনী এইরূপ অবস্থার দৃষ্টান্ত। কিন্তু লবঙ্গলতা অসাধারণ স্ত্রীলোক—তাঁহার হৃদয়ের বল অসীম। তিনি এই বৃদ্ধের গৃহে আসিয়াও নিপুণা গৃহিণী হইলেন—দেবতার ন্যায় সেই বৃদ্ধ স্বামীর সেবা করিয়া পাতিব্রত্যধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। শুধু তাই নয়, সেই বৃদ্ধকে লবঙ্গলতা ভাল বাসিতেনও —তরুণী যেমন তরুণকে ভালবাসে, তেমনই ভাল বাসিতেন। রজনীর কথায় "লবঙ্গ বাস্তবিক গুণবতী। গৃহকার্য্যে নিপুণা, দানে মুক্তহস্তা, হৃদয়ে সরলা, কেবল বাক্যে বিষময়ী। লবঙ্গলতার অশেষ গুণের মধ্যে, একটী এই যে, তিনি বাস্তবিক পিতামহের তুল্য সেই স্বামীকে ভাল বাসিতেন—কোন নবীনা নবীন স্বামীকে সেরূপ ভাল বাসেন কি না সন্দেহ।"

আবার এদিকে লবঙ্গলতা সপত্নীকে পর্য্যন্ত সেবা করিতেন, তাঁহাকে স্বহস্তে রাঁধিয়া খাওয়াইতেন। সতীন-পুত্রকে নিজ পুত্রের ন্যায়ই ভাল বাসিতেন। তাঁহার হৃদয়ের দৃঢ়তা অসীম, সঙ্কল্প অটল, বুদ্ধি সর্ব্বব্যাপিনী, দারিদ্র্যে তিনি ভয় করিতেন না, দুঃখে তিনি ভাঙ্গিয়া পড়েন না, বিপদে তিনি ধৈর্য্য হারান না। তাঁহার আনন্দের ত কখনই অভাব হয় না। তিনি সদানন্দময়ী। তাঁহার মুখে হাসি নাই, এরূপ কেহ কখনও দেখে নাই। যখন অমরনাথ বহুদিন পরে লবঙ্গলতাকে আবার দেখিলেন তখন বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন লবঙ্গলতার "সে হাসি তেমনই ছিল। পূর্ণিমার সমুদ্রে ক্ষুদ্র তরঙ্গের তুল্য, সপুষ্প বসন্তলতার আন্দোলন তুল্য, তাহা হইতে সুখ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।" অমরনাথ ভাবিলেন এ কি "বিচিত্রচরিত্রা রমণী"—ইহাকে আমি কোন দিনই বুঝিতে পারিলাম না।

কিন্তু এই যে হাসি, ইহার মধ্যে কি কোথায়ও অশ্রু লুকাইয়া ছিল না? এই যে হৃদয়ভরা আনন্দ, ইহার মধ্যে কি কোথায়ও দুঃখের ছায়া লেশমাত্রও পড়ে নাই? লবঙ্গলতা কি অমরনাথকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন! তাঁহার সেই বাল্যপ্রেম, সেই কৈশোরের প্রথম স্বপ্ন সেই তরুণ জীবনের সুখময় স্মৃতি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলেন? যদি তাহা হইতেন তবে লবঙ্গলতাকে আমরা মানবী বলিতাম না—দেবী বা দানবী বলিতে পারিতাম। কিন্তু লবঙ্গলতা তাহা ভুলিতে পারেন নাই। অকৃত্রিম প্রেমকে কখনও ভোলা যায় না। সেই প্রেম তাঁহার হৃদয়ে আরও গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। বাহিরে তিনি সদানন্দময়ী, হাসির উৎস; কিন্তু অন্তরের অন্তরে তাঁহার ন্যায় দুঃখী কে? তিনি কিরূপে তাঁহার হৃদয়কে প্রতিনিয়ত দমন করিয়া রাখিতেন তাহা কে বুঝিবে? অমরনাথের প্রতি তাঁহার প্রেমের পরিমাণ কে করিবে? শচীন্দ্রের প্রেমমুগ্ধা রজনী যখন বলিল "ঠাকুরাণি, তোমাদের চক্ষু

আছে, চক্ষু থাকিলে এত ভালবাসা বাসিতে পারে কি? লবঙ্গলতা প্রকাশ্যে উত্তর দিলেন "না রজনী আমার বুড়া স্বামী, আমি অত শত জানি না।" কিন্তু মনে মনে বলিলেন "কানি তুই ভালবাসার জানিস্ কি? তুমি লবঙ্গলতার অপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী।" লবঙ্গলতা এইটুকু মাত্র বলিয়াছেন কিন্তু ইহার মধ্যেই আমরা কত অর্থ পাইতেছি, এই এক কথাতেই তাঁহার হৃদয়ের পরিচয় যত খানি বাহির হইয়া পড়িয়াছে, সহস্র বাক্য-রচনা দ্বারাও আমরা তাহা প্রকাশ করিতে পারিব না।

লবঙ্গলতা এই গোপন হৃদয়ের কথা, এই গভীর প্রেমের কথা কোনদিনই ত প্রকাশ করেন নাই। এ জগতের কেহ সে বিচিত্র হৃদয়ের কথা জানিতে পারে নাই এমন কি অমরনাথও তাহা জানিতেন না। অমরনাথ জানিতেন তিনিই লবঙ্গলতাকে ভালবাসেন; কিন্তু লবঙ্গলতা যে তাঁহাকে ভালবাসে, তাহা তিনি বুঝেন নাই। লবঙ্গলতার এই যে প্রেম ইহা নিষ্কাম—কাম গন্ধশূন্য। ইহাতে বাসনার লেশ মাত্র নাই, প্রেমাস্পদের প্রেমও ইহার লোভের বস্তু নহে। এই প্রেমকে চিরদিনই তিনি অন্তরের অন্তরে, হৃদয়ের নিভৃত মন্দিরে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। কোন দিনই তাহা তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই, তাঁহার অসীম ধৈর্য্য কোনদিনই টলে নাই কেবল একদিন বুঝি লবঙ্গলতার হৃদয় ঈষৎ বিচলিত হইয়াছিল একদিনের জন্য অমরনাথ সেই জীবনব্যাপী প্রেমের, ঈষৎ সন্ধান পাইয়াছিলেন। কিন্তু সেই প্রথম ও সেই শেষ!

অমর নাথ কলিকাতা ত্যাগ করিতেছেন শুনিয়া লবঙ্গলতা বলিলেন "তুমি না কি কলিকাতা হইতে উঠিয়া যাইতেছ?"

অ। যাইব।

ল। কেন?

অ। যাইব না কেন? আমাকে যাইতে বারণ করিবার ত কেহ নাই।

ল। যদি আমি বারণ করি?

অ। আমি তোমার কে যে বারণ করিবে?

ল। তুমি আমার কে? তা ত জানি না। এই পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—

লবঙ্গলতা আর কিছুই বলিল না। অমরনাথ ক্ষণিক অপেক্ষা করিয়া বলিল "যদি লোকান্তর থাকে তবে?"

ল। আমি স্ত্রীলোক সহজে দুর্ব্বলা। আমার কত বল—দেখিয়া তোমার কি হইবে? আমি ইহাই বলিতে পারি। আমি তোমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।"

অমরনাথ বড় বিচলিত হইলেন, গত কথার উল্লেখ করিলেন, লবঙ্গও বড় অনুতপ্ত হইল। পরে অমরনাথ আবার বলিলেন "আমি আর আসিব না, আর কখনও তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না। কিন্তু যদি কখন ইহার পরে শোন যে অমরনাথ কুচরিত্র নহে, তবে তুমি আমার প্রতি একটু—অনুমাত্র—স্নেহ করিবে?"

ল। তোমাকে স্নেহ করিলে আমি ধর্ম্মে পতিত হইব।

অ। না, আমি সে স্নেহের ভিখারী আর নহি। তোমার এই সমুদ্রতুল্য হৃদয়ে কি আমার জন্য একটুকু স্থান নাই?

ন। না—যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও, তাঁহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই। লোকে পাখী পুষিলে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখন হইবে না।

আমরা এই একবার মাত্র লবঙ্গলতাকে বিচলিত হইতে দেখি, একবার মাত্র তাঁহার গভীর প্রেমের একটুমাত্র আভাস পাই। কিন্তু লবঙ্গলতার এই প্রেম সম্পূর্ণ নিষ্কাম, স্বার্থবর্জ্জিত, কামগন্ধশূন্য। ইহা লোক-চক্ষুর অন্তরালে ভাল বাসিয়াই সুখী—সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াই সুখী। ইহা ভালবাসার প্রতিদানের প্রত্যাশা করে না। তাই এ প্রেম ইহলোকের নয়। এ প্রেম পরলোকের 'অতি বিশুদ্ধ, পবিত্র, মহান্'। ইহলোকে কর্ত্তব্যই—পাতিব্রত্য ধর্ম্মই—লবঙ্গের সারা-জীবন অধিকার করিয়াছে। যদি পরলোক থাকে তবেই এই প্রেম প্রকৃতরূপে সার্থক হইয়া উঠিবে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

হিন্দুর ধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা

জগতে যেমন আর দশটা ধর্ম্ম আছে, হিন্দুর ধর্ম্ম যদি তারই মতন একটা বিশেষ ধর্ম্ম হইত, তবে এ ধর্ম্মের উৎপত্তি কোথায়, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন হইত না। যাহা বিশেষ তাহা সর্ব্বদাই দেশ এবং কালের দ্বারা অপরাপর বিশিষ্ট পদার্থ হইতে পৃথক্ হইয়া রহে। দেশ ও কালগত এই পরিচ্ছিন্নতা বিশিষ্ট পদার্থমাত্রেরই সাধারণ ধর্ম্ম। এই জন্য যে সকল ধর্ম্ম জগতের আর দশটা ধর্ম্মের মতই একটা বিশেষ ধর্ম্মমাত্র, তাহার উৎপত্তি নির্ণয় করা সহজ। বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়, মুসলমান্ প্রভৃতির জন্মকথা জানা আছে: বিশেষ কালে বিশেষ দেশে, মহাত্মা যীশুখৃষ্ট হইতে খৃষ্টীয়ান্, হজরত্ মহম্মদ্ হইতে মুসলমান্, এবং ভগবান্ বুদ্ধদেব হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা সকলেই জানেন। এ সকল ধর্ম্ম যতই কেন অনন্তসাধারণ শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করুন না, কিছুতেই বিশিষ্ট পদার্থের যে দায় তাহা এড়াইতে পারেন না। আর কখনো কোনো বিশিষ্ট বস্তু আপনার মধ্যে অপর কোনো বিশিষ্ট বস্তুর স্থানও করিতে পারে না। বিশিষ্টে বিশিষ্টে যখনই কোনো সম্মিলন হয়, তখনই তাহাদিগকে উভয়ের অতীত কোনো এক সাধারণ ভূমিতে যাইয়া দাঁড়াইতে হয়। এইরূপ কোনো সাধারণ তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে, বিশিষ্টের সঙ্গে বিশিষ্টের তুলনা হইতেই পারে না এবং যেখানে পরস্পরের সঙ্গে তুলনা অসম্ভব, সেখানে কে শ্রেষ্ঠ এবং কে নিকৃষ্ট ইহার বিচারও সম্ভব হয় না। বৌদ্ধ, খৃষ্টীয় বা মহম্মদীয় ধর্ম্ম যখনই অন্য ধর্ম্মের উপরে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে যান, তখনই তাঁহাদিগকে সকল ধর্ম্মের মধ্যে যে সাধারণ তত্ত্ব আছে, সেই সকল তত্ত্বের অধীনতা

স্বীকার করিয়া অপরাপর ধর্ম্মের সঙ্গে সেই এক ভূমিতে যাইয়া দাঁড়াইতে হয়। জগতের অন্যান্য ধর্ম্মের সঙ্গে তাঁহাদের সমজাতীয়তা স্বীকার না করিলে, খৃষ্টীয় প্রভৃতি ধর্ম্ম কিছুতেই আপনার শ্রেষ্ঠত্বও প্রতিপাদন করিতে পারেন না। হিন্দুর ধর্ম্ম এ জাতীয় ধর্ম্ম নহে। হিন্দু আপনার ধর্ম্মকে কখনো আর দশটা ধর্ম্মের মত একটা বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়া ভাবেন নাই। আর এই কারণেই হিন্দু কদাপি অপর কাহারও ধর্ম্মের সঙ্গে প্রতিযোগিতা বা বিরোধ করিতে যান নাই। ফলতঃ হিন্দু যাহাকে ধর্ম্ম ভাবিয়াছেন, তাহাকে কখনই কেবল আপনারই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন নাই। ধর্ম্ম সম্বন্ধে হিন্দুর এ অহং-অভিমান কখনো দেখা যায় নাই এই জন্য হিন্দু কখনো আপনার ধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম নাম দেন নাই। হিন্দুর ধর্ম্মের মর্ম্ম না বুঝিয়াই বিদেশীয়েরা তাহার এ নামকরণ করিয়াছে। হিন্দু যে বস্তুকে ধর্ম্ম বলিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহাকে সনাতন নাম দিয়াছেন। যাহা সনাতন তাহা নিত্য। দেশকালের দ্বারা তাহা কদাপি আবদ্ধ হয় না। বিশেষ কালে, বিশেষ দেশে অবতার-বিশেষ বা মহাপুরুষবিশেষের দ্বারা যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত বা প্রতিষ্ঠিত হয়,—তাহা যতই কেন শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করুক না, কখনই সনাতনত্ব লাভ করিতে পারে না। সনাতন বস্তুর উৎপত্তি নাই, বিলয়ও নাই, বিকারও নাই পরিণামও নাই। তাহা কালের অধীন নহে, দেশেতেও আবদ্ধ হয় না। তাহা নিখিলজনীন এবং সার্ব্বজনীন। হিন্দু চিরদিনই সনাতন ধর্ম্মের ও বিশ্বধর্ম্মের সাধন করিয়াছেন। সুতরাং কালবিশেষে বা দেশবিশেষে, অবতারবিশেষ বা মহাপুরুষবিশেষ হইতে হিন্দুর ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় নাই।

ফলতঃ বিশেষ কালে, বিশেষ দেশে, বিশেষ অবতার বা বিশেষ মহাজনকে অবলম্বন করিয়া জগতে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মনামক বস্তু প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, হিন্দু সে সকলকে ধর্ম্ম বলিতেই চান না। হিন্দু এ গুলিকে পন্থা বলেন। হিন্দুর চক্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম খৃষ্টীয়ান-ধর্ম্ম, মুসলমান-ধর্ম্ম বলিয়া কোনো বস্তু নাই বৌদ্ধমত ও বৌদ্ধপন্থা, খৃষ্টীয় মত ও খৃষ্টীয় পন্থা, মহম্মদীয় মত ও মহম্মদীয় পন্থা এ সকল ভিন্ন ভিন্ন মত ও পন্থার অস্তিত্বই হিন্দু স্বীকার করেন কিন্তু ধর্ম্মবস্তু মতও নহে, পন্থাও নহে। ধর্ম্মের মধ্যে মতেরও উৎপত্তি হয়, পন্থারও প্রতিষ্ঠা হইয়াই থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া মত বা পন্থা ধর্ম্ম হয় না। ধর্ম্ম-বস্তু অঙ্গী, মত ও পন্থা তার অঙ্গমাত্র। অঙ্গ কখনো অঙ্গীর স্থান অধিকার করিতে পারে না। অঙ্গী এক, কিন্তু তাহার অঙ্গ বহু। এই জন্য হিন্দুর চক্ষে ধর্ম্ম এক, দুই নহে; কিন্তু পন্থা অনেক। ধর্ম্ম-বস্তু নিত্য, সনাতন, সার্ব্বজনীন। কিন্তু এই সনাতন-ধর্ম্ম-সাধনের জন্য যুগে যুগে, দেশে দেশে অনেক পন্থার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ও হইতেছে। জগতের মহাজনেরা কেবল এই সকল বিভিন্ন পন্থারই প্রবর্ত্তক ও প্রতিষ্ঠাতা, ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও প্রতিষ্ঠাতা নহেন। আর এই সকল বিভিন্ন পন্থা

ঘুরিয়া ফিরিয়া, পরিণামে একই পরমপদে পৌঁছিয়াছে। বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়ান্, মহম্মদীয় পন্থা সকলের ন্যায় হিন্দুর সাধনেও অনেক পন্থার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়ান্, মহম্মদীয় পন্থা যেমন অবতার-বিশেষ বা মহাপুরুষ-বিশেষ দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, হিন্দুর ভিন্ন ভিন্ন সাধনপন্থাও সেই-রূপ ভিন্ন ভিন্ন অবতার বা মহাজনের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এ সকল বিবিধ পন্থার প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো বিশেষত্ব আছে। এই সকল বিশেষত্ব আছে বলিয়াই, এক পন্থা অপর পন্থা হইতে স্বতন্ত্র। খৃষ্টীয়ানের বা মুসলমানের পন্থার সঙ্গে তাঁহার আপনার সাধন-পন্থার পার্থক্য আছে বা থাকিতে পারে, হিন্দু এ কথা স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁর ধর্ম্ম এক, আর খৃষ্টীয়ানের বা মুসলমানের ধর্ম্ম অন্য, হিন্দু কখনো এমন অদ্ভুত কথা বলেন না। ধর্ম্ম বস্তু এক, বহু নহে। ধর্ম্মের স্বরূপ এক, কিন্তু তার রূপ অনন্ত। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় ধর্ম্ম-বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন রূপেরই প্রকাশ হইয়াছে, পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। হিন্দু অতি প্রাচীনকালে ধর্ম্মের এই সার্ব্বজনীন তত্ত্বের প্রত্যক্ষ লাভ করিয়াছিলেন। তাই তিনি আপনার ধর্ম্মে এমন অদ্ভুত বিচিত্রতার সমাবেশ করিতে পারিয়াছেন। জগতের আর কোনো ধর্ম্মে এ অদ্ভুত বৈচিত্র্য নাই। আর এই অদ্ভুত বৈচিত্র্যই—হিন্দু যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া জানেন—তাহার সার্ব্বজনীনতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদান করে।

খৃষ্টীয়ান্ প্রভৃতি মতবদ্ধ ধর্ম্ম সার্ব্বজনীনতার দাবি করেন, জানি। অনেক য়ুরোপীয় পণ্ডিত সর্ব্বদা এই দাবির সমর্থনও করিয়া থাকেন। ইঁহারা জগতের ধর্ম্ম সকলকে জাতীয় এবং সার্ব্বভৌমিক, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। যে সকল ধর্ম্ম কোনো জাতিবিশেষেই আবদ্ধ থাকে, যাহারা আপনার অঙ্কে ভিন্ন জাতির লোককে গ্রহণ করে না, সেই সকল ধর্ম্মকে জাতীয় ধর্ম্ম বা National Religion বলিয়া থাকেন। হিন্দু, ইহুদীয় প্রভৃতি প্রাচীন সমাজতন্ত্রে অন্য সমাজের লোককে কতকগুলি মত শিখাইয়া আপনার অঙ্গীভূত করিবার প্রথা নাই। যে হিন্দু বা ইহুদী হইয়া জন্মায় না, কতকগুলি মত মানিয়া লইয়া হিন্দু বা ইহুদীয় সমাজে প্রবেশ করিবার জন্য তাহার পক্ষে কোনো প্রশস্ত পথ নাই। লোকে যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া জানে, হিন্দুজাতিকে সে ধর্ম্ম কিছুতেই অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। ইহুদীয় ধর্ম্মেরও এইরূপ তথাকথিত সংকীর্ণতা আছে, সুতরাং সরাসরি ভাবে ধর্ম্মতত্ত্বের বিচার করিয়া, য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা হিন্দু ও ইহুদীয় প্রভৃতি ধর্ম্মকে জাতীয় ধর্ম্ম বলেন। অন্য পক্ষে বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়ান্ এবং মহম্মদীয় প্রভৃতি মতবদ্ধধর্ম্মে এইরূপ তথাকথিত সংকীর্ণতা নাই বলিয়া, এ সকল ধর্ম্মকে সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম বা Universal Religion বলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম বা খৃষ্টীয়ান্‌ধর্ম্ম বা মুসলমান্-ধর্ম্ম কোনো জাতিবিশেষের মধ্যে আবদ্ধ নহে। যে বৌদ্ধধর্ম্মে, খৃষ্টীয়ান্‌ধর্ম্মে বা মুসলমানধর্ম্মে জন্মায় নাই, সে বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে

পারিবে না, এমন কোনো কথা নাই। যে এ সকল ধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ মতকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে রাজি হয় সে যে দেশে বা যে জাতিতেই জন্ম গ্রহণ করুক না কেন, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমান্ সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে পারে। তাহার জন্ম বা জাতি, এ সকল ধর্ম্মগ্রহণের অন্তরায় হয় না। আর সকলেই ইচ্ছা করিলে বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমান হইতে পারে বলিয়া, য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা এ সকল ধর্ম্মকে সার্ব্বজনীন উপাধি দিয়াছেন। এইরূপ বিচার করিতে যাইয়া হিন্দুসমাজ বলিয়াই যে একটা বস্তু আছে, যে সমাজ অন্যান্য সমাজ হইতে স্বতন্ত্র, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া যে কোনো স্বতন্ত্র বিশেষ ধর্ম্ম নাই, য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা এ কথা ভলাইয়া দেখেন নাই। যদি দেখিতেন, তাহা হইলে হিন্দু যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া জানেন সে ধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা অস্বীকার করিতে তাহাদের সাহস হইত না। ফলতঃ এ সকল য়ুরোপীয় পণ্ডিত বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমান-ধর্ম্মে যে সার্ব্বভৌমিকতা আরোপ করেন, তাহা সার্ব্বভৌমিকতাই নহে। হরদ্দ ইহাকে মতবদ্ধ সার্ব্বভৌমিকতা বা Credal Universalism বলা যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ মতবদ্ধ সার্ব্বভৌমিকতা বা Credal Universalism সত্য বস্তু নহে, সোনার পাথর বাটির ন্যায় একটা স্ববিরোধী শব্দ মাত্র। সত্যকার সার্ব্বভৌমিকতা অন্য জাতীয় বস্তু।

মনুষ্যত্ব বস্তুটা যে সার্ব্বজনীন, এ সম্বন্ধে তো আর কোনো ভুল নাই। আর দেশকাল-নির্ব্বিশেষে, সদ্যোজাত শিশু ও মুমূর্ষু বৃদ্ধ, অসভ্য ভূখু ও সুসভ্য জর্ম্মান্, সকলের মধ্যেই এই মনুষ্যত্ব-বস্তু আছে। তাই বলিয়াই ইহা সার্ব্বজনীন। কারো মধ্যে বা এই বস্তু ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই, কারো মধ্যে বা ফুটিয়া উঠিয়াছে, এইরূপে প্রকাশের তারতম্য আছে, কিন্তু মূলবস্তুর অস্তিত্বের ইতরবিশেষ নাই। আর মনুষ্যমাত্রেরই মধ্যে ইহা আছে বলিয়াই মনুষ্যত্ব-বস্তু সার্ব্বজনীন। সাধন করিয়া, চেষ্টা করিয়া, শিক্ষাদীক্ষার সাহায্যে কেহ বা এই মনুষ্যত্বকে আপনার মধ্যে ভাল করিয়া ফুটাইয়া তুলে বা তুলিতে পারে; আর কেহ বা ফুটাইয়া তুলে না বা তুলিতে পারে না। কিন্তু আত্মচেষ্টায় ইহার উৎকর্ষসাধন সম্ভব হইলেও, কাহারো পক্ষে স্বেচ্ছায় এই মনুষ্যত্বকে ঐকান্তিক ভাবে বর্জ্জন করা বা ইহার বাহিরে যাওয়া সাধ্যায়ত্ত নহে। তুমি ইচ্ছা কর আর না কর, তুমি চাও বা না চাও, মানুষ হইয়া যখন তুমি জন্মিয়াছ, তখনই এই মনুষ্যত্ব-বস্তু তোমার হইয়াছে ও তুমি এই মনুষ্যত্ব-বস্তুর হইয়াছ। এই জন্যই মনুষ্যত্ব বলিতে আমরা যে বস্তুটাকে বুঝি তাহা সার্ব্বজনীন। বুঝি এ বস্তু এমন হইত যে কারো পক্ষে ইহা লাভ করা সম্ভব, কারো পক্ষে অসম্ভব; তাহা হইলে এই মনুষ্যত্ব-বস্তুকে আমরা কখনোই সার্ব্বজনীন বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতাম না। যাহা সর্ব্বত্রই আছে, তাহাই তো সার্ব্বভৌমিক। যাহা সর্ব্বজনে আছে, তাহাই তো সার্ব্বজনীন।

আর এ থাকাটা বস্তুর প্রকৃতিগত হওয়া চাই। যাহা প্রকৃতিগত নয়, তাহা গ্রহণ করা যেমন সম্ভব, বর্জ্জন করাও সেইরূপ সাধ্যপর। যাহা আমি গ্রহণও করিতে পারি, বর্জ্জনও করিতে পারি, তাহার বাহিরে থাকাও আমার পক্ষে সম্ভব। আর আমি ইচ্ছা করিলেই যার বাহিরে থাকিতে পারি, তাহা তো আমাকে অপরিহার্য্যরূপে, অনতিক্রমণীয়ভাবে, অধিকার করিতে পারে না। আর তাহাই যদি না পারিল, এক জনও যদি কোনো কারণে তাহার বাহিরে যায়, বা রহিয়া যাইতে পারে, তবে সে বস্তু আর সার্ব্বজনীন হইতে পারিল কৈ? মনুষ্যত্ব সার্ব্বজনীন, কেননা মনুষ্যমাত্রকেই ইহা অধিকার করিয়া আছে। ইহাকে পরিত্যাগ করা, ইহার অধিকারের বাহিরে যাওয়া কোনো মানুষেরই সাধ্যায়ত্ত নহে যতদিন সে মানুষ রহিল, ততদিন মনুষ্যত্বও তার, সেও মনুষ্যত্বেরই হইয়া রহিবে। ইহাই সার্ব্বজনীন বস্তুর ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের ব্যাঘাত ঘটিলে সে বস্তুর সার্ব্বজনীনতা আর রক্ষিত হয় না।

ইহাই যদি সার্ব্বজনীনত্বের বা সার্ব্বভৌমিকত্বের লক্ষণ হয়, তবে খৃষ্টীয়ান্, মুসলমান্, বৌদ্ধ প্রভৃতি মতবদ্ধ ধর্ম্ম সকল কিছুতেই এই সার্ব্বজনীনত্বের দাবি করিতে পারেন না। প্রথম সর্ব্বজনে খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমান্ বা বৌদ্ধ নহেন। ইচ্ছা করিলেও সকলে হইতে পারেন না। আমি বৌদ্ধ বা খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমান্ মত গ্রহণ করিতে পারি না। আমার মন এ সকলের সত্যে সায় দেয় না। ইহাতে আমার বুদ্ধিহীনতা প্রমাণিত হয় হউক; কিন্তু দুনিয়ায় আমিও যে সর্ব্বজনের মধ্যে একজন, ইহা তো আর অসিদ্ধ হয় না। আর যতদিন না এটী অসিদ্ধ হইয়াছে, ততদিন আমাকে বাহিরে রাখিয়া, কোনো কিছু সার্ব্বজনীনত্বের দাবি করিতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা সত্য সত্য সার্ব্বজনীনতা নয়। এই ক্রীড্যাল্ ইউনিভারস্যালিজম্ (Credal Universalism) এবং সত্য সার্ব্বজনীনতায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

হিন্দুর ধর্ম্ম মতবদ্ধ বা ক্রীড্যাল্ ধর্ম্ম নহে। আপনার মত গ্রহণ করিবার অধিকার সর্ব্বজনকে দিয়া খৃষ্টীয়ান্ প্রভৃতি ধর্ম্ম যে সার্ব্বজনীনতার গৌরব করেন, হিন্দুর ধর্ম্ম সে গৌরব করেন না। অথচ এ জগতে সত্য সত্য সার্ব্বজনীনত্ব যদি কোনো ধর্ম্মে থাকে, তবে এক হিন্দুর ধর্ম্মই কেবল সে দাবি করিতে পারেন। হিন্দুর ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম। ইহা কালাধীন নহে। যাহা কালাধীন নহে, তাহা দেশেও আবদ্ধ হইতে পারে না। সনাতন ধর্ম্ম দেশ-কালের অতীত। আর যাহা দেশ-কালের অতীত, তাহাই সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বজনীন।

আর হিন্দুর ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক বলিয়াই অবতার-বিশেষ বা মহাপুরুষ-বিশেষের দ্বারা এ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। ইহার উৎপত্তি সাধারণ মানব-প্রকৃতি হইতে। হিন্দু বলিতেছেন যে—

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।

মানবের অন্তরে, তাহার চিত্তরূপার নিগূঢ় প্রকৃতির মধ্যে ধর্ম্মের তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। হিন্দু এখানে আপনি যাকে ধর্ম্ম বলিয়া

জানেন, আপনি যাহা আচরণ করেন, আপনি যে ধর্ম্মের অনুসরণ করেন, কেবল তাহারই উৎপত্তির কথা বলিতেছেন না ; কিন্তু ধর্ম্মমাত্রেরই উৎপত্তির কথা কহিতেছেন। কেবল আমার ধর্ম্ম নয়, কেবল তোমার ধর্ম্ম নয়, কেবল হিন্দুর ধর্ম্ম বা মুসলমানের ধর্ম্ম নয়,—সকলেরই যা ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম সত্য সত্যই সার্ব্বজনীন,—যে ধর্ম্ম কাহাকেও বর্জ্জন করে না, কাহাকেও বাহিরে রাখে না,—যে ধর্ম্ম গ্রহণ করা বা না করা, কাহার ইচ্ছার বা চেষ্টার উপরে ঐকান্তিক ভাবে নির্ভর করে না ; কেহ বা জানিয়া কেহ বা না জানিয়া, কিন্তু মানুষমাত্রেই যে ধর্ম্মের অনুসরণ করে,—সেই ধর্ম্মের তত্ত্ব বেদে নাই, কেননা "বেদাঃ বিভিন্নাঃ" ; তাহা স্মৃতিকথিত বিধিনিষেধাদিতে বা আচার-সংস্কারে নাই, কেননা—"স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ" ; তাহা মুনিজনের সিদ্ধান্তে নাই, কেননা "নাসৌ মুনির্যস্ত মতং ন ভিন্নং"। সে ধর্ম্মের তত্ত্ব "গুহায়াং"—মানবের বুদ্ধির ভিতরে, তাহার অন্তঃপ্রকৃতির মূলে, নিহিত রহিয়াছে।

অতএব, হিন্দুর ধর্ম্মের উৎপত্তি কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর মহাভারতের এই উক্তি—"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।" মানবের অন্তঃপ্রকৃতি হইতে তার ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। আর এই মানব-প্রকৃতি যুগপৎ এক হইয়াও বহু। স্বরূপে মানুষ মাত্রেই এক। স্বরূপে হনুও যা, জর্ম্মান্‌ও তাহাই ; অন্‌ও যা' যহুও তাই। "রাম রহিম এক বান্দা।" সাধারণ শারীরধর্ম্ম সকলেরই এক, অথচ এই সাধারণ ভূমিতে, শারীরধর্ম্ম সম্বন্ধেই একে অন্যের মধ্যে অশেষ প্রকারের প্রভেদও রহিয়াছে। অস্থি, চর্ম্ম, রক্ত, মাংস, মেদ প্রভৃতি শরীরের উপাদান ; যকৃৎ, প্লীহা, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, অন্ত্র প্রভৃতি শারীর-যন্ত্র ; এগুলি মোটামোটি সকল মানুষেই সমান। অথচ এই সাধারণ শারীর-ধর্ম্ম থাকা সত্ত্বেও সকল লোকের ধাত তো আর সমান নয়। কারো বা ধাত বায়ু-প্রধান কারো বা পিত্তপ্রধান ; কারো বা শ্লেষ্মা-প্রধান হইয়া থাকে। শরীর সম্বন্ধে যেমন মানুষের মধ্যে একটা সাধারণ ও সার্ব্বজনীন একত্বের সঙ্গে সঙ্গেই, সেই একত্বেরই মধ্যে, সেই একত্বকে বিলোপ করিয়া নয়, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে তাহাকে রক্ষা করিয়াই, অশেষ প্রকারের বৈচিত্র্যও রহিয়াছে ; মন সম্বন্ধেও সেইরূপ। মানুষের শরীরের উপকরণ ও যন্ত্র সকল যেমন মোটের উপর একই প্রকারের, মনের উপকরণ এবং যন্ত্র সকলও সেই রূপই একই প্রকারের। চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল সকল মানুষেরই সমান। আর এই সকল পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যে রূপরসগন্ধাদি পঞ্চ তন্মাত্রকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য করে, আর এই রূপরসাদি আবার যে বিষয়-জগতকে ধরিয়া প্রকাশিত হয়, মোটের উপর এ সকল জ্ঞানের উপকরণ এবং আয়োজন সকল মানুষের মানসিক জীবনেরই আশ্রয় হইয়া আছে। এগুলিকে ছাড়িয়া কাহারোই শ্রবণ-মননাদি কর্ম্ম সাধন সম্ভব হয় না। অথচ সকল মানুষের

মনের ধর্ম্ম তো এক নহে। কেহ বা স্থূলদর্শী কেহ বা সূক্ষ্মদর্শী। কারো মন ভেদ-প্রতিষ্ঠাতেই পটু—ইংরেজিতে এজাতীয় বুদ্ধিকে analytic বলে; আর কারো মন স্বভাবতঃ অভেদ দর্শনেই সমধিক অভ্যস্ত, ইংরেজিতে এজাতীয় বুদ্ধিকে synthetic কহে। আমাদের শাস্ত্রীয় পরিভাষায় বলিতে গেলে, কোনো মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি সত্ত্বপ্রধান, কারো বা রজঃপ্রধান, আর কারো বা তমঃপ্রধান। কিন্তু এ সকল বৈষম্য সত্ত্বেও সকলেরই প্রকৃতি মূলে এক—এই তিনগুণের সমাবেশে উৎপন্ন হইয়াছে। অপরিহার্য্য একতা ও অপরিমেয় বৈচিত্র্য মানব-প্রকৃতিরই ধর্ম্ম। হিন্দু যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া জানেন ও মানেন, তাহা আকাশ হইতে পড়ে না। ভিতর হইতে ফুটিয়া উঠে; তাহা মানবপ্রকৃতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত, সেই প্রকৃতি হইতেই উদ্ভূত। এই জন্যই হিন্দুর ধর্ম্মে এমন অদ্ভুত বিচিত্রতার সমাবেশ হইয়াছে।

যাঁহারা মানুষকে কেবল রক্তমাংসের পিণ্ড বলিয়াই জানেন, শ্রেষ্ঠতর পশু রূপেই মানব যাদের দৃষ্টিতে প্রকাশিত হইয়াছে, জীবে ও শিবে, মানবে ও দেবতায়, যাঁরা একটা বিজাতীয় ও আত্যন্তিক ভেদ প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহাদের নিকটে মানব-প্রকৃতিকে ধর্ম্মের উৎপত্তি-স্থান বলিলে, ধর্ম্মবস্তুকে বড়ই হীন করা হয়, জানি। কিন্তু মানবের প্রকৃতি হইতেই ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে, হিন্দু যে অত বড় কথাটা বলিতে পারিয়াছেন, তাহা কেবল এই জন্য যে হিন্দুর চক্ষে প্রকৃত পক্ষে জীবে ও ব্রহ্মে কোনো আত্যন্তিক ভেদ নাই। হিন্দু মানুষকে কখনোই কেবল মানুষ বলিয়া দেখেন নাই।

"কি আর বোলব রে, কে করিবে প্রত্যয়,
এই মানুষ আছে সত্য, নিত্য, চিদানন্দময়"

ইহা কেবল হিন্দুরই কথা। জগতে আর কারো এমন সাহস হয় নাই যে মানুষকে দেবতা বলিয়া বরণ করিতে পারে। সকল ধর্ম্মই প্রকৃত পক্ষে মানবের ভিতরে, মানব-প্রকৃতির আশ্রয় ও অবলম্বনরূপে যে দেবতা নিয়ত বাস করিতেছেন, তাহাতেই আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কিন্তু সকল ধর্ম্ম নিজেদের ভিতরকার এই নিগূঢ় সত্যটা ভালো করিয়া ধরিতে পারে নাই। বিধানেরা ধরিলেও, জনসাধারণে ধরিতে পারে নাই দর্শনে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, লোকমতের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই। হিন্দুর ধর্ম্মেই এটী হইয়াছে। এই জন্যই হিন্দু এমন নিঃসঙ্কোচে বেদকে ছাড়িয়া, স্মৃতিকে ছাড়িয়া, মুনিজনসিদ্ধান্তকে ছাড়িয়া, —মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিতে—"গুহায়াং"—ধর্ম্মতত্ত্বকে অতি নিগূঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আর গুহা-প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই, —মানুষের মধ্যে যে "সত্য, নিত্য, চিদানন্দময়" আছেন তাঁহারই উপরে প্রতিষ্ঠিত ও তাঁহারই দ্বারা প্রকাশিত ও প্রবর্ত্তিত বলিয়া,—হিন্দু যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া জানেন তাহা সনাতন হইয়াছে। ইহাই সনাতন ধর্ম্মের লক্ষণ, ইহাই সনাতন ধর্ম্মের অর্থ।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

মানবের জন্মকথা

মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব কল্পনাশক্তিতে। এই বৃত্তি দ্বারা মানুষ অতীত কালের ভাব ও চিত্র সকল পরস্পরের সহিত সংযুক্ত করিতে পারে, ইহাতে ইচ্ছা-শক্তির কোনই সংস্রব নাই; এই রূপে সে আশ্চর্য্যজনক নূতন নূতন ব্যাপারের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়। জিন্ পল্ রিচার বলিয়াছেন, "যে কবি চিন্তা করিয়া স্থির করে উহার কাব্যোল্লিখিত কোন ব্যক্তি হাঁ বলিবে কি না বলিবে, সে কবিকে সয়তানে লউক সে বুদ্ধিহীন পশুমাত্র।" স্বপ্ন হইতে আমরা কল্পনা-শক্তির সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচয় পাই। জিন্ পল্ পুনরপি বলিতেছেন "স্বপ্ন অজ্ঞাত কবিতা"। কল্পনা হইতে যে সকল চিত্র জাত হয় তাহার উৎকর্ষাপকর্ষ আমাদিগের অনুভূতি সকলের সংখ্যা, শুদ্ধতা ও স্পষ্টতার উপর নির্ভর করে, এবং সেই সকল অনুভূতিকে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত করিবার রুচি ও বিচারশক্তির উপরেও নির্ভর করে, এবং কিয়ৎপরিমাণে সে গুলিকে ইচ্ছাপূর্ব্বক সংযুক্ত করিবার ক্ষমতার উপরেও নির্ভর করে। কুকুর, বিড়াল, অশ্ব এবং অন্যান্য উচ্চশ্রেণীস্থ জন্তু, এমন কি পক্ষীও স্বপ্ন দর্শন করে; তাহাদিগের অঙ্গসঞ্চালন এবং নিদ্রাকালীন শব্দ হইতেই ইহা প্রমাণিত হয়। সুতরাং তাহাদিগের কিছু কল্পনাশক্তিও থাকা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। রাত্রি কালে, বিশেষতঃ জ্যোৎস্নার রাত্রিতে কুকুর যে কি এক অদ্ভুত রকম দুঃখব্যঞ্জক স্বরে হাউ হাউ করিয়া ডাকে, তাহার মধ্যে অবশ্যই কোন বিশেষ অর্থ আছে। সকল কুকুর ঐ রূপ করে না; হোয়ো বলেন, কুকুরগণ ঐ রূপ ডাকিবার সময় চন্দ্রের দিকে তাকায় না, চন্দ্রবাল-রেখার কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানের দিকে তাকাইয়া থাকে। তিনি বিবেচনা করেন: চতুর্দ্দিকস্থ পদার্থ সকলের অস্পষ্ট চিত্র উহাদিগের কল্পনা-শক্তিকে বিক্ষোভিত করে, তাহাতেই উহারা নানাবিধ বিচিত্র ছায়ামূর্ত্তি দর্শন করে। যদি তাহাই হয়, তবে উহাদিগের সংস্কারকে প্রায় কুসংস্কার বলা যাইতে পারে।

আমি বোধ করি ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বুদ্ধিবৃত্তিই মানবগণের সমস্ত বৃত্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই এক্ষণে ইতর জন্তুগণের বুদ্ধি থাকা স্বীকার করেন না। উহাদিগকে সর্ব্বদাই ইতস্ততঃ করিতে, চিন্তা করিতে এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে দেখা যায়। প্রাণীতত্ত্ববিৎ কোন নির্দ্দিষ্ট জন্তুর আচার ব্যবহার যত অধিক পর্য্যবেক্ষণ করেন, ততই তিনি উহার মূলে বুদ্ধির অস্তিত্ব বেশি স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং ততই শিক্ষা-বিহীন সহজাত বৃত্তির কর্ম্ম কম স্বীকার করেন। ইহা উল্লেখযোগ্য। পরে দেখাইব যে অতি নিম্নশ্রেণীস্থ কোন কোন জীবও বুদ্ধির পরিচয় দেয়। বুদ্ধিবৃত্তির এবং সহজ বৃত্তির প্রভেদ বুঝা অনেক সময় অত্যন্ত কঠিন, সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্ত স্থলে, ডাক্তার

হেস্ তাঁহার open polar sea নামক গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ তাঁহার কুকুরগুলির যে ব্যবহারের বর্ণনা করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে; উহারা গাড়ী টানিতে টানিতে পাত্‌লা বরফের উপর আসিলে আর একত্রে থাকিত না, পরস্পর হইতে সরিয়া যাইত; তাহাতে তাহাদিগের দেহভার অপেক্ষাকৃত সমভাবে বিভক্ত হইত। এই ভাবে কুকুরেরা সরিয়া যাওয়াতেই গাড়ীর আরোহিগণ প্রথম বুঝিতে পারিতেন যে বরফ ক্রমে পাত্‌লা ও বিপদজনক হইতেছে। উহারা কি প্রত্যেক কুকুরের নিজের অভিজ্ঞতা হইতে, অথবা অধিকবয়স্ক সুতরাং ঠেকিয়া শিখিয়াছে এরূপ কুকুরের ব্যবহার দেখে, অথবা জন্মগত অভ্যাস অর্থাৎ সহজাত প্রবৃত্তিবশতঃ ঐ রূপ করিয়া যাইত? যখন আদিমনিবাসিগণ প্রথম উহাদিগকে গাড়ী টানিতে নিযুক্ত করিয়াছিল, সম্ভবতঃ সেই সুদূর অতীত কালের পর হইতে উহাদিগের এই বৃত্তি জ্ঞাত হইয়াছে; কিম্বা ইহাও হইতে পারে যে, উহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ মেরুপ্রদেশের নেকড়ে বাঘ সকল পাত্‌লা বরফের উপর শিকার আক্রমণ কালে একত্রে দল বাঁধিয়া আক্রমণ করিত না, তাহা হইতেই ঐ পূর্ব্ব-পুরুষেরা ঐ রূপ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

যে সকল অবস্থায় কর্ম্ম করা হয়, তদ্দৃষ্টে উহা বুদ্ধিপূর্ব্বক অথবা সহজবৃত্তি বশে করা হইল, কিম্বা কেবল ভাবের সংযোগবশতঃ হইল, তাহা স্থির করিতে হয়, নতুবা অন্য উপায় নাই। ভাবের সংযোগও বুদ্ধির সহিত বিশেষ ভাবে সংসৃষ্ট। অধ্যাপক মুবিয়ান্ পাইক (Pike) মৎস্য সম্বন্ধে এক অদ্ভুত বর্ণনা করিয়াছেন। একটী মাছের চৌবাচ্চার মধ্যে এক খণ্ড কাচ বসাইয়া উহাকে দুইটী কামরায় বিভক্ত করা হয়; একটী কামরায় কতকগুলি মৎস্য রাখা হইয়াছিল, অপর কামরায় ঐ পাইক মৎস্যটী ছিল; ঐ পাইক অপর কামরায় মৎস্যগুলি ধরিবার নিমিত্ত এত বেগে ধাবমান হইত যে ঐ কাচখণ্ডের সহিত আঘাত লাগিয়া সম্পূর্ণ অজ্ঞান হইয়া পড়িত। তিন মাস কাল পাইক এরূপ করিয়াছিল, পরে সতর্ক হইতে শিক্ষা করিয়া আর ঐ রূপ করে নাই। তৎপর ঐ কাচখণ্ড উঠাইয়া লওয়া হইয়াছিল, তথাপি ঐ পাইক ঐ মৎস্য গুলিকে আক্রমণ করিত না; কিন্তু পরে যখন অন্যান্য মৎস্য ঐ কামরায় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল তখন সে তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিত। পূর্ব্বের মৎস্যগুলির প্রতি আক্রমণ কালে কাচে যে আঘাত লাগিত, তাহা উহার দুর্ব্বল মস্তিষ্কে এতই স্থায়ী ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছিল। কোন অসভ্য মানব যে কাচের জানালায় শার্সি কখনও দেখে নাই, সে যদি একবার উহাতে আঘাত প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ঐ শার্সির সহিত সে মনে মনে বহুদিন পর্য্যন্ত আঘাতের সংযোগ করিয়া রাখিবে; কিন্তু এই ভাব পাইকের ভাব অপেক্ষা কত বিভিন্ন! ঐ অসভ্য যে শার্সিতে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার স্বরূপ চিন্তা করিবে এবং তত্তুল্য অবস্থায় সাবধান হইবে। আমি পশ্চাৎ দেখাইব, মানবগণ কোন কর্ম্ম হইতে ক্লেশকর অথবা অপ্রিয় ভাব যদি একবার প্রাপ্ত হয় তাহা হইলেও কখন কখন ঐ কর্ম্ম আর পুনরায় করে না।

পাইক ও মানব মধ্যে এই প্রভেদের একমাত্র কারণ যদি এরূপ বিবেচনা করি যে পাইকের অপেক্ষা মানবের মস্তিষ্কে ভাব-সংযোগ প্রবল ও দীর্ঘকাল স্থায়ী (যদিও পাইক অধিকতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল) তাহা হইলে মনুষ্যের সম্বন্ধে তদনুরূপ ক্ষেত্রে কি আর এরূপ বিবেচনা করা যায় যে, তাঁহার মস্তিষ্ক উহাদিগের তুলনায় মূলতঃ বিভিন্ন!

হোবো বলেন, তিনি যখন একটী বিস্তীর্ণ বালুকাময় সমতল পার হইতেছিলেন যখন তাঁহার কুকুর দুইটী পিপাসায় কাতর হইয়া জল পাইবার নিমিত্ত ত্রিশ চল্লিশবার খালের দিকে দৌড়াইয়া গিয়াছিল। এই খালগুলি উপত্যকা নহে, উহাতে বৃক্ষ ছিল না, কিম্বা উদ্ভিদ-সংস্থানেও সমতলের সহিত কোন পার্থক্য ছিল না; ঐ সকল খাল সম্পূর্ণ শুষ্ক থাকায় ভিজামাটির গন্ধও তাহাতে থাকিতে পারে না। কিন্তু কুকুর দুইটি এইরূপ ব্যবহার করিয়াছিল যেন তাহারা জানিত যে খাল মধ্যে জল পাইবার সম্ভাবনা অধিক। হোবো অনেকবার অন্য জন্তুকেও এইরূপ ব্যবহার করিতে দেখিয়াছেন।

পশুশালার একটি হস্তীর সম্মুখে, সে ধরিতে না পারে এরূপ ব্যবধানে, কোন বস্তু মাটিতে ফেলিয়া দিলে শুঁড় দ্বারা এমন বেগে ঐ বস্তু ডিপাইয়া প্রশ্বাস-বায়ু নিক্ষেপ করে যে, ঐ বায়ুর আঘাত চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া বস্তুটীকে হস্তীর নিকটে সরাইয়া আনে, ইহা আমিও দেখিয়াছি এবং অন্যেও দেখিয়াছেন। নিউার ওয়েষ্টকট্ একজন সুপরিচিত বর্ণতত্ত্ববিৎ, তিনি আমাকে জানাইয়াছেন যে ভারানাতে একটী ভালুকের খাঁচার শিকের সম্মুখে কিছু দূরে জলে একটু রুটীর টুকরা ভাসিতেছিল, ভালুক তাহা হাতে পায় না, তখন সে বিবেচনাপূর্ব্বক হস্তদ্বারা সম্মুখের দিকে জল টানিয়া টানিয়া যে স্রোত উৎপন্ন করিল, তাহাতেই ঐ রুটীখণ্ড উহার নিকটে চলিয়া আসিল। হস্তী এবং ভল্লুকের এই সকল কর্ম্ম, বংশানুক্রমিক অভ্যাস অথবা সহজাত বৃত্তিমূলক হওয়া কদাচিৎ সম্ভব। কারণ বন্য পশুর ঐ রূপ কর্ম্ম বিশেষ কোন উপকারে আসে না। ঐরূপ কর্ম্ম কোন অশিক্ষিত ব্যক্তি করিলে এবং কোন উচ্চ শ্রেণীস্থ জন্তুতে করিলে কি প্রভেদ লক্ষিত হয়?

(ক্রমশ)

শ্রীশশধর রায়।

জবরদস্তির লেখাপড়া

য়ুরোপের দেখাদেখি, আমরাও আইন-কানুন রচিয়া, শাসন-ভয় দেখাইয়া, জোর-জবরদস্তি করিয়া, দেশের সকল লোককে লেখাপড়া পড়া শিখাইবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি। অথচ য়ুরোপে কি কারণে এ "সংস্কার" প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, আর কোন্ দিকে ইহার কি ফল ফলিতেছে, তৎপ্রতি আমাদের একটুকুও দৃষ্টি নাই। এরূপ অসম্যক্‌দর্শন অন্ধ অনুকরণের সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। চারিদিক বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিলে, কোথাও নিরঙ্কুশ অনুকরণ-প্রবৃত্তি ভিত্তিতে পারে না। ভারত যে বিলাত নয়; ভারতের লোকপ্রকৃতি ও সমাজগঠন যে বিলাতের লোকপ্রকৃতি ও সমাজ-গঠন হইতে একান্তই ভিন্ন, ভারতের যে একটা নিজস্ব সাধনা ও সভ্যতা ছিল এবং আছে; ভারতের জাতীয় জীবনের বিবর্ত্তনে সেই সাধনা ও সভ্যতাকে রক্ষা করিতে না পারিলে উন্নতির পরিবর্ত্তে যে আমাদের অশেষ দুর্গতি হইবে; এ সকল যদি ভাল করিয়া বুঝিতে ও ধরিতে পারা যায়, তাহা হইলে এইরূপ ভাবে বিলাতের বা অপর কোনো দেশের অদ্ভুত অনুষ্ঠান দেখিয়া, তাহাদের অনুকরণ করিবার প্রবৃত্তি জন্মিতেই পারে না। কিন্তু আমাদের আধুনিক সকল সংস্কার-প্রয়াসের পশ্চাতেই এই সাংঘাতিক আত্মবিস্মৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে।

বিলাতী-সভ্যতার মূলমন্ত্র স্বত্ব। ইংরেজিতে ইহাকে 'রাইটস্' বলে। আমাদের ধর্ম্ম কথার যেমন ইংরেজি কোনো প্রতিশব্দ নাই, এ কথার ইংরেজি তর্জ্জমা হয় না; সেইরূপ ইংরেজের রাইটস্ (Rights) কথারও কোনো সংস্কৃত বা বাংলা প্রতিশব্দ নাই; ইহার বাংলা তর্জ্জমা হয় না। শব্দ তো বস্তুর চিহ্ন বা সঙ্কেত মাত্র। যে দেশে যে বস্তু নাই, সে দেশের ভাষায় তাহার সঙ্কেত শব্দও তো থাকিতে পারে না। আমাদের ধর্ম্ম-বস্তুটী য়ুরোপে নাই; তাঁদের রাইটস্ পদার্থটীও আমাদের দেশে কখনো জন্মায় নাই। সুতরাং এই দুইটী কথার ঠিক প্রতিশব্দ আমাদের একে অন্যের ভাষায় পাওয়া যায় না। রাইটস্-এর মূল ভাব—একে অন্য হইতে ভিন্ন, আর ইহারা পরস্পর হইতে ভিন্ন ও পৃথক্ বলিয়াই, প্রত্যেকের এমন কতকগুলি অধিকার, এমন কতকগুলি দাবি-দাওয়া আছে, যেগুলি প্রয়োজনমত অপর সকলের উপরে জোর করিয়া আদায় করিতে পারা যায়। এ হক্ রাইটস্-এর গতি বিচ্ছিন্নতার দিকে, একতার দিকে নয়। রাইটস্ যেখানে বহু লোককে একতাসূত্রে আবদ্ধ করে, সেখানেও অপরের আক্রমণ হইতে আপনাদের রাইটস্‌কে রক্ষা করা, কিম্বা আপনাদের সংহত শক্তিপ্রয়োগে প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজের বা জাতির রাইটস্‌কে হরণ করাই সে একতার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হয়। এই জন্য অপরজাতির আক্রমণ হইতে আপনার স্বজাতিকে রক্ষা করা, অথবা পরজাতির স্বত্ব হরণ করিয়া, তাহাদিগের উপরে আপনার জাতির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করা, ইহাই য়ুরোপীয়দের জাতীয় একতার

মূল প্রেরণা হইয়া রহিয়াছে। ইংরেজ যখন অন্য দেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করে, এবং তাহাতে যখন সাধারণ ইংলণ্ডবাসী ইংরেজের স্বত্বস্বার্থের সঙ্গে তার নিজের স্বত্বস্বার্থের প্রতিযোগিতা উপস্থিত হয়, তখন স্বজাতি বলিয়া আর তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনোই ঐক্যবন্ধন বা আন্তরিক সৌহার্দ্য থাকে না। ইহা রাইট্‌স্‌-এরই প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। রাইটস্ আপনাকে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করিতেই চায়। অপরের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া, হারাইয়া, তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হইয়া যে পূর্ণতর সার্থকতা লাভ করা যায়,—রাইট্‌স্ এ উচ্চতর তত্ত্বের সন্ধান রাখে না।

রাইটস্-এর নিয়মাধীন সমাজের প্রকৃতিই "চাচা আপন বাঁচা।" প্রতিযোগিতাই এ সমাজের বিবর্ত্তনের মূলসূত্র। এখানে সকলেই সকলের উপরে চড়িবার জন্য ব্যস্ত। সকলেই সকলের মুখের অন্ন, গায়ের বস্ত্র, শ্রমের ফল, কাড়িয়া লইবার সন্ধানে ফেরে। যারা দুর্ব্বল তারা এখানে সবলের হাত হইতে আপনাদের বাঁচাইবার জন্য দল বাঁধে। আর যাঁরা সবল তাঁরাও দুর্ব্বলের এই সংহত শক্তিকে নষ্ট করিবার জন্য নিজেদের প্রাচীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভুলিয়া গিয়া, সকলের সমবেত শক্তি ও চেষ্টার দ্বারা দুর্ব্বলের উপরে আপনাদিগের চিরাগত আধিপত্য ও অধিকার অপ্রতিহত রাখিবার চেষ্টা করে। এ ক্ষেত্রে সমরসজ্জাই সমাজের স্বাভাবিক ও নিত্যকার অবস্থা হয়। ইংরেজিতে যাহাকে armed peace বলে, সংগ্রামের জন্য সতত সজ্জিত থাকিয়া, যেরূপ প্রকারের শান্তি রক্ষা করিতে হয়, সংগ্রাম-সময়ে সমরক্ষেত্রে, সাক্ষাৎ যুদ্ধের ক্ষণিক বিরামকালে, যুযুৎসুদিগের শিবিরে যে সচকিত শান্তি বিরাজ করে রাইটস্-প্রধান সমাজের শান্তিও সেই জাতীয়। ইহাই যে সমাজের স্বভাব ও অবস্থা, সে সমাজে রাজশক্তিকে বা রাষ্ট্রীয় শক্তিকে সর্ব্বদাই, সমাজের ভিতরকার যে সকল লোকের আত্মরক্ষার সামর্থ্য এখনো জন্মায় নাই, তাহাদিগকে এই সাংঘাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে রক্ষা করিয়া, উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা দিয়া, সেই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়, না করিলে সমাজ-রক্ষা দুষ্কর হইয়া উঠে।

যে সমাজে রাইটস্-এর বা ব্যক্তিগত স্বত্বস্বাধীনতার এই অদ্ভুত আদর্শ এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সেখানে সহজ পারিবারিক স্নেহমমতা এবং অকৃত্রিম সামাজিক সৌহার্দ্যই দুর্ব্বলকে প্রবলের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। সেখানে রাজশক্তিকে বা রাষ্ট্রশক্তিকে এই সকল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হয় না। পিতামাতা প্রভৃতি পরিবারের জ্যেষ্ঠজনেরাই পরিবারের অক্ষম কনিষ্ঠদিগের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, ইহাই নিসর্গের নিয়ম। ইতর জন্তুদের মধ্যেও এই সহজ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। এ ব্যবস্থার ব্যতিক্রম যে কোনো প্রকারে বাঞ্ছনীয়, এমন কথাও কেহ বলিতে সাহস পাইবেন বলিয়া মনে হয় না। অথচ স্বত্ব বা রাইটস্-প্রধান য়ুরোপীয় সমাজে ক্রমশঃই ইহার ঘোরতর ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। এ রোগ কেবল য়ুরোপীয় মানব-প্রকৃতিরই নয়, য়ুরোপীয় সমাজ-প্রকৃতিরও এ রোগ আছে।

য়ুরোপে সমাজবিবর্ত্তন বহুকালাবধি এমন একটা উদ্ভট পথ ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে, যে তাহাতে য়ুরোপীয় সমাজে মানুষের স্বাভাবিক স্নেহমমতা প্রভৃতির সম্যক স্ফূর্ত্তি সাধন নিতান্তই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের প্রকৃতি আমাদের দেশে যেমন মোটের উপরে, য়ুরোপেও সেইরূপই। স্বাভাবিক স্নেহমমতা মানব-হৃদয়ে উভয় দেশেই রহিয়াছে। মূলে গোল নাই, থাকিতেই পারে না। কিন্তু য়ুরোপীয় সমাজগঠন এমন একটা আকার ধারণ করিয়াছে, যাহাতে য়ুরোপীয় সমাজে এ সকল অতি সহজ প্রবৃত্তির অনুশীলনও নিতান্তই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। কোথাও মানুষ দেবতা নয়। কোথাও মানুষ একেবারে পশুও নয়। মানুষে দেবত্ব ও পশুত্ব দুই আছে। এ দুই ইংরেজের ভিতরেও আছে, আমাদের ভিতরেও আছে। মানুষে মানুষে এ বিষয়ে বড় বেশি কোন প্রভেদ নাই। তবে সমাজে সমাজে আছে। কোনো সমাজবিধান এরূপ যে তাহাতে মানুষের স্বাভাবিক পশুত্বকে সঙ্কুচিত করিয়া দেবত্বকেই প্রসারিত করিবার চেষ্টা করে; আর কোথাও বা সমাজগঠন এমনি যে তাহাতে দেবত্বকেই চাপিয়া রাখে ও পশুত্বকেই বাড়াইয়া তোলে। কোনো সমাজের গঠন ও রীতিনীতিই এরূপ যে তাহাতে সমাজের লোককে স্বার্থের দিকে টানিয়া রাখে। আর কোনো সমাজের গঠন ও রীতিনীতিই এমন যে, তাহাতে সমাজের লোককে পরার্থের অনুসরণেই প্রণোদিত করে। কোথাও বা সমাজের বিধিব্যবস্থা স্বাভাবিক স্নেহমমতাকে ফুটাইয়া তোলে, আর কোথাও বা এ গুলিকে পদে পদে ব্যাঘাত দিয়া থাকে। আর যেখানে সমাজ-প্রকৃতি এই সকল সহজ মানবধর্ম্মের বাধা দিয়া থাকে, সেখানেই জীবন-সংগ্রামের যোগ্যতা যাহাদের জন্মায় নাই, যাহারা আত্মচেষ্টায়, আত্মবুদ্ধিতে, আত্মশক্তি-সাহায্যে আপনাকে বাঁচাইতে পারে না, রাজশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তিকে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইতে হয়।

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ব্যক্তিগত স্বার্থের তীব্রপ্রতিদ্বন্দ্বিতা নিবন্ধন সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন, ক্রমশঃই শিথিল হইয়া যাইতেছে। সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত ও অর্জ্জনক্ষম হইলেই, পিতামাতা হইতে পৃথক্ হইয়া গিয়া আপনি আপনার সংসার পাতিয়া থাকে। পুত্রের ধনে পিতার, ভা'এর ধনে ভা'এর কোনো অধিকার নাই। আইনতঃও নাই; সমাজশাসনও এরূপ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে না। কেহ আপনার জরাজীর্ণ পিতামাতার ভরণপোষণ না করিলেও, সমাজে নিতান্ত নিন্দনীয় হয় না। সে দেশে আমাদের দেশের মত একান্নবর্ত্তী পরিবার নাই। একান্নবর্ত্তী পরিবার যেখানে আছে, সেখানে নিজ নিজ স্বার্থের প্রেরণাতেই স্বাভাবিক স্নেহমমতাকে অলক্ষিতে সর্ব্বদা দৃঢ় করিয়া রাখে। পিতা সন্তানের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইবার সময়, "আমার ভবিষ্যতে কি হইবে," এ ভাবনায় আপনার সহজ স্নেহ-প্রবণতাকে সঙ্কুচিত করিতে বাধ্য হন না। পুত্রই তাঁর সর্ব্বস্ব, তিনি ইহা জানেন। পুত্র যেমন তাঁর স্নেহের পাত্র; সেইরূপ তাঁর সংসারের অবলম্বন। পুত্রকে বড় করিয়া, শিক্ষিত করিয়া, সক্ষম করিয়া, জীবন-

সংগ্রামের যোগ্যতা দান করিয়া, একদিকে যেমন তিনি আপনার স্বাভাবিক পিতৃস্নেহকে পরিতৃপ্ত করেন, অন্যদিকে ঐ তৃপ্তিলাভ করিতে যাইয়াই, আপনার বার্দ্ধক্যেরও সংস্থান করিয়া থাকেন। আমাদের সমাজের গঠনই এরূপ যে পুত্রের জন্য স্বার্থত্যাগ করাকে কেউ স্বার্থত্যাগই মনে করে না; আর বৃদ্ধ পিতামাতার যথাযোগ্য রক্ষণাবেক্ষণে আপনার অর্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়াও কেহ একটা অতি বড় উদার কাজ করিতেছে বলিয়া নিজেও অনুভব করে না, সমাজের লোকেও মনে করে না। এরূপ সমাজগঠন যেখানে সেখানে একই পরিবারের অন্তর্গত দুর্ব্বলদিগকে, পরিবারস্থ সবল ও সক্ষমদিগের ঔদাসীন্য বা প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার ভার বা তাহাদের ভবিষ্যৎ যোগ্যতা অন্যাইবার জন্য শিক্ষাদীক্ষা দিবার ভার রাজশক্তিকে বা রাষ্ট্রশক্তিকে আপনার হাতে গ্রহণ করিতে হয় না। মানুষের সহজ স্নেহমমতা আপনা হইতে যে কাজ করে, তার জন্য রাজবিধান-প্রণয়নে কেবল একান্তই অনাবশ্যক নহে, কিন্তু নিতান্তই অনিষ্টকর। পিতাকে জোর জবরদস্তি করিয়া, উদ্যতশাসনদণ্ড দেখাইয়া, পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্যপালনে নিযুক্ত করিতে গেলে, সে কর্ত্তব্য যতটা সুচারুরূপে সাধিত হউক আর না হউক, গোড়াতেই স্বাভাবিক পিতৃস্নেহ এমনভাবে আহত ও ক্ষুণ্ণ হয় যে, সে আঘাতের পরে তাহাকে আবার কখনই ভাল করিয়া গড়িয়া তোলা সম্ভব হয় না। স্ত্রী বল, পুত্র বল, কন্যা বল, ভগিনী বল, ভাই বল, বন্ধু বল,—সংসারে যাহাদের প্রতি মন অসীম স্নেহভরে ধাবিত হয়, তারাই যখন আবার অকারণ অপরের হাতে অযথা ক্লেশের বা নির্য্যাতনের কারণ হইয়া উঠে, তখন সে স্নেহটুকু তেমনি ভাবে বাঁচাইয়া রাখা কখনই সহজ হয় না। এই জন্য যেখানেই রাজশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তি, আপনার আইন-আদালত ও পুলিশপাহারা লইয়া, স্বামী-স্ত্রীর, বা পিতা-পুত্রের, বা অন্য কোন স্নেহের বা প্রেমের সম্বন্ধের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া, সে সম্বন্ধের স্বত্বাস্বত্ব এবং অধিকার-অনধিকার—সে সম্বন্ধের রাইট্‌স্-নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হয়, সেখানেই এ সকল সম্বন্ধ আর টিকিয়া থাকিতে পারে না।

বিধাতার কৃপায়, পূর্ব্বপুরুষদিগের আশীর্ব্বাদে, আমাদের সমাজের এমন অবস্থা এখনো উপস্থিত হয় নাই। এখনো আমাদের সমাজে স্বামীর দৌরাত্ম্য হইতে আপনার সতীত্বকে না হউক, কিন্তু স্বত্বকে রক্ষা করিবার জন্য হিন্দুস্ত্রী আদালতের আশ্রয় লইতে অগ্রসর হন নাই; আর পিতামাতার অত্যাচার হইতে পুত্রকন্যার স্বত্বকে রক্ষা করিবার জন্যও দেশের আইন-আদালতকে বড় ক্লেশ পাইতে হয় না। হয় না বলিয়াই, সমাজ এই বিপ্লবের মুখেও অনেকটা আপনার সহজ স্বাভাবিকতাকে রক্ষা করিতে পারিতেছে। কিন্তু এই সময়ে যদি সংস্কারের দোহাই দিয়া, রাজবিধির 'বেনো' জল খাল কাটিয়া সমাজের ভিতরে ডাকিয়া আনা হয়, তবে এই সহজ স্বাভাবিকতাকে রক্ষা করা আদৌ সম্ভব হইয়া উঠিবে। আমাদের সমাজের এই

স্বাভাবিকতাকে, আমাদের পরিবারের ও পারিবারিক সম্বন্ধের দৃঢ়-স্নেহময় বন্ধনগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে যদি হয়, তবে এই অনুকরণ-প্রিয় এবং অপরিণামদর্শী, অসংযত এবং ধার-করা সংস্কার-চেষ্টাকে সংযত করিতেই হইবে।

মানুষের সহজ স্নেহমমতার প্রেরণায় পরিবারে ও সমাজে অক্ষমদিগের রক্ষণা-বেক্ষণের ও শিক্ষা-দীক্ষার যে সকল ব্যবস্থা আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কেননা তাহাই সহজ ও স্বাভাবিক। মানবের অন্তঃপ্রকৃতি হইতে, সে প্রকৃতির সম্যক সফলতার জন্যই এ সকল ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা হয়। বাহির হইতে, অপরের সাধু-উচ্ছার জোরে এ গুলিকে কাহারো উপরে চাপাইয়া দেওয়া হয় না। এই চাপানো ব্যাপারটাই মন্দ। উদ্দেশ্য যতই কেন সাধু হউক না, তাহাতে এই মন্দকে কিছুতেই নষ্ট করিতে পারে না, বরং বাড়াইয়াই তোলে। মানুষের প্রকৃতিই এরূপ যে, সে তার ভিতরকার প্রবৃত্তির প্রেরণায় যাহা কিছু করুক না কেন, তাহাতে তার স্থায়ী অমঙ্গল কখনোই হইতে পারে না। আর সে আপনার প্রকৃতির ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যাই কিছু করিতে যায়, তাহাতেই পরিণামে তার অমঙ্গল হয়। তার প্রকৃতি যদি মন্দ, তার প্রবৃত্তি যদি নীচ হয়, তবে আগে সেই প্রকৃতিকেই ভালো, সেই প্রবৃত্তিকেই উন্নত ও শোধিত করা চাই। আর যে শক্তি দ্বারা এই শোধন-কার্য্য করিতে হইবে, তাহাকেও তার প্রকৃতির ভিতর হইতেই ফুটাইয়া তোলা আবশ্যক। মানুষমাত্রেরই প্রকৃতিতে ভাল ও মন্দ দুই মিলিয়া আছে। এমন মন্দ বিধতার সৃষ্টিতে কিছু নাই, যারও একটা সহজ ভালো দিক নাই। ছায়ালোকের ন্যায় জীব ও শিব মানুষের ভিতরে পরস্পরের সঙ্গে নিয়ত মিলিয়া আছেন। তার ভিতরকার আলোকের দ্বারাই মানুষের অন্তরের অন্ধকারকে দূর করিতে হয়, বাহির হইতে কোনো আলো সেখানে পৌঁছাইতে পারা যায় না। আর যতক্ষণ না তার নিজের ভিতরকার ভালোকে ফুটাইয়া তুলিয়া তার প্রকৃতির মন্দকে নষ্ট করিতে পারা যায়, ততক্ষণ বাহিরের শাসন-সংযমের দ্বারা তাহাকে সংযত করিবার চেষ্টা কেবল যে নিষ্ফল হয়, তাহা নহে; তাহাতে পরিণামে বিপরীত ফলই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জন্য মানুষের সহজ স্নেহমমতার প্রেরণায় যে সকল পারিবারিক বা সামাজিক বিধিব্যবস্থা আপনা হইতেই প্রতিষ্ঠিত হয়, বাহিরের রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা তাহার স্বাভাবিক কার্য্য-কারিতার ব্যাঘাত দেওয়া কিছুতেই কর্ত্তব্য নয়। মানুষের ভিতরকার ভাব ও প্রবৃত্তি হইতে, সে ভাব ও প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য যে সকল পারিবারিক বা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আপনা হইতে গড়িয়া উঠে, তার মধ্যে এমন একটা শক্তি ও সজীবতা থাকে, তাহার মধ্যে এমন একটা সহজ আনন্দ জাগিয়া রহে,—জোর করিয়া, রাষ্ট্র-শক্তির সাহায্যে যে সকল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার মধ্যে সে শক্তি, সে সজীবতা, সে আনন্দ থাকে না, থাকিতেই পারে না। মানবসমাজের সনাতন ব্যবস্থাগুলি এই

ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে। যুক্তি করিয়া, বিচার করিয়া, ভোট লইয়া, হাত তুলিয়া, কেহ এ গুলিকে প্রতিষ্ঠিত করে নাই। মানবশরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন শারীরধর্ম্মবলে, শরীরের আত্মপ্রয়োজনেই, গড়িয়া উঠিয়াছে, পার্লেমেণ্টের বিধানে এদের সৃষ্টি হয় নাই; সেইরূপ সমাজশরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলি, এবং সমাজের বিধিব্যবস্থা-সকলও সমাজশরীরের আত্মপ্রয়োজনেই সমাজের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। যেখানেই রাজা বা পুরোহিত রাষ্ট্রনীতিক বা সমাজসংস্কারক, সমাজের অন্তঃপ্রকৃতির অনুধ্যান ও সমাজের লোকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অনুসরণ না করিয়া আপনাদের স্বার্থের বা খেয়ালের চরিতার্থতা-সাধনের জন্য তাহাদের উপরে জোর করিয়া কোনো বিধিব্যবস্থা চাপাইয়াছেন, সেখানেই সমাজের সংস্কার করিতে যাইয়া তদ্ভাবহ পরধর্ম্মের ভারে, সমাজের লোকের চিত্তরকার মনুষ্যত্বটুকুকে চাপিয়া মারিয়াছেন।

সন্তানবাৎসল্য হইতেই অক্ষম শিশুদিগের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষাদীক্ষার সর্ব্ববিধ সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এই সন্তানবাৎসল্য কেবল মানুষের নহে, জীবমাত্রেরই সাধারণ ধর্ম্ম। এই সহজ স্নেহটী লোকস্থিতিরক্ষার্থে বিধাতাপুরুষের অপূর্ব্ব কৌশল। অন্য সর্ব্বত্র জীব জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনাকেই প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করে। কেবল তার নিজের সন্তানসন্ততিদের সম্বন্ধেই সে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া, তাদের বাড়াইয়া তুলিবার জন্য একান্ত ব্যস্ত হইয়া থাকে। অন্য সর্ব্বত্র জীব আপনার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে যায়, কেবল এখানে সে এক অদ্ভুত স্বর্গীয় স্বেচ্ছাদাসত্ব গ্রহণ করিয়া, তারই ভিতর দিয়া আপনার উচ্চতম চরিতার্থতার অন্বেষণ করে। জীবজগতের সর্ব্বত্রই পিতা-মাতা আপনাদের জীবন পণ করিয়া সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করে, এবং নিজেদের স্বোপার্জ্জিত ও পূর্ব্বপুরুষদিগের সঞ্চিত শক্তি ও সাধনা দ্বারা সন্তানকে শক্তিশালী করিয়া, জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিয়া দেয়। মানব-সমাজেও এই সহজ প্রবৃত্তিই শিশুদিগের রক্ষণাবেক্ষণের ও শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছে। পিতামাতাই আপনাদের সন্তানসন্ততির রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, ইহাই সহজ, নৈসর্গিক নিয়ম। যেখানে কোনো কারণবশতঃ পিতামাতা নিজেরা সন্তানগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে না পারেন, সেখানেও তাঁহাদেরই তত্ত্বাবধানাধীনে, তাঁহাদেরই প্রতিনিধিস্বরূপ গুরু বা আচার্য্য এ কর্ত্তব্য পালন করিবেন, সভ্যতার ইহাই প্রাচীনতম ও প্রকৃষ্টতম বিধান। যেখানেই এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে, সেখানেই সমাজ প্রথমে পিতামাতাকে এই সহজ কর্ত্তব্যপালনে অক্ষম করে, ও পরে আপনি, আত্মরক্ষার্থে, পিতামাতার হাত হইতে এই পবিত্র কর্ত্তব্যভার কাড়িয়া লয়, সেখানে কিছু কালের জন্য, আপাততঃ কিছু সুফল ফলিলেও পরিণামে মানুষকে মনুষ্যত্বহীন ও সমাজকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তোলে। পিতামাতা একান্ত অক্ষম বা নিতান্ত কর্ত্তব্যবিমুখ হইলে, ক্বচিৎ কোথাও সমাজ এ ভার সহজে

গ্রহণ করিতেও পারেন, সত্য। কিন্তু এইরূপে, যাহা কেবল একটা সার্ব্বজনীন বিধানের বিরল ব্যতিক্রম মাত্রই থাকা উচিত তাহাকেই সনাতন বিধানরূপে সমাজে প্রবর্ত্তিত করিলে, সমাজের পক্ষেই আত্মরক্ষা করা শেষে দায় হইয়া উঠে। পরিবারের স্নিগ্ধ ছায়া হইতে শিশুদিগকে ছিনিয়া নিয়া বোর্ডিং বা বিহারের উষ্ণ হাওয়াতে স্থাপন করিলে, ক্বচিৎ কেহ কেহ অসাধারণ উন্নতি লাভ করিতে পারিলেও, তাহাতে সমাজের সাধারণ মনুষ্যত্বটা ক্রমশঃই দুর্ব্বল ও ক্ষয়োন্মুখ হইয়া উঠে। এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থায়, সাধনার অভাবে লোকের স্বাভাবিক সন্তান বাৎসল্য হ্রাস হইতে আরম্ভ করে, পারিবারিক সম্বন্ধের শক্তি ও শ্রী নষ্ট হইয়া যায়, এবং সমাজ হীনবল ও শিথিলগ্রন্থী হইয়া পড়ে। এই জন্য প্রাচীন গ্রীসের জিম্‌নিশিয়া সকলই যুগপৎ তার ক্ষণিক অভ্যুদয়ের ও আত্যন্তিক ক্ষয়ের কারণ হইয়াছিল। গাছকে যেমন টবে পুতিয়া বেশি বড় করা যায় না; যতই কেন সার ও রস যোগাও না কেন, সহজ মাটির সহজ রস হইতে বঞ্চিত রাখিয়া উদ্ভিদের সম্পূর্ণ শ্রীবৃদ্ধিসাধন কদাপি সম্ভব হয় না; সেইরূপ মানুষের প্রাণকেও বোর্ডিং বা বিহারের, স্কুল বা চতুষ্পাঠীর টবে পুতিয়া সজীব রাখা ও সতেজ করা যায় না। সহজ পরিবারের স্বাভাবিক স্নেহরসের ভিতরে থাকিয়াই সে প্রাণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যতই কেন বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক পন্থা আবিষ্কৃত ও প্রতিষ্ঠিত কর না, স্কুল বা চতুষ্পাঠীর, বোর্ডিং বা বিহারের শিক্ষা ও শাসনের একটা কৃত্রিমতা থাকিবেই থাকিবে। আর বোর্ডিং বা বিহারকে যতই যত্ন করিয়া শিশুদের বাড়ীর মত সুখকর ও প্রীতিকর করিবার চেষ্টা করিবে, এবং যে পরিমাণে এ চেষ্টা ফলবতী হইবে, ততই, সে পরিমাণে ছেলেদের নিজেদের বাড়ীর টানটা কমাইয়া পরিবারের সহজ স্নেহমমতার বন্ধনগুলিকে শিথিল করিয়া, তাদের জীবনে পরার্থপরতার মূলভিত্তিটাকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিবেই ফেলিবে! এরূপ শিক্ষায় আপনার জনকে পর করিয়া দেয়, আর পরকে আপন করিতে যায়। ইহার ফলে একটা কৃত্রিম, কল্পিত, বিমানচারী, স্বাদেশিকতা বা বিশ্বপ্রেমের মায়িক সৃষ্টি হইতে পারে—কিন্তু মানুষ যখনই সংসারের নির্ম্মম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিষ্পেষিত হইতে আরম্ভ করে, তখন এই ভিত্তিহীন লোকহিতৈষা বা বিশ্বপ্রেম তাহাকে আপনার অতি হীন ও হেয় স্বার্থের টান হইতেও রক্ষা করিতে পারেন না। ফলতঃ শিশুদিগকে অপক্ক বয়সে, অসময়ে, পরিবারের স্নেহক্রোড় হইতে কাড়িয়া লইয়া, একটা অস্বাভাবিক শিক্ষাদানের জন্য পরের বাড়ীতে, পরের হাতে সমর্পণ করার মত মনুষ্যত্ব-বিকাশের এমন হানিকর কাজ আর কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। য়ুরোপীয়েরা ক্রমে এটা ঠেকিয়া শিখিয়াছেন। সকলের চোক এখনো ফোটে নাই। কারো কারো ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। আর এই সকল লোকে এখন য়ুরোপের প্রচলিত শিশুশিক্ষার ব্যবস্থাকে স্কুল বোর্ডিং হইতে মুক্ত করিয়া, পরিবারের মধ্যেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন। আর যে পথ

হইতে য়ুরোপের শ্রেষ্ঠতম মনীষীগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য ক্রমে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছেন. আমাদের সমাজ-সংস্কারকেরা কি না, সেই সর্ব্বনাশের পথেই সমাজকে তাড়াইয়া নিবার জন্য নিরতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছেন।

কেবল স্কুল, বোর্ডিং প্রভৃতিতেই যে য়ুরোপে পরিবার-বন্ধনকে শিথিল করিয়া সমাজকে ক্রমে গ্রন্থিহীন করিয়াছে, তাহা নহে। যে সার্ব্বজনীন সাধারণ শিক্ষা এদেশে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য একদল অধীর সংস্কারক রাজশক্তির শরণাপন্ন হইয়াছেন, সেই সার্ব্বজনীন সাধারণ শিক্ষাতেও পরিবারের বন্ধনকে ক্রমশঃই শিথিল করিয়া দিতেছে। একেই তো নানা কারণে বহুদিন হইতে য়ুরোপীয় সমাজে পরিবারের বন্ধন শিথিল হইয়া আছে। আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবারে, এক কালে, স্নেহ ও স্বার্থের যে অপূর্ব্ব সমাবেশ ও সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছিল, সে সমাবেশ ও সামঞ্জস্য য়ুরোপের ব্যক্তিস্বপ্রধান সমাজে এখনো হয় নাই, কখনো হইবারও নহে। সন্তানপালন ও সন্তানের শিক্ষাদীক্ষার সুব্যবস্থা করাতে, আমাদের প্রাচীন সমাজে কেবল যে পিতা-মাতার স্বাভাবিক স্নেহবৃত্তিই চরিতার্থ হইত, তাহা নহে। সন্তানগণকে শিক্ষাদীক্ষা দিয়া পিতামাতা অজ্ঞাতসারে আপনাদের বার্দ্ধক্যের ভরণপোষণের ব্যবস্থাও করিতেন। সন্তান-পালন ও সন্তানের শিক্ষাদান, আধুনিক কালের জীবন-বীমার উদ্দেশ্যও সহজে সাধন করিত। এই জন্য স্বাভাবিক স্নেহের চরিতার্থতা দ্বারাই লোকের সাংসারিক স্বার্থও সাধিত হইত। য়ুরোপীয় সমাজে স্বাভাবিক স্নেহের ও সাংসারিক স্বার্থের এ অপূর্ব্ব সমাবেশ হয় নাই। সেখানে মানুষের স্বাভাবিক স্নেহকে সংসার-বুদ্ধিতে আপনা হইতেই বাড়াইয়া তোলে না। আর স্বাভাবিক স্নেহও সেখানে সংসার-বুদ্ধিকে না জাগাইয়াই তৃপ্ত করিতে পারে না। য়ুরোপের সমাজগঠনই এরূপ যে সেখানে মানুষের স্বাভাবিক স্নেহমমতা প্রাণকে এক দিকে টানে, আর তাহের সংসারবুদ্ধি তাহাকে অপর, বিপরীত দিকে টানিয়া রাখিতে চায়। স্নেহ ও স্বার্থের মধ্যে এই অস্বাভাবিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিবন্ধন, স্নেহ ক্ষীণতর ও স্বার্থ ক্রমেই বলবত্তর হইয়া উঠিতেছে। স্নেহ বলে—"সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণে ও শিক্ষাদীক্ষায় আপনার সর্ব্বস্ব ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইও না।" স্বার্থ বলে—"সময় ও শক্তি থাকিতে ভবিষ্যতের বার্দ্ধক্যের অসহায় অবস্থার ব্যবস্থা করিয়া রাখ। যে সন্তান বড় হইলে আপনি যাইয়া আপনার ঘর বাঁধিবে, আপনার সংসার লইয়াই বিব্রত হইবে, তোমাদের মুখপানে তাকাইবার তার আর অবসর থাকিবে না, সেই সন্তানের শিক্ষাদীক্ষার জন্য এখন আপনাকে একেবারে নিঃস্ব করিও না। আপনারটী বাঁচাইয়া, যতটা পার, সন্তানসন্ততির পরিচর্য্যা কর।" এই দু'টানায় পড়িয়া, মানুষের মন স্বভাবতঃই নিরতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠে, ও তাহার সহজ স্নেহপ্রবৃত্তি ক্ষীণতর হইতে আরম্ভ করে। য়ুরোপের সমাজগঠনই এরূপ যে সেখানে পিতা ও পুত্রের, মাতা ও কন্যার

মধ্যেও একটা অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতার ভাব, অন্তর্লিপ্সার মত, লোকচক্ষুর অন্তরালে, আপনাদিগের অজ্ঞাতসারে ভিতরে ভিতরে জাগিয়া রহে। জোর করিয়া সকলকে স্কুলে আনিয়া যে লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা সে দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ক্রমশঃই তাহাতে এই ভিতরকার প্রতিযোগিতাকে বাহিরে টানিয়া আনিয়া পারিবারিক জীবনের সহজ স্নেহমমতার সম্বন্ধগুলিকে ক্ষুণ্ণ করিয়া, শিক্ষার নামে মনুষ্যত্বকে একান্তভাবে নষ্ট করিবার উপক্রম করিতেছে।

এই সার্ব্বজনীন সাধারণ শিক্ষার প্রথম ফলস্বরূপ বিলাতের শিশুসন্তানদিগকে ক্রমশঃই পিতামাতা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তুলিতেছে। গরীব পরিবারে সর্ব্বত্রই সাত আট বছরের ছেলে-মেয়েরা সংসার-কার্য্যের অনেক সাহায্য করিয়া থাকে, নয় দশ এগার বার বৎসরের ছেলেমেয়েদের তো কথাই নাই। ইহাদিগকে জোর করিয়া স্কুলে পাঠাইলে, তাহাদের পরিবার এই সাহায্যটুকু হইতে বঞ্চিত হয়, ও তাহাদের দারিদ্র্য-ক্লেশ আরো বাড়িয়া উঠে। একদিকে সন্তানদের দ্বারা সংসারের যে সাহায্য হইত, তাহা পাওয়া যায় না, অন্যদিকে তাহাদিগকে যথাসময়ে ধুইয়া পুছিয়া, খাওয়াইয়া পরাইয়া স্কুলে পাঠাইতে হয় বলিয়া, তাহাতে সংসারের খরচ আরো বাড়িয়া যায়। এই কঠিন সমস্যায় পড়িয়া অনেক দুঃস্থ জনকজননী স্কুল ছুটী হইলে ছেলেদিগকে অর্থোপার্জ্জনে নিযুক্ত করিয়া থাকে। সারাদিন স্কুলে থাকিয়া, বেচারিরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে বা সন্ধ্যাকালে বাড়ী আসিয়া, অমনি খবরের কাগজ বিক্রী করিয়া, কিম্বা লোকের চিঠিপত্র বিলি করিয়া, বা অপর কোনো কাজে যাইয়া কিছু উপার্জ্জন করিতে বাধ্য হয়। রাত্রে ঘরে দু'পয়সা লইয়া না আসিলে পিতামাতার নিকট শাস্তি পাইয়া থাকে। এ অবস্থায় একদিক্ দিয়া শিশুদিগের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, অন্যদিকে পিতামাতা ও সন্তানসন্ততির মধ্যে স্বাভাবিক স্নেহ ও ভক্তির সম্বন্ধটা একেবারেই ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হয়। একেই তো য়ুরোপীয় সমাজে স্নেহ ও স্বার্থের মধ্যে একটা নিত্য বিরোধ জাগিয়া আছে, তাহার উপরে এই সার্ব্বজনীন সাধারণ শিক্ষার প্রচলনে এই বিরোধটাকে আরো ফুটাইয়া ও বাড়াইয়া তোলে। ইহার দ্বারা কখনই সমাজের কল্যাণ হইতে পারে না।

জনগণকে আপনাদের স্বত্ব ও অধিকার বুঝিবার ও রক্ষা করিবার সামর্থ্য প্রদান করাই এই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, আর নিজ নিজ স্বত্ব ও অধিকার বোঝার অর্থই নিজ নিজ স্বার্থ সম্বন্ধে ভালো করিয়া সজাগ ও সচকিত হওয়া। যতই জনগণমধ্যে এইরূপ স্বার্থ প্রবল হইয়া উঠে, ততই সমাজ মধ্যে বিভিন্ন লোক ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিষম প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়িয়া চলে। কে কাকে নিচু করিয়া আপনি বড় হইয়া উঠিবে, কে কার মুখের অন্ন কাড়িয়া খাইবে, এই লইয়া জনগণের মধ্যে মারামারি হড়োহুড়ি লাগিয়া যায়। ইহাতে মনুষ্যত্বের হানি হয়, ও সমাজে বিপ্লব আসিয়া পড়ে। য়ুরোপে ইহাই হইতেছে। আর আমরা ও কি শিক্ষা-বিস্তারের

নামে, দেশোন্নতির দোহাই দিয়া, এই সাংঘাতিক ব্যবস্থাকে দেশে প্রচলিত করিয়া, যে সমাজ চিরদিন জগতে পরার্থপরতার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আছে, তাহার বুকে এই আত্মঘাতী স্বার্থানুসন্ধানকে প্রতিষ্ঠিত করিব, এই বিষময় কুশিক্ষা অপেক্ষা আমাদের বর্ত্তমান অশিক্ষাই কি অনেকগুণে ভাল নয়? ইহাই এখন ভাবিবার কথা।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

মুগ্ধা

(১৪)

নরেন্দ্রের বসিবার ঘরের একটা দরজা বাড়ীর ভিতরের উঠানের দিকে ছিল। একদিন সুশীলা বাহ্যোপলক্ষে সেই খান দিয়া যাইতেছিল, নরেন্দ্র ঘরের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "টেবিলের উপর আমার চসমাটা আছে নিয়ে এস তো।"

সুশীলা বিনা বাক্যব্যয়ে বসিবার ঘরে ঢুকিয়া সোজা টেবিলের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। ঠিক সেই সময় নরেন্দ্র ভিতরের দুয়ারটি বন্ধ করিয়া দিল। সুশীলা একটু চমকিয়া সে দিকে চাহিতেই দেখিল ঘরের পার্শ্বে একখানি ইজি চেয়ারে বসিয়া—অনিল।

সে ঘরে প্রবেশ করিবার সময় তাহাকে লক্ষ্য করে নাই, এখন দেখিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ হিম হইয়া গেল। মুহূর্ত্ত পরে যখন সেই জড়তা দূর হইল, তখন তাহার বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গ বেতসপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল।

অনিলও এই ব্যাপারে বড় বিব্রত হইয়া গেল, সেও বুকের ভিতর কি এক অনির্দ্দিষ্ট যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল। সে ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল, কি করিবে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। শেষে ভূমির দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ পর ভাঙ্গা আওয়াজে বলিল, "সুশীলা, এই—এই—"

তখন নরেন্দ্রনাথ দ্বার খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত জোরের সহিত হাসিয়া বলিল, "কি গো, অনেক দিনের পর প্রিয়-সম্ভাষণ, কি কথা হ'চ্ছে?"

সুশীলা তখন অনেকটা আত্মসম্বরণ করিয়াছে, তীব্র তড়িতালোকে তাহার চক্ষের সমক্ষে তাহার স্বামীর সমস্ত অভিপ্রায় সহসা সুস্পষ্ট হইয়া ভাসিয়া উঠিল। সে স্থির অবিচলিত ভাবে দাঁড়াইয়া কেবল তাহার স্বামীর দিকে একবার তীব্র কটাক্ষ-পাত করিল; তাহার পর সে নত নেত্রে মন্ত্রমুগ্ধ শবের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

সুশীলার যন্ত্রণায় নরেন্দ্র একটা পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করিতেছিল; রক্তের আস্বাদে উন্মত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহার প্রতিহিংসা আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল, সে আরও হাসিতে লাগিল। কিছুক্ষণ

পরে সে অনিলকে বলিল, "তোমার নিমন্ত্রণের কথাটা এঁকে ব'লেছ, কি ?"

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে দুই বন্ধুতে মিলিয়া পরামর্শ হইতেছিল যে, অনিল একবার তার পূর্ব্বপ্রণয়িনীর হৃদয় বিদ্ধ করিবার জন্য তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার বর্ত্তমান জীবনের সমস্ত গৌরব দেখাইবে, এবং সুশীলার চক্ষের সম্মুখে তাহার বিলাতী পত্নীটিকে অতিমাত্র সোহাগ দেখাইয়া তাহাকে দগ্ধ করিবে। বেচারা সবে তিন দিন হইল দেশে ফিরিয়াছে সে তখনও জানিত না যে সুশীলা নরেন্দ্রেরই স্ত্রী। নরেন্দ্রের এই নিষ্ঠুর পরিহাসের কথা কল্পনাও আনিতে পারে নাই।

নরেন্দ্রের কথায় অনিল ভ্রূকুঞ্চিত করিল। একটু ভাবিয়া, বলিল, "না বলি নি ; সুশীলা, আমার স্ত্রী অসুস্থ ব'লে আসতে পারেন নি, আমি তোমাকে ও নরেনকে কাল রাত্রে আমার বাড়ীতে আহারের নিমন্ত্রণ করতে এসেছি ! তোমার কোনও আপত্তি আছে কি ?"

সুশীলা শুধু বলিল "না" ; কিন্তু সেই ক্ষুদ্র কথা বলিতে তাহার হৃদয়ের সমস্ত বলের প্রয়োজন হইয়াছিল। সে অনবরত ঘামিতেছিল।

অনিল তখন তাড়াতাড়ি বিদায় হইল। সেও সমস্ত অবস্থাটা অত্যন্ত তীব্রতার সহিত এখন অনুভব করিতেছিল। নরেন্দ্রের ব্যবহার আর সুশীলার এই মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার মনের ভিতর একটা বিপুল বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল।

অনিল চলিয়া গেলে সুশীলা ধপ করিয়া একখানা ইজি-চেয়ারে শুইয়া পড়িল। নরেন্দ্র হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো, বড় অসুখ করছে কি ?"

সুশীলা কথা কহিল না। তাহার মাথা ঘুরিতেছিল ; মনের ভিতর দিয়া এতগুলি কথা তীব্রবেগে চলিয়া গেল যে সে তাহার বেগে একেবারে অবসন্ন হইয়াছিল। সব কথা বুঝিতে পারিয়াও যেন সে কিছুই স্পষ্ট বুঝিতে পারিল না। দু'হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া চক্ষু বুজিয়া সে পড়িয়া রহিল। সে প্রাণপণ করিয়া সব কথা একটু স্পষ্ট করিয়া ভাবিতে চেষ্টা করিল।

নরেন্দ্র যে সব কথা জানিয়াছেন এবং তাহার শাস্তিবিধানের জন্যই যে এই আয়োজন করিয়াছেন, এ সত্য প্রথম মুহূর্ত্তেই তাহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়া গিয়াছিল। স্বামীর হাসির ভিতর পৈশাচ প্রতিহিংসার এমন একটা বিকট আনন্দ সে দেখিতে পাইয়াছিল যে তাহাতে তাহার হৃদয়ের সমস্ত অভিমান জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল।

নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "স্মেলিং সল্টটা আনিতে বলিব কি ?" এই তীব্র বিদ্রূপ শেলের মত সুশীলার অন্তরে বিদ্ধ হইল। সে বলিল "কোনও প্রয়োজন নাই, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছি।"

তখন নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কাল তা' হলে অনিলের ওখানে যাচ্ছ।"

দৃঢ়ভাবে সুশীলা উত্তর করিল "না।"

"সে কি ! অনিলকে তুমি বলে দিলে যে !"

সুশীলা আর সহ্য করিতে পারিল না, বলিল, "দেখ, আমার সঙ্গে আজ লুকোচুরি

ক'রো না ; তোমার মনের ভিতর যা হ'চ্ছে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমি কি করেছি যে, তুমি আমাকে এমনভাবে অপমান ক'রতে বসেছ, আমি কি তোমাকে একদিনের তরেও একবিন্দু ভালবাসা এমন নেই নিয়া স্মরণ ক'রে তুমি আমার অপমানে তোমার তীব্র আনন্দ দমন ক'রতে পার ?"

মরেন্দ্র তখনও হাসিতেছেন, হাসিয়া বলিলেন "তোমার এত বড় বক্তৃতার কোনও তাৎপর্য্য আমি বুঝিতে পারিলাম না।"

সুশীলার হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, এই দীর্ঘকাল তাহার স্বামী হৃদয়ের ভিতর যে কালানল পুষিয়া তাহার সহিত প্রতারণা করিয়া আসিয়াছে, সেই অভিযোগের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত স্মরণ হইয়া তাহার হৃদয়কে কষাঘাত করিতে লাগিল। সে বলিল, "এখন তুমি কিছু বুঝিবে না, এখন বুঝিবে যে, যে সরলহৃদয়া অসহায়া বালিকা তোমাকে আত্মসমর্পণ করিয়া আপনার জীবনের সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহাকে তাহার অতীতের একটা তুচ্ছ কথা লইয়া দারুণ অপমান করায় বড় আনন্দ। কিন্তু শীঘ্রই বুঝিবে, আমার মৃত্যু হইলে বুঝিতে পারিবে যে, যে কোমল হৃদয় তুমি দারুণ অপমানে নিষ্পেষিত করিয়াছিলে সে হৃদয়ের একটা মূল্য আছে। জগদীশ্বর সাক্ষী, আমি জীবনের সর্ব্বস্ব দিয়া তোমাকে ভাল বাসিয়াছি, সে ভালবাসা তুমি একটা তুচ্ছ কথার জন্য পায় দলিতেছ। এমন দিন আসিবে যে সেই ভালবাসার জন্য তুমি কাঁদিয়া বেড়াইবে। তুমি মনে ভাবিয়াছ, আমাকে দারুণ অপমানে জর্জ্জরিত করিয়া আমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত বিষময় করিবে, কিন্তু আমি তোমাকে নিরাশ করিব, তোমায় সে আনন্দলাভ করিতে দিব না।"

বলিয়া বেগে সুশীলা সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, আপনার ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। সমস্ত দিন সে দ্বার খুলিল না। শ্বশুর-শাশুড়ী সকলে ডাকাডাকি করিলেন, সুশীলা উঠিল না, কেবলই ভিতর হইতে বলিল, "আমার জন্য তোমরা কোনও চিন্তা করিও না, আমি এখন উঠিতে পারিব না।"

সুশীলার শ্বশুর তাহার পিতার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। পিতা সন্ধ্যার সময় ব্যস্ত হইয়া আসিলেন। যোগেন্দ্রনাথ ডাকিতেই সুশীলা দ্বার খুলিয়া দিল। তখন তাহার সমস্ত মুখ কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে, কেশরাশি আলুথালু হইয়া মুখে চোখে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, সমস্ত অঙ্গ একটা তীব্র উত্তেজনায় কাঁপিতেছে। পিতাকে ঘরে বসাইয়া সুশীলা বলিল "বাবা, আমাকে এখনই লইয়া চল।"

যোগেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন মা, কি হয়েছে !"

সুশীলা বলিল, "সে কথা এখন প্রাণ গেলেও বলিব না। তুমি আমায় লইয়া চল।"

যোগেন্দ্রনাথ কন্যার এ মূর্ত্তিতে তাহার শৈশবের প্রকৃতির প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলেন, ইহার বিরুদ্ধে চলিলে অনর্থ ঘটিবে জানিয়া বলিলেন, "আচ্ছা দেখি।"

সুশীলার শ্বশুরের নিকট গিয়া যোগেন্দ্রনাথ সকল অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। "ছেলের সঙ্গে কি লইয়া ঝগড়া হইয়াছে" ইহার বেশী

তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন যোগেন্দ্রনাথ মেয়েকে লইবার কথা পাড়িলেন, সুশীলার শ্বশুর আপত্তি করিলেন না, বলিলেন "কথা মন্দ নয়, দু'চার দিন তফাতে থাকিলে দু'জনেই দু'জনকে ক্ষমা করিতে শিখিবে।"

তখনই যোগেন্দ্র কন্যাকে লইয়া আসিলেন। সমস্ত দিন নরেন্দ্র অপরাধীর ন্যায় নীরবে রহিলেন।

পিত্রালয়ে আসিয়া সুশীলা মাতাকে বলিল, "মা আমি জন্মের মত তোমার ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছি। স্বামী আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন। তোমরা আমাকে আশ্রয় দিতে পারিবে কি? চিরজীবন তোমার মেয়েকে অন্ন দিতে পারিবে কি?

সুশীলার মা বলিলেন "এমন অকল্যাণের কথা ব'লো না। যতদিন ইচ্ছা তুমি এখানে থাক, তুমি বই আমাদের কে আছে মা? কিন্তু ও কথা মুখেও আনিও না; দুদিন যা'ক সব মিটে যাবে।"

সুশীলা বলিল "এ বিপদ মিটিবার নয়। সব কথা তোমাকে ব'লবো, কিন্তু আগে আমাকে নিয়ে তোমরা কাশী চল। আমি কাশীবাস ক'রবো।"

মা তাহাতে নারাজ, বাপও সহসা সম্মত হইলেন না। কিন্তু সুশীলার ইচ্ছাই বলবতী হইল। তাহার পিতাও শেষে বুঝিলেন, কিছু দিন স্থানপরিবর্ত্তন করিলে তাহার স্বাস্থ্য ভাল হইতে পারে। অতএব সুশীলার শ্বশুরকে বলিয়া, সকলে কাশী যাত্রা স্থির করিলেন।

(১৫)

সুশীলার সঙ্গে সাক্ষাতের পর অনিলের চিত্তে বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল। তাহার দীর্ঘ কালের পোষিত প্রতিহিংসাবৃত্তি তিরোহিত হইল; সে যে কিরূপে সুশীলাকে কষ্ট দিয়া আনন্দ উপভোগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহাই ভাবিতে সে অবাক হইয়া গেল।

অতীত ঘটনা আলোচনা করিয়া সে আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাহার সম্মুখে সুশীলা যখন বিবর্ণ ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল, তাহার সেই ভীতত্রস্ত মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার সমস্ত ধারণাগুলি একেবারে ওলট-পালট হইয়া গেল। তবে কি সে সুশীলাকে ভুল বুঝিয়াছিল? সে তখন অতীত জীবনের ঘটনাগুলির পুনরাবৃত্তি করিল। দেখিল বাস্তবিকই সে সুশীলাকে ভুল বুঝিয়াছিল। সুশীলা যে তাহার আলিঙ্গনে ধরা দিয়াছিল, সে হয় তো একটু ক্ষণিক মোহ। তখনই তাহার মনে পড়িল তাহার সেই ভীত মূর্ত্তি, তাহার তীব্র কটাক্ষ, তাহার পরুষ তিরস্কার। অনিলের মনে হইল যে, সে আপনি অপরাধী, সুশীলার কোনও দোষ নাই। তাহারই দুষ্টতা সীমা অতিক্রম করিয়াছিল, সুশীলা হয় তো না বুঝিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। হয় তো সে কল্পনা করে নাই যে অনিল তাহাকে আলিঙ্গন করিবে। কি অকিঞ্চিৎকর ঘটনা লইয়া সে সুশীলাকে অপরাধী করিয়াছে এবং নিজের জীবন বিষময় করিয়াছে তাহাই ভাবিয়া অনুশোচনায় তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল।

অনুতাপের তীব্র জ্বালা তাহাকে বিশেষ অস্থির করিল। নরেন্দ্রের নিকট অজ্ঞাতসারে তাহার ভাবপ্রকাশের চিন্তায় নরেন্দ্র যে সুশীলার স্বামী তাহা না জানিয়া সে তাহাকে সুশীলা সম্বন্ধে এমন একটা ধারণা

দিয়াছে যে কোনও স্বামী তাহা লইয়া স্ত্রীকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভাল বাসিতে পারে না। নরেন্দ্র যেরূপ ব্যবহার করিল তাহাতেও অনিলের মনে হইতে লাগিল, তাহার মনের ভিতর তীব্র হলাহল। নরেন্দ্রের তাহার প্রতি প্রগাঢ় আত্মীয়তার কারণ কি তাহা অনিল অনুমান করিল। অনিলের দ্বারা নরেন্দ্র সুশীলার জীবনকে বিষময় করিবে এই ইচ্ছা সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাইল। নরেন্দ্র একবার তাহাকে লিখিয়াছিল, "আমি যদি কোনও উপায়ে তোমার এই প্রতিহিংসাকল্পে সহায়তা করিতে পারি, তবে সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা করিব, তাহা নিশ্চয় জানিও।" এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য এখন অনিলের মানস-পটে সুস্পষ্ট হইয়া প্রতিভাত হইল।

নরেন্দ্রের উপর তাহার বড় ঘৃণা হইল। কিছুক্ষণ পরেই সে বুঝিতে পারিল অপরাধ সম্পূর্ণ তাহার, নরেন্দ্রের কোনও দোষ নাই। তখন সে ভাবিতে লাগিল কি উপায়ে সমস্ত অবস্থার প্রকৃত প্রতিকার করা যায়। কি উপায়ে আবার সব জোড়া লাগাইতে পারা যায়। যদি কোনও পথ থাকে তাহা অবলম্বন করা তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, ইহা সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল।

পরদিন সকালে বসিয়া সে কি করিবে ভাবিতেছে এমন সময় নরেশনাথ তাহার ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া অনিল বিস্মিত হইয়া গেল। তাহার মুখে আর সে তীব্র পৈশাচ আনন্দলেখা নাই। মনটা যেন উদাস, চেহারাটাও কেমন রুক্ষ রুক্ষ। গতরাত্রে তাহার মনের ভিতর যে প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া গিয়াছে তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন তাহার মুখমণ্ডলে ব্যক্ত রহিয়াছে।

নরেন্দ্র একখানি চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিলেন "আজ তোমার বাড়ীতে আমাদের আসা হ'বে না।"

অনিল জিজ্ঞাসা করিল "কেন?" নরেন্দ্র অকপটে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন "গৃহিণীর এ রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি আমি কখনও দেখি নি! সত্যকথা বলিতে কি এখনো তাহার কাছে অগ্রসর হইতে ভয় হয়।"

অনিল দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আমি একদিন দেখিয়াছিলাম, এখনও আমার চক্ষের সম্মুখে সেই মূর্ত্তি জ্বল জ্বল করিতেছে। সে কথা পরে বলিব। যা'ক, তুমি তো আসিবে?"

"না, আমার মনটা বড় বড় খারাপ, আমি আসিতে পারিব না।"

কিছুক্ষণ দুজনে নীরব রহিল। তাহার পর অনিল নরেন্দ্রকে বলিল, "আমি তোমাদের দু'জনার কাছে বড় অপরাধী আছি, তুমি আমায় ক্ষমা করিবে কি?"

নরেন্দ্র দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "তোমার কি দোষ বল? দোষ আমার অদৃষ্টের।"

"অদৃষ্টের ঘাড়ে অতটা চাপাইয়া আমি আমার বিবেককে শান্ত করিতে পারি না। কাল হইতে আমি দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। তোমাদের যে সুখের সংসার ভাঙ্গিয়াছে সে কেবল আমারই অপরাধে।"

নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ের দুঃসহ দুঃখ আর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসে প্রশ্বসিত হইল, সে বলিল

"তুমি আমার উপকার করিয়াছ, আমি একটা মহামোহে আচ্ছন্ন ছিলাম, সত্যের ছুরিতে সেই অসত্য আবরণ ভিন্ন করিয়া ভিতরের দুষ্ট ক্ষত বাহির করিয়া দিয়াছ। তুমি কেবল সত্য কথা বলিয়াছ এই তোমার অপরাধ।"

"আমি সত্য কথা বলি নাই, ইহাই আমার অপরাধ।" নরেন্দ্র চমকিত হইলেন সুশীলার শেষ মুহূর্ত্তের পরিচয় মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারও সন্দেহ হইতেছিল যে, এ মূর্ত্তির ভিতর কোথাও অসত্য থাকিতে পারে না। কিন্তু আর সকল অবিশ্বাস করিলেও অনিল সুশীলাকে যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহা কিছুতেই অবিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

অনিল বলিল "আমি যে কেবল একটি সরল বিশ্বাসময়ী বালিকার প্রতি অতি দুষ্ট ও অসমসাহসিক ব্যবহার করিয়াছি তাহা নহে, আমি তাহার নামে মিথ্যা কলঙ্কের প্রচার করিয়া তাহার সমস্ত জীবন নষ্ট করিতে বসিয়াছি। আমার অপরাধের ক্ষমা নাই।"

নরেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অনিলের উপর তীব্র দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিলেন, "সব মিথ্যা?"

অনিল স্থিরভাবে দৃষ্টি নত করিয়া বলিল, "সব মিথ্যা।"

দৃঢ় কণ্ঠে নরেন্দ্র বলিলেন, "শুন অনিল, আমার দিকে চাহিয়া আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তুমি সুশীলার কাছে চিঠিতে যাহা লিখিয়াছিলে তাহাও কি মিথ্যা?"

অনিল স্থির করুণ দৃষ্টি নরেন্দ্রের মুখের পর স্থাপন করিয়া বলিল, "মিথ্যা।"

নরেন্দ্রনাথ বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "এ ধাঁধার অর্থ আমি বাহির করিতে পারিতেছি না। একটু বিশদ করিয়া বুঝাইয়া বল। তুমি সুশীলাকে ভাল বাসিতে না?"

"বাসিতাম।"

"সুশীলা তোমাকে ভালবাসিত?"

"না।"

"তবে তুমি কেন এই নিষ্ঠুর অসত্য প্রচার করিয়া দুইটি প্রাণীর জীবনের সব সুখ হরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলে? কেন এই পিশাচের প্রবৃত্তি তোমার ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল? আগা-গোড়া এই দুই বৎসর কাল ধরিয়া তুমি এ কি কুৎসিৎ প্রবঞ্চনা দ্বারা আমাদের সুখ হরণ করিতে বসিয়াছিলে? সকল কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া বল।"

নরেন্দ্রনাথের আকুলতাপূর্ণ অথচ দৃঢ় বাক্যে অনিল কিছু ভীত হইল; সে বলিল, "তুমি স্থির হইয়া বস, আমি সব কথা তোমায় খুলিয়া বলিব।" বলিয়া অনিল একে একে, সমস্ত প্রকৃত অবস্থা এখন যেরূপ বুঝিয়াছিল বিবৃত করিল। শেষে বলিল, "আগা-গোড়া আমি তোমার সঙ্গে মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া তুমি আমায় ঘৃণা করিবে, কিন্তু আমি কাল হইতে আপনাকে যত ঘৃণা করিতেছি, তাহার অধিক ঘৃণা তুমি করিতে পারিবে না। কিন্তু আমি জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা বলি নাই; আমারও চক্ষে কি একটা মোহ আবরণ পড়িয়াছিল, আমি সব উল্টা বুঝিয়াছিলাম। যেখানে আমার অপরাধ, সেখানে আমি আশ্চর্য্যভাবে সুশীলার উপর দোষারোপ করিয়া বসিয়াছিলাম, আমি নিজে যে সুশীলার উপর

অন্যায় অত্যাচার করিয়াছি, তখন আশ্চর্য্য ভাবে মনে করিয়াছি আমার উপরই সকলে যেন অত্যাচার করিতেছে। আমার একটা দারুণ মোহের ঘোর আসিয়াছিল, তাই সকলই ভুল বুঝিতেছিলাম। সে মোহ-ঘোর কাল তোমার স্ত্রীকে দেখিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আজ আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি গত তিন বৎসর আমার জীবন একটা প্রকাণ্ড ভুলে কাটিয়া গিয়াছে।"

নরেন্দ্র হাতে মাথা চাপিয়া নীরবে সমস্ত শুনিলেন। তাঁহার বড় আনন্দ হইল, বড় ক্ষোভ জন্মিল। আপনার প্রতি ধিক্কারে হৃদয় ভরিয়া গেল।

তাহার পর দে অবস্থায় যথাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া উভয়ে স্থির করিলেন যে, তখনি দু'জনে ভবানীপুর যাইবেন ও সেখানে যাইয়া সুশীলার কাছে অপরাধ স্বীকার করিবেন।

অনিল প্রথমে তাহাতে নারাজ হইল। সে কিছুতেই সুশীলার কাছে আর মুখ দেখাইতে সম্মত হইল না। কিন্তু পরিশেষে উভয়েই ভবানীপুর যাত্রা করিল।

(১৬)

ভবানীপুর যোগেন্দ্র বাবুর বাসায় যখন গাড়ী আসিয়া লাগিল, তখন সুশীলা উপরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া চুল শুকাইতেছিল। গাড়ী থামিতেই সে আগ্রহ সহকারে মুখ বাড়াইয়া দেখিল। নরেন্দ্রকে গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়া তাহার চিত্ত আশায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সে ভাবিল বুঝি বা নরেন্দ্র আপনার দোষ দেখিতে পাইয়াছেন তাই অপরাধ স্বীকার করিতে আসিয়াছেন। তাহার পরই Ingeএর প্রতিমূর্ত্তি অনিলকে নামিতে দেখিয়া তাহার সকল আশা তিরোহিত হইল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বলিয়া উঠিল। সুশীলা তখন ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল, দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভিতরে বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে সুশীলার মা তাহাকে ডাকিতে আসিলেন সুশীলা দ্বার খুলিল না। মুহূর্ত্ত পরে নরেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি সস্নেহে ডাকিলেন, "সুশীলা, দ্বার খোল।"

সেই সস্নেহ সম্ভাষণ শুনিয়া সুশীলার প্রতিজ্ঞার বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায় যায় হইল, কিন্তু সে তবু বসিয়া রহিল। পরিশেষে নরেন্দ্র যখন বিফলমনোরথ হইয়া চলিয়া গেলেন, তখন তাহার মনে দারুণ অনুশোচনার সঞ্চার হইল। সে দেখিতে পাইল অনিলের সহিত নরেন্দ্র গাড়ীতে চড়িয়া চলিয়া গেল। "কি করিলাম" বলিয়া সুশীলা বিছানায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

নরেন্দ্র বড় অপমানিত বোধ করিলেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন আর যাইবেন না। ভাবিলেন "এত গর্ব্ব! স্বামী হইয়া কখনই সহ্য করিব না, এ গর্ব্ব ভাঙ্গিব। যার স্ত্রী নাই সে কি বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।"

সেই রাত্রে সুশীলা যখন পিতার সঙ্গে কাশী চলিয়া গেল, তখন তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, তাহার স্বামীর সহিত যেন জন্মের মত দারুণ বিচ্ছেদ সে আপনি ঘটাইল। তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

সমস্ত দেখিয়া অনিল বেচারার চিত্তের শান্তি একেবারে অন্তর্হিত হইল। সে যে কি

করিবে কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না। কিছু দিনের মধ্যেই সে সুস্থ মনে তাহার কর্ম্মস্থান গয়ায় চলিয়া গেল।

(১৬)

ইহার পর ছয়মাস অতীত হইয়া গেল। পূজার অবকাশে অনিল নরেন্দ্রের সহিত হইতিন সপ্তাহের জন্য দেশ পর্য্যটনে বাহির হইল। তাহারা পশ্চিমে দিল্লী আগরা প্রভৃতি স্থান দেখিয়া ফিরিবার সময় অনিল বলিল "কাশীটা একবার হইয়া যাওয়া যাক!" কিন্তু নরেন্দ্র কিছুতেই কাশীতে পদার্পণ করিতে সম্মত হইলেন না। অতঃপর অনিল বলিল, "কাশীতে না হয় নাই নামা গেল, কিন্তু তাই বলিয়া কাশীর দৃশ্যটাও কি একবার দেখিব না।" শেষে স্থির হইল চুনার ষ্টেশনে নামিয়া সেখান হইতে নৌকা করিয়া কাশী অতিক্রম করিয়া যাওয়া হইবে। তাহারা শুনিয়াছিল কাশীর নদীতীরের দৃশ্য বড়ই সুন্দর।

অপরাহ্নে যখন তাহারা বারাণসীর নিকটবর্ত্তী হইল তখন কাশীর নদীকূলে গৃহশ্রেণির বিশাল সৌন্দর্য্য তাহাদিগকে মুগ্ধ করিল। সেই অনন্ত অসংখ্য সৌধসমূহ দেখিয়া তাহাদের কেবলি মনে হইতে লাগিল যেন বাড়ীগুলি সকল ভিড় করিয়া একটার উপর আর একটা পড়িয়া গঙ্গাস্নানে যাত্রীর মত গঙ্গার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তদ্ধারিণ ব্রিজ অতিক্রম করিয়া যখন তাহাদের নৌকা ধীর তরঙ্গে পড়িয়া ধীরে ধীরে নাচিয়া চলিল তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। অনিল মাঝিকে কাশীর তীরের নিকট দিয়া নৌকা লইতে বলিল, নদীতীরবর্ত্তী বিশাল সৌধশ্রেণীর কোথাও বা বিশালকায় বটবৃক্ষের ছায়ায় ছায়ায় নৌকা মৃদু হিল্লোলে নাচিয়া নাচিয়া চলিতে লাগিল। অনিল ও নরেন্দ্র অবাক হইয়া তীরের গৃহগুলি দেখিতে লাগিলেন।

নৌকা দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে আসিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, গঙ্গাতীর প্রায় জনশূন্য হইয়াছে, কোথাও বা এক আধ জন বিধবা সান্ধ্যস্নান দ্রুত সমাপ্ত করিতেছে, কেহ বা স্নান সমাপ্ত করিয়া সন্ধ্যা বন্দনা করিতেছে। দশাশ্বমেধের বিশাল সোপান বক্ষে স্থানে স্থানে এক একটী সন্ন্যাসী, কেহ বা দুই চারিজন সেবক পরিবৃত হইয়া, কেহ বা একাকী বসিয়া গল্পিকা সেবন করিতেছেন, না হয় ঝিমাইতেছেন, ঘাটের শেষ দিকে একটি যুবতী তসরের চওড়া লাল পেড়ে সাড়ী পরিয়া একখণ্ড ধাকাও ভাঙ্গা শানের উপর বসিয়া একাগ্র চিত্তে গঙ্গার জলের দিকে চাহিয়া আছে। তাহার নিকটেই একটি হারিকেন লণ্ঠন জ্বলিতেছে। দূর হইতে রমণীকে দেখিয়া নরেন্দ্র ও অনিল উভয়েই চমকিত হইলেন; নরেন্দ্র বলিলেন, "অনিল চল আমরা ভিতরে যাই।" বলিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। নৌকা ধীরে ধীরে সেই সোপানাবলির নিকট দিয়া বহিয়া চলিল।

রমণী আর কেহই নয়—সুশীলা। সে একদৃষ্টে গঙ্গার জলের পানে চাহিয়া ছিল, কিন্তু তাহার মন মোটেই সেখানে ছিল না। সে আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতেছিল, আর তাহার দুটি চক্ষু হইতে গণ্ড বহিয়া অজস্র অশ্রু

করিতেছিল। নৌকা তাহার অত্যন্ত নিকটে সম্মুখ দিয়া বহিয়া চলিল, সুশীলা কিছুই লক্ষ্য করিল না। কিন্তু ঠিক সেই সময় তাহার সমস্ত হৃদয় মথিত করিয়া একটী করুণ গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। নরেন্দ্র নৌকার ভিতর হইতেই চঞ্চুকর্ণধার হইয়া সুশীলাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাঁহার কাণে এই নিঃশ্বাসের শব্দ পৌঁছিল, তাঁহার হৃদয় সেই ক্ষুদ্র নিঃশ্বাসে মহা আলোড়িত হইল, নরেন্দ্র নৌকার ভিতর হইতে ছুটিয়া বাহির হইলেন। মাঝিকে বলিলেন, "নৌকা লাগাও"

অমনি নৌকা ফিরাইল। নৌকা তীরের নিকটবর্ত্তী হইবা মাত্র তিনি তীরে লাফাইয়া পড়িলেন, দ্রুতবেগে সুশীলার নিকট যাইয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন।

সুশীলা তখনও অন্যমনস্ক। নরেন্দ্র ডাকিলেন, "সুশীলা!"

সুশীলা ত্রস্তা হরিণীর ন্যায় মুখ তুলিয়া পশ্চাতে চাহিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইতেই নরেন্দ্র তাহার দুই হাতে দুই হাত ধরিয়া বলিলেন, "সুশীলা আমি তোমার কাছে বড় অপরাধী আমায় ক্ষমা করিবে কি?"

সুশীলা অশ্রুপূর্ণ মুখ তাঁহার বুকে রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তুমি কি অপরাধিনীকে ক্ষমা করিয়াছ?" আর বলিতে পারিল না। সেই মধুর সন্ধ্যায় ভাগীরথীর মৃদু কল্লোলের মধ্যে তাহা অপেক্ষাও মৃদু মধুর যে হৃদয়ের নীরব আলাপ হইল, তাহাতে দুজনেই বুঝিতে পারিল আর তাহাদের মধ্যে কোনও অন্তরায় নাই; সকল ত্রুটি সকল অপরাধ সেই মিলনের আনন্দগৌরবে ভাগীরথীর স্রোতের সম্মুখে ঐরাবতের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে নরেন্দ্র বলিলেন, "এত অন্ধকারে তুমি একা এখানে কেন?

সুশীলা বলিল "আমি একা নই, ও ধারে স্নান করিয়া আহ্নিক করিতেছে। আমি স্নান করিয়া এ ধারে নির্জ্জনে আসিয়া বসিয়াছি। বাবা খানিকটা উপরে পায়চারী করিতেছেন। আমাদের বাড়ী নিকটেই এখন আমরা বিশ্বেশ্বর দর্শন করিতে যাইব; চল তোমাকে মার কাছে লইয়া যাই; ঐ দেখ তাঁর আহ্নিক শেষ হইয়াছে।"

উৎফুল্ল হৃদয়ে দুই জনে ঘাটের অপর দিকে গেলেন সেখানে তখন সুশীলার মা সান্ধ্যকৃত্য সারিয়া উঠিয়াছেন। জামাইকে মেয়ের সঙ্গে দেখিয়া তিনি আনন্দে ও বিস্ময়ে বিহ্বল হইলেন। নরেন্দ্র শাশুড়ীকে প্রণাম করিলেন।

বেড়াইতে বেড়াইতে যোগেন্দ্রনাথ সেই দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন. একটি পুরুষ মানুষকে মেয়েদের কাছে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এমন সময় নরেন্দ্র ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন সুশীলার হস্তস্থিত লণ্ঠনের আলোকে তাঁহার মুখ স্পষ্ট দেখা গেল। যোগেন্দ্রনাথ ছুটিয়া নীচে নামিলেন।

সে আনন্দ-মিলনে যে কাহার সুখ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল তাহা লইয়া দীর্ঘকাল বাদানুবাদ হইয়াছিল। বিস্ময়ও কাহারও অল্প ছিল না। নরেন্দ্র ও সুশীলার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময়ের কথা ইহাই হইল যে কেমন করিয়া এত অল্প কথায়

ব মিটিয়া গেল। দুজনেই মনে করিয়াছিল । যদি কখনো দেখা হয়, তবে একটা ব বড় রকমের বোঝা-পড়া হইবে। তাই নেই সেই সম্ভাবিত তর্কের জন্য সর্ব্বদাই ত হইতেন। কিন্তু মিলন যখন আসিল উভয়ের হৃদয়ের প্রবল বন্যা সকল কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল, নীরবে দের ছিন্নকল্প হৃদয়বন্ধন অলক্ষ্যে কিরূপে া লাগিয়া গেল কেহ বুঝিল না।

কলে বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত নে। সুশীলা বলিল বিশ্বেশ্বরের রে প্রণাম না করিয়া ঘরে যাওয়া হইবে অগত্যা তাহাই হইল। ইহার কারণ লা চুপি চুপি নরেন্দ্রকে বলিল "তাঁহার ট রোজ তোমার জন্য মাথা খুঁড়িয়া য়ার পাইয়াছি, তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়াই মার প্রথম কর্ত্তব্য।" নরেন্দ্র হাসিলেন। ক নরেন্দ্র মনে মনে ভাবিলেন এ নের নিমিত্ত যদি কেহ প্রণম্য হয় তবে অনিল।

অনিলের কথা মনে পড়িতেই নরেন্দ্র াকে একটু একান্তে ডাকিয়া বলিল ার একটি অনুতপ্ত অপরাধী তোমার মার প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহাকে াকিব কি।"

বিস্মিত হইয়া সুশীলা জিজ্ঞাসা করিল "কে সে?" নরেন্দ্র বলিলেন, "অনিল।"

সুশীলা ভ্রূকুঞ্চিত করিল; আজিকার দিনেও সে অনিলকে ক্ষমা করিতে পারিল না। সুশীলা বলিল, "তুমি তো সব জান, বে তুমি যদি আজ্ঞা কর তাহার সহিত দেখা করিতে হইবে।"

নরেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "আমি সব জানি, তোমা অপেক্ষা কিছু বেশী জানি তাই বলিতেছি তুমি তাহাকে ক্ষমা কর; সকল কথা আমি তোমাকে পরে খুলিয়া বলিব।" বলিয়া নরেন্দ্রনাথ নৌকার দিকে অগ্রসর হইলেন। নৌকা এ ঘাটের কিছু ভাটীতে বাঁধা ছিল, তিনি সেখানে গিয়া ডাকিলেন "অনিল।"

অনিল উত্তর করিল না; মাঝি বলিল সাহেব তীরে উঠিয়া গিয়াছেন, বাবুর জন্য একখানা চিঠি রাখিয়া গিয়াছেন। নরেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া চিঠি হাতে লইলেন, লণ্ঠনের কাছে গিয়া খুলিয়া দেখিলেন অনিল তাহার নোটবুক হইতে একখানি পাতা ছিঁড়িয়া তাহাতে পেন্সিলে লিখিয়াছে।

"ভাই নরেন আমি বিদায় হইলাম। তুমি আমার অনুসন্ধান করিও না। সুশীলার সঙ্গে তোমার মধুর মিলন আমি দেখিলাম। ভাবিয়াছিলাম এই মিলন ঘটাইতে আমার তাহার সম্মুখে দেখা দিতে হইবে। তাহার যে প্রয়োজন হইল না তাহাতে আমি সুখী হইয়াছি। এ কালামুখ আর আমি সুশীলাকে দেখাইতে পারিব না। তোমাকেও না। বিশেষতঃ যখন আমি মনে মনে জানি, আমি এখনও সুশীলাকে ভালবাসি। অতএব জন্মের মত বিদায়। আমার সঙ্গে তোমরা আর দেখা করিতে চাহিও না। আমার অনুসন্ধান করিও না।——অনিল।"

সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া অনিল তীরে উঠিয়াছিল, সেখান হইতে অবিলম্বে ষ্টেশনে যাইয়া গয়ার ট্রেণ ধরিয়াছিল।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত।

চক্ষুদান *

গ্রন্থখানি উদ্দেশ্যমূলক উপাখ্যান। গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার স্বয়ং বলিয়াছেন "আর কতকগুলি কথাও এই গ্রন্থে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। বিধাতার রাজ্যে উচ্চশ্রেণী নিম্নশ্রেণী নাই। শিক্ষা ও সাধনায় সকল শ্রেণীই দেবত্বের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। অবনমিত জাতির প্রতি প্রীতি ও সহানুভূতি বিস্তার করিতে হইবে। রমণীগণকে প্রাচ্য আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মানুষ গড়িতে হইবে। কেননা তাঁহারা জননীরূপে জাতির শিক্ষাদাত্রী। পৌরোহিত্যের আদর্শ উচ্চ। অজ্ঞান ও কুসংস্কার, সঙ্কীর্ণতা বা বাহাড়ম্বর ধর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে। ধর্ম্ম—মানুষ, সমাজ ও ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্যসম্পাদনে; এক কথায় জগতের কল্যাণ-সাধনে। আনন্দ আত্মসুখে বা ভোগে নহে, আত্মবিসর্জ্জনে। মানুষ মাত্রেরই মনুষ্যত্বলাভের অধিকার আছে। এ তৃষ্ণা প্রবল ও সার্ব্বজনীন। অধঃপতন হইতে আত্মোন্নতি সকলেরই আয়ত্তাধীন।" এই উন্নত এবং বিপুল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গ্রন্থকার যে উপাখ্যানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে এই—

পৌরোহিত্যব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্যের এক মাত্র পুত্রের নাম নরেশ। নরেশ পিতৃব্যবসায়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া ইংরাজী শিখিতে ইচ্ছুক—পিতা সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষ পাতী। সুতরাং শিক্ষা-সম্বন্ধে পিতা ও পুত্রের মধ্যে মতভেদ ঘটে। এই মতভেদের ফলে পুত্র ইংরা বা সংস্কৃত কিছুই না শিখিয়া স্বেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলেন। পিতা পু ক্রমশঃ বিরোধ ঘটিল। ফলে পুত্র গৃহত্যা হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে নরেশের বিবাহ হইয়াছি এবং তাঁহার একটী কন্যাও জন্মিয়াছি নরেশের স্ত্রীর নাম সাবিত্রী। সাবি সতীসাধ্বী পতিব্রতা।

নরেশ স্ত্রীকন্যাকে ফেলিয়া দেশত্য করিলেন। ক্রমশঃ তিনি ব্রহ্মদেশে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কোন সাহায্যে কিছু ইংরাজী শিখিয়া নরেশ কর্ম্ম পাইলেন। কর্ম্মে ক্রমশঃ তাঁ উন্নতি হইতে লাগিল। কিন্তু নরেশ আর বাটী ফিরিলেন না, বা সংবাদ লইলেন না। অবশেষে নরেশ মেমিওতে এক ব্রহ্মদেশীয়া ফুলওয়া মা-পুর প্রেমে পড়িলেন। মা-পুর তাঁহার ধর্ম্ম, উন্নতি, উচ্চচিন্তা সব ভা গেল। ক্রমে তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলে অভাবের তাড়নায় শেষে এক দিন বাড়ী পীড়ার সংবাদ দিয়া টাকা পাঠাইবার টেলিগ্রাফ করিলেন। পীড়ার সংবাদ প নরেশের পিতৃব্যপুত্র অতুল সাবিত্র লইয়া নরেশের কর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইল বিপদ দেখিয়া মা-পু সাবিত্রীকে করিবার জন্য সাবিত্রীর দুগ্ধে বিষ মিশা কিন্তু ভ্রমক্রমে সেই দুগ্ধ নরেশের ি

* শ্রীশিবরতন মাইতি প্রণীত। মূল্য ১।

উপস্থিত হইল। দুগ্ধ পান করিয়া নরেশ পীড়িত হইয়া পড়িলেন ও অনেক কষ্টে রক্ষা পাইলেন। নরেশ সুস্থ হইলে মা-পু নরেশকে বুঝাইয়া দিল যে নরেশের দুগ্ধে বিষ দেওয়া সাবিত্রীরই কাজ। নরেশ তাহাই বিশ্বাস করিয়া সাবিত্রীকে বাসা হইতে দূর করিয়া দিলেন। সাবিত্রী মেমিও হইতে অতুলের সঙ্গে দেশে ফিরিয়া আসিলেন। সেই খানে স্বামী অভয়ানন্দের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। স্বামীজির সদুপদেশে সাবিত্রীর নবজীবন আরম্ভ হইল। দেশে ফিরিয়া সাবিত্রী পল্লীর কল্যাণ সাধনে মনোনিবেশ করিলেন। অতুলও "ডাক্তার" উপাধি গ্রহণ করিয়া আদর্শপুরোহিতরূপে গ্রামের ও দেশের হিতসাধনে ব্যাপৃত হইলেন।

নরেশ বহুকাল পরে নানা দুঃখ-দুর্গতি ভোগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া পরহিতে আত্মনিয়োগ করিলেন ও পত্নী-পুত্র লইয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

মূলতঃ ইহাই উপন্যাসের আখ্যানবস্তু। এতদ্ভিন্ন বাহারাম, মোহিনী প্রভৃতি আরও কতকগুলি অবান্তর চরিত্র এই উপন্যাসে চিত্রিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে মূল আখ্যানের সংস্রব অল্প।

গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নাই। কিন্তু উপন্যাসের মাধুর্য্য রক্ষা করিয়া তাহাতে এতগুলি নৈতিক তত্ত্ব ফুটাইয়া তোলা সুকঠিন ব্যাপার। গ্রন্থকারও যে এই দুঃসাধ্য সাধনে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন এমন কথা বলিতে পারি না। সমালোচ্য গ্রন্থে সমুন্নত উপদেশ ও বহুমূল্য নীতিবাক্যের অভাব নাই। কিন্তু নায়কনায়িকার মুখ দিয়া বা নিজের লেখনীমুখে কতকগুলি উচ্চভাবাত্মক বাক্যপ্রকাশই উদ্দেশ্যমূল উপন্যাসের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট নহে। উপন্যাস ও কথাগ্রন্থের প্রধান পার্থক্যই এই, যে কথাগ্রন্থে যাহা বর্ণিত হয়, উপাখ্যানে নাটকীয় কৌশলে তাহাকেই সজীব মূর্ত্তিতে ফুটাইয়া তুলিতে হয়। বর্ত্তমান গ্রন্থে উপদেশ গুলি উপদেশই রহিয়া গেছে, চরিত্রের সাহায্যে তাহারা সজীবমূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠে নাই। আলোচ্য গ্রন্থের কোন প্রধান চরিত্রকেই বেশ সজীব ও স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। "অতুলচন্দ্র"কে গ্রন্থকার আদর্শ পুরোহিতরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু অতুলচন্দ্রের মহৎ বাক্যে ও বর্ণনায় যত প্রকাশিত, কার্য্যে তত নহে। "সাবিত্রী"রও তাই। সাবিত্রীর পতিভক্তি ও সতীত্ব কতকটা পরিস্ফুট হইলেও তাঁহার পল্লী-হিতৈষণার চিত্র নিতান্ত অনুজ্জ্বল। এ মূর্ত্তিতে আমরা তাঁহাকে পুরললনাগণকে "রামায়ণ" "মহাভারত" শুনান ও উপদেশ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করিতে দেখি না। সাবিত্রীর "মাতৃমূর্ত্তি" আরও অপরিস্ফুট, প্রায় সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। নরেশের চরিত্রও বেশ স্বাভাবিক ও সজীব হয় নাই।

নরেশের উন্নতি, অধঃপতন ও পুনরুদ্ধার সমস্তই যেন সহসা সংসাধিত। কোথাও চিত্তের আন্দোলন, বিবেকের দংশন, বা মনের উপর অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনার প্রভাবের বর্ণনা বা বিশ্লেষণ নাই। নরেশের কতকগুলি কার্য্যে যেন সামঞ্জস্য ও স্বাভাবিকতার অভাব।

যে নরেশ মা-পুর মুখে সাবিত্রীর চরিত্রের প্রতি ঈষৎ কটাক্ষ মাত্রে দৃঢ়স্বরে বলিল "চুপ কর, অন্য বিষয়ে কথা বল। সতীর নিন্দা করিয়া জিহ্বা কলুষিত করিও না।" সেই নরেশই কিছুদিন পরে বিনা বিচারে তাহারই সেবার জন্য সুদূর জন্মভূমি হইতে সমাগতা পতিব্রতা পত্নীকে মা-পুর কথায় নিজের প্রাণনাশপ্রয়াসিনী স্থির করিতে ইতস্ততঃ করিল না!

তারপর যখন নরেশের মোহ ভাঙ্গিয়া গেল, মা-পুর পিশাচ প্রকৃতি আপনার নগ্ন ভীষণতায় তাহার চক্ষের উপর ফুটিয়া উঠিল, তখনো সতীর প্রতি অকারণ অন্যায়াচরণে অনুতপ্ত নরেশচন্দ্র বাটী ফিরিল না। নরেশ ভাবিতে লাগিল ছাড়িব? এ সম্পদে জলাঞ্জলি এই ধ্রুব অধ্যায়, এ তা স্বেচ্ছায় পরিহার করিয়া অনিশ্চিতভাবে দিন যাপন করিব?" এত দুঃখ, এত দুর্দশার পরেও যাহার নিকটে নিজের সুখ নিজের স্বার্থ এত বড় বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহার মধ্যে যে বিশ্বপ্রেম বা দেশহিতৈষণার চিহ্নমাত্র থাকিতে পারে এ কথা মনে হয় না। অথচ এই নরেশচন্দ্রই পুস্তকের নায়ক এবং অবশেষে ত্যাগশীল বিশ্বপ্রেমিক মহাপুরুষরূপে চিত্রিত। গ্রন্থকারের হৃদয়গত আদর্শের ধারণাও বোধ হয় সম্পূর্ণ পরিস্ফুট ও পরিণত হইয়া উঠে নাই। সেই জন্য তাঁহার রচিত আদর্শচিত্রে কিছু কিছু অসামঞ্জস্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার মনোগত বিশুদ্ধ হিন্দু আদর্শচিত্রের মধ্যে অজ্ঞাতে যেন কিছু কিছু পাশ্চাত্য বর্ণের আভাস রহিয়া গেছে। গ্রন্থকার উভয়ের সামঞ্জস্য বিধানে মনোনিবেশ করেন নাই।

গ্রন্থকার এক স্থলে লিখিয়াছেন "সাবিত্রী জানিতেন পতি সৎ হউন, অসৎ হউন, ন্যায় বা অন্যায় করুন, স্ত্রীর তিনি ইষ্টদেবতা।" আবার স্থানান্তরে তিনি সেই সাবিত্রীর মুখ দিয়াই বলিয়াছেন "দেশের পুরুষগণ উন্নত হইলেই জাতীয় মঙ্গল হইবে না। রমণীগণকে কুসংস্কার দূর করিয়া প্রকৃত সংস্কারের পথে অগ্রণী হইতে হইবে। ... সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলামঙ্গল, উন্নতি অবনতি আমাদের উপর নির্ভর করিতেছে।" পূর্ব্বোক্ত অন্ধ পতিভক্তির সঙ্গে শেষোক্ত আত্মনির্ভর ও স্বাধীনতার সামঞ্জস্য কিরূপে সম্ভব গ্রন্থকার একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন। আদর্শ পুরোহিত অতুলচন্দ্রের জীবনে "মোহিনী"-প্রসঙ্গও এইরূপ আদর্শসম্বন্ধে অস্পষ্টদর্শিতার পরিচায়ক। ছাত্রজীবনে অটল ব্রহ্মচর্য্য এবং অবিচলিত-সংযমই পরমার্থপরায়ণ হিন্দুজীবনের আদর্শ। সুতরাং কৈশোরে সুন্দরী প্রতিবেশী কন্যার প্রণয়-প্রসঙ্গ আদর্শ পুরোহিত-জীবনের পক্ষে গৌরবজনক নহে। কথা উঠিতে পারে যে অতুলচন্দ্রের অপূর্ব্ব ত্যাগশীলতা দেখাইবার জন্য "মোহিনী"-প্রেমের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকারের সতর্কতার অভাবে ইহা দ্বারা সে উদ্দেশ্যও সাধিত হয় নাই।

অতুলচন্দ্র যে মোহিনীকে ভালবাসিতেন এ কথার উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায়

...। অতুল নিজমুখেই বলিয়াছেন "আমি মোহিনীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী নহি।"

যাহাকে ভালবাসি না, যাহার সুসর্গ আমার প্রার্থনীয় বা প্রীতিপ্রদ নহে, তাহাকে ... দেওয়ার মহত্বই বা কি আর মনুষ্যত্বই বা কি! বরং এক হিসাবে ইহাতে অতুলের হৃদয়হীনতাই সূচিত হয়। "বাঙ্গারামের" স্বগতোক্তিতে প্রকাশ যে মোহিনী অতুলের প্রতি অনুরক্তা এবং এ তথ্য অতুলের কতকটা পরিজ্ঞাত। এরূপ স্থলে মোহিনীর সুখদুঃখের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া তাহার ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি লক্ষ্যমাত্র না করিয়া বন্ধুর হস্তে "মোহিনী"-সমর্পণের বিশ্বব্যাপী উদারতা হৃদয়হীনতারই নামান্তর নহে কি? হিন্দু সন্তানের সুশিক্ষার জন্য গ্রন্থকার বৈদ্যনাথে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম-প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থে এই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের আদর্শ ও অধ্যাপনাপ্রণালী সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। আছে শুধু এই—"বঙ্গবাসিগণ শুধু দেবনাগর অক্ষর গ্রহণ করুন। বশিষ্ট কার্য্য ভিন্নপ্রদেশবাসিগণ করিবেন।" বঙ্গসাহিত্যকে কেবল দেবনাগর অক্ষরের পরিচ্ছদে সাজাইলেই ভারতবর্ষের পুনরুদ্ধার হইতে পারে, এত বড় দুরাশাকে হৃদয়ে স্থান দিতে চিত্তে স্বতঃই সঙ্কোচের উদ্রেক হয়।

যাহা হউক এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটি ছাড়িয়া দিলে গ্রন্থখানি সুপাঠ্য; গ্রন্থের ভাষা বিশুদ্ধ ও সরল এবং গ্রন্থখানি নানা উচ্চ ভাবে পরিপূর্ণ। ব্রহ্মদেশসংক্রান্ত বর্ণনাগুলি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক এবং নানা জ্ঞাতব্যে পরিপূর্ণ।

সত্যরঞ্জন বাবু সুশিক্ষিত, ভাবুক এবং দেশহিতৈষী। এখনো তাঁহার তরুণ বয়স। সুতরাং আমরা তাঁহার নিকট আরও অনেক আশা করিতে পারি। আমাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস তাঁহার পরিণত লেখনী বঙ্গসাহিত্যের সৌষ্ঠব সাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। এবং এই বিশ্বাস আছে বলিয়াই আমরা তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটগুলিও উপেক্ষা করিতে পারিলাম না।

সমালোচক।

আরতি

[পঞ্চম "বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে" হুগলির সভায় পঠিত]

কোন্ সে অতীত যুগে জগতের
আদি-মহাকবি
সুধা-স্রাবী উদাত্ত ঝঙ্কারে,
তোমারি আরতি-গীতি হে ভারতি,
হে আরাধ্যা দেবি,
শুনাইলা বিমুগ্ধ সংসারে!
গলিল সপ্ত সিন্ধু, আলাপিল স্রোতস্বিনীদল,
মুখরিল বিহঙ্গ সমাজ,—
যুগের ঘুমন্ত-প্রাণে উদ্ভাসিল দীপ্তি নিরমল
শিহরিল ষড়ঋতুরাজ!

তখন কত দেশে কত কবি কত মহাজন
কত ছন্দে পূরি' চিত্ত-বীণা,
হে জননী বীণাপাণি! অর্চ্চিয়াছে ও
রাঙ্গা চরণ
আজি তার কে করিবে সীমা!
যুগে যুগে ধরিত্রীও অন্তরের নিভৃত পরতে
সঞ্চিত সে পীযূষ-উচ্ছ্বাস,—
তৃষিত আত্মার চির-আনন্দের উৎস এ মরতে
দুর্ল্লভের মিলন আভাষ!

অধঃ অক্ষম মোরা, কোথা পাব হেন:
আয়োজন,
কোথা হেন পূজার বিধান,—
মনীষ প্রাসাদ বুঝি দীন শুধু ক্ষুদে বিলোকন
বক্ষে লয়ে আকাঙ্ক্ষা অপার!

তবু যাগো, আহরিয়ে
হৃদয়ের ভক্তি-প্রীতি মনে
বসন্তের মাধুরী নিবিড়,
উদার আকাশ তলে
শত আশা-ব্যাকুলিত মনে
রচিয়াছি পূজার মন্দির !

দিকে দিকে বিচ্ছুরিয়ে
সুধাভরা তড়িৎ-হিল্লোল
পরিপূর্ণ নব চেতনার,
এস তুমি, এস তুমি, হে কল্যাণি
জীবন-কল্লোলি,
কৃপাময়ী উপাস্যা আমার !
আজি হেথা কোটি প্রাণে
বিরচিয়া একটী আলিকা
এস ও পদ-কমলে—
এসো সরস্বতী, সর্ব্বার্থসাধিকা,
সিত নয়নের তলে !

নিল ধারা ব্যাপ্ত করি বিশ্ব-চরাচর
তব মুক্ত বীণার লহরে,
ধরিয়া পড়ুক আজি যত দৈন্য-কালিমানিকর
ঘুচায়ে—ভাসায়ে চিত্তভরে !
হে শুভ্রে ! আজি সবে
করে দাও পবিত্র সুন্দর
মোদাতম তোমারি পূজার,—
সাধনা সার্থক হাক্ !
হোক্ তৃপ্ত নিখিল অন্তর
লভি প্রাণে পরশ তোমার !

হে মাতঃ ! নাট্য-পূজা-মণ্ডপের
প্রধান পূজারি !
সুহৃদয়, সজ্জন-বৎসল,
তোমা, মোরা ধরি সব
প্রীতি-মন্ত্র সম্ভ্রমে উচ্চারি'
করি অর্ঘ্য প্রদা-নিরমল !
চিরন্তন আদিত্য তুমি
সমুজ্জ্বল বিংশ শতাব্দীর,
দীপ্ত-নেত্র, প্রসন্ন-আনন,
এস হে আজি হেথা অনাবিল আনন্দে গম্ভীর
সর্ব্ব ত্রুটি করিয়া মার্জ্জন !

হে সৌম্য ! না জানি আজ
কি মহান্ সুর সঙ্গে তে
জননীর চিত্তে বন্দনা,—
তুমি ধ্বনিত বুঝি কণে কণে লবে সারা-চিতে
পূর্ণ করি সকল কামনা !
বড় আশা জাগে প্রাণে
ক্ষুদ্র আমি, এ ক্ষুদ্র অঞ্জলি
সযতনে রচিয়া অঞ্জলি
এনেছি তোমার তরে, কৃপাকরে করুণাময়ীর
পদ্মযুগে অর্পিতে কেবলি !

বেজেছে মঙ্গল-শঙ্খ বাঙ্গালার গৃহে গৃহে আজ
পশিয়াছে মায়ের আহ্বান,—
অন্ধকারে আপনার লয়ে ব্যথা ঘোর-লাজ
কে রহিবে মায়ের সন্তান !
বাগ্দেবীর পূজালয়ে নাহি
কোন বাধা-ব্যবধান
নহে তুচ্ছ কিছুই হেথায়,—
দীনতা হীনতা ভুলি, ভুলি সর্ব্ব গর্ব্ব-অভিমান
এস সবে প্রমুক্ত হিয়ায় !

এ যে সম্মিলন-ভূমি—পূজা-পীঠ
নিখিল জনের—
শতদল বিশ্ব-প্রতিভার,—
হেথায় সোদর সবে, আলিঙ্গন প্রাণের প্রাণে
পরিচয় আত্মার আত্মার !
দ্বিধা-হীন অসঙ্কোচে লয়ে পূত উপায়নরাশি
এস এস তীর্থ-যাত্রিগণ !
ধ্যানময়ী জননীর নিরাময়া বরাভয়-হাসি
হবে পলে কৃতার্থ জীবন !

হে বরদে ! হে মোক্ষদে !
লহ আজি লহ রাজরিত
প্রাণভরা বোধন আরতি !
ভুবন-গৌরব-মণি বরীয়ান্ সুধী মণ্ডলীর
লহ অর্ঘ্য আজি হে ভারতি !
তব দীন সন্তানের অন্তরের উচ্ছ্বসিত গান
লহ লহ জননী আমার !
হোক্ বিশ্ব মধুময়—বিকশিত প্রসূন অম্লান-
পুণ্যময় নির্ম্মালা পূজার ॥

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত ।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ।